প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪০শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪৭

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

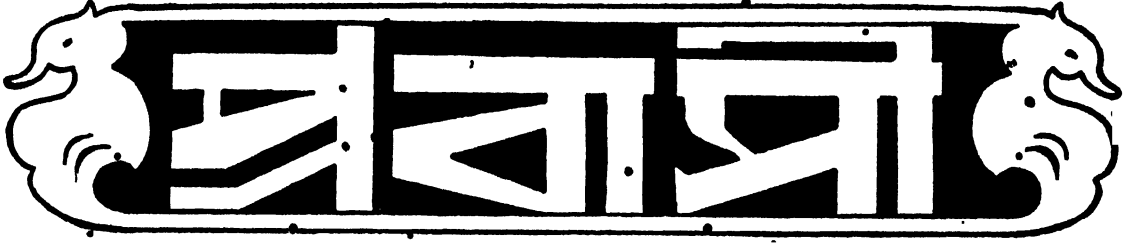
বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন

একবর্ণ





"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪৭

১ম সংখ্যা

পরিস্থিতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে বছর পুষেছিল এক পাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে
পায়রা জমায় সভা বকবকবকমে।

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে
প্যারাগ্রাফে ঠোকর লাগে তার চক্ষে।
তিন দিন ধরে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয়।
কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ
পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।
"রানাঘাট সমাচারে" লিখেছে রিপোর্টার,
আঠারই অঘ্রাণে শুরু হ'তে ভোরটার
বেশি বই কম নয় ছয়-সাত হাজারে
গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে।

এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার
গাপ্ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার।
ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেণ্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।
এডিটর বলে এতে পুলিসের গাফেলি,
পুলিস বলে যে, চলো বুঝে সুঝে পা ফেলি।
ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এ সব ফসল ফলে কনগ্রেসি শস্যে।
সবজির বাজারেতে মূলো মোচা সস্তায়
পাওয়া গেল বাসি মাল ঝাঁকা ঝুড়ি বস্তায়।
ঝুড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা
যশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা।
"মহাকাল" লিখেছিল ভাষা তার শানানো
চালতা-ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো ;
বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু-পক্ষে
শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে।
দাঙ্গায় হাঙ্গামে মিছে করে লোক গোনা,
সংবাদী সমাজের কখনো এ যোগ্য না।
আর এক সাক্ষীর আর এক জবানী,
বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী।
যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেব্‌ড়ে,
ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই থেবড়ে।
শুনে এডিটর বলে এ কি বিশ্বাস্য,
কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাশ্য।
জানি না কি ও-পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল
ভবানী লিখল এ যে আগাগোড়া লাইবেল্।
মাঝে থেকে গায়ে পড়ে চ্যাঁচায় আদিত্য
আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব !
কোন্ বংশে যে মোর জন্ম তা জানো তো,
আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত।
আমার বোনের যোগ বিবাহের সূত্রে
ভজু গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে।

এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে
গো বটে গোয়ালবাসী জানি তাহা আমি যে।
ঠাট্টার অর্থটা ব্যাকরণে খুঁজতে
দেরি হ'ল, পরদিনে পারল সে বুঝতে।
মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা
এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না।
ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোষনাম।
কোথায় তলিয়ে যাবে সাতকড়ি ঘোষ নাম।
জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই
আদালতে কত করে পেয়েছিল সে রেহাই।
ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে,
নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে
তার কথা বলি যদি— এই ব'লে বলাটা
শুরু ক'রে ঘেঁটে দিল পঙ্কের তলাটা।
তার পরে জানা গেল গাঁজাখুরি সবটাই
মাথা-ফাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই।
মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা,
পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা।
আসল কথাটা এই, ঝটলা ও পটলা
বাধাল ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা।
শুধু কুলি চার জন করেছিল গোলমাল
লাল পাগ্ড়ি সে এসে বলেছিল তোল্ মাল।
গুড়ের কলসীখানা মেতে উঠে ফেটেছিল,
রাজ্যের খেঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল;
বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার,
দোকানিরা বলেছিল এ যে ভারি দিক্‌দার।
সাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী
গ্রামের নিন্দে সে যে সইতেই পারে নি।
নেহাত পারে না যারা পাবলিশ্ না ক'রে
সব শেষ পাতে দিল বর্জই আখরে।
প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়।

ঠিকমতো সংবাদ লিখেছিল সজনী,'
সহ্য না হ'ল সেটা শুনেছে বা ক-জনই।
জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে
যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে
আদরের ভাগনের কী কেলেঙ্কারী সে
বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে।
হিতসাধিনী সভার চাঁদা চুরি কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড।
ছেলেরা দু-ভাগ হ'ল মাগুরার কলেজে,
এরা যদি বলে বেল ওরা লাউ বলে যে।
চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে
তারা লাগে দু-দলের সভা-ভাঙা কাজেতে।
দলপতি পশ্চাতে রব তোলে বাহবার,
তার পরে গোলেমালে হয়ে পড়ে যা হবার
ভয়ে ভয়ে ছি ছি বলে কলেজের কর্তারা,
তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা।

একদা দু-এডিটরে দেখা হ'ল গাড়িতে,
পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে।
ফোঁস করে ওঠে ফের্ পুরাতন কথা সেই,
ঝাঁজ তার পুরো আছে আগে ছিল যথা সেই
এক জন বলে বেল, লাউ বলে অন্যে,
দু-জনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হন্যে।
দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের।
পয়লা দরের knave, idiot কি কেবল,
liar সে, humbug, cad unspeakable ;
এই মতো বাছাবাছা ইংরেজি কটুতা
প্রকাশ করিতে থাকে দু-জনের পটুতা।
অনুচর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ.
কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ভেউ ভেউ।

হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সবে রঙ্গ,
গার্ড এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ।
গার্ডকে সেলাম করি, বলি ভাই বাঁচালি,
টার্মিনাসেতে এল রেল-ছোঁড়া পাঁচালি।

ঝিনেদার জমিদার বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হেলে দুলে হাঁসগুলো চলে বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বকবকবকমে॥

উদয়ন
৯।৩।৪০

দ্বিজেন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

তাঁর শাসনে অগ্নি তাপ দিচ্ছে, সূর্য আলোক দিচ্ছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, আর মৃত্যু হচ্ছে ধাবমান।

এই একটি আশ্চর্য শ্লোক। সহজেই মনে হয় মৃত্যুই যায় থেমে, মৃত্যুই দেয় থামিয়ে। কিন্তু কোন্ ঋষির অনুভূতিতে দেখা দিল, মৃত্যুই চলে, মৃত্যুই চালায়, সে নইলে স্তব্ধ হয়ে যেত যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এই চলমান জগতে যা কিছু গতিশীল। তিনি দেখেছেন উত্তাপ আলোক জল ও বায়ুর মতো যতগুলি চলৎশক্তি সৃষ্টিকে প্রকাশ করার কাজে নিযুক্ত মৃত্যুও তাদেরই সহকারী একটি, এমন কি তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো করে যেন নাম দিয়েছেন তার, বলেছেন মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। আর সকল শক্তি আপন আপন বিশেষ নির্দিষ্ট কাজ করছে, কেবল মৃত্যুর কাজ হচ্ছে বিশ্বকে নিয়ে ধাবমানতা। এ শক্তি বিনাশের নয়, এ শক্তি সৃষ্টি-প্রবাহের সবচেয়ে প্রবল ধারা। যখন অলস কালের মন্থরতায় জগতের গতিতে কোথাও শৈথিল্য ঘটে তখন জড়তার বাধা ভেঙে দিয়ে মৃত্যু ধাবমানতার পথ অবাধ ক'রে দেয়। মৃত্যুই জগতের রথযাত্রার বাহন। মৃত্যু জরাসন্ধের দুর্গ ধূলিসাৎ করতে উদ্যত।

আমি আজ নিজের কথা জানাই। এই তো দেখছি জরা ক্রমশই আমার চার দিকে তার ফাঁসগুলি আঁট ক'রে দিচ্ছে। সৃষ্টিগতিস্রোতের সঙ্গে আমার যে-সব ইন্দ্রিয়-বোধশক্তির সহচারিতা এত দীর্ঘকাল চলে এসেছে আজ তাদের মাঝখানে ক্রমশই নানা বেড়া উঠছে স্থূল হয়ে। সেই ব্যবধানে প্রতিহত হয়ে জীবনলীলা চিরকালের জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কথা সহজে মনে আসতে পারে, কেননা এই ব্যবধানের অতীত পথে যে অস্তিত্ব-স্রোত তাকে আমরা দেখতে পাই নে। কিন্তু য এতদ্ বিদুঃ, যাঁরা একে জানেন তাঁরা জানেন, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ, মৃত্যু চলেছে অচলতার ব্যবধান ভেদ ক'রে দিয়ে। বিনাশ যদি কোনো-খানেই সৃষ্টির প্রতিকূল সত্তারূপে থাকত তাহলে সেই রন্ধ্র দিয়ে বহিঃসৃত হয়ে সৃষ্টি কোন্ কালে যেত অতলে।

তলিয়ে, বিশ্বের আদি ও অন্তে বিরাট্ হয়ে দেখা দিত জরার পাণ্ডুর কুঞ্চিত মূর্তি মৃত্যু যদি পদে পদে পুরাতনকে আঘাত করার দ্বারা নিরন্তর না জাগিয়ে তুলত তাকে নূতনের রূপে রূপান্তরে। সব কিছু একাকার হয়ে যেত অবৈচিত্র্যে, সব চলা হয়ে যেত স্তব্ধ। কিন্তু ক্লান্তিবিহীন মৃত্যু দূর ক'রে দেয় সঞ্চরমান কালের ক্লান্তি। জীর্ণতাকে সে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে নূতন রচনার তোরণ নির্মাণ করছে সেই উপকরণে। প্রথমকে সে বারে বারে ফিরিয়ে আনছে শেষকে অতিক্রম ক'রে। সেই জন্যেই তো শ্রাদ্ধের দিনে মৃত্যুর সামনে এই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় মধু দ্যৌঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধুময় অন্তরীক্ষ মধুময় পৃথিবীর ধূলি। মধুময় কিনা আনন্দময়। এই আনন্দই সত্যের পরিপূর্ণ পরিচয়।

বিজ্ঞানীরা সূক্ষ্ম গাণিতিক গণনায় হিসাব ক'রে বলছেন কালের কোনো একটা বিশেষ দূর সীমানায় বিশ্ব আপনার ক্রমবিস্ফারিত স্ফীতিতে বিদীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হবে। কিন্তু বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এই চরম বিলোপের তত্ত্বই যদি সত্য হ'ত তাহলে আগামী ভবিষ্যতের কোনো এক বিশেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করত না। অসীম কালের মধ্যে বিশ্ববিনাশ কোনো একটামাত্র বিশেষ বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকার সীমার মধ্যে একবারের মতো প্রমাণিত হয়ে চিরকালের মতো স্থির হয়ে যেতে পারে এমন কথা মানতে পারি নে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলছে বিশ্বধারাকে সম্পূর্ণ থামতে দেওয়া হবে না, কেবল আলোক নয় উত্তাপ নয়, মৃত্যুর্ধাবতি। মৃত্যু চলবে চালনা করবে। তাঁদের সেই ধ্যানদৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই, আছে কল্পকল্পান্তর, প্রকাশের পর প্রকাশের অনুবর্তন প্রলয়ের পর প্রলয়ের চক্রপথে।

এই যদি মানতে হয় তাহলে বলতে হবে ব্যক্তিগত জীবনেও বারংবার ছেদ আছে কিন্তু নেই শেষ দাঁড়ি। এই কথাটাই ভাবছি যখন জরার প্রদোষচ্ছায়া নেমে এসেছে প্রাণের ক্ষেত্রে। বছর-কয়েক পূর্ব্বেও এই ধরিত্রীর লীলাস্থলীতে দৃষ্টির আমন্ত্রণ, শ্রুতির আমন্ত্রণ, স্পর্শের আহ্বান আমার কাছে ছিল নানা দিকে অবারিত। আমার চৈতন্যের সঙ্গে বিশ্বের বিচিত্র যোগ ছিল বহু-বিস্তৃত; ছিল অব্যবহিত। ক্রমে পর্দা নেমে আসছে যেমন পর্দা নামে নাটকের যে অঙ্কে অবসানের যতি আসে; পর্দা দেয় তাকে নিরোধ ক'রে পরের অঙ্কে প্রদীপ জ্বলে ওঠবার পূর্বে। জীবনের রঙ্গভূমিতে ছায়া প'ড়ে আসছে, দীপশিখা কিছু কিছু নিবছে, কিন্তু এ কেবল অঙ্কের সমাপ্তি, নাট্যের অবসান তো নয়। অবসানের অনুভূতিই তো পাই নে। যে অস্তিত্বকে এত দিন একান্ত জেনেছি তার সম্বন্ধে কিছু কিছু কম পড়তে পারে কিন্তু নেই ব'লে তাকে তো চৈতন্যের কোনো সীমাতেই অনুভব করতে পারি নে। না জিনিসটা যে বোধের অগোচর।

জানি এ বিষয়টা তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্তের বিষয় নয়, যে একে মানবে না সে মানবেই না, যে মানবে সে আপন আত্মপ্রত্যয়ের সাক্ষ্য দিয়েই মানবে। বাদ-প্রতিবাদ থাক্, আমি যুক্তির কথা তুলব না—আমি বলব, বিশ্বের মূলমন্ত্র হচ্ছে ওঁ, হাঁ, সে হচ্ছে সমুচ্চারিত এই বাণী, অয়মহং ভোঃ, এই আমি আছি। মৃত্যু এই বিরাট্ অস্তিত্বকে নব নব জাগরণের মধ্য দিয়ে বহন ক'রে নিত্যই চলেছে। আজ আমার প্রাণশক্তিতে সুপ্তির আবল্য যদি দেখা দেয় তবে তাকেই চরম সত্য ব'লে বিশ্বাস না ক'রে আমি বিশ্বাস করব জাগরণকেই। আমি বেদমন্ত্রের ধ্বনিকেই প্রতিধ্বনিত করব—প্রাণো বিরাট, প্রাণ সমস্তকে নিয়ে, প্রাণো মৃত্যুঃ, প্রাণ মৃত্যুকে নিয়ে।

ভারতবর্ষে আমাদের পিতামহেরা বলেছেন তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ, সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাঁর মধ্যে নাস্তিত্ব কোথাও নেই। কিন্তু এ কথা মুখের কথায় জানা নয়, জানো বলতে বোঝায় আপনার মধ্যে উপলব্ধি করো। এই যে প্রাণময় চৈতন্য আছে বিধৃত হয়ে এক অসীম চৈতন্যময় পুরুষে এ কথা সুস্পষ্ট করতে হ'লে আপন চৈতন্যকে মলিনতামুক্ত করতে হয়, বিশুদ্ধ করতে হয়, তার চার দিক থেকে অহমিকার বেড়া সরিয়ে ফেলতে হয়, আর বিস্তার করতে হয় উদার মৈত্রীকে সকলের মধ্যে।

মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ এই ব্যাখ্যান-মন্ত্র নিয়ে আজ যে আলোচনা করলুম সে হচ্ছে আজকের দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের সূচনা। আজ আমার পূজনীয় বড়োদাদার

জন্মদিনের শতবার্ষিকী। কিন্তু তাঁর জন্মদিন আজ তাঁর জীবনের সূচীপত্রে নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে নির্দেশ করছে না। তাঁর সাতাশি বছর আয়ুকালের সকল দিনগুলিই আজ সমষ্টিভূত হয়ে মৃত্যুর ভূমিকায় একমাত্র বিরাট্ দিনরূপে প্রকাশমান। মৃত্যু তাঁর জীবনকে আজ অখণ্ড ঐক্যে আমাদের কাছে ধরেছে। তাঁর জীবনের প্রথম জন্মদিন আজ তাঁর জীবনের শেষ দিনের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ প্রাণমণ্ডলে অভিব্যক্ত। আজ কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটি, তাঁর মর্ত্য আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্তে রাত্রির কোন্ অদৃশ্য রহস্য থেকে জীবনতরণী উত্তীর্ণ হ'ল প্রভাতের আলোতে, আর সেই তরী অদৃশ্য হয়ে গেল সূর্যাস্তরশ্মির অন্তরাল দিয়ে কোন্ সীমাবিহীনে। কেবল মাঝখানে দেখা গেল তাকে তরঙ্গাহত জীবনযাত্রার বিচিত্র বহুলতায়, দেখা গেল উত্থানে পতনে আলোকে অন্ধকারে। যা অগোচর তা এক দিকে পূর্বে এবং অন্য দিকে পশ্চিমে, কিন্তু এই অগোচরতা কি শূন্যতা। এক দিকে আলোক-সপ্তকের রক্তসীমানা, অন্য দিকে বেগুনি সীমানা অতিক্রম ক'রে আছে অদৃশ্য আলোক, কিন্তু সে তো নিরালোক নয়। অথর্ববেদ বলছেন,

অপূর্বেণেষিতা বাচস্ তা বদন্তি যথাযথম্
বদন্তীর্যত্র গচ্ছন্তি তদাহুর্ব্রাহ্মণং মহৎ।

বাক্য অর্থাৎ কোনো প্রকাশরূপ, কোনো প্রাণরূপ অপূর্বের দ্বারা অনাদির দ্বারা প্রেরিত হয়ে "বদন্তি যথাযথম্" যথাযথকে ব্যক্ত ক'রে যাচ্ছে, বলতে বলতে যেখানে চলে যাচ্ছে তাকে বলে ব্রাহ্মণ তাকে বলে মহৎ। অর্থাৎ প্রকাশরূপ প্রেরিত হচ্ছে অনাদি অগোচর থেকে, সে আপনাকে ব্যক্ত করতে করতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অনন্তে অগোচরে। এই অনাদি এবং অনন্তের অন্তর্বর্তী লীলাময় চৈতন্যকে স্মরণ করি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে, সত্য জেনে প্রণাম করি প্রকাশমানকে এবং অপ্রকাশিতকে, পরাচীনায় তে নমঃ প্রতীচীনায় তে নমঃ।

শ্রাদ্ধ শব্দের মধ্যে আছে শ্রদ্ধা অর্থ, তার দ্বারা বোঝায় যে যাঁকে সম্মান করতে এসেছি তিনি আছেন এ কথা শ্রদ্ধা করি। তিনি ছিলেন গোচরে সত্য, তিনি আছেন অগোচরে সত্য। তাঁর যে স্বরূপকে প্রত্যক্ষ জেনেছিলুম, তাকে আজ অপ্রত্যক্ষে স্মরণ করি।

এই বিশ্বাস করি যে, মর্ত্য প্রাণের জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ ক'রে তিনি নূতন প্রাণের নূতন বস্ত্র পরেছেন। চিরদিন বহির্বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন নিরাসক্ত, অন্তর্নিবিষ্ট ধ্যানপরায়ণ ছিল তাঁর চিত্ত, যারা ছিল তাঁর অনুগত অনুচর তাদের তিনি কখনো অবজ্ঞা করেন নি, তাদের সেবা গ্রহণ ক'রে কৃতজ্ঞতার ঋণ অজস্র পরিমাণে শোধ করেছেন। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁর সকরুণ আত্মীয়তা ছিল প্রসারিত, তরুলতার প্রতি কারো রূঢ় হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শব্দ ও অর্থের রহস্যভেদের আশ্চর্য অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন প্রবীণ, অন্য দিকে তিনি ছিলেন ক্রীড়াপরায়ণ বালক, সামান্য উপকরণে অনাবশ্যক শিল্প-নৈপুণ্য উদ্ভাবনায়। আপনার নিত্যপ্রয়োজন-ব্যাপারে তাঁর ছিল যদৃচ্ছাকৃত অসজ্জিত অবহেলা, অন্যের অভাব-মোচন যদি তাঁর সামর্থ্যে অসাধ্য হ'ত তবে প্রার্থনাকারীর সমান দুঃখেই তাঁকে অধীর করত। এক দিকে আত্মতত্ত্বের সন্ধানে তাঁর মন ছিল গুহাহিত, অন্য দিকে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে তাঁর কবিহৃদয় সর্বত্র পেয়েছে আনন্দিত প্রবেশাধিকার, তাঁর নিভৃত অবকাশ ছিল গভীর গবেষণায় অভিনিবিষ্ট, তাঁর লোকসঙ্গ ছিল কল-হাস্যোচ্ছ্বসিত সৌজন্যে মুখরিত। ইহলোক থেকে প্রয়াণ করবার পূর্বেই পরলোকের সঙ্গে তাঁর জীবনের ব্যবধান ক্ষয় হয়ে গেছে। উভয় লোকের মাঝখানে তাঁর বিষয়-বুদ্ধির জটিল বাধা বা ব্যবস্থা কোনোদিন কিছুই ছিল না। জানি একদা সেই বেদনীয় অসীম চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে আপন চৈতন্যকে তিনি উদ্ভাসিত দেখেছিলেন, তার প্রমাণ ছিল তাঁর নিরহংকার নম্রতায়, আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি আপন দৈন্যের দিকেই লক্ষ্য করতেন, ঐশ্বর্যের দিকে নয়। সাধকের আত্মাভিমানের দুর্গতি তাঁকে কোনোদিন স্পর্শ করে নি। জীবনের শেষ ভাগে এই মন্ত্র উচ্চারণের সত্য অধিকার লাভ করেছিলেন তিনি—

দিষ্টং নো অত্র জরসে নিনেষজ্
জরা মৃত্যবে পরি নো দদাত্বথ
পক্বেন সহ সং ভবেম।

আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে যাক জরায়, জরা নিয়ে যাক সেই মৃত্যুতে যে মৃত্যু আমাকে অসীম পরিণতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেবে।

শান্তিনিকেতন

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৬

[স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে শান্তিনিকেতন মন্দিরে পঠিত অভিভাষণ]

অধ্যাত্ম ও অধিদেহ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

দেহ এবং দেহাতিরিক্ত আত্মা, এ দুইয়ের পার্থক্য সাধারণ লোকেও করিয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা ইহাই ধরিয়া লই যে, দেহ যেমন সত্য, আত্মাও তেমনি সত্য; দেহ প্রত্যক্ষ সত্য, আত্মা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও সত্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়টি যতই সহজ হউক না কেন, দার্শনিকের নিকট উহা তত সহজ নয়। দেহ ও আত্মার পৃথক্ সত্তা, উহাদের সত্যতা এবং পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। তথাপি, দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক একটা পদার্থ আছে, ইহা ধর্ম্ম ও দর্শনের একটি সাধারণ গৃহীত সত্য।

প্রাণবান্ দেহেতে যেমন দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক একটা পদার্থ আছে, তেমনই আমাদের চারি দিকে বর্ত্তমান জড়-জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যেও ঈশ্বর নামক একটি পদার্থ আছেন। যিনি পৃথিবীতে আছেন অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, যিনি পৃথিবীকে চালিত করেন এবং পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছেন—এইরূপ অন্তর্যামী পুরুষের সত্তাও ধর্ম্ম এবং দর্শনের একটি সাধারণতঃ স্বীকৃত সত্য। অবশ্যই, এই অন্তর্যামী পুরুষের সত্তা ও স্বরূপ এবং জীব ও জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ লইয়া প্রচুর তর্ক ও মতভেদ রহিয়াছে। তথাপি, স্পষ্ট হউক, অস্পষ্ট হউক, এরূপ একটি সত্তায় বিশ্বাস মানুষের আছে।

সোজা কথায়, মানুষ আত্মা ও পরমাত্মা অথবা ঈশ্বর মানে; আর, জড় ও চেতনের প্রভেদও স্বীকার করে। ইহা ছাড়া, জড় ও চেতনের মধ্যে চেতন শ্রেষ্ঠ, ইহাও আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। দার্শনিকেরাও এ-সব স্বীকার করেন এবং জগৎ-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেতনের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লন।

জড়বাদী দার্শনিকদের অস্তিত্ব আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। চার্ব্বাকের ন্যায় দার্শনিক পৃথিবীতে অনেক আসিয়াছেন। তাঁদের মতে চেতন নামক কোন পৃথক্ সত্তা নাই; জড়েরই অবস্থা বিশেষে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। যকৃৎ হইতে যেমন স্বভাবতই পিত্ত নিঃসৃত হয়, তেমনই মস্তিষ্ক নামক জড়দেহের অংশবিশেষের ক্রিয়াবিশেষের নাম চিন্তা এবং উহারই অবস্থাবিশেষের নাম চৈতন্য। আত্মা নাই, ঈশ্বরও নাই। এরূপ একটি মতবাদ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে অনেকেই পোষণ করিয়াছেন এবং এখনও করেন।

তথাপি সাধারণ মানুষের মন হইতে ঈশ্বরে বিশ্বাস একেবারে তিরোহিত এখনও হয় নাই। দর্শনেও এখন পর্য্যন্ত উহা প্রবলই রহিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত দর্শনের সাধারণ প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে আমরা জড় ও চেতনের প্রভেদ স্বীকার করি এবং জড় হইতে চেতনকে বড় বলিয়াও মানি। আর, সমস্ত পদার্থের মধ্যে আত্মা বড় এবং সমস্ত জগতের মধ্যে অধ্যাত্ম বস্তু উচ্চে—এ-কথা অন্য বিষয়ে শত মতভেদ সত্ত্বেও আমরা মোটামুটি মানিয়া লই। তাহার ফলে, জগতের উৎপত্তি বুঝিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং মানুষের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহাও মানি। মানুষ জড় পরমাণুর মত অন্ধ জড়প্রকৃতির শক্তি দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত নয়—ইহাও কম-বেশী স্বীকৃত। আর ব্যক্তি হিসাবে মানুষের যেমন স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে, তেমনই এবং সেই জন্যই সমাজেও মানব-সমষ্টির সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি ভাবে মানুষের সমস্ত ক্রিয়ায় তার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম মাত্রেরই কম-বেশী স্বীকৃত সত্য। দর্শনও মোটামুটি ইহা মানিয়া লয়। ব্যক্তির স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে পাপ-পুণ্যের বিচার চলে না, এবং অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ারও কোন যুক্তি থাকে না। খুন বা রাহাজানি যে করে, সে ঐ অপরাধ না করিয়াও পারিত, এরূপ আমরা মনে করি এবং তাহা মনে করি বলিয়াই অপরাধীকে শাস্তি দিই। কিন্তু বাত্যা,

বন্যা বা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনায় যদি কেহ মারা যায়, তবে সেজন্য কাহাকেও অপরাধী করা হয় না—কেননা, আমাদের বিশ্বাস-মত ইহাদের কোন ব্যক্তিত্ব নাই, কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই।

ব্যক্তি হিসাবে মানুষের এই যে স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহার প্রকাশ তাহার সামাজিক জীবনেও হইয়া থাকে। সমাজে পরিবার, শ্রেণী, প্রভৃতি গোষ্ঠী-গঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা,—এমন কি রাষ্ট্রের উৎপাদন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই কোন-না-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির ক্রিয়াই আমরা দেখিতে পাই এবং সে-ভাবেই আমরা এ-সব ব্যাপার বুঝি। বর্ত্তমানে জার্ম্মেণীর রাষ্ট্র-গঠন যদি ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে, তবে সেই সুকৃতি বা দুষ্কৃতির জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের স্বাধীন ইচ্ছাই দায়ী। ইহার জন্য প্রশংসা বা নিন্দা সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণেরই প্রাপ্য।

মানুষের সমগ্র ইতিহাসকে আমরা এই ভাবে জড়-প্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া দেখি। জড়প্রকৃতি জড়ের নিয়মের অধীন; উহা যন্ত্রের মত চলে; উহাতে স্বাধীন ইচ্ছা কোথাও নাই; উহার সমস্ত ক্রিয়াই অন্ধ শক্তির ক্রিয়া; ভূত-ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, কোন উদ্দেশ্যের জ্ঞান লইয়া প্রকৃতি কাজ করে না। কিন্তু মানুষ উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে; তাহার অতীত ও অনাগতের একটা ধারণা আছে, একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে। সুতরাং তাহার ইতিহাস জড়ের ইতিহাস হইতে ভিন্ন।

জড়ের ইতিহাসে যে অন্ধ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যন্ত্র-শক্তির মত নির্ম্মম; উহাতে কম-বেশীর তফাৎ আছে, কিন্তু পাপ-পুণ্যের প্রভেদ নাই। সূর্য্য যে পৃথিবীর চারি-দিকে ঘুরে না, পৃথিবী যে সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরে—ইহার ভিতর কোন শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট কিংবা পুণ্য-পাপের প্রশ্ন নাই; শুধু আকারে অতএব শক্তিতে প্রভেদ মাত্র এখানে কার্য্য করিয়া থাকে। ঘড়িতে কিংবা তাহার চেয়েও জটিল কোন যন্ত্রে যেমনধারা কাজ হয়, সমস্ত জড়জগতেও ঠিক তাই। অবশ্যই বলা বাহুল্য যে, জগৎ-যন্ত্র মানুষের তৈরি যে-কোন যন্ত্রের চেয়ে ঢের বড়, বেশী সূক্ষ্ম এবং ঢের বেশী জটিল।

কিন্তু মানুষের ইতিহাস ঠিক এমন নয়। এখানে শুধু অন্ধশক্তিই প্রধান নয়। যেহেতু এখানে ব্যষ্টির—এবং কতকটা সমষ্টিরও—একটা সক্রিয় পুণ্যাপুণ্যবিবেক রহিয়াছে, সেইজন্য ইহার গতি ও পরিণতি অন্যরূপ। ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে—এবং সেই জন্যই মানুষের ইতিহাসেও—"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"—যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়; পাপে ক্ষয় হয় এবং ধর্ম্ম দ্বারা উন্নতি হয়। জাতির বেলাও ঠিক তাই। 'Righteousness exalteth a nation'—পুণ্যই জাতিকে উন্নত করে। এত কাল মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে এই বিশ্বাসই লোকে পোষণ করিয়া আসিয়াছে।

জড়ের চেয়ে চেতন বড়, দেহের চেয়ে আত্মা বড়; জড়শক্তির চেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি বড়, এবং সমস্ত জগতের মধ্যে মানুষ বড়; এগুলি সাধারণ বিশ্বাস এবং মোটামুটি সত্য বলিয়া গৃহীত। ইহার উপরে আরও একটা বড় সত্তায় মানুষ বিশ্বাস করে—সেটি ভগবান্। ভগবানের শক্তিও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তিনিও আত্মা; তিনি সকলের চেয়ে বড়, সেই জন্য পরমাত্মা।

সাধারণ ভাবে জড়প্রকৃতি অবশ্যই যান্ত্রিক শক্তির অধীন এবং যন্ত্রের মত চালিত। কিন্তু এই বিরাট্ যন্ত্রের পশ্চাতে এক জন মহান্ যন্ত্রী রহিয়াছেন—তিনি এই পরমপুরুষ। জগৎ-যন্ত্রের শক্তি প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই ইচ্ছা-শক্তি। জগতের নিয়ম তাঁহারই কৃত নিয়ম। বৃহত্তর জড়পিণ্ড যে ক্ষুদ্রতর পিণ্ডকে আকর্ষণ করে—তাহা তাঁহারই ইচ্ছায়; আর, উত্তপ্ত পিণ্ড হইতে যে তাপ নির্গত হইয়া যায় এবং আর ফিরে না—এটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম বটে, কিন্তু এটাও তাঁহারই ইচ্ছা। বিজ্ঞান জড়জগতে যত সব নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে, সে-সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র। আর, এ-সব নিয়ম যে অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, তার অর্থও এই যে ঈশ্বরের ইচ্ছা হাওয়ার গতির সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায় না।

সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর এই বিশ্বের স্রষ্টা; জগৎ-যন্ত্রের পিছনে তিনিই যন্ত্রী; জড়ের নিয়ম তাঁহারই নিয়ম। জড় ও চেতন—দেহ ও আত্মা—এ উভয়ই

তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। আর, তাঁহারই নিয়ম অনুসারে আত্মা দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ। আত্মার স্বাধীন কর্তৃত্ব এই শ্রেষ্ঠত্বের একটি নিদর্শন। চিৎ-অচিৎ-সমন্বিত এই চরাচর তাঁহারই শাসনে অবস্থিত। "এতস্য এব প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"—ইহারই শাসনে চন্দ্র-সূর্য্য তাহাদের স্থানে রহিয়াছে। ইহারই ইঙ্গিতে মানুষেরও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভারতীয় দার্শনিকেরা জগতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মোটামুটি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোন ক্রমোন্নতি স্বীকার করেন নাই। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—জগতের এই তিনটি অবস্থা; যন্ত্রের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই তিনটিই আসে এবং যায়। ব্যক্তির বেলায়ও ঐ একই নিয়ম;—জন্ম, জীবন, এবং আয়ুষ্কাল শেষ হইলে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুই সমাপ্তি নয়; কারণ, মৃতের আবার জন্ম আছে—"জন্ম মৃতস্য চ ধ্রুবং"। মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মার বেলায় এই ক্রম চলিবে। সমগ্র জগতেরও ঠিক তাই। সৃষ্ট জগৎ নিয়মিত কাল স্থিতি লাভ করিবে, তার পর তাহার প্রলয়; এবং প্রলয়াস্তে আবার সৃষ্টি। সাধারণ মানুষ, ঋষিরা, দেবতারা, জড়পিণ্ডসমূহ—সমস্তই এই ক্রম অনুসারে এই অবস্থা-ত্রয়ের ভিতর দিয়া অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারে, সে এই চক্রের বাহিরে চলিয়া যায়, এই মাত্র।

পাশ্চাত্য দর্শনে—বিশেষতঃ গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসর যাবৎ—জগতের একটা ক্রমোন্নতি স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ এই ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় প্রাণিজগতে। কিন্তু তার পর ভূতত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানে ক্রমশঃ এই একই নিয়মের ক্রিয়া দেখা যাইতে লাগিল। বর্ত্তমানে উহা সমগ্র বিশ্বের একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে গৃহীত। আদিম নীহারিকাপুঞ্জ হইতে ক্রমশঃ আকাশে সৌরমণ্ডল এবং আরও অসংখ্য নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। একই আদিম জীবাণু হইতে এই বিবিধ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ বিচিত্র উদ্ভিদ্-জগৎ এবং অসংখ্য প্রাণিময় বিরাট প্রাণিজগৎও উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভাবে কোনও অনির্ব্বচনীয় এক আদিম পদার্থ হইতে এই বিশাল, বিচিত্র, জটিল জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ক্রমশঃ নূতন নূতন দ্রব্য ও নূতন নূতন গুণেরও আবির্ভাব এই ভাবেই এখনও হইতেছে। অবশ্যই এই ক্রমবিকাশের স্বরূপ এবং পরিণতি লইয়া মতভেদ যে না রহিয়াছে, এমন নয়। একটা প্রশ্ন আছে, জীবজগতে দেহের চরম প্রকৃষ্টি লাভ ঘটিয়াছে কি না। কোন কোন বিষয়ে মানুষের দেহের চেয়েও উৎকৃষ্টতর দেহ জীবজগতে আছে; যথা, দৃষ্টিশক্তি মানুষের চেয়ে কোন কোন প্রাণীর বেশী এবং ঘ্রাণশক্তিও অনেক ইতর প্রাণী মানুষের চেয়ে বেশী রাখে, আর, শারীরিক বলে ত মানুষ অনেকের নীচে। তথাপি, সব দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে মানুষের দেহই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, জীবের দৈহিক পরিণতি কি তবে এখানেই শেষ হইল? আর কি উন্নততর দেহের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই? দেহের চেয়ে বড় আত্মার অস্তিত্ব যাঁহারা মানেন এবং মানুষের উপচীয়মান বুদ্ধির বিকাশ যাঁহারা লক্ষ্য করেন, তাঁহারা বলেন, মানুষের দৈহিক উন্নতি শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে; অতঃপর তাহার উন্নতি হইবে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ বুদ্ধির দিক্ দিয়া। শরীরের শক্তির ন্যূনতা সে যেখানেই অনুভব করে, সেইখানেই সে উহা বুদ্ধির সাহায্যে পূরণ করিয়া লয়। আকাশে সে উড়িতে পারে না, অথচ ওড়া তার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে অনবরত উড়িতে চেষ্টা করিলে হয়ত বা লক্ষাধিক বৎসর পরে তাহার পাখা গজাইত। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে সে ইতিমধ্যে উড়োজাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং পাখা আর তাহার গজাইবে না—দেহের সে উন্নতি আর তাহার হইবে না। এই রকম অন্যান্য দিকেও দেহের শক্তির খর্ব্বতা মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে দূর করিতেছে। সুতরাং আর উন্নততর দেহের আবির্ভাবের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু দেহের উন্নতি খতম হইলেও ক্রমবিকাশ সমাপ্ত হয় নাই। এখনও মানুষ ক্রমশঃ উন্নততর ও বৃহত্তর জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

জাতি হিসাবে মানুষের এই যে ক্রমোন্নতি সেটা ঐহিক ব্যাপার; এই পৃথিবীতেই বংশ-পরম্পরায় সে উহা লাভ করিতেছে। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে মানুষের ক্রমোন্নতি

তাহার ঐহিক জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাচ্যে তেমন না হইলেও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকের মতে পরলোকেও মানবের অমর আত্মা ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই অগ্রগতির কোথাও স্খলন নাই কিংবা বিরাম নাই, এমন নয়। পথ চলিতে যেমন পদস্খলন সম্ভব এবং বিশ্রামও প্রয়োজন, তেমনি উন্নতির দিকে এই গতিও মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বিপরীত দিকেও প্রধাবিত হয়। কিন্তু মোটের উপর এই গতি অগ্রগতি ভিন্ন আর কিছু নয়।

ব্যক্তি বা জীবাত্মার ইতিহাসে প্রাচ্য দার্শনিকেরা জন্মান্তরবাদের অবতারণা করিয়াছেন। দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তি তাঁহাদের মতে জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণের মত। জীবের ইতিহাসে উচ্চ এবং নীচ উভয়বিধ দেহলাভই ঘটিতে পারে; এবং মুক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ভাবে চলিবে। কর্ম্ম অনুসারে জীবের নানা প্রকার ভোগ হইয়া থাকে। যদিও শেষ পর্য্যন্ত তার মুক্তি সম্ভব, তথাপি ক্রমোন্নতির মত কিছু তাহার নাই; কেননা, ছোট হইতে বড়, নীচ হইতে উচ্চ, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, আত্মা প্রকৃতপক্ষে হয় না। এইখানে ইউরোপীয় দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শনের একটা মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে।

ইউরোপীয় দর্শনের মতে বিশ্বকে সমগ্রভাবে দেখিলেও এই একই ক্রমোন্নতির নিয়ম পরিলক্ষিত হইবে। আদিম নীহারিকারাশি হইতে অসংখ্য তারা ও তারামণ্ডল উৎপন্ন হইয়া যে আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহা সৃষ্টির এক ধাপ মাত্র। এই তারাসমূহের মধ্যে সূর্য্যও একটি। কিন্তু সূর্য্যের বড় পরিবার রহিয়াছে; সেগুলি গ্রহ, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরে। পৃথিবী তাহার মধ্যে একটি। পৃথিবীর আবির্ভাব হওয়ার পর ক্রমশঃ উহা প্রাণবান্ পদার্থের বাসের উপযোগী হয়। যতদূর জানা গিয়াছে, পৃথিবী ছাড়া আর কোন গ্রহ বা নক্ষত্র জীবের বাসের উপযুক্ত নয়। পৃথিবীতে আবার এই সব বিবিধ প্রাণবান্ বস্তু একসঙ্গে আবির্ভূত হয় নাই। এক আদিম জৈবিক অণু হইতে ক্রমশঃ এই বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ উপজাত হইয়াছে। এই ক্রমোন্নতির শেষ সোপান মানুষ। মানুষের ক্রমোন্নতি এখনও চলিতেছে; সুতরাং ক্রমোন্নতির প্রবাহ এখনও অসমাপ্ত।

জগতের ইতিহাসে যেমন মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসেও তেমনই একটা ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। মানুষের আদিম বর্ব্বর অবস্থা, তাহার সভ্যতার আবির্ভাব—মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস্, রোম, ভারত ও চীনের অভ্যুত্থান ও পতন—বিভিন্ন ধর্ম্মের আবির্ভাব ও বিস্তার প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত ঘটনাপরম্পরা বিচার করিয়া দেখিলে ইহার ভিতরও একটা ক্রমবিকাশের সূত্র পাওয়া যাইবে—ইহাই অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকের মত।

এই যে ক্রমশঃ আবির্ভূয়মান জগৎ-নাট্য, ইহার পরিচালনা রহিয়াছে জগদীশ্বরের হাতে। জগতের ক্রিয়াকলাপের ভিতর একটা উদ্দেশ্যের আভাস পাওয়া যায়। কি সে উদ্দেশ্য, বলা কঠিন; কিন্তু কোন একটা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে, তাহা জগতের গতির পরম্পরা ও জগতের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ দেখিলেই মনে হয়। একটা চরম উদ্দেশ্যের দিকেই এই বিরাট্ প্রবাহ চলিয়াছে। জগতের বর্ত্তমান ভবিষ্য উদ্দেশ্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই বিশ্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনে এই একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া আবার আর একটা মতবাদের অবতারণা করা হইয়াছে যাহাতে এই ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহের আবির্ভাব হইয়াছে। ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় যাইতে হইলে স্থায়িত্ব প্রয়োজন। যাহা ক্ষণিক কিংবা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলেও চিরস্থায়ী নয়, তাহার তো আর অব্যাহত উন্নতি সম্ভব নয়। এক দিন তাহার জীবনের গতির সঙ্গে উন্নতির গতিরও অবসান তো হইবেই। এই জগৎ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডল সমন্বিত জ্যোতির্জগৎ সম্বন্ধে, বিজ্ঞানের একটা আবিষ্কার এই যে, ইহা ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে। সূর্য্য প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে প্রচুর তাপ হারাইতেছে; এবং এই হারানোর আর বিরাম নাই। সূর্য্যের তাপ-ভাণ্ডার বিরাট্ সন্দেহ নাই;

একটা চিন্তার বিষয় এই যে; প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন উত্তপ্ত বস্তু যে তাপ হারায় তাহা ফিরাইয়া পাইবার শক্তি তাহার নাই। সূর্য্য প্রতিক্ষণ যে প্রচুর তাপ হারাইতেছে তাহা আর পূরণ হইতেছে না। ইহার ফলে এমন একটা দিন ত আসিতে পারে যখন সূর্য্য আর আলো ও তাপ দিবে না—অর্থাৎ নিবিয়া যাইবে! কিন্তু বেদের ঋষিও জানিতেন এবং আমরাও জানি যে—"সূর্য্য আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ"—সূর্য্যই আমাদের এই পৃথিবীর সমস্ত চর-অচর পদার্থের আত্মা। সূর্য্যের তাপ-বিকিরণ বন্ধ হইলে পৃথিবীতে জীবনের লোপ হইবে—এবং সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা হইবে এই যে, মানুষ থাকিবে না। ক্রমোন্নতির ইতিহাসে তাহা হইলে সেই দিনে সেইখানেই যবনিকাপাত হইবে। অবশ্যই আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। কেননা, দুই, পাঁচ বা দশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিবে না। যখন ঘটিবে তখন আমাদের বংশও হয়ত থাকিবে না। কিন্তু তথাপি উহা ঘটিবে। কাজেই বিশ্বনাট্যে এই আপাতদৃশ্য ক্রমোন্নতি একটা অবান্তর, অপ্রধান ঘটনা মাত্র—ইহা শুধুই একটা বিষ্কম্ভক।

বলা বাহুল্য, এই মনোরম হাসিকান্নাময় জগৎ এক দিন থাকিবে না, ইহা ভাবিতে মন অবসন্ন হইয়া আসে। যে কারণে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না করিয়া অনেকেই পারে না, ঠিক অনুরূপ কারণে জগতের অমরত্বও মানুষ ধরিয়া লইয়াছে। সুতরাং হাজার দূর ভবিষ্যতে হইলেও জগতের বিনাশ—একেবারে বিলয়—ভাবিতে মানুষ চায় না। কাজেই বিজ্ঞানের এই মতের বিরুদ্ধে দর্শন প্রতিবাদ না করিয়া পারে না। সকলে না হউক, অধিকাংশ দার্শনিক এখনও মনে করেন যে, যে গণনা ও গবেষণার ফলে জগতের স্থায়িত্ব সমর্থিত হয় না, তাহাতে কোথাও কোনও গলদ রহিয়াছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে এবং তাঁর শুভ ইচ্ছায় আস্থা রাখিলে বিজ্ঞানের এই গাণিতিক গণনাকে অভ্রান্ত মনে না করিয়াও পারা যায়। খ্রীষ্টীয় জগতের দার্শনিকেরা তাই করিয়া থাকেন—যেমন, ডীন ইন্‌জ্।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এখনও প্রাচীতে এবং প্রতীচীতে বেশীর ভাগ দার্শনিকের গৃহীত অভিমত অনুসারে ঈশ্বর আছেন, জীবাত্মা সত্য, এবং জড় হইতে চেতন বড়; আর ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—এই তিন লইয়াই ব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের অব্যাহত গতি, তার নিত্য নূতন আবিষ্কার এবং বর্ত্তমান সভ্যতার ধ্বংস-লীলায় তার অটুট দান—রেল, জাহাজ ও উড়ো-জাহাজ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেডিও—রোগের নিদান ও চিকিৎসা, এবং জন্ম ও মৃত্যুর উপর শাসন প্রতিষ্ঠা—এই সমস্ত দ্বারা নানা ভাবে জড়-বিজ্ঞান তাহার প্রভাব যে শুধু অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে তা নয়, বিস্তৃতও করিতেছে। শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া টেলিফোন আবিষ্কার করা যায় নাই, আর ঈশ্বরের কথা না ভাবিয়াও উড়ো-জাহাজ বোমা ফেলিতে পারে এবং সেই বোমা গায়ে পড়িলে পরম ভাগবতেরও মৃত্যু ঘটিবে। কলিতে প্রহ্লাদও হয় না, ধ্রুবও নাই। সুতরাং অধ্যাত্ম সত্যের শ্রেষ্ঠত্বের উপর চারি দিক হইতে আঘাত পড়িতেছে।

তাহার উপর বিগত দেড় শত বৎসর ধরিয়া মানব জাতির একটা প্রকাণ্ড অংশ বুভুক্ষায় এবং নিপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম তাহার তাহার পর রুশিয়ায়, তার পর ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই বুভুক্ষার তাণ্ডবলীলা কমবেশী প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, অনেক দেশেই সমগ্র ধন-সম্পত্তির দশ ভাগের নয় ভাগ দেশের জনসমষ্টির দশ ভাগের এক ভাগের করতলগত রহিয়াছে। বাকী নয়-দশম লোক এক-দশম অর্থের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। এই বৈষম্য এবং অবিচারের কারণ প্রাক্তন কর্ম্ম, এ-কথা বলা চলে, বলা হইয়াছেও। আর, ভগবৎ-বিশ্বাসীকে পারলৌকিক সুখের লোভ দেখাইয়া এখানে শান্ত রাখা যায়; এত কাল হইয়াছেও তাই। এখানে এখন যাহারা ধনী, তাহারা স্বর্গের রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবে,—যীশুর মুখে এ-কথা শুনিয়া অবধি জগৎ অনেক কাল ইহা সত্য বলিয়া মানিয়াছে। কিন্তু আজ যে জন্যই হউক অবিশ্বাসীর সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে, এখন আর পরলোকের ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্ত্তমানে অভাব ও অনাহার লোকে সহ্য করিতে চায় না।

যে প্রবল ভগবৎ-বিশ্বাসের ফলে মানুষ বিজ্ঞানের

গণনাকেও অবহেলা করিতে পারিয়াছে, তাহা আজ টলিয়াছে। সুতরাং জড়-বিজ্ঞানের প্রাধান্য বাড়িয়া চলিয়াছে। আত্মার চেয়ে দেহ আজ বেশী সত্য, পারত্রিকের চেয়ে ঐহিক আজ বেশী নিকটে; সেই জন্য আত্মার চেয়ে দেহের তৃপ্তির মূল্যও আজ বেশী। ফল হইয়াছে এই যে, জগতের পরিণতি, জীবের আবির্ভাব ও উন্নতি, মানুষের অগ্রগতি, ইতিহাসে ক্রমোন্নতির আভাস—এ সমস্তই এখন অন্যভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে।

মানুষের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে পূর্ব্বে বিধাতার অঙ্গুলি-সংকেত অনুমিত হইত; এখন সেখানে একটা কার্য্য-কারণ পরম্পরা ভিন্ন আর কিছু দার্শনিকেরা দেখিতে চান না। অতীতের বিকাশ বর্ত্তমানে এবং বর্ত্তমানের গতি ভবিষ্যতের দিকে—এই মাত্র ইতিহাসের অর্থ। আর এই যে অতীতের ভস্মস্তূপ দ্বারা নির্ম্মিত বর্ত্তমান, সেটা জড়ের ইতিহাসে যেমন, মানুষের ইতিহাসেও তেমনই। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যেমন আকাশে মেঘ সঞ্চিত হয় এবং অবস্থা-বিশেষে যেমন তাহা জল হইয়া ঝরিয়া পড়ে, তেমনই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্থান ও পতন—আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে;—প্রজা-জমিদার সম্বন্ধের (Feudalismএর) পর মজদুর ও মহাজন বিভাগের (Capitalismএর) আবির্ভাব হইয়াছে; আর তেমনই বর্ত্তমান বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ ভবিষ্য শ্রেণীহীন (classless) সমাজের দিকে চলিয়াছে। এই প্রকার অভিমত আজকাল খুব দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইতেছে।

আগে দর্শন-বিজ্ঞানের অনুসরণ একটা উচ্চতর বৃত্তি বলিয়া মানুষ ভাবিত। এখন ইহাও মানুষের সাধারণ দৈহিক জীবনের সহায়ক রূপে বিবেচিত হইতেছে এবং সেই ভাবেই ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। সুখে থাকিবার জন্য যেমন মানুষ ঘর বাঁধে, বিত্ত সঞ্চয় করে এবং আরও অনেক কিছু করে, তেমনই দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনাও করিয়া থাকে। আর প্রয়োজনমত ঘর নির্ম্মাণের পদ্ধতি যেমন বদলাইয়া যায়, দর্শন-বিজ্ঞানের ধারাও তেমনি বদলাইয়া যাওয়া উচিত এবং যাইবেও। চরম পারমার্থিক সত্য বলিয়া তেমন কিছু নাই যার জন্য একটা সনাতন দর্শন-বিজ্ঞান হইতে পারে। আর সত্যই বা কি এবং কোথায়?

"Truth is the summation of man's experience at any given moment."..."Past truth becomes incomplete as a greater truth replaces it."..."Truth is an instrument for the creation and working out of a human purpose." (*A Philosophy for a Modern Man* by Prof. H. Levy, p. 281).

অর্থাৎ "কোনও এক সময়ে মানুষের অভিজ্ঞতার সমষ্টির নামই সত্য। উচ্চতর সত্য দ্বারা স্থানচ্যুত হইলে অতীত সত্য অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সত্য মানুষের কোনও উদ্দেশ্যের সৃষ্টি ও প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রবিশেষ।"

মানুষের কাছে অবশ্যই মানুষের চেয়ে বড় কিছু হইতে পারে না—পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু আগে মানুষ নিজেকে বড় মনে করিত সে আধ্যাত্মিক জীব বলিয়া—মনন ও স্মরণ করিবার শক্তি তার আছে বলিয়া। কখনও সে নিজেকে বড় মনে করিয়াছে জড়-প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে বলিয়া। আর, আজ সে নিজেকে বড় মনে করিতেছে নিজের দৈহিক জীবনের পুষ্টি বিধান করিতে পারে বলিয়া। দর্শন, বিজ্ঞান, আচার, শিল্পকলা—এক কথায়, মানবের সমগ্র সভ্যতা তাহার দৈহিক জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—ইহাই আজ এক শ্রেণীর মনীষীরা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন।*

উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনীতিবিদেরা মানুষের সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাহাতে মনে হইত মানুষ বুঝি সস্তায় কিনে এবং বেশী দামে বেচে এমন একটি যন্ত্র-পুত্তলিকা মাত্র, তাহার বেশী কিছু নয়। মানুষের স্নেহ-মমতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার আত্মত্যাগ ও পরোপকারের প্রবৃত্তি—এ-সবের দিকে অর্থনীতি দৃষ্টি

* "Ideas develop out of the social background of economic needs and human desires."...Needs and desires, ideas, ethics and morality, science, art literature, social institutions, social theories are all...created by man in his progressive development in the material world" Levy, *op. cit.*, p. 237.

দেয় নাই। এই কারণেই কেহ কেহ ইহাকে 'নির্দ্দয়-হৃদয় বিজ্ঞান' ('hard-hearted science') মনে করিতেন। কিন্তু তখনও মানুষের বুভুক্ষা ও অভাব এত তীব্র হয় নাই। আজ এই বুভুক্ষা বর্ব্বর নগ্নতা অবলম্বন করিয়া সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। আজ দর্শন-বিজ্ঞানের মূল্যও এই ক্ষুধা-নিবারণের সহায়ক রূপে নির্ণীত হইতেছে। এক দিন মহিষমর্দ্দিনীকে স্তব করা হইয়াছিল 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা' —এই বলিয়া। যিনি ক্ষুধারূপে সমস্ত প্রাণীতে বর্ত্তমান আজ সেই দেবী মানবমর্দ্দিনীরূপে পৃথিবীর বুকে তাণ্ডব-লীলার অবতারণা করিয়াছেন। এক সময় মানুষ ভাবিত, আহার্য্যই মানুষের একমাত্র প্রয়োজন নয়—Man does not live by bread alone; কিন্তু আজ এই আহার্য্যের অভাব ও প্রয়োজন এত উগ্র হইয়াছে যে, অন্য সব বস্তুর মূল্য আজ ইহারই দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। দেহের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না যাহা দ্বারা এমন অধ্যাত্ম বস্তুর কোন মূল্য স্বীকার করিতে আজ মানুষ পরাঙ্মুখ।

প্রাচীন গ্রীসের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস এবং তাহার দর্শনের ইতিহাসও তিনটি ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমান বা নব্য যুগ। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এমন একটা দার্শনিক চিন্তাধারার অবতারণা হইয়াছে যে মনে হয়, এই যুগ-বিভাগ আবার নূতন করিয়া করা চলে। ইউরোপ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করার পূর্ব্বে সেখানে—বিশেষ করিয়া গ্রীসে ও রোমে—যে চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, সেটাকে অখ্রীষ্টান বা 'pagan' আখ্যা দেওয়া যায়। তার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত ভাবধারা খ্রীষ্টান ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত, সুতরাং তাকে 'খ্রীষ্টান' (Christian) নাম দেওয়া চলে। তার পর যে একটা প্রবল চিন্তাধারা বিচিত্র গতিতে চারি দিকে ছুটিয়াছে, তাতে কার্ল মার্ক্সের প্রভাব স্পষ্ট; সুতরাং তাকে 'মার্ক্সীয়' বলিয়া অভিহিত করিলে দোষ হইবে না।

এ-দেশের চিন্তাধারায়ও এবম্প্রকার তিনটি যুগ কম-বেশী দেখানো যাইতে পারে। বেদ-উপনিষদের দর্শন-ধারা ইউরোপের pagan যুগের মত। তার পর বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব একেশ্বরবাদের ছায়ায় যে চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা ইউরোপের খ্রীষ্টান যুগের অনুরূপ। পশ্চাতেই ত চলিয়াছি, সুতরাং মার্ক্সীয় অনুপ্রেরণা আমাদের ভিতরেও ত আছে।

এই তিন যুগে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের ধারণা তিন প্রকার হইয়াছে। গ্রীকদের সময়ে, বেদের সময়ে, এমন কি, উপনিষদের সময়েও এই জগৎ দেব-ময় ছিল। পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, আকাশে, বাতাসে, মেঘে, জলে, চন্দ্রে, সূর্য্যে—সর্ব্বত্রই দেবতারা খেলা করিতেন। কোথাও বা বিষ্ণু, আর কোথাও বা ইন্দ্র, কোথাও বা বরুণ, আর কোথাও বা যম—ইহারাই ত জগৎ জুড়িয়া লীলাখেলা করিতেন। কিন্তু তার পর, একেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদের প্রভাবে এই অসংখ্য দেবদেবী ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া কল্পনা-লোকে বিলীন হইয়া গেলেন। কেবল কাব্য এবং লৌকিক ভাষা এবং লৌকিক অর্চ্চনা তাঁহাদিগকে একেবারে ভুলিতে পারিল না। কিন্তু এই জড়জগতের যন্ত্রী এক মহান্ পরমেশ্বর তখনও রহিলেন। এই দ্বিতীয় যুগে ক্রমশঃ জড় প্রধান হইয়া উঠিল এবং দেবতারা অন্তরালে পড়িয়া গেলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি আধ্যাত্মিক জগৎ একেবারে অস্বীকৃত হইল না; আর জগৎ-চক্রের যন্ত্রী, পরমাত্মা ঈশ্বরের অসীম শক্তিতে বিশ্বাস একেবারে লোপ পাইল না। আর আজ?

এই যে দেহ এবং দেহের সর্ব্ববিধ ক্ষুধাকে মানুষ বড় করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এর তৃপ্তির মাপ-কাঠিতে অন্য সব বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এর অদূর ভবিষ্য ফল কি? শ্রেণীহীন সমাজ আজ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেইটি হইলেই মানুষের সকল অভাব দূর হইবে, সকল অভিলাষ চরিতার্থ হইবে। এ যুগের ভবিষ্যদ্দ্রষ্টারা এবং ভবিষ্যদ্বক্তারা ইহাকেই বর্ত্তমান প্রগতির আপাত-দৃশ্য বিরাম-স্থান ধরিয়া লইয়াছেন। তার পর?

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে ধমক দিয়া কহিয়াছিলেন, 'বেশী জিজ্ঞাসা করিও না, গার্গি'—"মা অতি প্রাক্ষীঃ"; আরও শাসাইয়াছিলেন, 'বেশী জিজ্ঞাসা করিলে তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে'—'মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি'। সুতরাং আমরাই কি আর ইহার বেশী জিজ্ঞাসা করিতে পারি?*

* ষ্টালিনের সঙ্গে, মুসোলিনির সঙ্গে, হিট্‌লারের সঙ্গে মতভেদ-সূচক তর্ক করিলে তার্কিকের মাথা যে অর্থে খসিয়া পড়ে, যাজ্ঞবল্ক্য সেরূপ মাথা-খসার ভয় নিশ্চয়ই দেখান নাই; তিনি ঋষিজনোচিত

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশীর্ণ ন্যুব্জ দেহ, রক্তহীনের মত বিবর্ণ পাংশুবর্ণ, পলিত-কেশ বৃদ্ধ বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া—দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। উত্তেজনার আতিশয্যে কঙ্কালসার বুকখানা হাপরের মত উঠিতেছে নামিতেছে। হেমাঙ্গিনী সুনীতিকে বলিলেন—ধর সুনীতি—হয়তো পড়ে যাবেন উনি।

ইন্দ্র রায় বিস্ময়ে বেদনায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এই রামেশ্বর! কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ বিলাসী রামেশ্বর এমন হইয়া গিয়াছে! সে রামেশ্বরের এতটুকু অবশেষও কি আর অবশিষ্ট নাই! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া রায় দেখিলেন—আছে, কঠোর বাস্তব একটি মাত্র পরিচয়-চিহ্ন অবশেষ রাখিয়াছে—চোখের পিঙ্গল তারা দুইটি এখনও তেমনি আছে! কয়েক মুহূর্ত পর রায় দেখিলেন—না, তাও নাই; চোখের তারা তেমনি আছে কিন্তু পিঙ্গল তারার সে দ্যুতি আর নাই। সুরহারা গানের মত অথবা রসহীন রূপের মতই সকরুণ তাহার অবস্থা।

ধীরে ধীরে রামেশ্বরের উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিতেছিল; খাটের বাজু ধরিয়া দেহের কম্পন তিনি রোধ করিলেন। কেবল ঠোঁটের সঙ্গে চিবুক পর্য্যন্ত অংশটি এখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—পিঙ্গল চোখে জল টলমল করিতেছে। হেমাঙ্গিনী সুনীতিকে বলিলেন—একটু বাতাস কর তুমি!

ইন্দ্র রায়েরও চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন—কেমন আছ?

চোখে জল এবং কম্পিত অধর লইয়াই রামেশ্বর হাসিলেন; ইন্দ্র রায়ের কথায় উত্তর দিতে গিয়া অকস্মাৎ তাঁহার রঘুবংশের মহারাজ অজের শেষ অবস্থা মনে পড়িয়া গেল, সেই শ্লোকের একটা অংশ আবৃত্তি করিয়াই তিনি বলিলেন—'প্লক্ষ প্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।' ব্যাধি বটবৃক্ষের মত দেহ-মন্দিরে ফাট ধরিয়ে মাথা তুলেছে ইন্দ্র। এখন ভূমিসাৎ হবার অপেক্ষা।

রায়ের চোখের জল এবার আর বাধা মানিল না, টপ টপ করিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িল—অশ্রু-আবেগ-জড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—না না, রামেশ্বর, ও-কথা ব'লো না তুমি, তোমাকে সুস্থ হ'তে হবে। আর তোমার হয়েছেই বা কি? দেহে তো—

রামেশ্বর ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—দেখতে পাচ্ছ না? বলিয়া হাত দুইখানি আলোর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আঙুলগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন; প্রদীপের আলোকের আভায় শুভ্র শীর্ণ অকুণ্ঠিত অবয়ব আঙুলগুলির ভিতরের রক্তধারা পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। রায় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—না, তোমার কিছুই হয় নি, ও কেবল তোমার মনের ব্যাধি! মনকে তুমি শক্ত কর। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ; তোমার ছেলের বিয়ে দাও, স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে আনন্দ কর।

রামেশ্বর অকস্মাৎ যেন বিবর্ণ হইয়া গেলেন, অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যলোকের দিকে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন, ঠোঁট দুইটি ঈষৎ নড়িতে লাগিল, আপন মনেই তিনি যেন কিছু বলিতেছিলেন।

রায় রামেশ্বরের এই অসুস্থ অবস্থা দেখেন নাই, তিনি নূতন দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, শঙ্কিত হইয়াই তিনি ডাকিলেন—রামেশ্বর! রামেশ্বর!

ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া রামেশ্বর রায়ের দিকে চাহিলেন; রায় বলিলেন—কি হচ্ছে?

—বলছি? ডাকছি, ভগবানকে ডাকছি, বলছি—'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ'। এ অন্ধকারের মধ্যে আর থাকতে পারছি না।

হেমাঙ্গিনী এবার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন; ইন্দ্র রায় ও রামেশ্বরের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া অবস্থাটা ক্রমশঃ যেন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল; দীর্ঘকাল পরে দুই বন্ধু এবং পরম আত্মীয়ের দেখা হওয়ার ফলে উভয়েই আত্মসংযম হারাইয়া স্মৃতির বেদনার আবর্ত্তের মধ্যে অসহায়ের মতই আবর্ত্তিত হইতেছেন। রামেশ্বরের পক্ষে এ অবস্থা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইন্দ্র রায়ও আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছেন না; বিচলিত মনের উচ্ছ্বাসই কথাবার্ত্তাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রায় কথাকে টানিয়া নিজের পথে চালিত করিতে পারিতেছেন না। এ ছাড়া এই অবস্থাটাও আর সহ্য হইতেছে না। এই বেদনাদায়ক অবস্থাটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া তাহার মধ্যে একটু আনন্দ সঞ্চার করিবার জন্যই তিনি সম্মুখে আসিয়া বসিলেন—আমি কিন্তু এবার রাগ করব চক্রবর্ত্তী মশাই; আপনি আমাকে কিন্তু এখনও একটিও কথা বলেন নি!

রামেশ্বর সবিস্ময়ে ঈষৎ চকিত হইয়াই হেমাঙ্গিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষণ্ণতার মধ্য হইতেও আনন্দে একটু চঞ্চল এবং সজীব হইয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সীমা ছিল না। নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতার মধ্যে মৃদু বাতাসের আকস্মিক সঞ্চরণে সব যেমন স্নিগ্ধ আনন্দ-চাঞ্চল্যে সজীব হইয়া উঠে, হেমাঙ্গিনীর সস্নেহ সরস কৌতুকে সমস্ত ঘরখানাই তেমনি চঞ্চল সজীব হইয়া উঠিল। রামেশ্বর সত্য সত্যই এতক্ষণ হেমাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করেন নাই। দীর্ঘকাল পরে ইন্দ্র রায় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মুহূর্ত্তে ইন্দ্র রায় ছাড়া অন্য সকল কিছু—স্থান কাল পর্য্যন্ত—রামেশ্বরের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর কথায় রামেশ্বর তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখ তাঁহার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সস্নেহ সম্ভ্রমের সহিত তিনি বলিলেন—

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু কপ্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ।

এ আমার স্বপ্ন, না মায়া, না মনের ভ্রম, কিম্বা কোন পুণ্যফলের ক্ষণিক সৌভাগ্য—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি এসেছেন?

হেমাঙ্গিনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অকপট আনন্দে কৌতুক করিয়া বলিলেন—আমি কিন্তু স্বপ্নও নই মায়াও নই—পুণ্যফলের সৌভাগ্য না কি বললেন তাও নই; আমি আপনার কুটুম্বিনী। আপনি পণ্ডিত লোক—কবি মানুষ, কবিতা দিয়ে আসল কথা চাপা দিলেন। কথা তো আমিই যেচে কইলাম—আপনি তো কথা বলেন নি!

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—তা হ'লে বুঝতে পারছি জীবনে সাগরতুল্য অপরাধের মধ্যেও কোথাও ক্ষুদ্রতম প্রবালদ্বীপের মত কোন একটি পুণ্যফল অক্ষয় আছে, যার ফলে দেবতাকে নিজে এসে দর্শন দিতে হ'ল এবং ভক্তের সঙ্গে যেচেই কথা কইতে হ'ল। ওর জন্যে আপনি নিজেও আক্ষেপ করবেন না, আমার প্রতিও অনুযোগ করবেন না; কারণ আপনি দেবধর্ম্ম পালন করেছেন, আমি ভক্তের অভিমান বজায় রেখেছি।

রামেশ্বরের কথা শুনিয়া রায় আশ্বস্ত হইলেন কিন্তু বেদনা অনুভব না করিয়া পারিলেন না; স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক উত্তর শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল কল্পনায় ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া রামেশ্বরের এই যে, আপনাকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস—এ শুধু রাধারাণীর অভাব। রাধারাণীকে হারাইয়াই আজ রামেশ্বরের এই অবস্থা। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে গিয়া সেটাকে তিনি রুদ্ধ করিলেন। রামেশ্বরের পাশে বসিয়া অবনতমুখী সুনীতি ব্যথিত মুখেও হাসি মাখিয়া ধীরসঞ্চালনে পাখার বাতাস দিয়া চলিয়াছেন। সুনীতির দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা ভাবিয়া রায়ের বেদনার বাষ্প জমিয়া পাথর হইয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া একটি অসম্বৃত মুহূর্ত্তে গভীর স্বরে তিনি ডাকিয়া উঠিলেন—তারা তারা! মা!

ঘরখানা সে গভীর স্বরের ডাকে মুহূর্ত্তে আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। রামেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, হেমাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া গেলেন, সুনীতি উদাস

হইয়া সকলের দিকে কোমল করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

ঘরের তাকের উপর পুরানো আমলের মন্দিরের আকারের ক্লক ঘড়িটার পেণ্ডুলামটা শুধু বাজিতেছিল—টক্-টক্, টক্-টক্!

*

সহসা ইন্দ্র রায়ের খেয়াল হইল—মাহেন্দ্রযোগ পার হইয়া যাইতে আর বিলম্ব নাই। তিনি চঞ্চল হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, গলাটা এক বার পরিষ্কার করিয়া লইলেন, তার পর প্রাণপণে সকল দ্বিধাকে অতিক্রম করিয়া বলিলেন—রামেশ্বর।

চক্রবর্ত্তী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—উঠবে, বলছ?

—না, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

—ভিক্ষে! রামেশ্বর চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—আমার কাছে?

সুনীতি সচকিত হইয়া উঠিলেন, মাথার ঘোমটা একটু বাড়াইয়া দিয়া বিস্মিতভাবে রায়ও হিমাঙ্গিনীর দিকে চাহিলেন। চোখে চোখ পড়িতেই হেমাঙ্গিনী হাসিলেন।

ইন্দ্র রায় বলিলেন—হ্যাঁ, তোমার কাছেই ভিক্ষে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—ভিক্ষে বলতে হয় উনি বলুন—আমি বলছি ডাকাতি; না দিলে শুনব না, জোর ক'রে কেড়ে নেব।

রামেশ্বর প্রশান্ত গম্ভীর মুখে ধীর ভাবে বলিলেন—রায়-গিন্নী, ভাগ্যদেবতা যার বিমুখ হন তার লক্ষ্মী-ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েই বেরিয়ে যান; ভাণ্ডারের দরজা আমার খোলা—হাঁ-হাঁ করছে। আপনি সে ভাণ্ডারে কিছু নেবার অছিলায় প্রবেশ করলে বুঝব, লক্ষ্মী আবার ফিরে আসছেন। কিন্তু আমার লজ্জা কি জানেন—শূন্য ভাণ্ডারের ধুলোয় আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভরে যাবে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—ও কথা বলবেন না। যে-ঘরে সুনীতির মত গিন্নী আছে সে-ঘরে ধুলোর পাপ কি থাকে, না থাকতে পারে! আর সে-ঘর শূন্যও কখনও হয় না! ভাগ্য বিমুখ হয়, লক্ষ্মীও লুকিয়ে পড়েন, কিন্তু মানুষের পুণ্যের ফল—আত্মার ঘরের মাণিক কোথাও যায় না। আমরা আপনার সেই মাণিকের লোভে এসেছি। আমাদের ঘরে আছে এক টুকরো সোনা—সেই সোনা-টুকরোর মাথায় আপনার মাণিকটি গেঁথে গয়না গড়াতে চাই। সুনীতি আর আমি—ভাগাভাগি করে সে গয়না পরব।

ইন্দ্র রায় একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—এমন করিয়া গুছাইয়া বলিতে তিনি পারিতেন না। পুলকিত মৃদু হাসিতে তাঁহার মুখ ভরিয়া উঠিল। ওদিকে সুনীতি বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন—তাঁহার হাত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে; মাথার অবগুণ্ঠন প্রায় খসিয়া পড়িয়াছে, বুকের ভিতরটা উত্তেজনার স্পন্দনে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছে। সোনা ও মাণিকের অর্থ সে যে বুঝিতে পারিতেছে! কিন্তু সে কি সত্য!

গভীর চিন্তার সারি সারি রেখায় রামেশ্বরের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; অনন্ত আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কোথায় তাঁহার কোন ঐশ্বর্য্য আছে তিনি যেন তাহাই খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন। কিছু বুঝিতে পারিলেন না, শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—রায়-গিন্নী, আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। লক্ষ্মী যখন যান তখন তিনি তো শুধু বাইরের ঐশ্বর্য্যই নিয়ে যান না—মনকেও কাঙাল ক'রে দিয়ে যান!

হেমাঙ্গিনী এবার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র রায় বলিলেন—রামেশ্বর, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি, তোমার অহীন্দ্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করতে এসেছি।

মুহূর্ত্তে রামেশ্বর পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া গেলেন। স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ইন্দ্র রায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—আমার উমাকে আপনি দেখেছেন, সেই যে, যে আপনাকে কবিতা শুনিয়েছিল। বাংলা কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা!

তবু রামেশ্বর কোন উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধ ভাবে বিস্ফারিত চোখে অর্থহীন দৃষ্টিতে রায়-দম্পতির

দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। এবার ইন্দ্র রায় ও হেমাঙ্গিনী উভয়েই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রামেশ্বরের পিছনে সুনীতি বসিয়াছিলেন, আনন্দের আবেগে তাঁহার দু-চোখ বাহিয়া দুটি অশ্রুর ধারা বিন্দু বিন্দু করিয়া কোলের কাপড়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। অকস্মাৎ সে-ধারা জলের প্রাচুর্য্যে যেন উচ্ছ্বাসময়ী হইয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না, হেমাঙ্গিনী ইন্দ্র রায় শঙ্কিত ভাবে রামেশ্বরের মুখের দিকেই চাহিয়া ছিলেন।

রামেশ্বর মুখ বিকৃত করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—আঃ ছি ছি ছি! ঘৃণিত রোগ—বীভৎস ব্যাধি ছড়িয়ে গেল—পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল।

ইন্দ্র রায়ের আশঙ্কা এবার বাড়িয়া গেল—তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, ডাকিলেন—রামেশ্বর রামেশ্বর!

—কে? কে?—অপেক্ষাকৃত সহজ দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর এবার বলিলেন—ও, ইন্দ্র! রায়-গিন্নী!—বলিতে বলিতেই দারুণ বেদনায় তাঁহার মুখ-চোখ আর্ত্ত সকরুণ হইয়া উঠিল—বলিলেন—আঃ ছি ছি ছি, রায়-গিন্নী আমার কুষ্ঠ হয়েছে, কুষ্ঠ! আমার সন্তানের দেহে আমারই রক্ত! শাপভ্রষ্টা স্বর্গের মেয়ে উমা, ইন্দ্র, ইন্দ্র—আঃ ছি ছি ছি, এ তুমি কি বলছ?

রায় পরম আন্তরিকতার সহিত গভীর স্বরে বলিলেন—ছি ছি নয়, রামেশ্বর, তোমার রোগ তোমার মনের ভ্রম। আর এ বিবাহ আমার ইষ্টদেবীর প্রত্যাদেশ। মা আমাকে আদেশ করেছেন।

রামেশ্বর আবার যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এত বড় অভাবনীয় ঘটনার সংঘাতে তাঁহার দুর্ব্বল রুগ্ন মস্তিষ্ক ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল; তিনি বিহ্বলের মত বলিলেন—ইষ্টদেবী? কিন্তু—কিন্তু—

—আর কিন্তু কি হচ্ছে তোমার বল!

—কিন্তু—সে—সে কি বলবে?

—কে? কার কথা বলছ তুমি?

হেমাঙ্গিনী পিছন হইতে স্বামীকে আকর্ষণ করিয়া কথা বলিতে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন, তার পর রামেশ্বরের আরও একটু কাছে আসিয়া বলিলেন—বলেছে—সেও বলেছে, হাসিমুখে বলেছে।

রামেশ্বরের চোখ হইতে টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, চোখের জলের মধ্যেও ম্লান হাসি হাসিয়া এবার তিনি বলিলেন—রাধারাণী অনুমতি দিয়েছে?

—হ্যাঁ। এ বিয়ে না হ'লে তার গতি হচ্ছে না, সে শান্তি পাচ্ছে না। হেমাঙ্গিনীও এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র রায় সজল চক্ষে উপরের দিকে মুখ তুলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন—তারা—তারা!

দুর্ব্বল রামেশ্বর আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; অস্ফুট করুণ স্বরে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—অধীর হবেন না চক্রবর্ত্তী মশাই! বলিয়া তিনি সুনীতির পরিত্যক্ত পাখাখানা তুলিয়া লইয়া বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন—আপনি একটা কথা তাকে বলবেন? একটি কবিতা। বলবেন,

"গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো লক্ষান্তরেঽর্ক সলিলে চ পদ্মম্।
দ্বিলক্ষ দূরে কুমুদস্য নাথো যো যস্য মিত্র ন হি তস্য দূরম্।"

হেমাঙ্গিনী অশ্রুসজল চোখে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—বলব।

তার পর কিছুক্ষণের জন্য ঘরখানা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হেমাঙ্গিনীই আবার বলিলেন—তা হ'লে আমাদের কথার কি বলছেন বলুন!

রামেশ্বর বলিলেন—ও—হ্যাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ; উমা—উমা—পর্ব্বত-দুহিতা উমার মতই সে পুণ্যবতী। ইন্দ্র ইষ্টদেবীর আদেশ পেয়েছে, আপনি তার আদেশ পেয়েছেন—এ যে আমারই মহা ভাগ্য রায়-গিন্নী! চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে লক্ষ্মীর প্রত্যাগমনের সময় হয়েছে! সুনীতি—সুনীতি! কই শাঁখ বাজাও—

রামেশ্বরের পিছনে আত্মগোপন করিয়া সুনীতি বিরামহীন ধারায় কাঁদিয়া চলিয়াছিলেন, স্বামীর শেষ কথা কয়টির পর আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, অতি মৃদুস্বরে করুণতম বিলাপ ধ্বনিতে তাঁহার বুকের

কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিল—মহীন—আমার মহীন!

মুহূর্ত্তে ঘরখানা স্তব্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ঘরের মৃদু আলোটুকু পর্য্যন্ত কেমন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হেমাঙ্গিনী ইন্দ্র রায় অপরিসীম বেদনায় আত্মগ্লানিতে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিলেন—রামেশ্বর আবার বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। সুনীতির কণ্ঠও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুখে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিলেন—যেন কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে—মুহূর্ত্তের অসংযমে! এই স্তব্ধতার মধ্যে সুনীতির সেই মৃদু বিলাপের কয়টি সকরুণ ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত ঘরখানাকে পরিপূর্ণ করিয়া ভরিয়া দিয়াছে, নিশীথরাত্রির নীরবতার মধ্যে মাটির বুকের কীটপতঙ্গের রবধ্বনির একটি উদাস সুর যেমন পৃথিবীর বুক হইতে অসীম শূন্য পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।

কিছুক্ষণ পর রামেশ্বর বলিলেন—মহীন! হ্যাঁ হ্যাঁ—মহীন! আচ্ছা, দ্বীপান্তরে এক রকম পাতা পাকিয়ে দড়ি করতে দেয়—যাতে হাতে কুষ্ঠ হয়, না?

রায় বলিলেন—আঃ রামেশ্বর, তুমি মনকে একটু দৃঢ় কর ভাই! ও সব মিথ্যে কথা।

হেমাঙ্গিনী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিবর্ণ মুখে অতি কষ্টে একটি হাসির সৃষ্টি করিয়া বলিলেন—বেশ তো, সম্বন্ধ হয়ে থাক!

রামেশ্বর বলিলেন—না না না। এ বিয়ে না হ'লে রাধারাণী শান্তি পাচ্ছে না, তার গতি হচ্ছে না! রায়-গিন্নী বলেছেন—রায়-গিন্নী বলেছেন!

রায় বলিলেন—না না। হবে, দু-দিন পরেই হবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

সুনীতি অন্দরের মধ্যে নির্ব্বাসিতার মত নিতান্ত একাকিনী বাস করিলেও বায়ুতরঙ্গে ধ্বনি বাহিত হইয়া আসে। এই অপমানকর ঘটনার ধ্বনির ক্ষীণ ঝঙ্কার তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল; এখন হেমাঙ্গিনীর কথা, এ-বিবাহ না হইলে রাধারাণী শান্তি পাইতেছেন না—তাঁহার গতি হইতেছে না—ইহার মধ্য হইতে সহজেই তিনি একটি গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিলেন। যে লজ্জা সময়ক্ষেপের ক্ষয়ে ক্ষয়িত হইয়া ইন্দ্র রায়কে মাথা তুলিবার অধিকার দিয়াছিল, অনধিকারপ্রবেশ করিয়া তিনি এবং অহীন্দ্রই আবার সে ক্ষয়িত লজ্জাকে অখণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন—পুরানো লজ্জা আজ নূতন হইয়া উঠিয়াছে। সেই আত্মগ্লানি এবং লজ্জাতেই সুনীতি এমন অপরাধিনীর মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ধীর মৃদুস্বরে ইন্দ্র রায় এবং স্বামীর সমক্ষেই ডাকিলেন—দিদি!

হেমাঙ্গিনী সচকিত হইয়া সুনীতির মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, অনবদ্য প্রশান্তির ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা সুনীতির মুখে নিশান্তের ক্ষীণ প্রসন্নতার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুনীতি বলিলেন—না দিদি—হোক বিয়ে হোক। আমি একা আর থাকতে পারছি না। মহীন ফিরে আসবে—তখন আর বিয়ে দিয়ে আবার আনন্দ করব। সুখের মধ্যে হঠাৎ তাকে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। হোক বিয়ে হোক!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া রায় বলিলেন—তোমার মঙ্গল হবে বোন, তুমি আমাকে সত্য লজ্জা না হোক লোক-লজ্জার হাত থেকে ত্রাণ করলে।

সুনীতি উঠিয়া বলিলেন—ঠাকুরের পুজোর টাকা তুলে আসি দিদি, আর মানদাকে বলি শাঁখ বাজাক—বাজাতে হয়। আপনি একটু বসুন দিদি—মিষ্টিমুখ ক'রে যেতে হবে।

রায় বলিলেন—আন বোন, তোমার রান্নার সুখ্যাতি তোমার বেয়ানের মুখেতে ধরে না; আজ আমি পরখ ক'রে দেখি।

২৬

হাউইয়ে আগুন ধরিলে সে যেমন আত্মহারা উন্মত্ত গতিতে ছুটিয়া চলে, ইন্দ্র রায়ও ইহার পর তেমনি দুরন্ত গতিতে ধাবমান হইলেন। রাধারাণীর নিরুদ্দেশের ফলে যে-অপমান বারুদের মত সর্ব্বনাশা ক্ষোভ লইয়া বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল সে-অপমানের বারুদস্তূপকে ভস্মীভূত করিয়া ইন্দ্র রায়ের বংশকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া

লইবার উপযুক্ততম নিষ্কলুষ অগ্নিকণা দিতে পারিতেন একমাত্র চক্রবর্ত্তী-বংশই ; সেই পরম বাঞ্ছিত অগ্নিকণার সংস্পর্শ পাইয়া ইন্দ্র রায়ের এমনি ভাবে অপূর্ব্ব আনন্দে বহ্নিমান হইয়া দশ দিক্ প্রতিভাত করিয়া তোলাই স্বাভাবিক। সংসারে স্বভাবধর্ম্মের বিপরীত কিছু কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে—ইন্দ্র রায় স্বভাবধর্ম্মের আবেগেই ছুটিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণের আর ছয়টা দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল; ইহারই মধ্যে তিনি পাত্র-কন্যা আশীর্ব্বাদ-অনুষ্ঠান শেষ করিয়া ফেলিলেন। সুনীতির নাম দিয়া অহীন্দ্রকে টেলিগ্রাম করা হইল, ইন্দ্র রায় নিজে টেলিগ্রাম করিলেন অমলকে—"অবিলম্বে উমাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া এস।"

সেই দিন গভীর রাত্রে অহীন্দ্র এবং উমাকে সঙ্গে করিয়া অমল আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই বাড়ীই প্রতীক্ষমান হইয়াই ছিল, অহীন্দ্র ডাকিবামাত্রই মানদা ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল—দাদাবাবু!

অহীন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল—বাবা কেমন আছেন মানদা ?

—ভাল আছেন গো দাদাবাবু, সবাই ভাল আছে! মানদার মুখে কৌতুক সরস হাসি ঝলমল করিতেছিল।

—তবে ? এমন ভাবে টেলিগ্রাম কেন করলে মানদা ?

—আপনার বিয়ে গো দাদাবাবু, উ বাড়ীর উমাদিদির সঙ্গে।

অহীন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত শিহরণ বহিয়া গেল, বুকের ভিতরটা এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠিল। উমা—তন্বী কিশোরী উমা, সপ্রতিভ কথা-কুশলা উমা! মুহূর্ত্তে সে অনুভব করিল—উমাকে সে ভালবাসে—হ্যাঁ সত্যই সে ভালবাসে!

ঠিক এই সময়েই সুনীতি আসিয়া দাঁড়াইলেন, অতি মিষ্ট মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন—আয়, বাড়ীর ভেতর আয়, আমরা জেগেই ব'সে আছি তোর জন্যে।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অহীন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল দাদাকে; সুনীতির সুন্দর মুখখানির উপর তাঁহার জীবনের মর্ম্মন্তুদ দুর্ভাগ্যগুলি কেমন একটি পরিস্ফুট বেদনার্ত্ত সকরুণ ভঙ্গির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। সুনীতির মুখে বর্ত্তমানের দীপ্ত আনন্দের উজ্জ্বলতা জল জল করিলেও তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই অতীত দুঃখের স্মৃতিগুলি মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠে। বেদনার আবেগে অহীন্দ্রের বুক ভরিয়া উঠিল—সে কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—ছি ছি এ করেছ কি মা? না না না, এ যে হয় না, হ'তে পারে না!

সুনীতি আশঙ্কায় চকিত হইয়া উঠিলেন, শঙ্কাতুর কণ্ঠে বলিলেন—কেন হয় না অহি ? আমরা যে কথা দিয়েছি বাবা!

অহীনের চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল—দাদার কথা কি ভুলে গেলে মা ?

সুনীতির মুখে একটি বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, গাঢ় শীতের জ্যোৎস্নার মত সে হাসি—তীক্ষ্ণ কাতর স্পর্শময়ী অথচ উজ্জ্বল রূপ সে হাসির ; অহীন্দ্রের মাথাটি গভীর স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—তবু তোকে বিয়ে করতে হবে, উপায় নেই। এ তোর বাপ-মায়ের আজ্ঞা-পালন, কোন অন্যায় তোকে স্পর্শ করবে না বাবা।

অহীন্দ্র মুখে কোন প্রশ্ন করিল না, কিন্তু স্থির সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুনীতি বলিলেন—ঘরে আয়।

বাড়ীর ভিতর উপরে অহীনের ঘরে বসিয়া সুনীতি সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া বলিলেন—তোর বড়মা আমার দিদি—আমি স্থির জানি অহীন তিনি বেঁচে নেই। কোন দুরন্ত অভিমানে তিনি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত আত্মগোপন ক'রে করেছেন ; যার আঘাতে তোর বাপও এমন ক'রে পাগল হয়ে গেছেন অহি! কিন্তু কলুষের কালি এ ওর মুখে মাখিয়ে মানুষ ভগবানের পৃথিবীকে করেছে সং-সার। সেখানে মানুষে তো রেয়াত কাউকে করে না, তারা তার স্মৃতির উপর কালি বুলিয়ে দিয়েছে বাবা! এ কালি তোমাকে আর উমাকেই ধুয়ে মুছে তুলতে হবে।

অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া অভিভূতের মত মায়ের কথা শুনিতেছিল। সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—সেদিন উমার মা বললেন, তোর বড়মায়ের

নাম ক'রে—যে, এ বিয়ে না হলে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না, তাঁর গতি হচ্ছে না;—এত বড় সত্যি কথা আর হয় না।

প্রথমেই পাত্র-আশীর্ব্বাদ শেষ হইল। ইন্দ্র রায় সমারোহ করিয়া অহীন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। তিনি রায়-বংশের প্রত্যেককে তাঁহার সঙ্গে পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী যাইবার নিমন্ত্রণ জানাইলেন। চক্রবর্ত্তী বাড়ীতে আশীর্ব্বাদের আয়োজন হইয়াছিল, ইন্দ্র রায়ের নায়েবের ভাইপো চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর নূতন নায়েব; ইন্দ্র রায়েরই আদেশ অনুযায়ী সে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছিল। সেই নায়েবই এক দিন যোগেশ মজুমদারকে সুনীতির নাম করিয়া সাদর আহ্বান জানাইয়া আসিল—কর্ত্তাবাবুর অবস্থা তো জানেন, গিন্নীমা বললেন—এ-বাড়ীর মর্য্যাদা জানেন এক আপনি, আপনি না এলে এ-সব কাজ কি করে হবে!

মজুমদার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর বলিল—যাব আমি, বলবেন—আমার ক্ষমতায় যা হবে তার কসুর আমি করব না।

—আর ও-বাড়ীর রায় মশায়ও এক বার দেখা করবার জন্যে বার বার ক'রে বলেছেন!

—কে, ছোট রায় মশায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি তার ছেলেকেই পাঠাতেন তা—

বাধা দিয়া মজুমদার বলিল—না না না, আমি নিজেই যাব।

মজুমদার আসিতেই সাদর আহ্বান করিয়া রায় বলিলেন—তোমার মনটা সেদিন বড় পবিত্র ছিল যোগেশ, কথাটা মা তারা সত্যে পরিণত ক'রে দিলেন। তোমাকে আমি বলেছিলাম—সত্য হ'লে তুমিই জানবে সর্ব্বাগ্রে—সেটাও আমার মনে আছে। এখন তোমাকে কিছু ভার নিতে হচ্ছে ভাই, চক্রবর্ত্তী-বাড়ী তোমার পুরনো বাড়ী। ওখানকার কাজকর্ম্মের ভার তোমাকেই নিতে হবে। আর কন্যা আশীর্ব্বাদ করতে রামেশ্বর তো আসতে পারছেন না, আশীর্ব্বাদ করবেন ও-বাড়ীর কুলগুরু—তা সেদিন তুমিও আসবে ও-বাড়ীর প্রতিনিধি হয়ে।

মজুমদার মুখে কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু রায়ের কথা প্রাণপণে পালন করিবার চেষ্টা করিল, এবং অকপট অন্তরেই চেষ্টা করিল।

কলের মালিক বিমলবাবুকেও সমাদর করিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনিও পাত্র-আশীর্ব্বাদের আসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র রায় ব্যস্তভাবে তাঁহার হাতে গোলাপজলভরা গোলাপপাশখানি ধরাইয়া দিলেন এবং আতরদানবাহী চাকরটাকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া বলিলেন—আপনি হলেন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর লোক, আমরা আজ আপনাদের বাড়ী কুটুম্ব এসেছি। আপনি আজ আমাদের খাতির করুন, আপনার খাতির করব আমি আমার বাড়ীতে।

বিমলবাবু প্রত্যাখ্যান করিলেন না, করিবার যেন উপায় ছিল না।

বাহিরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সাঁওতালেরা মাদল বাজাইয়া মহা আনন্দে গান গাহিয়া নাচ জুড়িয়া দিয়াছিল। এই উপলক্ষে বাগ্দীপাড়ার লাঠিয়ালদের প্রত্যেকে হাত দশেক লম্বা এক গজ চওড়া এক ফালি করিয়া লাল শালু ও একটি করিয়া ফতুয়া পাইয়াছিল; নূতন ফতুয়া গায়ে লাল পাগড়ী মাথায় তাহারা লাঠি হাতে মোতায়েন ছিল। তাহারা এবং সাঁওতালেরা মদ খাইয়াছে প্রচুর। আশীর্ব্বাদের অনুষ্ঠান শেষ হইতেই অহীন্দ্র অমলের সঙ্গে সাঁওতালদের আসরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরস্পরের কোমরে জড়াইয়া ধরিয়া সাদা ধবধবে কাপড়পরা কালো মেয়েগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সারি বাঁধিয়া জলের ঢেউয়ের মত হিল্লোলিত ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে, সম্মুখে পুরুষেরা মাদল, নাগরা, বাঁশী ও নিজেদের তৈয়ারী সারেঙ্গী বাজাইয়া ঝড়ের দোলায় শালের শাখার মত দীর্ঘ আন্দোলিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। মেয়েরা গাহিতেছিল বড় মজার গান—উহাদেরই নিজেদের রচনা করা বাংলা ভাষায় গান—

রাস্তা যাবে সোরানে সোরানে (পাকা রাস্তা)
রাণী আসছে ডুলির উপর চেপ্যে—
রাঙাবাবুর বিয়া হোবে
লাল ফুলের মালা কুথা পাব গো!
পালতে পোলাশ জবাফুলের মালা গো!

গান শুনিয়া সকৌতুকে অমল হাসিয়া বলিল—বাঃ!

অহীন্দ্র হাসিমুখে দলটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। দেখিয়া মুখের হাসি তাহার মিলাইয়া গেল। কমলকে এবং সারীকে না দেখিয়া তাহার মন সপ্রশ্ন বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল। গানটি শেষ হইতেই মেয়েগুলি কল কল করিয়া অহীন্দ্র ও কমলের দিকে আঙুল দেখাইয়া কলরব জুড়িয়া দিল; কালো মুখের সাদা চোখগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া অহীন্দ্রের মুখের উপর অসঙ্কোচে নিবদ্ধ হইল। চূড়া মাঝি মাদল গলায় ঝুলাইয়াই আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—গড় করছি গো বাবাঠাকুর রাঙাবাবু! প্রণাম করিয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—আপোনার বিয়াতে ই গানটি আমি করলম; হঁ—আমি লিজে করলম। আমি লিজে। আপুনি শুধাও উয়াদিগে।

অমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—বাঃ বাঃ! খুব ভালো গান হয়েছে!

চূড়া উৎসাহিত হইয়া বলিল—আমি—এই বুঝলি বাবু এই আমি—বুকে হাত দিয়া সে নিজেকে বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়া বলিল—আমি মন্তর জানি, ভূত তাড়াতে জানি, গান বানাতে জানি—বুঝলি বাবু অ্যানেক জানি আমি। তা—তা—কি বুলব আর? বলিয়া সে খানিকটা চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল—আমাদিগে আরও হাঁড়িয়া দিতে হবে বাবু, আপোনারা যা দিলি—উই মেয়েগুলা সব বেশী খেঁয়ে লিলে; দেখ্ কেনে চুর-চুর ক'রছে সব!

মেয়েগুলি এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অহীন্দ্র এবার মৃদু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, সে হবে। কিন্তু তোদের সর্দ্দার কই? কমল মাঝি? আর সেই তীরন্দাজ শিকারী মাঝি যে সাপ মারলে, কমলের নাতজামাই, সেই লম্বা মেয়েটির বর? তারা আসে নি কেন সব?

সমস্ত সাঁওতালের দলটি এ প্রশ্নে এক মুহূর্ত্তে নীরব হইয়া গেল। বার বার অকারণে গলা ঝাড়িয়া—চূড়ামাঝি হাতযোড় করিয়া অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল—আপোনাকে আমরা বুলছি রাবাঠাকুর, রাঙাবাবু! আপুনি আমাদের রাজা বট। সি রাঙাঠাকুরের লাতি বট আপুনি; তেমুনি আগুনের পারা রঙ! বাবা রে! আপোনাকে মিছা বুলতে নাই! হ'ল কি—উয়ারা করলে কি—উয়ারা—

অহীন্দ্র অসহিষ্ণু হইয়া প্রশ্ন করিল—কি করলে ওরা?

চূড়া হাত তুলিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞ ভাবে বলিল—তাই থো বুলছি বাবু। উয়ারা—উয়ারা পাপ করলে। আমাদের 'পঞ্চ' বুললে—তুদের সাথে আমরা খাব না, তুদের সাথে করণ কাম করব না, বিয়া-সাদী দিব না। হঁ,—ভিন্ন ক'রে দিলে উয়াদিকে। ঘেন্না করলে! তাথেই বুড়ার শরম লাগল, ইখানে থাকতে লারলে। চলে গেল, পালিয়ে গেল! লাজের কথা কি না!

অহীন্দ্র বলিল—তারা ক'রেছিল কি?

অত্যন্ত লজ্জা প্রকাশ করিয়া চূড়া জিভ কাটিয়া বলিল—ছি! উটি লাজের কথা বটে, খারাপ কথা বটে! উ আপোনাকে শুনতে নাই। ছি! বাবা রে!

অহীন্দ্র আর প্রশ্ন করিতে পারিল না। ইহাদের কথা-বার্ত্তাগুলি অমলের বড় ভাল লাগিতেছিল, সে বলিল—তা হ'লে এখন সর্দ্দার কে? তুমি?

চূড়া পরম বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল—আপুনি উয়াদিকে শুধাও—আমি বুলি নাই। উয়ারাই বুললে। আমি অ্যানেক জানি কি না, আমি নোকটি খুব বিদ্যে জানি। ওস্তাদ বটে আমি। বোঙার পূজা জানি, মরং বোঙা,—মরং বোঙা বুঝছ তো? ভগোমান—উয়ার মন্তর জানি আমি। ভূত তাড়াতে জানি, ওষুদ জানি! অ্যানেক বিদ্যে আমি জানি, হঁ—! তা সোবাই বুললে—আমি বুলি নাই। ছি—লিজে থেকে বুলতে নাই, সরমের কথা, ছি! উয়াদিগে শুধান আপনি!

অমল হাসিয়া বলিল—ব্যাপারটা একটু জটিল মনে হচ্ছে অহীন। এতখানি বিনয় তো ভাল নয়।

অহীন্দ্র বলিল—হুঁ। পরে জানতে হবে ব্যাপারটা কি। এখন নাচগান করছে করুক।

তাহাদের মৃদু স্বরের কথা ভাল বুঝিতে না পারিলেও চূড়া এটুকু বুঝিয়াছিল যে কথাটা তাহাদের সম্পর্কেই হইতেছে। সে আবার বিনয় করিয়া বলিল—উই

চ-রাটোতে সিটল-পিটি—(সেটেলমেণ্টের জরীপ) যখন হ'ল, রাঙাবাবু গেল—মোড়লরা গেল—তখুন আমি হিসাব করলম, মাপের দাঁড়া ধরলম। আমি সকুলই জানি কি না! তাথেই আমাকে উয়ারা মোড়ল করলে।

অহীন্দ্র বলিল—বেশ বেশ। এখন তোরা নাচগান কর। তুইও তো খুব ভাল লোক—তুই মোড়ল হয়েছিস—টং‌ও বেশ ভালই হয়েছে।

চূড়া খুশী হইয়া মাদলটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া লাফ দিয়া মেয়েদের সম্মুখীন হইয়া মাদলে ঘা দিল। বাঁশী, সারেঙ্গী, নাগরা আবার বাজিতে আরম্ভ করিল। মেয়েরা আবার সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

অহীন্দ্র সমস্ত দলটির দিকে চাহিয়া দেখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। সেই সচল পাহাড়ের মত কমল মাঝি—বাবরী চুলওয়ালা সেই শিকারী বংশী-বাদক তরুণটি না হইলে পুরুষের দলটি যেন মানায় না; আর মেয়েদের ওই শ্রেণীটির ঠিক মধ্যস্থলে থাকিত দীর্ঘাঙ্গিনী সারী; তাহার মাথাটা ঠিক মধ্যস্থলে সকলের চেয়ে উঁচু হইয়া থাকিত মুকুটের মাঝখানের কালো পাখীর উজ্জ্বল পালকের মত।

পরদিন সন্ধ্যাতেই উমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কুলগুরু। ইন্দ্র রায় সমারোহ করিলেন প্রচুর; রায়-বংশের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি যোগেশ মজুমদারকে ডাকিয়া একখানি দামী ধুতি ও গরদের চাদর হাতে দিয়া বলিলেন—তুমি আজ আমার বেয়াইয়েরই তুল্য মাননীয় ব্যক্তি, কর্ম্মচারী হ'লেও রামেশ্বর তোমাকে ভাইয়ের মতই স্নেহ করেন, অহীন্দ্র তোমাকে বলে কাকা। বেয়াই-বাড়ীর এ সম্মান তোমার প্রাপ্য।

বিমলবাবু আজ আর আসেন নাই। শরীর খারাপ বলিয়া সবিনয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পাঠাইয়াছেন। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র ভাবে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। ইন্দ্র রায় চেয়ার টেবিলের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। হাসিয়া টেবিলের উপর একটি বিলাতী মদের বোতল নামাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—আপনার জন্যেও হাঁড়িয়ার বন্দোবস্ত আমরা রেখেছি।

সাঁওতালী ভাষায় মদের নাম হাঁড়িয়া।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালে হেমাঙ্গিনী উমাকে লইয়া রামেশ্বরের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। উমা রামেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সলজ্জ ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

রামেশ্বর সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন—প্রথমে যেদিন মাকে আমার দেখেছিলাম, সেদিন কুমারসম্ভবের উমার বাল্যরূপের বর্ণনা মনে পড়েছিল; আজ মনে পড়ছে উমার ভাবী বধূরূপ। মহাকবি কালিদাস—তিনি বলছেন—

'সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈ রামুচ্যমানাভরণা চকাশে।'

অর্থাৎ উমা অলঙ্কার পরিধান করলে কেমন শোভা হ'ল—না—কুসুমিত লতার মত, জ্যোতির্লোক উদ্ভাসিত রাত্রির মত, আশ্রয়ার্থী হংসবলাকাশোভিত নদীর মত। তা' হ্যাঁ মা উমা—তুমি আমার মা হ'তে পারবে তো? দেখছ তো—আমি ব্যাধিগ্রস্ত, আমার পুত্রবধূ হ'তে তোমার কোন দ্বিধা নেই তো?

উমা মুখে কিছু বলিতে পারিল না, কেবল গভীর বেদনায় কাতর দৃষ্টিভরা চোখে রামেশ্বরের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সেও মুহূর্ত্তের জন্য পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া দৃষ্টি নত করিল। হেমাঙ্গিনী কাতর ভাবে বলিলেন—কেন আপনি বার বার ও-কথা বলেন চক্রবর্ত্তীমশাই? কোথায় আপনার ব্যাধি? এই সেদিনও তো আপনার রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে—তারাও তো বলেছে আপনার কোন ব্যাধি নেই। ও আপনার মনের ভ্রম!

রামেশ্বর বলিলেন—রায়-গিন্নী, ভগবানের শাস্তি—মৃত্যুব্যাধি—এগুলোর নির্ণয় হয় না, চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও জ্ঞানের বাইরে এগুলো। কিন্তু ও তর্ক থাক। মা আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমি ধন্য হয়েছি রায়-গিন্নী। হ্যাঁ—আর একটা কথা। মা উমা, আমি দরিদ্র, লক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। আর তার জন্যে আমার

দুঃখ নেই। জান মা, দারিদ্র্যকে প্রণাম ক'রে আমি বলি—

দারিদ্র্যায় নমস্তভ্যং সিদ্ধোহহং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
জগৎ পশ্যামি যেনাহং ন মাং পশ্যন্তি কেচন।

বলি—হে দারিদ্র্য, তোমাকে নমস্কার, তোমার প্রসাদে আমি সিদ্ধ হয়েছি; যেহেতু কেউ আমার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে না—আমি জগৎকে দেখি—আমি দ্রষ্টা হতে পেরেছি। তবে মা তোমার আগমনে লক্ষ্মীকে আবার ফিরতে হবে, তবু কথাটা তুমি জেনে রাখ।

উমা এবার চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে একে সপ্রতিভ মেয়ে তার উপর কলিকাতার স্কুলে পড়াশুনা করিয়াছে, এবং রামেশ্বর তাহার অপরিচিত তো ননই বরং কাব্যালাপের মধ্য দিয়া একটি হৃদ্য আত্মীয়তার স্মৃতিই তাহার মনে জাগরূক ছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল—কবিতাটি ভারি সুন্দর।

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন—নিন এইবার, বেটার বউকে সংস্কৃত শেখান!

পরম উৎসাহে রামেশ্বরের চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—নিশ্চয় শেখাব। মা আমাকে পড়ে শোনাবেন, আমি শুনব। জান মা, তোমার সেই বাঙালী কবি—রবীন্দ্রনাথের বই আমাকে অহীন্দ্র এনে দিয়েছে, কিন্তু চোখের জন্য পড়তে পারি না। তুমি আমায় শোনাবে মা? ওই দেখ—আন তো মা, তোমার কণ্ঠে কবির কাব্য স্বর লাভ ক'রে সঙ্গীত হয়ে উঠবে। শোনাও তো মা আমাকে কিছু। বহুদিন কিছু শুনি নি!

উমা দেখিল—সে আমলের পুরানো টেবিলটির উপর একখানি "সঞ্চয়িতা" সযত্নে রাখা রহিয়াছে; সে বইখানি আনিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—আমি নীচে সুনীতিদের কাছে যাচ্ছি চক্রবর্তীমশায়, আপনারা শ্বশুরে পুত্রবধূতে মিলে কাব্য করুন বসে বসে।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন। রামেশ্বর বলিলেন—পড় তো মা, মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাদের কবির কোন কবিতা যদি থাকে তবে তাই পড়ে আমায় শোনাও দেখি।

উমা বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিল—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

প্রথমে লজ্জার সঙ্কোচে ঈষৎ মৃদু স্বরেই উমা আরম্ভ করিল, কিন্তু পড়িতে পড়িতে কাব্যের প্রভাবে অভিভূত হইয়া স্থানকালকে অতিক্রম করিয়া সে স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল—কণ্ঠস্বরে আর সঙ্কোচের জড়তা রহিল না, আবেগপূর্ণ অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ছন্দে ছন্দে তালে তালে সঙ্গীতের মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া আবৃত্তি করিয়া চলিল—

তব পিঙ্গল ছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না।
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেহ ব'বে না!
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙা বরণ।
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

বিস্ফারিত চক্ষে রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন, আবেগে নাকের প্রান্তভাগ বার বার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। কবিতা শেষ হইয়া গেল—উমা নীরব হইল। কিন্তু সমস্ত ঘরখানা তখনও যেন আবৃত্তির ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। অকস্মাৎ রামেশ্বর বলিলেন—ঐখানটা আর এক বার পড় তো মা—ওই যে—তব শঙ্খে তোমার তুলো নাদ—তার পর কি মা?

উমা পড়িয়া বলিল—

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয় শ্বাস ভরণ।

সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বর আবৃত্তি করিলেন—

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ।
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

ইহার পর যেন কাব্যের মোহে স্তব্ধ হইয়া রামেশ্বর রহিলেন, উমার উপস্থিতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর হাত দুইটি তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন—তোমার শঙ্খনাদ আমি শুনতে পাচ্ছি—প্রলয়শ্বাসের ঢেউ আমার অঙ্গে এসে লেগেছে! এঃ একেবারে জীর্ণ ক'রে দিয়েছে আঙুলগুলো!

উমা শঙ্কিত হইয়া উঠিল, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য সন্তর্পণে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের প্রদীপের আলোয় তাহার ছায়াখানি দীর্ঘ হইয়া মেঝের উপর চঞ্চল হইয়া জাগিয়া উঠিল।

রামেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—কে?

উমা শঙ্কিত কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—আমি!

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর যেন স্মরণ করিয়া বলিলেন—ও—উমা, আমার মা-জননী। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি মা—

আখণ্ডলো সমো ভর্ত্তা জয়ন্ত প্রতিমঃ সুতঃ
আশীরণ্যা ন তে যোগ্যা পৌলমী মঙ্গলা ভব।

উমা আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া সন্তর্পনেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রামেশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্দর-মহলের দিকে টানা-বারান্দা দিয়া উমা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। খান দুয়েক ঘর পার হইয়াই সে দেখিল অহীন্দ্র আপনার ঘরে খোলা জানালার ধারে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। এ দিকে ওদিকে চাহিয়া উমা মৃদুস্বরে বলিল—গুড্ আফটারনুন সায়েব!

অহীন্দ্র চকিত হইয়া হাসিমুখে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—নমস্কার শ্রীমতী উমা দেবী!

তাহাদের উভয়ের এই সম্বোধনের একটু ইতিহাস আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতেই বালিকা উমা এক দিন অহীন্দ্রকে বলিয়াছিল—আপনাকে দেখলেই লোকে চিনতে পারবে, এই স্কলারশিপ পেয়েছে। যে সায়েবদের মত ফরসা রঙ!

তার পর অহীন্দ্র কলিকাতায় গেলে অমল উমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—কে বল্ দেখি?

উমার স্কুলের তখন বাস দাঁড়াইয়া, সে দীর্ঘ বেণীটি দোলাইয়া বলিয়াছিল—সায়েব। পরক্ষণেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—জিজ্ঞেস কর না সায়েবকে—রায়হাটে ওঁদের বাড়ীতেই ওঁর নাম দিয়েছি সায়েব। গুড মর্নিং সায়েব।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিল—নমস্কার শ্রীমতী উমা দেবী। আমি তোমাকে বাঙালিনীই দেখতে চাই।

উমা মাথাটি ঈষৎ নত করিয়া বলিয়াছিল—বাঙালী ভালো মেয়ের স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে অতএব— বলিয়াই দোলাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

আজ উমা বলিল—এমন ধ্যানমগ্নের মত ব'সে যে?

অহীন্দ্রের জানালা হইতে চরটা স্পষ্ট দেখা যায়, সে চরটার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—চরটাকে দেখছি। ইন্দ্রজালের মত ময়দানবের পুরী গড়ে উঠল। এই এবার পূজার সময়েও দেখেছি—সবুজ ঘাসে ঢাকা শান্ত একটুকরো ভূখণ্ড—মধ্যে ছোট্ট একটি সাঁওতাল-পল্লী। এক বারে এক প্রান্তে কটা ইটের ভাটা।

উমা বলিল—চরটা ত তোমাদের?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল—হ্যাঁ তোমাদের।

উমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় এবার আর সে জবাব দিতে পারিল না। অহীন্দ্র বলিল—জান, ওই চরের ওপর আমার এক দল পূজারিণী আছে। তারা আমাকে দেখে লজ্জায় রাঙা হয় না। অসঙ্কোচ আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

উমা বলিল—জানি, একটি মেয়ে আজ আমাকে দেখতে এসেছিল। আমাকে বললে রাঙাঠাকরুণ। বললে—বাবুকে বলি রাঙাবাবু, তোমাকে বলব রাঙা-ঠাকরুণ।

অহীন্দ্র একটু উচ্ছ্বসিত হইয়াই বলিল—চমৎকার নাম দিয়েছে।

উমা বলিল—তার নিজের নামটিও বেশ—সারী, সারী।

সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অহীন্দ্র বলিল—সারী? খুব লম্বামত মেয়েটি?

—হ্যাঁ। একটু বেশী লম্বা। কিন্তু আর নয়, চললাম। মা-রা হয়ত এক্ষুনি উপরে চলে আসবেন। পালাচ্ছি আমি। সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না—ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কয়েক মিনিট পরেই অহীন্দ্র নীচে নামিয়া আসিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া মানদাকে ডাকিয়া বলিল—আমি চরের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি। অমল এলে বলিস—দাদাবাবু আপনাকে যেতে বলে গেছেন।

অহীন্দ্র চলিয়া যাইতেই মানদা হাসিতে প্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া সুনীতি ও হেমাঙ্গিনীর নিকট আসিয়া বলিল—শাশুড়ীকে দেখে দাদাবাবুর লজ্জা হ'ল—আমাকে ডেকে চুপি চুপি—; বলিতে বলিতে সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

লেখন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

পূর্বের দিগন্তমূলে
অপূর্বের ললাটের 'পর,
পশ্চিম-প্রান্তের রবি
আশিসিল প্রসারিয়া কর।

১৯২৬,

২

পশ্চিমে রবির দিন
হ'লে অবসান
তখনো বাজুক কানে
পুরবীর গান।

১৯২৬

৩

দূর সাগরের পানে চলিয়াছে তরী
তীরে মোর আশীর্বাদ রাখিলাম ভরি'।

১১ জুন ১৯২৯

৪

ধ্যানে আছি, দ্বারে কেন হানিতেছ কর?
আর কিছু নয়, শুধু মাগিছ অক্ষর।

৭ই পৌষ

৫

মাধবী তুমি যে দখিন বায়ুরে
মাধুরী করেছ দান,
সে তোমারে তাই নব নব সুরে
দিয়ে গেছে তার গান।

৩১।৩।১৯৩৯

আকাশ হতে রবির পুণ্য আলো
উর্ধ্ব হতে ঝরে
দেবে তোমায় পরিপূর্ণ
প্রস্ফুটিত ক'রে।
ধরার রবি সে দীর্ঘকাল
রইবে না এই ভবে
তবু তাহার আশীর্বাদ তো রবে।

৭

প্রাণের ধারা গোপনে ছিল
ভরি' গহনতল
এ ঘট কে যে নামাল তাহে
তুলিয়া আনে জল।
মন্ত্রে যেন প্রকাশ পেল
উচ্ছলিত দান,
অমৃতময় সঞ্চয়ের
নাহি যে অবসান।

২৭।৯।১৯৩৮

৮

মাটিতে মিশিল মাটি
যাহা চিরন্তন
রহিল প্রেমের স্বর্গে
অন্তরের ধন।

Dust returns to dust
that which is imperishable
Dwells in love's heaven
treasured by the Eternal.

২৩।১০।১৯৩৮

৯

জীবনের দীপে তব আলোকের আশীর্বচন
আঁধারের অচৈতন্যে সঞ্চিত করুক জাগরণ।

৩০।৮।১৯৩৮

১০

লাগাক দোলা হৃদয়-পদ্মবনে
রসের সরোবর
আশিস বহি আসুক শুভলগনে
প্রভাত-রবিকর।

১৫ মাঘ, ১৩৪৪

১১

প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা যমুনা
মিলায়েছে দুই ধারা
সেখানে তোমার দেখেছিনু কী চেহারা।
দ্বিবেণী তোমারে নাম দিয়েছিনু
দুই বেণী সোজাসুজি
পিঠে নেমেছিল অচল ঝরনা বুঝি।
আজি এ কী দেখি খোঁপায় তোমার
বাঁধিয়া তুলেছ বেণী,
চাঁদেরে মাগিয়া জমেছে মেঘের শ্রেণী,
এবার তোমার নামের বদল
না ক'রে উপায় নাই,
খোঁপা-গরবিনী, খোবানি ডাকিব তাই॥

১৬।৩।১৯৪০

১২

দাদুরে যে মনে ক'রে
লিখেছ এ চিঠি
তাই ভাবি দাদুতেও
আছে কিছু মিঠি।
সেটা কি অহৈতুকী প্রীতি,
অথবা চকোলেটের স্মৃতি?
এ কথাটা সংসারে
নয় খুব সোজা,
হয়তো বছর-কয়
যাবে নাকো বোঝা—
তবু যদি লিখে রাখি তাহে ক্ষতি নেই
সংক্ষেপে এই—
ভিতরে এনেছ তুমি বিধাতার চিনি
আমি সে বাহির হতে বাজারেতে কিনি।
দাদু

১৭।৩।১৯৪০

[এই লেখন-সংগ্রহের প্রথমটি ১৯২৬ সালে কবির পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে, দ্বিতীয়টি কবির "পূরবী" গ্রন্থের পৃষ্ঠায় শ্রীঅপূর্ব্ব-কুমার চন্দের উদ্দেশে লিখিত। তৃতীয়টি ১৯২৯ সালে কবির জাপান-ভ্রমণকালে জাহাজে লিখিত—শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্রী ও তৎকালে জাপান নিবাসী শ্রীসতী সহায়ের উদ্দেশে। চতুর্থটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবের সময় কোনো স্বাক্ষরপ্রার্থীর উদ্দেশে লিখিত। পঞ্চমটি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী শ্রীমতী মাধবীকে, ষষ্ঠটি শ্রীমান্ প্রসূনকে (পরিচয় জানা নেই, শুধু নামই লেখা আছে), সপ্তমটি শ্রীরাণী চন্দের আঁকা ছবির পিছনে তার ব্যাখ্যাস্বরূপে, অষ্টমটি কবির আত্মীয়া শ্রীএমা দেবীকে, নবমটি শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে, দশমটি বোলপুরবাসী বিশ্বভারতীর ছাত্রগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি সাহিত্যসভার আশীর্ব্বাদরূপে, একাদশটি কবির আত্মীয়া লক্ষ্ণৌপ্রবাসী শ্রীইরা বড়ুয়াকে এবং দ্বাদশটি শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর কন্যা 'মিঠুয়া'কে উদ্দেশ ক'রে লেখা হয়েছে।]

নির্ম্মোক

"বনফুল"

২

গঙ্গাবক্ষে নৌকা সজ্জিতই ছিল, ভূধরবাবু তাহাতে বসিয়া ছিলেন, বিমলও গিয়া আরোহণ করিল। কামারখালির অখিল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে ডাক পড়িয়াছে। অখিল চৌধুরী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত চৌধুরী মহাশয়েরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, প্রয়োজন হইলে বরাবর ভূধরবাবুকেই ডাকিয়া থাকেন, এবার জ্যেষ্ঠের নির্দ্দেশ অনুসারে বিমলকেও ডাকিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ব্যগ্র।

বিমল নৌকায় আসিয়া উঠিতেই ভূধরবাবু বলিলেন—টিফিন কেরিয়ারে ও-সব কি মশাই ?

—লুচি মাংস।

—আপনি খাদ্য-রসিক আছেন তো মশাই, বাইরে থেকে আপনাকে দেখে নিরামিষ ব'লে বোধ হয়!

বিমল হাসিয়া বলিল—বাইরে থেকে দেখে লোকের সম্বন্ধে বিচার করেন এত কাঁচা লোক তো আপনি নন! অন্ততঃ আমার তাই ধারণা!

—না, তা বটে, মানে—ভূধরবাবু হাসিয়া নিজের ছোট বেতের বাক্সটি খুলিতে খুলিতে বলিলেন—আমিও আমিষ ব্যাপার এনেছি কিছু, জানি না আপনার এ-সব চলে কি না।

ছোট বোতলটি বাহির করিয়া তিনি বলিলেন—কঁইয়্যাক্! অর্থাৎ ইংরেজীতে যার বানান কগ্ন্যাক! চলে নাকি ?

বিমল বলিল—না।

—তাহলে আর কি আমিষ আপনি! নিরীহ পাঁটা কেটে সবাই খেতে পারে।

বিমল হাসিল, তাহার পর সহসা কি মনে করিয়া বলিল—বেশ দু-এক ঢোঁক খাওয়াই যাবে না হয়, তাতে আর কি হয়েছে!

ভূধরবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন—সোডায় না কম পড়ে যায়! আনিয়ে নেব নাকি আরও দু-বোতল।

—ক-বোতল আছে ?

—দু-বোতল।

—ওতেই হবে, না হয় শেষে গঙ্গোদক তো আছেই, শোধন হয়ে যাবে!

—যা বলেছেন! আমাদের চক্রবর্ত্তীকে চেনেন? আরে ঐ যে মশাই ওপারের উকিল হারাধন চক্রবর্ত্তী, চেনেন না তাকে ?

—নাম শুনেছি, আলাপ নেই তেমন!

—আমি ওর নাম দিয়েছি চৌকোস চক্রবর্ত্তী! একেবারে চৌকোস লোক। মদ রোজ খাওয়া চাই, কিন্তু আটঘাট বেঁধে—

—আটঘাট বেঁধে মানে ?

—মানে, গ্লাসে প্রথমে ব্রাণ্ডিটি ঢালবেন, তা প্রায় আউন্স-ছয়েক, তার পর তাতে গোটা-চারেক কার্টার্স লিভার পিল ফেলে দেবেন, তার পর তাতে চামচ-টাক সোডা, তার পর হাতে আংটি-বাঁধা পৈতেটি জড়িয়ে চোখ বুজে গ্লাসের উপর পৈতেসুদ্ধ হাতটি নিয়ে গিয়ে মিনিট দুই মন্ত্রপাঠ করবেন, তার পর আংটিটা মদে একবার ডুবিয়ে চোঁ চোঁ ক'রে মদটুকু এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলবেন! রোজ এই ব্যাপার!

—আংটিটা ডোবাবার মানে ?

—যে সে আংটি নয়, আংটিতে মীনে-করা কালীমূর্ত্তি রয়েছে, মদ আর মদ রইল না, কারণ হয়ে গেল! চৌকোস, রিয়েলি চৌকোস!

—চমৎকার লোক তো ?

—চমৎকার!

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

অগণিত তরঙ্গশীর্ষে মাণিক জ্বলিতেছে। ভূধরবাবু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, বিমলও চাহিয়া আছে। তাহার কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, রগের শিরাগুলা দপ দপ করিতেছে। বিবেকও দংশন করিতেছে। জীবনে এই প্রথম মদ্যপান। কেন সে মদ খাইতে গেল! লোভে পড়িয়া? তাহা তো ঠিক নয়। মদ দেখিয়া লোভ তাহার কোনকালে হয় নাই। তবে? ভূধরবাবুকে খুশী করিবার জন্য, ভূধরবাবুর লজ্জা নিবারণের জন্যই সে মদ খাইয়াছে। ভূধরবাবু যাহাতে তাহার নিকট অকারণ সঙ্কোচ বোধ না করেন, তাহাকে একটা পীর-পয়গম্বর মনে না করেন, মনে মনে নাক সিঁটকাইয়া যেন না ভাবেন—ইস ভারি আমার সাধু রে! ভূধরবাবুর বন্ধুত্বকামনায় যদি সে দুই-এক ঢোঁক মদ্যপান করিয়াই থাকে, কি এমন ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে! মন হইতে সে চিন্তাটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সহসা তাহার অমরের কথাটা মনে পড়িল। তাহাকে দেখিয়া সেদিন সে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিল কেন! সে হয়ত এমনি কোন বন্ধুত্বের দাবি মিটাইতে গিয়া—

ভূধরবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—হ্যাঁ, যে-কথাটা বলছিলাম, বিজনেস ইজ বিজনেস! পৃথিবীর চার দিকে টাকা ছড়ানো রয়েছে, কোন ফন্দী-ফিকিরে সেগুলোকে কুড়িয়ে ঘরে তোলার নামই ব্যবসা! কোন ফন্দী-ফিকির করব না অথচ টাকাগুলো আপনা-আপনি এসে আপনার ট্যাঁকে ঢুকে পড়বে তা কি কখনও হয়! এই যে দেখুন না, আমি ঐ যে আখ মাড়িয়ে গুড় তৈরি করাবার কলটা বসিয়েছি, ওর তদ্বির করতে হচ্ছে কত রকম! যেখানে যা ঘুষঘাস সিন্নি-পৈরবি সবই দিতে হচ্ছে, না দিলে আমার গুড় নেবে না কেউ! দেখুন আমার মাথায় আর একটা প্ল্যান এসেছে—

—কি?

—আচ্ছা এই গুড়কেই বেশ একটু পরিষ্কার ক'রে বোতলে পুরে ভিটামিন-ফিটামিন পাঁচ রকম ভাঁওতা জুড়ে বাজারে বের করলে কি রকম হয়! বিজ্ঞাপন দিলে ঠিক চলে!

বিমল হাসিয়া ফেলিল, বলিল—আপনার মাথায় খেলেও তো নানা রকম!

ভূধরবাবুও হাসিতে লাগিলেন—না খেললে উপায় কি, যা ভীষণ সময় পড়েছে মশাই, আজকাল রোজগারের নতুন নতুন পন্থা বার করতে না পারলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। যে যাই বলুক মশাই, পয়সাই হ'ল আসল; ঐ যে আপনাদের চেয়ারম্যান রাখাল নন্দী, কি আর ওর এমন গুণ আছে বলুন, না আছে বিদ্যে, না আছে বংশমর্যাদা, তবু আমরা লেখাপড়া-জানা ভদ্র-সন্তানরা ওর দুয়ারে দু-বেলা সেলাম ঠুকছি তো! কেন? ও তাক-মাফিক পাটের ব্যবসা ক'রে লাখ কয়েক টাকা রোজগার করেছে এই তার একমাত্র কারণ। তাই ও মান্য, তাই ও গণ্য, তাই ও চেয়ারম্যান, তাই ও সব!

ভূধরবাবু তাকিয়াটার উপর কনুই দিয়া একটু আরাম করিয়া বসিলেন ও গঙ্গার দিকে খানিক ক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন—ইটের ভাটাও করব ভাবছি একটা, করতে পারলে খুব লাভ ওতে, এ অঞ্চলে এক ঐ আঢ্যিদের ছাড়া আর কারও নেই।

বিমল বলিল—একা মানুষ আপনি ক-দিক সামলাবেন?

—সামলাতে হবে! শুধু ডাক্তারি ক'রে আর পেট ভরবে না মশাই, সেদিন গেছে! আজকাল কমপিটিশন কত, চার দিকে ডাক্তার তো গিজগিজ করছেই, তার ওপর কবরেজ আছে, হোমিওপ্যাথ আছে, হকিম আছে, হাতুড়ে আছে, মাদুলি আছে, জলপড়া আছে! ঐ যে আমাদের জগদীশবাবু, এদ্দিনের সিনিয়ার লোক, কত রোজগার করেন উনি বলুন তো?

ভূধরবাবু চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া বিমলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ভাবটা, দেখি আপনার আন্দাজের দৌড়টা!

বিমল বলিল—কত, পাঁচ-সাত-শ?

—তিন-শ'র এক ছিদাম বেশী নয়! হবে কোথা থেকে মশাই, ডাক্তারদের রোজগার বাইরে থেকে খুব বেশী মনে হয়, কারও বাড়ীর সামনে দিয়ে বার-দুই

যাতায়াত করলেই সে মনে করে উঃ খুব কামাচ্ছে, কিন্তু যে কামাচ্ছে সেই জানে, পকেটে ক'টা টাকা ঢুকল—তাও আবার সবগুলো সচল থাকে না!

—হ্যাঁ কি বলেন!

ভূধরবাবু হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে বিমলের পানে চাহিলেন। তাহার পর আবার সুরু করিলেন—এই কম্‌পিটিশনের জন্যেই তো মশাই আমি হোমিওপ্যাথি, কবরেজি সব করি, যখন যা সুবিধে। রুগী হাতছাড়া করি কেন! যখন দেখি আমাদের ওষুধে বিশেষ বাগ মানছে না, রুগীর বাড়ীর লোকেরাও একটু দোনা-মোনা করছে, তখন তাক বুঝে তাদের মনোমত ব্যবস্থা ক'রে ফেলি। হোমিওপ্যাথি চাও, চলে এস আমিই দিয়ে দিচ্ছি এক ফোঁটা, কবরেজি চাও, তা-ও দিচ্ছি—অপরের কাছে যাবার দরকার কি! হোমিওপ্যাথির একটা মস্ত সুবিধে খেতে খারাপ নয়, সস্তা, রুগীর ইষ্ট না হোক অনিষ্ট হয় না, আর যখন লেগে যায় অদ্ভুত ফল! অদ্ভুত ফল মশাই, একটা নশিয়া সেদিন কিছুতে কমে না, কমলো শেষে ইপিকাকের থার্টিতে!

বিমল বলিল—কবরেজিটা কিন্তু একটু—

তাহার কথা সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া ভূধরবাবু বলিলেন—ঐ কয়েকটা ওদের বাঁধি গৎ আছে, মকরধ্বজ, স্বর্ণপর্পটি, চ্যবনপ্রাশ, ঐ আমাদেরই মত ব্যাপার! আর্সেনিক, আয়রন, ক্যালসিয়াম আর তার সঙ্গে বায়ুপিত্তকফঘটিত কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোক! কবরেজরাই কি জোচ্চুরি করে না মনে করেন! অধিকাংশ কবরেজই আজকাল কুইনিন ব্যবহার করে, অ্যালকহল ব্যবহার করে। পয়সা রোজগার করতে হ'লে এ-সব না ক'রে উপায় কি! সেদিন তো দেখলাম এক কবরেজ এমিটিন ইনজেকশন দিচ্ছে—

—তাই না কি?

—না তো কি! নিও-সালভারশনের মতন ওষুধ যে-কোন হাতুড়ে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিচ্ছে! এই কবরেজগুলো আমাদের পরম শত্রু, ক্রমাগত আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা ক'রে বেড়ায়। আমিও বাগে পেলে ছাড়ি না। এই সেদিন আমি সঞ্জয় কবরেজকে বেশ নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিয়েছি! ওর কম্পাউণ্ডার এসে আমারই দোকান থেকে কুইনাইন কিনছিল, এক-দোকান লোকের সামনে দিলুম এক্সপোজ ক'রে বাছাধনকে!

বিমল মাঝিকে প্রশ্ন করিল—আর কত দূর মাঝি?

—ঐ যে আলোটা হুজুর, ঐ যে দূরে একটুকুন টিপকাছে—

ভূধরবাবু বলিলেন—এখনও মাইল-দুই তার মানে! এটুকু আর বাকি থাকে কেন, শেষ ক'রে ফেলি আসুন।

—আপনি খান, আমি আর খাব না।

—আরে খান খান, ঐ তাগড়া শরীর আপনার, কিছু হবে না!

—না থাক, প্রথম দিনেই অত ভাল নয়।

ভূধরবাবু অগত্যা বাকিটুকু একাই ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিলেন। মুখটি মুছিয়া বলিলেন—এই যেখানে আমরা যাচ্ছি, কামারখালিতে দেখবেন এক জন ডাক্তার আছেন, পাকা ব্যবসাদার যাকে বলে! এম. বি. নন, সাব-এসিস্টেণ্ট সার্জন, কিন্তু পাকা লোক। জমি-জারাৎ খেত-খামার বিস্তর করেছেন, প্র্যাকটিসও খুব। কিন্তু ডাক্তারি ব্যবসা কি ক'রে করতে হয় জানেন ভদ্রলোক

—কি রকম?

—এই ধরুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তাঁর ডিসপেনসারিতে প্রকাণ্ড একটা কড়া ক'রে রোজ বার্লি তৈরি হয়, আর গরীব রুগীদের সেটা তিনি বিতরণ করেন। খরচ বিশেষ কিছুই নয়, দু-আনার বার্লিতে ভেসে যাবে কামারখালি, কিন্তু এর জৌলুষটা ভীষণ, সবাই ধন্য ধন্য করছে। ডাক্তারের এত দয়া যে নিজের ওখান থেকে বার্লি পর্য্যন্ত তৈরি ক'রে গরীবদের দেয়। মহাদেববাবুর আর একটি ভয়ানক অস্ত্র আছে—সহজে কথা বলেন না। আপনি আপনার বিদ্যে ফলিয়ে যতই ব'কে মরুন মহাদেববাবু চুপচাপ, বড়জোর চোখ দুটো হয়ত ওপর দিকে তুললেন, কিংবা একটু ভুরু কোঁচকালেন, কিংবা হয়ত একটু মুচকি হাসলেন—ব্যস! আপনার সামনে সাধ্যপক্ষে কিছু বলবেন না, যা বলবার আপনি চ'লে গেলে বলবেন! এবং যেটি বলবেন সেটি কামারহাটির সকলের কাছে বেদবাক্য। বিশেষত মেয়ে-মহলে। এক বার এই গ্রামের একটি মেয়ের জ্বর হয়েছিল, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাই শুনে

একেবারে এক সায়েব সিবিল সার্জন নিয়ে এসে হাজির। মহাদেববাবু কিছু বললেন না। সায়েব দেখে শুনে সেই সনাতন কুইনাইন মিকশ্চার লিখে দিয়ে গেলেন, কুইনিন আর অ্যাসিড এন. এম. ডিল.। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াতে মহাদেববাবু চটেছিলেন। তিনি মেয়ের মাকে ডেকে বললেন—দেখ বাছা, তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে সায়েব-ডাক্তার এসে দেখে গেল, খুবই আনন্দের কথা এটা। কিন্তু সায়েব যা ওষুধ দিয়ে গেলেন তা সায়েবি ধাতে সইতে পারে কিন্তু তোমার ঐটুকু মেয়ে তা সইতে পারবে কি না সন্দেহ—এই দেখ—ব'লে তিনি ফোঁটা দু-চার অ্যাসিড শানের উপর ফেললেন। বুঝতেই পারছেন সঙ্গে সঙ্গে বজবজ ক'রে উঠল, শানের খানিকটা ক্ষয়েও গেল। মহাদেব চিন্তিত মুখে সেই দিকে খানিক ক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—যে ওষুধে শান গ'লে যাচ্ছে, সে ওষুধ ওই কচি মেয়েকে দিতে বাপু আমার কেমন যেন—। আর বলতে হ'ল না সায়েবের ওষুধ চলল না। তার পর দিন আমি এলুম, মিকশ্চার দিলুম না, দিলুম কুইনিন পাউডার।

একটু থামিয়া ভূধরবাবু পুনরায় বলিলেন—লোকটার রুগী দেখার ধরণও অদ্ভুত। আপনি যা দেখবার দেখলেন —বুক, পেট, জিব, চোখ, আপনার দেখা হয়ে গেলে মহাদেব হয়ত খুব নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে মাথার চুলগুলো দেখতে লাগলেন। আপনি যদি জিগ্যেস করেন কি দেখছেন, কোন উত্তর দেবেন না, একটু মুচকি হাসবেন! অদ্ভুত লোক!

বিমল বলিল—আপনার উপর খুব বিশ্বাস বুঝি?

ভূধর হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাসের কারণ আছে, শতকরা পঁচিশ টাকা হিসেবে কমিশন দি।

—বলেন কি?

—একবর্ণ অতিরঞ্জিত নয়।

বিমল নির্ব্বাক্ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল জ্যোৎস্নালোকে নদীর প্রতি তরঙ্গটি যেন মুচকি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিতেছে।

অখিল চৌধুরীর বাড়ির রোগীটির জিহ্বায় ক্যানসার হইয়াছে। ক্যানসার দুরারোগ্য ব্যাধি, বিমল সে কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভূধরবাবুর মুখের পানে চাহিয়া কিছু বলিল না। ভূধরবাবুর চোখের পাতায় সে যেন একটা নিষেধের ইঙ্গিত পাইল। মহাদেব বাবুও তাঁহার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী নীরব রহিলেন। অখিল চৌধুরী মহাশয় বিমলকেই পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কেমন বুঝছেন ডাক্তার বাবু?

বিমল একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল—কঠিন ব্যাপার।

ভূধর বাবু সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন—তা তো বটেই। কিন্তু কঠিন ব'লে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। চেষ্টা করতে হবে যথাসাধ্য!

মহাদেব বাবু একটু মুচকি হাসিলেন।

ভূধরবাবু কাগজে কলমে নানা রকম ভাবে যথাসাধ্য করিলেন। ব্যথার জন্য, ঘুমের জন্য, ঘায়ের জন্য, রক্তপড়া বন্ধ হওয়ার জন্য এবং জীবনীশক্তি বাড়াইবার জন্য নানাবিধ ঔষধের ফর্দ লিখিয়া যখন উভয়ে উঠিতে যাইবেন তখন মহাদেব বাবু বলিলেন—এঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া কি উচিত মনে করেন?

ভূধরবাবু বলিলেন—পারলে তো খুবই ভাল হয়, কিন্তু এখন যে রকম দুর্ব্বল রয়েছেন, আর যাওয়াও তো সোজা নয়—

অখিলবাবু বলিলেন—দেখুন আপনারা যা ভাল মনে করেন—

ভূধরবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—দিন-পনর দেখুন, যদি একটু উন্নতি হয়, গায়ে একটু জোর-টোর যদি পান, ব্লাডপ্রেসারটা যদি একটু কমে—তখন দেখা যাবে।

মহাদেব বাবু নির্ব্বিকার ভাবে গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

নৌকায় ফিরিয়া গিয়া ভূধরবাবু বিমলকে বলিলেন—আপনি আর একটু হ'লে সব মাটি করেছিলেন তো মশাই। ক্যানসার যে ওর সারবে না সে কথা ব'লে আমাদের লাভ কি! ওরা তো চিকিৎসা করাতে ছাড়বে না। আপনি হাল ছেড়ে দিলে আর এক জন এসে হাল ধরবে। ও-রকম কথা কখনো বলতে আছে? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

ও যতক্ষণ খরচ করতে পারে করুক, আমরা যতক্ষণ নিতে পারি নিয়ে নি।

নৌকা ছাড়িয়া দিলে ভূধরবাবু বলিলেন—মহাদেব বাবুকে ও-কটা টাকা দিয়ে ভালই করলেন, ভবিষ্যতে ফের ডাকবে, দেখবেন।

বিমলের কিন্তু কেমন যেন লাগিতেছিল, সে একটু হাসিল মাত্র।

৩

পাশে মণিমালা শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে, বিমল জাগিয়া আছে। এপাশ-ওপাশ করিয়া কিছুতেই ঘুম আসিতেছে না। অনেক দিন আকাশের নীচে শোওয়া অভ্যাস নাই, তাই বোধ হয়। বহুকাল পরে আজ ছাতে শুইয়াছে। মণিমালা তো ছাতে শুইতে কিছুতেই রাজি ছিল না, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই শেষে আসিয়াছে। ঘরে তাহার একা শুইতে ভয় করে। বিমল নিদ্রিত মণিমালার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা এখানে যেন কেমন ঠিক খাপ খাইতেছে না! তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচির সহিত এখানকার কোন কিছুরই যেন ঠিক মিল নাই। এই বাড়িটা লইয়া তাহার অসন্তোষের সীমা নাই। মেজেটা খারাপ, জানালা-কপাটগুলো খেলো, দেওয়ালের এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে চটা উঠিয়া গিয়াছে, ছাতটা শ্যাওলা-পড়া, ছাত হইতে জল পড়িবার নলগুলো বিশ্রী, বাড়ির পিছন দিক্‌টা কেমন যেন জঙ্গলের মত কচুগাছ-ঘেঁটুগাছে ভরা, উঠানটা বাঁধানো নয়, এক পশলা বৃষ্টি হইলে কাদা হইয়া যায়, উঠানের ওদিকের দেওয়ালটা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো ইঁট বাহির হইয়া আছে, বাড়ির উত্তর দিকের অশ্বত্থগাছটায় যত কাক ও বকের আড্ডা। বাড়িটা মোটে ভাল নয়! ইহার উপর শহরের একটেরে হওয়াতে সন্ধ্যার পর কেমন যেন নির্জ্জন হইয়া পড়ে, এমন কি ঐ দিকের মাঠটা হইতে শেয়ালের ডাক পর্য্যন্ত শোনা যায়, দুই-একটা শেয়াল সে স্বচক্ষে দেখিয়াওছে এক দিন। তাহার উপর সঙ্গী নাই। পাড়ায় যে মেয়ে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। লেখাপড়া করিয়া এ যেন অন্য জাতের হইয়া গিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া বিমলের সঙ্গেও যে মতের খুব মিল হয় তাহাও নয়। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া প্রায়ই তো ঝগড়া হইতেছে। আজই তো দুপুরে সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া রাগারাগি হইয়া গেল। ক্লান্ত বিমল দুপুর-বেলায় বিশ্রামের জন্য একটু শুইয়াছে, মণিমালা কল লইয়া বসিল। ব্লাউস না বালিসের ওয়াড় ভগবান্ জানেন কি হইতেছে, কিন্তু শব্দের চোটে অস্থির। বাড়িটা দর্জ্জির দোকান হইয়া উঠিয়াছে। এই আপদটার জন্য মাসে মাসে টাকা গুনিতে হইতেছে। বিমল বলিল—ও খচখচানি বন্ধ কর এখন।

এই কল-প্রসঙ্গে আরও দুই-এক বার বচসা হইয়া গিয়াছিল, মণিমালা দুম্ করিয়া কলের ঢাকাটা কলের উপর চাপাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া আসিয়া ক্যাম্প-চেয়ারটার উপর বসিল এবং সমস্ত বিকালটা মুখ ভার করিয়াই রহিল। সন্ধ্যাবেলাতেও বিমলের সহিত ভাল করিয়া কথা বলে নাই।......ম্লান জ্যোৎস্নালোকে মণিমালার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিমলের সমস্ত বুকখানা অপূর্ব্ব মমতায় ভরিয়া উঠিল। বেচারীর দোষ কি! যেমন ভাবে বাল্যকাল হইতে মানুষ হইয়াছে, ঠিক তেমনটি তো এখানে পাইতেছে না। প্রতাপবাবুর কোন্দলপরায়ণা নাতিনী অথবা পরেশ-দার স্ত্রীর সহিত ইহার কি করিয়া মিল হইবে। প্রতাপবাবুর নাতিনীটি কেবল কলহের ছুতা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং পরেশ-দার স্ত্রীর অতি-ঔৎসুক্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়। মণিমালার কত গহনা আছে, কোন্‌টা কত ভরির, জড়োয়া গহনা-গুলার দাম কত, ঝুমকোর বানি কত লাগিয়াছে, ঐ বেনারসীখানা কবে কিনিয়াছে, ঐ ঢাকাই শাড়িখানা ডাক্তারবাবু নূতন কিনিয়া দিয়াছেন বুঝি, সকালে কি রান্না হইয়াছিল, রাত্রে কি রান্না হইবে, ডাক্তারবাবু কি খাইতে ভালবাসেন—পরেশ-দার স্ত্রীর ঔৎসুক্যের সীমা নাই! লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া মণিমালার যে এ-সব ঔৎসুক্য একেবারে নাই তাহা নয়, সেও পরেশ-দার স্ত্রীর নিকট হইতে অনুরূপ অনেক খবর সংগ্রহ করে, কিন্তু এ-সব ছাড়াও সে আরও কিছু চায়। সে চায় শরৎবাবুর লেখা লইয়া একটু আলোচনা করিতে, রবীন্দ্রনাথের দুই-একখানা গান

গাহিতে, সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যে-সব গল্প বাহির হইয়া থাকে তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে, ছিমছাম হইয়া বেড়াইতে। কেবল রান্না আর খাওয়া, রান্না আর খাওয়া—এ ছাড়া আর তো কোন কাজ নাই এখানে! বিমল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার সহিত দুই দণ্ড বসিয়া যে গল্প করিবে তাহারও অবসর নাই। দুপুরে অথবা সন্ধ্যার পর যদি কোন দিন অবসর হয় তাহাও যে সে ঠিক কি ভাবে কাটাইবে তাহা বিমল বুঝিতে পারে না। মণিমালার সহিত বসিয়া কি বিষয়ে গল্প করিবে সে। দুই-এক দিন সে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, ঠিক যেন জমে না। এখানে সিনেমা-টিনেমা কিছুই নাই যে মাঝে মাঝে যাওয়া যায়। কলিকাতার শহুরে আবহাওয়ায় মানুষ মণিমালার যেন নির্বাসন হইয়াছে। এখানে বিমলই তাহার একমাত্র আকর্ষণ। কিন্তু বিমলকে সে কতটুকু পায় এবং যখন পায় তখন নাগাল পায় না। বিমল যে-জগতে বাস করে সে-জগতে মণিমালার প্রবেশাধিকার নাই।

হঠাৎ গভীর রাত্রে বিমলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মণিমালা তাহাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আবেগে নয়, ভয়ে।

—ওগো শুনছ, নীচে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে!

বিমল কান পাতিয়া শুনিল একটা শব্দ হইতেছে বটে। বলিল—দেখে আসি দাঁড়াও।

—আমি একা থাকতে পারব না এখানে।

—বেশ চল সঙ্গে।

ছাতের এক কোণে লণ্ঠনটা কমানো ছিল, তাহার শিখাটা বাড়াইয়া লইয়া উভয়ে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। নামিয়া আসিয়া প্রথমে কিছুই নজরে পড়িল না। তাহার পর সহসা দেখিতে পাইল মাঝের ঘরের তালাটা ভাঙা, কপাট খোলা। চোরটা বাক্স ভাঙিতে এত ব্যস্ত ছিল যে ইহাদের পদশব্দ এতক্ষণ তাহার কানেই যায় নাই। ইহারা কাছাকাছি আসিতে তবে সে সচকিত হইয়া উঠিল এবং ছুটিয়া বাহির হইতে গেল। কিন্তু পলাইতে পারিল না, নিমেষের মধ্যে বিমল তাহাকে ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া ফেলিল এবং ডাকাডাকি করিয়া যোগেনকে তুলিল। যোগেন তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা কাছে আনিতেই দেখা গেল চোর আর কেহ নয় হাসপাতালের পুরাতন চাকর ভৈরব। ইহাকেই কিছু দিন আগে বিমল দূর করিয়া দিয়াছিল। ভৈরবেরই কাপড় দিয়া যখন তাহার হাত-পা বাঁধিতে বিমল ব্যস্ত, তখন সহসা যোগেন বলিল—বাবু, মা মূর্চ্ছা গেছেন!

বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল সত্যই মণিমালা মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়াছে।

—তুই ভাল ক'রে বাঁধ একে, পারবি তো?

—খুব পারব।

যোগেনের হাতে ভৈরবকে ছাড়িয়া দিয়া বিমল মণিমালার কাছে আসিল। সত্যই সে মূর্চ্ছা গিয়াছে, ঠোঁট দুইটা নীল হইয়া গিয়াছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হিম। মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙিল, বিমল তাহাকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মণিমালা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—এখানে থাকলে ঠিক মরে যাব আমি, কিছুতে বাঁচব না!

বিমল স্নেহভরে তাহার সিক্ত অলকগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল—ছি অমন করতে নেই! ভয় কি!

কিন্তু সে লক্ষ্য করিল মণিমালা তখনও একটু একটু কাঁপিতেছে।

ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছে শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক উঠিয়া পড়িল এবং ভৈরবকে টানিতে টানিতে থানায় লইয়া চলিয়া গেল। সকলে মিলিয়া তাহাকে যে মারটা মারিল তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর কেমন যেন একটা হিংস্র নিষ্ঠুরতা আছে, সুযোগ পাইলেই কারণে-অকারণে তাহা প্রকট হইয়া উঠে। সকলে থানায় চলিয়া গেলে বিমল সদর-দরজাটা বন্ধ করিয়া শুইতে যাইতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে শঙ্কিত মৃদু কণ্ঠে কে যেন ডাকিল—ডাক্তারবাবু!

—কে?

বিমল কপাট খুলিয়া দেখিল শতছিন্ন ময়লা কাপড়-পরা একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, তৈলবিহীন এক মাথা

রুক্ষ চুল, অনাহার-ক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারা। বিমলকে দেখিয়াই সে বিমলের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল—আর ককৃখনো করবে না বাবু, ওকে ছেড়ে দিন এবারটি—

—কে তুমি?

মেয়েটি উত্তর দিল না।

যোগেন বলিল—ভৈরবের স্ত্রী।

বিমল তাড়াতাড়ি পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা কাল দারোগাবাবুকে বলব আমি।

মেয়েটি চোখ মুছিতে মুছিতে অন্ধকারে একা চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া বিমল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা তাহার মনে হইল স্ত্রী-হিসাবে ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা অশিক্ষিত কুৎসিত মেয়েটি মণিমালার অপেক্ষা বেশী মহিমময়ী। এই অন্ধকার রাত্রে সে একা তাহার চোর-স্বামীর উদ্ধারের জন্য স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়াছে। অন্ধকার বলিয়া ভয় করে নাই, ছেঁড়া কাপড় বলিয়া লজ্জা করে নাই, স্বামী চোর বলিয়া ঘৃণা করে নাই, পায়ে ধরিতে সঙ্কোচ করে নাই। স্বামীই উহার সব, তাহার উদ্ধারের জন্য ও সব করিতে প্রস্তুত। ঘরে ফিরিয়া দেখিল মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আলো লইয়া নিজের বাক্সগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। ভাগ্যে আমরা এসে পড়েছিলুম, গয়নার বাক্সটা তো ঠিক ওপরেই ছিল। ও কি, তুমি জামা গায়ে দিচ্ছ কেন?

—বেরব একটু।

—কোথায়?

—হাসপাতালে একটা রুগী এসেছে। এক্ষুনি আসছি—

—না, আমার ভারি ভয় করবে, তুমি যেও না।

—ভয় কি, যোগেন তো রইল, টচটা দাও তো।

—কি বিচ্ছিরি চাকরি বাপু, ভাল লাগে না আমার!

—এখুনি আসছি আমি—

বিমল বাহির হইয়া সোজা থানায় চলিয়া গেল।

থানার দারোগা বিমলের প্রস্তাব শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন—ছেড়ে দেব, বলেন কি!

—আমার বিশেষ অনুরোধ!

ভৈরবের স্ত্রী বারান্দার এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া আবার বলিল—ওর ঢের শাস্তি হয়ে গেছে, ছেড়ে দিন এবার।

দারোগাবাবু আড়চোখে এক বার ভৈরবের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আপনার কথা ঠেলা তো মুশকিল, আচ্ছা দেখি—

বিমল হাসপাতালের ডাক্তার, দারোগাবাবুর বাড়ি বিনা-পয়সায় দেখে, সুতরাং বিমলের কথা তিনি ঠেলিতে পারিলেন না। ভৈরব ছাড়া পাইয়া গেল।

পরদিন সকালে একটা সুসংবাদও পাওয়া গেল, মণি পাস করিয়াছে।

ক্রমশঃ



সাপের শত্রু

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মারাত্মক বিষ ও খল স্বভাবের জন্য সাপের প্রতি সকলেই বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। ইহাদের দেহের গড়নটি পর্য্যন্ত অনেকের নিকট অপ্রীতিকর। তবু ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলার উপায় নাই। প্রকৃতি ইহাদিগকে এমন মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দিয়াছে যে, সর্প-অধ্যুষিত স্থানে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া একটু অসতর্ক হইলেই বিপদ। সবলের পাল্লায় পড়িলে দুর্ব্বল ভয়ে বিচলিত হয় সত্য; কিন্তু একটু ভরসা থাকে যে, ক্ষীণ-শক্তিবলে অন্ততঃ কিছুক্ষণ লড়াই করিয়া আহত অবস্থায়ও বুদ্ধিকৌশলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সাপের কবলে পড়িলে আত্মরক্ষার সে ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও থাকে না। একটি বার মাত্র দংশন করিতে পারিলেই সর্ব্বনাশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা আবার অলক্ষিতে দংশন করিয়া থাকে। কোন কিছু ভাবিবার সময় পাওয়া যায় না। কাজেই বাঘ-ভালুক অপেক্ষা সাপের ভয়ে কেবল মানুষই নহে, অন্যান্য প্রাণীরা পর্য্যন্ত কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। এই কারণেই সর্পবিদ্বেষ মানুষের মজ্জাগত। বিষধরই হউক, কি নির্ব্বিষই হউক, এই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ নির্ব্বিচারে সর্পহত্যা করিয়া থাকে। মহাভারত ও অন্যান্য দেশের পুরাণেতিহাসে সর্পবিদ্বেষের অনেক অদ্ভুত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের যদি কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিয়া থাকে তাহা বোধ হয় এই যে, এক সময়ে সর্পের উপদ্রবে মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত ভাবে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, সেই উপদ্রব হইতে প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত জনমেজয় পরীক্ষিতের সর্পদংশন উপলক্ষ্য করিয়া ব্যাপকভাবে সর্প-সংহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতেই সর্প সম্বন্ধে একটা অপার্থিব ভয় হইতে কত যে অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং এই কারণেই সুদূর অতীত কাল হইতে আজও পর্য্যন্ত সর্পপূজা চলিয়া



কেরাণী-পাখী

আসিতেছে। কোন কোন স্থানে লোকেরা আবার সর্পের মূর্ত্তি পূজা করিয়াই সন্তুষ্ট নহে; মন্দিরে জীবন্ত সর্প প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য তাহাদিগকে পূজোপহারে পরিতৃপ্ত করে। পেনাং এবং জর্জটাউনের সন্নিকটস্থ এক গ্রামের সর্প-মন্দিরে এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে টবে লাগানো গাছের ডালে বৃহদাকার অসংখ্য সর্প যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থান



সর্পভুক্ নকুল

অধিকাংশই সর্পের মাংস ভক্ষণের লোভে শত্রুতা করিয়া থাকে; আবার কেহ কেহ কেবল বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াও শত্রুতা সাধন করে।

নকুল বা নেউল সাপের চিরশত্রু। ইহাদের শরীরের গড়ন কতকটা ইঁদুরের মত। সর্ব্বশরীর ধূসর বর্ণের লোমে আবৃত। প্রায় দুই ফুট আড়াই ফুট লম্বা হয়। তীক্ষ্ণ দন্ত ও ধারালো নখ ইহাদের শিকার করিবার প্রধান অস্ত্র। অনেক স্থানে ইহারা বেজী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদাই যেন বিদ্যুৎগতিতে চলাফেরা করে। সাপ দেখিতে পাইলেই অতি তৎপরতার সহিত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু সহজে কাবু করিতে পারে না। অনেকের ধারণা, নকুল সর্পবিষঘ্ন কোন বনজ ঔষধের সন্ধান জানে। সর্পদংশনমাত্রই ছুটিয়া গিয়া সেই ঔষধ-পত্র চিবাইয়া খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া দূরীভূত হইবামাত্রই পুনরায় আসিয়া সাপের সঙ্গে লড়াই সুরু করিয়া দেয়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার ফলে এ ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন লেখকেরাও নকুলের সর্পশিকার সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্লিনি বলিয়াছেন সর্পের সঙ্গে লড়াইয়ের পূর্ব্বে নকুল কর্দ্দমে গড়াগড়ি দিয়া সর্ব্বশরীরে একটা প্রলেপ লাগাইয়া লয়। কর্দ্দমের আবরণে আবৃত থাকায় লড়াইয়ের সময় সর্প দংশন করিলেও তাহার কোনই অনিষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলিয়াছেন—সাপের সঙ্গে লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখা গেলেই ইহারা বালির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে আত্মগোপন করিয়া থাকে। সাপ যখন ফণা উদ্যত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে ছোবল মারিবার চেষ্টা করে তখনই

পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অন্য কোথাও যায় না। পূজোপহার-স্বরূপ ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়।

হত্যাই করুক আর পূজাই করুক আজও প্রতি বৎসর বহু লোক সর্পদংশনে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সবলই হউক কি দুর্ব্বলই হউক স্বাভাবিক উপায়ে বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না হইলে তাহাদের প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে বাড়িয়াই চলিতে থাকে; কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ অসাম্য ঘটিবার উপায় নাই। প্রকৃতি এক হস্তে সর্পকে যেমন আত্মরক্ষার্থ ভীষণ অস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছে, অপর হস্তে তেমনই সংখ্যাধিক্যজনিত প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য ইহাদের অসংখ্য স্বাভাবিক শত্রুও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ ইহাদিগকে হত্যা করে বটে, কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণ শত্রু অপেক্ষা ভক্ষক শত্রুরাই ইহাদের বংশবিস্তারে প্রতিবন্ধকতা করে বেশী। তবে সর্পভক্ষক মানুষেরও যে অস্তিত্ব নাই এমন নহে; কিন্তু সংখ্যায় তাহারা খুবই কম। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে ইহাদের শত্রু অগণিত। তাহাদের

গর্ত্তের মধ্য হইতে সে অব্যর্থ সন্ধানে সাপের মাথা কামড়াইয়া ধরে এবং চিবাইয়া এমন ভাবে থেঁতলাইয়া দেয় যে, তাহার আর বিষপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু এ-সব কথা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য হইলেও সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য নহে। মোটের উপর নকুল সাপের স্বভাব-শত্রু। লড়াইয়ের সময় আত্মরক্ষার জন্য উভয়েই নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করিয়া থাকে। ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিবার আয়োজন করিতে সাপের যতক্ষণ সময় লাগিয়া থাকে, ততক্ষণে নকুল ক্ষিপ্রগতিতে অনেক দূর সরিয়া যাইতে পারে এবং পুনরায় প্রস্তুত হইতে না-হইতেই সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন বলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই নকুল সাপকে যে-কোন দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু ফণধর সাপের সেইরূপ ক্ষিপ্রতা নাই। কাজেই নকুলের সহিত লড়াই বাধিলে সাপ কখনও জয়লাভে সমর্থ হয় না।

পাড়াগাঁয়ে এক বার একটা বেদে সাপের খেলা দেখাইতে আসিয়াছিল। বেদেটা নূতন। খেলা দেখাইতে তত ওস্তাদ নহে। খেলার শেষের দিকে একসঙ্গে চার-পাঁচটা সাপ ছাড়িয়া দিতেই আড়াই ফুট তিন ফুট লম্বা একটা কেউটে কেমন করিয়া যেন আবর্জ্জনাপূর্ণ নীচু বারান্দাওয়ালা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। "ধর ধর" করিতে করিতেই চোখের পলকে সাপটা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। ঘরের হাঁড়িকলসী, বাসনকোসন সব তচনচ করিয়া কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। কেহ বলিল—বেড়ার ফাঁক দিয়া জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে, আবার কেহ বলিল—ঘরের মধ্যেই কোন গর্ত্তে আশ্রয় লইয়াছে। তখন সকলের আক্রোশ গিয়া পড়িল বেদেটার উপর। বেচারা বেগতিক দেখিয়া বলিল—বাবুমশায়, নৌকায় আমার ওস্তাদ আছে—যেখানেই থাক্, মন্ত্র পড়িয়া এক বার "আয়" বলিয়া ডাকিলেই সাপকে তাহার কাছে আসিতেই হইবে। আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। লোকটা তো সরিয়া পড়িল; কিন্তু গৃহস্থ বেচারা ভয়ে অস্থির। সে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া অন্য ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু



সর্পভুক ও উভচর নকুল, আফ্রিকা

এ ভাবে ত আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। বেদেরও ফিরিয়া আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কেহই কোন সুপরামর্শ দিতে পারিতেছে না, অবশেষে একটি লোক বলিল, ও-পাড়ায় একটা পোষা বেজী আছে; সেটাকে আনিয়া ঘরে ছাড়িয়া দিলে হয় না? সাপ যেখানেই থাক, বেজী তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই। এই পরামর্শই অগত্যা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইল। লোক ছুটিল বেজী আনিতে। বেজী পাওয়া গেল, কিন্তু মালিক বাড়ী না থাকায় অনেক বিলম্ব ঘটিয়া গেল। যাহা হউক, বেজীটাকে আনিয়া খাঁচার মুখ খুলিয়া ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ছাড়িয়া দিতেই সে ঘরের কাঠখড়, তৈজসপত্রের মধ্যে খাবারের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা ছুটাছুটি করিয়া বেজীটা বেড়ার ফাঁক দিয়া



অপোসাম ও সাপের লড়াই

সে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সাপটাকে দেখিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে উভয়ের দিকে যেন নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। বেজীর শরীরের সমস্ত লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিল; কিন্তু সে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তার পর চোখের পলকে ছুটিয়া সাপটাকে আক্রমণ করিতে গেল। সাপটাও হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুই-তিন বার ছোবল মারিল, কিন্তু প্রত্যেকটি ছোবলই মেঝেতে আঘাত করিল। বেজীটা এক বার সাপটার এ-পাশে, আর এক বার ও-পাশে যেন চরকির মত ঘুরিতেছিল। সাপটা ক্রোধভরে বেজীকে আরও দুই-এক বার ছোবল মারিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না এবং অবশেষে নিরাশ হইয়াই যেন ফণা গুটাইয়া চৌকাঠের নীচে দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেই বেজী সুযোগ বুঝিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। তখন একটা ধস্তাধস্তি ব্যাপার।

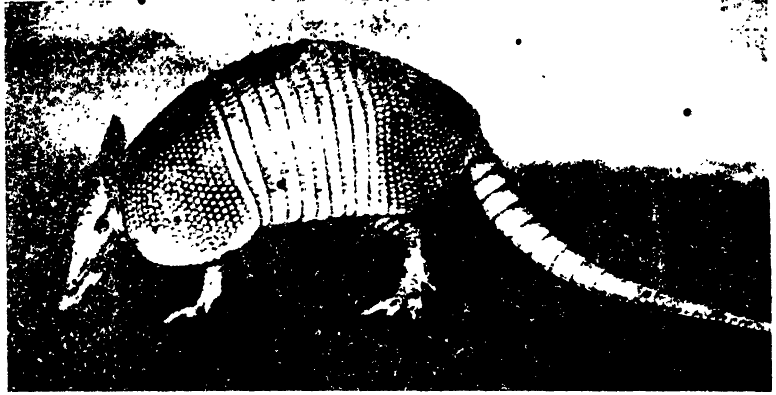
বাহির হইয়া পড়িল এবং জঙ্গলের দিকে যাইতে উদ্যত হইল। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—সাপ নিশ্চয়ই জঙ্গলে পলাইয়াছে, বেজী গন্ধ শুঁকিয়া তাহারই অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু বেজীর মালিক বেজীকে জঙ্গলে ঢুকিতে দিবে না, কি জানি সাপের সঙ্গে তার বেজীটিও যদি অদৃশ্য হয়। সে বেজীটাকে ধরিয়া আনিয়া খাঁচায় পুরিল। অনুপায় দেখিয়া সকলেই গৃহস্থকে আশ্বাস দিয়া বলিল—আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই, বেজীর গতিবিধি হইতেই পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে—জঙ্গলের সাপ জঙ্গলেই গিয়াছে।

অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত স্থানে ঘরের মেঝের এক পাশে মোটা একটা বিড়ার উপর বড় একটা ধানের মটকি বসানো ছিল। সে স্থানটা কিন্তু অনেক বার খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে। একটা লোক তখন সে মটকিটাকে একটু কাৎ করিতেই "এই যে—এইখানে" বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আড়ষ্টভাবে সাপটা বিড়াটার এক ফাঁকে এমন ভাবে কুণ্ডলী করিয়া বসিয়াছিল যে, সহজে সাপ বলিয়া বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। সকলে মিলিয়া তখন কৌশলে মটকিটাকে বিড়া হইতে সরাইয়া ফেলিল। আচ্ছাদন অপহৃত হওয়াতে এবং এত লোকজন দেখিয়া সাপটা ফণা মেলিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, তখন খাঁচা খুলিয়া বেজীটাকে ছাড়িয়া দিবা মাত্রই



অপোসাম সাপকে চিবাইয়া খাইতেছে

বেজী কামড় ছাড়ে না; সাপটা শরীরটাকে মোচড়াইতে মোচড়াইতে স্প্রিঙের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ফেলিল। প্রায় আধ ঘণ্টা এরূপ অবস্থায় কাটিবার পর বেজী তাহার কামড় ছাড়িয়া দিল। সাপের ঘাড়ের দিকটা ভাঙিয়া সম্পূর্ণরূপে থেঁতলাইয়া গিয়াছিল।



আর্মেডিলো

বেজীটা দুই-তিন মিনিট এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সাপটার লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত কয়েক বার শুঁকিয়া দেখিল; পরে দাঁতে চিবাইয়া ঠিক মধ্যস্থলে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। সাপের মাংস খাইয়া পাছে অধিকতর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, এই ভয়ে বেজীর মালিক তাহাকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিয়া দিল। যাঁহারা সাপের সহিত নকুলের লড়াই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বলিয়াছেন—যতই শক্তিশালী হউক না কেন, সাপ নকুলের হাতে পড়িলে কখনও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই নকুল সাপকে পরাভূত করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া খাইয়া ফেলে। ইহাদের মস্তক, বিষের থলি, এমন কি বিষদাঁত পর্য্যন্ত চিবাইয়া খায়। ইহাতে নকুলের শরীরে বিষক্রিয়ার কোনই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আফ্রিকার জলা-ভূমিতে জলে স্থলে বিচরণকারী এক প্রকার উভচর নকুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও সাপের মাংস খাইতে ভালবাসে, কিন্তু সাপের অভাবে কাঁকড়া, ব্যাং প্রভৃতি খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।



রাজগোখুরা একটি সাপকে গিলিতেছে

শল্লকী-জাতীয় ক্ষুদ্রকায় হেজ্-হগও সাপের ভয়ানক শত্রু। খাঁচায় আবদ্ধ হেজ-হগের সম্মুখে সাপ দিয়া দেখা গিয়াছে—সাপটাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া গিয়া আক্রমণ করে এবং চক্ষের পলকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁটাগুলি খাড়া করিয়া পিঠটাকে তাহার দিকে আগাইয়া দেয়। সাপও ক্রোধভরে কাঁটাগুলির উপরই ছোবল মারিতে থাকে। ইহাতে জানোয়ারটার কোনই অনিষ্ট হয় না, লাভের মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র কাঁটার আঘাতে সাপটার মুখ ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই লড়াইয়ের সময় হেজ-হগ শরীর গুটাইয়া বলের আকার ধারণ করে। কাঁটাগুলি শরীরের চতুর্দ্দিকে খাড়া হইয়া থাকে। সাপ সেই কাঁটার উপর বারংবার আঘাত করিয়া ব্যর্থতার আক্রোশে গোলাকার বস্তুটার শরীরে পাক খাইয়া তাহাকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করে। সুযোগ বুঝিয়া হেজ্-হগ্ তখন বলের মত গড়াইতে থাকে।

ফলে কাঁটার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া সাপ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। তার পর ধীরে ধীরে সে পরাজিত শত্রুর মৃতদেহ উদরস্থ করিয়া থাকে। আর্ম্মাডিলো নামক প্রাণীরাও সাপের মাংস খুবই পছন্দ করে। সাপ দেখিলেই তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে; বিষধর কি নির্ব্বিষ তাহা গ্রাহ্যই করে না। সাপও প্রথমে আততায়ীর শক্ত খোলার উপর প্রাণপণে দংশন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেই আর্ম্মাডিলো তাহাকে আক্রমণ করিয়া শরীরের নীচে ফেলিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সাপটাকে কোন রকমে শরীরের নীচে ফেলিয়া শক্ত খোলার ধারালো প্রান্তভাগের সাহায্যে করাতের মত এক বার সম্মুখে ও এক বার পিছনে ঘষিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লেজের দিক হইতে খাইতে সুরু করে।



সাপের শত্রু গোসাপ

ছয়-সাত ইঞ্চি লম্বা ছুঁচা-জাতীয় প্রাণীরাও সাপ খাইয়া থাকে। সাপ চলিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেই ছুঁচা এক পাশ হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ধারালো দাঁতের সাহায্যে কামড়াইয়া তাহার শিরদাঁড়া ভাঙিয়া দেয়। মুখ ঘুরাইয়া সাপ তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই সে বিদ্যুৎগতিতে সরিয়া দাঁড়ায়। সুযোগমত এইরূপ কয়েক বার আক্রমণের ফলে সাপের মৃত্যু ঘটে। তৎপরে সে ধীরেসুস্থে মৃত সর্পের দেহ উদরসাৎ করে।

আমেরিকার বনে জঙ্গলে ইঁদুরের মত আকৃতিবিশিষ্ট অপোসাম নামে এক প্রকার হিংস্র প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রধানতঃ সর্পভুক্। সাপ এক বার নজরে পড়িলেই হইল—যে-কোন উপায়েই হউক তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবেই। আমেরিকার জঙ্গলের মোকাসিন নামে এক প্রকার বিষধর সর্পই বেশীর ভাগ ইহাদের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে। অপোসাম দেখিতে পাইলেই সাপ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু যেখানেই আত্মগোপন করুক না কেন অপোসাম তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে এবং ধারালো দাঁতের সাহায্যে প্রথমে তাহার শিরদাঁড়া ভাঙিয়া দিয়া পরে আছাড় মারিয়া প্রাণবধ করে। ইহারা সর্পের যাবতীয় অংশই ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিছুই ফেলিয়া দেয় না।



ছুঁচা ও সাপের লড়াই

বিড়ালও সাপের সহিত শত্রুতা করিতে কসুর করে না। কিন্তু মাংসভক্ষণের লোভে নয়। ইঁদুর

শিকার করিয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থায় তাহাকে লইয়া যেমন খেলা করে, সাপ দেখিলেও তাহাকে আঁচড়ে কামড়ে অর্দ্ধমৃত করিয়া নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া সেইরূপই খেলিয়া থাকে। মনে হয় যেন শিকারের সখ মিটাইবার জন্যই ইহারা সর্প শিকার করিয়া থাকে। সাপ লইয়া খেলা করিবার সময় অনেক বিড়ালকে তাহার দংশনে প্রাণ হারাইতে দেখা যায়। আবার এমন ঘটনার কথাও শোনা যায় যে, বড় বড় পাহাড়িয়া সাপ সুযোগ পাইলে বিড়ালকেও আক্রমণ করিয়া আস্ত গিলিয়া ফেলে।

কোন কোন জাতীয় মেছো-কুমীরেরাও সাপ খাইয়া থাকে। ফ্লোরিডায় এক বার নাকি মোকাসিন সর্পের উপদ্রব ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা গেল—কুমীরের চামড়ার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় শিকারীরা মেছো-কুমীরের বংশ প্রায় নির্মূল করিয়া ফেলিয়াছিল। এই কুমীরেরাই সাপ খাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটাইত। কাজেই কুমীরের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে সাপের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল।

মাংস খাইবার লোভে গোসাপেরা প্রায়ই সর্প শিকার করিয়া থাকে। সাপ দেখিতে পাইলে আক্রমণ তো করেই, অধিকন্তু মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্তের মধ্য হইতেও তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসে। সাপের ডিম ও বাচ্চা ইহারা অতি উপাদেয়বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ে একটা এঁদো পুকুরের ধারে এক বার সাপের সঙ্গে গোসাপের লড়াই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা কেউটে সাপকে একটা স্থলচর গোসাপ আক্রমণ করিয়াছিল। সপাৎ সপাৎ একটা শব্দে সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গিয়া দেখি—সাপটা ফণা তুলিয়া যেন সম্মুখে ও পিছনে দুলিতেছে। তাহারই প্রায় দুই-তিন ফুট তফাতে একটা গোসাপ গলা ফুলাইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সম্মুখের দুই পায়ের সাহায্যে মাটি আঁচড়াইয়া ফেলিতেছে। গোসাপটা ক্রোধভরে মাঝে মাঝে লেজটাকে চাবুকের মত সপাৎ সপাৎ করিয়া মাটিতে আছাড় মারিতেছিল। গোসাপটা একটু অগ্রসর হইবামাত্রই সাপটা তাহাকে ছোবল মারিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু গোসাপটা তড়িদ্বেগে পিছু হটিয়া তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল। দুই-তিন বারই এরূপে ব্যর্থকাম হইয়া সাপটা ফণা গুটাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সুযোগে গোসাপটা চক্ষের পলকে ছুটিয়া গিয়া তাহার শরীরের মধ্যস্থলে কামড়াইয়া ধরিল। সাপটার তখন কি আক্রোশ! হিস্ হিস্ করিয়া বার দুই-তিন তাহার পিঠের উপর আঘাত করিল। দূর হইতেও ছোবলের ঢিব ঢিব আওয়াজ শুনা যাইতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গোসাপটা একটুও নড়িল না। চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে সে সাপকেও ছাড়ে নাই। কিছুক্ষণ বাদে একটু নাড়াচাড়া দিতেই যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সাপটা আবার তাহার পিঠের উপর ঢিব ঢিব করিয়া কয়েক বার ছোবল মারিয়াই যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। এত বার দংশনেও যে গোসাপটার কিছুই হইল না সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়। হয় গোসাপের পিঠের শক্ত চামড়ায় সাপের দাঁত বিদ্ধ হয় না, অথবা প্রথমেই দাঁত ভাঙিয়া গিয়াছিল, নয়তো প্রথম কয়েক বারের দংশনের ফলে সমস্ত বিষ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, সাপটাকে অনেকটা নিস্তেজ দেখিয়া গোসাপ তাহাকে এক বার এদিকে আবার ওদিকে ক্রমাগত আছাড় মারিয়া একেবারে নিস্পন্দ করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তাহার মুখে ঝুলানো মৃতকল্প সাপটা তখনও মাঝে মাঝে মোচড় খাইয়া উঠিতেছে। খানিকক্ষণ দম লইয়া গোসাপ প্রায় মিনিট-দশেক পর্য্যন্ত থামিয়া থামিয়া আরও কয়েক বার আছাড় মারিবার পর তাহার জীবনের আর কোনই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। তার পর সে ধীরে ধীরে শিকার গিলিতে আরম্ভ করিল। খানিকটা গিলে আবার দু-চার বার আছাড় মারে। এরূপে প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশী সময়ে সম্পূর্ণ সাপটাকে উদরস্থ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিবার পর জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া গেল।

বোয়াল মাছেরা না খায় এমন জিনিষ নাই। স্বজাতীয় অথবা বিজাতীয় সকল রকমের মাছ, এমন কি সুবিধা পাইলে সাপ, ব্যাং প্রভৃতিও উদরস্থ করিতে ইতস্ততঃ করে না। কোন কোন বোয়ালের পেটের মধ্যে আস্ত সাপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

পাখীদের মধ্যেও সাপের শত্রুসংখ্যা কম নয়। অধিকাংশ শিকারী পাখীরা ইহাদের পরম শত্রু। সাপেরাও আবার সুযোগ পাইলে পাখীর ডিম ও বাচ্চা খাইয়া উজাড় করিয়া দেয়। পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে হাড়িয়া-কুক্কু নামক এক প্রকার কদাকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। নালাডোবার পাশে ঝোপঝাড়ে ইহাদিগকে প্রায়ই বিচরণ করিতে দেখা যায়। সর্প-শিকারে ইহারা খুবই পটু। সাপ দেখিলেই তাড়া করে এবং ঠোকরাইয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তোলে। সাপও দংশন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে; কিন্তু এই পাখীরা ডানার সাহায্যে তাহাদের আঘাত ব্যর্থ করিয়া দেয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক লড়াই চলিবার পর সাপ ক্রমশঃ নির্জ্জীব হইয়া পড়িলে পাখীর পুনঃ পুনঃ ঠোঁটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

কোরাল-জাতীয় পাখীরাও সুবিধা পাইলে সর্প শিকার করিয়া থাকে। ইহারা জলের ধারে খুব উঁচু গাছের উপর বসিয়া শিকার লক্ষ্য করে। মাছ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণী জলের উপর ভাসিয়া উঠিলেই উপর হইতে ঝুপ্ করিয়া তাহাদের উপর পড়ে এবং পায়ের ধারালো নখের সাহায্যে শিকার ধরিয়া গাছের ডালে বসিয়া তাহার মাংস ছিঁড়িয়া খায়। কোন সাপকে জলে সাঁতার কাটিতে দেখিলে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গাছের ডালে বারংবার আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলে এবং মাংস কুরিয়া খাইয়া হাড়গোড় ফেলিয়া দেয়। বাজ-জাতীয় এক প্রকার শিকারী পাখী মাঠে ঘাটে সাপ দেখিতে পাইলেই ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাদের ধারালো নখরের আঘাতে সাপের শিরদাঁড়া ভাঙিয়া যায়, কাজেই উড়িয়া যাইবার সময় সাপের আর দংশন করিবার সামর্থ্য থাকে না।

হাঁড়িচাচা পাখীরাও সাপের সহিত শত্রুতা করিয়া থাকে। তবে ইহারা মাংসের লোভে শত্রুতা করে না; মানুষের মত ভয় অথবা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় তাহারা শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য বলিয়া সাপেরা প্রায়ই তাহাদের ডিম ও বাচ্চা খাইয়া ফেলে। ইহাই বোধ হয় তাহাদের বিদ্বেষের প্রধান কারণ। আকারে ইহারা শালিক পাখী অপেক্ষা বড় নয় এবং একাকী একটা সাপের সঙ্গে লড়িতে পারে না। কাজেই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সাপকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। এক বার হাঁড়িচাচার সঙ্গে সাপের লড়াই দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। অনেক দিনের কথা হইলেও ঘটনাটা যেন এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে এক দিন পাড়াগাঁয়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একটু কাজ করিতেছিলাম। ঘরের এক পাশেই বাগান। হাঁড়িচাচারা দলে দলে বাগানের মধ্যে লাফাইয়া লাফাইয়া আহারান্বেষণ করিতেছে। মাটিতে-পড়া শুকনো পাতার তলা হইতে এরূপ ভাবেই ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাদের কলরবে কান ঝালাপালা হইয়া যায়। রোজই ইহাদের কলরব শুনিতে শুনিতে কান অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সেদিন কিন্তু উহাদের একটু অস্বাভাবিক রকমের চেঁচামেচি কানে আসিতেছিল। নিত্যকার ব্যাপার মনে করিয়া প্রথমে কিছু গ্রাহ্যই করি নাই। কিন্তু চেঁচামেচি যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম—প্রায় তিন হাত লম্বা একটা করাইত সাপকে পঁচিশ-ত্রিশটা পাখী এক-সঙ্গে আক্রমণ করিয়াছে। সাপটা অতগুলি পাখীর ঠোঁটের আঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে ভাঁজে ভাঁজে ফণা তুলিয়া পাখীগুলিকে ছোবল মারিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এক দিকে কতকগুলি পাখীকে আক্রমণ করিতে যাইবামাত্রই অপর দিক হইতে আরও কতকগুলি পাখী আসিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে। বেচারা যন্ত্রণায় এবং অতগুলি শত্রুর সমবেত আক্রমণে দিশাহারা হইয়া প্রাণভয়ে নিকটস্থ আনারসের জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই সকলে মিলিয়া চেঁচামেচি করিতে করিতে লেজ ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসে। যতবারই সে পলায়নের চেষ্টা করে ততবারই তাহাকে তাহারা ঠোকরাইয়া টানিয়া বাহির করিয়া আনে। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই ব্যাপার চলিতেই সাপটা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে এক-এক করিয়া বহু লোক সমবেত হওয়াতে পাখীগুলি ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া যাইবা-

মাত্রই সাপটা কোনরূপে দেহটাকে টানিয়া লইয়া ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দক্ষিণ-আফ্রিকার কেরাণী-পাখীর নাম বোধ হয় অনেকেরই পরিচিত। ইহারা সাপের পরম শত্রু। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের পালকগুলি দেখিয়া মনে হয় যেন কেরাণী কানে কলম গুঁজিয়া আছেন। এই জন্যই ইহাদের কেরাণী-পাখী নাম হইয়াছে। ইহাদের লম্বা লম্বা পা, ধারালো নখ ও ঠোঁট যেন সর্পধ্বংসের উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে। পাগুলি লম্বা হওয়ায় ইহারা এক স্থানে থাকিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘাসের মধ্যে পলায়নপর সর্পের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে পারে। সাপ দেখিলেই ইহাদের ঘাড় ও পিঠের পালকগুলি খাড়া হইয়া উঠে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত এমন ভাবে আক্রমণ করে যে ঠোঁটের এক আঘাতেই সাপ কাবু হইয়া পড়ে। কোনগতিকে প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হইবামাত্রই সাপ ফণা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তখন সে চক্ষের পলকে এক পাশে সরিয়া যায়, বা ডানা প্রসারিত করিয়া দংশন প্রতিরোধ করে। পুনরায় সুযোগ পাইলেই পায়ের ধারালো নখের আঘাতে ঘায়েল করিয়া মাথাটাকে চাপিয়া ধরে এবং সর্ব্বশরীরের মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার পর মস্তকের অস্থি চূর্ণ করিয়া একসঙ্গে বাকী সমস্তটাই গিলিয়া ফেলে।

অনেক জাতের ঈগল সাপের মাংস খাইয়া থাকে। ইহাদের কেহ কেহ নির্ব্বিষ আবার কেহ কেহ বিষধর সর্প উদরস্থ করে। আফ্রিকায় এক জাতের ঈগল দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা ছোট বড়, নির্ব্বিষ বা বিষধর সকল প্রকারের সাপই উদরস্থ করিয়া থাকে। ঐ সব অঞ্চলে সময় সময় ঘাসের বনে আগুন ধরিয়া যায়। তখন এই পাখীগুলিকে আগুনের পথ ধরিয়া সর্পের অন্বেষণে উড়িতে দেখা যায়। আগুনের তাপে সাপ বাহির হইয়া আসিলেই ইহারা তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। সর্পের অন্বেষণে ইহারা সময়ে সময়ে ঘন ধোঁয়ার ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে।

বন-মোরগ ও ময়ূরও সাপের শত্রু। ইহারা বোধ হয় নির্ব্বিষ সর্পই সংহার করিয়া থাকে। সারস-জাতীয় পাখীরাও অনেকেই সর্পভুক্।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাপই সাপের ভক্ষক হইয়া প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য বিধানের সহায়তা করিতেছে। সাপ সাধারণতঃ ব্যাং, ইঁদুর, মাছ, ডিম প্রভৃতি খাইয়া উদর পূর্ত্তি করে; কিন্তু কয়েক জাতের সাপ প্রধানতঃ অপর সাপ খাইয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় শঙ্খিনী ও রাজগোখুরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শঙ্খিনী সাপের শরীর ত্রিশির। গায়ে অঙ্গুরীর মত মোটা মোটা সাদা-কালো ডোরাকাটা। ইহারা অনেকটা নিরীহ প্রকৃতির। ইহারা সাধারণতঃ নির্ব্বিষ সাপকে ধরিয়া লেজ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে গিলিয়া ফেলে। এদেশীয় হামাড্রায়াড বা রাজগোখুরা বিষধরই হউক, নির্ব্বিষই হউক যে কোন সাপকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। কাচ-সাপ নামে এক প্রকার সাপ ব্রহ্মদেশ, হিমালয় ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কীটপতঙ্গ, শামুক, ইঁদুর প্রভৃতি খাইয়াই জীবন ধারণ করে; কিন্তু অন্য জাতীয় সাপ দেখিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া জড়াইয়া ফেলে এবং পরে ধীরে ধীরে উদরস্থ করে। এইরূপ ধস্তাধস্তির সময় বিষধর সাপেরা আক্রমণকারীকে বার বার দংশন করিয়াও কৃতকার্য্য হয় না। কারণ ইহার শরীর শক্ত আঁশে আবৃত। নচেৎ শরীরে একটু বিষ প্রবেশ করিতে পারিলেই ইহার জীবনান্ত ঘটিত। অনেকের বিশ্বাস সাপের বিষ সাপকে লাগে না; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সাপের শরীরে সাপের বিষ প্রবেশ করাইয়া দেখা গিয়াছে ইহা অন্যান্য প্রাণীর পক্ষেও যেরূপ সাপের পক্ষেও ঠিক সেইরূপই মারাত্মক।

পটভূমিকা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

নিস্তারিণী দেবী সেকালের মানুষ। অবশ্য এটুকু না বলিয়া দিলেও তাঁহার নাম শুনিয়া বুদ্ধিমান পাঠকের অগোচর থাকিবার কথা নহে। বাপ-মায়ের তিনিই একমাত্র সন্তান ছিলেন না; পাঁচটি মেয়ের তিনিই ছিলেন সর্ব্বকনিষ্ঠা এবং তাঁহার পরেই একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুন্নাম নরক এবং কন্যাদায় এই দুই গুরুতর বিষয় হইতে পিতামাতাকে নিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আদরের সামগ্রী তিনি ছিলেন। সেই জন্য অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া ও খরচপত্র করিয়া আর চারিটি মেয়ের তুলনায় তাঁহারা তাঁহাকে ভাল ঘরেই দিয়াছিলেন বলিতে হইবে। পুরাতন বনিয়াদি বংশের বড় বৌ-রূপে পয়মন্ত নিস্তারিণী সেখানেও আদর-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যথেষ্ট। সে-সব এখন কাহিনীর বিষয়। আজ নিস্তারিণীর মাতা-পিতা বাঁচিয়া নাই, সেখানের একমাত্র বংশধর সেই ভাইটির চুলে পাক ধরিয়াছে। নিস্তারিণী ত কবে বিধবা হইয়া গৃহিণীতে পরিণত হইয়া স্থূলাঙ্গী হইয়াছেন—তাহা এ বাড়ীর বধূরাও জানে না। তাহারা শাশুড়ীকে বা দিদিমাকে জন্মাবধি থান কাপড় পরিতে দেখিতেছে; তাহারা জানে, তিনি একসন্ধ্যা আতপ চাউলের অন্ন গ্রহণ করেন, রাত্রিতে সামান্য দুধ ও মিষ্টি জলযোগ করেন; তাঁহার পাকা চুলের সংখ্যা কমাইতে মাঝে মাঝে ছোট ছোট নাতি-নাতিনীগুলির আগ্রহ দেখা যায়। একাদশীর দিন তাঁহার মুখে সেকালের গল্প শুনিতে ভালই লাগে, অবশ্য দশমীর লুচি, হালুয়া বা মিষ্ট ক্ষীর ও দ্বাদশীর সরবৎ, কলা ও ফলের টুকরার আস্বাদ গল্পের চেয়ে কম লোভনীয় নহে। আর লোভের সামগ্রী হইতেছে, প্রতি রবিবারে তাঁহার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাওয়া।

ভিখু বলিয়া এক গরীব রিকশওয়ালা তাঁহার বাহন-গিরি করে। ভিখু লোকটি ভাল, কারণ পটলডাঙ্গা হইতে বড়বাজারের ঘাটে বাহিনী-সমেত নিস্তারিণী দেবীর যাতায়াতের ভাড়া মাত্র তিন আনা লইয়া থাকে। নিস্তারিণী দেবীর দেব দ্বিজে যেমন ভক্তি, পুণ্যকর্ম্মে যেমন আগ্রহ, তেমনি গরীব দুঃখীর উপরেও মাঝে মাঝে দয়াশীলা হইয়া পড়েন। সেদিন ভিখুর অদৃষ্টে বাঁধা ভাড়া ছাড়া চানা খাইবার জন্য একটি আধলা এবং দয়ার আধিক্য হইলে একটি পয়সাও মিলিয়া থাকে।

নিস্তারিণী বলেন—আহা! ওরা হচ্ছে গরীব নারায়ণ, ওদের দেওয়াতেই যথার্থি পুণ্যি। গেরণের দিন, পুন্নিমে আমাবস্যের দিন, একাদশী দোয়াদশীর দিন, পালে পাব্বণে ওদের যা দেবে তার চার গুণ হয়ে তোমার ফিরে আসবে।

ছোট নাতি বাবু এক দিন বলিয়াছিল—আচ্ছা, ঠাকমা, আমি যদি ভিখুকে একটা আনি দিই ত কত পাব?

বড় নাতিটি ধারাপাত ইত্যাদি শেষ করিয়া স্কুলে সবে ভর্ত্তি হইয়াছে। দিদিমা উত্তর দিবার আগেই টপ করিয়া বলিল—কেন, চার আনা।

নিস্তারিণী ভ্রূকুটি করিয়া ছোট নাতিটির হাতের মুঠা চাপিয়া ধরিয়া রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন—দেখি হতভাগা ছেলে, ওই কুলুঙ্গি থেকে নিয়েছিস ত পেড়ে! ধন্যি ডাকাত বাপু, কি ক'রে নিলি?

নাতিনী লিলি বলিল—ও যে টুলে উঠতে পারে ঠাকমা।

—তাই!—ঠাস করিয়া তাহার গালে একটি চড় বসাইয়া তিনি তাহার পুণ্যসঞ্চয়ের আশাটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিলেন।

কিন্তু পুণ্যসঞ্চয় জিনিষটি বট, অশ্বত্থ বা ডুমুর জাতীয় গাছের মত এমন মারাত্মক রকম সজীব যে অঙ্কুরে বিনষ্ট হইবার উপায় নাই। মাটির রস না পাইলেও ইটের রসে পরিপুষ্টি লাভ করে। নিস্তারিণী দেবী গঙ্গাস্নানের

উদ্যোগ করিলেই একে একে নাতি নাতিনীরা রিকশয় চাপিয়া বসে। তাহাদের নামাইতে গেলে যে-কলরব উঠে তাহা বাড়ী—তথা পাড়ার পক্ষে চিত্তচাঞ্চল্যকর। যে-ঐকতান বাদনে মানুষের মাথায় খুন চাপিয়া যায়, এ কলরব ঐ জাতীয়। নিস্তারিণী দেবী ষষ্ঠীবুড়ী সাজিয়া এক ডজন নাতি নাতিনী লইয়া কি করিয়া যে রিকশর মধ্যে স্থান সঙ্কুলান করিয়া বসেন—তাহা বড় বড় গণিতজ্ঞেরও সমস্যার বিষয়! কিন্তু সর্ব্বংসহা নিস্তারিণী দেবীর যে-কোন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলিয়াই ওগুলিকে লইয়া বহুবার নিরাপদে বাড়ি পৌঁছিয়া গিয়াছেন। বস্ পুণ্য-সঞ্চয়ের ইচ্ছাই বলুন আর বকশিসই বলুন, ভিখুর লাভ হইয়াছে একটি আধলা বা পয়সা!

২

অর্দ্ধোদয় নহে—তাহারই কাছাকাছি একটা মাঝারি-গোছের যোগ ছিল। গঙ্গাস্নানে সহস্র গোদান তুল্য ফল। অবশ্য নিস্তারিণী দেবী বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সামান্য দুই, চার বা আট আনা ব্যয় করত ইতিপূর্ব্বে বহু শত গোদানের পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু বিনা ব্যয়ে (অবশ্য রিকশর তিন আনাকে ব্যয় বলা যায় না, কারণ প্রতি রবিবারে ওটি ত বাঁধা ব্যয়ের তালিকাভুক্ত হইয়াছে)—হাঁ—বিনাব্যয়ে একসঙ্গে সহস্র গোদান তুল্য ফল; নিস্তারিণী দেবী আয়োজন করিতে লাগিলেন।

—বড় বউমা, চাল যা নেবে, হিসেব করে নিয়ো। গেল রোববারে কিছুই মেপে দিয়ে যেতে পারি নি, নাহ'ক এক পো চালের ভাত নষ্ট করেছ! একটু হিসেব না করলে…আমার আর কটা দিন! বুঝবে ঠেলাটা তোমরাই। বলি হ্যালা নন্দা, তোর যে বড় বড়মানুষি দেখতে পাই লা? শ্বশুরবাড়ি গেলে যদি শতেকখোয়ার না হয়ত…বলি তিন দিন পরতে না পরতে শাড়ীগুলো দিস কাচাবাড়ি?…সরষের তেল একটু হিসেব ক'রে খরচ করো মা। কাল ত দেখলুম তরকারি দিয়ে তেল গুঁটিয়ে পড়ছে। আর গয়লা পোড়ারমুখোকে ব'লো—যদি অমন ক'রে দুধে জল ঢালে আর বাতাসা মিশোয়—তাহ'লে মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে—। ওমা, তুই আবার কোথায় চললি, সুবি?

সুবি ওরফে সুবাসিনী নিস্তারিণীর কনিষ্ঠা কন্যা। দিন কয়েক হইল পিত্রালয়ে আসিয়াছে। পাড়াগাঁয় দিকে শ্বশুরালয়; সেখানে গঙ্গা নাই। সুতরাং, পুণ্য-সঞ্চয়ের সুবিধাও নাই। পিত্রালয়ে আসিলে এই সঞ্চয়ের লোভ তাহার তীব্রতর হইয়া উঠে।

হাতের মটকার শাড়ীখানা কাঁধে ফেলিয়া ও সরিষা তেলের খাটিটি বাঁ-হাতের তালুর মধ্যে রাখিয়া সে ঈষৎ আব্দারের ভঙ্গীতে কহিল—বাঃ রে, আমি বুঝি নাইব না?

—নাইবি! ওই ত একরত্তি টেমি রিশকো—কুলোবে?

মেয়ে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—বাঃ রে, আমায় খুঁড়ছ। তোমার নাতির পাল আজ না হয় নাই গেল! না হয় একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে—

নিস্তারিণী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন—ঘোড়ার গাড়ী! ভাড়া জান? যেতে আসতে দেড়টি টাকার কম নয়। গরীব মানুষ, পাব কোথায়?

মেয়ে বলিল—মার যত টাকা জমছে—

মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ লো হ্যাঁ। পরের ধন আর নিজের পেরমাই কেউ কম দেখে না।

মেয়ে মুখ ভার করিয়া কহিল—আমি পর! বেশ গো বেশ—তবে পরই না হয়!

নিস্তারিণী দেবীর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য্য রকমে নামিয়া গেল। বহু সাধাসাধনা করিয়া মেয়ের অভিমান তিনি ভাঙাইলেন। কিন্তু পয়সা খরচ করিয়া ঘোড়ার গাড়ী আর ডাকাইলেন না।

ভিখু কিন্তু অবুঝের মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—সে তোবে না, মায়ি। খোকা খোঁকীরা যাবে, দিদিমণি যাবে, হাম নেহি শেকেগা।

নিস্তারিণী চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—শেকেগা নেই কিরে! এই ত মাত্তর দুটি প্রাণী আমরা, ছেলেদের ত সব নেব না, ওই টুনিটা আর বাল্টুটা—ও ছিনে জোঁক দুটোকে তো নিতেই হবে, বাবা।

আবার ঘাড় নাড়ে! আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় দুটো পয়সাই ধরে দেব। না কিরে দুটো পয়সা? আচ্ছা—না হয় তিনটে পয়সা—আবার ঘাড় নাড়ে—

৩

একটি সিকির বন্দোবস্ত করিয়াই ভিখু সকন্যা নিস্তারিণী দেবীকে গাড়ীতে তুলিল। বাণ্টু ও টুনির ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা ছিল, কিন্তু খেঁদী, খুকী, সন্তু বাবু ও গুবলু এমন কান্না জুড়িয়া দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল যে নিস্তারিণী তাহাদেরও তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। একটু বড় লিলি, নন্তু, ফণি, ঘোঁতন, মণ্টু ও পুঁটি কেবল পয়সার লোভে কোন মতে শান্ত হইয়া রহিল। শান্ত না হইলেই বা উপায় কি ছিল! যে-ভাবে নিস্তারিণী ও তৎকন্যার কাঁকে, কোলে ও পদতলে নাতি-নাতিনীগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছিল—তাহাতে তিল ধারণের জায়গা আর সেখানে ছিল না। বড় বধূ কিন্তু প্রকাণ্ড একটা ঘড়া আনিয়া দোর গোড়ায় নামাইয়া দিয়া ঘোমটার মধ্য হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—এক ফোঁটা গঙ্গাজল নেই, মা। ওবেলা সন্ধ্যে-আহ্নিক—

নাতি-নাতিনীকে বেড়িয়া হাতের যেটুকু উদ্বৃত্ত ছিল তাহাতেই কোনক্রমে নিস্তারিণী ঘড়াটি ধারণ করিলেন। পদতলন্যস্ত দুটি নাতির মাথায় সেটি ঠেকিয়া গেল। তাহারা আপত্তি করিতেছিল, নিস্তারিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—অমন করলে নামিয়ে দেব, জানিস? ভিখু, পর্দ্দাটা ফেলে দে বাবা, লোকে দেখলে কি বলবে!

পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া ভিখু পথচারীদের এক স্মরণীয় দৃশ্য দর্শন হইতে বঞ্চিত করিল। কিন্তু পথ চলিতে গিয়া সে পদে পদে বোধ হয় ভাবিতে লাগিল, গৃহিণী তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাটিকে এত ভালবাসেন তাহার একমাত্র কারণ উভয়ের দৈহিক আয়তন ও ওজনের সাদৃশ্য।

রিকশ ধনুকের মত বাঁকিয়া গেল, ভিখুর কপাল বাহিয়া দরদর ধারে ঘাম ছুটিল। অতি কষ্টে সে পুণ্যার্থী বাহিনী ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

ফিরিবার পথে পুণ্যসঞ্চয়ের ভারেই কি ভিখু হাঁপাইতে লাগিল? অশরীরী পুণ্যের এত কি ভার? কিন্তু ভিজা কাপড় ও পূর্ণকুম্ভ? সে তো পুণ্যের মত সূক্ষ্ম ভার নহে।

তবে পুণ্যের জোর অনেকখানিই ছিল, নতুবা সারা পথ নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া বাড়ির দরজায় ভিখু যেমন গাড়ীখানি নামাইয়াছে, পরিশ্রান্ত ভিখুর হাত ফস্কাইয়া একটু জোরেই হয়ত সেটি ভূমিস্পর্শ করিয়াছিল, অমনই ধনুকাকৃতি রিকশ মট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল। ঝাঁকানি খাইয়া সর্ব্বপ্রথম নিস্তারিণীর হস্তচ্যুত হইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ ঘড়াটি পর্দ্দা ভেদ করিয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িল। সম্মুখেই ছিল নর্দ্দমা; বগ্ বগ্ শব্দে পবিত্র জল উদ্গীরণ করিতে করিতে ঘড়াটি গড়াইতে গড়াইতে তাহারই মধ্যে কাৎ হইয়া স্থিতিলাভ করিল। এবং ঘড়াকে অনুসরণ করিয়া বগ্ বগ্ অর্থাৎ চীৎকার শব্দে একে একে নিস্তারিণী দেবী, তৎকন্যা ও নাতি-নাতিনীর দল সেই নর্দ্দমার মধ্যে গিয়াই স্থিতিলাভ করিলেন। সে এক দর্শনীয় ব্যাপার! কলিকাতার রাস্তা; কৌতূহলাক্রান্ত দর্শক জমিয়া গেল; এ-বাড়ীর ও অন্য বাড়ীর বৌয়েরা জানালায় ও বর্ষীয়সীরা দরজায় উঁকি দিতে লাগিলেন; পুরুষেরা বাহির হইয়া আসিয়া নর্দ্দমা হইতে একে একে নিস্তারিণী, তৎকন্যা ও নাতি-নাতিনীদের উদ্ধার করিতে লাগিলেন।

শতকণ্ঠে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল:—

—কি ক'রে ভাঙল, অ্যাঁ?—

—আহা বড্ড লেগেছে, বুড়ো মানুষ!—

—ডাক্তার ডাকবো?

—অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করব?

—ছেলেগুলোর হাড়টাড় ভাঙে নি তো?

—ইস্, ছড়ে গেছে হাঁটুটা, রক্ত বেরুচ্ছে!

—আহা, দামী ঘড়াটা টোল খেয়ে বিচ্ছিরি হয়েছে দেখ?

—এমনও আনাড়ী রিকশওয়ালা ব্যাটা!

—ব্যাটা খুনে কোথাকার।

ভিখু অভিভূতের মত তাহার ভাঙা রিকশটার পাশে বসিয়াছিল। তাহার কান্না শুনিবার সময় ও তাহাকে সহানুভূতি দেখাইবার সাহস এই জনতার ছিল না, সুতরাং সে কাঁদিয়া কোলাহল বৃদ্ধি করে নাই।

মধু-সন্ধায়ী

মংপু-নিবাসিনী শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মউচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে
যদি তা পাঠাতে পারো ডাকে
বিলাতি শুগার হ'তে পাব নিস্তার
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
গুড়ং দদ্যাৎ বাণী বলে কবিরাজে
দায়ে পড়ে তাই
লুচি-পাঁউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই,
বিমর্ষ মুখে বলি গুড়ং দদ্যাৎ
সে যেন গদ্যের দেশে আসি পদ্যাৎ।
খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিঃশ্বাস ফেলে বলে সকলি অনিত্য
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হ'তে তোমার আতিথ্য।
গৌড়ী গদ্য হ'তে মধুময় পদ্য
দর্শন দিতে পারে সদ্য।

১৩ ফাল্গুন, ১৩৪৬

২

তল্লাস করেছিনু হেথাকার বৃক্ষের
চারিদিকে লক্ষণ মধু দুর্ভিক্ষের।
মৌমাছি বলবান পাহাড়ের ঠাণ্ডার,
সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধুভাণ্ডার
হেন দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে চিঠিতে,
এ বছর বৃথা যাবে মধুলোভ মিটিতে।
তবু কাল মধু লাগি করেছিনু দরবার
আজ ভাবি অর্থ কি আছে দাবী করবার।
মৌচাক-রচনায় সুনিপুণ যাহারা
তুমি শুধু ভেদ কর তাহাদের পাহারা।
মৌমাছি কৃপণতা করে যদি গোড়াতেই
জা্যাম না মেলে তবু খুশি রব খোড়াতেই।
তাও কভু সম্ভব না হয় যদিস্যাৎ
তাহলে তো অবশেষে শুধু গুড় দদ্যাৎ।
অনুরোধ না মিটুক মনে নাহি ক্ষোভ নিয়ো,
দুর্লভ হ'লে মধু গুড় হয় লোভনীয়।
মধুতে যা ভিটামিন কম বটে গুড়ে তা
পূরণ করিয়া লব টমেটোয় জুড়ে তা।
এই ভাবে করা ভালো সন্তোষ আশ্রয়
কোনো অভাবেই কভু তার নাহি নাশ রয়।

২৭।২।৪০

৩

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা
আজি হ'তে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণা বৈলাতী শর্করা
পূর্বাহ্নে পরাহ্নে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে;
এ মধু করিব ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে।
যে দাক্ষিণ্য-উৎস হ'তে উৎসারিত এই মধুরতা
রসনার রসযোগে অন্তরে পশিবে তার কথা।
ভেবেছিনু অকৃতার্থ হয় যদি তোমার প্রয়াস
সস্নেহ আঘাত দেবে তোমারে আমার পরিহাস,

তখন তো জানি নাই গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী
তোমার সহায় হয়ে অর্ঘ্যপাত্র দিবে তব ভরি।
দেখিনু বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে
তোমারে বরিল ধরা মধুময় আশীর্ব্বাদ দানে।

৫।৩।৪০

৪

দূর হ'তে কয় কবি,
জয় জয় মাংপবী,
কমলা কানন তব না হউক শূন্য,
গিরিতটে সমতটে
আজি তব যশ রটে
আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দান পুণ্য।

তোমাদের বনময়
অফুরান যেন রয়
মৌচাক-রচনায় চির নৈপুণ্য।
কবি প্রাতরাশে তার
না করুক মুখ ভার,
নীরস রুটির গ্রাসে না হোক সে ক্ষুণ্ণ।
আর বার কয় কবি,
জয় জয় মাংপবী,
টেবিলে এসেছে নেমে তোমার কারুণ্য,
রুটি বলে জয় জয়
লুচিও যে তাই কয়
মধু যে ঘোষণা করে তোমারি তারুণ্য।

৭।৩।৪০

জবাবদিহি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি হয়ে দোল-উৎসবে
কোন্ লাজে কালো সাজে আসি,
এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে
করেছিলি খুব হাসাহাসি।
চৈত্রের দোল-প্রাঙ্গণে
আমার জবাবদিহি চাই
এ দাবি তোদের ছিল মনে
কাজ ফেলে আসিয়াছি তাই।

দোলের দিনে, সে কি মনের ভুলে
পরেছিলাম যখন কালো কাপড়,
দখিন হাওয়া দুয়ারখানা খুলে
হঠাৎ পিঠে দিল হাসির চাপড়।
সকল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগাল বুঝি
শেষ প্রহরে রং-হরণের পালা।

ওরে কবি ভয় কিছু নেই তোর
কালো রং যে সকল রঙের চোর।
জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি
হারিয়ে যাওয়া পূর্ণিমা ফাল্গুনী,
অস্তরবির রঙের কালো ঝুলি,
রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি।
অন্ধকারে অজানা সন্ধানে
অচিন লোকে সীমাবিহীন রাতে
রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে
চলব যখন তারার ইশারাতে,
হয়তো তখন শেষ বয়সের কালো
করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি'
যৌবন-দীপ, জাগাবে তার আলো
ঘুম-ভাঙা সব রাঙা প্রহরগুলি।
কালো তখন রঙের দীপালিতে
সুর লাগাবে বিস্মৃত সংগীতে॥

২৮।৩।৪০



দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নবনির্ম্মিত ভবনে প্রবেশ-উৎসবানুষ্ঠানে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে



ভারতপ্রেমিক ও প্রবাসী-ভারতীয়ের বন্ধু এণ্ডরুজ

পনর বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত চিত্র

কবির উত্তর

বাঁকুড়ার জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে কথিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধুগণ, এ-রকম ভূরিপরিমাণ সম্মান গ্রহণ করবার শক্তি আর নেই। আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত। স্বভাবত আমি এই কথাই মনে করি যে, সম্মান প্রাপ্য হচ্ছে তাঁদের, যাঁদের এমন কোনো কর্ম বা ব্যবসা যাতে লোকেদের মানিয়ে চলায় তাঁদের প্রয়োজন। সবাই যাঁদের নির্দেশকে মেনে চলবে তাঁদের নেতৃত্ব সম্পাদন করতে হ'লে সম্মান চাই। তাঁরা রাষ্ট্র চালনা করেন, অস্ত্র চালনা করেন, আইন চালনা করেন, বে-আইন চালনা করেন—সেই চালনা জনসাধারণকে মানতে বাধ্য করতে হ'লে সম্মানের জোর চাই। আমরা কবিরা বরাবর যে-কাজ করে এসেছি তার পরিচয়কে ক্ষমতা আখ্যা দেওয়া চলে না। ক্ষমতার ভিতরে যে বলবত্তা আছে এর মধ্যে সেই পেয়াদার ডাণ্ডা ওঁচানো নেই, ঠিক উলটো। আমরা যে-শক্তি নিয়ে ব্যবহার করি, বলতে হয় সে জাদু; বলতে হয়, বিশ্বজাদুকর সেই জাদুমন্ত্র কবির কানে দীক্ষামন্ত্ররূপে দিয়েছেন সেইটে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি তো তাতে ভুলিয়ে দেয় লোকের মন—বাধ্য করে না, জবরদস্তি করে না। সেই জাদুশক্তির পরিণাম সম্মান নয়, খুশি, সেই সঙ্গে হয়তো বিস্ময়। সেইটা আপাতত দাবি করা যাক। তার পরের কথা মহাকালের সভায়। মহাকাল কবিকে অভিনন্দন দেবার জন্যে যে প্যাণ্ডেল তৈরি করেন তা দিগন্ত হতে দিগন্তে বিস্তৃত। সেই প্যাণ্ডেল আকাশবিস্তৃত বলেই ধ্বনিসংযম থাকে।

সাধারণত আমরা সেইখানেই সম্মানকে গ্রহণ করি, যে প্যাণ্ডেলের পরিধি সংকীর্ণ। সংকীর্ণতার মধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় একটু বেশি আতিশয্যের সঙ্গে। সেটা কিছু অস্বাভাবিক হয়েই থাকে। খুশিমনের ভাষা হয়েই পড়ে অত্যুক্তির ভাষা—বাহবা উঠতে থাকে উচ্ছ্বসিত স্বরে। সেটার সম্পূর্ণ যাথার্থ্য স্বীকার ক'রে নিতে মন কুণ্ঠিত হয়, এইটে অনুভব করেছি আমি অনেক দিন থেকেই। তরুণ কবিদের মধ্যে দেখা যায় এই অত্যুক্তির উপরি-পাওনা নিয়ে তাঁরা হানাহানি করেন। কিন্তু একটা বয়স আসে যখন সম্মান গ্রহণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য আসে। কিন্তু যে কামনাটা স্বাভাবিক তার সম্বন্ধে উপেক্ষা হয়তো বোধশক্তির দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

এ-কথা যখন মানুষের কাছ থেকে শোনা যায় যে তোমাকে পেয়ে খুশি হয়েছি তখন কুণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। কাঁচা বয়সে উচিত পাওনার চেয়ে বেশিই দাবি করে মানুষ। দ্বিধা হবার বয়স পরে আসে যখন দেখা যায় খ্যাতির বাজার-দর ক্রমাগতই কী রকম ওঠানামা করে।

অভ্যস্ত হ'তে পারি নি আমি প্রশস্তি নিতে।

পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে বাংলার অখ্যাত এক প্রান্তে দিন কেটেছে। স্বদেশের কাছে কি বিদেশের কাছে অজ্ঞাত ছিলুম। তখন মনের যে স্বাধীনতা ভোগ করেছি সে যেন আকাশের মতন। এই আকাশ বাহবা দেয় না তেমনি বাধাও দেয় না। বকশিষ যখন জোটে নি বকশিষের দিকে তখন মন যায় নি। এই স্বাধীনতায় গান গেয়েছি আপন মনে। সে-যুগে যশের হাটে দেনা-পাওনার দর ছিল কম, কাজেই লোভ ছিল স্বল্প। আজকের দিনের মত ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না। সেটা আমার পক্ষে ছিল ভালো, কলমের উপর ফরমাশের জোর ছিল ক্ষীণ। পালে যে হাওয়া লাগত সে হাওয়া নিজের ভিতরকার খেয়ালের হাওয়া। প্রশংসার মশাল কালের পথে বেশি দূর পথ দেখাতে পারে না—অনেক সময়ে তার আলো কমে, তেল ফুরিয়ে আসে। জনসাধারণের

মধ্যে বিশেষ কালে বিশেষ সাময়িক আবেগ জাগে—সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত। সেই জনসাধারণের তাগিদ যদি অত্যন্ত বেশি করে কানে পৌঁছোয় তাহলে সেটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো ভাবী কালের যাত্রা-পথের দিক ফিরিয়ে দেয়। কবিরা অনেক সময়ে বর্তমানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক-একটা সময় আসে যখন ঘুষের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাত্মবোধ, সম্প্রদায়ী বুদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে। তখন নগদ-বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়। অন্য দেশের সাহিত্যে এর সংক্রামকতা দেখেছি, জনসাধারণের ফরমাশ বাহবা দিয়ে জনপ্রিয়কে যে উঁচু ডাঙায় চড়িয়ে দিয়েছে, স্রোতের বদল হয়ে সে ডাঙায় ভাঙন ধরতে দেরি হয় না।

আমার জীবনের আরম্ভকালে এই দেশের হাওয়ায় জনসাধারণের ফরমাশ বেগ পায় নি, অন্তত আমাদের ঘরে পৌঁছোয় নি। অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার খুব নাম শুনেছ কিন্তু এক সময় ছিল আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। আমরা যে অল্প লোককে জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না। আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে, তখন আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের মতো কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব ব'লে। আমার মরাইয়ে আজ যা কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অঙ্কুরিত হয় মাটির মধ্যে ভূগর্ভে। ভোরের বেলার চাষী তার বীজ ছড়ায় আপন মনে। অঙ্কুরিত না হ'লে সে বীজ-ছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কী পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ জেনে মহাজন তবে দাদন দিতে আসে। যে মহাজনের ক্ষেতের উপর নজর পড়ে নি তাদের ঋণের আশ্বাস আমি পাই নি। একান্তে নিভৃতে যা ছড়িয়েছি, ভাবিও নি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

এক সময়ে অঙ্কুর দেখা দিল। মহাজন তার মূল্য ধরে দিলে আপন-আপন বিচার অনুসারে। সেই সময়কার কথা বলি। বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে-ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোণের এক ঘরে ছিলেম বন্দী। সেই ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখেছি বাগান, সামনে পুকুর। লোকেরা স্নান করতে আসছে স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছে। পুব দিকে বটগাছ, ছায়া পড়েছে তার পশ্চিমে সূর্যোদয়ের সময়। সূর্যাস্তের সময় সে ছায়া অপহরণ করে নিয়েছে। বহির্জগতের এই স্বল্প পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি করত। জানলার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাই নি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে।

সেই সময় অকস্মাৎ পেনেটির বাগানে আসতে পেরে-ছিলুম ডেঙ্গু জ্বরের প্রভাবে বাড়ির লোক অসুস্থ হওয়ায়। সেই গঙ্গার ধারের স্নিগ্ধ শ্যামল আতিথ্য আমায় নিবিড় ভাবে স্পর্শ করল। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেত মেঘের ছায়া, ভাঁটার স্রোতে জোয়ারের স্রোতে চলত নৌকো, পণ্য নিয়ে যাত্রী নিয়ে। বাগানের খিড়কির পুকুরপাড়ে কত গাছ, যে-সব গাছে ছিল বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের বিশেষ পরিচয়। পুকুরে আসত যেত যারা সেই সব পল্লীবাসী-পল্লীবাসিনীদের সঙ্গে একরকমের চেনাশোনা হ'ল, নিকট থেকে নাই হোক অসংসক্ত অন্তরাল থেকে।

তার পর পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে—ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, নদীয়া এবং রাজসাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে পল্লীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান্ জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পল্লীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দুঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলেম এই প্রথম।

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, "উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রূপোর চামচে মুখে নিয়ে

জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি 'কী জানেন'।" আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলা দেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লী-পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।

কলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়েছি শান্তিনিকেতনে। চারি দিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। কিন্তু সে তার একটা বিশেষ দৃশ্য। পুকুর-নদী বিল-খালের যে বাংলা দেশ এ সে নয়। এর একটা রুক্ষ শুষ্কতা আছে, সেই শুষ্ক আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস; সেখানকার মানুষ যারা, সাঁওতাল, সত্যপরতায় তারা ঋজু, এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি। আমার বিপদ হয়েছে এখন—অখ্যাত ছিলেম যখন, অনায়াসে পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো বেষ্টন ছিল না "ঐ কবি আসছেন"—"ঐ রবি ঠাকুর আসছেন" ধ্বনি উঠত না। তখন কত লোক এসেছে, সরল মনে কথা বলেছে। কত বাউল কত মুসলমান প্রজা, তাদের সঙ্গে একান্ত হৃদ্যতায় আলাপ-পরিচয় হয়েছে। সম্ভব ছিল তখন। ভয় করে নি তারা। তখন এত খ্যাতিলাভ করি নি, বড়ো দাড়িতে এত রজতচ্ছটা বিস্তার হয় নি। এত সহজে চেনা যেত না আমাকে, ছিল অনতিপরিচয়ের সহজ স্বাধীনতা।

এই তো একটা জায়গায় এলুম, বাঁকুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে কিন্তু পল্লীগ্রামের চেহারা এর। পল্লীগ্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন যদি থাকত তো এরই আঙিনায় আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারতুম। এ দেশের এক নূতন দৃশ্য—শুষ্ক নদী বর্ষায় ভরে ওঠে অন্য সময় থাকে শুধু বালিতে ভরা। রাস্তার দুই ধারে শালের ছায়াময় বন। পেরিয়ে এলুম মোটরে পল্লীশ্রীর ভিতর দিয়ে, দেখতে পাই নি বিশেষ কিছুই। এমনতরো দেখা এড়িয়ে যাবার উপায় তো আর নেই। কেবলই চেষ্টা কী ক'রে দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিতে পারে উপলক্ষ্য থেকে। যেন উপলক্ষ্যটা কিছুই নয় শুধু লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার উপায়। কিন্তু এই উপলক্ষ্যই তো হ'ল আসল জিনিস। এরই জন্যে তো লক্ষ্য আনন্দে পূর্ণ হয়। আগে তীর্থ ছিল লক্ষ্য আর সারা পথ ছিল তার উপলক্ষ্য। তীর্থের যাত্রীরা কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়ে তীর্থের মহিমাকে পেতেন; তীর্থ সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করত তাঁদের। টাইম-টেবল নিয়ে যারা চলাফেরা করে দুর্ভাগ্য তারা, চোখ রইল তাদের উপবাসী। পূর্বকালে ভারতের ভূগোল-বিবরণের পাঠ ছিল তীর্থে তীর্থে। তীর্থদেশে হিমালয় পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর, অপর পার্শ্বে আরব সাগর—এ সমস্তই তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত। এই পাঠ নিতে হয়েছে পদব্রজে। সে শিক্ষা নেমে এসেছে ব্ল্যাকবোর্ডে। আমার পক্ষেও। আমি পল্লীর পরিচয় হারিয়েছি নিজে পরিচিত হয়ে। বাইরে বেরনো আমার পক্ষে দায়, শরীরেও কুলোয় না। আমার পল্লীর ভালোবাসা বিস্তৃত করতে পারতুম, আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম কিন্তু সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না। আমার সেই শিলাইদহের জীবন হারিয়ে গেছে। তাই আমি বলব, সম্মান দিয়ে কবিকে ব্যর্থ করা কিছু নয়। সেজন্যে অপেক্ষা করা ভালো মৃত্যুর।

জীবনের পরপারবর্তী এক জন কবির প্রতি এই প্রদেশের কত বড়ো সম্মান ভালোবাসার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে এখানকার আকাশে। সেই চণ্ডীদাস মৃত্যুর আগে সমাজে কত নিন্দা পেয়েছেন, কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। কবিজনোচিত আত্মশক্তি ছিল তাঁর। যে সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন,

তাতে লোকনিন্দা পরিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তাঁর উপর থেকে। সে নিন্দা তাঁর জীবনকে মহত্ত্ব দিয়েছে, পরে সেই জীবন আপন সম্মান নিয়ে সুবিস্তীর্ণ হয়েছে সমস্ত বাংলার মধ্যে। মহাকালের হাতে সত্যকার সম্মান লাভ করেছেন তিনি মৃত্যুর পরে, এখন তো কেউ বাধা দিতে পারে না তাঁকে। যদি অদৃষ্টে থাকে চণ্ডীদাসের সম্মান আমার ঘটবে—তখন জানব না আমি থাকব না আমি।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া
মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ—

সুস্পষ্ট বাংলা ভাষার এই যেন প্রথম বাণী চিরকালের মর্মের মধ্যে প্রবেশ করে রইল। চণ্ডীদাসের গান বাংলার গায়কদের সহযোগিতা আকর্ষণ করেছে, গঙ্গার প্রবাহ যেমন পূর্ণ হয়েছে পথে পথে উপনদীদের ধারায়। তখনকার কালের কাব্য সমস্ত দেশের কাব্যরসকে মিলিয়ে চলত আপনার মধ্যে। আমাদের দেশের কালোয়াতি গানে রচয়িতার স্বত্বসীমা গায়কের তানের উচ্ছ্বাসকে বাধা দেয় না। পদাবলীরও সেই দশা। চণ্ডীদাসের গান উৎসমুখে ছিল যে-ভাষায় কালের প্রবাহে সে-ভাষা বাংলার পরিবর্তমান বাণীকে গ্রহণ করে এসেছে। বস্তুত কালশিল্পীর হাতের রং-লাগানো চণ্ডীদাসের গানকেই আমরা আপন ব'লে উপভোগ করে এসেছি। এতদিন তাকে তার ঐতিহাসিক সীমায় পাই নি। এখন ইতিহাসের প্রহরী তার তর্জনী তুলেছে। তার ফলে তিন চণ্ডীদাস নয়, দুই চণ্ডীদাসের উদ্ভব হয়েছে—ঐতিহাসিক তর্কক্ষেত্রের বিশেষ চণ্ডীদাস এক জন, আর এক জন সর্বজনের চণ্ডীদাস, সর্বকালের বাংলাভাষায় যাঁর গান আজ ধ্বনিত হচ্ছে। এই চণ্ডীদাসের সঙ্গেই আমার প্রথম পরিচয় এবং সম্পূর্ণ পরিচয়।

এখন ছাপাখানা হয়েছে, আমাদের গানের সীমানা পাকা হয়ে গেছে ছাপার হরফে। তাই চণ্ডীদাস দেশের যে ক্ষেত্রে আসন নিয়েছেন আমাদের মতো হালের কবি সেখানে পৌছতে পারবে না। আমরা ইতিহাসে বাঁধা, এত বাঁধা যে কবির নিজের হাতের বদল নিয়েও স্বত্বের মামলা উঠে পড়ে। চণ্ডীদাস আজ সমস্ত দেশের কাছে যে অভিনন্দন পাচ্ছেন ইতিহাস তাকে বেড়া দিয়ে ঘেরে নি। আজকের দিনের এই অভিনন্দনের মধ্যে বসে এ তর্ক সহজেই মনে আসে ইতিহাসের অতীত মহাকাল এর কতখানি গ্রহণ করবেন কতখানি ফেলে দেবেন বিস্মৃতির আবর্জনায়। পৃথিবীতে পাকা ইমারত দিয়েই ইতিহাসের বড়ো বড়ো ধ্বংসস্তূপ তৈরি হয়েছে। যা চলনশীল, কালের চলার সঙ্গে যার চলার তাল মেলে তা বিশেষ স্বত্বের দাবি করে না ব'লেই সকলের স্বত্বে টিঁকে যায়। তোমাদের অভিনন্দনকে আজ আমি গ্রহণ করি, আপাতত এ জমা থাক্ গচ্ছিত সম্পত্তির মতো, কালের বড়ো অভিনন্দন-সভায় এর যাচাই হবে, তখন তোমাদের এই বাঁকুড়াতেই চণ্ডীদাসের পাশে কি আসন পাব এই প্রশ্ন মনে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৬



নূতন কবিতা

ছড়া-ছন্দে লিখিত নূতন কবিতা পাঠের ভূমিকাস্বরূপে
বিশ্বভারতীর ছাত্রদের উদ্দেশে কথিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমরা আমার ছড়া-ছন্দে লেখা নূতন কবিতা শুনতে চেয়েছ, কিন্তু কাজ কী। যার পরিচয় পাকা হয় নি তাকে সহজেই হাত বাড়িয়ে পাবার চেষ্টা করলে পাওয়াই হবে না। এতদিন আমার কাব্যের যে পরিচিত পথে তোমরা চলে এসেছ এদের পথ তার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম শুনে এইটেই মনে লাগবে যে এ জিনিস অদ্ভুত। কবি কেন যে হঠাৎ লিখতে বসল ভেবেই পাবে না। পরের সুপারিস নিয়ে এ-সব জিনিষ মেনে যাওয়ার বিপদ হচ্ছে এই যে, কী যে মানছ তা নিজেই সুস্পষ্ট বুঝতে পারবে না। অপেক্ষা করতে দোষ কী। যখন সুযোগ হবে তখন নিজেরাই আবিষ্কার করবে এর স্থান কোথায়, এর অর্থ কী। তখন যে চমক লাগবে সে যেন ভ্রমণকারীর মনে নতুন দেশ আবিষ্কারের চমকের মতো। হয়তো কিছুটা সময় নেবে সেই আবিষ্কারের পথে। তা হোক, তাতে ক্ষতি নেই।

আজ আমি যদি ছড়াগুলি তোমাদের পড়ে শোনাই, আমার কণ্ঠস্বরের মোহে এবং পাঠের বৈশিষ্ট্যে হয়তো সেগুলি তোমাদের মনে কিছু রসসৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু সে রসসঞ্চার হবে সম্পূর্ণ সাময়িক—তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

এ সম্পর্কে তোমাদের দিক থেকেই প্রস্তুত হতে হবে রসাস্বাদনের জন্যে; এবং সত্যিকারের কাব্যরস উপভোগের সহায়তা তাতেই করবে। বিশেষ আকাশ বিশেষ বাতাস বিশেষ মাটি বিশেষ ঋতুর সঙ্গে ফসলের প্রাণগত পরিপ্রেক্ষিতের একান্ত যোগ আছে। শস্যের সেই রহস্যময় প্রাণরূপ দেখে যে লোক আনন্দ পায় সে এই সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে তাকে দেখতে পেয়েছে। মহাজন যখন তাকে আড়তের ভাণ্ডারে তুলে জমা করে তার প্রাণরূপ হয় উপেক্ষিত, বস্তুরূপই হয় মুখ্য, তখন সে তার বিশাল পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্তূপ বাঁধে। তেমনি কাব্যের প্রাণরূপটিকে যারা সম্পূর্ণ ক'রে দেখতে পারে তারা কবির মনের ভিতর থেকে কাব্যের সেই পরিপ্রেক্ষিতকে আপনার মনের মধ্যে বিস্তীর্ণ ক'রে আনতে পারে। বিচ্ছিন্ন বিষয়বস্তু থেকে কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিতাকে তার স্বকীয় বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে দেখা, পাঠকের এটি একটি বিশেষ শক্তি। এই এই শক্তি সুলভ নয় কাব্যপাঠকদের মধ্যে, তাই খাঁটি রসগ্রাহীর সংখ্যাও জগতে অধিক নয়। স্বকীয় পরিবেষ্টনের মধ্যে কাব্যের সত্যতা। এই সত্যতা উপলব্ধিতেই আনন্দ। এর দ্বারাই কবিতার রসগ্রহণের স্বীকৃতি। ছবির উদাহরণ দিয়েই বলা যাক্। নন্দলাল এঁকেছিলেন একটি গাধার ছবি। সে-ছবি আমাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছিল। এ-কথা নিঃসংকোচেই স্বীকার করতে হয়, জীব-গাধাটির ধ্বনির মোহ নেই, আকৃতিগত সৌন্দর্যেও কোনো গৌরব নেই। কিন্তু নন্দলালের গাধার ছবি দেখে বিনা দ্বিধায় বলতে হয়, হ্যাঁ, কিছু একটা হয়েছে। এই ভাবেই কবির সৃষ্টি রসপিপাসুদের মনের স্বীকৃতি আদায় ক'রে নেয় সুনিশ্চিত সত্যের দাবিতে।

এক দিন চলেছিলেম বাঁধা পথ বেয়ে। আচমকা চোখে পড়ল অজানা একটি ফুল। ওকে সেই মুহূর্তেই অভিনন্দন জানালেম কল্পনার রাজ্যে, নাম দিলেম রক্তমুখী; স্বীকার ক'রে নিলেম সৃষ্টিকৌশলের একটি নূতন রূপ বলে। মনের সেই সহজ স্বীকৃতি আদায়ের মূলে ঠিক

ছিল না ফুলটির সৌন্দর্যের মোহে ভোলাবার জাদু। ওর সঙ্গে পরিচয়ে হঠাৎ পেয়েছি বাস্তবের নূতন ও যথার্থ আবিষ্কারে। সৃষ্টির নিশ্চিত স্বাক্ষর আছে ব'লেই তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি সহজে। নব নব রসবিকাশে কবিদের সৃষ্টি এই ভাবেই নব নব রূপে আত্মনিবেদন করে। সেই নূতন সৃষ্টিকে স্বীকার ক'রে নিতে হয় অভ্যাসের দ্বারা নয়, সর্বসাধারণের সমর্থনের দ্বারা নয়, অলংকারশাস্ত্রের প্রচলিত বিধানের দ্বারা নয়, আপনার মধ্যে সৃষ্টিবোধের সত্যতায়।

সমুদ্রমন্থনে উঠেছিল উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত; তারই সঙ্গে উঠেছিলেন লক্ষ্মী। উদ্ভাবিত হয়েছিল নব নব রূপ। কবির মনেও চলেছে নিত্যকালের সেই সমুদ্রমন্থন, নূতন নূতন রূপ আত্মপ্রকাশ লাভ করে সেই মন্থনের ফলে।

তাই তোমাদের বলি, আমার কাব্যের একটি বিশেষ পথ ধরে চলতেই তোমরা অভ্যস্ত। তোমরাই আবার এক দিন নূতন পথে চলতেও অভ্যস্ত হবে তোমাদেরই নূতন আবিষ্কারে। আমি সে-পথ দেখাতে পারি নে—তোমরা নিজেরাই সেই পথ আবিষ্কার করো।

[শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত]

কালবৈশাখী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

হৃদয় আমার নেচে উঠে শুনি'
কালবৈশাখী ডাক—
গগনাঙ্গনে দিগঙ্গনার
শুভাশীর্ব্বাদ-শাঁখ!
শুষ্ক বসুধা যে আশিসে উর্ব্বর,
ধনে ও ধান্যে ভরে মানবের ঘর,
পশু পাখী শাখী—প্রকৃতির অন্তর
ভরে' উঠে ভরসায়,
যে রসের টানে হরষের বানে
নদনদী বয়ে যায়!

শৈশবে যবে মেঘ-উৎসবে
পেয়েছি নিমন্ত্রণ,
অজানা ছন্দে মহা আনন্দে
মাতিয়া উঠেছে মন!
তার পরে ধীরে আসিয়াছে যৌবন,
মুগ্ধ শ্রবণ শুনেছে সে ডাকে
ধ্রুপদ সঙ্গে মৃদঙ্গ গরজন!
কত যূথী-বেলা-চম্পা-চামেলা
দীপ্ত করেছে অন্তর-উপবন!

জীবনের এই সন্ধ্যায় সীমানাতে,
ঐ ডাকে আজও মনের ময়ূর মাতে,
দেহমনে হানে পুলকের শিহরণ!
নাহি ক্ষতি ক্ষোভ,
জাগে শুধু লোভ—
ঐ ডাকে যেন মুদে' আসে দু-নয়ন।

বৈরিগীর ভিটেয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভীষণ শীত। বাহিরে বৃষ্টি আর বাতাসে মাতামাতি চলিতেছে। তারাপদ বলিয়া দিয়াছিল, চাকর একটা তোলা উনানে এক উনান আগুন রাখিয়া গেল, সকলে নিজের নিজের চেয়ার টানিয়া লইয়া আগুনটা ঘেরিয়া ফেলিল। যে-প্রসঙ্গটা সুরু হইয়াছিল তাহারই জেরটা ধরিয়া রাখিয়া সুধেন বলিল, "অশ্বিনী, বিশ্বাস না কর নেই নেই; তুমি কিন্তু এত রাত্রে ও-পথ দিয়ে আর বাড়ী যেও না, তারাপদ যেমন বলছে এইখানেই খেয়ে দেয়ে রাতটা কাটিয়ে দাও। ভূত না থাক, এই রকম ভয়ঙ্কর রাত্রের একটা নিজস্ব স্পিরিট আছে, অবস্থাগতিকে সেইটেই মানুষের প্রাণঘাতী হ'তে পারে।"

অম্বিকা বলিল, "নটা থেকে আবার অমাবস্যা পড়েছে।"

অশ্বিনী উত্তর করিল, "যাক্, মানুষের স্পিরিট থেকে রাত্রির স্পিরিটে নেমে এসেছ, এইবার বলবে রাস্তার স্পিরিট, পুকুরের স্পিরিট;—আর এতই যদি চারি দিকে স্পিরিটের হুড়োহুড়ি তো অক্ষয় তো থাকবেই আমার সঙ্গে..."

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মাফ করতে হচ্ছে, শর্মা আর আজ এ-ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে না। এই রাত্রে দু-মাইল পথ ভেঙে যাওয়ার সখ আমার নেই, তাও আবার সিদ্ধেশ্বরীর শ্মশানঘাটের কাছ দিয়ে। তোমার মত আমার নূতন বিয়ে নয় যে জবাবদিহি দিতে হবে; বরং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বিয়ের কথাটা এত দিনে উঠেছে, তার জন্যে আমায় শত্রুমুখে ছাই দিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।"

স্থানটা এদের দৈনিক তাসের আড্ডা তারাপদর বাসা। মিল এরিয়াটা এইখানে প্রায় শেষ হইয়াছে। এর পরেই একটা প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার একটা দিক্ গঙ্গা পর্য্যন্ত প্রসারিত। মুক্ত মাঠের উপর দিয়া এলোমেলো হাওয়া আসিয়া চারি দিক দিয়া ঘরটায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, দুয়ার জানালার ছিদ্রপথে কখনও কান্না, কখনও অনুযোগ, হাওয়ার উগ্রতায় কখনও বা ভীত আর্ত্তনাদের মত শব্দ হইতেছে। একবার দুয়ারের ছিটকিনিটা পর্য্যন্ত এমন ঝন্‌ঝনাইয়া দিল যে সবাইকেই ফিরিয়া চাহিতে হইল; অম্বিকা একটু নিষ্প্রভ হাস্যের সহিত বলিল, "সত্যিই ভেতরে আসতে চাইছেন নাকি ওঁদের কেউ?"

অক্ষয় বলিল, "যদি চানই তো কিছু বিচিত্র নয়। এই যে প্রবল ধাক্কাটা লাগল দোরের গায়ে, এটা এই পাগলা হাওয়ার হওয়াই বেশী সম্ভাবনা;--পনের আনা, কিন্তু বাকী এক আনার মধ্যে আর একটা মস্ত সম্ভাবনা আছে। সেটাকে শুধু গল্পিকা ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে না কেননা তাতে দর্শনশাস্ত্রের শিলমোহর আছে। ব্যাপারটা—তোমরা জান দর্শনের একটা থিয়োরি হচ্ছে যে আসলে সময়ের বিভাগ অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ব'লে কোন বস্তু নেই, ও ধারণাটা নিতান্ত আপেক্ষিক। প্রকৃত তথ্য এই যে—There is one eternal Now, অর্থাৎ কাল সর্ব্বব্যাপী একটি শাশ্বত সত্তা। এখন, তাই যদি ঠিক হয় তো জগতের যা কিছু ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে আর ঘটবে ব'লে আমরা মনে করি সবই একই সময়ে উপস্থিত রয়েছে—শুধু time and space অর্থাৎ স্থান আর কালের বিভিন্ন স্তরে। তার মানে ঠিক এই স্থানে—আমরা যাকে অতীত বলি সেই সময় যদি কোন এক ঘটনা থাকে তো এখনও তা ঘটছে—শুধু আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে। জ্ঞানের অন্তরালে এই জন্যে যে, যে-স্তরে তা ঘটছে সেই স্তরে আমরা এই স্থূল চেতনা নিয়ে পৌঁছতে পারি না। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হ'লে, বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে, আমরা হঠাৎ সেই ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। তার মানে..."

সুধেন বলিল, "দোহাই তোমার, আর, 'তার মানে'

নয়, টীকা ক্রমেই মূলের চেয়ে জটিল হয়ে উঠছে। বরং প্রথমটা কিছু বুঝছিলাম, এখন আর…”

অক্ষয় বলিল, “বুঝিয়ে দিচ্ছি খুব স্থূল ভাবে,—ধর কোন অতীতে ঠিক এই জায়গাতে একটা বাড়ী ছিল কারুর—এমনই এক দুর্য্যোগের রাত্রি,—সেদিনের সেই গৃহকর্ত্তা বা বাড়ীর অন্য কেউ—বা ধর কোন থার্ড অতিথি বহু দূর থেকে এসে এই বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াল—শীতে বৃষ্টিতে, পথের শ্রান্তিতে একেবারে বিপর্য্যস্ত। দ্রুত ঘা পড়ল বন্ধ দরজার ওপর; হয়ত কাপড়ের আড়ালে প্রদীপ নিয়ে গৃহিণী কিংবা বাড়ীর অন্য কোন বধূ গিয়ে দরজা খুলে দিল। কিংবা হয়ত আগন্তুক বাড়ীর কেউ নয়—কোন পথিক মাত্র আশ্রয়ভিক্ষায় এসেছে। কপাটে আঘাত হওয়ায় সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ভিতর হ'তে প্রশ্ন হ'ল—

—কে ধাক্কা দেয়?…

তারাপদ, সুধেন, অক্ষয়, অম্বিকা, রমেন, হঠাৎ চমকিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, অশ্বিনীও যেন বাদ গেল না। অক্ষয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাহিরে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আওয়াজ হইল—“কে?”

দুয়ারের পানে শঙ্কিত নেত্রে একবার চাহিয়া প্রায় সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, “কে?—কে ধাক্কা দেয়?”

কিন্তু তখনই ঘরের পাশের ডোবাটায় একটা ব্যাঙের আওয়াজ পাইয়া কতকগুলা ব্যাং একসঙ্গে “কে-কেও কে-কেও” করিয়া তারস্বরে আওয়াজ তুলিল। সকলে লজ্জিত হইয়া আবার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল!

অশ্বিনী হাসিয়া বলিল, “যাক, অক্ষয়ের থিয়োরিটা অনেকটা স্পষ্ট হ'ল এই দিয়ে—যেমন এই বায়ুর স্তরে বায়ু হানা দিচ্ছে আর জলের স্তরে ব্যাং ‘কে-কেও’ আওয়াজ করছে—দুটো সময়-হিসাবে একসঙ্গেই হচ্ছে—মাঝখান থেকে আমরা দুটো জুড়ে একটা জিনিষ খাড়া ক'রে নিয়ে আঁৎকে উঠলাম। কেমন হে অক্ষয় এই তো?”

অক্ষয় একটু রাগিয়া বলিল, “অত উড়িয়ে দেবার কথা নয় হে অশ্বিনীবাবু, ঠিক এই ধরণের ব্যাপার আমাদের গ্রামে একবার হয়ে গেছে, আর মজার কথা এই যে তুমিও স্বয়ং তার মধ্যে ছিলে। এমন কিছু বেশী দিনের কথাও নয়; অথচ এখন দিব্যি ঠাট্টা ক'রে যাচ্ছ আমায়।”

অশ্বিনী স্মৃতিকে আলোড়ন করিবার চেষ্টা করিয়া অক্ষয়ের পানে একটু বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল, “ও!—তুমি বৈরিগীর ভিটের সেই সেদিনকার কাণ্ডটার কথা বলছ?”

তারাপদ, সুধেন, অম্বিকা, রমেন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “কি, কি, ব্যাপারটা কি শুনি?”

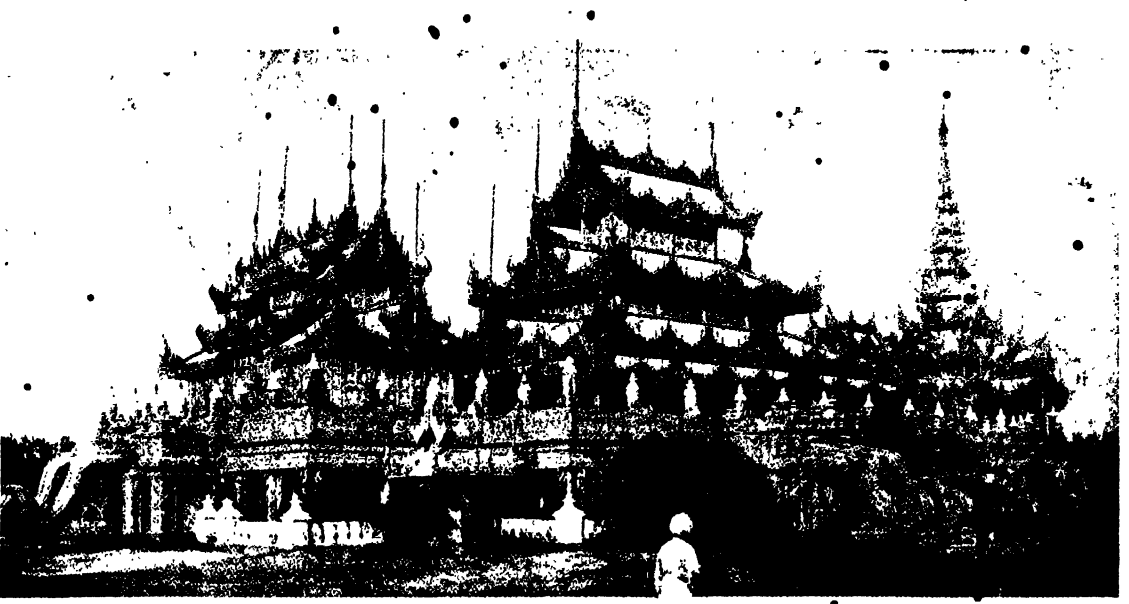
অক্ষয় অশ্বিনীকে বলিল, “বল না অশ্বিনী, অবিশ্বাসীর মুখেই শোনা যাক ব্যাপারটা।”

অশ্বিনী বলিল, “তাতে জিনিষটার অমর্য্যাদা হবে। তুমিই বল, আমি না হয় শেষকালে টীকা ক'রে দোষখণ্ডন। যদি কারুর সন্দেহ থাকে তো পরিষ্কার হয়ে যাবে।”

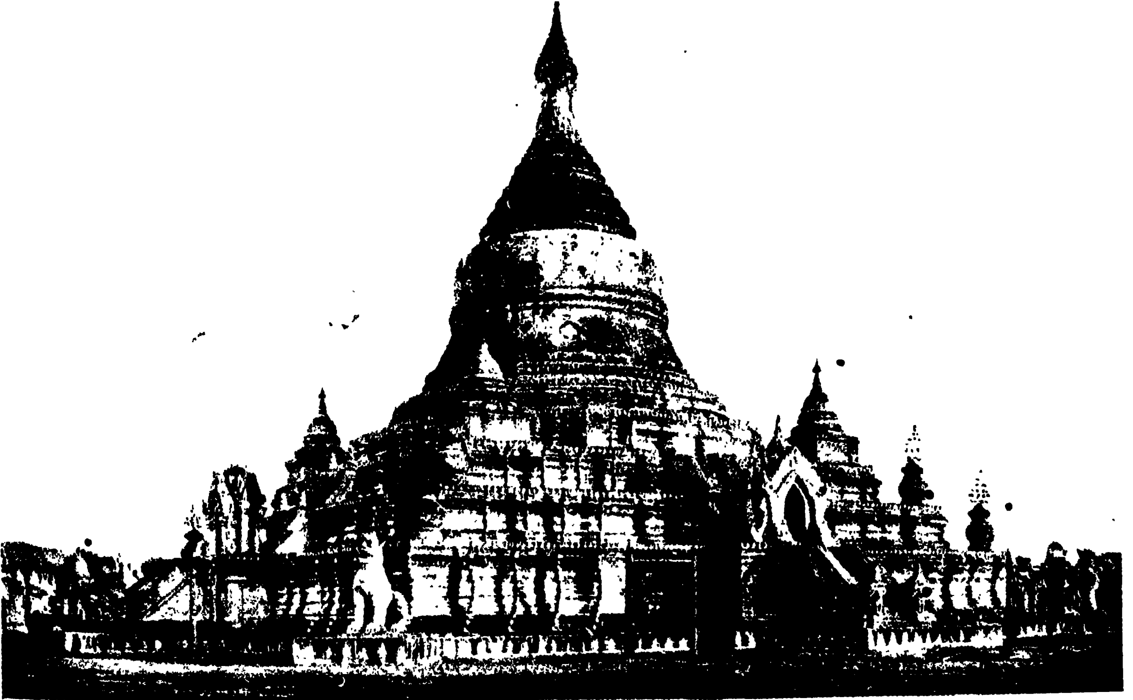
অক্ষয়ই বলিতে আরম্ভ করিল, “তারাপদ তুমি বৈরিগীর ভিটেটা দেখেছ, ব'লে দিলেই বুঝতে পারবে। সেদিন সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ী যাবার সময় একটা উঁচুপানা জায়গায় একটা খেজুরগাছ দেখেছিলে মনে আছে?”

তারাপদ বলিল, “আছে মনে। সেই লম্বা উঁচু হয়ে গিয়ে আবার ঘাড়ের কাছটায় মুচড়ে নেমে এসেছে—সেইটে তো?”

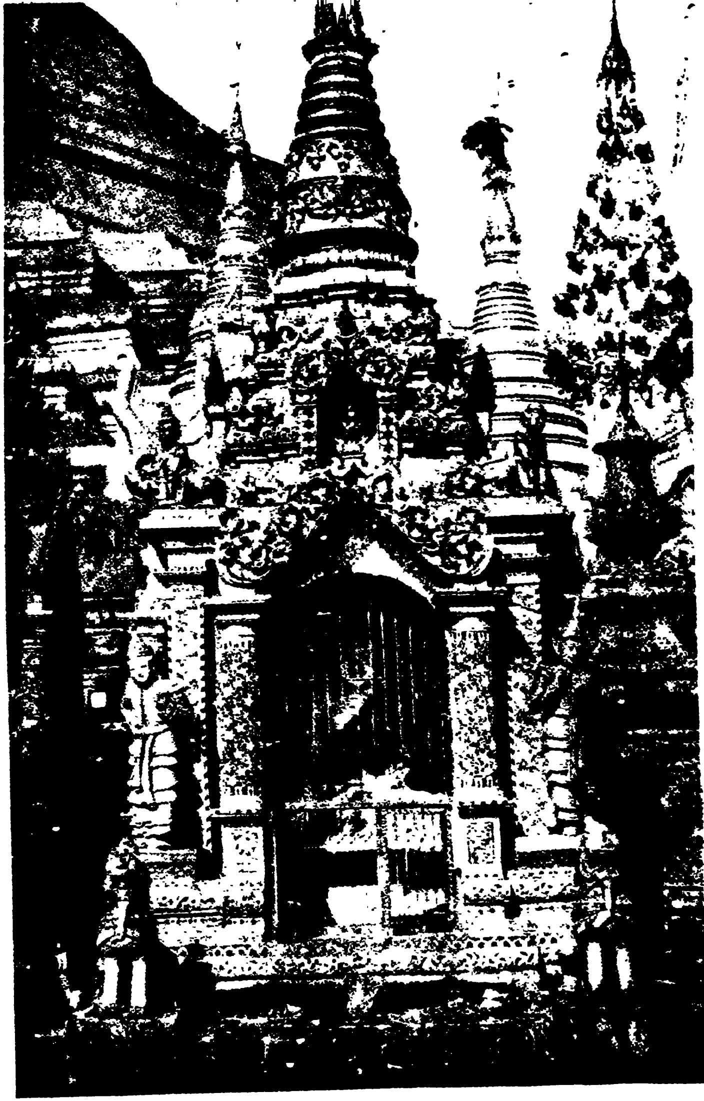
“হ্যাঁ, সেইটে। তুমি বলেওছিলে—খেজুরটা বেয়াড়া দেখতে তো!…আমি বলেছিলাম জায়গাটার ইতিহাস আছে একটা, বলব বাড়ী গিয়ে, তার পর তুমিও জিগ্যেস কর নি, আমিও বলতে ভুলে গেছি।…সেই উঁচু ঢিবিটা বৈরিগীর ভিটে। জায়গাটার একটা বিশেষত্ব এই যে, এক ঐ কাঁধ-মোচড়ান খেজুরগাছ ছাড়া সবুজ একটি ঘাসের কণা পর্য্যন্ত দেখতে পাবে না। কিছু হয় না ওটুকুতে। কলেজে দু-পাতা কেমিষ্ট্রি প'ড়ে আর সব জায়গার মত আমাদের গ্রামেও দু-এক জন দিগ্‌গজ বৈজ্ঞানিক গজিয়েছেন, নাকে চশমা দিয়ে তাঁরা অবশ্য বলছেন—ঘরের দেয়াল প'ড়ে জায়গাটা বড্ড নোনা হয়ে গেছে, তাই কিছু হয় না; কিন্তু যারা জানে তারা ঠিক জানে যে সবুজ বা প্রাণবন্ত কিছু হবার জো নাই ও-ভিটেতে। ওর ওপর প্রাণের অভিশাপ আছে—পাশের চারি দিকেই সবুজ



মান্দালয়ের রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী দারুনির্ম্মিত মন্দির। রাজা থিবর পত্নী সুপায়া রাজসিংহাসনাভিলাষীদিগকে হত্যা করিবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে।



ব্রহ্মদেশের একটি সুবিখ্যাত প্যাগোডা। ইহার শীর্ষদেশ একটি স্বর্ণছত্রে মণ্ডিত।
["ব্রহ্মদেশে নববর্ষ ও পূজাপার্ব্বণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃ. ৬৮]



রেঙ্গুনের সুবিখ্যাত শোয়েডাগন প্যাগোডার এক অংশ—ব্রহ্মদেশ, সিংহল, শ্যাম, কম্বোজ হইতে বহু পুণ্যার্থী এইখানে পূজা দিতে আসে।



বুদ্ধ-মন্দিরের দ্বারে পুণ্যার্থিনী ব্রহ্ম-রমণী প্রিয়জনের মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছেন।

লতা-আগাছার ঘন জঙ্গল—ছাগল চরছে, গরু চরছে, ছেলেমেয়েরা বৈঁচি, আঁশফল সংগ্রহ করছে, শুধু বৈরিগীর ভিটেয় কিছু হবে না, জীবন্ত কারুর পায়ের দাগ পড়বে না। ঐ একটি খেজুরগাছ,—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, তার ভাঙা কাঁদ আস্তে আস্তে দুলিয়ে দুলিয়ে পাহারা দিচ্ছে—অভিশাপের কোথাও ব্যতিক্রম ঘটল কিনা। লোকে বলে না কি ওই গাছটার মাথায়ও কেউ কখনও একটা পাখী বসতে দেখে নি, অবশ্য সত্যি মিথ্যে ভগবান্ জানেন।

বৈরিগীর ভিটের ইতিহাস—সে এক সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, আজকের যে ঘটনার কথা তুলেছি তার সঙ্গে যেটুকু সম্বন্ধ আছে সেইটুকুর কথাই বলব, সবিস্তারে না হয় অন্য এক দিন বলা যাবে।

ঐ খেজুরগাছের নীচে গোকুল বৈরিগীর বাড়ী ছিল। পরিবারের মধ্যে নিজে, স্ত্রী বিন্দু বোষ্টমী, গোকুলের প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে আর সাধন। এই সাধন যে আসলে গোকুল বৈরিগীর কে ছিল কেউ জানে না, কেউ বলত তার দূরসম্পর্কের এক ভাই, কেউ বলত প্রথম পক্ষের খুব দূরসম্পর্কের শালা, কেউ বলত গুরুভাই, মোট কথা খুব নিকট আত্মীয় কেহ না হয়েও সাধন গোকুলের বাড়ীতে বহুদিন থেকেই ছিল। সাধন যাত্রার বেশ পালা বাঁধতে পারত, এদিকে ছিল পঙ্গু, তার ডান পা-টা জন্ম থেকেই শুকনো আর অসাড়। যখনই দেখ শুকনো পা আর একটা মোটা খাতা কোলে ক'রে সাধন পালা লিখে যাচ্ছে। উঠত খুব কম, কেউ এলে পালা নিয়ে কথাবার্তা হ'ত, সন্ধ্যার সময় গোকুল গাঁজার ছিলিম হাতে এসে বসত, দুটো সুখ-দুঃখের কথা হ'ত। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক এক খাওয়া নিয়ে, সেটাও বেশী দিনই গোকুলের মেয়ে রেবতী দিয়ে যেত।

এই রেবতী মেয়েটি যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল, ততই বাইরে ভাত নিয়ে আসাটা তার কমে আসতে লাগল। সাধন লোকটার পা শুকনো ছিল বটে, কিন্তু মন শুকনো ছিল না—বুঝতেই পার শুকনো মন নিয়ে কেউ কখন যাত্রার পালা বাঁধতে পারে না। যেদিন বাইরে ভাত না আসত সেদিন সে বগলে ক্রচ্ দিয়ে ভেতরে উপস্থিত হ'ত—রেবতীর মার কাছে তার নতুন বাঁধা পালার কথা সবিস্তারে পাড়ত, এবং দোরের আড়ালে, কিংবা উঠানের ও-পাশে রেবতীর উপর তার প্রভাব কি রকম হচ্ছে তার খোঁজ রাখত। লোকটার বয়েস খুব বেশী হয় নি—এত দিন পালা বাঁধা নিয়েই ছিল, বোঝা গেল এবার তার মনে ঘর বাঁধবার তাগিদ জেগেছে। অবশ্য সে নিজে ছাড়া ভাল ভাবে কথাটা বুঝল রেবতীর মা, কিছু কিছু রেবতীও বোধ হয়। ক্রমে রেবতীর বাইরে আহার দিতে যাওয়া খুব কমে গেল, এবং সাধনের শুধু আহারের সময় ছাড়া অন্য সময়েও ভেতরে আসার নানান রকম প্রয়োজন হয়ে উঠতে লাগল। এই সময় রেবতীর মা হঠাৎ বিসূচিকায় মারা গেল এবং তার মাস-দুয়েক পরে গোকুল বিন্দু বোষ্টমীর সঙ্গে মালা বদল ক'রে বাড়ীতে আনলে।

গোকুল লোকটা ছিল যাকে বলে হ্যালাখ্যাপাগোছের। রেবতীর মায়ের সঙ্গে মালা বদল ক'রে একটানা আঠার বৎসর ঘর ক'রে এসেছে, এর মধ্যে একটা কন্যা হয়েছে এই পর্য্যন্ত জানে; কিন্তু সে যে বড় হয়েছে এবং তার বড় হওয়ায় শুকনো-পা সাধনের বাড়ীতে আসা বেড়েছে এসব তার চোখে পড়ে নি। বিন্দুকে আনার পর ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাহার হঠাৎ চৈতন্য হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে চৈতন্য হ'ল না। সাধন যে রেবতীর জন্যই শুকনো পায়ের উপর উপদ্রব করছে এটা সে টের পেল না। তার মনে হ'ল বিন্দুর আসবার পর থেকেই সাধনের গতিবিধির মধ্যে এই পার্থক্যটুকু এসেছে। এই ভ্রান্তি থেকে জটিলতার আরম্ভ হ'ল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাধনের বাড়ীতে আসা অল্প অল্প ক'রে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বিন্দু বোষ্টমী হয়ে গেল ভীষণ রকম পর্দানশীন। শেষে এমন পর্য্যন্ত হ'ল যে গোকুল বাইরে গেলে বাড়ীর দোরে শেকল উঠতে লাগল।...

এক দিন গোকুলের কাজ ছিল দূরে কোথায়। যথারীতি শেকলের উপর সেদিন একটা তালাও ঝুলিয়ে গিয়েছিল দোরে—সন্ধ্যার সময় এসে তালা খুলতে যাবে হঠাৎ খেজুরগাছের মাথায় একটা খসখসে আওয়াজ

শুনে নীচে গিয়ে দাঁড়াল, স্পষ্ট বুঝতে পারলে উপরে এক জন লোক। ডাকল, "কে?···নেমে এস।"

সাধন আস্তে আস্তে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। গোকুল একটু মাত্রও বিস্মিত হ'ল না। প্রশ্ন করলে, "খেজুরগাছে যে, এই সন্ধ্যেয়?"

সাধন একটু কাঁপা গলায় বললে, "শিউলি আজ নতুন গাছ কেটেছে—দেখছিলাম রস হ'ল কি না।"

গোকুল বললে, "আমি আসল কথাটা বলব? তুমি অন্য জায়গায় রসের সন্ধান পেয়েছ। আজ সমস্ত দিন দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নি, তাই এই সন্ধ্যেয় গাছে চ'ড়ে—"

সাধন ধরা পড়ে স্বীকার ক'রে ফেললে। গোকুলের পায়ের উপর ব'সে বললে, "আমি পঙ্গু, কিন্তু একেবারে নির্গুণ নয়, গোকুল-দা; তুমি দাও আমায় রেবতীকে, তাকে আমি সুখে রাখব।"

গোকুল হেসে উঠল; বললে, "এখনও মিথ্যে বলছ রেবতীর কথা তুলে?—আমায় বোঝাতে চাও যে তুমি রেবতীর টানেই"···সঙ্গে সঙ্গেই একটু কি ভেবে নিয়ে গলা নরম ক'রে বললে, "তা বেশ, খেজুরগাছের কাঁটাও যখন তোমার কাছে তুচ্ছ, তখন নিশ্চয় তুমি ভালবাস আমার মেয়েকে। চল, ভেতরে চল, বিয়ের কথা খেজুর-গাছতলায় দাঁড়িয়ে হয় না।"

অক্ষয় একটু চুপ করিয়া বাহিরের দুর্য্যোগটা যেন ভাল করিয়া অনুভব করিয়া লইল, তাহার পর আরও একটু গুটাইয়া বসিয়া বলিল, "ক্রমে বেড়েই চলেছে দেখছি যে।"

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তার পর?"

অক্ষয় বলিল, "তার পর আর কি? বৈরিগীর বাড়ীটা একটেরেয় ব'লে সেদিন কেউ বুঝতে পারে নি, পরদিন সকালেই টের পাওয়া গেল গোকুল বৈরিগী তিনটে খুন ক'রে উধাও হয়েছে। অবশ্য ধরা পড়ে কিছু দিন পরেই।···সাধনের ঘাড়টা ছিল মচকান, লোকশ্রুতি যে পরের দিনই একটা দমকা হাওয়া উঠে খেজুরগাছের মাথাটা ঐরকম ক'রে মুচড়ে দেয়।"

সুধেন খুব অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ যেন সম্বিৎ পাইয়া প্রশ্ন করিল, "রেবতীকেও খুন করলে? সে কি করেছিল?"

অক্ষয় হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "রেবতীর জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদল ব'লে তাকে খুন করাই যে বেশী অন্যায় এমন তো নয়; বিন্দুরই বা দোষ কি? সাধনেরই বা কি এমন অন্যায় হয়েছিল?"

সুধেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, সে কথা বলছি না···মানে ···থাক্, তোমার বৈরিগীর ভিটার পরবর্তী কি ইতিহাস যেন বলতে যাচ্ছিলে তাই বল।"

অক্ষয় বলিতে লাগিল, "বৈরিগীর ভিটাকে সেই থেকে সবাই এড়িয়ে চলে। পাড়ার জীবন্ত বাড়ীগুলো থেকে দূরে, নিজের কাহিনী বুকে ক'রে বৈরিগীর ভিটে পড়ে আছে, না ঘাঁটাও কিছু বলবে না; ঘাঁটাও, এমন কিছু একটা অভিজ্ঞতা দেবে যা সহজে ভুলে উঠতে পারবে না। নানা প্রকার দেখে ঠেকে গ্রামের লোকে ছেড়ে দিয়েছিল, এমন সময় সেবার গরমের ছুটিতে দেশে ফিরে এসে এক দল তোমাদের আধুনিক ছেলে গ্রাম থেকে অন্ধ সংস্কার দূর করবার জন্যে একেবারে অন্ধ ভাবে মেতে উঠল। ঠিক করলে তারা ঐ বৈরিগীর ভিটের বুকের উপর স্টেজ খাটিয়ে থিয়েটার করবে।

গ্রামের প্রাচীন অভিজ্ঞ লোকেরা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে। বললে, "অন্ধ সংস্কার বল বা যাই বল লোকে চিরকালটা যা মেনে এসেছে—ভূত, প্রেত, উপদেবতা, হাঁচি, টিক্‌টিকি, বার ক্ষণ—সবই মানা উচিত; দু-অক্ষর ইংরেজী পড়লেই সব মিথ্যে হয়ে যায় না।'

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। বার-ক্ষণের কথায় ছেলেরা ঠিক করলে সামনের শনিবারটাতেই তারা 'প্লে'টা করবে, সেদিন অমাবস্যাও আছে; আর টিকটিকি স্বাধীনচেতা জীব, তাদের উপর তো হুকুম চলবে না, তবে থিয়েটারের সীন্ তোলা, সীন্ ফেলা তারা করবে হাঁচির সাহায্যে, ঘণ্টা দিয়ে নয়; পাঁচ ছয় জন ছোকরা এই জন্যে নস্যি আর কাঠি নিয়ে তৈয়ের থাকবে।

উপদেষ্টারা হাল ছেড়ে দিলে।

শুধু তাই নয়, শেষ পর্য্যন্ত কিছু লোক এদের দিকেও ঝুঁকল;—কয়েক জন পার্টের লোভে, কয়েক জন আবার আধুনিক হবার লোভে বোধ হয়। কয়েক জন আবার এই জন্যেও বোধ হয় যে ভাল রকম খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল,—শিঙাড়া, কচুরি, লুচি, সন্দেশ, আলুর দম, আর ঢালোয়া চা। এক জন ময়রা ডাকিয়ে বৈরিগীর ভিটের এক পাশেই এসব তৈরি করবার ব্যবস্থা হ'ল। জনা তিন চার ছেলে এই দিকটা নিয়ে রইল,—জিনিসপত্র জোগাড় করা, তদারক করা—এই সবের জন্যে।

অশ্বিনী বলিল, "আমিও এক জন ছিলাম তার মধ্যে।"

অক্ষয় বলিল, "তাই তোমার অবিশ্বাসটা আরও বেশী।"

তারাপদ বলিল, "ফাঁকা বাহাদুরিতে একটা আরাম আছে কিনা…"

অক্ষয় বলিতে লাগিল, "দল যখন পুরু হয়ে উঠল, আরও কয়েক জন এল—সাহসী বলবে লোকে এই লোভে। জানই তো—ভিড়ের মধ্যে ভয় থাকে না। ঠিক হ'ল দুটো প্লে হবে, বেশ বড় দেখে, অর্থাৎ সমস্ত রাত ধরে ভূতের ভিটেয় ভূতের নৃত্য করতে হবে, ভূতেরা যেন না ছুয়ো পাড়তে পারে যে প্রথম রাত্রে একটু চেহারা দেখিয়ে সব পালাল। পালা ঠিক হ'ল 'চন্দ্রগুপ্ত' আর 'পাণ্ডবগৌরব'।

শনিবার সন্ধ্যা থেকে জায়গাটা বেশ গম গম ক'রে উঠল। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল লোক হবে না, ভূতেদেরই দেখাতে হবে 'প্লে'টা, কিন্তু ক্রমে এক এক ক'রে অনেক লোক জুটে গেল। হোগলা দিয়ে একটা অডিটোরিয়াম করা হয়েছিল, সেটা উপচে বাইরে পর্য্যন্ত লোক জমে উঠল।

ঠিক ন'টার সময় একেবারে আট-দশটা ছেলের হাঁচির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট বেজে উঠল। বাইরের কয়েক জন ভূত-বিরোধী ছোকরা-দর্শক তালি দিয়ে এদের অভিনন্দিত করতে যাবে, প্রবল একটা বাধা পড়ল;—কনসার্ট বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা জিনিষ উঠল, কোথাও কিছু নেই, একটা উৎকট রকমের দমকা হাওয়া। ঠিক কে যেন অডিটোরিয়াম আর স্টেজের ঝুঁটি ধরে একটা কড়া ঝাঁকানি দিয়ে, বৈরিগীর ভিটের পুরনো পাহারাদার সেই কাঁধ-ভাঙা খেজুরগাছটাকে জাগিয়ে দিয়ে, আকাশ বেয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। একটা রীতিমত গোলমাল হ'ল অডিটোরিয়ামে। যারা বুদ্ধিমান তারা ব্যাপার দেখে পাতলা হ'ল! কিন্তু এদের বাহাদুরি দিতে হবে—এদের কনসার্ট একবারও থামল না…"

অশ্বিনী বলিল, "তার কারণ সেটা ছিল গ্রামোফোনের রেকর্ড।"

অক্ষয় কথাটা কানে না তুলিয়া বলিল, "কনসার্ট থামলে হাঁচির আরও একটা গুরুতর আওয়াজ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ্‌সীন উঠল। হাঁচিটা আরও গুরুতর করবার অর্থ,—ভূতেই যদি দমকা হাওয়া হয়ে দেখা দিয়ে থাকে তো যত পারে দিক, এরা পেছপা নয়।…এরা যে কাদের ঘাঁটাচ্ছে তখনও টের পায় নি। এবার আর ঝড় উঠল না, কিন্তু যা আরম্ভ হ'ল কিছু দিন [illegible] থাকবে বাছাধনদের।…ড্রপ্‌সীন উঠল।…তারাপদ, তোমার আলমারিতে 'চন্দ্রগুপ্ত' আছে? দাও তাহ'লে, ব্যাপারটা যেমন যেমন হয়েছিল সঠিক বর্ণনা করতে পারব।"

তারাপদ উঠিয়া আলমারি হইতে ডি. এল. রায়ের বাঁধান গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া আনিয়া অক্ষয়ের হাতে দিল। অক্ষয় চন্দ্রগুপ্ত পালাটা খুলিয়া বাহির করিয়া বলিতে লাগিল, "ড্রপ উঠতেই একটা নদীর দৃশ্য। সিন্ধুনদ। সূর্য্যাস্তের সময়। সীনে নদীর জলের কাছটায় একটু চিরে তার মধ্যে গোল লাল রঙের একটা কাগজ অর্দ্ধেকটা সাঁদ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানে সূর্য্য অর্দ্ধেক অস্ত গেছে, বাকী কাগজটা টেনে নিলেই সূর্য্য একেবারে ডুবে যাওয়া হবে আর কি।

সামনেই সেকেন্দর, সেলুকাস আর হেলেন্; হেলেন সেলুকাসের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে। তিন জনেই সূর্য্যাস্ত দেখছে।

এই সময় একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'ল। সূর্য্যের দরুন রাঙা কাগজটা যেই আস্তে আস্তে টেনে নেওয়া হ'ল,

স্টেজের কড়া গ্যাস-ল্যাম্পটা কয়েক বার দপ দপ ক'রে হঠাৎ নিবে গেল।

তোমরা বোধ হয় বলবে ব্যাপারটা কাকতালীয় ন্যায় গোছের একটা 'কয়েন্‌সিডেন্স' মাত্র, কিংবা গ্যাসল্যাম্প-গুলোর একটা দোষই এই যে ঠিক সময় বুঝে নিবে ব'সে থাকে। পরে সেই নব্যদের মধ্যেও ধীরে সুস্থে সেই কথাই হয়েছিল; ঠিক সেই সময়টিতে অন্ধকারের ছায়া যেন সবার মুখ কালি করে দিলে। অডিটোরিয়ামে তো একটা ভীষণ হট্টগোল উঠল, আর এদিকে স্টেজের ওপর সবাই একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। মুখ ফুটে না বললেও কারুর যেন সন্দেহ রইল না যে প্রথমটা অর্থাৎ দমকা হাওয়াটা ছিল যেন কারুর হুমকি, তাতে ফল না হওয়ায় সে-ই আবার এই মোক্ষম ঠাট্টার অবতারণা করেছে। বাতাসে যেন একটা হি-হি-হি ক'রে বিদ্রূপ-হাসির চাপা ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।...বাঃ, সূর্য্যাস্ত হ'লে অন্ধকার হয়ে যাবে না? তবে আর তোমরা সীনারি দেখাচ্ছ কি?

... ড্রপসীন ফেলে আবার আলো জ্বালা হ'ল। আর যাই হোক, হাঁচিটা যে ফললই এতে আর কারুর সন্দেহ রইল না। দ্বিতীয় বারও অবশ্য হাঁচি দিয়েই ড্রপসীন উঠল, তবে জোর অনেক কমে এসেছে। ওদিকে অডিটোরিয়ামও অর্দ্ধেকের বেশী খালি, যারা আছে তারা খুব গা ঘেঁষে ঘেঁষে উৎসুক ভাবে ব'সে আছে।

যাক্, প্লে আরম্ভ হ'ল। সেকেন্দর বলে যাচ্ছে (অক্ষয় বইয়ের দিকে চাহিল) "সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে সেকেন্দর অডিটোরিয়ামের গ্যাস-ল্যাম্পের দিকে চেয়ে, চোখ মুখে যতটা সম্ভব আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সত্যিই কিছু একটা দেখেছে। প্রথমটা সবাই ভাবলে সেকেন্দর জেশ্চার-পশ্চার দেখাচ্ছে। কেষ্টা, যে সেকেন্দরের পার্ট নিয়েছে, তার আবার ওদিকে একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল কেষ্টার হিসেবেও বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রম্পটার তাগাদা দিতে লাগল—"এবার বল—প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি...প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি...বল্ না কেষ্ট—প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ—বল্...হয়েছে তো পশ্চার, মস্ত বড় পশ্চারী তুই—শিশির ভাদুড়ী..."

প্রম্পটার ছাড়াও উইংসের দুই দিক থেকে ঘন ঘন তাগাদা দিতে লাগল; অডিটোরিয়ামেও তালি পড়ল; কিন্তু সেকেন্দরের মাথায় যে কি "বিস্মিত আতঙ্ক" ঢুকে গেছে, না চোখ ফেরায়, না পার্ট বলে। প্রম্পটার শেষকালে হেরে বললে, "সেলুকাস, তাহলে তুমি বল—'সত্য সম্রাট্!'...ও পশ্চার দেখাক।"

সেলুকাস এমন ভাবে ফ্যালফ্যালিয়ে ফিরে চাইলে যেন কথাটা বুঝতেই পারে নি, তার পর হঠাৎ সামলে নিয়ে বললে—'সত্য সম্রাট।'

"এবার সেকেন্দর বল—'কোথাও দেখি তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে'...বল্ না কেষ্টা, কি জ্বালা!"

কেষ্টর যেন হঠাৎ খেয়াল হ'ল; প্রম্পটারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, "কি বলব?"

অডিটোরিয়ামে আবার তালি পড়ল। "ভূতে পেয়েছে ড্রপ ফেলে দাও" ব'লে একটা সোরগোলও উঠল, এবং আরও এক দল দর্শক পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ায় অডিটোরিয়ামটা যেন খাঁ-খাঁ করতে লাগল। প্রম্পটার ভেংচি কেটে বললে, "কি বলব! কচি খোকা!...বল্—'কোথাও দেখি তালীবন গর্বভরে মাথা উঁচু করে'..."

কেষ্টা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আবার প্রশ্ন করলে, "কেন?"

আবার একচোট হাততালি। সেই গোলমালে প্রম্পটার প্রাণের আক্রোশ মিটিয়ে বললে, "সখ ক'রে থিয়েটার করতে এসেছ যে তোমার পিণ্ডি, আর কেন!"

পাশ থেকে সেলুকাস বললে, "বাঃ, আমরা থিয়েটার করছি যে বৈরিগীর ভিটেয়, মনে নেই তোর?" উইংসের দুই পাশ থেকে দাবড়ি খেয়ে সে চুপ ক'রে গেল।

কেষ্টার এবার যেন ঘুম ভাঙল, একটু নড়েচড়ে বললে, "ও! বুঝেছি, বল্।"

গড়গড়িয়ে বেশ খানিকটা ব'লে গেল, প্রম্পটেরও বড় একটা অপেক্ষা করলে না। শেষকালে সেলুকাসের মুখের পানে চেয়ে লেখামত প্রশ্ন করলে, "পুরুকে বন্দী ক'রে আমি যখন—সে কি বললে জান?"

সেলুকাসের অল্প পার্ট, তারই মধ্যে গোলমাল ক'রে ফেলে বললে, "কি বললে র‍্যা?"

তার পর দাবড়ানি খেয়ে শুধরে নিলে—"কি সম্রাট্?"

কেষ্টা-সেকেন্দর খানিকটা হাঁ ক'রে রইল—প্রম্পটিং যেন কানেই যাচ্ছে না। তার পর দু-বার কপালে চিন্তিত ভাবে হাত বুলিয়ে ব'লে উঠল, "দাঁড়া, মনে পড়েছে—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর? সে নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিলে—জামাইয়ের মত...।"

"ড্রপ ফ্যাল্ ড্রপ ফ্যাল্ ব'লে চারি দিক থেকে একটা রব উঠল। এবার স্টেজের মধ্যে থেকেও।

খুব বেশী দরকারের সময় ড্রপ-সীন খুব বেশী বাগড়া দেয় এটা তোমরা সবাই জান, শূন্যে অনেক ওঠা-নাবার পর শেষে পড়ল। তার পর স্টেজের বাইরে ভেতরে যে নারকীয় গোলমালটা উঠল তাতে স্বয়ং ভূতেদেরও লজ্জা পাবার কথা। কেষ্টা আর গজানন, যারা আলেকজেণ্ডার আর সেলুকাসের পার্ট নিয়েছিল, তাদের তো সবাই খুন করতে বাকী রাখলে। সে বেচারীরা মুখ চুণ ক'রে এক ধারটিতে গিয়ে ব'সে রইল।

কয়েক জন বয়স্থ লোকেও ভেতরে ঢুকে পড়ল। বললে, "বাপু, সাধ মিটিল তো? এখন ভালয় ভালয় পাত্তাড়ি গুটিয়ে সব ঘরে ফিরে চল। রাত্তিরে তাঁদের নাম করতে নেই, কিন্তু আগাগোড়া কোথা থেকে ব্যাপারটা হচ্ছে তা নিয়ে এখনও আছে সন্দেহ তোমাদের মনে? শেষকালে পুরু যে বললে 'জামাইয়ের মত ব্যবহার চাই'—বুঝতে পারছ না, ওটা গোকুলের মেয়ে রেবতীর সম্পর্কে সাধন বৈরিগীর মনের কথা, যা নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা হ'ল এই ভিটের ওপর···তোমরা কি চাও আরও স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেবেন তোমাদের ওঁরা? তা ভিন্ন শোনাবে কাদের তোমরা বাপু? মুখ বাড়িয়ে একবার অডিটোরিয়ামটা দেখে এস তো!"

যজ্ঞের পাণ্ডা সতীনাথ ও আর কয়েক জন জিদ ধ'রে বসল তারা করবেই থিয়েটার, দু-জন আবোল-তাবোল বকেছে ব'লে কিছু ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায় না। সতীনাথ এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে বললে, "আর ভূত যদি থাকেই, আর তাদের বুকের পাটা থাকে তো তারা সামনে এসে যা করবার···"

ব্যস্, এই পর্য্যন্ত বলেছে এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল যা কেউ স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারে নি। বিরূপাক্ষ চাণক্য সেজেছিল, হঠাৎ গ্রীনরুমের দিক থেকে এসে হাজির। সে কি উগ্র মূর্ত্তি! চাণক্যের নেড়া-মাথার ওপর টিকিটা ফেঁপে রয়েছে, গম্ভীর মুখ, রক্ত জবার মত চোখ দুটো গর্ত্তের মধ্যে যেন জ্বলছে। সামনে দাঁড়িয়ে শিশির ভাদুড়ীর মত মাথা নেড়ে নেড়ে টিকিতে তা দিতে লাগল। ঠিক যেন কোন কিছুর ভর হয়েছে, মূর্ত্তি, হাব-ভাব দেখে সবাই একটু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বয়স্থদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ হিসাবে এসেছিল নবীন হাজরা—ডাকসাইটে ভূতের ওঝা; চাণক্যের পানে চেয়ে কপালে হাতজোড় ক'রে বললে, "ঠাণ্ডা হও বৈরিগী বাবা, এরা ছেলেমানুষ, ক'রে ফেলেছে একটা ভুল···" সতীনাথ কি বলতে যাচ্ছিল, বিরূপ ওদের দিকে চেয়ে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠল—"নীচের আজ স্পর্দ্ধা—ব্রাহ্মণ-বৈরাগীকে দেখে একটা শুষ্ক প্রণাম করতেও হাত ওঠে না?···যাও আমার ছায়া মাড়িও না, আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে, আমি দুর্ভিক্ষ, আমি মড়ক···এখনও গেলে না!···কাত্যায়ন! কাত্যায়ন! নিয়ে এস তো রামদা-টা, আমি কোপাই সবগুলোকে, আর তুমি বাকী-গুলোর ঘাড় মটকাতে থাক—ঐ খেজুরগাছটার মতন ক'রে।···কোথায় কাত্যায়ন?···আচ্ছা দা না থাকে, স্টেজ-খোঁড়া ঐ শাবলটাতেই হবে···"

ছুটে নিতে যাবে শাবলটা, সবাই তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললে। তার মধ্যে থেকেই কী সে আফ্‌সানি! জলন্ত ভাঁটার মত চোখ, পরচুলটা পিছলে গিয়ে টিকির গোছাটা মুখে এসে পড়েছে, গায়ে এসে পড়েছে এক অসুরের ক্ষমতা; ধরে কি রাখা যায়? আর মাঝে মাঝে সেই চীৎকার—"কাত্যায়ন! কোথায় গেল

কাত্যায়ন?···নিয়ে এস তো শাবলটা, আমি দেখি একবার এদের···"

এক উৎকট কাণ্ড, এখনও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!···"

অক্ষয় চুপ করিল। বেশ বুঝা গেল এই অস্বাভাবিক গল্প বলিতে তাহার স্নায়ুগুলা অতিরিক্ত উত্তেজিত হইয়া গিয়াছে। বাহিরে সেই দুর্য্যোগ; রাত্রিবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও মাতিয়া উঠিয়াছে। সব মিলাইয়া বৈরিগীর ভিটার তাণ্ডব চিত্রটা যেন সবার চোখের সামনে স্পষ্ট করিয়া দিতেছে। ভিতরে সমস্ত ঘরটা থম্‌থম্ করিতে লাগিল। দুয়ার-জানালার উপর একটা প্রচণ্ডতর আঘাত আসিয়া পড়ায় সবাই—এমন কি অশ্বিনী পর্য্যন্ত—চমকিয়া উঠিয়া একবার সেই দিকে চাহিল। রমেন নিতান্ত অল্প কথার লোক। এতক্ষণ বালাপোষে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া শুধু নাক আর মুখটুকু বাহির করিয়া শুনিতেছিল, চমকিয়া উঠায় বোধ হয় নিজের দুর্বলতাটা ঢাকিয়া লইবার জন্য ধীরে ধীরে টীকা করিল—"গঞ্জিকা।"

"গাঁজা?"—বলিয়া অক্ষয় চটিয়া উঠিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, অশ্বিনী শান্তভাবে বলিল, "তুমি চ'টো না অক্ষয়, যে আসল ব্যাপারটা জানে সে কখনও 'গঞ্জিকা' বলবে না।"

অবিশ্বাসী অশ্বিনীর মুখে এ ধরণের কথা শুনিয়া সবাই বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল—আরও নূতন কিছু শুনিবার জন্য। তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তুমি জান নাকি আসল কথাটা? অর্থাৎ ঠিক কার বা কিসের প্রভাবে···"

অশ্বিনী গম্ভীর ভাবে সিগারেট টানিতে টানিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ। সে শুনলে···"

সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কি? কি বল ত···"

অশ্বিনী সিগারেটে একটা দীর্ঘতর টান দিয়া, ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "গঞ্জিকা নয়, সিদ্ধি।"

সবাই একটু থ হইয়া গেল, সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া অক্ষয় আবার উগ্রভাবে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, অশ্বিনী শান্তভাবে হাত উঁচাইয়া তাহাকে বিরত করিয়া বলিল, "থাম না ভাই, আমি নিজের হাতে কচুরির পুরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলাম; ও জিনিস পেটে গেলে একবার যা ঝোঁক মাথায় ঠেলে উঠবে, তা নামায় কার সাধ্যি! না হয় একবার দেখই এক দিন পরখ করে।···শুধু দুঃখু রয়ে গেল থিয়েটারটা শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল না ওরা,—চন্দ্রগুপ্ত, তার মা মুরা, ছায়া, এ্যান্টিগোনাস্—এরা সব তো বাকীই রয়ে গেল···"



অনসূয়া

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাঁঠালের ভুতি পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়—
বীভৎস মাছির দল ঐকতান বাদন জমায়।
শেষরাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্‌গদ ভাষায়,
ঘুমভাঙা পাশের বাড়িতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে।
ভদ্রতার বোধ যায় চলে
মনে হয় নরহত্যা পাপ নয় ব'লে।
কুকুরটা সর্বঅঙ্গে ক্ষত
বিছানায় শোয় এসে, আমি নিদ্রাগত।
নিজেরে জানান দেয় তীব্রকণ্ঠে আত্মশ্লাঘী সতী
রণচণ্ডা চণ্ডী মূর্তিমতী।
মোটা সিঁদুরের রেখা আঁকা,
হাতে মোটা শাঁখা,—
শাড়ি লালপেড়ে,
খাটো খোঁপা-পিণ্ডটুকু ছেড়ে
ঘোমটার প্রান্ত ওঠে টাকের সীমায়,
অস্থির সমস্ত পাড়া এ মেয়ের সতী-মহিমায়।
এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোম্যান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে—
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।

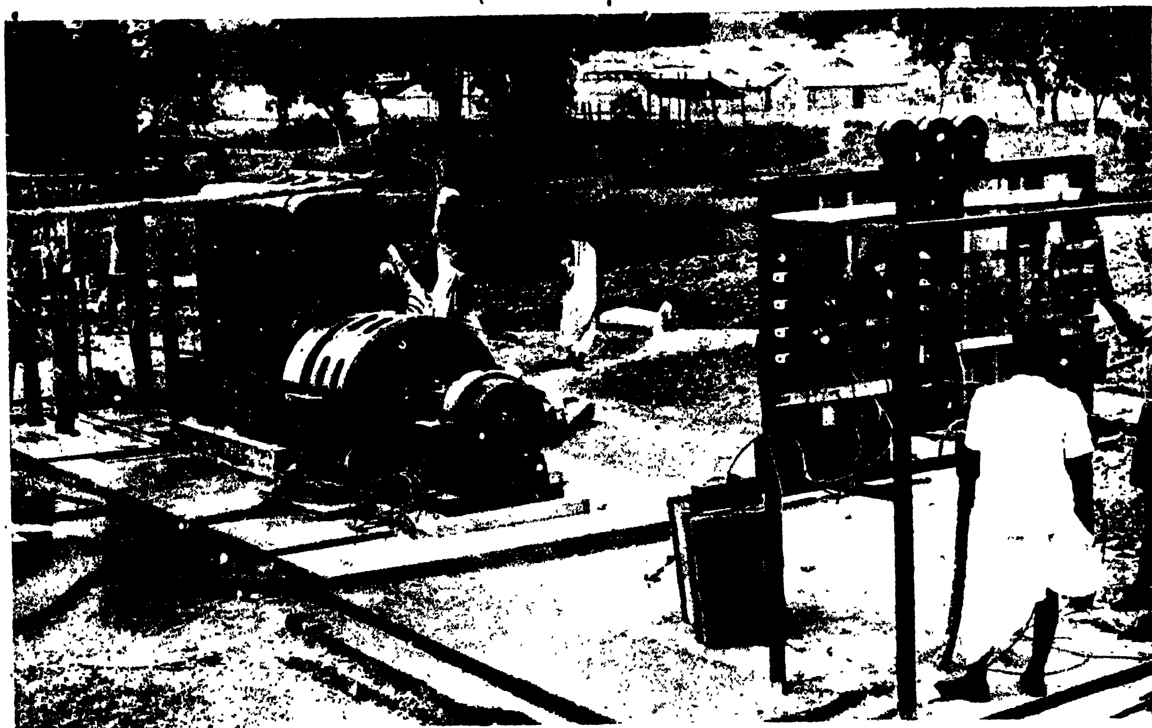
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে,
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার।
আজি এই চৈত্রের খেয়ালে
মনেরে জড়াল ইন্দ্রজালে।
দেশকাল
ভুলে গেল তার বাঁধা তাল।
নায়িকা আসিল নেমে আকাশ-প্রদীপে আলো পেয়ে,
সেই মেয়ে
নহে বিংশ-শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গ হাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্‌স্‌-পরীক্ষাবাহিনী
আতপ্ত বসন্তে আজি নিঃশ্বসিত যাহার কাহিনী।
অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃত ভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,
অশ্রুত হাসির ধ্বনি মিলায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে।
পিনদ্ধ বল্কল-বন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।
প্রিয়কে সে বলে "পিয়"
বাণী লোভনীয়,
এনে দেয় রোমাঞ্চ হরষ
কোমল সে ধ্বনির পরশ।
সোহাগের নাম দেয় মাধবীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে,
এ মাধুরী যে দেখে গোপনে
ঈর্ষার বেদনা পায় মনে।



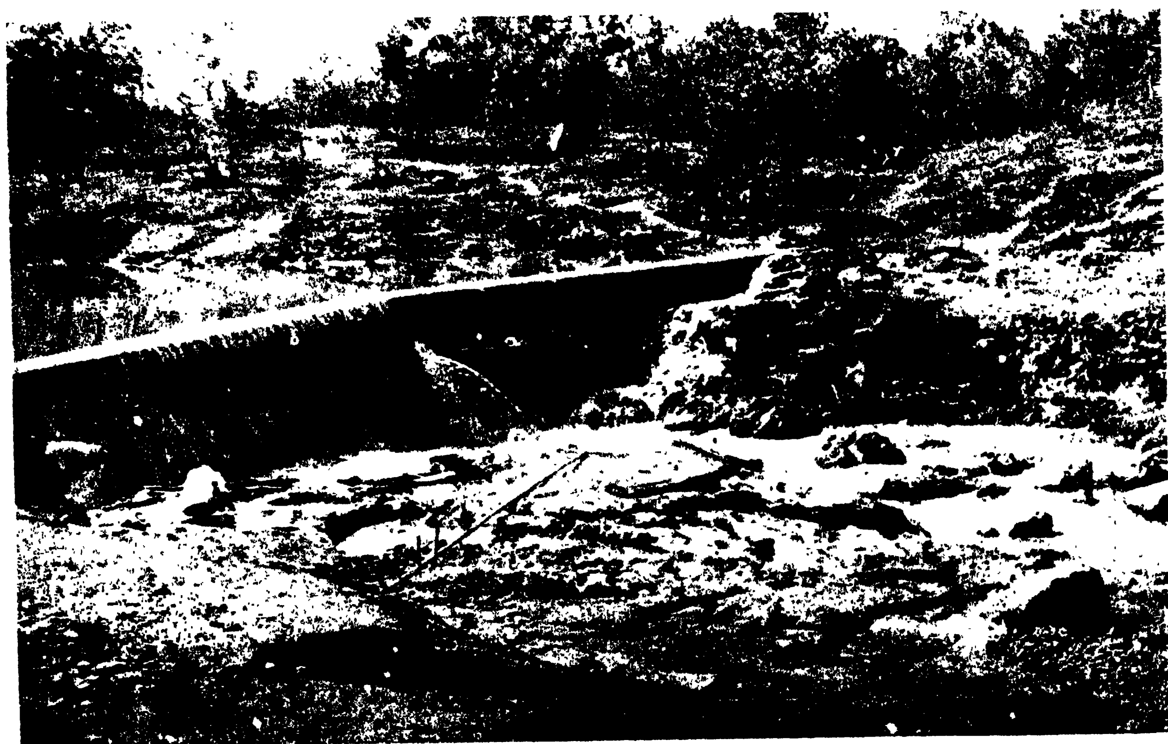
রামগড়ে কংগ্রেস-সভাপতির অভ্যর্থনাকল্পে শোভাযাত্রা। মাল্যভূষিত সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তাঁহার বাম দিকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ।



রামগড়ে কংগ্রেস-সভাপতির অভ্যর্থনা উপলক্ষে শোভাযাত্রার অংশ



রামগড় কংগ্রেসের জন্য নির্ম্মিত বিদ্যুতাগার



রামগড় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য জলাধার

যখন নৃপতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্তের মতো
দয়াহীন ছলনায় রত
আমি কবি অনাবিল সরল মাধুরী
করিতেছিলাম চুরি
এলা-বনচ্ছায়ে এক কোণে,
মধুকর যেমন গোপনে
ফুলমধু লয় হরি
নিভৃত ভাণ্ডার ভরি ভরি
মালতীর স্মিত সম্মতিতে !
ছিল সে গাঁথিতে
নতশিরে পুষ্পহার
সদ্য তোলা কুঁড়ি মল্লিকার।
বলেছিনু, আমি দেব ছন্দের গাঁথুনি
কথা চুনি চুনি।
অয়ি মালবিকা
অভিসার-যাত্রাপথে কখনো বহ নি দীপশিখা।
অর্ধাবগুণ্ঠিত ছিলে কাব্যে শুধু ইঙ্গিত-আড়ালে,
নিঃশবদে চরণ বাড়ালে
হৃদয়প্রাঙ্গণে আজি অস্পষ্ট আলোকে,—
বিস্মিত চাহনিখানি বিস্ফারিত কালো দুটি চোখে;
বহু মৌনী শতাব্দীর মাঝে দেখিলাম,—
প্রিয় নাম
প্রথম শুনিলে বুঝি কবি কণ্ঠস্বরে
দূর যুগান্তরে।
বোধ হোলো তুলে ধরে ডালা
মোর হাতে দিলে তব আধফোটা মল্লিকার মালা।
সুকুমার অঙ্গুলির ভঙ্গীটুকু মনে ধ্যান ক'রে
ছবি আঁকিলাম বসে চৈত্রের প্রহরে।
স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর বার যেতে হবে চ'লে
সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

উদয়ন
২০।৩।৪০

রামগড়ে কি দেখিলাম

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এসসি.

কংগ্রেস সম্পর্কেই আমি রামগড়ে গিয়াছিলাম দুই বার। প্রথম বার গত জানুয়ারীর শেষ ভাগে, দ্বিতীয় বার মার্চ্চের প্রথম ভাগে। প্রথম বার একটি কামরা, একটি বার্থ, একান্ত একাকী; রামগড় টাউনে পাইলামও এক কুলী, এক টিকিট-চেকার এবং কংগ্রেস-নগরে হাঁটিয়া গেলামও একাকী। কিন্তু দ্বিতীয় বার পাইলাম বড় কামরা, সাথী পাইলাম অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর মিঃ সেনকে এবং রামগড় স্টেশনে পৌঁছিয়াই পাইলাম কংগ্রেসের প্রচারকর্ত্তা সোন্ধীজীকে, তিনি মোটর 'অফার' করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দেখিলাম ইতিমধ্যেই নগর পত্তন হইয়া গিয়াছে। নগরের প্রবেশপথেই কাঠের ফ্রেম করিয়া অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়ো স্টুডিয়ো গড়িয়া তুলিতেছেন, ঝাণ্ডা-চকে অশোক-স্তম্ভ রূপ পাইতেছে। বাঁশ, চাটাই, পেরেক, শালকাঠ ও হোগলা দিয়া ছোট, বড়, লম্বা, গোল সব ছাউনি তৈরী হইতেছে। অনেক হইয়াছে এবং অনেক বাকী।

আমাদের ক্যাম্পের স্থান দুই মাস আগেই নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছিলাম, সহজেই পাইলাম। বিকালে আমাদের দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্রের সাইনবোর্ড বসিয়া গেল, অমনি রোগীও আসিয়া পড়িল। স্বেচ্ছাসেবকেরা ও কর্ম্মীরা বহুদিন ভুগিতেছে, তাহারা ঔষধ পাইয়া বাঁচিল।

কিন্তু বিপদ করিল ৯ই মার্চ্চ রাত্রির বৃষ্টিতে। সমস্ত রাত্রির বৃষ্টি দিনেও শান্ত হইল না এবং পরের চার দিনও অবিশ্রান্ত চলিল। হোগলার চাল দিয়া যে জল পড়িল তাহা হইতে কম্বল ঢাকা দিয়া মাথা যদি বা বাঁচাইলাম পরদিন প্রাতে বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের আর কিছু পাইলাম না। খাটিয়া হইতে পা নামাইয়াই দেখিলাম স্থানে স্থানে রাঙামাটির রাঙাজল এবং তাহা সকলের বাক্সে ঢুকিয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ মহাশয় সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও তাঁহার একটি বাক্স বাঁচাইতে পারিলেন না।

কিন্তু কষ্ট দেখিলাম কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাদের। কত ছাউনির চাল উড়িয়া গিয়াছে, কত মজুর পালাইয়া গিয়াছে, কত গৃহনির্ম্মাণ বাকী রহিয়াছে, কত প্রার্থী আসিয়া ভিড় করিতেছে। লোক নাই, সামগ্রী নাই, সময় আসন্ন, জলে ভিজিয়া কর্ম্মীরা সব অসুখে পড়িতেছে, সম্মুখে গুরুদায়িত্ব।

অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাদের স্বভাবের একটি বিশেষত্ব আমার চিত্ত আকর্ষণ করিল। এই বিহারী ভদ্রলোকেরা কি ধীর ও নম্রস্বভাব। এত বিপর্য্যয়েও ইহারা কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং সমস্ত প্রার্থীদের যথাসাধ্য তুষ্ট করিতে লাগিলেন। সুভাষচন্দ্রের নামে পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়া বিলাতী পত্রিকা 'লাইফে'র প্রতিনিধিও যখন সাধারণ সম্পাদক অনুগ্রহবাবুর নিকট যথাযোগ্য বাসস্থান ও সম্মান পাইলেন তখন তাঁহার সংযম ও ভদ্রতা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম।

পর দিন ঘনবর্ষান্তে ১৪ই মার্চ্চ উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে নগর হাসিয়া উঠিল। গান্ধীজী আসিলেন⋯বিভিন্ন দিক হইতে নেতারা আসিতে লাগিলেন, নগরের নির্ম্মাণ-কার্য্যও সম্পূর্ণ হইয়া গেল। প্রদর্শনী খুলিয়া গেল। রাঁচী-হাজারীবাগ রাস্তায় যত দূর হইতে মোটরে আসা যায়, সেখান হইতে মোটরে নরনারী আসিয়া নগরে পৌঁছিতে লাগিলেন। কেহ কুটীরে বাস করিতে টিকিট কিনিলেন, কেহ ঝাণ্ডা-চকে সতরঞ্চ বিছাইলেন, কেহ বা সঙ্গে-আনা তাঁবু পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া বসাইবার জন্য লোক লাগাইয়া দিলেন। ট্রেন ও মোটরে আগত লোকে দুই দিনের মধ্যে মজহরপুরী বহুজনাকীর্ণ নগরে পরিণত হইল। ১৭ই মার্চ্চ যখন বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা আরম্ভ হইল তখন আকাশে দীপ্ত কিরণ, নগরে প্রবল জনতা।

বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার কার্য্যাবলী সহজেই সমাপ্ত হইল—স্বাধীনতা-প্রস্তাবও সহজেই পরদিন মঞ্জুর হইয়া

গেল—এই প্রসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ অনেকেই নড়িয়া চড়িয়া পরামর্শ ও বাক্‌বিতণ্ডায় নিয়োজিত রহিলেন, গান্ধীজীও বহুদিন পরে সাধারণের আসরে আসিয়া অতি গুরুবিষয়ে এক বিবৃতি প্রদান করিলেন, কিন্তু বাক্‌পটু-জননেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুই কেবল একান্তে নিশ্চল, নির্ব্বাক বসিয়া রহিলেন, যেন এই ব্যাপারে তাঁহার ও তাঁহাকে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

১৯শে মার্চ্চ প্রাতে, ঝাণ্ডা-চকে সভা। পূর্ব্ব-ঘোষণা অনুযায়ী সমাজতন্ত্রী নেতা আচার্য্য নরেন্দ্রদেব আসিয়া সমবেত জনতার নিকট দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলকে গান্ধীজীর অনুবর্ত্তী হইতে অনুরোধ করিলেন। দিন দীর্ঘতর এবং রৌদ্র কষ্টদায়ক হইতে লাগিল। আরও কেহ কেহও দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে লাগিলেন, কিন্তু জনতা পূর্ব্ব-ঘোষণা অনুযায়ী পণ্ডিত জওাহরলালের বক্তৃতার জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। এই সময়ে রাঁচী-রোড্ স্টেশন হইতে আগত সুভাষচন্দ্রের ষণ্ডবাহিত রথসমন্বিত দীর্ঘকায় শোভাযাত্রা ঝাণ্ডা-চকের পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথে দামামা-ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। ঝাণ্ডা-চকের জনতা চঞ্চল হইয়া স্থান ত্যাগ করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হইল যে পণ্ডিতজী আসিবেন না। তখনই সেই বিরাট জনতা অতি দ্রুত আসিয়া সুভাষচন্দ্রের রথ বেষ্টন করিল।

অপরাহ্ণ ৫॥টায় কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় এ-জন্য মণ্ডপ রচিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বেষ্টনী, নিম্নভূমিতে উচ্চ সভাপতিমঞ্চ এবং উপরে নীল আকাশ। সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে হেলিয়া পড়িলেন। দিনের খণ্ডমেঘ পুঞ্জিত মেঘরাশিতে পরিণত হইল। কংগ্রেসের ব্যবস্থা অনুযায়ী দুই-তিনখানা এরোপ্লেন সভাপতির মঞ্চের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিবার জন্য আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল। সুভাষচন্দ্রের যে আপোষবিরোধী সম্মেলন তিনটায় আরম্ভ হইয়াছিল পাঁচটায় সে-সভা ভাঙিয়া তাহা হইতেও প্রায় ৫০ হাজার লোক পিছনের পায়ে হাঁটা সোজা পথে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে আসিয়া পৌঁছিল। কংগ্রেসের বিরাট বেষ্টনী লক্ষ নরনারীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সহসা আকাশের সকল আলো নির্ব্বাপিত হইয়া কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে ঘনবর্ষণ আরম্ভ হইল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও কংগ্রেস-সভাপতির মুদ্রিত অভিভাষণ বিতরিত হইল এবং স্বাধীনতা-প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। ঘনবর্ষণে সমস্ত ভাষণ, সমস্ত সজ্জা, সমস্ত আলোকমালা স্থানচ্যুত হইল। বসিবার আসনের জন্য যে হোগলা ও চাটাই পাতা ছিল তাঁহাই তুলিয়া নরনারী সকলে মাথায় দিয়া রহিল। পার্ব্বত্য বৃষ্টিতে উপত্যকা ভরিয়া জলাশয়ে পরিণত হইল···সকলে আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। সজ্জা রহিল না, আড়ম্বর মুছিয়া গেল, কেবল স্বাধীনতার সঙ্কল্প সকলের অন্তরে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পরদিন ২০শে মার্চ্চ ঝাণ্ডা-চকে অসমাপ্ত অধিবেশন সম্পূর্ণ হইল। বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল সেই সকল প্রশ্নই উঠিল এবং সেই সকল উত্তরই প্রদত্ত হইল। স্বাধীনতা-প্রস্তাবটি অবহেলে মঞ্জুর হইয়া গেল।

রাত্রিতে রামগড় টাউন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। যে ট্রেনখানি স্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল গান্ধীজী তাহাতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বহু কলিকাতাগামী যাত্রী স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। চারি দিকে নানা ধ্বনি উঠিতে থাকিল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে নায়কের চিন্তা, নীতি ও বাক্যের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। উহা তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান বুদ্ধিই সূচনা করে। আমরা জনসাধারণ মাত্র—মহাজনের যে পথ আমাদেরও সেই পথ। বহু মত ও মহাজনতা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সমাসীন, কিন্তু লক্ষ্য এক। ইহা হইতে যদি বিষ উত্থিত হয় তবে এই ভারতে শিবও জন্মলাভ করিবে। যদি অমৃত অর্জ্জিত হয় তবে অর্জ্জনকারীকে চাহিব না, বহু দিনের পরাধীনতার জ্বালা সেই অমৃত নিষেকে জুড়াইব। তাই যেখানে বহু মত ও বহু জনতা মিলিত হইয়াছে সেইখানে আমি আমার প্রণাম রাখিলাম।

ব্রহ্মদেশে নববর্ষ ও পূজাপার্ব্বণ

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

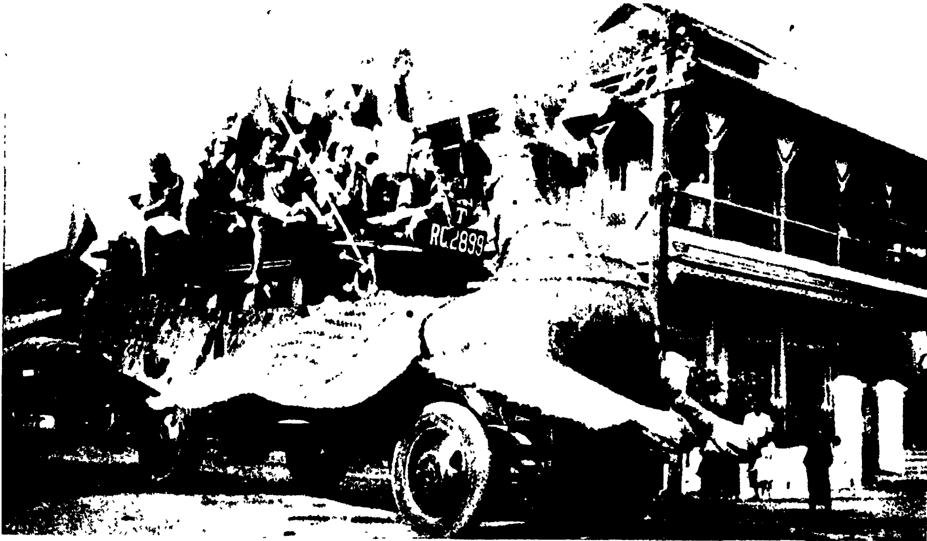
আমাদের নববর্ষ এবং বর্মীদের নববর্ষ প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হয়, দু-এক দিনের ব্যবধান মাত্র। তাদের বছরের প্রথম মাসের নাম "টাগু"। আমাদের যেমন বছরের প্রথম মাসের পয়লা তারিখে নববর্ষের উৎসব-সমারোহ হয়, এদের কিন্তু তা নয়। টাগু মাসের মাঝামাঝি এদের নূতন বছর পড়ে, আমাদের যে-সময়টা চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখ মাসের আরম্ভ। এই সময় জলক্রীড়া-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে তিন দিনব্যাপী এক বিরাট আনন্দ-উৎসব চলে। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে বড় বড় জলাধারে শীতল জল ভরা থাকে। বালবৃদ্ধযুবানির্ব্বিশেষে পরস্পরের গায়ে জল নিক্ষেপ করে, প্রতিবেশীর গৃহে গৃহে প্রবেশ ক'রে পরস্পরকে ভিজিয়ে দেয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পথিকদের এবং গাড়ী ও ট্রাম-বাসের যাত্রীদের জল ছুঁড়ে স্নান করিয়ে দেয়। পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব মিলে এক-একটি দল বেঁধে, একই রকমের পোষাক প'রে গান-বাজনা করতে করতে বড় বড় মোটর-লরী, গরুর গাড়ী চড়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ জল নেয়, নিজেরাও ভেজে, পরকেও ভেজায়। এতে কখনও কেউ বিরক্ত হয় না বরং জল দিলে হাততালি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে গানের সুরে বলতে থাকে, "ইরাব-ইরাব", অর্থাৎ "পরোয়া করি না, দাও জল, যত পার।"



জলক্রীড়া-উৎসবে সুসজ্জিত বর্ম্মী যুবকগণ

এই জলক্রীড়া-পর্ব্বের একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। বৎসরের শেষে সারা বৎসরের সকল নিষ্ফলতার জন্য অনুতাপাশ্রু-বর্ষণে হৃদয় ধৌত ক'রে নূতন বৎসরকে শুদ্ধহৃদয়ে অভিনন্দন করাই বোধ হয় এর আধ্যাত্মিক অর্থ। এই সময় নিষ্ঠাবান বর্মী-গৃহস্থরা তথাগত বুদ্ধের প্রদত্ত পাঁচটি উপদেশ পালন করেন, নিয়মিত

পূজা-দান-প্রার্থনাদি করেন। তদ্ভিন্ন; পূজনীয়দের জল-অর্ঘ্যদান, বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধমন্দির প্রক্ষালন ইত্যাদিও অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য। এই সময়টাকে বর্মীভাষায় তিঙ্গান বলে। বর্মী জ্যোতিষীরা গণনা করে প্রতি বৎসর এই সময়ের আরম্ভ-তারিখ নির্দ্দেশ ক'রে দেন। সূর্য্যদেব যখন মেষরাশিতে অশ্বিনী নক্ষত্রের সম্মুখীন হন তখন এই কাল আরম্ভ হয় এবং তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই সময় দেবরাজ 'তাঁজ্যামিন" তাঁর বার্ষিক পরিভ্রমণে ধরাতলে অবতরণ করেন। বর্ণনায় বোঝা যায়, আমাদের ব্রহ্মার সহিত তাঁজ্যামিনের গণনার হিসাব নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। উভয়েরই বিশ্বাস নিজের গণনাই ঠিক্। মীমাংসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উভয়ে নিজ নিজ মস্তক পণ রাখেন। দেবরাজ তাঁজ্যামিন পণে জয়লাভ ক'রে মহা খুশী হয়ে ব্রহ্মার মাথা কাটতে যান। এমন সময় তাঁর চিন্তা উপস্থিত হ'ল, মাথা কেটে তা ফেলবেন কোথায়? পৃথিবীতে পড়লে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে সমুদয় ভস্ম হবে, সমুদ্রে পড়লে সাগরের জল উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, আকাশে ছুঁড়লে চতুর্দ্দিক অগ্নিময় হবে। অনেক চিন্তার পর সমস্যার সমাধান হ'ল এই যে, কয়েক জন দেবকন্যা



ব্রহ্মদেশের উৎসবে সুসজ্জিত মোটর-বাস

দেবরাজ ইন্দ্র এবং বর্মীদের তাঁজ্যামিন একই দেবতা, দেশভেদে সামান্য রূপান্তরিত হয়েছেন মাত্র। দেবরাজ তাঁজ্যামিনের হাতে দুখানি খাতা থাকে, একখানি সোনার পাতে, অপরখানি কুকুরের চর্ম্মে আবৃত। সোনায় বাঁধানো খাতাখানিতে যে-সকল ব্যক্তি সৎকার্য্যের দ্বারা নিজ জীবনকে শুদ্ধ করেছে, তাদের নাম এবং অপরখানিতে কুকর্ম্মের কলঙ্কে যারা জীবনকে কলুষিত করেছে তাদের নাম লেখা থাকে। এই সম্পর্কে একটি মজার গল্পও এ-দেশে প্রচলিত আছে। একদা দেবলোকে এই বিরাট মস্তক-বহনের ভার নেবেন। সারা বৎসর ভার-বহনে ক্লান্ত হয়ে দেবীগণ যখন বৎসরান্তে হাত বদল করেন, সেই সময়ে তাঁজ্যামিন এক বার অল্প-কালের জন্য পৃথিবী-ভ্রমণে আসেন। পৃথিবীতে দেবরাজের এই আবির্ভাব এবং প্রস্থানের কাল নিরূপণ করেন বর্মী জ্যোতিষী, জ্ঞানী বর্মী এবং পোণা ব্রাহ্মণরা সকলে মিলে একত্র গণনা দ্বারা। ঘণ্টা, মিনিট, এমন কি মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ঠিক-ঠিক ব'লে দেওয়া হয়। জ্যোতিষীরা দেবতার



জলক্রীড়া-পর্ব্ব। পথিকগণ বাসের আরোহিগণকে জল দিতেছে, তাহারাও পথিকদিগের গায়ে জল দিয়া অভ্যর্থনা করিতেছে। শ্রীঅরুণ বসাক গৃহীত ফোটোগ্রাফ।

টাগু মাসে জল কমে,
কাসোন্ মাসে জল শুকিয়ে যায়,
এ সময় পিপাসাতুর পথিককে
শীতল ছায়া দিয়ে বাঁচায় যে বটগাছ,
তাকে বাঁচিয়ে রাখবে কে ?

দলে দলে বর্মী মেয়েরা এই সময় মাথায় জলের কলসী নিয়ে বটগাছের গোড়ায় জল সেচন করতে যায়।

বৌদ্ধ ত্রিপিটকে বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ কর্ত্তৃক বোধিতরু-রোপণ এবং কোশল-রাজের বোধিবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-অর্পণের ঘটনার উল্লেখ আছে। বোধিতরুর প্রতি এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রতীক যুগে যুগে প্রচারিত হয়ে আজও বর্মী গৃহস্থের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতি বর্মীর ঘরে বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, পূজার বেদীর সম্মুখে তিনটি ফুলদানিতে জলের মধ্যে বটবৃক্ষের তিনটি কচি ডাল, কখনো কখনো শুধু ফুলও সাজানো থাকে। তার সম্মুখে নিষ্ঠাবান বর্মী পুরুষ এবং নারী হাঁটু পেতে করজোড়ে প্রণতি জানায়। ফুলদানি তিনটি, বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ, এই তিনটি সাধনের প্রতীক। কাসোন মাসের এই পর্ব্বকে বর্মীভাষায় "ন্যাউঙ্-রে" পর্ব্ব অর্থাৎ বটবৃক্ষে জলসেচনপর্ব্ব বলা হয়। মাটির ঘটে জলের মধ্যে নানা রকম গাছের ডাল ও ফুলপাতা সাজিয়ে, মাথায় বসিয়ে সুসজ্জিতা বর্মী কিশোরী ও প্রাচীনার দল যখন প্যাগোডায় যাত্রা করে, তখন বড়ই ভাল লাগে।

বাহনের নামও ব'লে দিতে পারেন। তিনি বৃষভে কি সর্পে আরোহণ ক'রে আসছেন, হাতে জলের কলস, বর্শা, লাঠি, বা মশাল কি বহন ক'রে আনছেন, তা দেখে জ্যোতিষীরা ভাবীকালে ফসল, অজন্মা, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, দারিদ্র্য, যুদ্ধ, শান্তি প্রভৃতি ফলাফল কিরূপ হবে, তা' নির্ণয় করেন। আমাদের দেশে দুর্গা দেবীর মর্ত্ত্যে আগমন ও বাহনভেদে তার ফলাফলের সম্বন্ধে যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, যা পঞ্জিকায় লিখিত থাকে, তার সঙ্গে এটি তুলনীয়। আমাদের দেশের বর্ষপঞ্জীর মতন "তিন্‌জ্যান্‌সা" মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং গৃহস্থ বর্মীরা কিনে ব্যবহার করে।

টাগু মাসের জলক্রীড়া-পর্ব্বের অবসানে "কাসোন্" মাসের আরম্ভে বর্মীদের আর-একটি পর্ব্ব অনুষ্ঠানের আয়োজন চলতে থাকে। বাংলা বৈশাখের পূর্ণিমাতিথি বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি এবং নির্ব্বাণলাভের কাল ব'লে পুণ্যময়। বর্মীদের কাসোন্ মাসের পূর্ণিমা-তিথিও সেই জন্যই পুণ্যব্রতানুষ্ঠানের কাল। এই পুণ্য-দিবস উপলক্ষ ক'রে সারা মাসটা পর্ব্বানুষ্ঠান চলতে থাকে। বর্মী ভাষায় একটি ছড়া প্রচলিত আছে, তার মর্ম্ম এই,

"নায়োন্" মাসে আধুনিক যুগে বিশেষ কোন পর্ব্বানুষ্ঠান হয় না। বর্মী রাজাদের আমলে এই মাসে ধর্ম্মশাস্ত্রের পরীক্ষা নেওয়া হ'ত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা তা-লনের রাজত্বকালে এই পরীক্ষা-গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ইনি খুব ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। সাগাইনের প্রসিদ্ধ চাউঙ-মু-ড

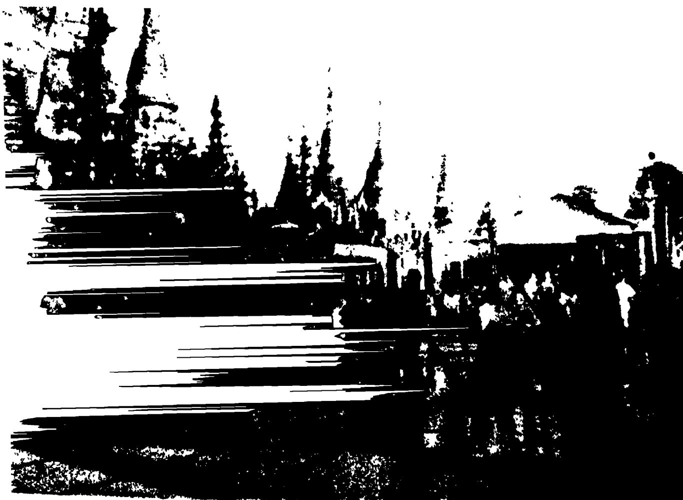
প্যাগোডা এঁরই যত্নে নির্ম্মিত হয়। নায়োন্ মাসে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রদর্শিতার পরীক্ষা নিয়ে পরবর্ত্তী 'ওয়াজো" মাসে কাকে কোন্ স্তরের ফোঙ্গীত্ব দান করা যাবে তা' স্থির করা হ'ত। দীক্ষাদানের পূর্ব্বে যোগ্যতার বিচার নিতান্তই প্রয়োজন ব'লেই বোধ হয় এই পরীক্ষা-পর্ব্ব অনুষ্ঠানের প্রচলন হল।



ব্রহ্মদেশে জলক্রীড়া-উৎসব

ওয়াজো মাস বৌদ্ধব্রত-উপবাসের আরম্ভ-কাল। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ব্রত-গ্রহণ উপলক্ষ করে নানাবিধ উৎসবের সৃষ্টি হয়।

বর্ষারম্ভে বর্ষণের অবিরাম ধারা প্রবাহিত হ'তে থাকে, সুতরাং পথে ঘাটে চলা, ভিক্ষাগ্রহণ সবই ক্লেশকর হয়। কথিত আছে, বুদ্ধদেব এই কারণেই তাঁর শিষ্যদলকে সঙ্গে নিয়ে এই সময়ে কোনো নিরালা বনে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। ধনী অথবা পুণ্যলাভার্থী ভক্তেরা তাঁদের বাসের উপযোগী মঠ নির্ম্মাণ ক'রে দিয়ে নির্জ্জন সাধনের সহায়তা করতেন। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় যে-সময় তাঁরা এইরূপ নির্ব্বাসন গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন, সে-সময়টার সদ্ব্যবহার করবার জন্যে তথাগত তাঁর শিষ্যদের নানাপ্রকার বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়ে কঠিনতর সূক্ষ্মতর সাধনের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। বুদ্ধের এই প্রণালী অনুসরণ ক'রে আধুনিক ফোঙ্গীগণও এই সময় নিতান্ত বাধ্য না হ'লে মঠের বা চাউঙের বাহিরে যান না। চাউঙের মধ্যে বাস ক'রে শাস্ত্রপাঠ, অধ্যয়ন, প্রার্থনা ও উপবাসাদি দ্বারা নিজ নিজ জীবনকে শুদ্ধতর এবং আরও সংযত, পবিত্র করবার চেষ্টা করেন। শুধু ফোঙ্গীরা নন, অনেক গৃহস্থ বর্মীরাও এই সময় গৃহে বাস ক'রেও বুদ্ধের উপদেশ-গুলি ব্রতরূপে পালন করেন, আমোদপ্রমোদাদিতে যোগ দেন না, দানধ্যানের দ্বারা জীবনকে বিশুদ্ধ করবার সাধনা করেন। অনেক যুবকও সাময়িক ফোঙ্গীত্ব গ্রহণ ক'রে প্যাগোডা-সংলগ্ন চাউঙে বাস করেন। যে যত দিন চাউঙে ফোঙ্গীর জীবন যাপন করবে,



বর্মী ভক্তগণের শোয়েডাগন প্যাগোডার প্রাঙ্গণ প্রক্ষালন

তদনুযায়ী ফোঙ্গী-জীবনের স্তর বিচার করা হয়।

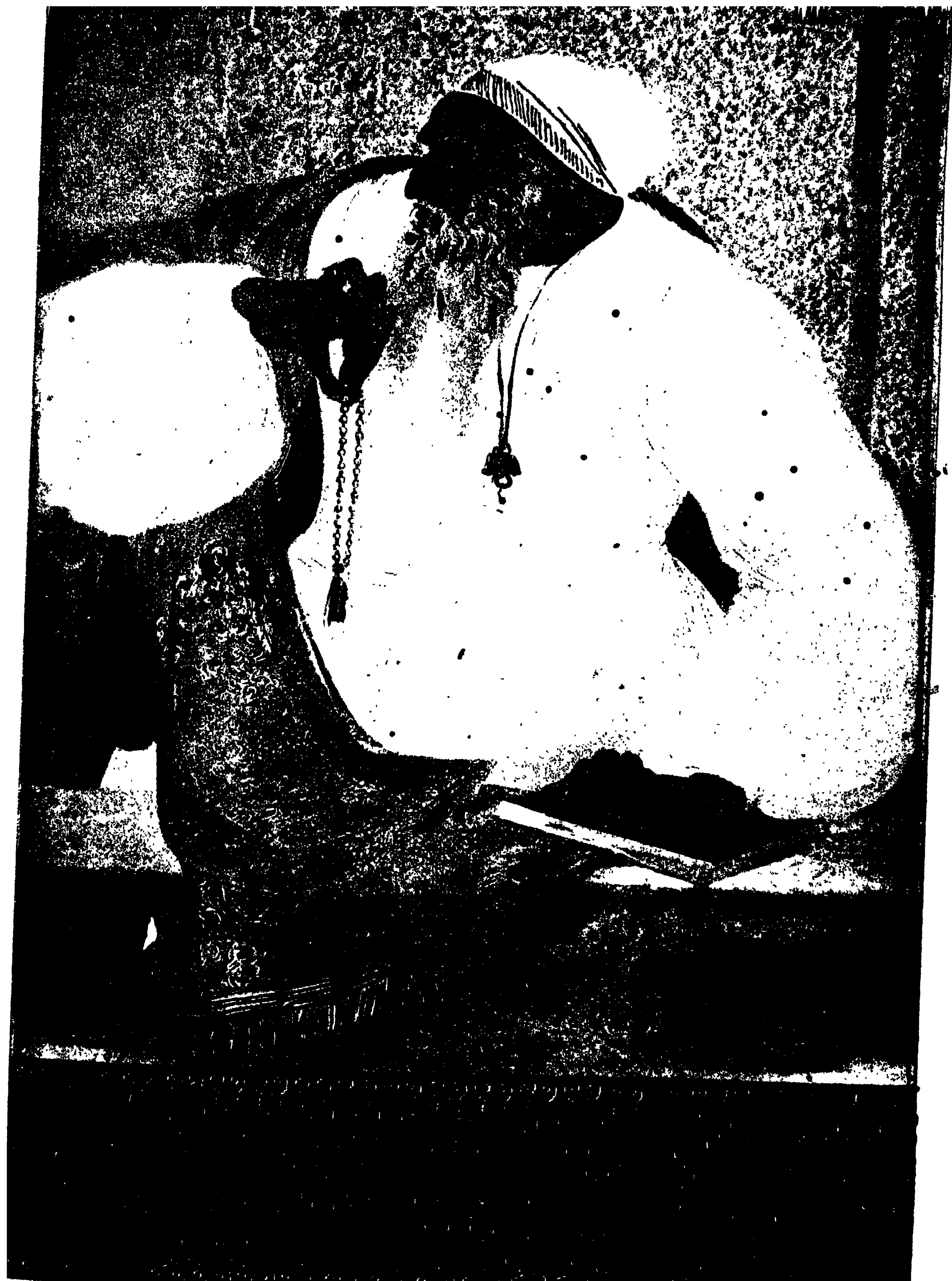
ওয়াজো মাসের পূর্ণিমার দিনে প্যাগোডায় মহোৎসব হয়, কারণ সেদিন ফোঙ্গীরা নিজেরাই উপবাস-ব্রত গ্রহণ করেন। পূর্ণিমার পরদিনে এক সুন্দর পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে তরুণতরুণীদের বনফুল সংগ্রহ ক'রে প্যাগোডায় অঞ্জলি দেওয়ার বিধি আছে।



তাডিনজু্য পর্ব্ব-উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণস্থ বৌদ্ধমন্দিরে আলোকসজ্জা।
শ্রীমিহির দত্ত গৃহীত ফোটোগ্রাফ।

বৌদ্ধ পূজাপার্ব্বণ-অনুষ্ঠান সবই বেশ সুরুচিসম্পন্ন এবং গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ। কিন্তু ব্রহ্মের পুরাতন রাজধানী মান্দালয়ের নিকট টাউঙ-বিয়োঁ নামক একটি স্থানে দুইটি প্রেতাত্মার সম্মানার্থে প্রতি বৎসর একটি উৎসব হয় এবং প্রায় সমস্ত ব্রহ্মদেশ থেকে সেই উৎসবে যোগ দিতে দলে দলে লোক যায়—সেই উৎসবটির ইতিহাস তেমন সূক্ষ্ম রুচির পরিচায়ক নয়। কথিত আছে, আনুমানিক প্রায় একাদশ শতাব্দীতে আনরাঠা নামক পাগানের এক প্রতাপশালী রাজা তাঁর অসংখ্য অভিযানের শেষে এক প্রকাণ্ড বজরায় ক'রে বর্ব্বরোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে ইরাবতী নদীর উপর দিয়ে মান্দালয়ের নিকটবর্ত্তী ওয়েজিন্‌ডৌ নামক স্থানে এসে উত্তীর্ণ হন এবং তথায় টাউঙ-বিয়োঁ নামক এক প্যাগোডা নির্ম্মাণ করেন। তিনি তাঁর অনুচরবর্গের প্রতি এই আদেশ দেন যে, প্রত্যেকে অন্ততঃ একখানি ক'রে ইট এনে প্যাগোডার নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করবে। সোয়েপিঞ্জী এবং সোয়েপিঙে নামক দুই ভৃত্য তাঁর আদেশ অমান্য করায় সেখানে তিনি তাদের অত্যন্ত নৃশংস ভাবে হত্যা করেন। তারা এখনও ঐ স্থানে প্রেতাত্মারূপে সকলের পূজা গ্রহণ করছে। প্রতিবৎসর অসংখ্য লোক এই পূজায় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। সেই মূর্ত্তির সেবায়েতরা শূকরের মাংস স্পর্শ করবে না এই বিধি। সাধারণতঃ শূকরের মাংস বর্ম্মীদের একটি উপভোগ্য খাদ্য।

"ওয়াগাউঙ্" মাসে বর্ত্তমান যুগে বিশেষ কোন পর্ব্বানুষ্ঠান চলিত নেই। পুরাকালে এ-দেশে এ-সময় একটি উৎসব প্রচলিত ছিল, এখনও কোন কোন সহরে তার সামান্য প্রচলন দেখা যায়। বর্ম্মী গৃহস্থগণ তাদের ধর্ম্মযাজক বা ফোঙ্গীদের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে দান সংগ্রহ করত এবং ভাগ্যপরীক্ষা দ্বারা কার ভাগ্যে কি পড়বে, স্থির করা হ'ত। কাকে কোন্‌টি দেওয়া হবে নির্ণয় করবার সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায় এই, যাতে কারও উপর পক্ষপাতিতা-দোষ না স্পর্শে। এই ব্যাপারটির পশ্চাতে একটি প্রাচীন কিম্বদন্তীর দোহাই বিদ্যমান আছে। বুদ্ধের জীবিতকালে পাগানের নিকটবর্ত্তী পিঞ্চা নামক স্থানে রাজা তিহাতু একটি মঠ নির্ম্মাণ ক'রে প্রচার করেন যে, যে-ফোঙ্গী নিজে সাহস ক'রে এসে এই মঠ অধিকার ক'রে নেবে, এ মঠ তারই হবে। ফোঙ্গী সু-চৌ পিয়্টূ সেই মঠ অধিকার করেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি রাজাকে পরামর্শ দেন যে ভাগ্যপরীক্ষা দ্বারা এ-মঠের স্বত্বাধিকার নিরূপণ করাই শ্রেয়। এই ঘটনা অবলম্বন ক'রেই প্রতিবৎসর এই মাসের একটি নির্দ্দিষ্ট



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জীবন-প্রান্তে
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

সময়ে ভাগ্যনিরূপণ-পর্ব্বোৎসবের সূচনা হয়। উৎসব-প্রিয় জাতি ব'লেই বোধ হয় সামান্য সুযোগ খুঁজে নিয়েও এরা আমোদে মেতে ওঠে।

বর্ষার অবসানে শরতের আবির্ভাবে নদীর জল শান্ত ভাব ধারণ করে। এই মাসকে বর্মীরা "ট-দালীন্" মাস বলে। বর্মী রাজাদের আমলে এই সময় জলকেলির সহিত উৎসব সমারোহের সম্পন্ন হ'ত। নদীর মাঝখানে একটি কাঠের স্তম্ভ স্থাপন ক'রে তার উপর থেকে নদীর জলে ঝাঁপ দেবার প্রতিযোগিতা হ'ত। রাজারা তীরে ব'সে আনন্দের সহিত এই ক্রীড়া-উৎসবে উৎসাহ দিতেন। নদীর তীরে বহু প্রতিযোগী এবং দর্শকের ভিড় হ'ত। আধুনিক যুগে উন্নততর আয়োজনে এই উৎসব সুসম্পন্ন হচ্ছে দেখা যায়। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, এই সময় নৌকাচালন-প্রতিযোগিতা উৎসব হয়।

"তাডিন্জ্যু" পর্ব্ব বর্মীদের একটি মহোৎসব বললেই চলে। তাডিন্জ্যু মাসেই এই উৎসব সম্পন্ন হয়। ওয়াজো মাসে যে ব্রত-উপবাস আরম্ভ হয়, এই সময় তার উদ্‌যাপন-কাল। গত তিন মাসে বিবাহ, নাচ-গান সবই নিষিদ্ধ ছিল, সেজন্য এই সময় চারি দিকে পোয়ে নাচ, মেলা প্রভৃতি চলতে থাকে। আমাদের দেশের দীপান্বিতার উৎসবের মতন ঘড়বাড়ী আলোকমালায় সজ্জিত হয়, প্যাগোডার মুকুটগুলি রঙবেরঙের বিজলী বাতির চমকে উদ্ভাসিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় উন্মুক্ত আকাশতলে বাঁশের মঞ্চ নির্ম্মিত হয়, সুন্দরী নর্ত্তকীর দল ফুলের আভরণে সেজে নাচতে থাকে, বাদকের দল মাথা নেড়ে ঢাক, করতাল, মৃদঙ্গে আঘাত ক'রে নৃত্যে প্রচুর উন্মাদনা এনে দেয়। রাস্তার দুই ধারে নানাবিধ দোকান সাজানো থাকে—শৌখিন দ্রব্য, খেলনা, পোষাক যা চাও সবই পাবে। অফুরন্ত আহার ও পানীয়ের আয়োজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব'সে খাবারও ব্যবস্থা থাকে। রাত্রি ন-টা হ'তে আরম্ভ ক'রে সারারাত পোয়ে নাচগান এবং নাটক-অভিনয় চলে। বিনা টিকিটে রাস্তার ধুলোয় অথবা ছিন্ন চাটাইয়ে ব'সে বর্মী পুরুষ-নারী, যুবা-শিশু সকলেই মহা আনন্দে পোয়ে নাচ দেখে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যে যার কাজে ফিরে যায়। এই সময় তিন দিন ধরে প্যাগোডাতেও মহোৎসব চলতে থাকে। প্রবীণেরা সেখানে গিয়ে প্রায় সমস্ত দিনটাই স্তব-স্তুতি-বন্দনায়ই কাটান। যুবক-যুবতীরাও সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে শান্-ব্যাগ, টিফিন্-ক্যারিয়ার ইত্যাদিতে আহার্য্য-দ্রব্য পূর্ণ ক'রে দল বেঁধে প্যাগোডায় যায় এবং চাউঙ্-সংশ্লিষ্ট অতিথি-শালায় একত্র আহারাদি ক'রে, নাচ-গান উপভোগ ক'রে মহা আনন্দে সারাদিন কাটায়। এই সকল উৎসবের দিনে প্যাগোডায় গেলে নানারূপ দৃশ্য দেখা যায়। মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত বুদ্ধের বিরাট ধ্যানী-মূর্ত্তিসমূহের সম্মুখে অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে, সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ায় মন্দিরটি সুন্দর শুচিতায় আচ্ছন্ন, অর্ঘ্য-পুষ্পের প্রাচুর্য্যে দেবতার চরণ আবৃত। অগণ্য ভক্ত নরনারী নতজানু হয়ে করজোড়ে অশ্রুসিক্তনয়নে মর্ম্মরমূর্ত্তির পূজায় নিরত। মুণ্ডিতকেশ গৈরিকধারী ভিক্ষুগণ শান্তভাবে ইতস্ততঃ পদচারণা করছেন, কেউ বা প্রাঙ্গণস্থিত বিপুলায়তন ঘণ্টায় ধীরে-ধীরে আঘাত ক'রে আকাশে বাতাসে সেই গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করছেন।

এই তাডিন্জ্যু পর্ব্বানুষ্ঠানটি বুদ্ধের জীবনের একটি ঘটনা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকের অধিবাসীদের নিকট ধর্ম্মপ্রচারে যান। কথিত আছে, বুদ্ধের জননী দেবীও অশরীরী রূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রচারান্তে পৃথিবীতে প্রত্যাগমনের সময় দেবতারা তাঁর সমস্ত পথ আলোকমালায় উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা স্মরণ ক'রে বৌদ্ধ গৃহস্থ এই দিনে নিজ নিজ গৃহ, পথঘাট সব আলোকিত করেন এবং বৌদ্ধ মন্দিরে মূর্ত্তির সম্মুখেও আলোর অর্ঘ্য প্রদান করেন।

এক সময় এই ঘটনাটি নাটকের সাহায্যে সমারোহে অনুষ্ঠিত হ'ত। ইহা "মিন্হেমা পোয়ে" বা "তব তিন্থা" নামে অভিহিত। একটি সু-উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ ক'রে তার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ধারে দুইটি ঢালু পথ প্রস্তুত করা হ'ত। পর্ব্বের প্রথম দিনে একটি বুদ্ধমূর্ত্তিকে ট্রলির সাহায্যে পূর্ব্বদিকের পথে চালিত

ক'রে অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিশ্রামের জন্যে এক দিন সেখানে রাখা হ'ত। এই স্থানটি তথাকথিত উগান্দ্র পর্ব্বত, যেখানে বুদ্ধদেব দেবলোকে অর্থাৎ তেত্রিশটি দেবতার আবাসভূমিতে যাবার পথে বিশ্রাম করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনে মঞ্চের উচ্চতম স্থানে মূর্ত্তিটি স্থাপিত হ'ত—এই স্থানেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক। দ্বিতীয় রাত্রি এই স্থানে যাপন করবার পর তৃতীয় বা শেষ দিনে তাঁকে পশ্চিমের ঢালু পথ দিয়ে তাঁর মঠে ফিরিয়ে আনা হ'ত। পশ্চিমের পথটির প্রান্তদেশে একটি সুন্দর মঠও নির্ম্মিত হ'ত। সমস্ত ব্যাপারটি অভিনয়ের সাহায্যে এমন সুন্দর ভাবে দেখান হ'ত যে, অতীতের বিস্মৃত যুগের ঘটনা বাস্তবের ন্যায় মানুষের চোখের সম্মুখে সেই কাহিনীটিকে জীবন্ত ক'রে তুলত। প্রবীণ বর্ম্মীরা বলেন, তাঁদের কিশোর বয়সে এই অনুষ্ঠানটির যথেষ্ট সমারোহ দেখেছেন এবং আজও তাঁদের মনে সে-দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তাডিনজ্যু পর্ব্বের সংশ্রবে আরও একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন কোন স্থানে তার সামান্য চিহ্ন দেখা যায়। কথিত আছে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির প্রায় এক শত বৎসর পরে উপগুপ্ত ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। ধর্ম্মাবতার অশোক যখন বৌদ্ধ তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন, ভিক্ষু উপগুপ্ত তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপর বর্ম্মীদের অগাধ শ্রদ্ধা। তাঁকে গৃহে বরণ ক'রে আনতে পারলে গৃহস্থের সমূহ কল্যাণ হবে এই বিশ্বাসে ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ বর্ম্মীরা আজও ব্রত-উপবাস উদ্‌যাপনের শেষ দিনে আপন আপন গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত করে এবং একটি ক্ষুদ্র নৌকা নির্ম্মাণ ক'রে ফুল ও প্রদীপের আলোয় সাজিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। সেই নৌকায় "উপাগু" দেবতা তার ঘরে আসবেন এবং আশীর্ব্বাদ ক'রে বর প্রদান করবেন এই আশায় সারারাত্রি জেগে প্রতীক্ষা করে।

এই অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য আর কিছু না বুঝলেও সৌন্দর্য্যপিপাসু জাতটির শিল্পনৈপুণ্য এবং রুচির পারিপাট্যের প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। প্রশান্ত নদীর কালো জলের বুকে অসংখ্য প্রদীপের মালা বায়ুভরে নেচে বেড়াচ্ছে—কি মনোরম সে দৃশ্য! কখনও কখনও বড় বড় বজরা সাজিয়ে সুবেশা নর্ত্তকীর দল গানবাজনা করতে করতে চলেছে, এমন দৃশ্যও দেখা যায়।

এই মহোৎসবের অন্তে "টাজাউঙ্‌মন্" মাস আরম্ভ হয়—আমাদের বাংলা অগ্রহায়ণ মাস বা ইংরেজী নবেম্বর মাসের কাছাকাছি এই মাসে "টাজাউঙ্-ডাইঙ্" পর্ব্ব। বর্ম্মী গৃহস্থগণ এই সময় ফোঙ্গীদের মধু উপহার দেন। অবিবাহিত বর্ম্মী কন্যাগণ সারারাত্রি জেগে ফোঙ্গীদের ব্যবহার্য্য গৈরিকবস্ত্র বয়ন করেন। এই অনুষ্ঠানটির সম্বন্ধেও একটি গল্প প্রচলিত আছে। বুদ্ধ-জননী মায়াদেবী দেবতাদের নিকট থেকে যখন অন্তরে অনুভব করলেন যে তাঁর পুত্র রাজবস্ত্র পরিত্যাগ করে গৈরিক ধারণ করবেন মনস্থ করেছেন, তখনই এক রাত্রির মধ্যে যাতে তাঁর সন্তানের সন্ন্যাসবস্ত্র প্রস্তুত হয় তার ব্যবস্থা করলেন। পালাক্রমে অনেকে মিলে সারারাত্রি জেগে প্রত্যুষের পূর্ব্বেই বয়ন-কার্য্য সমাধা করেছিলেন। নিশাবসানে সেই বস্ত্র পরিধান ক'রেই রাজপুত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উপাস্য দেবতার জীবনের এই ঘটনা অবলম্বনে বর্ম্মী নারীগণ সারারাত্রি জেগে বস্ত্র বয়ন ক'রে প্রত্যুষে ফোঙ্গীগণকে উপহার দেন। রাত্রিজাগরণের ক্লেশ নিবারণের জন্য যথেষ্ট আয়োজন হয়—নাচগান, আহারবিহার চলতে থাকে। এই সময় আকাশে প্রদীপ-সমেত বেলুন উড়ান হয় এবং আলোক দ্বারা গৃহ সজ্জিতও হয়।

এর পর "না-ড্ড" মাস। এই মাসে নাট-পূজা বা প্রেতাত্মার উদ্দেশে পূজার প্রচলন আছে। পাগান্ রাজ্যের গৌরব-সমৃদ্ধির দিনে তথাকার সোয়েজিগন প্যাগোডায় নিয়মিতরূপে আড়ম্বরের সহিত নাট-পূজা হ'ত। এই উপদেবতাদিগের উদ্দেশে খাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। এই খাদ্য অপক্ব অবস্থায় দিতে হয়, রন্ধন করা কোন জিনিষ অর্ঘ্য দেওয়া যায় না। এর পর "প্যা-দো" মাস। বর্ম্মীরাজাদের সময় এই মাসে ঘোড়দৌড়ের খেলা হ'ত। শীতকাল ব'লে এই সময় সৈন্যসামন্তদের নানারূপ রণকৌশল-প্রদর্শনীও হ'ত। অশ্বারোহী, হস্তি-

বাহিনী ও সৈন্যদল সজ্জিত হয়ে অভিযানে বাহির হ'ত। বর্ত্তমানে এ-সব বিশেষ কিছুই দেখা যায় না।

"টাবোডোয়ে" মাসে এ-দেশে এক রকম নূতন ধান উৎপন্ন হয়। এই চালের এক রকম মিষ্টান্ন প্রস্তুত ক'রে পরস্পরকে বিতরণের প্রথা চলিত আছে। পাড়া-প্রতিবেশী মিলে বাড়ীর বাহিরে কোন খোলা জায়গায় বিরাট্ পাত্রে এই মিষ্টান্ন রন্ধন করার নিয়ম। রন্ধনের পর আঠার মত হ'য়ে যায় বলে ইংরেজীতে একে gum-rice বলে। এই চাল দেখতে গাঢ় লাল্‌চে গোছের। নারেকেলের সঙ্গে খেতে বেশ সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। এদের এই চালের পিঠা বিতরণ দেখে আমাদের দেশের নবান্ন উৎসব মনে পড়ে।

বৎসরের শেষ উৎসব "টাবাউঙ্" মাসে টাবাউঙ-পর্ব্ব। এ-সময়ে আমাদের দেশের ফাল্গুন-চৈত্র মাস, বসন্ত-সমাগম। এই মাসে বর্মীরা তীর্থভ্রমণে যায়। এই সময়ে বিশেষ ভাবে "ফায়া"র উৎসব সম্পন্ন হয়। শহরের অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্যাগোডা-দর্শন, অর্ঘ্যদান, স্থানান্তরে বিখ্যাত মন্দির ও মঠ প্রদক্ষিণ, আর্থিক প্রাচুর্য্য থাকলে দেশদেশান্তরে তীর্থদর্শন প্রভৃতি প্রথার প্রচলন আছে। তীর্থভ্রমণ-উৎসবে কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের বিধি নেই। আহারবিহার, আমোদপ্রমোদ, নৃত্যগীত বর্মীদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিরন্তর সঙ্গী।

এই ভাবে প্রায় সারা বৎসরই বর্মীদের ঘরে-বাহিরে উৎসব লেগে থাকে। আমাদের দেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাবিধ অনুষ্ঠানাদির প্রচলন আছে, এ-দেশেও প্রায় সেই রকমই। তবে, প্রকৃতপক্ষে এ-দেশে তিনটিই ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। প্রায় প্রত্যেক মাসেই একটি-না-একটি পর্ব্বের চলন আছে, যদিও সব অনুষ্ঠানগুলিকে বৌদ্ধ অনুষ্ঠান বলা যায় না।

বর্মীরা মনে করে, যা-কিছু তাদের জাতীয় অনুষ্ঠান, তা সবই বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত। গার্হস্থ্য কোন ছোট-খাট অনুষ্ঠানেও এরা ধর্ম্মযাজক বা ফোঙ্গীদের এবং ধর্ম্মমন্দির বা ফায়াকে বাদ দেয় না। ধর্ম্মমন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে সকল পূজাপার্ব্বণ আমোদ-প্রমোদ হয়। প্রত্যেক পর্ব্বানুষ্ঠানে আমোদপ্রমোদ, নৃত্য-অভিনয়, মেলা, আহারবিহার প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বর এত বেশী থাকে যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব'লে অনুভব করা কঠিন হয়। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও যখন দেখি, সুখী, ধনী, নিষ্ঠাবতী, বর্মী নারী শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ ক'রে আপন হস্তে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন ক'রে প্রত্যুষে আপন গৃহের দ্বারে বিনীতমুখে ভিক্ষু-সন্ন্যাসীদের আগমন প্রতীক্ষা করছেন, আপন হস্তে শয্যাদ্রব্য প্রস্তুত করে মঠে গিয়ে দান ক'রে ফোঙ্গীর সকল অভাব মোচন করছেন, নিতান্ত দরিদ্রা অভাবপীড়িতা রমণীও স্বীয় ক্ষুধার গ্রাস হ'তে এক মুষ্টি অন্ন বাঁচিয়ে ফোঙ্গীর দৈনিক ভিক্ষাপাত্রে শ্রদ্ধাভরে এনে ঢেলে দিচ্ছেন, বিশেষ পর্ব্বের দিনে বা গৃহের কোন মঙ্গলানুষ্ঠানে দুটি মোমবাতি, কয়েকটি ফুল কিনে ফায়ার চরণে নিবেদন করছেন, তখন স্বীকার না ক'রে পারা যায় না যে এই জাতির, বিশেষতঃ নারীদের, অন্তর সরল ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মমন্দিরগুলির শোভন পারিপাট্য দেখলেই বোঝা যায়, বর্মী গৃহস্থ ধর্ম্মার্থে দানে মুক্তহস্ত, ধর্ম্মাচার্য্যের প্রতিও এদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

ধর্ম্মের দর্শন এরা কত দূর আয়ত্ত করতে পেরেছে জানি না, তবে জীবনকে আনন্দময়রূপে এরা দেখতে শিখেছে, সন্দেহ নেই।



প্রতিক্রিয়া

শ্রীআশালতা সিংহ

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর সমাজে বেশ একটু মান-সম্ভ্রম আছে। মাসিক পত্রে তাঁর কয়েকটি রচনাও ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে। সে রচনাগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাতে আধুনিকতার সমর্থন কোথাও নেই। নারীর ধর্ম্ম যে গৃহকাজে এবং সে গৃহ সুখের হোক দুঃখের হোক একমনে তাকেই বরণ করে নিয়ে কল্যাণীরূপে তাকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে এই কথাটা তারস্বরে তিনি তাঁর নানা লেখায় বলেছেন। আদর্শ মহিলা হিসাবে সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি। কোথাও নূতন মেয়ে-ইস্কুল হ'লে লোকে আগে গিয়ে তাঁকে ধরে, উদ্বোধন তাঁকে করতেই হবে। অমনি মেয়েদের আদর্শ শিক্ষার একটা বিবরণও পাওয়া যায় নির্ম্মলা দেবীর অভিভাষণে। সম্প্রতি দত্তদের ইলা নামে মেয়েটা একটু বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। পরশু সে নাকি বারোটায় বাড়ী ফিরেছিল। বাড়ী ফিরেও দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিষ্টিসুরে কার সঙ্গে গল্প করছিল। তার আগের দিনেই বুঝি রাত নটা-দশটার সময়েও লেকের বেঞ্চে বসে সে গান গাইছিল। এ-সব ভাল লক্ষণ নয়। সঙ্গদোষে শত গুণ নাশে। তার এ-রকম দৃষ্টান্তে সমাজের অপরাপর পাঁচটা মেয়ের ক্ষতি হ'তে পারে এই কথাটাই নির্ম্মলা মিসেস বোসকে প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাচ্ছিলেন, কারণ ইলা তাঁরই ভাইঝি। মিসেস্ বোস সখেদে বললেন, "কি করব ভাই নির্ম্মল, সবাই যদি তোমার মত আদর্শ-নারী হ'ত তাহলে আর ভাবনা কি ছিল! ইলা আমার নিজের ভাইঝি হ'লে কি হবে, তার জন্যে আমি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হয়ে থাকি। যখন-তখন এ-বাড়ী আসে। আমার নীরু-তরু-সুনীকে বিগড়ে না দিলে বাঁচি। কিন্তু ভাই আমাকে যদি আধ ঘণ্টার জন্যে মাপ কর, আজ পাঁচটার সময় জজ সায়েবের আর কালেক্টারের স্ত্রীর অনাথ-আশ্রমের জন্যে চাঁদা নিতে আমার এখানে আসবার কথা আছে। মনে ক'রে রেখেছি অমনি তাঁদের একটু চা খাইয়ে দেব। তার উদ্‌যোগ-আয়োজন হচ্ছে। কেক আর পুডিংটা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি। ততক্ষণ তুমি বরঞ্চ আমাদের মেয়ে-স্কুলের বার্ষিক অভিভাষণটা লিখে দাও। তোমার বাণী মাঝে মাঝে শুনতে পায় বলেই তবুও যা হোক মেয়েগুলো এখনও ধাতস্থ আছে। কিন্তু যা মেঘ ক'রে এল, ওঁরা আজ এলে হয়।"

মিসেস্ বোস ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। আকাশের মেঘে ঘরখানির আলো কমে এসেছে। সেই নিবে-আসা আলোর পর্দ্দায় কতদিন আগেকার চেনা-জানা কারা সব যেন বেরিয়ে এল। দৃশ্যপট বদলে গেল। নির্ম্মলা দেবী টেবিলের উপর মাথা রেখে দেখছিলেন, মেঘের কালো আবরণের তলায় চাঁদ এক বার ক'রে চাপা পড়ছে। গঙ্গার দিক্ থেকে একটা জোলো হাওয়া ছুটে আসছে। ঝড় এসে পড়ল। একটা খোলা জানালার গরাদে ধরে নির্ম্মলা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। ওপারের নির্জ্জন কাশবন আর বালির চড়া ঘোলাটে চাঁদের আলোর তলায় কি এক রকম দেখাচ্ছে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে এক জন ঘরে প্রবেশ করল। নির্ম্মলা ফিরে দাঁড়িয়ে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, "বেশ তো, না এলেই একেবারে হ'ত। এতক্ষণে বুঝি তোমার আসবার সময় মিলেছে! আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি।"

আরও কি সে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু যে ঘরে এসে ঢুকল তার ব্যথিত করুণ মুখের দিকে চেয়ে নির্ম্মলার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। ভীত ত্রস্তভাবে সে বললে, "ওকি, তোমার কি হয়েছে?"

রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ ছেলেটির হাতে ছিল, সেটি সে নির্ম্মলার হাতে তুলে দিয়ে বললে, "বোম্বের ওদিকে

একটা ভাল চাকরি পেয়েছি। কালই আমাকে চলে যেতে হবে। তোমাকে বলতে এলুম। আর সময় নেই অপেক্ষা করবার। সে অনেক দূর।"

ততক্ষণে ঝড় আরম্ভ হয়ে গেছে। খোলা জানালাগুলো আর্ত্তস্বরে এক বার বন্ধ হচ্ছে আবার খুলে যাচ্ছে। নির্ম্মলা ছবির মত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌকির উপর একটা হাত রেখে।

নরেন একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ কাছে সরে এসে ফুলসুদ্ধ ওর হাতটা চেপে ধরে বললে, "মিথ্যে কথা। আমি কোন চাকরি পাই নি। তবু আমাকে অনেক অনেক দূরে চলে যেতে হবে। তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে।" ঘরে আলো ছিল না। শুধু মেঘরন্ধ্রচ্যুত চাপা জ্যোৎস্নার একটুখানি এসে পড়ছিল। এক জন প্রৌঢ়া মহিলা বেশ একটু সাজসজ্জাসমেত বিলাতী এসেন্সের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে উঁচু-হীলের জুতো খুট খুট করতে করতে সে-ঘরে এসে ঢুকলেন।

"উঃ এই অন্ধকারে একা বসে নির্ম্মলা কি করছিস? রেবারা অত ক'রে বলে গেল আমার সঙ্গে তাদের বাড়ী এক বার গেলেই হ'ত। কত দুঃখ করছিল তারা। এ যে দেখছি ঘরে বালি কিচকিচ করছে। ঝড়ের সময় চাকরগুলো করে কি, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করতেও তাদের মনে থাকে না। সেটুকু আক্কেল অবধি তাদের যদি হয়। ডেকে বলতে পারিস্ নি ওদের।"

ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ টিপে দিতেই অজস্র আলোর বন্যায় ঘর ভরে গেল। জয়ন্তী মুখ কালো ক'রে নরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নরেন, তোমাকে সকালে যে চিঠিখানা পাঠিয়েছি বোধ হয় পেয়েছ। তোমার যদি তেমন কোন দরকার না থাকে তাহলে নির্ম্মলার সঙ্গে আমার একটু জরুরি কথা ছিল।"

রজনীগন্ধার গুচ্ছটি হাতে নিয়ে নির্ম্মলা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। শান্তকণ্ঠে বললে, "ওঁর বাইরে যাবার দরকার নেই। তোমার দরকারী কথাটা যে কি তা আমি জানি মা। সকালবেলায় বোধ হয় এই দরকারী কথা জানিয়েই তুমি ওঁকে চিঠি লিখেছিলে।"

জয়ন্তী একটু অপ্রতিভমত হ'লেন কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে একটা চৌকিতে বেশ জুত করে বসে বললেন, "তা যদি জেনে থাক বাছা সে তো ভাল কথা। কাল এই নিয়ে তোমার বাবা বড় দুঃখ করছিলেন। বলছিলেন, নরেন যখন প্রথম আমার কাছে এসেছিল তার বুদ্ধি দেখে চমক লেগেছিল। ছেলের মত স্নেহে যত্নে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়েছি। আমারই চেষ্টা-যত্নে সে য়ুনিভার্সিটিতে এত ভাল রেজাল্ট করতে পেরেছে। এত স্নেহ এত বিশ্বাসের প্রতিদান সে কি এই রকম করেই শেষে দিলে।"

নরেনের মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ জ্বলতে লাগল। বহু কষ্টে সে নিজেকে সংবরণ ক'রে রাখলে। পানের ডিবে খুলে একটা পান মুখে দিয়ে জয়ন্তী বললেন, "ছেলের মত আমিও তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু এটা তো কিছুতেই ভুলতে পারি নে যে তোমার মা শেষটা ভুগে ভুগে যক্ষ্মায় মারা গেলেন। আর তুমি তো জান নির্ম্মলার বাবা নামে বিলেতফেরৎ মস্ত ব্যারিষ্টার হলে হবে কি, মনে মনে ভীষণ গোঁড়া। তোমরা পদবীতে সাহা, এত নীচু যে ঠিক কায়স্থও বলা চলে না তোমাদের।" এক সঙ্গে এতগুলি কথা ব'লে জয়ন্তী অল্প একটু থামলেন নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। যে দুটি নবীন আসামী তাঁর দু-পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের দিকে আড়চোখে এক বার চাইলেন, ফল কিছু হ'ল কিনা দেখবার জন্যে। হঠাৎ পাশের দরজা খুলে গেল, নির্ম্মলার বাবা মিষ্টার চাটার্জ্জী বেরিয়ে এলেন। ঘরে এসে কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সোজা নির্ম্মলার কাছে গিয়ে তার মাথায় একটি হাত রেখে বললেন, "মা নির্ম্মল, মেয়েদের জীবনের চরম কথা ত্যাগে, সুখভোগে নয়। তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ তুচ্ছ এখানে। জাতির সমাজের ভবিষ্যত জীবনধারা অদৃশ্য আকারে তোমার মধ্যে বইছে। তাকে নির্ম্মল ক'রে প্রবাহিত রাখবার ভার তোমার উপরে। কোন লোভ কোন আপাতসুখের আকর্ষণে এ-কথা ভুলো না। তোমার দায়িত্ব অনেক।" এতক্ষণে নির্ম্মলার দু-চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। নরেন কখন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। প্রফেসর চাটার্জ্জী মোহমুদ্গরের কি একটা শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর

বিশেষ রকম দখল আছে। রজনীগন্ধার করুণ তীব্র গন্ধ ঘরের হাওয়াকে সুরভিত করে তুলেছে। জলের ঝাপটা আসছে জানালা দিয়ে। বহু দূরের থেকে একটা ঝড়ের গর্জ্জন ও গঙ্গার দুরন্ত কল্লোলের মিলিত কলরোল শোনা যাচ্ছে।

*   *   *

মিসেস বোস ঘরে ঢুকে অবাক সুরে বললেন, "তোমার শরীরটা কি ভাল নেই ভাই নির্ম্মলা? ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? আমাদের স্কুলের বার্ষিক অভিভাষণটা দু-ছত্র মাত্র লিখে থেমে গেছ। না ভাই, তোমাকে এবারে বেশওজস্বিনী ভাষায় দু-চার কথা বলতে ইহবে। ইলার ব্যাপার দেখে আমি তো ভয়ে মরছি। সেদিন জ্ঞানদা নন্দীদের অত বড় পার্টিটা গেল, তা আমার কমলা-নীরু-তরু-সুশীকে আমি যেতে দিলুম না। শুনেছিলুম কিনা ঐ সোমেশকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। যাকে নিয়ে ইলা এত বাড়াবাড়ি করছে। বড় চাকরি করলে কি হয়, ছেলেটা অত্যন্ত বেহায়া। মর‍্যাল্‌স্ বলে কোন জিনিসই যেন ওর নেই।" নির্ম্মলা সুপ্তোত্থিতের মত মিসেস বোসের দিকে চেয়ে রইল। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল…সে কি স্বপ্ন দেখছিল। না তা নয়। বোসেদের ড্রইং-রুমে পিতলের ফুলদানিতে একগোছা রজনীগন্ধা কে সাজিয়ে রেখেছে। ঐ গন্ধের ইঙ্গিতে জীবনের বিস্মৃত কোন অধ্যায়ের পাতা আপনা-আপনি উল্টে যাচ্ছে। এই জীবনের অন্তরালে যে আর একটা সুপ্ত জীবন আছে তার ঢাকা খুলে গেছে ক্ষণকালের জন্যে। নির্ম্মলা ভীত হয়ে তখনই আবার পর্দ্দা টেনে দিলে। মুখে একটুখানি মৃদু হাসি টেনে এনে সে বললে, "না লিখব বই কি। এ-সব কাজ নির্জ্জন নইলে হয় না। আজ রাত্রিতেই আমি অভিভাষণটা শেষ ক'রে ফেলব। যাক্ তোমার কাজ শেষ হ'ল?"

মিসেস বোসের হাতে একটা উলের অর্দ্ধসমাপ্ত সোয়েটার ছিল, তিনি তাতে ঘন ঘন কাঁটা চালাতে চালাতে বললেন, "তা এক রকম হ'ল বই কি। এখন ওঁরা এলে হয়। অনাথসদনের ব্যাপারে ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি।" নির্ম্মলা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মেঘটা কেটে গেলেই নিশ্চয় আসবেন। তা ভাই তোমার মত সুগৃহিণী কমই দেখা যায়। কোথায় অনাথসদন, কোথায় স্কুলের সেক্রেটারির কাজ, সমস্তই নিখুঁত ভাবে করে তুলছ, আবার এদিকে ঘরের দিকেও পুরোমাত্রায় দৃষ্টি আছে। সেদিন ঐ যে নন্দীদের পার্টিতে যাও নি খুব ভাল কাজ করেছ। আমার অভিভাষণে আমি তোমার ঐ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব মনে করছি।"

মিসেস বসু গর্ব্বে বিস্ফারিত হয়ে সোয়েটার বুনতে বুনতে বললেন, "তা করতে পার। তাই উনিও সেদিন আহ্লাদ করে বলছিলেন, আর যাই হোক আমার স্ত্রীভাগ্য ভাল মানতেই হবে। সকল সময়েই দেখছি তোমার হাতে একটা কাজ রয়েছে, হয় একটা এমব্রয়ডারি নয় একটা উলের নিটিং। গল্প করবার সময় অবধি অপব্যয় কর না। তবু ঘরের বা বাইরের কোন জিনিসটি চোখ এড়িয়ে যাবার যো নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকল বিষয়ে।" নির্ম্মলা সায় দিয়ে বললে, "খুব ঠিক কথাই বলেছেন। তোমার এই দৃষ্টান্তের কথা আমি মেয়েদের অভিভাষণে লিখব। গল্প করবার সময় অনায়াসে হাতে একটা সেলাই রাখা যায়। সেটুকু সময়ই বা অপব্যয় করবে কেন? আচ্ছা আজ আসি ভাই, কাল সকালেই তোমাকে অভিভাষণটা পাঠিয়ে দেব। পড়ে দেখবে কেমন হয়েছে। যেতে যেতে নির্ম্মলা একবার একটু থমকে দাঁড়াল। রজনীগন্ধার গন্ধ মুহূর্ত্তের জন্য তার মনকে বিমনা করে তুলেছে। মেঘাবৃত স্নিগ্ধ অপরাহ্ণের দীপ্তিহীন আলোর দিকে চেয়ে ক্ষণকালের জন্যে সে মেয়ে-স্কুলের অভিভাষণের কথা ভুলে গেল।

বড়ু চণ্ডীদাসের দেশ ও কাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

"চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে লিখিত আছে, জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচিত পদ শুনে চৈতন্যদেবের পরম আনন্দ হ'ত। এইরূপ অন্যেও লিখেছেন, চণ্ডীদাসের 'গীতামৃত আস্বাদ' করে', চৈতন্যদেব আনন্দিত হ'তেন। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৪৮৬ ফেবরুআরি) চৈতন্যদেব আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। তৎপূর্বে চণ্ডীদাস প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। অন্যের উক্তি হ'তে জানা যায়, চৈতন্যদেবের জন্মের ৮৩ বৎসর পূর্বে চণ্ডীদাস ইহলোক হ'তে অন্তর্হিত হন। দুই তিন কবি লিখেছেন, চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি মিথিলা পর্যন্ত প্রচারিত হ'য়েছিল। বিদ্যাপতি রূপনারায়ণের সঙ্গে এসে চণ্ডীদাসের সহিত মিলেছিলেন। ইহা আশ্চর্যের কথা নয়। তৎকালে মিথিলার সহিত নবদ্বীপের সম্পর্ক ছিল, মিথিলায় লক্ষণাব্দ প্রচলিত ছিল। রূপনারায়ণ শিবসিংহ নামে ২৯৩ লক্ষণাব্দে (১৩২২ শকে) মিথিলার রাজা হ'য়েছিলেন। ইহার পূর্বে দুই কবির মিলন হ'য়েছিল।

"পদকল্পতরু" ও "পদামৃতসমুদ্র" নামক বৈষ্ণব পদসংগ্রহে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদ আছে। ১৩০০ বঙ্গাব্দে নদীয়া মেহেরপুরের রমণীমোহন মল্লিক "চণ্ডীদাসের পদাবলী" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে প্রায় আড়াই শত পদ আছে। ইহার প্রথম পদ—'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'। বীরভূমনিবাসী নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রায় আট শত পদ সংগ্রহ করেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "চণ্ডীদাসের পদাবলী" নামে সে সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে রাসলীলার পদই পাঁচ শত।

বাঁকুড়ানিবাসী শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পুথী খুজিতে খুজিতে বিষ্ণুপুরে এক অজ্ঞাতপূর্ব পুথী আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন," নাম দিয়া সে পুথী প্রকাশ করেন। আর বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ বিচলিত হ'য়ে উঠেন। ইহার ভাষা পুরাতন, ভাব ও বিষয়বস্তু নূতন। মুখবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখ্‌লেন, "এতকাল তবে আমরা যে ভাষার সুরে মুগ্ধ, অভিভূত, অবসন্ন হইতেছিলাম, সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? তবে কি আমাদের চির-পরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু? তাহা হইতে পারে না। আমার মতে কৃষ্ণ-কীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই।"

কৃষ্ণ-কীর্তনে প্রায় চারি শত পদ আছে। পুথীর কয়েকখানি পাতা পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে বোধ হয় প্রায় পাঁচ শত পদ হ'ত।

এই পদসংগ্রহে চণ্ডীদাস

১। প্রত্যেক পদে বাসলীকে বন্দনা করে'ছেন।

২। অনেক পদে আপনাকে বড়ু বলে'ছেন।

৩। অনেক পদে আপনাকে বাসলীর গণভুক্ত করে'ছেন।

এই তিন হ'তে পাচ্ছি, চণ্ডীদাস বাসলীর দেশে থাকতেন। তিনি বাসলীর বড়ু ছিলেন। আর সে বাসলীর গণ (পরিচারক) ছিল। সংস্কৃত 'বটু' শব্দ হ'তে 'বড়ু' শব্দ এসেছে। 'বটু' শব্দের অর্থ দ্বিজবালক। কোন দেবদেবীর বটু বা বড়ু ব'ললে বুঝায়, তিনি পূজার দ্রব্যাদির আয়োজন করেন। "শূন্যপুরাণে" 'পুষ্প-বটু' ধর্মরাজের পূজার জন্য পুষ্পচয়ন ক'রতেন। "ধর্ম-পূজা বিধানে" 'ভোগবড়ু' ধর্মরাজের ভোগ রাঁধতেন। ওড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজের বড়ু আছেন। তাঁরা স্নান-পূজার জল আনেন। এই উপাধি তাঁদের বংশগত।

চণ্ডীদাসের এই তিন বিশেষণ হ'তে জানছি, তাঁর

দেশে বাসলী দেবী বিখ্যাত ছিলেন। কোন রাজা দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে' গণ নিযুক্ত করে'ছিলেন। আর চণ্ডীদাস সেই গণের এক জন ছিলেন।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদ হ'তে জানছি, চণ্ডীদাস এক রাজার আশ্রয়ে ছিলেন। তার প্রমাণ, তিনি হিরক-পরীক্ষা জানতেন। তিনি এক উপমায় লিখেছেন, মাণিক দ্বারা হীরা বিদ্ধ হয় না। সে রাজা পণ্যশুল্ক আদায় ক'রতেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ শুল্কগ্রাহক দানী সেজেছিলেন।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা পশ্চিম-রাঢ়ী। ইহাতে ওড়িয়া শব্দ ও বিহারী বিভক্তি-প্রত্যয়ের সমাবেশ আছে। অগণ্য ড়, ঢ় আছে। শব্দের আদ্য অকার আ হ'য়েছে। এই কয়েকটি লক্ষণ সামন্তভূমে বর্তমান। বাসলী দেবী সামন্তভূমের অধিষ্ঠাত্রী। ছাতনায় তাঁর বিগ্রহ আছে। তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্রে তাঁর নিত্য পূজা হ'চ্ছে। তাঁর গণ আছে। তিনি ছাতনার রাজার প্রতিষ্ঠিত কুলদেবী হ'লেও গ্রাম-দেবী। সর্বসাধারণের পূজা গ্রহণ করেন। দুই শত বৎসর পূর্বে নির্মিত পাষাণ মন্দিরে (এখন ভগ্ন) 'বা-স-লী' এই নাম ক্ষোদিত আছে। ইহাঁর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। মাণিক গাঙ্গুলী তাঁর "ধর্ম্মমঙ্গলে" ইহাঁর বন্দনা করে'ছেন। তাঁর নিবাস ছাতনা হ'তে ৫০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে ছিল।

চণ্ডীদাস 'বিষ্ণুলোক' না লিখে দুই বার 'বিষ্ণুপুর' লিখেছেন। বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ। বিষ্ণুপুর বৈকুণ্ঠ নয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুর নামক নগর না জানলে এই ভ্রমে প'ড়তেন না। বিষ্ণুপুরের রাজার 'ফুলবাড়ী' (পুষ্পোদ্যান) দেখে থাকবেন। তিনি বহু পুষ্প দেখেছিলেন। কোন্ পুষ্প কোন্ ঋতুতে ফুটে, বিলক্ষণ জানতেন।

ছাতনার বাসলীর দেঘরিয়ারা (পূজারী) বলেন, তাঁরা দেবীদাসের বংশ। দেবীদাস চণ্ডীদাসের অগ্রজ ছিলেন। চণ্ডীদাসের বিবাহ হয় নাই। অনেক বয়সে দেবীদাসের বিবাহ হ'য়েছিল। দেবীদাসই বাসলীর পূজা ক'রতেন। কিন্তু তিনি প্রসাদ পেতেন না। তাঁরা আরও বলেন, দেবীদাস হ'তে বর্তমানে তাঁদের ২৩ পুরুষ চ'লছে। (২৫ বৎসরে এক পুরুষ ধরা যেতে পারে। চণ্ডীদাসের অনুমিত কালের সহিত ঐক্য চিন্তনীয়)।

ছাতনায় একখানি ছোট সংস্কৃত পুথী পাওয়া গেছে। বিষয় দৃষ্টে ইহার নাম বাসলী-মাহাত্ম্য রাখা হ'য়েছে। লিপিদৃষ্টে পুথীর বয়স দুই শত বৎসর মনে হয়। কিন্তু ইহার রচনা-শক ১৩৮৭। শ্রাবণ (ইং ১৪৬৬)। লেখকের নাম পদ্মলোচন শর্মা। তিনি লিখেছেন, যাঁর পিতা নিত্য-নিরঞ্জন, মাতা বিদ্ধ্যবাসিনী, অগ্রজ দেবীদাস, গোত্র ভরদ্বাজ (সেই কবি চণ্ডীদাসের জয় হউক)। "জয়তু শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ।" পদ্মলোচন দেবীদাসকে পিতা বলে'ছেন। পিতৃ শব্দে বপ্‌তা, পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদি বুঝায়। বর্তমান দেঘরিয়ারা বলেন, পদ্মলোচন দেবীদাসের পৌত্র ছিলেন। ইহা সম্ভব মনে হয়। কারণ বাসলীর যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হ'য়েছে তা এক পুরুষের মধ্যে লোকসমাজে প্রচারিত হ'ত না। এই পুথী হ'তে জানছি ছাতনার রাজা হামির উত্তর রায় বাসলী-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি চণ্ডীদাসের প্রতিপালক ছিলেন।

ছাতনায় আর একখানি পুথী পাওয়া গেছে। নাম "বাসলী ও চণ্ডীদাস"। এই পুথী "চণ্ডীদাস-চরিত" নামে প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত হ'য়েছে। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার অপূর্ব কাব্য, ১৫৭৫ শকে (ইং ১৬৫৩ সালে) ছাতনার এক কবিরাজ, নাম উদয়সেন, "চণ্ডিদাস-চরিতামৃতম্" নামে এক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখেছিলেন। সে পুথী এখন লুপ্ত। সে পুথী আশ্রয় ক'রে ছাতনার এক রাজার পাত্র, নাম কৃষ্ণপ্রসাদ সেন, ১২০।১২৫ বৎসর পূর্বে 'বঙ্গে অনুবাদ' করেছিলেন। ইহাতেও চণ্ডীদাসের পিতা, মাতা, ভ্রাতার নাম আছে। এই পুথীর মতে চণ্ডীদাস ছাতনায় ১৩২৪ শকের মাঘ মাসে (ইং ১৪০৩, ফেব্রুআরি) অন্তর্হিত হ'য়েছিলেন।

রাজা হামির উত্তর দেবীদাস ও চণ্ডীদাসকে বাসলী পূজায় নিযুক্ত করেছিলেন। চণ্ডীদাসের তিরোধানের প্রায় ৩০০ বৎসর পরে কোন কোন কবি কিংবদন্তী ও কল্পনাবলে চণ্ডীদাসের খণ্ডিত, অসংলগ্ন চরিত লিখেছিলেন। এতকাল আমরা কিছুই বুঝতে পারি নাই। এখন "চণ্ডীদাস-চরিতে" সে সবের উৎপত্তি জানতে পাচ্ছি। ছাতনায় নুহুর বা নাহুরের মাঠ আছে।

নিকটে হাটতলা আছে। হাটতলায় জগহরি আছে। এখন সেখানে হাট বসে না। ছাতনা হ'তে সালতড়া গ্রাম অধিক দূরে নয়। সেখানে এখনও নিত্যা দেবীর আলয় আছে।

কেহ কেহ বলেছেন চণ্ডীদাস বীরভূমে নান্নুরে বাসুলীর আরাধনা করতেন। কিন্তু সেখানে নান্নুর নামে গ্রাম নাই। চণ্ডীদাসের আরাধ্যা বাসলী নাই। নিকটে সালতড়া গ্রাম নাই। আর "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে" বর্ণিত চণ্ডীদাসের বিশেষণের চিহ্ন নাই। ৪০ বৎসর পূর্বে ভূমি কর্ষণ ক'রতে ক'রতে অগ্নিপুরাণোক্ত সরস্বতীর প্রস্তর-মূর্তি আবিষ্কৃত হ'য়েছে। লোকে ভ্রমক্রমে বীণাপাণি চতুর্ভুজা সরস্বতীকে বিশালাক্ষী এবং বিশালাক্ষীকে বাশুলী মনে ক'রছেন। যে গ্রামে এই সরস্বতীর মন্দির নির্মিত হ'য়েছে, সে গ্রামের নাম নান্দুড়। ইহা হ'তে নান্নুর নাম এসে থাকবে। দুই শত বৎসর পূর্বে ও পরে না-হু-র নাম ছিল। বীণাপাণি সরস্বতী প্রতিমাকে বিশালাক্ষী ভ্রম কেন হ'ল? মনে হয়, সেখানে পূর্বে বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিমা ছিল। মূর্তি অপহৃত বা নষ্ট হ'য়েছে, কিন্তু জনশ্রুতি ছিল। নূতন আবিষ্কৃত মূর্তি পেয়ে বিনা বিচারে তিনি বিশালাক্ষী হ'য়েছেন। কিন্তু বা-স-লী ও বি-শা-লা-ক্ষী এক দেবী নহেন। কিন্তু বীরভূমবাসী মনে করেন, বাসলী-ভক্ত বড়ু চণ্ডীদাস সে বিশালাক্ষীর আরাধনা ক'রতেন। দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ কেহ কোন প্রমাণ দেন নাই, আমার যুক্তিপরম্পরা খণ্ডন করেন নাই।

[বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদে ১৩৪৩।১৫চৈত্র দিবসের বক্তৃতার সংক্ষেপ। শ্রীসুধীরকুমার পালিত কর্তৃক অনুলিখিত এবং বক্তা কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত।]

উদ্বৃত্ত

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া যায় তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়োদাদার কবিকল্পনায় এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এই জন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।"

"রেখাক্ষর বর্ণমালা" গ্রন্থেরও অনেক অংশ, এবং আরও অনেক রচনা দ্বিজেন্দ্রনাথ এইরূপ এক বার পড়িয়া বা পড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। নিম্নে মুদ্রিত রচনাগুলির মধ্যে শেষটি "রেখাক্ষর বর্ণমালা"র অংশ বলিয়া বিদিত। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী শ্রীমতী সতী দেবী এই বর্জিত কাব্য-কণিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১

কী গাচ্চ তুমি বসিয়া কোণে
তোমার ও গান কে-ই বা শোনে
আপনাকেই শুনাচ্চি গান।
গাচ্চে গলা শুনচে কান ॥

২

হস্তখানিকে কে রাখে আটকি
রচে যখন গীত টাটকাটাটকি।

৩

অতিবড় বিজ্ঞ যারা—শুনি ঘাড় নাড়ে
অথচ দুধের গন্ধ লেগে আছে হাড়ে ॥
অনুস্বার বিসরগ গাছে তো ফলে না!
হসন্ত উঁআই বিন্দু দেখলে যায় চেনা ॥
হসন্ত হ বিসরগ নাহি তায় ভুল।
অজ্ঞের বিজ্ঞতা-ভান অনর্থের মূল

মঞ্জুদ্বীপ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

রাস্তার ধারেই আমার লিখিবার ঘর। লিখিতে লিখিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন বাহিরের রাস্তায় অবিশ্রাম লোক-চলাচল অন্যমনস্ক হইয়া দেখি। ডান পদ, বাম পদ, ডান পদ, বাম পদ,—অবিরাম পদক্ষেপণ চলিয়াছে। ইহার মাঝে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত অনিয়মে চঞ্চল শিশুর দ্রুত পদধ্বনি সমুদ্রের ঢেউয়ের নিয়মিত উত্থান-পতনের মাঝে সহসা দুরন্ত জোয়ারের আনাগোনার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া চলিয়া যায়। আমি ভাবি, হায় বাগ্‌দেবী বঙ্গসাহিত্যের গড্ডলিকা-প্রবাহের মাঝে ঐ দুরন্ত শিশুর পদধ্বনির সাড়া জাগাইবার শক্তি যদি আমায় দিতে!

ঘরের কোণে লাঠির ঠক্‌ঠকানির আওয়াজে সচকিত হইয়া দেখি—এক বৃদ্ধ, বোধ করি কোন পথভ্রান্ত পথিক হইবে, নির্ব্বিবাদে তিন মাথা এক করিয়া বিচিত্র কৌতূহলের সহিত আমাকে দেখিতেছে। পৃথিবীতে কত শত দ্রষ্টব্য থাকিতে আমার প্রতিই বা সে কেন এমন পক্ষপাত করিল, কত শত গন্তব্য থাকিতে আমার গৃহকোণে কেন আসিয়া জুটিল, বলা শক্ত।

"বাবু, নিক্‌চো বুঝি?"—বৃদ্ধ কহিল।

অল্প গবেষণা করিয়া এই বৃদ্ধবয়সেও সে ঠিক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছে, তাহার ত ভুল হয় নাই। ভাবিলাম, অথচ অল্পবয়সের প্রবল কর্ম্মতৎপরতা সত্ত্বেও গবেষণা করিয়া সকল সময় অভ্রান্ত সত্যে পৌঁছান যায় না।

এমন সময় চটিজুতার ফটফট আওয়াজ করিতে করিতে রাসবিহারীবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। রাসবিহারীবাবু আমার প্রতিবেশী, কাঠ-চালানির কারবার করিয়া ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছেন, মহাধনবান ব্যক্তি। তথাপি মাঝে মাঝে তাঁহার অতিস্বল্প অবসরের কিয়দংশ আমার লিখিবার ঘরে অতিবাহিত করিতে কার্পণ্য করেন না। লেখা-চালানির কারবার অপেক্ষা কাঠ-চালানির কারবারে মুনাফার হার যে সহস্রগুণ বেশী তাহা তিনি বহু বার আমায় বুঝাইয়াছেন, অবশেষে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া উপদেশপ্রদানমার্গে তিনি এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যাহাকে যৌগিক নিষ্ক্রিয়তা বলা চলে। ঘরের কোণে উপবিষ্ট আমার বৃদ্ধ অভ্যাগতটিকে দেখিয়া তিনি সশব্দ বিরক্তির সহিত তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এবং আমায় বলিলেন, "এই সব হতভাগা লোককে তুমি ঘরে ঢোকাও কেমন ক'রে?"

আমি কহিলাম, "ও আপনি এসেছিল।"

রাসবিহারীবাবু কহিলেন, "ও।"

এ-কথার তাৎপর্য্য এই যে, আমার আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি আছে হতভাগা লোকদের যাহার প্রভাব অমান্য করিবার জো নাই। কিন্তু বিশদভাবে এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে আমার মানসিক ক্লেশ হইতে পারে ভাবিয়া তিনি প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"তোমার সে লেখাটা কতদূর এগোল হে?"

কিছুদিন হইতে একটা উপন্যাস সুরু করিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবল হইলে রাসবিহারীবাবুকে পড়িয়া শোনাই। তিনি চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন। বোধ করি উঠতি-পড়তি চালানি-কাঠের বাজার-দরটা মনে মনে হিসাব করিয়া লন, কিন্তু আমি তাঁহার সেই অভিনিবেশের অভিনয়েই সন্তুষ্ট। যখন পড়িয়া যাই আমার প্রণয়ী নায়কের মনোভাবের বিশ্লেষণ, পার্ব্বত্য ঝরণার উপলপ্লাবিনী ফেনধারার পাশে পাশে বনজ্যোৎস্নার সাদায় কালোয় বিজড়িত তরুগুল্মের ডালে ডালে সহসা ফুটিয়া-ওঠা অর্কিডের গুচ্ছ, ফাল্গুনের বহ্নিরাঙা পলাশবনে ধূসর ধরণীর সলজ্জনিবেদিত কিশোরী কন্যার কামনা—তখন মনে মনে স্থির জানি, লোহালক্কড়

এবং ইট-কাঠের সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া রাসবিহারী-বাবুর হৃদয়ে তাহাদের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ। তাই চমকিয়া উঠিলাম যখন রাসবিহারীবাবু বলিলেন, "আমার জীবনেও প্রকাণ্ড একটা রোমান্স এসেছিল হে, তা তুমি বোধ হয় আজ আমায় দেখে বিশ্বাস করতে পারবে না।"

"দেখো গিন্নীকে যেন এ-কথা কোনদিন ব'লে ফেল না।" রাসবিহারীবাবু আমায় সতর্ক করাইয়া দিলেন।

তার পর মেঘমন্দ্রস্বরে তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী বলিয়া চলিলেন। বয়স তখন তাঁহার একুশ কি বাইশ, এবং মঞ্জু ছিল পাশের বাড়ীর মেয়ে। উপক্রমণিকা বাদ দিয়া শেষের দিকটাই বলি। বিবাহের কথাবার্ত্তা একেবারেই যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। মঞ্জু কাঁদিয়াছিল কি? ঠিক জানা নাই। মঞ্জুকে লইয়া পলায়নের প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু দূরদর্শিনী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তার পর?" এই তার পরের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া রাসবিহারীবাবুর নবোদ্ভিন্ন রোমান্স চুরমার হইয়া ভাঙিয়া গেল, মঞ্জুও অপরের গৃহশোভা করিতে সাড়ম্বর শঙ্খধ্বনির সহিত যাত্রা করিল।

রাসবিহারী বাবু কহিলেন, "কতদিন একান্তে বসে ভেবেছি, নির্জ্জন একটি দ্বীপ, চারি দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। সেখানে শুধু আমি আর মঞ্জু।"

তার পর বলিলেন, "গিন্নীকে যেন ব'লো না।"

হায় মানব-জীবনের অবর্ণনীয় এই পরিহাস, তাহা না হইলে কাঠের কারবারী রাসবিহারীরাও ভাবে—সমুদ্র-ঘেরা একটি দ্বীপ, সেখানে শুধু আমি আর মঞ্জু! তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ফেনিল সমুদ্র অসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, এলাচ-লবঙ্গের গন্ধমন্থর বাতাসে হৃদয়-বিনিময়ের বাজনা বাজিতেছে, নিস্তব্ধ নির্জ্জন দ্বীপে দুই মিলনোন্মুখ নরনারী, স্নানসিক্ত কেশ রৌদ্রে মেলিয়া ধরিয়া স্বল্পাবরণা মঞ্জুশ্রী বালুকাসনে বসিয়া আছে, পার্শ্বে রাসবিহারীর রসালাপ চলিতেছে—সখি জাগো, সখি জাগো!

আমাকে হাসিবার অবকাশ না দিয়া রাসবিহারী-বাবু বলিলেন, "প্রচণ্ড প্রয়াসে কাঠের ব্যবসা গড়ে তুললাম। যে সাধনা, যে অধ্যবসায় মঞ্জুকে অর্জ্জন করবার জন্যে সঞ্চয় করেছিলাম, তাকেই শতগুণ ক'রে লাগালাম মুনাফা অর্জ্জন করবার কাজে। ব্যাঙ্কে যখন মোটা মোটা টাকার অঙ্ক জমা হ'তে লাগল, কি সে তৃপ্তি, কি সে আনন্দ। মাঝে মাঝে মনকে যখন দোলা দিয়ে যায় মঞ্জুদ্বীপের স্বপ্ন—"

আমি বলিলাম, "মঞ্জুদ্বীপ? তার মানে?"

"আমার সেই কল্পনার দ্বীপের নাম রেখেছিলাম মঞ্জুদ্বীপ। তার স্বপ্ন যদি কখনও মনে আসে, তখনই মনের চিন্তাকে বাঁক ঘুরিয়ে দিই কারবারের কাষ্ঠগলির দিকে। এতেই আমি পাই সত্যিকারের আনন্দ, সাফল্যের তৃপ্তি। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, তবু পাই।" এই বলিয়া রাসবিহারীবাবু চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন, বোধ করি উঠতি-পড়তি বাজার-দরের আর-এক বার মানসিক আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

বিশ্বাস করিব না কেন, খুবই বিশ্বাস করি। সকল মানুষই অল্পবিস্তর এই কাঠওয়ালা রাসবিহারীবাবু। যাহা চাহিয়াছে তাহা পায় নাই, যাহা পাইয়াছে তাহাতে তৃপ্তি নাই। গভীর মিলনের মধ্যে তাই বিরহের ব্যথা উঁকি মারে, অপরিসীম নৈরাশ্যের মাঝে তাই অপ্রাপণীয়ের বেদনা আরও দুঃসহ হইয়া বাজে। আত্মবিস্মৃতিকে তাই মানুষ প্রাণপণে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, যেন ইহাকে ছাড়িলে তাহার একান্তই চলিবে না, যেন ইহার উপরই তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। তাই আমরা সকলেই রাসবিহারীবাবুর মত কোন-না-কোন কাঠের কারবার ফাঁদিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়াছি। মঞ্জুদ্বীপ,—অনুভব করিলাম রাসবিহারীর মঞ্জুদ্বীপ প্রতি মানুষের মনের কোণে বাসা বাঁধিয়া আছে। আর মঞ্জু? তাহারও কি নিজস্ব কোন দ্বীপ আছে? কে জানে! কৌতূহল হইল, আত্মবিস্মৃতির কোন্ উপায় সে অবলম্বন করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মঞ্জুর খবর জানেন?"

"জানি বই কি," রাসবিহারীবাবু বলিলেন, "মস্ত বড় সংসারের গিন্নী সে, পঞ্চদশ সন্তানের জননী।"

যাক্, আশ্বস্ত হওয়া [illegible] এই ক্ষিতবর্দ্ধনশীলা

বঙ্গললনার বংশধরগণ যদি বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকে তাহা হইলে সুযোগ এবং সময় পাইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করিতে পারিবে। কিন্তু হায় মঞ্জুদ্বীপ!

রাসবিহারীবাবু কখন চলিয়া গিয়াছিলেন, খেয়াল করিয়া দেখি নাই। হঠাৎ আবার লাঠির আওয়াজে সচকিত হইয়া দেখি সেই বৃদ্ধ যেখানেই হউক গিয়াছিল সেখান হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাহার দিকে চাহিলাম। জরা তাহার পৃষ্ঠকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়াছে, বাহিরের দৃষ্টি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, কোন্ দিন বা পরপারের ডাক আসিয়া পৌঁছিবে। তথাপি অন্তরের দৃষ্টি দিয়া এখনও হয়ত ইহার স্বপ্ন দেখার শেষ হয় নাই—যাহাকে পায় নাই, যাহা ঘটিতে পারিত কিন্তু এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষাতেও ঘটে নাই, সেই মরীচিকা ইহাকেও হয়ত হাতছানি দিয়া ডাকিয়া যায়, জীর্ণ তরুর তৃষ্ণার্ত্ত শিকড় শুষ্ক পর্ব্বতের বিদীর্ণ ফাটলে যেমন করিয়া শীর্ণ মুষ্টি দিয়া আপনার নিষ্ফল কামনাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, এও হয়ত তেমনি করিয়া সেই চিরন্তন অথচ সেই চির-অনিত্য মঞ্জুদ্বীপের সন্ধানে ফিরিতেছে।

লোভ

শ্রীকল্পিতা দেবী

১

উপরতলায় আধেক খোলা পর্দাখানার ফাঁকে
একটুখানি গ্রীবার বাঁকন রেখা,
একটুখানি ঠিকরে-পড়া আলো,
রামধনুকের ছবি-আঁকা বাঁকা-নয়ন,
চোখের তারায় ঝাপসা ভাষা,
মনের গোপন গোধূলিতে।

সামনে পথে ঐ কে চলে কাজের তাগিদ নিয়ে
ভাবনা যেন পিছনে তার ছায়ায় মেশা
ফরসা আকাশ —

আঁট ক'রে ডুরে শাড়ির আঁচল বেঁধে কাঁখে
পাড়ার মেয়ে বাজার নিয়ে চলে।
মুদির ছেলের খামখেয়ালী দুষ্টুমিতে
সজাগ করে গলি।
ফিরে দেখি তীক্ষ্ণ লোভে দুয়ার পাশে
ঝুড়ির পরে তাকায় কালো বেড়াল,
ঝক্‌ঝকে তার নজর উঠে জ্বলি।
দূর আকাশে চীল উড়ছে কোন নিশানায়
মেয়েটা ঐ তাড়াতাড়ি ঢাকে ত্রস্তে হাতে
যত্নে কেনা মাছের ঝুড়িটাকে।

২

বরন তাহার উজ্জ্বল শ্যাম
তন্বী মেয়ে —
নরম হাওয়ার দোলন-খাওয়া
ঝুমকো লতা।
রাতজাগা তার ক্লান্তগলার কালাংড়াতে
ঘনিয়ে তোলে শেষ রজনীর আবেশখানি।
ভোরের হাওয়া গলির আকাশটাতে।

উদাস মনে পথিক ছাড়ল দীর্ঘশ্বাস,
থমকে দাঁড়ায় কী ভেবে যে
একটু পরে চলল দ্রুত পায়।

দেখলে চেয়ে ফিরিওয়ালা
সড়ক দিয়ে হাঁকে।
দেখলে চেয়ে জীবনধারার জোয়ার জলে
ছোটোখাটো কতই কী যে ভাসিয়ে আনে।
শুধু এ কি গতির বেগে ক্ষণিক লীলা,
পথের দান কি মনের কোণে
রইবে কিছু বাকি?
তাই দিয়ে কি জ্বালবে শিখা
চিরগোপন প্রাণের আঁধারলোকে,
অন্যমনা অবসরের কোণে
পড়বে কি তার ছায়া?

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও তাঁহার নিকট প্রাপ্তব্য। বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড আট আনা, ডাকমাশুল এক আনা।

কাগজের মূল্য খুব বাড়া সত্ত্বেও এই বৃহৎ অভিধানটি বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া চলিতেছেন। ব্রতপালনে এরূপ নিষ্ঠা বিরল।

অভিধানটির ৬৫তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "বাহনা" এবং শেষ পত্রাঙ্ক ২০৬৮।

ইহা সমুদয় শিক্ষালয়ের বৃহৎ গ্রন্থাগারে এবং সাধারণ ও পারিবারিক বৃহৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক।

আচার্য্যের প্রার্থনা—দ্বিতীয় ভাগ (১৪ই এপ্রিল, ১৮৭৯ হইতে ২২শে নবেম্বর, ১৮৮১ পর্য্যন্ত)। প্রার্থনার স্থান—কমল কুটীর, দক্ষিণেশ্বর ঘাট, চন্দননগর, বুদ্ধগয়া, গয়া, ডুমরাও, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, মঙ্গলবাড়ী, বীডন স্কোয়্যার, বাগবাজার নন্দলাল বসুর বাটী, নৈনীতাল, গঙ্গাটক। শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী কমীটির পাবলিকেশন বিভাগের যুক্ত সম্পাদক শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ, ডাঃ কালিদাস নাগ ও শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৯৫নং কেশব সেন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান ঐ ঠিকানায় "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির", কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক আকারের ৪০০ পৃষ্ঠা।

ভাল কাগজে ভাল ছাপা এই বহিখানির দাম খুব সস্তা রাখা হইয়াছে।

নানা অবস্থায় নানা স্থানে ভক্ত কেশবচন্দ্রের হৃদয় হইতে যে-সব প্রার্থনা উত্থিত হইত, তাহার প্রায় ২৭০টি এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রার্থনাগুলি সাংসারিক কোন সুখ-সুবিধা, সাফল্য, ঐশ্বর্য্যের জন্য নহে। সবগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি, প্রেম, পবিত্রতা, সাধুতা, পুণ্যের নিমিত্ত। ভগবদ্বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের এই পুস্তকটি ভাল লাগিবে। যাঁহাদের মনে সহজে ভক্তি আসে না, হৃদয় যাঁহাদের নীরস, তাঁহারাও ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন ও তৃপ্তি লাভ করিবেন।

কেশবচন্দ্র সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থী ছিলেন না; কিন্তু সাহিত্যিক সাধনায় তিনি মনোনিবেশ করিলে তাঁহার সিদ্ধি কিরূপ হইত, তাহা তাঁহার অন্যান্য রচনার ন্যায় এই প্রার্থনাগুলি হইতেও বুঝা যায়।

ড.

শিশুর শিক্ষা—শামসুন নাহার। ২৭ ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বুলবুল হাউস হইতে আনোয়ারা চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবন্ধ-রচনায় লেখিকা সুপরিচিতা। এই গ্রন্থে তিনি শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শিশুর শাস্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, তাহার খেলাধূলা, সত্যপরায়ণতা ও স্নেহ-মমতা বিষয়ে তাহার শিক্ষা, এবং তাহার নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে লেখিকার বিশদ আলোচনায় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আলোচনা শিশুর মঙ্গলেচ্ছু সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার যোগ্য। শেষের এক অধ্যায়ে লেখিকা শিশুর যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি মনে করেন যে শিশুকে দৃঢ়চরিত্র করিতে হইলে যৌন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে লেখিকা আমাদের দেশে নার্সারি স্কুলের আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন। মোটের উপর শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে লেখিকা সরলভাবে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার ভাষা সরল ও সুপাঠ্য।

সুন্দর সংহিতা—চারুধর্ম্মী রচিত এবং ত্রিপুরা হইতে কামরুল ইসলাম কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

সুদীর্ঘ ও সুখময় জীবন সকলেরই কাম্য এবং স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। এই গ্রন্থে নানা তথ্যের মধ্য দিয়া এই সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা হইয়াছে। নানা প্রমাণের দ্বারা মৃত্যুর মধ্যে অমরতালাভের উপায় ও সম্ভাবনার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকার্য্যে স্রষ্টার উদ্দেশ্য, মানব-চেতনার গতি ও আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্ম্ম, মানব-দুর্গতির কারণ ও মোচনের উপায়, স্রষ্টার আশীর্বাদ লাভের পথ প্রভৃতি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনা স্থানে স্থানে বড় জটিল, তবে তথ্যগুলি সরল ভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

স্তবকুসুমাঞ্জলি—শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, উদ্বোধন আপিস, ১নং মুখার্জি লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকখানি শুধুই স্তবসংগ্রহ নহে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগকে বেদসংগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ তাহাতে বিভিন্ন বেদ হইতে ছয়টি শান্তিবচন, পুরুষসূক্ত, নারদীয় সূক্ত প্রভৃতি নয়টি প্রসিদ্ধ সূক্ত ও প্রধান উপনিষদ্‌সকল হইতে অনেক বিখ্যাত শ্রুতি সংগৃহীত হইয়াছে; দ্বিতীয় ভাগে সাধারণতঃ প্রচলিত অনেক স্তোত্র ব্যতীত মহিম্নস্তোত্র, চণ্ডীর দেবীস্তোত্র, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র প্রভৃতিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য বৈদিক অংশে প্রত্যেক শ্রুতির মূল নির্দ্দেশও করা হইয়াছে এবং সহজে অর্থবোধের জন্য প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয় ব্যতীত বাংলা প্রতিশব্দ এবং অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই পুস্তকখানি সকলশ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

অলকানন্দা—নিশিকান্ত। কালচার পাবলিশার্স, ২৭এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

গ্রন্থকার কবি এবং গীত-রচয়িতারূপে সুপরিচিত। এই কবিতাগুলিতেও কল্পনার এবং ভাবা-নৈপুণ্যের সুন্দর মিলন ঘটিয়াছে। কোথাও চমকপ্রদ নূতনত্ব চোখে পড়িল [illegible] শান্তি সংযত শ্রী হৃদয়ে

তৃপ্তি আনিয়া দিল। ভাবে ও ভাষায় অতিরিক্ত চটুলতায় বা অনাবশ্যক রুক্ষতায় কোনও চিহ্ন নাই। অধিকাংশ কবিতাই কবিতা হিসাবে উপভোগ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজনীতি—মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স' পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা; পৃ. ৸৹+১৮০। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই নবপ্রকাশিত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে তিনটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম কথা—গ্রন্থখানি অনুবাদ; মূল গ্রন্থ ইতালিয়ানে লেখা, লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ কূটনীতিবিদ্ মেকিয়াভেলি। আমাদের দেশে চাণক্যের যে-আসন, পাশ্চাত্য জগতে সে-আসন আরিষ্টটলের,- না প্লেটোর, না মেকিয়াভেলির তাহা বলা দুঃসাধ্য। তবে লোক-সংস্কারে যে স্থান চাণক্যের সেই স্থানই মেকিয়াভেলিরও। কিন্তু লোকচিত্তের সেই সংস্কার অনেকটা অজ্ঞতাপ্রসূত। সত্য সত্যই ইঁহারা মনস্বী, তীক্ষ্ণধী, ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তববাদী। মনে রাখিতে হইবে, রাজনীতিতে অ-বাস্তবের কোনো স্থান কোনো কালে নাই। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতি যুগেই পরিবর্ত্তিত হয়; তাই এক কালের রাজনীতিক বাস্তববাদীর পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, বোধ হয় অন্য যুগের বাস্তববাদী তাহা আর প্রয়োজনীয় মনে করেন না। এই কারণেই কোনো একটি যুগের রাষ্ট্রচিন্তাকে সেই কালের রাষ্ট্র ও তাহার পরিবেশ হইতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া দেখিলে সেই রাষ্ট্রচিন্তার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। মেকিয়াভেলির চিন্তা তৎকালীন ইতালির রাজনৈতিক অবস্থাপ্রসূত, সেই ক্ষেত্রেই প্রয়োগ-উদ্দেশ্যে লরেঞ্জো ডি মেডেচির জন্য প্রণীত। মানব-সভ্যতার ভিত্তি তাহার পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাষ্ট্রেরও রূপ বদলাইতেছে; কিন্তু মোটের উপর এখনও সভ্যতার ভিত্তি ক্ষুদ্র স্বার্থ, দুর্ব্বলের শোষণ,—সমবায় নয়, যৌথ পরিপুষ্টি নয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ এখন বরং রাজ্যে রাজ্যে সামগ্রিক যুদ্ধে রূপ লইয়াছে। অতএব, যে রাষ্ট্রচিন্তা একটু গভীর আজও তাহার মূলসূত্র-গুলি মনে হয় অভ্রান্ত। এই দিক হইতেই প্রধানত মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স' এখনও বিস্ময়কর মনে হইবে—যদিও কালের পরিবর্ত্তনে ইহার অনেক বিষয়ই পুরাতন ঠেকে। এই সব কথা মনে রাখিয়া যে আলোচনা হইবে, সেই আলোচনাই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপ্রযোজ্য। কিন্তু তাহার স্থানাভাব।

গ্রন্থখানি সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা—বাংলায় একখানা চিরপ্রসিদ্ধ ক্লাসিক গ্রন্থের অনুবাদ হইল। অনুবাদের মতএকঘেয়ে কাজে বাঙালী যেরূপ বিমুখ, তাহাতে এই কষ্টসাধ্য প্রয়াসের জন্য লেখক সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বিশেষত, অনুবাদ যেমন সরল তেমনি সবল।

এইখানে তৃতীয় কথাটি আসিয়া গিয়াছে—তাহা এই প্রাঞ্জল অনুবাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনুবাদকের কথা। 'কৈফিয়তে' তাহা তিনি অতি সুন্দররূপে বলিয়াছেন। একদা রাষ্ট্রগুরু অশ্বিনীকুমার দত্তের একটি কথায় লেখক সঙ্কল্প করেন, তিনি তাঁহার মাতৃভাষায় কোনো একখানি বৈদেশিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ করিবেন। প্রথম বারের বন্দীদশায় 'প্রিন্স' বইখানি তাঁহার হাতে পড়ে, তিনি অনুবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু মূলগ্রন্থ শীঘ্রই তাঁহার হস্তচ্যুত হইল—অনুবাদ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। দ্বিতীয় বারের বন্দীদশায় আবার বই জুটিল, তর্জ্জমা সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু মুক্তি পাইলে ষ্টেশন হইতেই পুলিস সেই পাণ্ডুলিপি হস্তগত করে। ইহার প[illegible] আবার অনুবাদ করিলেন তৃতীয় বারের বন্দীদশায়; যৌবনের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইল। এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর পশ্চাতে যে নিষ্ঠা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ মূর্ত্তিটি দেখা যায় তাহা বাঙালীসুলভ নয়; কিন্তু তাহা বাঙালীর পক্ষে নিশ্চয়ই ভরসার কথা।

শ্রীগোপাল হালদার

বিবিধ জ্ঞান—শ্রীবিমল দত্ত, এম. এ. চারু সাহিত্যকুটীর, কলিকাতা। পৃ. ৯৫। মূল্য আট আনা।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় জানিবার জন্য শিশুদের মনে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে এই কৌতূহল যথাযথ নিবৃত্তির উপর তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি যথেষ্ট নির্ভর করে। শিশু-মনে সাধারণতঃ যে সকল প্রশ্ন জাগে, আলোচ্য বইখানিতে সেই সকল প্রশ্ন ও সরল ভাষায় তাহাদের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচন ভালই হইয়াছে। বইখানি পাঠ করিয়া প্রাপ্তবয়স্কেরাও উপকৃত হইবেন।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

গোলকচন্দ্রের আত্মকথা—কাজী দীন মহম্মদ, বি.এ., বি. টি, প্রণীত। ৮২, সদর বকসী লেন, হাওড়া। মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

বাংলাদেশে প্রবন্ধের বই প্রকাশ করিতে সাহসের প্রয়োজন করে। লেখক গল্পের ছলে প্রবন্ধ লেখার দুঃসাহস করিয়াছেন, এবং সেই কঠিন কার্য্যে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

'গোলকচন্দ্র' বইয়ের কল্পিত [illegible]ক; তাহার আত্মকথার অজুহাতে তাহার মুখে আমাদের জীবনের বহু বিষয় লইয়া সমালোচনা বসানো হইয়াছে। দেশের শিক্ষা, নীতি, সাহিত্য, বানান, রাজনীতি, সমাজ, অনেক বস্তু লইয়াই লেখক কথা বলিয়াছেন, এবং সে-কথা কোনখানেই অবান্তর বা চর্বিতচর্বণ নয়। লেখক চক্ষু চাহিয়া দেখিতে জানেন, এবং কি দেখিলেন তাহা শুনিবার মত করিয়া বলিতেও জানেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত ও মতামত হয়তো সর্বত্র পাঠকের সহিত মিলিবে না, তথাপি রসগ্রাহী পাঠক বইখানিতে পড়িবার মত এবং মনে রাখিবার মত বস্তুর সন্ধান পাইবেন।

লেখকের প্রয়াসকে সহজ করিয়া তুলিয়াছে তাঁহার অপরূপ ভাষা। লঘু কৌতুক ও পরিহাসের সুরে আগাগোড়া বইখানি লেখা; অথচ সে কৌতুক বক্তব্যকে সরসই করিয়া তুলিয়াছে, কোথাও লঘু করে নাই। তাঁহার দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ ও দূরপ্রসারী, ব্যঙ্গও তেমনি শাণিত; এবং ব্যঙ্গের সহিত যেটুকু দরদ ও করুণগম্ভীর রস তিনি মিশাইয়াছেন তাহাও ঠিক সমপরিমাণেই মধুর।

বইখানা ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই ত্রুটিও ধরিতেছি—বইয়ের প্রথম দিকে মুসলমানী শব্দের কিছু অধিক প্রয়োগ করা হইয়াছে। নায়ক গোলকচন্দ্র হিন্দু ব্রাহ্মণ, তাহার মুখে কথাগুলা স্বাভাবিক শোনায় না। মুসলমান নায়কের মুখে সংস্কৃতবহুল ভাষা দিলেও একই ত্রুটি ঘটিত। বইয়ের দ্বিতীয়ার্ধে এই দোষ কম, ভাষাও তাই সুন্দরতর হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করিয়া দিলে বইখানার গৌরব আরও বাড়িবে।

কলম হাতে লইয়া কথা বাংলাদেশে অনেকেই বলেন, এবং শুনিবার মত নূতন কথা অনেকেই বলেন না। এই বইখানাতে নূতন কথা আছে।

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

জওহরলালের চিঠি বা পৃথিবীর ইতিহাস—অনুবাদক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীসুনীলচন্দ্র দাশগুপ্ত, পি. ১৬৪ বি, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। বহুচিত্রসংবলিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

এখানি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কর্তৃক তাঁহার কন্যাকে লিখিত "Letters from a father to his daughter" গ্রন্থের অনুবাদ। মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন করিয়া প্রশস্তি লিখিবার কিছু নাই, তবে বাংলা-দেশে আজকাল বালকবালিকাদের জন্য সাহিত্য যাঁহারা রচনা করেন তাঁহাদের স্মরণার্থ একটি কথা বলা যাইতে পারে। লেখকের দশ বৎসরের কন্যা সম্ভবতঃ তাঁহার চিঠিগুলির সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই, তৎসত্ত্বেও একান্তভাবে বালিকার বোধগম্য করিবার জন্য বক্তব্য বিষয়ের হানি করিয়া উহাকে একান্ত লঘু ও তরল করিয়া পরিবেষণের প্রয়াস করেন নাই; আমরা সাধারণতঃ ইহার বিপরীত নিয়মেই অভ্যস্ত। সকল বিষয় অত্যন্ত লঘুপাক করিয়া বালকবালিকাদের ধরিলে তাহাদের চিত্তবৃত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না, কোন কালেই তাহাদের মনের গঠন দৃঢ় হয় না।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "যে-সব ছেলেমেয়েরা এই চিঠিগুলি পড়বে তারা হয়তো ধীরে ধীরে চিন্তা করতে আরম্ভ করবে যে, আমাদের এই পৃথিবী কতকগুলি বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ একটা পরিবার।" নকল অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের বইয়ের পরিবর্ত্তে এই বইখানি ছেলেমেয়েদের হাতে দিলে তাহাদের মঙ্গল সাধন করা হইবে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শ্রীশ্রীগীতামৃত লহরী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ. কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীঅজিতকুমার জ্যোতিঃশেখর, ৪এ, সাহানগর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে গীতার সার সঙ্কলন করিয়াছেন।

এই পুস্তকে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় বেশ সুন্দর ভাবে শৃঙ্খলিত ও বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের সাহায্যে অতি অল্প পরিশ্রমেই গীতা-প্রতিপাদ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হৃদগত হয়।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

বেদান্ত সোপান—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহরায় স্মায়বাগীশ প্রণীত। ডিমাই ৮ পাতার আকার, ৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা। প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থকারের নিকট, পি, ২০৫, ল্যান্সডাউন রোড, এক্সটেন্‌শন্ কলিকাতা।

গ্রন্থকার, তর্কবিজ্ঞান, ধর্ম্মযোগ, গীতাসোপান, ইংরাজীতে গীতার ভূমিকা, দর্শন সোপান প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থরচনার দ্বারা সুধীসমাজে সুপরিচিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম "বেদান্তসোপান" ইহার বহিরাবরণে লিখিত হইলেও, ইহার মুখপত্রে ইহার নাম 'বেদান্ত সোপান ও অদ্বৈতবাদ" লিখিত হইয়াছে, এবং ইহার পরিচয়-মুখে বলা হইয়াছে—বৈদান্তিক এবং পাশ্চাত্য অদ্বৈত এবং দ্বৈত মতসকলের তুলনামূলক আলোচনা।

ইহাতে সাতটি প্রকরণ এবং একটি পরিশিষ্ট আছে, আর তন্মধ্যে ২৯টি প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গে বেদান্তের অনেক প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা আছে তন্মধ্যে কতিপয় যথা—বেদান্ত কি। বেদান্তের ভাষ্য। দুইটি বস্তুর মধ্যে কি কি সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। বৈদান্তিক মত সকলের কোন মতে ব্রহ্মের সহিত জড় ও জীবজগতের কোন্ সম্বন্ধ। বিশিষ্টাদ্বৈত, ভেদাভেদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের স্বরূপ। দর্শন এবং ধর্ম্মের দিক হইতে দার্শনিক মতসকলের বিচার। পাঁচটি বৈদান্তিক দার্শনিক মতের মধ্যে কোন্‌টি ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা। অন্য কোনও ব্যাখ্যা সম্ভব কি না। বৈদান্তিক অদ্বৈত মতসকলের সহিত পাশ্চাত্য অদ্বৈত মতসকলের তুলনামূলক আলোচনা। গ্রীক দার্শনিক প্লাটিনাসের মতে ভারতীয় বেদান্ত সাংখ্য এবং পাতঞ্জলদর্শনের প্রভাব। কপিল এবং প্লেটোর মতের তুলনা। দর্শন এবং বিজ্ঞানের মিলনভূমি। তত্ত্বের সংখ্যাভেদে দার্শনিক মতসকলের সংক্ষেপে শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদি।

গ্রন্থের এই প্রসঙ্গগুলি দেখিলেই বুঝা যায় গ্রন্থখানি কতদূর উপযোগী হইয়াছে। যাঁহারা বেদান্তের চর্চা করেন, তাঁহাদের চিন্তার পক্ষে ইহা যে বিশেষ সহায়তা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আলোচনার মধ্যে চিন্তাশীলতা, অভিজ্ঞতা, বহুদর্শন, ও সূক্ষ্মদর্শিতার যেন মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইয়াছে। দার্শনিক অতি জটিল বিষয় অতি সরল ভাষায় প্রকাশ এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব। যাঁহারা পাশ্চাত্য চিন্তায় অভ্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ তাঁহাদের চিন্তারাজ্যের নানাদিক্ উন্মুক্ত করিয়া দিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও এই গ্রন্থের কতিপয় বিষয় চিন্তনীয়। ইহা আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম। দ্বৈত অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনেক স্থল আমাদের সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। ইহারা সকলই সত্য এবং সকলই মিথ্যা (৪২ পৃ.) এরূপ কথা এরূপ প্রাচীন গ্রন্থকারের পক্ষে শোভন বলিয়া বোধ হইল না। "ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অনুভূতিলাভ করিয়া তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এই সকল বাক্যই শ্রুতি" (৩৫ পৃ.), শ্রুতিসকলের প্রত্যেকটিই সত্য অথচ কোনটিই একমাত্র সত্য নহে (৩৭ পৃ.), "জীব ও ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে যে পাঁচটি মত আছে, এক অর্থে তাহাদিগের প্রত্যেকটিই সত্য, এবং এক অর্থে প্রত্যেকটিই মিথ্যা" (৩৭ পৃ.), এই সকল সম্বন্ধের কোনটিই মিথ্যা নহে, সব কয়টিই সত্য অথচ কোনোটিই একমাত্র সত্য নহে (৩৮ পৃঃ)। "জীব ও ব্রহ্ম সম্যক রূপে কিরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব" (৪৩ পৃঃ)। এইরূপ বহু কথা এই গ্রন্থে দৃষ্ট হইল। এই সব কথা কি করিয়া সঙ্গত হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয় যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মূল বেদান্তগ্রন্থের আলোচনা করেন, তাঁহারা এই জাতীয় কথা শুনিয়া ইহাদের অযৌক্তিকতা নির্ণয় করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত পুষ্ট করিবারই অবকাশ পাইবেন।

পাশ্চাত্য দর্শনের সমালোচনামধ্যে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ অতি দক্ষতার সহিত করা হইয়াছে। এই দিক দিয়া এই গ্রন্থের উপযোগিতা যত অধিক হইয়াছে, প্রাচ্য দর্শনের দিক দিয়া সেরূপ হইলে ইহার উপযোগিতা আরও অধিক হইত। ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্য ব্যাসসম্মত বা শ্রুতিসম্মত ইহার নির্ণয় প্রয়াস একেবারেই সফল হয় নাই। তিনি যেমন ভাষ্যকারগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার মত যে সূত্রের একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা ইহা দেখাইতে যাইয়া, যে পরিমাণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, যদি সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া প্রকৃত সত্য নিরূপণের জন্য সেই পরিমাণ প্রতিভার ব্যবহার করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন" (৪৩ পৃ.) তদ্রূপ গ্রন্থকার সম্বন্ধেই কি এই কথা বলা যায় না? যাহা হউক, এই জাতীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের আলোচনা বাঞ্ছনীয়, যেহেতু এতদ্দ্বারা চিন্তাশীলতা সমাজে বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

দীনবন্ধু এণ্ডরূজ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

একটি গণ্ডে চাপড় মারিলে
অপর গণ্ড ফিরায়ে দিও—
সৌম্য প্রেমিক যীশুর এ বাণী
কোন্ দেশে আজ হয়েছে প্রিয়?
আজিকে দেখি যে সারা ইউরোপ
পরের চাপড় পাবার আগে
নিজের চাপড় মুষ্টি উঁচায়ে
তেঁড়ে আসে আর সরোষে লাগে।
শক্তি-মদিরামত্ত সে-দেশে
যীশু পেয়েছেন লজ্জা ঘৃণা;
তাঁহারি ভক্ত যে-জন সেও যে
লভিয়াছে ক্ষোভ, তৃপ্তি বিনা।

দীনের বন্ধু প্রেমী এণ্ডরুজ
তেয়াগি য়ুরোপ-দৈত্যলীলা,
এলেন ভারত-জননীর ক্রোড়ে
ক্ষমা-দয়া-ত্যাগ-ধৈর্য্য-শীলা।
বুদ্ধের আর চৈতন্যের
প্রেম-বাণী-পূতা ভারতভূমি
যীশুর প্রেমের প্রতীক মানিয়া
'এণ্ডরুজ-শিশু চরণ চুমি'।

ইংলণ্ডের পুত্র সে হ'ল
ভারত-পুত্র প্রেমের বলে;
কোটি অনাদৃতে কোল দিল সেই
স্মরি যীশু-প্রেম চিত্ততলে।

দীনের বন্ধু, দীন বৈষ্ণব,
তোমারে আমরা প্রণাম করি;
বুদ্ধের সাথে যীশুরে যে মোরা
রেখেছি নিয়ত চিত্ত ভরি'।
বলের মদিরা ভারত-চিত্তে
করে নি বিমুখ বুদ্ধ 'পরে;
তাই তুমি পেলে প্রেমের আসন,
দিলে সে আসন চিত্ত-ঘরে।
সৌম্য প্রেমিক, আজি তোমা বিনে
কাঁদিছে পীড়িত, আর্ত্ত, দীন;
বন্যাক্লিষ্ট কাঁদে শোন তুমি
কাঁদে কোটি কোটি অন্নহীন।
উচ্চ উদার হৃদয় তোমার
ছাপায়ে আপন ক্ষুদ্র দেশ,
ছড়ায়ে পড়েছে সর্বমানবে
বিপুল ধরায়,—নাহি যে শেষ!
বারিধিসমান বিশাল হৃদয়
আজিকে ছড়াল বিশ্বময়;
ক্ষুদ্র মানব এ কি এ বিরাট্।
বিস্ময়ে গাহি তাহারি জয়।



গান

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্নীবিয়োগে রচিত

বসন্তের কাল গেছে কেন ফুল ফুটিবে আর
ভানু গেছে অস্তাচলে হবে না কি অন্ধকার,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার বীণা কি বাজিবে আর
হাসিটুকু নিয়ে গেছে রেখে গেছে হাহাকার !
ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, দেহে কি আর কেহ আছে
কাহারে, কেমন আছ, শুধাইছ বারে বার।

বঙ্গলক্ষ্মী]

পয়লা এপ্রেল

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌত্রী নলিনী দেবীর পয়লা এপ্রিলের পত্রের উত্তরে

ফুলের বাহারে যার
মন নাহি টলে আর
বৃথা কেন গায়ে তাঁর
ফুল ছুঁড়ে মারো ;
কবিতার বনিতার
দ্বিজ নাহি ধারে ধার
পেটটিই জানে সার
মোণ্ডা যাহে পায় লয়
গোণ্ডা দশ-বারো।

বঙ্গলক্ষ্মী]

গোধূলি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রং ফেরে গুঞ্জন-গীতি।
ফাগুনের চম্পক-পরাগে,
সেই রং জাগে,
ঘুমভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রং লাগে,
সেই রং পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমা তিথি।

এই ছবি ভৈরবী আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি।

জয়শ্রী]

মাছিতত্ত্ব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে
আজন্ম ধ্যানী সে।
সাধনের মন্ত্র তাহার
ভন্ ভন্ ভন্ ভন্কার।
সংসারে দুই পাখা নিয়ে দুই পক্ষ
দক্ষিণ বাম আর ভক্ষ্য অভক্ষ্য
কাঁপাতে কাঁপাতে পাখা সূক্ষ্ম অদৃশ্য
দ্বৈতবিহীন হয় বিশ্ব।
সুগন্ধ পচাগন্ধের
ভালোমন্দের
ঘুচে যায় ভেদবোধ বন্ধন,
এক হয় পঙ্ক ও চন্দন।

অঘোরপন্থ সে যে শবাসন-সাধনায়
ইঁদুর কুকুর হোক কিছুতেই বাধা নাই,—
ব'সে রয় স্তব্ধ,
মৌনী সে একমনা নাহি করে শব্দ।
ইড়া পিঙ্গলা বেয়ে অদৃশ্য দীপ্তি
ব্রহ্মরন্ধ্রে বহে তৃপ্তি।
লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব,
ভুলে যায় মাছিত্ব।

মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ ;
মানুষের বক্ষ বা পৃষ্ঠ
কিংবা তাহার নাসিকান্ত
তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত,
বার বার তাড়া খায়, গাল খায়, তবুও
হার না মানিতে চায় কভুও।
পৃথক করে না কভু ইষ্ট অনিষ্ট,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ,
সমবুদ্ধিতে দেখে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট।
সংকোচহীন তার বিজ্ঞানী ধাত,
পক্ষে বহন করে অপক্ষপাত।
এদের ভাষায় নেই "ছি ছি,"
শৌখিন রুচি নিয়ে খুঁতখুঁত নেই মিছিমিছি।

অকারণ সন্ধানে মন তার গিয়াছে,
কেবলি ঘুরিয়া দেখে, কোথায় যে কী আছে!
বিশ্রামী বলদের পিঠে করে মনোযোগ
রসের রহস্যের যদি পায় কোনো যোগ,
ল্যাজের ঝাপট লাগে পলকেই পলকেই,
বাধাহীন সাধনার ফল পায় বলো কে-ই!
চারিদিকে মানবের বিষম অহংকার,
তারি মাঝে থেকে মনে লেশ নেই শঙ্কার।
আকাশ-বিহারী তার গতি নৈপুণ্যেই
সকল চপেটাঘাত উড়ে যায় শূন্যেই।
এই তার বিজ্ঞানী কৌশল,
স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।
মানুষের মারণের জন্য
ক্ষিপ্রগুড়ায়ে যায় নির্ভয় পক্ষ।

নাই লাজ, নাই ঘৃণা, নাই ভয়,
কর্দমে নর্দমা-বিহারীর জয়।
ভন্ ভন্ ভন্কার
আকাশেতে ওঠে তার ধ্বনি জয়ডংকার।

মানবশিশুরে বলি, দেখো দৃষ্টান্ত
বারবার তাড়া খেয়ো, নাহি হোয়ো ক্ষান্ত।
অদৃষ্ট মার দেয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ
কখন অকস্মাৎ,
তবু মনে রেখো নির্বন্ধ
সুযোগের পেলে নামগন্ধ
চ'ড়ে বোসো অপরের নিরুপায় পৃষ্ঠ,
কোরো তারে বিষম অতিষ্ঠ।
সার্থক হ'তে চাও জীবনে
কী শহরে, কী বনে,
পাঠ লহ প্রয়োজন-সিদ্ধের
বিরক্ত করবার অদম্য বিদ্যের,
নিত্য কানের কাছে ভন্ভন্ ভন্ভন্
লুকের অপ্রতিহত অবলম্বন।

শনিবারের চিঠি]

কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

...যে সকল মনস্বী নিজ দেহ পাত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রবাল-দ্বীপ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন অগ্রণী।...যখন আমরা স্মরণ করি যে কালীপ্রসন্নের আয়ুষ্কাল মাত্র ত্রিংশ বর্ষ মাত্র, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৮৭০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।...

তাঁহার জীবনে দুইটি বিষয়ের অত্যুগ্র প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়—একটি তাঁহার স্বদেশানুরাগ, আর একটি তাঁহার বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি।... জেমস্ লং সাহেব যখন জজ সার মর্ড্যান্ট ওয়েলসের বিচারে অর্থদণ্ডে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ অযাচিত ভাবে সহস্র মুদ্রা দিয়া তাঁহার দুঃখ লাঘব করিয়াছিলেন। এই লং সাহেব কিছুদিন পরে স্বদেশ যাত্রা করেন, তখন কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র মারফতে

তাঁহাকে এক বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সংস্কারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভার নিকট যে আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিন সহস্র ভদ্রলোকের স্বাক্ষর যোগাড় করিয়াছিলেন।...

তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে নিজের গায়ের বহুমূল্য শাল দান করিতেও বিরত হন নাই, আবার ল্যাঙ্কাশায়ার দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে এক সহস্র মুদ্রা প্রদানেও কাতর হন নাই। জজ ওয়েল্‌স্ বাঙ্গালী-চরিত্রের নিন্দা করিতেন বলিয়া কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, আবার যখন ঐ জজ সাহেব স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া এতদ্দেশবাসীর অনুকূল হইলেন, তখন তাঁহার বিদায়-সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে লর্ড ক্যানিং যখন দেশের লোককে অযথা অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন কালীপ্রসন্নের হৃদয় গলিয়াছিল; তিনি লর্ড ক্যানিংএর মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাবে হাজার টাকা দিয়াছিলেন। বাংলার নীলকরপ্রপীড়িত প্রজাও তাঁহার যেমন সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল, সিপাহী-যুদ্ধের শেষে অত্যাচার-উৎপীড়িত ভারতবাসীর জন্যও তিনি তেমন ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য হইতে শুধু যে তাঁহার স্বদেশহিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয়েরও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।...

বাংলা ভাষার অগ্রগতি যাহাতে ক্ষিপ্র হয়, তাহার জন্যও কালীপ্রসন্ন যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনিই ছিলেন প্রাণস্বরূপ। তাঁহারই চেষ্টায় 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রচারিত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সম্পাদনভার কালীপ্রসন্ন গ্রহণ করিয়া ইহাকে কিছুকাল জীবিত রাখিয়াছিলেন।...

'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক সংবাদপত্রও কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকেও কালীপ্রসন্ন সাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন 'সংবাদ প্রভাকরে'র বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনে নানাবিধ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ইনি বঙ্গভাষার উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপনেও কালীপ্রসন্ন যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না।...

সাহিত্য সৃষ্টির নানা আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি তৎকালীন কলিকাতা সমাজের যে পরিহাসোচ্ছল চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অনেক বিষয়ে অপূর্ব।...এই গ্রন্থে লেখক যে স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহার ভূমিকাও সেইরূপ। সমস্ত গতানুগতিকতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি অমিত্রাক্ষর পদ্যে ভূমিকা লিখিয়াছেন।...মাইকেলকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহাতে কালীপ্রসন্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং মাইকেল যে এই মেঘনাদবধ রচনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবেন, তাহাও ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন।

অলকা]

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবেলা ঘোষ

যে সুর বাজালে জগত মাঝারে, ছন্দের তার গাঁথিয়া;
ঝঙ্কারে তার বিশাল বিশ্ব আছে বিস্ময়ে চাহিয়া।
বিশ্বদেবের চরণ-কমলে গীত-অঞ্জলি ঢালিয়া;
হইয়াছ তুমি বিশ্বপূজিত বিজয়মাল্য লভিয়া।

বিশ্বে বাঁধিলে প্রেম-বন্ধনে গড়িয়া বিশ্বভারতী,
মহামানবের শান্তির দূত করি গো তোমায় প্রণতি।
ওগো বাংলার বাউলের কবি, নমি গো তোমায় নমি,
প্রেমের সুরেতে বাঁধিয়া জগতে অমর হয়েছ তুমি।

গান

অতুলপ্রসাদ সেন

বেহাগ মিশ্র—দাদরা

তুমি গাও তুমি গাও (গো)
গাহ মম জীবনে বসি
বেদনে বাঁধা জীবন-বীণা
ঝঙ্কারি বাজাও। তুমি গাও

তোমার পানে চাহিয়া
চলিব তরী বাহিয়া
অভয় গান গাহি
ভয়-ভাবনা ভুলাও। তুমি গাও

দগ্ধ যবে চিত্ত হবে
এ মরু-সংসারে
স্নিগ্ধ করো মধুর সুরধারে।

তোমার যে সুরে ছন্দে
পাখীরা গাহে আনন্দে
শিষ্য করি আমারে
সে সঙ্গীত শিখাও। তুমি গাও

কথা ও সুর—অতুলপ্রসাদ সেন স্বরলিপি—শ্রীহরিপদ রায়

নধা না I র্সা া া । া নধা না I ধপা া া । পমা গরা গা
তুও মি গা ও ০ ০ তুও মি গা ও ০ গোও ০০ ০

I গা া মা । া ধা পা I মা গা গরা । সন্া সা া I সা সা সা । া গা মা
গা ০ হ ০ ম ম জী ব নেও বও সি ০ বে দ নে ০ বা ধা

I পা পা পা । না র্সা া I র্সা র্গা র্রা । র্সা া র্সা I র্সনা ধনা ধপা । া নধা না
জী ব ন বী ণা ০ ঝ ০ ঙ্কা রি ০ বা জাও ০০ ও ০ তুও মি

I র্সা া া । া া া II
গা ও ০ ০ ০ ০

[গা মা পধা নর্সা না না]
II পা পা পা । না না না I র্সা র্সা র্সর্সা । নর্সা া া I র্সা র্সা সা
তো মা র ০ পা নে চা হি য়া০০ ০০ ০ ০ চ লি ব

। া না না I পা পা পমা । গরা গা া I র্সা র্সর্গা র্গা । া র্গা র্মা I র্মর্গা র্রা র্সা
০ ত রী বা হি য়া০ ০০ ০ ০ অ ভ য় ০ গা ন গা ০ হি

। া র্সা না I র্সা র্গা র্রা । র্সা া র্সা I র্সনা ধনা ধপা । া নধা না I র্সা া া
০ ভ য় ভা ০ ব না ০ ভু লা০ ০০ ও ০ তু০ মি গা ও ০

। া া া II
০ ০ ০

II সা পা পা । া পা পা I পা া পা । া পা পা I পা পা পধা
দ গ্ ধ ০ য বে চি ০ ত্ত ০ হ বে এ ম রু০

। পধা পা া I পমগা রগা গা । া া া I সা মা মা । া মা মা I মা মা মা
০০ সং ০ সা০০ ০০ রে ০ ০ ০ স্নি গ্ ধ ০ ক রো ম ধু র

। পা পা পমা I গা া রা । সা া া II
০ সু র ধা ০ ০ রে ০ ০

[গা মা গমা পধা নর্সা না]
II পা পা না । ধা না না I না র্সা র্সা । া র্সর্রা র্সা নর্সা
তো মা র০ ০ ০ যে সু রে ছ ০ ন্দে০০ ০০

I র্সা র্সা র্সা । না না না I পা পমা গরা । গা া া I র্সা র্গা র্গা । া র্গা র্মা
পা খী রা ০ গা হে আ ন০ ০০ ন্দে ০ ০ শি ০ ষ্য ০ ক রি

I র্গা র্রা র্সা । না া না I র্সা র্গা র্রা । র্সা া র্সা I র্সনা ধনা ধপা । া নধা না
আ ০ মা রে ০ সে স ০ ঙ্গী ত ০ শি খা০ ০০ ও ০ তু মি

I র্সা া া । া া া II II
গা ও ০ ০ ০ ০

বাঁকুড়ায় ছাত্রদের উদ্দেশে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার শরীর অসুস্থ। ইচ্ছা ছিল তোমাদের কাছে কিছু বলব না, কিন্তু পরে ভাবলাম, হার তোমাদের কাছে স্বীকার করব না কিছুতেই। তাই শরীরের অসুস্থতাকে উপেক্ষা করতে প্রবৃত্ত হলুম।

প্রথমেই একটা কথা বলব। এই যে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি গাওয়া হ'ল এর প্রত্যেকটি লাইন প্রত্যেকটি শব্দ অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত হ'ল।* আজ তোমরা এই জাতীয় সঙ্গীতের মূল বাহন যে সংস্কৃত ভাষা তার অবমাননা করেছ। বন্দনার কী এই রীতি? আমাদের পরিবারে আর্য পিতামহদের বাণীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় এমন অশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে হয় নি। আমার পিতার নাম শুনেছ। কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে তিনি কাশী পাঠিয়েছিলেন সেখানকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে বৈদিক ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখে আসবার জন্য। বাল্যকালে উপনিষদের শ্লোক বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করবার শিক্ষা আমাদের বিশেষ যত্নে দেওয়া হয়েছে। তাই তোমাদের মুখে এই সংস্কৃত উচ্চারণের বিকৃতিতে আমার কানে কঠোর আঘাত দিয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশেই সংস্কৃত ভাষার এ-রকম অনার্য উচ্চারণ শোনা যায়। এ-রকম ভাবে সংস্কৃত ভাষার কদাচরণ অন্য কোন প্রদেশে দেখি নি। বিশেষত স্তুতিমন্ত্রে এ-রকম বাণীবিকারকে অপরাধ ব'লেই গণ্য করা উচিত।

কেবল উচ্চারণের নয় আচরণের উচ্ছৃঙ্খলতা সেও কম অপরাধ নয়। তাতে সমাজকে শ্রীভ্রষ্ট ক'রে দেয়। আজকাল তরুণদের মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত ভাবে এই সামাজিক অবৈধতা উত্তরোত্তর উদ্দাম হয়ে উঠেছে, এ যে সকল সভ্যদেশের ভদ্রবিধির বিরুদ্ধে। যে-সকল বিধিবিধান কর্মের মধ্যে কেবল শোভনতা নয় সার্থকতা আনে যখন-তখন তাকে অন্যায়রূপে অমান্য করার স্পর্দ্ধা কুশ্রীভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। যে-সীমার মধ্যে মানুষ বাল্যকাল থেকে আত্মসংযম করতে শিক্ষালাভ করে সেই সীমাকে ধূলিসাৎ ক'রে ছাত্রেরা নিজের চরিত্রে ভ্রষ্টতা আনছে। যে-বিরোধের মধ্যে নৈতিক বলিষ্ঠতা আছে, এ তা নয়; এতে দুর্বলতারই পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, একে বলে আবদার, নারীজাতির হাতে লালিত প্রশ্রয়প্রাপ্ত চিত্তবৃত্তির এ স্বৈরাচার। কোনো সংগত নিয়মের মর্যাদা মানব না এ-কথা যারা ছেলেবেলা থেকে বলতে অভ্যস্ত হ'ল তারা ভবিষ্যতে দেশকে চালনা করবার দায়িত্বশক্তি হারাচ্ছে। যে-সব ছেলেরা সকলের চেয়ে দুর্বল প্রকৃতির, সকলের চেয়ে অসংগত আদুরেগিরি তাদেরই। এ-কথা তারা ভুলে যায় যে, যারা অকুণ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায় তারা নিয়ম গড়তে কোনোদিন পারে না। এই ভাঙন-ধরানো মন সাংঘাতিক ভাবে বিস্তার লাভ করছে, এদের হাতে কীর্তি গঠিত হচ্ছে না, কীর্তি ভাঙছে। দলাদলিতে ক্রমাগতই ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে দেশের আশ্রয়সৌধকে। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা এই সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিপ্রীতির মূলে আঘাত করেছেন তাঁরা এটা করেছেন স্বাজাত্য-কর্তব্যের দোহাই দিয়ে। সভা-ভাঙা দল-ভাঙা ইস্কুল-ভাঙা মাথা-ভাঙা সমস্ত এর অন্তর্ভুক্ত ক'রে মারণ-তাণ্ডবের পিছনে দাঁড়িয়ে বাহবা দিয়েছেন। যে-বয়সে কোনো একটা গড়ে তোলবার শক্তি বা অভিজ্ঞতা থাকে না সেই বয়সে তাঁরা নিজের দলের সুযোগ ঘটাবার জন্যে এদের কানে ভাঙার মাহাত্ম্য ঘোষণা ক'রে নেশা জমিয়েছেন। দেশকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবার কাজে ছেলেদের উৎসাহ জাগিয়েছেন,—

---

* প্রবাসীর সম্পাদকের বাড়ী বাঁকুড়ায়। সেই জন্য তাঁহাকে বলিতে হইতেছে যে, এই গানটি যে ভাবে গাওয়া হইয়াছিল, তাহা বাঁকুড়ার বৈশিষ্ট্য নহে। বহুবিজ্ঞাপিত একটি গ্রামোফোন রেকর্ড ইহার জন্য দায়ী। কবির নিন্দা বিশেষ করিয়া তাহারই প্রাপ্য।—প্রবাসীর সম্পাদক

এই কাজটা সব চেয়ে সহজ কাজ। বাংলা দেশের পলিটিক্সের ক্ষেত্র আরম্ভ থেকেই আত্মবিচ্ছেদের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিকীর্ণ এই। ক্ষুধার্ত তৃষার্ত রোগজীর্ণ শিক্ষা-বঞ্চিত নিরানন্দ নিঃসম্বল দেশের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো সৃষ্টিসাধিনী কর্তব্যবিধি পাওয়া গেল না—কেবল কলহ।

এই দুয়ো দেবার আনন্দ এতকাল বাংলা দেশে কন্যা-কর্তার খরচে বরকর্তারা নির্লজ্জভাবে সম্ভোগ করে এসেছে। এখন সেটা চেপে বসেছে অপমানিত ইস্কুল মাষ্টারদের উপরে, প্রতিকূল রাষ্ট্রসম্প্রদায়ের উপর, এর মধ্যে আছে স্ত্রৈণ কলহবুদ্ধি, নেই পৌরুষ। এই চরিত্রের মূলগত ভাঙনবিলাসী ছেলেমানুষীর অন্ধ মত্ততায় বাংলা দেশের কর্ম্মক্ষেত্র নিষ্ফল রিক্ততায় ধূ ধূ করচে—কোনো প্রোগ্রাম নেই কেবলি আস্ফালন, এতে আমাদের যত লজ্জিত করেছে ততই মনে করছি এই পথেই আরো দূরে গিয়ে লজ্জা দূর হবে। এই বিনাশবুদ্ধি বয়স্ক পোলিটিশানরা চর্চা করুন আমরা অগত্যা সহ্য করব, কিন্তু বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল মত্ততার আবর্তের মধ্যে আকর্ষণ করার মতো স্বদেশের পক্ষে আত্মঘাতকতা আর কিছু হতে পারে না।

ধ্বংস করবার কাজে যখন আগুন লাগানো হয় তখন সর্বনাশ করতে করতে সেটা আপনি ছড়িয়ে পড়ে—তাতে কারো কোন কৃতিত্বের প্রয়োজন হয় না, বুদ্ধির তো নয়ই। যে-বয়সে স্বভাবতই পরিণাম-দৃষ্টি থাকে না, যখন দায়িত্ব-বোধের যথেষ্ট চর্চা হয় নি তখন এই আগুন লাগানোর মাতামাতিতে দল বাঁধতে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো দেশের অনিষ্ট সাধন আমি তো কিছু মনে করতে পারি নে। গত মহাযুদ্ধের পরে আমি জর্মনিতে গিয়েছিলুম—আমি থাকতুম ডার্মস্টাডে, সেখানে হাইডেলবুর্গ মারবুর্গের ছাত্ররা প্রতিদিন আমার কাছে আসত—তারা এক দিন আমাকে বলেছিল, এতদিন যারা আমাদের চালনা ক'রে এসেছে সেই প্রবীণদের প্রতি বিশ্বাস আমাদের একেবারে ভেঙে গেছে, আমাদের এমন কিছু চাই যার মধ্যে সার্থকতার আশা আছে। প্রবীণেরা জাতিবিদ্বেষের আগুন লাগানোর কাজে তাদের অন্ধভাবে ঠেলে নিয়ে গেছে। তার সর্বনেশে ব্যর্থতা যখন সুস্পষ্ট হ'ল তখন তারা ব্যাকুলভাবে এমন কিছুকে চাইল যাতে তাদের সৃষ্টির উদ্যমকে যথার্থভাবে ফলবান করতে পারে। আমাদের দেশেও কি এক দিন কর্তব্যদায়িত্বহীন ব্যর্থতার মরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজকের দিনের তরুণেরা বলবে না যে, যে-প্রবীণেরা আমাদের এই রিক্ততার মধ্যে নিয়ে এসেছে তাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ভেঙে গেছে। আমরা এমন কিছুকে চাই যাতে সৃষ্টিকাযের সার্থকতা আছে। যাতে আমাদের গড়ে তোলবার শক্তি, যাতে আমাদের শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে।

এক দিন বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করে বলেছিলুম—

"এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে"—

আজ কি বলতে হবে, হাত আছে অকাজে—কিছু গড়ে তুলতে এরা কোমর বাঁধে নি, কোমর বেঁধেছে যা গড়া আছে তার ভিত্তিতে সাবল চালাতে, তা সে নিজের চরিত্রেই হোক, বা কোনো প্রতিষ্ঠানেই হোক।

[গত ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ বাঁকুড়ায় ছাত্রদের সভায় রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, বাঁকুড়ার ছাত্রেরা শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনিয়াছিল। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন, বাঁকুড়ার বা অন্য কোনও স্থানের বিশেষ কোনও ঘটনা তাঁহার লক্ষ্যীভূত ছিল না।—প্রবাসীর সম্পাদক]



আল্প্সের প্রতিধ্বনি

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক, ডি. এস্‌সি.

সেই রহস্যময় প্রতিধ্বনির রেশ আজও কানে লেগে আছে।

আল্প্স্ জনপদের নরনারী কাজে অকাজে পর্ব্বত আরোহণের কালে কিংবা উপত্যকার অলিতে-গলিতে বিচরণের অবকাশে একটি অদ্ভুত স্বর ক'রে তাদের সঙ্গীদের ডাকে—উ-হু-উ-উ-উ-উ-উ…যানবাহনহীন জনবিরল পার্ব্বত্য প্রদেশে পথভ্রষ্ট সঙ্গীদের কিংবা দলভ্রষ্ট আগন্তুকদের সঙ্কেত করবার একটি অপূর্ব্ব কৌশল।

সাথীর উত্তরের প্রতীক্ষায় এই কম্পমান আহ্বানের সুর ভেসে বেড়ায় এক শিখর থেকে আর এক শিখরে, এক উপত্যকা থেকে আর এক উপত্যকায়,—এ যেন আর শেষ হ'তে চায় না। আহ্বানকারী নিজেই তার প্রতিধ্বনির অভিযান মুগ্ধ হয়ে শোনে, মনে হয় যেন প্রস্তর-অবরুদ্ধ আকাশের গোপনতম গুহায় চলছে কিসের একটি নিবিড় অথচ ক্ষিপ্র অন্বেষণ। ধ্বনি মিলিয়ে যায় আর প্রতিধ্বনিকে আশ্রয় ক'রে এই আহ্বান ভেসে বেড়ায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে। ধ্বনির চেয়ে প্রতিধ্বনিকে তাই বেশী রহস্যময় ব'লে মনে হয়। তার সুরের রেশ কিছুতেই মুছে যেতে চায় না।

এই প্রতিধ্বনি শুধু সুর-মাধুর্য্যে নয়, ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যেও চিরমুখর হয়ে রয়েছে। ইউরোপীয় সভ্যতার ঊষাকালে আল্প্স্ পর্ব্বতমালার অরণ্যে উপত্যকায় যে মানবসম্প্রদায় প্রথম বাসা বেঁধেছিল, প্রকৃতির নিদারুণ অভিশাপ মাথা পেতে নিয়ে একটি বিপজ্জনক এবং শ্বাপদ-সঙ্কুল জনপদকে মনুষ্যের বাসোপযোগী ক'রে তুলেছিল, ইতিহাসের পাতায় ছাড়া তাদের আর কোন চিহ্নই আজ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তারা সংখ্যায় ছিল অল্প কিন্তু দৃঢ়তায় ছিল অসাধারণ। শুধু প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেই তাদের বেঁচে থাকবার সংগ্রাম শেষ হয় নি; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্তর দক্ষিণ, পূব ও পশ্চিম থেকে একটির পর একটি রণবিলাসী জাতির বিজয়-অভিযান তাদের বুকের উপর দিয়ে অতিক্রম ক'রে গেছে। পরাজয়ের অপমানে, পরাধীনতার অত্যাচারে মুহ্যমান হয়ে পড়লেও তারা হাল ছাড়ে নি। এই একান্ত নির্ভীক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নরনারী এক দিন তাদের সর্ব্বস্ব পণ ক'রে বিদেশী শাসন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ ক'রে তাদের পার্ব্বত্য জনপদকে মুক্ত এবং বীরত্বনিষ্ঠ ক'রে রেখে গিয়েছিল। সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল আল্প্সের বিভিন্ন উপত্যকায়, পর্ব্বতগাত্রের নিবিড় অরণ্যমধ্যে, দুর্গম গিরিসঙ্কটে আর পর্ব্বতমালার শিখরে শিখরে। আল্প্সের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছে সেই সব বীরত্বের স্মৃতি। আল্প্স্ ভ্রমণকালে যত বার এই প্রতিধ্বনি কানে এসেছে তত বারই মনে হয়েছে যেন সেই বীরত্ববিলাসী যুগের নরনারী তাদের কঠিন প্রস্তর-সমাধি থেকে বিস্মৃতকালের কাহিনী পুনরাবৃত্তি করবার চেষ্টা করছে।

আধুনিক কালের সুইটজারল্যাণ্ডকে দেখে ও-সব কথা মনে করা শক্ত। আজকাল বরফ সেখানে একটা বিলাসের বস্তু। প্রচণ্ড শীতে পাহাড়ের গায়ে গায়ে যখন বরফ জমতে আরম্ভ করে তখন স্কী-ক্রীড়াবিলাসী আধুনিক তরুণ-তরুণীদের মন আনন্দে নৃত্য ক'রে ওঠে। কিন্তু তখনকার দিনে বরফের আধিক্য দেখলে গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হ'ত। নরম শুভ্র তুষারের শোভা তখনও আবিষ্কৃত হয় নি, কারণ ভাবপ্রবণ, আরামপ্রিয় কবিদের ভয়সঙ্কুল আল্প্স্ প্রদেশে অভিযান করবার সাহস তখনও আসে নি। আজ বিজ্ঞান সেই দুর্গম পথকে করেছে সুগম; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে ভ্রমণকারীর দল, আল্প্স্ প্রদেশের রূপের খ্যাতি



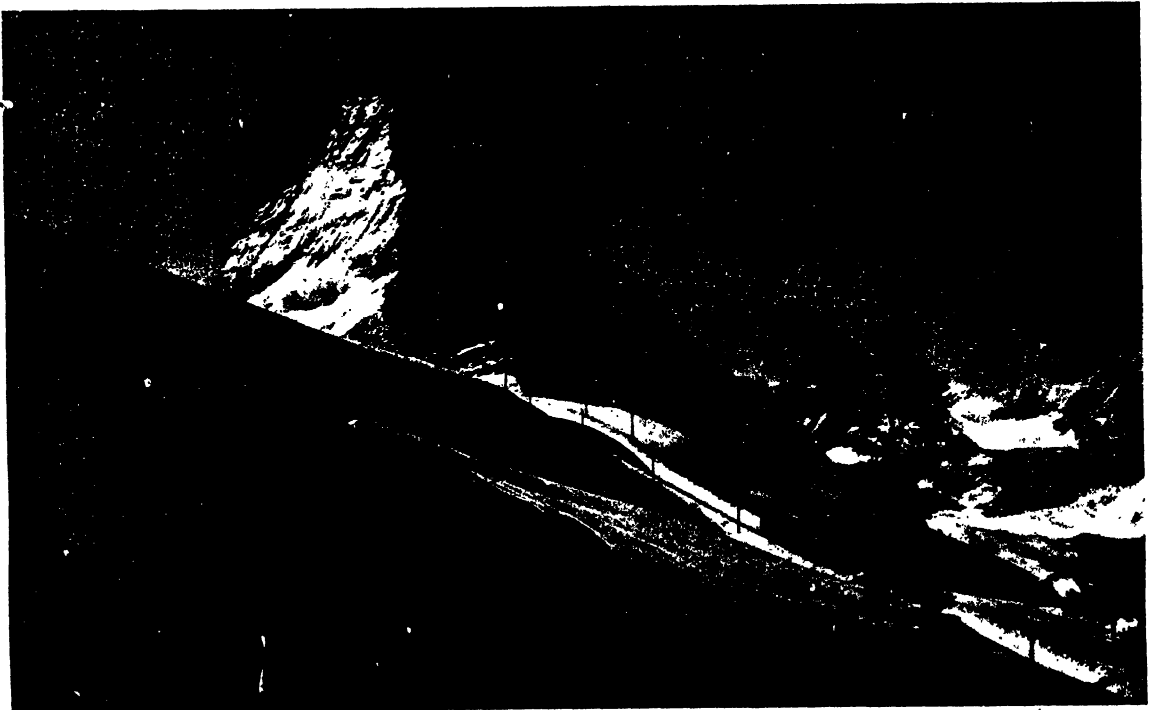
দেশী ভূষায় সজ্জিত আল্‌প্‌স্‌-অঞ্চলের সুইস তরুণী



সুইস চাষীর কাছে গোধন একান্ত সমাদরের বস্তু



সুইস চাষী ও তার অনুগত প্রিয় সঙ্গী



'স্কী'-ক্রীড়াকারীদের পরিভ্রমণ-পথ

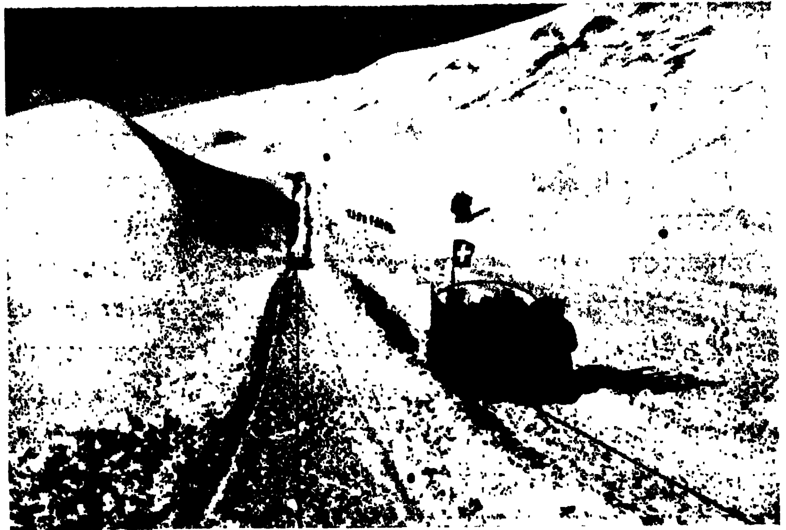


আল্‌পসের তুষারাবৃত শৈলশিখরে স্কী-ক্রীড়ার্থী দল

সংগ্রহ করত, আজ সেখানে তরুণ-তরুণীর দল এক হাতে স্যাণ্ডউইচ আর এক হাতে সিগারেট নিয়ে পরস্পরকে প্রেমনিবেদন করে। পূর্ব্বপুরুষদের রক্তে উর্ব্বর দেশের মাটির দিকে না তাকিয়ে তারা আজ তারকার শোভা নিরীক্ষণ করে। আল্‌পসের প্রতিধ্বনি এদেরই ক্ষীণ স্মৃতিশক্তিকে জাগিয়ে তোলার নিস্ফল চেষ্টায় যেন হাহাকার ক'রে মরে।

কিন্তু সেই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের কোন স্মৃতিই আজ বর্ত্তমান নেই এ-কথা বলা ভুল হবে। যে-স্বাধীনতা তারা অর্জ্জন করেছিল বুকের রক্ত দিয়ে তাদের বংশধরগণ আজও সগর্ব্বে তার উত্তরাধিকার রক্ষা করছে। ইউরোপ যে শান্তিরক্ষার জন্যে আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে নিস্ফল চেষ্টা ক'রে আসছে, সুইটজারল্যাণ্ড আজ প্রায় চার-শ বছরের অধিককাল যাবৎ সেই শান্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং শান্তিরক্ষায় গণতন্ত্রের সাফল্যের জলন্ত উদাহরণ পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে। সুইটজার-

গেছে ছড়িয়ে। আজ স্কী-ক্রীড়ারত তরুণ-তরুণীদের হাস্যকোলাহলে আল্পসের উপত্যকাগুলি মুখরিত। আসলেশী বা স্কী জিনিষটার আবিষ্কার এবং প্রথম প্রচলন হয়েছিল উত্তর-ইউরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়। পশ্চিম- এবং মধ্য-ইউরোপের অভিজাত-সম্প্রদায় নরওয়ে-সুইডেনের প্রচণ্ড শীত এবং দুর্গম তুষারক্ষেত্রে কৌতুক আহরণের প্রলোভনকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি; তাই আল্পস্ পর্ব্বতমালার সব চেয়ে মনোরম তুষারক্ষেত্রগুলিতে তাদের ঘাঁটি বসিয়েছে। পাহাড় কেটে এনেছে রেলগাড়ী, দুর্গম শৈলশিখরে বসিয়েছে বিংশ শতাব্দীর শৌখিন পান্থশালা। লোক-সঙ্গীত এবং গ্রাম্য-নৃত্যের স্থান অধিকার করেছে প্যারিস কি ভিয়েনা থেকে আমদানি-করা জ্যাজ-ব্যাণ্ড আর ট্যাঙ্গো নাচ। বন পরিণত হয়েছে উদ্যানে; আগেকার দিনে যেখানে হয়ত হিংস্র পশুপক্ষী শিকার ক'রে গ্রামবাসীরা আহার্য্য



স্কী-ক্রীড়াকারীর দল বিদ্যুৎচালিত যানে পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিতেছে



সুইটজারল্যাণ্ডের শুভ্র শীতশ্রী

এমনি কত কি এসেছে এবং গেছে, কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ড এই দীর্ঘকাল ধ'রে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। হাব্‌স্‌বুর্গ, নেপোলিয়ান, বিসমার্ক, মুসোলিনী, হিট্‌লার, কেউ আজ পর্য্যন্ত সুইস্‌দের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি। ইউরোপ আজ যুগ যুগ ধ'রে যে শান্তি অন্বেষণের ব্যর্থ চেষ্টায় তার আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করেছে, এই বরফে-ঢাকা সাদা পাহাড়ের দেশটি সেই শান্তির শুভ্র-পতাকা অম্লান রাখতে পেরেছে। তাই বিগত

ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল বলতে গেলে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে, সোয়াবিয়ান যুদ্ধগুলিতে জয়লাভের অর্থাৎ Treaty of Basle-এর পরে। আল্‌প্‌স্‌-অধিবাসী সুইস্‌দের স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ সমর করতে হয়েছিল হাব্‌স্‌বুর্গ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। শক্তিগর্ব্বে স্পর্দ্ধিত জার্মান সেনাদলকে এই অল্পসংখ্যক নির্ভীক পার্ব্বত্য যোদ্ধাগণ পরাজিত করেছিল একাধিক রণক্ষেত্রে। তাদের অর্জ্জিত স্বাধীনতা যে আজও অক্ষুণ্ণ আছে, তা শুধু সামরিক শক্তির প্রভাব বা আশ্রয়ে নয়, তার হেতু মিলনপন্থী সামাজিক পদ্ধতি এবং উদার জাতীয় চরিত্র।

ইউরোপের ইতিহাসে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় সুইটজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় দান তাদের গণতন্ত্রের আদর্শ। সুইটজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-লাভই গণতন্ত্রের কাছে সাম্রাজ্যবাদের সর্ব্বপ্রথম পরাজয় ঘোষণা করেছিল। তার পর থেকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে গণতন্ত্রের কত উত্থান-পতন হয়েছে, ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ান, ইতালির স্বাধীনতা-লাভ, জার্ম্মান গণতন্ত্রের অভ্যুদয়, কার্ল মার্কস, বিগত মহাযুদ্ধ এবং তাহার পরবর্ত্তী কালের স্বৈরাচার ও ডিমোক্রাসির সংঘর্ষ—

মহাযুদ্ধের পরে যখন আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিশ্ব-সঙ্ঘের প্রয়োজন হ'ল তখন জেনীভার হ্রদের ধারে পাইন-আচ্ছাদিত পাহাড়ের পাদদেশে বসল লীগ-অব-নেশ্যন্‌স্‌-এর দপ্তর। আজ মনে হয় ভের্সাইয়ের সন্ধি যদি প্যারিসের জয়গর্ব্বিত উন্মাদনার মধ্যে কল্পিত না হয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের কোন শান্তপল্লীর স্নিগ্ধ ছায়ায় ব'সে পরিকল্পিত হ'ত তবে হয়ত ভের্সাইয়ের শান্তি আরও বেশী দিন স্থায়ী হ'ত।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড দেশটি ছোট হ'লেও নগণ্য নয়। আধিপত্য-বিলাসী সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ যেন শান্তিশূন্য বারিশূন্য মরুভূমি, তার বুকে সুইটজারল্যাণ্ড এক অপূর্ব্ব মরূদ্যান। রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সামাজিক নির্য্যাতন যেদিন থেকে ইউরোপে সুরু হয়েছে সেদিন থেকেই সুইটজারল্যাণ্ড এই সর্ব্বহারা নির্যাতিত সম্প্রদায়কে অকাতরে আশ্রয় দান করেছে। আজ সুইটজারল্যাণ্ড তার রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতদের, অবরোধকারী শত্রুর ভয়ে দেশত্যাগী "হতভাগাদের পরম তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ তাই আল্‌প্‌স্‌-পল্লীগুলির অলিতে-গলিতে ফ্রান্স, জার্ম্মেনী এবং ইতালি থেকে নির্ব্বাসিত রাষ্ট্রনেতাদের দেখতে পাওয়া যায়; সেখানে তাদের



সুইটজারল্যাণ্ডের কৃষক—সাজসজ্জায় সৌন্দর্য্যপ্রিয় হ'লেও পরিশ্রমে বিমুখ নয়

চায়ের আসর স্বাধীন মতামতের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে, কেউ তাদের বাধা দেয় না।

একই জাতি, একই ভাষা, একই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নাকি আধুনিক গণতন্ত্রের একটি সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি, এ-রকম কথা আজকাল আমাদের দেশে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের মত অল্পপরিসর দেশেও বিভিন্ন জাতির নরনারী একাধিক ভাষার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও কিরূপে একটি সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সৃষ্টি করেছে, তা আমাদের দেশের ভেদনিষ্ঠ নেতাদের প্রণিধানের বিষয়। সুইটজারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা শুধু লণ্ডন শহরের লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক। অথচ এদের মধ্যেই তিনটি বিভিন্ন জাতির নরনারী বসবাস করে তারা প্রধানতঃ ইতালিয়ান, ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষা ব্যবহার করে। একটি চতুর্থ ভাষারও প্রচলন আছে—নাম তার রোমান্স্—লাতিনের মধ্যযুগের একটি অপভ্রংশ বিশেষ। জেনীভার ভাষা ফরাসী, জ্যুরিকের জার্ম্মান এবং লোকার্ণোর ইতালিয়ান। রোমান্সের প্রচলন সর্ব্বত্রই কিছু কিছু আজকাল হয়ে উঠেছে তবে প্রধানতঃ দক্ষিণ-সুইটজারল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশেই ইহা বেশী লোকপ্রিয়। বিস্ময়ের কথা এই যে সুইস্ প্রজাগণ তাদের প্রতিবেশী জাতীয়তাবাদীদের বিপ্লবী প্রচারে কখনও আস্থা স্থাপন করে নি। সুইস্ প্রজারা রোম, বার্লিন কি প্যারিসের কথা না ভেবে তাদের "হেলভেৎ-সিয়া"র বন্দনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বিশেষ ক'রে সুইটজারল্যাণ্ডের ফরাসী সম্প্রদায় ফরাসীদের খুব পছন্দ করে না। জার্ম্মান আর ইতালিয়ানদের বেলাতেও এই কথা খাটে। ফরাসী-সীমান্ত থেকে জেনীভা খুবই নিকটবর্ত্তী, ইতালিয়ান সীমান্ত থেকে লুগানোও তাই; কিন্তু এর কোন শহরেই প্রতিবেশীদের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ কখনও লক্ষ্য করি নি। লুগানোর নরনারী অবশ্য ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলে, কিন্তু মুসোলিনীর



দেশী পোষাকে আল্‌স্-অঞ্চলের কৃষক-যুবা



ক্রীড়াকৌতুকরত সুইস বালকদল

ভাগাভাগির প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত শিক্ষা এবং সামাজিক ব্যবহার দ্বারাই ধর্ম্মগত বৈষম্য জয় করা যায়। প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা দরদ যেখানে নেই, স্বায়ত্তশাসন সেখানে কথার কথা। সুইটজারল্যাণ্ডের নরনারী ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাদের প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা করে এবং সহানুভূতি দেখায়। স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি সে-জন্য সেখানে এত দৃঢ়।

আল্প্‌সের চাষীদের জীবনে এই শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির নিদর্শন সর্ব্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। আল্পসের চাষীরা

শাসনের বাইরে আছে ব'লে তারা গর্ব্বিত। তেমনি জ্যুরিকের নরনারী জার্ম্মান ভাষা বললেও হিট্‌লারের কঠিন শাসন-শৃঙ্খলের মধ্যে যাওয়ার কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারে না। অধিকাংশ শিক্ষিত সুইস্ নরনারী একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারে। তারা একক ভাষাকে জাতীয়তার প্রধান ভিত্তি ব'লে মনে করে না।

সুইস্ পার্লামেণ্টে তিনটি প্রচলিত ভাষার যে কোনটিতেই আলাপ-আলোচনা করা সম্ভব। এই প্রধান ভাষা কয়টি ছাড়া সুইটজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্যাণ্টনগুলিতে উপভাষার অন্ত নাই। একই পাহাড়ের বিভিন্ন উপত্যকায় বিভিন্ন উপভাষার প্রচলন দেখা যায়। ভাষাবৈষম্য যে জাতীয়তাবোধ কিংবা স্বাধীনতার অন্তরায় হ'তে পারে না, এই পার্ব্বত্য 'ফেডারেল' গণতন্ত্রটি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাছাড়া, একাধিক ধর্ম্মপন্থীদেরও আড্ডা সুইটজারল্যাণ্ডে। ক্যাথলিক, লুথারেন্, ক্যালভিনিষ্ট ইত্যাদি ভিন্নপন্থী গির্জ্জার একত্র সমাবেশ সুইস্ রিপাব্লিকের সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায় তাদের ধর্ম্মের প্রতি আসক্তির জন্য অপরের সঙ্গে দেশের জমি ভাগ করে নিতে চায় নি। সুইটজারল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে যে ধর্ম্মবৈষম্যের জন্য দেশ

খুব কঠোর পরিশ্রমী, কারণ বেশীর ভাগ অঞ্চলেই কৃষির অবস্থা বিশেষ অনুকূল নয়। সুইটজারল্যাণ্ডে ডেয়রী-শিল্প খুব উন্নত। এখান থেকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র জমানো দুধ, মাখন, পনীর প্রভৃতি খুব বেশী পরিমাণে রপ্তানি হয়ে থাকে। এজন্য সুইস্ চাষীরা গোধনকে খুব শ্রদ্ধা করে। তাই বসন্তের সমাগমে ভালে (Valais) অঞ্চলে "গাভী-রাণী" (Queen Cow) নির্ব্বাচনের উৎসব এখনও বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় এবং খুব যে প্রতিপত্তিশীল তা-ও বলা যায় না। ঘড়ি এবং যন্ত্রপাতির ব্যবসা ছাড়া তেমন কোন উন্নতিশীল শিল্প এদেশে নেই। সুইস্ চাষীরা গরিব, সুইস্ সমাজে আভিজাত্যের বালাই নেই।

আল্প্‌স্ জনপদের বিভিন্ন অঞ্চলে পুরাকালের উত্তরাধিকারসূত্রে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতি এখনও বিদ্যমান আছে। এক ক্যাণ্টন থেকে আর এক ক্যাণ্টনে গেলেই লোকনৃত্য এবং বেশভূষার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ক্যাণ্টনে বিভিন্ন উৎসবের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বসন্তোৎসব সর্ব্বত্রই সমান আগ্রহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। "পয়লা মে" সুইটজারল্যাণ্ডে



দিনের কাজ আরম্ভের পূর্ব্বে মেষপালকদের প্রীতিসম্ভাষণ ও কথাবার্ত্তা

সব চেয়ে বড় লোক-উৎসব—আজ তা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। দেশের সমস্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান ক'রে থাকে নব-বসন্তের চপল উন্মাদনা নিয়ে, শহরে পল্লীতে অকারণ আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। কি ধনী কি গরিব, সেদিনটাতে কারও আর কাজে মন বসতে চায় না। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বৃক্ষাগ্রভাগে কুয়াশার অবগুণ্ঠন ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে কাঁচা সবুজের রং, পথের ধারে ধারে চোখ মেলে চায় নিদ্রিত ফুলের বন, উপত্যকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কত নাম-না-জানা পাখীর ঐকতান। বরফ গলা জলে ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদীগুলির প্রাণে আসে জোয়ার, তারা কলধ্বনি করে। হ্রদের বুকে নৃত্য করে সহস্র তরঙ্গের চঞ্চলতা। কিন্তু তার স্বচ্ছ জলের দর্পণে শুভ্র বৈরাগ্যের প্রতিবিম্বের বদলে আজ দেখা দেয় সবুজের তারুণ্য, প্রথম প্রেমের অস্থিরতা। এই হ্রদের তীরে বিগত শীতের শুভ্র স্বচ্ছ রাত্রিতে হয়ত কত তরুণ-তরুণী পাশাপাশি ব'সে আকাশে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছে, তাদের বন্ধুগণ উপরে হোটেলের বারান্দা থেকে ডেকে ডেকে তাদের খোঁজ পায় নি। সেই রাস্তাগুলির স্মৃতি বরফে-ঢাকা হ্রদের বুকে জমাট বেঁধেছিল, আজ তারা যেন প্রাণ পেয়েছে। বসন্তের স্পর্শে আল্‌প্‌স্ পাহাড়ের চেহারা এত বদলে যায় যে শীতের সুইট্‌জারল্যাণ্ড আর বসন্তের সুইট্‌জারল্যাণ্ডকে একই দেশ বলে মনে করা কঠিন। একটি শুভ্র, শান্ত, রহস্যময়, অপরটি রঙীন, চঞ্চল, উৎসবের কোলাহলে মুখরিত। কিন্তু পরিবর্ত্তন হয় না শুধু সেই প্রতিধ্বনির। শীতে, গ্রীষ্মে, বসন্তে সকল সময়েই সেই প্রতিধ্বনির রহস্য পথিকের মন ভোলায়, অতীত দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে।



দীনবন্ধু এণ্ডরূজ

১

চার্ল্‌স্‌ এণ্ডরূজের প্রতি

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধারা
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এণ্ডরূজ মহোদয়ের শান্তিনিকেতনে প্রথম যোগদান উপলক্ষ্যে রচিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত]

২

দীনবন্ধু এণ্ডরূজ মহাশয় সম্বন্ধে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিশেষ কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ ক'রে আমার মত এক জন মানুষের পক্ষে, যিনি তাঁর বন্ধু হবার অযোগ্য হ'লেও যাকে তিনি বরাবর বন্ধু ব'লেই মনে ক'রে সেই রকম ব্যবহার করেছেন। শুধু আমার সঙ্গে যে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা নয়, আমার একটি পুত্রকে তিনি ছাত্ররূপে পেয়ে তাকে যে স্নেহ ও উৎসাহ দিয়েছিলেন তাও আমার এখন মনে পড়ছে। সেই সকল কথা মনে পড়ে আমার তাঁর সম্বন্ধে ভালো ক'রে কিছু বলতে সামর্থ্য জোগাচ্ছে না।

তাঁকে যে দীনবন্ধু নাম দেওয়া হয়েছিল তা সার্থক। তিনি যীশুখ্রীষ্টের যে আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করতেন, সে আদর্শ কথার দ্বারা প্রচার না ক'রে তাঁর নিজের জীবনের দ্বারা প্রচার করার চেষ্টা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ক'রে গেছেন।

আমরা কখনও মনে করি নি যে এত শীঘ্র তাঁর মৃত্যু হবে, কারণ আমার মনে পড়ে যখন তিনি পীড়িত হয়ে কলকাতায় এলেন তার কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত তাঁকে আমি দেখেছি সুরুলের শ্রীনিকেতন থেকে শান্তি-নিকেতন পর্য্যন্ত দেড় মাইল দু'মাইল পথ হেঁটে যাওয়া-আসা করতে।

অনুশোচনাতে কোন ফল নেই। তাঁর মহৎ জীবন তিনি যাপন ক'রে গেছেন এই ভাবেই যেন তার জাতির দ্বারা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে অপরাধ হয়েছে তারই তিনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন। কিন্তু আমাদের সেই দিক দিয়ে এখন কিছু ভাবা উচিত নয়। আমরা যে তাঁর কাছে কত ঋণী কত দিক দিয়ে, সেই কথাই আমরা বিশেষ ক'রে ভাবব। আমার ব্যক্তিগত ঋণের কথা এখন কিছু বলছি না। ভারতবর্ষের জন্য, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের যে-সকল দরিদ্র হীন অবস্থার লোক, অত্যাচরিত লোক বিদেশে উপনিবেশে বাস করে তাদের জন্য তিনি যা পরিশ্রম করেছেন আমাদের ভারত-বর্ষের কোন লোক সেই রকম করে নি; কেবল মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের জন্য করেছিলেন, অন্য উপনিবেশের ততটা করতে পারেন নি। তাঁর হৃদয়ের উদারতা ও প্রশস্ততা ছিল এরূপ যে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন, মুসলমান ছিলেন, জৈন ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন, খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন; আজ যে তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হ'ল সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক তাতে যোগ দিয়েছিলেন এবং বোধ হয় যদি আগে থেকে খবর পেতেন তা হ'লে এত বেশী লোক যোগ দিতে ইচ্ছা করতেন যে জনতা সামলানো কঠিন হয়ে উঠত। তিনি যে-শান্তি চেয়েছিলেন সে-শান্তি তিনি এখন পেয়েছেন যে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন ব্রিটেন এই উভয়ের মধ্যে মৈত্রী

তাঁর জীবনের কাম্য ছিল। তিনি সেই মৈত্রী দেখে যেতে পারলেন না। কিন্তু যখন এই মৈত্রী স্থাপিত হবে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন ব্রিটেনের মধ্যে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর স্বর্গগত আত্মা পরম আনন্দ ও পরম শান্তি উপভোগ করবেন।

[কলিকাতায় বেতার-বক্তৃতা, ৫-৪-৪০]

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণকমলেষু

আপনি যে-ভাবে মৃত্যুকে দেখেছেন সেই দৃষ্টি সামনে রেখে শোকের অতীত স্মিত সুন্দর সর্ব্বদা কল্যাণময় প্রাণের মূর্ত্তি মনে রাখতে চেষ্টা করি—সেই মূর্ত্তি যা আমাদের কাছে সত্যকালের চিরকালের এণ্ডরুজ। কোনো ঘটনাই তাঁকে দূরে নিতে পারে না• এই কথা ভাবতে চেষ্টা করি। রোগযন্ত্রণায় পরিবর্ত্তিত চেহারা যেমন তাঁর সত্য চেহারা নয়, তেমনি অভাবের শূন্যতায় তাঁর হারানো কর্ম্মও আমাদের কল্পনামাত্র—যে-কর্ম্মের শুদ্ধতা তিনি সামনে রেখেছিলেন তার ক্রিয়া চলবে। এই কথা ভাবতে চেষ্টা করি কিন্তু মৃত্যুর ঘটনা বারে বারেই মহান্ মৃত্যুর স্বরূপকে ঢেকে দেয়।

অপারেশ্যনের পূর্ব্বাহ্ণে তিনি বারম্বার বলেছিলেন—আমি প্রস্তুত, কোনো সংশয়, কোনো দ্বিধা নেই আমার মনে। হঠাৎ আশ্চর্য্য শক্তি এসেছিল তাঁর মধ্যে—সচরাচর মৃত্যু বা শারীরিক বেদনার প্রসঙ্গে তাঁকে কাতর হ'তেই দেখেছি। সেই শক্তির শান্ত ক্ষণে বারেবারে তিনি আপনার নাম করেছেন এবং বলেছেন এই দান আপনার কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন ভারতবর্ষে, যা পেয়ে প্রথম তাঁর জীবন একেবারে বদলে গেল। অতি সহজ ক'রে এই কথা তিনি বলেছিলেন। বলতে গিয়ে আমি সে-ভাষা রাখতে পারি না। যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে যেন তাঁর শেষ মনোভাব আপনাকে জানাই এই তাঁর ইচ্ছা ছিল—তাঁর ইচ্ছামত ছোট কয়েক লাইন কাগজে দিয়েছি, অপারেশ্যনের আগে লিখে নিয়েছিলাম, তিনি বলছিলেন।

অসামান্য সেবা করেছে নার্স এবং একটি নবাগত হিন্দুস্থানী বেয়ারা। যে-ভালোবাসার শক্তিতে সর্ব্বত্র সেবার ইচ্ছা জাগিয়েছেন তাই আজ মনে পড়ে—কত দেশে অদৃশ্য প্রচ্ছন্নভাবে তার ক্ষুদ্রবৃহৎ ক্রিয়া চলবে।

দেশের এবং জাতির কী দায়িত্ব তা জানি না, মনে মনে যে ছোট একটি সৌরভময় দিগন্ত রচনা ক'রে গেছেন তার মাধুর্য্য জীবনে রাখতে চাই চিরদিন। অকৃত্রিম কল্যাণকারী বন্ধুত্বের সেই দান। অনেক সময়ে মনে হয় এত বড়ো মহার্ঘ্য জিনিষ রাখিবার মতো জায়গা কোথায়।...

পুরী, ৬. ৪. ৪০

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

৪

খুঁজিয়াছি যীশুখ্রীষ্টে পড়িয়া তাঁহার মর্ম্মবাণী,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লিখেছে যা তাঁর ভক্তগণ,
চিত্রকর আঁকিয়াছে প্রেমময় ধ্যানমূর্ত্তিখানি,
দীর্ঘকায় এক যুবা সৌম্যকান্তি প্রশান্ত আনন!

শতাব্দী ক্রন্দিয়া ওঠে স্বার্থোদ্ধত অন্ধ অবিচারে,—
মানুষের মনুষ্যত্বে প্রাণ দিয়ে কে করে প্রমাণ?
করুণার কোন্ দেব ক্রুশ-কাষ্ঠে দিবে আত্মপ্রাণ,
বেদনার করাঘাত খুলি দিবে যত রুদ্ধ দ্বারে?

রৌদ্রদগ্ধ রাহী যথা পিপাসার্ত্ত খুঁজে মরূদ্যান,
ধ্রুবতারা অন্বেষিয়া ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ধায় নৌকা বেয়ে,
হিংস্র অরণ্যের পথে যাত্রী চলে মানুষেরে চেয়ে
সেইমত খুঁজে ফিরি—পাই নি কো কাহারো সন্ধান।

ডুবে যাই ঘূর্ণাবর্ত্তে, সহসা আকর্ষি মোর ভুজ
আমারে তুলিলে কূলে যীশুসম, হে বন্ধু এণ্ড্রুজ।

শ্রীসতীশ রায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

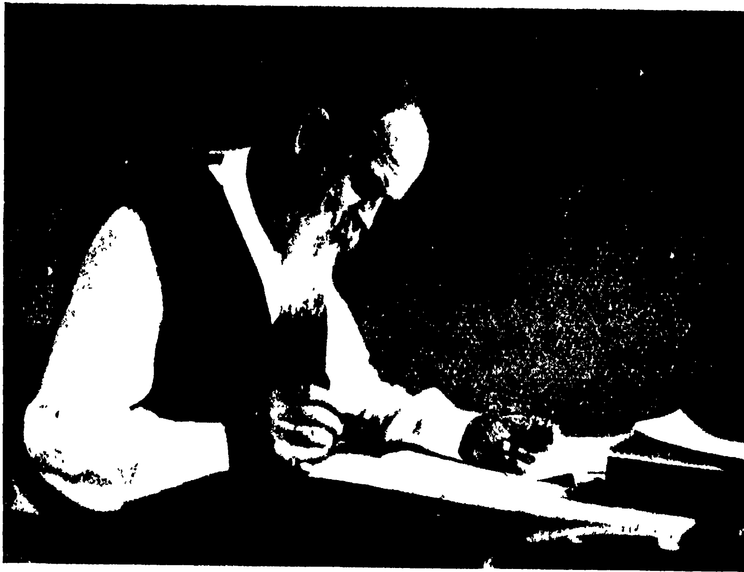
"প্রবাসী"র চত্বারিংশ বর্ষ

সর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রয়াগ হইতে "প্রবাসী" প্রথম বাহির করিয়াছিলাম। তাঁহার কৃপায় ইহার জীবনের উনচল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইল। চত্বারিংশ বৎসরের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

—

দীনবন্ধু চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরূজ

চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরূজ ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিধারী এবং তথাকার পেম্ব্রোক কলেজের ফেলো ছিলেন। তিনি যৌবনেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচারার্থ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সেণ্ট স্টীফেন্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখন তিনি অন্যান্য পাদরীদের মত রেভারেণ্ড উপাধিভূষিত ছিলেন। পরে তিনি ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। তাহা করিলেও, তাঁহার চরিত্র ও জীবনের দ্বারা সত্য খ্রীষ্টীয় আদর্শ যেরূপ প্রচারিত হইয়াছে, অল্প পাদরী বা সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। তাঁহার নামের তিনটি আদ্য অক্ষর "সী," "এফ্" এবং "এ" "Christ's Faithful Apostle" (খ্রীষ্টের বিশ্বাসী প্রেরিত-পুরুষ) এই আখ্যারই আদ্য অক্ষর-ত্রয়, ইহা যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন। কারণ, খ্রীষ্টের জীবন ও চরিত্র যে আদর্শের ছিল বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ খ্রীষ্টিয়ান ও অ-খ্রীষ্টিয়ানগণ মনে করেন, এণ্ডরূজ সেই আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টা আমরণ করিয়া গিয়াছেন।



সী. এফ. এণ্ডরূজ
শ্রীরাম শর্ম্মা গৃহীত আধুনিক ফটোগ্রাফ হইতে

সেই আদর্শের একটি অংশ, যাহারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত, দীনহীন, তাহাদের সহায় হওয়া। এণ্ডরূজ এইরূপ সকল মানুষের বন্ধু ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে যে 'দীনবন্ধু' নাম দেওয়া হইয়াছিল তাহা সার্থক।

দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ফিজিতে, এবং অন্যান্য উপনিবেশে দুর্গত ভারতীয়দের জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে ভারতীয়দের অবস্থার যদি কিছু উন্নতি হইয়া থাকে, তাহার প্রশংসার বহু অংশ এই সাথকনামা দীনবন্ধুর প্রাপ্য। ব্রিটিশ গিয়ানা হইতে যে-সব ভারতীয় শ্রমিক ভারতে স্থান ও সুখশান্তি পাইবার আশায় ফিরিয়া আসিয়া নিরাশ হইয়া মাটিয়াবুরুজে দুঃখে দিনপাত করে, তাহাদের খবর পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা অল্প লোকেই জানে, কিন্তু দীনবন্ধু তাহাদের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেন, বড় লাটসাহেব ও তাঁহার পারিষদদের নিকট দৌড়াদৌড়ি করিতেন।

বিহারের চম্পারনের নীলকরপীড়িত প্রজাদের সহায় তিনি ছিলেন, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের তিনি কর্ম্মিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, বহু বার প্লাবন ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত উড়িষ্যার স্থায়ী দুঃখমোচন-ব্যবস্থার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের অবিস্মরণীয় প্লাবনপীড়নের সময়ও তিনি দুর্গতদের বন্ধুরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লিখিতেছি না, সুতরাং তিনি যে কোথায় কি কি করিয়াছিলেন তাহা এখন লেখা যাইবে না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে কত লোকের উপকার করিয়াছেন, তাহার ত কোন হিসাবই পাইবার জো নাই।

তিনি অনুগ্রাহক মুরুব্বি রূপে কিছু করিতেন না, কখন ভাই কখন বা সেবকরূপে করিতেন। প্রভুজাতি-সুলভ মুরুব্বিয়ানার ভাব বর্জন করিতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন। যাহা করিতেন, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদেশে বা পরামর্শে করিতেছেন যথাসম্ভব এইরূপ বলিতে চেষ্টা করিতেন—সৎকার্যের প্রশংসা নিজে লইতে চাহিতেন না।

ইহা সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে কোন কোন প্রধান বিষয়েও মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয়েরই সহিত দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল; রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার "গুরুদেব", গান্ধীজী "মোহন"। হৃদয়-মনের যে ঔদার্য ও বিশালতা তাঁহাকে এই উভয় পুরুষ-প্রবরকে শ্রদ্ধাভক্তি দিতে সমর্থ করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তিনি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের বহু লোকের বন্ধুত্ব লাভ করিতে ও তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

আজকাল সচরাচর পরিচিত লোকমাত্রকেই অনেক সময় বন্ধু বলা হয়। দীনবন্ধু তাঁহার অন্তিম বাণীতে ভগবৎকৃপায় যে বহু বন্ধুলাভের সৌভাগ্যের কথা বলিয়াছেন, সে বন্ধুত্ব প্রকৃত বন্ধুত্ব। সে-সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল তাঁহার হৃদয়ের অগাধ প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডারের গুণে। প্রেম দিতে তাঁহার কৃপণতা ছিল না। যাঁহাকে বন্ধু মনে করিতেন, এমন কেহ উপেক্ষা করিলে, ঔদাসীন্য দেখাইলে, এমন কি কঠোর আঘাত করিলেও, তাঁহার প্রেম বিমুখ বা ভিন্নমুখ হইত না, ইহা বেদনামিশ্রিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলিতে পারি। এ-বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ মহানুভবতা ও সদাশয়তা ছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও স্নেহ অসামান্য ছিল। মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি বড় দাদা বলিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালে যখনই এণ্ডরূজ শান্তিনিকেতনে থাকিতেন, প্রত্যহ বড় দাদাকে দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে চা খাইতেন। বড় দাদার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও স্নেহের কেবলমাত্র দুটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—অধিক স্থান ও সময় নাই। এক দিন, কি কারণে জানি না, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভুজাতির উপর চটিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় এণ্ডরূজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ইংরেজীতে নিত্যকার প্রশ্ন করিলেন, "বড় দাদা, কেমন আছেন?" বড় দাদা ইংরেজীতে যে উত্তর দিলেন তাহাতে বৃদ্ধ স্বদেশভক্তের এই মতই প্রকাশিত হইল যে, প্রভুজাতির সব লোক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত না হইলে কোন সুখশান্তি নাই! এই ব্যাপারটির বর্ণনা করিতে গিয়া এণ্ডরূজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "I say Dinoo, your grandfather is terrible"। আর এক দিন এণ্ডরূজের সহিত আমিও দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন তিনি, কি কারণে জানি না, খ্রীষ্টিয়ান পাদরীদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা উভয়ে প্রণাম করিবার পর, পাদরীদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার বিষয়ে

দ্বিজেন্দ্রনাথ উদ্দীপনার সহিত অনেক কথা বলিলেন—ইহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, এণ্ড্রুজ এক সময় কার্য্যতঃ এবং নামেও পাদরী ছিলেন এবং তখনও বস্তুতঃ পাদরী ছিলেন। পরে বড় দাদা আবার শান্তভাব ধারণ করিলেন। আমরা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথে নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে এণ্ড্রুজ বেশ প্রসন্নভাবেই বলিলেন, "We had a very interesting talk from Bara Dada this evening !"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এণ্ড্রুজের ভক্তি ও প্রীতির প্রগাঢ়তা, প্রাবল্য ও অচঞ্চল স্থৈর্য্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ তাঁহা অপেক্ষা গুরুদেবের প্রিয়তর ও নিকটতর হয়, এই সম্ভাবনার চিন্তাও যেন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। নারীসুলভ একনিষ্ঠ প্রেম এই বর্ষীয়ান চিরকুমারের হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিল।

সেণ্ট স্টীফেন্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গত সুশীলকুমার রুদ্র দীনবন্ধুর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে যেন আধ্যাত্মিক অভিন্নহৃদয় ছিলেন। রুদ্র মহাশয়ের একটি নাতনীর যখন জন্ম হয়, তখন এণ্ড্রুজ আমাকে স্পর্দ্ধার সহিত লিখিয়াছিলেন, "এখন আমিও ঠাকুরদাদা হয়েছি!"—কারণ তিনি বোধ হয় মনে করিতেন, আমার অনেকগুলি নাতনী আছে বলিয়া আমি অহঙ্কৃত! সে-বিষয়ে আমার কথঞ্চিৎ সমকক্ষতা এই স্পর্দ্ধিত উক্তির কারণ!

তিনি শান্তিনিকেতনে আগে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বিদ্বান, সুশিক্ষক এবং গদ্যে ও পদ্যে বহু পুস্তক ও সাময়িকপত্রের প্রবন্ধের সুলেখক ছিলেন। বালকেরা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিত। বলা বাহুল্য, তিনিও তাঁহাদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং সকল বিষয়ে স্বাধীন ও নির্ভীক চিন্তা করিতে ও লোকহিতকর কাজ করিতে উৎসাহ দিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত দিবার সামর্থ্য থাকিলেও দিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষের লোকদের সহিত অভিন্নতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। সরকারী ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার সময় তিনি নিজের জাতীয় পোষাক পরিতেন। অন্য সব সময়ে তিনি দেশী পরিচ্ছদ—ধুতি পিরান চাদর—ব্যবহার করিতেন। তাহাতে কোন পারিপাট্য ছিল না, গলার বোতাম খোলাই থাকিত। শান্তিনিকেতনের কঙ্করাকীর্ণ পথে মাঠে অনেক সময় খালি পায়েই চলিতেন, কখন কখন চটি জুতা পায়ে থাকিত।

এই লেখাটার গোড়ায় তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলিয়াছি। তাঁহার হৃদয়মন ভারতীয়মুখী না হইলেও হয়ত তিনি বিষয়াসক্তিহীন মানুষই থাকিতেন; কিন্তু ভারতবর্ষকে—বিশেষতঃ বাংলা দেশকে—স্বদেশ বলিয়া বরণ করিবার পর তিনি ভারতীয় অর্থেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কোন আয় বা সম্পত্তির উপর তাঁহার আসক্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একবার এণ্ড্রুজের সমক্ষে পরিহাস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার যদি কোন জিনিষ হারাবার দরকার থাকে, তা হ'লে সেটা এণ্ড্রুজকে দেবেন।" এণ্ড্রুজ তাহা শুনিয়া প্রতিবাদচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "No, no, Gurudev, you are very mischievous." কিন্তু বাস্তবিকই কোন জিনিষ আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তিনি উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশেই জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়াছিলেন। শেষের দিকে দক্ষিণ-ভারতেও কিছু কাল কাটাইয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিতেছিলেন।

তিনি ভারতীয় বহু সমস্যা মানবিকতার দিক্ হইতেই আলোচনা করিয়া সেই দিক্ হইতেই তাহার সমাধান-চেষ্টা করিতেন, সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিতেন না—যদিও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তাঁহার খুবই ছিল। কিন্তু তিনি যে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ গত ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ হইতে (পৃষ্ঠা ১৫৬) নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Every year that now passes in India, without removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote in 1921, called "The Immediate Need of Indepen-

dence," where I emphasised the word "immediate," and I hold fast to every word which I then wrote.

Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India *have* deteriorated, as Prof. Seeley prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved at once.

এরূপ মানুষকে অধিকাংশ সাধারণ ইংরেজ—বিশেষতঃ ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা—ভালবাসিতে পারে না। লর্ড-বিশপ মহোদয় যে প্রত্যহ তাঁহাকে রোগশয্যায় দেখিতে যাইতেন এবং গির্জায় তাঁহার শ্রাদ্ধিক উপাসনা করিয়া সমাধিস্থান পর্য্যন্ত পদব্রজে গিয়া সেখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ইহা তাঁহার (লর্ড বিশপের) বন্ধুপ্রেম, ধার্মিকতা ও মহানুভবতার প্রমাণ। গির্জাতে ও সমাধিস্থানে অ-পুরোহিত ইংরেজ অতি অল্প জনই উপস্থিত ছিলেন; অধিকাংশই ভারতীয়।

স্বাধীন দেশের লোকদের ইহা একটি সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকার যে, তাঁহাদের হৃদয় অন্য দেশের লোকদের দুঃখেও সক্রিয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইতে পারে। দীনবন্ধু এই সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকারের যথোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি, সাধারণত ভারতীয় ইংরেজরা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার মত স্বদেশ-প্রেমিক বিরল। তিনি জানিতেন, স্বাধীন ভারতের সহিত স্বাধীন ব্রিটেনের মৈত্রীর চেয়ে ব্রিটেনের পক্ষে (এবং জগতের পক্ষেও) অধিকতর কল্যাণকর অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উভয় দেশের স্বাধীনতার ভিত্তির উপর নির্মিত মৈত্রীসৌধের স্থপতি তিনি হইতে চাহিয়াছিলেন। সৌধ নির্মিত হয় নাই। কিন্তু যদি কখনও হয়, দীনবন্ধুর বিদেহী আত্মা আনন্দিত হইবেন।

যে-সকল ইংরেজ তাঁহাকে ভালবাসিতেন না, তাঁহারা জানেন না বুঝেন না, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মত প্রতিনিধি পাওয়া একটা জাতির কত বড় সৌভাগ্য। তিনি জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর, বিশ্বমৈত্রীর অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ভারতীয়দের ও ভারতের সম্পর্কে সব কাজ এইরূপ ভাবে করিতেন, যেন নিজ জাতির সব দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহা প্রায়শ্চিত্ত মনে করিব না, তিনি আমাদিগকে মৈত্রী ও হিতকারিতার অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে করিব।

তাঁহার স্নেহভাজন পরলোকগত শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি এখন নবজীবনের ও নববর্ষের উৎসব করুন।

"ভূতের মুখে রামনাম"

ডোমীনিয়ন শব্দটি বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, ও মাসিক কাগজে এত বার ব্যবহৃত হইয়াছে, যে, নূতন করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। যে-সব ইংরেজ ও যে-সব ইংরেজী কাগজ ভারতবর্ষের প্রতি খুব সদয়, তাঁহারা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি ডোমীনিয়ন করিবার পক্ষপাতী, এই দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহারাও কল্পনা করিতে পারেন না। আবার, যাঁহারা ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করিবার পক্ষপাতী তাঁহারাও কিন্তু কোন্ বৎসর এই দেশ ডোমীনিয়নের মত শাসনতন্ত্র পাইবে তাহা কখনও বলেন নাই—যদিও ডোমীনিয়নত্বের অঙ্গীকারটা এখন আর নাবালক নহে, সাবালক হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, গত মার্চ মাসের শেষের দিকে বিলাতের প্রসিদ্ধ দৈনিক টাইম্‌স্ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে জনাব জিন্না সাহেব বা মুসলিম লীগের মুরুব্বি সাজিয়া বলিতেছেন, ওঁদের কথা উপেক্ষা সহকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু ইঁহারা যে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও টাইম্‌সের পছন্দসই হয় নাই। টাইম্‌স্ কংগ্রেসকে বলিতেছেন, মুসলমানরা এবং দেশী রাজ্যের নৃপতিরা ফেডারেশুনের চেয়েও ডোমীনিয়নত্বকে অধিক না-পছন্দ করেন; অতএব বড়লাট যে ডোমীনিয়নত্বের অঙ্গীকার করিয়াছেন কংগ্রেস সে সম্বন্ধে যেন পুনর্বিবেচনা করেন। অর্থাৎ কংগ্রেস যদি পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার

ভরসায় উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার দাবী জানাইতে থাকেন এবং বড়লাটের ডোমীনিয়নত্ব অঙ্গীকার অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাহার ফল এই হইবে যে, কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা ত পাইবেনই না, মুসলমান ও দেশী নৃপতিদের বিরোধিতায় ডোমীনিয়নত্বও হারাইবেন; অতএব শীঘ্র শীঘ্র ডোমীনিয়নত্বের অঙ্গীকার মাথা পাতিয়া লইয়া ফেলুন, তাহা হইলে বড়লাট মুসলমান ও দেশী নৃপতিদিগকে কোন প্রকারে রাজী ও ঠাণ্ডা করিয়া লইবেন।

এইরূপ অনেক কথা বলিতে বলিতে টাইম্‌স্ বলিতেছেন :—

Already the Moslems are suggesting an alternative in the form of innumerable Ulsters throughout India—a solution which none in this country favours or desires. It would mean the end to Indian Unity.

তাৎপর্য্য। ইতিমধ্যেই ত মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে হিন্দু ভারতবর্ষ ও মুসলমান ভারতবর্ষে ভাগ করিবার বৈকল্পিক প্রস্তাব করিয়াছে—যাহার অর্থ ভারতময় অসংখ্য অলষ্টার সৃষ্টি। ভারতীয় সমস্যার এরূপ সমাধানের এদেশে (বিলাতে) কেহ পক্ষপাতী নহে, কেহ তাহা চাহে না। ইহাতে ভারতীয় একতা নষ্ট হইবে।

টাইম্‌সের ভারতীয় একতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ "ভূতের মুখে রামনাম"। নামে ভারত এক থাকিলেও যাহাতে এদেশে কার্য্যকর প্রকৃত একতা না জন্মে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা ত তাহাই চায়। এদেশে প্রকৃত একতা যত বাড়িবে, ব্রিটিশ প্রভুত্ব ততই কমিবে এবং তাহা সম্পূর্ণ লোপ পাইবার সম্ভাবনাও তত বাড়িবে। সুতরাং জনাব জিন্না সাহেবের পাকিস্তান পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষের খণ্ডীকরণে ভারতীয় একতা একেবারে লুপ্ত হইবে, পরিকল্পনাটার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ও টাইম্‌সের প্রকৃত আপত্তি ইহা নহে। প্রকৃত আপত্তি যাহা, আমাদের অনুমান অনুসারে তাহা বলিতেছি।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইন অনুসারে ভারতের প্রদেশগুলিকে যে-পরিমাণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটা প্রধান উদ্দেশ্যই যে এই দেশের একত্ব অনেকটা ভাঙিয়া দেওয়া, পার্লেমেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমীটির রিপোর্ট হইতে তাহা আমরা একাধিক বার দেখাইয়াছি। কিন্তু পুরা আত্মকর্তৃত্ববিশিষ্ট ভিন্ন-ভিন্ন-পথগামী প্রদেশগুলিকে বশে রাখা কঠিন। সেই জন্য ঐ আইনে এরূপ ফেডারেশ্যনের ব্যবস্থা আছে যাহার দ্বারা প্রদেশসমষ্টিকে কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের হাতের মুঠার মধ্যে রাখা যায়। সেই উদ্দেশ্যে ঐ আইনকে সংশোধিত করিয়া প্রাদেশিক আইন-সভাআদির ক্ষমতাও কিছু কমান হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায়, ভারতের খণ্ডীকরণ এবং তাহাতে ভেদের অস্তিত্ব ও সৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যের অনুকূল হইলেও, এই ভেদ একটা সীমা ও মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে দেশটাকে ও মহাজাতিটাকে নিজ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠে।

একটা গাড়ীতে যদি কেহ এগারটা ঘোড়া যুতিয়া গাড়ীটাকে নিজের অভীষ্ট পথে চালাইতে চেষ্টা করে এবং ঐ এগারটা ঘোড়ার প্রত্যেকটাই যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইতে, কিংবা একেবারেই না-যাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সারথির উদ্দেশ্যসিদ্ধি সহজ হয় না। ইহার উপর যদি এমন হয়, যে, গাড়ীটাকেই দ্বিখণ্ডিত বা বহুখণ্ডিত করিয়া সেই খণ্ডগুলাকে জোড়াতাড়া গিয়া সমষ্টিটাতে এগারটা ভিন্ন-ভিন্ন-মতি-গতি-মান ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে গাড়ীর মালিকের বা সারথির কাহারও কাজ সহজ হয় না।

সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাহাদের মুখপত্র টাইম্‌স্ কেন ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত দেখিতে চায় না, উপরের কথাগুলি হইতে তাহা বুঝা সহজ হইতে পারে।

—

অলস্টার ও পাকিস্তান

টাইম্‌স্ যে প্রস্তাবিত-পাকিস্তানকে বাস্তব-অলস্টারের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট মনে করিয়াছেন, তাহা ঠিক্ নয়।

প্রটেস্টাণ্ট ইংলণ্ড বিজিত রোম্যান ক্যাথলিক আয়ার্ল্যাণ্ডকে যেন তেন প্রকারেণ দাবাইয়া রাখিবার

নিমিত্ত অলস্টারে বিস্তর প্রটেস্টাণ্ট ইংরেজ ঔপনিবেশিক বসায়। তাহাদের সংখ্যা রোম্যান ক্যাথলিক আইরিশদের চেয়ে কম। যখন যখন আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন পাইয়া প্রায় স্বাধীন হইবার সম্ভাবনা হয়, তখনই এই অলস্টারের ঔপনিবেশিক ইংরেজরা তাহাতে বাধা দেয়; কারণ তাহারা রোম্যান ক্যাথলিক আইরিশদের প্রভাববৃদ্ধি সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না, তখন তাহারা আইরিশ ফ্রী স্টেটের (আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্রের) অন্তর্গত না হইয়া ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওএলসের সহিত যুক্ত থাকাই পছন্দ করিল।

পাকিস্তান-প্রচেষ্টাকারী মুসলমানদিগকে ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ইংরেজরা এদেশে ঔপনিবেশিক রূপে বসায় নাই। ইংরেজরা এদেশে আসিবার অনেক শতাব্দী আগে বিদেশী-বংশ-জাত মুসলমানদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই দেশে আসিয়াছিল। মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদের বংশজাত মুসলমানদের হিন্দু পূর্ব্বপুরুষরা ত আগে হইতেই এদেশে ছিল। অলস্টারের প্রটেষ্টাণ্ট ইংরেজ ও পাকিস্তান-কামী মুসলমানদের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, ঐ ইংরেজরা যেমন রোম্যান ক্যাথলিক আইরিশদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন ও তাহাদের স্বাধীনতা চায় না, নিজেদের প্রভুত্ব চায়, সেইরূপ পাকিস্তানী মুসলমানেরা হিন্দু ভারতীয়দের বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাহাদের স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া নিজেদের প্রভুত্ব চায়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা পাকিস্তানী মুসলমানদের এইরূপ মনোভাব নিজেদের কাজে লাগাইতেছে ও লাগাইবে, এবং আশা করে যে, তাহার দ্বারা কংগ্রেসের ও হিন্দু মহাসভার স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। এই জন্যই টাইম্‌স লিখিয়াছে যে, মুসলিম লীগের মত উপেক্ষার সহিত উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

—

ইয়োরোপে ফ্রান্স এবং ভারতে পাকিস্তান

টাইম্‌সের সব কথার আলোচনা করা অনাবশ্যক। কেবল আর একটা কথা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

"It may even be no exaggeration to say that apart from British paramountcy, there is no Indian nation as it may be said of Europe that there is no European nation. The French are a minority in Europe, which does not imply they must submit to German domination. To Moslem minds this is an exact parallel to their own position in India."

তাৎপর্য্য। ইহা বলিলেও অত্যুক্তি না হইতে পারে যে, ব্রিটিশ সার্বভৌম প্রভুত্ব বাদ দিলে ভারতীয় নেশ্যন বলিয়া কিছু নাই, যেমন ইয়োরোপ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, কোন সমগ্র-ইয়োরোপীয় নেশ্যন নাই। ইয়োরোপে ফ্রেঞ্চরা একটি সংখ্যালঘু জনসমষ্টি, কিন্তু তাহাতে ইহা বুঝায় না যে, তাহাদিগকে জার্ম্যান প্রভুত্ব মানিতে হইবে। মুসলমানদের মতে ইহা ভারতবর্ষে তাহাদের অবস্থার ঠিক্ সদৃশ।

ব্রিটিশ প্রভুত্ব বাদ দিলে ভারতীয়দের একনেশ্যনত্ব থাকে কিনা, ব্রিটিশ রাজত্বের আগে হইতেই ভারত একটি দেশ ও ভারতীয়েরা এক মহাজাতি ছিল কিনা, এবম্বিধ প্রশ্নের বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না। ইয়োরোপে ফ্রেঞ্চদের অবস্থার সহিত ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবস্থার সমতুল্যতার কথা বলা যে কিরূপ হাস্যকর ও অযৌক্তিক, তাহাই দেখাইব।

ফ্রেঞ্চরা ফ্রান্স নামক নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করে। তাহা জার্মেনী হইতে পৃথক্। ফ্রেঞ্চরা একটি আলাদা ভাষায় কথা বলে যাহা জার্ম্যান্ ভাষা হইতে পৃথক্। ঐ উভয় জাতির সাহিত্য ও ইতিহাস আলাদা। ভারতীয় মুসলমানেরা হিন্দুদিগ হইতে পৃথক্ কোন একটি আলাদা স্বাধীন (বা পরাধীন) রাষ্ট্রে বাস করে না; যে-যে প্রদেশে, জেলায়, নগরে, তাহারা বাস করে, সেখানে হিন্দুরাও বাস করে। কেবলমাত্র মুসলমানরাই যাহাতে বাস করে, এরূপ গ্রামেরও সংখ্যা অতি অল্প; এবং এ-রকম গ্রামসকলের পাশেই হিন্দু গ্রাম আছে। ভারতবর্ষের যে-যে ভাষায় হিন্দুরা কথা বলে, মুসলমানেরাও সেই সেই ভাষায় কথা বলে। উর্দু যদিও সব প্রদেশের বা অধিকাংশ প্রদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা নহে, তাহা হইলেও যদি মুসলমানরা বলে উহাই তাহাদের মাতৃভাষা, তবে ইহাও জানা দরকার যে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিত্য উর্দু বলে। উর্দু সাহিত্যের অনেক প্রসিদ্ধ লেখক হিন্দু।

ভারতবর্ষে যতগুলি সাহিত্য আছে, তাহার লেখকদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে। বিদেশী মুসলমানরা ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ জয় করিয়া তথায় বসবাস করিবার পর হইতে সেই সেই অংশের ইতিহাস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই এক।

অতএব ইয়োরোপে ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্যানরা যেমন পৃথক্ নেশ্যন, ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানরা সেইরূপ আলাদা নেশ্যন, এরূপ উক্তি কেবল অজ্ঞতা, বাতুলতা, বা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

টাইম্‌সে লেখা হইয়াছে, ফ্রেঞ্চরা যেমন সংখ্যালঘু বলিয়া ইহা বুঝায় না যে তাহাদিগকে জার্ম্যানদের অধীন হইতে হইবে, তেমনই ইহাও বুঝায় না যে, ভারতীয় মুসলমানরা সংখ্যালঘু বলিয়া তাহাদিগকে ভারতীয় হিন্দুদের অধীন হইতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদিগকে ত বলা হইতেছে না যে, তোমরা হিন্দুদের অধীন হও। কংগ্রেস তাহাদিগকে হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির সহিত সমান পৌর অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছে, হিন্দু মহাসভাও সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে-যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহিত হইবে, সেই সব দলে কেবল হিন্দু, কেবল মুসলমান ইত্যাদি থাকিবে না, নানাধর্মাবলম্বী লোক থাকিবে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি যে-যে প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল, তথাকার কোন হিন্দু বলে নাই যে, তথায় হিন্দুরাজ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গের অনেক মুসলমান মনে করে এবং বলিয়াছে যে, এখানে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে ও তদ্রূপ আচরণ করে। কংগ্রেসের ও হিন্দু মহাসভার রাষ্ট্রীয় আদর্শের মধ্যে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নাই।

—

ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় ইংরেজ কখন রাজী হইবে

বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজপুরুষ ও রাজনীতিকরা ভারতবর্ষকে যতটা রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার কথা বলিয়া আসিতেছেন কিন্তু কার্যতঃ দেন নাই, তাহার মাত্রা ডোমীনিয়নত্বের উপর উঠে নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা কেহ কেহ পূরা স্বাধীনতাই অঙ্গীকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যদিও তাহা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আমরা যত দূর জানি, সকলের চেয়ে পুরাতন এরূপ অঙ্গীকারের তারিখ ১৭ই মে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেই তারিখে ভারতবর্ষের তাৎকালিক গবর্ণর জেনারাল লর্ড হেষ্টিংস তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন যে, খুব বেশী দূরবর্ত্তী নহে এরূপ এক সময় আসিবে যখন ইংলণ্ড ভারতবর্ষের প্রভুত্ব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং যখন ভারতীয়েরা ইংরেজদের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চালাইতে থাকিবে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকিবে। কিন্তু এক শত বাইশ বৎসর পরেও সেই সময় আসে নাই।

তাহার পর ১৮৩৩ সালের ১০ই জুলাই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে মেকলে হাউস অব কমন্সে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন এক সময় আসিতে পারে যখন ভারতীয়েরা ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয়-প্রতিষ্ঠান চাহিবে ("demand European institutions") এবং যখন "রাজদণ্ড আমাদের হাত হইতে চলিয়া যাইতে পারে" ("The sceptre may pass from us")। মেকলে ইহাও বলিয়াছিলেন :—

"Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to avert or to retard it. Whenever it comes, it will be the proudest day in English history."

তাৎপর্য্য। এমন দিন কখনও আসিবে কিনা জানি না। কিন্তু এমন দিনের আগমন ব্যাহত বা বিলম্বিত করিবার চেষ্টা আমি কখনই করিব না। ইহা যখনই আসুক, ইহা ইংলণ্ডের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিন হইবে।

ভারতের রাজদণ্ড ইংরেজ জাতির হাত হইতে এখনও খসিয়া পড়ে নাই, কিন্তু ভারতীয়েরা ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ পূর্ণস্বাধীনতা, তাহা বার বার দাবী করিতেছে। কিন্তু ইংরেজ জাতি এহেন সময়কে

তাহাদের ইতিহাসের "সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিন" মনে করিতেছে না।

—

নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা- ও- সাহিত্য-প্রসার সমিতির উদ্যম

নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা- ও- সাহিত্য-প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা নিম্নমুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিটি পাইয়াছি।

"বোম্বাই ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বহু ভাষার পুস্তক থাকা সত্ত্বেও বঙ্গভাষার কোন পুস্তক না রক্ষিত হওয়ায় এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দুইটির রেজিষ্ট্রারদ্বয়কে বাংলা পুস্তক রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সমিতি বঙ্গের বাহিরে বাঙালী ও অবাঙালীদের বঙ্গসাহিত্যের সহিত পরিচয় করাইবার সুবিধার জন্য বোম্বাই, দিল্লী, ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পুস্তক প্রদান করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সমিতির অনুরোধেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের প্রকাশিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে এক শত ভাল বাংলা পুস্তক দান করিয়াছেন। বাঙালী গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ যদি কিছু কিছু পুস্তক বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা প্রসারের সুবিধা হইবে, নিজেদেরও লাভ হইবে।

"সমগ্র ভারতে প্রবাসী বাঙালী ও অবাঙালীদিগকে বঙ্গসাহিত্যের পঠন-পাঠনে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করিবার জন্য এই সমিতি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া এক পরীক্ষামণ্ডল গঠন করিয়াছেন। আগামী নবেম্বর মাসে এলাহাবাদে তাহার 'প্রবেশিকা' ও 'বিশারদ' পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই জন্য এই সমিতি অন্য পৃথক্ ব্যবস্থা না করিয়া ঐ মণ্ডলীর সহিত সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিষয় নির্ব্বাচন ও পাঠ্যপুস্তক তালিকাদি নির্দ্ধারণ ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ; শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস,; মিঃ ওয়াজেদ্ আলি, বি, এ, (ক্যান্টাব) বার-য়্যাট-ল ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়দিগকে লইয়া একটি শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে। এইরূপ কার্য্যে প্রভূত অর্থ ও কর্ম্মীর প্রয়োজন। হিতৈষী ব্যক্তিগণ এই সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য করিবেন। এই সমিতি শীঘ্রই আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইবে।"

কলিকাতার ২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোডে এই সমিতির কার্য্যালয় অবস্থিত। ইহার কাজের সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এই প্রকার একটি সমিতির ক্রিয়াশীল অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক।

অবাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রচার করিতে হইলে বাংলা কাগজে লেখা যথেষ্ট নহে, ইংরেজীতে লেখা আবশ্যক। সেই কারণে আমরা "মডার্ণ রিভিয়ু"দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অ-বাঙালীদের মনে কৌতূহল উদ্রেকের চেষ্টা গত চারি শত মাস করিয়া আসিতেছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ভারতীয় অন্য কোন কোন আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামূলক জ্ঞান যাহাতে জন্মিতে পারে, এরূপ কিছু প্রবন্ধাদিও মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপিয়াছি। কিন্তু আমরা এ-পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামান্য যে-সেবা অ-বাঙালীদের মধ্যে তৎসম্বন্ধে কৌতূহল-উদ্রেক-কল্পে করিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিব না বলিয়া, এবং বাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অহঙ্কৃত আস্ফালন ব্যতীত অবাঙালীদিগকে উহার জ্ঞান দিবার কোন কার্যগত উৎসাহ দেখিতে পাই না বলিয়া, "নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যপ্রসার সমিতি"র কোন সেবা করিতে আমরা অসমর্থ, যদিও সমিতি কৃপা করিয়া প্রবাসীর সম্পাদককে উহার অন্যতম সহকারী সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের যে-যে প্রদেশের মাতৃভাষা হিন্দী নহে, তথায় হিন্দীর জ্ঞানবিস্তারার্থ হিন্দীভাষীদের বিপুল চেষ্টা দেখা যায়। বঙ্গেও এই চেষ্টা আছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত শান্তিনিকেতনের হিন্দীভবন। যাঁহারা ইহা নির্মাণ করাইয়াছেন, তাঁহারা শান্তিনিকেতনে এক জন হিন্দীর অধ্যাপকও রাখিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে পাঁচ শত কেন্দ্রে হিন্দী শিক্ষা দিবার এবং তদন্তে পরীক্ষা লইয়া উপাধি দিবার ব্যবস্থা আছে। অ-হিন্দীভাষীদের হিন্দী-শিক্ষা সহজ ও সুগম করিবার নিমিত্ত প্রাথমিক কয়েকটি পুস্তকও প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল চেষ্টার তুলনায় আমরা অবাঙালীদিগের বাংলা শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্যের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কি করিয়াছি? যাহা করা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য।

—

বীরসিংহা গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন

মেদিনীপুর শহরে ইতিপূর্বেই মহাসমারোহে শ্রীমদ্ আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবনের দ্বার-মোচন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রাম বীরসিংহায় তাঁহার স্মৃতিভবনের দ্বার মোচন বাকী ছিল। তথায় তাঁহার স্মৃতিসংরক্ষণ প্রচেষ্টার সূত্রপাত আগে হইতেই হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়াছে।

বীরসিংহার স্মৃতিসদনটির দ্বারমোচন অনুষ্ঠান গত ৩ঠা চৈত্র নির্বাহিত হয়। কোনও প্রসিদ্ধ মান্যগণ্য ব্যক্তিকে না-পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ কাজটি প্রবাসীর সম্পাদকের দ্বারা নির্বাহ করাইয়াছেন। প্রবাসীর সম্পাদকের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্য। বীরসিংহা গ্রামটি ছোট, মেদিনীপুর শহর হইতে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত সুবৃহৎ মণ্ডপটি মহিলা ও পুরুষদের সমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার বাহিরেও বিস্তর লোক দাঁড়াইয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সময়ে বলিয়াছেন, সভায় দশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আমরা যদি বলি পাঁচ হাজার, তাহা অত্যুক্তি হইবে না। ইহার মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছিলেন মহিলা। ছোট গ্রামের সভায় এত মানুষের উপস্থিতি বিস্ময়ের বিষয়। বিদ্যাসাগরের জীবনমাহাত্ম্য ইহার প্রধান কারণ, মেদিনীপুরে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন-জনিত জন-জাগৃতিও একটি কারণ। মেদিনীপুর শহর হইতে অল্পসংখ্যক লোক গিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ, ঝাড়গ্রামে বিধবাদের শিক্ষার্থে বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের শাখা প্রতিষ্ঠা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাল্যে ও যৌবনে বৈধব্যদশা প্রাপ্তা বিধবাদের বিবাহ দিবার নিমিত্ত কর্মিষ্ঠ সমিতি স্থাপন করিলে তবে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে।

মূলঘর দর্শন

মূলঘর খুলনা জেলার একটি গ্রাম। সেই গ্রামে স্থিত খড়মিয়া উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের "সুবর্ণজয়ন্তী" উপলক্ষ্যে গিয়া গ্রামটি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। ইহার লোকসংখ্যা মোটামুটি চারি হাজার। ইহার উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়টি ৫০ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়। জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ইহার বিস্তর প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ অনুকরণীয়। গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও আছে। জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পুরাতন পুথি, মুদ্রা, খোদিত ইট, প্রাচীন জমা-খরচের কাগজ, দলিল প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কোন কোন ছাত্রের উদ্ভাবিত ও নির্মিত যন্ত্রাদিও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

গ্রামের সমুদয় প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দিবার স্থান নাই, কেবল তাহাদের নাম উল্লেখ করিব। যথা—

বীণাপাণি গ্রন্থাগার (নিজের পাকা বাড়ীতে স্থিত); হিতৈষী সমবায় সমিতি (নিজের পাকা বাড়ীতে অবস্থিত এই সুপরিচালিত পল্লীসমবায় ব্যাঙ্কটির এক টাকা পর্যন্ত চেক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকায় স্থানীয় মজুর, গোয়ালা প্রভৃতিও তাহাদের প্রাপ্য টাকা চেকে লইয়া থাকে); কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (নিজের পাকা বাড়ী নির্মিত হইতেছে); পল্লীসংগঠন সমিতি; পল্লী স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি (ইহার পাকা চিকিৎসালয় আছে, সভ্যেরা বিনা ভিজিটে সমিতির ডাক্তারের সাহায্য পান, দরিদ্র রোগীরা বিনামূল্যে ঔষধ পায়, এবং সমিতি গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির নানাবিধ চেষ্টা করেন); স্বস্তিকা হোসিয়ারী (এখানে গেঞ্জি প্রস্তুত হয়); শ্রম বিদ্যালয় (এখানে নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি, পা-পোষ ও ম্যাটিং প্রস্তুত হয়, এবং মহিলা ও বালিকাদিগকে সুইডিশ তাঁতে তোয়ালে, টেবিল-ক্লথ, ব্লাউস-পীস্ প্রভৃতি বুনিতে শিখান হয়, এবং চামড়ার কাজ শিখান হয়); গো-জাতির উন্নতি সাধন চেষ্টা; গোরুর খাদ্যের নিমিত্ত নেপিয়ার ঘাসের চাষ, এবং কৃষি-উদ্যান (ইক্ষু ও নানাবিধ তরকারি উৎপাদনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ইহার কাজ)।

আমাদের গ্রামগুলি, এবং শহরগুলিও, মূলঘরের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে দেশের কল্যাণ হইবে।

—

কলিকাতার মেয়রের বিদায় গ্রহণ

কলিকাতার মেয়র যিনি যে বার নিযুক্ত হন তিনি নামে এক বৎসর কিন্তু কার্য্যতঃ কয়েক মাস মেয়র থাকেন। বর্ত্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেনের কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে। তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন, যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় মনে হইতে পারে সেরূপ নহে। তিনি আবার মেয়র নির্ব্বাচিত হইলে ভাল হইত, কিন্তু তিনি কৌন্সিলর-পদপ্রার্থীও না-হইয়া তদ্দ্বারাই জানাইয়াছেন আর মেয়র হইবেন না।

—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিলর নির্ব্বাচন

কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিলর নির্বাচন, কোথাও কোথাও গুণ্ডামি জাল-ভোট-সংগ্রহ ঘুষ ইত্যাদি সহকারে, শেষ হইয়া গিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার ভিত্তিতে প্রণীত ভারতশাসন আইনে যেমন বঙ্গে ইংরেজ ও মুসলমান প্রাধান্য স্থাপনের ব্যবস্থা আছে, সংশোধিত নূতন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনেও সেইরূপ কৌশল আছে—যদিও সমগ্র-বঙ্গের ন্যায় কলিকাতায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে। এই নগরে হিন্দুরাই সংখ্যায় খুব বেশী এবং ট্যাক্সেরও অধিক অংশ তাহারাই দেয়। কিন্তু আইনে যতগুলি হিন্দু কৌন্সিলর নির্বাচিত হইবার কথা আছে, তাহাদের সংখ্যা কলিকাতার মোট হিন্দুর সংখ্যার অনুরূপ নহে, তাহাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের অনুপাত অনুযায়ীও নহে, এবং তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সার্বজনিক কর্মোৎসাহ প্রভৃতির অনুরূপ ত নহেই। নামে হিন্দু কৌন্সিলরদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে এমন ভাবে নানা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যে কর্পোরেশনে হিন্দুর ন্যায্য প্রাধান্য থাকিবে না। তাহার উপর হিন্দুদের নিজের দলাদলি ত আছেই।

ফলে, এক দিকে মুসলিম লীগ প্রায় সব মুসলমান আসন দখল করিয়াছে, সেগুলির প্রায় সবগুলিতে অ-বাঙালী মুসলমান বিরাজ করিবে, এবং তাহারা ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইবে ও তপসিলভুক্ত হিন্দুদিগকে ও সরকার-মনোনীত সভ্যদিগকে হাত করিবার চেষ্টা করিবে, অন্য দিকে হিন্দুরা হিন্দুমহাসভা, সুভাষপন্থী, ও স্বতন্ত্র এই তিন দলে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু সংহতি ঘটা দুর্ঘট। হিন্দুমহাসভা যে প্রথম উদ্যমেই, পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও কায়েমি তোড়জোড় না-থাকা সত্ত্বেও, অনেকগুলি আসন দখল করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের উৎসাহ ও লোকপ্রিয়তার পরিচায়ক। সুভাষ-পন্থীদের অনেকগুলি আসন পাইবার কারণ, নির্বাচন-কার্যে সুভাষবাবুর ও শরৎবাবুর অভিজ্ঞতা, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অক্লান্ত অবিরাম পরিশ্রম, অভিজ্ঞ সংঘবদ্ধ কর্মিদল, দেশের জন্য অতীত কালে সুভাষবাবুর স্বার্থত্যাগ ও দুঃখভোগের সত্য খ্যাতি, এবং কংগ্রেসের নামের অবৈধ ব্যবহার। বঙ্গের সাবেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির নেতা ছিলেন সুভাষবাবু। কিন্তু এই কমীটি খারিজ হইয়াছে, সুভাষবাবুর কোন কংগ্রেস কমীটির সভ্য নির্বাচিত হইবার অধিকার তিন বৎসরের জন্য লুপ্ত হইয়াছে, এবং বৈধ কংগ্রেস কলিকাতার নির্বাচনের সংস্রবে থাকিবেন না আগেই ঘোষিত হইয়াছিল। সুতরাং সুভাষপন্থী কৌন্সিলরদিগকে বৈধভাবে কংগ্রেসী বলা চলে না।

হিন্দু কৌন্সিলররা ও অল্ডারম্যানরা নাম ও দল লইয়া ঝগড়া না-করিয়া একসমষ্টিভুক্ত হইলে হিন্দুদের অনিষ্ট কতকটা নিবারিত হইবে; নতুবা কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে ন্যায্য হিন্দুপ্রভাব লুপ্ত হইবে, অর্থের খুব অপব্যবহার হইবে, এবং পৌর কল্যাণকর্ম সকল দিকে ব্যাহত হইবে।

ধর্মসম্প্রদায়, ন্যাশন্যালিটি, ও শ্রেণী অনুসারে আসন বাঁটিয়া দিয়া স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা না করিয়া, আইন যদি পূরা সম্মিলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে আমাদিগকে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার কথা লিখিতে হইত না। সাম্প্রদায়িকতার আমরা বিরোধী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে হিতকর। ন্যায্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইলে হিন্দুদের কোন ক্ষতি হইত না, কারণ যোগ্যতা অনুসারে প্রতিযোগিতায় তাহারা পশ্চাৎপদ নহে। সেরূপ প্রতিযোগিতায় সিদ্ধকাম না হইলেও তাহারা কোনরূপ কূট রাজনৈতিক ফন্দীর সাহায্য ভিক্ষা

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নিকট করিত না। ভারতশাসন-আইন এবং সংশোধিত কলিকাতা মিউনিসিপাল-আইন হিন্দুদের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায্য প্রভাব নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়াই আমাদিগকে তাহাদের স্বার্থের ও স্বার্থরক্ষার কথা লিখিতে হইল।

—

নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন

গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই চৈত্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র শিলাইদহ পল্লীতে নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যত দূর জানি, ইহাই এরূপ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত বাংলা দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই অধিবেশন সম্ভব হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণপত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন :—

"আমার যৌবনের ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরসসাধনার তীর্থস্থান ছিল, পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ আর সহজগম্য নয়, কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে। সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে সে কথা এই উপলক্ষ্যে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে রাখলুম।"

নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কাজ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার অভিভাষণে পল্লীসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং বাউল ও মুর্শিদা গানের রূপ, তত্ত্ব ও রসের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় শিলাইদহকে পৃথিবীর কবি ও সাহিত্যিকের তীর্থ-স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন এবং প্রতিবর্ষে যাহাতে এখানে এইরূপ একটি অনুষ্ঠান হয়, সে জন্য বাংলার প্রত্যেক লোককে সচেষ্ট হইতে বলেন। রাত্রে বাউল ও মুর্শিদা গানের এক বিরাট্ জল্‌সা হয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় অনিবার্য কারণে চলিয়া যাওয়ায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় পরদিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহাশয় বাংলার বাউল ও মুর্শিদা গানের মরমী অংশের কথা উল্লেখ করেন ও উহার ভাবসম্পদের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি মুন্‌সী নুরুদ্দিন আহম্মদ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় গৃহীত তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে প্রথমটি এই :—

(১) বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসাধনক্ষেত্র শিলাইদহ পল্লী অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সাহিত্যতীর্থরূপে পরিণত হইবে মনে-প্রাণে ইহা অনুভব করিয়া, এই নিখিল-বঙ্গ পল্লী-সাহিত্য-সম্মেলন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিকুঞ্জ "শিলাইদহ কুঠীবাড়ী" যাহাতে জাতীয় সম্পদরূপে সংরক্ষিত হয়, তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানসমূহকে ও "শিলাইদহ কুঠীবাড়ী"র বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী মহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছেন।

শিলাইদহে "কবির পুণ্যস্মৃতিকে বহন করিয়া তাঁহার ভবনখানি নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ওখানেই গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ হয়। ঐ গৃহখানি জাতির মহাসম্পদ—বাংলা সাহিত্যের একটি পীঠস্থান। শিলাইদহের কুঠী-বাড়ীকে ঘিরিয়া কবির বহু গীতিকবিতা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। বর্ষে বর্ষে যাহাতে ওখানে রবীন্দ্রভক্তদের সমাগম হয় তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।" ইহা বড়ই আনন্দের সংবাদ। কবির শিলাইদহের কুঠীবাড়ীটি জাতীয় সাহিত্যতীর্থরূপে সুরক্ষিত হয় এবং তথায় সাহিত্য-সাধকদের ও সাহিত্যরসপিপাসুদের সমাগম হয়, ইহা সর্বথা অতীব বাঞ্ছনীয়।

—

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের শেষ রচনা

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সৌজন্যে তাহার সহিত মডার্ণ রিভিয়ুর বিনিময় হইয়া থাকে। ঐ দৈনিকে লেখা হইয়াছে, গত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ মহোদয় "পোল্যাণ্ড ও যুদ্ধ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ রচনা। তাঁহার লিখিত কোন্ প্রবন্ধটি তাঁহার শেষ রচনা জানি না। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ুতে তাঁহার নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

জানুয়ারী—The World Outlook Today: America.

ফেব্রুয়ারী—The World Outlook Today: India.

ফেব্রুয়ারী - Raja Rammohun Roy.

মার্চ—Dadabhai Naoroji.

এপ্রিল—Sir R. Venkata Ratnam Naidu.

এপ্রিল—Lala Har Dayal.

এতদ্ভিন্ন তিনি ফেব্রুয়ারী ও মার্চ সংখ্যায় কতকগুলি পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। "The World Outlook" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি পীড়ায় শয্যাশায়ী হন।

—

"জাতীয় সপ্তাহ"

ভারতবর্ষে যত প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমীটি আছে, তাহার মধ্যে বঙ্গের পুরাতন বঙ্গীয় কংগ্রেস কমীটি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খারিজ হয় এবং নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমীটি মনোনীত হয়। 'বৈধ' নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ৬ই এপ্রিল হইতে এক সপ্তাহ "জাতীয় সপ্তাহ" রূপে পালন করিতে কংগ্রেসীদিগকে আদেশ করেন। অন্য দিকে বঙ্গের খারিজ প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমীটি, সুভাষবাবু ও স্বামী সহজানন্দ ঐ সপ্তাহটিই তাঁহাদের দলভুক্ত লোকদিগকে "জাতীয় সপ্তাহ" রূপে পালন করিতে বলেন। তাঁহাদের "জাতীয় সপ্তাহ" অনুষ্ঠান বাংলা-গবন্মেণ্টের অর্ডিন্যান্স দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহার কার্যপদ্ধতি, কার্যবিবরণ বা তৎসংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ। তদ্বিষয়ক কোন মন্তব্য করিতে গেলেও পরোক্ষভাবে কিছু খবর আসিয়া পড়ে, সুতরাং তাহাও নিষিদ্ধ মনে করিতে হইবে।

—

"চরখা-যজ্ঞ"

'বৈধ' কংগ্রেসের কলিকাতায় "জাতীয় সপ্তাহ" অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল সূত্র-যজ্ঞ বা চরখা-যজ্ঞ। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ইহার আয়োজন হইয়াছিল। অনেক পুরুষ ও মহিলা চরখা লইয়া সেখানে সুতা কাটিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের বিরোধী দলের কতকগুলি লোক আসিয়া নানারূপ ধ্বনি করেন ও অনুবিধ বাধা উপস্থিত করেন। মহিলা ও পুরুষদের উপর ধুলা ও কাঁকর প্রভৃতি নিক্ষেপ তাহার অন্তর্গত। যাঁহারা সুতা কাটিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আহতও হইয়াছিলেন।

সুভাষপন্থী দৈনিক ও অন্য দৈনিক কাগজগুলির এই ঘটনার বর্ণনায় অন্ততঃ একটি বিষয়ে মিল আছে; তাহা এই যে, বিঘ্ন-উৎপাদনকারীরা "সুভাষবাবু কী জয়!" এইরূপ ধ্বনি করিয়াছিল। তাহা হইতে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধ-পক্ষীয় লোকেরা এবং অনেক নিরপেক্ষ লোকেও এইরূপ অনুমান স্বভাবত করিতে পারেন যে, বিঘ্ন-উৎপাদনকারীরা সুভাষপন্থী। কিন্তু আর একটা অনুমান এই হইতে পারে যে, তাহারা সুভাষবাবুর শত্রু, লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত "সুভাষবাবু কী জয়" ধ্বনি উত্থাপন করিয়াছিল। যে-অনুমানই সত্য হউক, এই শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনা সম্বন্ধে সুভাষবাবু নিজের মত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

চরখায় সুতা না-কাটিলে কেন স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে না, অহিংস হইতে হইলে এবং অহিংস উপায়ে স্বরাজ অর্জন করিতে হইলে চরখায় সুতা কাটা কেন একান্ত আবশ্যক, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তাহা অনাবশ্যকও মনে করি না। অধিকন্তু, অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব বলি দিতে হয় বলিয়া, চরখা-যজ্ঞেও চরখা বলি দিতে হইবে মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। চরখার সুতা ও হাতের তাঁতে বোনা খাদির পক্ষপাতীরা সুতা ও কাপড়ের মিলের যন্ত্রপাতি ত ভাঙিয়া দেন না। তাঁহারা অহিংস থাকেন। সেইরূপ চরখা ও খাদির বিরোধীরাও চরখা ও খাদি সম্বন্ধে অহিংস থাকিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের 'দেশ-সেবা' বাতিল হয় না। সুতাকাটুনী মহিলাদেরও উপর ধুলা কাঁকর নিক্ষেপ ও তাঁহাদেরও

লাঞ্ছনা হইয়া থাকিলে তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য অভদ্রতা ও কাপুরুষতা।

—

মৌলানা আবুল কলাম আজাদের অভিভাষণ

কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনের সভাপতি মৌলানা আবুল কলাম আজাদের অভিভাষণটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও বিশদ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। তাঁহার এবং অন্য বহু বা সমুদয় কংগ্রেসীর ধারণা বোধ হয় এইরূপ যে, ব্রিটেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধে নামিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত। আমাদের মত ঠিক্ তাহা নহে। জার্ম্মেনী জয়লাভ্ দ্বারা প্রবলতর হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ আছে, আমরাও ইহা বিশ্বাস করি। এবং ব্রিটেনের যুদ্ধ সেই বিপদ নিবারণের জন্য বটে। কিন্তু গণতান্ত্রিকতা ও মানবস্বাধীনতা নিরঙ্কুশ করিবার উদ্দেশ্য যে এই যুদ্ধের আংশিক কারণ নহে, আমরা এরূপ মনে করি না। ব্রিটেন, যুদ্ধ চলিতে চলিতে বা যুদ্ধের অবসান হইলে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করুন বা না-করুন, জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে তাঁহার লড়িবার ন্যায্য কারণ ছিল ও আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ব্রিটেন ইয়োরোপে গণতান্ত্রিক এবং ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী, এটা অত্যন্ত গর্হিত অসঙ্গতি। তথাপি, ব্রিটেনের গণতান্ত্রিকতা ও স্বাধীনতার পক্ষপাতিত্ব ইয়োরোপের সীমাতেই আবদ্ধ থাকিলেও, তাহা নির্জ্জলা ভণ্ডামি না-হইতেও পারে। এইরূপ অসঙ্গতি অন্য অনেকের আছে, আমাদের দেশেও আছে।

ইয়োরোপীয় জাতিরা মনে করে, স্বাধীনতাটা তাহাদেরই একচেটিয়া জন্মস্বত্ব, মৌলানা আজাদ এই মর্ম্মে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অতীব সত্য।

তিনি তাঁহার বক্তৃতার দুই জায়গায় এক দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্য দিকে নাৎসি-বাদ ও ফাসিস্টবাদের তুলনা করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে অধিকতর অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় বলিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, যে, ভারতবর্ষের অনিষ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতেই হইয়াছে (এবং তাহা খুব বেশি), অন্য দুইটা দ্বারা হয় নাই। কিন্তু ঐ দুটা অন্যান্য কোন কোন দেশে (এবং নিজেদের দেশেও) যাহা করিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা অনিষ্টকারিতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমকক্ষতা করিতে, এমন কি তাহাকে অতিক্রম করিতেও সমর্থ।

মৌলানা আজাদ বলিয়াছেন, মুসলমানরা, হিন্দুরা ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মিলিত ভাবে ভারতবর্ষীয় নেশ্যনের অঙ্গ। সকলকে লইয়াই যে ভারতীয় নেশ্যন বা মহাজাতি, তাহা সত্য। জিন্নাপন্থীরা মুসলমানরাই একটা আলাদা নেশ্যন বলায়, কাজে কাজেই ভিত্তিহীন রব উঠিয়াছে, কেবল হিন্দুরাই ভারতীয় নেশ্যন।

মৌলানা আজাদ বলেন, প্রচলিত অর্থে মুসলমানেরা একটা মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু দল নহে। কারণ তাহারা সংখ্যায় আট নয় কোটি এবং ইসলাম তাহাদিগকে এরূপ সামাজিক গণতান্ত্রিকতা ও মানসিক প্রকৃতি দিয়াছে যে, তাহার ফলে তাহারা আত্মস্বার্থরক্ষায় সমর্থ।

এই কথাগুলি শুনিতে বেশ ভাল। কিন্তু মৌলানা সাহেব যদি সত্যই এইরূপ মত পোষণ করেন, তাহা হইলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাকল্পে যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা ও পৃথক্ নির্বাচনের ব্যবস্থা আইন করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দও তিনি কেন তাঁহার অভিভাষণে করেন নাই। ইসলামিক বিধানের ফলে মুসলমানরা গণতান্ত্রিক সাম্য ও একতাবিশিষ্ট, দৃঢ়চিত্ত, সাহসী, আত্মরক্ষায় সমর্থ, এই প্রশংসাটা তিনি চান, অথচ আবার আইনের সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার ও পৃথক্ নির্বাচনের সুবিধাটাও তিনি চান—এই রূপই কি মনে করিতে হইবে? তাহা যদি মনে করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তিনি "স্বর্ণলতা" উপন্যাসের গদাধর চন্দ্রের মত ডুগ্‌ও চান আবার টামাকও চান।

—

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পরীক্ষা-পরিষদ

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পরীক্ষা-পরিষদ বৎসরে একবার করিয়া প্রবেশিকা ও বিশারদ উপাধি পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—(ক) প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সহিত পরিচয়, (খ) বঙ্গভাষার আভিজাত্য সংরক্ষণ। এই পরিষদের "প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কাহারও কোনরূপ বিশেষ

যোগ্যতার প্রয়োজন হইবে না। বাঙালী অ-বাঙালী যে-কোন বয়সের পুরুষ ও নারী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেন।" নিয়মাবলীর জন্য পরিষদের পরীক্ষা-সচিব শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য, ডি. লিট, মহাশয়কে স্বস্তিক ভবন, জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ, ঠিকানায় চিঠি লিখিতে হইবে। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ।

দুইটি উপাধি-পরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট ও অনুমোদিত পুস্তকসমূহের তালিকা দেখিলাম। মোটের উপর তালিকা দুইটি মন্দ নহে। এরূপ কোন কোন বহি তালিকায় আছে যাহা বহুদিন হইতে ছাপা নাই এবং অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। যাহা তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত ছিল না, এরূপ বহিও তালিকায় আছে। অক্ষয়কুমার দত্তের কোন পুস্তকই কোন তালিকায় নাই। উপন্যাস ও নাটক বিভাগের তালিকার পুনর্বিবেচনা বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের আপেক্ষিক দারিদ্র্য

বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক দারিদ্র্যের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গে জমিদার, ব্যারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী। এইরূপ তথ্যসমূহ হইতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, মোটের উপর অধিকাংশ বাঙালী হিন্দুর অবস্থা অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানের অবস্থার চেয়ে ভাল। এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মুসলমানদের শিক্ষার জন্য গবর্ন্মেণ্ট ছাত্রনিবাস, বৃত্তিদান, বিনাবেতনে পড়িবার অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের সম্বন্ধে যেরূপ বিবেচনা করেন, হিন্দুদের সম্বন্ধে তাহা করেন না, কূট-রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে কেবল তপসিলী হিন্দুদের জন্য কিছু করেন। ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য সরকার যাহা ব্যয় করেন, তাহা হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয়ের অন্ততঃ ১৫।১৬ গুণ। তা ছাড়া, সকল সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষার সরকারী ব্যয় ত আছেই।

মডার্ণ রিভিয়ুর উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে যতীন্দ্র বাবু সরকারী রিপোর্ট ও কাগজপত্র হইতে সাংখ্যিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুদের মধ্যে দরিদ্রতর লোকদের অনুপাত মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্রতর লোকদের অনুপাত অপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ সাধারণ হিন্দুদের অবস্থা সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা অপেক্ষা মন্দ;—যদিও মুসলমান সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজে অপেক্ষাকৃত ধনী অল্পসংখ্যক লোক বেশী আছে। অতএব দরিদ্র লোকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইলে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদিগকেই বেশী সুবিধা দেওয়া উচিত, অন্ততঃ উভয়কে সমান সুবিধা দেওয়া উচিত।

সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা সাধারণ হিন্দুদের চেয়ে ভাল হইবার একটি প্রধান কারণ, মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু জাতিভেদ প্রথার অনস্তিত্ব এবং "ভদ্রলোক" বলিয়া পরিচিত হইবার একান্ত ঔৎসুক্যের অভাব। মুসলমানরা রাজমিস্ত্রী, ছুতার, দরজি, নাপিত, ধোবা—যাহা কিছু হইতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদা যায় না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ,...খাইতে না পাইলেও রাজমিস্ত্রী নাপিত প্রভৃতি হইবেন না; কেহ কেহ বেতনভোগী লোক রাখিয়া ছুতার, ধোবা প্রভৃতির ব্যবসায়ে নামিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। অন্য দিকে, বাঙালী হিন্দু ছুতার, ধোবা, নাপিত প্রভৃতি কৌলিক বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া লম্বা কোঁচা দুলাইয়া "ভদ্রলোক" হওয়ায় যথেষ্ট কেরানী-গিরি পাইতেছেন না, বেকার হইতেছেন, এবং তাঁহাদের কাজ বাঙালী মুসলমান বা পশ্চিমা ছুতার নাপিত প্রভৃতিরা দখল করিতেছে। আমরা কাহাকেও অ-ভদ্রলোক মনে করি না। সকলকেই সম্মানার্হ মনে করি। ইহাও মনে করি না যে, প্রত্যেকেরই কেবল কৌলিক বৃত্তিই অবলম্বন করা উচিত, কিংবা কতকগুলি কৌলিক বৃত্তি "ভদ্র" বৃত্তি নহে মনে করি না। কিন্তু আমরা ইহা বলিলে কি হয়? বহুযুগ ধরিয়া, জাতিভেদের প্রভাবে, মানুষের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, "ভদ্রলোক" কোন কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে না, এবং সেই-সেই-বৃত্তি-অবলম্বী ব্যক্তি "ভদ্রলোক" হইতে পারে না।

মুসলমান উত্তরাধিকার বিধি অনুসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সম্পর্কিত সকল পুরুষ ও নারীর অল্পাধিক অধিকার থাকায়, এক দিকে যেমন কতকগুলি লোকের হাতে প্রভূত ধন কেন্দ্রীভূত হইবার বাধা ঘটে, অন্য দিকে সেইরূপ সর্বসাধারণের স্বত্বসাম্যের সম্ভাবনাও ঘটে।

—

হিন্দু কন্‌ফারেন্সে সমাজসংস্কার

কয়েক বৎসর হইতে হিন্দু মহাসভার এবং অন্য কোন কোন হিন্দু সভার উদ্যোগে যে-সব কন্‌ফারেন্স হইতেছে, তাহাতে সমাজসংস্কারসমর্থক নানা প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ। কিন্তু প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে তাহার ফল কি হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থাও হওয়া আবশ্যক। একটি দৃষ্টান্ত লউন। সম্প্রতি পাবনায় এবং গত দুই-এক বৎসরের মধ্যে বঙ্গের একাধিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সে ভিন্ন ভিন্ন জা'তের (casteএর) মধ্যে বিবাহ বাঞ্ছনীয় বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। আমরাও অবশ্য তাহার সমর্থন করি। কিন্তু এরূপ মিশ্র বিবাহের সন্তানদের জা'ত কি হইবে? তাহাদের কি এক একটা নূতন জা'ত হইবে? এরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, বঙ্গের কোন কোন জা'ত এইরূপ মিশ্র বিবাহ হইতে উৎপন্ন। যদি মিশ্র বিবাহের সন্তানদিগকে লইয়া নূতন নূতন জা'ত গড়া হয়, তাহা হইলে এরূপ সমাজসংস্কারে জাতিভেদ প্রথার একতা-বিনাশক শক্তি নির্মূল ত হইবেই না, অধিকন্তু মিশ্র বিবাহের সন্তানদিগকেও অসুবিধায় ফেলা হইবে। এই জন্য আমাদের মনে হয়, হয় জাতিভেদ ঠিক্ বজায় রাখিতে হইবে, নয় ভাঙিয়া দিতে হইবে; মধ্যপন্থা নাই, দু-নৌকায় পা দিলে চলিবে না।

—

রফাবিরোধী সম্মেলন

রামগড়ে রফাবিরোধী সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি রূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব না, যেমন রামগড়ে কংগ্রেস-সভাপতির বক্তৃতারও বিস্তারিত আলোচনা করি নাই। সুভাষবাবুর শেষবাক্য ও প্রশ্নটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তিনি বলিয়াছিলেন:—

"A compromise with Imperialism will mean that an anti-Imperialist national struggle will soon be converted into a civil war among the people themselves. Would that be desirable from any point of view?"

তাৎপর্য্য। "সাম্রাজ্যবাদের সহিত রফার মানে এই হইবে যে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা অচিরে জনগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধে পরিণত হইবে। তাহা কি কোন দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় হইবে?

উত্তর, হইবে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সহিত রফা বা তাহার পূর্বগামী কথাবার্তার আগেই যে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, দেশবন্ধু পার্কে..."সুভাষবাবু কী জয়"এর দল খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহা কি বাঞ্ছনীয় হইয়াছে? যাহারা "সুভাষবাবু কী জয়" বলে, স্বভাবতঃ তাহাদিগকে লোকে সুভাষপন্থী মনে করিতেছে। কিন্তু ইহা একেবারে অসম্ভব নহে যে, তাহারা সুভাষবিরোধী, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত গুণ্ডামির সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। কিন্তু এরূপ অনুমানের প্রমাণ চাই।

সহজ বুদ্ধিতে এবং অভিজ্ঞ আইনজীবীদের মতে এইরূপ ধারণা স্বাভাবিক, যে, মোকদ্দমায় যে-পক্ষ রফার জন্য আগেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহাদের 'কেস্'টা কাঁচা অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় নিশ্চয়ই তাহাদের দিকে এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টায় সত্য ও ন্যায় যে আমাদের পক্ষে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং রফার জন্য আগ্রহ অপর পক্ষেরই আগে দেখান উচিত, আমাদের নহে। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে আগেই রফার জন্য আগ্রহ-প্রদর্শন নিবারণ করা যদি সুভাষবাবুর উদ্দেশ্য হয়, তাহার নিন্দা আমরা নিশ্চয়ই করি না, করিব না—যদিও আমরা তাহা আবশ্যক মনে না-করিতে পারি। কিন্তু "সুভাষবাবু কী জয়" চীৎকারীদের উপদ্রব নিবারিত হওয়া উচিত, এবং তাহাদের মধ্যে বালকদিগকে টানিয়া আনা চরম দেশদ্রোহিতা।

—

বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দির স্থাপনের প্রস্তাব

গত মাসের "প্রবাসী"তে বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দির

নির্মাণের প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। এ-বিষয়ে অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহারই কোন কোনটি সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।

কবি ও অন্য লেখকদের রচনাই তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার প্রধান উপায় হইলেও, সকল দেশেই, বাংলা দেশেও, অনেক লেখকের স্মৃতিমন্দির মূর্তি প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। সুতরাং চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির নির্মাণের প্রস্তাবে কিছু অদ্ভুতত্ব নাই।

এমন কথা যদি বলা হয় যে, চণ্ডীদাস এত ছোট কবি, যে, তাঁহার স্মৃতিমন্দির নির্মাণ না-করাই ভাল, তাহা হইলে আমরা নিজে কিছু না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ গত ফাল্গুন মাসে বাঁকুড়ায় তাঁহার একটি বক্তৃতায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন ও যাহার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যার ৫১ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফ হইতে ৫২ পৃষ্ঠার শেষ পর্য্যন্ত আছে (এবং যাহা তাঁহার অনুমোদিত), তাহাতে সংশয়াপন্ন ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিপাত যাচ্ঞা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বহু বৎসর পূর্ব্বের এক গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও পঠনীয়।

তাহার পর প্রশ্ন হইতে পারে, চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির বাঁকুড়ায় কেন নির্মিত হইবে। আমাদের বাঁকুড়ার মানুষদের উত্তর এই যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় চণ্ডীদাস ছিলেন। চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন কিনা, সে প্রশ্নের আলোচনা এখানে করিব না। তাহা থাকিলেও, আমাদের বিশ্বাস প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস ছাতনায় ছিলেন। আমি বাল্যকাল হইতে ইহা শুনিয়া আসিতেছি। অন্য প্রমাণও বহুবার 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। ১৩৩৩ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানার দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ এবং তাহার উপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির দীর্ঘ মন্তব্য দ্রষ্টব্য। 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যাতেও বিদ্যানিধি মহাশয় কিছু লিখিয়াছেন।

যাঁহাদের বিশ্বাস চণ্ডীদাস অন্যত্র ছিলেন, তাঁহারা সেখানেও তাঁহার স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করিতে পারেন। তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি থাকিতে পারে না; যদি থাকিত, তাহা হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবার অধিকার তাঁহাদের থাকিত।

চণ্ডীদাস যে-সময়ের মানুষ তখন বাংলা দেশ ছিল, কিন্তু তাহার যে দুটা ভাগকে এখন বীরভূম জেলা ও বাঁকুড়া জেলা বলা হয়, তখন ভাগ দুটার আয়তন ও নাম এরূপ ছিল না, ভাগও এরূপ ছিল না। সুতরাং এমন হইতে পারে যে, যে-দুটা ভাগকে এখন বাঁকুড়া জেলা ও বীরভূম জেলা বলা হয়, সেই দুটা ভাগেরই কোন কোন স্থানে চণ্ডীদাস কখন কখন জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সকল স্থানেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে।

বস্তুতঃ, চণ্ডীদাস বাঙালীর কবি, অতএব বঙ্গের যে-কোন স্থানে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার জন্মকালে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন তাহা মেদিনীপুর জেলাভুক্ত। সেই জন্য, যেমন মেদিনীপুর শহরে তাঁহার স্মৃতিমন্দির হইয়াছে, হুগলীতেও সেইরূপ হইতে পারে। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর বাণীভবন হইয়াছে, ঝাড়গ্রামে হইয়াছে, অন্যত্রও হইতে পারে। রামমোহন রায় সমুদয় ভারতবর্ষের মানুষ। তাই তাঁহার নামে রাধানগরে স্মৃতিসৌধ আছে, কলিকাতায় লাইব্রেরী আছে, বাঁকীপুরে বালক-বিদ্যালয় আছে, লাহোরে বালিকা-বিদ্যালয় ও সাধন-আশ্রম আছে, রাজমহেন্দ্রীতে বড় রাস্তা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি কাঁঠালপাড়ায়, কলিকাতায় এবং অন্যত্র রক্ষার ব্যবস্থা আছে।

নজীরের যদি প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে এই সব নজীর অনুসারে বঙ্গের সর্বত্রই চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইতে পারে; বিশেষ করিয়া পারে সেই বাঁকুড়াতেও যাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ গত ১৮ই ফাল্গুন বাঁকুড়ায় বলিয়াছিলেন, "জীবনের পরপারবর্তী এক জন কবির প্রতি এই প্রদেশের (অর্থাৎ বঙ্গের) কত বড়ো সম্মান ভালোবাসার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে এখানকার (অর্থাৎ বাঁকুড়ার) আকাশে।"

চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দিরের উদ্যোক্তারা বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাছে বিশেষ একখণ্ড জমির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্ত এখনও কেন মঞ্জুর হয় নাই জানি না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বর্ত্তমান সভ্যগণ ও সভাপতি বিনা ব্যক্তিগত ব্যয়ে চিরস্মরণীয় হইবার সুযোগটি কেন লুফিয়া লন নাই, বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যদি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের দূরদৃষ্টির ও সুবিবেচনার অভাবই ঘটে, তাহা হইলেও স্মৃতিমন্দিরের স্থানাভাব নিশ্চয়ই হইবে না বলিতে পারি।

স্মৃতিমন্দির যে অংশত ম্যুজিয়মও হইবে, সে বিষয়ে আগামী সংখ্যায় কিছু লিখিব।

—

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের শেষ বাণী

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের বাণী সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী ইংরেজীতে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইল—

"অস্ত্রোপচারের প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত সী. এফ. এণ্ডরুজ আমার নিকট এই বাণীটি মুখে বলিয়া যান এবং আমি লিখিয়া লই। যদি কিছু তাঁহার ঘটে, তাহা হইলে ইহা প্রকাশ করিতে তিনি আমায় বলেন। এই বেদনার মুহূর্ত্তে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন স্বরূপ তাঁহার বাণী আমি লোকসমক্ষে প্রকাশ করিলাম।"

বাণীটির বঙ্গানুবাদ এই—

"যখন স্থির হইল এই অস্ত্রোপচার আমাকে করাইতেই হইবে, তাহার পর হইতেই প্রতিনিয়ত এই প্রতীক্ষার দিনগুলি আমি ভগবানের চিন্তায় যাপন করিয়াছি; আমি জানি, যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। প্রতিদিন শুধু এই প্রার্থনাই করি, 'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবপ্রেরণা শান্তি-নিকেতনে অবস্থানকালে আমি যাহা আহরণ করিয়াছি সেই শিক্ষা, তৎসহ মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা এবং তাঁহার নিকট হইতে বহু বৎসর যাবৎ যে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহা আমার মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে আশ্চর্য্য রূপে সহায় হইয়াছে। হাসপাতালে কলিকাতার লর্ড বিশপ প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন; সর্ব্বোপরি সেই প্রীতিপূর্ণ আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎকারগুলি হইতে আমি প্রচুর শান্তি লাভ করিয়াছি। তীব্র যন্ত্রণা এবং একান্ত দৈহিক দুর্ব্বলতা সহ্য করিতে তাঁহার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুরাগ আমাকে অপূর্ব্ব শক্তি দান করিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তিনি আমার নিকট প্রিয়তর হইয়াছেন। ভারতবর্ষ এবং বিশ্বজগতের প্রতি ভালবাসায় তাঁহার ও আমার হৃদয় একই সূত্রে গ্রথিত।

"স্নেহশীল বন্ধুলাভ—সকল দানের শ্রেষ্ঠ এই দান—এই জীবনে আমি ভগবানের নিকট পাইয়াছি। যখন আমি আমার জীবন তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি, সেই মুহূর্ত্তে, আমার রচিত গ্রন্থগুলিতে পূর্ব্বে যাহা স্বীকার করিয়াছি, সেই শ্রেষ্ঠ দানের কথা আবার স্বীকার করিব—ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে ভগবান্ আমায় প্রকৃত বন্ধু মিলাইয়াছেন।

"যাঁহারা ভারতবর্ষে আমার নিকটে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদের কথাই এতক্ষণ বলিয়াছি। আমার জন্মভূমি প্রিয় ইংলণ্ডে যে একান্ত প্রীতিপরায়ণ বন্ধুবর্গ রহিয়াছেন তাঁহাদের কথাও অনুক্ষণ আমার মনে জাগিতেছে। পত্র ও টেলিগ্রামের মধ্য দিয়া আমি নিরন্তর তাঁহাদের নিকট হইতে আত্মিক সাহায্য লাভ করিতেছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যে সকল বন্ধু আছেন তাঁহাদের নিকট হইতেও অনুরূপ আত্মিক সাহায্য পাইতেছি।

"হাসপাতালের রুগ্ন শয্যায় আমি শয়ান, তাই বলিয়া শুধু আমারই দেহক্লেশের গণ্ডীর মধ্যে আমার আশা ও প্রার্থনা সীমাবদ্ধ থাকে নাই; নিখিল মানবসমাজের নিদারুণ যন্ত্রণার নিকট সে ক্লেশ নিতান্তই তুচ্ছ। আমি নিয়ত শুধু এই প্রার্থনাই করি, স্বর্গের মত মর্ত্ত্যেও ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

—

কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ

কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের নিজের বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে বালকদের জন্য ও বালিকাদের জন্য। এই সমুদয় বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সুব্যবস্থা করিবার এবং সবগুলি পরিচালন ও পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত, কর্পোরেশ্যন এক জন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। এই কাজটির জন্য আটান্ন জন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোক দরখাস্ত করিয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায় কি রকম লোককে এই কাজে নিযুক্ত করা উচিত, বলিতেছি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা, শিক্ষার কাজ এবং ক্রিয়াশীল রাজনীতিকের কাজ, একই মানুষে এই দুটির একত্র সমাবেশ হইলে শিক্ষার কাজটি নিশ্চয়ই অবহেলিত হয়। যাঁহার মনের ঝোঁক বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক কাজের দিকে, তিনি খুব উচ্চশিক্ষিত হইলেও শিক্ষার কাজ তাঁহার দ্বারাও ভাল করিয়া হওয়া দুর্ঘট যদি তিনি খুব দৃঢ়তার সহিত রাজনীতি সম্পূর্ণ বর্জন না করেন, বা তাঁহার কার্য্যাবলীতে রাজনীতিকে অপ্রধান স্থান না-দেন। বস্তুতঃ শিক্ষাবিষয়ক কর্মী নিয়োগ করিতে হইলে, আমরা যদি দেখি দু-জন প্রার্থীর অন্য সব যোগ্যতা সমান এবং এক জন রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক রাখেন, অন্য জন রাখেন না, তাহা হইলে আমরা অ-রাজনীতিককেই মনোনীত করিব।

লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল কেবল তাহার প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলির জন্য যত কোটি টাকা খরচ করেন, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সমগ্র ভারতবর্ষের সকল স্তরের সকল রকম শিক্ষার জন্য তাহা অপেক্ষা কম খরচ করেন। এই লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল তাহার কোন শিক্ষাকর্মীকে রাজনৈতিক কারণে নিযুক্ত করেন না, কোন রাজনৈতিক দলের লোক ইহার শিক্ষকদিগকে কোন রাজনৈতিক কাজে অনুচর রূপে বা অন্য রূপে কাজে লাগান না,—বস্তুতঃ ইহার শিক্ষা-বিভাগটি পরিচালিত হয় রাজনীতির সহিত সংস্রববিহীন ভাবে।

ভারতবর্ষের প্রধান কর্পোরেশ্যনের শিক্ষাবিষয়ক সব ব্যবস্থা ও কর্মীর নিয়োগাদিও এইরূপ অ-রাজনৈতিক ভাবে হওয়া আবশ্যক; নতুবা শিক্ষাবিষয়ক ব্যর্থতা নিশ্চিত।

শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষের পরিচালন ও শাসনের শক্তি ও অভিজ্ঞতা (Administrative ability and experience) থাকা আবশ্যক।

আমাদের দেশে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার যথোচিত হয় নাই। অতএব কলিকাতার শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষের স্বদেশে এবং শিক্ষায় উন্নত বিদেশেও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

তাঁহার শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। যাঁহার উচ্চাঙ্গের জ্ঞান দানের মত জ্ঞান আছে, নিম্নস্তরের জ্ঞান দান তাঁহার পক্ষে আরও সহজ। অতএব কলিকাতার শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষের উচ্চ শিক্ষাদান এবং প্রাথমিক শিক্ষাদান উভয় রকমেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতার বিদ্যালয়গুলি কতক বালকদের ও কতক বালিকাদের নিমিত্ত। অতএব শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, বালক ও বালিকা উভয়েরই শিক্ষালয়ের ঘনিষ্ঠ ও কার্য্যগত অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে এবং যাঁহার স্বভাবচরিত্র সন্দেহাতীত।

শিক্ষায় উন্নত সব দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত একটি শিক্ষণীয় বিষয়। অতএব শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষের সংগীতজ্ঞ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষার সর্বাঙ্গীনতা সাধনের নিমিত্ত নানা রকম খেলার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। অতএব খেলোয়াড় বলিয়া খ্যাতিবিশিষ্ট লোককে এই কাজটির জন্য পাইলে ভাল হয়।

কলিকাতায় উর্দুভাষী ও হিন্দীভাষী লোক অনেক। সুতরাং বিদ্যালয়ে তাহাদের সন্তানেরাও আসে। অধ্যক্ষ হিন্দী ও উর্দু জানা হইলে ভাল।

হাতের কাজের ভিতর দিয়া জ্ঞান লাভ করা এবং হাত ও মনকে শিক্ষিত করা উত্তম প্রণালী। অধ্যক্ষ এইরূপ প্রণালীর সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশের, এবং বাংলা দেশের, প্রাথমিক ও অন্যবিধ নানা শিক্ষার দোষত্রুটি অভাব বিস্তর আছে। ভারতবর্ষে বঙ্গের বাহিরে কোন কোন প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে অনেক বিদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ও লোকশিক্ষা অপেক্ষাকৃত উন্নত ও অগ্রসর। যদি কেহ উচ্চশিক্ষা পাইবার এবং শিক্ষাবিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার পর ইয়োরোপের ইংলণ্ডে, এবং ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতিতে, বার বার গিয়া প্রাথমিক শিক্ষা ও লোকশিক্ষা সম্বন্ধে কার্য্যগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন, প্যালেস্টাইন প্রভৃতিতে ইহুদীদের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া থাকেন, এবং ভারতবর্ষেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া থাকেন, তাহা

হইলে শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষের কাজটির জন্য তাঁহার যোগ্যতা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য ও স্বীকার্য্য।

আমরা কাজটির ৫৮ জন প্রার্থীর মধ্যে দেখিয়াছি এরূপ লোক আছেন আমাদের বর্ণিত সর্ববিধ যোগ্যতা যাঁহার আছে এবং স্বদেশের ও বিদেশের অত্যুচ্চ ডিগ্রীও যাঁহার আছে। কলিকাতা কর্পোরেশ্যন যদি তাঁহাদের শিক্ষা-বিভাগটিকে শিক্ষাবিভাগরূপেই চালাইতে ও তাহাকে আদর্শস্থানীয় করিতে চান, তাহা হইলে এইরূপ লোককেই নিযুক্ত করা উচিত।

—

চট্টগ্রামের মহিমচন্দ্র দাস

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ জননায়ক ও দেশহিতকর্মী মহিমচন্দ্র দাসের তিরোভাব হইয়াছে। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া ও নেতৃত্ব করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন, কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন বলিয়া ছাপাখানার ক্ষতি ও অন্য আঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, শিক্ষাবিস্তারের সফল চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অন্য নানা প্রকারে চট্টগ্রামের উন্নতি সাধনে তৎপর ছিলেন। তিনি এক সময়ে কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের আহ্বানে চট্টগ্রাম গিয়া যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় দেখি, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "তুমি যখন বিদ্যালয়টি বিস্তৃত খেলার মাঠ যুক্ত তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবে, আমাকে ডাকিয়ো, দেখিয়া যাইব।" ইহলোকে তাঁহার আহ্বান আর আমার নিকট আসিবে না।

—

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু শোকাবহ। তিনি বঙ্গীয় কৌন্সিলে সদস্যপদের প্রার্থী রূপে আসানসোলে কাজ সারিয়া মোটরে বর্ধমান আসিতেছিলেন। পথে পানাগড়ের নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। তিনি কৃতী অধ্যাপক ছিলেন। কলেজপাঠ্য অনেক ইংরেজী বহির তাঁহার লেখা টীকা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে আদর লাভ করিয়াছিল। তিনি বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। শব্দের ভাণ্ডার ছিল তাঁহার অফুরন্ত। বক্তৃতা করিতে উঠিয়া কথা যোগাইতেছে না এরূপ অবস্থা তাঁহার কখনও হইত না। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি নামজাদা লোক ছিলেন।

—

"প্রবাসী"র বয়স

"প্রবাসী" চল্লিশ বৎসরে পড়িল। ইহার নাবালকত্ব অনেক দিন হইল গিয়াছে, কিন্তু এখনও বার্দ্ধক্য আসে নাই। যদি ইহা আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে—আশা করি থাকিবে—তাহা হইলে বছর কুড়ি পরে ইহার বার্দ্ধক্য আসিবে। আমি ত তখন বাঁচিয়া থাকিব না। কিন্তু আমার অভিলাষ এই যে, সে বার্দ্ধক্য যেন 'বার্দ্ধক্যং জরসা বিনা' হয়।

উনচল্লিশ বৎসরে "প্রবাসী" কি করিয়াছে তাহা অন্যেরা বিবেচনা করিবেন। প্রথম পঁচিশ বৎসরে কি করিয়াছিল, সে বিষয়ে ১৩৩৩ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সর্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেজর বামনদাস বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ রামলাল সরকার, অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ, শ্রীহরিহর শেঠ প্রভৃতি তাঁহাদের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—

দোল ও হোলিখেলা

আমরা অনেক বৎসর আগে পশ্চিমে দেখিয়াছিলাম দোলের সময় হোলিখেলা উপলক্ষ্যে অশ্লীল গান ও অন্য নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাদুর্ভাব হইত। তাহা নিবারণের নিমিত্ত স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লাহোরে এবং পরে এলাহাবাদে 'পবিত্র হোলি' প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে ইহাতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি হিন্দু নেতৃবর্গ যোগ দিতেন। এখন হোলির সময় পশ্চিমে অবস্থা কিরূপ হয়, নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি না। দোলের সময় কলিকাতার

কোন কোন স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া রাজপুতানার একটি বৃহৎ রাজ্যে মহারাজার ডাক্তাররূপে বহুবৎসর প্রবাসী ও বর্ত্তমানে পেন্সন পাইয়া কলিকাতাবাসী এক জন বৃদ্ধ হিন্দু ডাক্তার আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নীচে ছাপিতেছি। বালিকা ও তরুণীদের উচ্ছৃঙ্খলতার সংবাদ বঙ্গের অন্যত্র হইতেও পাইয়া দুঃখিত হইয়াছি।

"রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যে, যেখানে শ্রীবৃন্দাবনের মত অসংখ্য রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, এই দোলপার্ব্বণ প্রকৃত মর্য্যাদার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানেও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা সভ্যতার পরিচায়ক নহে। তথায়, এই উৎসব তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ উচ্চ মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীতে নিবদ্ধ। উচ্চ, অর্থাৎ রাজকীয় শ্রেণীতে, রাজদরবারে পূজা ও নানাবিধ আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান হয় যাহাতে, অভিজাতবৃন্দ সাধারণ ধনী দরিদ্র, সকলেই আনন্দ উপভোগ করে। রাজা স্বয়ং তাঁহার কুটুম্ব সহ ও উচ্চপদস্থ আমলা পরিবৃত হইয়া সেই উৎসবে যোগদান করিয়া নগরের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। দ্বিতীয় বা মধ্য শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা দোলপূর্ণিমার দিন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে পূজা সমাপন করিয়া "হোলি বৃক্ষে" অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহা দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ পুরাকালে মেড়রো নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া তাহার রক্তে বসুন্ধরা রঞ্জিত করিয়া তাহাকে দগ্ধ করেন, এইরূপ পৌরাণিক প্রবাদ-বাক্য হইতে নাকি "হোলি বৃক্ষ" দগ্ধ করার প্রথা হইয়াছে। পরদিন ধুলণ্ডি অর্থাৎ রং খেলার দিন। হোলির প্রধান অনুষ্ঠান, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে মিষ্টান্ন আদান-প্রদান, আবির কুঙ্কুম বিতরণ। হোলি-উৎসবের এই প্রকার সদ্ব্যবহার প্রায় সপ্তাহ অবধিই চলে। তাহারা অর্থাৎ ভদ্র গৃহস্থেরা, রাস্তায় ঘাটে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ঢালিয়া দেয় না। তৃতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীতে এই "ধুলণ্ডি" প্রথাই বলবৎ। তাহাতে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা এখনও প্রচলিত থাকিলেও তাহা নিবারণ-কল্পে, সদুপদেশকারীরা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

"কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি-অভিমানী শিক্ষিত বাঙালী সমাজ আজকাল কলিকাতায় বিধিসঙ্গত পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই কেবল "ধুলণ্ডি"র তাণ্ডব অভিনয়ে যুবক ও প্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকাদিগকেও প্রকাশ্য রাজপথে যেরূপভাবে মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যাইতেছে, তাহাতে আধুনিক বাঙালী সমাজের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় না বলিয়া মনে হয়। ইহা নৈতিক অবনতির লক্ষণ নহে কি ?"

—

মেথরদিগের ধর্ম্মঘট

ইহা সাতিশয় সন্তোষের বিষয় যে কলিকাতার মেথর ধাঙড়রা ধর্ম্মঘট পরিত্যাগ করিয়াছে। অন্যত্র যেখানে এইরূপ ধর্ম্মঘট এখনও আছে বা হইতে পারে, সেখানেও নগরপরিষ্কারকদিগের অভাব ও নালিশ বিশেষ সহানুভূতির সহিত শুনিয়া প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

মায়েরা তাঁহাদের শিশুসন্তানগুলির জন্য যে কাজ করেন, এই অযথা-অবজ্ঞাত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা সমুদয় পুরবাসীর জন্য সেই প্রকার কাজ হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নমুদ্রিত কবিতাটিতে তাহাদিগকে গঙ্গাজলের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া এবং তাহাদের কার্য্যকে মহাদেবের হলাহল পানের সদৃশ বলিয়াছেন এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। সমুদয় লিখনপঠনক্ষম বাঙালীর তাহা জানিবার কথা।

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি !
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী !

নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল !
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

এই কবিতাটিতে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কোন অত্যুক্তি নাই।

—

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট

বাংলা দেশে ভূমির ও তাহার খাজনার বন্দোবস্ত কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। তাহার সভাপতি ফ্লাউড নামক এক জন ইংরেজের নাম অনুসারে তাহাকে ফ্লাউড কমিশন বলা হয়। ইহার রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে। এক জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পর তাহা প্রকাশিত হইবে। পরীক্ষায় ছয় মাস লাগিবে। এইরূপ খবর বাহির হইয়াছে এবং তাহা বিশ্বাসযোগ্য

বলিয়াও শুনিয়াছি, যে, কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিবার এবং স্বহস্তে-চাষী ও জমিদারের মধ্যবর্ত্তী জমিতে স্বত্ববান অন্য সকল ব্যক্তির স্বত্ব লোপ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন, এবং জমিদার ও অন্যান্য স্বত্ববান লোকদিগকে তাঁহাদের স্বত্বের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। স্বত্বের মূল্য কি প্রকারে নির্ধারিত হইবে জানা যায় নাই।

কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কাজ হইলে সমুদয় জমি গবন্মেণ্টের হাতে আসিবে। গবন্মেণ্ট বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক। এইরূপ গবন্মেণ্ট কর্তৃক জমি বিলি হইলে ভাল জমি ও অধিকাংশ জমি সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের সহিত বিলি হইবার সম্ভাবনা।

জমিতে বর্ত্তমানে স্বত্ববান লোকেরা ক্ষতিপূরণের টাকা নগদ পাইবেন না, ডিবেঞ্চারের মত কিছু পাইবেন। কালক্রমে তাহার মূল্য ও সুদ হ্রাস পাওয়া ও লুপ্ত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। তাহার নজীর—আইনের দ্বারা মহাজনদের আসল ও সুদ উভয়ের উপরই হস্তক্ষেপ হইয়াছে।

জমিতে স্বত্ববান লোকেরা যদি ক্ষতিপূরণের টাকা নগদও পায়, তাহা হইলেও, আইন যেরূপ তাহাতে টাকা তেজারতিতে খাটান সংকটাপন্ন, ব্যাঙ্কগুলিকেও, অনুগৃহীত-গুলি ভিন্ন, গবন্মেণ্টের মুঠার মধ্যে থাকিতে হইবে। কেনাবেচার আইনও হইতেছে। রাশিয়াতে যে সব-কিছুর উপর গবন্মেণ্টের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে তাহা মন্দ হইলেও, সেখানে মন্দের ভাল এই যে, ধর্মসাম্প্রদায়িকতা সেখানে নাই। বঙ্গে কিন্তু সব কিছুই যেরূপ-গবন্মেণ্টের আয়ত্তে আসিতে পারে, তাহা সাম্প্রদায়িক গবন্মেণ্ট।

—

ভারতবর্ষ ভাগ

জনাব জিন্নাসাহেব ভারতবর্ষকে যেরূপ ভাগ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা মুসলীম লীগের গত অধিবেশনে তাঁহার বক্তৃতায় ও গৃহীত প্রস্তাবে পুনরায় ব্যক্ত হওয়ায়, সে বিষয়ে আলোচনা বাড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে, বহু মান্যগণ্য মুসলমান, মুসলিম লীগেরও অনেক মুসলমান, ইহার বিরোধী। তাঁহারা ইহার সমালোচনা ও বিরুদ্ধ-বাদে অবতীর্ণ হওয়ায় আমাদের সে কাজ করিবার প্রয়োজন কমিয়াছে।

যে কোন রকমের ভাগাভাগি যাঁহারা চান, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষ নানা ভাগে বিভক্ত থাকায় বার-বার পরাধীন হইয়াছে। ইহা প্রাদেশিকতার প্রভাবে স্ব-স্বপ্রধান প্রদেশসমূহে, কিংবা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে, বিভক্ত হইলে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়িতে পারিবে না, কোন প্রকারে স্বাধীন হইলেও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না।

—

'মুহম্মদান' নহে, মুসলিম

বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল হুকুম করিয়াছেন যে, অতঃপর বাংলার সরকারী নথিপত্র, চিঠি ও অন্যান্য কাগজে 'মোহামেদান' বা 'মুহম্মদান' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মুসলিম' শব্দ ব্যবহৃত হইবে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ লিখিত হয় নাই। সরকারের হজরত মুহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির হ্রাস হয় নাই, সুতরাং তাহা এই পরিবর্ত্তনের কারণ হইতে পারে না।

—

আসাম-প্রবাসী বাঙালীদের অবস্থা

আসাম প্রদেশের যে-সব জেলা প্রাকৃতিক ও ভাষিক বঙ্গের অংশ তাহার অধিবাসী বাঙালীদিগকে প্রবাসী বলা যায় না; আবার যে-সকল বাঙালী ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, হয়ত পুরুষানুক্রমে করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই বা কেমন করিয়া প্রবাসী বলা যায়? আসাম প্রদেশে অসমিয়াভাষীদের চেয়ে বাংলাভাষীরা সংখ্যায় বেশী। অথচ অদ্ভুত ব্যবস্থা এই যে, বাঙালীরা সেখানে বহু ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত। অবশ্য ইহাও আমরা একটুও চাই না, যে, অসমিয়াভাষীদের অধিকার কাহারও চেয়ে কম হয়—অধিকার সকল অধিবাসীদেরই সমান হওয়া উচিত।

আসামের অধিবাসী বাঙালীদের অবস্থা আলোচনা ও প্রতিকার-চেষ্টা করিবার নিমিত্ত ডক্টর রাধা-কুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তাঁহাদের সভার অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। অল্পস্বল্প প্রতিকার

হয়ত এখন হইতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্ধারণের (Communal Decisionএর) ভিত্তির উপর প্রণীত ভারতশাসন আইনের ন্যায্য আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত পূর্ণ প্রতিকার হইবে না।

—

সুরমা উপত্যকার হিন্দুদের সভা

আসামের সুরমা উপত্যকার হিন্দুদের সভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে হইলে হিন্দুদিগকে এক হইতে হইবে, তাহা সত্য কথা। ইহাও সত্য যে, হিন্দুদের এক হইবার নিমিত্ত হিন্দু সংগঠন আবশ্যক। কিন্তু হিন্দু নেতাদের ইহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, কেবল পান-আহারে 'অস্পৃশ্যতা' দূরীকরণ হিন্দু একতা ও হিন্দু সংগঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, হিন্দু-জাতিভেদ দূরীকরণও আবশ্যক। এরূপ মন্তব্য অপ্রীতিকর লাগিবে। কিন্তু, এখন না হউক, কিছুকাল পরে ইহার সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজন আমরা যেমন স্বীকার করি, সেইরূপ ভারতবর্ষের অধিবাসী সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে লইয়া মহাজাতি সংগঠনের আবশ্যকতাও অনুভব করি।

—

হিন্দু কনফারেন্সে সমবেত উপাসনার প্রস্তাব

সম্প্রতি বাজিতপুরে এবং অন্যত্র হিন্দু সম্মেলনে সমবেত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা ইহার সমর্থন করি। যেমন প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধ্যানধারণা সন্ধ্যা আহ্নিক উপাসনা আবশ্যক, সেইরূপ সকলের একত্র উপাসনাও আবশ্যক। সকলের উপাস্য এক হইলে সমবেত উপাসনা সহজ ও সম্ভবপর হয়।

—

সভাভঙ্গ উপদ্রব

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'সূত্র-যজ্ঞ' লণ্ডভণ্ড হইবার কথা আগে লিখিয়াছি। তাহার পর দেশবন্ধু পার্কে "জাতীয় সপ্তাহে"র একটি সভাও উপদ্রবকারীরা ভাঙিয়া দিয়াছে। পরে আরও এইরূপ হইতে পারে।

সুভাষবাবুর দলের বাংলা দৈনিকটি বলিতেছেন, এ-সব তরলমতি ছোকরাদের কাণ্ড, তিনি এজন্য দায়ী নহেন। না-হইলেই ভাল। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার দলের লোকদের দাবী এই যে, তিনি বঙ্গের, বিশেষতঃ বঙ্গীয় যুবকদের, একছত্র নেতা। তাহা হইলে এ-সব লজ্জাকর উপদ্রব তাঁহার বন্ধ করিতে পারা উচিত। তিনি অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন ত? উপদ্রব নিবারণ, অন্ততঃ নিবারণ-চেষ্টা, না হইলে এই সিদ্ধান্ত কেহ করিলে সুভাষ-পন্থীরা তাহা অযৌক্তিক বলিতে পারিবেন না যে, সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের আয়োজন ঘোষিত হইতেছিল, তাহা 'বৈধ'-কংগ্রেস-বাদ ও গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে প্রযোজিত হইতেছে।

যে-সব কংগ্রেসওআলা এখন উপদ্রবকারীদের নিন্দা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি একটি নিবেদন আছে। যখন কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী বামপন্থী ভেদ ছিল না, তখন অনেক কংগ্রেসী অ-কংগ্রেসীদের সভায় নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। আশা করি, এখন এরূপ কাজের অন্যায্যতা উপলব্ধ হইতেছে।

—

স্কটিশ চার্চ কলেজে ধর্ম্মঘট

স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক্যামেরন সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, সে-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত পদস্থ লোকও তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া কোন মীমাংসার সাহায্য করেন, ইহা তিনি চান না। অর্থাৎ যাহা কিছু করা হইবে তিনি স্বয়ং করিবেন, কিংবা স্বয়ং ছাত্রদের সহিত আলোচনা করিয়া করিবেন। শেষোক্ত পথ ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তিনি স্বয়ং কিছু করিবেন, ভাল কথা। কিন্তু তাহা হইলে কলেজটি যে খ্রীষ্টিয়ান মিশনের, তাহার কমীটিকে ইহার মধ্যে টানিলেন কেন? বোধ হয় দুটি কারণে। একটি তিনি বলিয়াছেন, অন্যটি বলেন নাই। প্রকাশিত কারণটি এই যে, কলেজটি শুধু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নহে, অ-খ্রীষ্টিয়ানদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিবার ইহা একটি উপায়। এ-কথা ক্যামেরন সাহেব বলিয়াছেন এই ভরসায় যে, ইহা জানিয়াও হিন্দুত্বে আস্থাবান্ হিন্দু অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদিগকে তাঁহার কলেজে পাঠাইবেন!

অপ্রকাশিত কারণটি এই যে, মিশন কলেজটি স্থাপন করিবার ও চালাইবার নিমিত্ত টাকা খরচ করিয়াছেন। এই কারণে আমাদিগকেও বলিতে হইতেছে যে, অভিভাবকেরা ছাত্রদত্ত বেতনের আকারে কলেজ

চালাইতে সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং মিশনের সহিত যদি পরামর্শ আবশ্যক, অভিভাবকদের সহিতও সেইরূপ পরামর্শ আবশ্যক। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

এখন বহু অভিভাবক একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সন্তানদিগকে স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে সরাইয়া লইয়া অন্যত্র ভর্তি করিবেন। তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করায়, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া তাহারা অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন না।

অ-খ্রীষ্টিয়ানদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করা যে-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, প্রধানতঃ অ-খ্রীষ্টিয়ানদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে গবর্মেণ্ট কেন তাহাকে সাহায্য দেন, এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

—

ইউরোপীয় যুদ্ধ ব্যাপক ও ঘোরতর হইল

জার্মেনী অতি দ্রুত ডেন্মার্ক দখল করিয়াছে, নরওএরও রাজধানী এবং বহু ঘাঁটি দখল করিয়াছে। এই দুই দেশ জার্মেনীর কোন অনিষ্ট করে নাই, করিবার ইচ্ছাও করে নাই। জার্মেনীর এই কাজ দস্যুতা। ইহার জন্য সে আগে হইতে নিশ্চয়ই সব আয়োজন ও বন্দোবস্ত ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিল। রাশিয়ার সঙ্গে তাহার সম্ভবতঃ এই বুঝাপড়া হইয়া আছে যে, সুইডেনটা রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে, বা "প্রভাবাধীন" হইবে। ইটালীর সঙ্গেও বুঝাপড়া হইয়া থাকিবে; কিন্তু এই শয়তানী ভাগবাঁটোআরায় তাহার অংশে নূতন কি পড়িতে পারে, অনুমান করিতে পারিতেছি না।

জার্মেনী হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়মও আক্রমণ করিতে পারে।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনীর লোকসংখ্যা ছিল ৭,৬৪,৪৩,০০০। নিকটবর্ত্তী কয়েকটি ভূখণ্ড দখল করায় সেইগুলির অধিবাসী সমেত হিটলারের অধীন জনসমষ্টির সংখ্যা দাঁড়ায় ১০,৮৫,০০,০০০। ইহা ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্মিলিত লোকসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। এই দুই দেশ তাহাদের ইয়োরোপের বাহিরের সাম্রাজ্য হইতে লোক না আনিলে জার্মেনীর সহিত জনবলে সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কারণ, তাহার অধীন জনগণের সংখ্যা এখন এগার কোটির উপর হইল। সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিলে ফ্রান্স ও ব্রিটেন অধিকতর সহজে লোক পাইবে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স নরওএর সাহায্য করিবেন বলিতেছেন। দেখা যাক কি করেন। বাংলা প্রবচনে আছে, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।' ইংরেজীতে, 'ঘোড়া চুরি হইবার পর আস্তাবলের দরজা বন্ধ করা' ইহার সমতুল্য। দ্রুত অভীষ্টসিদ্ধিতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের হিটলারের সমকক্ষ হওয়া আবশ্যক।

—

কলিকাতার হিন্দু কৌন্সিলরদের ঐক্য

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর একটি সম্মিলিত বিবৃতিতে জানা গেল, কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের সমুদয় নির্বাচিত হিন্দু কৌন্সিলর কলিকাতার পৌরকল্যাণকর্ম একযোগে করিবেন। ইহা সন্তোষের বিষয়। কেবল ইহার দ্বারাই কর্পোরেশ্যনে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটিবে না—যে-গরিষ্ঠতা সকল দিক দিয়া ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা হইলেও এই একতার প্রভাব শুভ হইবে আশা করা যায়।

—

রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার আর একটি বলি

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রদলের ও ফরওআর্ড ব্লক দলের ঝগড়ার ফলে আহত জ্যোতির্ম্ময় ভৌমিক নামক যুবকটির মৃত্যু হইয়াছে। যশোহরেও এইরূপ বিবাদে একটি ছাত্রের মৃত্যু হইয়াছিল।

সহজে উত্তেজনাশীল অপরিণতবুদ্ধি যুবক ও বালকদিগের সক্রিয় রাজনীতিক হইবার আমরা বরাবর বিরোধিতা করিয়া আসিতেছি। রাজনীতির কার্যক্ষেত্রে তাহাদের প্রবেশে তাহাদের বিদ্যাবত্তা বাড়ে নাই ও চরিত্র উন্নততর ও দৃঢ়তর হয় নাই এবং দেশের স্বাধীনতাও অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয় নাই। কিন্তু কুফল খুব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও বঙ্গের রাষ্ট্রিক নেতাদের, অভিভাবকদের, ছাত্রনেতাদের ও ছাত্রদের চোখ ফুটিবে কি না, সন্দেহস্থল।

—

লর্ড জেটল্যাণ্ডের রেডিয়ো বক্তৃতা

স্বাধীন প্রভুজাতির রাজপুরুষদের একটা সুবিধা আছে, যে, তাঁহারা পুরাতন বুলি বারবার আওড়াইতে থাকেন এবং প্রচারের সব উপায় তাঁহাদের হাতে থাকায় তাঁহাদের কথাগুলাই জগৎময় ছড়ায়, তাঁহাদের অধীন লোকেরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের কথার অসত্যতা প্রমাণ করিয়া দিলেও তাঁহারা তাহাতে কান দেন না, জগতের লোকেরাও পরাধীন জাতির জবাব শুনিতে পায় না, কিংবা সামান্যই শুনিতে পায়।

গত ৩রা এপ্রিল ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড লণ্ডন

হইতে রেডিয়ো বক্তৃতায় অনেক পুরাতন বুলি ঝাড়িয়াছেন যাহার প্রত্যেকটার উত্তর অনেক বার দেওয়া হইয়াছে।

তিনি জগদ্বাসীকে বুঝাইতে চান, হিন্দু-মুসলমানের গরমিল এবং কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও দেশী রাজাদের মধ্যে মতভেদই ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব দিবার একমাত্র অন্তরায়, এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সকল দলের মধ্যে মিল ও সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা সর্বান্তঃকরণে করিতেছেন! অহো!

তিনি বলেন, কংগ্রেস এখন ("now") পূর্ণস্বাধীনতা ও কন্সটিটিউয়েণ্ট এসেমব্লী চাহিতেছে। যেন আগে ডোমীনিয়নত্বই চাহিয়াছিল! গান্ধীজী দেখাইয়াছেন, কংগ্রেস বার বার পূর্ণস্বাধীনতা ও কন্সটিটিউয়েণ্ট এসেমব্লীই চাহিয়াছে, তিনি (কংগ্রেস নহে) একদা বলিয়াছিলেন তিনি ওএষ্টমিন্‌সটার স্ট্যাটিউট অনুযায়ী ডোমীনিয়নত্বে সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু সেই মত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং এখন পূর্ণস্বাধীনতার কম কিছু চান না।

নাৎসী জার্মেনীর ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ভারতসচিব হাস্যকর বলিয়াছেন। ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজের কথায় ও কাজে কতটা মিল আছে তাহার খোঁজও তাঁহাদের লওয়া আবশ্যক।

এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটেনের সাহায্যকল্পে কোথায় কোথায় সৈন্য গিয়াছে, তিনি তাহা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহাদিগকে পাঠাইয়াছে। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট পাঠাইয়াছেন বলিলেই ঠিক্ হইত।

জিনিষ যোগান সম্বন্ধে তিনি "ভারত-গবর্ন্মেণ্টের সরবরাহ বিভাগ" ("the Government of India's Supply Department") এই কাজ করিয়াছে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ দিয়াছে বলেন নাই। ইহা ঠিক্ হইয়াছে।

মৌলানা আক্রাম খাঁর গান্ধীজীর উক্তির প্রতিবাদ

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের সাদৃশ্য দেখাইতে গিয়া বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের নানা বিষয়ে সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতে মৌলানা আক্রাম খাঁ তাঁহার "আজাদ" কাগজে এই মর্মের কথা লিখিয়াছেন যে, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি এবং খাদ্য প্রভৃতিতে তাহাদের পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন। "আজাদে"র লেখার উল্লেখ করিলাম সমালোচনা করিবার বা উত্তর দিবার নিমিত্ত নহে, এক জন প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান ঐতিহাসিক এইরূপ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিবার নিমিত্ত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সর্ শফাৎ আহমদ খাঁ শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "Hindus and Musalmans of India" নামক বহির Forewordএ লিখিয়াছেন:—

The history of Indian culture shows continuous reciprocity of feeling and solidarity of sentiment between the masses no less than classes of the two communities and the classics of Indian languages give us a more complete embodiment of the national spirit than can be shown by any other nation in Asia…Whatever our political differences may be…the fact remains that in the temper of their intellect, their traditions of life, their habits, and the circle of their thought, there is a powerful tradition of unity, which has been forged in the fires and chills of nearly a thousand years of a chequered period, and is indestructible and immortal.

চারি দিকে ধরপাকড়

কংগ্রেস এখনও অহিংস আইনলঙ্ঘন বা অন্য কোন প্রকার কার্যগত স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু সরকারী ধরপাকড় ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু বঙ্গে 'বৈধ'-কংগ্রেসওআলাদের উপর বেসরকারী উপদ্রব ও গুণ্ডামিও চলিতেছে।

"অফিসার-সোহাগী কর্পোরেশ্যন"

কলিকাতা কর্পোরেশ্যন একটি বৃহৎ ব্যাপার। ইহার ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত প্রত্যক্ষজ্ঞান আমাদের নাই। ইহা একটি ছোট রাষ্ট্রের মত বলিয়া ইহার সব কাজ ও বন্দোবস্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হওয়া আবশ্যক। শীঘ্রই নবগঠিত কৌন্সিলর ও অল্ডারম্যানেরা কাজে প্রবৃত্ত হইবেন। সকল সমালোচনা ও অভিযোগ তাঁহাদের বিচার্য্য বলিয়া "কর্পোরেশনের কথা" নামক সাপ্তাহিক ও তাহাতে প্রকাশিত 'অফিসার-সোহাগী কর্পোরেশ্যন' প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁহারা দেখিলে ভাল হয়।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের প্রিয়তম বন্ধু চার্লস এণ্ড্রুজের গতপ্রাণ দেহ আজ এই মুহূর্তে সর্বগ্রাসী মাটির মধ্যে আশ্রয় নিল। মৃত্যুতে সত্তার চরম অবসান নয় এই কথা ব'লে শোকের দিনে আমরা ধৈর্যরক্ষা করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সান্ত্বনা পাই নে। পরস্পরের দেখায় শোনায় নানাপ্রকার আদান-প্রদানে দিনে দিনে প্রেমের অমৃতপাত্র পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দেহাশ্রিত মন ইন্দ্রিয়বোধের পথে মিলনের জন্যে অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। হঠাৎ যখন মৃত্যু সেই পথ একেবারে বন্ধ ক'রে দেয় তখন এই বিচ্ছেদ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল এণ্ড্রুজকে বিচিত্র ভাবে পেয়েছি। আজ থেকে কোনোদিন আর সেই প্রীতিস্নিগ্ধ সাক্ষাৎ মিলন সম্ভব হবে না এ-কথা মেনে নিতেই হবে কিন্তু কোনোরূপে তার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পেতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যে-মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ তার সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। তখন সহযোগিতার অবসানকে চরম ক্ষতি ব'লে সহজে স্বীকার করতে পারি। সেই রকম সাংসারিক সুযোগ ঘটানো দেনাপাওনার সম্বন্ধ মৃত্যুরই অধিকারগত। কিন্তু সকল প্রয়োজনের অতীত ভালোবাসার সম্পর্ক অসীম রহস্যময়, দৈহিক সত্তার মধ্যে তাকে তো কুলোয় না। এণ্ড্রুজের সঙ্গে আমার অযাচিত দুর্লভ সেই আত্মিক সম্বন্ধই ঘটেছিল। এ বিধাতার অমূল্য বরদানেরই মতো। এর মধ্যে সাধারণ সম্ভবপরতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক দিন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচয়ের ভিতর হ'তে এই খ্রীস্টান সাধুর ভগবদ্ভক্তির নির্মল উৎস থেকে উৎসারিত বন্ধুত্ব আমার দিকে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, তার মধ্যে না ছিল স্বার্থের যোগ, না ছিল খ্যাতির দুরাশা, কেবল ছিল সর্বতোমুখী আত্মনিবেদন। তখন কেনোপনিষদের এই প্রশ্ন আপনি আমার মনে জেগে উঠেছে, কেনেষিতং প্রেষিতং মনঃ, এই মনটি কার দ্বারা আমার দিকে প্রেরিত হয়েছে, কোথায় এর রহস্যের মূল। জানি এর মূল ছিল তাঁর অসাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তির মধ্যে। সেই জন্যে এর প্রথম আরম্ভের কথাটা বলা চাই।

তখন আমি লণ্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রটেন-স্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্‌স্ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এণ্ড্রুজ। পাঠ শেষ হ'লে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে-রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এণ্ড্রুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বর-প্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।

শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। তখন আমাদের এই দরিদ্র বিদ্যায়তনের বাহ্য রূপ ছিল যৎসামান্য এবং এর খ্যাতি ছিল সংকীর্ণ। সমস্ত বাহ্য দৈন্য সত্ত্বে তিনি এর তপস্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপন তপস্যার অন্তর্গত ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছিল। আমার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত করে তিনি শান্তিনিকেতনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। সবল চারিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের দ্বারা সে আপনাকে



ভারতপ্রেমিক দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী গৃহীত আধুনিক ফটোগ্রাফ হইতে

দিয়েই শান্তিনিকেতন আপন আন্তরিক চরিতার্থতা প্রকাশের সাধনায় নিযুক্ত ছিল এতেই বোধ করি বেশি ক'রে তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করেছিল।

আমার সঙ্গে এণ্ড্রুজের যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল সেই কথাটাই এতক্ষণ বললুম কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম। তাঁর এই নিষ্ঠা দেশের লোক অকুণ্ঠিতমনে গ্রহণ করেছে কিন্তু তার সম্পূর্ণ মূল্য কি স্বীকার করতে পেরেছিল? ইনি ইংরেজ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। কী ভাষায় কী আচারে কী সংস্কৃতিতে সকল দিকেই এঁর আজন্মকালের নাড়ীর যোগ ইংলণ্ডের সঙ্গে। তাঁর আত্মীয়মণ্ডলীর কেন্দ্র ছিল সেইখানেই। যে ভারতবর্ষকে তিনি একান্ত আত্মীয় ব'লে চিরদিনের মতো স্বীকার ক'রে নিলেন, তাঁর দেহমনের সমস্ত অভ্যাসের থেকে তার সমাজ-ব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল বহুদূরে। এই একান্ত নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য। এ-দেশে এসে নির্লিপ্ত সাবধানিতার সঙ্গে দূরের থেকে ভারতবর্ষকে তাঁর প্রসাদ বিতরণ

নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের দ্বারা। কখনো তিনি অর্থ সঞ্চয় করেন নি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে কোথা থেকে তিনি যে একে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তা জানতেও পারি নি। অন্যের কাছে কতবার ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কখনো কিছুই পান নি, কিন্তু সেই ভিক্ষা উপলক্ষ্যে অসংকোচে খর্ব করেছেন যাকে সংসারের আদর্শে বলে আত্মসম্মান। নিরন্তর দারিদ্র্যের ভিতর

করেন নি, অসংকোচে তিনি এখানকার সর্বসাধারণের সঙ্গে সবিনয় যোগ রক্ষা করেছেন। যারা দীন, যারা অবজ্ঞাভাজন, যাদের জীবনযাত্রা তাঁদের আদর্শে মলিন শ্রীহীন নানা উপলক্ষ্যে সহজ আত্মীয়তায় তাদের সহবাস অনায়াসেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এ-দেশের শাসক-সম্প্রদায় যাঁরা তাঁর এই আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা আপনাদের রাজপ্রতিপত্তির অসম্মান অনুভব ক'রে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাঁকে ঘৃণা করেছেন তা আমরা জানি, তবু

স্বজাতির এই অশ্রদ্ধার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নি। তাঁর যিনি আরাধ্য দেবতা ছিলেন তাঁকে তিনি জনসমাজের অভাজনদের বন্ধু ব'লে জানতেন তাঁরই কাছ থেকে শ্রদ্ধা তিনি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। এই ভারতবর্ষে কী পরের কী আমাদের নিজের কাছে যেখানেই মানুষের প্রতি অবজ্ঞা অবারিত সেখানেই সকল বাধা অতিক্রম ক'রে তিনি আপন খ্রীস্টভক্তিকে জয়যুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ-কথা বলতে হবে অনেক বার আমাদের দেশের লোকের কাছ থেকেও তিনি বিরুদ্ধতা ও সন্দিগ্ধ ব্যবহার পেয়েছিলেন, সেই অন্যায় আঘাত অম্লানচিত্তে গ্রহণ করাও যে ছিল তাঁর পূজারই অঙ্গ।

যে-সময়ে এণ্ডরুজ ভারতবর্ষকে আপন আমৃত্যুকালের কর্মক্ষেত্ররূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন সেই সময়ে এ-দেশে রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা ও সংঘাত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল। এমন অবস্থায় এ-দেশীয়দের মধ্যে আপন সৌহৃদ্যের আসন রক্ষা ক'রে টিঁকে থাকা ইংরেজের পক্ষে কত দুঃসাধ্য সে-কথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু দেখেছি তিনি ছিলেন অতি সহজে তাঁর আপন স্থানে, তাঁর মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। এই যে অবিচলিতচিত্তে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা, এতেই তাঁর আত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে এণ্ডরুজকে আমি জানি দুই দিক থেকে তাঁর পরিচয় পাবার সুযোগ আমার হয়েছে, এক আমার অত্যন্ত কাছে, আমার প্রতি সুগভীর ভালোবাসায়। এমনতরো অকৃত্রিম অপর্যাপ্ত ভালোবাসাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি। আর দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের কাছে তাঁর অসামান্য আত্মোৎসর্গ। দেখেছি তাঁর অশেষ করুণা এ-দেশের অন্ত্যজদের প্রতি। তাদের কোনো দুঃখ বা অসম্মান যখনি তাঁকে আহ্বান করেছে তখনি নিজের অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে। এই জন্যেই তাঁকে স্থিরভাবে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজে বেঁধে রাখা অসম্ভব ছিল।

এই যে তাঁর প্রীতি এ যে সংকীর্ণভাবে ভারতবর্ষের



প্রবাসী-ভারতীয়ের সেবাক্ষেত্রে সম্মিলিত চার্ল্‌স্‌ এণ্ডরুজ (বামে), উইলিয়াম পিয়ার্সন (দক্ষিণে) ও মহাত্মা গান্ধী (উপবিষ্ট)

সীমাগত সে-কথা বললে ভুল বলা হবে। তাঁর খ্রীস্টধর্মে সর্বমানবের প্রতি প্রীতির যে অনুশাসন আছে ভারতীয়দের প্রতি প্রীতি তারই এক অংশ। একদা তারই প্রমাণ পেয়েছিলুম যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কাফ্রি অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখেছি, যখন সেখানকার ভারতীয়েরা কাফ্রিদেরকে আপনাদের থেকে স্বতন্ত্র ক'রে হেয় ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছিল, এবং য়ুরোপীয়দের মতোই তাদের চেয়ে আপনাদের উচ্চাধিকার কামনা করেছিল। এণ্ডরুজ এই অন্যায় ভেদবুদ্ধিকে সহ্য করতে পারেন নি,—এই সকল কারণে এক দিন এণ্ডরুজকে সেখানকার ভারতীয়েরা শত্রু ব'লেই কল্পনা করেছিল।

আজকের দিনে যখন অতিহিংস্র স্বাজাত্যবোধ অসংযত ঔদ্ধত্যে উদ্যত হয়ে রক্তপ্লাবনে মানবসমাজের সমস্ত ভদ্রতার সীমানা বিলুপ্ত ক'রে দিচ্ছে তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সর্বমানবিকতা। কঠিন বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আসে যুগবিধাতার প্রেরণা। সেই প্রেরণাই মূর্তি নিয়েছিল এণ্ডরুজের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যে-সম্বন্ধ সে তাদের স্বাজাত্য ও সাম্রাজ্যের অতি কঠিন ও জটিল বন্ধনের। সেই জালের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে মানুষ-ইংরেজ আপন ঔদার্য নিয়ে আমাদের নিকটে আসতে পদে পদে বাধা পায়, আমাদের সঙ্গে অহংকৃত দূরত্ব রক্ষা করা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার আড়ম্বরের আনুষঙ্গিকরূপে উত্তুঙ্গ হয়ে রয়েছে। সমস্ত দেশকে এই অমর্যাদার দুঃসহ ভার বহন করতে হয়েছে। সেই ইংরেজের মধ্য থেকে এণ্ডরুজ বহন করে এনেছিলেন ইংরেজের মনুষ্যত্ব। তিনি আমাদের সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে বাস করতে এলেন এই পরাজয়-লাঞ্ছিত জাতির অন্তরঙ্গরূপে। এর মধ্যে লেশমাত্র ছিল না উচ্চমঞ্চ থেকে অভাগ্যদের অনুগ্রহ করার আত্মশ্লাঘা সম্ভোগে। এর থেকে অনুভব করেছি তাঁর স্বাভাবিক অতি দুর্লভ সর্বমানবিকতা। আমাদের দেশের কবি এক দিন বলেছিলেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—

প্রয়োজন হ'লে এই কবিবচন আমরা আউড়িয়ে থাকি কিন্তু আমরা এই সত্যবাক্যকে অবজ্ঞা করবার জন্যে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সম্মার্জনীকে যে-রকম ব্যবহার ক'রে থাকি এমন আর কোনো জাতি করে কিনা সন্দেহ। এইজন্যে বিদ্রূপ সহ্য ক'রেই আমাকে বলতে হয়েছে আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণস্থলী স্থাপন করেছি। এইখানে আমি পেয়েছি সমুদ্রপার থেকে সত্যমানুষকে। তিনি এই আশ্রমে সমস্ত হৃদয় নিয়ে যোগ দিতে পেরেছেন মানুষকে সম্মান করার কাজে। এ আমাদের পরম লাভ এবং সে-লাভ এখনো অক্ষয় হয়ে রইল। রাজনৈতিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে অনেক বার অনেক স্থানে তিনি আপনার কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কখনো কখনো তার আলোড়নের দ্বারা আবিল করেছিলেন আমাদের আশ্রমের শান্ত বায়ুকে। কিন্তু তার ব্যর্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি, এবং রাষ্ট্রীয় মাদকতার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত আশ্রমকে বিপর্যস্ত হ'তে দেন নি। কেবলমাত্র তাঁর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্য এবং সকল মানবের জন্যে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে রেখে গেলেন,—তাঁর মরদেহ ধূলিসাৎ হবার মুহূর্তে এই কথাটি আমি আশ্রমবাসীদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে গেলাম।

৫।৪।৪০

[শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত।]



আইরিশদের দেশে

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রাচী ও প্রতীচী—দুস্তর ব্যবধান। এক দিকে ছায়াশ্যাম নীড়ে অচঞ্চল স্নিগ্ধতা, অন্য দিকে কর্ম্মমুখর সমারোহ। কিন্তু প্রতীচী যেখানে শেষ হয়, প্রাচী সেইখানেই আরম্ভ হয়। তাই আয়র্লণ্ডকে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

মাত্র দশ দিন একটা জাতিকে বা একটা সভ্যতাকে চিনবার পথে যথেষ্ট নয়। কিন্তু বেলফাস্টে ও ডাবলিনে দেখবার ও জানবার বিশেষ সুযোগ হয়েছিল।



আইরিশ বীর রবার্ট এমেট

আইরিশদের সঙ্গে আমাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। মলোনি বলে এক জন আইরিশ আই. সি. এস. তার 'দি রিডল অব দি আইরিশ' বইতে ভারতীয়দের সঙ্গে আইরিশদের তুলনা করেছেন। তাঁর কথাতেই বলছি—

There is a certain resemblance between the average Irishman and the average Indian. Each is very much a child; each lacks the sturdy self-reliance of the Englishman. Each feels with extraordinary intensity any little personal attention or lack of consideration. Each will do readily, but only "to oblige a friend," many things which the Englishman does dispassionately and impersonally as a matter of public duty. Each in the heat of the moment will say a good deal more than he really means.

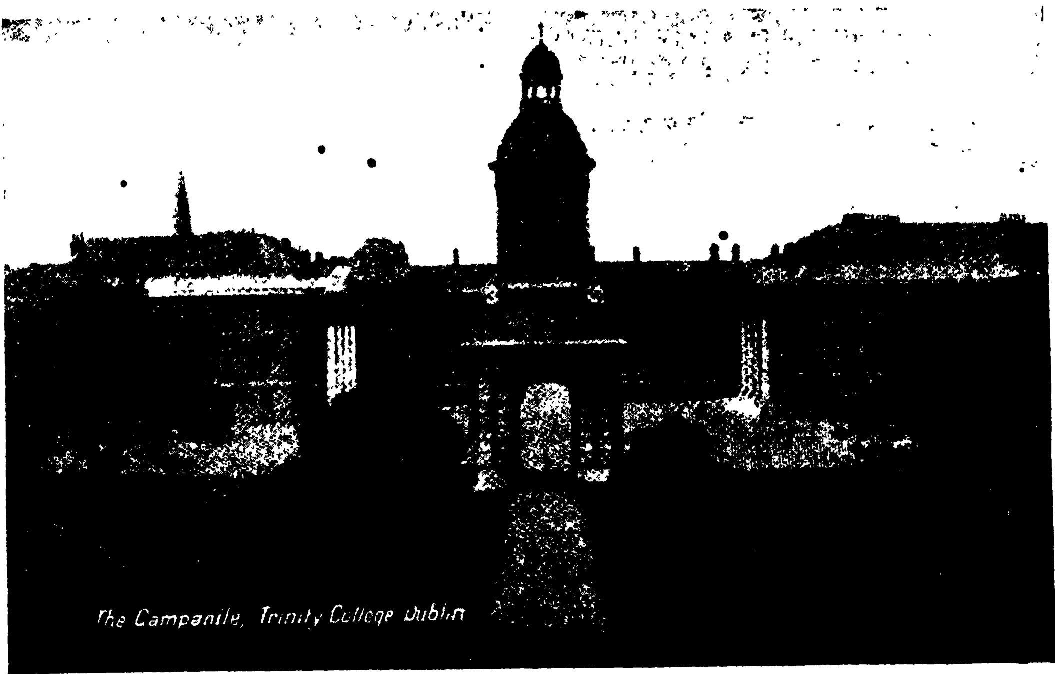
মলোনি সাহেবের এই উক্তি আমার নিকট ঠিক ব'লেই



আয়র্লণ্ডের রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরা

মনে হয়। আইরিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কেল্‌টিক প্রভাব অত্যধিক। টিউটনিক জাতির অনমনীয় দৃঢ়তা, অবিচল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সুকঠোর আত্মসংযম কেল্‌টিকেরা পায় নি। কেল্‌টিকেরা চঞ্চল, ভাবালু, আলাপপ্রিয় এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে ভেসে যেতে চায়। আইরিশদের নগরে নগরে নানা বিচিত্র সভ্যতার সংঘাত হয়েছে, কিন্তু নগরের বাহিরে পল্লী ও জনপদে চাষীরা গেলিক ভাষায় রূপকথা বলেছে, গান গেয়েছে এবং জাতির হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও মধুর করেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর আইরিশ ফ্রী স্টেট এই নিজস্ব



ডাবলিন ট্রিনিটি কলেজের উচ্চচূড় ঘণ্টা-ঘর

অনাদৃত ভাষার উদ্ধারসাধনে ব্রতী হয়েছে। বাংলার ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন মলয়সমীরের কোমলতার সঙ্গে কেল্টদের কোমলতার সাদৃশ্য আছে।

তাই যে-কয়দিন আয়র্লণ্ডে ছিলাম সে-কয়দিন মনে হয়েছিল যেন স্বজনের নিকটে রয়েছি। সাধারণ ইংরেজের চরিত্রে একটি উদ্ধত আত্মসমাহিত নির্লিপ্ত ভাব আছে, তাই সহজে সে বন্ধুর মত গ্রহণ করে না, কিন্তু আইরিশ হৃদয় স্বত-উৎসারিত মাধুর্য্যের নির্ঝর।

আইরিশদের দেশ আজ দ্বিধাবিচ্ছিন্ন—উত্তরে অলস্টার, দক্ষিণে আয়ার। আমি গ্লাসগো শহর থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেলফাস্ট যাই—মোটরযোগে ডাবলিন আসি—সেখান থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওয়েলসের মাঝ দিয়ে লণ্ডনে ফিরি। তাই অল্পসময়ের মধ্যেও এই দেশটিকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছিল।

১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার গ্লাসগো থেকে বেলফাস্টে রওনা হলাম। গ্লাসগো লণ্ডনের পরেই বেশ বড় শহর, এখানে কর্ম্মের ও শ্রমের অশ্রান্ত গুঞ্জন—সাহিত্য বা শিল্পের বিশেষ স্থান নেই—কোন ঐতিহাসিক স্মৃতিও নেই। গ্লাসগোর কলাভবনগুলির অবশ্য নাম আছে।

সন্ধ্যার পর বেলফাস্টে গাড়ী থামল। অজানা শহর, কোথায় উঠব, পাত্তা নেই। এক জন মিশনারি আডাম স্কটের নিকট পরিচয় পত্র দিল। তাকে স্টেশনে ফোন করবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু আনাড়ি আমি পাবলিক ফোনে তাকে ধরতে পারলাম না, একটি ছেলে সাহায্যার্থ এল, সেও বিফলকাম হ'ল। খালি খালি দু-পেনি গেল।...সামান্য বিষয়েও আমার মনের একটা সহজ নির্ভরতা নেই, তাই গাড়ী ধরব, ট্যাক্সি করব, না ঘোড়ার গাড়ী ডাকব, না হাঁটব এই নিয়েই মনে মনে হয়ত আধঘণ্টা নষ্ট করি—ফলে আসে অহেতুক অশান্তি।

গাড়ীতে এক ভদ্রলোক বললেন—প্রেসবাইটেরিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল ব'লে একটা হোটেল আছে। সেখানে সস্তায় নিরুপদ্রবে উঠতে পারবেন।

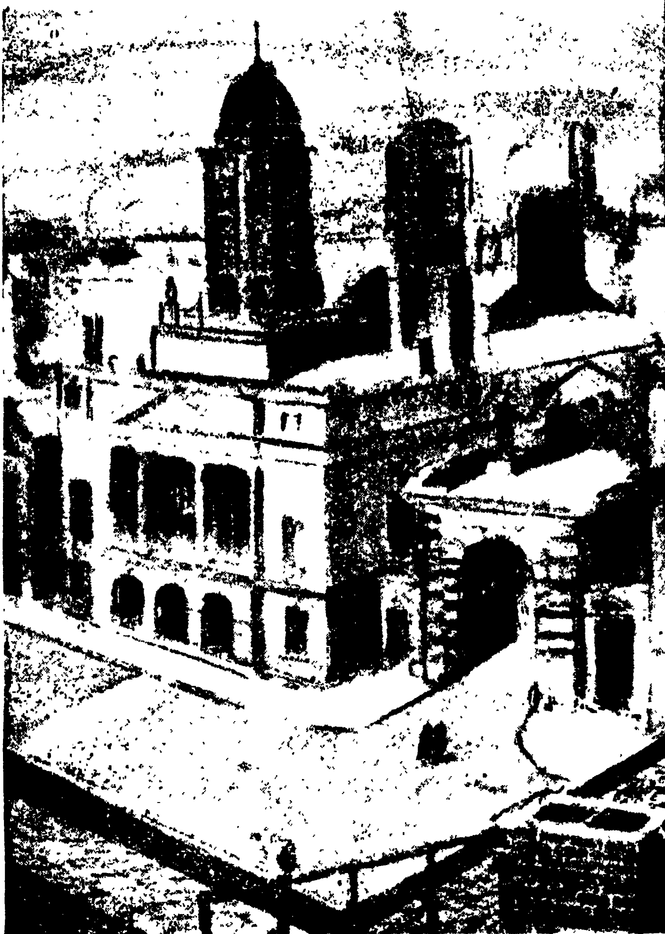
হেঁটে হেঁটে সেখানেই গেলাম। যুদ্ধ মানুষকে পশু করে, আবার পশুত্বের আস্ফালন শেষে দেবত্ব জাগায়। এই পান্থশালা সেই আত্মজাগরণের প্রতীক। হানাহানি শেষ নয়, প্রেম ও মৈত্রী বড়—সেই সত্যের জন্য উৎসৃষ্ট ভবনে এক রাত্রির বাস হ'ল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, সাধারণতঃ শ্রমজীবী প্রভৃতিরাই এখানে বাসা নেয়। ভাল ঘর ছিল কিনা জানি না—তবু অপরিচিত স্থানে নিরাপদ আশ্রয় মিলেছিল।

বেলফাস্ট উত্তর-আয়র্লণ্ডের রাজধানী। আইরিশ স্বাধীনতার যুদ্ধে আলস্টার যোগ দেয় নি, দক্ষিণের স্বাধীনতাকামীরা আয়ারের প্রতিষ্ঠা করেছে—উত্তর আজও ইংলণ্ডের তাঁবেদার। মলোনির কথায় বলছি :—

Loyalty to the British Empire and to the British throne is or is believed to be a part of the Ulsterman's very being. A few years ago, the Ulsterman was prepared to the death an attempt of England herself to slacken the bonds which united him to England, to interpose an intermediary between him and his Sovereign. "Fear God, honour the King in an Ulster Slogan."

বেলফাস্ট আয়র্লণ্ডের সর্ব্ববৃহৎ শহর। এর ধনসম্পদও অতুলনীয়। লাগান নদীর উভয় তীরে শহর চলেছে। লাগান নদী বেলফাস্ট খাড়িতে পড়েছে। এখানে জাহাজ তৈরির কারখানা আছে। কয়লা ও লোহা আসে সাগর-পার হ'তে—ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড থেকে। শহরে উত্তরাংশের নাম এ্যান্ট্রিম—সেখানে শৈলমালা নগরের পরিবেশকে মনোমোহন ক'রে তুলেছে। উত্তরাংশে শণের নীলাভ পুষ্পে ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র চিত্তহরণ শোভা ধারণ করেছে। এখানকার কলে নানাবিধ শণ-বস্ত্র নির্ম্মিত হয়।



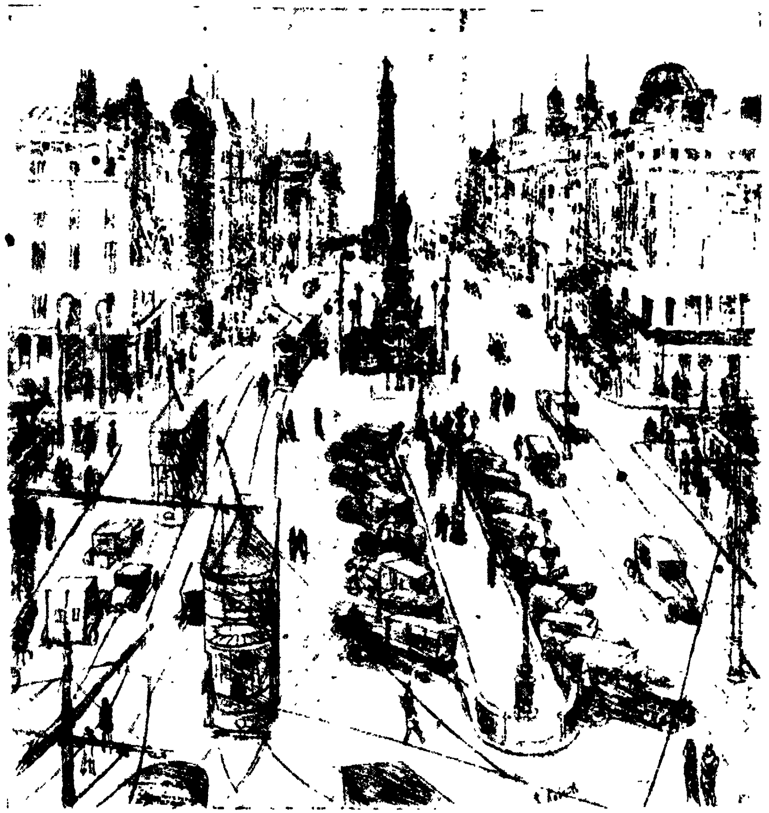
ডাবলিন কাস্‌লের এক অংশ

বেলফাস্টের দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। যে-সব শহর শিল্পপ্রধান, সাধারণতঃ সেগুলি ধূলি ও ধূমে মলিন হয়, তার চারি পাশে জমে মলিনতার আবহাওয়া। কিন্তু বেলফাস্ট শুভ্র, রুচির এবং সম্পন্ন। রাজপথগুলি চমৎকার—নানা সুদৃশ্য হর্ম্ম্যে নগর অলঙ্কৃত।

২০ সেপ্টেম্বর। রবিবার প্রাতঃকালে প্রাতরাশ খেয়ে আডাম স্কটের সন্ধানে চললাম। ট্রামে ক'রে অনেকখানি যেতে হ'ল। তার পর এক নিভৃত পল্লীর কাঁটার বেড়াঘেরা একটি সুন্দর সুদৃশ্য হ্রদে তার সন্ধান পেলাম। এক-এক জন মানুষ থাকেন, যাঁদের উদারতা অতুলনীয়, বসুধাকে যাঁরা বিনা শ্লোকেই আপন ক'রে দেখতে পারেন, আডাম স্কট এমনই এক জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি। বৃদ্ধবয়সেও

মুখে যৌবনের ললাম জ্যোতি। সুদর্শন বৃদ্ধ আমাকে আপন জনের মত আপ্যায়ন করলেন। বললেন, "আপনার যদি বিশেষ কাজ না থাকে তবে আমাদের সঙ্গে চার্চ্চে চলুন, তার পর লাঞ্চ খেয়ে বিকালে আপনার দেখবার শোনবার ব্যবস্থা করা যাবে।"

আমি সানন্দে সম্মতি দিলাম। জীবনে এই প্রথম খ্রীস্টান-উপাসনায় যোগ দিলাম। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষ অনুভব করেছে প্রার্থনায় বিশ্বশক্তির আসন টলে, মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হয়। আমার নাস্তিক হৃদয় নিয়ে প্রার্থনার সম্পূর্ণ মহিমা অনুভব করা মুস্কিল। কিন্তু এই সুন্দর সুবৃহৎ গির্জ্জায় বহু লোকের সম্মেলন, তাদের সমবেত প্রার্থনা ও পুরোহিতের বক্তৃতা আমায় বেশ মুগ্ধ করল। পুরোহিত অবশ্য আধুনিক, উপদেশ দিতে দিতে তিনি নির্ব্বাচনী বক্তৃতাও সুরু করলেন--এটা বহিরঙ্গ। তবে মন্দিরের পুরোহিতকে ওরা বলে মেষপাল, তিনিই গির্জ্জার অন্তর্ভুক্ত মেষদিগকে চরান, কাজেই ঐহিক এবং পারত্রিক উভয় বিষয়েই তাদের চালাবার দায়িত্ব তার। একটি শিশুর ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্‌ উৎসব হ'ল। এটি মন্দ লাগল না। উপাসনার পর দু-একজনার সঙ্গে আলাপ হ'ল।



ও'কনেল ষ্ট্রীটের দৃশ্য

তার পর এসে সাদাসিধে লাঞ্চ খেলাম। রবিবার দিন অবসরের দিন---সেদিন আড়ম্বর হয় না। আহার-শেষে আডাম স্কট আমাকে তাঁর মোটরে লিসবার্ণ স্কুলে নিয়ে গেলেন।

শহর-পরিক্রমা হ'ল, কিন্তু কোথাও না থেমে আমরা স্কুলে গেলাম। সেখানে মিঃ ও মিসেস ডগলাসের সঙ্গে তাদের পুষ্পকাননে বসে বেশ সান্ধ্য আলাপ জমল।

ডগলাস প্রশ্ন করলেন, "ভারতীয় সমস্যার কারণ কি?"

আমি বললাম, "প্রশ্ন জটিল, এক কথায় তার উত্তর দেওয়া যায় না, তবে দারিদ্র্যই ভারতবর্ষের অধোগতির কারণ—"

ডগলাস বললেন, "দারিদ্র্যই সব নয়, আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে চারিত্রের অভাব আছে।"

আপত্তি করলাম, "ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। আপনার স্বল্প পরিচয়ে এত বড় কথাটা বলা ঠিক নয়। চারিত্রের মাপদণ্ড ব্যবহার করা বিদেশীর পক্ষে সর্ব্বত্র সুলভ নয়।"

এটা নিছক তর্ক। মনে প্রাণে জানি ডগলাসের কথা



ডাবলিন ট্রিনিটি কলেজের লাইব্রেরি

লীলাচঞ্চল জীবনের পিছনে যে অমৃত সত্য আছে তার সন্ধানে —তার পরিচয় পাই নি—"

মিসেস হাসলেন। বর্ষীয়সী, অথচ মুখে সৌন্দর্য্যের লালিত্য আছে। হাসি ও আনন্দে তিনি আসর জমালেন।

আডাম খানিক পরে বিদায় নিলেন। মিঃ ডগলাস তাঁর সঙ্গে গেলেন। মিসেস ডগলাস আমাকে মিস হিন্টন নামক এক জন তরুণী শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে দিয়ে বিদায় নিলেন।

সেটা মিঃ ডগলাসের পাঠকক্ষ। চারি দিকে থরে থরে নানা প্রকারের বই। তরুণীর মুখে যৌবনলাবণ্য নেই—শীর্ণ দেহ সৌন্দর্য্যহীন, কেবল উজ্জ্বল চোখ দুটিতে বুদ্ধিমত্তা জ্বল জ্বল করছে।

সত্য—ইউরোপের নানা দেশ দেখে যে জ্ঞান লাভ করেছি, তাতে মুক্তকণ্ঠে বলতে হবে যে জীবনের সাধারণ চলবার পথে যে সৌজন্য, যে দায়িত্ববোধ, যে সত্যনিষ্ঠা দেখি—এক কথায় চরিত্রবত্তার যে পরিচয় পাই আমাদের দেশে তা দুর্লভ। এখানে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভেদ নেই, উচ্চ ও নীচের ভেদ নেই। ইংরেজীতে জেণ্টলম্যান একটি সংজ্ঞা শব্দ—যেমন আমাদের কুলীন, নবগুণযুক্ত ব্যক্তিই কুলীন, তেমনই চারিত্রিক কতকগুলি গুণ যাদের আছে তারাই জেণ্টলম্যান। আমাদের তথাকথিত ভদ্রলোকের মধ্যে ভদ্রতার অভাবই বোধ হয় তাদের ভদ্র আখ্যা দিয়েছে।

মিসেস ডগলাস প্রশ্ন করলেন, "ইউরোপ কেমন লাগল আপনার?"

বললাম, "আমি এসেছিলাম তীর্থযাত্রী—ইউরোপের

যুদ্ধ-পূর্ব্ব ইউরোপের সহিত যুদ্ধ-পরের ইউরোপের ব্যবধান একান্ত গভীর। চারি দিকে উল্লাস-আলোড়ন ওদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ক্লিষ্ট করে তুলেছে। এই তরুণী শিক্ষয়িত্রীকে দেখে আমার সেই কথাই মনে জেগেছিল।

তরুণীর সঙ্গে স্ত্রীবিপ্লবের আলোচনা হ'ল। তরুণী বললেন, "এখানে আমি থাকব না, আমি লণ্ডনে চলে যাব—এখানে জীবনের প্রসার নেই।"

"কেন?"

"কারণ বেলফাস্ট আজও আধুনিক হয়ে ওঠে নি—"

প্রশ্ন করলাম, "আপনি আধুনিকতা কাকে বলেন?"

তরুণী বললেন, "স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সমানাধিকার—এইটাই যুগধর্ম্ম।

প্রশ্ন করলাম, "আপনি শিক্ষকতা কেমন পছন্দ করেন?"

তরুণী বললেন, "আমার ভাল লাগে না।"

"এর চেয়ে কি আপনি গৃহজীবন ভাল মনে করেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তরুণী বললেন, "শতগুণে, কিন্তু তা সফল হবে কেমন ক'রে?"

মিস হিন্টন তার পর আমাকে স্কুল কক্ষ খেলার মাঠ দেখিয়ে দিলেন। একটি ছোট পাহাড়ের উপর সুন্দর স্কুলটি—পরিবেশ চিত্তকে মুগ্ধ করে। মিস হিন্টন ছুটি নিয়েছেন, কোনও বন্ধুর সঙ্গে বিহরণ করবার প্রয়োজন—তাই বিদায় নিলেন।

রাত্রে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সান্ধ্যভোজন হ'ল। সুবৃহৎ একটি হলে ছেলেমেয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী মিলেছেন। সবাই একসঙ্গে আহার করছেন—আহারের আয়োজন সামান্য—ছেলেরা নিজেরাই খাবার করে এবং খাবার পরিবেশন করে।

২১শে সেপ্টেম্বর। পরদিন সকালে মিসেস ডগলাস তাঁর ঘরে প্রাতরাশ খাওয়ালেন। এই শিক্ষক-দম্পতীর অতিথির প্রতি অনুরাগ ছিল। জন ডগলাস, নোরা ডগলাস এবং তাদের বড় মেয়ে মারিয়া আমার অটোগ্রাফ-কে প্রীতিপূর্ণ বিদায়-সম্ভাষণ লিখে দিলেন।

রেলে বেলফাস্টে ফিরলাম।

লিসবার্ণের এই একটি রাত্রির স্মৃতি আমার অতি প্রিয়। বেলফাস্টে থাকলে শহরের অনেক দেখতে পারতাম, সেটা হ'ল না বলে একটু অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এদের পারিবারিক জীবন ও স্কুল-জীবনের ক্ষণিক যে পরিচয় পেলাম সেটা উপেক্ষার নয়। জন ডগলাস তার ভাই জেমস ডগলাসের নিকট পরিচয়লিপি দিলেন—এটা খুব কাজে এসেছিল।

স্টেশন থেকে এসে নগর পরিভ্রমণ সুরু হ'ল। প্রথমে এদের টাউনহল দেখতে গেলাম। এটা এদের মিউনিসিপাল অফিস। এখানে টাউন-ক্লার্ক জন আর্চারের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভদ্রলোক তাঁদের ডাক্তার টমসনের নিকট নিয়ে গেলেন। ডাক্তারের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল। কেমন ক'রে শহরকে ওরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছে তার সম্বন্ধে আলাপ হ'ল।

প্রশ্ন করলাম, "অবাধ যৌন জীবনের ফলে যৌন ব্যাধির প্রসার কেমন?"

ভদ্রলোক রসিক, হাসলেন, বললেন, "এখন লোক চালাক হয়েছে, তাই ব্যাধির বিস্তার হয় না— আর যা হয় তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করেছি।"

প্রতিপ্রশ্ন করলেন, "ভারতবর্ষ কি এ-বিষয়ে মুক্ত?"

বললাম, "মুক্ত বলা মুস্কিল, সব দেশেই অসচ্চরিত্র লোক আছে, তবে অধিকাংশ লোক স্বাভাবিক জীবন যাপন করে, তাই আমার মনে হয় ভারতবর্ষ অধিকতর পবিত্র।" ভদ্রলোক হাসলেন।

তার পর লর্ড মেয়রের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমার অটোগ্রাফে নাম লিখে দিলেন, বেলফাস্ট মিউনিসিপালিটির কার্য্যবিবরণী দিতে বললেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আদালত দেখতে চললাম। রয়াল কোর্টস অব জাস্টিসের সিটি রেজিস্ট্রার মিঃ নর্ম্মানের সঙ্গে নানা বিষয়ে দেড় ঘণ্টা আলাপ হ'ল।

ভদ্রলোক আলাপী। আদালতের নীরস আবহাওয়া তাঁর সরস চিত্তকে নিরস করে নি। তিনি ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম, "ভারতবর্ষ জিগীষাকে বড় করে নি, প্রেমকে বড় করেছে। ভারতের কাম্য আত্মদর্শন—সে দর্শন সত্য হ'লে মানুষের অন্য প্রয়োজন থাকে না, মানুষ তখন আনন্দ পায়।"

মিঃ নর্ম্মান প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন। আমিও যথাযোগ্য উত্তর দিলাম। আমার আলোচনায় ভদ্রলোক অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে আমাকে আপ্যায়ন করবার জন্য ব্যস্ত হ'লেন—আমি সময় নেই ব'লে তাঁর নিকট বিদায় নিলাম। তার পর ব্যাঙ্করাপিস আদালত দেখে ওয়াই. এম. সি. এ. অফিসের কাছে ওয়াই. এম. সি. এ. কাফেতে লাঞ্চ খেলাম।

তার পর এদের পার্লামেণ্ট দেখতে গেলাম। শহরের প্রান্তে একটি উচ্চ শৈলের উপর নবনির্ম্মিত বাড়ী, ধবধবে সাদা, নূতন স্থাপত্যবিদ্যার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের আইন অনুসারে লর্ড লেফটেনাণ্ট পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাবিত আইন-কানুনে তিনিই রাজকীয় সম্মতি দেন। আলস্টার ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টে তের জন সদস্য পাঠায়। এদের নিম্ন

সভায় ৫২ জন সদস্য আছে এবং উচ্চ-সভায় ২৬ জন সভ্য আছে। এই পার্লামেণ্ট রাষ্ট্র, সৈন্য, রক্ষাবিভাগ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

পার্লামেণ্টের পাশে বেলিভিউ। এই দুটি দেখে ফিরে আডাম স্কটের সঙ্গে এখানকার মেথডিস্ট কলেজে গেলাম। ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে সেখানে ছাত্রদের এক বক্তৃতা দিলাম, তার পর প্রশ্নবাণের জ্বালায় জর্জ্জরিত হলাম।

প্রশ্ন—ভারতে যদি মৈত্রীর বাণী পেয়ে থাকে তবে সেখানে জাতিতে জাতিতে এত বৈষম্য কেন?

উত্তর দিলাম, জাতিভেদ ধর্ম্মাঙ্গ নয়, এটা অর্থনৈতিক সমাধান। সেকালের বার্ত্তাবিদেরা এই বিভাগকে সমাজানুকূল মনে করেছিলেন তাই স্থাপন করেছিলেন।

প্রশ্ন—সেবার আদর্শ কি?

উত্তর—আমাদের সমস্ত জীবন সেবার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত। পশ্চিমে মানুষ ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তির স্বার্থকে বড় করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ গৃহীকে পরার্থপর জীবন যাপন করতে বলেছে। তার চিত্তের প্রসার করতে হবে—প্রথমে পরিজনের সেবায়, পরিজন থেকে তার দৃষ্টির প্রসার হবে ভূতযজ্ঞে—তখন সমস্ত সৃষ্ট জগৎকে সে আত্মীয় মনে করবে।

একটি ছাত্র প্রশ্ন করলেন, "ভারতবর্ষে খ্রীস্টধর্ম্মের কি প্রয়োজন আছে?"

আমি বললাম, "এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়, ভারতবর্ষের নিজস্ব যে ধর্ম্ম আছে তা সর্ব্বায়ত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; তার বৈচিত্র্যও যেমন অসংখ্য, তার দার্শনিকতাও তেমনি সুগভীর। অথচ ভারতবর্ষে কোনও দিন ধর্ম্ম নিয়ে বিবাদ হয় নি—ভারতীয় দৃষ্টি ধর্ম্মকে অন্তরের জিনিস মনে করে। ধর্ম্ম আমাদের বাইরের প্রকাশ নয়।"

অপর ছাত্র প্রশ্ন করলেন, "খ্রীস্ট যে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করেছেন—তার অনুরূপ কিছু কি ভারতীয় ধর্ম্মে আছে?"

আমি উত্তর দিলাম, "বাংলা দেশে চৈতন্যদেব প্রেমের ধর্ম্মের প্রচার করেছিলেন—প্রেমানুভূতির এর চেয়ে গভীরতম বিশ্লেষণ আর কোথাও কখনও হয় নি।"

তার পর ছেলেরা আমাকে বৈকালিক চা খাওয়ালেন সেই সঙ্গে নানাপ্রকার গল্পগুজব করলেন। ছেলেদের সঙ্গে একটি অপরাহ্ন খুব আনন্দে কাটল। এদের মনে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার আমেজ আছে—কিন্তু তার মধ্যে যতটুকু উদারতা সম্ভব তা এদের আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগে আডাম স্কটের বাড়ী এলাম। রাস্তা থেকে ওদের ছেলেমেয়ের জন্য বড় এক টিন চকোলেট কিনে নিলাম। এসে দেখি বৃদ্ধ নিজের বাড়ীর কাঁটা-বেড়ার গাছ ছাঁটছেন। কর্ম্মের প্রতি এই শ্রদ্ধা প্রশংসনীয়। আমিও বৃদ্ধের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করলাম।

২২শে সেপ্টেম্বর। আডাম স্কটের আতিথ্য আন্তরিক। বেলফাষ্ট থেকে ডাবলিনের টিকিট ছিল আমার। কিন্তু মিঃ স্কট নিজের মোটরে কর্কে যাবেন। তাই তাঁর সঙ্গেই চললাম। দৃশ্যের পর দৃশ্য নূতনত্বের রূপশ্রী নিয়ে দেখা দিল। পথে যে-সব শহর পড়ল তা ধনজনসমৃদ্ধ নয়, বাইরের প্রকৃতির শোভায় আমাদের দেশের চারুতা নেই। দূরে দূরে চোখে পড়ে শৈলশিখর, আর আর্দ্র জলাভূমি। গোধন ও মেষ চরছে মাঠে—মাঝে মাঝে ছোটখাট এক-একখানি বাড়ী। ডাবলিনে পৌঁছে ওয়াই. এম. সি. এ.-র আস্তানায় জিনিষ রেখে গেলাম লাঞ্চ থেকে। আডামকে আজ আমি খাওয়ালাম। আডাম আমাকে কোনও পরিবারে স্থান দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন—তা হয়ে উঠল না—তখন সেণ্ট এণ্ড্রুজ হোটেলে উঠলাম। লাওনেল বুথ নামক এক জন যুবা বন্ধুকে উনি ফোন করে আমার তদারক করতে ব'লে গেলেন।

লাওনেল বুথ এল—শ্রীমন্ত যুবা, জীবনে আনন্দ তার উছলে উঠছে। আমাকে নিয়ে ট্রিনিটি কলেজে গেল। আমার সহযাত্রী শিখ বন্ধু সিংজীর সন্ধানে এলাম। তন্ন তন্ন ক'রে তার কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না।

ট্রিনিটি কলেজ নানা মহাপুরুষের শিক্ষানিকেতন। 'আইডিয়ালিজম' ও বার্কলি অভেদাত্মার মত সুপরিচিত দার্শনিকপ্রবর বিশপ বার্কলির শিক্ষা এখানেই হয়। নাট্যকার কনগ্রিভ এই কলেজের ছাত্র। "ডেজার্টেড

ভিলেজে"র কবি গোল্ডস্মিথ তার সরলচিত্ততা এখানেই অর্জ্জন করেন। বাগ্মী বার্ক তার অমর বক্তৃতাশক্তির জন্য এই কলেজের নিকটই ঋণী। আধুনিক নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে অস্কার ওয়াইল্ড, বার্নাড শ, জেমস জয়েস এই কলেজেই শিক্ষালাভ করেন।

বুথ বিদায় নিল। আমি ট্রামে চড়ে এদের হার্ব্বারে গেলাম। কুকের অফিসে সিংজীর খবর নিলাম। তারাও সন্ধান দিতে পারল না। তার পর সেনেটর জেমস ডগলাসের সন্ধানে চললাম।

সেনেটর ডগলাস ব্যারিষ্টার। তাঁর আপিসে ভাগ্যক্রমে তাঁর দেখা মিলল। তিনি তাঁর বাড়ীর ঠিকানা দিলেন, বললেন, "রাত ন'টায় আমার বাড়ীতে যাবেন তখন আলাপ হবে।"

সান্ধ্য আহার-শেষে রাত ন'টায় যাব ঠিক ক'রে শহর দেখতে বার হলাম। মেরিয়ন স্কোয়ারে একটি গির্জ্জায় জমকালো সভার আয়োজন দেখে সেখানে ঢুকলাম। মেথডিষ্ট চার্চ্চের এক জন নববিবাহিত যাজক সস্ত্রীক ভারতবর্ষে যাচ্ছেন তাই তাঁদের বিদায়-অভিনন্দনের সভা চলছে। এক জন পাণ্ডার সঙ্গে দৈবক্রমে আলাপ হ'ল। তিনি ভিতরে নিয়ে দম্পতীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। যাজকপত্নী ভীত হয়েছিলেন—তাঁকে বললাম, ভারতবর্ষে তাঁরা পাবেন প্রীতি ও শ্রদ্ধা। তরুণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাত নয়টায় জেমস ডগলাসের ওখানে বেশ একটা মজলিস জমল। গৃহস্বামী, তাঁর পত্নী, পুত্র হেরল্ড, মিসেস লেমি, মিস ম্যানিং, মিঃ হেজ, মিসেস হেজ, সকলে মিলে নানা বিষয়ে আলাপ চলল। কফি পান করা গেল।

আলাপ চলল আইরিশ ইতিহাসের সাম্প্রতিক এবং অতীত সমস্যা নিয়ে। মিঃ লেমি বোধ হয় আইরিশ-বিদ্রোহের সময় অবিচারে নির্ব্বাসিত হন। তার কীর্ত্তি স্বীকৃত হয় নি বলে মিসেস লেমি দুঃখ করছিলেন।

জেমস ডগলাস আইরিশ সংস্কৃতির প্রতীক কয়েক

জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবেন বললেন। তার পর তাঁর পুত্র হেরল্ডকে আমাকে বাসায় রাখতে বললেন।

জেনিভাতে বিশ্ব-যুব-সংঘের অধিবেশনে হেরল্ড আইরিশ দেশের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেছিল।

সে বলল, "আমি জানি, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, কিন্তু আপনাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না—আপনাদের যুবক-মনে যে উৎসাহ ও আনন্দ দেখেছি—তাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা একান্ত আশান্বিত।"

এমনই শুভেচ্ছা আয়র্লণ্ডের সর্ব্বত্র দেখেছি। পর-শাসনের দুঃখ ওরা অনেক ভোগ করেছে—তাই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওদের সহানুভূতি আন্তরিক।

স্বাধীনতার পথে আমাদের স্বকৃত অন্তরায়ের কথা হেরল্ডকে বললাম। সে বলল, "এর জন্য আপনাদের লজ্জা নেই—আপনাদের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা, হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অবশ্য বাধা—কিন্তু স্বাধীনতা পেলে ওগুলি আপনা হতেই দূর হবে।"

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য



রামগড়ে কংগ্রেস উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালের দাতব্য চিকিৎসালয়

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিল্প-প্রদর্শনী



ধ্বংসের দেবতা
শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ঘরমুখো
শ্রীঅমলরাজ

কুটির
শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়

তুলসীতলায়
শ্রীপরিতোষ সেন



পাড়ি

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী



পূজারিণী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী



প্রাং   রুশীয় পরিবার   পুরাতন   ত্র হইতে



চিন্তাব্যাকুল রুশীয় পরিবার   পুরাতন চিত্র হইতে

আদি মানব ও সভ্যতার বিকাশ

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল, এম. এসসি

মানুষের ন্যায় জীব যে সময়ে ধরাপৃষ্ঠে প্রথম বাস করিতে আরম্ভ করে তাহার পর দশ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়াছে এমনও হইতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর লিখিত ইতিহাস অতীতের দিকে মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রসারিত। আদি মানবের যাহা কিছু পরিচয় এ পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি সে সকলই, পৃথিবীর নানা স্থানে নানা অবস্থায় যে সকল চিহ্ন সে রাখিয়া গিয়াছে সেই সমুদয় হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। প্রথম যুগের মানুষের দেহাবশেষ অল্পই মিলিয়া থাকে। যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হস্তনির্ম্মিত প্রস্তরের দ্রব্য হইতেই তাহার বেশীর ভাগ পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। ঐ সকল যন্ত্রের আকার যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভূগর্ভের যে স্তরে আদি মানবের স্মৃতিচিহ্নের সন্ধান মিলে সেই স্তরের বয়স হইতে কোন্ যুগে বিশেষ প্রকার মানুষ পৃথিবীতে বাস করিত তাহা অনুমান করা সম্ভবপর। এক-এক যুগের সংস্কৃতি এক-এক প্রকার। ঐ সংস্কৃতির ক্রমে উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্থি, শৃঙ্গ প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত যন্ত্রেরও ব্যবহার হইয়াছে দেখা যায়। অতীত কালের মানব-স্মৃতিচিহ্নের সহিত অধুনালুপ্ত বহু জীবের শিলীভূত কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইগুলি হইতে যুগবিশেষের মানুষের সমকালে যে-সকল প্রাণী পৃথিবীতে বাস করিত তাহাদের বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি। এক সময়ে মানুষ মুক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে আরম্ভ করে। পর্ব্বত-কন্দরবাসী মানবের স্মৃতিচিহ্ন অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। পরে আবার মানুষ উন্মুক্ত স্থানে ফিরিয়া আসে বটে, কিন্তু গভীর গুহাভ্যন্তরে ও সুরক্ষিত পার্ব্বত্য আশ্রয়ে নানা প্রকার চিত্রশিল্প রাখিয়া যায়। ঐগুলি হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমাদের ন্যায় মানুষের প্রাথমিক জীবনের অনেক কাহিনীই উহাদের মধ্যে ধরা পড়ে। ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া মানুষ শেষে সভ্যতার স্তরে আসিয়া পৌছে এবং মৃত্তিকাগঠিত দ্রব্য ব্যবহার করিতে শিখে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ধাতুর প্রচলন হয়। সভ্যযুগের প্রস্তর, মৃত্তিকা ও ধাতুনির্ম্মিত অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীর নানা স্থানে মিলিয়া থাকে। স্পষ্টাক্ষরে লিখনকার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। তাহারও আগে বহুদিন ধরিয়া জটিল সাঙ্কেতিক লিপি ও চিত্রাক্ষরলিপির ব্যবহার চলিয়াছিল। মানব-সভ্যতা কি ভাবে বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা ঐ সকল স্মৃতিচিহ্ন ও প্রাচীন লিপি হইতে অনেকাংশে নিরূপিত হইতে পারে। কিন্তু ভূগর্ভখননাদির দ্বারা অতীত চিহ্নের উদ্ধার সাধন করিয়া মানবেতিহাস রচনার চেষ্টার কেবল আধুনিক যুগে সূত্রপাত হইয়াছে এবং অনুসন্ধান-কার্য্যও পৃথিবীর বেশী স্থানে সাধিত হয় নাই। সুতরাং আদি মানব ও তাহার ক্রমবিকাশের যে ইতিবৃত্ত এ পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি তাহা অসম্পূর্ণ বিবরণ মাত্র।

বর্ত্তমানে ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ যে অপরাপর স্তন্যপায়ী প্রাণীর ন্যায় মানুষও নিম্নস্তরের জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং এককালে শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং, গিবন, গরিলা ও মানুষের পূর্ব্বপুরুষ অভিন্ন ছিল। বর্ত্তমান পৃথিবীর হাতী, ঘোড়া, উট প্রভৃতি বৃহৎ জন্তুর বিবর্ত্তনের প্রতি স্তর অতীত যুগ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা যেরূপ সম্ভবপর হইয়াছে মানুষের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে সেরূপ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই সত্য, তবে ডারউইন যে সময়ে বিবর্ত্তনবাদ প্রচার করেন সে সময়ে মানুষ ও লাঙ্গুলহীন বানরের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল আধুনিক আবিষ্কারের ফলে তাহা অনেকাংশে দূর হইয়াছে। ১৯২৪ সালের একটি আবিষ্কার Taungs Skull এবং তাহারও পরে পিকিং-এর সিনানথ্রোপাস

নামক লুপ্ত জীবের আর এক শ্রেণীর আবিষ্কার হইতে মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি জীব এককালে পৃথিবীতে বাস করিত বলিয়া জানা যায়। দাঁত, মাথার খুলি, কপালের ক্রমনিম্ন আকার প্রভৃতি বিষয়ে ঐ সমুদয় জীব বানর অপেক্ষা উচ্চস্তরের ছিল, কিন্তু মানুষের সমস্তর পর্য্যন্ত পৌছে নাই।

কেনোজয়িক যুগই ভূতত্ত্বের কয়েকটি প্রধান যুগের মধ্যে শেষ যুগ। বর্ত্তমান কাল হইতে কয়েক কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর—তৃণ, ফুল, পাখী ও আধুনিক জীবের এই যুগ আরম্ভ হয়। কেনোজোয়িক যুগকে পাঁচটি ক্ষুদ্রতর যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম—ইয়োসিন্, দ্বিতীয়—অলিগোসিন, তৃতীয়—মায়োসিন, চতুর্থ—প্লিয়োসিন এবং পঞ্চম বা শেষ যুগ—প্লিষ্টোসিন। প্রথম যুগের শিলাস্তরে আধুনিক জীবের দেহাবশেষ দেখা গেলেও মানবসদৃশ বৃহৎ বানরের পরিচয় পাইতে বৈজ্ঞানিকদিগকে তৃতীয় বা মায়োসিন যুগে আসিতে হয়। সুতরাং মূল বংশের প্রকৃতিজাত যে বিভেদের ফলে মানুষ ও বানরে পৃথক হয় মেসোজোয়িক যুগের আগে তাহার সূচনা হয় নাই ইহা নিশ্চিত। অনুমান দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কেনোজোয়িক যুগের তৃতীয় অংশে মানবের স্বতন্ত্র বংশ ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় এবং মায়োসিন ও সমগ্র প্লিয়োসিন যুগ ধরিয়া নবোদ্ভূত মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন ভাবে বিকাশ পায় যে তাহাতে তাহার দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গী ঋজু হইতে পারে। অর্থাৎ প্লিয়োসিন যুগের সমাপ্তিতে মানব-দেহের সম্মুখভাগ চলাফেরার কাজে বিরত হয় এবং পদদ্বয় উহাতে বৈশিষ্ট্য লাভ করে। প্লিষ্টোসিন যুগের প্রথম দিকে মস্তিষ্ক যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবার পর বানরের স্থূলভাব মানুষের দেহ হইতে চলিয়া যায় এবং তাহার বেশীর ভাগ অবয়বও লোমমুক্ত হয়।

সম্ভবতঃ মানুষের পূর্ব্বপুরুষ চারি পায়ে ভর করিয়া মাটির উপর দিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া চলিত এবং বৃক্ষে বাস না করিয়া প্রধানতঃ ভূমিতে থাকিত এবং প্রয়োজন হইলে জিব্রাল্টরবাসী বানরের ন্যায় পাহাড়ের মধ্যে লুকাইত। সহজেই সে গাছে চড়িতে পারিত এবং জাপানীদের মত পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও দ্বিতীয় অঙ্গুলির মধ্যে দ্রব্যাদি ধরিতে পটু ছিল। গরিলা প্রভৃতি বানর যেমন এখন পৃথিবীতে সংখ্যায় অল্প মানুষের পিতৃপুরুষও সেইরূপ অল্পসংখ্যক ছিল এবং একটি দুইটি অথবা কয়েকটিতে দল বাঁধিয়া খাদ্যের অন্বেষণে বিস্তৃত ভূভাগে ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষ যে সন্তরণের শক্তি লইয়া জন্মে না, তাহাকে সাঁতারের শিক্ষা লাভ করিতে হয় তাহা হইতে প্রমাণিত হয় নদী, হ্রদ ও সমুদ্র হইতে সে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সংখ্যায় কম থাকায় এবং মৃতদেহ জলে পড়িয়া শিলীভূত না হইবার ফলে কেনোজোয়িক প্রস্তরে মানুষের পূর্ব্বপুরুষের দেহাবশেষ মিলে না বলিলেই চলে।

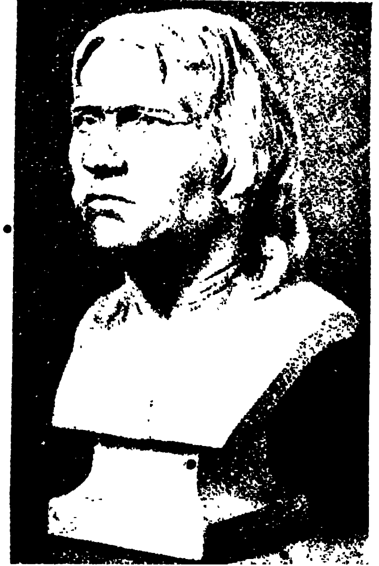
মানুষের মত জীবের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় স্থূলভাবে কাটা এবং হাতে ধরিবার উপযুক্ত করিয়া গঠিত কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড হইতে। প্রথম যুগের পাথরের যন্ত্রগুলি (Eoliths) মানুষের হাতের প্রস্তুত কি স্বভাবজাত ইহা লইয়া অনেক দিন বিতর্ক চলিবার পর ভূতত্ত্ববিদেরা আধামানব হস্তের নিশ্চিত চিহ্ন উহাদের মধ্যে দেখিতে পান। শেষ প্লিয়োসিন যুগের কাছাকাছি সময় উহাদের গঠনকাল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের যে জীব ঐ সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাদের কোনরূপ দেহাবশেষ ইউরোপ ও আমেরিকায় এ পর্য্যন্ত মিলে নাই। কিন্তু সেই সময়কার জীববিশেষের মাথার খুলির উপরিভাগ, বাম দিকের ঊরুর হাড় এবং কতকগুলি দাঁত জাভায় পাওয়া গিয়াছে। দেহাস্থি সমুদয় হইতে জানা যায়, প্লিয়োসিন যুগের শেষে এবং প্লিষ্টোসিন যুগের সূচনায় মানবসদৃশ এক জীব মস্তিষ্কের আকারে শিম্পাঞ্জী ও মানুষের মাঝামাঝি স্থান অধিকার করিয়াছিল। উহা পা দুইটি সোজা হইয়া চলিবার উপযোগী হইয়াছিল এবং সেই কারণে হস্তদ্বয়ও ভূমির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হইবার মত অবস্থায় আসিয়াছিল। উক্ত জীব বানর বা মানুষ কোনটিই ছিল না। বৈজ্ঞানিকেরা হাঁটিয়া চলিবার শক্তিসম্পন্ন বানর-মানুষটির নাম দিয়াছেন—Pithecanthropus erectus. আদি মানব বা উপমানবের জগতে বিরাটকায় হাতী, জলহস্তী ও বীবর এবং বন্য ষাঁড় ও বিড়াল বাস করিত। খড়্গাকার দাঁতযুক্ত বাঘ এবং বন্য ঘোড়াও তখন পৃথিবীতে

অনেক ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু সিংহ বা প্রকৃত বাঘের কোন চিহ্ন ইউরোপে দেখা যায় না। ভালুক, ভোঁদড়, নেকড়ে বাঘ এবং বন্যশূকরের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রথম মানুষের যুগে মিলিয়া থাকে।

আরও লক্ষ বৎসর কাটিয়া গেলে নূতন এক প্রকার মানুষ (Eoanthropus) ধরাতলে উদ্ভূত হয়। তাহার দেহাবশেষ চার্লস ডসন কর্তৃক ১৯১১-১৫ সালে সাসেক্সের অন্তর্গত পিল্টডাউন নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম যুগের বানর-মানুষ অপেক্ষা উচ্চ স্তরের হইলেও ঐ জীব প্রকৃত মানবের স্তরে উঠে নাই। উহার মস্তিষ্ক মানব-মস্তিষ্কের সমান ছিল সত্য কিন্তু দাঁত, চোয়াল ও মুখাবয়বে উহা বানরকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। হাতীর দাঁত হইতে প্রস্তুত আশ্চর্য্য রকমের এক যন্ত্র পিল্টডাউন মানবের সমস্তরে দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে আমরা এই অনুমান করিতে পারি যে প্লিষ্টোসিন যুগের প্রথম দিকেই মানুষ হাতের কাজে দক্ষ হইয়াছিল এবং উদ্ভাবনার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল।



পুরাযুগের মানুষ (Eoanthropus)



ম্যাগডালেনীয়ান যুগের মানুষ

পুরাযুগের মাথার খুলি হইতে পুনর্গঠিত

হাইডেলবার্গের কোন বালুকাগহ্বরে ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৮০ ফুট নীচে এক জীবের চোয়ালের হাড় পাওয়া যায় তাহাও আদি মানবের মনে করা হইয়া থাকে। ঐ হাড় আকারে অতি বৃহৎ। হাইডেলবার্গ মানবের দেহ অনুরূপ বৃহৎ ছিল মনে করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ সে লোমশগাত্র ও দেখিতে অতি কুৎসিত ছিল। ইহার পর বহু কাল মানুষ কোন দেহাবশেষ পৃথিবীতে রাখিয়া যায় না। তখনকার মানবহস্ত-প্রস্তুত যন্ত্রেরই কেবল আমরা সন্ধান পাই। ঐ সমুদয় যন্ত্র যাহারা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাদের অপর সকল চিহ্নই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। যন্ত্রগুলি



প্রাচীনযুগের বানর-মানুষ (Pithecanthropus Erectus)



নিয়ানডার্থাল মানুষ

পুরাকালের মাথার খুলি হইতে পুনর্গঠিত

না থাকিলে এক সুদীর্ঘ কালের মানুষের কথাই চিরদিনের জন্য অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

প্রস্তর-যুগ ধাতু ব্যবহারের পূর্ব্বযুগ। প্রস্তর-যুগের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশ ভূগর্ভের শিলাস্তরে ধরা পড়ে। একটি পেলিওলিথিক বা প্রাচীন প্রস্তরের যুগ, অপরটি নিওলিথিক বা নূতন প্রস্তরযুগ। উভয়ের মধ্যে পড়ে মেসোলিথিক যুগ। পেলিওলিথিক যুগকে আবার ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির যুগে বিভক্ত করা যায়। আদিমকালের মানুষ পর-পর যে-সকল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়াছিল ঐ সংস্কৃতিপরম্পরা তাহার পরিচায়ক। বহুসংখ্যক ভূস্তরের পর্য্যবেক্ষণ হইতে পেলিওলিথিক সংস্কৃতির ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, নিম্ন-পেলিওলিথিক কাল্‌চার প্রায় পৃথিবীব্যাপী। কোথায় উহার জন্ম ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ আফ্রিকা হইতে উহা ইউরোপে পৌঁছে। আরবদেশ, এক দিকে ভারতবর্ষ, অপরদিকে আফ্রিকা ও বেবিলন উভয়ের নিম্ন-পেলিওলিথিক সংস্কৃতির যোগ সাধন করিয়াছিল এমনও হইতে পারে। ভারতের উত্তর দিকে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত ঐ সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিদেরা নিম্ন-পেলিওলিথিক শিলাশিল্পে তীর, ছুরি, ঘষিবার ও ছিদ্র করিবার যন্ত্র, দূরে ছুড়িবার মত প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন। পেয়ারা ফলের আকার বিশিষ্ট পাথরের যন্ত্র নিম্ন-পেলিওলিথিক শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার চিলীয় শিল্পে শিলাযন্ত্রের আকার বৃহৎ। তাহাদের গঠনে কোন শ্রী নাই। মারামারির সময়ে ও মাটি খুঁড়িবার কাজে সম্ভবতঃ যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত। স্থূল গঠনের পেয়ারার আকারের যন্ত্র চিলীয় শিল্পে অনেক মিলিয়া থাকে। তৎপূর্ব্ব শিল্পে যন্ত্রের আকার আরও স্থূল। গ্রীষ্মপ্রিয় জীবের দেহাবশেষই চিলীয় শিল্পের সহিত জড়িত দেখা যায়। সেই যুগে উদ্ভিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল—ডুমুরের মত বৃক্ষ এবং পীত পুষ্প-প্রসূ লরেল সদৃশ লতা। আন্দাজ আড়াই লক্ষ বৎসরকাল চিলীয় শিল্প পৃথিবী জুড়িয়া ছিল। পরবর্ত্তী নিম্ন পেলিওলিথিক একুলীয় শিল্পে পেয়ারার আকারযুক্ত হাত-কুঠারের গঠনে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। একুলীয় সংস্কৃতি উহার পূর্ব্ব সংস্কৃতির বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থামাত্র। শীত সহ্য করিতে পারে এরূপ জন্তুর দেহাবশেষও চিলীয় জীবের সহিত এক সঙ্গে নিম্ন পেলিওলিথিক যুগের শেষভাগে দৃষ্ট হয়। সুতরাং সেই সময়ে শীতের আবির্ভাব হইয়াছে বুঝা যায় কোন বিশিষ্ট প্রকার মানবদেহাস্থির সহিত নিম্ন পেলিওলিথিক শিল্পবিশেষকে এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে সংযুক্ত করা যায় নাই। পিল্টডাউন মানবের যুগ তেমন সুনির্দ্দিষ্ট নহে। হাইডেলবার্গ মানব প্রায় একই কালের। যদি ধরিয়া লওয়া যায় প্লিষ্টোসিন যুগের সূচনায় ঐ সকল মানুষ পৃথিবীতে বাস করিত তবে তাহাদের সংস্কৃতিকে পূর্ব্ব-চিলীয় বলিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম মানব অর্থাৎ বানর-মানুষের মধ্যে বানরের ভাব এত বেশী ছিল যে ইহা কল্পনা করিলে ভুল হইবে না, তাহারা প্রস্তরগঠিত কুঠারাদির ন্যায় উন্নত ধরণের যন্ত্র কোন দিন ব্যবহার করে নাই।

পৃথিবীর জলবায়ুর অবস্থা আদি মানব ও তাহার সংস্কৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্লিষ্টোসিন যুগ প্রায় সমগ্রভাবে নাতিশীতোষ্ণ ছিল। উহার শেষ দিকে মাত্র শৈত্য দেখা দেয় এবং ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া তুষার-যুগের সৃষ্টি করে। এক হিমতরঙ্গেই তুষার-যুগের অবসান হয় নাই। এক দল বিশেষজ্ঞ বলেন, চারিটি বিরাট হিমতরঙ্গ প্লিষ্টোসিন যুগের উপর দিয়া চলিয়া যায়। আল্পস পর্ব্বতের চারটি নদীর নামে তাঁহারা উহাদের নামকরণ করিয়াছেন—প্রথম, গুঞ্জ, দ্বিতীয়, মেণ্ডেল; তৃতীয়, রীস ও চতুর্থ, উর্ম, মাঝের তিনটি উষ্ণযুগ—গুঞ্জ-মেণ্ডেল, মেণ্ডেল-রীস ও রীসউর্ম। চতুর্থ বা শেষ তুষার-যুগের পর পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়িতে থাকে। পরে আবার উহা হ্রাস পাইলেও তুষার-যুগ সৃষ্টি হইবার মত অবস্থা আসে না। জল-বায়ুর অবস্থার কল্পনাতীত পরিবর্ত্তনে উদ্ভিদ ও জীবজগতে স্বভাবতঃই বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। যেমন, জানা যায়, প্রবল শীতের সময় চারিদিকে অসংখ্য বল্গা-হরিণ দেখা দিত আবার শীতকাল চলিয়া গেলে বল্গা-হরিণ অন্তর্হিত হইত এবং তাহার স্থানে আসিয়া জুটিত লাল হরিণ। ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিতর্কের বিষয়






নীয়ান্ডার্থাল মানুষের মাথার খুলি হইতে তাহার মুখের চেহারা গড়িয়া তোলা হইতেছে। উপরের সারি বাম দিকে, নীয়ান্ডার্থাল মাথার খুলি; দক্ষিণে, খুলিটির প্লাষ্টার প্রতিরূপ। নীচের সারিতে ক্রমশ পুরা মুখটি তৈরি হইতেছে।

হইলেও এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে নাতিশীতোষ্ণ বা শীতল অবস্থার মধ্যে একুলীয় সংস্কৃতি উদ্ভূত হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী চিলীয় সংস্কৃতি পৃথিবীর জলবায়ুর নানা অবস্থা অতিক্রম করে।

১৮৫৭ সালে জার্ম্মানীর ডুসেলফোর্ডের নিকটবর্ত্তী নীয়ান্‌ডার্থেল গুহায় একটি মানুষের মাথার খুলি ও দেহের হাড়ের সন্ধান মিলে। ভবিষ্যতে ঐরূপ মানুষের আরও যে কয়েকটি দেহাস্থি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৯২৬ সালের মিস ডরোথি গ্যারডের আবিষ্কারটি একটি পাঁচ বৎসরের শিশুর। দেহাবশেষগুলি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষের। তাহার বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এক সময়ে মনে করা হইত, আধুনিক মানুষ উহারই বংশধর। পরে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে বর্ত্তমান মানুষের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও বানরের চিহ্ন নীয়ান্‌ডার্থেল মানবের দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে দূর হয় নাই। তাহার কপাল অনুন্নত, ওষ্ঠ দীর্ঘ, চোয়াল প্রলম্বিত এবং ভ্রূ ললাটের সীমা অতিক্রম করিয়া মস্তকের দুই দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উরু বাঁকা ছিল বলিয়া সে নেংচাইয়া চলিত এবং দুই বাহুও তাহার সাধারণ মাপ ছাড়াইয়া গিয়াছিল। উহার চিবুকহীন মুখে কথা বাহির হইত কি না সন্দেহ আছে। গরিলার ন্যায় আকারবিশিষ্ট ঐ অদ্ভুত মানবের অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে গল্পের রাক্ষসের বীজ নিহিত আছে কেহ কেহ মনে করেন।

প্লিষ্টোসিন যুগের মধ্যভাগে সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া নীয়ান্‌ডার্থেল মানুষ ধরাপৃষ্ঠে বাস করিত। তাহার সংস্কৃতি মধ্য পেলিওলিথিক বা মুষ্টিরীয়। ফ্রান্সের পর্ব্বতগুহায় একুলীয় শিল্পের উপর স্তরে মুষ্টিরীয় শিল্প পরিলক্ষিত হয়। বল্গা হরিণ প্রভৃতি মেরুদেশীয় জীবের সহিত মধ্য-পেলিওলিথিক শিল্পকে জড়িত দেখা যায়। কাজেই ধরা যাইতে পারে নীয়ান্‌ডার্থেল মানবের আবির্ভাব-কাল এক তুষার-যুগ। উহাই পৃথিবীর শেষ তুষার যুগ। শৈত্য চরমে আসিয়া পৌছিলে নীয়ান্‌ডার্থেল মানব পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ সময়ে অন্য উপমানব যাহারা পৃথিবীতে বাস করিত সকলেই তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

নীয়ান্‌ডার্থেল মানবের শিল্প সুন্দর। তাহারা সুশ্রীভাবে পাথরের যন্ত্র প্রস্তুত করিত। এক যন্ত্রের অগ্রভাগের চাতুর্য্যে

সহিত কঠিন বিন্দু সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু প্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রও বোধ হয় তাহারা ব্যবহার করিত এবং নানা গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান কাঠের কাজ হইতে লাভ করিয়া পরে সম্ভব তাহা প্রস্তরে প্রয়োগ করিত। ফ্রান্সের মুষ্টিরীয় শিল্পের তিন বিভাগের মধ্যে প্রথমটিতে একুলীয় শিল্পের অবশেষ লক্ষিত হয়। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সুগঠিত অনেক হাত-কুঠার প্রথম শিল্পে দেখা যায়। কখন কখন উহা ত্রিকোণাকার হইয়াছে। মধ্যের শিল্পে ঐ যন্ত্র প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। অন্যান্য শিল্পেও প্রকারভেদ কম। শেষ শিল্প সম্পূর্ণ ভাবে হাত-কুঠারবর্জ্জিত। উহাতে আছে শুধু একঘেয়ে রকমের ঘর্ষণী ও সূক্ষ্মশীর্ষ যন্ত্রবিশেষ।

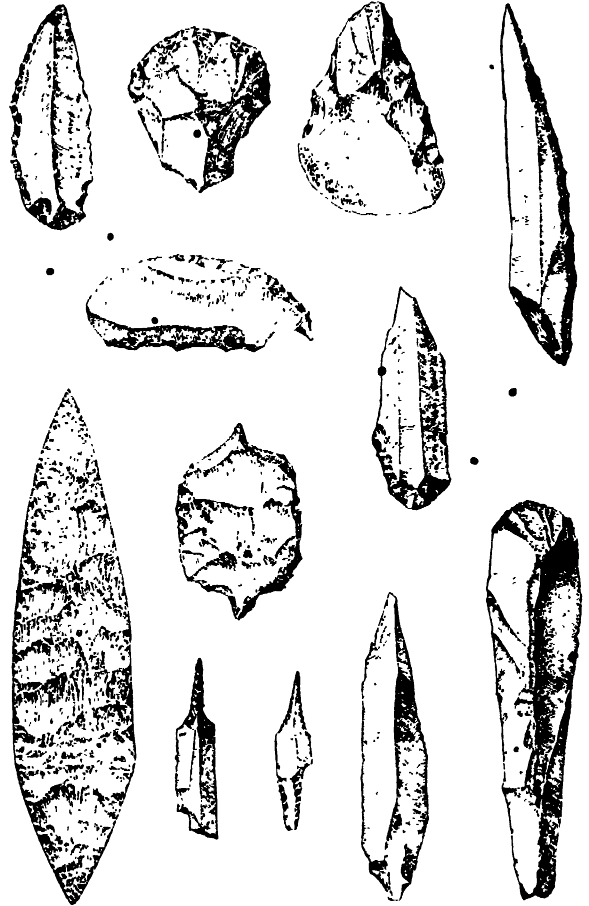
মধ্য-পেলিওলিথিক সংস্কৃতি পৃথিবী ব্যাপিয়া না থাকিলেও সুবিস্তৃত ছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, উত্তর-আফ্রিকা, ইটালী, জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভেকিয়া পোলাণ্ড, ক্রিমিয়া, সাইবিরিয়া এবং সম্ভবতঃ চীন, এসিয়ামাইনর ও প্যালেস্টাইনে উহা প্রবেশ করিয়াছিল। মধ্য-ইউরোপে নিম্ন-পেলিওলিথিক শিল্প তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তৎপরিবর্ত্তে লক্ষ্য করা যায় প্রথম সময়কার মুষ্টিরীয় যন্ত্র। সেখান হইতেই উহা পশ্চিম ইউরোপে নীত হয়। নীয়ান্ডার্থেল মানব যে সময়ে শৈত্যতাড়িত হইয়া পশ্চিমের দিকে চলিয়া যায় সেই সময়ে সে তাহার যন্ত্র সঙ্গে লইয়া যায়। ফ্রান্সের ডর্ডোন উপত্যকায় তুষার-যুগের প্রবলতম শীত তাহাকে আক্রমণ করে। উপত্যকাটি মুষ্টিরীয় শিল্পে সমৃদ্ধ। মধ্য-ইউরোপ নীয়ান্ডার্থেল মানবের আদি জন্মভূমি কি না বলা কঠিন। তবে হাইডেলবার্গ মানব তাহার পূর্ব্বপুরুষ এ-কথা সত্য হইলে ধরিতে হয়, পঞ্চাশ হাজার বৎসরের অনেক বেশী সময় সে এই পৃথিবীর অধিবাসী ছিল। মুষ্টিরীয় যুগের যে একটি বিষয় বিশেষভাবে আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে তাহা নীয়ান্ডার্থেল মানবের সমাধি-প্রথা। সযত্নকৃত ক্ষুদ্র গর্ত্তে সুন্দর সুন্দর যন্ত্রপাতির সহিত ঐ নরবুরাক্ষস মৃতদেহ সমাহিত করিত।

নীয়ান্ডার্থেল মানবের দৈনন্দিন জীবনের মোটামুটি চিত্র এখন আমরা অঙ্কিত করিতে পারি—একটি ক্ষুদ্র পরিবার, তাহার কর্ত্তা থাকিত একজন প্রবীণ পুরুষ। দিনের বেলা খাদ্যের অন্বেষণে সকলে ঘুরিয়া বেড়াইত। নিজ হস্তে প্রস্তুত পাথরের অস্ত্র ও লাঠির আঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু শিকার করা তাহাদের একটি কাজ ছিল। বৃহৎ জন্তুর মৃতদেহ ও বন্য আপেল প্রভৃতি তাহারা সংগ্রহ করিত এবং সন্ধ্যার সময়ে একত্রে আগুন জ্বালাইয়া তাহার চারি পার্শ্বে উপবেশন করিত। গাছের শুষ্ক পাতার মধ্যে পাথর ও লোহাপাথর ঘষিয়াই অগ্নি উৎপাদন করা হইত। আগুন নিবিতে দেওয়া হইত না। কেননা, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা তখন কঠিন কাজ ছিল। স্ত্রীলোক ও শিশুরা কাঠ জোগাড় করিয়া আনিয়া তাহার সাহায্যে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িত। জলের প্রয়োজনে নদীর ধারেই নিশ্চয় বসিবার স্থান করিতে হইয়াছিল। মৃৎপাত্র অথবা অন্য কোন পাত্রের কথা তখনকার মানুষের জানা ছিল না। চারি দিকে জীবজন্তুর চামড়া ছড়ান থাকিত। আদি-মানব প্রথম দিনেই চামড়ার ব্যবহার শিখিয়াছিল মনে হয়। চামড়াগুলি শিশুদের গায়ে জড়াইয়া দেওয়া হইত অথবা ভূমি আর্দ্র এবং শীতল থাকিলে তাহার উপর বিছান হইত। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ও বিচরণশীল বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার পক্ষে আগুনের মত উপকারী কিছুই ছিল না। ফলমূল, জীবজন্তুর হাড়, আধ-পচা মাংস সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিত। দুর্গন্ধে কাহারও আপত্তি ছিল না, এখনও অনেক সময়ে থাকে না। ক্ষুধার সময়ে পরিবারের দুর্ব্বল ব্যক্তি ও রুগ্ন শিশু হত্যা করিয়া খাদ্যের অভাব যে মিটান হইত না এমন নহে। এক জন বয়স্থ পুরুষ ভিন্ন দলের মধ্যে থাকিত কেবল স্ত্রীলোক, বালক ও বালিকা। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ পরিবারে থাকিতে পারিত না যেহেতু প্রাচীন ব্যক্তির ঈর্ষা উৎপাদন করিবার মত কোন বালকের বয়স হইলেই ঐ ব্যক্তি তাহাকে মারিয়া ফেলিত অথবা দল হইতে তাড়াইয়া দিত। প্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দল ত্যাগীর সহ-গামিনী হইত। দলপতি যখন বেশী বৃদ্ধ হইয়া পড়িত ও তাহার সকল শক্তি নষ্ট হইত, দাঁত পড়িয়া যাইত এবং স্বভাব খিট্‌খিটে হইত তখন আবার কোন প্রবীণ পুরুষ তাহাকে হত্যা করিয়া দলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত।

তুষার-যুগের শীতের তীব্রতা ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে। যে তুষাররাশি পৃথিবীর মেরুদেশ ছাড়াইয়া

বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল ক্রমে তাহা মেরুতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শ্যামল উদ্ভিদ ও বৃহৎ জন্তুর সংখ্যাও পৃথিবীতে বাড়িতে থাকে। তৃণগুল্মের সঙ্গে বন্য ঘোটক দলে দলে আসিয়া জুটে। এইরূপ অনুকূল অবস্থায় বর্ত্তমান কাল হইতে ৪০ হাজার ও ৫০ হাজার বৎসরের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ ইউরোপে বাস করিয়াছিল। তাহারা সকল রকমে প্রকৃত মানুষ ছিল। আধুনিক মানুষ ঐ মানবের সমশ্রেণীভুক্ত। দক্ষিণ-এসিয়া, আফ্রিকা কিংবা ভূমধ্যসাগরে তলাইয়া গিয়াছে এমন কোন ভূভাগে উহারা আপনাদের বিকাশ সাধন করিয়াছিল। পূর্ব্ব-যুগের নীয়ান্‌ডার্থেল মানবকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের পার্ব্বত্য আশ্রয় শেষ পেলিওলিথিক মানব অধিকার করিয়াছিল বলিয়া ধারণা হয়। তবু তাহারা প্রধানতঃ মুক্ত স্থানে বাস করিত। জীবজন্তু শিকার করিলেও তাহারা পশু পালন করে নাই। মোটের উপর তাহারা নগ্ন থাকিত। চিত্রাঙ্কন উহাদের জীবনের একটি প্রধান কাজ ছিল। সাদা, লাল, কাল প্রভৃতি রঙ চিত্রে প্রযুক্ত হইত। ধাতব অক্‌সাইড্‌ ও কার্ব্বোনেট এজন্য ব্যবহৃত হইত। চিত্র আঁকিবার এমন প্রবৃত্তি আধুনিক কোন জাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা শেষ-পেলিওলিথিক ইতিহাসের তিনটি স্তর দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, প্রথম, অরিগ্‌নেসীয়। সুন্দর সুন্দর প্রস্তরের যন্ত্র এবং নানা প্রকার দেওয়াল চিত্র ও ক্ষুদ্র মূর্ত্তি অরিগ্‌নেসীয় স্তরে দেখা যায়। চিত্রিত গুহার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সমাদৃত সেগুলি এই যুগের শেষ দিকের। কতকটা স্থূল হইলেও অরিগ্‌নেসীয় শিল্পকলার ভঙ্গী সবল। "ভেনাসেস" নামে পরিচিত এই সময়ের মানুষের মূর্ত্তি বিশেষ বিখ্যাত। দ্বিতীয় স্তর সলুট্রীয়। এই স্তরে প্রস্তরগঠিত যন্ত্র গুণে ও সৌন্দর্য্যে চরমে উঠিয়াছে। সলুট্রীয় যুগের কতকগুলি ক্ষুরাকৃতি ফলক এরূপ হইয়াছে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিওলিথিক যন্ত্রও তাহাদের উর্দ্ধে উঠে না। যন্ত্রগুলি ইস্পাতের ব্লেডের ন্যায় পাতলা ও ধরাল। লরেল পত্রসদৃশ সূক্ষ্ম বর্শাফলক আবিষ্কার করিতে পারিয়াই সলুট্রীয় মানব এক দিন পশ্চিম-ইউরোপের অনেক স্থানে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। অতি দ্রুতভাবে দ্বিতীয় স্তরের মানুষ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়। তিন যুগের মধ্যে সলুট্রীয়ই স্বল্প-স্থায়ী হইয়াছিল। মুষ্টিরীয় সংস্কৃতি যেমন রীস-যুগের

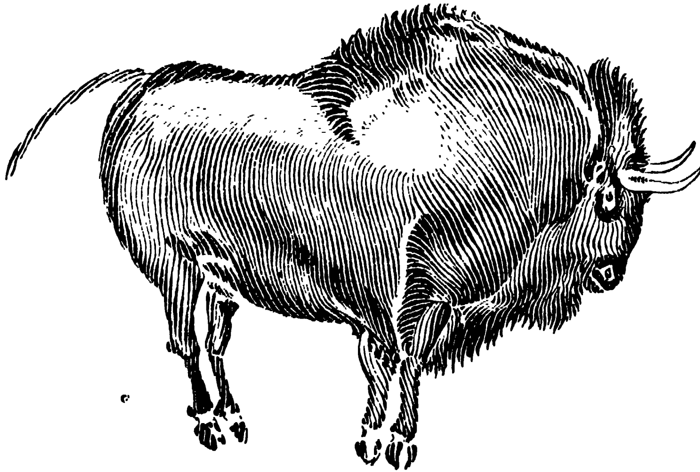


শেষ পেলিওলিথিক যুগের তিন স্তরের যন্ত্রাদি

শেষ ভাগের সঙ্গে জড়িত অরিগনেসীয়ও তেমনই উর্ম্‌-যুগের শেষাংশের সহিত সংযুক্ত। তৃতীয় বা শেষ স্তর ম্যাগডালিনীয়। ইহা তুষার-যুগ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ উর্ম্‌পরবর্ত্তী যুগ। ফ্রান্সেই প্রধানতঃ ম্যাগ-ডালিনীয় সংস্কৃতি বা রেনডীয়ার কাল্‌চার বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অস্থি, শৃঙ্গ ও হস্তীদন্ত নির্ম্মিত যন্ত্রাদি এই যুগেই বেশী দেখা যায়। হাড় হইতে এরূপ সুন্দর সূচ ম্যাগডালিনীয় মানব প্রস্তুত করিয়াছিল যে তাহার সহিত তুলনা করিবার মত দ্রব্য ঐতিহাসিক কালের নবযুগ

পর্য্যন্ত কোন সময়ে মিলে নাই। রোমবাসীদের পর্য্যন্ত উহার সমতুল্য সূচ ছিল না। অরিগনেসীয় যুগে যে চারু-কলা চর্চ্চার সূত্রপাত হয় শেষ সংস্কৃতিতে তাহার চরম উন্নতি ঘটে। এই যুগে পাথরের যন্ত্র আকারে খুব ছোট হইয়াছে। গোলাকার হাড়ের উপর খোদাই কার্য্য এই যুগের। ক্ষোদিত নক্সার সমস্ত অংশ একবারে দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। মাটির মূর্ত্তি ম্যাগডালিনীয় যুগে প্রথম পরিদৃষ্ট হয়, যদিও মৃৎপাত্র প্রস্তুত তখনও পর্য্যন্ত আরম্ভ হয় নাই। গুহাভ্যন্তরস্থ ম্যাগডালিনীয় চিত্র সত্যই বিস্ময়কর।

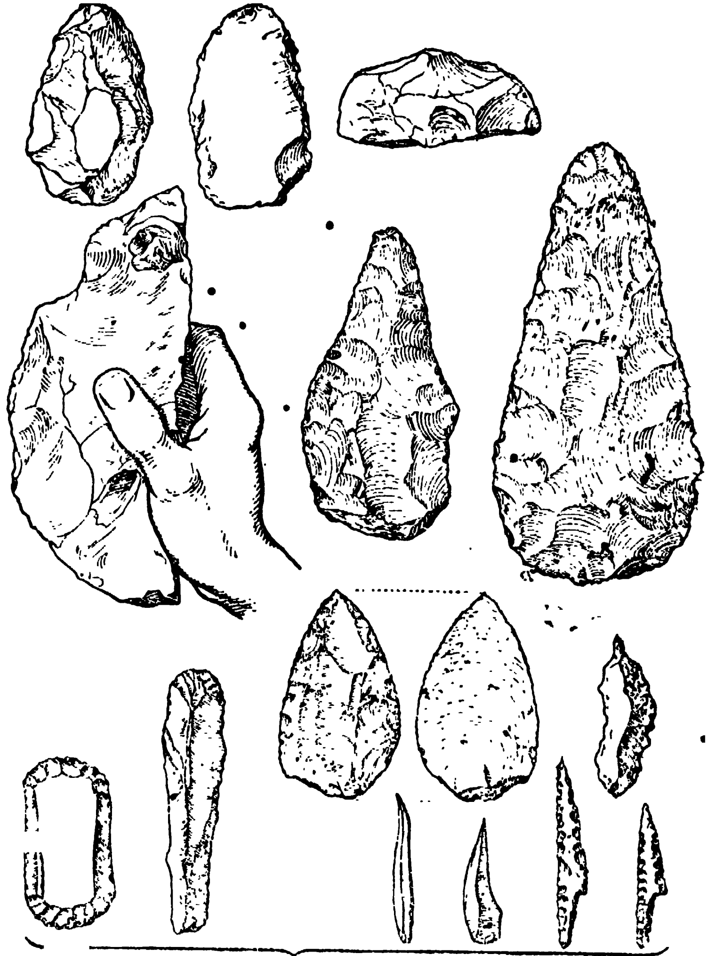
ফ্রান্সে ও উত্তর-স্পেনে যখন রেনডীয়ার-যুগের মানুষ একাধিপত্য করিতেছিল সেই সময়ে স্পেনের কোন কোন অংশে এবং উত্তর-আফ্রিকায় আরও অনেক প্রকৃত মানুষ বাস করিতেছিল। তাহাদের সংস্কৃতিকে অধ্যাপক ওবারমেয়ার ক্যাপসীয় কাল্‌চার বলিয়াছেন। ক্যাপসীয় মানবের সামাজিক অবস্থা মোটের উপর উন্নত ছিল বলিয়া বুঝা যায়। আল্‌টামীরা গুহার বিস্ময়োৎপাদন-



স্পেনে আলটামিরা গুহায় রেনডীয়ার যুগে অঙ্কিত চার রঙের ছবি

কারী চিত্রের সজীব ভাব উহাদের ছবিতে দেখা না গেলেও অনেক চিত্র উহাদের পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতে দেখা যায় মানুষ নানাবিধ কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শেষ পেলিওলিথিক-মানব দেহের গঠনে এবং প্রায় সকল রকমে আমাদের মত মানুষ ছিল। কিন্তু উহারাই প্রথম প্রকৃত মানুষ না হইতে পারে। ১৯২১ সালে রোডেসিয়ায় এক মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে সে সম্ভবতঃ প্রকৃত মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। নীয়ান্‌ডার্থেল মানব স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত ছিল পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি। রোডেসিয়ার মানব নীয়ান্‌ডার্থেলারেস্র সমকালে উত্তর-আফ্রিকায় বাস করিত অনুমান হয়। আমেরিকায়, প্লিষ্টোসিন যুগ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মানুষ বাস করিত বলিয়া কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হরিণ-শিকারী পেলিওলিথিক মানুষ যেমন জলবায়ুর অবস্থা অনুকূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া, সাইবেরিয়া প্রভৃতি স্থানের দিকে অগ্রসর হয় তেমনি তাহারা বর্ত্তমান বেরিং প্রণালীর স্থলপথে আমেরিকায়ও উপনীত হয়, দক্ষিণের দিকে ক্রমে তাহারা অগ্রসর হইতে থাকে এবং যখন দক্ষিণ-আমেরিকা পৌঁছে তখন দেখিতে পায় অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবসমূহ সেখানে বাস করিতেছে।

অবশেষে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং শেষ-পেলিও-লিথিক মানব জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করে, নূতন যে মানুষ তাহার পর ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে ইউরোপ অধিকার করে তাহারাই সভ্য মানুষ। উহাদের জীবনধারণের প্রণালী নিওলিথিক। নিওলিথিক মানুষই এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বাস করিতেছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের যুগ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত উহার জীবনযাত্রার ধারায় আকস্মিক কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখন হইতে বিশ ও দ্বাদশ সহস্র বৎসরের মধ্যে নিওলিথিক মানুষ আবির্ভূত হয়। পৃথিবীর অবস্থা তখন উষ্ণ ও আর্দ্র হইয়াছে এবং মরুময় প্রান্তরের স্থানে দেখা দিয়াছে বিস্তীর্ণ অরণ্য। শৈত্যপ্রিয় জন্তুরা হয় এক বার লুপ্ত হইয়াছে কিংবা বহুদূর উত্তরে শীতের দেশে চলিয়া গিয়াছে। নিওলিথিক সংস্কৃতির সূচনা হয়—কৃষি-কার্য্য, পশুপালন, মৃৎপাত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার, রন্ধনকার্য্য,



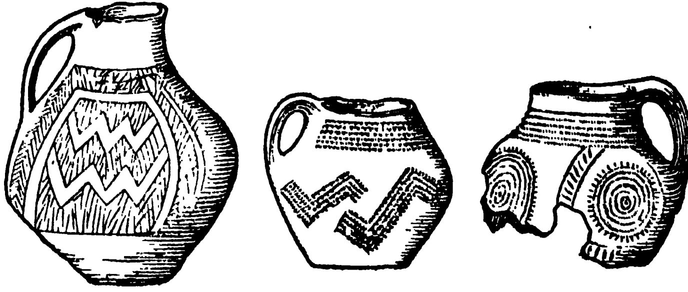
পেলিওলিথিক যুগের প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্রাদি

চিলীয় যুগের কুঠার প্রভৃতি প্রস্তরনির্ম্মিত হাতিয়ার

রেনডীয়ার যুগের প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্রাদি। অপেক্ষাকৃত সুসভ্য মানুষের প্রস্তুত এই হাতিয়ারগুলি পূর্ব্বযুগের হাতিয়ার অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও কার্য্যোপযোগী।

তন্তুবয়ন এবং প্রস্তরগঠিত যন্ত্রে পালিশ ও শান দিবার প্রথায়। নিওলিথিক সংস্কৃতি কতখানি নূতন এবং কতটা পূর্ব্ব-সংস্কৃতির বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থা তাহার নির্দ্দেশ সহজ নহে। সম্ভবতঃ ক্যাপসীয় মানব অংশতঃ আত্মোন্নতি সাধন করিয়া নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছিল, নিওলিথিক ও শেষ-পেলিওলিথিক যুগের ব্যবধান দূর করিবার জন্য মেসোলিথিক নামে যুগ কল্পিত হইয়াছে। উহার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না, তবে ঐ যুগে মানুষের যত দূর অধোগতি হইয়াছিল বলিয়া এক সময়ে মনে করা হইত ক্রমে জানা যাইতেছে সত্যই মেসোলিথিক মানুষ সেরূপ অবনত ছিল না। চারু-শিল্পের প্রতি উহাদের তেমন অনুরাগ ছিল না। তবে চিত্র যে তাহারা একেবারে আঁকিত না এমন নহে। জ্যামিতিক চিত্র কিছু কিছু উহারা অঙ্কিত করিত এবং তুলির সাহায্যে প্রস্তরও চিত্রিত করিয়াছিল। মৎস্য- ও হরিণ- শিকারী পেলিওলিথিক মানুষ যে-যুগে জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও স্পেনের প্রান্তরে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটাইতেছিল সেইরূপ কালে বোধ হয় নিওলিথিক মানুষের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়া কিংবা ভূমধ্য-সাগর বা ভারত-সাগরে নিমজ্জিত ভূখণ্ডে কৃষিকার্য্য, জীবজন্তু পালন, মসৃণ যন্ত্র প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেছিল। ভূমধ্যসাগরের প্লাবন নিওলিথিক জীবনের এক দুর্ঘটনা।

প্রথম নিওলিথিক মানুষ কাঠের লাঙ্গল, নিড়ানি



পুরাযুগের বিচিত্রিত পাত্র

প্রভৃতির সাহায্যে যব, বার্লি প্রভৃতি শস্যের চাষ করিত এবং বীজবপনের পূর্ব্বে কোন কুমারী বা যুবাপুরুষকে বলি দিত। হরিণ, শূকর প্রভৃতি শিকারও যে সে করিত না এমন নহে। গাভী, ছাগী প্রভৃতির দোহনকার্য্য তাহারই আবিষ্কার। প্রথম-প্রথম মৃৎপাত্রগুলিকে সে পোড়াইত না বটে তবে বিচিত্রভাবে অলঙ্কৃত করিত। কাঠের হাতলযুক্ত কুঠার নিওলিথিক মানুষের প্রধান অস্ত্র ছিল। প্রধানতঃ মাটিতে গর্ত্ত কাটিয়া অথবা জলের উপরে সে বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিত এবং চারি দিকে জঞ্জাল স্তূপীকৃত করিয়া রাখিত। মৃত্তিকার বিরাট্ স্তূপও মৃতের সমাধির উপর প্রস্তুত করা হইত। প্রস্তরস্তূপ-নির্ম্মাণ উহার সহিত জড়িত।

দেখা গেল, প্লিয়োসিন যুগে মানুষের উৎপত্তি এবং প্লিষ্টোসিন যুগে তাহার বিকাশ। পেলিওলিথিক যুগের আরম্ভে মানুষ বানরেরই মত ছিল। ঐ যুগের মধ্যভাগে বানরসদৃশ থাকিলেও সে মানুষ হইয়াছে। শেষ-পেলিওলিথিক যুগে সে আমাদেরই মত প্রকৃত মানুষ এবং নিওলিথিকে পদার্পণ করিয়াই সভ্য এবং সামাজিক।

মৃত্যু

শ্রীকল্পিতা দেবী

এই গৃহ এই পুষ্পবীথি
যারে ঘেরি একদিন তোমার কল্পনা
গড়েছিল ইমারৎ দীপ্ত গরিমার
উত্তপ্ত বাসনা তব যার প্রতি ধূলির কণায়
জীবন্ত করেছিল তব মুহূর্ত্তেরে।
যে বাসনা মনে ছিল পুরিল না,
অবসন্ন প্রাণ
গেল চলে ছায়া ফেলে অঙ্গনে প্রাঙ্গণে।

চেয়েছিলে একদিন তুমি,
ভোগের শৃঙ্খলপাশে বাঁধিবারে যারে,
আজো বুঝি ছড়াইছে তাহারি লালসা
কামনার রঙা রং,
দিনান্তের গোধূলিতে।

ধরণীর খেলাঘরে ঘুরে ফেরে
দেহহারা চেতনা তোমার।
পার্থিব বস্তুর স্তূপে নিষ্ফলের একান্ত সাধনা
শ্রান্ত হয় নাই আজো,
ব্যর্থতার আর্ত বাহু আলিঙ্গিয়া আছে চারিধার।
প্রকৃতির দারুণ ইঙ্গিতে
ভেসে গেছে অলক্ষ্যের পারে
জীবন-তরণী তব,
পিছনের হাহাকার নৈরাশ্যের উন্মত্ত আঘাত
পারে নি ফিরাতে তারে।
তবু তারি রুদ্ধকণ্ঠ প্রতিবাদ,
আঁধারে গুঞ্জিয়া ফেরে দীপ-নেবা মিলন-রাত্রির।

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭

চরের উপরে কর্ম্মকোলাহল তখনও স্তব্ধ হয় নাই। শেডটার লৌহকঙ্কাল তৈয়ারি ইহারই মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে—আজ তাহার উপরে করোগেটেড শীট পিটানো হইতেছে। বোল্টগুলির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে। আকাশমুখী সুদীর্ঘ চিমনিটার আকার এই বার সরু হইতে আরম্ভ করিয়াছে; আজ আবার নূতন মাচান বাঁধা হইতেছে। নীচে কোথাও গাঁথনির কাজে কর্ণির শব্দের ধাতব ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। ছাদের উপর অসংখ্য কোপার আঘাত এক সঙ্গে পড়িয়া চলিয়াছে, মেয়েগুলি কিন্তু এখন আর গান গাহিতেছে না—আর বোধ হয় ভাল লাগে না। একটা লরীর এঞ্জিন কোথায় দুর্দ্দান্ত ভাবে গর্জ্জন করিতেছে—বোধ হয় কোথাও দুরন্ত বাধা ঠেলিয়া চলিতে হইতেছে। মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ স্টীমে বয়লারটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। এ সমস্তকে একটি ক্ষীণ আচ্ছাদনের মত আবরণে আবৃত করিয়া মানুষের কোলাহল-কলরবের উচ্চ গুঞ্জনরোল অবিরাম গুঞ্জিত হইয়া চলিয়াছে। অহীন্দ্র নদীর বুকে দাঁড়াইয়া এই অর্দ্ধনির্ম্মিত যন্ত্রপুরীটির দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র—বিজ্ঞানকে সে মনে মনে নমস্কার করিল।

নদী হইতে চরের ঘাটে উঠিয়াই সে দেখিল, বেনা ঘাসের মধ্যে গরুর গাড়ীর চাকার রেখায় চিহ্নিত সে কাঁচা পথটি আর নাই; রাঙা কাঁকর-বিছানো প্রশস্ত সুগঠিত একটি রাজপথের মত পথ, ঘাটের মুখ হইতে গুনটানা ধনুকের মত দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাঁকিয়া কারখানার দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিছু দূর আসিয়া তাহাকে সে-পথ ছাড়িয়া ডান দিকে ফিরিতে হইল—এতক্ষণে সেই কাঁচা পথটির দেখা মিলিল। পথটি চলিয়া গিয়াছে সাঁওতাল-পল্লীর দিকে। দুই পাশে সাঁওতালদের চাষের ক্ষেত। ক্ষেতগুলি সমস্তই অকর্ষিত, কোথাও ফসল নাই; সমগ্র ক্ষেত্রভূমিটাই একটা ধূসর উদাসীনতায় সদ্য-বিধবার মত সমস্ত বিষণ্ণ রিক্ত। সে বিস্মিত হইয়া গেল—সেই সাঁওতালেরা জমিগুলিকে এমন অযত্নে একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে! গত বৎসরেও এই সময়ের ক্ষেতের ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল; বিচিত্রবর্ণের ফুলে ফসলে ভরা সে যেন একখানি কোমল সবুজ গালিচা! আলুর সতেজ সবুজ গাছে ভরা ক্ষেতগুলির চারি পাশে ফুলে ভরা কুসুম-ফুলের গাছ, পুষ্পিত মটরশুঁটির লতায় ভরা ক্ষেত, এক চাপ সবুজের মত ছোলা ও মসুরের ক্ষেত—তাহার ভিতর অসংখ্য বেগুনি রঙের কুচি কুচি ফুল, সদ্যোদ্গত সবুজ কোমল শীষে ভরা গম ও যবের ক্ষেত! সকলের চেয়ে বাহার দিত সরিষার ক্ষেতগুলি—হলুদ রঙের ফুলগুলি চাপ বাঁধিয়া ফুটিয়া থাকিত, গাঢ় সবুজের মাথায় একটি পীতাভ আস্তরণের মত! ক্ষেতের আইলে আইলে সাঁওতাল চাষীরা অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইত—তাহাদের কালো মুখে, সাদা চোখে আনন্দ প্রত্যাশার সে কি বিপুল ব্যগ্রতা! অহীনের মনে পড়িয়া গেল সচল পাহাড়ের মত বিপুলদেহ কঠিনপেশী কমল মাঝিকে! শেষ সে তাহাকে দেখিয়াছে বর্ষার সময় জলেভরা এই ধানক্ষেতের মধ্যে। কর্দ্দমাক্ত দেহে সে তখন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ধানক্ষেতের কাদানো জমি সমান করিয়া দিতেছিল। বন্যবরাহের মত হামা দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নরম মাটি দলিয়া খুঁড়িয়া ফেলিতেছিল যেন! কমল থাকিলে কিন্তু ক্ষেতের চাষের এমন দুর্দ্দশা কখনই হইত না। অহীন্দ্র বেশ বুঝিল—দৈনিক নগদ মজুরির আস্বাদ পাইয়া ইহারা এমন করিয়া চাষ পরিত্যাগ করিয়াছে। কমল বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও আড্ডা গাড়িয়াছে; নহিলে সারী কেমন করিয়া উমাকে দেখিতে আসিল? উমা তো বলিল—খুব লম্বামত মেয়েটি—নামটি বেশ—সারী! মাঠ পিছনে ফেলিয়া অহীন্দ্র সাঁওতাল-পল্লীর ছায়াঘন প্রান্তসীমায় প্রবেশ করিল। পল্লীটা নীরব স্তব্ধ; কেবল

গোটাকয়েক কুকুর তাহাকে দেখিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অহীন্দ্র শঙ্কিত না হইলেও সতর্ক না হইয়া পারিল না, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিকটতম বাড়ী হইতে একটি মেয়ে, বোধ হয় ঘটনাটা কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, রাঙাবাবুকে দেখিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—রাঙাবাবু!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ রে! কিন্তু কুকুরগুলো যে তোদের যেতে দেবে না বলছে!

মেয়েটি বেশ একটু ত্রস্ত হইয়া কুকুরগুলাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য হাত তুলিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—হড়িচ্—হড়িচ্! কুকুরগুলা তবুও গেল না, মেয়েটির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে চীৎকার আরম্ভ করিল, মেয়েটি এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল—ই—রে—কম্বড়ো সে—তা—, হড়িচ্—হড়িচ্! অর্থাৎ, ওরে চোর কুকুর, পালা বলছি পালা! এবার কুকুরগুলা মাথা নীচু করিয়াও মৃদু গর্জ্জনে আপত্তি জানাইতে জানাইতে সরিয়া গেল।

অহীন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল—তোরা সব কেমন আছিস?

মেয়েটি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিল—কেনে ভাল আছি! সেই যি তুমার বিয়ার 'ল-সম্বন্ধিতে' (নব সম্বন্ধ উপলক্ষে) নেচ্যা এলম গো! হাঁড়িয়া খেলম—গান করলম!

অহীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তা বটে; নেচে যখন এলি, তখন খারাপ থাকবি কি ক'রে, আর ভালই যদি না থাকবি তবে নেচেই বা এলি কি ক'রে? ঠিক কথা!

মেয়েটি সবিস্ময়ে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কথার অর্থ উপলব্ধি করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—হেঁ! তা লইলে নেচ্যা এলম কি ক'রে?

—রাঙাবাবু!

—রাঙাবাবু!—এ—বাবা গো!

—হালে—ভালা—রাঙাবাবু গো!

হাসির ধ্বনি শুনিতে পাইয়া আশপাশের বাড়ীগুলি হইতে তিন-চারটি মেয়ে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে রাঙাবাবুর আগমনবার্ত্তা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া অহীন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে দলবদ্ধ হইয়া তরুণীর দল আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বয়স্কা মাঝিনেরা তাড়াতাড়ি ছোট্ট একটি চৌপায়া আনিয়া তাহাদের 'জহর সার্না' অর্থাৎ দেবতার কুঞ্জভবন কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় পাতিয়া দিয়া সম্ভ্রমভরে বলিল—আপুনি বোস বাবু!

তরুণীগুলি পরস্পরের গলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আপনাদের মধ্যেই নিজেদের ভাষায় অনর্গল কথা বলিতেছিল—তাহার সমস্তই অহীন্দ্রকে লইয়া। অহীন্দ্র বলিল—কি এত সব বলছিস তোরা?

মেয়েগুলি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটি বয়স্কা মেয়ে বলিল—উয়ারা বুলছে—রাঙাবাবুকে শুধা বহুটি কেমন হ'ল? কতো বোড়ো বেটে বহুটি? তাই ই উয়াকে বুলছে—তু শুধা, উ ইয়াকে বুলছে—তু শুধা। সরম লাগছে উয়াদের!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল—এই এদের মতই হবে।

এবার একটি মেয়ে বলিল—আমাদের পারা কালো বেটে না গোরো বেটে?

অহীন্দ্র বলিল—সে আমি বলব কেন? তোরা গিয়ে দেখে আয়। সারী গিয়েছিল দেখতে, সে আমার বউয়ের নাম দিয়ে এসেছে—রাঙাঠাকরুণ।

মেয়েগুলি এক সঙ্গে অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গম্ভীর মৃদু স্বরে দুই-এক জনের মধ্যে দুই-একটা বাদানুবাদের সুরের কথা আরম্ভ হইল। অহীন্দ্র বুঝিতে পারিল না এবং লক্ষ্যও করিল না তাহাদের এই আকস্মিক সুর-বৈষম্য; সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাবে সপ্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ভ্রূ এবং কপাল কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—ভাল কথা—সারীরা এখন কোথায় থাকে রে? কমল মাঝিরা এখান থেকে উঠেই বা গেল কেন?

মেয়েগুলি আবার স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহাদের অপ্রসন্নতার গাম্ভীর্য্য অত্যন্ত কঠোর ভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। অহীন্দ্র তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত

হইয়া বলিল—কি, তোরা সব গুম্ মেরে গেলি যে? তাহার সন্দেহ হইল যে, ইহারাই সকলে চূড়ার নেতৃত্বে দল পাকাইয়া কমলকে তাড়াইয়াছে।

একটি তরুণী এবার বলিয়া উঠিল—উ মেয়েটোর নাম তু করিস না রাঙাবাবু, ছি!

আরও বিস্মিত হইয়া অহীন্দ্র বলিল—কেন?

সকলের মুখেই ঘৃণার অতি তীব্র অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল—যে-মেয়েটি কথা বলিতেছিল সে বলিল—ছি—উ পাপী বটে, পাপ কোরলে!

—পাপ করলে?

—হেঁ—পাপ করলে; আপোন বরকে মরদকে ছেড়ে উ ওই সায়েবটোর ঘরে থাকছে!

অহীন্দ্র চমকিয়া উঠিল, বাক্যের অর্থে অর্থে সম্পূর্ণ ভাবে কথাটা না বুঝিলেও অর্থের একটা আভাস সে বুঝিতে পারিতেছিল, তীক্ষ্ণ-তির্য্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল—বরকে ছেড়ে সায়েবের ঘরে থাকছে? সায়েব কে?

—ওই যি—কল বানাইছে—উয়াকে আমরা সায়েব বুলি।

—হুঁ। ছোট একটি হুঁ বলিয়াই অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া গেল।

অপর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—উ এখুন ভালো কাপড় পোরছে, গোন্ধ মাখছে—ওই সাহেব দিছে উকে।

অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল—সেই জন্যে বুঝি কমল মাঝি, সারীর বর এখান থেকে পালিয়ে গেছে?

—হেঁ—সরম লাগল উয়াদের, আমরা সব উয়াদের সোঙ্গে খেলম না, তাথেই উয়াদের সরম বেশী হ'ল, উয়ারা সব চলে গেলো। হেঁ!

অন্যান্য মেয়েগুলি আপনাদের ভাষায় অনর্গল কিচির-মিচির করিয়া আলোচনা করিয়া চলিয়াছিল—দলবদ্ধ সারিকা পাখীর মত। অকস্মাৎ একটি মেয়ে আপনাদের ভাষায় বলিয়া উঠিল—দেখ্ দেখ্! রাঙাবাবুর মুখখানা কেমন হইছে দেখ!

সবিস্ময়ে আর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—জেঙ্গেৎ-আরা (অর্থাৎ টকটকে রাঙা)! উ—বাবারে!

অহীন্দ্র আবার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, দুঃখে ক্রোধে তাহার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই দীর্ঘতনু মুখরা মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিত, তাহার পরিণতি শেষে এই হইল? আর তাহাদেরই অধিকৃত ভূমির মধ্যে এক জন আগন্তুক ধনের দর্পে এমনি করিয়া অত্যাচার করিল—সরল নিরীহ জাতির নারীর উপর?

মাথার মধ্যে সে অস্বস্তি অনুভব করিল—রক্তের চাপে মাথাটা যেন ভারী হইয়া উঠিতেছে।

একটি প্রৌঢ়া মেয়ে বলিল—হা বাবু, কেনে তুরা উই সায়েবটোকে ইখানে কল বোসাতে দিলি? উই মেয়েটোকে উ জোর ক'রে বশ করলে! উয়ার ভয়ে কেউ কিছু বুলতে লারলে।

অহীন্দ্রের স্থির দৃষ্টি একটি স্থানেই আবদ্ধ হইয়াছিল—তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে অতীতের ছবি ভাসিয়া যাইতেছিল—সবই ঐ সারী ও কমল মাঝির স্মৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহার মনে পড়িল ঐ সম্মুখের উঠানে যেখানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া আছে, ঐখানেই প্রথম দিন সে আসিয়া বসিয়াছিল। তখন চারিপাশে ছিল বেনাবন। সম্মুখেই উপু হইয়া একখানা বিরাট্ পাথরের মত বসিয়া ছিল কমল। আর সম্মুখেই পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল মেয়েগুলি, ঠিক মাঝখানে ছিল সারী।

বৃদ্ধা বলিয়াই চলিয়াছিল—আবার এই দেখ্ আমাদের জমিগুলা উ সব কেড়ে লিছে।

অহীন্দ্র যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কেড়ে লিছে?

তাহার সেই গর্জ্জনে সমস্ত দলটি চমকিয়া উঠিল—অহীন্দ্রকে এমন রূপে তাহারা কখনও তো দেখেই নাই—এমন কি তাহার মধ্যে এমন রূপের প্রকাশকে তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না। যে প্রৌঢ়া কথা বলিতেছিল সেও ভয়ে চুপ করিয়া গেল। অহীন্দ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে আবার প্রশ্ন করিল—জমি কেড়ে নিচ্ছে কি মেঝেন?

ভয়ে ভয়ে প্রৌঢ়া বলিল—বুলছে তুদের কাছে আমি টাকা পাব। জমিগুলা আমাকে দিতে হোবে। লইলে—লালিশ করবে!

—টাকা পাবে? কিসের টাকা?

—ওই যি—চিবাস মোড়ল,—উয়ার কাছে আমরা সোব ধান খেতম বর্ষাতে, তাই চিবাস খত ক'রে লিলে ধানের দামে। উয়ার কাছ হ'তে উই সায়েব আবার কিনে লিলে খতগুলান। তাথেই বুলছে জমিগুলা দে—তুদিগে আরও টাকা দিব—খতও শোধ ক'রে লিবে। লইলে লালিশ করবে।

—করুক নালিশ। খবরদার তোরা জমি লিখে দিবি না। যে টাকা পাবে সে আমরা শোধ ক'রে দেব।

মেয়েটি হতভম্বের মত খানিকক্ষণ অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—জমি যে বাবু লিখে লিলে!

—লিখে নিলে?

—হেঁ বাবু। আজকে সোঁকালে মরদগুলাকে লিয়ে শহরে পাঠায়ে দিলে—তুদের সেই মজুমদারের সোঙ্গে। হাকিমের ছামুতে টিপ-ছাপ লিবে—রেজষ্টালী ক'রে লিবে।

অহীন্দ্র অনুশোচনায় অস্থির হইয়া উঠিল বলিল—ছি ছি ছি! তোরা দিলি কেন? আমাদের ওখানে গেলি না কেন?

মেয়েটি সকরুণ স্বরে বলিল—উ যি বুলতে বারণ কোরলে রাঙাবাবু! উয়াকে দেখলে যে আমরা ডরে মরে যাই! পাহাড়ে চিতির ছামুতে ছাগল ভেঁড়ার মোতন আমরা লড়া-চড়া করতে লারি বাবু!

সমবেত সকলেই যেন এতক্ষণ উদ্বেগে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রৌঢ়ার কথা শেষ হইতেই দুঃখে হতাশায় দীর্ঘ প্রক্ষেপে সে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মৃদুস্বরে আক্ষেপ করিয়া দুই-চারি জন বলিয়া উঠিল—আঃ-আঃ! হায় রে!

অহীন্দ্রের চোখের উপর চকিতে ভাসিয়া উঠিল—সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল সম্মুখেই একটি স্থানে একটা বিরাট্ অজগরের মৃতদেহ,—চিত্রিত নিস্পন্দ মাংসস্তূপ! ঠিক ঐখানেই সেটা সেদিন পড়িয়াছিল, তীরে তীরে বধ করিয়াছিল সেটাকে সারীর স্বামী! সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়াই অনুভব করিল সর্ব্বশরীর তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মাথাটা যেন অবরুদ্ধ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেছে

* * *

এমন দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের অস্থিরতা সে জীবনে অনুভব করে নাই; দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে, শীতের কনকনে বাতাসের স্পর্শেও আরাম বোধ হইতেছে। রগের শিরা দুইটা দপ্ দপ্ করিয়া স্পন্দিত হইতেছে। বার বার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—ঐ কলের মালিকের সম্মুখে গিয়া মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে। এক বার খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছিল, কিন্তু পথ হইতেই ফিরিয়াছে; এই অবস্থার মধ্যেও তাহার শৈশব হইতে মায়ের দৃষ্টান্তে অভ্যাস করা আত্মসংযম তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছে। আরও একটা চিন্তা তাহার পথরোধ করিয়াছিল,—সে তাহাদের বংশপ্রচলিত মর্য্যাদা-রীতি! সে রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী অহীন্দ্রের এমন করিয়া বিমলবাবুর ওখানে যাওয়া চলে না। চক্রবর্ত্তীদের আসনের সম্মুখেই ঐ কলওয়ালাকে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়! সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিয়াছে। শীতের কালিন্দীর বালুময় তটভূমি ধরিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া সে বসিল। সম্মুখেই পশ্চিম দিকে অপরাহ্নের সূর্য্য দিকচক্ররেখার দিকে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে—ইহারই মধ্যে শুকতারাটি ক্ষীণ প্রভায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল—ঐ কলওয়ালার অত্যাচারের কথা। নিরীহ সরল জাতির নারী কাড়িয়া লইয়াছে, ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে! আর তাহাদের পৃথিবীতে আছে কি? আর কি অপদার্থ ভীরু জাতি এই সাঁওতালগুলা! তীর-ধনুক লইয়া কারবার করে—বুনো শূকর মারিয়া খায়। কুমীর মারে—বাঘও নিস্তার পায় না—অতি কদর্য্য ভয়াল অজগর—ঐ সারীর স্বামীই তো সে অজগরটাকে বধ করিয়াছিল! আর এটাকে পারিল না! ঐ সাঁওতাল রমণীটা তো মিথ্যা বলে নাই—অর্থের শক্তিতে, বুদ্ধির কুটিলতায়, ও অজগরই বটে; পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া পেষণে পেষণে রক্তহীন হত্যা করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া থাকে! অজগরই বটে! সারীর স্বামী, এ অজগরটাকে বধ করিতে পারিল না?

এমনি ধারার অত্যন্ত নিষ্ঠুর কামনা তাহার মাথার মধ্যে যেন চিতাগ্নিশিখার মত পাক খাইয়া খাইয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বালুরাশি ভাঙিয়া কালিন্দীর ক্ষীণ জলস্রোতের কিনারায় আসিয়া আঁজলা আঁজলা জল মাথায় মুখে দিয়া ধুইয়া ফেলিল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলের উপর শীতের বাতাসের স্পর্শে এবার সে শীত বোধ করিল। মস্তিষ্ক মন এতক্ষণে যেন সুস্থ হইয়া আসিতেছে! বেশ পরিস্ফুট কণ্ঠেই সে বলিয়া উঠিল—আঃ!

ধীরে ধীরে সে বালির উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিল। উঃ, কি কঠিন ক্রোধই না তাহার হইয়াছিল! ঐ লোকটার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে আজ একটা অঘটন ঘটিয়া যাইত। কিন্তু এই যে অন্যায় অত্যাচার, ধনদর্পিত স্বেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার কেন ব্যাভিচার—ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। করিতে যে সে ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ বাধ্য! ওই নিরীহ সাঁওতালগুলি তাহাদেরই প্রজা—শুধু প্রজাই নয়, তাহার পিতামহ হইতে আজও পর্য্যন্ত তাহাদের বংশকে উহারা দেবতার মত মান্য করে! শুধু তাই বলিয়াই বা কেন? মানুষ হিসাবেও এ তাহার কর্ত্তব্য! অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্যে যুদ্ধ করার অধিকারই তো মানুষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার! সকল ব্যথিতের বেদনায় ব্যথিতা অশ্রুমুখী মায়ের মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—তাহার মা ননী পালের মৃত্যুর জন্য কাঁদেন অথচ পুত্রের দ্বীপান্তরের আদেশ অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করেন।

অকস্মাৎ পাশের বেনাবন আন্দোলিত হইয়া উঠিতেই সে ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চরের এই খানিকটা অংশের বেনাবন এখনও সাফ হয় নাই। বেনাবনের ওপাশেই চরের উপর সারি সারি ইঁটের পাঁজা; ঐগুলিই এখন সরীসৃপ ও বন্য জন্তুদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সে নিরাপদ দূরত্ব বজায় করিয়া একটু সরিয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আত্মরক্ষার্থে একটা পাথরের নুড়িও নদীর বালি হইতে কুড়াইয়া লইল। জানোয়ার নয়—মানুষ; বেনাবনের অন্তরালে একেবারে সম্মুখেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সাদা কাপড় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অহীন্দ্র হাতের ঢেলাটা ফেলিয়া দিয়া আবার ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইল। তাহার মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর অভিশাপে'র কথা। পাপে আসক্ত পুত্রের প্রতি অভিশাপের বজ্র নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় চোখে তাঁহার জল আসিয়াছে। কৃষ্ণার লাঞ্ছনার চেয়ে কৃষ্ণকায়া হতভাগিনী সারীর লাঞ্ছনা তো কম নয়!

—রাঙাবাবু! পিছন হইতে মৃদুস্বরে কে ডাকিল—রাঙাবাবু!

অহীন্দ্র পিছন ফিরিয়া দেখিল বেনাবনের পটভূমির গায়ে দুটি গাঢ় লাল রঙের ফুল হাতে দাঁড়াইয়া সারী। মুহূর্ত্তে তীব্র কঠিন ক্রোধে আবার তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত স্নায়ুশিরাগুলি গুণ দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান হইয়া টঙ্কার দিয়া উঠিল। দুর্নীতিপরায়ণা মেয়েটার উপর ক্রোধের তাহার আর সীমা রহিল না। তাহার চোখে পড়িল না, সারী কত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহার কালো রঙের উপরেও চোখের কোলে গাঢ়তর কালির রেখায় আঁকা একটি গভীর ক্লান্তির অতি স্পষ্ট ছাপটিও সে দেখিতে পাইল না।

সারী হাসিয়া বলিল—তাহার সে হাসির মধ্যে একটি শঙ্কার আভাস; সে বলিল—আমি দেখলম আপোনাকে; নদীর বালিতে বালিতে রাঙা আগুনের পারা মানুষ—তখুনি চিনতে পারলম। ফুল নিয়ে এলম। কথা বলিতে বলিতেই সে রুক্ষাভ রাঙা মখমলের রঙের দুইটি গোলাপ ফুল তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিল।

অহীন্দ্র সেদিকে দৃষ্টিপাতই করিল না, ভ্রূকে স্পর্শ করিয়া প্রসারিত তাহার অতি তীব্র দৃষ্টি সারীর মুখের উপরেই স্থির ভাবে নিবদ্ধ ছিল। অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত লৌহ-শলাকার মত সে দৃষ্টি মর্ম্মঘাতী তীক্ষ্ণ। সারী সভয়ে হাতটি গুটাইয়া লইয়া চরমদণ্ডে দণ্ডিতা অপরাধিনীর মত নীরবে বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিষ্করুণ কঠিন কণ্ঠে এতক্ষণে অহীন্দ্র বলিল—স'রে যা আমার সুমুখ থেকে! তোর লজ্জা করে না মানুষের সুমুখে দাঁড়াতে? যা এখান থেকে!

সারীর চোখ হইতে দুইটি অশ্রুর ধারা মুখ বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। ভয়ার্ত্ত বিহ্বলতার মধ্যেও সে অস্ফুট স্বরে বলিল—আমাকে ঘরের ভিতর এই এত বোড়ো ছুরি দেখালেক বাবু—কাঁড়ার চাবুকে ক'রে আমাকে মারে, ওগো রাঙাবাবু গো!

অহীন্দ্র অসহিষ্ণু হইয়া তীব্র স্বরে বলিল—যা—যা এখান থেকে বলছি!

সারী আর সাহস করিল না, ক্লান্ত বাহুবিক্ষেপে বেনাবন ঠেলিয়া তাহারই মধ্যে ডুবিয়া গেল।

* * *

সারী চলিয়া গেল। আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অহীন্দ্র আবার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বেড়াইতেও আর ভাল লাগিতেছে না। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস সে ফেলিল, দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্য দিয়া বুকের আবেগ অনেকটা বাহির হইয়া কিছু হাল্কা হইয়া আসে। তাহার সে দীর্ঘনিশ্বাসটি বাহির হইয়া আসিল কাঁপিতে কাঁপিতে—যেন অফুরন্ত কান্না সে কাঁদিয়াছে! সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইয়া আবার সে কালিন্দীর জলস্রোতের কিনারায় আসিয়া চোখ মুখ কান আর এক বার ধুইয়া ফেলিল। ধুইয়া সেইখানেই সে বসিল, প্রয়োজন হইলে আবার এক বার মাথা ধুইয়া ফেলিবে। মাথার মধ্যে ক্রোধের যে এমন যন্ত্রণা হয় সে তাহা জানিত না। জ্বরোত্তপ্ত মস্তিষ্কের যন্ত্রণার চেয়ে এ যন্ত্রণা তো কোন অংশে কম নয়! তাহার মনে পড়িল আরও এক দিন ক্রোধে তাহার মাথা ধরিয়াছিল। নবীন বাগ্দী ও রংলাল মোড়ল তাহাকে বলিয়াছিল—'আইনে পান তো লেবেন সেলামী'! তাহার মা সেদিন সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে সে যন্ত্রণার উপশম হইয়াছিল। সেদিনের যন্ত্রণা আজিকার যন্ত্রণার তুলনায় নগণ্য তুচ্ছ! আজও সে মায়ের হাতের স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। এমন কোমল শান্ত স্পর্শ মায়ের হাতের, আর এত শীতল সে হাত! সে বাড়ী যাইবার জন্যই উঠিয়া পড়িল।

কিছু দূর আসিতেই দেখা হইল অমলের সঙ্গে। অমল বলিল—বাঃ বেশ! খুঁজে খুঁজে হয়রাণ তোমাকে! যাকে বলে গোরু-খোঁজা তাই! পরমুহূর্ত্তেই সে বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—বাঃ, আকাশের গোধূলি যে তোমার মুখে নেমেছে হে! ওঃ—সো বিউটিফুল ইউ লুক! মুখে যেন লাল রুজ মেখেছ মনে হচ্ছে! না—রক্তসন্ধ্যাই হবে আরও মিষ্টি—

অহীন্দ্র বলিল—ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার অমল। অত্যন্ত রাগে আমার ভয়ঙ্কর মাথা ধ'রে উঠেছে!

—রাগে? তুমি আবার রাগ করতে শিখলে কবে?

—আজই। ব'স, বলি।

ধীরে ধীরে সমস্ত বলিয়া সে বলিল—এরই মধ্যে সাঁওতালদের অবস্থা যা হয়েছে সে কি বলব! মাঠগুলো পড়ে ধূ ধূ করছে। তাদের পল্লীতে সে গান নেই, নাচ নেই, আনন্দ নেই! তাদের মুখের হাসি যেন ফুরিয়ে গেছে। অমল—তাদের মেয়েদের উপর পর্য্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করেছে! এর প্রতিকার করতেই হবে।

অমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আজই পড়ছিলাম গোল্ডস্মিথের Deserted Village। বলিয়া সে আবৃত্তি করিয়া গেল—

Ill fares the land, to hastening ills a pray
Where wealth accumulates, and men decay;
Princes and lords may flourish, or may fade
A breath can make them, as a breath has made;
But a bold Peasantry, their country's pride
When once destroyed, can never be supplied.

অহীন্দ্রেরও মনে পড়িয়া গেল। স্মৃতি-স্মরণের মধ্যে আবৃত্তি করিতে করিতে সে স্ফুটস্বরে আবৃত্তি করিয়া উঠিল—

His best companions, innocence and health,
And his best riches, ignorance of wealth.

ঠিক ঐ সাঁওতালদের ছবি। ওদের বাঁচাতেই হবে অমল, bold peasantryকে রক্ষা করতেই হবে।

অমল বলিল—চল, আজ বাবাকে গিয়ে বলি। বাবাও লোকটার উপর খুব চটে আছেন। কালিন্দীর ওই বাঁধটা, ওই যে পাম্পে ক'রে জল তুলছে, ওটা নিয়ে বোধ হয় শীগ্গির একটা গোলমাল হবে। ফৌজদারীই হবে ব'লে মনে হচ্ছে।

অহীন্দ্র বার বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—নো নো অমল, নট অ্যাজ এ প্রিন্স অর এ লর্ড— জমিদার বা ধনী হিসেবে নয়! মানুষ-হিসেবে মানুষের দুঃখ দূর করতে হবে। জমিদার আর কলওয়ালায় তফাৎ কোথায়?

অমল বিস্মিত হইয়া অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকার পর নদীর বালির উপর অর্দ্ধশায়িত হইয়া অহীন্দ্র যেন আপনাকে এলাইয়া দিল—এমন আকস্মিক উগ্র উত্তেজনার ফলে তাহার দেহ ও মন যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে!

অমল বলিল—এ কি, শুয়ে পড়লে যে। চল বাড়ী চল।

ক্লান্তির একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— চল।

২৮

অমলের মুখে অহীন্দ্রের মাথাধরার সংবাদ এবং অপরাহ্নের সমস্ত ঘটনার কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনী মাত্রাতিরিক্ত রূপে চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রায় তর্পণের আসনে নীরবে জপে ব্যাপৃত ছিলেন; কথা তাঁহার সম্মুখে বসিয়াই হইতেছিল, তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বিশেষ একটি উপলব্ধির ভঙ্গিতেই হাসির মৃদুতার সহিত সমতা রাখিয়া মাথাটি বার কয়েক দুলিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—অহীনের তো রাগ কখনও দেখি নি! ওর স্বভাব হ'ল মায়ের মত।

অমল হাসিয়া বলিল—পূর্ব্বে কখনও রাগ হয় নি ব'লে পরেও কখনও রাগ হ'তে পারে না, এ তো তোমার অদ্ভুত যুক্তি মা!

হেমাঙ্গিনী দৃঢ় স্বরে বলিলেন—না, রাগ করতে পারে না! এমন মায়ের ছেলে—সে কারও উপর রাগ করবে কেন? সুনীতির দয়ামায়ার কথা তোরা জানিস নে— গোটা পৃথিবীর উপর তার মায়া ছড়ান আছে। তার ছেলে—

—মায়ের স্বভাব কন্যার প্রাপ্য গিন্নী, ছেলে পাবে পৈত্রিক স্বভাব! তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, অহীন্দ্র হ'ল শাক্ত জমিদার-বংশের সন্তান? তার স্বভাব হবে সিংহের মত। দুর্ব্বলকে সে স্পর্শ করবে না—যুদ্ধ হবে তার সবলের সঙ্গে। অহীন্দ্রের তেজস্বিতায় আমি খুব খুশী হয়েছি। তারা! তারা! মা! রায়ের জপের এক পর্য্যায় শেষ হইয়াছিল—সেই অবসরে তিনি এই কথা কয়টি বলিয়া আবার কারণ-পাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন।

হেমাঙ্গিনী কিন্তু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, স্বামীর কথাগুলি তাঁহার ভাল লাগে নাই। বলিলেন—তোমাদের ঐ এক ধারার কথা। শাক্ত জমিদার-বংশের ছেলে হ'লে তাকে রাগ করে মাথা ধরাতে হবে—কিংবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে হবে কেন শুনি? এমন কিছু শাস্ত্রের নিয়ম আছে নাকি?

ক্রিয়ায় নিযুক্ত রায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু মুখে তাঁহার মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—ওদের গুষ্টির রাগকে আমার বড় ভয় করে বাপু। ওর বাপের রাগের সে থমথমে মুখ মনে হ'লে হাত-পা যেন গুটিয়ে আসে!

রায়ের মুখও গম্ভীর হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী বলিয়াই চলিয়াছিলেন—অহীনের এখন থেকে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানই বা কেন? সে এখন পড়ছে, পড়ে যাক। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার—তুমি রয়েছ—যেমনই অসুস্থ হোক তার বাপ রয়েছেন—সে সব তাঁরা যা হয় করবেন!

বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—চল্, তুই আমার সঙ্গে চল্—এক বার দেখে আসি—আর ব'লে আসি। উমিটা কোথায় গেল? সেও চলুক।

* * *

অহীন্দ্র একখানা ডেক-চেয়ারে চোখ বুজিয়া ক্লান্ত ভাবে হেলান দিয়া শুইয়া ছিল। পদশব্দে চোখ খুলিয়া সে দেখিল, তাহার মা, মায়ের পিছনে হেমাঙ্গিনী ও অমল। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল—হেমাঙ্গিনী বলিলেন—না না, উঠতে হবে না। তোমার শরীর

খারাপ হয়ে রয়েছে—শুয়ে থাক তুমি। তার পর, তুমি নাকি এত রাগ করেছিলে যে তোমার মাথা ধরে উঠেছে? ছি বাবা, রাগ চণ্ডাল—তাকে এত প্রশ্রয় দিয়ো না। যে মায়ের ছেলে তুমি, তাতে রাগ তোমার শরীরে থাকাই উচিত নয়।

অহীন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আপনারা জানেন না, কি অমানুষিক অত্যাচার ঐ কলওয়ালাটি করেছে, ঐ নিরীহ সাঁওতালদের উপর।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বেশ তো তার জন্যে তোমার বাবা রয়েছেন—তোমার—। বলিয়াই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন—মামা বলা তো আর চলবে না—শ্বশুরই বলতে হবে; তাই বলি,—তোমার শ্বশুর রয়েছেন—তাঁরা তার প্রতিকার নিশ্চয় করবেন! গরিব প্রজা—তাদের বাঁচাতে হবে বইকি। এটা তো জমিদারের ধর্ম্ম। যত কিছু দোষ রায়হাটের বাবুদের থাক—ও ধর্ম্ম তাঁরা কখনও অবহেলা করেন না। তোমার এখন পড়ার সময়—তুমি লেখাপড়া কর।

সুনীতি বলিলেন—আমি বলি কি অহীন, আমাদের খাসে যে জমিটা আছে, যেটা সাঁওতালেরা ভাগে চাষ করছে ওইটে ওদের বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হোক। তা হ'লে ওদের দুঃখও ঘুচবে, আর কলের মালিককেও বুঝিয়ে ব'লে দিলেই হবে যে ওটাতে যেন আর তিনি হাত না দেন।

অমল হাসিয়া এবার বলিল—পিসীমার ধর্ম্মটি কিন্তু বড় ভাল। ও ধর্ম্মের মহিমায় সকল সমস্যার সমাধান জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

সুনীতি লজ্জা পাইলেন—কিন্তু হেমাঙ্গিনী বলিলেন—'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।' গোঁ-ধরা শাক্ত তান্ত্রিকের বংশ তোমাদের, তোমরা আর ও ধর্ম্মের মহিমা কি বুঝবে বল। ওরে ও ধর্ম্ম যদি সকলে বুঝত তবে কি পৃথিবীতে আর দুঃখ থাকত!

অমল হাসিয়াই উত্তর দিল—সে তো অস্বীকার করছি না মা—কিন্তু পিসীমার ধর্ম্মের মুশকিল কি জান? মুশকিল হচ্ছে নিঃসম্বল অবস্থায় আর ও ধর্ম্ম নিয়ে চলা যায় না। মানে ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরভাণ্ড—সেই তিনি যখন ননীগোপাল সেজে ননীলোলুপ হয়ে ওঠেন তখন যশোদাকেও মুস্কিলে পড়ে ও ধর্ম্ম ছেড়ে বিপরীত ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়—দায়ে পড়ে তখন ননীগোপালকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে হয়! পৃথিবীতে মানুষ মাত্রেই যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর বিষয় গোপাল, বিপদ যে ওইখানে!

অমলের কথার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিয়া ফেলিল, হাসিল না কেবল অহীন্দ্র, সে যেমন গম্ভীর মুখে অবসন্ন ভঙ্গিতে ডেক-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়াছিল—তেমনই ভাবেই রহিল। হেমাঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুই কিন্তু ভারি জ্যাঠা হয়েছিস অমল।

অহীন্দ্র চোখ বুজিয়াই ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল—তুমি ভুল বুঝেছ অমল, মায়ের ধর্ম্ম যশোদার ধর্ম্ম নয়, মায়ের ধর্ম্ম গান্ধারীর ধর্ম্ম। দাদার গুলিতে যখন ননী পাল ম'ল তখন ননী পালের জন্যে কেঁদেছিলেন—কিন্তু দাদার দ্বীপান্তরের হুকুম যেদিন হ'ল, এক ফোঁটা চোখের জল তিনি ফেলেন নি। শুধু পাথরের মূর্ত্তির মত ব'সে রইলেন।

লজ্জা এবং দুঃখ দুইই একসঙ্গে সুনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—সেই তো বাবা, হাজার অপরাধ করলেও তোমার মা কখনও কারও উপর রাগ করেন না। কেউ অন্যায় ক'রে দণ্ড পেলেও তোমার মা তার জন্যে কাঁদেন। সেই মায়ের ছেলে তুমি—রাগ করা তো তোমার সাজে না!

অহীন্দ্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হ্যাঁ, রাগ করাটা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু রাগ তো আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি—হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেলাম আমি। তা নইলে অত্যাচার-অবিচার কোথায় বা নেই বলুন! ধনী-দরিদ্রও পৃথিবীর সর্ব্বত্র, অত্যাচার-অবিচারও সর্ব্বত্র। ক-জনের উপর রাগ করব? কত প্রতিবিধান করব?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—না না না, তা বললে চলবে কেন? যতটুকু তোমার আয়ত্তের মধ্যে তার ভিতর অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে বইকি! আর সে হবেও; লোকটিকে ভালমত শিক্ষা দেবার জন্যে উনি উঠে-পড়ে লেগেছেন। আমাদের তরফ থেকে

যাতে অন্যায় না হয় সেজন্যে আমি বার বার ক'রে বলেছি। বলেছি, ও-লোকটি অন্যায় করেছে—তাকে শাস্তি দিতে হ'লে ন্যায়পথে চ'লে শাস্তি দিতে হবে—অন্যায় কৌশল অবলম্বন করতে পাবে না।

অহীন্দ্র এ কথার কোন জবাব দিল না—নীরবে চোখ বুজিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—মাথা কি এখনও ধরে রয়েছে তোমার? এক কাজ কর, অডিকলোনের একটা পটি দাও কপালে। না হয় পিপারমেণ্ট জলে গুলে কপালে বুলিয়ে নাও। তার পর সুনীতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—চল আমরা যাই, এক বার চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি চল।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার বড় ভয় হয় দিদি! ওই চরটা সর্ব্বনাশা চর; যখনই চর নিয়ে কোন হাঙ্গামা বাধে, আমার বুক থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। অহি আবার চর নিয়ে কি যে করবে, ওর ভাবগতিক আমার ভাল লাগল না দিদি! কেমন উদাসী মন হয়ে গেছে দেখলেন?

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন—ও তুমি কিছু ভেবো না সুনীতি, ও সব ঠিক হয়ে যাবে। উমার আমার স্বামীভাগ্য খুব ভাল; তা ছাড়া উমা একালের লেখা-পড়া-জানা চালাক মেয়ে! বিয়ে হোক না—কেমন মন উদাসী থাকে দেখবে। দেখবে? এক্ষুনি বাবার মন ভাল ক'রে দিচ্ছি। বলিয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—অমল।

অমল আসিতেই বলিলেন—একটা কাজ যে ভুলেছি বাবা! এক্ষুনি তোকে বাড়ী যেতে হবে, গিয়ে স্যাকরাকে বলে পাঠাতে হবে যে, উমার রুলির প্যাটার্নটা অন্য রকম হবে; আজই সেটা সে আরম্ভ করবে, সেটা যেন আরম্ভ না ক'রে। কাল সকালে আমার কাছে এলে আমি সব বুঝিয়ে দেব।

অমল চলিয়া গেল; হেমাঙ্গিনী অডিকলোনের জল তৈয়ারী করিয়া ডাকিলেন—উমা!

উমা মানদা ঝির পাল্লায় পড়িয়াছিল; ভাবী বউদিদিকে লইয়া মানদা ছোটদাদাবাবুর বাল্যকালের কথা বলিয়া নিজের গুরুত্ব এবং প্রবীণত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। উমারও শুনিতে মন্দ লাগিতেছিল না। মায়ের আহ্বান শুনিয়া সে উঠিয়া আসিয়া সুনীতি ও হেমাঙ্গিনীর সম্মুখে দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন—এই অডিকলোনের জলটা আর এই ন্যাকড়ার ফালিটা দিয়ে আয় তো মা। আমরা দু-জনে চক্রবর্ত্তী মশায়ের ঘরে যাচ্ছি। তুই বরং ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে কপালে একটা পটিই লাগিয়ে দিয়ে আসবি। বড্ড মাথা ধরেছে অহির!

উমা লজ্জায় স্থাণুর মত হইয়া না গেলেও ঈষৎ সঙ্কুচিতা না হইয়া পারিল না। রক্তাভ মুখে সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, হেমাঙ্গিনী অডিকলোনের পাত্রটি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—তোমার তো লজ্জা করলে চলবে না মা; বাড়ীতে একটা ননদ দেওর নেই যে তাকে পাঠিয়ে দেবেন তোমার শাশুড়ী। যাও দিয়ে এস!

উমা পাত্রটি হাতে করিয়া চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—এ কি আর আমাদের কাল আছে ভাই? সেকালে আর একালে অনেক তফাৎ।

সুনীতি অতি মৃদু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—এ ধরনটা কিন্তু খুব ভাল নয় দিদি!

মুহূর্ত্তপূর্ব্বে হেমাঙ্গিনীর ইচ্ছা হইতেছিল মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়েন, কিন্তু সুনীতির কথা শুনিয়া তিনি সংযত হইয়া বসিলেন—তার পর বলিলেন—ভাল আর মন্দ ভাই, যে কালের যে ধারা। এর পর আবার কত হবে, নাতি-নাতনীর আমলে বেঁচে থাকলে সেও দেখতে হবে! এ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন—চল, চক্রবর্ত্তী মশাইকে এক বার দেখে আসি। আজই বিকেলে এক বার দেখা হয়েছে তবু যখন এসেছি—চল।

অহীন্দ্র চোখ বুজিয়াই শুইয়াছিল, ঠিক ঘুমায় নাই—কিন্তু সজাগও ঠিক ছিল না। জাগ্রত পৃথিবীর সকল সংস্পর্শকে দূরে সরাইয়া দিয়া সে যেন আপন অন্তরের চিন্তালোকের গভীর-গর্ভ কোন কক্ষের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। অকস্মাৎ কপালের উপর শীতল একটি

স্পর্শ যেন করাঘাত করিয়া তাহাকে বাহির হইতে ডাকিল। উমা আসিয়া তাহাকে ঘুমন্তই মনে করিয়াছিল; ডাকিয়া ঘুম না ভাঙাইয়া সন্তর্পণে অডিকলোনের পটিটা কপালে বসাইয়া দিয়াছিল।

অহীন্দ্র স্বপ্নাচ্ছন্নের চোখ মেলিয়া উমার মুখের দিকে চাহিল। উমা লজ্জা পাইল, আরক্তিম মুখে বলিল—অডিকলোনের পটি। আমি ভেবেছিলাম, ঘুম আর ভাঙাব না।

স্মিত হাসিতে অহীন্দ্রের মুখ ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে বলিল—আমি ঘুমুই নি!

—ঘুমোও নি? তবে এমন ভাবে শুয়েছিলে যে? মাথা বুঝি খুব ধরেছে?

—মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে; কিন্তু মন যেন vacant হয়ে গেছে।

উমা মৃদু হাসিয়া এবার বলিল—সায়েবলোকের কিন্তু এ রকম দুর্ব্বল হওয়া উচিত নয়। রাগ দুর্ব্বল চিত্তের একটি লক্ষণ।

অহীন্দ্রের মুখের হাসি এবার আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল—কথাটা তোমার মুখে শোভন হ'ল না হে বাঙালিনী শ্রীমতী উমা দেবী। যে হেতু না স্মরণ কর পুরাকালে পর্ব্বতদুহিতা উমার প্রিয়তম পরম যোগী শঙ্করেরও একদা ক্রোধ হয়েছিল—যে-ক্রোধের অগ্নিতে কাম হয়েছিল ভস্মীভূত।

উমা হাসিয়া বলিল—তুমি কি ওই কলওয়ালাটিকে ভস্মীভূত করতে চাও না কি?

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া অহীন্দ্র বলিল—তখন তাই চেয়েছিলাম; কিন্তু আর তা চাই না। একটু আগে মনকে ঐ চিন্তা থেকে মুক্ত করবার জন্যে পড়ছিলাম—রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর অভিশাপ—তার ক'টা লাইন আমাকে যেন পথ দেখিয়ে দিলে। লাইন ক'টি মুখস্থ হয়ে গেছে আমার—

দণ্ডিতের সাথে—
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায়—তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার।

আমি শাস্তি দিতে চাই—তার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই, কিন্তু তার উপর বিদ্বেষ আমি রাখতে চাই না। যদি কোনও দিন কথা ভুলে যাই উমা—আমায় তুমি মনে করে দিয়ো।

ওদিকে রামেশ্বরের ঘর হইতে ফিরিয়া নীচে নামিবার পথে সিঁড়ির একটি গোপন স্থানে সুনীতি ও হেমাঙ্গিনী আপনা-আপনিই যেন দাঁড়াইয়া উমা ও অহীন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। হেমাঙ্গিনী আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, সুনীতিকে স্পর্শ করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—দেখলে?

সুনীতি বলিলেন—ফাল্গুনের প্রথমেই দিন ঠিক করুন দিদি। আমার অদৃষ্টকে আমার সর্ব্বদাই ভয় হয়। আমার সম্বলের মধ্যে অহি। উমার হাতে ওর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।

* * *

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের দিন পাওয়া গেল—শুক্লাত্রয়োদশী তিথি।

সাঁওতালদের সমস্ত দলটিকে বরযাত্রী যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কেহ আসিল না।

অচিন্ত্যবাবু আসিয়াছিলেন—তিনি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—বারণ ক'রে দিয়েছে মশায়! যে আসবে তার জরিমানা হবে।

চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর নায়েব বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—বারণ ক'রে দিয়েছে! কে? জরিমানাই বা কে করবে শুনি?

—মুখার্জ্জী সায়েব – মিষ্টার মুখার্জ্জী!

নায়েব গম্ভীর ভাবে ডাকিল—কে রয়েছিস রে, বাগ্দী পাইকদের ডাক তো এখানে।

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—ঠকবেন মশাই ঠকবেন। এমন কাজটি করবেন না। সাঁওতালদের প্রজাইস্বত্ব এখন মুখার্জ্জী সায়েবের। আপনাদের প্রজা মুখার্জ্জী সায়েব, সাঁওতালেরা মুখার্জ্জী সায়েবের প্রজা, মজুর--। তিনিই এখন ওদের মা-বাপ—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সব

কথাটা অহীন্দ্রের কানেও উঠিল। বরবেশে চতুর্দ্দোলে বসিয়া, কুঞ্চিত ললাটে সে জ্যোৎস্নার আলোতে আলোকিত চরখানির দিকে চাহিয়া দেখিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। দলিলের কৌশলে সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল? জাল দলিলে মানুষ বিকাইয়া গেল!

রাঙা ইটের তৈয়ারি সুদীর্ঘ চিমনিটা শাসনরত তর্জ্জনীর মত উদ্যত হইয়া আছে।

সংবাদটা শুনিয়া ওদিকে ইন্দ্ররায় সারা দিনের উপবাসে পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহখানাকে টানিয়া মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু তিনি কিছু বলিবার বা করিবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—আজ কিছু করতে পাবে না, আজ আমার উমার বিয়ে।

[ক্রমশঃ

হিন্দুদিগের ঋতুবিভাগ ও বর্ষারম্ভ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম. এ, পিএইচ. ডি.

পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে বৎসরের চারিটি ঋতু-বিভাগ; ২১শে মার্চ্চ হইতে ২১শে জুন পর্য্যন্ত তিন মাস কাল বসন্ত, ২১শে জুন হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বর এই তিন মাস কাল গ্রীষ্ম, ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর এই তিন মাস কাল হেমন্ত এবং ২১শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে মার্চ্চ তিন মাস কাল শীত। কিন্তু ভারতের ঋতু-বিভাগ চারিটি নয়, ছয়টি; যথা, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

সূর্য্যই ঋতুবিভাগের কর্ত্তা, কারণ সূর্য্যের বার্ষিক গতির ফলস্বরূপই বৎসরের এই ঋতুবিভাগ। ঋগ্‌বেদে এই কথাই বলা হইয়াছে—"সূর্য্য ও চন্দ্র উহাদের নিজের শক্তিতে ভ্রমণ করিতেছে, একটি আর-একটির পশ্চাতে, যেন ক্রীড়াপরায়ণ দুইটি শিশু যজ্ঞের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটি সমগ্র জগতের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে, অপরটি ঋতুবিভাগ নির্ণয় করিয়া পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে।"

ঋতুর সংখ্যা যে ছয়টি, তাহা ঋগ্‌বেদের বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে; এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহাদের নামেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে যে ঋতুর সংখ্যা পাঁচটি, এই স্থলে হেমন্ত ও শিশির (শীত) এই দুই ঋতুকে একই ঋতু ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই কথারই উল্লেখ আছে—"পাঁচটি ঋতু বলা যাইতে পারে, কারণ হেমন্ত ও শিশির একই ঋতু বলিলে চলে।" মাধবাচার্য্য প্রণীত কালমাধব পুস্তকের ঋতুনির্ণয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণের কোন কোন স্থলে হেমন্ত ও শিশিরকে একই ঋতু ধরিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। যাহা হউক, ছয়টি ঋতুবিভাগই সাধারণ বিধি ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে এই কথাই বলা হইয়াছে এবং ছয় ঋতুর মাসগুলির এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—মধু ও মাধব বসন্ত মাস, এই সময়ে তরু ও বৃক্ষ পুষ্প ও ফলে ভূষিত হইয়া উঠে; শুক্র ও শুচি গ্রীষ্ম ঋতুর মাস, এই সময়ে সূর্য্যের কিরণ উজ্জ্বল ও প্রখর হয় (শুক্র = পরিষ্কার, শুচি = উজ্জ্বল); নভস্ ও নভস্য বর্ষা ঋতুর মাস (নভস্ = মেঘ); ঈষ ও উর্জ শরৎ ঋতুর মাস, এই সময়ে খাদ্য (ধান্যাদি) পরিপক্কতা লাভ করে (উর্জ = খাদ্য); সহস্ ও সহস্য শীত ঋতুর মাস, কারণ শীত ঋতু সকল প্রাণীকে নিজ শক্তির বশীভূত করে; তপস্ ও তপস্য হেমন্ত ঋতুর মাস,

এই সময়ে দ্রব্যাদি জমিয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের আর এক স্থলে মাসগুলির অন্যরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে ;—রথগৃৎস ও রথৌজস্ বসন্ত ঋতুর মাস, রথস্বন ও রথেচিত্র গ্রীষ্মঋতুর মাস, রথপ্রোত ও অসমর্থ বর্ষা ঋতুর মাস, তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি শরৎ ঋতুর মাস, সেনজিৎ ও সুষেণ শীত ঋতুর মাস; তপস্ ও তপস্য হেমন্ত ঋতুর মাস। শতপথ ব্রাহ্মণে আবার কয়েক স্থলে পাঁচটি ঋতুর উল্লেখ আছে। এই গণনায় হেমন্ত ঋতুর উল্লেখ নাই। এক স্থলে কেবল তিনটি ঋতুর কথা বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ এই গণনায় প্রত্যেক ঋতুর চারিটি মাস ধরা হইয়াছে। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থানে সাতটি ঋতুর কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কোথায়ও ইহার সন্তোষজনক কারণ দেওয়া হয় নাই। এক স্থলে একটা অস্পষ্ট কারণের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পরিশেষে বলা হইয়াছে, "বাস্তবপক্ষে ছয়টি ঋতুই ধরা যাইতে পারে।" অপর এক স্থলে আর একরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে, প্রথমে বসন্ত প্রমুখ ছয়টি ঋতুর বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তৎপরে বলা হইয়াছে যে ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ মলমাসের রাত্রি ও দিনগুলিকে একটি ঋতু ধরিয়া উহাকে সপ্তম ঋতু বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, মধু ও মাধব প্রভৃতি মাসের নাম বহু বৎসর প্রচলিত ছিল, পরে উহারা চৈত্র, বৈশাখ প্রভৃতি নামে পরিচিত হইল। কখন এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল? বসন্ত তখন ঋতুসমূহের মুখ বলিয়া গণ্য হইত, সুতরাং বসন্ত ঋতু যখন চৈত্র মাসে আরম্ভ হইল, তখন হইতে মাসের নাম পরিবর্ত্তিত হইল। চৈত্র ও বৈশাখ যে বসন্ত ঋতুর মাস ছিল, তাহা পুরাণেও উল্লিখিত আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে জ্যোতিষসিদ্ধান্তে ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত ঋতুর মাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের কোথায়ও বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠকে বসন্ত ঋতুর মাস বলা হয় নাই, অথবা চৈত্রও হেমন্ত ঋতুর মাস বলিয়া গণ্য হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে চৈত্র ও বৈশাখকে বসন্ত ঋতুর মাস ধরা হইত এবং আরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে চৈত্র ও বৈশাখ মাস দুইটি মধু ও মাধব নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু-পঞ্জিকায় ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত ঋতুর মাস বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে বসন্ত ঋতু অয়নচলনের জন্য এতটা সরিয়া আসিয়াছে এবং জ্যোতিষিক গণনায় বলা যায় যে ইহা প্রায় ৪৩০০ বৎসরে সম্ভব হইতে পারে। কাজেই চৈত্র, বৈশাখ নামগুলি শকাব্দ আরম্ভ হইবার প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। সেই সময়ে বসন্ত ঋতুকেই প্রথম ঋতু বলিয়া গণ্য করা হইত এবং অগ্রায়ণেষ্টি বা অর্দ্ধবাৎসরিক যজ্ঞ প্রভৃতি বসন্ত ঋতুতেই আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বসন্তকে ঋতুচক্রের মুখ বলা হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে কালমাধব গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—"সংবৎসরোপক্রমরূপত্বেন বসন্তস্য প্রাথম্যং দ্রষ্টব্যম্"—অর্থাৎ বৎসরের রূপ বর্ণনায় বসন্তঋতুই প্রথম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ফাল্গুনী পূর্ণমসী বৎসরের মুখ বলিয়া গণ্য হইত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বৎসরকে একটি বিহঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, বসন্ত উহার মস্তক, গ্রীষ্ম দক্ষিণ পক্ষ, বর্ষা উহার পুচ্ছ, শরৎ বাম পক্ষ এবং হেমন্ত ইহার মধ্যম ভাগ। এই স্থলে শীত ঋতুর উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ শীত ঋতুকে হেমন্তের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় সংহিতায় চিত্রা ও ফাল্গুনী পূর্ণমসী হইতে বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য মনে করিয়াছিলেন যে ঋতুবিভাগের প্রথম ঋতু অর্থাৎ বসন্তে চিত্রা ও ফাল্গুনী পূর্ণমসী পড়ে বলিয়াই সেই সময় হইতে বর্ষারম্ভ গণ্য হইয়াছে, তৈত্তিরীয় সংহিতার টীকায় সায়ণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিলক এই ব্যাখ্যাকে আদৌ সন্তোষজনক মনে করেন নাই, তিনি তদ্‌রচিত Orion গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন,—"সমস্ত জ্যোতিষগ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে শিশিরের আরম্ভ হইত মকর-সংক্রান্তি হইতে এবং সেই সময়ে উত্তরায়ণ বলিতে যাহা বুঝাইত, তাহাতেই শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম এই তিন ঋতু আসিত। তৈত্তিরীয় সংহিতার সময়ে মকর-সংক্রান্তি মাঘ মাসে পড়িত, সুতরাং মাঘ ও ফাল্গুন মাস ছিল শিশির ঋতু এবং চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত ঋতুর মাস। কিন্তু সায়ণের সিদ্ধান্ত ঠিক হইলে,

ফাল্গুন বসন্ত ঋতুর মাস হইয়া পড়ে, অথচ বাস্তবিক তাহা ছিল না।" সায়ণ এই অসামঞ্জস্য বুঝিয়াই বৌধায়ন সূত্রের টীকার এক স্থলে ইহার অন্য ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে তিনি চান্দ্র ও সৌর দুই প্রকারের বসন্ত ঋতু ধরিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে ফাল্গুন ও চৈত্র চান্দ্র বসন্ত ঋতুর মাস, আর চৈত্র ও বৈশাখ সৌর বসন্ত ঋতুর মাস; এই প্রসঙ্গে তিনি ঋগ্‌বেদ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে ঋতুবিভাগ চন্দ্রের দ্বারাই সংগঠিত হইত। ঋতুসমূহের দ্বৈতরূপ সম্বন্ধে সায়ণের মতবাদ তিলক তাঁহার Orion গ্রন্থে এইরূপ ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, "অবশ্য চান্দ্র মাসের প্রচলন ছিল, কিন্তু চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরের আরম্ভ এক সময়েই করিবার জন্য যখনই প্রয়োজন হইত তখনই মলমাস বা অধিমাসের প্রবর্ত্তন হইত, সুতরাং এই ব্যবস্থানুসারে চান্দ্র ঋতুর কোনও স্থানই হইতে পারে না; যখনই ঋতুবিভাগের সহিত চান্দ্র মাসের অসামঞ্জস্য দেখা যাইত, তখনই অধিমাসের প্রবর্ত্তনে সেই অসামঞ্জস্য বিদূরিত হইত।" তিলকের এই যুক্তি ভিন্নও সায়ণের মতবাদের বিরুদ্ধে আরও যুক্তি রহিয়াছে। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর হইতে ১১ দিন কম, কাজেই সৌর বসন্ত যদি এক বৎসর চান্দ্র চৈত্র মাসের প্রথম দিনে পড়ে, তাহা হইলে পর বৎসর ইহা চান্দ্র চৈত্র-মাসের ১২ই তারিখে পড়িবে, আবার পর বৎসর ইহা আরও ১১ দিন সরিয়া যাইবে, এই সময়ে অধিমাস যোগ দিয়া বসন্তের আরম্ভকে আবার ১লা চৈত্রে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সুতরাং ঋতুসমূহের দ্বৈতরূপ বসন্তের আরম্ভকে চান্দ্র বৈশাখে নিয়া ফেলিবে এবং ঐ ঋতুকে আগাইয়া আগাইয়া উহাকে পুনরায় ফাল্গুনে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। অবশ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন সায়ণ জীবিত ছিলেন, বসন্ত ঋতু এখনকার ন্যায় ফাল্গুনেই আরম্ভ হইত, কিন্তু ইহা অয়নগতির জন্যই সম্ভব হইয়াছিল, কারণ সেই সময়ে মকর-সংক্রান্তি এক মাসের উপর পিছাইয়া আসিয়াছিল। জ্যোতিষিকগণনায় পারদর্শী না থাকায় ইহা সায়ণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কাজেই ঋতুসমূহের দ্বৈত-রূপ অনুমান করিয়া তিনি ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হইয়া যে অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহারই পক্ষে যুক্তি দিবার জন্য তিনি কয়েকটি অসম্ভব মতবাদের প্রচার করিলেন। অথচ ভারতীয় সাহিত্যের বহুস্থলে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা রাত্রিকে বৎসরের প্রথম রাত্রি ধরা হইয়াছে। ইহাতেও মনে হয় সায়ণের মতবাদ ভ্রান্ত।

বৈদিক যুগে বর্ষারম্ভ হইত বিষুব-সংক্রান্তি হইতে এবং সেই সময়েই সূর্য্য বিষুবরেখার দক্ষিণ হইতে উপরে উঠিত এবং ইহাই ছিল সূর্য্যের উত্তরায়ণের আরম্ভ এক কথায় উত্তরায়ণ, বসন্ত ঋতু, বর্ষ ও যজ্ঞ সবগুলিরই একত্র আরম্ভ হইত বিষুব-সংক্রান্তি হইতে। পরবর্ত্তী কালে বর্ষারম্ভের সময় বিষুব-সংক্রান্তি হইতে মকর-সংক্রান্তিতে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সময়ে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে বিষুব-সংক্রান্তি যখন কৃত্তিকানক্ষত্রে ধরা হইত, তাহার বহু পূর্ব্বেই এই পরিবর্ত্তন প্রচলিত হইয়াছিল; এবং যখন এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, তখন উত্তরায়ণ ক্রমশঃ নূতন বর্ষের প্রথম ভাগ সূচিত করিতে লাগিল অর্থাৎ মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত কাল ইহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময়ে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ মকরক্রান্তি হইতে বর্ষারম্ভ স্থির করিল। শ্রৌতসূত্রেরও স্থানে স্থানে নির্দ্দেশ আছে যে গবাময়ন প্রভৃতি বাৎসরিক যজ্ঞ সেই সময়েই আরম্ভ করিতে হইবে।

বর্ষারম্ভের এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তৎকালে সৌর বৎসর ছিল নক্ষত্র-বৎসর, অয়নসংক্রান্ত বৎসর নহে। অথচ পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঋতুগুলির যথার্থ সময় নির্দ্ধারণ করা। একটি স্থির নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যের সেই নক্ষত্রে ফিরিয়া আসার কাল্পনিক সময়কে নক্ষত্র বৎসর ধরা হয় এবং সূর্য্যের এক বার বিষুবক্রান্তিতে অবস্থানের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় বিষুবক্রান্তিতে প্রত্যাগমনের কালকে অয়নান্ত বৎসর বলা যায়। সুতরাং তৎকালে বৎসর নাক্ষত্র বৎসর ছিল বলিয়াই প্রায় দুই

হাজার বৎসর পর পর বর্ষারম্ভের পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজন হইত, ইহাতে ঋতুচক্রের সহিত বর্ষারম্ভের সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হইত। একটি নাক্ষত্র বৎসর ও একটি অয়নান্ত বৎসরের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ২০ মিনিট; সুতরাং নাক্ষত্র বৎসরকে যদি সময়ের পরিমাপক-সন ধরা যায়, তাহা হইলে প্রায় দুই হাজার বৎসরে ঋতুগুলি প্রায় এক চান্দ্র মাস পিছাইয়া যাইবে।

সুতরাং অয়নচলনের জন্য বর্ষারম্ভ দুই বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ভারতীয় সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রে মধ্যবর্ত্তী অবস্থার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন প্রথম উঠিল যখন দেখা গেল যে বিষুবক্রান্তি কৃত্তিকা-নক্ষত্রে সরিয়া গিয়াছে এবং ঋতুগুলিও প্রায় এক মাস পিছাইয়া গিয়াছে। এই সময়ে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ বর্ষারম্ভ ফাল্গুনী পূর্ণমসী হইতে স্থির করিলেন এবং নক্ষত্রতালিকাও অগ্রহায়ণ হইতে না আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিলেন। কোন আড়ম্বর না করিয়াই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গেল, কারণ তৎকালে পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞসমূহের কাল নির্দ্ধারণ করা এবং যখন বাস্তবিকই দেখা গেল যে দিন ও রাত্রি সমান হইলে সূর্য্য মাগশীর্ষে না আসিয়া কৃত্তিকানক্ষত্রে আসিয়াছে, তখনই বর্ষারম্ভ কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে ধরা হইল; আর এই সময়েই পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন করা সুবিধা-জনক বোধ হইল, যে হেতু ঋতুচক্রও তখন প্রায় এক মাস পিছাইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না যে এই পরিবর্ত্তনের যথার্থ কারণ নির্ণীত হইয়াছিল কিনা, অথবা সম্যক্ অবগত হইবার চেষ্টা হইয়াছিল কিনা। ইহার পর তৃতীয় বার পরিবর্ত্তন সাধিত হইল বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে, তখন ঋতুগুলি এক পক্ষকাল সরিয়া গিয়াছে। এই সময়ে মাসের আরম্ভ পূর্ণিমায় না ধরিয়া অমাবস্যায় ধরা হইল। মাসের আরম্ভ সম্পর্কে এই সংশোধন প্রবর্ত্তিত হইলে ঋতুচক্র এক পক্ষকাল পিছাইয়া যাওয়ায় ধনিষ্ঠার অমাবস্যা হইতে বর্ষারম্ভ স্থির করা হইল। বেদাঙ্গজ্যোতিষ এইরূপভাবে বর্ষারম্ভ ও ঋতুচক্রের আরম্ভের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া দিল। পুনরায় খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির চতুর্থ সংশোধন প্রচলিত করিলেন এবং নক্ষত্রতালিকা অশ্বিনী হইতে আরম্ভ করা হইল। মধ্যবর্ত্তী সময়ে পঞ্জিকা সংস্কারের আর একটি চেষ্টা হইয়াছিল, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে'। দেখা গেল যে ঋতুচক্র আবার এক পক্ষ কাল পিছাইয়া গিয়াছে, তখনই এই চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা সফল হয় নাই, কারণ সাধারণ লোকে এই সংশোধন স্বীকার করে নাই। সুতরাং বেদাঙ্গ জ্যোতিষ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকা সংশোধনই বরাহমিহিরের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং পরে বরাহমিহির নক্ষত্রতালিকাকে অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিলে এই পরিবর্ত্তনই সকলে গ্রহণ করিল এবং এখন পর্য্যন্ত এই সংশোধিত পঞ্জিকাই চলিয়া আসিতেছে।

সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে তিনটি ঋতুর প্রচলন ছিল, যথা গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত। শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থানেও তিনটি ঋতুর উল্লেখ আছে। ইহার পরে জ্যোতিষ-সংহিতার যুগে দেখা যায় যে বৃহৎসংহিতার আদিত্যা-চারাধ্যায়ে শিশির অর্থাৎ শীত ঋতুকে বৎসরের প্রথম ঋতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে সে সময়ে বর্ষ মকর-সংক্রান্তিতে আরম্ভ হইত। এই পরিবর্ত্তন বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং বর্ষারম্ভ মকরক্রান্তি হইতে ধরা হইল; এই ব্যবস্থাই বরাহমিহিরের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বরাহমিহির দেখিলেন যে তৎকালে বিষুবন্ রেবতী নক্ষত্রের শেষভাগে পড়িতেছে এবং কর্কটক্রান্তি পুনর্বসু নক্ষত্রে পড়িতেছে। সুতরাং বরাহমিহির বর্ষারম্ভের এই পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন এবং নক্ষত্রতালিকা অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিষুবন্ হইতে বৎসরের আরম্ভ হইল এবং সেই সময় হইতেই ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত ঋতুর মাস বলিয়া গণ্য হইল। বরাহমিহির কর্তৃক এই সংশোধিত বর্ষারম্ভ তখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্তও চলিয়া আসিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। বৎসর কখন হইতে এবং কেন 'বর্ষ' নামে অভিহিত হইল? প্রথমেই মনে হইবে যে বর্ষা ঋতুর সহিত বৎসরের নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ ছিল; আর ইহাও



পল্লীবধূ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র ধর

অনুমিত হয় যে কোন-না-কোন সময়ে বর্ষা ঋতুতে বৎসরের আরম্ভ হইত এবং এই কারণেই বৎসরের 'বর্ষ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ কোন-না-কোন সময়ে দক্ষিণায়ন গতির আরম্ভের সঙ্গে বৎসরেরও আরম্ভ হইত, এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বেদ ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও সংহিতায় কিংবা বেদাঙ্গজ্যোতিষের কোন স্থানে এই ব্যাপারের উল্লেখ নাই। অথচ কৌটিল্য তদ্‌রচিত অর্থশাস্ত্রের এক স্থানে (কালমান অধ্যায়ে) বলিতেছেন যে তাঁহার সময়ে আষাঢ়ের শেষে কর্কট-ক্রান্তিতে বৎসরের আরম্ভ হইত। তবে জৈনদিগের জ্যোতিষগ্রন্থ সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তিতে ইহার একটি বিশদ কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে ঋতুচক্রের আরম্ভ হয় আষাঢ় মাস হইতে। সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি ঋতুগুলির এইরূপ বর্ণনা দিয়াছে—(১) বর্ষা, (২) শরৎ, (৩) হেমন্ত, (৪) বসন্ত ও (৫) গ্রীষ্ম। এখানে দেখা যায় যে হেমন্ত ও শিশিরকে এক ঋতু ধরিয়া ঋতুগুলির সংখ্যা পাঁচটি বলা হইয়াছে। আবার বৎসরের আরম্ভ ধরা হইয়াছে বর্ষা ঋতু হইতে।

এখন দেখা যাউক জ্যোতিষসিদ্ধান্তে ঋতুগুলির বিষয় কি বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে বরাহমিহির ফাল্গুন মাসে বিষুর্বন্ হইতে বর্ষারম্ভ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তে বৎসরের আরম্ভ মকরক্রান্তি হইতে ধরা হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিতেছে—মকরক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ঋতুগুলির ক্রমিক বিবরণ এই প্রকার, যথা, (১) শিশির, (২) বসন্ত, (৩) গ্রীষ্ম, (৪) বর্ষা, (৫) শরৎ ও (৬) হেমন্ত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বরাহমিহিরের পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ বেদাঙ্গজ্যোতিষ-প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থাই স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই অংশ প্রাচীন সৌরসিদ্ধান্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, ভাস্কর তদ্‌রচিত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে বসন্ত ঋতু হইতেই ঋতুচক্রের আরম্ভ করিয়া ঋতুগুলির পর-পর একটি কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন।

হিন্দুদিগের বর্ষারম্ভ ও ঋতুচক্রের একটা ক্রমিক বিবৃতি দেওয়া হইল এবং ইহাতে দেখান হইল যে বর্ষারম্ভ ও ঋতুচক্রের আরম্ভের সামঞ্জস্য করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করিবার জন্য হিন্দুদিগের কিরূপ প্রয়াস করিতে হইয়াছিল। এই প্রয়াসে তাঁহারা অয়নগতি প্রভৃতি জ্যোতিষের জটিল বিষয়গুলিও লক্ষ্য করিতে ভুলেন নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ বিষয়ে তাঁহাদিগের অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন দিয়া পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছেন।



শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শান্তিনিকেতনের শিক্ষায়তনের সঙ্গে আমার অনেক দিনের নাড়ীর টান আছে। ১৯০৩ সনের কথা বলছি। তখন এসেছিলাম এক গ্রীষ্মের ছুটিতে, আমার হাতের তৈরি (অর্থাৎ মিস্ত্রির হাত আর আমার বাৎলানো) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে, সেই ছুটির সময় সখের মাস্টারি করতে। তখন সরকারী অধ্যাপকের পদে বাহাল হই নি। এই খানেই হয় আমার অধ্যাপনার হাতে-খড়ি। তখন আমি নববিবাহিত, সস্ত্রীক এই আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। গুরুদেবের সঙ্গে নিকটতর পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই প্রথম। কিন্তু মাত্র দু-দিনের জন্য। কন্যার রোগবৃদ্ধির দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি আলমোড়া পাহাড়ে চলে গেলেন। কিন্তু সেই দু-দিনের স্মৃতি অমর হয়ে আছে। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর আমাদের ঘরে এসে তাঁর "বিনি-পয়সায় ভোজ" শীর্ষক রচনাটি আবৃত্তি ক'রে একটা হাসির ঢেউ তুলে দিয়ে গেলেন।

শান্তিনিকেতনের পুরানো বড়কুঠির অদূরে, কবির সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সেই নবোদ্ভিন্ন রূপটি মনে পড়ে।

খোলার চালে আর মাটির দেওয়ালে তৈরি ছোট ছোট ঘরের লাইনবন্দী একটি লম্বা কুটীর। সামনে মাটির দাবা। তার পাশে ছিল একটি একতলা পাকা বাড়ী, কতকটা সরকারী ডাকবাংলার মত। তিনখানি ঘর পাশাপাশি, মাঝের ঘরটা বড়। সামনে ধূ ধূ করছে কাঁকর-ভরা খোলা মাঠ। বাড়ীর এক পাশে ছিল একটা বেঁটে ত্রিভঙ্গ খেজুর গাছ। সেই বাড়ী এখন দ্বিতল লাইব্রেরি গৃহে পরিণতি লাভ করেছে। মাঝের ঘরটি ছিল আমাদের বিজ্ঞানাগার, বাঁ-দিকের ঘরটা হল আমাদের আস্তানা, আর ডানদিকের ঘরটিতে মাদুর পাতা। দুপুরে সে-ঘরে আমাদের সাহিত্যিক মজলিশ বসত।

সকালবেলা ঐ মাঝখানের বড় ঘরটিতে চলত আমাদের বিজ্ঞানচর্চ্চা। ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির ছোটখাটো পরীক্ষা, আর সেই সঙ্গে তাদের ব্যাখ্যা; কতকটা কিণ্ডারগার্টেনের মত। কুয়োতলায় হ'ত স্নান, জল তুলে দিতেন ছাত্ররা। তাঁদের মধ্যে যতীন গুপ্তের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে।

দুপুরবেলা অসহ্য গরম। ডানদিকের ঘরে বসত আমাদের বৈঠক। একটা খসখসের পর্দা ছিল দরজায় ঝুলানো। বালতিতে থাকত জল, শ্রীমান যতীন্দ্র এবং আমরাও মাঝে মাঝে পিচকারি নিয়ে পর্দার সঙ্গে বিনা আবীরে হোরি খেলে আসতাম। বৈঠকে চলত পাঠ, কাব্যালোচনা ও গল্প। সেক্সপীয়রের তিনখানি নাটক—কীং লীয়র, সিম্বেলিন ও ম্যাকবেথ পড়া হয়ে গেল মাস-খানেকের মধ্যে, কতক বোঝা, কতক না-বোঝার ভিতর দিয়ে। আমাদের প্রধান পাঠক ছিলেন আশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সেক্সপীয়র ছাড়া আমাদের কবির ও ইংরেজী কবিতার আবৃত্তি চলত। সতীশের মুখে রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" ও ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সোরাব রুস্তম আবৃত্তির অনুরণন এখনও আমার মনে জেগে ওঠে।

গলদঘর্ম্ম দেহে দুপুর থেকে বিকাল পর্য্যন্ত কী রকম উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে দ্রুতবেগে কাব্যচর্চ্চা চলত, তা এক মাসের পাঠসূচীর পরিমাণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। এরই মধ্যে পঠিত অংশের বিষয়বস্তু নিয়ে বিচার-বিতর্ক টীকাটিপ্পনীও চলত। অধিকাংশই কিশোরবয়স্ক, কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনায় গুরুশিষ্য সকলেই সমপ্রাণ। এই আসরের প্রাণস্বরূপ ছিলেন সতীশচন্দ্র ও তস্য সহযোগী অজিতচন্দ্র। একটা কথা সর্ব্বদাই মনে হয়, দুইয়ে দুইয়ে চার হয় আঙ্ক গুণে, কিন্তু দু-চার জন সহধর্মী প্রাণের অন্তরঙ্গ সহযোগের যোগফল উত্তীর্ণ হ'তে পারে সংখ্যাতীতে।

সকালবেলা আমি ছিলাম বিজ্ঞানের উপাধ্যায় এবং দুপুরবেলা কাব্যালোচনায় ছেলেদের সতীর্থ। রোদ পড়ে এলেই আমরা দল বেঁধে বাহির হতাম মাঠে। প্রায় প্রত্যহই সেই সময়ে দেখা দিত বৈশাখী ঝড়। আমরা খালিপায়ে কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢেকে সেই ঝড়ে উধাও হয়ে ছুটতাম। ঝোড়ো হাওয়ার প্রকোপ বেশী হ'লে উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে থাকতাম পড়ে, আর খেতাম বালি-কাঁকরের ছররা-গুলি। আপাদমস্তক ধূলি-ধূসরিত হয়ে যেত সেই বায়ব্য স্নানে, তবে সেটা গোরজঃ কৃতং নয়, কালবোশেখীর ফুৎকার-মারুতোত্থিতম্। তার পর কুয়োতলায় এসে হ'ত 'অবগাহং তু বারুণম্' বালতির পর বালতি জলে। মাঝে মাঝে দু-এক দিন অদৃষ্টে শিলাবৃষ্টিও জুটত। এই ধূলোটে মাস্টার ছাত্রে ভেদাভেদ ছিল না।

স্নানের পর সবাই মিলে বসতাম মাঠে-ফেলা মস্ত একটা পুরানো তক্তাপোষের উপর। ছারপোকার দৌরাত্ম্য তাতে ছিল বলে তাকে রৌদ্রবৃষ্টির অন্তরায়ণে রাখা হয়েছিল। গানের আসরে আমরা যখন মশগুল তখন খাটমলদের রুধির-পারণা চলত দিনান্তে, যদিও আমরা কেহই ছিলাম না জৈনভাবাপন্ন। এই তক্তাপোষটি ছিল আমাদের গীতিবিতান। দিনুর* হাতে এস্রাজ, কণ্ঠে অমৃতলহরী। গানের পর গান চলেছে, বিরাম নেই। খোলা আকাশের তলে সমুৎসুক শ্রোতৃবৃন্দের মাঝখানে সে-গান অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য লাভ করত। এই ছিল মোটামুটি তখনকার রোজনামচা।

মনে পড়ে এক দিন দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বসেছি আমাদের পাঠচক্রে, এমন সময়ে দিনু বললেন—আজ পড়া নয়। সকলে মিলে চাঁদা ক'রে একটা কবিতার মকস করা যাক্। তথাস্তু। হঠাৎ কবিত্বের ভূত চাপল ঘাড়ে। এই পয়ারীয় চাঁদার ফণ্ডে প্রস্তাবক দান করলেন—

এস্রাজ, শোনা আজ সুমধুর তান,
মধুর সঙ্গীতে তোর ভরে যাক্ কান।

সবাই চুপ। মনে মনে কিন্তু কবিতার জাঁতাকল ঘুরছে। দিনুর পাশেই বসেছিলেন সতীশচন্দ্র। তিনি আকর্ণসন্ধানে তার জ্যা আকর্ষণ ক'রে ছাড়লেন মর্ম্মভেদী বাণ—

কহিল এস্রাজ শত কান করি খাড়া
এ গরমে গান কি রে, ওরে লক্ষ্মীছাড়া।

তার পরেই বসে আছি আমি। নাচার, গণ্ডায় আণ্ডা দিতেই হবে। বলতে হ'ল—

তবে যদি শালী বলি মলি দাও কান,
গান বাহিরিতে পারে দুই-চারিখান।

সবাই মিলে হো হো করে অট্টহাস্য। অতঃপর পাঠারম্ভ।

আর এক দিন মনে পড়ে, ঘোর ঘনঘটা, আমরা ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাঁপ দেবো ব'লে বাহির হয়েছি। এমন সময় মনে হ'ল, আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ে মাথায়। ঠাণ্ডা দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে নামল বৃষ্টি, সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের ঝিলিক আর হুঙ্কার। বুকে বাজ পেতে নেবার মত মরীয়া আমরা কেউ হই নি। সুতরাং এক-ছুটে উত্তীর্ণ হওয়া গেল কুঞ্জবাবুর কুটীরে। তিনি সে-সময়ে আশ্রমের সহযোগীদের মধ্যে এক জন। তাঁর কুঁড়ে ঘরের দাবায় সকলে নিলাম আশ্রয়। মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সময়টা কাটে কী ক'রে। খেয়াল হ'ল একটা শারাদ (charade) অভিনয় করা যাক। তাড়াতাড়ি দুই অঙ্কের এক নাটিকার খসড়া ঠিক হয়ে গেল। গল্পটি নেই স্মরণে। এইটুকু শুধু মনে আছে, সে হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর হচ্ছে—'বিদ্যুৎ'। প্রথমাঙ্কে আছে 'বি' এবং দ্বিতীয় অঙ্কে 'দ্যুৎ'।

সাঁইত্রিশ বৎসর পার হয়ে সেই সব দিনের স্মৃতি আজ জাগছে মনে। জ্যোতির্বিদের মুখে শুনি, এমন সব তারা আছে, যারা নিবে গেছে অনেক দিন, তবু তাদের দীপ্তি এখনও আমাদের চোখে অনির্ব্বাণ। জীবনেও তাই হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনা, যারা কালের প্রবাহে ভাসমান নৌকার মত কোন্ দিগন্তে লীন হয়েছে, স্মৃতির সাগরে ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেসে আসে দীর্ঘ দেশকাল পার হয়ে, তাদের গতিধারার উজান পথে।

পুরানো ফটোর অ্যালবমে আলেখ্যগুলি প্রায় সবই যখন লুপ্তপ্রায়, তখন দু-একখানা ছবি চোখে পড়ে যা কালের সংঘর্ষে একেবারে মুছে যায়নি, তাদের মুখশ্রী সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হয়ে আছে। আজও যেন চোখের

* দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই তরুণ দিনেন্দ্রনাথের সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি, কানে আসে তাঁর গীতিনির্ঝরিণীর কলধ্বনি। রথীন্দ্রনাথের সেই কিশোর কান্তি, সলজ্জ অথচ সপ্রতিভ তাঁর ব্যবহার। সর্বদা নিজেকে পিছনে রাখতেন, কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি। পুতুল নাচের ওস্তাদের হাতে থাকে সূত্রগুলি, পর্দ্দার আড়ালে। তাদের অদৃশ্য টানে রঙ্গমঞ্চে চলে পুতুলের নর্মলীলা। পিছনে থেকে রথীন্দ্রের কাপ্তেনী চলত কতকটা সেই রকমের।

সতীশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ কাব্যোন্মাদ আমাদের মুগ্ধ করত। মাঝে মাঝে মাত্রাধিক্যে একটু হাস্যরসের উদ্দীপনা যে না হ'ত এ-কথা বলতে পারি না। মনে পড়ে গেল একটি দিনের কথা, সেদিন 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'। সতীশচন্দ্র কলাপীর মত উর্দ্ধগ্রীব হয়ে আরম্ভ ক'রে দিলেন তাঁর আবৃত্তি—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে।

ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত তাঁর মুখমণ্ডল। আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি তাঁরই মর্ম্মবাণী কবির জবানীতে। আবৃত্তি যখন এসে পৌঁছল—

'ওগো, প্রাসাদ-শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কেশ এলায়ে'

এই অংশটিতে, তখন তাঁর করসঞ্চালনা ও মুদ্রাবেগের ধাক্কায় ফুল্লমনা দিনেন্দ্রের চিত্তে হ'ল কৌতুকসঞ্চার। প্রথমে তো রুমালে মুখ ঢেকে মাথা নীচু করে রইলেন—তার পর এক বার আড়চোখে সতীশের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র তাঁর সর্ব্বাঙ্গে একটা চাপা হাসির ভূমিকম্প খেলে গেল। অতঃপর ত্বরিত উত্থান ও বেগে পলায়ন। সতীশচন্দ্রের ভ্রূক্ষেপও নেই। নিরুপদ্রবে আবৃত্তিকে ভাবতরঙ্গে নৌকাডুবির হাত থেকে সমাপ্তিতে উত্তীর্ণ করলেন। যতদূর মনে হয়, বাইশ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। যে বলিষ্ঠ ও সরস কাব্যবৈদগ্ধ্য সেই ক-দিনে তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম, এ দীর্ঘ জীবনে আর কোথাও তা দেখিনি।

আমাদের দেশে একটা কবিপ্রসিদ্ধি আছে, হাতী কমলবন বিধ্বস্ত করে, পটপট ক'রে পদ্মগুলি নেয় উপড়ে তার শুঁড়ে জড়িয়ে। বোলপুরের সেই দিনগুলির উদ্দেশে আজ বলি—

সরোবরে ছিল কমলিনী,
স্বেচ্ছাবন্দী মৃণাল-শৃঙ্খলে,
পড়িল সে করীর কবলে।
কুণ্ডলিত শুণ্ডে নিল ছিনি'
হস্তী তারে, তুলিল আকাশে
ছিন্নমস্তা কমলমণিরে।
প্রতিবিম্বখানি তার ভাসে
আজি স্তব্ধ সরসীর নীরে।

অটুট রহিল শুধু মাঝে
অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম তন্তুগুলি,
তন্ত্রীসম আজি তারা বাজে
স্মৃতি যবে বুলায়ে অঙ্গুলি
মীড়ে মীড়ে মধুমূর্চ্ছনায়
তোলে সুর কম্প্র বেদনায়।

সেই ক-দিনের আশ্রমবাসের স্মৃতির সঙ্গে আমার মনে চিরন্তন হয়ে রইল, দিনেন্দ্রনাথের গান, সতীশচন্দ্রের কাব্যোন্মাদ, যতীন্দ্রের অতন্দ্রিত সেবা।

আশ্রমে এখন আয়োজনের বিপুলতা বেড়েছে। অধ্যাপকরা ও ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যাবহুল। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিগত শক্তি তখনই বলিষ্ঠ হয় যখন উদ্দেশ্য ও আচরণে তার উপান্ত-অংশগুলির মধ্যে নিবিড় ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে। বিজ্ঞান বলে, এক পিণ্ড লোহার প্রত্যেক কণা একটি স্বতন্ত্র চুম্বক। কিন্তু যখন তারা এলোমেলো হয়ে তাল পাকিয়ে থাকে, তখন তাদের অন্তর্গূঢ় চৌম্বকশক্তি পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে খণ্ডিত হয়, এবং মোটের উপর সেই লোহার টুকরোর সমবেত চৌম্বকশক্তি একেবারেই লুপ্ত হয়েছে মনে হয়। কিন্তু একটা প্রবল চুম্বকদণ্ডের প্রভাবে ও অবমর্ষে তারা যখন একমুখী হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের প্রত্যেকের পৃথক শক্তির যোগফলে সেই নির্গুণ লৌহপিণ্ডটি চুম্বকায়িত হয়ে ওঠে। সাধনাশ্রম মাত্রেরই অধিনায়ক সেই চুম্বক-যষ্টি যার স্পর্শে ও প্রেরণায় প্রত্যেক শিষ্য ও উপাধ্যায় আশ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে পারেন, যদি প্রতি চিত্তের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনুকূল্য তাঁর নির্দ্দেশের ছন্দানুবর্ত্তী হয়। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে নিয়মাধীন হয়, তখনই আমরা আশ্রম রাষ্ট্র সমাজ সংসার সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যের মধ্যেও শৃঙ্খলা ও শক্তির সমন্বয় করতে পারি।

এই আশ্রম ভারতের প্রাণকেন্দ্র হোক, বিশ্বভারতীর মহৎ আদর্শ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করুক এই প্রার্থনা করি।

পটভূমিকার জের

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হাওড়া স্টেশনে যে-রোগামত কুলিটা প্রায়ই শুষ্ক মুখে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার নাম হরিয়া। বয়স তাহার খুব বেশি নহে। সংসারে পিতামাতা নাই, কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা হরিয়ার মাথায় এক বোঝা চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বোঝাটা এখনও সম্পূর্ণরূপে হরিয়ার স্কন্ধীভূত হয় নাই; কিছু টাকা না জমিলে সে-বোঝা স্কন্ধীভূত হওয়াও দুরূহ এবং হরিয়ার ঘর বাঁধিবার আশাও কম। তাই আরা জেলা ত্যাগ করিয়া একদা সে হাওড়া স্টেশনে আসিয়াছে এবং অন্য কোথাও সুবিধা করিতে না পারিয়া সর্দ্দার কুলির হাতে-পায়ে ধরিয়া একটা নীল রঙের কোর্ত্তা গায়ে চাপাইয়া কুলিগিরির সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু রোগা শীর্ণ দেহ দেখিয়া মোটভারাক্রান্ত যাত্রীরা তাহার পানে ফিরিয়াও চাহেন না। তাঁহাদের মূল্যবান দ্রব্যের অপচয় আশঙ্কাই হয়ত হরিয়ার প্রতি অনির্ভরতার একমাত্র হেতু। এক পয়সার চানা বা ছাতু খাইলেও হরিয়ার দিন কাটে; কাজেই, উপার্জ্জন তেমন না হইলেও, মণিয়াকে ঘরে আনিবার আশা সে অতিকষ্টে পোষণ করিয়া আছে।

কিন্তু হরিয়ার কথা থাকুক। সামান্য একটা কুলি, যাহার মাথায় মোট চাপাইয়া প্ল্যাটফরম-বারিধি পার হওয়ার কাজটুকু চলে, যে সামান্য একটা পয়সার জন্য ভদ্রলোকের মানসম্ভ্রম ঘুচাইয়া চোখা চোখা কথা বলে, তাহার কথা ইনাইয়া-বিনাইয়া বলিবার কি-ই বা দরকার! তার চেয়ে কাননবাবু লোকটি ভাল। হরিয়ার মত শীর্ণও নহেন, কালোও নহেন—এবং কলিকাতা হইতে কোন্ সুদূরে—আরা জেলায় তাঁহার বাড়ীও নহে। কলিকাতা হইতে মাত্র আশী মাইল দূরে তাঁহার বাসভবন এবং প্রতি সপ্তাহে তিনি শহরের ধূলিমলিন ইষ্টকারণ্য ছাড়িয়া পল্লীর মাঠ বনের মধ্যে গিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে ভালবাসেন। আজকাল যন্ত্রযুগের দিনে আশী মাইল অবশ্য ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু কাননবাবুর দেশে যাওয়ার মধ্যে নাতিআধুনিক ও প্রাচীন দুই প্রকারের যানবাহনকেই আশ্রয় করিতে হয়। মাইল চল্লিশেক রেলগাড়ির কয়লা ও ধোঁয়া, মাইল ত্রিশেক মোটর-বাসের ধূলা মাখিয়াও তাঁহার নিস্তার নাই, আরও মাইল দশেক গোযানের ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ শুনিতে শুনিতে তন্দ্রার মধ্যেই তিনি বাড়ী পৌঁছিয়া যান। বেলা আড়াইটার ট্রেনে হাওড়ায় চাপিয়া রাত্রি নয়টার মধ্যে বাড়ী পৌঁছানোও তো কম সৌভাগের কথা নহে। সওদাগরী আপিসে চাকরি করিয়া রবিবারের ছুটি ভোগ করিবার সৌভাগ্য কয়জন কেরাণীরই বা হয়! তা কাননবাবুর বরাত ভাল। তিনি মাসের চারিটি রবিবার ও ছুটির দিনগুলি (যে ছুটিগুলি শনি বা সোমবার ঘেঁষিয়া পড়ে অর্থাৎ সপ্তাহান্তিক টিকেটে যাতায়াত চলে) নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিতে পারেন। এবং বড়বাবুরা সোমবারের দিনও অত্যন্ত উদার হইয়া হাসিমুখে কাননবাবুকে দুই-একটি বয়স্যোচিত রসিকতার দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। সেদিন অস্নাত অভুক্ত কাননবাবু নিদ্রালু চোখ দুটিকে যদিই কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ করিয়া মোটা লেজারের উপর মাথাটি রাখেন—বড়বাবুরা সেদিকে চাহিয়াও কিছু বলেন না। কারণ, কাননবাবুর বাড়ীর বড়ি ও আমসত্ব নাকি ভাল এবং কাননবাবু নিজে লোকটিও যাহাকে বলে নিরীহ ভদ্রলোক, কাহারও অনুরোধ কোনদিন ঠেলিতে পারেন না—বিশেষ করিয়া বড়স্থানীয়দের!

সোমবারে মেসে গিয়াই কাননবাবু কোনমতে চারিটি খাইয়া নিতান্ত নির্জ্জীবের মত বিছানা আশ্রয় করেন। সেদিন তাঁহার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই খুঁজিয়া মেলে না। আসল জীবনের সাক্ষাৎকার ঘটে মঙ্গলবারের

প্রাতঃকাল হইতে। বাড়ীর গল্প, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, আহারতত্ত্ব, গৃহিণী ও পুত্রকন্যা তত্ত্ব সবেগে চালাইয়া আগামী শনিবার বাড়ী যাইবার লম্বা ফর্দ্দটি দাখিল করিয়া হাসেন :

আর ভাই, বোঝা বয়েই দিন গেল। এবারের ফর্দ্দটা দেখেছ? যেন মুদির দোকানের মাসকাবারী ফর্দ্দ। পৌষসংক্রান্তি আসছে কিনা! দেখ, ভায়া, দেখ।

হিন্দু হইয়া পাঁজির শুভদিনগুলিকে তো অগ্রাহ্য করা চলে না। পূজার সময় নূতন কাপড়, নবান্নের দিন নূতন চালের পায়স, পৌষপার্ব্বণে পিঠাপুলির ধুম, সরস্বতী পূজায় ইলিশ মাছ ও পটোল, শীতলষষ্ঠীতে কলাই ও সিম বেগুন সিদ্ধ, জামাইষষ্ঠী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ঐ সম্পর্কীয়দের জন্য বিশেষ আয়োজন, অরন্ধনে পান্তা ভাত, কচুর শাক সিদ্ধ ও চালতার অম্বল ইত্যাদির হাঙ্গামা বাঙালীদের পোহাইতেই হয়। কাননবাবু শহরের চাকুরে, কাজেই ওগুলি ছাড়াও খুচরা পাল-পার্ব্বণগুলিতেও কমবেশি আয়োজন তাঁহাকে করিতে হয়।

সম্মুখে পৌষপার্ব্বণ, এবং সে পার্ব্বণ পড়িয়াছে রবিবারে। কাননবাবু সোমবার রাত্রির নির্জ্জীবতার মধ্যেই বারকয়েক লম্বা ফর্দ্দখানির এপিঠ ওপিঠ চোখ বুলাইয়াই ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মঙ্গলবার হইতে সোৎসাহে সংগ্রহ চলিতে লাগিল। শনিবার সকালে দেখা গেল, একখানি রিক্‌শ না হইলে ঐ সমস্ত জিনিস বহন করিয়া হাওড়া স্টেশনে পৌছানো অসম্ভব।

যে-কেরাণী সপ্তাহান্তিক টিকেটের নিয়মিত খরিদ্দার সে যদি বলে শনিবারের দিন আপিসের কাজে অন্য দিনের মত মনোযোগী—তাহা হইলে ভুক্তভোগী ব্যতীত সে-কথায় আর সকলে আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন; কিন্তু কাননবাবুর বড়বাবু অন্য ধাতুর। তিনি শনিবারের দিন হাসিয়া বলেন, খাতায় সইটা ক'রে সরে পড়ুন না—মিছিমিছি লেজার কাটাকুটি ক'রে লাভ কি!

কাননবাবু মাথা চুলকাইয়া ও মুখ নামাইয়া বলেন, আড়াইটার আগে যে ট্রেন নেই স্যর।

বড়বাবু হাসিয়া বলেন, ঠিক—ঠিক। রেল কোম্পানী প্যাসেঞ্জারদের এত সুখসুবিধার খবর রাখে, কেবল শনি-বার দিন যারা আপিস ঠেকিয়ে বাড়ি যায়—তাদের মনের আসল খবরটি জানে না! এদের ব্যবসায়ে লাভ হওয়া কঠিন!

তা কাননবাবুর ট্রেন আড়াইটায় হইলেও একটার সময়েই তিনি সুরুৎ করিয়া সরিয়া পড়েন। আপিস হইতে মেস পাকা দেড় মাইল। সেটুকু পদব্রজে সারিয়া মিত-ব্যয়িতার পরিচয় দেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে মেসে আসিয়াই পোঁটলাপুঁটুলিগুলি হাতে ও কাঁধে ঝুলাইয়া বাহির হইয়া পড়েন। সুবিধা হইলে বাস, অন্যথায় রিক্‌শ।

পৌষপার্ব্বণের বোঝাটা ভারি ছিল বলিয়া একখানা রিক্‌শ ডাকিয়া হাওড়া অভিমুখে রওনা হইলেন। তখন দুটা বাজিতে সাত মিনিট বাকি।

২

রিক্‌শ ছুটিয়াছে, কাননবাবু তাহাতে চাপিয়া এ-পাশ ও-পাশ হেলিয়া দুলিয়া যে-জিনিসগুলি হাতের মুঠায় ও পায়ের তলায় চাপা আছে তাহার হিসাব লইতেছেন। দুটি বাঁধা কপি ও চারটি ফুলকপি একই দড়িতে বাঁধা এবং বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলিতে সেই দড়ির প্রান্তভাগ আটকানো। ঐ হাতেরই অনামিকা ও কনিষ্ঠায় আটকানো ঝাড়নে বাঁধা মশলার পোঁটলাটি। ডান হাতের মুঠায় যে বৃহৎ পুঁটুলিটি রহিয়াছে—তাহার মধ্যে আছে গোটা আষ্টেক নারিকেল, এক কুড়ি কমলালেবু, সের পাঁচেক আলু, সের দুই বেগুন, কিছু বিলাতী আমড়া ও ওলকপি। পদতলে কাপড়ের মোট ও এক টিন ফিনাইল, দুটি মেথিলেটেড্ স্পিরিটের বোতল, একটা শিক দেওয়া রঙীন মশারি ও দু-পিস সেগুন কাঠ। টিকেট কেনাই আছে। সময়ও খানিকটা পাওয়া যাইবে, স্টেশনে নামিয়া বিশেষ ছুটাছুটি করিতে হইবে না। কিন্তু—ওই যাঃ—মোয়ার হাঁড়ি? জয়নগরের মোয়া—আজ দুই-তিন শনি-বার বলিয়া বলিয়া তবে যে আপিস-বন্ধু অনিলকে দিয়া সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। মেয়ে শ্বশুরালয় হইতে বৎসরখানেক বাদে আসিয়াছে এবং আসিয়াই বাবাকে ঐ মোয়ার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। এখন উপায়? সেই বহুপ্রার্থিত মোয়া না

লইয়া কোন্ মুখে তিনি বাড়ি উঠিবেন। মোড়ের মাথায় গোল্ড ফ্লেকের ঘড়িতে দেখা গেল মাত্র পঁচিশ মিনিট বাকি। মেসে ফিরিয়া মোয়ার হাঁড়ি আনিতে গেলে কি আর আড়াইটার গাড়ী ধরিতে পারিবেন? কিন্তু মোয়ার হাঁড়িও চাই, এবং আড়াইটার গাড়িও ফেল করা চলিবে না। রিক্শওয়ালা বকশিশের লোভে প্রাণপণে ছুটিল এবং হাঁড়ি সমেত কাননবাবু যখন হাওড়া স্টেশনে পৌছিলেন তখন গাড়ি ছাড়িতে মাত্র দুই মিনিট বাকি।

৩

চার আনা ভাড়া রিক্শওয়ালার সঙ্গে চুক্তি হইয়াছিল, আরও দুই আনা বকশিশ কাননবাবু তাহাকে দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু হাতে একটি আধুলি উঠিল। পকেটের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত খুঁজিয়াও খুচরা সিকি, দুয়ানি বা আনি মিলিল না। ট্রেনের উপর মমতাবশতঃ কাননবাবু পয়সার উপর মমতা ত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রিক্শওয়ালা খুশী-মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল।

কাননবাবু দেখিলেন—সম্মুখেই একটি কমবয়সী শীর্ণকায় কুলি ক্ষুধার্ত্ত চোখে তাঁহার মোটগুলিকে নিরীক্ষণ করিতেছে। বলা বাহুল্য, সে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত হরিয়া। কাননবাবু হাত তুলিতেই সে ছুটিয়া আসিল। কাননবাবু দ্রুতকণ্ঠে বলিলেন—জলদি গাঁটরি লেও, বকশিশ মিলেগা।

হরিয়ার মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পোটলা-পুঁটুলি যথাসম্ভব তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া নিজে এক হাতে কপির দড়ি ঝুলাইয়া ও অন্য হাতে মোয়ার হাঁড়ি লইয়া ছুটিলেন। মুখে শুধু বলিলেন—তিসরা নম্বর প্ল্যাটফরম।

ধন্য রেল কোম্পানীর ব্যবস্থা। প্ল্যাটফরম সেই কোন্ সুদূর প্রান্তে! আর বে-আক্কেল যাত্রীগুলিই বা কেমন? লোকের সামনের পথ আটকানো ছাড়া যেন চলিতেই পারে না। মর হতভাগারা, আড়াইটার যে আর এক মিনিটও বাকি নাই—সে-কথা উহাদের বুঝাইবে কে?

কে এক জন বলিল—দেখ ভাই লোকটা পাগল নাকি? চোখ কপালে তুলে পড়ি কি মরি করে ছুটছে দেখ?

অন্যজন উত্তর দিল—ক'টা কাক মরে ডেলি প্যাসেঞ্জার হয় জানিস?

—কিন্তু ভাই, ও তো ডেলি প্যাসেঞ্জার নয়, অত মোট নিয়ে—

—তবে গাধা। না রে, ধোপার গাধা নয় রে, চিনির বলদ।

কাননবাবু মনে মনে তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে ছুটিলেন। সময় থাকিলে—যে ভালমানুষ তিনি—অবশ্য মনে ছাড়া মুখে কিছু বলিতেনও না। ওদিকে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটিয়া ঢং ঢং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। গার্ড বেটাও যেন কান পাতিয়া ছিল; ফরর ফরর হুইস্‌ল বাজাইয়া সবুজ নিশান দুলাইয়া দিল। উহারই মধ্যে যা একটু হিসাবজ্ঞান ছিল ড্রাইভারের।

গার্ডের সঙ্কেত সত্ত্বেও আধ-মিনিট বাদে বাঁশী বাজাইয়া দিল। আধ-মিনিট বাদে বাঁশী না বাজিলে কি কাননবাবু শেষ কামরাখানির নাগাল পাইতেন? টিকেট-কালেক্টর, গার্ড, প্ল্যাটফর্ম্মের লোক ও গাড়ির লোক হাঁ করিয়া তাঁহার উন্মত্তবৎ দ্রুতধাবন দেখিতেছিল।

কপি ও হাঁড়ি সমেত কাননবাবু যেমন গাড়ির পা-দানিতে উঠিলেন অমনি গাড়ি দুলিয়া উঠিল। হাঁ হাঁ করিয়া ভদ্রলোকেরা দুয়ার খুলিয়া দিলেন। কেহ তাঁহার হাত হইতে কপি লইলেন, কেহ বা মোয়ার হাঁড়ি। কিন্তু কুলি কই? ছোকরা রোগামত কুলি? অনেকগুলি মোট মাথায় ও হাতে করিয়া অষ্টাবক্রের মত যে অতি কষ্টে কাননবাবুকে দ্রুত অনুসরণ করিতেছিল!

কাননবাবু পাগলের মত গাড়ির জানালা হইতে অর্দ্ধেকখানি দেহ বাহির করিয়া হাত নাড়িয়া প্রাণপণে হাঁকিতে লাগিলেন, এই কুলি ইধার আও, জলদি আও, ছুট্‌কে ছুট্‌কে আও।

অমনই চারিদিকে, গাড়ির মধ্য হইতে, প্ল্যাটফরমের চলমান জনস্রোত হইতে, টিকেট-কালেক্টর ও ক্রুম্যানদের মুখ হইতে সমস্বরে ধ্বনি উঠিল, কুলি, কুলি, জলদি। সমবেদনায় সকলেরই অস্থিরতা বাড়িয়া গেল।

—হায়, হায়, ভদ্রলোকের মালগুলো এসে পৌছলে হয়।

—আপনি না হয় নেমে যান, পরের ট্রেনে যাবেন।

—কুলিটা মালপত্তর নিয়ে সরে পড়ল না তো?

—নম্বর নিয়েছিলেন মশাই, নম্বর? সেবার আমার—

—এই যে ইধার—ইধার—

ট্রেনের গতিবেগ বাড়িতে লাগিল। কুলি ছোকরা শীতের দিনে গলদঘর্ম্ম হইয়া ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল আর কাননবাবু তাহার হাত ও মাথা হইতে ক্ষিপ্রকরে মোটগুলি লইয়া ট্রেনের ভিতর দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিলেন। সমবেদনাতুর যাত্রীরা সেগুলি হাতে হাতে সন্তর্পণে যথাস্থানে রাখিয়া দিতে লাগিলেন।

সর্ব্বশেষ মোটটি যখন কাননবাবু কুলির মাথা হইতে লইলেন তখন সে প্ল্যাটফরমের ঢালু দেশে আসিয়াছে এবং বেগ সামলাইতে না পারিয়া সেইখানে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। ট্রেন সশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ভিতরের লোকগুলি সানন্দে কলরব করিয়া উঠিলেন।

—খুব ট্রেনটা পেয়ে গেছেন মশাই।

কাননবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিলেন, পাব না? বলেন কি মশাই? বলে বাড়িশুদ্ধ লোক হা-পিত্যেশ ক'রে বসে আছে—কাল যে পোষপার্ব্বণ। আজ নারকোলের ছাঁই হবে—কাল হবে পিঠেপুলি।

তাঁহার সারা মুখ বিস্তীর্ণ হইয়া হাসির জোয়ার নামিল। গাড়ীর লোকগুলিও উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

গাড়ির গতিবেগে শব্দ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অভ্যন্তরস্থ উল্লাসধ্বনি অনুকূল বায়ুপ্রবাহেও প্ল্যাটফরমের প্রান্তদেশ স্পর্শ করিবার কথা নহে, তথাপি উপার্জ্জন-অপটু হরিয়া মাথা তুলিয়া দ্রুতধাবমান ট্রেনের পানে একবার সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিল।

অন্ধকার

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

প্রাঙ্গণেতে বসে আছি। বহুক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা গত;
সম্মুখের অন্তরীক্ষ কালো গিরিগহ্বরের মতো
গম্ভীর শূন্যতা লয়ে অপেক্ষিছে শিবের সমাধি,
বাউলের একতারা চলে ঝিল্লি একতানে সাধি।
বিস্রস্ত জলদমালে সমাচ্ছন্ন বিবর্ণ অম্বর
তারি ফাঁকে সঙ্গীহীন ছড়ায়ে রয়েছে অপ্রখর
দুয়েকটি তারা যেন সাগ্নিকের হোমাগ্নি-আভাস;
থাকি থাকি আচম্বিতে ভৈরবের ভীম অট্টহাস-
ছায়াটি আঁকিয়া মিলে ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের ছটা,
শিলা-নিক্ষেপণে যেন দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা
পল্বলের শ্যামল শৈবাল; সেই মতো অন্ধকার
বিদ্যুদ্বিলয়ে আরো চতুর্দ্দিক হ'তে সে দুর্বার
বেড়ে আসি কৃষ্ণতায়। সর্বচিন্তা ফেলিছে ডুবায়ে
মনশ্চক্ষে মুক্ত তব আপাদলুণ্ঠিত কেশচ্ছায়ে॥

প্রাণীর পুচ্ছবৈচিত্র্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অভিব্যক্তির ধারানুযায়ী বিচার করিলে দেখা যায়, মৎস্য-জাতীয় প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীরই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা ও দৈহিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য দেহের প্রান্তদেশে কোন-না-কোন আকারের লেজের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অমেরুদণ্ডী কীটপতঙ্গের মধ্যেও যে লেজের অস্তিত্ব নাই, এমন নহে। কিন্তু লেজ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, কাঁকড়া, চিংড়ি, কাঁকড়া-বিছা প্রভৃতি কতকগুলি অমেরুদণ্ডীপ্রাণী ব্যতীত অধিকাংশ কীটপতঙ্গের দেহপ্রান্তে প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ কোন লেজের অস্তিত্ব নাই। শক্তিশালী দাঁড়া ও লেজই কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণীদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। সাধারণ মাছের লেজের মত চিংড়ির লেজ উপরে নীচে প্রসারিত নহে। ইহাদের লেজ পাখীর লেজের মত পাশাপাশি ভাবে বিস্তৃত। জলের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিবার সময় ইহাদের লেজ হালের কাজ করিয়া থাকে। তাছাড়া লেজের আকস্মিক প্রবল আঘাতে অততায়ীকে ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া অতি সহজেই ইহারা শত্রুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে কাঁকড়ার দেহে কোন লেজের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একটু বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ইহাদের লেজ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা লেজটাকে বুকের খাঁজের মধ্যে গুটাইয়া রাখে। কাজেই সাধারণ ভাবে দেখিলে কাঁকড়ার প্রকাণ্ড মস্তকটি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। শৈশবাবস্থায় ইহারা কিন্তু চিংড়ির মতই লেজ প্রসারিত করিয়া জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। সমুদ্র-জলে গোলাকার শক্ত খোলায় আবৃত এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা রাজকাঁকড়া নামে পরিচিত। ইহাদের আকৃতি কতকটা কচ্ছপের মত, পিঠের গোলাকার খোলাটার পশ্চাদ্ভাগে সূচ্যগ্র লাঠির মত একটি শক্ত লম্বা লেজ আছে। লেজটি খোলাটার সঙ্গে যেন কব্জার মত



জাপানী রঙীন মাছ। জাপানীদের চেষ্টায় ইহাদের বৈচিত্র্য ক্রমশ অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কৌশলে সংলগ্ন। খোলাটার তুলনায় অভ্যন্তরস্থ প্রাণীটি অতি ক্ষুদ্র। জলের টানে কোন গতিকে বালির উপর উঠিয়া চিৎ হইয়া পড়িলে লেজটাকে 'লিভারে'র (leverএর) মত ব্যবহার করিয়া আবার সোজা হইয়া বসে। লেজটি না থাকিলে একবার চিৎ হইয়া পড়িলে আর উপুড় হইবার কোন উপায়ই থাকিত না; এই ভাবে থাকিয়া মৃত্যু বরণ করিতে হইত। কাঁকড়া-বিছার লেজ উন্নততর প্রাণীদের লেজের আকৃতি পরিগ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের লেজের প্রান্তভাগে সূক্ষ্মাগ্র বাঁকানো একটি হুল থাকে। এই হুলই



অ্যাঞ্জেল মাছের বিচিত্র লেজ

ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। হুলের বিষে তীব্র যাতনা অনুভূত হয়। কাঁকড়া-বিছা তাহার লেজের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রিত করিয়া আততায়ীর শরীরে যে-কোন রকমে হুল ফুটাইতে পারে।

জীবজগতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লেজেরও বিচিত্র পরিণতি ঘটিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার কার্য্যকারিতার অভাবহেতু তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাঁকড়া যেমন শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিবার 'পর লেজ গুটাইয়া বুকের নীচে মুড়িয়া রাখে, মেরুদণ্ডী জীব বেঙেরও প্রায় কতকটা তদনুরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শৈশবাবস্থায় বেঙের বেশ লম্বা ও প্রশস্ত লেজ থাকে; সেই লেজের সাহায্যে বেঙাচি জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। কিন্তু বেঙাচি অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়ে। তখন ধীরে ধীরে লেজটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে-সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহপ্রান্তে লেজের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের শরীরের অস্থিসংস্থান ও ভ্রূণের ক্রমবিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে যে, এক সময়ে ইহারাও লেজের অধিকারী ছিল। প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমবিকাশের ধারায় কোন নূতন অঙ্গের আবির্ভাব অথবা কোন পুরাতন অঙ্গের তিরোভাব বা বিকৃতি ঘটা অসম্ভব নহে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা যাহাকে প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, সেরূপ কেন প্রয়োজনের অভাবই যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিলুপ্ত হইবার একমাত্র কারণ—ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কারণ এমন অনেক প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের লেজের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। ঘোড়া-গরুর লেজের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কারণ মশামাছি তাড়াইবার জন্য তাহারা লেজের ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু বিড়াল, কুকুর, হরিণ, ছাগল, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীদের লেজ না থাকিলে তাহারা যে জীবন-সংগ্রামে অচল হইয়া পড়িত, এমন কথা বলা চলে না। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কিন্তু বলেন—পরোক্ষভাবে হইলেও, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই সকল প্রাণীদের লেজ যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে অথবা আক্রমণ-আশঙ্কায় বিড়াল শরীরের লোম ফুলাইয়া, লেজটাকে খাড়া করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। এরূপ উগ্রমূর্ত্তি আততায়ীর প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করিয়া তাহার আত্মরক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। অবশ্য ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও বিরল নহে। লিংক্স-জাতীয় বিড়ালের লেজ ক্ষুদ্র হইলেও এবং ম্যাংক্স নামক বিড়ালের প্রকৃত প্রস্তাবে লেজ না থাকিলেও তাহারা আত্মরক্ষায় কাহারও অপেক্ষা অপটু নহে। কুকুর লেজ নাড়িয়া আনুগত্য ও আনন্দ



কাঁকড়া-বিছার লেজ



"স্বর্গীয় পাখী"

বেড়ান সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। 'সান্-ফিশ' নামক গোলাকার মাছেরা পাখনার সাহায্যেই জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়; কিন্তু আকাশে বিচরণকারী লেজশূন্য কোন পাখীর অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। কোন কোন ডুবুরী-পাখীর অবশ্য লেজের অস্তিত্ব নাই। ইহাদের পা শরীরের প্রান্তভাগে অবস্থিত। তাহার ফলে খালে জলে ডুবিয়া সাঁতার কাটিতে ইহাদের খুবই সুবিধা। লেজ থাকিলে সাঁতার কাটিতে অনেক সুবিধা ঘটিত। আবার এমন অনেক পাখী আছে যাহাদের আকাশে উড়িবার প্রয়োজন হয় না, অথবা উড়িলেও অতি সামান্যই উড়িতে পারে। তথাপি তাহাদের লেজের বহর দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দৈহিক সৌন্দর্য্য বিকাশের জন্যই যে তাহাদের লেজের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ-পাখীদের মধ্যেই লেজের এরূপ সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ময়ূর, বীণা-পাখী, মোরগ ও অন্যান্য সুদৃশ্য লেজওয়ালা পাখীরা তাহাদের লেজের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া প্রণয়িনীদের প্রদর্শন করে। আবার শত্রুকে আক্রমণ করিবার বেলায় উত্তোলিত পতাকার মত লেজ খাড়া করিয়া অনুগামীদের প্রাণে সাহসের সঞ্চার করিয়া থাকে। তাছাড়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য লেজ অবনমিত করিয়া স্বজাতীয় বা বিজাতীয় শত্রুর নিকট পরাজয় স্বীকার করে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করাই খরগোস, ছাগল, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীদের শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেই দলের সর্দ্দার তাহার ক্ষুদ্র লেজটি খাড়া করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে। সকলেই তখন পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে। খাড়া লেজই তাহাদের বিপদজ্ঞাপক ইঙ্গিত।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায়—মাছ ও পাখীর লেজ তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অপরিহার্য্য। লেজের অভাব ঘটিলেও মাছ বরং জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু লেজশূন্য পাখীর পক্ষে কেবলমাত্র ডানার সাহায্যে ইচ্ছামত আকাশে উড়িয়া



মটমট পাখী



লেমুর

মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। ময়ূর ও বীণা-পাখীর লেজ যেমন দীর্ঘ, সৌন্দর্য্যে তেমনই অতুলনীয়। জাপানী মোরগের লেজের মত শরীরের তুলনায় এত বড় লম্বা লেজ বোধ হয় আর কোন প্রাণীরই নাই। কতকগুলি পাখী আবার লেজের সাহায্যে দুই প্রকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশীয় জংলী-খঞ্জন, কাঠঠোক্‌রা, মেক্সিকো ও প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশের মট্‌মট্‌ ও অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্গীয় পাখীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। জংলী-খঞ্জন প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত হাতপাখার মত লেজ ছড়াইয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া থাকে এবং উড়িবার সময় লেজ ছড়াইয়া যেন হাওয়ার মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। কাঠঠোক্‌রা পাখীরা গাছের খাড়া গুঁড়ির গায়ে বসিতে অভ্যস্ত। এই ভাবে বসিবার সময় ইহারা লেজটাকে গাছের গায়ে ঠেসান দিয়া শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। মট্‌মট্‌ ও স্বর্গীয় পাখীর লেজ সঙ্গিনীর চিত্তবিনোদন ও উড্ডয়ন-কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে।

এঞ্জেল-মাছ ও জাপানী রঙীন মাছের দেহের বর্ণ-বৈচিত্র্য ও লেজের বাহার অতুলনীয়। জাপানীদের বহুকালের অক্লান্ত সাধনার ফলে আদিম রঙীন মাছের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও লেজের বাহার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতীয় লেমুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বানরের নিকটতম জ্ঞাতি। কোন কোন জাতের লেমুরের লেজ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু অধিকাংশেরই বড় বড় লেজ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সর্ব্বদাই গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। এক ডাল হইতে অন্য ডালে লাফাইয়া যাইবার সময় এই প্রকাণ্ড লেজ শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। এক জাতীয় লেমুরের দীর্ঘ লেজে অঙ্গুরীর মত সাদা-কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। লেজের জন্য ইহাদিগকে খুবই সুশ্রী দেখায়। গাছের উপর ছুটাছুটি করিবার সময় কাঠ-বিড়ালীর লেজও শরীরের ভারসাম্য রক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করে।

যে-সকল প্রাণীর বিষয় আলোচিত হইল তাহাদের অনেকেরই লেজ কতকটা পরোক্ষভাবে তাহাদের জীবন-যাত্রায় সহায়তা করিয়া থাকে; কিন্তু এমন অনেক প্রাণী আছে যাহাদের লেজ জীবনযাত্রা পরিচালনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের লেজ সুনিয়ন্ত্রিত হস্তপদের মত কার্য্য করিয়া থাকে।

ক্যাঙ্গারু এক অদ্ভুত জানোয়ার। ইহাদের পিছনের পায়ের মত লেজটিও অসম্ভব শক্তিশালী। ইহার লেজ যেমন মোটা তেমনই লম্বা। পিছনের পা ও লেজের উপর শরীরের ভার ন্যস্ত করিয়া ইহারা বিশ্রাম করিয়া থাকে। ছুটিয়া পলাইবার সময় লেজের সাহায্যে লাফাইয়া লাফাইয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। মরুভূমিতে বিচরণকারী জারবোয়া নামক প্রাণীরাও ঠিক ক্যাঙ্গারুর মতই লেজে ভর করিয়া বিশ্রাম করে এবং ছুটিবার সময় লেজের সাহায্যে লাফাইয়া চলে।

অপোসাম নামে আমেরিকায় এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী

দেখিতে পাওয়া যায়। কাঙ্গারু যেমন পেটের থলির মধ্যে বাচ্চা বহন করিয়া বেড়ায়, ইহারাও সেইরূপ তিন-চার বা ততোধিক বাচ্চা পিঠের উপর লইয়া গাছের ডালে ডালে



কাঠবিড়ালী

ঘোরাফেরা করে। বাচ্চাগুলি এমন ভাবে মায়ের পিঠ আঁকড়াইয়া থাকে যে, সে এক ডাল হইতে অন্য ডালে লাফাইবার সময়ও তাহারা পড়িয়া যায় না। অপোসামের লেজ ঠিক মানুষের হাতের মত কাজ করিয়া থাকে। লেজের ডগা গাছের ডালে জড়াইয়া ইহারা অনায়াসে বাচ্চাগুলিকে পিঠে করিয়া ঝুলিয়া থাকে। লেজে ঝুলিয়া দোল খাইতে খাইতে এক ডাল হইতে অন্য ডালে চলিয়া যায়। শয়ান ভাবে অবস্থিত গাছের ডালের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার সময় অপোসামের বাচ্চাগুলি মায়ের খাড়া লেজের সহিত তাহাদের লেজ জড়াইয়া পিঠের উপর নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করে। দক্ষিণ-আমেরিকার কিংকাজো নামক প্রাণীরাও অপোসামের ন্যায় লেজের সাহায্যে গাছের ডাল হইতে ঝুলিয়া থাকিতে পারে। কিংকাজো দেখিতে একটি বড় বিড়ালের মত; সর্ব্বশরীর কোমল হরিদ্রাভ লোমে আবৃত। লেজের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিবার ক্ষমতা থাকায় ইহারা বেপরোয়া ভাবে গাছের ডালে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে পারে। আমাদের দেশের বহুরূপী-জাতীয় প্রাণীরা লেজের সাহায্যে গাছের ডাল জড়াইয়া শিকারের অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

আমাদের দেশে সজারু অনেকেরই পরিচিত প্রাণী। ইহাদের সর্ব্বশরীর সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে আবৃত। গায়ের এই কাঁটাগুলিই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। ইহাদের লেজও কতকগুলি ভোঁতা ও ফাঁপা কাঁটার সমবায়ে গঠিত। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই ইহারা লেজের ব্যবহার করিয়া থাকে। শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখিলেই ইহারা গায়ের কাঁটাগুলি খাড়া করিয়া 'রণং দেহি' মূর্ত্তিতে লেজের কাঁটাগুলি ঝুমঝুমির মত বাজাইতে সুরু করে। তাহার এই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া এবং অদ্ভুত ঝুমঝুম শব্দে ভয় পাইয়া শত্রু আর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। দুর্দ্ধর্ষ শত্রু হইলেও আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করে। এই সময়ের মধ্যেই সজারু সংঘর্ষ এড়াইয়া পলায়নের সুযোগ করিয়া লইতে পারে। আমেরিকার উগ্র বিষধর র‍্যাটেল সাপও লেজের সাহায্যে শব্দ করিয়া শত্রু অথবা অবাঞ্ছিতকে দূরে সরিয়া যাইবার সুযোগ প্রদান করে। র‍্যাটেল সাপের বিষ মারাত্মক; কিন্তু সে সহজে এই বিষ নষ্ট করিতে চাহে না। তাহাদের লেজের প্রান্তভাগে মালার ন্যায়



চীনের প্যাঙ্গোলিন



আফ্রিকার ইঁদুর—ইহাদের লেজে চর্ব্বি সঞ্চিত থাকে

উপায়ে প্রবল শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার কোন উপায় না থাকিলে ইহারা শরীরের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করিয়া লেজটিকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। বিচ্ছিন্ন লেজ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। আততায়ীর দৃষ্টি তখন স্বভাবতই এই ছিন্ন লেজের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। এই সুযোগে ছিন্ন-লাঙ্গুল টিকটিকি কোন নির্জ্জন স্থানে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। কিছু দিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে আবার নূতন লেজ গজাইয়া উঠে।

কয়েক খণ্ড শুষ্ক অস্থি গ্রথিত থাকে। কাহাকেও নিকটস্থ হইতে দেখিলেই লেজ নাড়িয়া অস্থিখণ্ড হইতে খট্‌খট্‌ শব্দ করে এবং সেই শব্দ শুনিয়াই আগন্তুক সতর্ক হইয়া যায়।

দক্ষিণ-আমেরিকায় এক জাতীয় বৃক্ষচারী সজারু দেখিতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় ইহারা আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। ইহারা লেজের ডগার সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে। এক গাছ হইতে অন্য গাছে যাইবার সময় এইরূপভাবে সর্ব্বদাই ইহারা লেজের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। লেজে ঝুলিয়া দোল খাইতে খাইতে এক ডাল হইতে অন্য ডালে চলিয়া যাইতে কোনই অসুবিধা অনুভব করে না।

টিকটিকি-জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জানোয়ার-দের বিশালাকৃতি লেজের দাপটের কথা ভাবিলে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের তাহাদের ক্ষুদ্রকায় বংশধরদের লেজের দাপটও উপেক্ষণীয় নহে। গোসাপের প্রকাণ্ড লেজই তাহার আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। লড়াইয়ের সময় লেজের দাপটে জলাশয় বা বনজঙ্গল তোলপাড় করিয়া ফেলে। আততায়ী ইহাদের লেজের আস্ফালনে অস্থির হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। কুমীরের লেজের প্রচণ্ড শক্তির কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। লেজের এক আঘাতেই ইহারা বড় বড় জন্তু-জানোয়ারকে ঘায়েল করিয়া ফেলিতে পারে।

ক্ষুদ্রকায় টিকটিকিরা লেজের সাহায্যে অতি অদ্ভুত

ইউরোপের কাঁচসাপও শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার্থ লেজ ফেলিয়া পলায়ন করে। দেখিতে সাপের মত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা টিকটিকি-জাতীয় প্রাণী। ক্রমবিকাশের ফলে টিকটিকির আকার পরিত্যাগ করিয়া সাপের আকৃতি ধারণ করিয়াছে। শত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় না দেখিলেই হঠাৎ মাংসপেশী সঙ্কুচিত করিয়া লেজটাকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। বিচ্ছিন্ন লেজটা মোচড় খাইতে খাইতে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে। ছিন্ন লেজটার উপর আক্রমণ-কারীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবার সুযোগে সে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করে। টিকটিকির মত ইহাদেরও নূতন লেজ গজায়। অন্ধ-কৃমি নামে এক প্রকার পা-শূন্য টিকটিকিকেও কাঁচসাপের মত লেজের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে দেখা যায়।

আফ্রিকা মহাদেশে গোসাপের মত আকৃতিবিশিষ্ট প্যাঙ্গোলিন নামে এক প্রকার জানোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়। মাথা হইতে ইহাদের সর্ব্বশরীর মাছের আঁশের মত এক প্রকার বড় বড় শক্ত শল্কে আবৃত। রাত্রিচর প্যাঙ্গোলিন দিনের বেলায় ডালপালাবিহীন গাছের গুঁড়ির গায়ে পিছনের পা আটকাইয়া নিদ্রা যায়। ইহাদের বিশ্রামের ভঙ্গী অদ্ভুত। পিছনের দুই পায়ের

সাহায্যে গাছটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শরীরটাকে ডালের মত বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। শত্রুর নজর এড়াইবার জন্যই তাহারা বিশ্রামের এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। এই অবস্থায় দেখিলে ইঁহাকে একটি মৃত ডাল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু দৃঢ় লেজ না থাকিলে কেবল দুই পায়ের সাহায্যে এরূপ ভাবে অবস্থান করা সম্ভব হইত না। দৃঢ় ও লম্বা লেজটাকে 'লিভারে'র মত গাছের গায়ে ঠেসান দিয়া প্যাঙ্গোলিন শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে।

চীনদেশীয় প্যাঙ্গোলিনও গাছের ডালে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের বিশ্রামভঙ্গী আফ্রিকা-দেশীয় প্যাঙ্গোলিন হইতে স্বতন্ত্র। ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়া যাইবার ভয়ে ইহারা তাহাদের শক্তিশালী প্রকাণ্ড লেজের সাহায্যে গাছের ডাল জড়াইয়া ধরে। ইহাদের লেজের এত জোর যে নিজের ইচ্ছামত আলগা না করিলে শত চেষ্টাতেও বাঁধন খোলা যায় না।

বিভার নামক প্রাণীদের লেজ চেপ্টা লোমশূন্য; ঠিক একখানি দাঁড়ের মত দেখিতে। ইহাদিগকে প্রয়োজনের তাগিদে প্রায়ই জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতে হয়। পিছনের দাঁড়ের সাহায্যে নৌকা যেমন করিয়া অগ্রসর হয়, বিভারও সেরূপ তাহার অদ্ভুত লেজের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। লেজের এরূপ অদ্ভুত পরিণতি না ঘটিলে ইহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িত।

পিপীলিকাভুক্ প্রাণীদের লেজের গঠন অতি অদ্ভুত। লেজের উপরে ও নীচে লম্বা লম্বা লোম গজাইয়া একটি লম্বাটে পাখার আকৃতি ধারণ করে। ঘুমাইবার সময় এই অদ্ভুত লেজের সাহায্যে তাহারা পাখার বাতাস করিয়া শরীর ঠাণ্ডা করিয়া থাকে।

সাপের শারীরিক গঠন এমনই যে, লেজ ছাড়া ইহার পূর্ণতা লাভ ঘটিতে পারে না। কারণ ইহাদের সম্পূর্ণ শরীরটাই লেজের মত। শরীরের কোন্ স্থান হইতে যে লেজের আরম্ভ হইয়াছে তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া ও পেপুয়া-দ্বীপে সবুজ টিকটিকি নামে সাপের মত এক অপূর্ব্ব সরীসৃপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের



কিংকাজো লেজের সাহায্যে ঝুলিয়া আছে

মস্তক হইতে কিছু দূরে শরীরের পশ্চাদ্দেশে আঁশের মত দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে। এই উপপদের পশ্চাদ্ভাগকে লেজ ধরিলে, তাহার দৈর্ঘ্য শরীরের দ্বিগুণের অধিক হয়। এত বড় লেজের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সাধারণ সাপের শারীরিক গঠন অনুসারে ডাঙায় ভ্রমণ ও জলে সন্তরণ করিবার জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। লেজই সাপের শিকার ধরিবার প্রধান অস্ত্র। শিকারকে লেজে জড়াইয়া প্রবল চাপে তাহার অস্থি চূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে উদরস্থ করিয়া থাকে। শিকার ক্ষুদ্র হইলে অবশ্য মুখের সাহায্যেই আক্রমণ করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন কতকগুলি প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা অতি অদ্ভুত উপায়ে লেজের সাহায্যে প্রাণধারণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। দুম্বা ভেড়ার অদ্ভুত লেজ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহাদের লেজ একটা প্রকাণ্ড চেপ্টা থলির মত। শরীরের তুলনায় লেজটা অত্যন্ত ভারী। এরূপ একটা ভারী থলি পিছনে ঝুলাইয়া

দ্রুতগতিতে চলাফেরা করা ইহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কিন্তু কষ্টকর হইলেও এই লেজ তাহাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্য। ইহাদের আদিবাসভূমি আফ্রিকা দেশের যে স্থানে ইহারা বিচরণ করিত, বছরের কয়েক মাস মাত্র সেখানে তৃণশস্যাদি পাওয়া যায়। সেই সময়ে তাহারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উদরস্থ করিয়া থাকে। অতিরিক্ত খাদ্য চর্ব্বিরূপে লেজে জমা হয়। শীতের সময় যখন খাদ্যাভাব ঘটে তখন লেজের সঞ্চিত চর্ব্বি শরীর-পোষণে ব্যয়িত হয়। আফ্রিকায় এক প্রকার ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও দুম্বা ভেড়ার ন্যায় গ্রীষ্মকালে প্রচুর খাদ্য উদরস্থ করে। অতিরিক্ত খাদ্য চর্ব্বিরূপে তাহাদের লেজে জমা হইয়া থাকে। শীতের সময় খাদ্যাভাব ঘটিলে এই চর্ব্বি শরীরে শোষিত হইয়া তাহার জীবনরক্ষা করিয়া থাকে।

লেজের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে কয়েকটি জীব-জন্তুর বিষয় উল্লেখ করা হইল মাত্র। পৃথিবীতে যে এরূপ আরও কত শত জীবের অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

রোমান্স

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটনাগপুরের যে অখ্যাতনামা স্টেশনে হাওয়া বদলাইতে গিয়াছিলাম তাহার নাম বলিব না। পেশাদার হাওয়া-বদলকারীরা স্থানটির সন্ধান পায় নাই; এখনও সেখানে টাকায় ষোল সের দুধ এবং দুই আনায় একটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগী পাওয়া যায়।

কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক আছে। কবির ভাষায় বলিতে গেলে 'দোসর জন নহি সঙ্গ'। দিনান্তে মন খুলিয়া দুটা কথা বলিব এমন লোক নাই। পোস্টমাস্টার বাবু আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বয়স হইয়াছে এবং মেজাজ অত্যন্ত কড়া। তা ছাড়া স্টেশনের মালবাবুটি আছেন বাঙালী; কিন্তু তিনি রেলের মাল ও বোতলের মালের মধ্যে নিজেকে এমন নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন যে সামাজিক মনুষ্যহিসাবে তাঁহার আর অস্তিত্ব নাই।

দুগ্ধ ও কুক্কুটমাংসের সুলভতা সত্ত্বেও বিলক্ষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। দিন এবং রাত্রি কোন মতে কাটিয়া যাইত; কিন্তু বৈকাল বেলাটা সত্যই অচল হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনে বানপ্রস্থ অবলম্বনের যে বিধি ঠাকুর-কবি দিয়াছেন, তাহাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলে আমার আপত্তি নাই, নচেৎ প্রস্তাবটা পুরামাত্রায় গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। যৌবনকালে অবিবাহিত অবস্থায় একাকী হাওয়া বদলাইতে আসিয়া ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

কিন্তু দু-চার দিন কাটিবার পর সন্ধ্যা যাপন করিবার একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। রেলের স্টেশনটি নিরিবিলি; লম্বা নীচু প্ল্যাটফর্ম্ম এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত চলিয়া গিয়াছে—উপরে কোনও প্রকার ছাউনি নাই। মাঝে মাঝে একটি করিয়া বেঞ্চি পাতা আছে। এক দিন বৈকালে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়াই একটা বেঞ্চির উপর গিয়া বসিয়া পড়িলাম। মিনিট কয়েক পরে স্টেশনে সামান্য একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল; তার পরই হু হু শব্দে পশ্চিম হইতে কলিকাতা-যাত্রী মেল আসিয়া পড়িল। যাত্রীর নামা-ওঠার উত্তেজনা নাই বলিলেই চলে; কিন্তু সারা গাড়ীটা যেন মনুষ্যজাতির বিচিত্র সমাবেশে গুলজার হইয়া আছে। জানালা দিয়া কত প্রকারের স্ত্রী-পুরুষ গলা বাড়াইয়া আছে, কলরব করিতেছে। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসে দু-চারিটি ইঙ্গ-সাহেব-মেম নিজেদের চারি পাশে স্বতন্ত্রতার দুর্ভেদ্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে।



পল্লীশ্রী

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ

প্রবাসী প্রেস, কলিক

ঘর্ম্মাক্তকলেবর অর্দ্ধ-উলঙ্গ এঞ্জিন-ড্রাইভারটা যেন এক পকড় কুস্তি লড়িয়া ক্ষণেকের জন্য মল্লভূমির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইল, আমার চোখের সামনে লোহার খাঁচায় পোরা একটা ধাবমান মিছিল আসিয়া দাঁড়াইল।

এক মিনিট দাঁড়াইয়া ট্রেন-দৈত্য আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। এখানে তাহার কোনই কাজ ছিল না, শুধু হাঁফ লইবার জন্য একবার দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু আমার মনে একটা নেশা ধরাইয়া দিয়া গেল। এই আকস্মিক দুর্যোগের মত হঠাৎ আসিয়া হাজির হওয়া, তার পর তেমনই আকস্মিক ভাবে উধাও হইয়া যাওয়া—ইহার মধ্যে যেন একটা রোমান্স রহিয়াছে। জীবনের গতানুগতিক ধারার মধ্যে এমনি বৈচিত্র্য আসিয়া প্রাণকে নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া দেয়—ইহাই তো রোমান্স!

স্টেশন আবার খালি হইয়া গিয়াছিল। বেশ একটু প্রফুল্লতা লইয়া উঠি-উঠি করিতেছি, ঠং ঠং করিয়া স্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সচকিতে গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, বিপরীত দিক হইতে ট্রেন আসিতেছে। আবার বসিয়া পড়িলাম।

ইনিও মেল; কলিকাতা হইতে পশ্চিম যাইতেছেন। তেমনই বিচিত্র স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। জানালার প্রতি ফ্রেমে চলচ্চিত্রের এক-একটি দৃশ্য। তার পর সেই খাঁচায়-পোরা দীর্ঘ মিছিল লোহা-লক্কড় বাষ্প ও কয়লার জয়গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

স্টেশনে খবর লইয়া জানিলাম আজ আর কোনও ট্রেন আসিবে না। শিস্ দিতে দিতে বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন বৈকালে আবার গেলাম। ক্রমে এটা একটা দৈনন্দিন অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। এমন হইল যে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার দিকে সরিতে আরম্ভ করিলেই আমার পদযুগলও অনিবার্য্য টানে স্টেশনের দিকে সঞ্চালিত হইতে থাকে। আধ ঘণ্টা সেখানে বসিয়া দুটি ট্রেনের যাতায়াত দেখিয়া তৃপ্তমনে ফিরিয়া আসি। কোনও ট্রেন কোনও দিন একটু বিলম্বে আসিলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি। নিজের উৎকণ্ঠায় নিজেরই হাসি পায়, তবু উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারি না; যেন ইহাদের যথাসময়ে আসা না-আসার দায়িত্ব কতকটা আমারই স্কন্ধে।

সেদিনের কথাটা খুব ভাল মনে আছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি; ঝিরঝিরে বাতাস স্টেশনের ধারের ছোট ছোট পলাশগাছের পাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিতেছিল। আকাশে কয়েক খণ্ড হাল্কা মেঘ অস্তমান সূর্য্য হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দিতেছিল, বাতাসের রং গোলাপী হইয়া উঠিয়াছিল। কনে-দেখানো আলো, এ আলোর নাকি এমন ইন্দ্রজাল আছে যে চলনসই মেয়েকেও সুন্দর মনে হয়।

স্টেশনে গিয়া বসিয়াছি, মনে এই কনে-দেখানো গোলাপী আলোর ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। এমন সময় বংশীধ্বনি করিয়া কলিকাতা-যাত্রী মেল আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর যে-কামরাটা ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছিল, তাহারই একটা জানালা আমার চোখের দৃষ্টিকে চুম্বকের মত টানিয়া লইল।

জানালার ফ্রেমে একটি মেয়ের মুখ। কনে-দেখানো আলো সেই মুখখানির উপর পড়িয়াছে বটে কিন্তু না-পড়িলেও ক্ষতি ছিল না। এত মিষ্টি মুখ আর কখনও দেখি নাই। চুলগুলি অযত্নে জড়ান, চোখদুটি স্বপ্ন দেখিতেছে। আমার উপর তার চক্ষু পড়িল, তবু সে আমাকে দেখিতে পাইল না। বাহিরের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; যৌবনের অভিনব স্বপ্নরাজ্যে নূতন প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই ঘোর চোখে লাগিয়া আছে। মনের বনচারিণী। অন্তরের কৌমার্য্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; শিলারুদ্ধ পথ তটিনীর মত পথ খুঁজিতেছে কিন্তু শিলা ভাঙিয়া ফেলিবার সাহস এখনও হয় নাই। যৌবনের তটে দাঁড়াইয়া তাহার পা দুটি ন যযৌ ন তস্থৌ।

গাড়ীর কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ নাই। এক মিনিট কখন কাটিয়া গেল; গাড়ী গোলাপী বাতাসের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমার দৃষ্টির চুম্বক দিয়া লোহার গাড়ীটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। গাড়ী কিন্তু থামিল না।

তার পর কত ক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলাম। পশ্চিম-গামী গাড়ী আসিয়া চলিয়া গেল জানিতেও পারিলাম

না। চমক ভাঙিতে দেখিলাম, ফাগুনের হাল্‌কা বাতাস তখনও পলাশ-পাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে কিন্তু আকাশের কনে-দেখানো আলো আর নাই, কখন্ মিলাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম। বাঙালীর মেয়ে নিশ্চয়; এত সুকুমার মুখ বাঙালীর মেয়ে ছাড়া হয় না। কিন্তু পশ্চিম হইতে আসিতেছে। তা পশ্চিমে তো কত বাঙালী বাস করে? কোথায় যাইতেছে? হয় তো কলিকাতায়। কিংবা আগেও নামিয়া যাইতে পারে! কোথায়? বর্দ্ধমান? চন্দননগর? বাংলা দেশটা তো এতটুকু নয়। এই বিপুল জনসমুদ্রে এক বিন্দু শিশিরের মত সে কোথায় মিলাইয়া যাইবে!

কুতূহলী জল্পনা চলিতে লাগিল। মন নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইল না। আবার কখনও দেখা হইবে কি? ইংরেজি বচন মনে পড়িল—Ships that pass in the night! না, তা হইতেই পারে না। একবার মাত্র চোখের দেখায় যে মনের উপর এমন দাগ কাটিয়া দিল, সে চিরজীবনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে! আর তাহাকে কখনও দেখিতে পাইব না!

আশ্চর্য্য! এমন তো কত লোককেই প্রত্যহ দেখিতেছি, কাহারও পানে ফিরিয়া তাকাইবার ইচ্ছাও হয় না,—আয়নার প্রতিবিম্বের মত চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের আড়াল হইয়া যায়। অথচ এই মেয়েটি এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল কি করিয়া?

সে কুমারী—আমার মন বুঝিয়াছে। তা ছাড়া সিঁথিতে সিন্দুর, মাথায় আঁচল ছিল না। ঠোঁট দুটিও অনাঘ্রাত কচি কিশলয়ের মত—

তবে? কে বলিতে পারে? জগতে এমন কত বিচিত্র ব্যাপারই তো ঘটিতেছে। হয়ত আমারই জন্য সে—!

মন তাহাকে লইয়া মাধুর্য্যের হোলিখেলায় মত্ত হইয়া উঠিল।

পরদিন অভ্যাসমত আবার স্টেশনে গেলাম। দুটা গাড়ীই পর-পর বিপরীত মুখে চলিয়া গেল; আজ তাহাদের ভাল করিয়া লক্ষ্যই করিলাম না। মন ও ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখী; বহির্জগৎ যেন ছায়াময় হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মাথার ভিতর দিয়া তড়িৎ খেলিয়া গেল। কে বলিতে পারে, হয়ত এই পথেই সে ফিরিয়া যাইবে! কোথা হইতে আসিয়াছিল জানি না, কোথায় গিয়াছে তাহাও অজ্ঞাত; তবু এই পথেই ফিরিতে পারে ত!

পরদিন হইতে আবার সতর্কতা ফিরিয়া আসিল। শুধু তাই নয়, এত দিন যাহা ছিল নির্ব্যক্তিক কৌতূহল তাহাই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। পশ্চিমযাত্রী গাড়ী আসিলে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না; সময় অল্প, তবু সমস্ত প্ল্যাটফর্ম্ম ঘুরিয়া সব জানালাগুলা অনুসন্ধান করিয়া দেখি। হঠাৎ জানালায় কোনও মেয়ের মুখ দেখিয়া বুক ধড়াস করিয়া উঠে। তার পরই বুঝিতে পারি, এ সে নয়।

মাঝে মাঝে মনে সংশয় উপস্থিত হয়। সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কই ফিরিল না ত! তবে কি অন্য পথে ফিরিয়া গিয়াছে? কিংবা—যদি না ফেরে? হয়ত চিরদিনের জন্য বাংলা দেশে থাকিয়া যাইবে। এমনও ত হইতে পারে, পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিবার পথে আমি তাহাকে দেখিয়াছি। তবে, আমি যে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ট্রেন সন্ধান করিতেছি, ইহা ত নিছক পাগলামি।

আবার কখনও কখনও মনের ভিতর হইতে একটা দৃঢ় প্রত্যয় উঠিয়া আসে। দেখা হইবেই। তাহাকে মনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে পাইয়াছি যে সে আমার মনের ঘরণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে আর চোখে দেখিতে পাইব না, এ হইতেই পারে না।

জল্পনা করি, দেখা হইলে কি করিব। গাড়ীতে উঠিয়া বসিব? কিংবা, এই বেঞ্চিতে বসিয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিব। সে একটি কথা বলিবে না, গাড়ী হইতে নামিয়া আমার সামনে স্মিতমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। দু-জনে হাতধরাধরি করিয়া স্টেশনের বাহির হইয়া যাইব; পাথুরে কাঁকর-ঢালা পথ দিয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে এক সময় জিজ্ঞাসা করিব,—এত দেরি করলে কেন?

কিন্তু তাহার দেখা নাই।

তার পর এক দিন—

সে-দিনের কথাও বেশ ভাল মনে আছে।

পশ্চিমগামী মেল আসিয়া দাঁড়াইল। বেঞ্চি হইতে উঠিতে হইল না, ঠিক সামনের জানালায় সে। বারো দিন পরে আবার ফিরিয়া চলিয়াছে।

লাল চেলিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, সিঁথিতে অনভ্যস্ত সিন্দূর লেপিয়া গিয়াছে। চোখের চাহনি তেমনই স্বপ্নাতুর। আমার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু এবারও সে আমাকে দেখিতে পাইল না। মনের বনচারিণী। কিন্তু তবু আজ কোথায় একটা মস্ত তফাৎ হইয়া গিয়াছে। সেদিন আকাশের কনে-দেখানো আলো যে বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ তাহা তাহার ভিতর হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এক মিনিট। গাড়ী চলিয়া গেল। তার পর কত ক্ষণ বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলাম। নিজের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙিতে দেখিলাম, ফাগুনের হাল্কা বাতাস পলাশ-পাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে।

বাংলা দেশের একটি উৎসব

জামাইষষ্ঠী

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাংলা দেশে জামাইষষ্ঠী বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত। কলিকাতা এবং পশ্চিম-বঙ্গের স্থানে স্থানে উহার যত প্রচলন, পূর্ব্ববঙ্গে তত নাই। যে-সব শাস্ত্রবিধি অনুসারে হিন্দু ধর্ম্মাচরণ অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের কোথাও জামাই-ষষ্ঠীর উল্লেখ নাই। বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, মহাভারতে কোথাও উহার সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলার বাহিরে এরূপ কোন ব্রতোৎসব ত নাই-ই, এমন কি যে অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের আশ্রয়ে উহা বর্দ্ধিত তাহাও কুত্রাপি অনুষ্ঠিত হয় না। ভবিষ্য-পুরাণে অরণ্যষষ্ঠী ব্রতকথা রহিয়াছে, তদনুসারেই বঙ্গজননীগণ সন্তান এবং সন্তানস্থানীয় সকলের মঙ্গলকামনায় এবং সন্তানসন্ততিবৃদ্ধির কামনায় এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অরণ্যষষ্ঠী হইলেন স্কন্দজননী দুর্গা স্বয়ং। তিনি বাম ক্রোড়ে কার্ত্তিকেয়কে ধরিয়া বরাভয়া সুপুত্রিকারূপে ব্রতচারিণীগণকে প্রার্থনা-মত সন্তান বা সন্তানের মঙ্গল দান করিতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষষ্ঠী দিনে বঙ্গজননীগণ তালের পাখা ও পূজার দ্রব্যাদি সহ ষষ্ঠীদেবীর যথোচিত আরাধনা করেন। পূজান্তে ব্রতকথা শ্রবণপূর্ব্বক মায়েরা তাঁহাদের সন্তান ও সন্তানস্থানীয় সকলকে এবং কুমারী বালিকাগণ পিতৃদেব ও পিতৃস্থানীয় সকলকে মাঙ্গলিক উলুধ্বনি সহকারে প্রত্যেকের মস্তকে সুনির্ম্মিত দূর্ব্বাগুচ্ছ স্পর্শ দ্বারা বিশ্বমাতৃকা ষষ্ঠীদেবীর আশীর্ব্বাদ দান করিয়া থাকেন। এই দূর্ব্বাগুচ্ছটি বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যে রচিত হয়। দেবীর শুভাশিষ নিবেদনের পর, প্রসাদী নববস্ত্র প্রত্যেককে উপহার দেন, আশীর্ব্বাদী রক্ষাসূত্র হস্তে বাঁধিয়া দেন, অক্ষতদেহে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবার কামনায় প্রসাদী অক্ষত তণ্ডুল খাইতে দেন, পাখা দ্বারা কিঞ্চিৎ ব্যজনকরতঃ সকল দুঃখ, অশান্তি ও শ্রান্তি দূর করিয়া দেন। তৎপর ব্রতচারিণীগণ ফলমূলাহারে দিবসরজনী কাটাইয়া পরদিন পারণ করিয়া থাকেন।

এই শাস্ত্রসম্মত ব্রতানুষ্ঠানের সহিত জামাইষষ্ঠী কিরূপে কোথা হইতে আসিয়া মিলিল তাহা ভাবিবার বিষয়। বাংলার অধিবাসিগণ যখন স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, শক্তি, ধন, সম্পদ ও সুখে সুসমৃদ্ধ ছিল তখন বাঙালীর জীবন একটা আনন্দের উৎসস্বরূপ ছিল। তখন জামাইষষ্ঠী, ছেলেষষ্ঠী, এমন কি রম্ভাতৃতীয়া, শাক-চতুর্দ্দশীর ঘটা দেখিয়াও বহির্বঙ্গের লোকেরা বিস্মিত হইত। আজ আমরা সর্ব্বহারা হতদরিদ্র তাই সেই সৌভাগ্যের দিনের শুভ উৎসব অসীম আনন্দের বদলে মহাদুঃখ, সন্ত্রাস, সঙ্কোচ ও জড়তা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আমরা এমনই হীন ও অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি যে এখন মনে হয় এসব প্রথা সমাজ হইতে বিদূরিত হইলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা যায়। এই ভাবটি সম্পূর্ণ হীনতাপ্রসূত।

মহামতি এণ্ডরুজ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

হঠাৎ বেতার-যোগেই খবর পেলাম মহামতি এণ্ডরুজ পরলোক কালপ্রয়াণ করেছেন। অনেক দিন তিনি শয্যাগত। তবু শেষের দিকে ক্রমে ভাল হচ্ছিলেন তাই খবরটা মনে হ'ল যেন আকস্মিক।

জীবনে মানুষকে তাঁর খুঁটিনাটির মধ্যে দেখি। মৃত্যুতে মানুষকে দেখতে পাই তার অখণ্ডতায়। জীবনীর খুঁটিনাটি খবর আজ তো আমার হাতে নেই তাতে ক্ষতি কি? মৃত্যুর দূরত্বের মধ্য দিয়ে আজ তাঁর জীবনের সমগ্রটাই দেখতে চাই। অসীম আকাশ দূরে আছে ব'লেই সূর্য্যচন্দ্রের গোলত্বটা চোখে পড়ে।

প্রায় সাতাশ-আঠাশ বছর আগে মহামতি এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সন সাহেব দুইটি বন্ধু শান্তিনিকেতন আশ্রমে এলেন। তখন আশ্রম খুবই ছোট। আয়োজন অতি যৎসামান্য। তার আগে তাঁর লেখা কিছু কিছু পড়েছি, এবার ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ দেখলাম! দেখলাম কি সহজ সরল মানুষটি। প্রীতিতে, ভদ্রতায় সৌজন্যে একেবারে ভরা। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর যে ভাব সেখানে কোথাও একটু ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা বা অবজ্ঞা উপেক্ষা কিছু নেই। এই বিষয়ে তিনি খ্রীষ্টের সাচ্চা ভক্ত। কাজেই ভৌগোলিক সীমায় বা জাতি-পংক্তিগতভেদে তাঁর প্রীতি বা মৈত্রীর কোন প্রকার বাধা হ'ত না।

সত্যকার খ্রীষ্টীয় ভক্ত-পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর মায়ের কোলে ব'সে তিনি খ্রীষ্টের যে জীবন শুনেছেন তাতে তাঁর হৃদয়ে এমন গভীর রেখাপাত করেছে যে কিছুতেই তিনি তা ভুলতে পারেন নি। এবারও খ্রীষ্টোৎসবে তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়ে তাঁর সেই খ্রীষ্টজন্মকথা শুনেছি।

ঐ খ্রীষ্টের চরিত্রই তাঁর জীবনকে সকল বাধাবন্ধ ও ক্ষুদ্রতা হ'তে মুক্তি দিয়েছে। যাঁরা যথার্থই খ্রীষ্ট-ভক্ত তাঁদের মধ্যে কেন দেশগত কারণে উচ্চনীচতার হিসেব থাকবে? দিল্লী কলেজে তিনি স্বর্গীয় সুশীল রুদ্রকে এক সময় প্রধান অধ্যাপক করেন, তাঁর অধীনে তিনি সেখানে আত্মনিয়োগের দ্বারা আপন মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। সুশীল রুদ্র তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁর ছেলেপিলেদেরও তিনি নিজ সন্তানের মত দেখেছেন।

সাদাসিধা ছিল তাঁর জীবন। ভারতীয় প্রাচীন মহত্ত্বের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। ক্রমে আমি তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছি। ভারতের নানা বিষয় আলাপ হ'ত। তবু অন্য নানা কথা বললেও ভারতের ভক্তদের কথা বলতাম না। এ জন্যই বলি নি যে এসব কথা তাঁর ভাল লাগবে কি না লাগবে কেমন ক'রে বুঝিব।

এক দিন তিনি আমাকে চেপে ধরলেন—বললেন, "ইউরোপ ভারতের কাছে যদি ঐহিক সম্পদই চায় তবে সে কিছুই পেলে না। হায় হায়, সে তার সোনা, তার কয়লা, তার লোহা খুঁজেই জীবনপাত করল। কিন্তু তার সংস্কৃতি জ্ঞান, প্রেম ভক্তির সন্ধান পেলই না।" তার পর তাঁকে দেখেছি ভারতীয় প্রাচীন সাধক ও মধ্যযুগের ভক্তদের কথা কি গভীর প্রীতির সঙ্গে পড়েছেন ও তাঁদের ধ্যানে তিনি নিজের ধ্যানকে প্রতিদিন গভীর ও পবিত্র করে তুলেছেন।

তাঁর প্রেম শুধু ধ্যান ক'রে বা ভালবেসে তৃপ্ত নয়। তাঁর প্রেমের মধ্যে ছিল বলিষ্ঠ কর্ম্ম ও সেবার ভাব। তিনি বার বার খ্রীষ্ট-ভক্ত কন্যা মেরী ও মার্থার কথা বলতেন। তাঁর মধ্যে উভয়েরই ভাব দেখেছি, মেরীর মত গভীর অনুরাগ অথচ মার্থার মত গভীর সেবা-পরায়ণতা উভয় ভাবকে অন্তরের মধ্যে যুক্ত করতে না পারলে তিনি কিছুতেই তৃপ্তি পেতেন না। ভারতকেও

যখন তিনি ভালবাসলেন তখন তার জন্য দুঃখসহ সেবাব্রতকেও তিনি স্বীকার করলেন।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি সত্যি সত্যি শ্রদ্ধা করতেন, তাই তাঁর আশ্রমের জন্য সর্ব্ববিধ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। প্রায় সাতাশ-আঠাশ বৎসর আগে এই ব্রতের কাছে তিনি নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তখন শান্তিনিকেতনের বয়স অল্প, তার পরিবার ও বাহ্য উপকরণ সবই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এমন অবস্থায় খুব অল্প লোকেই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখতে পারত। তিনি যে শুধু বিশ্বাস করলেন তা নয় তিনি তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ অর্ঘ্যটি তার কাছে উৎসর্গ করলেন। এমন করে এ-দেশের কয়জন লোকই বা আপনাকে এমন কাজে উৎসর্গ করতে পেরেছেন? পিয়ার্স'ন সাহেবের সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনের সেবাতে লাগলেন।

সেখানকার শিক্ষকেরা যে রকম কুটীরে বাস করেন, যে ভাবে তাঁদের খাওয়া-দাওয়া হয় সেই সবই তাঁরা গ্রহণ করলেন। তাঁদের স্বাস্থ্য তাতে বার বার ভেঙেছে। তার জন্য পিয়ার্স'ন সাহেব জীবনের শেষ ভাগে খুব অসুস্থ থাকতেন, যদিও তিনি মারা গেলেন একটা দৈব দুর্ঘটনায়। সেই সব নানা কারণে ও পরবর্ত্তী নানা সময়ে ভারতের জন্য নানা সেবাকর্ম্মে এণ্ড্রুজ সাহেব স্বাস্থ্য হারালেন। যখন মানুষের কোন দুঃখদুর্গতির কথা তিনি শুনতেন তখন নিয়ম পালন ক'রে সুস্থভাবে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত। তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেছেন, আমাদের ছেলেপিলেদেরও নিজের সন্তানের মত দেখেছেন।

আমাদের সুখদুঃখকে তিনি আপন ক'রে নিয়েছেন। সে-সব কথার খুঁটিনাটি আজকে লেখা সম্ভব নয়। মানব-প্রেমের গভীরতাবশতই যেখানে যখন যার প্রতি অত্যাচার হয়েছে তখন তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতীয় দরিদ্র শ্রমিকদের উপরে যে অবিচার হয়েছে তার জন্য তাঁর শ্রমের অবধি ছিল না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় তিনি এ-জন্য বহু নির্যাতন ও অপমান সহ্য করেছেন। সে এত পরিমাণ যে বলা যায় না। নিঃশব্দে সহ্য করেছেন, কিন্তু কাউকে কিছু বলেন নি। এই মৌনভাবে সহ্য করার মধ্যে যে বলিষ্ঠ পৌরুষ আছে তার মর্য্যাদা কি সকলে বোঝেন? ভারতবর্ষের মধ্যেও দেখেছি কোথাও যে কাউকে বিনা কারণে অপমান সহ্য করতে হচ্ছে সে ছিল তার অসহ্য। এজন্য দক্ষিণ-ভারতের অস্পৃশ্যতা তাঁকে বড়ই দুঃখ দিত। বার বার সেই দুঃখ তিনি আমাদের বলতেন।

অনেক দিন পরে মহাত্মাজীর রাজনীতি-আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন যে অস্পৃশ্যতা দূর করাও তার মধ্যে গৃহীত হ'ল সেটা প্রথমে মহাত্মার কার্য্যক্রমের মধ্যে ছিল না। এণ্ড্রুজ সাহেব প্রভৃতি আরও দুই-এক জনের এই বিষয়ে একটু হাত আছে এ-খবর সকলে রাখেন না। মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় দক্ষিণ-আফ্রিকায়। তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মাজীর পরিচয় সাধন করিয়ে দিলেন মিঃ এণ্ড্রুজ। মহাত্মাজী তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয় নিয়ে একটু বিপদে পড়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে চলে আসবেন, তাঁর বিদ্যালয় কি করবেন? মিঃ এণ্ড্রুজের কাছে শুনে কবি রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টিকে নিজ আশ্রমের অতিথি ভাবে রাখতে চাইলেন। এতেই হ'ল দুই জনের মধ্যে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা।

তারপর যখন মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তখন কত এদেশীয় লোক তো ছিলেন কেউ সেই ভেদকে মিটিয়ে দেবার কথাও মনে করেন নি, মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেবের তখন দিবারাত্রি চেষ্টা ছিল কিসে ভারতের এই দুই জন মহাপুরুষের ভেদ মেটে। সবারমতী ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে তিনি ছিলেন নিত্যযোগসেতু।

কোথাও দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্গতির কথা শুনলেই তাঁর কি ব্যাকুলতা দেখা যেত! আসাম-বেঙ্গল রেলের ও আসামের কুলিদের ধর্ম্মঘট তিনি বার বার নিষেধ করেছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে প্রার্থনা করেছিলেন যে ঐ ধর্ম্মঘট যেন না হয়, কারণ এর ভবিষ্যৎ যে কি ভয়ঙ্কর তা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর নিষেধ কেউ শুনলেন না, শেষে তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ তিনি প্রাণপণে মেটাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর

নিষেধ মানে নি ব'লে রাগও করেন নি। বিহারের দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতেও তাঁর মহৎ চেষ্টা দেখেছি।

কোনো কল্যাণব্রতের সহায়তা করতে তাঁর আর আলস্য ছিল না। তাঁর সঙ্গে এই সব কাজে কখনও কখনও গুজরাট, কাথিওয়ার, সিন্ধু প্রভৃতি দেশে ছুটেছি। দিন নেই রাত্রি নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই, শুধু চা আর সরবৎ খেয়ে দিন যাচ্ছে—দারুণ গ্রীষ্ম—কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে স্বাস্থ্য ক-দিন থাকে? লোহার শরীরও ভেঙে যায়। চীন দেশেও তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি, সেই একই কথা। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের সহায়তার জন্য চীনে গিয়েছিলেন।

প্রেমের জোর তাঁর যে কত ছিল তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের বড়ভাই মহাদার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকেও তিনি আপন ক'রে নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি প্রাচীন ধরণের ভারতীয় মনীষী। সাহেবসুবা সইতে পারতেন না। এণ্ডরুজ সাহেব প্রভৃতি প্রথমে ঘেঁসতেই পারেন নি। ক্রমে সেই মহাপুরুষকে প্রেমের দ্বারা এণ্ডরুজ সাহেব আপন করলেন। দিনের পর দিন তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন তবু হাল ছাড়েন নি। তার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ এই এণ্ডরুজ সাহেবকে নিজের ছোট ভাইটির মত স্নেহ করতেন। পশুপাখীর বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথকে এণ্ডরুজ ক্রমে জয় করলেন।

এণ্ডরুজ সাহেবের সাহিত্যিক শক্তি ছিল অসাধারণ। কি সুন্দর সহজ ভাষায় তিনি বলতেন ও লিখতেন। কিন্তু দুর্গতদের দুর্গতির নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে তিনি এই সব দিকে তেমন মনোযোগ দিতেই পারেন নি। পত্র লিখে, দেখা ক'রে, কাজ ক'রে, দেশের দুর্গতির নানা ব্যবস্থা করে তাঁর আর সময় থাকত না। এর মধ্যে কত জায়গায় কত সেবকদের তিনি টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন তা ব'লে শেষ করা যায় না।

আজ তিনি পরলোকে। তাঁকে বিশেষ কোনও দেশের লোক ব'লে যদি আজ শ্রদ্ধা জানাই তবে তাঁর আত্মার প্রতি অবমাননা হবে, জাতীয়তার অনেক ঊর্দ্ধের লোক তিনি। কারণ তা নইলে কি তিনি ইংরাজ হ'য়ে ভারতীয়দের জন্য এমন ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে জাতীয়তা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবতার দিকে ধাবিত হ'ল তার প্রত্যক্ষ দুইটি কারণ মিঃ এণ্ডরুজ ও মিঃ পিয়ার্সনের চরিত্র। জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের এত সম্মান করেন, কিন্তু তাঁরা যদি জাতীয়তাজাতীয়তাবাদীই হতেন তবে তাঁদের কাছে আমাদের জাতীয়তাবাদীরা আসতেন কি করে?

তিনি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, খ্রীষ্টের মতই তিনি ভগবানের লোক—সেই সূত্রে প্রাচীন আধুনিক সকল দেশের সকল ভক্তেরই অনুরাগী। খ্রীষ্টের নামে তাঁর হৃদয় নিত্য প্রণত, খ্রীষ্টভক্তদের চরিতকথা বলতে বলতে তিনি তন্ময়। অথচ হিন্দু সাধকদের কথা তিনি গভীর শ্রদ্ধাসহ শুনেছেন। ভারতীয় সাধনার প্রতিমূর্ত্তি দ্বিজেন্দ্রনাথের চরণতলে তিনি আসীন, মুসলমান সাধক জাকাউল্লা সাহেব তাঁহার পরম শ্রদ্ধার মানুষ। এমন লোককে বিশেষ কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে চিহ্নিত করতে গেলে ভুল হবে।

কিছু দিন হ'তেই তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। শান্তিনিকেতনে এই শরীর নিয়েও তিনি দিনরাত্রি দেখেছি লিখছেন, কত কত লোকের পত্রের উত্তর দিচ্ছেন, দেশ-দেশান্তরের দুঃখদুর্গতি মোচনের চেষ্টা করছেন। তার পর এবার খ্রীষ্টোৎসবে তিনি মন্দিরে কি সুন্দর করে খ্রীষ্টের জীবনী তাঁর সরল অপূর্ব্ব ভাষায় বর্ণনা করলেন, তখনও বুঝতে পারি নি ভিতরে ভিতরে যে তাঁর এতটা শরীর ভেঙেছে।

হঠাৎ তিনি কলকাতা গেলেন। শুনলাম তাঁর পেটেরই মধ্যে পীড়া। তার পর তাঁর অস্ত্রোপচার হ'ল। তার পর তাঁর অসুখের যথার্থ খবর শুনে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা বিষম উদ্‌গ্রীব হলেন, মহাত্মাজী স্বয়ং বার বার দেখা করলেন, সব ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু যিনি আপনার প্রাণ মানবের হিতযজ্ঞে উৎসর্গ করেই দিয়েছেন তাঁর পক্ষে জীবন-মরণ দুইই সমান।

ভগবানের প্রেমলোকের বার্ত্তা যে জীবনে শুনেছে সে কি আর মৃত্যুভয়ে জীবনকে আঁকড়ে থাকতে পারে? তাই যাঁর হাতে তাঁর জীবনটি পেয়েছেন তাঁরই প্রেমের নির্দ্দেশে ভক্ত আপন সেই জীবনটি অমলিন ভাবে তাঁরই হাতে উৎসর্গ ক'রে চলে গেলেন। আজ তাঁর জন্য প্রাচীন ভারতের ঋষিবাক্যেই বলতে হয়—

> তপসা যে অনাধৃষ্যা স্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
> তপো যে চক্রিরে মহস্তাং চিদেবাপি গচ্ছতাৎ।
> যে চিৎ পূর্ব্বে ঋতসাতা ঋতযাতা ঋতাবৃধঃ।
> ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজা অপি গচ্ছতাৎ।

৫. ৪. ৪০

[ঢাকা ধ্বনিবিস্তার-কেন্দ্রে কথিত। কেন্দ্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের সৌজন্যে]

মা

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

জাফর ফকীরের মাত্র একটি পুত্রই বাঁচিয়া আছে। সন্তান তাহার একটি নয় সাতটিই ছিল, কিন্তু একটির বেশী এখন আর বাঁচিয়া নাই। জাফর বলে 'খোদাতাল্লার মরজি' লোকে জানে দারিদ্র্যের অভিশাপ। সে যাহা হউক জাফর ফকীর কিন্তু বলিয়া বেড়ায়, পীরচাঁদ বাঁচিয়া থাকিলেই সাত রাজার ধন। দেখিতেই যা একটু রুগ্ন, নতুবা আয়ু আছে, বাঁচিয়া থাকিলে তাহার দুঃখ দূর করিবে।

পীরচাঁদ বাঁচিয়া থাকিলে একটা কিছু যে হইবে তা কে না শুনিয়াছে? জাফর ফকীরের জানাশোনা এমন একটি লোক পাওয়া যাইবে না যে এই ভবিষ্যদ্বাণী বহুবার শুনে নাই। ফকীরের স্ত্রী ফুলজানের কিন্তু ভরসা হয় না। প্লীহায় পেটঠাসা রোগা শিশু, তার উপর রীতিমত খাইতে পায় না। দেশের যা দুরবস্থা পড়িয়াছে তাহাতে শীঘ্র যে কোন সুবিধা হইবে তাহার কোন আশা নাই। দেশে মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়াছে, ইহার পর ফুলজান আশা পোষণ করেই বা কি করিয়া।

ফুলজান আশা না রাখিতে পারে কিন্তু ফকীর যথেষ্ট আশা রাখে। মেয়েরা নিজের প্রিয়জনের প্রতি এমন সন্দিগ্ধমনা হইয়াই থাকে। জাফর ফকীর বৃদ্ধ হইয়াছে, এখন আর খাটিতে পারে না এই যা তাহার ভয়, নতুবা ফকীর ভাবে এক সন্তানকে সে সুখেই মানুষ করিতে পারিত। দেশের দুরবস্থা; ভিক্ষা মিলে না, তবু তাহাকে ভিক্ষাই করিতে হইবে। খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য থাকিলে সে এই পেশাটা অনেক দিন পুর্ব্বেই ত্যাগ করিত।

ফকীর তামাক সাজিয়া খাইতে বসিয়াছে। তামাকটা পুড়িলেই সে ভিক্ষায় বাহির হইবে। তামাক খাইতে খাইতে তাহার অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। তাহার বড় ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে, এত দিনে একটা জোয়ান পুরুষ হইত, গতর খাটাইয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে খাওয়াইত। ফুলজান যখন দুঃখের দিনে তাহাকে তালাক দিয়া পলাইয়া যায় নাই তাহার পুত্রও তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু—!

ফুলজান সেনদের ইঁদারায় জল আনিতে গিয়াছিল। বাড়ির আঙিনায় পা দিতে-না-দিতেই সে গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল—মরণ আর কি। এতখানি বেলা হ'ল তবু মিন্সের উঠবার নাম নেই, ব'সে ব'সে আমার পিণ্ডি চটকাচ্ছেন।

ফকীর স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়াই তাড়াতাড়ি পোড়া তামাকে শেষ টান দিয়াছিল, কোন ভাবে নাকে মুখে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে অদ্ভুত স্বরে বলিল—এই যাই।

ফুলজান ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—এই যাই! কখন্ থেকে বলছে এই যাই। নবাবের মত কেবল তামাক টানলেই ভাত মিলবে।

ফকীর ভয়ে ভয়ে বলিল—খালি-ঘরে ছেলেটা পড়েছিল কি ক'রে যাই, নইলে কখন্ চলে যেতাম।

—সে আমি জানি। কোন মিঞাকে চিনতে আমার বাকি নেই। কুড়ের বাদশা কোথাকার! একটি-দুটি নয়, ছ-ছটি তো না-খেতে পেয়ে মরেছে, তবু লজ্জাসরম হয় না—বের হ পোড়ারমুখো!

ফুলজান কলসী রাখিবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ফকীর হুঁকা-কলিকা যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলিল—বাপ্স, মেয়েছেলে তো নয় যেন কৃষ্ণলীলার তাড়কা রাক্ষুসী। আমি মরি জ্বরে, কোথায় এক দণ্ড বসব—না, তেড়ে আসে মারতে, দূর দূর ক'রে বাড়ি থেকে বার ক'রে দেয়। বের হ'লেই হ'ল, এই রোগা শরীর নিয়ে তো রোজই বার হই—কি ফয়দাটা হয় শুনি। ইস্ বললেই

হ'ল, নবাবজাদারা যেন আমার জন্য দানছত্র খুলে দিয়েছেন।

ফুলজানকে ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া, জাফর ফকীর আর দাঁড়াইতে সাহস পাইল না, 'আল্লা বিসমিল্লা' বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

২

জাফর ফকীরের বাড়ি ফিরিতে কখনও এত রাত্রি হয় না। কখনও বহু দূরের গ্রামে কোন উৎসবে গেলে ফুলজানকে সঙ্গে লইয়া যায়, একা একা যায় না। কখনও একা একা গেলে এত রাত্রি করে না, তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসে।

ফকীরের বিলম্ব দেখিয়া ফুলজান ভয় পাইয়া গেল। আজ ঘরে এক দানা খাবার ছিল না বলিয়া ফুলজানের মেজাজ স্বাভাবিক ছিল না, কাজেই সে সে ফকীরকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল। ফকীর সরল ও নির্বিকার মানুষ। গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিলেও সে কোন উত্তর দেয় না। কিছু কাল হইল তাহার স্বভাবের একটু পরিবর্তন হইয়াছে। দারিদ্র্যের চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়া এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে কেমন যেন একটু রুক্ষস্বভাব হইয়াছে। ফুলজান কোন কথা বলিলে সোজাসুজি প্রতিবাদ না করিলেও কোন একটা উত্তর দেওয়া চাই। আগে এমন ছিল না। আজ সকাল বেলায় দুই জনের মধ্যে বেশ কথাকাটাকাটি হইয়াছে। তাই ফুলজানের এত ভয়। কে জানে রাগ করিয়া কোথায় কোন্ ঝাড়ে-ঝোপে পড়িয়া রহিয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে হয়ত গোঙাইতেছে। এমনও তো হইতে পারে রাগের মাথায় কোথাও হয়ত নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

ফুলজান যতই ভাবে, ততই যেন তাহার ভয় বাড়িয়া যায়। আল্লা জানে, কখন হয়ত জ্বর আসিয়াছে আব কোথায় কোন্ পুকুর-পাড়ে, কোন্ গাছের তলায় দুর্ব্বল মানুষটি ধূলার উপর বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মনে মনে বলে—আল্লা, এ রোগা দুঃখী মানুষটিকে আর কষ্ট দিও না, বেচারা সারাদিন না খেয়ে আছে, ওকে ফিরিয়ে দাও দয়াময়!

হঠাৎ এক সময় ফকীর ফিরিয়া আসিল। ভয়ে ফকীরের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সারা দিন বাড়িসুদ্ধ লোক উপবাস করিয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ফুলজানের কথা মনে করিতেও ফকীরের শরীর শিহরিয়া উঠে। তাহার মনে হয় ফুলজান এমনি খুবই ভাল, তবে রাগিলে তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। দিনরাত্রি গাধার মত খাটে, মুখে একটু শব্দ নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ক্ষেপিয়া যায় যে কিছুতেই শান্ত করা যায় না। যে-বাড়িতে ফুলজান কাজ করিত সে-বাড়ির কর্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় দুই-তিন দিন যাবৎ তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। তার পর আজ একটি দানাও মুখে দিবার ছিল না।

ফুলজান কিন্তু ফকীরকে দেখিয়া মোটেই ক্ষেপিয়া উঠিল না। বরং পথে কোন বিপদ-আপদ হইয়াছে কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ফকীর ভর্ৎসনার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। ফুলজান কোন ভর্ৎসনা না করিয়া, সস্নেহে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিল, এমন কি এক বার ভিক্ষার ঝুলিটাও পরীক্ষা করিল না। ফকীর হুঁকাটা হাতে লইয়া অবাক-বিস্ময়ে ফুলজানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ফুলজান বলিল—রোজ রোজ বারণ করি তবু অত রাত ক'রে কেন ফের? মাথার দিব্যি দিলেও তোমার কানে যায় না। এ অসুখ-শরীরে অত দূর না গেলেই নয়!

ফকীর কোন জবাব খুঁজিয়া পাইল না। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলে বরং কুড়ে বলিয়া গালমন্দ শুনিতে হয়, ভিক্ষা না পাইলে লাঞ্ছনার সীমা থাকে না।

ফুলজান একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মুকুন্দ চক্কোত্তি আজ দুপুরে মারা গেছে। কি সর্ব্বনাশা জ্বর! বাপের বয়সে এমন দেখি নি, শুনিও নি!

ফকীর ভয়ার্ত্ত ও ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—মারা গেল! কি উপায় হবে এতগুলি নাবালক ছেলেমেয়ের! যে দিনকাল পড়েছে, কি যে উপায় হবে—আল্লাই জানে। চক্কোত্তি-মশাই ভারি ভালমানুষ ছিল।

চিদম্বরমে মন্দিরগাত্রে নৃত্যভঙ্গী



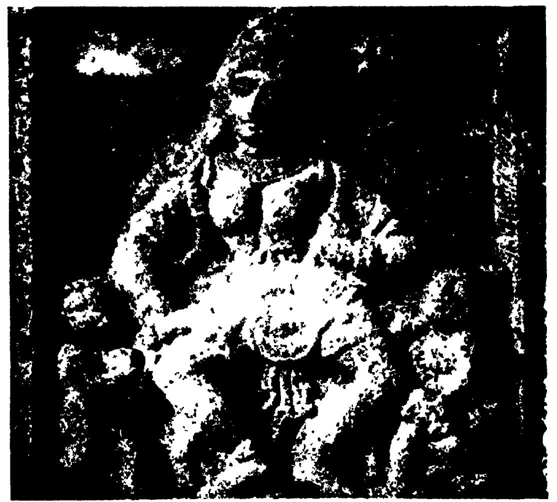
রোষ



রোষোন্মত্ত



রোষভাব



ক্রোধ



সিংহ



হরিণ



গরুড়



মেষ

চিদম্বরমে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি



করুণা



মানভঞ্জন



ধনগর্ব্ব



ধনগর্ব্ব



হাস্য



হাস্য



বৃশ্চিক



বৃশ্চিক

—যে সর্ব্বনাশা জ্বর দেখা দিয়েছে, কারও নিষ্কৃতি নেই, সব উজোড় ক'রে নিয়ে যাবে।

—ভট্টচাষ্যি-মশাই সিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি বলেন, শনির কোপ পড়েছে। তাই হবে রে,'চল্ আমরা পালাই। এ সর্ব্বনাশা জ্বরে আমাদের তিন-তিনটে ছেলে মারা গেল। দেখছিস না, দু-বছরের মধ্যে আদ্দেক গাঁ সাবাড় হয়ে গেল, এ অঞ্চলে একটাও জোয়ান মানুষ নেই—সব মরবে রে, সব মরবে।

সারা দিন খাওয়া হয় নাই। ফুলজান আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া রান্না চড়াইল। ফকীর উঠানে হাতমুখ ধুইতে গিয়াছে। ফুলজান রান্নার জন্য চাউল নিতে গিয়া অবাক্ হইয়া গেল। ভিক্ষার ঝুলিতে শুধু চাউল নয়, ডাল, তরিতরকারি, সাগু, মাছ ও কিছু লাল চিনি। এই সকল জিনিস যে কি করিয়া আসিতে পারে তাহা ফুলজান কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। ফকীর কি শেষ পর্য্যন্ত চুরি করিতে আরম্ভ করিল! কিন্তু ফুলজানের কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না। তাহার মনে হয় জাফর ফকীর চুরি করিবার মত চালাক লোক নয়।

ফকীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে এমন বিস্মিত নয়নে জিনিষপত্রগুলি দেখিতে দেখিয়া সগর্ব্বে বলিল—কি দেখছিস অত?

—এত জিনিষ কোথায় পেলে?

ফকীর মুখ মুছিবার কাপড়ের টুকরাটা দড়ির উপর রাখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

—আরে, হাসছ যে বড়, বল না এত জিনিস কোথায় পেলে?

ফকীর ট্যাঁক হইতে তিন টাকা সাড়ে ন-আনা বাহির করিয়া দিয়া বলিল—বরাত খুলল রে, আরও আরও টাকা মিলবে, বুঝলি আরও টাকা মিলবে।

—টাকা, এত টাকা কে দিলে?

ফকীর ললাট ঠুকিয়া বলিল—আল্লা। আজ ছোবান মিঞা ও সমসের আলির সঙ্গে দেখা।

ছোবান ও সমসেরের নাম শুনিয়া ফুলজানের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

ফকীর উৎসাহভরে বলিয়া চলিল—ছোবান মিঞা ও সমসের আলি ভারি ভালমানুষ—না রে! এ ঘোর কলিযুগে এমন ভালমানুষ মেলে না।

ফুলজান কোন কথা কহিতে পারিল না। জীর্ণশীর্ণ মুখে যে সামান্য রক্তটুকু ছিল তাহাও যেন মিলাইয়া গিয়াছে। কণ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা জড় হইয়া পড়িয়াছে, অদৃশ্য আতঙ্কে বুকটা দুর্ দুর্ করিতেছে। যে উৎসাহভরে রান্না চড়াইয়াছিল তাহা আর রহিল না।

ফকীর পুনরায় তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—আমাদের এত দুঃখ আর থাকবে না, বুঝলি। নগদ আরও এগার টাকা দেবে, মাসে মাসে এক টাকা ক'রে দেবে—আর আমাদের ভাবনা কি বল?

ফুলজান হঠাৎ ভিক্ষার ঝুলিটা ঠেলিয়া দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—না তা হবে না, ছেলে বিক্রি আমি করব না, এমন টাকায় আমি লাথি মারি।

ফকীর অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কোন জবাব দিতে কিংবা কোন অনুরোধ করিতে সাহস পাইল না।

ফুলজান উনুন হইতে জ্বলন্ত চেলাকাঠগুলি তুলিয়া ফেলিয়া বিছানায় গিয়া সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল।

ফকীর ফুলজানকে ঘাঁটাইতে সাহস পাইল না। ফুলজানের দিকে একবার ভীত নয়নে তাকাইয়া চাল-ডাল-তরকারিগুলির দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া রহিল।

শেষ পর্য্যন্ত ফুলজানকে স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। পুরুষের যুক্তিতর্কের নিকট সে একা কত আর পারে। ফুলজান টাকাকড়ি চায় না, সুখ চায় না—সন্তান যদি সুখী হয়, ভাল ভাবে খাইয়া পরিয়া মানুষ হইতে পারে তবেই সে সুখী। ফুলজান মনে মনে বলে—আল্লা, যত দুঃখই পাই না কেন হাসিমুখে সব সইব, সন্তানের কোন ক্ষতিই আমি মা হয়ে করব না। তুমি আমায় বহু সন্তানই দিয়েছিলে। স্বার্থপর হয়ে শেষ সন্তানের অমঙ্গল আর আমি ডেকে আনব না। ও যাক, সুখে স্বচ্ছন্দে খেয়ে-প'রে বড় হোক, ও সুখী হলেই আমি সুখী। আল্লা তুমি ওকে দেখো।

কিন্তু বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া ফুলজান আত্মসংবরণ করিতে পারে না। চঞ্চল প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, চোখ বাহিয়া জলধারা নামে। সন্তানকে শত শত চুম্বনে চঞ্চল করিয়া তুলে, বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সন্তানকে কাঁদাইয়া নিজে কাঁদিয়া ভাসায়।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ছোবান মিঞা ও সমসের আলি আসিয়া পাওনা টাকাকড়ি মিটাইয়া দিয়া পীরচাঁদকে লইয়া গেল।

ফুলজান চীৎকার করিয়া কাঁদিল না, কোন বাধাও দিল না। অন্ধকার ঘরের ঘুপচি কোণটায় অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিল। কাহারও কোন কথায় সাড়া দিল না, কোন শব্দও করিল না, জড়পিণ্ডের মত যেন পড়িয়া রহিল। শুধু দেখিয়া মনে হয়, যূপকাষ্ঠের পাঁঠার মতই অসহায় হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। চোখ হইতে শুধু টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

গতিশীল কালস্রোতে মানুষের পরিবর্ত্তন হয়। ফকীরেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু ফুলজানের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। যতই দিন যায় ততই যেন বিচ্ছেদটা মর্ম্মন্তুদ ও অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। কল্পিত ভয় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে অকারণে চমকিয়া উঠে, সারাক্ষণ অজানা ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপে। বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, চোখের জ্যোতিও যেন স্তিমিত হইয়া পড়িতেছে।

এক দিন। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। জাফর ফকীর বহুক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফুলজানের চোখে ঘুম নাই। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে, আবার কিসের শঙ্কায় যেন বার-বার চমকিয়া জাগিয়া উঠে। শত চেষ্টাতেও ঘুম আসিতেছে না, ফুলজান এপাশ-ওপাশ করিয়া কেবলই ছটফট করিতেছে।

শেষরাত্রিই হইবে। খানিকক্ষণ হয় ফুলজানের চোখের পাতা মাত্র বুজিয়াছে, হঠাৎ সন্তানের চীৎকারে চমকিয়া উঠিল। আবার সে পীরচাঁদের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল, ছোবান মিঞা ও সমসের আলি শয়তানের মত পীরচাঁদের মুখ চাপিয়া ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার হাত-পা ভাঙিতেছে। উঃ! ফুলজান শত চেষ্টাতেও পীরচাঁদকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। না, সে কিছুতেই আপন সন্তানকে শয়তানদের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। ফুলজানের অসহায় অবস্থায় শরীর যেন শিথিল হইয়া পড়িল, শরীরে রক্ত বরফ শীতল হইয়া গেল, কণ্ঠস্বর বুজিয়া গেল। ফুলজান গোঁ গোঁ স্বরে গোঙাইতে গোঙাইতে ছোবান মিঞার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

জাফর ফকীর লাফাইয়া উঠিয়া ফুলজানকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল—করছিস কি, আর 'একটু হ'লে দম আটকে মরতাম।

ফুলজানের তখনও স্বপ্নের ঘোর কাটে নাই, জড়িত কণ্ঠে বলিল—আমার ছেলে—আমার ছেলে!

৩

নদীর তীরে মেলা বসিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে কত দোকানপাট, দোকানে দোকানে কত বিচিত্র ধরণের জিনিসপত্র। কত শত-সহস্র নরনারী দোকানে দোকানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালক-বালিকার চেঁচামেচি, নানা রকম বাঁশির শব্দ, দোকানীদের বক্তৃতা প্রভৃতিতে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

কোথাও ম্যাজিক-প্রদর্শনের তাঁবু খাটান হইয়াছে, কোথাও ম্যাজিক-লণ্ঠনের বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে, কোথাও শিল্পপ্রদর্শনী, কোথায়ও গান-বাজনার আসর, কোথাও বা বিচিত্র জীবজন্তুর প্রদর্শনী।

রাস্তার দুই পাশে কত ভিক্ষুক ও ফকীর ভিড় জমাইয়াছে এবং গাছের নীচে কত সাধু-সন্ন্যাসী ও অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ মানবজাতির কল্যাণের জন্য দয়াপরবশ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

জাফর ফকীর ও ফুলজান বহু দূর হইতে এই মেলায় আসিয়াছে। ফকীর আর চলিতে পারে না, বলে—ফুলজান আর পারি নে, চল্ এবার গাছতলায় একটু ব'সে জিরিয়ে নি। উঃ এবার, কি জাড়ই না পড়েছে—হাড়ে কাঁপুনি লেগে গেছে।

ফুলজানও চলিতে পারিতেছে না। শীতে তাহার হাত-পা অবশ হইয়া গিয়াছে, তবু জোর করিয়া বলে—না, আর একটু এগোই। এক বার বসলে আর ওঠা যাবে না। ঐ ত মেলায় এসে গেছি।

ধীরে ধীরে তাহারা মেলায় আসিয়া পৌছিল। জাফর ফকীর একটা গাছের নীচে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর আমি একটুও নড়ব না। না, কিছুতেই নয়। উঃ, তোর জেদে পড়ে মরে গেছি আমি। শরীরে আর কিছু নেই।

ফুলজান বসিল না, শুধু স্থির হইয়া একটু দাঁড়াইল। সত্যই তাহাদের পক্ষে আর হাঁটা সম্ভবপর নয়। ফুলজান স্বামীর কাতর মুখের দিকে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেল, পুনরায় অনুরোধ করিতে সে পারিল না, অনুরোধ করিতে গিয়া হৃদয় তাহার কাঁদিয়া উঠিল।

ফকীর গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বলিল—এ ভিড়ের মধ্যে কি পাবে—পাবে না। এক বছর ধরে এত খোঁজা খুঁজছি, কোথাও ওদের সন্ধান পাই নি। কাল ভাল ক'রে খোঁজা যাবে; এখন এখানে বস দিকি। বহু লোক তীর্থ করতে এসেছে, খাওয়ার ভাবনা কি।

ফুলজান বসিল না, বলিল—তুমি এই গাছের নীচে ব'সে থাক, আমি এখনই একটু ঘুরে আসছি। বেশী দেরি হবে না, তুমি এই মুড়ি-মুড়কিগুলো খাও।

ফকীর বলিল—দেরি করিস নে। যে জাড় পড়েছে, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে তো।

ফুলজান মৌন সম্মতি দিয়া মুহূর্ত্তে ভিড়ের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

ফুলজান চলিয়াছে। ভিড়ের মধ্যে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া উন্মাদিনীর মত চলিয়াছে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এই মেলাতেই সে পীরচাঁদের দেখা পাইবে। চলিতে চলিতে হঠাৎ কোন বালক-বালিকার কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠে, শঙ্কিত নয়নে থমকিয়া দাঁড়ায়। পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে, আবার থমকিয়া দাঁড়ায়।

'মাগো, অন্ধ আতুরকে দয়া ক'রে একটি পয়সা দিন মা।'

শিশুর কণ্ঠস্বরে জননীর প্রাণ চমকিয়া উঠিল। আহা, এত করুণ স্বরে কোন্ অনাথ শিশু ভিক্ষা চাহিতেছে!

ফুলজান চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রাস্তার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল চাকা-লাগান ছোট ছোট কাঠের বাক্স। বাক্সের মধ্যে যত বিকলাঙ্গ বালক-বালিকা, মনে হয় ব্যর্থ সৃষ্টির নির্ম্মম পরিহাস। ইহাদের দৃশ্য কারুণ্যকে ছাপাইয়া উঠে বিভীষিকায়।

পুনরায় আর একটি বালক চেঁচাইয়া উঠিল—মাগো, দয়া ক'রে খেতে দিন। দু দিন ধরে খেতে পাই নি—বড় দুঃখী মাগো।

ফুলজান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বালকটির প্রতি তাকাইল। ছোট বাক্সে দুইটি বালককে জড়পিণ্ডের ন্যায় যেন ঠাসিয়া ভরিয়া রাখা হইয়াছে, অতি কষ্টেও নড়িতে চড়িতে পারিতেছে না।

বালকটি অতি করুণ স্বরে বলিল—দুঃখীজনে দয়া করুন মা, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন। হাত-পা নেই মা, বড় কষ্ট পাই মা···

ফুলজান আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। শরীর তাহার কাঁপিতেছে। 'আল্লা' বলিয়া কাতর ধ্বনি করিয়া উঠিল।

অন্ধ-আতুরদের যাহারা বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন মন্তব্য করিয়া উঠিল—পাগলী!

পাগলী! পাগলী!—ফুলজান বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—পাগলী! ডাকাতেরা আমার ছেলেকে চুরি ক'রে এনে হাত-পা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। শয়তান, খুনী, আমি তোদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাব।

ফুলজান হিংস্র ব্যাঘ্রিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িল।

লোকগুলি 'পাগলী' 'পাগলী' বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ফুলজান 'আমার ছেলে', 'আমার ছেলে' চীৎকার করিয়া পীরচাঁদকে বক্ষে জড়াইয়া লইল। দুর্ব্বল শরীরে এত উত্তেজনা সহ্য হইল না, ফুলজান পীরচাঁদকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

লোকগুলি তখনও বলাবলি করিতেছে—একেবারে ক্ষ্যাপা পাগলী!



বিপ্লব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল
ছিন্ন করে দিল তার ছন্দ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী

হে নর্তিনী,
বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ;
বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী।
সীমন্তের সীঁথি তব প্রবালে খচিত কণ্ঠহার
অন্ধকারে মগ্ন হোলো চৌদিকে বিক্ষিপ্ত অলংকার।
আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ,
ভীষণ রিক্ততা তার
উৎসুক চক্ষুর পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার।
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে, মুগ্ধ হস্তে গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিতদলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হোত রসের প্লাবন,
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিছে উদ্‌যাপন।

যে অভিসারের পথে চেলাঞ্চলখানি
নিতে টানি
কম্পিত প্রদীপশিখা 'পরে
তার চিহ্ন পদপাতে লুপ্ত করি দিলে চিরতরে ;
প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে।

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারি হিংস্র সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি সম।

তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রুর বালুকারে।

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে
তীব্র রস দিতে ঢালি রজনীর অনিদ্র কৌতুকে
যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।
প্রেমেরি সে দানখানি, সে যেন কেতকী
রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,
বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে,
যেখানে উল্কার আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে।

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথ গগনে,
হে নির্দয়া, কী সংকেতে বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে

কবিতা]

উদ্বোধন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুকতারকার প্রথম প্রদীপ হাতে
অরুণ-আভাস-জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু তোমারে জাগাব বলে
তরুণ আলোর কোলে,—
যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,—
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি
মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী-ডালি।

জাগে সুন্দর জাগে নির্মল জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহ আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।

শতদল]

রবিবারী সংস্করণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ হোলো রবিবার,—খুব মোটা বহরের
কাগজের এডিশন ;—যত আছে শহরের
কানাকানি, যত আছে আজগবি সংবাদ
যায় নিকো কোনোটার একটুও রং বাদ।
"বার্তাকু" লিখে দিল, "গুজরানওয়ালায়
দলে দলে জোট করে পাঞ্জাবী গোয়ালায়।
বলে তারা গোরু পোষা গ্রাম্য এ কারবার
প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
স্তূপ রচা দুই বেলা খড়-ভূষি-ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুল-মাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
অন্তর্ভুক্ত হবে বই-গেলা বিদ্যের।
যত অভ্যেস আছে ল্যাজ ম'লে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো।"

"গদাধরে" রেগে লেখে "এ কেমন ঠাট্টা!
'বার্তাকু' পরে পরে সাতটা কি আটটা
যা লিখেছে সব ক'টা সমাজের বিরোধী,
মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি।
সেদিন সে লিখেছিল, ঘুঁটে চাই চালানো,
শহরের ঘরে ঘরে ঘুঁটে হোক জ্বালানো,
কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে
ঝড়িয়াকে করে দিক একদম দেউলে।
সিনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী
শহরের বুকে জুড়ে আছে যেন হেঁয়ালি।
ঘুঁটে দিয়ে ভবা হোক, এই এক ফতোয়ায়
এক দিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয়।
গোয়ালারা চোনা যদি জমা করে গামলায়
কত টাকা বাঁচে তবে জল দেওয়া মামলায়।
"বার্তাকু" কাগজের ব্যঙ্গে যে গা জ্বলে,
সুন্দর মুখ পেলে ল্যাপে ওরা কাজলে।
এ সকল বিদ্রূপে বুদ্ধি যে খেলো হয়,
এ দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়।"
"গদাধর" কাগজের ধমকানি থামল,
হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল।
বলে, "ভায়া এ জগতে ঠাট্টা সে ঠাট্টাই।
গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।
মাস্টার না হয়ে যে হোলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।
এডুকেশনের পথে হয় নি যে মতি তব
এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব।"

অবশেষে এ দুখানা কাগজের আসরে
বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে।

বঙ্গলক্ষ্মী]

লেখন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

বড়ো কাজ নিজে বহে
আপনার ভার
বড়ো দুঃখ নিয়ে আসে
সান্ত্বনা তাহার
ছোটো কাজ ছোটো ক্ষতি
ছোটো দুঃখ যত
বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ
করে কণ্ঠাগত।

২

না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়
পুরাতে পার না তাও
কেমনে বহিবে চাও যত কিছু
সব যদি তার পাও।

৩

যশের বোঝা তুলিয়া লয়ে কাধে
নামটা মোর মরে মরুক ঘুরে
মনটা আমার যেন অপ্রমাদে
শান্ত হয়ে রহে অনেক দূরে।

৪

দুঃখ এড়াবার আশা নাই এ জীবনে
দুঃখ সহিবার শক্তি যেন পাই মনে।

৫

যতক্ষণ থাকে মেঘ
শূন্য পটে নাম রহে লেখা
যখন সে চলে যায়
মুছে দিয়ে যায় সব রেখা।

৬

মনে রেখো দৈনিক
চা খাইবে চৈনিক
গায়ে যদি জোর পাও
হবে অবৈসৈনিক।
জাপানীরা যদি আসে
চিঁড়ে নিক দই নিক,
আধুনিক কবিদের
যত পারে বই নিক।

৭

অরুন্ধতী পরুন ধুতি
বশিষ্ঠকে পরিয়ে দিয়ে শাড়ি
জমদগ্নি অভিমানে পালকি চ'ড়ে
যান না বাপের বাড়ি।

শনিবারের চিঠি]

এণ্ডরুজ-স্মৃতি

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

সে আজ প্রায় ২৬।২৭ বছর পূর্ব্বেকার কথা।...আশ্রমের একটি খোড়ো ঘরে এণ্ডরুজ সাহেব নিলেন আশ্রয়, ছেলেদের সঙ্গে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেসব নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হ'ত, তৎকালীন শিক্ষক এবং ছাত্রদের সে-সব নিয়মাদি পালনের চেষ্টা তিনি করতেন প্রাণপণ, ধুতি পরতে জানেন না, তবু ধুতি পরা চাই, অনভ্যস্ত কাজকর্ম্ম ক'রে সর্ব্ববিষয়ে আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। সৌজন্যরক্ষার দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে বাইরে আমরা ঘনিষ্ঠ ভাব প্রদর্শনের চেষ্টা করলেও তাঁকে আমাদের বিশ্বাস এবং প্রীতির অন্তঃপুরেও গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের অধিকাংশের এই মনোভাব বুঝতে পেরে কবি একদিন আশ্রমবাসীদের সভায় এণ্ডরুজ সাহেবের মহত্ত্বের পরিচয় বুঝিয়ে বলেছিলেন। তার কতদিন পরে ঠিক জানিনে, আশ্রমের একটি সভায় তৎকালীন আশ্রমের কর্ণধার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আশ্রমের কাজকর্ম্ম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে, শিক্ষক এবং কর্ম্মীদের আলোচনা হচ্ছিল। সভায় এণ্ডরুজ সাহেব উপস্থিত হ'তেই মহাত্মা গান্ধী, সরল এবং সহজভাবে সভাস্থলে তাঁর থাকার অন্তরায় আছে, একথা তাঁকে বলে দিলেন। শুধু তাই নয়, স্পষ্টভাবে এ-কথাও তিনি এণ্ডরুজ সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আশ্রমবাসী অধিকাংশের তিনি বিশ্বাসভাজন নন। মহাত্মাজী ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সত্যি কথা বলবার লোক নন, তিনি সত্যকে সত্যভাবে

নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে, দৃঢ়ভাবে অথচ সম্পূর্ণ ভদ্রভাবেই এণ্ড্রুজ সাহেবকে বলেছিলেন। আশ্রমগতপ্রাণ এণ্ড্রুজ সাহেব সভা হ'তে গেলেন চলে, একটা অভাবিত আঘাত পেয়ে। সেদিন সমস্ত বিকেল তিনি পোষ্ট আপিসের রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তাঁর চোখে অশ্রু এসেছিল বারে বারে। ভাবা গিয়েছিল, এই ঘটনার পর তিনি আশ্রমের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করবেন। কিন্তু তা করলেন না।···

তার পর ধীরে ধীরে হলেন তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর ক্ষমা, তাঁর প্রেম মুগ্ধ করে দিলে আমাদের। যখন আশ্রমে গান্ধী-কর্তৃত্ব চলেছিল, সেই সময় দেখেছি এণ্ড্রুজ এবং পিয়ারসন ভৃত্যদের করণীয় কতকগুলি কঠিন কাজ করতে সুরু করে দিলেন, যথা—বাসন মাজা, কূপ হ'তে জল টানা ইত্যাদি। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিদ্বান অধ্যাপকদের দ্বারা এই সব কঠিন কাজ করানোতে গান্ধীজীর তো সঙ্কোচ ছিলই না, পক্ষান্তরে এঁরাও ঐ সব কাজ করাকে গৌরব এবং গর্ব্বের বিষয় মনে করেছিলেন। বেচারা ঐ দুটি সাহেবদের হাতে পড়তে লাগল ফোস্কা, মধ্যাহ্নে ধরতে লাগল মাথা, তবু তাঁরা এলিয়ে পড়বার পাত্র নন। একটা আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করে তদনুযায়ী জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করবার সাধনায় রত হওয়ার শিক্ষা যেন এঁদের মজ্জাগত।···

তিনি সন্ন্যাসী। কিন্তু ছিলেন দাতা। শুধু সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করেন নি মানুষকে, অর্থ দিয়ে উপকার করেছেন অনেক অভাবীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস।···

কাজ করা ব্যাপারে তাঁর অসহিষ্ণুতা ছিল অত্যধিক। তুচ্ছ কাজকেও নেহাৎ জরুরী মনে করে নিয়ে তদনুযায়ী অস্থির হয়ে ওঠা এবং সেই উপলক্ষ্যে কাউকে যেখানে সাত দিন পরেও চিঠি লিখলে কোনো ক্ষতি হয় না, সে-ক্ষেত্রে তখনি আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম তাঁর করা চাই—শুধু তাই নয়, হাতের কাছে যদি ভৃত্য না থাকে তো তখনি ঝাঁঝাঁ-করা রৌদ্র মন্থন ক'রে ধুলোভরা অত্যন্ত গরম পথে খালিপায়ে দূরে পোষ্ট আপিসে গিয়ে সেই তার করে আসা-ই চাই। তারে লেখা আছে, "লেটার ফলোজ," (letter follows) সুতরাং তখনি পোষ্ট আপিস থেকে ফিরে এসেই সেই লেটার লেখা চাইই চাই, এবং বেলা চারটের সময় সেটা ডাকে ছাড়বার সময় থাকা সত্ত্বেও তখনি আবার সেই দুপুরে নিজে গিয়ে সেটা ডাকঘরে গিয়ে ডাকবাক্সে ছেড়ে আসা চাই—এমনি ছিল তাঁর প্রকৃতি। তাঁর এই স্বভাবের জন্য, বোঝাই আমাদের পক্ষে কঠিন হ'ত তাঁর কোন্ কাজটা জরুরী আর কোন্ কাজটা জরুরী নয়।

সৌজন্য ছিল অসাধারণ। যে কেউ হোক না কেন, তার আর্থিক অবস্থা অতি দীন, বাড়ীর স্থিতি পচাগলির মধ্যে, ভোজ্যের আয়োজন অবাঞ্ছনীয়—তবু সেই ব্যক্তির নিমন্ত্রণ রক্ষা তিনি পারতপক্ষে করতেন এবং সে খাবার খেলে তিনি বিপদে পড়বেন জেনেও, নিমন্ত্রণকারীর দেওয়া ভোজ্য হাস্যমুখে প্রসন্ন চিত্তে খেতেন।

কারো প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে ফেললে, তার পর, সেজন্য তাঁর আর অনুশোচনার অবধি থাকত না। যখন মহাত্মাজী শান্তিনিকেতনের কর্ণধার, সেই সময়, জনৈক আশ্রমবাসীর সঙ্গে এণ্ড্রুজ সাহেবের একটু কথাকাটি তর্কবিতর্ক হয়েছিল। উভয় পক্ষই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের ঐ তর্কযুদ্ধের বেমাত্রিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ঐ যুদ্ধের ঝড় শেষ হবার পর আশ্রমের তৎকালীন কর্তাব্যক্তিরা, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিরা একটি জরুরী মিটিং তলব করে ঐ যোদ্ধাদের মধ্যে কে প্রকৃত দোষী তার বিচার করবার আয়োজন করলেন। বিচার সুরু হব-হব করছে এমন সময় মহাত্মাজী সেই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে এণ্ড্রুজ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন "প্রিয় চারলি, ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছিলেম! যা ঘটেছিল, তার জন্য তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত, কেননা তুমি যার সঙ্গে বাক্য-ব্যাপারে উত্তেজিত হয়েছিলে, সে তোমার চেয়ে অনেক ছোট, নেহাৎ সে যুবক। দ্বিতীয়ত, তোমার ক্রোধের কারণ হয়ত সঙ্গত ছিল কিন্তু তার প্রকাশ উদ্ধত হয়েছিল। সেই ঔদ্ধত্যের জন্য যদি অপর পক্ষ তোমার মধ্যে শাসক-জাতির মতিগতি বর্ত্তমান আছে কল্পনা ক'রে নিজেকে শাসিত-জাতের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনায় ব্যথিত হয়ে পালটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, সেটা খুব স্বাভাবিক। তোমার বিপক্ষের আচরণ আমি সমর্থন করি না, কিন্তু তার সাহস ও আত্ম-সম্মানবোধের আমি প্রশংসা করি। আমার মনে হয় তোমার তরফ থেকে তার কাছে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" এণ্ড্রুজ সাহেব আর কোন কথা না ব'লে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, কাতর মুখে সেই যুবকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি অন্যায় করেছি, আমাকে সরল ভাবে ক্ষমা কর, করজোড়ে ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা কর।" যুবকটি সত্যি সাহেবকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করত, সে বেচারাও একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি এণ্ড্রুজ সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে বললে, "আমাকে ক্ষমা করুন, যা হয়ে গেছে তার জন্য আমি লজ্জিত।" তখনকার মতন মনে হয়েছিল, সব মিটে গেল। কিন্তু হঠাৎ বিকেলের দিকে, আশ্রমবাসী সকলকে এক জায়গায় সমবেত করবার ঘণ্টা বেজে উঠল। সকলে আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হ'তেই দেখা গেল এণ্ড্রুজ সাহেব সেখানে উপস্থিত। তিনি সমবেত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন "আজ প্রাতঃকালে আপনাদের অগোচরে আমি অমুকের প্রতি উদ্ধত আচরণ করেছি, সেজন্য আমি লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। যদিও বিশেষ কয়েকজনের সম্মুখে সকালেই আমার কৃত কর্ম্মের জন্য সেই যুবকের কাছে ক্ষমা চেয়েছি, তবু আমার মনে হচ্ছে আপনাদের সকলের কাছে প্রকাশ্যে পুনরায় অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইলে সত্যিকার ক্ষমা চাওয়া হবে।" এর পরও তাঁর প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'ল না। তার পরদিন প্রাতে তিনি সেই যুবকের ডরমিটরীতে উপস্থিত হলেন তাঁর বিছানাপত্র নিয়ে। সেই যুবককে বললেন, "আমি থাকব এই ঘরে তোমার সহযোগী হয়ে আর দুই বেলা দেব এই ঘর ঝাড়ু; শুধু ঘরের ময়লা তাতে যাবে না, সেই সঙ্গে নিজের মনের গোপনে সঞ্চিত, গর্ব্বের আবর্জ্জনাও পরিষ্কার করব।"···

দেশ]

জন্মদিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে
লক্ষ কোটি নক্ষত্রের
অগ্নি-নির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্থলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।
এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হ'তে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থর গমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী;
অপূর্ব্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে

অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা,
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্য নিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য প্রদক্ষিণ
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে॥

২

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনা-মন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে,—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে এক দিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হ'তে
নারায়ণী এ ধরণী
যার আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ
যাহাতে প্রত্যক্ষ হ'ল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও॥

৩

অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।

একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরী
নমস্কার সহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন ক্ষণে
প্রস্তর-আসনে বসি,
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর,
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।
সেই বর, মানুষেরে সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্রে খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান॥

বৈশাখ, ১৩৪৭

জন্মমৃত্যু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে,
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী ক'রে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিম সীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।
সে মহিমা উদ্বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে॥

মংপু, বৈশাখ, ১৩৪৭

অনন্ত আমি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে কালো ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জড়ের কবলে
জীবনের স্বর্গীয় অমৃত,
নিত্য জ্যোতি তার,
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

প্রেমের অসীম মূল্য সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহাগহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

সব চেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিনু যারে
সব চেয়ে মিথ্যা ছিল
তারি মধ্যে ছদ্মবেশ ধরি
অস্তিত্বের এ-কলঙ্ক
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে বলে
সেই তার আমি,
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
অনন্ত আমির সত্যে সত্য সে যে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

২৫ বৈশাখ
১৩৪৭

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় মহাকোষ—দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪শ সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। কলিকাতার ১৭০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটস্থিত ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট হইতে প্রকাশিত।

এ যাবৎ এই মহাকোষটি পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রধান সম্পাদক কে হইয়াছেন বা হইবেন, জানিতে পারি নাই। তবে, সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাকোষটির সঙ্কলনকার্য্য সমাপ্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যদিও উহার মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশে কয়েক বৎসর সময় লাগিতে পারে।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম শব্দ 'অনিঃসরণ'; শেষ দুই পৃষ্ঠায় 'অনুপলব্ধি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, আগামী সংখ্যায় তাহা সমাপ্ত হইবে। এই সংখ্যায় অন্য যে-যে প্রধান শব্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা 'অনিদ্রা', 'অনিরুদ্ধ', 'অনিলভদ্র', 'অনু', ও 'অনুগীতা'।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা।

এই বৃহৎ বাংলা অভিধানখানির ৬৬তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ 'বিধায়ক' এবং শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২১০০।

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনন্যকর্মা হইয়া অনেক বৎসর ধরিয়া এই অভিধানখানির পাণ্ডুলিপি একাধিক বার সমাপ্ত করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ সংশোধন ও সংযোজনের ইচ্ছায় ও প্রয়োজনে তাহা আবার লিখিতেছেন, এবং আধুনিকতম পাণ্ডুলিপিও প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। লেখা চলিতেছে, মুদ্রাঙ্কণও চলিতেছে। এরূপ অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা বিরল।

প্রফুল্ল প্রশস্তি—শ্রীশেফালিকা শেঠ। প্রকাশক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শেঠ, ২১৫ পার্ক ষ্ট্রীট, সার্কাস পোঃ আঃ, কলিকাতা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে এই কবিতা পুস্তিকাটি রচিত হইয়াছিল। ইহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আচার্য্য মহাশয়ের চরিত্র এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানবিস্তার, দেশহিতসাধন ও জনসেবাকল্পে তাঁহার বহুবিধ কার্য্য পদ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। রচনাটি শুধু পদ্য নহে, ইহাতে কবিত্বও আছে। এবং ইহা যে অকৃত্রিমশ্রদ্ধাপ্রসূত তাহাও সুস্পষ্ট।

বিক্রমপুরের ইতিহাস—(প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত)। প্রথম খণ্ড। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। চিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত, পি.৬৫১এ, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা। ডিমাই আটপেজী ১৮৶+৩৭০+২৮ পৃষ্ঠা। তদ্ভিন্ন ৩৭টি চিত্র ও ২টি মানচিত্র আছে। কাগজের মোটা পাটা ও কাপড়ে বাঁধান।

এই বহুশ্রমসাধ্য ও মূল্যবান্ পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন পরিবর্দ্ধিত আকারে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। বিক্রমপুর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে এবং যাহার সন্ধান লেখক পাইয়াছেন, সমস্তই তিনি অধ্যয়ন করিয়া কাজে লাগাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি নানাঃস্থানে ভ্রমণ করিয়া ও চিঠিপত্র লিখিয়া অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেগুলিও কাজে লাগিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রাচীন গৌরব বিবেচনা করিলে ইহার ইতিহাস বাংলা দেশের এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রয়োজনীয় অংশ। এই জন্য ইহা লিখিবার ও অধ্যয়ন করিবার যোগ্য। আধুনিক সময়েও বিক্রমপুর বহু শিক্ষিত ও কৃতী ব্যক্তির জন্মস্থান। এখনও বিক্রমপুর কেন এই গৌরবের অধিকারী, তাহা তাহার ইতিহাস হইতে বুঝা যায়।

বিক্রমপুরের ইতিহাসের এই প্রথম খণ্ডে নয়টি অধ্যায় আছে। যথা:—প্রথম অধ্যায়, বঙ্গদেশ ও বিক্রমপুর; দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রকৃতি-পরিচয়, তৃতীয় অধ্যায়, জনসংখ্যা, জাতি ও ধর্ম; চতুর্থ অধ্যায়, প্রাচীন ইতিহাস; পঞ্চম অধ্যায়, স্বাধীন বঙ্গরাজা—রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর; ষষ্ঠ অধ্যায়, বিক্রমপুরে স্বাধীন বর্মরাজগণ—রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর; সপ্তম অধ্যায়, স্বাধীন সেন-রাজবংশ—বিজয়সেন—বিক্রমপুর; অষ্টম অধ্যায়, সেন-রাজত্বের শেষ যুগ—মুসলমান-বিজয়; নবম অধ্যায়, রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর—রামপাল।

গ্রন্থখানি পুরু কাগজে ছাপা। সমুদয় ছবি মসৃণ পুরু কাগজে স্বতন্ত্র মুদ্রিত।

ড.

তীর্থঙ্কর—শ্রীদিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—কালচার পাবলিশার্স, ২৫।এ বকুলবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ২৸০।

রোমা রোলাঁ, মহাত্মা গান্ধী, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ—এই পাঁচ জন মনীষী ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকালে গ্রন্থকারের যে-সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সেইগুলি আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু দিলীপকুমারের প্রশ্ন-পরম্পরায় উক্ত মনস্বী ব্যক্তিরা শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, মানব-সমাজ, মানব-মন ও অতি-মানস লোকের বহু সমস্যার ব্যবচ্ছেদ, বিচার ও বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন অপূর্ব্বসুন্দর বাঙ্গলায়। এই তত্ত্বালোচনা নূতন আলোকপাত করিয়া বহু দিক্‌ভ্রান্ত পথিককে অকূলে পথনির্দ্দেশ করিবে।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

বুকের বীণা—শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। ৭৫ নং বংশী গলি, বারাণসী, হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০; বাঁধাই ১।০ টাকা। পৃ. ১৪৪।

এই কবিতা-গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক তাঁহার দীনতা ও অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আশা করি, এগুলির কাব্যমূল্য সম্বন্ধে তাঁহারও কোন অযথা উচ্চ ধারণা নাই। কবিতাগুলির ভাব ও ভাষা বৈশিষ্ট্যহীন। গ্রন্থারম্ভে কবির ফটো-চিত্র না দিলেই সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইত।

প্রাথমিকা—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীমোহিত-লাল গঙ্গোপাধ্যায়। আলাপনী রসচক্র, রাজদিয়া, ঢাকা। মূল্য ১৲, ১৷৹, ১৷৹ টাকা।

ভূমিকা পড়িয়া মনে হইল, কবি নিরভিমান। এইখানি তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থ। ভাব, ভাষা ও ছন্দের উপর কবির অনেকটা অধিকার আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র এই তিনের যথাযোগ্য সমন্বয় হয় নাই। 'পশ্চিমা বাতাস'—শেলীর বিখ্যাত 'ওড্ টু দি ওয়েষ্ট উইণ্ড'-এর অনুবাদ। এরূপ কবিতার অনুবাদ করা খুব কঠিন। আলোচ্য অনুবাদটির প্রথমাংশ অস্পষ্ট লাগিল, কিন্তু 'অগ্নিশর্ম্মা হে ঋষি দুর্ব্বাসা' বা 'স্থবিরতা-তিষ্ঠান-প্রয়াসী' প্রভৃতি বাক্যাংশ বড়ই শ্রুতিকটু মনে হইল। সুদীর্ঘ শুদ্ধি-তালিকা অগৌরবের বিষয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূর্য্যোদয়—শ্রীসুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোঃ লিঃ। ১বি, রসা রোড। মূল্য ১৷৹ টাকা।

গল্পের বই। সাতটি গল্প আছে। সমস্তগুলি ঠিক গল্পের পর্য্যায়ে উঠিতে পারে নাই, কিন্তু তাহা হইলেও সবগুলিরই মধ্যেই এক একটি পরিপূর্ণ সুর মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন, কিন্তু তাঁহার এই প্রথম বইখানিতেই আমাদের আশান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার লেখাগুলি লিরিক-জাতীয়; একটা চমৎকার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে এবং প্রকাশ করিবার ভঙ্গীটি এমন যে পাঠককেও নিজের দৃষ্টি-কোণের সঙ্গী করিয়া লন।

বইখানি রসিক সমাজকে আনন্দ দিবে।

হে কিশোর চিত্ত—শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়। "কথাতীর্থ", ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

উপন্যাস। বইখানির প্রথমাংশে লেখক বেশ ধীর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া পাত্রপাত্রীদের মনের গতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরে দ্বিতীয়ার্দ্ধে বহু ঘটনা তাড়াতাড়ি একের পর একটি আনিয়া ফেলিয়া উপন্যাসের পরিণতি ঘটাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে একটু লয় কাটিয়াছে। এইটুকু ত্রুটি সত্ত্বেও বইখানি ভাল লাগিল। সব চরিত্রেরই নিজের বিশেষত্ব আছে। লেখকের ভাষাও বেশ স্বচ্ছন্দগতি, এবং সংলাপের মধ্য দিয়া বেশ সজীবতা এবং বুদ্ধির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষার্দ্ধের অংশটুকুর জন্য আরও কিছু জায়গা দিলে বইখানি সুসমঞ্জস হইতে পারিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আর না—শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.। প্রকাশক—শ্রীতিনকড়ি মিত্র, গোবর্দ্ধনপুর, পোঃ বাগনান, হাওড়া। মূল্য ২৲।

রবীন্দ্র-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কবিতায় একটা সহজ নিরভিমান সুর ছিল—এই সুরের পরিচয় পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায় প্রভৃতির কবিতায়। এত কাল পরে সেই সুরে রচিত কবিতা প্রকাশ করিয়া লেখক সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কবিতাগুলি সরলতার জন্যই মিষ্ট লাগিল।

কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, সাদা বাংলায় অকপটে বলিয়াছেন, ভাষার দ্যুতি ও সৌষ্ঠবে বক্তব্যকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া পাঠকের চক্ষু ধাঁধাইবার চেষ্টা করেন নাই। অভিজাত ভাষাসমৃদ্ধ কবিতার প্রতি অতিরিক্ত মোহ যে-পাঠকদের নাই তাঁহারা এই বই পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। গানগুলি প্রায় সমস্তই ভক্তিরসাশ্রিত।

দুই টাকা দাম বেশী হইয়াছে।

শ্রীঅমূল্যকুমার দাসগুপ্ত

বধূ অমিতা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৪৯। মূল্য ১৷৹ টাকা।

'বধূ অমিতা'র চরিত্রগুলি সজীব এবং বিভিন্ন হইলেও সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট নয়। তাহাদের মনোরাজ্যের সংবাদ এবং সংঘাত অধিকাংশ স্থলেই পাঠককে অনুমান করিয়া লইতে হয়। লেখায় তাহাদের সাক্ষাৎ অতি অল্পই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নায়ক সলিলের সাহিত্যিক ও অন্যান্য মতামত প্রকাশের আধিক্যে গল্পের গতি অতি মন্থর। আরও মনে হয়, লেখক যে সমস্যার অবতারণা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণরূপ ও পরিণতির পূর্ব্বেই পুস্তকের সমাপ্তি হইয়াছে। প্রকৃত সমস্যার আরম্ভ ও রূপ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যার শেষ চিত্র আঁকা হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উপনিষদ্ রহস্য বা গীতায় যৌগিক ব্যাখ্যা—অষ্টম খণ্ড, শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেব শর্ম্মা। শ্রীগুরু মন্দির, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া হইতে প্রকাশিত।

এই খণ্ডে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ ধ্যানযোগের যৌগিক ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মখণ্ডে অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিয়াছেন। ধ্যানের পূর্ব্বাবস্থা কি, সাধক কখন ধ্যানে সিদ্ধি-লাভ করেন, ধ্যানযোগ ও অধ্যাত্মযোগ যে একই জিনিষ, গ্রন্থকার তাহা পরিষ্কার রূপে এই খণ্ডে বুঝাইয়াছেন। যদিও যৌগিক প্রণালী আলোচনাকালে গ্রন্থের ভাষা মাঝে মাঝে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে, তথাপি যাঁহারা সাধনার সহিত গীতাকে জপস্বরূপ পাঠ করেন, তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিবৃত যৌগিক কৌশলের সঙ্কেত বুঝিবার কোন কষ্টই হইবে না।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

মলয়-যাত্রী—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল। বি. সিংহ এণ্ড কোং। ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹। পৃ. ২+১৬০, ৪০ খানি ছবি।

লেখক সবান্ধবে ব্রহ্ম এবং মালয় দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বইখানিতে তাহারই কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভ্রমণের নেশাই প্রধান ছিল বলিয়া লেখার মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপভোগ করিবার ভাবই বেশী। ব্রহ্ম এবং মালয়ের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার বর্ণনা গৌণভাবে স্থান পাইয়াছে। এই কাহিনী পড়িয়া যদি কাহারও চিত্তে মালয়ের অধিবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

পুস্তকখানির ভাষা লঘুগামী হইলেও স্থানে স্থানে পীড়া দেয়। ছবিগুলির ছাপা তেমন ভাল হয় নাই।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী—শ্যামানন্দ। গ্রন্থকার কর্তৃক রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত। পৃ. ৬২৪। মূল্য ২৸৹।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত-কথা পদ্যছন্দে লিখিত। ইহাতে তাঁহার জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথম ৫৭৪ পৃষ্ঠায় পদ্যে তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ, এবং শেষের ৫০ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্টে (ক) উপাদানসংগ্রহের পুস্তকাবলি, (খ) শুদ্ধিপত্র, (গ) শব্দার্থ সংগ্রহ, (ঘ) সময় নিরূপণ, (ঙ) সংযোগাবলি ও (চ) সাময়িক ধর্ম্মান্দোলন ও সঙ্ঘ লিখিত হইয়াছে। বইখানি ধর্ম্মপিপাসুগণের ধর্ম্মজীবনযাপনে সহায়তা করিবে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

অবশ্যম্ভাবী—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। পৃ. ৩২৫; মূল্য ২৲ টাকা। প্রকাশক কাত্যায়নী বুকষ্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাশ্চাত্য-জগতে বহু বিজ্ঞানবিদ্ উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস-জগতে বিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া সাহিত্যে এক অভিনব যুগ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। জীবন-লোকের দুর্জ্ঞেয় রহস্যজালকে বিজ্ঞানের রঞ্জনরশ্মির প্রখর তীক্ষ্ণ আঘাত ছিন্নভিন্ন করিয়া জীবনকে যাচাই করিয়া লইতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ কঠোর বাস্তববাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার নিজে এক জন বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার, কিন্তু উপন্যাস রচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানবিদের এই বাস্তবতান্ত্রিকতাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। জীবকোষের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও জীবনের মধ্যে সেই অনাদিকালের আদি-অন্তহীন রহস্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাহার হাতছানির ইঙ্গিতে মানুষ আপন সৃষ্টির আদি দিন হইতেই চিরন্তন পথিক রূপে পথচলা সুরু করিয়াছে, যে সত্যকে সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া জীবনদর্শন রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আজও পথ বাহিয়া চলিয়াছে। অবশ্যম্ভাবীর নায়ক রাসবিহারীও এক জন বিজ্ঞানবিদ্—নিজে সে এম-এসসি তবু সে দুঃখের আঘাতে চিরকেলে পথিকবৃত্তিকেই গ্রহণ করিয়াছে। ঘর ছাড়িয়া সে পথে পথেই ঘুরিতেছে অনাদিকালের পথিকের মত। পথে পথপার্শ্বে বিশ্রামরত কত পথিকের (অর্থাৎ তখনকার মত গৃহী) সহিত দেখা হয়—আত্মীয়তা গড়িয়া উঠে—বন্ধুত্ব জমিয়া উঠে; রাসবিহারী কয়েক দিন তাহাদের বাঁধনে বাঁধা পড়ে—আবার একদিন সে বাঁধন ছিঁড়িয়া পথে অগ্রসর হয়। মানুষের জীবন-রহস্যের গোপন প্রকৃতি নারী কিন্তু পথ চলে সংসারের মধ্য দিয়া—ঘরের আড়ালে আড়ালে তাহার পথ চলা; তাই প্রান্তরের পথের পথিক পুরুষকে সে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিয়া ঘরে বদ্ধ করিয়া নিজে আগাইয়া চলে। একই নারী কত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে রাসবিহারীর সম্মুখে আসিয়া এই ডাক দিয়াছে। সতী-মা গৌরী দীপ্তি লছমী প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে মায়াময়ীদের এক কথা—তাহারা বাঁধিতে চায়। অবশেষে এক দিন পথিক রাসবিহারী রহস্যের প্রান্তসীমার নাগাল না পাইয়া ক্লান্ত হয়, পরাজয় স্বীকার করে। সেদিন সে আপনার পরিত্যক্তা স্ত্রীর মধ্যে জীবনের দেখা সকল মায়াময়ীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারই কাছে ফিরিয়া তাহার বন্ধনকেই স্বীকার করে। নারীচরিত্রগুলির মধ্যে যেমন একটি প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তেমনি পুরুষ-চরিত্রগুলির মধ্যেও একটি তারেরই বিভিন্ন গ্রামের সুর ঝঙ্কারের সমতার রেশও সুন্দর ভাবে বজায় আছে। কোনটির সহিত কোনটির সাদৃশ্য নাই অথচ রক্তগত একটি আত্মীয়তা বেশ অনুভব করা যায়। ভাবসৌকুমার্য্যে বইখানি যেমন সুন্দর হইয়াছে, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে লেখক অনুরূপ সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়াছেন। ভাষা অতি পরিচ্ছন্ন এবং মিষ্ট, ফলে বইখানি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ—শ্রীকমলা দেবী এম-এ। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮৫। দামের উল্লেখ নাই।

লেখিকা বঙ্গজননীর দুই জন সুসন্তানের চরিত-কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, রচনা-ভঙ্গীও সুন্দর। লেখিকা স্বল্প পরিচয়ের মধ্যেও কেবল উচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় দেন নাই, বস্তু লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তবে এ ক্ষেত্রে দু-একটি ভ্রম নজরে পড়িল। লেখিকা বঙ্কিম-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, খ্রীঃ ১৮৫৭ সালে তিনি হুগলী কলেজ হইতে সীনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন।" বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬, এপ্রিল মাসে সীনিয়ার পরীক্ষা পাস করেন ও দুই বৎসরের জন্য মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন, ইহা শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী কলেজের নথিপত্র হইতে দেখাইয়াছেন। এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও পুস্তকখানি পাঠকসমাজে আদর লাভ করিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র এণ্ড ঘোষ, ২০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

সাধারণ বাঙালীর যুদ্ধ সম্বন্ধে ধারণা খবরের কাগজ পড়িয়া, এবং সিনেমা দেখিয়া। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের উৎসাহের অভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। যুদ্ধবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রামাণিক কোন বই বাংলা ভাষায় আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

সংবাদপত্র মারফৎ নূতন নূতন মারণাস্ত্র ও আত্মরক্ষার অস্ত্রের ভাসাভাসা বিবরণ পাইয়াছি। লেখক বিদেশী বই ও সাময়িক পত্রাদি হইতে বহু আয়াসে বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান প্রধান মারণাস্ত্রসমূহের খবর দিয়াছেন। সহজ ও সরল ভাষায় নানা কঠিন বিষয় সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোথাও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করেন নাই।

অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ সুমুদ্রিত ছবি দিয়া ব্যাখ্যা করা আছে। মোটের পর বইখানি অতি সময়োপযোগী হইয়াছে।

কয়েকটি জার্ম্মান শব্দের বাংলা প্রতিলিখনে ভুল চোখে পড়িল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে ভুলগুলি যথাযথ সংশোধিত হইবে।

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

ডোন কোজাক

ডক্টর শ্রীসত্যনারায়ণ

"এই তুর্কীটাকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলে? কি বিশ্রী মুখের রং! আরে, কি বে-ঢঙা কাপড় পরেছে! জীবনে যত তুর্কী তাতার মঙ্গোল দেখেছি—এ ত তাদের কারুরই মত নয়!"

এই ব'লে বুড়ো কোজাক (Cossack) বোরোদাতী করল আমায় অভ্যর্থনা। বুড়ো ছিল গত যুগের লোক। মাথার সব চুল শাদা। রেখাগুলো গভীর ব'লে অনেক দূর থেকেই তার মুখের লোল বলিগুলো দেখা যাচ্ছিল। কাছের জিনিস ছিল তার কাছে অস্পষ্ট, তাই কাউকে ঠিক ক'রে চিনতে হ'লে তাকে দু-তিন পা পিছনে সরে যেতে হ'ত। সম্ভবতঃ মুরুব্বিয়ানার এই সব লক্ষণের জন্যই ডোন প্রদেশের কোজাকেরা এর খুব খাতির করত।

বুড়ো আগে ছিল কোজাকদের সর্দার। যুবাবস্থায় যখন সে ঘোড়দৌড়ে ভাগ নিত, সব সময় সে হ'ত প্রথম। সঙ্গীদের খুশীর চোটে নাক হয়েছিল চ্যাপ্টা, আর উপরের ঠোঁটটা গিয়েছিল সঙীনের খোঁচায় কাটা, কিন্তু দাড়ি-গোঁফ বেশ বড় বড় ছিল ব'লে এ-সব বিশেষত্বগুলো নজরে পড়ত না। হাব-ভাব অতি সরল, চোখ নিষ্কপট, ছোট ছেলের মত হাসি। অট্টহাসি হাসার সময় চোখ দুটো হ'ত অন্তর্ধান। কাছে এসে আমার কাঁধ দুটো বেশ জোরে নাড়া দিয়ে বলল, "এ ত কোজাক হাড় নয়। আমাদের হাড় তোমাদের বয়সে ঘোড়ায় চড়তে চড়তে হ'ত কত শক্ত। তোমার হাড়গুলো যে দেখছি দেবদারু গাছের মত ঠুনকো।"

রোস্টোভের পার্টি-সেক্রেটারী এসেছিলেন আমায় সেখানে নিয়ে। তাঁর দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল— "তোমরা ত নিজেদের নাম রাখ বলশোই (বলশেভিক) যার মানে হচ্ছে বিশাল, প্রকাণ্ড, কিন্তু তোমরা সবাই দেখছি লিলিপুটিয়ান। ছিঃ, তোমাদের লজ্জা করে না?"

"যারা লেখাপড়া করে তাদের শরীর এই রকমই হয়, দাদা!" সেক্রেটারী উত্তর দিলেন।

"এই লেখাপড়া নিয়েই ত তোমরা দুনিয়াকে টেনে চলেছ রসাতলে! লেখাপড়া, পুঁথিপত্র,—এ-সব জিনিস দেয় মানুষের মাথা খারাপ ক'রে, পাগল ক'রে ছাড়ে। এ-সব কোন কাজের জিনিসই নয়! কাজের জিনিস হ'ল খোলা মাঠ আর ঘোড়া! আর ঐ যে আমার বন্দুকটা দেখছ, ঐ হ'ল আমার সঙ্গী। এ সব জিনিস তুমি আমার কাছ থেকে কিছুতেই কেড়ে নিতে পারবে না।"

বুড়োর এখন তার অতীত যৌবনের কথা মনে পড়ছিল। মনে। কতকগুলো সুন্দর সুন্দর স্মৃতি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার চোখের সামনে বিদ্যুতের মত খেলে গেল।

যৌবনকালে কয়েকটি সুন্দর বছর সে কাটিয়েছিল কোজাকদের নিজের ধরণের প্রজাতন্ত্রবাদী ক্যাম্পে। সেই জন্যে সেই ক্যাম্পের শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন রকম শিক্ষার মূল্যই ছিল না তার কাছে। সেই ক্যাম্পের সবচেয়ে প্রধান বিশেষত্ব ছিল সেখানকার স্বাধীনতা। সকাল থেকে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত লোক প্রাণ ভরে হল্লা করত, মদ খেত আর গল্প করত। সে-সব গুলিখোরের আড্ডার গল্প নয়—বীর কোজাকদের জীবনের কাহিনী। হল্লা করার সময় নারীর অসম্মান হ'ত না—ক্যাম্পের নিয়মই ছিল, মেয়েরা ক্যাম্পের আশেপাশে আসতেই পেত না। মদ বেচত ইহুদীরা, আর তাদের কাছ থেকে যে কোজাক যত বলবান্ হ'ত, তত অনায়াসেই সে মদ নিত কেড়ে। দরদস্তুরের কোনও বালাই ছিল না। যতক্ষণ কোজাকদের পকেটে থাকত পয়সা, ততক্ষণ তারা লুটোতে থাকত; যখন থাকত না, তখন যেদিকে দু-চোখ যায় লুটপাট আরম্ভ ক'রে দিত।

কোজাকদের সবচেয়ে ভাল লাগত কয়েক হাজার ঘোড়ার দৌড়। এই দৌড়ে প্রথমে যাওয়ার জন্যে ঘুষোঘুষি পর্য্যন্ত হয়ে যেত। সকল সময় লড়াই করতে থাকাই ছিল তাদের বিশেষত্ব। এমন কোজাক অনেক ছিল যারা লড়াই না ক'রে একটি দিনও কাটালে মনে করত ভারি অসম্মান, ভারি বেইজ্জত।

এই রকমের লড়াই-ধাক্কাধাক্কিতে হ'ত তাদের শরীর দৃঢ় মজবুত আর বিকাশ হ'ত যুদ্ধশিক্ষার। বড় বড় যুদ্ধে কোজাকেরা হ'ত পারদর্শী, কিন্তু তাদের এ শিক্ষাটা মিলিটারী ক্যাম্পে হ'ত না। শান্তির সময় মিলিটারী-রীতিতে মার্চ্চ শেখা, যুদ্ধশিক্ষার অভ্যাস করা তারা মোটেই পছন্দ করত না। বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রেই হ'ত তাদের অভ্যাস।

সকল সময়ে কোজাক-ক্যাম্পে ফেটে পড়ত জাগ্রত জীবন। এই জীবনটার দিকে এখন বুড়োর মনটা আরম্ভ করছিল উড়তে। কোজাক সকল সময় কেবল একটা কথাতেই কেঁদে ফেলে—"যৌবন কেন না-থাকে সব সময়?"

বুড়ো হয়েছি এ কথাটা স্বীকার ক'রে নেওয়া তাদের পক্ষে ছিল বড় কঠিন। বোরোদাতী দু-হাতের আস্তিন গুটিয়ে দু-পা এগিয়ে এসে বলল, "অনেক দিন পরে আজ লড়বার ইচ্ছে হচ্ছে। এস একটু লড় দেখি।"

পার্টি-সেক্রেটারীর কপাল, বুক, পিঠ, পাশ যেদিকে সুবিধা পেল সেই দিকেই লাগল সে ঘুষি চালাতে, ওস্তাদ বক্‌সারের মত। সেক্রেটারী ছিলেন শরীরে দুর্ব্বল আর ঘুষি-চালনার কায়দায় একেবারে আনাড়ি। নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দু-চারটা ঘুষি নিলেন খেয়ে। দাঁত দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রক্ত। বুড়ো বলল, "নাঃ, তোমার লড়াই করা আসে না। সাত জন্মেও তুমি কোজাকের সমান হ'তে পারবে না।"

"হাঁপাতে হাঁপাতে সে পড়ল ব'সে তার জায়গাটায়। পরিশ্রমে ঘাম বেরিয়ে গেল। মাথার উপর থেকে ফার-এর টুপী নিল খুলে, সামনের টেবিলের উপর সেটাকে আছড়ে ফেলে হুকুম দিল "ভোদকা (রাশিয়ান মদ, খুব জোরাল), ভোদকা লাও!" তখনি আবার হেসে ফেলে বলতে লাগল, "এখন কোথায় আর ভোদকার সে বাহার? এখন ত তোমাদের দিন। তোমরা ত খেতে আরম্ভ করেছ ময়দা, কেক্, গুড়,—জানি নে আরও কত সব উদ্ভট জিনিস। এ-সব কোজাকের খোরাক নয়! আমাদের সামনে নিয়ে আসা চাই সেদ্ধ-করা একটা পুরো ভেড়া, সেঁকা একটা পুরো খাসি, আর ফেনায় টগবগে ভোদকা।"

বুড়োর মনে পড়ে গেল ক্যাম্পে এমন কোজাকও ছিল যে রোজ খেয়ে ফেলত একটা পুরো পাঁঠা, আর এক সরা মদ তো তার এক চুমুক। মনে মনেই বলল, তারা কত ভাল কোজাকই ছিল।

২

আমার থাকার বন্দোবস্ত হ'ল বুড়ো বোরোদাতীরই বাড়ীতে। সে বিধিপূর্ব্বক সেখানে আমার গৃহপ্রবেশ করাল।

"ডোনভূমি তোমার প্রিয়?" আমায় প্রশ্ন করল।

"হাঁ।"

"সোভিয়েট রাজ্যে বিশ্বাস আছে?"

"হাঁ।"

"ডোন আর সোভিয়েট রাজ্যের জন্য রক্ত দেবে?"

"সর্ব্বদা।"

"বহুৎ আচ্ছা। এখন আমার বাড়ীতে যে-ঘর তোমার পছন্দ হয় সেইখানেই তুমি থাকতে পার।"

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'ল। বাড়ীর সবচেয়ে ভাল ঘরখানা দেখাবার জন্য গেল আমার সঙ্গে। সে-ঘরটা ঝাঁট দিচ্ছিল এক জন স্ত্রীলোক। সে আমাদের পায়ের শব্দে গেল বাইরে পালিয়ে। তার চলার ভাবে মনে হ'ল সে বুড়োকে পায় ভয়। নইলে পর্দ্দা মানার ত তার অভ্যাস ছিল না।

ঘরখানি ছিল একটা ঝুপড়ির মত। দেয়ালগুলো রঙীন মাটিতে লেপা। তার গায়ে টাঙান ছিল নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র আর চাষের সরঞ্জাম। অস্ত্রশস্ত্রগুলো ছিল মধ্যযুগের; কতকগুলো ত সাঁওতালদের কুড়ুলের মত। একটা দেয়ালে টাঙানো ছিল মাছধরার জাল।

বসবার জন্য দুই-তিনখানা বেঞ্চি পড়েছিল এদিকে-ওদিকে। একখানার উপর ছিল কিছু কম ধুলা। বোধ হয় সেইখানাই আসত ব্যবহারে। ঠিক সেই বেঞ্চিখানার উপর দেয়ালে ঝুলছিল একখানা তলোয়ার আর বহু প্রাচীন কালের একটা বন্দুক।

৩

বিদেশীদের নিজের ক'রে নিতে ডোন কোজাক উদার-হৃদয় হয় না—এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি শুয়ে ছিলাম ঘরের মধ্যে। দেয়াল ছিল খুব পাতলা। আমার প্রতি-বেশিনীর অল্পস্বল্প নড়নচড়নও বেশ জানা যেত। তার পাশ ফেরার খবরটা তো তার খাটিয়াটাই দিত দিয়ে; যখন সে শুত মাটির উপর, শোনা যেত তার নিঃশ্বাস। যখন সে চলতে-ফিরতে থাকত, তখন তো দেয়ালটা উঠত দুলে। আর যে বেঞ্চিখানার উপর থাকতুম ব'সে, সেটার সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠতুম দুলে।

এত নিকট হ'লেও মনে হ'ত, সে আমার কাছ থেকে কত দূরে, যেন আমার জানালাটার কাছ থেকে ঐ আকাশের তারা। লুকিয়ে-চুরিয়ে এক-আধ বার তার মুখটা নিয়েছিলুম দেখে। চার চোখে মিলন হ'লে এক বার লজ্জা গোপন করার জন্য আমায় নমস্কারও করেছিল চাপা গলায়। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত হয় নি আমাদের পরিচয়।

এক দিন সন্ধ্যার কিছু আগে জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি সে গাছের ধারে খাচ্ছে বন-বেরী পেড়ে। লাফিয়ে পড়ে তার কাছের রাস্তাটা দিয়ে যেতে লাগলুম। কাছে এসে পড়ায় তাকে নমস্কার করব মনে করলুম, কিন্তু মুখ গেল শুকিয়ে। সে বুঝে নিল আমার সঙ্কোচ, আর ধীরে ধীরে বলল, "দাঁড়াবেন না, বুড়োর কাছে দূরবীণ আছে। নদীর ধারে আমি আসছি এখনি।"

নদীর ধারে ভাল ক'রে দেখলুম তার মুখ। তরুণী, আঠার বছরের নবযুবতীর মত। মুখশ্রীর ঐশ্বর্য্যের তুলনায় অতি দরিদ্র কাপড়চোপড়; কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য দুটোর প্রতিই উদাসীন।

হাতের বনবেরীগুলো এক-একটা ক'রে মুখের মধ্যে ফেলবার দিকেই তার মন। মুচকে হেসে দু-চারটে বেরী আমার দিকেও দিল এগিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর হয়ে উঠল মুখের লালিমা। সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সেই লালিমাটাকে গোপন করার বিফল প্রয়াস।

পকেট থেকে এক মুঠো বনবেরী বার ক'রে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললে, "আরও নাও।"

আমার পক্ষে যে কিছু বলা প্রয়োজন।

"আপনি......" কথা আটকে গেল।

"বেলা।" নিঃসঙ্কোচে হাসতে হাসতে দিল উত্তর।

"কোজাক-কন্যা?"

"না।"

"তবে?"

"উক্রেনের।"

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ থেকে বার হয় না দেখে সে বলল, "এবার আমি পরীক্ষা নিই। আপনি..."

ভাবতে লাগলুম।

"প্রথম প্রশ্নেই আপনি ফেল। এখন দ্বিতীয়। তুর্কী?"

"না।"

"পারসী?"

"তাও না।"

"উজবেক?"

হাসতে লাগলুম।

"এবার আমি নিজে ফেল। এখন আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। এবার পরিচিত হয়ে গেছি। আপনি যাই হোন না কেন আমি ডাকব "সাস্কা" ব'লে। সে দিল হাত বাড়িয়ে। হাত-ধরাধরি ক'রেই আমরা চললাম এগিয়ে।

"তোমার মাছ-ধরা আসে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"হাঁ।"

"তবে ধর না কেন?"

"কেমন ক'রে?"

"বঁড়শী দিয়ে।"

"বঁড়শী কই?"

"আমার কাছে।"

"বেলা!" কিছু দূর থেকে এল বুড়োর আওয়াজ।

বেলা চট্ ক'রে হাত নিল ছাড়িয়ে আর বুড়োর দিকে তাকিয়ে বলল, "কাল মাছ-ধরার কথা ভাবছি, দাদু। তুমিও বনবেরী খাবে? এই নাও…।"

৪

কোজাকদের মধ্যে ক-টা মাস গেল কেটে। বেলা আমায় রাশিয়ান ভাষায় পোক্ত করতে লাগল। সকালটা ত তার গ্রামে কাটত ছোট ছেলেদের পড়াতে; বিকেল বেলাটা খালি রেখেছিল আমার জন্যে। বুড়োও এজন্যে দিয়েছিল হুকুম। কথাটা বড় আশ্চর্য্যের, কারণ সে ছিল বেলা ও বই—দুটোরই বিরোধী। কিন্তু আমার কাছে প্রথমেই তো শপথ করিয়ে নিয়েছিল কি না, ভবিষ্যতে আমি হব এক জন খাঁটি কোজাক।

ঘরে আমার যখন রোদ ঢুকত পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে, তখন যেতুম বেলার ঘরে পড়বার জন্যে। আমাদের পড়াটা সুরুও হ'ল এক বিচিত্র রকমে। বই থাকত সামনে খোলা, কিন্তু দু-জনেরই দৃষ্টি সেদিকে যেত কদাচিৎ। যখন আমি দেখতুম অক্ষরের দিকে, তখন সে চুপি চুপি তাকিয়ে থাকত আমার মুখের দিকে, আর যখন সে দেখত বই, আমি তখন দেখতুম তার মুখখানা এক দৃষ্টিতে। যদি কখনও এ চুরিটা ধরা পড়ত, তখন দু-জনেই হাসতুম প্রাণভরে হাসি।

দ্বিতীয় দিনেই সে ব'লে ফেলল খোলাখুলি, "আর লুকোচুরি কেন? তোমার মুখ তো এত ভয়ানক নয় যে আমি সেদিকে তাকাব না। বেশ করব দেখব। এস আগেই দু-জনে নিজেদের ভাল ক'রে দেখে নিই, তার পর সুরু করি পড়া।"

তার সঙ্কোচ তো অতি শীঘ্রই দূর হ'ল, কিন্তু আমি ব'সে রইলুম কাঠের পুতুল। সে নানান রকমে সুরু করল খেলা। কখনও নিজের গলার বড় বড় পুঁতির মালা আমায় পরায়, কখনও বা কানের গয়না খুলে বেঁধে দিতে চায় আমার কানে, আবার কখনও ঢেকে দেয় মসলিন চাদর দিয়ে। যেন ছোট ছেলের খেলা।

পড়ার সময়টা কাটে বড়ই স্বাধীনতায়, বাধার নাম-গন্ধ থাকত না। বুড়োকে ত সে প্রথমেই পাঠিয়ে দিত তাস আর ভোদকা দিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ী যুদ্ধের গল্প করতে। যদি কখনও ফিরতও সে সন্ধ্যার আগে তো কেবল এইটুকুই বলত, "এখন বন্ধ কর। বেশী পড়লে পাগল হয়ে যাবে।"

তখন ত' হয়ে যেত আমাদের বেড়াতে যাওয়ার সময়। বেলার কাছে ছিল মুখ দিয়ে বাজাবার একটা ছোট হারমোনিকা। সেটা বাজিয়ে সে দেখাত আমায় কোজাকদের নাচ। নাচ-গানের সখ ছিল তার ছেলেবেলা থেকেই। কোন জাতির ভিতরের ভাবকে নাচের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করায় কিংবা কারুর নকল করায় ছিল সে পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। নিজের কল্পনার রঙে রঙিয়ে 'বোরোদাতী-নৃত্য', 'ঘোড়দৌড়-নৃত্য', 'কোজাক-প্রেমনৃত্য', 'কোজাক-বিবাহ-নৃত্য', 'কোজাক-তাণ্ডব-নৃত্য',—এমন কত রকমের নাচই সে বার করেছিল। এ-সব নাচের মধ্য দিয়ে কোজাকদের সত্যিকারের জীবনটা হয়ে উঠত জীবন্ত। এই সব নৃত্যের ধারা তার কখনই বন্ধ হ'ত না। রোজই ছিল তার নব নব নৃত্যের উদ্ভাবন। আমার কোজাকদের মধ্যে আসার এক নাচ দেখাল, তার নাম দিয়েছিল 'সাস্কা-নৃত্য'। আর এক নাচ তৈরি করছিল, 'সাস্কার পড়া'। কোজাক-সাস্কা-নাচের মধ্যে আমার চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র সব চেয়েছিল ফুটিয়ে তুলতে।

যদি কোন জিনিস সে প্রকাশ করতে চাইত না তো সেটা ছিল তার নিজের স্বভাব। কোন আলোচনাই সে চলতে দিত না নিজের সম্বন্ধে। তবুও এক দিন আমি তাকে টুকলুম, "আর, বেলা-নৃত্যটা দেখাবে কবে?"

"সেটা তো রেখে দিয়েছি একটা বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্যে।"

"কি সে উপলক্ষ্যটা?"

"তা ত বলব না এখন। আগে তুমি বল—বিয়ে হয়েছে তোমার?"

"জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য?"

"এমনি জানতে ইচ্ছা।"

"না।"

"তবে এখানে ক'রে ফেল। এখানকার অনেক মেয়ে তোমায় পছন্দ করে।"

"চুপ..."

"সত্যি বলছি। কোজাক-মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার ভারি লাভ।"

"কি রকম?"

"দেখ, কাপড়-চোপড়ের উকুন মারতে এরা ভারি ওস্তাদ। কোজাকরা ত বিয়েই করে এর জ্বালায়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন মেয়ে পারবে এ কাজ করতে? এদের এই আর্টের উপর একটা নাচ বার করেছি। এ নাচ যদি কোন বড় শহরে দেখান যায় তো এক দিনের মধ্যেই আনা পাবলোভার মতন নাম হয়ে যায়।"

"নাম হয় তোমার, আর আমি বনি বেকুব!"

"না না, তুমি বেকুব বনবে কেমন করে? আরে, ভারি সস্তায় থাকবে। দু-চারটে তাকিয়া, এক-আধখানা খাটিয়া, দু-একটা ঘাঘরা, এতেই তোমার সুন্দরী কোজাক-মেয়ে মিলে যাবে। আর, মজা তো এই, তুমি তাকে যত খুশী পিটতে থাক না কেন তোমায় ছেড়ে সে যেতেই পারবে না। বল দেখি এত সস্তায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও স্ত্রী মিলবে?"

"সস্তা আমার চাই নে।"

"আচ্ছা মাগ্‌গিই তোমার জন্যে..." আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক করি?"

বাইরে থেকে এল বুড়োর কাশির শব্দ। বেলা তার কাছে গিয়ে বলল, "দাদু, সাস্কার জন্যে একটা বিয়ে ঠিক কর।"

তখন উত্তর হ'ল, "এ ত বড় লজ্জার কথা। এ ছোকরা ত এখনও লড়ায়ের মাঠই দেখল না, আর এখন থেকে ভাবতে লেগেছে মেয়েদের কথা—ছিঃ ছিঃ। আরে, এর চেয়ে আর কি হবে লজ্জার কথা? যদি আমাদের যুগের কোন কোজাক ছোকরা হ'ত ত এই খেয়াল আসার আগেই সে ডুবে মরত। নইলে আমিই তার মাথাটা কেটে ফেলতুম শশার মত।"

অনেক ক্ষণ ধরে গজ-গজ করতে লাগল। সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল আমার লেখাপড়া।

৫

মুর্গী প্রথম ডাক ডেকেছিল। খিড়কিতে কে যেন লাঠির খোঁচা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিল, "সাস্কা! সাস্কা! এ সাস্কা!"

বেলার আওয়াজ। লাফিয়ে উঠলুম।

"মাছ ধরতে যাবে না?"

"এখুনি..."

সেই খিড়কী দিয়ে লাফিয়ে এলুম বাইরে। আকাশে তখন জলজলে তারা। রংটা কিছু ফিকে হয়ে আসছিল, যেন খামারে ছড়ান ধানের দানা। ডোনের সারা দৃশ্য স্নান করছে চাঁদের আলোয়। এমন চাঁদের আলোয় ধোওয়া পথে কেউ চলেছে কিনা সন্দেহ।

পায়ের শব্দ বাঁচিয়ে চলতে লাগলুম পাছে গাঁয়ের কুকুর জেগে পড়ে। চারি দিক নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কেবল আওয়াজ আসছিল কোন বুড়ো কোজাকের হাই তোলার। একটা খিড়কি থেকে যেন ফিস্ ফিস্ শব্দ এল, "বেলা দিদি! আমিও আসব?"

"কে? লীজা?"

"হাঁ।"

"আয় না। তাতে কি?"

"তোমার সঙ্গে যদি ধরা পড়ি তবে ত বিপদ! চল, আমি পিছনে পিছনে যাচ্ছি। আমি না এলে খুলো না যেন নৌকো।"

বেলা ব'সে পড়েছিল নৌকোয়। লীজা ধারে দাঁড়িয়ে আনাড়ির মত বলতে লাগল, "যাই কেমন ক'রে? কাপড় যে ভিজে যাবে!"

জল ছিল খুব কম, নৌকো ধারে ভেড়ান সম্ভব ছিল না। বেলা বললে, "দাঁড়া, সাস্কা তোকে তুলে আনছে।"

সে বসল গিয়ে নৌকোর একটা মাথায়। কোজাকদের মধ্যেও এমন সৌন্দর্য্য মেলে, হঠাৎ বিশ্বাস হচ্ছিল না। বসতে-না-বসতেই ব'লে উঠল, "কাল রাত্তির বেলায়ও

আমাকে খুব মার খেতে হয়েছে। আজ ভোরে গম বেচতে ওর শহরে যাওয়ার কথা ছিল। নিজেও সমস্ত রাত ঘুমল না, আমায়ও দিল না শুতে। যেমনি ঢুলুনি ভাঙে, মারে আমায় ঘুষি। যেতে যেতেও বুকের উপর দু-ঘা এমনি বসিয়ে দিল, আমার ত মূর্চ্ছার মতন হয়ে গেল।"

সে ছিল রেলস্টেশন থেকে অনেক দূরে কোজাক-গ্রামের মেয়ে। এই তিন মাস হয়েছে তার বিয়ে, রয়স-ঢলে-পড়া বলোভ্যা কৎল্যারোভ কোজাকের সঙ্গে। বিয়েতে তার মা-বাপ পেয়েছে দুটো গরু আর পঁচিশটা টোটার সঙ্গে একটি বন্দুক।

অনেক ক্ষণ সে ব'সে রইল, একেবারে চুপচাপ। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে সাড়া পর্য্যন্ত দিলুম না। স্রোতের মুখে ছেড়ে দিলুম নৌকোখানাকে।

অনেক দূর চলে যাওয়ার পর হাসল সে। সে হাসির কারণ ছিল বোধ হয় তার কাছেও অজ্ঞাত।

"আজ কি সুন্দর প্রভাত..." উদীয়মান সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু কেন...আঃ...বেলা!..."

৬

রাজীনস্কী গ্রামখানা ছিল ডোন নদীর ঠিক তীরে। সেই জন্যে মাটিতে বালির ভাগ বেশী থাকায় বাড়ী-ঘরের ভিত হ'ত না মজবুত। একটু জোরে বাতাস বইলেই বাড়ী সব উঠত দুলে।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগেই এল জোরে একটা আঁধি। ঘন মেঘের জন্যে সকাল বেলাতেই গাঁখানা অন্ধকারে ঢাকতে সুরু করেছিল। ফেনায়-ভরা ডোনের ঢেউগুলো তীরে আছড়ে পড়ছিল জোরে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ী উঠছিল কেঁপে। বুড়োরা ঢুকতে লাগল ঘরের মধ্যে। ছেলেছোকরারা বাইরে বেরিয়ে লাগল নাচতে আর আনন্দ করতে।

ডোনের তীরে চৌমাথায় অনেক ক্ষণ থেকে তরুণ-তরুণীরা জমা হচ্ছিল। ভিড়ের চারি দিকে যে-সব লোক দাঁড়িয়েছিল লীজাও তাদের মধ্যে মুখ লুকিয়ে চুপি-চুপি এসে দাঁড়াল। তারই মত মাথায় ছিল সেখানে এক জন যুবক, সে তাকে দেখতে পেয়ে তার হাত ধরে মাঝখানে টেনে আনতে-আনতে বললে, "কোজাক-নাচের জন্য তোমার-আমার জুড়ি হবে গাঁয়ের দেখবার মতো।"

লীজার বাঁ-হাতে কে দিয়ে দিল একখানা রুমাল। যুবক নাচতে আরম্ভ ক'রে দিল ডিঙি মেরে। তখনি দু-পা পিছনে সরে গিয়ে নাচের তালে তালে পা ফেলতে-ফেলতে লীজাকে আগে-আগে নাচিয়ে নাচিয়ে সে নিজে তার পিছনে পিছনে যেতে লাগল নেচে। লীজা নাচের মধ্যে বোধ হয় নদী পার করাটা চাইছিল দেখাতে। জলেনামবার আগে যেমন শীত করে, সেটা প্রথমে দেখাল; পরে নীচের কাপড়টা ভিজে যাওয়ায় ভয়ে সেটা ওঠাল একটু উপরে, আর তখনি ভয় ছেড়ে দিয়ে দিল একটা লাফ, আর সাঁতার দেওয়ার মত হাত-পা জোরে তাড়াতাড়ি লাগল চালিয়ে যেতে। সেই হিসাবে বাজনাও উঠল তাড়াতাড়ি অতি জলদ বেজে।

চারি দিক থেকে বাহবা-বাহবা পড়ে গেল; হাত-তালির বিরাম রইল না। লীজা নাচতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। মুখ তার হয়ে উঠল লাল, ঘামে ভরে যেতে লাগল শরীর, তবুও তার বন্ধ হ'ল না নাচ। তার মুখে আনন্দ আর হাসি। সেদিন সে তার মুক্ত হৃদয় নিয়ে কি যে করবে,তারই ছিল না ঠিকানা।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল, ভিড়টা ঠেলতে ঠেলতে সামনে আসছে এক জন এগিয়ে; সে দাঁড়িয়ে পড়ল পাথর হয়ে। কৎল্যারোভ এসে তার চুলের মুঠিটা জোরে ধরে টানতে টানতে বলল, "বদমাস! ডাইনী কোথাকার! আমার মুখে কালি লাগিয়ে নেচে মরছিস এখানে!"

তাকে নিয়ে গিয়ে খাড়া ক'রে দিল পঞ্চায়তের সামনে। অনেকগুলো বুড়ো বসেছিল সেখানে বিচারের জন্য। বাইরে পড়ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। মধ্যে মধ্যে চমকে উঠছিল কড়াক্ ক'রে বিদ্যুৎ। একবার বজ্রনাদে শব্দ হ'ল কড়াক্। যেন এসে পড়ল মাথারই উপর, কিন্তু বাড়ীটা কাঁপিয়ে দিয়েই চলে গেল। সকলে ব'সে রইল ঠোঁট কামড়ে।

পঞ্চায়তের লোকেরা বসে ছিল দু-ভাগে। সেকালের দলের বুড়োরা বলছিল লীজা সম্পূর্ণ অপরাধী, আর তার

দরকার উপযুক্ত শাস্তি। অন্য দলে ছিল একালের দলের যুবকেরা; তারা বলছিল লীজার স্বামী কৎল্যারোভই অপরাধী, তারই পাওয়া উচিত শাস্তি, এই বিষয়ে ছিল তাদের জিদ। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর বুড়োরা নিজেদের মধ্যে এক জন মুরুব্বিকে সম্বোধন ক'রে বলল, "সিরগে এরমিলাই! তুমিই কেন এই মামলার নিষ্পত্তি ক'রে দাও না? তুমি বুড়োও বটে আর আমাদের ডাক্তারও বটে—ঘোড়ার চিকিৎসা সারা ডোন প্রদেশে তোমার মতন ত কেউ পারে না করতে। তুমি বাইবেলও পার পড়তে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার মতন বুদ্ধিমান আর কে আছে বল।"

"আমার মত যদি চাও তো শোন!" ঘোড়ার ডাক্তার বলল সকলকে শান্ত ক'রে, "আমাদের কোজাক উপনিবেশের দণ্ডবিধান ছিল এই রকম—যদি কোন মেয়ে তার সুস্থ ও জীবিত পতিকে ছেড়ে অন্য বিয়ে করত ত সমস্ত কোজাক-বংশের উপর ভারি কলঙ্কের কথা ব'লে ধরা হ'ত।"

"ঠিক, ঠিক, আমরা আমাদের বংশের উপর কখনও কলঙ্ক লাগাতে পারি না।" বুড়োরা ডাক্তারকে করল উৎসাহিত। যুবকেরা ছিল শাস্তির বিরোধী। তাদের বক্তব্য ছিল, সোভিয়েট-সরকার থাকতে নিজেরা এই রকম সাজা দেওয়ার অধিকার কোজাকদের নেই। বুড়োদের যুক্তি, কোজাকদের সামাজিক মামলায় সোভিয়েট-সরকারের হাত দেওয়ার কোন অধিকার নেই। যুবকেরা বলে—নিশ্চয় আছে এ অধিকার; বিচারপতির আসনে রোস্টোভে যে কোজাক আছেন, তাঁরই কাছে যাওয়া উচিত এ মামলাটা।

ডাক্তার দেখল, যুবকদের আওয়াজ কিছু জোর হয়ে উঠছে। মারপিট করবার জন্যও হচ্ছে তৈরি। যদি একবার হাত চলতে আরম্ভ করে তবে বুড়োদের হবে বেশ একটু উত্তম-মধ্যম। সবচেয়ে বেশী মার পড়বে ডাক্তারের উপর। এই খেয়াল ক'রে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বলল, "কিন্তু আর এক কথা। এ সাজা ত দেওয়া হ'ত জারের সময়। এখন আমরা রাজা, কেবল ডোন এলাকা নয়, সারা রাশিয়া আমাদের। আমাদের গাঁয়েরই মার্শেল বুদিয়োনী লাল-সেনার অত বড় পদে মস্কোয় ব'সে আছেন। তাঁর ভয়ে সব বোর্জুই থাকে কাঁপতে। আমাদের দারিদ্র্য দিন দিন কমে চলেছে, আমাদের উপরকার অত্যাচারটা শেষ হয়েছে। তবে কেন আমরা ঝাল ঝাড়ি মেয়েদের উপর?"

কিন্তু এত সহজেই বুড়োরা হার মেনে নিতে কি পারে? আমাদের বুড়োদাদাও ছিল ঐ দলে। তাকে যখন বললাম বাড়ী যাবার জন্যে, তখন ধমকে বলল, "তুমি পালাও এখান থেকে। আমরা তোমায় কোজাক-প্রথায় কাল সাজা দেব ঠিক করেছি।"

আমার বিশ্বাস হয়ে গেল, এবার কেবল নির্জ্জলা ধমক নয়।

৭

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা সেদিন ঘাস-রাখার ঘরে আমার করেছিল বিছানা। ডোনের দিকের জানলাটা ছিল খোলা। অন্ধকার ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে আসছিল। ডোনের তীর অস্পষ্ট, তবু দূর পর্য্যন্ত যাচ্ছিল দেখা। আমাদের পরিচিত টিলাটা দূরে মাথা উঁচু ক'রে সমস্ত ডোন প্রদেশটার উপর প্রহরী হয়েছিল দাঁড়িয়ে। সেটা এখন জীবন্ত ব'লে আমার মনে হ'তে লাগল।

গাঁয়ের দিক থেকে কার যেন আঁতকে ওঠার শব্দ! একদৃষ্টে রইলাম সেই দিকে তাকিয়ে। কিছুই ত দেখা যায় না। ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল, চাঁদ হেসে উঠল। আমি সেই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছি সামনের দিকে চেয়ে।

কৎল্যারোভের বাড়ীর জানলার কাছে নড়ে কি? জানলা দিয়ে বাইরে আসার এই ভাবটা যে পরিচিত। সেদিনের চেয়ে বেশী সাবধানে সে এল বাইরে। সোজা চলল ডোনের দিকে।

আমায় লাগল বিদ্যুৎস্পর্শ। জানলার বাইরে পড়লাম লাফিয়ে। আরও এক বার চারি দিকে দেখে নিলাম। কেউ নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। গাছপালা নদী সকলই স্তব্ধ—একদৃষ্টে সাক্ষী হয়ে আছে তার কাজের। একটা ঝোপের আড়ালে সে চলে গেল। দাঁড়িয়ে গেলাম।

"কিছুই তো করি নি আমি—" দূরে ধীর অস্ফুট করুণ স্বর শোনা গেল, "ভগবান্! সবচেয়ে অন্যায় তোমার নিয়ম। কেন দেখ না চোখ খুলে? না, কেমন ক'রে দেখবে তুমি? নিজেই যে তুমি অন্যায়ের কর সাহায্য। অত্যাচারী তুমি নিজে, তোমার সমস্ত দল, তোমার সারা দুনিয়া! যারা তোমায় বিশ্বাস করে না তাদের জীবন অনেক ভাল তোমাতে বিশ্বাসীদের চেয়ে, অনেক সুখী তাদের জীবন। আমি যে ন্যায়বিচারের ভার ছেড়ে দিয়েছিলাম তোমার উপর! তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম—তারই এই ফল! এমন অন্যায়কারী, এমন অত্যাচারীর উপর আমার আর নেই বিশ্বাস।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। কিছু পরে সেটাও বন্ধ। ভুল হয়ে গেল আমার, সত্যিই কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইছে! দেখি টিলার মাথার উপর রয়েছে দাঁড়িয়ে। ভয়ে পা-দুটো আমার মাটিতে ব'সে গেল।

"অত্যাচারী সমাজ···ক্রূর সংসার···"

সঙ্গে সঙ্গে লাফ। ছপ্! ডোনের মধ্যে জোরে আওয়াজ! তীরে জোরে ছল্-ছল্। হঠাৎ সব শান্ত। গিয়ে দেখি বর্ষায় জল বেড়েছে কানায় কানায়। প্রবাহের তীব্র বেগ। এক মুহূর্ত্তেই যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে।···

মৃত্যু

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কতবার মৃত্যু চাহিয়াছি, কত শত বার।
আমার অনেক মৃত্যু তোমাতে উজ্জ্বল;
অগোছালো রাতগুলি শান্ত নম্র নীলছায়াময়;
দেবতা কুমারী দেহে স্বর্ণরেণু হয়ে সমুজ্জ্বল।

শালবনে আকাশ পতাকা, রাঙা পথ হয়েছে
খেয়ালী,
দিনের বলাকা গেল সায়াহ্নের স্বর্ণ বালুচরে,
ফাল্গুনী পৃথিবী কাঁপে থরোথরো কি অজস্রতায়
তোমার কুমারী-দেহে কোন্ দেব পাঠাল অঞ্জলি?

স্বপ্ন দেখি: নীল রাত, রাতের জোয়ার,
আর কত সায়াহ্ন আর ভাঙা ভাঙা দিন,
স্বপ্ন দেখি ফাল্গুনের। তবুও মৃত্যুরা
ভিড় ক'রে আসে। রাতেরা অরণ্যময়
তারায় তারায়:
আকাশে ফাল্গুন।

এই সব নীল রাতে মৃত্যু উড়ে আসে।
টলটলে চন্দ্রা রাত, গভীর নিবিড়।
তোমার কুমারী-অঞ্চলে নীল রাত নাও,
নাও দিনগুলি,
অরণ্য, কুসুম-স্বপ্ন, প্রজাপতি-ভিড়।

প্রজাপতি দিনগুলি উড়ে যায়, উড়ে উড়ে যায়,
কি অজস্র, কি অজস্রতায়!
হে দেবতা, তবুও আমার
ফাল্গুনী রাতেরা হ'ল স্তব্ধ হিম মৃত্যুর পাহাড়!

বিবিধ প্রসঙ্গ

আবার ডোমীনিয়নত্ব দিবার প্রস্তাব

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত প্রদেশগুলিতে তাঁহারা তাঁহাদের কাজে ইস্তফা দেওয়ায় ভারতশাসন-আইনের বিধিবিশেষ অনুসারে সেই সেই প্রদেশের গবর্ণরেরা মন্ত্রীদের সব কাজ ও ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। আইন অনুসারে এই ক্ষমতাগ্রহণ ছয় মাস বলবৎ থাকে। আরও দীর্ঘকাল গবর্ণরদিগকে এইরূপ ক্ষমতা নিজের হাতে রাখিয়া মন্ত্রীদের কাজ চালাইতে হইলে আবার ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। আরও বার মাসের জন্য এই ক্ষমতা লইবার নিমিত্ত পার্লেমেণ্টে গত ১৮ই এপ্রিল এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় এবং অবশ্য পার্লেমেণ্ট অনুমতি দেন। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা হয়, সেই প্রসঙ্গে ভারতসচিব ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব দিবার প্রস্তাব পুনর্বার করেন।

কিন্তু পুনঃ পুনঃ অঙ্গীকার ও যাচাই করিবার প্রয়োজন কি? "ওগো, তোমরা ডোমীনিয়নত্ব নেবে? আমরা দিতে প্রস্তুত", ভারতবর্ষের লোকদিগকে পুনঃ পুনঃ একথা বলিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই তো করিতে পারেন—আমাদিগকে ডোমীনিয়নত্ব দিয়াই ফেলুন না।

যে ভারতশাসন-আইন অনুসারে এখন ভারতবর্ষের কাজ চলিতেছে, তাহার খসড়া ভারতবর্ষের সমস্ত বা কোনও রাজনৈতিক দলের সম্মতি লইয়া রচিত, প্রণীত ও জারি হয় নাই। কর্তাদের যেরূপ ইচ্ছা, তাঁহারা তাহাই করিয়াছিলেন। যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া ঐ আইন রচিত, সেই সিদ্ধান্তও ভারতবর্ষের সমস্ত বা কোনও দলকে সম্মত করিয়া ঘোষিত হয় নাই। কর্তারা স্বয়ং সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ভারতবর্ষের সম্মতি-অসম্মতি-নিরপেক্ষ ভাবে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতশাসন-আইন জারি হওয়ায় এদেশে কোন বিদ্রোহ হয় নাই। বরং উহার সর্বাপেক্ষা অধিক বিরোধী কংগ্রেস উহা অনুসারে প্রাদেশিক কাজ চালাইবার নিমিত্ত অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া দুই বৎসরেরও অধিক কাল ঐ প্রদেশগুলি শাসন করিয়াছিলেন।

অতএব আমরা বলি, যদি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব দিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে—সেরূপ ইচ্ছা আছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ আছে, তাহা হইলে **ওএষ্টমিন্সটার আইন অনুযায়ী ডোমীনিয়নত্ব** ভারতবর্ষকে দিয়া ফেলুন। যদি বলেন, উহা দিতে হইলে পার্লেমেণ্টে আইন পাস করাইতে হইবে, ঘোরতর যুদ্ধের সময় তাহা করা যাইবে না, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, এই যুদ্ধের সময়েও তো পার্লেমেণ্টে অনেক আইন হইতেছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও হইতেছে, সুতরাং ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব দিবার আইনই বা তথায় এখন কেন উত্থাপন ও পাস করা যাইবে না? তথাপি যদি জিদ করিয়া বলেন, যাইবে না, তাহা হইলে বলি, পার্লেমেণ্টে আইনসঙ্গত ভাবে পার্লেমেণ্টের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হউক যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর এক বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে ভারতবর্ষে ওএস্টমিন্সটার আইন অনুযায়ী ডোমীনিয়নত্ব চালু করা হইবে।

পার্লেমেণ্টের প্রতিশ্রুতি কেন চাহিতেছি, বলি। বর্তমান ভারতশাসন-আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া যখন পার্লেমেণ্টে তর্কবিতর্ক চলিতেছিল তখন পার্লেমেণ্টের উভয় হৌসেই বিনা প্রতিবাদে এই মত প্রকাশিত হয়, যে, ভারতবর্ষের বড়লাট, ভারতসচিব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বা অন্য কোন রাজপুরুষ, এমন কি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরও যদি কোন প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে পার্লেমেণ্ট তাহা নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলে তাহা পালন করিতে বাধ্য হইবেন না। পার্লেমেণ্টই সর্বেসর্বা। অতএব আমরা পার্লেমেণ্টেরই প্রতিশ্রুতি চাই; অন্য কাহারও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা যায় না।

আমরা কোনও দলের প্রতিনিধিরূপে ডোমীনিয়নত্ব সম্বন্ধে এই সকল কথা লিখিতেছি না; ইহা কেবল আমাদেরই মত রূপে লিখিতেছি। ইহাতে অন্য কাহারও সম্মতি না থাকিতে পারে, থাকিতেও পারে। কিন্তু আমাদিগকে কেহ যদি প্রশ্ন করেন, "ওএস্টমিন্সটার স্ট্যাটিউট অনুযায়ী ডোমীনিয়নত্ব দিলে তুমি কি তাহা লইবে?" উত্তর—"লওয়া না-লওয়ার প্রশ্ন নিরর্থক। ভারতশাসন-আইন যখন প্রণীত ও জারি হইয়াছিল, তখন তো কেহ লওয়া না-লওয়ার প্রশ্ন তুলেন নাই। উহাতে আমাদের সম্মতি না থাকিলেও যেমন উহাতে বাধা দি নাই, তেমনি ডোমীনিয়নত্বেও বাধা দেওয়া হইবে না। ইহাকে গ্রহণ বা অগ্রহণ, কিংবা 'গ্রহণাগ্রহণ' (!), যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন।"

ইহার পর কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, "তবে কি তুমি ডোমীনিয়নত্বকেই ভারতবর্ষের চরম রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য মনে কর?" উত্তর—"কখনই না। ভারতশাসন-আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই বলিয়া কেহ ত এ ভুল করে না যে, আমরা উহাকে ভারতবর্ষের চরম রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যদি ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব দেওয়া হয় এবং আমরা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করি, তাহা হইলেই বা কেন মনে করা হইবে যে, আমরা ডোমীনিয়নত্বকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক স্বর্গলোক মনে করি? তাহা নিশ্চয়ই মনে করি না।"

ইহার পরও প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতবর্ষের পূর্ণস্বরাজ লাভের যে আন্দোলন এখন হইতেছে, ডোমীনিয়নত্ব পাইলে সেই আন্দোলন কি থামিয়া যাইবে? যদি না থামে, তাহা হইলে তাহা চালাইবার সুবিধা বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা ডোমীনিয়নত্বের আমলে কমিবে, না বাড়িবে?" উত্তর—"ডোমীনিয়নত্ব পাইলেও পূর্ণস্বরাজ লাভের প্রচেষ্টা থামিবে না, চলিতে থাকিবে, এবং তাহা চালাইবার সুবিধা বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা বাড়িবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ও আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত লউন। ডোমীনয়নত্ব পাইবার পরেও ঐ দুই দেশে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা লুপ্ত হয় নাই, তন্নিমিত্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে, এবং তাহা চালাইবার সুবিধা বাড়িয়াছে।"

ভারতবর্ষ যদি ডোমীনিয়ন হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস কি করিবেন, কংগ্রেসীরা মন্ত্রী হইবেন বা হইবেন না, বলিতে পারি না। আমার অনুমান, কংগ্রেসীরা মন্ত্রী হইবেন, এবং সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষহীন বিরাম-বিহীন সংগ্রামের পক্ষপাতীরাও মন্ত্রীত্ব পাইলে লুফিয়া লইবেন।

—

বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা

যে-সব প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সরকারী কাজ চালাইবার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর লোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। যুক্তপ্রদেশের এই চেষ্টার সহিতই আমরা বিশেষ পরিচিত।

বাংলা দেশে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর লোকদের শিক্ষার নিমিত্ত কোন সরকারী চেষ্টা হয় নাই। একটি কমীটি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং ভূতপূর্ব ইন্সপেক্টার-জেনেরাল অব্ রেজিস্ট্রেশন শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিবার পর আবার একটা কমীটি নিযুক্ত হইয়াছিল শুনিয়াছি, কিন্তু কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি। বাংলার মন্ত্রীদের যে একটা সরকারী ইংরেজী সাপ্তাহিক আছে, তাহাতে জাতিগঠন (nation-building)-মূলক কাজের বিবরণ বা বিজ্ঞাপন থাকে। জাতিগঠনমূলক কাজের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার কাজ একান্ত আবশ্যক। মন্ত্রীরা ইহাতে মন দিলে তাহা অপকর্ম্ম হইবে না।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের নিমিত্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে অনেক ছাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদিগের শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষিত হইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

—

"দেশে-বিদেশে"

বীরভূম জেলার সুরুল গ্রামে বিশ্বভারতীর পল্লী-সংস্কার প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। ইহা শ্রীনিকেতন নামে পরিচিত। জনসাধারণের জন্য সহজ ভাষায় লিখিত একখানি পাক্ষিক পত্র এখান হইতে প্রকাশিত হয়। নাম "দেশে-বিদেশে"। ইহাতে চাষবাস, স্বাস্থ্য, নানাবিধ গৃহশিল্প এবং অন্য নানাবিধ আয়ের উপায় সম্বন্ধে ছোট ছোট প্রবন্ধ থাকে। তদ্ভিন্ন নানা রকম সংবাদও ইহাতে প্রকাশিত হয়। গত ১৮ই বৈশাখের সংখ্যায় মৌমাছি-পালন ও তাহার দ্বারা লাভবান হওয়া সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ আছে। যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্কদিগকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা এই কাগজটি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে পড়িতে দিলে ফল ভাল হইবে মনে করি। প্রাপ্তবয়স্কেরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। মূল্য প্রতিসংখ্যা এক পয়সা, বার্ষিক চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৫০ আনা।

—

"ছাত্র" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন "ছাত্র" শব্দটির একটি ব্যুৎপত্তি (derivation)-গত অর্থ শুনিয়াছিলাম। তাহা কয়েক দিন পূর্বে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় সন্দেহ হইল যে, হয়তো কেহ পরিহাস করিয়া আমাদিগকে ঐরূপ ব্যুৎপত্তি শুনাইয়া থাকিবেন। কারণ, আজকাল দৈনিক কাগজসমূহে বড় অক্ষরে শিরোনাম দিয়া যে-সকল "ছাত্রসংবাদ" বাহির হয়, "ছাত্র" শব্দটির আমাদের কৈশোরে শ্রুত ব্যুৎপত্তির সহিত তাহার অনেকগুলির সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং এখনকার ছাত্রনেতাদের ছাত্রাদর্শ সেকেলে ছাত্রাদর্শ অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, অন্ততঃ আপ-টু-ডেট, সে বিষয়ে সন্দেহও করিবার যো নাই। যাহা হউক, কৈশোরে শ্রুত প্রাচীন সংস্কৃত ব্যুৎপত্তিটা লিখিয়াই ফেলি।

কোন বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান নিকটে না থাকায় পুণা হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বামন আপ্টে মহাশয় প্রণীত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান দেখিলাম। তাহাতে ছাত্র শব্দটির পরে লেখা আছে—[ছত্রং গুরোর্দোষাবরণং শীলমস্য]। অর্থাৎ গুরুর দোষ আবরণ করা যাহার স্বভাব। ছত্র কথাটির অর্থ এই অভিধানে লেখা আছে, "concealing the faults of one's teacher," অর্থাৎ নিজের শিক্ষকের দোষ গোপন করা। নিজের শিক্ষকের দোষ গোপন করার স্বভাবকে বলিত "ছত্র," সেই স্বভাব যাহার থাকিত, তাহাকে বলিত "ছাত্র"। একেবারে নিখুঁৎ মানুষ তো পাওয়া যায় না। শিক্ষকের যদি কোন খুঁৎ থাকে, তাহা ঢাকা দেওয়াই সেকালে শ্রদ্ধাবান ছাত্রদের গুণ বলিয়া লোকে মনে করিত। একালে অবশ্য ন্যায়পরায়ণ ছাত্রেরা পিতামাতা গুরুজন সকলেরই শাসনকর্ত্তা, কাহারও কোন দোষত্রুটি ভুলচুকের প্রশ্রয় দিতে পারেন না; অন্য উপায়ে না পারিলে ধর্মঘট দ্বারা তাঁহারা সকলকেই শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন।

—

কলিকাতা টাউন-হলে পাকিস্তান পরিকল্পনা ও বসু-লীগ চুক্তির বিরোধী সভা

গত ২৫শে বৈশাখ বুধবার কলিকাতার টাউন-হলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনার এবং কলিকাতা কর্পোরেশ্যনে সুভাষচন্দ্র বসুর দল ও মুসলিম লীগ দলের চুক্তির বিরুদ্ধে কলিকাতার হিন্দু পৌরজনের একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভা সম্বন্ধে কোন কোন দৈনিক কাগজে অনেক মিথ্যা ও আংশিক মিথ্যা কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত মিথ্যা ও আংশিক মিথ্যা কথার প্রতিবাদ ও ভ্রম প্রদর্শন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ, সভারম্ভের পূর্বে, সভার কাজ চলিবার সময়ে ও তাহার পরে কতকক্ষণ পর্য্যন্ত টাউন-হলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সব কিছু আমি দেখি নাই ও শুনি নাই—বস্তুতঃ কেহই সমস্ত দেখেন নাই শুনেন নাই; এবং যদি সমস্তই আমার দৃষ্টিগোচর ও কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলেও আমার যথেষ্ট অবসরের অভাব ও কাগজে স্থানের অভাবে সমস্ত কথা লিখিতে পারিতাম না। সেই জন্য, আমি স্বয়ং যাহা বলিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, তাহারই আবশ্যক কিয়দংশ লিখিব। কারণ, আমি এই সভার সভাপতিরূপে কার্য্যারম্ভের আগে হইতে গুণ্ডামি থামিয়া যাইবার পর পর্য্যন্ত টাউন-হলে ছিলাম বলিয়া

আমার এইরূপ কিছু লিপিবদ্ধ করা উচিত। এই প্রকার উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রের সাহায্যে কখন কখন পারস্পরিক পঙ্কনিক্ষেপ হইয়া থাকে। তাহা ঘৃণ্য।

—

কলিকাতা টাউন-হলে বসু-লীগ চুক্তির সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই

আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতা টাউন-হলের সভায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার কর্ত্তৃক সমর্থিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যাহার একটি অংশে সুভাষচন্দ্র বসু ও মুসলিম লীগের চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছিল। এইরূপ একটি প্রস্তাব যে উত্থাপিত বা গৃহীত হইয়াছিল, তাহার সংবাদ সভার সভাপতি আমি প্রথম দেখি সভার তারিখের পরবর্ত্তী দিন বৃহস্পতিবারের প্রাতঃকালের আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে। তাহার আগে ওরূপ কোন প্রস্তাব আমার নয়নগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই।

কোন সভায় কোন মূল প্রস্তাব বা সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে সভাপতির অনুমতি ও সম্মতি লওয়া আবশ্যক;—তাঁহার অনুমোদন না থাকিলেও, অন্ততঃপক্ষে তাহা তাঁহার জ্ঞাতসারে হওয়া উচিত ও হইয়া থাকে। উত্থাপিত ও গৃহীত বলিয়া কথিত নরেন্দ্রনারায়ণ বাবুর প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আমি তাঁহাকে অনুমতি দি নাই, তিনি যে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে বা অনুমান করিতে পারি নাই। তিনি মাইক্রোফোনের সম্মুখে এবং পরে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের সহিত সভাপতির টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া সভাপতিকে তাঁহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগপ্রদর্শনপূর্ব্বক কি যেন বলিতেছিলেন, ইহা আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। কিন্তু সভাস্থলে তখন এরূপ বীভৎস হট্টগোলআদি চলিতেছিল, যে, আমি তাঁহাদের চীৎকারের একটি কথা, বা একটি বর্ণও শুনিতে পাই নাই।

কোন প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হইবার পর যদি তাহার কোন বিরুদ্ধবাদ না হয়, তাহা হইলে সভাপতি তাহা গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে সভাপতি আমি তাহা করি নাই। করিবার কোন কারণই ঘটে নাই। কেননা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের তাৎকালিক দৈহিক দক্ষতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যে কোন-প্রস্তাব-বিষয়ক, তাহা আমার জ্ঞানগোচর, কিংবা আমার অনুমান বা কল্পনার বিষয়ীভূত ছিল না।

জনসাধারণের প্রকাশ্য সভার বৈধ রীতি অনুসারে নরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার সঙ্গীরা যাহা কিছু বলিতে করিতে চাহিবেন, তাহা তাঁহাদিগকে বলিতে করিতে দেওয়া হইবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা দেওয়া ও পাওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের রীতিবিরুদ্ধ আচরণের উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা উদ্যোক্তাদের আয়োজন পণ্ড করিতে চাহিয়াছিলেন।

—

টাউন-হলের সভায় গুণ্ডামি

পাকিস্তান পরিকল্পনার ও বসু-লীগ চুক্তির বিরুদ্ধে কলিকাতার টাউন-হলে যে সভা হইয়াছিল, তথায় অনুষ্ঠিত গর্হিত গুণ্ডামির বর্ণনা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে বড় বড় অক্ষরে "Clash And Free Fight Between Mahasabhites And The Public" ("মহাসভা-ওআলা ও জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষ ও অবাধ মারা-মারি") শিরোনামাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কাগজখানি নির্জলা মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন বলা যায় না, বরং সত্য যতটুকু বলিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদার্হ। বাস্তবিক ইহা সত্য, যে, যাহাদের সহিত হিন্দু মহাসভার লোকদের সংঘর্ষ হইয়াছিল, যাহারা হিন্দুসভার লোক-দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা, দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, নিশ্চয়ই জনসাধারণের অংশ। কিন্তু এই উপদ্রব-কারীরা জনসাধারণের কোন্ অংশ তাহা কাগজখানি বলেন নাই, যদিও লোকে ঠিক্ বুঝিয়া লইয়াছে।

—

প্রবাসী-সম্পাদকের সভাপতি হইবার অনিচ্ছার কারণ

গত ২৬শে বৈশাখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের একটি বিবৃতিতে দেখিলাম

তিনি আমার সম্বন্ধে কোন কোন কথা লিখিয়াছেন। বিবৃতি-যুদ্ধে আমি অনভ্যস্ত এবং তাহাতে আমার অরুচি আছে। কিন্তু পাকিস্তান ও বসু-লীগ চুক্তি সম্বন্ধে আমার মত স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত আমাকে কিছু লিখিতে হইবে। আমার হিতৈষীরা এরূপ অনুমান করিয়া অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্ন হইবেন না যে, আমি বিবৃত্যাঘাতের পাল্টা খেলোয়াড়ী করিতে থাকিব। মজুমদার মহোদয়া লিখিয়াছেন :—

"সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আসিলে আমি তাঁহাকে বলি যে পাকিস্তান পরিকল্পনার নিন্দা সকলেরই করা উচিত, কিন্তু ঐ পরিকল্পনার নিন্দার জন্য আহূত সভায় কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস লীগ চুক্তির সমালোচনা করা সঙ্গত হইবে না। চুক্তির সমালোচনা তাঁহারা অন্য কোন সভায় করিতে পারেন ; উহাতে ঐ চুক্তি সম্পর্কে জনমত কি তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইবে।

"ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও আমি অনুরূপ কথা বলি।

"উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, চুক্তি সম্পর্কে তাঁহার মত কাগজে ইতিপূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সভার সভাপতিত্ব করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি বন্ধুদের অনুরোধে সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন।"

উদ্ধৃত শেষ প্যারাগ্রাফের প্রথম বাক্যটি হইতে পাঠকেরা ঠিক্ বুঝিতে পারিবেন না আমি কেন বলিয়াছিলাম চুক্তি সম্পর্কে আমার মত কাগজে ইতিপূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। মজুমদার মহাশয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে অনেকের এই ভ্রম হইতে পারে, যে, যেহেতু চুক্তি সম্পর্কে আমার মত আগেই কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে, অতএব সভায় উহা আবার ব্যক্ত করা অনাবশ্যক, সেই জন্য আমি সভার সভাপতি হইতে চাই নাই ; এবং অনেকের এই ভুলও হইতে পারে যে, সভার উভয় উদ্দেশ্যের সহিত আমার সহানুভূতি ছিল না বা তৎসম্পর্কে আমি উদাসীন। বস্তুতঃ সভার উভয় উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল ও আছে।

প্রকৃত কথা এই যে, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার (এবং যত দূর মনে পড়িতেছে শ্রীযুক্তা লীলাবতী রায়ও) আমাকে বার-বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যে, আমি যেন আমার বক্তৃতার বসু-লীগ চুক্তি বিষয়ক অংশ সভায় না-পড়ি। তাহারই উত্তরে আমি এই মর্ম্মের কথা বলি, "কেন, ও-বিষয়ে আমার মত তো আগেই বাহির হইয়া গিয়াছে ; এখানে তাহা বলিলে ক্ষতি কি ?" তাহাতে তিনি (বা তাঁহারা) বলেন, কাগজে বাহির হওয়া এক কথা, এবং এখানে আপনার মুখ হইতে বাহির হওয়া ভিন্ন কথা।" যাহা হউক, আমি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করা উচিত বা আবশ্যক মনে করি নাই।

একাধিক উদ্দেশ্যে আহূত অনেক সভা আমরা দেখিয়াছি ; তাহাতে কোন দোষ হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সভাটির দুটি উদ্দেশ্যের পরস্পর সম্বন্ধ মোটেই নাই, বলা যায় না। মুসলিম লীগের সহিত চুক্তি যাহাদের দ্বারা হইতে পারে, ঐ লীগের পাকিস্তান-পরিকল্পনার কার্য্যতঃ প্রাণপণ বিরোধিতা তাহাদের দ্বারা হইবার সম্ভাবনা কম, সম্পূর্ণ বা অন্ততঃ কিছু রফা বরং সম্ভবপর। তাহার লক্ষণও কিছু দেখা গিয়াছে। সুভাষবাবুর ফরোআর্ড ব্লক কাগজে "কমন সেন্স" ছদ্মনামধারী এক ব্যক্তি যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে পাকিস্তানের পরোক্ষ সাফাই আছে।

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের সহিত দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার পুত্রেরা কেমন আছে। তিনি বলেন, ভাল আছে। এই প্রকার পারস্পরিক কুশল জিজ্ঞাসা সূত্রে আমারও স্বাস্থ্যের কথা উঠায় সেই প্রসঙ্গে সভাপতিত্ব করিবার অনিচ্ছার উল্লেখ করিয়াছিলাম।

আজকাল সভাপতিত্ব করিবার অনুরোধ এত বেশী আসে যে, অসুস্থ ও দুর্বল শরীরে বেশী সভায় সভাপতিত্ব করা অসুবিধাজনক ও দৈহিক ক্ষতিকর বলিয়া আমি টাউন-হলের সভায় সভাপতি হইতে অনিচ্ছুক ছিলাম ; মজুমদার মহাশয়ার বিবৃতি হইতে যেরূপ কারণ অনুমিত হইতে পারে, সেরূপ কোন কারণে নহে।

প্রবাসী-সম্পাদকের বক্তৃতায় বাধাদানের কারণ ও স্বরূপ

পাকিস্তান-পরিকল্পনার ও বসু-লীগ-চুক্তির বিরুদ্ধে কলিকাতার টাউন-হলে সভাপতির বক্তৃতায় যে বাধা

দেওয়া হইয়াছিল, তাহার একাধিক কারণ ঐ সভার বিরোধীরা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—ঐ লিখিত ইংরেজী বক্তৃতা পাঠক সভাপতির কণ্ঠস্বর ক্ষীণ বলিয়া মাইক্রোফোনের সাহায্যেও উহা শুনা যাইতেছিল না; কেহ বা বলিয়াছেন, মাইক্রোফোনটা বিগড়িয়া যাওয়ায় ভাল কাজ দিতেছিল না, এবং তজ্জন্য বক্তৃতা শুনা না-যাওয়ায় অনেক লোক চীৎকার করিতেছিল, ইত্যাদি। আমার কণ্ঠস্বরের ক্ষীণতাবশতঃ মাইক্রোফোনের সাহায্যেও তাহা শুনা যাইতেছিল কি না আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমি কোন কোন কাগজে ও বিবৃতিতে দেখিয়াছি যে, আমার কথা স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। বস্তুতঃ আমার পাশেই উপবিষ্ট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি অত উচ্চৈঃস্বরে না পড়িয়া সাধারণ স্বরে পড়ুন, তাহাতেই শুনা যাইবে।" যাহা হউক, যাহাতে কোন শ্রোতার কোন অভিযোগই না থাকে তন্নিমিত্ত আমি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমার বক্তৃতাটি পড়িতে দিয়াছিলাম। তাঁহার গলার স্বর আমার স্বরের চেয়ে দূরগামী ও উচ্চ। তিনি যখন পড়িতেছিলেন, আমি তখন শ্রোতা। তিনি মাইক্রোফোনের সাহায্যে ও বিনা-সাহায্যে, দুই রকমেই, বক্তৃতা পড়িয়াছিলেন। উভয় প্রকার পড়ার সময়েই মধ্যে মধ্যে কতকগুলি লোক চেঁচাইতেছিল।

উপদ্রবকারীরা যত রকম শব্দসমষ্টি তারস্বরে উচ্চারণ করিতেছিল, তাহার সবগুলি বুঝা যায় নাই। কিন্তু অনেকেই "বন্দে মাতরম্" এবং "সুভাষবাবু কী জয়" ধ্বনি শুনিয়াছিলেন। চীৎকার দ্বারা বক্তৃতায় বাধা দেওয়া উপদ্রবকারীদের মতে জননী জন্মভূমির পূজা এবং সুভাষবাবুকে জয়ী করিবার উপায় কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু ছোট ছোট বাইশ-পৃষ্ঠা-ব্যাপী সমগ্র বক্তৃতাটার মধ্যে প্রথম ১৮½ পৃষ্ঠার পাঠে বাধা দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। কারণ ঐ ১৮½ পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র পাকিস্তান-পরিকল্পনার প্রতিকূল সমালোচনা ছিল, এবং সভার বিরোধীদের মতেও ঐ পরিকল্পনা নিন্দারই যোগ্য। সুতরাং ঐ অংশ পঠিত হইবার সময় যে নানাবিধ চীৎকার হইতেছিল, তাহা বক্তার মতের সহিত ধ্বনিকারীদের মতের বৈপরীত্যপ্রসূত নহে, বক্তৃতাটা পড়িতে দেওয়া হইবে না এই প্রতিজ্ঞা ও হুকুমের ফল।

একটা খুব কৌতুকজনক ব্যাপারের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। বক্তৃতাটার শেষ ৩½ পৃষ্ঠায় বসু-লীগ চুক্তির প্রতিকূল সমালোচনা ছিল। আমি শ্রোতারূপে লক্ষ্য করিতেছিলাম, যে, নির্মলবাবু যখন এই অংশটি পড়িতেছিলেন তখন উপদ্রবকারীরাও অপেক্ষাকৃত নীরবে তাহা শুনিতেছিল। অর্থাৎ বক্তৃতার যে ১৮½ পৃষ্ঠায় তাহাদের সহিত সভাপতির মতের বৈপরীত্য ছিল না, সেই অধিকতর অংশ পাঠের সময় তাহারা যত গোলমাল করিয়াছিল, যে ৩½ পৃষ্ঠার সহিত তাহাদের মতের বৈপরীত্য ছিল বলিয়া বিরোধীরা বলিয়াছেন তাহা পাঠের সময় তাহারা তত গোলমাল করে নাই! ইহার কারণ কি? কখন্ কখন্ গোলমাল করিতে হইবে, সে বিষয়ে উপদ্রবকারীরা তালিমটা ঠিক্ রপ্ত করিতে পারে নাই বোধ হয়!

বিরোধী কাগজে দেখিলাম, বসু-লীগ চুক্তির সমালোচনা পঠিত হইবার সময় "withdraw", "withdraw" "প্রত্যাহার কর", "প্রত্যাহার কর" ধ্বনি হইয়াছিল। এরূপ কোন ধ্বনি বাস্তবিক উত্থাপিত হইয়াছিল কি না জানি না। উত্থাপিত হইয়া থাকিলেও আমি উহা শুনিতে পাই নাই। যদি শুনিতে পাইতাম তাহা হইলেও আমার বক্তৃতার কোনও অংশ প্রত্যাহার করিতাম না। যাহা সত্য ও ন্যায্য বলিয়া মনে করি, তাহা কেন প্রত্যাহার করিব?

এইরূপ আর একটা কথাও বাহির হইয়াছে যে, বার বার বাধা পাওয়ায় শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতাটা শেষ পর্য্যন্ত না-পড়িয়াই বসিয়া পড়িতে বাধ্য হন। ইহা মিথ্যা কথা। তিনি বক্তৃতার শেষ বাক্যের শেষ শব্দটি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ও তাহার পর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সভা সম্বন্ধে এত মিথ্যা কথা বিরোধীরা রটাইয়াছে যে, তাহাদের সব মিথ্যার প্রতিবাদ করিবার মত সময় আমার নাই, আমার কাগজে যথেষ্ট জায়গাও নাই।

—

রংপুতে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

রংপু হইতে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের গত ২৫শে বৈশাখ রচিত "অনন্ত আমি" কবিতাটি যে চিঠির মধ্যে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সেখানে কবির জন্মোৎসবের একটু বর্ণনা আছে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাহা ছাপিবার জন্য পাঠান নাই, কিন্তু আমরা তাহার কিয়দংশ ছাপিতেছি।

"এখানে ৫ই (মে) তারিখে গুরুদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা একটু উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলাম। ৩০০ পাহাড়ী ভুটিয়া লেপ্‌চা প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সব এদেশী গ্রাম্য লোক, কিন্তু কী তাদের আনন্দ! এক জন বৌদ্ধ বৃদ্ধ বুদ্ধের বন্দনা করলেন, সকাল বেলায় ওঁকে মালা পরালেন—সেই কথা কবিতায় লিখেছেন। বিকেল বেলা সবাই এল। তাদের খাওয়ান হল চা লুচি ইত্যাদি। উনি তাদের মাঝখানে বসে দেখলেন। ওঁর খুব ভাল লেগেছিল। সকলেই একটি একটি ছোট ফুল এনেছিল। কেউ বা তিব্বতী খদা বলে এক রকম গাছের সুতোর স্কার্ফ (scarf) পরাল। সেটা ওদের খুব সম্মানের জিনিষ। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন মেঘলা হয়ে অন্ধকার হয়েছিল। ছবি হয়ত ভাল ওঠে নি, যদিও অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি প্রিণ্ট ভাল হয় আপনাকে পাঠাব।"

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় ২২৫।২২৬ পৃষ্ঠায় কবি রংপুর এই উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেক বৎসর আগে কবি যখন তাঁহার এক জন্মদিনে চীন দেশে ছিলেন তখন সেখানকার লোকেরা আপনাদের শিশুদের জন্মদিনে তাহাদিগকে সবুজ রঙের কাপড়ের যে রকম পোষাক দেয় তাঁহাকেও সেই রকম পোষাক দিয়াছিল। চীন হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর কলিকাতায় তাঁহার যে সংবর্দ্ধনাসভা হয় কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, তাহাতে তিনি ঐ চৈনিক পরিচ্ছদ পরিয়া সভাস্থ সকলকে দেখাইয়াছিলেন। রংপুর লোকেরাও দেখিতেছি তাঁহার জন্মোৎসবে তাহাদের স্থানীয় রীতি অনুযায়ী কিছু অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

যাঁহারা কবির ভাষা বুঝে না, তাঁহার কবিতা ও অন্য রচনাবলী অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত আনন্দ ও কল্যাণের অংশী হইতে পারে না, তাহারাও যে তাঁহাকে প্রীতি করে ও সম্মান প্রদর্শন করে, ইহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ব্যাপক প্রভাব উপলব্ধ হয়।

—

পার্লেমেণ্টে গত ভারতীয় তর্কবিতর্কের বিশেষত্ব

গত ১৮ই এপ্রিল ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তাহাকে বিতর্ক (debate) না বলিয়া আলোচনা বলা অধিকতর সঙ্গত। ঐ আলোচনার একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে বিলাতী ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে-সব সদস্য যে-সব বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সকলগুলিতেই এই মত ব্যক্ত হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি রচনা করা ভারতবর্ষেরই—ভারতীয় নেতাদেরই—কাজ, তাঁহাদিগকেই ইহা করিতে দেওয়া উচিত এবং এই শাসনবিধি ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস অনুযায়ী হইবে। ভারতবর্ষের প্রতি এই বন্ধুসুলভ প্রসন্ন দৃষ্টি কি পরিমাণে যুদ্ধে সঙ্কট অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ফল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে, যখন যে-সকল মত বিলাতে ব্যক্ত হয়, তাহাতে অতিরিক্ত আশান্বিত ও উৎফুল্ল না হইয়া তাহা আমাদের কাজে লাগান উচিত। কোন ইংরেজ যদি বলে, তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি নিজেই রচনা কর, তাহা হইলে তাহার বাক্যে আন্তরিকতা আছে কিনা, বা কি পরিমাণ আছে, তাহার বিচার করা অপেক্ষা, শাসনবিধি রচনা করিবার অধিকার অবিলম্বে দাবী ও আদায় করিবার চেষ্টা করা অধিক আবশ্যক।

১৮ই এপ্রিলের আলোচনায় পার্লেমেণ্টের টোরী হইতে শ্রমিক সদস্যেরা কি প্রকারে ভারতবর্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার সমর্থন করিয়াছিলেন, ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় ব্যাপার সংপৃক্ত ব্রিটিশ কমীটির অবৈতনিক সম্পাদক মেজর গ্রেহাম পোল তাহা মডার্ণ রিভিয়ুর জুন সংখ্যায় প্রকাশিতব্য একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন।

বিলাতী বন্ধুরা পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা তো করিলেন, কিন্তু সকলে মিলিয়া এরূপ একটা দস্তুরমত প্রতিজ্ঞা (resolution) কেন করিলেন না, যে, ভারতীয় নেতৃবর্গকে ডোমীনিয়ন স্টেটাস অনুযায়ী একটি শাসনবিধি

রচনা করিবার অধিকার দেওয়া হউক এবং ঐ বিধি যুদ্ধ শেষ হইবার অনধিক এক বৎসরের মধ্যে চালু করা হইবে ?

—

সমবায় স্বাস্থ্যসমিতি সম্বন্ধে বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর মত

সমবায় নীতি অনুসারে গঠিত কতকগুলি স্বাস্থ্যসমিতি বীরভূম জেলায় আছে। তাহার কয়েকটি বিশ্বভারতী স্থাপন করিয়াছেন, কয়েকটি তথাকার কোন কোন জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্থাপিত। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী আবুল কাসেম ফজলল হক বীরভূম জেলায় সফর করেন তখন তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে যশপুর গ্রামের স্বাস্থ্যসমিতি দেখান। তাহার পরিদর্শন-পুস্তকে মান্যবর প্রধান মন্ত্রী এই মন্তব্য লিখিয়াছিলেন :—

"I had the privilege of visiting the Jashpur Health Society this afternoon. The institution owes its inception to the brilliant and inspiring ideas of the District Judge, Mr. B. K. Guha, I. C. S., in translating the basic principles of co-operation into actual practice. The Society has become not only self-supporting, but is gradually acquiring financial stability by building up a reserve fund. The best compliment I can pay to the Institution is by declaring my intention of introducing similar institutions in other parts of the province."

এই মন্তব্যে প্রধান মন্ত্রী যশপুরের স্বাস্থ্যসমিতির ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা জজ ব্রজকান্ত গুহ মহাশয়ের সুখ্যাতি করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, "এই প্রতিষ্ঠানটির উৎকৃষ্টতম প্রশংসা আমি বাংলা প্রদেশের অন্যান্য অংশে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াই করিতে পারি।"

প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের অভিপ্রায় আন্তরিক ছিল না বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার পর আট মাস গত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গের কোন জেলাতেই তিনি বা তাঁহার সহকর্মী কোন মন্ত্রী এ পর্য্যন্ত সমবায় স্বাস্থ্যসমিতি স্থাপন করেন নাই। অভিপ্রায় প্রকাশ না-করায় কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রকাশ করিয়া তদনুযায়ী কাজ না করিলে ক্ষতি আছে।

—

বাঁকুড়ায় প্রস্তাবিত মিউজিয়াম

বাঁকুড়ায় প্রস্তাবিত মিউজিয়াম সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যায় কিছু লিখিবার কথা ছিল। কিন্তু তথাকার প্রাচীন একটি মূর্ত্তিরও এখনও প্রকাশযোগ্য ফোটোগ্রাফ প্রস্তুত না হওয়ায় এবার কিছু লিখিলাম না। বাঁকুড়ায় এখন গরম অত্যন্ত অধিক, ফোটোগ্রাফ তোলা কঠিন। তাহা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কিছু ফোটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। আগামী সংখ্যায় তাহার মধ্যে কোন কোনটি ছাপিতে পারিব আশা করিতেছি।

—

দাশ ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখা খোলা

গত ২৬শে বৈশাখ কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের প্রতিষ্ঠিত হাওড়ার দাশ ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখা খোলা হইয়াছে। দাশ ব্যাঙ্কের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ ইহা নূতন নূতন পণ্যশিল্প কারখানা স্থাপন করিবে কিংবা দীর্ঘ মিয়াদে অল্প সুদে থোক টাকা ঐ প্রকার কারখানা স্থাপনেচ্ছু লোকদিগকে ধার দিয়া তাঁহাদিগকে তাহা স্থাপন করিতে সমর্থ করিবে। এই জন্য দাশ ব্যাঙ্ক এক কোটি টাকা মূলধন তুলিবে। এক কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের বহু কোটি টাকা গচ্ছিত থাকিবে। সুতরাং এইরূপ ব্যাঙ্ক দ্বারা বঙ্গে পণ্যশিল্পের কারখানা অনেক বাড়িতে পারিবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বঙ্গে যে এই প্রকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের প্রয়োজন আছে, তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। বিহার গবর্ন্মেণ্টের লাক্ষা-গবেষণা-কার্য্যের ডিরেক্টর ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বাংলা দেশে নানাবিধ পণ্যশিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিস্তর লোক আছেন, উপযুক্ত মূলধনের ব্যবস্থা হইলে তাঁহাদের সাহায্যে অনেক পণ্য-শিল্প-কারখানা স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়া বঙ্গের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ কৃতী ব্যক্তি। অল্প বয়সে তিনি ফেরিওআলার কাজও করিয়াছেন, আবার এখন একটি পাটের কল এবং নানাবিধ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি নির্মাণের বিশাল কারখানা চালাইতেছেন। সম্প্রতি এই কারখানায় সুদূর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে পাঁচ লক্ষ টাকার যন্ত্রের ফরমায়েস আসিয়াছে। ফিলিপাইন্স এখনও আমেরিকার 'উপনিবেশ' এবং জাপান তাহাদের নিকটে অবস্থিত। তাহারা আমেরিকা বা জাপানে যন্ত্রপাতির অর্ডার না দিয়া বাঙালীর কারখানায় অর্ডার দিল, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ যে ব্যাঙ্কটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তাহারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মূল ব্যাঙ্কটি স্থাপনের প্রস্তাব তিনি অল্প কয়েক মাস মাত্র করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই সাত লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রী হইয়াছে। বড়বাজার শাখা ২৬শে বৈশাখ সন্ধ্যার সময় খোলা হয়। সেই দিন তাহার পূর্বেই এক শতের উপর আমানতকারী ঐ শাখায় হিসাব খুলেন, তাহার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক অ-বাঙালী। এই শতাধিক আমানতকারীরা প্রথম দিনেই লক্ষাধিক টাকা আমানত দিয়াছেন।

—

ফেরিওআলার 'পয়'

দাশ ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখা খোলার দিন শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহাতে তিনি যে এক সময় ফেরিওআলা ছিলেন তাহার উল্লেখ ছিল। অল্পদিন আগে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ট্রাস্ট হাউসের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে নির্বাহিত হইবার সময় যোগেশবাবুও তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, তিনি এক সময় ফেরিওআলা ছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ফেরির কাজ পয়া পেশা! অবশ্য ফেরি করিলেই পরে কৃতী ও ধনী হইতে পারা যাইবে, মনে করিলে তাহা ভুল হইবে। সৎ হওয়া চাই, পরিশ্রমী হওয়া চাই, মিতব্যয়ী হওয়া চাই, ব্যবসাবুদ্ধি থাকা চাই, এবং এই সকল যোগ্যতার সমাবেশে লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই।

—

ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী বাঙালী

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীদের চেয়ে বর্ত্তমানে অ-বাঙালীরা বেশী কৃতী হওয়ায় অনেকের এইরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীদের বুদ্ধি কম এবং অন্যবিধ যোগ্যতাও স্বভাবতঃ কম। তাহা সত্য নহে। তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা মধ্যে মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী বাঙালীদের জীবনী ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ ছাপিয়া থাকি। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমার্শ্যাল মিউজিয়ম এ বিষয়ে একটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও বৃহৎ আয়োজন করিয়াছেন। গত ২৬শে বৈশাখ ইহার "শিল্প প্রবর্ত্তক" প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের গোড়া হইতে এ-পর্য্যন্ত যে-সমস্ত বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, এই প্রদর্শনীতে তাঁহাদের জীবনী, ছবি, এবং আবিষ্কৃতি ও কীর্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রক্ষিত হইয়াছে। অল্পবয়স্ক লোকেরা—এবং বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়েরাও—এই প্রদর্শনীটি দেখিয়া উপকৃত ও উৎসাহিত হইবেন। কমার্শ্যাল মিউজিয়াম এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া দেশের উপকার করিয়াছেন।

—

সভায় গুণ্ডামি

আমরা আগে আগে জনসাধারণের প্রকাশ্য সভায় গুণ্ডামির কথা খবরের কাগজে পড়িতাম। কলিকাতার টাউন-হলে পাকিস্তান ও বঙ্গ-লীগ চুক্তির বিরোধী সভায় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই অভিজ্ঞতা দুঃখকর ও লজ্জাজনক। উপদ্রবকারী আমি নহি, এরূপ কিছু ভবিয়া সান্ত্বনা পাইতেছি না। উপদ্রবকারীরা ভিন্ন দলের লোক, ইহাও ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। আমি কোন দলের নহি। রাজনৈতিক গুণ্ডারা বাঙালী, আমিও বাঙালী; সুতরাং তাহাদের লজ্জাজনক অপকীর্তি আমারও মাথা হেঁট করিতেছে। সকলের

চেয়ে অধিক ব্যথা ও লজ্জা পাই উপদ্রবকারীদের সঙ্গে কোন কোন মহিলাকে দেখিয়া।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি যে-দলেরই লোক হউন, তিনি আঘাত পাওয়ায় আমি দুঃখিত।

—

অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে ইচ্ছাকৃত আঘাত

যে-সব বিষয়ে গুরুতর মতভেদ আছে, সেই সকল বিষয়ে সভা হইলে উত্তেজনা ও হট্টগোলের মধ্যে জনতার চাপে অনেকে আহত হয়। তাহাদের আঘাত কাহারও ইচ্ছাকৃত না হইতে পারে। কিন্তু চেয়ার, সোডা ওআটারের বোতল, ইট পাটকেল আপনা হইতে কাহারও কাহারও হাতে উপস্থিত হইল, আপনা হইতে কাহারও প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল, এরূপ হয় না। বিশেষতঃ, ইহা ত অকস্মাৎ, স্বভাবতঃ, হয়ই না যে, এক জনের আঙুল ব্যক্তিবিশেষকে দেখাইয়া দিল এবং পরমুহূর্ত্তে তিনি অন্য এক জন কর্ত্তৃক প্রহৃত ও আহত হইলেন।

কলিকাতা টাউন-হলের পাকিস্তান ও বঙ্গ-লীগ চুক্তির বিরোধী সভায় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন সপ্ততিপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় ভীড়ের মধ্যে ছিলেন না, এক পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। হট্টগোল ও গুণ্ডামির সময় এক জন লোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা তাঁহাকে চিনাইয়া দিল এবং তাহার পর অপর এক ব্যক্তি তাঁহার মাথায় আঘাত করিল, নেপালবাবু স্বয়ং এই কথা জানাইয়াছেন। আঘাতের ফলে প্রচুর রক্তপাত হইয়াছে। সারিতে কত দিন লাগিবে বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এই সভার এক জন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে তিনিই আমাকে সভাপতি হইবার অনুরোধ জানান।

—

পেশাদার সাক্ষী ও পেশাদার বিবৃতিলেখক

আদালতের বিচারক ও আইনজীবীরা এবং যাঁহাদিগকে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে মোকদ্দমা করিতে হয়, তাঁহারা পেশাদার সাক্ষী নামক এক শ্রেণীর লোক আছে জানেন। বিচারকেরা সহজেই সেই রকম সাক্ষী চিনিতে পারেন ও তাহাদের সাক্ষ্যের মূল্য নিরূপণ করিতে পারেন।

আজকাল দৈনিক কাগজে স্টেটমেণ্ট অর্থাৎ বিবৃতির প্রাচুর্য্য দেখিয়া সন্দেহ হয়, যে, শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যে-সকল বিবৃতির গুরুত্ব ও জনহিতার্থ প্রয়োজন আছে, সেগুলি বাদ দিলে, পেশাদার বিবৃতিলেখকদের লেখা বিস্তর বিবৃতিও নানা কাগজে ছাপা হইতেছে।

—

সম্মানজনক আপোষ সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তি

বোম্বাই, ১০ই মে

"সম্মানের সহিত শান্তি স্থাপনের জন্য কোন মীমাংসার পথ যদি উদ্ভাবন করা যায়, তাহা হইলে আমি উহা সাদরে গ্রহণ করিব। বড়লাট জানেন যে মীমাংসার জন্য আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত।" "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহাত্মাজী প্রসঙ্গক্রমে উপরোক্ত কথা বলেন।

সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া মহাত্মাজী আরও বলেন, "দেশ-রক্ষা, বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপার ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে ব্রিটেনের সহিত আপোষের বিরোধী আমি নহি। মীমাংসা সম্পর্কে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকিলে উক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের ভার গণ-পরিষদের উপর ন্যস্ত করিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

গণপরিষদ সম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস আপোষ-মীমাংসার পথে অগ্রসর হইবার উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক উপায়; তাই বলিয়া ভুলিবেন না যে, এ বিষয়ের প্রত্যেকটি ব্যাপারের উপর আমার সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে। যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন যে গণপরিষদ অপেক্ষা অধিকতর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মীমাংসা সম্ভব, তবে বুঝাইয়া দিলে আমি তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত। আজ আমি বলিতেছি যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমার এই অভিমতও আমি পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত, যদি অপর কোন প্রকৃষ্টতর প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। অবশ্য সেই প্রস্তাব প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই।"

সংবাদদাতা মহাত্মাকে প্রশ্ন করেন, "বড়লাট যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য ইংরেজ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয়দের লইয়া একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এবং যথাসম্ভব সত্বর ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য, বড়লাট যদি একথা স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনি কি বড়লাটের সেই ইঙ্গিত স্বীকার করিয়া লইবেন?"

উত্তরে মহাত্মাজী বলেন, "নিশ্চয় আমি তাহাতে সম্মত হইব। মতানৈক্য সম্বন্ধে মীমাংসার আলোচনার জন্য প্রথম যে সম্মেলন আহ্বান করা হইবে তাহাতে ব্রিটেন ও ভারতের নির্ভর-শীল প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দই থাকিবেন।"

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই

মন্মে ঘোষণা প্রচার করিতে বড়লাটকে নির্দ্দেশ যদি দেওয়া হয় যে তাহারা সুনির্দ্দিষ্টভাবে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষই ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় পূর্ণ অধিকারী এবং সেই উদ্দেশ্যে বড়লাট যদি নির্ভরযোগ্য শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয়দের লইয়া একটি বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন যে-বৈঠকে যুক্তিসঙ্গত পন্থায় ভারতীয় সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন এবং যে বৈঠক ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা ও অন্যান্য সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য গণপরিষদ আহ্বানের উপায় নিদ্ধারণ করিয়া দিবে, তাহা আমি গ্রহণ করিব। কিন্তু বর্ত্তমানে তদনুকূল কোন ভাব আমি লক্ষ্য করিতেছি না।"

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যদি একটি বৈঠক আহ্বান করেন এবং সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ করেন তবে কংগ্রেসী মন্ত্রিদিগকে পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করাইবার জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাইবেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "হিন্দু-মুসলমান চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নয়। সে পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করাই উচিত।"

গণপরিষদ (constituent assembly) দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্বাহের সম্পূর্ণ উপযোগী উৎকৃষ্ট একটি শাসনবিধি রচিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।

—

স্বরাজের একটি মোটামুটি পরিকল্পনা

বর্ত্তমান সময়কে জাতীয় জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। গণপরিষদ দ্বারা বা অন্য উপায়ে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি রচিত হইবার কথা এখন আলোচিত হইতেছে। এমন সময়ে মান্দ্রাজের নিউ ইণ্ডিয়া লীগ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও ডক্টর ভগবান দাস কর্ত্তৃক প্রণীত স্বরাজের পরিকল্পনার কাঠামোটি পুনঃপ্রকাশ করিয়া একটি বিশেষ সময়োচিত কাজ করিয়াছেন। ইহা অধ্যয়ন ও আলোচনার যোগ্য।

—

"রফা-বিরোধী প্রচেষ্টা"

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সাম্রাজ্যবাদের সহিত রফার বিরোধী যে সম্মেলন রামগড়ে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাহার আগে ও পরে রফা-বিরোধী যে প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন, আমরা তাহার একান্ত বিরোধিতা করি নাই, বরং ইহা মনে করিয়াছিলাম যে, এরূপ প্রচেষ্টা গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরদিগকে বেশী নরম হইয়া পড়া হইতে রক্ষা করিতে পারে, সুভাষবাবুর এরূপ ধারণা থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি ও তাঁহার দল কলিকাতা কর্পোরেশ্যনে মুসলিম লীগের সহিত চুক্তি করায় এবং বঙ্গের মন্ত্রিসভায় অংশীদারির চেষ্টা করায় তাঁহার ও তাঁহার দলের "রফা-বিরোধী প্রচেষ্টার" আন্তরিকতা থাকিতেও পারে, এরূপ অনুমান আমরা আর করিতে পারিতেছি না। যাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালকদিগের সহিত সত্যসত্যই সংগ্রাম করিতে চান, তাঁহারা উক্ত পরিচালকদিগের তাঁবেদারদের নেক-নজর প্রার্থী হইতে পারেন না।

আমরা বাংলা দেশের—এবং ভারতবর্ষের—রাজনৈতিক দলাদলিতে নির্লিপ্ত থাকিতে চাই। পূর্বে "রফা-বিরোধী সম্মেলন" ও তৎসংপৃক্ত প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়াই সে বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান ধারণা জানাইলাম। যদি পরে এই ধারণার পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহা জানাইব।

—

প্রকৃত নারীহন্তার শাস্তি হইল না

সুজাতা সরকারের মোকদ্দমা বলিয়া সুবিদিত মোকদ্দমার নিম্ন আদালতে ও হাইকোর্টে বিচারকেরা এক বা একাধিক দুর্বৃত্ত ধনীকে মূল অপরাধী বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু তাহাকে বা তাহাদিগকে ধরিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। পুলিসের পক্ষ হইতে এবং নিম্ন আদালতে ও হাইকোর্টে যাঁহারা সরকার পক্ষে মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষ হইতে তাহাকে বা তাহাদিগকে ধরিবার ও দণ্ডিত করিবার যথোচিত চেষ্টা হইয়াছিল কি? রাজনীতি-ঘটিত সামান্য সন্দেহও কাহারও সম্বন্ধে হইলে রাষ্ট্রের প্রভূত শক্তি তাহাকে শাস্তি দিতে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু সমাজস্থিতির মূলে যে-সকল দুর্বৃত্ত আঘাত করে, তাহারা অবস্থাবিশেষে রাজদণ্ড ও সমাজদণ্ড উভয়কেই ব্যাহত করিতে পারে দেখা যাইতেছে।

ইহা রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই জরা সূচিত করে—বিশেষ করিয়া সমাজের অসাড়তা প্রমাণ করে।

—

পাকিস্তান সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত

মহাত্মা গান্ধী পাকিস্তান-পরিকল্পনার বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন, "যদি ভারতবর্ষের মুসলমানেরা বাস্তবিক ভারতবর্ষের প্রস্তাবিত দ্বিখণ্ডীকরণে নির্বন্ধাতিশয় দেখায় (অর্থাৎ জেদ করে) তাহা হইলে আমি অহিংস মানুষ বলিয়া বলপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাতে বাধা দিতে পারি না। কিন্তু এই জীবন্তব্যবচ্ছেদের আমি কখনও ইচ্ছুক অংশী হইতে পারি না। ইহা যাহাতে না ঘটে, তন্নিমিত্ত সর্বপ্রকার অহিংস উপায় অবলম্বন করিতে চাই।" গান্ধীজী অহিংসা বলিতে যাহা বুঝেন, আমরা ঠিক তাহা বুঝি না।

দৈহিক বলপ্রয়োগ মাত্রকেই আমরা হিংসা মনে করি না। যাহা হউক গান্ধীজী যে তাঁহারই মানিত অর্থ অনুসারে সর্ববিধ অহিংস উপায়ে ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডীকরণ নিবারণ করিতে প্রস্তুত, ইহাও ভাল।

কিন্তু তিনি যে আর একটা কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা মোটেই সমর্থনযোগ্য মনে করি না। তিনি বলিয়াছেন, "We are at present a joint family. Any member may claim a division;"—"আমরা এখন একটি যৌথ বা মিলিত পরিবার, এই পরিবারের যে-কোন সভ্য বিভাজন দাবী করিতে পারে।" এটা বেজায় ব্যবহারজৈবিক ব্যবস্থা! বরদাস্ত করা যায় না। কোন রকম একটা উপমাত্মক বা তুলনাত্মক কথা বলিলেই তাহা সুযুক্তিতে পরিণত হয় না। এইরূপ ঔপম্যের বলে ইহাও তো বলা চলে, এক পিতামহের বা পিতামহীর যত নাতি নাতিনী আছে, সবাই বৃদ্ধের বা বৃদ্ধার এক-একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাগ করিয়া লইতে অধিকারী। আমরা বলি, বুড়া বুড়ীর প্রাণবধ না করিয়া যাহা করা চলে, তাহা বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রাণ লইয়া টানাটানি করা চলে না। ভারতবর্ষকে দুই তিন চারি ভাগে বিভক্ত করিলে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, স্বাজাত্য, বৈশিষ্ট্য—সবই বিপন্ন হইবে; তাহার পক্ষে স্বাধীনতালাভ অসম্ভব হইবে। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইত, তাহা হইলে খণ্ডীকরণে তাহার স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষমতা ও সুতরাং স্বাধীনতা লুপ্ত হইত। ভারত দ্বিখণ্ডীকরণ প্রসঙ্গে প্রাণবান পিতামহ-পিতামহী-বিভাজনের কথা তুলিলাম এই জন্য, যে, গান্ধীজী জীবন্তব্যবচ্ছেদ (vivisection) শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন যে, একটি গভীর অর্থে এক-একটি মহাজাতির ও দেশেরও প্রাণ আছে, বিশিষ্ট স্বভাবচরিত্র আছে; বিভাজনে তাহা নষ্ট হয়।

যদি ভারতীয় মহাজাতিকে একটা যৌথ পরিবার মনে করা যায় এবং সকলেরই ইহাকে বিভক্ত করিয়া এক-একটা অংশ লইবার অধিকার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দিক্ দিয়া ভারতবর্ষকে হিন্দু জৈন বৌদ্ধ পারসীক খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান শিখ···অংশে বিভাজনে রাজী হইতে হইবে, নৃতত্ত্বের দিক্ দিয়া তথাকথিত 'আর্য্য' দ্রাবিড় মোঙ্গল সাঁওতাল ওরাঁও ভীল টোডা প্রভৃতি অংশে বিভাজনে রাজী হইতে হইবে, এবং ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া ন্যূনকল্পে তিন-চার গণ্ডা অংশে বিভাজনে সম্মত হইতে হইবে। এই প্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণে (self-determinationএ) কোন প্রকৃতিস্থ লোক রাজী হইতে পারে না। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেবল যে সংখ্যালঘুদেরই আছে এমন নহে, সংখ্যাগরিষ্ঠদেরও আছে। সংখ্যালঘুরা যদি বলেন, ভারতবর্ষকে ভাগ করিতে হইবে, সংখ্যাগরিষ্ঠেরা বলিবেন ভারতবর্ষকে এক ও অখণ্ড রাখিতে হইবে। এরূপ স্থলে সংখ্যালঘুদের কথা অনুসারেই কেন কাজ হইবে? সংখ্যাগরিষ্ঠেরা কি বানে ভাসিয়া আসিয়াছে?

পাকিস্তানের পাণ্ডারা ধরিয়া রাখিয়াছেন, ব্রিটিশ সরকারের প্রদেশভাগ অনুসারে মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলি পাকিস্তানের মধ্যে পড়িবে। কিন্তু কোন কোন প্রদেশের সীমানা ব্রিটিশ আমলেও বার-বার বদলাইয়াছে, সুতরাং পাকিস্তান হিন্দুস্থান এই দুই ভাগে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলে বাংলা পঞ্জাব প্রভৃতির হিন্দুপ্রধান জেলাগুলি, এমন কি কলিকাতার মত হিন্দুপ্রধান শহরগুলিও, হিন্দুস্থানের অন্তর্গত হইতে চাহিবে। গ্রামগুলিও এইরূপ দাবী করিতে পারে। বাহুবল ও অস্ত্রবল ভিন্ন এই রকম দাবী উপেক্ষা করা চলিবে না।

নানা দেশে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, একদা দুটি স্ত্রীলোক উভয়েই একটি শিশুর মা বলিয়া দাবী করিয়া বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়। বিচারক বলেন, "আমি স্থির করিতে পারিতেছি না বাস্তবিক কে মা; অতএব শিশুটিকে দু-টুকরা করিয়া তোমরা দু-জনে এক এক টুকরা লও।" যে বাস্তবিক মা নহে, সে বিচারকের এই নির্দ্দেশে রাজী হইল, কিন্তু যিনি প্রকৃত মা তিনি বলিলেন, "শিশুটিকে না কাটিয়া অন্য স্ত্রীলোকটাকেই দেওয়া হউক।" তখন, বিচারক বুঝিতে পারিলেন যিনি দ্বিখণ্ডীকরণ চান নাই তিনিই প্রকৃত মা এবং তাঁহাকেই শিশুটি দিলেন।

ভারতবর্ষকে ভাগ করা ত শুধু জমি ভাগ নয়, ভাগ করিলে উহার প্রাণবধ করা হইবে।

উপরে যে প্রাচীন গল্পটির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে যে উপদেশ পাওয়া যায় তদনুসারে বলিতে পারা যায়, যাহারা ভারতজননীকে দ্বিখণ্ডিত করিতে চায়, তাহারা ভারতবর্ষের সন্তানত্বের দাবী করিতে পারে না।

সুখের বিষয় গত মাসে দিল্লীতে সর্বাধিকসংখ্যক মুসলমান সমিতিসমূহের প্রতিনিধি ও সভ্যেরা বিরাট্ সভায় মিলিত হইয়া বলিয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের বিভাজন চান না।

—

দেশবিভাজনের বিরোধিতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিমে পর্ব্বতমালা এবং পূর্ব্ব,

পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র থাকায় ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক একত্ব সন্দেহাতীত। এই একত্ব সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক একত্ব বিদ্যমান এবং কোন কোন যুগে রাষ্ট্রিক একত্বও প্রায় ঘটিয়াছিল। এখন ত রাষ্ট্রিক একত্ব রহিয়াছেই।

যে ভূখণ্ডকে এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়, ভারতবর্ষের মত ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক একত্ব তাহার নাই। ভারতবর্ষের মত প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক একত্ব তাহার ছিল না। তাহার অধিকাংশ অধিবাসীর পূর্ব্বপুরুষেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে আমেরিকায় বসবাস করে। এহেন দেশে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি উত্তরের রাষ্ট্রগুলি হইতে আলাদা হইতে চায়। দক্ষিণ দাসত্ব-প্রথা বজায় রাখিতে চায়, কারণ নিগ্রো দাসদের মজুরী তাহার পক্ষে লাভজনক ছিল। উত্তর দাসত্ব-প্রথার বিরোধী এবং তাহার উচ্ছেদকামী ছিল। উত্তর ও দক্ষিণের বিবাদের ইহাই প্রধান কারণ। উত্তর দক্ষিণকে ইহা বলিতে দিল না, "আমরা যৌথ পরিবারের অংশ, বিভাজন দাবী করিতে অধিকারী।" যদি বলিতে দিত তাহা হইলে আমেরিকার বহু রাষ্ট্রে দাসত্ব-প্রথা এখনও প্রচলিত থাকিত, উত্তরের রাষ্ট্র বা দক্ষিণের রাষ্ট্র কোনগুলিই নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিত না, আমেরিকায় একটি অখণ্ড প্রবল সমৃদ্ধিশালী সুশিক্ষিত সংস্কৃতিমান দেশ ও জাতির অভ্যুত্থান হইত না, এবং তদ্দ্বারা মানবমণ্ডলীর যে হিত ও প্রগতি সাধিত হইয়াছে, তাহাও হইত না। সেই জন্য উত্তর দক্ষিণকে পৃথক্ হইতে দিল না, বরং ঘোরতর গৃহযুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিয়া দেশের অখণ্ডত্ব রক্ষা করিল এবং দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিল। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায়ে এই ফল লব্ধ হইতে পারিত কিনা, শুভ-ফল-লাভার্থ-যুদ্ধও ভাল না মন্দ—এরূপ কোন প্রশ্নের আলোচনা এখানে করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলি একত্র থাকায় তাহাদের উভয়েরই মঙ্গল হইয়াছে এবং জগতেরও কল্যাণ হইয়াছে—তদ্দ্বারা মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাধীনতা রক্ষা ও বৃদ্ধির সুবিধা ও সাহায্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ অবিভক্ত ও অখণ্ড থাকিলে তাহার স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষার সুবিধা হইবে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমিক অভিব্যক্তি হইতে থাকিবে, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য ও ভারতীয়দিগের সুখ-সুবিধা বাড়িবে এবং এই শুভফলগুলি সকল দিকে জগতের কল্যাণের কারণ হইবে; নতুবা হইবে না।

ইহা নিশ্চিত যে, ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত না-করিলে মুসলমানদেরও মঙ্গল হইবে এবং তাহারা নিজ বলে ও হিন্দুর বলে শক্তিমান হইবে। কিন্তু দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিলে তাঁহারা স্বাধীন হইতে ও থাকিতে পারিবে না, অখণ্ড ভারতে থাকিলে জ্ঞানে ও ধনে যত অগ্রসর হইতে পারিবার সম্ভাবনা পাকিস্তানে তাহা হইতে পারিবে না, এবং ভারতবর্ষে দীর্ঘকালস্থায়ী নানাবিধ গৃহযুদ্ধ লাগিয়া থাকায় উভয় পক্ষের ধনক্ষয় শক্তিক্ষয় ও অন্যবিধ ক্ষয় হইতে থাকিবে। পাকিস্তানের পক্ষপাতী মুসলমানদের ইহাও বুঝা উচিত, যে, তাহাদের পরিকল্পনা-অনুযায়ী পাকিস্তান আয়তনে, লোকসংখ্যায়, ধনবলে, ও অন্য নানা বিষয়ে হিন্দুস্থানের সমকক্ষ না হইয়া নিম্নস্থানীয়ই হইবে, কিন্তু অখণ্ড ভারতে সকলে বাস করিলে সকলেরই শক্তি সমৃদ্ধি ও গৌরব বাড়িবে।

—

মুসলমান রাজত্বে বাস সম্বন্ধে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী একাধিক বার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি মুসলমান শাসনাধীন হইতে রাজী আছেন, কারণ তাহাও ভারতীয় শাসন। তাঁহার এই সমুদয় উক্তির সবগুলি উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"My hope in desiring a Constituent Assembly is that whether the Muslims are represented by the Muslim League mentality or any other, the representatives when they are face to face with the reality will not think of cutting up India according to religions but will regard India as an indivisible whole and discover a national, *i. e.*, Indian, solution of even specially Muslim questions. But if the hope is frustrated, the Congress cannot forcibly resist the express will of the Muslims of India. Needless to say the Congress can never seek the assistance of British forces to resist the vivisection. It is the Muslims who will impose their will by force singly or with British assistance on an unresisting India. If I can carry the Congress with me, I would not put the Muslims to the trouble of using force. I would be ruled by them, for it would still be Indian rule."—*Harijan*, March 23, 1940.

তাৎপর্য্য। আমি যে আশায় গণপরিষদ আহ্বানে অভিলাষী, তাহা এই যে, তাহার মুসলমান প্রতিনিধিরা মুসলিম লীগ মনোভাবাপন্ন বা অন্য যেরূপই হউন, তাঁহারা বাস্তবের সম্মুখীন হইলে ভারতবর্ষকে ধর্ম্ম অনুসারে কাটিবার চিন্তা মনে স্থান দিবেন না, কিন্তু ভারতবর্ষকে একটি অবিভাজ্য সত্তা মনে করিবেন এবং যে-সব প্রশ্ন বিশেষভাবে মুসলমানী সেগুলিরও জাতীয় অর্থাৎ ভারতীয় সমাধান আবিষ্কারের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যদি এই আশা বিফল হয়, তাহা হইলেও কংগ্রেস বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের ব্যক্ত ইচ্ছা ব্যাহত করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস কখনও জীবন্ত-ভারত-ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধার্থ

ব্রিটিশ সৈন্যবলের সাহায্য চাইতে পারে না। মুসলমানরাই একা কিংবা ব্রিটিশ সহায়তায় বাধাদানপরাঙ্মুখ ভারতবর্ষের উপর তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবে। যদি আমি কংগ্রেসকে আমার মতে সায় দেওয়াইতে পারি, তাহা হইলে আমি মুসলমানদিগকে বলপ্রয়োগ করিবার কষ্টটুকুও দিতে চাহিব না। আমি তাহাদের দ্বারা শাসিত হইতে চাহিব, কারণ মুসলমান-শাসনও ভারতীয় শাসনই হইবে।"

এইরূপ লেখা যেরূপ চিন্তাপ্রক্রিয়া হইতে উদ্ভূত, আমাদের মনন-ধারার সহিত তাহা খাপ খায় না। সিন্ধুদেশে, পঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বঙ্গে কোথাও কোথাও যে মুসলমান শাসন হিন্দুরা ভোগ করিতেছে, তাহা মনিবী মুসলমান শাসন নহে, তাঁবেদারী মুসলমান শাসন মাত্র। যাঁহারা শাসক, তাঁহারা পুরা ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিলে শাসনটা যে কিম্বিধ হইবে, তাহা কল্পনা করিতে চাই না।

ব্রিটিশ শাসন বিদেশী শাসন বলিয়া এবং ব্রিটিশ শাসনের ও বিদেশী শাসন মাত্রেরই অনেক দোষ আছে বলিয়া আমরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ভারতীয় যে-কোন লোকসমষ্টির যে-কোন রকম শাসনই বাঞ্ছনীয় হইবে, রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্বেষ আমাদিগকে এরূপ বিশ্বাস করাইবার মত অন্ধ করে নাই। ইহা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে, আমরা মনে করি না, যে, ভারতবর্ষের প্রাগ্‌ব্রিটিশ মুসলমান শাসন বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। ভারতবর্ষের ধন তখন কোন অ-ভারতীয় জাতি প্রচুর পরিমাণে বেতন ও পেন্সান বাবতে এবং বাণিজ্যাদি সূত্রে ভোগ ও বিদেশে চালান করিত না, এবং কোন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়েরা ভারতীয় বলিয়াই উচ্চতম পদগুলি হইতেও বঞ্চিত হইত না। প্রধানতঃ এই দুই বিষয়ে প্রাগ্‌ব্রিটিশ মুসলমান শাসন বর্ত্তমান ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু প্রধানতঃ অন্যান্য অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট ছিল। আমরা ব্রিটিশ বিদেশী শাসনের অবসান নিশ্চয়ই চাই এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাহা চাই। কিন্তু যে-কোন ভারতীয়নামধারী শাসনে আমরা সন্তুষ্ট হইব কিংবা বর্ত্তমান বিদেশী শাসন অপেক্ষা আমাদের বিবেচনায় তাহা শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছনীয় হইবে, ইহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।

ভারতবর্ষে লোকহিতব্রতী, সার্বজনিক কাজে উৎসাহী ও দক্ষ ও ত্যাগী যত লোক আছেন, তাহার অধিকাংশ হিন্দু বটে; কিন্তু তাহা হইলেও আমরা নিছক হিন্দু শাসন চাই না, তাহা ভাল ও বাঞ্ছনীয় হইবে মনে করি না। আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশসমূহে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের অনুরূপ ও ভারতবর্ষের উপযোগী এরূপ শাসনতন্ত্র চাই, যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পৌরজনাধিকার ধর্ম-সম্প্রদায়-জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমান হইবে, ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের লোক বলিয়া কেহ অধিক সুবিধা পাইবে না বা তজ্জন্য কোন সুবিধা বা অধিকার হইতে বঞ্চিতও হইবে না।

ইহা সন্তোষের বিষয় যে, যত দূর বুঝা যাইতেছে, অধিকাংশ স্বমতপ্রকাশক্ষম ভারতীয় মুসলমান ভারত-ব্যবচ্ছেদ চান না। কিন্তু যদি তাঁহারা চান, তাহা হইলে তাঁহারা ইংরেজের সাহায্য লইয়াও তাহা অবাধে করিতে পারিবেন, এমন কি তদর্থে স্বকীয় বা পরকীয় কোন বলপ্রয়োগের কষ্টস্বীকারও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে না, কংগ্রেস স্বেচ্ছায় তাঁহাদের পদানত হইবে—এ বড় আজব কথা। গান্ধীজী বলিয়াছেন, কংগ্রেসকে তাঁহার মতে সায় দেওয়াইতে পারিলে, মুসলমানেরা একা অথবা ইংরেজদের সাহায্যে বাধাদান-পরাঙ্মুখ ভারতবর্ষের উপর তাহাদের স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা চাপাইয়া দিতে পারিবে! যেন কংগ্রেসই নিয়ন্তা, ভারতব্যবচ্ছেদে বাধা দেওয়া হইবে কি না-হইবে, তাহা স্থির করিবার অধিকারও যেন কংগ্রেসের বাহিরের অগণিত ভারতীয় মানুষের নাই! ভারতের জীবন্তব্যবচ্ছেদ ঘটাইতে ইংরেজের সৈন্যবলের সাহায্য ব্যবচ্ছেদকামীরা লইতে পারিবে, কিন্তু ব্যবচ্ছেদ যাহারা চায় না তাহারা নিজেরাও বাধা দিবে না এবং তদর্থে অন্যের সাহায্যও চাহিতে পারিবে না! আমরা বলি, আমরা জীবন্ত-ব্যবচ্ছেদবিরোধীরা কেবলমাত্র আমাদের সমষ্টিগত শক্তি দ্বারা কিংবা অপরেরও শক্তির সাহায্য লইয়া যত প্রকারে পারি ব্যবচ্ছেদে বাধা দিব। ভারতবর্ষকে অখণ্ড ও অবিভাজ্য রাখিবার প্রচেষ্টা পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকিবে। এ বিষয়ে কংগ্রেসের প্রতিকূলতা বা ঔদাসীন্য যদি থাকে তাহা হইলে কংগ্রেসই লয় পাইবে, ব্যবচ্ছেদবিরোধীদের প্রতিজ্ঞা টলিবে না।

—

ইউরোপীয় যুদ্ধ

ইউরোপে যুদ্ধ ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে। হিটলারের—জার্মেনীর—ভূমিক্ষুধা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন আগুনের শিখার আয়তন ও প্রচণ্ডতা বাড়িতে থাকে। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে জার্মেনী অষ্ট্রিয়া গ্রাস করে, তার পর ক্রমান্বয়ে ১৯৩৮-এর অক্টোবরে চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল, ১৯৩৯-এর মার্চে সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়া, ঐ সালের ঐ মাসেই মেমেল, ঐ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যাণ্ড, এবং ১৯৪০ সালের

এপ্রিলে ডেন্মার্ক পদানত হয়। ডেন্মার্ক ও নরওয়ে এক সঙ্গেই আক্রান্ত হয়। ডেন্মার্ক যুদ্ধ না করিয়া জার্মেনীর অধীনতা স্বীকার করে; নরওয়ে যুদ্ধ করে কিন্তু অংশতঃ জার্মেনীর অধীন হইয়াছে। তাহার পর এই মে মাসেই জার্মেনী হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুক্সেমবুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। ফ্রান্সের কোন কোন শহরে এবং ইংলণ্ডেরও দুই এক জায়গায় জার্মেন এরোপ্লেন বোমা বর্ষণ করিয়াছে। গুজব রটিয়াছে যে, যেমন নেপোলিয়ন ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিলেন, হিটলারেরও সেইরূপ অভিপ্রায় আছে।

মুসোলিনি উসখুস করিতেছে। শীঘ্রই তাহার মতলব জানা যাইবে। তুরস্কেরও তাই। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া…কি করিবে এখনও অনিশ্চিত।

আমেরিকার সহানুভূতি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের দিকে, কিন্তু তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন, মনে হয়।

জাপান অনেকটা চীন লইয়া ব্যস্ত থাকায়, এবং কতকটা ইউরোপীয় যুদ্ধের সুযোগে যুদ্ধনিরত জাতিদের নানা দেশের বাণিজ্য দখল করিবার অভিপ্রায়ে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে না বোধ হয়। তবে যদি হল্যাণ্ড জার্মেনীর কাছে পরাজিত হয় তাহা হইলে তাহার অধিকৃত যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপময় ভারত (Dutch East Indies) দখল করিবার চেষ্টা করিতে পারে।

—

ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা পরিবর্ত্তন

ব্রিটেনের সৈন্যবল, অস্ত্রবল, রণতরী, যুদ্ধবিমান ও ধনবল যেরূপ, তদনুযায়ী রণদক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে তাহার মন্ত্রীরা যুদ্ধ চালাইতে পারিতেছেন না, এইরূপ সন্দেহ ইংলণ্ডের লোকদেরও কিছু দিন হইতে হইতেছিল। সম্প্রতি নরওয়ে জার্মেনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় ফ্রান্স ও ব্রিটেন তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেও তাহাদের যথেষ্ট ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতির অভাব বশতঃ সে সাহায্য ফলদায়ক হয় নাই এবং আমেরিকা প্রভৃতির মতে ব্রিটেনের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধটা ব্রিটেন যে-ভাবে চালাইয়াছে, সে সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে খুব তর্কবিতর্কও হইয়া গিয়াছে। ফলে, মিঃ চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়াছেন, মিঃ চার্চিল প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, অন্যান্য পরিবর্তনও হইয়াছে এবং শ্রমিক দলের কোন কোন নেতা মন্ত্রী হইয়াছেন। এখন হয়তো ব্রিটেনের জয়লাভের সম্ভাবনা বাড়িবে।

—

জার্মেনীর জয়পরাজয় ও জগতের কল্যাণ

জগতের কল্যাণের নিমিত্ত জার্মেনীর পরাজয় এবং জার্মেনীর অধিকৃত পরদেশগুলির স্বাধীনতালাভ আবশ্যক। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের জয়লাভও মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত আবশ্যক। সত্য বটে, ফ্রান্স ও ব্রিটেন পৃথিবীর কতকগুলি জাতির ও দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে অধীন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু জার্মেনী এই সকল পরাধীন জাতিকে অধীনতাপাশমুক্ত করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে না, এবং কতকগুলি স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, আরও কতকগুলিকে পদানত করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে পরাজিত করিতে পারিলে তাহাদের অধীন দেশগুলিকেও নিজের অধীন করিবে। সুতরাং জার্মেনীর জয়লাভে কোন অধীন জাতির বা কোন স্বাধীন জাতির লাভ হইবে না।

—

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র মনীষী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বাংলা দেশ—বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা কিরূপ ছিল, তিনি কিরূপ মনস্বী ও হৃদয়বান ছিলেন, তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণা কিরূপ ব্যাপক, প্রবল ও সর্বদিগ্দর্শী ছিল, তাহার কোন বাহ্য চিহ্ন অবস্থাবৈগুণ্য ও আত্মপ্রকাশবিমুখতাবশতঃ তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাংলায় তিনি, "একটি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সাকুরা পুষ্প" নাম দিয়া, একটি জাপানী গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং মহাভারতের প্রধান গল্পটি সাধুভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ এবং অনেক প্রবন্ধ ও ছোট গল্প তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ইংরেজী মাসিকে "গোরা"র পিয়াস'ন সাহেব-কৃত যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ মনোজ্ঞ ইংরেজীতে খুব দ্রুত অনুবাদ করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের লিখনভঙ্গী এবং চিন্তাধারা ও ভাবধারার সহিত তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ ও পরিচয় ছিল যে, তিনি অনুবাদে কোন স্থানে অক্ষরে অক্ষরে মূলের অনুসরণ না করিলেও তাঁহার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ও অনুমোদন লাভ করিত। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর যেমন বহুজনের অধিগম্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেমনই রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা বাংলার ও বাঙালী জাতির বাহিরের লোকদের

অধিগম্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা না করিলে কবির বহু রচনা বাংলা-না-জানা লোকদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

অনেক গুরুতর বিষয়ে কবি তাঁহার পরামর্শ লইতেন।

তিনি যে কেবল সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যক্ষেত্রেই অবাধ বিচরণক্ষম ছিলেন, তাহা নহে, জীবনবীমার কার্য্যেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওর‍্যান্স সোসাইটি প্রধানতঃ যাঁহাদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

জর্জ ল্যান্সবেরি

ইংলণ্ডের অশীতিপর বর্ষীয়ান ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রমিকনেতা জর্জ ল্যান্সবেরির মৃত্যু হইয়াছে। যখন জেমস র‍্যামজী ম্যাকডোন্যাল্ড শ্রমিক দল ত্যাগ করিয়া ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী হন, তখন তিনি ঐ দলের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি শান্তিকামী দলের লোক ছিলেন, যে-কোন উদ্দেশ্যে যে-কোন রকম যুদ্ধেই তাঁহার আপত্তি ছিল। পৃথিবীর যে-কোন দেশে যে-কোন জাতি উৎপীড়িত হইত, তিনি তাহাদের দরদী বন্ধু ও যথাশক্তি সহায় ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের হিতৈষী ও তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত *Labour's Way with the Commonwealth* নামক পুস্তকের দীর্ঘতম অধ্যায় ও অধিকতম অংশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। ব্রিটেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন তাহা ইহাতে লিখিত আছে এবং ব্রিটেনের কর্তব্যও নির্দিষ্ট হইয়াছে। ডেলী হেরাল্ড নামক প্রসিদ্ধ বিলাতী কাগজ তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দীর্ঘকাল তাহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীন নানা রাষ্ট্রের নৃপতি ও রাষ্ট্রপতিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধের কারণসমূহের উচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। তিনি সরলহৃদয়, অমায়িক ও অকপট ধার্মিক লোক ছিলেন।

—

মৌলবী মুজিবর রহমান

মুসলমান সমাজের নেতাদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি খাঁটি ন্যাশন্যালিষ্ট (স্বাজাতিক) বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য, মৌলবী মুজিবর রহমান তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি গত দুই বৎসরেরও অধিক কাল পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০এর উপর হইয়াছিল। তিনি চিরকুমার ছিলেন। জীবন-সংগ্রাম তাঁহার পক্ষে বাস্তবিক সংগ্রামই ছিল, কিন্তু তিনি পদমর্য্যাদা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ বা আরামের লোভে কখনও যাহাকে অসত্য বা অন্যায় মনে করিতেন তাহার সহিত রফা করেন নাই। তিনি "দি মুসলমান" নামক ইংরেজী কাগজ বাহির করিয়া পরে তাহাকে দৈনিকে পরিণত করেন ও দীর্ঘকাল তাহার সম্পাদকতা করেন। কিন্তু তাহার কর্মীটির লোকদের সহিত মতভেদ হওয়ায় তাহা ত্যাগ করিয়া "কমরেড্" স্থাপন করেন। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ সোম

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের বয়স মৃত্যুকালে ৭০এর উপর হইয়াছিল। তিনি কবিতা কিছু লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে তৎপ্রণীত বৃহৎ গ্রন্থের জন্য। ইহা রচনা করিতে তিনি বিস্তর অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি তাহা করায় মধুসূদনের জীবনের অনেক অজ্ঞাত কথা বাঙালী শিক্ষিত সমাজের গোচর হয়।

—

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অধ্যাপক পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বয়স মৃত্যুকালে ৬১ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু বলা যাইতে পারে। তাঁহার তিরোভাবে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি "বঙ্গীয় মহাকোষ" তাঁহার দ্বারা সমাপ্ত হইতে পারিল না। বাংলা সাহিত্যের, এক দিক দিয়া, পুষ্টিতে এই যে বিঘ্ন ঘটিল, ইহা দুঃখের বিষয়। দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব এই ভাবিয়া হইতে পারে, যে, মহাকোষের সংকলন কার্য্যের তাঁহার অংশ তিনি শেষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা কাশীতে হইয়াছিল এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ উপাধিধারী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ভারতীয় ও বিদেশী ২৬টি ভাষা জানিতেন। দর্শন ও প্রত্নতত্ত্বের তাঁহার বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। অন্য বহু বিদ্যার সহিতও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন কোন মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কয়েকখানি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। হৃদয়গ্রাহী ও বহুতথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। তিনি নানাবিধ রসাল গল্প করিতে পারিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত দীর্ঘকাল তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

—

কালীমোহন ঘোষ

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর কাজ শেষ করিবার সময় বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অল্প কথায় কি যে লিখিব স্থির করিতে পারিতেছি না। বিশ্বভারতীর গ্রাম-পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন বিভাগের কথা মনে হইলে তাঁহার কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িত। জাতির বাঁচিয়া থাকিবার শ্রী ও শক্তি লাভ করিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক এই গ্রামসেবা যেন তাঁহাতে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল।

—

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বাংলা রচনা একত্র হইয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসরে উহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে কবিতা ও গান বিভাগে সোনার তরী, নাটক ও প্রহসন বিভাগে চিত্রাঙ্গদা ও গোড়ায় গলদ, উপন্যাস ও গল্প বিভাগে চোখের বালি, এবং প্রবন্ধ বিভাগে আত্মশক্তি সংকলিত হইয়াছে। এই খণ্ডে পাঁচখানি ছবি মুদ্রিত হইয়াছে—যৌবনে রবীন্দ্রনাথ (আনুমানিক পঁচিশ বৎসর বয়সে), জ্যেষ্ঠা কন্যা সহ রবীন্দ্রনাথ (১৮৮৭ সালে শিল্পী আর্চার অঙ্কিত প্যাস্টেল চিত্র), "ঝুলন" কবিতার পাণ্ডুলিপির এক অংশ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধু প্রিয়নাথ সেন, ও ১২৯৭ সালে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের ছবি।

এই খণ্ডের বিশেষ আকর্ষণ আত্মশক্তি গ্রন্থখানি। বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে স্বদেশী সমাজ প্রভৃতি যে-সকল বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন ও বিভিন্ন সভায় পাঠ করেন, তাহা এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গদ্যগ্রন্থে খণ্ডিত ভাবে মুদ্রিত হইত বটে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অন্য প্রবন্ধগুলি পড়িবার এবং রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় মতামত বুঝিবার, ও স্বদেশী যুগে তিনি দেশবাসীকে কি মন্ত্রে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা জানিবার, সুযোগ ছিল না।

"আত্মশক্তি" কথাটিকে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক আদর্শের মূলমন্ত্র বলা যাইতে পারে; দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি যে-সম্বন্ধেই অভাব বা সমস্যা উপস্থিত হউক না, বিদেশীয় সরকারের কাছে তাহার সমাধানের জন্য আবেদন-নিবেদনকে তিনি সর্ব্বদাই অবজ্ঞেয় বলিয়া জানিয়াছেন, এবং আত্মশক্তির উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া সকল সমস্যা সমাধানের ভার দেশবাসীকে গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে সকলমানবকর্ত্তব্যবিস্মৃত সৌন্দর্য্যের পূজারী বলিয়া জানেন। "ব্রতধারণ" প্রবন্ধ হইতে তাঁহাদের অবগতির জন্য কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করি—এই প্রবন্ধটি "কোনো স্ত্রী-সমাজে জনৈক মহিলা কর্ত্তৃক পঠিত" হইয়াছিল। বঙ্গমহিলাদিগকে স্বদেশী ব্রতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"ভগিনীগণ,…আমরা পরণের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিল্টন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতী দোকানের…আমরা এতদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া তাহার ভূষণ ছিনাইয়া বিলাত-দেবতার পায়ে রাশি রাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।…আমরা কি এ-কথা বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়,—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের বেশভূষার শখ মিটাইব না? আমরা ভালো হউক মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।

"ভগিনীগণ, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দোহাই দিবেন না! **সৌন্দর্য্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চ জিনিস আছে।** আমি এ-কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিসে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে; কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাসক্রমে আমাদের সেইরূপই ধারণা হয়, তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্য্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিবার দিন আজ নহে—সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত, তখন জননী বেনারসি শাড়িখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না—তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্য্যবোধের দাবি?"…

"আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে, তখন সুবিধা বা সৌন্দর্য্যচর্চ্চার কথা ভাবে নাই—ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে,—সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্ম্মের বীর্য্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি, তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই—স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্য্য দ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।"

১৩১২ সালে লিখিত "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধের একটি অংশ বাঙালী লোকনায়কদের স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন ১৩৪৭ সালেও রহিয়াছে:

"যে গুণে মানুষকে একত্র করে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলই অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারও চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের

একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস—এইগুলিই সেই শয়তানের প্রদত্ত বিষ, যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে।...বাঙালিকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চ্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণ রূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদা অন্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্রভাবে বিনাবাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

গ্রন্থপরিচয় বিভাগে এই খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্য সংকলিত হইয়াছে, এবং অনেকগুলি কবিতার কবি-কৃত ব্যাখ্যা সংকলিত হইয়াছে। এগুলি অনুসন্ধিৎসু ও রসগ্রাহী পাঠকের বিশেষ সহায় হইবে।

—

"নবজাতক"

বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্যগ্রন্থ "নবজাতক"ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সূচনায় কবি বিভিন্ন পর্ব্বে তাঁহার কাব্যের গতি-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে লিখিতেছেন,

"আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু জোগান নূতন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারিদিগের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রং হয় রাঙা, কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র, আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।

নবজাতকের কবিতাগুলি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

"...এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।"...

গ্রন্থখানির বিস্তৃত আলোচনা প্রবাসীর আগামী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

—

মধ্যপ্রদেশে একটি প্রধান কর্মে বাঙালী

নাগপুরের প্রধান কলেজ মরিস কলেজে দীর্ঘকাল প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিয়া শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং এখনও সেই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ঐ প্রদেশের দৈনিক নাগপুর টাইমসের ৫ই মের সংখ্যায় দেখিলাম ঐ প্রদেশের অন্য একটি বড় কাজে এক জন বাঙালী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি শ্রীযুক্ত করুণাদাস গুহ—তথাকার ইণ্ডাষ্ট্রিজ বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গের ইণ্ডাষ্ট্রিজ বিভাগে কাজ করিবার সময় তিনি সিংহল গবন্মেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রি (পণ্যশিল্প) সম্বন্ধে পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে দুই দফা চুক্তিবদ্ধ হইয়া পাঁচ বৎসর কাজ করেন, একটি ইণ্ডাষ্ট্রিজ বিভাগ স্থাপন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন এবং ঐ দ্বীপের নানা পণ্যশিল্পের প্রবর্তন উন্নতি ও বিস্তারের জন্য চারি বৎসরে সম্পাদ্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া দেন। তাহার নিমিত্ত সিংহল গবন্মেণ্ট ত্রিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। সিংহলের কাজ শেষ করিয়া তিনি ভারতবর্ষের কংগ্রেসী জাতীয় শিল্পবিষয়ক পরিকল্পনা কমীটির (National Planning Committee-র) যুগ্ম সম্পাদকের কাজ করিতেছিলেন। এই কাজ করিতে করিতে তিনি মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ইণ্ডাষ্ট্রিজ্‌ বিভাগের ডিরেক্টর হইয়াছেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমীটির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে না, তিনি উহাতে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সরকারী প্রতিনিধি থাকিবেন।

সকল প্রদেশেই প্রাদেশিক সংকীর্ণতা—বিশেষ করিয়া বঙ্গের বাহিরে বাঙালীবিদ্বেষ—চরম আকারে বিদ্যমান, এরূপ ধারণা যাহাতে বদ্ধমূল না হয়, তাহার নিমিত্ত করুণাদাসবাবুর ভিন্ন ভিন্ন কাজের কিছু পরিচয় দিলাম।

—

"ফরোআর্ড ব্লকে" 'কমন সেন্স' লিখিত প্রবন্ধত্রয়

এই সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, যে, সুভাষবাবুর ফরোআর্ড ব্লক কাগজে 'কমন সেন্স' কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধগুলিতে পাকিস্তানের পরোক্ষ সাফাই আছে। উক্ত লেখকের তৃতীয় প্রবন্ধটি বাহির হইবার আগে এই মন্তব্য লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তৃতীয় প্রবন্ধে অন্যবিধ উপকরণও অনেক আছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সংখ্যালঘু জাতিসমূহ সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানের বর্ণনা এই প্রবন্ধটিকে মূল্যবান করিয়াছে। তিনটি প্রবন্ধই পঠনীয়।

—

সাঁতারের কথা

শ্রীশান্তি পাল

জলের তারতম্য

এক বাটি জল ও এক বাটি তেলের ওজন সমান নয়। বিভিন্ন জিনিষের গুরুত্ব তুলনা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা একটি মাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন্ বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব কত, তাহা জানিতে হইলে জলের সহিত হয়। কিন্তু নদীতে অল্প পরিশ্রমে অগ্রসর হওয়া যায়,—সমুদ্রে তো কথাই নাই। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি পুষ্করিণীর জল 'ভারি', নদীর জল 'হালকা'; কিন্তু আসলে পুকুরের জলের গুরুত্বের অর্থাৎ গলিত পদার্থের স্বল্পতার জন্য আমাদের পরিশ্রম বেশী করিতে হয়।



সাঁতারে 'টার্নিং' বা ঘুরনি
প্রথম ভঙ্গী



দ্বিতীয় ভঙ্গী



তৃতীয় ভঙ্গী

তাহার তুলনা করিতে হয়। জল হইল সকল জিনিসের গুরুত্বের নিরিখ। বৈজ্ঞানিক মতে মানুষের শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা যৎসামান্য কম। তাই মানুষ সামান্য চেষ্টায় জলে ভাসিতে পারে। যে জলে যত বেশী গলিত পদার্থ অথবা সূক্ষ্ম পদার্থকণা মিশ্রিত থাকে, তাহাতে ভাসিয়া থাকা ততই সহজ। সাঁতারের সময় পুকুরের জলে সাঁতার কাটিতে যেন বেশী পরিশ্রম বোধ

পুষ্করিণীতে সাঁতার

পুষ্করিণী, নদী বা অন্য কোন জলাশয়ে যে-সব সাঁতারু সাঁতার কাটিবেন, তাঁহারা যেন জলে নামিবার আগে সেই স্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লন। সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার বিভিন্ন স্থানে সন্তরণ প্রদর্শনকালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। উন্মুক্ত জলাশয়ে সাঁতার কাটিতে হইলে, প্রথমেই দেখা আবশ্যক, সাঁতার কাটিতে



ঘুরনি

চতুর্থ ভঙ্গী



পঞ্চম ভঙ্গী



সাঁতারে 'মার্চিং' বা মিল-সাঁতার

কাটিতে যাহাতে জলের নীচে কোন আগাছা, পাটা-শেওলা বা অন্য জলজ উদ্ভিদে দেহ জড়াইয়া গিয়া জীবন বিপন্ন না হয়। দৈবক্রমে বা অসাবধানতাবশতঃ যদি কোন আগাছায় পা আটকাইয়া যায়, তবে সাঁতারু তৎক্ষণাৎ পায়ের ক্রিয়া বন্ধ করিবেন। এ অবস্থায় হাতের দ্বারাই ধীরে ধীরে ভাসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিবেন ও সাহায্যের জন্য তীরের লোক ডাকিবেন। এরূপ স্থলে দড়ি কিংবা বাঁশের সাহায্যে অথবা বুক-

সাঁতারের দ্বারা (যদি সুবিধা হয়) তীরে উঠিতে চেষ্টা করাই উচিত।

নদীতে সাঁতার

নদীতে সাঁতার কাটিবার পূর্ব্বে আগে নদীর অবস্থা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। যাহাতে ঘূর্ণি বা চোরা-স্রোতে না পড়িতে হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখাও একান্ত প্রয়োজন। যে-নদীর জল লবণাক্ত, সে-নদীতে কদাচ সাঁতার কাটা উচিত নয়। স্রোতের টানের মুখে পড়িলে সাঁতারুর পক্ষে নিকটবর্ত্তী তীরের কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কোণাকুণি পাড়ি দেওয়াই নিরাপদ। বানের সময় নদীর মাঝখানে থাকাই শ্রেয়স্কর।

সমুদ্রে সাঁতার

সমুদ্রের যেখানে কেহ স্নান করে না সেইরূপ স্থলে সাঁতার কাটিবার জন্য নামা কখনও উচিত নয়। সাঁতার কাটিবার জন্য স্রোতের সহিত তীর লক্ষ্য করিয়া কোণাকুণিভাবে যাইতে হইবে। ঢেউ কাটাইবার সময় সুবিধামত কখনও পাশ দিয়া কখনও বা মাথা দিয়া ঢেউ কাটাইবেন। কোন সময়েই বুক দিয়া ঢেউ প্রতিরোধ করা নিরাপদ নয়। সাঁতারু যদি ঠিকভাবে ঢেউ কাটাইতে না পারেন, তাহা হইলে শক্তির অপচয় ঘটিয়া জীবন বিপন্ন হইতে পারে। সমুদ্রে সাঁতারের সময়, ঢেউগুলির ভিতর দিয়া অর্থাৎ মাথার উপর দিয়া ঢেউ পার করিয়া দিয়াই সাঁতার কাটা উচিত। শান্ত সমুদ্রেই সাঁতার দেওয়া অধিক বিপদজনক। কারণ সমুদ্র প্রচণ্ড ঢেউ থাকিলে জন্তু-জানোয়ারের হাতে পড়িবার আশঙ্কা কম থাকে। শান্ত সমুদ্রে তাহাদের উপদ্রব যে-কোন মুহূর্ত্তে ঘটিতে পারে। আর এক কথা, সমুদ্রে সাঁতার অভ্যাস করিতে গেলে সকল সময়েই একখানি নৌকা কাছে রাখা ভাল। সমুদ্রে নামিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া তৈল মর্দ্দন করা ও চোখে চশমা (goggies) লাগানো প্রয়োজন।

গ্রীষ্ম ও শীতে সাঁতার

গ্রীষ্মকালে শরীর সাধারণত জল অপেক্ষা অল্প গরম থাকে। এ-সময় জলে বেশীক্ষণ থাকিলে কোন ক্ষতি হয় না—বিশেষতঃ গায়ে তেল থাকিলে তো কথাই নাই। কিন্তু, জলে খুব বেশীক্ষণ থাকিলে চামড়ার প্রথম স্তরের জীবকোষগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং স্থানীয় রক্তশিরা-গুলির সঙ্কোচ ঘটিয়া স্বাভাবিক রক্তচলাচলের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। তাহাতে শুধু চামড়ার নয়, ভিতরকার স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয়। সেই জন্য গায়ে উত্তমরূপে তেল অথবা চর্ব্বি না মাখিয়া কখনই অধিকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকা উচিত নয়। চামড়া কুঁচকাইয়া উঠিতেছে দেখিলেই সাঁতারুর জল ত্যাগ করা উচিত। তেল অথবা চর্ব্বি গায়ের চামড়াকে বর্ম্মের ন্যায় ঢাকিয়া রাখে। জল থাকা সত্ত্বেও চামড়া সহজে সঙ্কুচিত হইতে পারে না। আর এক কথা, গ্রীষ্মকালে চর্ম্মস্থ স্নায়ুমণ্ডলী যেরূপ স্বাভাবিক-ভাবে জলমধ্যে থাকিয়াও ক্রিয়া করিতে পারে, শীত-কালে তাহা পারে না। কারণ শীতকালে স্নায়ুমণ্ডলী শীঘ্রই অসাড়বৎ হইয়া যায়। সেই জন্য শীতকালে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি চলিতে পারে না। আমরা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোক, বেশী শীত সহ্য করিতে পারি না। কাজেই শীতকালে বেশীক্ষণ জলে থাকিলে ঠাণ্ডাও লাগিয়া যাইতে পারে। এই সব কারণে শীতকালে সন্তরণে রেকর্ড করা যায় না। এখানকার সন্তরণ-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ সন্তরণ-প্রতিযোগিতার জন্য যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ আগষ্ট হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত, আমাদের বিবেচনায় তাহাই প্রশস্ত সময়।

আইরিশদের দেশে

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীমতিলাল দাশ

বুথ তার গাড়ী নিয়ে এল। চমৎকার ছেলেটি—বাইশ বছর বয়স, কিন্তু জ্ঞানের পরিধি বেশ বিস্তৃত। মোটরে ক'রে নিয়ে গেল উইকলো পাহাড়ে। ড্যবলিন নগরের পরিবেশ চমৎকার। বিস্তৃত সাগর-শাখার পাশে সমতলভূমি—সেখানে শহর বেড়ে চলেছে—খাড়িতে গড়েছে চমৎকার বন্দর। কালে কালে এখানে এসেছে নানা জাতির যোদ্ধা দিগ্বিজয়ী বীর। তাদের নৌসৈন্য এবং পোত এই খাড়িতেই পেয়েছে নিরাপদ আশ্রয়। শহরের দক্ষিণ দিকে সহসা ডাবলিন এবং উইকলো পাহাড় মাথা উঁচু ক'রে উঠেছে।

এই সমতল প্রান্তরে বিজয়ীরা গড়েছে উপনিবেশ, পরাজিতেরা নিয়েছে পাহাড়ের আশ্রয়। অতীতের এই সংগ্রাম ও বিজয়ের নানা স্মৃতিচিহ্ন এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে।

শহর ছাড়িয়ে মোটর চলল। এঁকেবেঁকে রাস্তা চলল পাহাড়ের পারে—পাশে জলাভূমি। পাহাড়ের উপর উঠে মোটর থামিয়ে আমরা নামলাম।

বুথ আলাপী। নানা বিষয়ে ওর অদম্য কৌতূহল আছে। ওকে আইরিশ-জাগরণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছিলাম। ওর কথাবার্ত্তায় নবজাগ্রত স্বাধীন আইরিশ যুবার সন্ধান পেয়েছিলাম। ওদের মনে গড়বার স্বপ্ন। আপন দেশকে ওরা মহৎ করবে—তার জন্য সর্ব্বপ্রকার তপস্যা করতে ওরা উন্মুখ, সর্ব্বপ্রকার ত্যাগের জন্য ওরা প্রস্তুত। মোটর নিয়ে ফিরলাম।

তার পর এখানকার আদালত দেখতে চললাম। সেখান থেকে ফিনিক্স পার্কে গেলাম। চমৎকার পার্কটি—মাঝখানে উচ্চচূড় ওয়েলিংটন মনুমেণ্ট। তার পর সরকারী দপ্তরখানায় গেলাম, আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরা এবং বিচার-বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য—দু-জনেই সেদিন অনুপস্থিত—ব্যর্থমনোরথ হয়ে এখানকার ন্যাচারেল হিষ্টরী মিউজিয়ম এবং ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি দেখতে গেলাম। ন্যাশনাল গ্যালারি পূর্ব্বে লোকপ্রিয় ছিল না। সুলেখক জর্জ মুর লিখেছেন যে, যদি সাহারা দেখতে চাও তবে গ্যালারিতে যাও, দূরচক্রবালে বেদুইনের মত কদাচিৎ এক জন লোক দেখতে পাওয়া যায়। সেদিন আর নেই—চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ এই কলাভবন বর্ত্তমানে লোকরঞ্জন হয়ে উঠেছে। এখানে ডাচ ও ফ্লেমিশ চিত্রকরদের সুন্দর সংগ্রহ আছে, স্প্যানিশ চিত্রকরদেরও সুন্দর চিত্রমালা আছে। এল গ্রেকোর "সন্ত ফ্রান্সিসের পুলক" খুব মনোহরণ।

এই চিত্রশালায় প্রেসিডেণ্ট উইলসনের একটি সুন্দর আলেখ্য আছে। ফ্রান্স হাল্‌সের তরুণ মৎস্যশিকারী এবং ষ্টীনের গ্রাম্য পাঠশালা—এই দুখানি চিত্র শিল্পরসিক সমালোচকদের নিকট আদৃত।

রাত্রে এবি থিয়েটারে ও'কেসির রচিত একটি নাটক The Plough and the Stars দেখলাম। আইরিশ বিদ্রোহ শান্ত হবার পরে ডাবলিনে যখন নির্বিঘ্নতা ফিরে এল তখন এবি থিয়েটারে নূতন নূতন নাটকের অভিনয় চলল। মানুষের মনের রুদ্ধ বাসনা আনন্দ চাইল। জেমস্ কনোলি যে শ্রমিক-আন্দোলন সুরু করেন ও'কেসি তার এক জন পাণ্ডা ছিলেন। গেলিক লীগের তিনি এক জন সভ্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক গুরু সিঞ্জ।

ও'কেসি নাট্যজগতে যুগান্তর আনেন। তার পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে সাহিত্যরসিকের ভিড় ছিল। ও'কেসির অভ্যুদয়ে এল জনতার ভিড়। তাঁর নাটকে বিদ্রোহের জয়ধ্বনি নেই। যখন রাস্তায় চলছে বোমার দুর্জ্জয় নৃত্য, তখন শান্তপ্রকৃতি নরনারীর কুটীর-দ্বারে অবাঞ্ছিত মৃত্যু আসছে, তাঁরই করুণ ছবি তাঁর লেখায় মূর্ত্ত হয়েছে।



মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারি, ডাবলিন

তাঁর নাটকে বিদ্রোহীরা আসছে—তাদের হাতে রিভলভার, মুখে বড় বড় বুলি, কিন্তু তাদের তিনি বড় ক'রে তোলেন নি—এই সব বিদ্রোহীদের রক্তখেলায় নিরীহেরা অনর্থক জড়িয়ে পড়ে, তারই নির্ম্মম দৃশ্য তিনি এঁকেছেন।

ও'কেসির নাটকে বীর্য্যবান নায়কের অভাব—তিনি নারীদের বড় ক'রে মহিমময়ী ক'রে ধরেছেন। আইরিশ-বিদ্রোহের ব্যঙ্গরূপ দেখানো হয়েছে ব'লে এই বইটিকে লোকে নিন্দা করেছিল।

অভিনয় দেখে সমস্ত গল্পটা ধরতে পারি নি—বইটি আগাগোড়া পড়া না থাকলে চলতি ভাষায় লেখা নাটকের রসোপভোগ করা বিদেশীর পক্ষে অসম্ভব। আমার দু-পাশে দুটি তরুণী বসেছিল। সহৃদয়া তরুণীরা আমাকে গল্পটি বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। তাদের সংলাপ মনে নেই—গল্পটি ভুলেছি, কিন্তু এই নাটকে অতিসাধারণ নর-নারীর সাধারণ জীবনযাত্রাকে নাট্যকার যে রসরূপ দিয়েছেন, তা অতি চমৎকার। বাস্তব ছবি—মানুষ মরছে, তবু মানুষের দুর্জ্জয় লোভ কাজ করছে—বোমার ও গুলির ভয়কে উপেক্ষা ক'রে লোকে লুট সংগ্রহ করতে ব্যস্ত—এই দৃশ্য আমার বেশ ভাল লেগেছিল।

নাট্যকার ডাবলিন-জীবনের যে ছবি অঙ্কিত করেছেন তা মোটেই গৌরবজনক নয়। তিনি শান্তির পথিক, বিদ্রোহের নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা তাঁকে পীড়া দেয়। তাঁর নাটকের নায়কেরা স্ত্রীর অর্জ্জিত ধন নিয়ে মদ খেয়ে ওড়ায়। ও'কেসির নাটক লণ্ডনে আদর পায় নি।

আইরিশ-পরিবেশ এই নাটকগুলির প্রাণ—সেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে এর নাটকীয় মূল্য কমে যায়। ও'কেসি অন্য ধরণের নাটকও লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি তেমন সমাদর পায় নি। যে-সব নাটকে তিনি ডাবলিন-বিদ্রোহের রুদ্ররূপ এবং দুঃখের দাবদাহের ছবি এঁকেছেন, সেখানেই তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন।

বলস্‌ব্রিজ উপসাগরে ও'কনরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ও'কনর একটি পাঠাগারের কর্ম্মসচিব। তরুণ যুবা—আইরিশ-বিদ্রোহের তিনি অন্যতম সৈনিক। তাঁর লেখায় বিদ্রোহের প্রতি প্রচ্ছন্ন এবং ব্যক্ত প্রীতি



ফোর্ কোর্ট্‌স্, ডাবলিন

ছত্রে ছত্রে উচ্ছল হয়ে উঠে। The Saint and Mary Kate নামক উপন্যাস লিখে ও'কনর খ্যাতিলাভ করেছেন। আইরিশ-বিদ্রোহের পটভূমির উপর এক জন অতি-ভক্তের নিখুঁত ছবি এঁকেছেন, বর্ণনানৈপুণ্যে এটা খুব সমাদর পেয়েছে।

তরুণ যুবা—মুখে চোখে প্রতিভার জ্যোতি। স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দে পরিবেশকে সে আনন্দিত ক'রে রাখে। প্রতিভা সর্ব্বত্রই আপন বাঞ্ছিত অবসর পায় না—ধনিক বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিকে হস্তগত ক'রে পায় স্বাচ্ছন্দ্য, মনীষা পিষ্ট হয় দুঃখে ও ক্ষোভে। একটি তরুণী দেখিয়ে দিল পথ—অফিসের ফাইলের মধ্যে ও'কনর ডুবে আছে।

আমার সঙ্গে ও'কনর অনেকক্ষণ আলাপ করল। আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করেছে। বলল, "তোমাদের সাহিত্য কাব্যধর্ম্মী—অলোক-লোকের দিকে তার প্রীতি—এ দিয়ে চলবে না—ভারতবর্ষে চাই যুগসাহিত্য, যে সাহিত্যে সাধারণ মানুষকে তার মর্য্যাদা বুঝিয়ে দেবে—সেই প্রাণবন্ত সাধারণ মানুষের সাহিত্য চাই।"

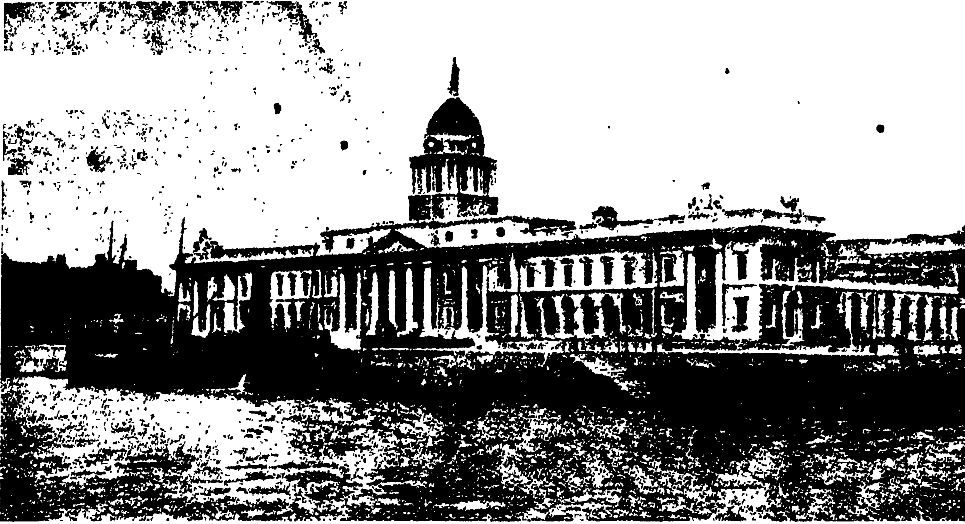
কথায় কথায় বলল, "আমার ভারতবর্ষে যেতে ইচ্ছা করে—সেখানে কাজ করবার ক্ষেত্র আছে—যেখানে মানুষ ঘুমিয়ে আছে সেখানে নূতন নূতন বার্ত্তা দেওয়ায় আনন্দ আছে।"

আমি এই মমতাময় ব্যঙ্গে সন্তুষ্ট হলাম না। প্রত্যুত্তরে বললাম, "তোমাদের নিজের জন্য কি করছ? তোমরা যে মরতে বসেছ, য়ুরোপীয় সভ্যতার পিছনে যে ধূমায়িত অগ্নি, সে অগ্নি জ্বলবে এবং তোমাদের কীর্ত্তি সমূলে ভস্মসাৎ করবে।"

কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সে আমার মুখের দিকে চাইল, তার পর সহাস্যবদনে উত্তর দিল, অবশ্য একটু উষ্ণ হয়ে "তোমাদের মনের ধারা ও আমাদের ধারা এক নয়—তোমাদের শান্তির ধর্ম্ম, প্রেমের মন্ত্র আমাদের নয়, আমরা চাই অনির্ব্বাণ সংগ্রাম—এই সংগ্রামই আমাদের মনে জাগায় উন্মেষশালিনী প্রতিভা।"

আমি বললাম, "মানুষের প্রগতির জন্য যে সংগ্রাম, সে সংগ্রামে পৌরুষ রয়েছে, কিন্তু লোভ ও মাৎসর্য্য যে বিরোধকে জাগায় তার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায়?"

কনর চুপ ক'রে হাসল। ধীরে ধীরে বলল, "ভারতবর্ষ তার বৌদ্ধ অহিংসা ও মৈত্রী নিয়ে জয়ী হবে না—তার গান্ধীবাদ মুক্তির পথ নয়, এই আধুনিকতাকে



কাষ্টম্‌স্‌ হাউস, ডাবলিন

যদি ভারতবর্ষ গ্রহণ না করতে পারে তবে জীবনযুদ্ধে সে পরাস্ত হয়ে যাবে।”

গান্ধীর আত্মিক সংগ্রামের অর্থ বিদেশী সহজে ধরতে পারে না। কনরকে অহিংসা-মন্ত্র বোঝাবার চেষ্টা বৃথা মনে ক'রে বিদায় নিলাম।

২৫শে সেপ্টেম্বর। ডগলাসের আপিসে গেলাম। তিনি মিঃ নরমান ও মিঃ লিটলের নিকট চিঠি দিলেন। মিঃ লিটলের প্রাইভেট সেক্রেটরীকে আগমনের উদ্দেশ্য বললাম। তিনি বললেন—ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন। তার পর মিঃ গুজেভের সঙ্গে প্রায় দু-ঘণ্টা আলাপ হ'ল।

আইরিশদের যে নিজস্ব ভাষা আছে তার উদ্ধারের আয়োজন চলছে—পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই দুই ভাষায় লেখা রয়েছে। আমি বললাম, “একি অন্যায় চেষ্টা নয়?”

গুজেভ হাসলেন, বললেন—“কেন?”

“ইংরেজী আপনাদের মাতৃভাষা হয়ে গেছে। এখন অনর্থক অপ্রচলিত জাতীয় ভাষা তুলবার প্রয়োজন কি? তাছাড়া ইংরেজী জাগতিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার দাম খুব বেশী।”

গুজেভ বললেন, “আপনার কথা বুঝি, কিন্তু ভাষা তো কেবল বহিরঙ্গ নয়, ওর অন্তরঙ্গ একটা রূপ আছে। সে রূপ তার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীতে দেশান্তর আছে, এক-এক দেশের এক-এক রূপ, ভাষাও তেমনই—জাতির অন্তস্তলে তার জন্ম—মর্ম্মকোষের সেই পদ্মকে কোনও রত্নের বিনিময়েই আমরা বেচতে পারি নে।”

আমি নিস্তব্ধ হয়ে বক্তার বিশ্বাসোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—আইরিশ ফ্রি স্টেট থেকে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, আইরিশ ভাষা পুনরায় সাধারণের কথ্যভাষা করতে স্কুলপাঠ্য পুস্তক তৈরি হচ্ছে—সর্ব্বপ্রকারে জাতির বিস্মৃত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। গুজেভ এই দপ্তরের প্রধান কর্ম্মী। তিনি বললেন, “শব্দের পিছনে রয়েছে একটা জাতির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী—আইরিশ শব্দের যে দ্যোতনা রয়েছে, ইংরেজী শব্দে সে প্রেরণা কখনও পাওয়া যায় না।”

আমি এ কথায় সম্মতি না জানিয়ে পারি না।

বক্তা বললেন, “আমাদের সন্তানেরা যখন গেলিক ভাষায় শিক্ষিত হবে, তখনই তারা সত্যিকার ভাবে আইরিশ সংস্কৃতির মর্ম্মবাণী বুঝতে পারবে—অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত জাতির প্রাণধারা জাতীয় ভাষার পিছনে আছে, তারা তার সন্ধান পাবে।”

নর্ম্মানের ওখানে গেলাম। বৃদ্ধ সমবায়-কৃষি নিয়ে



লিসবার্গের একটি স্কুলে ছেলেরা বাগান তৈরি করছে

সারা জীবন কাটিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁদের বুড়া ও বুড়ীর উৎসাহ অনন্ত। আমাকে এই আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তিকা দিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, "ভারতবর্ষের অবস্থা আর আয়রলণ্ডের অবস্থা অনুরূপ, ভারতের মুক্তির পন্থা সমবায়-কৃষি।"

প্রশ্ন করলাম, "আপনারা কত দূর সফল হয়েছেন?"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "আইরিশ কৃষকদের অবস্থা একদম বদলে গেছে—হোরেস প্লাঙ্কেট এই আন্দোলন সুরু করেন—লোকে একে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে—ফলে কল্পনাতীত সুফল ফলেছে।"

বৃদ্ধের কথা আমার খুব মনে লাগল। মান্ধাতার আমলের সনাতন পন্থা নিয়ে আমরা দিব্যি আরামে আছি। কিন্তু এই বিশ্ব-প্রতিযোগিতার যুগে এই নিষ্ক্রিয় অবসাদ মৃত্যুর পথ। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল: লণ্ডনের বাজারে আলফন্সো আম আমদানী হ'ল। দিনকতক বাজারে সেগুলি বেশ চড়া দামে বিক্রি হ'ল। কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীর সনাতন চাতুরী দেখা দিল। তারা ঝুড়ির উপর ভাল আম দিয়ে ভিতরে খারাপ দিতে লাগল। ফলে বাজারে দুর্নাম হ'ল এবং ব্যবসায়টি একদম বন্ধ হ'ল। কৃষির কেবল উন্নতি হ'লেই লাভ নেই—কৃষিজাত দ্রব্য পৃথিবীর বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রীত হওয়া প্রয়োজন, তার জন্য আজকাল চাই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। বাংলা দেশে অজস্র কলা জন্মে, কলিকাতার বন্দরে অসংখ্য জাহাজ থামে, কোন জাহাজই বোধ হয় ভারতীয় কলা কেনে না, অথচ বড় বড় জাহাজে ফল সরবরাহ ক'রে কালিফর্ণিয়ার কৃষকেরা রাজা হয়ে উঠেছে। এই দুর্নামের মূল আমাদের বায়স-বুদ্ধি। ব্যবসায়-জগতে সততা যে সিদ্ধির পথ—এ কথা বাঙালী বা ভারতীয় ব্যবসায়ী বোঝে না।

বৃদ্ধ দম্পতিকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। কলিযুগে সংঘে শক্তি—দেশে নানা প্রকার সভা, সমিতি, গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু যে সংঘ সত্যিকার কাজ করে, তাদের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষি, গোপালন প্রভৃতি পরিচালনায় বিদেশে যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে সে-কথা দেশবাসীকে স্মরণ করতে বলি।

ওখান থেকে ফিরে হাইকোর্ট-রেজিষ্ট্রার কুরাণের ওখানে গেলাম। ভদ্রলোক বোধ হয় অবিবাহিত। তার রুচি ও সৌষ্ঠব-জ্ঞান অসামান্য—গৃহে নানাবিধ চিত্র ও শিল্পদ্রব্যের সমাবেশ আছে। একটি সুন্দর পাঠাগারও আছে। আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কাজের চাপে পিষ্ট না হয়ে শিল্পরসে আপনাকে মগ্ন রাখতে পারেন কেমন ক'রে?"

বললেন, "কাজে কখনও হৃদয়ের আনন্দকে চাপতে পারে না; আপনি যদি সত্যিই ভাল কাজ করতে চান, তবে একটা খেয়াল (hobby) রাখবেন—ঐ খেয়াল চরিতার্থ করলে মনে যে আনন্দ জমবে, সেই আনন্দ আপনাকে কাজে দ্বিগুণ বল দেবে।"

কুরাণের এই কথাটি খুব ভাল লাগল। সাধারণতঃ দেখি এদেশে যে-সব য়ুরোপীয় কাজ করেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটা-না-একটা খেয়াল আছে, অন্য দিকে ভারতীয়েরা সাধারণতঃ শুষ্ক ও নীরস হয়ে পড়েন।

কুরাণ বললেন, "আপনাদের হিন্দু প্রভাব আমাদের সাহিত্যে খুব পড়েছে। আপনাদের আনন্দতত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম করবেন—আনন্দই বিশ্বসৃষ্টির মূলে, সেই আনন্দ জাগাতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।"

২৬শে সেপ্টেম্বর। আজ হোয়াইট হল দেখতে চললাম। এটা ডাবলিন কাস্‌ল্—ঐতিহাসিক মূল্য এর যত, সৌন্দর্য্য তত নয়। ডেনরা ডাবলিন নগর পত্তন করে। ডাবলিন কথাটির অর্থ কালো সায়র—খাড়ির কালো জল দেখে হয়ত এই নাম হয়েছিল। নর্ম্মান শাসনের সময় এই প্রাচীন দুর্গ পুনরায় নূতন ক'রে সংস্কৃত এবং নির্ম্মিত হয়েছিল। সেই থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এটা সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। দেখলাম সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ—অতীত দিনে এখানে কত উৎসব-সমারোহ হ'ত, আজ সেগুলি কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টির অবমাননায় যেন লাঞ্ছিত। চারি দিকে যে পুডল নদী পরিখার কাজ করত, আজ সেগুলি বিস্তৃত রাজপথে পরিণত। সেণ্ট প্যাট্রিক হল তন্মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ কক্ষ। এরমধ্যে রাজকীয় ভজনালয় আছে। তার খোদিত কাঠের কারুকার্য্য এবং চিত্রিত কাচসজ্জা গির্জ্জার স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে অতুলনীয়। এর মধ্যে বার্মিংহাম টাওয়ার নামে যে তোরণ আছে, সেখানে রাণী এলিজাবেথ হিউ ও'ডনেলকে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। রাজগৃহে দেখলাম রাজদণ্ডের প্রতীক, তরবারি ও দণ্ড। এর ঘড়ি-ঘরের নীচে অস্ত্রশস্ত্রের যাদুঘর।

দুর্গের বাহিরে সিটি হল এবং মিউনিসিপ্যাল বাড়ী। এখানে এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি তন্ন তন্ন করে সব দেখালেন এবং লর্ড মেয়রের সঙ্গে পরদিন সাক্ষাতের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

তার পর পার্লামেণ্ট হাউস দেখতে গেলাম। এটা লেনস্টার হাউসে বসে। লেনস্টার-বংশীয় ডিউকের বাড়ী ছিল ব'লে এর নাম লেনস্টার-ভবন। জেমস ফিটজেরাল্ড এই আবাসভবন প্রস্তুত করেন। এর শিল্পীর নাম রিচার্ড কাসল এবং ভিত্তি পত্তন হয় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরে এখানে রয়াল ডাবলিন সোসাইটি স্থান পায়। পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এটা Orieachtas অধিবেশন-গৃহ হয়েছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ইংরেজ ও আইরিশদের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সেই থেকে আয়র্লণ্ড স্বাধীন দেশ এবং ডাবলিন সত্যকার রাজধানী। আইরিশ ফ্রী স্টেটকে আইরিশেরা বলে Saorstat Eireann। এই নূতন রাষ্ট্র ব্রিটিশ জাতিসংঘের অন্যতম স্বাধীন অংশ। এই রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা গণতান্ত্রিক।

পার্লামেণ্ট-ভবন দেখা শেষ ক'রে পাশের ন্যাশনাল মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। এই কারুভবনে প্রাচীন আইরিশ জাতির অতীত অবস্থার সম্যক্ পরিচয় দেওয়ার জন্য বিচিত্র সংগ্রহ আছে। যাঁরা অতীত ইতিহাসে রসজ্ঞ, তাঁরা এই সব সমাবেশ দেখে য়ুরোপীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বুঝতে পারেন। আমার তত বিদ্যাও নেই, তত সময়ও ছিল না। কাজেই চোখ বুলিয়ে নিলাম। এই মিউজিয়মের বিশ্ববিদিত সংগ্রহের মধ্যে পাঁচটি জিনিষ আছে—প্রথম সেণ্ট প্যাট্রিকের ঘণ্টা, দ্বিতীয় আর্দাগের পেয়ালা, তৃতীয় টারা ব্রুচ, চতুর্থ কঙের ক্রস, পঞ্চম সেণ্ট কলাম্বার ক্রোজিয়ার।

মিউজিয়াম দেখে এদের লাইব্রেরি দেখতে চললাম। ডাবলিনে অসংখ্য পাঠাগার আছে। ট্রিনিটি কলেজের পাঠাগার রাজকীয় সনন্দে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এতে নানা অদ্ভুত সংগ্রহ আছে। এটা দেখবার সুযোগ ক'রে উঠতে পারি নি। আমি কিলডেয়ার ষ্ট্রীটে এদের ন্যাশনাল পাঠাগার দেখি। এটা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে। এখানে প্রায় তিন লক্ষ বই আছে, আইরিশ ইতিহাস সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার পুস্তক, পাণ্ডুলিপি এখানে সংগৃহীত করা হয়েছে। দুই শত পাঠকের পড়বার স্থান আছে। এই পাঠাগারে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সমস্ত সংবাদপত্রের পুরাতন ফাইল একত্র করা আছে।

এই পাঠাগার দেখে বাসায় ফিরে মধ্যাহ্নভোজন শেষ ক'রে মিউনিসিপাল আর্ট গ্যালারি দেখতে চললাম। হেঁটেই চললাম। এক্‌সচেকার ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে ডেম ষ্ট্রীটে পড়লাম। এই রাস্তাটি বেশ সুপরিসর—চারি পাশে নানাবিধ বিপনি খানিক দূর এলেই বামে পড়ল আয়র্লণ্ডের ব্যাঙ্ক, দক্ষিণে পড়ল কলেজগ্রীণ নামক কলেজের শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। এই স্থানটিকে অনেকে ডাবলিন শহরের হৃদয় বলেন। এখান থেকেই চারিদিকে শিরাপ্রশিরা বাহির হয়েছে—সেই সব বেয়ে যেখানে খুশি যেতে পারা যায়। টি নিটি কলেজ ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পূর্ব্বে এখানে খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের একটি মঠ ছিল। কলেজের প্রবেশ-তোরণ তেমন জমকালো নয়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবার পর কলেজের সুগম্ভীর দৃশ্য ও সুকোমল তৃণের বাহার একত্র মিলে মনে অপূর্ব্ব অনুভূতি সৃষ্টি করে। চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের সম্মুখে উঠেছে সুউচ্চ ঘণ্টা-গম্বুজ—তার ইতালীয় নাম ক্যাম্পানিল। ডাইনে ও বামে কলেজের নানাবিধ গৃহ। পিছনে অধ্যাপক ও ছাত্রদের বাসস্থান। ডাইনে চলেছে ময়দান—তার তরুবীথি হৃদয় ভোলায়, তার শ্যাম ক্ষেত্র ক্রীড়াঙ্গন। ট্রিনিটি কলেজের মধ্যেই ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়। ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বপ্রথম মেয়েদের ডিগ্রি দেয় এবং সর্ব্বপ্রথম ইহুদীদের ডিগ্রি দেয়—এটা এর বৈশিষ্ট্য।

ডাবলিনে ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা ক্যাথলিকদের জন্য তৈরি। ট্রিনিটির কলেজ-লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়ম এবং অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরি গ্রেটব্রিটেনে যে কোনও বই ছাপা হোক বিনামূল্যে তার এক খণ্ড পায়। এই পাঠাগারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের বিষয় The Book of Kelts—এটা বাইবেলের অনুবাদ। ইহার চিত্রমাধুর্য্য আইরিশ প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন—এটাকে আইরিশেরা পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম পুস্তক বলে।

ব্যাঙ্কটি পূর্ব্বে পার্লামেণ্ট-ভবন ছিল; পিয়ার্স নামক এক জন স্থপতি এটি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। এর

করিন্থিয়ান স্তম্ভগুলি দেখতে খুব সুন্দর। অবসর হয় নি ব'লে এই সুন্দর গৃহটি দেখা হয় নি। এখান থেকে ওয়েষ্ট মোরল্যাণ্ড ষ্ট্রীট বেয়ে গেলে ও'কনেল মনুমেণ্টে পৌছান যায়। লিফি নদী আয়র্লণ্ডকে দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই ভাগে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। নদীটি খালের মত। ও'কনেল সেতু দিয়ে পারাপার হওয়া যায়।

এই সেতুর পূর্ব্ব দিকে নদী ক্রমশঃ প্রশস্ততর এবং পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর। সেতুর উপর দাঁড়িয়ে বহু দূর পর্য্যন্ত ঘাটগুলি দেখা যায়। অপরাহ্ণের সোনালি আলোকে নদীর দৃশ্য খুব সুন্দর—দূরে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায় এবং কাষ্টমস্ ভবনের উচ্চ ডোমও দৃষ্টিপথে পড়ে। সেতু পার হ'লেই ও'কনেল ষ্ট্রীট—সুপরিসর রাজপথ। আইরিশেরা একে প্যারির সাঁজেলিজে নামক বিখ্যাত পথের সঙ্গে তুলনা করে। ততদূর না হ'লেও এই বিস্তৃতপরিসর রাস্তাটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বিপ্লবের সময় এই রাস্তাটি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এখন এটি নূতন ক'রে সংস্কৃত হয়েছে। খানিক অগ্রসর হলেই এদের বড় ডাকঘর চোখে পড়ে। এর 'আয়নিক' বারান্দা চোখে না পড়ে যায় না।

ও'কনল ষ্ট্রীটে বড় বড় সিনেমা ও রেস্তরাঁর সমাবেশ। নৃত্যশালা ও আনন্দনিকেতনগুলি এখানেই ভিড় করেছে। ও'কনেল সেতুর উপর একটি লোক ব'সে ছবি তুলছে—মাত্র ছ-পেনি দিতে হয়। তার প্ররোচনায় লুব্ধ হয়ে একটা ছবি তুললাম। ও'কনল ষ্ট্রীটে অনেকগুলি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট নেলসন পিলার ডোরিক স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক ১২৮ ফুট উচ্চ স্তম্ভ—তার উপরে কার্ক নামক এক জন শিল্পীর খোদিত নেলসনের মূর্ত্তি। স্তম্ভের গা বেয়ে একটি বাঁকানো সিঁড়ি আছে—সেটা বেয়ে দর্শকেরা উপরে উঠতে পারে।

ও'কনলের নাম ক্যাথলিক এমান্‌সিপেশনের সঙ্গে জড়িত। লোকে তাকে মুক্তিদাতা ব'লে পূজা করে। সেতুর উপর ও'কনলের মূর্ত্তি ১২ ফুট উচ্চ, চারি পাশে নানা রূপক মূর্ত্তি আছে। এক পাশে এরিনের নারীমূর্ত্তি—হাতে মুক্তির আইন। আর কিছু দূর গেলেই পার্নেলের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি। গ্রানাইট পাথরের ৬০ ফুট চতুষ্কোণ স্তম্ভের পাদদেশে মূর্ত্তিটি অবস্থিত। উপরে একটি বীণা এবং তার নিকটে পার্নেলের অমর বাণী ক্ষোদিত আছে।

"No man can set a boundary to the march of a nation. No man has the right to say :—thus far shalt thou go and no further. We have never fixed the ne plus ultra of Ireland's march to nationhood and we never shall."

ইহার সন্নিকটেই রোটাণ্ডা এবং রোটাণ্ড হাসপাতাল। সেখানে দেশদেশান্তরের ছাত্র ও ছাত্রীরা ভিড় জমায়। এইগুলি দেখে মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারিতে চললাম। হারকোর্ট ষ্ট্রীটে লর্ড ক্লোনমেলের যে প্রাসাদ ছিল, সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর গৃহে এই কলাভবনের স্থান হয়েছিল। কক্ষগুলি সুপরিসর, ছাদ সুচিত্রিত এবং দরজাগুলি সুন্দর, কিন্তু বাড়ীটি আর্ট গ্যালারির উপযোগী নয় ব'লে বর্ত্তমানে এটা সার্লিমোণ্ট ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। মাত্র ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই চিত্রশালা সংস্থাপিত হয়েছে। সর্ হিউ লেনের বদান্যতা এবং উদ্যোগের ফলেই এই আধুনিক চিত্রশালার উদ্বোধন সম্ভব হয়েছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রদর্শনীতে কল্পনাটি তাঁর মনে জাগে এবং প্রত্যেক চিত্রকরই এক একখানি ছবি উপহার দেন। লেন তাঁর চিত্রসংগ্রহ প্রথমে ইহাতে দেন, কিন্তু সেগুলি সুসন্নিবেশিত না হওয়ায় তিনি রাগ ক'রে সেগুলি লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে দেন। লেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে লুসিটানিয়া জাহাজডুবির ফলে মারা যান। তাঁর উইলের কডিসিলে এই ছবিগুলি তিনি মিউনিসিপ্যাল গ্যালারিতে দিয়েছেন দেখা যায়। কিন্তু কডিসিল আইনানুসারে সাক্ষীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত না হওয়ায় এখনও এগুলি ন্যাশনাল গ্যালারিতে আছে। তবে সেগুলি ফিরে পাবার জন্য বিশেষ আন্দোলন চলছে, হয়ত ভবিষ্যতে সেগুলি আয়ারে ফিরবে।

সার্লিমোণ্ট আবাসে নূতন ক'রে কাচের ছাদ নির্ম্মিত হয়েছে। ছাদের ভিতর দিয়ে আলো ঘরে বিচ্ছুরিত হয়, দেওয়ালে পড়ে। ফলে ছবিগুলি আলোকিত হয়, কিন্তু দর্শকের উপর অপেক্ষাকৃত কম আলো পড়ে। এই বৈজ্ঞানিক আলো-ছায়া-নিয়ন্ত্রণের ফলে গ্যালারির উপকারিতা বহুগুণ বাড়ে।

এই চিত্রশালাটির পরিকল্পনা, সন্নিবেশ এবং পরিচালনায় ডাবলিন কর্পোরেশনের বিশেষ কৃতিত্ব আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এইরূপ একটি চিত্রশালা যদি নির্ম্মাণ করেন, দেশের রসবোধ এবং শিল্পবোধের প্রসার হয় এবং নগরীর ঐশ্বর্য্য স্বতঃই বৃদ্ধি করা যায়।

গেইটি থিয়েটারে একটি ভ্যারাইটি শো দেখলাম। একটা নাচকে তারা "গান্ধী নৃত্য" নাম দিয়েছে। সেই নাচের সঙ্গে মহাত্মার কি সংস্পর্শ তা আমি বুঝতে পারি নি। দেশনায়ক এক জন মহাত্মাকে এ ভাবে ব্যঙ্গ করাটা আমার ভাল লাগে নি। অবশ্য ও-দেশে ওরা বড় বড় মহাপুরুষদের এইভাবে কৌতুক চিত্রাদি অঙ্কন ক'রে উপহাস করা দোষাবহ মনে করে না।

ফিরে সান্ধ্যভোজন-শেষে জষ্টিস রেড্ডিনের বাড়ী গেলাম। আমি যখন বিলাত যাই তখন হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস আমার পরিচয়-পত্রে লিখে দেন জুনিয়র জজ। মুন্সেফ বললে ওদেশের লোক বুঝতে পারবে না, তাই সহৃদয় চীফ জষ্টিস এইরূপ লেখেন। রেড্ডিন আমার কার্ড দেখে আমাদের দেশের বিচার-প্রথার সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলেন। আমিও যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁকে সেটা বুঝিয়ে দিলাম। জষ্টিস রেড্ডিন, মিসেস রেড্ডিন ও তাঁদের বন্ধু মিঃ চাইল্ডার্স ও তাঁর পত্নী একত্র বসেছিলেন। কফি পান চলছিল। মিসেস আমায় এক কাপ কালো কফি দিলেন। তার পর আলাপ চলল।

এঁরা প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের শৈশব-বিবাহ আছে তো?"

আমি উত্তর দিলাম, "শৈশব-বিবাহ নেই, তবে কৈশোর-বিবাহ আছে—"

মিসেস রেড্ডিন বললেন, "এটা কি ভাল?"

বললাম, "কোন জিনিসই হঠাৎ ভাল বা মন্দ বলা চলে না, কারণ সাধারণতঃ সব বিষয়েরই দুটা দিক থাকে।"

রেড্ডিন হাসলেন, বললেন, "এ-বিষয়ে দু-দিক নেই।"

উত্তর দিলাম, "আছে বইকি—হিন্দু-মতে বিবাহ যুক্তি নয়, সংস্কার। নর ও নারী মিলে ধর্ম্মজীবন যাপন করবে তার জন্য চাই একাগ্র নিষ্ঠা। কৈশোর-বিবাহে এই মিলন নিকটতর ও মধুরতর হয়—চারিত্রিক ব্যবধান মার্জ্জিত হয়ে দ্বৈত-সম্প্রীতি সম্ভব হয়—"

মিসেস চাইল্ডার্স বললেন, "কথাটি শুনতে মন্দ নয়!"

বললাম, "আসলেও মন্দ নয়, ভারতীয় হিন্দুর বিবাহ চিরজীবনের বন্ধন—বিবাহিতের সেখানে বিচ্ছেদ নেই।"

মিসেস রেড্ডিন সভয়ে প্রশ্ন করলেন, "যদি ঝগড়া হয়?"

"তাহলেও নয়?"

মিসেস চাইল্ডার্স, "যদি স্বামী অত্যাচারী হয়, ব্যভিচারী বা মদ্যপ হয়?"

হাসতে হাসতে বললাম, "এ-বন্ধন এক যম ছিন্ন করতে পারেন, অপরে নয়।"

তার পর উঠল জাতিভেদের কথা।

দেখছি এই বন্ধুরা ভারতের সর্ব্বপ্রকার দোষের সংবাদ সঠিক রাখেন। কিন্তু এই দোষগুলির কার্য্য ও কারণ এঁরা কখনও আলোচনা করেন না। খবরকে এঁরা হজম করেন—বিশ্লেষণ করেন না।

বললাম, "দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। আয়ারেও ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট এই দুই দলের মধ্যে দুর্ব্বার ব্যবধান আছে। তাছাড়া হিন্দু-

মুসলমানের এই দাঙ্গা আজ যত অধিক, মুসলমান শাসন-কালে ছিল না—এটা তাই সাময়িক একটা ব্যাধি মাত্র।"

রেড্ডিন বললেন, "হিন্দু-মুসলমানের এই দ্বন্দ্ব আপনারা মেটান না কেন?"

"মেটে না তার এক কারণ অজ্ঞতা, আর এক কারণ সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এদের আলাদা ক'রে দিয়েই রাষ্ট্র এই ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকতে সাহায্য করছেন।"

তার পর আয়র্লণ্ডের বিচার-প্রথা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম।

রেড্ডিন বললেন, "স্বাধীনতালাভের পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে-সব অনাহারী বিচারক ছিলেন, তাঁরা সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রাহ্য করতেন না, যা খুশি তাই রায় দিতেন—নূতন শাসনের পর চার দিকে ক্রমবর্দ্ধমান শৃঙ্খলা আরম্ভ হয়েছে—এখন বিচার-প্রথা খুব স্বাভাবিক ভাবেই চলছে।"

রাত্রি অনেক হয়ে এল। সাড়ে এগারটা বাজে—বিদায় নিয়ে উঠলাম।

২৭শে সেপ্টেম্বর। আজ লর্ড এডওয়ার্ড ষ্ট্রীটে ক্রাইস্ট চার্চ ক্যাথিড্রেল দেখলাম। এটা ডাবলিনের সর্ব্বোত্তম গির্জ্জা। পরিত্যক্ত একটি ডেনিস মঠের উপর এই সুবৃহৎ ভজনালয় একাদশ শতাব্দীতে নর্ম্মানদের স্থাপত্যরীতিতে স্থাপিত হয়। কিংবদন্তী এই গির্জ্জায় ল্যাম্বার্ট সিমলেন ইংলণ্ডের রাজা রূপে বৃত হন এবং মহাসমারোহে মুকুটোৎসব সম্পন্ন হয়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে গির্জ্জাটি একেবারে ভেঙে পড়ছিল, তখন মিঃ রো নামক এক জন নাগরিকের বদান্যতায় ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। তিনি আড়াই লক্ষ পাউণ্ড খরচ করেন। গির্জ্জার ভিতরের সরু সরু সূক্ষ্মাগ্র খিলানের উপর কারুকার্য্যমণ্ডিত ছাদ উঠেছে—রঙীন কাচে বাইবেলের ঘটনার চিত্র অঙ্কিত আছে। কাঠের এবং পিতলের নানাবিধ কারুকার্য্য এখানে আছে। নর্ম্মান অভিযানকারী ষ্ট্রংবোর সমাধি এই গির্জ্জায়, এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

একটু দূরে সেণ্ট প্যাট্রিক ষ্ট্রীটে আর একটি গির্জ্জা আছে। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সৃষ্টি। পুডল নদীর বন্যা-প্লাবনে বৎসর বৎসর এটি ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বেঞ্জামিন লী গিনেস্ এটি সংস্কার করেন। সংস্কারের সময় ইহার নর্ম্মান রীতি বজায় রাখা হয় নি। পার্শ্বে মার্শের পাঠাগার। এটা অতি পুরাতন পাঠাগার। মার্শ লেক এক জন আর্চবিশপ। তিনি ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক ডিন সুইফ্‌ট এই পাঠাগারে মজলিস বসাতেন।

এখানে প্রথম যুগের মুদ্রিত বহু পুস্তকের সুন্দর সংগ্রহ আছে। এই পাঠাগারে পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বহু কীর্ত্তিমান্ লোকের স্বাক্ষর সঞ্চিত আছে। এই অঞ্চলটিতে ধর্ম্মযাজকদের স্বাধীন অধিকার ছিল—এখানে পৌরশাসন চলত না, তাই একে Libertis বলে।

এখান থেকে ফিরে লর্ড মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ডসন ষ্ট্রীটে ম্যানসনে গেলাম। গ্রাফটন ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া গেলাম। এই রাস্তার উপর নগরের বড় বড় বিপণি-সম্ভার। বিলাসের সহস্র উপকরণ সেখানে মেলে। ম্যানসনের পাশেই রয়াল আইরিশ একাডেমি। সেটাতে এক বার চোখ বুলিয়ে নিলাম। লণ্ডনে রয়াল সোসাইটি সংস্থাপনার কয়েক বৎসর পর এই সংসদ স্থাপিত হয়। এখানে আইরিশ পণ্ডিতদের পাণ্ডুলিপি একত্র করা আছে।

এই পরিষদের সদস্যেরা বিদ্যার নানা বিভাগে আপনাদের পাণ্ডিত্যের প্রভূত পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সাধনায় আইরিশ পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ, তাদের সংগ্রহে ডাবলিনের মিউজিয়ম সম্পূর্ণ। বিদ্যায় বরেণ্য, সাহিত্যে স্রষ্টা, গণিত ও বিজ্ঞানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত যত ডাবলিনে জন্মেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই এই সভার সভ্য।

একটার পূর্ব্বেই ম্যানসন হাউসে গেলাম। দ্বার খুলে দিল একটি বালিকা—সে লর্ড মেয়রের কাছে কাজ করে। মেয়র আসেন নি ব'লে সে আমাকে নিয়ে একটি ঘরে বসাল এবং নানা প্রকার আলাপে সময় কাটিয়ে দিল।

ম্যানসন লর্ড মেয়রের সরকারী বাসভবন। এখানে পূর্ব্বতন মেয়রদের পরিহিত পোষাকের সংগ্রহ আছে। একটি গোলঘর আছে, সেই ঘরে চতুর্থ জর্জ্জকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

তার পর বুথেদের ওখানে গেলাম। পথে একটি বুড়ার সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহলী। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে আমরা চললাম। আর্গাইল রোডে বুথেদের বাড়ী চিনে ১২ নং বাড়ীতে কড়া নাড়লাম। দরজা খুলল বুথের বোন। সে বুথের কাছে আমার কথা শুনেছিল—বলল, "আপনি ভারতীয় জজ?"

হাসতে হাসতে বললাম, "হ্যাঁ; বুথ আছে?"

সে মাথা নেড়ে জানাল, "না। তবে আসুন, চা খাবেন, সে এখনই আসবে।" ওদের ড্রয়িং-রুমে নিয়ে বসাল। বুথের মা এলেন। তাঁর নাম এলো; তিনটি বোন, তাদের নাম, এডিথ, মার্জ্জুরী এবং ভিভিয়েন। ভিভিয়েনের সঙ্গে বুথের চেহারার অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

চা পান চলল ও নানা রকম আলাপ হ'ল।

বুথ এল। তখন সকলে মিলে চা খাওয়া হ'ল—মেয়েরা সেদিন কোথায় বেড়াতে যাবে, তাই বুথ আমাকে বড় রাস্তায় ট্রাম ডিপোর কাছে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল। বলল, "বড় হ'লে আমি আপনাদের দেশে যাব।"

আমি বললাম, "এস।"

এই তরুণ বন্ধুটির সহৃদয় চিত্ত আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। অল্প পরিচয়ে সে যেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। তাই সত্যই ব্যথিত চিত্তে বাসায় ফিরলাম।

সন্ধ্যায় সেনেটর ডগলাস খেতে বলেছিলেন—তাঁর ওখানেই চললাম। এই আর একটি মানুষ, যাঁর স্মৃতি জীবনে ভুলব না। কর্ম্মী লোক, অথচ কি প্রেমময় সহজ সারল্য। আমাকে ডাবলিনের জীবনধারা বোঝাবার জন্য কি চেষ্টাই না করেছিলেন। এই পরহিতব্রত মনস্বীকে আজ দূর হ'তে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিই।

ডগলাস, মিসেস ডগলাস, হেরল্ড ডগলাস এবং আমি

আহার করলাম। আহারের পূর্ব্বে একটি প্রার্থনা হ'ল। আহারের পরে উনি একটি কবিতা পড়ে শোনালেন। ডগলাস বললেন, "এই রীতিটি আমার খুব ভাল লাগে, আহার শেষে আমি প্রতিদিন কোনও-না-কোনও মহৎ বিষয় পড়ি।" এটা সংগ্রহ পুস্তক, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ ছিল; আমি আছি ব'লে সেটা বিশেষ ক'রে পড়লেন।

আহার-শেষে ড্রয়িং-রুমে গিয়ে বসলাম। সেখানে আইরিশ ইতিহাসের অনেক সত্য শুনে নিলাম।

প্রশ্ন করলাম, "আলস্টার-সমস্যা কি কোনও দিন মিটবে?"

বললেন, "মিটবে, মিটতে বাধ্য। ধর্ম্মের তারতম্য নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণে এই ভেদ—আয়ার যতই গণতান্ত্রিক হয়ে সমৃদ্ধ হবে, ততই এই ভেদ ঘুচবে এবং দুটি মিটবে। দক্ষিণ ও উত্তরকে এক করবার সাধনা আমাদের—আমরা না পারি আমাদের বংশধরেরা তা করুন।" এ-কথা সত্য। বুথও বলছিল, দক্ষিণ ও উত্তরের কলহ সত্বরই শেষ হবে, তখন এক অভিন্ন আয়ার গড়ে উঠবে।

কথায় কথায় ডগলাস আইরিশ ইতিহাসের চমকপ্রদ ইতিহাস শোনালেন, সিনফিন-আন্দোলন প্রভৃতির ইতিহাস তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করলেন। আলাপ-শেষে বললেন, "আপনি ডাবলিনের নানাবিধ লোকের সঙ্গে আলাপ করেছেন, চলুন আপনাকে একজন সত্যকার বিপ্লবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

উত্তর দিলাম, "চলুন, মন্দ কি?"

ডগলাস উঠলেন, মোটর আনতে বললেন। আমি তাঁর পুত্র ও পত্নীকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলাম।

মোটর চলল। নৈশালোকিত রাজপথ দিয়ে অনেক দূর যেতে হ'ল—সমস্ত রাস্তায় কিন্তু সমান আলো নয়। এক অন্ধকার গৃহে ও'গেটির সঙ্গে দেখা হ'ল। তার সঙ্গে একটি বৃদ্ধা ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "ভারতবর্ষের বিদ্যালয়ে কি ফলিত জ্যোতিষ শিখায়?"

অদ্ভুত প্রশ্ন। শেষে অবশ্য কারণ বুঝলাম। ওরা মনে করে ভারতীয়েরা সকলেই জ্যোতিষী—তাই এ খবর জানবার আগ্রহ। আমি "না" বলায় বুড়ী যেন একটু অতৃপ্ত হ'ল।

ও'গেটি বৃদ্ধ হয়েছেন। দাড়িগোঁফভরা মুখ—চোখে যেন তবুও অপূর্ব্ব ভাস্বরতা।

আমি বললাম, "ভারতবর্ষ পৃথিবীকে নূতন পথ দেখাচ্ছে, রক্তের পথই পথ নয়, আত্মিক বিদ্রোহও সম্ভব।"

এই পুরাতন বিপ্লবী স্বল্পভাষী। ধীরে ধীরে বললেন, "অসম্ভব, সংঘর্ষ সভ্যতার গতিপথের প্রতীক—দুঃখ না পেলে স্বাধীনতা দুষ্প্রাপ্য।"

আমি বললাম, "আপনি গান্ধীর জীবন ও বাণী পড়েন নি?"

"পড়ি নি, তবে পড়লেও বিশ্বাস করব না।"

বললাম, "মহাত্মা গান্ধী যে আত্মিক সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন, সেটা নূতন নয়, এটা ভারতীয় সাধনার চিরন্তন বাণী—এটাকে তিনি কেবল নূতন দিকে পরিচালিত করলেন।"

ও'গেটি বললেন, "কমিউনিজম এবং ইণ্টারন্যাশনালিজিম শুনতে খুব মুখরোচক কথা—কিন্তু এ দুটোই মরীচিকা—পৃথিবীতে এ চলবে না—সমস্ত মানুষের পথে সমান অধিকার ভগবান্ দেন নি, মানুষও দিতে পারবে না, পৃথিবী চলবে যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে।"

যুবক ও'কনরের সঙ্গে প্রবীণ ও'গেটির মতের সামঞ্জস্য হুবহু মিলছে। উভয়েই একই বিদ্রোহের সুরে সুর মিলিয়েছেন।

মনে প্রাণে এরা শক্তির ভক্ত। এরা ডারউইনের মতকে মেনে চলেছে—পৃথিবীতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হবে, অতএব যোগ্যতার অর্জ্জনে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রেম, মৈত্রী, বিশ্বপ্রীতি এ-সব কথা এরা হৃদয়ঙ্গম করে না।

ভারতবর্ষ তার তপস্যার ক্ষেত্রে যে হোমাগ্নি জ্বালছে, সেই প্রেমযজ্ঞের টীকা জগতের লোক তত দিন পরবে না যত দিন তারা তার জাগতিক অভ্যুদয় দেখতে পাবে। বিশ্বসভ্যতা আজ বহিরঙ্গ। আজ প্রকৃতিকে জয় করে

যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি, বিশ্বদরবারে তাকে অপাংক্তেয় লোকে করবেই।

রাত হয়েছিল। আমি বিদায় নিয়ে উঠলাম। বললাম, "আপনি রুধিরাক্ত পথে চলেছিলেন, তাই হয়ত ভারতীয় এই আধ্যাত্মিকতা ধরতে পারলেন না—কিন্তু আমরা একান্ত ভাবে বিশ্বাস করি—এটা সার্থক হবে, পৃথিবীতে রণদামামা বাজবে, সে-কথা সত্যি, কিন্তু সেটাই বড় নয়, তা ছাড়িয়ে বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গান্ধীর প্রেমের ও মৈত্রীর বাণী ঝঙ্কৃত হবে।"

ও'গেটি হাসলেন, বললেন, "আপনাদের আশা সফল হোক।"

২৮শে সেপ্টেম্বর। আজ বিদায় নেবার পালা। সকাল-সকাল উঠে কোনও মতে প্রাতরাশ শেষ করে বন্দরে এলাম। ডাবলিনের দ্রষ্টব্য সব দেখা হয় নি—আরও কয়েক দিন থাকলে এই নবজাগ্রত রাজধানীর সম্পূর্ণ শোভা দেখা হয়ত হ'ত। জাহাজ ছাড়ল, কূলে মিলিয়ে গেল তরুশ্রেণী, সৌধমালা। মনে পড়ল এখানে যত আন্তরিকতা পেয়েছি, আমি তো তার যোগ্য নই। নয়ন সজল হয়ে এল।

মনে মনে বললাম—বিদায় হিবার্নিয়া, বিদায় আয়ার-জননী! নীল সাগরের পার থেকে ভারতবর্ষ তোমায় বন্ধু ব'লে, আত্মীয় ব'লে স্মরণ করবে। [সমাপ্ত]



নববধূ — রুশীয় চিত্র

বাংলা ব্যাকরণের কথা

শামসুর রহমান

বাংলা ব্যাকরণ কিরূপ হওয়া উচিত, এই বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে প্রচলিত অসংখ্য "বাংলা ব্যাকরণ" বলিয়া কথিত পুস্তক তাহার প্রয়োজনীয়তার সাক্ষ্য দিবে।

ব্যাকরণ-শব্দের সংস্কৃত অর্থ পদ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র। অর্থাৎ "এমন গ্রন্থ, যাহা প্রত্যেক পদকে ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দেখাইতে চাহে যে কিরূপ কোন্ মূল ধাতু হইতে পদটি উৎপন্ন হইয়াছে"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কিন্তু পদের গঠন জানা হইলে, ভাষার সম্যক পরিচয় জানা হয় না। পদের গঠন বর্ণ লইয়া এবং বাক্যের গঠন পদ লইয়া। ভাষার পরিচয় জানিতে হইলে, পদ-গঠন এবং বাক্য-গঠন, এই দুই-ই শিক্ষা করা প্রয়োজন।

বাক্য-গঠন করিয়াই আমরা বলি, শুধু পদ-গঠন করিয়া আমরা বলি না। বলি না যে, "ও কোন হইয়া বিরক্ত বিষয়ে জীবনে হইও হতাশ না" বলি, "জীবনে কোনও বিষয়ে বিরক্ত হইয়া হতাশ হইও না।"

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, শুধু শব্দ-বা পদ-জ্ঞান থাকিলে, কোন ভাষার পরিচয় সম্যক্ শিক্ষা করা গিয়াছে, এরূপ বলা যায় না। বাক্য-গঠন শিক্ষাও প্রয়োজন এবং বাক্য-গঠন শিক্ষার জন্য পদ-গঠন শিক্ষারও প্রয়োজন। কারণ, পদ-গঠন না-জানিলে, পদের পরিচয় জানা হইবে না; কিন্তু পদ বাক্যের উপাদান, উহা ব্যতীত বাক্য হইতে পারে না। এই কারণে, পদ-ব্যুৎপত্তি, পদ-গঠন বা পদ-নির্ম্মাণ জানাও আবশ্যক। কাজেই ভাষার পরিচয় জানিতে হইলে, পদ-গঠন ও বাক্য-গঠন দুই-ই জানা দরকার।

এখানে দেখা যাক, পদ-পরিচয় কি?

পদ-পরিচয় নানা প্রকার। এক সংক্ষেপ-বিস্তার-পরিবর্ত্তন-পরিচয়। পদের বর্ত্তমান আকৃতির সহিত যতদূর পূর্ব্বকার আকৃতি পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে, এই পূর্ব্বকার পদ ক্রমশঃ যে যে রূপ সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া, এবং বর্ত্তমান কালে যে বা যে যে আকৃতিতে উপনীত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া যে পদের পরিচয় জানা যায়, তাহাই পদের সংক্ষেপ-বিস্তার-পরিবর্ত্তন-পরিচয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের শব্দ-শিক্ষা পদের এইরূপ পরিচয়-পুস্তিকা।

পদের অন্য পরিচয় উৎপত্তি-পরিচয়। প্রত্যয়-বিভক্তি-হীন পদ, যাহাকে মূল শব্দ বলা হয়, তাহার কথা বলা যাইতেছে। এ-কথা এখন সর্ব্ববাদীসম্মত যে শব্দ দুই প্রকারে উৎপন্ন, এক ধ্বনি হইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অপর, মানুষের ইচ্ছানুযায়ী গঠিত শব্দ। অবশ্য কতক শব্দ ধ্বন্যাত্মক কি ইচ্ছাগঠিত, তাহা লইয়া মতবিরোধ বর্ত্তমান। এই মতবিরোধ থাকিবেই। কারণ, যে পদ বহু পূর্ব্বকালীন বলিয়া প্রমাণিত, তাহা যখন উৎপন্ন হইয়াছিল, তখনকার ধ্বনি এবং মানুষের মনোভাব আমরা ততটা জানি না, তখনকার শব্দ ধ্বন্যাত্মক কি ইচ্ছাগঠিত তাহা নির্ণয় করিতে যতটা জানা প্রয়োজন। যাহা হউক, এই সমস্যার আলোচনার স্থান ইহা নহে; এখানে আমার বক্তব্য, শব্দের উৎপত্তি-বিষয়ও পদের অন্যতম পরিচয়।

পদের আর এক পরিচয়, প্রত্যয়-বিভক্তি-হীন পদ যাহাকে মূল শব্দ বা ধাতু বলা হয়, তাহার সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়া যে অন্য শব্দ বা ধাতু উৎপন্ন হয় তাহার পরিচয়। এইটিকে পদের পদান্তর-পরিচয় বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচয়, পদ-বিভক্তি-পরিচয়। "আমি তোমাকে ভালবাসি—এই কথায়, "আমি," "তুমি," "ভালবাস্"—এই তিনটি শব্দ ও ধাতু পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া একটি কথায় পরিণত হইয়াছে। শব্দের সহিত অন্য শব্দ বা ধাতুর এই যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে, শব্দের বা ধাতুর শেষে নানা রকমের বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়।

ইহাদের নাম বিভক্তি। পদের ও বিভক্তির বিষয়ে যে পরিচয়, তাহাকেই পদ-বিভক্তি-পরিচয় বলিতেছি।

অতএব দেখা যাইতেছে, পদের মোটামুটি চারি প্রকার পরিচয়।

এখন দেখা যাক, বাক্য-পরিচয় কি?

বাক্যের প্রয়োগের নিয়ম, অর্থাৎ আমরা যত প্রকার বাক্য গঠন করিয়া কথা কহিয়া থাকি, এবং যে-যে নিয়মে গঠন করিয়া থাকি, সেই সেই নিয়মের পরিচয়ই বাক্যের পরিচয়। ইহার প্রয়োজন পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

বাংলা ভাষার পরিচয়-পুস্তকে, বাংলা ব্যাকরণে, উক্ত বিষয়সকল থাকা প্রয়োজন। অথবা এই সকল বিষয়-সমন্বিত পুস্তকই বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়-পুস্তক বা ব্যাকরণ।

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য ব্যাকরণ বিভিন্ন ভাবে লেখা দরকার। এখানে এই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের ব্যাকরণের কথা বলা যাইতেছে।

যে কেবল বাংলা ভাষার সাধু রূপ শিক্ষা করিতে চায়, তাহার কেবল বাংলা ভাষার সাধু রূপের পরিচয় শিক্ষা করা দরকার। তাহার জন্য যে ব্যাকরণ লিখিত হইবে, তাহাতে পদের সংক্ষেপ-বিস্তার-পরিবর্ত্তন-পরিচয় এবং উৎপত্তি-পরিচয় অনাবশ্যক। তাহাতে, কেবল সাধু রূপ বাংলা ভাষার পদের বিভক্তি-পরিচয়, এবং পদান্তর-পরিচয় এবং বাক্য-গঠন-পরিচয় আবশ্যক।

এইরূপ, যে বাংলা ভাষার কলিকাতা-রূপ শিক্ষা করিতে চায়, তাহার জন্য যে ব্যাকরণ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা। সেই পুস্তকেও বাংলা ভাষার কলিকাতা-রূপের বিভক্তি-পরিচয়, পদান্তর-পরিচয় এবং বাক্য-গঠন-পরিচয় ব্যতীত পদের সংক্ষেপ-বিস্তার-পরিবর্ত্তন-পরিচয় ও উৎপত্তি-পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ শিক্ষার জন্য, এই ধরণের ব্যাকরণেরই প্রয়োজন।

এখানে কথা উঠিতে পারে, যে এক বাংলা ভাষার নানা প্রকার রূপ শিক্ষার জন্য যদি বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিতে হয়, তবে ইহা নিতান্ত জটিল বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

কিন্তু ব্যাকরণকার জানেন, ইহা তেমন জটিল বিষয় নহে। কারণ, সাধু রূপের সহিত, বাংলার প্রাদেশিক অন্যান্য কথ্য রূপের যে পার্থক্য, তাহা নির্দ্দেশ করিতে বা শিক্ষা করিতে, বিভিন্ন বড় বড় পুস্তক লিখিতে বা শিক্ষা করিতে হইবে না। এই বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিতে ছোট ছোট পুস্তিকামাত্র লেখা দরকার এবং তাহার এক-একখানা পাঠ করিলেই, বাংলা ভাষার এক-এক প্রকার কথ্য রূপ জানা যাইবে।

আর প্রত্যেক ভাষারই নানা কথ্য রূপ থাকে, যেমন ইংরেজী ভাষারও আছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে, আমরা তাহার বিভিন্ন প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের দিকে বিশেষ লক্ষ্য, এমন কি লক্ষ্যমাত্র, না করিয়া, তাহার পরিমার্জ্জিত সাহিত্যিক ভাষার প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া, তাহা শিক্ষা করিয়া থাকি। বাংলা ভাষার সম্বন্ধেও এইরূপ। বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতেও শিক্ষার্থী বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপই শিক্ষা করিয়া থাকে, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করে না। তবে পণ্ডিতের কথা স্বতন্ত্র। তিনি চাহেন ত বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণই শিক্ষা করিতে জীবন অতিবাহিত করিবেন।

বর্ত্তমান বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ দুই প্রকার। এক, কলিকাতার মার্জ্জিত কথ্য রূপ, অপর, সাধু রূপ। সাধু রূপের সহিত এই কথ্য রূপের যে পার্থক্য, তাহা শিক্ষা করিতে সাধু রূপ বাংলা ব্যাকরণের পরিশিষ্ট রূপে গোটাকতক পৃষ্ঠামাত্র পাঠ করা দরকার। অতএব এই বিষয় লইয়া উচ্চবাচ্যের প্রয়োজন নাই।

অতএব, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সাধু রূপ বাংলা ভাষাই বাংলা ভাষার প্রধান রূপ। ব্যাকরণ এই রূপেরই লেখা উচিত। যে বাংলা ভাষার অন্য রূপ শিক্ষা করিতে চায়, ইহার সহিত সে এই সাধু রূপ বাংলা ব্যাকরণের পরিশিষ্ট-রূপ অন্য পুস্তিকা পাঠ করিবে।

কিন্তু এই যে "সাধু রূপ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ," ইহা আজিও সম্পূর্ণ অবয়বে প্রকাশিত হয় নাই। সাধু ভাষায় লিখিত বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ নামীয় অসংখ্য পুস্তক আছে বটে, কিন্তু তাহাদের একখানিও প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ নহে। ইহাদের কতক বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, কতক এইরূপ পুস্তকের সহিত দুই-একটি বিষয় বিজড়িত, কতক বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যাকরণের মিশ্রণ। আজকাল বাংলা ব্যাকরণের অভাব দূরীকরণার্থে কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন।

দক্ষিণ-ভারতের মন্দির-গাত্রে নৃত্যমূর্ত্তি

প্রাচীন ভারতের সর্ব্বপ্রকার শিল্পকলার মত নৃত্যকলার লক্ষ্যও প্রধানতঃ ভাবব্যঞ্জনা—অঙ্গলীলার মধ্য দিয়ে



নটরাজ

মানব-চিত্তের নানা ভাব ও বেদনার প্রকাশই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নৃত্যের গৌরব, শুধু চিত্তবিনোদন বা অবসর-যাপন তার উদ্দেশ্য নয়। ভারতীয় নৃত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা গেছে দক্ষিণ-ভারতে, আর এখনো সেখানে নৃত্যকলা পুরাতন আদর্শ নিয়ে সজীব হয়ে আছে। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরে মন্দিরে এই নৃত্যভঙ্গী ভাস্কর্য্যের মধ্যেও রূপ পেয়েছে। দক্ষিণ-ভারতের এই নৃত্যমূর্ত্তির একটি শ্রেষ্ঠ সমাবেশ হয়েছে চিদম্বরমে, শ্রীনটরাজ এই মন্দিরের অধিপতি দেবতা। আন্নামালাই কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি. এস. নাইডু সম্প্রতি এখানকার অনেকগুলি নৃত্যমূর্ত্তির প্রতিলিপি প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন, এই সংখ্যায় সেগুলি মুদ্রিত হ'ল। রসশাস্ত্রে ও নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন রস এই মূর্ত্তিগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পী একদা অভিব্যক্ত ক'রে তুলেছিলেন। বিভিন্ন নটরাজ-মূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে শ্রীরমেশ বসু একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন; কিন্তু এই মন্দিরের নটরাজ-মূর্ত্তির নৃত্যভঙ্গীর শিল্পগৌরব মনে হয় অপূর্ব্ব, অসাধারণ। নটরাজের এই নৃত্যের মধ্যে কোনো বিশেষ একটি ভাবের ব্যঞ্জনা নেই। নৃত্যকলারই বিশেষ রসটিকে পরিস্ফুট ক'রে তোলাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য, তাই নটরাজ স্বয়ং এই নৃত্য বর্ণনা ক'রে দেখাচ্ছেন, শিল্পী এইরূপ কল্পনা করেছেন।

অন্যান্য নৃত্যমূর্ত্তির মধ্যে বিভিন্ন রসের দ্যোতনা করা



বেদনা



অগ্নিভয়



নৃত্য-করণ



ভয়াভিভূত



সমবেদনা

হয়েছে। ভয়, করুণা, রৌদ্ররস, বীররস প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব মূর্ত্তির মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করা হয়েছে। আবার একই রসের বিভিন্ন প্রকার বিকাশের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তারতম্য ও বৈচিত্র্য, তাও শিল্পী মূর্ত্তির মধ্যে অভিব্যক্ত করেছেন। মুদ্রিত চিত্রমালার মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে অনেকগুলিকেই একই ছবি ব'লে মনে হ'তে পারে; কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলে লক্ষ্যগোচর হবে যে, একটি মূর্ত্তিতে সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা কৌশলী শিল্পী



বৃশ্চিক



ভয়ব্যাকুল



"মামেকং শরণং ব্রজ"



বৃশ্চিক



নৃত্য-করণ



সর্পভয়



নৃত্য-করণ



হাস্য

সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিস্ফুট করেছেন। এইরূপ ভাবে শিল্পী ক্রোধ, ভয়, করুণা প্রভৃতির বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া অনেকগুলি মূর্ত্তিতে সিংহ হরিণ প্রভৃতি প্রাণীও বর্ণিত হয়েছে, কতকগুলিতে যুদ্ধ, মানভঞ্জন প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে। "ধনগর্ব্ব" শীর্ষক মূর্ত্তিগুলিতে হঠাৎ-বড়লোকের দম্ভ শিল্পী ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নৃত্য-করণ মূর্ত্তিগুলিতে কোনো বিশেষ ভাবের ব্যঞ্জনা নেই, সেগুলির মধ্যে শুধু নৃত্যকলার লালিত্যকে শিল্পী অভিব্যক্ত করেছেন। ১৫ ইঞ্চি পরিসরের মধ্যে কঠিন গ্রানাইট পাথরে এই সব সূক্ষ্ম ভাব পরিস্ফুট করে তোলা ভারতশিল্পীর মহাকৃতিত্বের নিদর্শন।

গুপ্ত

মহিলা-সংবাদ



ডক্টর সি. মীনাক্ষী



কুমারী সুবিনীতা ঘোষ

বিদুষী ডক্টর সি. মীনাক্ষী এম. এ., পিএইচ. ডি. সম্প্রতি লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯৩১ সালে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিভাগে গবেষণা কার্য্যে ব্রতী হন। এই গবেষণার ফলে তিনি ১৯৩৬ সালে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গবেষকের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ-ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে গবেষণা করিতে থাকেন। কাঞ্চীর বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গালোরে মহারাণী মহিলা-কলেজে তিনি ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপকের কাজও করিয়াছিলেন।

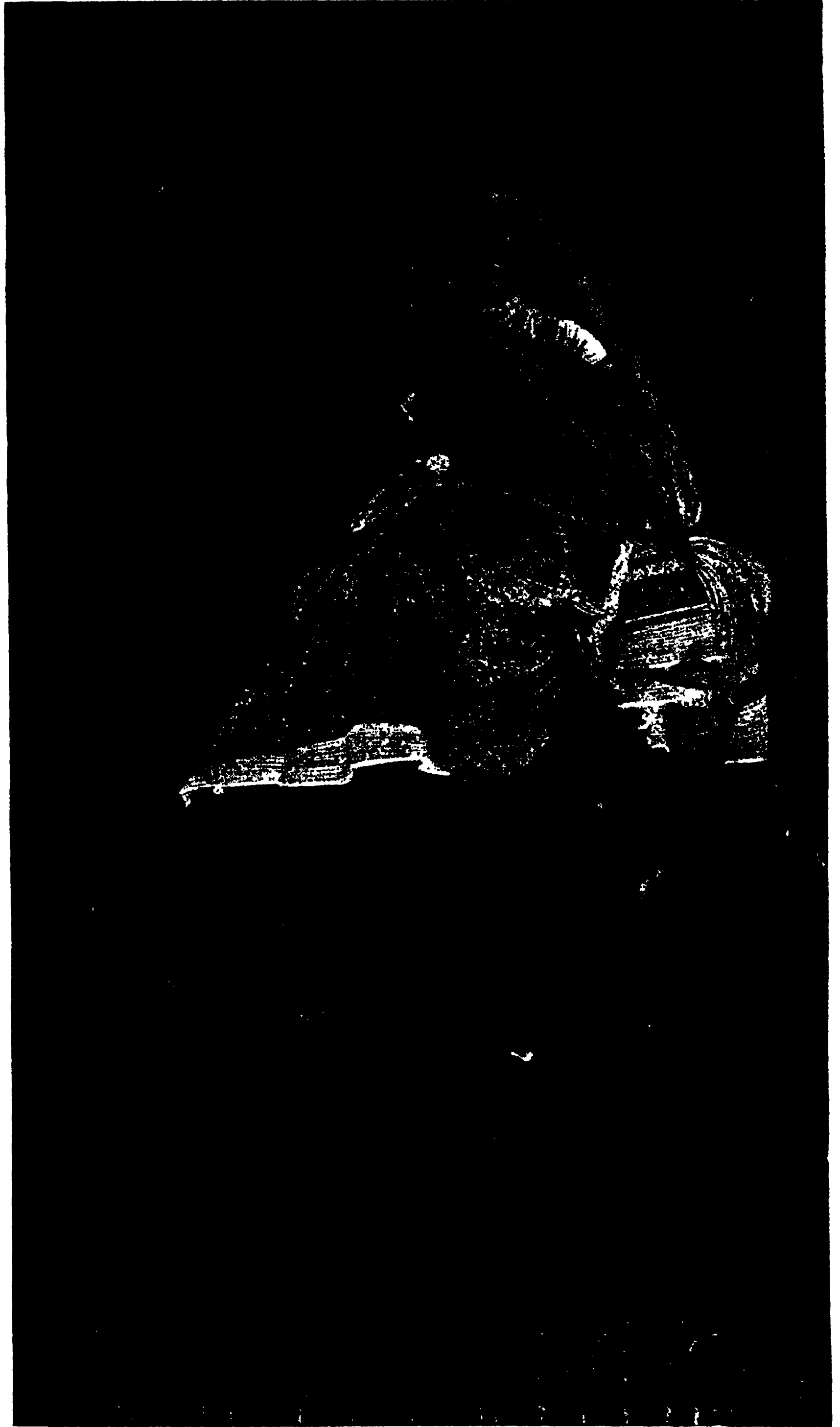
শ্রীশীলা সরকার কলিকাতা সঙ্গীত-সম্মিলনী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত গীতশ্রী পরীক্ষায় এই বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে উত্তীর্ণা ছাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বিবেচিত হওয়ায় কুমারী সুবিনীতা ঘোষ গঙ্গামণি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।



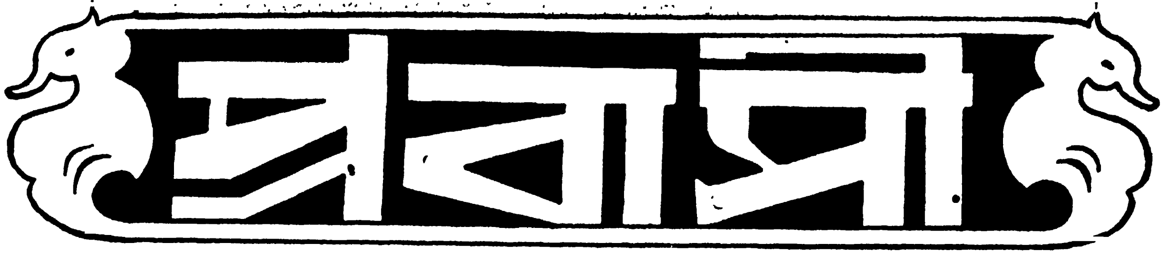
শ্রীশীলা সরকার

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



প্রতীক্ষা
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪৭

৩য় সংখ্যা

অভিশাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর-গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্চ্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হ'তে
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।
যে লোভ রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশ-বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর ;
আদিম বন্যতা তার উদ্ঘারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।

অসন্তুষ্ট বিধাতার
ওরা দূত বুঝি,
শত শত বর্ষের পাপের পুঁজি
ছড়াছড়ি করে দেয় এক সীমা হ'তে সীমান্তরে,
রাষ্ট্রমদমত্তদের মদ্যভাণ্ড চূর্ণ করে
আবর্জনাকুণ্ডতলে।
মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে,
বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়
ইতিহাসময়।
সেই পাপে
আত্মহত্যা-অভিশাপে
আপনার সাধিছে বিলয়।
হয়েছে নির্দয়
আপন ভীষণ শত্রু আপনার 'পরে ;
ধূলিসাৎ করে
ভূরিভোজী বিলাসীর
ভাণ্ডার-প্রাচীর।

শ্মশান-বিহার-বিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শত স্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী-বেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

২২।৫।৪০, গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত (পৃ. ২২৪) "জন্মদিন" কবিতার "মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের" পংক্তিটি এইরূপ পড়িতে হইবে—
"মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ।"

পরশ পাথর

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯২৭ সালে শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ওআল এক দিন ঘোষণা করিলেন যে তিনি তামার পরমাণু ভাঙিবার চেষ্টায় আছেন। ইহার ১৫ বৎসর পূর্বে রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম নাইট্রোজেন পরমাণু ভাঙেন ; তাহার পর রাদারফোর্ড এবং তাঁহার সহকর্মীরা আরো অনেক প্রকার পরমাণু ভাঙিয়াছিলেন, কিন্তু কি কারণে বুঝা যায় না ওআলের এই ঘোষণায় জনসাধারণের মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার হইল ; লোকে ভাবিল এইবার বুঝি পৃথিবীর শেষ হইবে। এক জন এক পত্র লিখিলেন—

প্রিয় মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া পরমাণু ভাঙিবেন না। আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। দোহাই আপনার, সব যেমন আছে তেমনি থাকুক।

—ভীত এক ব্যক্তি

আর এক জনের চিঠি এইরূপ—

শুনিলাম আপনি স্থির করিয়াছেন যে আগামী বুধবার পৃথিবী উড়াইয়া দিবেন। অনুগ্রহ করিয়া ওটা বুধবার না করিয়া রবিবার করিবেন, কারণ তাহার মধ্যে আমার আধ দিনের ছুটি এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাহিনা পাইব। আশা করি আমার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন।

তৃতীয় পত্রে অনেকগুলি সন্তানের পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া লিখিলেন—

শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে আপনি আপনার পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প। আপনি যে মনুষ্যজাতির ধ্বংসে উদ্যত হইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, আপনার কি স্ত্রী পুত্র পরিবার নাই ? কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদের প্রতি আপনি কি নিষ্ঠুর ! ভগবান আপনার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।

এই সব পত্র পাইয়া ডক্টর ওআল পরীক্ষা বন্ধ রাখিলেন বা পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিলেন আমরা সঠিক জানি না, তবে এটা সকলেই স্বীকার করিবেন যে সেদিন পৃথিবীর ধ্বংস হয় নাই।

পরমাণু ভাঙিবার ইতিহাস একটু গোড়া হইতেই আরম্ভ করা যা'ক।

কবি বলিয়াছেন—'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'। কিন্তু মধ্য যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ শুধু খ্যাপা নয়, অনেক তথাকথিত বিজ্ঞানী একটা উপায় খুঁজিয়া গিয়াছেন যদ্দারা তামা, লোহা, দস্তা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনাতে পরিণত করা যায়। আর কেনই বা যাইবে না ? তাঁহারা দেখাইলেন যে একটি লোহার ঘড়াকে ঝরণার জলে অনেকক্ষণ রাখিলে লোহার ঘড়াটি তামার হইয়া যায় ; তাহা যখন হয় তখন তামাকেই বা সোনাতে পরিণত করা যাইবে না কেন ? রাজা মহারাজা ইহাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন ; ইহার কারণ খুবই সুস্পষ্ট ; এইরূপ উপায় বাহির হইলে রাজ-সরকারের আর কোন দেনা থাকিবে না এবং নিজেদের বিলাস ব্যসনে তাঁহারা যথা ইচ্ছা খরচ করিতে পারিবেন। চেষ্টা চলিতে লাগিল ; তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহুলোকের বহুচেষ্টার ফলে মানব এই মহা সত্যে উপনীত হইল যে সোনা পাওয়া যায় একমাত্র সোনা হইতে। অবশ্য এখনও মাঝে মাঝে শুনা যায় যে পল্লীগ্রামে সাধুবেশধারী কোন লোক রূপাকে সোনা করিবে বলিয়া প্রচার করিতেছে এবং পল্লীবাসীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের যত কিছু রূপা জমা দিয়া যাইতেছে। তবে এ রকম সংবাদ এখানেই শেষ হয় না ; পরে খবর আসে যে যেদিন রূপার সোনা হইবার কথা তাহার পূর্বরাত্রেই সাধু বাবাজী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন রসায়নবিদ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, ড্যালটন যখন পরমাণুবাদ প্রচার করিলেন, তখন জানা গেল যে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। লোহার ঘড়ার প্রস্রবণের জলে তামা হওয়ার কথা বলা হইয়াছিল ; দেখা গেল লোহার উপর তামার একটি আস্তরণ পড়িয়াছিল মাত্র এবং সেটা এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে,

জলের মধ্যে খুব অল্প পরিমাণে তামা মিশ্রিত থাকিত বলিয়া ঐরূপ ঘটিত। যাহা হোক, প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া ড্যালটনের সিদ্ধান্ত অটল রহিল।

গত শতাব্দীর শেষভাগে ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হইল; তাহার পর ইলেকট্রনের জুড়িদার প্রোটনের অস্তিত্ব জানা গেল। নিউট্রনের সন্ধান মিলিল। রাদারফোর্ড, বোর পরমাণুর এক চিত্র আঁকিলেন। প্রতি পরমাণুর দুইটি অংশ কল্পিত হইল; কেন্দ্র ও বাহির; বাহিরে ইলেকট্রন ঘুরিতেছে; বিবিধ পরীক্ষায় যে ইলেকট্রন বিচ্যুত হইয়া আসে তাহা বাহিরের ইলেকট্রন, কেন্দ্রের বস্তু অটুট থাকে। এক পরমাণুকে অন্য পরমাণুতে পরিবর্তন করিতে হইলে কেন্দ্রটিকে ভাঙিতে হইবে। কিন্তু কেন্দ্রস্থ বিভিন্ন অংশের মধ্যে আকর্ষণ খুব দৃঢ়; তাহাদের সেই বন্ধন ছিন্ন করা সহজ নয়; আর সহজ যদি হইত তবে এতদিনে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত। সহজ নয় বটে কিন্তু একেবারে অসম্ভব কি? মোস্‌লে বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রের যে কল্পনা করিলেন তাহাতে এই দাঁড়ায় যে কোন রকমে একটি পারদ-পরমাণুর কেন্দ্রে যদি একটি ইলেকট্রন প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে পারদ সোনাতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। কিন্তু কিরূপে ইহা হইতে পারে? মিথী এবং নাগোয়াকা সাধারণ তড়িৎ-শক্তির সাহায্য লইলেন এবং তাঁহারা বলিলেন যে পারদ সোনাতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের পরীক্ষার যাচাই হইল; কিন্তু তাঁহাদের উক্তি সমর্থিত হইল না। অপর এক জন বলিলেন তিনি টংগ্‌স্টেনকে হিলিয়মে পরিবর্তিত করিয়াছেন; নাইট্রোজেনকে হিলিয়মে পরিবর্তনের কথা উঠিল; কিন্তু পরীক্ষায় কোন কথাই টিকিল না। এ সব উক্তি ত্যাগ করা হইল, সেই পুরান প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল এক পরমাণুকে আর এক পরমাণুতে রূপান্তরিত করা কি কোন রকমেই সম্ভব নয়? অতিশয় ক্ষুদ্র অথচ প্রভূত বলশালী পদার্থকে কেন্দ্রের অভিমুখে পাঠাইয়া কি হয় দেখা যাইতে পারে। তেজস্ক্রিয় (radioactive) পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মির মধ্যে দেখা গেল আল্‌ফা-রশ্মি এইরূপ একটি ছট্‌রা; ইহা ছোট, হিলিয়মের কেন্দ্রস্থ বস্তু, এবং রেডিয়ম C হইতে নির্গত আল্‌ফা-রশ্মির বেগ প্রচণ্ড। এই আল্‌ফা-রশ্মি হয়ত কেন্দ্রে পৌঁছিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে পারে। কিন্তু না দেখা যায় একটি আল্‌ফা-রশ্মি, না দেখা যায় কেন্দ্রস্থ বস্তু। কলির কোন অর্জুন লক্ষ্য করিয়া একটি আল্‌ফা-রশ্মিকে ঠিক একটি কেন্দ্রের দিকে ছুড়িয়া দিবে? তবে একটা কথা আছে অনেকগুলি ছট্‌রা পাঠাইয়া তো একটি উড়ন্ত পাখিকে বধ করা যায়। সেইরূপ করা হইল; রেডিয়ম C হইতে বিভিন্ন দিকে আল্‌ফা-রশ্মি ছুটিল; কয়েক সহস্রের মধ্যে মাত্র একটি ঠিক কেন্দ্রের দিকে গেল এবং ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড এক পরীক্ষায় দেখিলেন যে নাইট্রোজেন পরমাণু ভাঙিল, বাহির হইল হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক, প্রোটন; এই প্রোটনের নিকট একটি ইলেকট্রন আসিলেন, উহা হাইড্রোজেনে দাঁড়াইবে। কিন্তু পরীক্ষায় কি করিয়া বুঝা যাইবে যে হাইড্রোজেন পাওয়া গেল! কেন, রসায়নবিৎ তো হাইড্রোজেনের অনেক গুণাবলীর কথা বলিয়াছেন, মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে উহা হাইড্রোজেন কি না। কিন্তু যতটুকুর কম হইলে আর রাসায়নিক পরীক্ষা চলে না ততটুকু পরিমাণ হাইড্রোজেনে বহু কোটী পরমাণু আছে, আর এখানে কতগুলিই বা নাইট্রোজেন পরমাণু ভাঙিতে পারা গেল। অন্য উপায়ে জানা গেল যে উহারা প্রোটন।

আল্‌ফা-রশ্মি নিজেকে প্রকাশিত করে তিনটি উপায়ে; গ্যাসকে তড়িৎ পরিবাহক করে, উইলসন কক্ষে নিজের গতিপথে জলকণা উৎপন্ন করে, জিঙ্ক-সলফাইড পর্দায় যেখানে আঘাত করে সে স্থানটা ঝিকমিক করিয়া উঠে। বাতাসের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে উহার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে; যদি একটি নির্দিষ্ট বেগের কম হইয়া দাঁড়ায় তবে উহা আগেকার কোন রকম প্রক্রিয়ায় নিজেকে ধরা দিতে পারে না। রেডিয়ম C হইতে যে আল্‌ফা-রশ্মি বাহির হয় তাহা ৭ সেণ্টিমিটার দূর অবধি নিজেকে জানাইয়া দেয়। এই আল্‌ফা-রশ্মি যদি হাইড্রোজেনের ভিতর দিয়া যায় তবে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রস্থ প্রোটন ধাক্কা খাইয়া ২৮ সেণ্টিমিটার দূর অবধি যাইয়া জিঙ্ক-সালফাইড পর্দায় স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে। নাইট্রোজেনের মধ্যে আল্‌ফা-রশ্মি পাঠাইয়া রাদারফোর্ড দেখিলেন যে ২৮

সেন্টিমিটার দূরে স্ফুলিঙ্গ দেখা যাইতেছে। নাইট্রোজেনের কেন্দ্রস্থ বস্তু দ্বারা উহা হইতে পারে না; এই বস্তু অপেক্ষাকৃত ভারী, অতদূর যাইবে না; প্রোটন ঠিক যতটা যায় উহা ততদূর অবধি যাইতেছে; চুম্বক দ্বারা, তড়িৎ দ্বারা, প্রোটন যতটা বাঁকে উহা ততটা বাঁকিতেছে, উহা প্রোটন ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। তখন কথা হইল, হয়ত নাইট্রোজেনের মধ্যে অল্প পরিমাণে হাইড্রোজেন মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রোটন। দেখা গেল তাহাও হইতে পারে না, কারণ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন লইয়া পরীক্ষায় স্ফুলিঙ্গের সংখ্যা বরং বাড়িয়া গেল। রাদারফোর্ড অপর বৈজ্ঞানিকগণকে তাঁহার এ পরীক্ষা দেখাইলেন! বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই সর্বপ্রথম পরমাণু ভাঙা হইল। নাইট্রোজেন ব্যতীত অন্য পরমাণু লইয়াও পরীক্ষা চলিল; বোরন, ফ্লুয়োরিন, সোডিয়ম, এলুমিনিয়ম, ফস্‌ফরস্ পরমাণু ভাঙা হইল; প্রতি ক্ষেত্রেই প্রোটন বাহির হইল।

এ সবই ভাঙা হইল রেডিয়ম হইতে নির্গত আল্‌ফা-রশ্মির সাহায্যে। কিন্তু কথাটা হইল এই পৃথিবীতে রেডিয়ম আছে কতটুকু, আর উহা হইতে আল্‌ফা-রশ্মি বাহির হইতেছে বা কি পরিমাণে? পদার্থকে ভাঙিতে হইলে যদি শুধু আল্‌ফা-রশ্মির উপর নির্ভর করিতে হয় তবে এই ভাঙার পরিমাণ কতটুকুই বা হইবে? পরমাণু ভাঙিতে পারিলাম, মানব শুধু এই আনন্দটুকু লাভ করিবে, আর কিছু নয়। অনেকে হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে কৃত্রিম কিছুর সাহায্য লইয়া পরমাণুকে ভাঙা অসম্ভব। যাহা কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ওখানকার বস্তুকে ভাঙিবে তাহাকে আল্‌ফা-রশ্মির মত শক্তিধর হইতে হইবে। কিন্তু কোন কণিকাকে তো এইরূপ শক্তিযুক্ত করা যায় না। এই সময় গামাও, গুর্নে ও কণ্ডন তরঙ্গবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলবিদ্যা প্রয়োগ করিয়া পরমাণুর অভ্যন্তরের যে চিত্র দিলেন তাহাতে বুঝা গেল যে অল্পশক্তিধর কণিকার পক্ষে কেন্দ্রস্থ বস্তু ভাঙা একেবারে অসম্ভব নয়। কল্পনা করা হইল কেন্দ্রস্থ বস্তুকে ঘিরিয়া একটি প্রাচীর আছে; প্রাচীরের উচ্চতা যতটা শক্তির মাপক তাহার বেশি শক্তি না হইলে ভিতরে প্রবেশ একেবারে অসম্ভব, ইহা ছিল সনাতন বলবিদ্যার কথা। নূতন বলবিদ্যা বলিল, অসম্ভব নয়, তবে সদাসর্বদা ঘটিবে না। তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্র হইতে আল্‌ফা-রশ্মি পলায়ন ব্যাপারে এইরূপ কল্পনার সাহায্যে অনেক ঘটনা মীমাংসিত হয়। এই হিসাবের পর আল্‌ফা-রশ্মির সাহায্য ব্যতীত অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর বস্তুর সাহায্যে পরমাণুকে ভাঙিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল।

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাভেণ্ডিশ পরীক্ষাগারে কক্‌ক্রফ্‌ট ও ওআলটন প্রোটনকে প্রায় ৮ লক্ষ ভোল্ট বিভবের তড়িৎ দ্বারা বেগযুক্ত করিলেন। ঐ প্রোটন লিথিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রে গিয়া প্রচণ্ড আঘাত করিল। এখন লিথিয়মের কেন্দ্রে ৭টি প্রোটন আছে, বাহির হইতে আরও একটি আসিল; ৮ টি, ৪টি ৪টি করিয়া ভাগ হইল। কিন্তু ৪টি প্রোটনওয়ালা পরমাণু তো হিলিয়ম; সুতরাং ব্যাপারটা এই দাঁড়াইল যে একটি প্রোটন ভীমবেগে আসিয়া যেই একটি লিথিয়ম পরমাণুর উপর পড়িল, লিথিয়ম ভাঙিল, দুইটি হিলিয়মের জন্ম হইল। রাদারফোর্ডের সম্মুখে এই পরীক্ষা হইল। রয়াল সোসাইটির অধিবেশনে বিজ্ঞানীদের সম্মুখে রাদারফোর্ড এই পরীক্ষা দেখাইলেন, পরিশেষে বলিলেন,

I was present at the birth of the alpha particles and I recognised these at once as legitimate children!

আল্‌ফা-রশ্মির সাহায্যে যে-দিন প্রথম পরমাণু ভাঙা হইল সে-দিন রসায়ন বিদ্যার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এতদিন অবধি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অণুর মধ্যে পরমাণু যাওয়া-আসা করিত; এবার এক পরমাণু ভাঙিল আর এক পরমাণুর সৃষ্টি হইল। রাদারফোর্ডের আদি পরীক্ষায় প্রথমে কি কি পরমাণু ছিল এবং আঘাতের ফলে কিসে কিসে দাঁড়াইল দেখা যাক। ১৪ আণবিক ওজন নাইট্রোজেনের উপর ৪ আণবিক ওজনের আল্‌ফা কণিকা আসিয়া পড়িল; বাহির হইল এক আণবিক ওজনের প্রোটন এবং জন্মগ্রহণ করিল ১৭ আণবিক ওজনের অক্সিজেন আইসোটোপ (isotope)। কক্‌ক্রফ্‌ট ও ওআলটনের পরীক্ষায় ৭ ও ১ আণবিক ওজনের দুইটি বিভিন্ন পরমাণু মিলিল, দুইটি ৪ আণবিক ওজনের পদার্থে পরিণত

হইল। কিন্তু এই ব্যাপারে একটি সূক্ষ্ম হিসাব দেখিয়া বিজ্ঞানী অতিমাত্রায় চমৎকৃত হইলেন। লিথিয়মের উপর যখন প্রোটন আসিল তখন সমবেত ভর (mass) হইল ৮.০২৬১ ; উহারা দুইটি হিলিয়ম পরমাণুতে পরিবর্তিত হইল ; এই দুইটি হিলিয়ম পরমাণুর ভর ৮.০০৭৮। হিসাবের তো গরমিল হইল। '০১৮৩ ভর গেল কোথায় ? কিন্তু আইনস্টাইন তো পূর্ব হইতে ইহার জবাবদিহি করিয়াছেন, পদার্থের বিলোপে শক্তির উৎপত্তি। এই '০১৮৩ ভরের বিলোপে কত পরিমাণ শক্তি উদ্ভূত হইবে ? আইনস্টাইনের হিসাবে দাঁড়াইল ১৬৪০০০০০০০০০০০০০০০০০ মাত্রা। হিলিয়ম পরমাণু দুইটি জন্মগ্রহণ করিয়াই দুই দিকে ছুটিল ; দেখা গেল তাহাদের মিলিত শক্তি ঠিক এই পরিমাণের। শেষ অবধি দেখা গেল যে পরমাণুর যখন পরিবর্তন ঘটে তখন মাত্র একটি নিয়ম প্রয়োগ করিলেই হয়, ভর ও শক্তির যোগফল পূর্বে যাহা ছিল পরে ঠিক তাহাই থাকে।

ককক্রফ্‌ট ও ওআলটনের পরীক্ষায় প্রোটন ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল যে ভারি হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক ডয়টেরনের ভর প্রোটনের দ্বিগুণ তখন ডয়টেরনও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। নিউট্রন আবিষ্কৃত হইবার পর উহাও ছোড়া হইল। শেষ অবধি পরমাণু ধ্বংসের জন্য ছটরা হিসাবে চারিটি পদার্থ ব্যবহৃত হইল—আল্‌ফা-রশ্মি, প্রোটন, ডয়টেরন ও নিউট্রন। আল্‌ফা-রশ্মি আপনা হইতে প্রচণ্ড গতিযুক্ত হইয়া বাহির হয়, উহার জন্য কোন বন্দুকের প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রোটন, ডয়টেরনকে বেগযুক্ত করিবার যে যন্ত্র ব্যবহৃত হইল তাহা (১) ককক্রফ্‌ট ও ওআলটনের যন্ত্র, (২) ভ্যানডি গ্রাফের যন্ত্র এবং (৩) লরেন্সের উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রোন। সব কয়টি যন্ত্রের কার্য হইল প্রোটন, ডয়টেরনকে অধিক ভোল্ট বিভব যুক্ত করা। ভ্যানডিগ্রাফের যন্ত্রে বেশি বিভবের স্থির তাড়িৎ উৎপন্ন হয়। এই তিন প্রকার যন্ত্রের মধ্যে লরেন্সের সাইক্লোট্রোন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৯ সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার লরেন্সকে প্রদত্ত হয়। আর এই যন্ত্র বিজ্ঞানজগতে এক যুগান্তর আনিয়াছে।

একটি সাইক্লোট্রোনের ক্রিয়ায় মূল কথা এই। দুইটি অর্ধ বৃত্তাকার চেপ্‌টা বাক্স আছে ; একটি আর একটি হইতে পৃথক্‌ এবং দুইটার মধ্যে তড়িৎ বিভবের (potential) পার্থক্য কয়েক সহস্র ভোল্ট। বাক্স দুইটির মধ্যে কেন্দ্রস্থলে প্রোটন বা ডয়টেরন দেওয়া হইতে লাগিল। বাক্স দুইটি একটি প্রকাণ্ড তড়িৎচুম্বকের মধ্যে রাখা হইল ; ইহার চৌম্বক শক্তি অসাধারণ। লরেন্স প্রথম যে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করিলেন তাহার ওজন প্রায় ৮৫ টন, একখানা রেলগাড়ির এঞ্জিনের সমান ভারি। চৌম্বক শক্তির ফলে প্রোটন বা ডয়টেরন ঘুরিয়া গেল এবং একটা বাক্সের শেষে আসিয়া পৌঁছিল। ঠিক এই সময় বাক্সের তড়িৎ বিভব উল্টাইয়া গেল, প্রোটন বা ডয়টেরনের বেগ বাড়িয়া গেল। এইরূপ এক একবার বাক্স ত্যাগ করে এবং ধাপে ধাপে উহার প্রায় দশ সহস্র ভোল্টজনিত শক্তি বাড়িয়া যায় ; যে বৃত্তে ঘুরে তাহার ব্যাস ক্রমশ বাড়িয়া চলে, অবশেষে বাক্স ত্যাগ করিয়া যখন বাহির হয় তখন উহা প্রচণ্ড শক্তিধর হইয়া আসে। একটা সহজ উপমার কথা ভাবা যাক। এক গাছি সুতার এক দিকে একটা ঢিল বাঁধা আছে আর এক দিক ধরিয়া ঢিলটিকে ঘুরান হইতেছে। এক এক পাক ঘুরিবার পর ঢিলটিকে যদি এক একটি হেঁচকানি দেওয়া হয় তবে ঢিলের বেগ ক্রমশ ক্রমশ বাড়িয়া চলে। এখানেও অনেকটা সেই ব্যাপারই ঘটিতেছে। লরেন্সের প্রথম পরীক্ষায় সাইক্লোট্রোন হইতে ৫৫ লক্ষ ভোল্ট শক্তি লইয়া একটি প্রোটন বাহির হইল। এই শক্তি লইয়া উহা একটি পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং কেন্দ্রস্থ বস্তুকে চুরমার করিল। সাইক্লোট্রোনের মূল কথাটি খুবই সরল, কিন্তু যন্ত্রটি মোটেই সরল নয় এবং একটি সাইক্লোট্রোন নির্মাণ করিবার ব্যয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে কত রকম ভাবে যে পরমাণু ভাঙা হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ১১ আণবিক ওজনের বোরনের উপর একটি প্রোটন আসিল, তিনটি হিলিয়ম পরমাণু জন্মগ্রহণ করিল। ভারি হাইড্রোজেনকে ডয়টেরন আঘাত করিল ; ২ আর ২, ১ আর ৩-এ ভাগ

হইল; একটি প্রোটন হইল ও তিন আণবিক ওজনের হাইড্রোজেনের এক নূতন আইসোটোপ জন্মিল। দু-একটা উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল; শেষ অবধি দেখা যাইতেছে যে এমন কোন পরমাণু নাই যাহাকে ভাঙিয়া অন্য পরমাণুতে পরিণত করা যায় না; সোনা পাওয়া গিয়াছে, অবশ্য সোনা অপেক্ষা মূল্যবান প্ল্যাটিনম হইতে। কিন্তু এই সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিজ্ঞানের আর একটি নূতন দিক খুলিয়া গেল।

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল কথা জানা ছিল। মৌলিক পদার্থসমূহকে যদি আণবিক ওজন অনুসারে সাজান যায় তবে দেখা যায় শেষের কয়েকটি তেজস্ক্রিয়। একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আর একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিবর্তিত হইতেছে, আপনা হইতেই হইতেছে; ইলেকট্রন বা আল্‌ফা-রশ্মি বাহির হইবার ফলে এই পরিবর্তন। ইউরেনিয়ম এবং থোরিয়ম আদি মৌলিক পদার্থ, ইহাদের হইতে অপর মৌলিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপত্তি, পর পর পরিবর্তিত হইয়া সীসায় পৌঁছিলে তেজস্ক্রিয়তার পরিসমাপ্তি। পরিবর্তনের কাল ইউরেনিয়ম এবং থোরিয়ম খুব বেশী, অর্ধেকে দাঁড়াইতে প্রায় এক হাজার কোটি বৎসর লাগে। এত বেশী বলিয়াই পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এখনও পাওয়া যায়, কম হইলে সব একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইত। আর একটা কথা সুনিশ্চিত ভাবে জানা ছিল যে তেজস্ক্রিয়তার হার কোন রকম কোন প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না; এবং এইরূপই হইবার কথা, কারণ তেজস্ক্রিয়তা কেন্দ্রস্থ বস্তুর ধর্ম, আর কোন রকমের কোন ঘটনায় কেন্দ্রে এতটুকু আঁচড় লাগে না। কিন্তু এখন দেখা গেল, আঁচড় তো লাগান যায়।

১৯৩৪ সালে ইরীন কুরী জোলিও ও জোলিও পলোনিয়ম হইতে নির্গত আল্‌ফা-রশ্মি দিয়া পরমাণুকে আঘাত করিতেছিলেন। এই রশ্মির বিশেষত্ব এই যে উহাতে বিটা বা গামা রশ্মি মিশ্রিত নাই। এলুমিনিয়মে আঘাত করিবার পর দেখা গেল এলুমিনিয়ম হইতে পজিট্রন নির্গত হইতেছে; আরও দেখা গেল যে আল্‌ফা-রশ্মি বন্ধ করিবার পরও কিছু সময় পর্যন্ত পজিট্রন বাহির হইতে থাকে; এই পজিট্রন নির্গম ধীরে ধীরে কমিয়া আসে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মি যে ভাবে কমে। তবে কি এলুমিনিয়ম তেজস্ক্রিয় হইল। অনেকটা তাহাই। উহা পরিবর্তিত হইয়া একটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল।

প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রোটন ও ডয়টেরন যখন পাওয়া গেল তখন উহাদের সাহায্যে বহু কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপাদন হইতে লাগিল। কার্বনের উপর প্রোটন লাগিল; ১৩ আণবিক ওজনের নাইট্রোজেনের এক আইসোটোপ জন্মিল। উহা তেজস্ক্রিয় হইল, পজিট্রন বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। লিভিন্‌গুড সাইক্লোট্রোন হইতে আগত ডয়টেরন দ্বারা বিসমথকে আঘাত করিয়া রেডিয়ম E নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাইলেন। যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এতদিন প্রকৃতিতে পাওয়া যাইতেছিল, সাইক্লোট্রোন সাহায্যে তাহা এখন পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হইল। সাইক্লোট্রোন হইতে নির্গত ২০ লক্ষ ভোল্টের ডয়টেরন সোডিয়মের উপর পড়ায় এক বিস্ময়কর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হইল। ২৩ আণবিক ওজন সোডিয়মের উপর ২ আণবিক ওজনের ডয়টেরন পড়িল; ২৪ আণবিক ওজনের সোডিয়ম হইল এবং প্রোটন বাহির হইল; এই ২৪ আণবিক ওজনের সোডিয়ম হইতে ধীরে ধীরে ইলেকট্রন এবং গামা-রশ্মি বাহির হইতে লাগিল; অকৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে বিটা-রশ্মি ও গামা-রশ্মি যেমন নির্গত হয়। এইরূপ সোডিয়মের নাম দেওয়া হইল রেডিও-সোডিয়ম। দেখা গেল এই রেডিও-সোডিয়ম হইতে ইলেকট্রন নির্গমের হার বাড়াইয়া দেওয়া যায়, সাইক্লোট্রোনে তড়িৎ-বিভব বাড়াইতে পারিলেই হইল। এক গ্রাম রেডিয়ম হইতে সেকেণ্ডে ৩৭০ লক্ষ ইলেকট্রন বাহির হয়; লরেন্স লবণকে তেজস্ক্রিয় করিয়া উহা হইতে সেকেণ্ডে আরও বেশী সংখ্যক ইলেকট্রন পাইতে লাগিলেন। অবশ্য সোডিয়মের পরিমাণ এক গ্রাম ছিল না, আরও বেশী। আর একটা পার্থক্য রহিল এই যে যেখানে রেডিয়মের তেজস্ক্রিয়তা প্রায় ২০০০ বৎসরে অর্ধেক হইয়া যাইবে, কৃত্রিম সোডিয়মের তেজস্ক্রিয়তা ১৫ ঘণ্টায় অর্ধেক হইবে। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা শীঘ্র

শেষ হওয়ায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক স্থলে ইহাকে অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলিল। ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে রেডিয়ম মহৌষধ; তবে দেহের অভ্যন্তরে ক্যান্সার হইলে রেডিয়ম প্রয়োগ করা চলে না। সেখানে রেডিয়ম দেওয়া চলে না বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট তেজের রেডিও-সোডিয়ম দেওয়া চলে। কিছু সময়ের জন্য উহা রশ্মি বিকিরণ করিয়া স্বতঃই নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে; যখন নিষ্ক্রিয় হইবে তখন উহা ম্যাগনিসিয়মে পরিণত হইবে, আর ম্যাগনেসিয়ম শরীরের পক্ষে আদৌ অনিষ্টকর নয়। দেহের মধ্যে যদি রেডিয়ম দেওয়া যাইত তবে রোগ সারিত, কিন্তু রোগ সারিবার পরও রেডিয়ম রশ্মিবিকিরণ করিতে ছাড়িত না, রোগ শেষের সঙ্গে সঙ্গে রোগীও শেষ হইত। শুধু রেডিও-সোডিয়ম নয়, রেডিও-ফস্‌ফরস্‌ও চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতেছে এবং একটি সাইক্লোট্রোন পুরাপুরি কাজ করিয়া যাইলে প্রচুর পরিমাণে এই সব দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু এই সব কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে একটা অসুবিধার কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। আমেরিকা হইতে যদি ইহা শিশি ভরিয়া আসে তবে পথে জাহাজের মধ্যে উহার শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবে। চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতে হইলে উহাকে সদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু প্রস্তুত করিবার জন্য এদেশে সাইক্লোট্রোন কই? ১৯৩৯ সালের শেষ অবধি হিসাবে দেখা যায় যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৩০টির উপর সাইক্লোট্রোন হয় কাজ করিতেছে না-হয় প্রস্তুত হইতেছে, একটিতে চুম্বকের ওজন হইবে ২২০ টন। কোপেনহেগেন, কেমব্রিজ ও লিভারপুলে এক একটি কাজ করিতেছে, প্যারিস, জুরিক, স্টকহলম, লেনিনগ্রাড ও কারকৌতে এক একটি নির্মিত হইতেছে; জার্মানিতে দুইটি পরিকল্পিত হইয়াছে: জাপানে একটি কাজ করিতেছে আর একটি গঠিত হইতেছে। ভারত তবু কৈ?

সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থকে অস্থায়ীভাবে তেজস্ক্রিয় করা সম্ভব হইয়াছে। একই পরমাণু নিষ্ক্রিয় বা তেজস্ক্রিয় অবস্থায় একই রসায়ন ধর্মাবলম্বী। কিন্তু সমুদ্রতীরে বালিরাশির মধ্যে এক কণা বালিকে যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, দেহমধ্যে একটি নিষ্ক্রিয় পরমাণুও সেইরূপ, ইহা আপনাকে হারাইয়া ফেলে। কিন্তু উহা যখন তেজস্ক্রিয় হয় তখন উহার উপর যেন ছাপ পড়িয়া যায়, উহা নিজের গতিপথ জানান দিয়া চলে। রেডিও-সোডিয়ম যুক্ত লবণ যদি খাওয়া যায় তবে দশ মিনিটের মধ্যে উহা আঙুলের ডগায় আসিয়া পৌঁছিবে, গাইগারের কক্ষে উহা ধরা পড়িবে। দেহমধ্যে রেডিও-ফস্‌ফরসের গতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে দেহের হাড়ের মধ্যে ধাতব পদার্থগুলি স্থির হইয়া নাই, যাওয়া আসা করিতেছে।

আল্‌ফা-রশ্মি, প্রোটন, ডয়টেরন ও নিউট্রন সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্র-ভাঙা প্রক্রিয়াটি আলোচনা করা যাক। সাধারণত দেখা যায় যে এইরূপ আঘাতের ফলে যে পরমাণু জন্মগ্রহণ করে তাহার আণবিক ওজন ও আণবিক সংখ্যা আঘাতপ্রাপ্ত পরমাণুর ওজন ও সংখ্যা হইতে সামান্য পৃথক। এইরূপ কল্পনা করা হয় যে কেন্দ্রকের বাহিরের গাত্রে অবস্থিত কোন ক্ষুদ্র কণিকা কতকটা শক্তিলাভ করিয়া ছুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু একটি জলবিন্দুর কথা ধরা যাক। বাহিরের শক্তি পাইয়া ঐ জলবিন্দুর গাত্রের একটি অণু ছুটিয়া বাহির হইতে পারে আবার এমনও তো হয় যে জলবিন্দুটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হইল। কেন্দ্রক যখন আঘাত পায় তখন প্রথমটির অনুরূপ ক্রিয়া কল্পনা করা হইত। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে দ্বিতীয় ব্যাপারটিও ঘটিতে পারে, কেন্দ্রকটিকে দুইভাগ হইতে দেখা যায়। ইহা প্রধানত ঘটে যখন ইউরেনিয়মের কেন্দ্রকের ন্যায় ভারি অথচ কম মজবুত বস্তুকে নিউট্রন আঘাত করে। ইহার পূর্বে নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়মের যে পরিবর্তন ঘটে তৎসম্বন্ধে ফার্মি ও তাহার সহকর্মিগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ২৩৮ আণবিক ওজন ইউরেনিয়মের উপর নিউট্রন আসিয়া পড়িল, ২৩৯ আণবিক ওজনের ইউরে-নিয়ম আইসোটোপ জন্মিল। উভয়ের আণবিক সংখ্যা ৯২। কিন্তু ইউরেনিয়মের এই আইসোটোপ হইতে ইলেকট্রন ক্ষরণ হইতে লাগিল, ফলে আণবিক ওজন ২৩৯ থাকিলেও উহার আণবিক সংখ্যা ১ বাড়িয়া ৯৩তে দাঁড়াইল।

আণবিক সংখ্যা ৯৩এর অর্থ এই যে ৯২টি মৌলিক পদার্থের উপর জগতে আর একটি নূতন মৌলিক পদার্থ সৃষ্ট হইল। কিন্তু ১৯৩৮ সালে হান ও স্ট্রাসমান দেখাইলেন যে এই সংঘাতের ফলে যে বস্তু মিলে তাহাকে কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বেরিয়ম হইতে পৃথক করা যায় না। অতএব ৯২ আণবিক সংখ্যক ইউরেনিয়ম ভাঙিয়া ৫৬ আণবিক সংখ্যক বেরিয়ম মিলিল; অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহার আণবিক সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৬, ক্রিপ্টন, এবং উহা ভাঙিয়া প্রথম রুবিডিয়ম পরে স্ট্রনসিয়মে পরিণত হইল। এইরূপ ভাবে দু-টুকরা হইয়া ভাঙার অন্য নির্দশনও পাওয়া যাইতেছে।

সাইক্লোট্রোনের ক্ষমতা কি অপরিসীম তাহা একটি ব্যাপার চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে। সাধারণ রাসায়নিক মিলন যখন ঘটে তখন গোটা পরমাণুর সহিত আর একটা আস্ত পরমাণুর মিলন হয়; কিন্তু সাইক্লোট্রোন সাহায্যে যে-সব প্রক্রিয়া হয় তাহাতে পরমাণুর কেন্দ্রকটি ভাঙে। কিরূপ ধরণের শক্তি হইলে কেন্দ্রক ভাঙিতে পারে উত্তাপের দিক দিয়া বিচার করা যাক। অন্য হিসাবে জানা গিয়াছে যে একটি নক্ষত্রের আভ্যন্তরিক উষ্ণতা কয়েক লক্ষ ডিগ্রী। সেখানে সেই উষ্ণতায়ও যখন পরমাণুগণের কেন্দ্রস্থ বস্তু অটুট থাকে তখন বুঝিতে হইবে যে পরমাণু ভাঙা ব্যাপারে সাইক্লোট্রোন কয়েক লক্ষ ডিগ্রীর উষ্ণতা অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী।

কিন্তু সাইক্লোট্রোন কি কখন পদার্থকে বিধ্বস্ত করিয়া পৃথিবীকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবে? দেখা গিয়াছে ইহা হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রককে মিলাইতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় ভরের যে হ্রাস হয় তজ্জনিত অসাধারণ শক্তির আবির্ভাব হয়। একটা ঘটনার কথা চিন্তা করা যাক। লিথিয়মকে হাইড্রোজেন আঘাত করিলে হিলিয়মের জন্ম হয়। যদি এক গ্রাম লিথিয়মকে উপযুক্ত পরিমাণ হাইড্রোজেনের সহিত মিলাইয়া হিলিয়মে পরিণত করা যায় তবে পদার্থের হ্রাসের জন্য যে শক্তির উদ্ভব হইবে হিসাবে দেখা যায় তাহা দশ টন কয়লার দহনজনিত শক্তির সমান। এইরূপ মিলন ঘটাইলে তো প্রচুর শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখনও ব্যাপারটা সেরূপ সহজ হইয়া দাঁড়ায় নাই। আমাদিগকে এলোপাতাড়ি অনেক ছটরা ছাড়িতে হইবে, তজ্জন্য প্রভূত শক্তির খরচ আছে, এই ছটরার দু-একটা মাত্র কেন্দ্রককে আঘাত করিবে, বাকি শক্তির সমূহ লোকসান। এ পর্যন্ত দেখা যায় যে এই সব প্রক্রিয়ায় খরচ বেশী, জমা কম; কখনো খরচকে ছাড়াইয়া জমার অঙ্ক ভারি হইবে কি না বিজ্ঞানের পক্ষে সে ভবিষ্যদ্বাণী করা এখনো সম্ভব নয়। সুদূর ভবিষ্যতে সেদিন যদি আসে তবে তখনই সত্যকার পরশমণি মিলিবে। মানব কিন্তু সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে তখন নয়, তাহারো অনেক পরে; যে দিন সে আয়াসলব্ধ পরশমণিকে হাতে পাইয়াও নদী-নীরে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে পারিবে—

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানো না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে।"

সেদিন পৃথিবী, আজ যেমন ঘুরিতেছে, সেই রূপই ঘুরিবে,

সেদিনও

'নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
যাবে অস্তাচলে'

তবে সেদিন ধরাধামে মানব-ইতিহাসের শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইবে। তাহার পর আরম্ভ হইবে দেবতার ইতিহাস।

ডাইনী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে-ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্ত্তমান—ছাতি-ফাটার মাঠ! জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়; সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নাম-গৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; তখন অপর প্রান্তের গ্রামচিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্যনির্ব্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ! ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটায় এখানে-ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোন বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না; কোথাও জল নাই,—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।

মাঠখানির চারি দিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে, কোন্ অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশ-লোকে সঞ্চরমান পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা পাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।

সে-নাগ আর নাই, কিন্তু বিষ-জর্জ্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ! তাহারই ভাগ্যদোষে ঐ বিষজর্জ্জরতার উপরে আর এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্ব্বপ্রান্তে 'দলদলির জলা' অর্থাৎ অত্যন্ত অগভীর পঙ্কিল ঝরণা-জাতীয় জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আম-বাগান আছে সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী, নিষ্ঠুর, ক্রূর এক বৃদ্ধা ডাইনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে—তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে; তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে-দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে-ছাওয়া বারান্দা—সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষ-হীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করে, গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটা বাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে; সেরখানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না—বাড়ী ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্দ্ধেক বিক্রী করিয়া দোকান হইতে একটু নূন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন

তেল কিনিয়া আনে। বাড়ী ফিরিয়া আর এক বার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই-চারিটা শুকনো ডাল-পাতার সন্ধানে। ইহার পর সমস্তটা দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ী এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ী সে-কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে এ-কথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন-চারিখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটা মাঠের নির্জ্জন-রূপে মুগ্ধ হইয়া এখানে নামিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে। নির্জ্জনতাই উহারা ভালবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়া উঠে! ঐ সর্ব্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মত লকলকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠে! না হইলে সেও তো মানুষ!

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে। বহুকালের পুরানো একখানি আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজেরই ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মত একটা ঝকমকে ধার! জরা-কুঞ্চিত মুখ, শণের মত সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতি-বিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানার চারি দিকের কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রঙ, আর কি পালিশই না ছিল! আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ-চক্‌চকে পুকুরের জলের মত! কাচ-খানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত! ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নীচেই টিকোলো নাক—চোখ দুটি ছোটই ছিল—চোখের তারা দুটিও খয়রা রঙেরই ছিল—লোকেও সে-চোখ দেখিয়া ভয় করিত, কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিত; ছোট চোখ দুটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত আকাশের কোল পর্য্যন্ত এ-চোখ দিয়া দেখা যায়! অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরুণ-দিয়া-চেরা ছুরির মত চোখের বিড়ালীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না! কোথায় দিয়া কি যে হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না; তবে হইয়া যায়!

প্রথম দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়:—

বুড়াশিবতলার সম্মুখেই দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটে ভাঙা রাণার উপর সে দাঁড়াইয়াছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহারই মত দশ-এগার বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতে-ছিল। হঠাৎ বামুনবাড়ীর হারু চৌধুরী আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া সান-বাঁধান সিঁড়ির উপর তাহাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পাইতেছে—হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে!

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া-ছিল—ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

—আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল—তবে সে-কথা বললি নে কেন হারামজাদী?

হ্যাঁ, লোভ তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল!

—হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট-বেদনায় ছট্‌ফট করছে!

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়! কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই! তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—সে হারু সরকারের বাড়ী গিয়া অঝোর ঝরে

কাঁদিয়াছিল, আর বার-বার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভাল ক'রে দাও, ওকে ভাল ক'রে দাও! কত বার সে মনে মনে করিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি; এই লইলাম! আশ্চর্য্যের কথা—কিছুক্ষণ পরেই বার-দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল—ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার-গিন্নী একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল—ছাই দেব হারামজাদীর মুখে; মা-বাপ-মরা অনাথা মেয়ে ব'লে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিন আমি ওকে খেতে দি। আর ও কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়! আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দিষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল—কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপিলেকে খেতে দিই নে। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি—আর ও কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি দিষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল। সেদিন সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ীর দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়াশিবতলায়। অঝোর-ঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টি ভাল ক'রে দাও, না হয় আমাকে কানা ক'রে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ বৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে ক্ষীণ একটি চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্ব্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কি, আর সাধ্যই বা কি? বেশ মনে আছে—গৃহস্থের বাড়ীতে সে আর ঢুকিবে না, কিছুতেই ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির-দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না—কোনও-মতে বহুকষ্টে বলিত—দুটি ভিক্ষে পাই মা! হরিবোল!

—কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে। খবরদার!

—না মা! ঘরে ঢুকব না মা!

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিয়াছিল, এখনও উঠে! কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ উঠিতেছে! বেশ খুব বড় পাকা মাছের খানা বোধ হয়!

—এই এই! হারামজাদী, বেহায়া—উঁকি মারছে দেখ—সাপের মত!

—ছি ছি ছি! সত্যই ত সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালের সমস্ত আয়োজন তাহার নরুণ-চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে! মুখের ভিতরে জিভের তলা হইতে ঝরণার মত জল উঠিতেছে!

বহুকালের গড়া জীর্ণবিবর্ণ মাটির মূর্ত্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাটধরা শিথিলগ্রন্থি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল; অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এ-বার নড়িয়াচড়িয়া বসিল—বাঁ-হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়া-মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয় সে-কথা সারাটা জীবন ভরিয়াও যে বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়!

কিন্তু সে তার কি করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে—সে তার কি করিবে, কি করিতে পারে? প্রহৃত পশু যেমন মরিয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ আঁ গর্জ্জন করিয়া উঠে ঠিক তেমনি একটা ই ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মত চুলগুলাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুণ-চেরা চোখের চিলের মত দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস—বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মত কি একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে! একটা ফুৎকার যদি সে দেয় তবে মাঠের ধূলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে!

ঐ ধোঁয়ার মধ্যে জমাট সাদার মত ওটা কি? নড়িতেছে যেন! মানুষ? হ্যাঁ মানুষই ত! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া, দিবে মানুষটাকে জড়াইয়া? হি হি হি করিয়া পাগলের মত হাসিয়া একটা অবাধ্য নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না-না-না। ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধূলার গরমে শ্বাসরোধী ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

না:—ওদিকে আর সে চাহিবেই না। তার চেয়ে বরং উঠানটায় আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই ভাঙিয়া-পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে সুরু করিল।

* * *

জড়ো-করা পাতাগুলা ফর ফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল; ঝাঁটার মুখে টানিয়া-আনা ধূলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়ীকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল, মুখে চোখে ধূলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্ত্তিত পাতাগুলা সর্ব্বাঙ্গে যেন তাহাকে প্রহার করিতেছে। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জ্জারীর মত ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটা গাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো।

বার-বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্ত্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। আবর্ত্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধূলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধূলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কি একটা? এখানে ওখানে ছোট বড় ঘূরণ পাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন নাচিতেছে! একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মত অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে শ্লাস্ত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাশুদ্ধ হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তাহার আর ছিল না। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা হইতে বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে!

—কে রইছ গো ঘরে? ওগো!

জলে-পচা নরম মরা-ডালের মত বৃদ্ধা বাঁকিয়া চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়াছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল—কে?

ধূলিধূসর দেহ, শুষ্কপাণ্ডুরমুখ একটি যুবতী মেয়ে, বুকের ভিতর কোন একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধ হয় ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল—একটুকুন জল!

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার কোনমতে উঠিয়া বসিল—মেয়েটির শুষ্ক-পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আহা-হা বাছারে! আয়, আয়! বোস!

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল—একটুকুন জল দাও গো! মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুকরা পাটালীর সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল—আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্কুসী মাঠে কি ব'লে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল—আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তুক এসে পড়লাম একবারে মধ্যিখানে!

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল—মেয়েটির পাশে একটি শিশু! গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত শিশুটি ঘর্ম্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে।

বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল—দে দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে! মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির দিকে চাহিয়া রহিল। স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মত নরম, সরস; দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে!

এঃ, ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে! তবে কি…? কিন্তু সে তাহার কি করিবে? কেন তাহার সম্মুখে আসিল? কেন আসিল? ঐ কোমল নধরদেহ শিশুময়দার মত ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া—; জীর্ণ জ্বর জ্বর ত্বকের একটা রোমাঞ্চিত স্পর্শ শিহরণ জাগাইয়া বহিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! এঃ, 'ঘামে ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ! যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্ত্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল—খেয়ে ফেললাম! ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে! পালা পালা—তু ছেলে নিয়ে পালা বলছি!

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢক ঢক করিয়া জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এটা তবে রামনগর? তুমি সেই—; সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া পক্ষিনীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কি করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের শীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন্ মুখে? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না—সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে-কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কি করিয়া? ছেলেমেয়েরা এমনিই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও উঠে; আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধ হয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে! ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে ত অনেকটা ডাগর হইয়াছে! তাহারই বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্ব্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়াছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি!

ঠিক এমনি ভাবেই—ঠিক এই আজিকার মতনই সে-দিনও তাহার মনে হইয়াছিল ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া, নরম ময়দার তালের মত ঠাসিয়া ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল—বলি ওলো—ও আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে ডাবী-সাবীর সঙ্গে মস্করা জুড়েছিস! আমার ছেলের যদি কিছু হয় তবে তোকে বুঝব আমি—হ্যাঁ!

তার পর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল—বেরো বলছি বেরো! হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি!

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্ব্বল শরীরে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। মর্ম্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। বার-বার সে মনে মনে বলিয়াছিল—ছি ছি! তাই নাকি সে পারে? হইলই বা সে ডাইনী—কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল—তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ-

বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে! দিয়া প্রমাণ করিয়া দিও সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালবাসি।

কিন্তু অপরাহ্ণ বেলা হইতে-না-হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টিক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুর ভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমন ভাবে কাতরাইতেছে যে, ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

ভয়ে লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের প্রান্তে শ্মশানের জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। বার-বার সে মুখের থুথু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল—কোথায় রক্ত! গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রথম বার-দুয়েক বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা, শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেইদিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার নিষ্ঠুর অপার শক্তির কথা।

গভীর রাত্রে—সেদিন বোধ হয় চতুর্দ্দশীই ছিল, হ্যাঁ চতুর্দ্দশীই তো—বাকুলের তারাদেবী তলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা, তারাদেবী; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দ্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কত বার সে মানৎ করিয়াছে—মা আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন যেন দুঃখে হতাশায় উদাস হইয়া যায়। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন নিরুদ্দেশ লোকে হারাইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারায় অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠে—সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। ছাতি-ফাটার মাঠ ধূলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ; ধূসর ধূলার গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, হারাইয়া গিয়াছে!

* * *

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ-গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে-ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে-ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার? ঐ সর্ব্বনাশী! মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে—কেন গেলাম গো—আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম গো! আমি কি করলাম গো!

লোকে শিহরিয়া উঠিয়াছে, তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছে। এক বার কয়েক জন জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঐ ঝরণাটার কাছে আসিয়া জুটিয়াছিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল—সে তাহার কি করিবে? সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরস লাবণ্যকোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মত তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই চীৎকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধা অজগরীর মত ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্গার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চীৎকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিতে ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে, বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া, পৃথিবী ফাটাইয়া হা-হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। সে আজ একটা গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য শোষণে পান করিয়াছে।

ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাসের মত পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখী অশ্রান্ত ভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গে-ল! চোখ গে-ল! আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনে ঝরণার ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জনে কথা কহিতেছে! আবার সেই ছেলেগুলা তাহার কোন

অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাউড়ীদের সেই স্বামীপরিত্যক্তা উচ্ছৃঙ্খলা মেয়েটা—আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউড়ী ছেলেটা!

মেয়েটা বলিতেছে—না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব।

ছেলেটা বলিল—হেঁ! এখানে আসছে নোকে; দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

—তা হোক! তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেনে থাকব আমি?

ছি ছি ছি! কি লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে! যদিই তাই গোপনে দুই জনে দেখা করিতে আসিয়াছে—তবে মরিতে ওখানে কেন? তাহার এই বাড়ীতে আসিল না কেন? তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা! কি? কি বলিতেছে ছেলেটা?—বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল তোতে আমাতে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বিয়ে ক'রে সংসার পাতব! তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দের! ঐ কুপোর মত মেয়েটাকে উহার এত ভাল লাগিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চৌদ্দ-পনর বছরের একটি মেয়ের ছবি! একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট; চোখ দুটি ছোট—তারা দুটি খয়রা রঙের—কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বই কি! আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। আয়না ত তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোনদিন দেখে নাই। আরে তুই আবার কে রে? কোথা থেকে এলি? লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছিল। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই চতুর্দ্দশীর রাত্রেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢংটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে, তোমার কি?

—আমার কি? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস—কিল? ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটার দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কাল পাথরের মত শক্ত নিটোল শরীর! জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোনও উত্তর না দিয়া তীব্র তির্য্যক ভঙ্গিতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বদিকে চুনে-হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মত নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল; বোলপুরের একেবারে শেষে রেল-লাইনের ধারে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়াছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই; ঘোলাটে আবছা আলোয় চারি দিক ঝাপসা দেখাইতেছিল। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে চমকিয়া উঠিয়াছিল; সেই লোকটা! সে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোল খাইয়াছিল; হাসিলে তাহার গালে টোল খাইত। সে বলিয়াছিল—কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলি যে?

সে বলিয়াছিল—এই দেখ, তুমি যাও বলছি—লইলে আমি চেঁচাব।

—চেঁচাবি? দেখেছিস পুকুরের পাঁক—টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দোব ঐ পাঁকে!

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল—ধ্যে-ৎ।

সে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল-ধরা হাতের মুঠিটা খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

লোকটার হি হি করিয়া সে কি হাসি! সে এবার কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল—দূ রো ফ্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার! ভাগ! তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল—তুমি মারবা না কি?

—না না, মারব কেনে? তোকে শুধালাম কোথা বাড়ী তোর, তু একবারে খ্যাঁক করে উঠলি! তাথেই বলি—বলিয়া আবার সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

—আমার বাড়ী অ্যানেক দূর, হুই পাথরঘাটা!

—কি নাম বটে তোর? কি জাত?

—নাম বটে আমার 'সোরধনি'—লোকে ডাকে—'সরা' বলে। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশি হইয়া বলিয়াছিল—আমরাও তো ডোম! তা ঘর থেকে পালিয়ে এলি কেনে?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়াছিল; সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল—কি বলিবে?

—রাগ ক'রে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

—না।

—তবে?

—আমার মা-বাবা কেউ নাইকো কিনা? কে খেতে পরতে দেবে? তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাকে।

—বিয়ে করিস না কেনে? বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে—তাহার মত ডাইনীকে, কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তার পর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধূলা-কাঁকর জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে; মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হঠাৎ সুতা হইতে সূচটা যেন পড়িয়া গেল।

আঃ কি মশা! মৌমাছির চাক ভাঙিলে যেমন মাছিগুলা মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই করিয়া সর্বাঙ্গে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্ত্তা ত আর শোনা যায় না! চলিয়া গিয়াছে! সন্তর্পণে ঘরের দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। কাল আবার উহারা নিশ্চয় আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মত আর এমন নিরিবিলি জায়গা কোথায়? এ চাকলার কেউ আসিতে সাহস করিবে না! তবে উহারা ঠিক আসিবে। ভালবাসার কাছে কি ভয় আছে!

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল; আচ্ছা ঐ ছোঁড়াটাকে সে খাইয়া ফেলিবে? শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর!

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল—না না!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আপন মনে দুলিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া উঠানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে সুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে! আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো ঘুমাইবার তাহার উপায় নাই! ইচ্ছা হয় এই ছাতিফাটার মাঠটা পার হইয়া ও-ই গ্রামগুলা পার হইয়া, নদী বন পার হইয়া অনেকদূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে—জানিলে কিন্তু ভাল হইত! গাছের উপর বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু-হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলা শোনা হইত না! উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।

* * *

হি হি হি! ঠিক আসিয়াছে! ছোঁড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে আসিবে রে, সে আসিবে!

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় সে ঠিক সেই পুকুরের বাঁধাঘাটে আসিয়াছিল। তাহার আগেই আসিয়া বসিয়াছিল, পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতেছিল। সে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

—এসেছিস? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি!

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই কথা—সেও তাহাকে এই কথাটিই বলিয়াছিল। ওঃ, ঐ ছোঁড়াটাও ঠিক সেই কথাটিই বলিতেছে! মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; নিশ্চয় সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সেদিন সে একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল। তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—কাল তোর মুড়ি পড়ে গিয়েছিল। নে।

সে লইতে হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বুকের দুর্দ্দান্ত লোভ—সাপের মত তাহার ডাইনী-মনটা বেদের বাঁশী শুনিয়া যেন কেবলই দুলিয়া নাচিয়াছিল, ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তার পর সে কি করিয়াছিল? হ্যাঁ মনে আছে! সে কি আর ইহারা জানে, না পারে? ও মাগো! ঠিক তাই; এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজে হাতে কি তুলিয়া দিতেছে। বুড়ী দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল। সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল—ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে বিয়ে করবি 'সরা'?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতেও পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল—হাত-পা ঘামিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল—এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজগার করি অ্যানেক। তা, জাতে পতিত ব'লে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?

ঝরণার ধারে প্রণয়ী যুবকটি বলিল—ই গাঁয়ে সবাই হাঁ-হাঁ করবে। আমার জ্ঞাতগুষ্টিতেও করবে—তোর জ্ঞাতগুষ্টিতেও করবে। তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দুজনায় 'সাঙা' করে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথা, কিন্তু এই নিস্তব্ধ স্থানটির মধ্যে কথাগুলি যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—তাহারাও পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল। মাড়োয়ারীবাবুর কলের ধারেই একখানা ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল। 'বয়লা' না কি বলে—সেই প্রকাণ্ড পিপের মত কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরি ছিল সকলের চেয়ে বেশী।

ঝরণার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উ হবে না। আমাকে রূপোর চুড়ি গড়িয়ে না দিলে তোর কোন কথা আমি শুনি না। আর আমার খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে—তবে আমি যাব। লইলে বিদেশে পয়সা অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না!

ছি ছি! মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়! এত বড় একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে তাহার না কি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনদিন! মরণ তোমার! রূপার চুড়ি কি—এক দিন সোনার শাঁখা-বাঁধা তোর হাতে উঠিবে! ছি!

ছেলেটি কথার কোন জবাব দিল না, মেয়েটিই আবার বলিল—কি রা কারিস না যি? কি বলছিস বল্? আমি আর দাঁড়াতে লাড়ব কিন্তুক।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কি বলব বল্? টাকা থাকলে আমি তোকে দিতাম, রূপোর চুড়িও দিতাম—বলতে হ'ত না তোকে!

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল—তবে আমি চললাম।

—যা।

—আর যেন ডাকিস না!

—বেশ!

অল্প একটু দূর যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরণার ধারে বসিয়া রহিল। আহা! ছেলেটার যেমন কপাল—তাই ঐ হারামজাদীর মত মেয়েকে সে ভালবাসিয়াছে! শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটা যে কি করিবে—কে জানে! হয়ত বিবাগী হইয়াই চলিয়া

যাইবে—নয় ত গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে! বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ইহার চেয়ে তাহার সেই রূপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে ত তাহার এক কুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা—না হয় পাঁচটা সে দিতে পারে! তাহাতেই হইবে। মেয়েটা আর বোধ হয় আপত্তি করিবে না। আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়, সখের সময়—আহা! ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপোর চুড়ি ও টাকা সে দিবে, আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমা সম্বন্ধ পাতাইবে। গোটাকতক চোখা চোখা ঠাট্টা সে যা করিবে!

মাটিতে হাতের ভর দিয়া উঠিয়া কুঁজীর মত সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল—বলি ওহে ও লাগর—শুনছ!

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্ত্তে বৃদ্ধারও একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধা মার্জ্জারীর মত ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল—মর মর! তুই মর! সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।

* * *

পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্ব্বনাশী ডাইনী বাউড়ীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়াছিল ঐ ঝরণার ধারে; মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনীর মত জানিতে পারিয়া নিঃশব্দে পদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ছেলেটি ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে; অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কি রক্তপাত! তাহার পরই প্রবল জ্বর; আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে!

কিন্তু সে তাহার কি করিবে?

কেন সে পলাইতে গেল? পলাইয়া যাইবে? তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে? সেই তাহার মত শক্তিমান পুরুষ—যে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিত—শেষ পর্য্যন্ত তাহারই অবস্থা হইয়া গিয়াছিল মাংসশূন্য একখানি মাছের কাঁটার মত!

কে এক নাকি গুণীন আসিয়াছে—সে নাকি এই ছেলেটাকে ভাল করিয়া দিবে! তাহাকে দেখিয়াও শহরের ডাক্তারে বলিয়াছিল—ভাল করিয়া দিবে। তিলে তিলে শুকাইয়া ফ্যাডাসে হইয়া সে মরিয়াছিল! রোগ! ঘুসঘুসে জ্বর, কাসি! তবে রক্ত বমি করিয়াছিল কেন সে?

শুষ্ক দ্বিপ্রহরে উন্মত্ত অস্থিরতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধা আপনার উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়িতেছে নিস্পন্দ শবদেহের মত। সমস্ত মাঠটার মধ্যে আজ আর কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই। বাতাস পর্য্যন্ত স্থির হইয়া আছে!

যাহাকে সে প্রাণের চেয়ে ভালবাসিত, কোনদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশ—নিষ্ঠুর শোষণ হইতে ইহাকে বাঁচাইবে ঐ গুণীনটা!

হি হি করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে সে হাসিয়া উঠিল। উঃ কি ভীষণ হাঁপ তাহার ধরিতেছে! দম যেন বন্ধ হইয়া গেল! কি যন্ত্রণা! উঃ—যন্ত্রণায় বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। ঐ গুণীনটা বোধ হয় তাহাকে মন্ত্র-প্রহারে জর্জ্জর করিবার চেষ্টা করিতেছে! কর্—তোর যথাসাধ্য তুই কর্!

এখান হইতে কিন্তু পলাইতে হইবে! তাহার মৃত্যুর

পর বোলপুরের লোকে যখন তাহার গোপন কথাটা জানিতে পারিয়াছিল—তখন কি দুর্দ্দশাই না তাহার করিয়াছিল! সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল; কলের সেই হাড়ীদের শঙ্করীর সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার কাছেই সে এক দিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর হইতে সে গ্রামের বাহিরে এক ধারে লোকের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বাস করিতেছে। কত জায়গাই যে সে ফিরিল! আবার যে কোথায় যাইবে!

ও কি? অকস্মাৎ উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি উচ্চ কান্নার রোল চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মত ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সন্ধ্যার মুখে সে একটি ছোট পুঁটলী লইয়া ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল। পলাইবে—সে পলাইবে।

একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত নিথর স্তব্ধ। তাহারই মধ্যে পায়ে পায়ে ধূলা উড়াইয়া কুব্জা বৃদ্ধা পলাইয়া চলিয়াছিল। কতকটা দূর আসিয়া সে বসিল—চলিবার শক্তি যেন সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল—ওগো, তুমি ফিরে এস গো!

তাহার নরুণ-দিয়া-চেরা ছুরির মত চোখের সম্মুখে আকাশের বায়ুকোণটা তাহার চোখের তারার মতই খয়ের রঙের হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কিছু ধূলার আস্তরণের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। দুর্দ্দান্ত ঘূর্ণী ঝড়! সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি!

পরদিন সকালে ছাতি-ফাটার মাঠের অগ্নিকোণে আকাশস্পর্শী শিমুলগাছের উচ্চতম শাখাগুলি একটা শাখার শীর্ষের দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র শীর্ষে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখীর মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নীচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।

অতীতকালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। চারি দিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্য্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসরতার মধ্যে শূন্যলোকে কালো কালো কতকগুলি বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছিল শকুনির পাল।

মাটির প্রদীপ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাটির প্রদীপ
ক্ষীণ গৃহদীপ
একাকিনী জাগি' ঘরে
ছোট অঙ্গনে
ছোট আয়োজনে
মৃদু আলো দেয় ভরে।

আহ্বান আসে
শুভ অবকাশে,
স্মিত সচকিত ক্ষণে
জ্বলে সেই দীপ
দীপ্ত প্রদীপ
জীবনের আয়োজনে॥

সমাজ-বন্ধন

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্ব-মানুষের আবেষ্টন

প্রায় এক কোটি বৎসর পূর্ব্বে ভূমণ্ডলে জলভাগ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ও স্থলভাগ বৃদ্ধি পায়। বিশাল পর্ব্বতরাজি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে তখন মাথা তুলে। ভূমণ্ডলের উত্তাপ ও বায়ুতে জলীয় ভাগ ঈষৎ কমিয়া যাওয়ায় উদ্ভিদ্-জগতে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ অরণ্য বিরল হইতে থাকে এবং পৃথিবীতে সেই সময় প্রথম সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন ও গুল্মাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখা দেয়।

পৃথিবীর অনেক অংশে জঙ্গলের পশুপক্ষী তখন যেদিকে অরণ্যপথ মুক্ত ছিল সেইদিকে পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হিমালয়ের উত্তরে মধ্য-এশিয়ার সুবিস্তৃত পর্ব্বতরাজি ও উপত্যকা পলায়ন-পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলে অনেক পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেবল পাখী ও কীটপতঙ্গেরা এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

প্রকৃতি ও প্রগতি

এই বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে মনুষ্যজাতির জন্ম ও আদিম বিকাশের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অরণ্য বিনাশের ফলে বানর জাতিকে বৃক্ষের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মুক্ত প্রান্তরে নামিতে হয়। পূর্ব্বে বৃক্ষই যখন একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল তখন নানা জাতের বানরের মধ্যে সহযোগ দেখা দিয়াছিল। জাতকের একটি গল্পে আছে যে একদা এক দল বানর শিকারীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িলে বানররাজ—যিনি পরে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন, আপনার দেহ সেতুর মত বিস্তার করিয়া দিলেন, তাহার উপর দিয়া বানরদল পরস্পরের হাত ধরিয়া একটা শৃঙ্খল তৈয়ার করিয়া নদী পার হইয়া রক্ষা পাইল। মনুষ্যজাতির পূর্ব্বতন পুরুষের ধারাবাহী আদিম বানরেরা বৃক্ষে জীবনযাপন কালেই হাত ও কণ্ঠস্বর—শুধু ব্যক্তিগত উপকারের জন্য নহে দলের প্রয়োজনের জন্য নিয়োগ করিতে শিখিয়াছিল। এই সমাজবন্ধন ও সামাজিকতার অভিব্যক্তি অনুধাবন না করিলে মানুষের প্রগতির ধারা বুঝা যায় না। বানরদিগের মধ্যে আমরা হাতের সাহায্যে আত্মরক্ষা ও আক্রমণকল্পে পাথর ও গাছের ডাল ব্যবহারের পরিচয় পাই। সঙ্গীত-প্রিয় এক জাতি বানর আছে তাহারা একসঙ্গে সমস্বরে গান করে, অপর দিকে সিম্পাঞ্জীরা নানা প্রকার শব্দ ব্যবহার করে যাহাতে তাহাদিগের ভয়, উদ্বেগ, হর্ষ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। মানুষের সঙ্গে এই প্রকার সামাজিক অভিব্যক্তির তবুও বিশেষ প্রভেদ আছে।

মানুষ—যন্ত্রী ও ভাষা-ভাষী

প্রথমতঃ পূর্ব্ব-মানুষ বানরের মত শুধু যে পাথর বা লাঠি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল তাহা নহে; সে পাথর ও লাঠি তৈয়ার করিতেও শিখিয়াছিল। এই নির্ম্মাণকৌশল মানুষের অধিকতর মস্তিষ্ক-ব্যবহারের সাক্ষ্য দেয়। এক দিকে বানরের তুলনায় আদিম মানুষের মস্তিষ্ক আকারে বড় ও অধিকতর জটিল, অপর দিকে আদিম মানুষের মুক্ত হাত ও হাতের আঙুল তাহার মানসিক শক্তির বিকাশের কারণ হইয়াছে। এই সচল দেহ-যন্ত্রই মানুষকে যন্ত্রী করিয়াছে এবং পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে। নিম্নস্তরের জীব—যেমন কাক, কুকুর, ঘোড়া কিংবা বানর—শব্দ করিতে বা পদ ব্যবহার করিতে পারে সত্য, কিন্তু বাক্যযোজনা করিতে পারে না এবং বাক্যপ্রণয়নের দ্বারাও কোন বিচার বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে না। বড় বানরদিগের শব্দসমষ্টি কম নয়, কিন্তু একমাত্র মানুষই ভাষার অধিকারী। অন্য জীবের শব্দপ্রকাশ ও কথন আছে, কিন্তু মানুষই একমাত্র ভাষাবান্। ভাষার সঙ্গে

কথনের এই প্রভেদ যে, ভাষাতে কেবল ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় ও মনোভাবের নহে,—বিচারেরও প্রকাশ আছে। অবশ্য নিয়েণ্ডারথাল মানুষের যে ভাষা ছিল ইহা ঠিক বলা যায় না, যদিও সে পাথর ও আগুনের ব্যবহার জানিত।

পাথরই হোক, গাছের ডালই হোক, মুষলই হোক পূর্ব্ব-মানুষ তাহা ব্যবহার করিয়া অন্য জীব অপেক্ষা আত্ম-রক্ষা করিতে অধিক সমর্থ হইয়াছিল। তেমনই মানুষের ভাষা-ব্যবহারও আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা ও সমাজগ্রন্থি সুদৃঢ় করিতে পারিয়াছিল। ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কোমলবৃত্তি ও অনুভব বিকাশলাভ করে; মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবিধ সম্বন্ধে, পরিবারে, গোষ্ঠীতে ও বৃহত্তর সমাজজীবনে দৃঢ়তা আসে। গরিলা, সিম্পাঞ্জী এবং অন্য বানর-শ্রেণীর মধ্যে পারিবারিক জীবন আছে, গোষ্ঠী-জীবনও আছে, কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা তেমন নাই। পূর্ব্ব-মানুষ তাই প্রথম হইতেই শুধু যে যন্ত্র ও ভাষার ব্যবহারে জীবন-সংগ্রামে বিশেষ সমর্থ ও জয়ী হইতে পারিয়াছিল তাহা নহে,—সে সমাজগ্রন্থিও বিচিত্র ও দৃঢ়ভাবে বুনিতে পারিয়াছিল, নানা অনুরাগের রঙে তাহাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল।

নিম্নতর জীবের সামাজিকতা

জীব-জগতের যে ধারা হইতে পূর্ব্ব-মানুষের উদ্ভব, সেখানে আমরা কত প্রকার সামাজিকতার পরিচয় পাই। সিংহ ও বাঘ একা বনে বিচরণ করে সত্য, কিন্তু বেশীর ভাগ জীবই সামাজিক। বড় বানরশ্রেণীর মধ্যে আমরা দেখি যে পারিবারিক জীবনে তাহারা আপন-পরের প্রভেদ বেশ বোঝে। সেখানে শ্রেণী-বিভাগ আছে, উচ্চ-নীচ আছে, প্রভুত্ব ও দাসত্ব আছে। তাহাদিগের বড় দলে বহু স্ত্রী ও কিশোর বানরের অনুবর্ত্তিতা আছে। তাহাদিগের মধ্যে এক জনের উদ্বেগ, ভয়, উল্লাস, রাগ ও অভিমান এমনভাবে শব্দিত হয় যে, বন হইতে বনান্তরে সমগ্র বানর-সমাজে তাহা অনুভূত ও ব্যাপ্ত হইতে পারে।

তবুও যে-ভাষা মানুষ সৃজন করিয়া আপনার সঙ্গে অপরকে নিবিড় হৃদ্যতায় বাঁধিয়াছে, সদ্বুদ্ধি ও সহানুভূতি অনুরাগ ও পরিণামদর্শিতা থাকিলেও সে-ভাষা ও কথন-পটুতা গরিলা ও সিম্পাঞ্জীর নাই। মানুষ ভাষার সাহায্যে শুধু যে পরস্পরকে বাঁধিয়াছে তাহা নয়, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকেও একসূত্রে গাঁথিয়াছে। মানুষের অতীতের অভিজ্ঞতা বর্ত্তমানে কত প্রয়োজনে লাগে। মধুমক্ষিকার চাক, পিপীলিকা ও উইপোকার ঢিবি আছে; আমেরিকার বীবর ও মরু-কুকুরের "শহর" আছে সত্য; সেখানে তাহারা বংশপরম্পরায় বাস করে। পূর্ব্বপুরুষের শ্রম ও মিতব্যয়িতার অধিকারী তাহারাও। কিন্তু মানুষের বাসস্থান অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, লোকবহুল ও স্থায়ী। মানুষের বসবাস এক যুগের পরিশ্রম ও মূলধন, অভিজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে উত্তর যুগের পুরুষের উত্তরাধিকারী করে।

আদিম মানুষ শুধু যে যন্ত্রী হইয়া অন্য জীব বা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা নহে। তাহার পক্ষে বেশী সহায়ক হইয়াছিল বরং তাহার সমাজ-জীবন, যাহার ফলে সে তাহার দৈহিক বল ও ভাষা, যন্ত্র, তন্ত্র ও মন্ত্রের অধিকার এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে দান করিতে পারিয়াছিল। সামাজিকতা এবং মানুষের যন্ত্র-তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন প্রকার অসামাজিক বৃত্তি,—যেমন স্বেচ্ছা-চারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি—সামাজিকতার মাপকাঠিতে ক্রমশঃ দণ্ডিত ও পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। ইহার ফলে মানুষের সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তিতে একটা সমতা ও ধারাবাহিকতা আসিল যাহা অন্য কোন জীব-সমাজে দেখা যায় নাই।

আদিম পুরুষের দুর্ব্বলতা ও সহকারিতা

কিন্তু মানুষ তাহার আদিম জীবন হইতে তাহার দুর্ব্বল দেহ ও সজাগ মন লইয়া যে সহযোগ ও সমষ্টি-বোধের দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহা প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল যখন কোন বানরজাতি অরণ্য-ধ্বংসের ফলে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে আসিয়া তাহার নূতন জীবন ধারণের উপায় খুঁজিতে থাকে। এই প্রান্তরে বহু প্রকার স্তন্যপায়ী ও মাংসাশী জীবের সহিত পূর্ব্ব-মানুষের পরিচয়

হইয়াছিল। নূতন আবেষ্টনে তৃণভোজী স্তন্যপায়ী জীবের দাঁত, ক্ষুর ও হাড় এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে তাহারা সংগ্রাম অপেক্ষা পলায়নে দক্ষ হয়। অন্য দিকে তাহাদিগের মধ্যে দল গঠন করিবার প্রবৃত্তি ও আয়োজন বিচিত্রভাবে দেখা গিয়াছিল। গরু, মহিষ, ঘোড়া, হরিণ প্রভৃতি দলবদ্ধ হইয়া বড় মাংস-ভোজী জীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ তৃণভোজী জীবগণের মধ্যে শুধু যূথ-শক্তি নয় কিছু শ্রমবিভাগও দেখা গেল। পালের কেহ কেহ রক্ষা বা আক্রমণ-কাজে, কেহ বা আহার সন্ধান বা প্রহরীর কাজে নিযুক্ত হইল, ইহাতে সমগ্র পালের বিশেষতঃ শিশু ও মাতাদিগের কল্যাণ হইল। অনেক পশুদলে শ্রেণীবিভাগ বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, বিশেষতঃ যখন তাহারা অজ্ঞাত বা বিপদসঙ্কুল তৃণভূমিতে বিচরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব ও বশ্যতা এবং সমূহভাব বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। অনেক তৃণভোজী জীব এমনই করিয়া প্রান্তরের বিভিন্ন বিভাগের উপর অধিকারও স্থাপন করে।

এই সব ধারাই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব-মানুষ অথবা আদিম মানুষ সামাজিকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। নানা কারণে সামাজিকতার দাবী মানুষের পূর্ব্বতন পুরুষের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় হইয়াছিল। মাংসাশী জীবের তুলনায় সে নিতান্ত দুর্ব্বল। তৃণভোজী জীব অক্ষম হইলেও পলায়নপটু ও ক্ষিপ্রগতি। পূর্ব্ব-মানুষ যখন সমতল ভূমিতে পৌছিয়া নূতন হাঁটিতেছে তখনও তাহার মেরু-দণ্ড সরল হয় নাই; সে ঝুঁকিয়া হাঁটে, গোড়ালি অপেক্ষা পায়ের পার্শ্বদেশ সে বেশী ব্যবহার করে। বাঘ বা বিড়াল-বাঘের সঙ্গে সে দৌড়িতে বা যুঝিয়া উঠিতে পারিবে কেন? কাজেই সহযোগ ও সহকারিতা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না।

শিকারীর সমবেত আয়োজন

এই সহযোগ অবশ্য দেখা গেল প্রথম খাদ্যসংস্থানের ক্ষেত্রে। মাটিতে পা দিয়া আদি-মানুষ হইল সর্ব্বভুক্। ফলমূল ও শাকসব্জী আহারেই সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না—সে পশুমাংস গ্রহণ করিতে শিখিল। অন্য পশু তাহাকে শিকার করে। সেও অন্য পশু শিকার করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনে সচেষ্ট হইল। এখানে শিকারীর মিলিত উদ্যোগ ভিন্ন তাহার সিদ্ধিলাভেরই উপায় ছিল না। আদিম মানুষের যাদু, ধর্ম্ম, মন্ত্রতন্ত্র শিকারীকে একজোট করিতে এবং তাহাদিগের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় করিয়া সমবেত উত্তেজনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যই প্রথম নিয়োজিত হইয়াছিল। পশুমাংস অবলম্বনের ফলে খাদ্যসংগ্রহের অনিশ্চয়তা কমিয়া যায়। কঠিন ও দুষ্পাচ্য শাকমূলাদি-ত্যাগের ফলে শিশুমৃত্যুও কমে। ফলে পরিবারবৃদ্ধি সামাজিকতার অনুশীলনের সুযোগ বিস্তার করে।

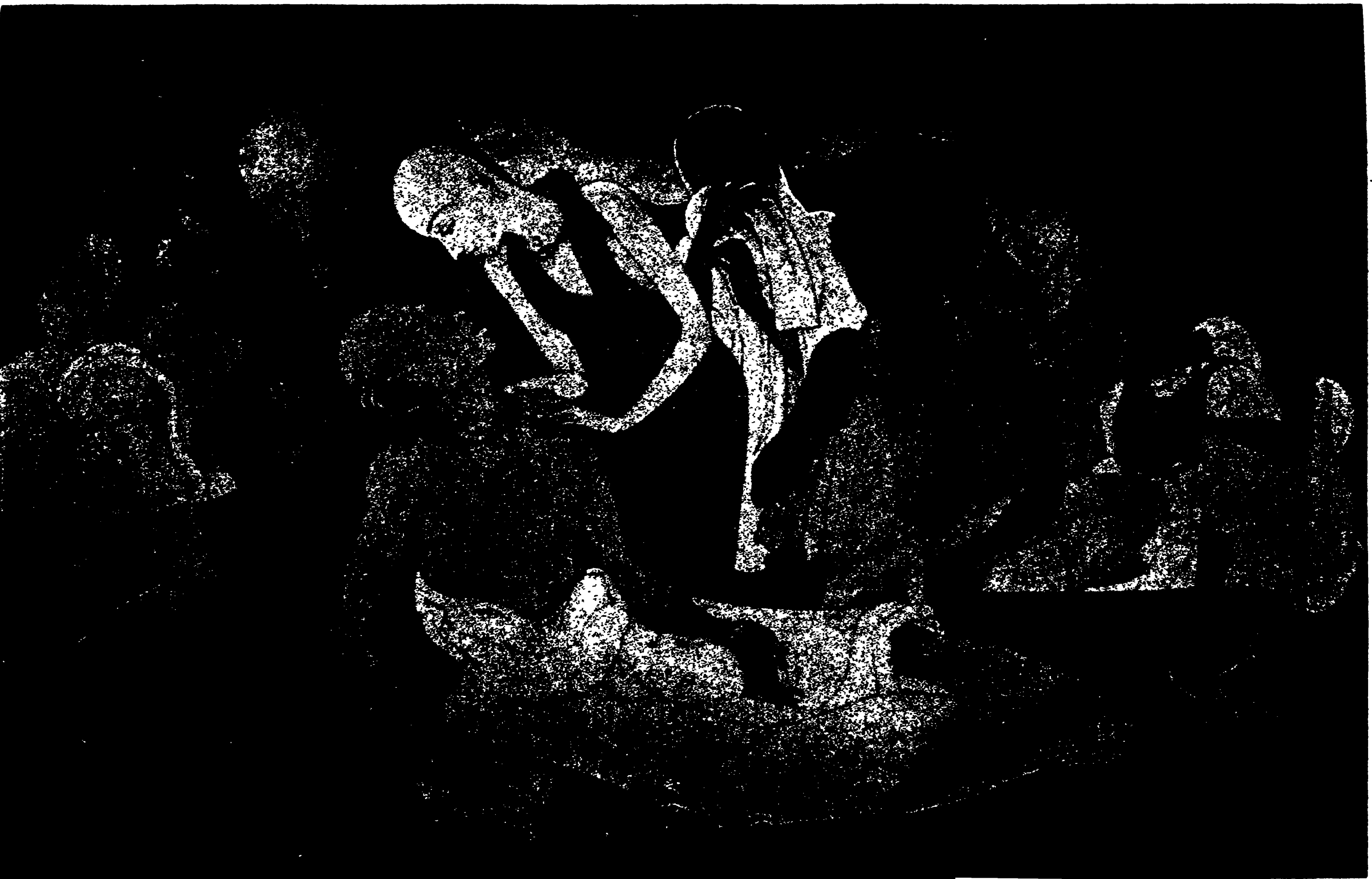
বনভূমিতে একটি বিচ্ছিন্ন পরিবার অপেক্ষাকৃত অসহায়। ক্রমশঃ কতকগুলি পরিবার মিলিয়া দল বা গোষ্ঠী তৈয়ার করিল। অবশ্য পূর্ব্ব-মানুষ—যাহাদিগের কঙ্কাল-অবশেষের সহিত বিজ্ঞান পরিচয় পাইয়াছে, তাহাদিগের জীবন একটি বয়স্ক পুরুষের কেন্দ্রীভূত পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাহারা বড় দল বা গোষ্ঠী গড়িতে পারে নাই। ইহা তাহাদিগের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতেই অনুমান করা যায়। কিন্তু আসল মানুষ (*Homo Sapiens*) যেমন গোড়া হইতেই তাহার বিচিত্র প্রয়োজন অনুসারে অন্য কোন পূর্ব্ব-মানুষ অপেক্ষা কাঠ ও পাথর ব্যবহার করিতে অনেক বেশী শিখিয়াছিল তেমনই সে পরিবার অতিক্রম করিয়া গোষ্ঠী, দল বা যূথে বিস্তৃত হইতে পারিয়াছিল। গত পঞ্চাশ হাজার বৎসরে পূর্ব্ব ও আদিম মানুষের ইতিহাস অনেকটা তাহার সামাজিকতাবৃদ্ধির অভিব্যক্তি। উহার প্রধান সহায় হইয়াছিল যেমন এক দিকে প্রকৃতির প্রসন্নতা, অপর দিকে মানুষের কার্য্যকৌশল ও সঙ্ঘভাব। একটি অপরটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। লোকবৃদ্ধি ঘটিল প্রকৃতির প্রসন্নতা ও খাদ্যসংস্থানের ফলে। এই লোকবৃদ্ধি যেমন এক দিকে দলবদ্ধভাবকে পোষণ করিল, অপর দিকে তেমনই আত্মরক্ষা ও খাদ্যসমস্যাও বিষমভাবে উপস্থিত করিল। আবার আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহ দল-গঠন ও দলবদ্ধভাবে অবস্থানের প্রধান কারণ। মধ্য-এশিয়ায় তুষার-নদীর পর্য্যায়ক্রমিক বিস্তার ও পরিবর্ত্তনের

সঙ্গে খাদ্যসংগ্রহের সাচ্ছল্য ও সঙ্কট এমনই করিয়া কোথাও মানুষকে অধিক সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিল, কোথাও বা তাহাকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়া সমাজগঠনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। প্রায় চার কিংবা সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন তুষার-যুগের অবসানের পর পৃথিবীর আবহাওয়া প্রসন্ন হইল, সেই সময় অনুকূল স্থানগুলিতে মানুষ লোকসংখ্যায় বাড়িয়াছিল এবং খাদ্যাভাবও মোচন করিতে পারিয়াছিল। এইরূপ সুবিধাজনক স্থানে—হয়ত জঙ্গলের পাশে নদীর কোন সমতলভূমিতে, অথবা কোন হ্রদের সন্নিকটে বা মরুদ্যানের চারি দিকে আদিম মনুষ্য-সমাজ লোকবৃদ্ধি, শ্রমবিভাগ ও দৃঢ় সহকারিতার ফলে ছাগ, গো-মহিষ, হরিণ ও অতি বৃহৎ হাতীর পালের সহিত সংগ্রামে সহজে জিতিয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে ভৌগোলিক কারণ-সমবায়ে এমনি করিয়া বিচিত্র পূর্ব্ব-মানুষ উদ্ভূত ও কৃতকার্য্য হইয়াছিল। আবার ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ও খাদ্যসঙ্কটের সঙ্গে আরও নূতন জাতি পৃথিবীর নানা স্থানে দেখা দিল। তাহাদিগের মধ্যে যেমন খাদ্যাভাব বা হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের জন্য দেশান্তরে অভিযানের সময় বিষম যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত, তেমনই অন্য সময়ে পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্মেলনের দ্বারা সঙ্কর জাতি উৎপাদন এবং শিক্ষা ও ব্যবহারের আদানপ্রদানও চলিল। এমনি করিয়া কত যুগ ধরিয়া নানা আবেষ্টনে আসল মানুষের সূচন হয়। আসল মানুষের দুই জাতিই, ক্রো-ম্যাগনন ও গ্রিমালডি, এক দিকে যেমন বন-জঙ্গলে বাসের ফলে অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত, অন্য দিকে তেমনই তাহারা খুবই দলবদ্ধ। প্রান্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃক্ষবিহীন। যেখানে কিছু কিছু ঝোপঝাড় ছিল সেখানে কিংবা হ্রদ বা নদীতটে আদিম মানুষ বিষম শীত বা গরম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। ঐ সব অঞ্চলেও খাদ্য পশুর অভাব ছিল না। আদিম সমাজ-বিন্যাস অনেকটা নেকড়ে বাঘ বা কুকুরের দলের মত ছিল; এক রকম শিকারী-যূথ—যাহা বড় মহিষ, গণ্ডার বা হাতীর সঙ্গে পাল্লা দিত নেকড়ে বাঘেরই মত আক্রমণোপযোগী শ্রমবিভাগ ও শৃঙ্খলার দ্বারা। বিক্ষিপ্ত দল শিকারের সুবিধায় একত্র বসবাস করিয়া লোকবহুল হইতে লাগিল। এদিকে অন্তর্ব্বিবাহ করিয়া আর্থিক সহযোগকে দৃঢ়তর করিয়াছিল; ইহার ফলে জাতির মধ্যে দৈহিক গুণগুলি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, সমাজের প্রথা, আচার-ব্যবহারও বংশপরম্পরাগত হইল। এমনি করিয়া আবেষ্টনশক্তি মানুষের বিধিনিষেধ ও সামাজিক বিন্যাসকে যুগ যুগ ধরিয়া স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়াছে। ঐ বিচারে সব ক্ষেত্রে সামাজিকতার জয়ই ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু সমাজ-গঠনের প্রেরণা আসিল মানুষের অন্তর-প্রবৃত্তি হইতেও।

সামাজিকতা ও শৈশবকাল প্রসারণ

মানবশিশু অন্য জীবশিশুর তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অসহায়। ইহার কারণ শিশুর মাথা অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী হওয়াতে উহা সোজা করিয়া রাখিতে ও শিশুর হাঁটিতে শিখিতে বিলম্ব ঘটে, তাহা ছাড়া গায়ে তাহার শুধু লোম থাকাতে সে অপেক্ষাকৃত কম সহনশীল। মানুষের দীর্ঘপ্রসারিত শিশুজীবন এক দিকে যেমন তাহার মস্তিষ্কবিকাশের কারণ, অপর দিকে তাহার পরিবার ও সমষ্টি জীবনের সহযোগ অপরিহার্য্য করিয়াছে। মানব-শিশু ক্ষুধায় বা শীতে-উত্তাপে কাঁদে, তাহা লইয়া পূর্ব্ব-মানুষ-পরিবারে নিশ্চয়ই চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল, যেমন দেখা যায় বড় বানরজাতির মধ্যে যাহাদিগেরও শিশুকাল দীর্ঘ। দীর্ঘকালীন শৈশবের সঙ্গে দেখা যায় ক্রীড়াকৌতুকের প্রাবল্য। বয়স্করা হইল এখন শিশুর খেলার সাথী। খেলা একটা জীবের অভিনয়। এই অভিনয়ের পশ্চাতে রহিয়াছে ছোট ও বড়, দুর্ব্বল ও সবলের ভাব-বিনিময়। জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই অভিনয় জীবকে পরিণত জীবনের কঠোর সংগ্রামের জন্য শিক্ষা দেয়, যেমন হাঁস তাহাদিগের সন্ততিকে সাঁতার শিখায়; বাঘ, সিংহ ও বিড়াল যেমন শাবককে শিকার শিখায় এবং বানর ও মানুষ যেমন তাহার সন্তানকে কার্য্যকৌশল বা ভালমন্দ শিখায়।

শিশুকাল প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জীবের কোমল বৃত্তিগুলি প্রবল হইতে থাকে। বৃহৎ বানরেরা প্রায় মানুষের মতই শিশুর প্রতি মমতা ও যত্ন দেখায়। পূর্ব্ব-



যবন হরিদাসের তিরোভাব
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ও আদিম-জননীর হৃদয়ে যে স্নেহ, কোমলতা ও সেবা-পরায়ণতা প্রথমে দেখা দিয়াছিল তাহা মানবজাতির মানসিক ও অধ্যাত্ম উন্নতির একটি প্রধান উপকরণ। হয়ত উহাই ভাবপ্রকাশের ব্যথা লইয়া প্রথম ভাষার সৃজন করে মাতৃক্রোড়ে, শিশুর রোগশয্যায় অথবা ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে। যুগ যুগ ধরিয়া এই স্নেহ, দয়া, মমতা সন্তান-সন্ততির মনে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সমষ্টি-বোধের মাপকাঠিতে মানুষ-জাতির বিচার ও নির্ব্বাচন হইতে লাগিল। ফলে হইয়াছে মানুষের মগজ এমন একটি অত্যন্ত ধারণক্ষম কর্ম্মসাধন-যন্ত্র যাহার অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করে অপর মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শের উপর।

মানুষের বিদ্রোহ

এক কোটি বৎসর মনুষ্যজীবের ইতিহাসে তাহার মুক্ত ও নমনীয় হাতের মত তাহার মগজও অভিব্যক্তির আরোহণ-পথ ইঙ্গিত করিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে যুঝিয়া যে হাতের খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব তাহা বর্ত্তমান যুগে কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে সে নিয়োগ করিতেছে, বহুল বিচিত্র যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈয়ার করিয়া। যে মগজ মানুষের সহজ বন্ধনী তাহা সে নিয়োগ করিতেছে চাতুরী ও কূটবুদ্ধি ব্যবহারে অপর মানুষের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা বা প্রভাববৃদ্ধির জন্য। দুই দিক হইতেই মানুষ তাহার ক্রমবিকাশের বন্ধুর আরোহণপথ ছাড়িয়া দিতে উদ্যত। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দেহ ও মনের ক্রমবিকাশে কর্ম্মকুশল মানুষের হাত মগজের জটিলতাবৃদ্ধি অর্থাৎ ধীশক্তির তীক্ষ্ণতা ও অনুভবের বিস্তৃতির সহায় হইয়াছে। অপর দিকে মানুষের মগজই হাতের বিচিত্র ব্যবহার নির্ণয় করিয়া দিয়াছে।

বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় এখন একটি বিষম সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—মানুষ শুধু পৃথিবীর উপর নহে মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তাহার পূর্ব্ব-অকল্পিত শক্তি নিয়োগ করিতেছে। অনুভবের সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও বিস্তৃতি বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইতেছে। সমাজ-জীবনে যখনই মানুষ চুরি, ডাকাতি বা চালাকি বা বলপ্রয়োগ করিয়া অপরকে হটায়, অন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যখনই কোন দেশ অপর দেশের উপর বাহুবল প্রয়োগ করে, পরস্পরের মধ্যে সুবিবেচনার দ্বারা নহে যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসা খুঁজে, তখনই আমরা জানি প্রকৃতি মানুষকে যে মন ও হৃদয়ের বিস্তৃতির দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দানের জন্য যোগ্য করিতেছিল তাহার ব্যতিক্রম ঘটে।

জীবের ক্রমবিকাশের আরোহণ-পথের সীমানায় দাঁড়াইয়া মানুষের দৈহিক বিকাশ অনেক কাল হইল এক রকম বন্ধ, সে কি আপনার অধ্যাত্ম বিকাশও এখন রুদ্ধ করিয়া তাহার এই সুবিশাল সাম্রাজ্য—যাহা শুধু ভূমণ্ডল নহে আজ পাতালে ও আকাশে, আলো, অন্ধকার, বিদ্যুৎ ও ব্যোম রাজ্যে পরিব্যাপ্ত, তাহা কি মধুমক্ষিকা পিপীলিকা বা কীটপতঙ্গের হাতে ভবিষ্যতে ছাড়িয়া দিবে? শত দোষ ও অপরাধ থাকিলেও একমাত্র মানুষই তাহার জৈবিক নীতি ও আদর্শ জানে। সকল জীবের মধ্যে একমাত্র সে-ই বোঝে কোন্‌টি প্রকৃতির নিশ্চিত আরোহণের পথ, কোন্‌টি পতনের পথ। মানুষ জানিয়া-শুনিয়া যদি এ বিষয়ে পাপী হয় এবং যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে সে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহার নিকট একেবারেই 'আত্মসমর্পণ করিতে থাকে, তবে পৃথিবীর ইতিহাস একটা নিদারুণ বিদ্রূপের মত। কিংবা কে জানে অপর কোন সামাজিক জীব—যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়া নহে শান্তি ও পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের ভিতর দিয়া—মানুষকে বিলুপ্ত করিবার এবং বসুন্ধরাকে আপনার একভোগ্য করিবার জন্য এখন নীরবে ও নির্ব্বিবাদে আয়োজন করিতেছে?

জামাই-সপ্তমী

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

শৈশবে ও বাল্যকালে পিতামহী, মাতামহী, মাসীমা, পিসীমা প্রভৃতি শিশুকে যে শিক্ষা দেন, অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাও যে সেই শিক্ষাজনিত সংস্কার হইতে পরবর্ত্তী কালে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারে না, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল আমাদের রমেশচন্দ্র।

রমেশচন্দ্র শৈশবে তাহার ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতিবেশী গঙ্গারাম মুখুয্যে এমন ভীষণ কৃপণ যে, প্রাতঃকালে তাঁহার মুখ দর্শন ত দূরের কথা তাঁহার নাম উচ্চারণ এমন কি শ্রবণ পর্য্যন্ত করিলে সেদিন একটা-না-একটা বিপদ হইবেই, কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারে না। চট্টোপাধ্যায়দের মধ্যম গৃহিণী এক বার কি একটা ব্রত উপলক্ষে "দোয়াদশটি" ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় এক জন কথায় কথায় প্রাতঃস্মরণীয় মুখুয্যে মহাশয়ের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র সেই কক্ষস্থিত একটা জলপূর্ণ বড় জালা ফাঁসিয়া গিয়া ব্রাহ্মণদের ভোজ্য ভাসাইয়া দিয়াছিল।

রমেশের পিতামহ যে সওদাগরি আপিসের বড়বাবু ছিলেন, সেই আপিসের একখানা ষ্টীমার কলিকাতা হইতে মাল বোঝাই লইয়া যেদিন যাত্রা করে, সেদিনটায় নাকি মঘা নক্ষত্র ছিল, তাই বড়বাবু আপিসের সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, মঘা নক্ষত্রে ষ্টীমার না ছাড়িয়া পরদিন ছাড়িলে ভাল হয়, কারণ মঘা নক্ষত্রটা যাত্রার পক্ষে বড়ই অশুভ। সাহেব সে-কথায় কর্ণপাত না করাতে হাতে হাতে ফল পাইয়াছিলেন, সমুদ্রে সেই ষ্টীমার জলমগ্ন হইয়াছিল। সেই ঘটনা হইতে সাহেবের মনে হিন্দুর পঞ্জিকার উপর এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস হয় যে, পঞ্জিকাতে যাত্রার শুভদিন না দেখাইয়া তিনি কোন ষ্টীমার ছাড়িবার আদেশ দিতেন না। এই গল্পও রমেশ তাহার পিতামহীর মুখেই শুনিয়াছিল। এ হেন পিতামহীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত রমেশ বি. এসসি. পড়িতেছে বলিয়াই কি অশ্লেষা-মঘাকে উড়াইয়া দিতে পারে, না গঙ্গারাম মুখুয্যের সম্বন্ধে তাহার বদ্ধমূল ধারণা পরিত্যাগ করিতে পারে?

কচুরি-পানার শিকড় কোন উপায়ে একটা জলাশয়ে স্থান পাইলে যেমন অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত জলাশয়টি কচুরি-পানায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ পিতামহীর মুখে শৈশবে শ্রুত অপয়া গঙ্গারাম মুখুয্যে এবং অশ্লেষা-মঘার কথা রমেশের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া অচিরে ডালপালা বিস্তার করিয়া সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল, শৈশব হইতে বাল্যে এবং বাল্য হইতে যৌবনে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে অনেকগুলা অপয়া নামের সন্ধান পাইল, অশ্লেষা, মঘা প্রভৃতি নক্ষত্রের উপর ভর করিয়া অনেক দেবতা উপদেবতাও রমেশের কাছে আশ্রয় পাইয়াছিল। এক-এক জন লোকের চিত্তবৃত্তি এরূপ অদ্ভুত যে বাল্যসংস্কার তাহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহার বন্ধু এবং সহপাঠীরা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহার বাল্য-সংস্কারের মূলোৎপাটনে অকৃতকার্য্য হইয়া বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছিল। গঙ্গারাম মুখুয্যের নাম করিলে বা অশ্লেষা-মঘা-ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা করিলেও যে সকল সময়ে অনিষ্ট হয় না ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আই. এস. সি পরীক্ষার কয়দিন প্রত্যহ যখন সে পরীক্ষা দিবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইত, তখন তাহার কোন-না-কোন বন্ধু গঙ্গারাম নামটা তাহাকে শুনাইয়া দিত, কেহবা অন্তরালে থাকিয়া তাহার গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে নাকে কাঠি দিয়া হাঁচিত, কেহ বা তাহার পশ্চাৎ হইতে পিছু ডাকিত। কিন্তু এই সকল বাধা ও অযাত্রা সত্ত্বেও রমেশ প্রথম বিভাগে আই. এসসি. পাস করিল।

২৮শে এপ্রিল, ১৪ই বৈশাখ শুক্রবার মঘা নক্ষত্র তাহার উপর ত্র্যহস্পর্শ, সুতরাং যাত্রা নাস্তি। রমেশের বন্ধু বিপিন

বলিল, "রমেশ আজ যাত্রার দিনটা কেমন? শুভ না অশুভ?"

রমেশ বলিল, "অত্যন্ত অশুভ।"

"বেশ এই অশুভ দিনে যাত্রা করিয়া যদি আমি বৰ্দ্ধমান হইতে সীতাভোগ মিহিদানা কিনিয়া অক্ষতদেহে, নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারি, তাহা হইলে কি দিবে?"

রমেশ বলিল, "যাতায়াতের খরচ আর খাবারের দাম।"

বিপিন বলিল, "বেশ কথা, আমি এখনই যাত্রা করিব, টাকা দাও।"

রমেশ একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "কিন্তু বৰ্দ্ধমান পৰ্য্যন্ত যাওয়া চাই।"

বিপিন বলিল, "আমার সঙ্গে স্টেশনে চল, আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে।"

তখন রমেশ, বিপিন, মতি ও ভুবন, চারি বন্ধুতে হ্যারিসন রোডে হাওড়া-স্টেশনগামী একখানা বাসে উঠিয়া বসিল। বাসে উঠিবার সময় বিপিন বলিল, "দোহাই বাবা গঙ্গারাম মুখুয্যে।" শুনিয়া রমেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

মতি বলিল, "আজ শুভযাত্রা, তিন বামুন এক শুদ্দ্‌র।" রমেশ কোন কথা কহিল না। হাওড়া স্টেশনে গিয়া বিপিন বৰ্দ্ধমানের একখানা উইক-এণ্ড টিকিট কিনিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, বিপিন আবার এক বার উচ্চকণ্ঠে গঙ্গারাম স্মরণ করিয়া গাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হইল।

রাত্রি সাড়ে নয়টার মধ্যে বিপিনের ফিরিবার কথা, দশটা বাজিয়া গেল, বিপিন ফিরিল না, এগারটাও বাজিয়া গেল, বিপিনের দেখা নাই। টাইম-টেবল খুলিয়া দেখা গেল, বৰ্দ্ধমান হইতে ফিরিবার শেষ গাড়ীর সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন রমেশ, মতি ও ভুবন তিন জনেই বিপিনের জন্য চিন্তিত হইল, কি হইল বিপিনের? বিপিন যে কোন বিপদে পড়িয়াছে, সে-বিষয়ে রমেশের কোন সন্দেহ রহিল না। কেন সে বিপিনকে টাকা দিয়া বৰ্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিল? সে টাকা না দিলে ত বিপিন বৰ্দ্ধমানে যাইত না।

রমেশ ও তাহার বন্ধুত্রয় মেসের বাসাতে একই কক্ষে থাকিত। সেদিন বিপিনের জন্য দুর্ভাবনায় কাহারও ভাল নিদ্রা হইল না, রমেশ ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিল। পরদিন প্রাতঃকালে এক খানা দৈনিক সংবাদ পত্রে বৰ্দ্ধমান লাইনে কোন ট্রেন দুর্ঘটনার সংবাদ আছে কি না দেখিতেছিল, এমন সময় সুতালি সুতায় জড়াইয়া বাঁধা খাবারের চাংড়া হাতে করিয়া হাসিমুখে বিপিন তথায় উপস্থিত হইল। মতি তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি? কাল কোথায় ছিলে? কাল এলে না কেন?"

বিপিন বলিল, "ভাগ্যে গঙ্গারাম স্মরণ ক'রে মঘা ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা করেছিলেম, তাই রাত্রে লুচি, মাংস, চপ, কাটলেট খেয়ে জামাই-আদরে রাত্রিটা কাটিয়ে এলেম। বৰ্দ্ধমান স্টেশনে নেমেই দেখি, প্লাটফরমে আমার বড় ভগিনীপতি বাঁড়ুয্যে-মশাই দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই ছুটে এসে আমাকে পাকড়াও ক'রে তাঁর কোয়ার্টারে টেনে নিয়ে গেলেন। আমি জানি তিনি রাণীগঞ্জে আছেন। বললেন, আজ দিন-চারেক হ'ল বৰ্দ্ধমানে এ-এস.এম (সহকারী স্টেশন মাস্টার) হয়ে এসেছেন। তিনি একাই এসেছেন, দিদি ও ছেলেরা রাণীগঞ্জে আছেন। বাঁড়ুয্যে-মশাই কিছুতেই আসতে দিলেন না, রিফ্রেশমেণ্ট রুম থেকে মাংসের কালিয়া, চপ, কাটলেট আর খাবারের দোকান থেকে লুচি, মিষ্টান্ন, আলুর দম আনিয়ে ঠিক জামাই-আদরে সেবা নিলেন। ছাড়তে চান না, বলেন, কলেজ বন্ধ, দু-দিন থেকে যাও, রাণীগঞ্জে গিয়ে তোমার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে এস। অনেক কষ্টে, ব'লে-কয়ে তবে ছাড়ান পেয়েছি, তাই ভোরের ট্রেনেই মিহিদানা-সীতাভোগ নিয়ে লম্বা দিলেম। ভাগ্যে কাল ত্র্যহস্পর্শ মঘা ছিল আর গঙ্গারাম স্মরণ করে যাত্রা করেছিলেম তাই আর বাসার ঠাকুরের হাতের রাজভোগ খেতে হয় নি।"

হাতে হাতে এমন অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও কিন্তু রমেশের বাল্য সংস্কারের মূল শিথিল হইল না। গঙ্গারামের নাম শুনিলেই তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিত।

২

রমেশের শ্বশুর রায়-সাহেব ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভাগলপুর-বিভাগের কমিশনারের পার্সনাল এসিষ্টাণ্ট। ভাগলপুরেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে, সেখানে বাড়ীঘরও করিয়াছেন। ভাগলপুরেই রমেশ বিবাহ করিতে গিয়াছিল এবং গত বৎসর জামাই-ষষ্ঠী উপলক্ষে ভাগলপুরেই গিয়াছিল, কিন্তু এ-বৎসর জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ আসিয়াছে ক্ষেত্রনাথ বাবুর দেশ বর্দ্ধমান জেলার বেগুনে গ্রাম হইতে। ক্ষেত্রনাথ বাবু ভবিষ্যদ্দর্শী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিহারে বাঙালী-বিদ্বেষ দিন দিন যেরূপ উগ্র হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাঁহার পুত্রেরা "ডোমিসাইল্ড" হইলেও যে বিহারে কাজকর্ম্মের বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে, সে আশা নাই। তাই তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, বাঙালীর ছেলের বাংলা মায়ের বুকে ফিরিয়া গিয়া মায়ের দেওয়া মোটা ভাত-কাপড়ই মাথায় তুলিয়া লওয়া উচিত। অনেক বিবেচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া দেশের বাড়ীর জীর্ণসংস্কার করাইবার জন্য তিন মাসের ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। আর দুই বৎসর পরে তাঁহার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ণ হইলেই তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এ বৎসর জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে শ্বশুর মহাশয়ের দেশের বাড়ীতেই রমেশের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

ক্ষেত্রনাথ বাবু রমেশকে সকালের ট্রেনে যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু রমেশ পত্রোত্তরে শ্বশুর মহাশয়কে লিখিয়াছিল যে সকালের ট্রেনে যাইলে গ্রামে পৌছাইতে প্রায় মধ্যাহ্ন হইবে, রৌদ্রে কষ্ট হইবে, সেই জন্য সে প্রাতঃকালে না গিয়া বৈকালের ট্রেনে যাইবে। ক্ষেত্রনাথ বাবু জামাতার পত্র পাইয়া তাঁহার পুরাতন ভৃত্য রামদীনকে মেমারি ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন এবং জামাই বাবুকে পাল্কী করিয়া লইয়া আসিতে বলিলেন। মেমারি ষ্টেশনে পাল্কী পাওয়া যায়। রামদীন রমেশকে চিনিত।

রমেশ শ্বশুরবাড়ী যাইবে, তাহার বন্ধু ভুবন ও মতির আর আনন্দের সীমা নাই; রমেশ কোন্ কাপড় পরিবে, কোন্ জামাটা গায়ে দিবে ভুবন তাহা পছন্দ করিয়া দিল। মতি নিজের ট্রাঙ্ক হইতে এক শিশি এসেন্স আনিয়া রমেশের রুমালে মাখাইয়া রুমালখানি সযত্নে জামার পকেটে রাখিয়া দিল। বিপিন বাসাতে ছিল না, সে প্রাতের ট্রেনেই হাসিশহরে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় রমেশ সাজসজ্জা করিয়া বাসা হইতে যাত্রা করিল। তাহার একখানা সাইকেল ছিল, স্টেশনে যাইবার জন্য সাইকেলে আরোহণ করিবার সময় মতি ও ভুবন বারংবার "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া রমেশকে বিদায়-সম্ভাষণ করিল। রমেশের ভয় হইয়াছিল, যাত্রাকালে তাহার নাস্তিক বন্ধুরা পাছে কোন অযাত্রা বা অপয়ার উল্লেখ করে। কিন্তু মতি বা ভুবন সেরূপ কোন গর্হিত কার্য্য না করাতে, বরং "দুর্গা শ্রীহরি" বলাতে রমেশ হৃষ্টমনে যাত্রা করিল।

হাওড়া-পুলে প্রবেশপথে রমেশ একখানা রিক্‌শর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চমকাইয়া উঠিল। রিকশতে বসিয়া গঙ্গারাম মুখুয্যে নাকি? সেই রকম খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ, সেই রকম ময়লা ছেঁড়া জামা গায়ে, নিশ্চয়ই সে-ই। কিন্তু মুখুয্যেমশাই ত রিক্‌শতে চড়িয়া পয়সা খরচ করিবার লোক নহেন, তবে বোধ হয় অন্য কেহ হইবে। যাহা হউক রমেশের মনটা খারাপ হইয়া গেল। অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে সে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া একখানা মেমারি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট এবং সাইকেলের টিকিট কিনিয়া প্লাটফরমের দিকে অগ্রসর হইল। সে জানিত যে মেমারি পার হইয়া বর্দ্ধমান, সুতরাং যে-গাড়ী বর্দ্ধমানে যায়, সেই গাড়ীতে উঠিতে হইবে। সে একদল বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল; "বর্দ্ধমানের গাড়ী কোন্ প্লাটফরম বলিতে পারেন?"

তিনি বলিলেন, "এগার নম্বর, শীঘ্র যান, গাড়ী এখনি ছাড়িবে।"

রমেশ এগার নম্বর প্লাটফরমের গেটে উপস্থিত হইলে, গেটের টিকিট-চেকার, তাহার হাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দেখিয়া, টিকিটখানা পরীক্ষা না করিয়াই পাঞ্চ করিয়া বলিল, "শীঘ্র যান, গাড়ী ছাড়িতেছে।" রমেশ সাইকেল সহ, সত্বর গিয়া একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়িল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

রমেশ তাহার সাইকেলখানা কামরার প্রাচীরে ঠেস দিয়া রাখিয়া বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। ছুটাছুটি করাতে কপাল হইতে ঘাম ঝরিতেছিল, ঘাম মুছিবার জন্য পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল, এসেন্সের সৌরভে গাড়ী আমোদিত হইয়া উঠিল। ভাঁজ খুলিবা মাত্র রুমালের ভিতর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ পড়িয়া গেল। কি কাগজ দেখিবার জন্য উঠাইয়া লইয়া দেখিল—সর্ব্বনাশ! কাগজে লেখা রহিয়াছে "প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গারাম মুখুয্যের জয়।" ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল, এ নিশ্চয়ই সেই রাস্কেল মতির কাজ। তখন রমেশ যদি মতিকে কাছে পাইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঘুষি মারিয়া তাহার নাক ভাঙিয়া দিত। সে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেই কামরায় অন্য একখানা বেঞ্চে একজন বৃদ্ধ ইংরেজ একখানা বই পড়িতেছিলেন, আর কোন যাত্রী সেই কামরায় ছিল না।

গাড়ীখানা যখন লিলুয়া স্টেশন অতিক্রম করে, তখন রমেশ মনে মনে মতির মুণ্ডপাত করিতেছিল, তাই গাড়ী লিলুয়াতে দাঁড়াইল কি না খেয়াল করে নাই, পূর্ণ বেগে বেলুড় স্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী যখন বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে প্রবেশ করে, তখন বোধ হয় গাড়ীর ঝাঁকুনিতে চমকিত হইয়া বাতায়ন হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিল, গাড়ী মেন লাইন ছাড়িয়া নিউ কর্ড লাইন ধরিয়া দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, দেখিতে দেখিতে বালি ব্রিজ অতিক্রম করিয়া গাড়ী একটু একটু করিয়া বাম দিকে বাঁকিয়া, মেন লাইন হইতে দূরে গিয়া পড়িল, তখন রমেশ সেই বৃদ্ধ ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ট্রেন কি সকল স্টেশনে থামে না?

প্রশ্ন শুনিয়া সাহেব বিস্মিত হইয়া রমেশের পানে খানিক চাহিয়া বলিলেন, "না। এটা এক্সপ্রেস ট্রেন, একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়া থামিবে। তুমি কোথায় যাইবে?"

রমেশ আর এই অপরিচিত বিদেশী ভদ্রলোকের নিকট আপনার মূর্খতা প্রকাশ করিল না, বলিল, "বর্দ্ধমানে যাইব।" সাহেব আর কোন কথা না বলিয়া পুস্তকে মনঃসংযোগ করিলেন, রমেশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল কাহার দোষে এই বিভ্রাট উপস্থিত হইল? হাওড়া স্টেশনে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কেন এগার নম্বর প্লাটফরম দেখাইয়া দিলেন? কিন্তু তাঁহার দোষ কি? রমেশ যদি মেমারির গাড়ীর কথা বলিত, তাহা হইলে তিনি কখনই এগার নম্বর বলিতেন না। তিনি ত ঠিকই বলিয়াছেন, এগার নম্বর প্লাটফরমের গাড়ী ত বর্দ্ধমানেই যাইতেছে। সেই ফিরিঙ্গী টিকিট-চেকারটা তাহাকে ছাড়িল কেন? কিন্তু এক জন দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটধারী যাত্রী যে এইরূপ গোলযোগ বাধাইয়া বসিবে, তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই, গাড়ী তখন ছাড়িবার সময় হইয়াছে, তখন কি ভাল করিয়া টিকিট পরীক্ষা করা চলে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর? সুতরাং তাহার কোন দোষ নাই। মতিই যত দোষের কারণ, সে যদি ঐ অপয়া বামুনটার নাম-লেখা কাগজ তাহার পকেটে না দিত, তাহা হইলে কখনই এই গাড়ী-বিভ্রাট হইত না। যাক্, এখন আর ভাবিয়া কি হইবে? কলিকাতায় ফিরিয়া মতিকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।

যথাসময়ে গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে রমেশ সাইকেল লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল, কিন্তু যে-গেটে যাত্রীরা টিকিট দিয়া বাহিরে যাইতেছে, সেদিকে না গিয়া প্লাটফরমের এক পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কত যাত্রী টিকিট দিয়া বাহির হইয়া গেল, কত যাত্রী ট্রেনে উঠিয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল, রমেশ নির্লিপ্ত দর্শকের মত শূন্যদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। যে-সকল যাত্রী গাড়ী হইতে নামিয়াছিল, তাহারা বাহির হইয়া গেলে রমেশ ধীরে ধীরে গেটের নিকটে গিয়া টিকিট-কালেক্টর বাবুকে বলিল, "আমি মেমারি যাইব। হাওড়ায় এক ব্যক্তি ভুল প্লাটফরম দেখাইয়া দেওয়াতে আমি বর্দ্ধমানে আসিয়া পড়িয়াছি; এক্সেস্ ফেয়ার ও পেনাল্টি লইয়া আমাকে মেমারির একখানা টিকিট দিন।"

"আমার সঙ্গে বুকিং আপিসে আসুন।" বলিয়া বাবুটি রমেশকে আপিসে লইয়া গিয়া এক্সেস ফেয়ার, পেনাল্টি ও মেমারির টিকিটের মূল্য হিসাব করিয়া রমেশের নিকট হইতে টাকা লইলেন এবং এক্সেস

ফেয়ারের রসিদ ও মেমারির টিকিট দিলেন। রমেশ বলিল, "মেমারির ট্রেন কখন পাইব?"

"সন্ধ্যার সময়; ঐ প্লাটফরমে গিয়া অপেক্ষা করুন।"

রমেশ টিকিট-কালেক্টরের কথামত নির্দ্দিষ্ট প্লাটফরমে গিয়া একখানা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, মাত্র এক মাস পূর্ব্বে বিপিন মঘা নক্ষত্রে, ত্র্যহস্পর্শে সেই অপয়া বামুনটার নাম করিয়া এই বর্দ্ধমানে আসিয়া ভগিনীপতির বাসাতে লুচি, মাংস, চপ, কাটলেট খাইয়া নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল, আর আজ তাহার অদৃষ্টে এ কি বিড়ম্বনা! বিপিনের কথা মনে পড়িতেই তাহারও জলযোগের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে ভাবিল, শ্বশুরবাড়ী পৌছিতে সম্ভবতঃ রাত্রি সাড়ে নয়টা দশটা হইবে, সুতরাং এই সময় কিছু জলযোগ করিয়া লই। বিপিনের কথিত চপ-কাটলেটে লোভ না করিয়া রমেশ প্লাটফরমে মিষ্টান্ন-বিক্রেতার দোকানে গিয়া লুচি, আলুর দম ও সীতাভোগ মিহিদানায় উদর পূর্ত্তি করিয়া ভোজন করিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সে মিষ্টান্ন-বিক্রেতা এবং এক জন রেল কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া মেমারি-গামী গাড়ীতে আরোহণ করিল।

৩

রমেশ হাওড়া হইতে কোন্ ট্রেনে এবং কখন মেমারিতে পৌছিবে, তাহা শ্বশুর মহাশয়কে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ বাবুও রামদীনকে সে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। রামদীন বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান। সে মেমারিতে উপস্থিত হইয়াই একখানা পাল্কী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পর গাড়ী আসিবার ঘণ্টা হইলে সে ষ্টেশনে গিয়া প্লাট-ফরম গেটের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। যথা-সময়ে গাড়ী আসিল, ছাড়িয়া গেল, যাত্রীরা একে একে টিকিট দিয়া বাহির হইয়া গেল, রমেশের দেখা নাই। রামদীন তখন পাল্কী-বেহারাদিগকে বলিল, "জামাইবাবু এ গাড়ীতে আসেন নাই, পরের গাড়ীতে নিশ্চয়ই আসিবেন।" সে পরের গাড়ীর অপেক্ষায় নিশ্চিন্তমনে বসিয়া বেহারাদের সহিত গল্প করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হাওড়া হইতে আর একখানা গাড়ী আসিল, তাহাতেও জামাইবাবুর দেখা নাই। স্টেশনে সংবাদ লইয়া রামদীন জানিল যে, রাত্রি সাড়ে আটটার সময় হাওড়ার গাড়ী আসিবে। সে স্থির করিল যে, সেই গাড়ী-খানা দেখিয়া সে ফিরিয়া যাইবে, কারণ তাহার পরের গাড়ী রাত্রি সাড়ে দশটায়, তত রাত্রে জামাইবাবু নিশ্চয়ই আসিবেন না।

রাত্রি পৌনে আটটার সময় রমেশ মেমারি স্টেশনে ডাউন প্লাটফরমে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। সে রামদীনকে খুঁজিয়াছিল, কিন্তু ডাউন বা আপ কোন প্লাট-ফরমেই তাহাকে দেখিতে পাইল না, স্টেশনের বাহিরেও রামদীনকে দেখিতে পাইল না। মূর্খ নিরক্ষর রামদীন জানিত না যে, তাহার মনিবের উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান জামাতা হাওড়ার আপ-ট্রেনে আরোহণ করিয়া মেমারিতে বর্দ্ধমানের ডাউন-ট্রেন হইতে অবতরণ করিবেন, জানিলে সে আপ-ডাউন দুই দিকের ট্রেনেই দৃষ্টি রাখিত। রমেশ যখন স্টেশনের ভিতরে ও বাহিরে রামদীনের অনুসন্ধান করিতেছিল, রামদীন তখন বাজারের এক পার্শ্বে একটা গলির মধ্যে পাল্কীর আড্ডায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। সাড়ে আটটার ট্রেনেও জামাইবাবুকে দেখিতে না পাইয়া সে অগত্যা একখানা বাসে উঠিয়া বেগুনেতে ফিরিয়া গেল।

রামদীনকে দেখিতে না পাইয়া রমেশ এক জন লোককে বেগুনের পথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "সাতগেছে-বেগুনে? আপুনি এই বাসের রাস্তা ধরে বরাবর সিধে যাও, কোন দিকে বেঁকতে হবেন না, এই রাস্তা সাতগেছে-বেগুনের উপর-উপর দিয়ে গেছেন।"

সাইকেলের আলো জ্বালিয়া রমেশ সাইকেলে আরোহণ করিল। গ্রামের ভিতরের রাস্তাটা সোজা নহে, বাঁকিয়া, কোন বাড়ীর সম্মুখ দিয়া, কোন বাড়ীর পশ্চাৎ দিয়া, কোন পুষ্করিণীর ধার দিয়া গিয়াছে। সাবধানে সাইকেল চালাইয়া রমেশ গ্রামের বাহিরে আসিয়া দেখিল, রাস্তা মাঠের মধ্যে পড়িয়াছে। ষষ্ঠীর ক্ষীণ চন্দ্র মেঘাবৃত হইয়া যে ক্ষীণতর আলোক দিতেছিল, তাহাতে অধিক দূর দৃষ্টি চলে না, তবে রমেশ বুঝিতে পারিল যে পথে পথিকের বা গাড়ীর ভিড় নাই, কদাচিৎ দুই-এক জন লোক বা দুই-

একখানা গরুর গাড়ী ধীর মন্থরগতিতে যাতায়াত করিতেছে। রমেশ দ্রুতবেগে সাইকেল চালনা করিল। কিন্তু যত বেগে যাইবে মনে করিয়াছিল, গাড়ী তত বেগে চলিল না, কারণ সে পথ কলিকাতার পথের মত বা গ্রাণ্ড-ট্র্যাঙ্ক পথের মত পিচ দিয়া বাঁধান মসৃণ নহে, লোকাল্ বোর্ডের ঝামা দিয়া বাঁধান রাস্তা, কোথাও বা একখানা ঝামা সূচ্যগ্র মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা পথের মধ্যস্থলেই জলপূর্ণ একটা গর্ত্ত রহিয়াছে। সুতরাং সাইকেলের আলোকে পথ দেখিয়া খুব সাবধানে গাড়ী চালাইতে হইল।

প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর রমেশ পশ্চাদ্দিক হইতে মোটর-হর্ণের শব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল অদূরে একখানা বাস আসিতেছে। সে ঐ বাস্‌কে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য রাস্তার ধারে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে একখানা যাত্রীপূর্ণ বাস্ তাহাকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল এবং ক্ষণকাল পরে বাম দিকে মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচ-সাত মিনিট পরে আর একখানা এবং তাহার অত্যল্প কাল পরে তৃতীয় একখানা বাস্ তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল এবং প্রথম বাসের মত বাম দিকে মোড় ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এই তিনখানা বাসের এক খানাতে রামদীন মেমারি হইতে বেগুনে যাইতেছিল।

রমেশ ক্ষণকাল পরে সেই মোড়ের কাছে আসিয়া দেখিল যে বাসের রাস্তা সেইখানে বাম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, সুতরাং সেও সেই বাম দিকের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইল। তখনও সম্মুখে অতিদূরে শেষ বাসের পশ্চাতের লাল আলো অতি ক্ষীণভাবে মিট মিট করিতেছিল। রমেশ বুঝিতে পারিল যে, সে বাসের রাস্তা ধরিয়াই যাইতেছে, পথ ভুল করে নাই। ষষ্ঠীর চন্দ্র অনেক পূর্ব্বেই অস্ত যাওয়াতে চারি দিক ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পথে আর লোকজন বা গাড়ী দেখা যায় না। কদাচিৎ দক্ষিণে বা বামে মাঠের দুই-একটা আলো দেখিয়া রমেশ বুঝিতে পারিল যে ঐখানে লোকালয় আছে।

মেমারি হইতে বেগুনে আট মাইল পথ। দিনমান হইলে রমেশ এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টায় ঐ পথ অক্লেশে যাইতে পারিত, কিন্তু অপরিচিত, অমসৃণ পথে গভীর অন্ধকারে তাহাকে বিশেষ সাবধান হইয়া গাড়ী চালাইতে হইতেছিল, সেই জন্য সে বুঝিতে পারিল না যে মেমারি হইতে কত মাইল আসিয়াছে। পথে এমন এক জনকেও দেখিতে পাইল না, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে বেগুনে গ্রামের অবস্থান স্থির করিয়া লইতে পারে। এক-এক বার তাহার মনে এরূপ সন্দেহও হইল যে, হয়ত বেগুনে গ্রাম পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। এমন সময় সহসা অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ভীষণ গর্জ্জন যেন তাহাকে বধির করিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তের বিদ্যুতে সে দেখিল যে পথ সম্মুখে বহুদূরবিস্তৃত, দক্ষিণে ও বামে দূরে দূরে গ্রাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এতক্ষণ তাহার মনে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা হয় নাই, এখন বিদ্যুৎ-ঝলকে ও মেঘ-গর্জ্জনে নূতন বিপদের সম্ভাবনায় সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

ঘন ঘন বিদ্যুদ্বিকাশ ও মেঘগর্জ্জন হইতে লাগিল। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুতের আলোকে তাহার একটা সুবিধা হইল, অনেক দূর পর্য্যন্ত পথটা দেখিয়া লইবার সুবিধা হইল। সে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সাইকেল চালাইতে লাগিল, যদি বৃষ্টি আসে তবে একটা লোকালয়ে আশ্রয় লইবার উদ্দেশ্যে পথের দক্ষিণে ও বামে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু পথের পার্শ্বে বা নিকটে কোন আশ্রয়স্থান দেখিতে পাইল না। পাঁচ-সাত মিনিট এই ভাবে কাটিয়া যাইবার পর তাহার হাতে এক ফোঁটা শীতল জল পড়িল, রমেশ বুঝিল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ থামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একেবারে প্রবল বেগে বারিবর্ষণ হওয়াতে তাহার সমস্ত পরিধেয় ভিজিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে পথের উপর বৃষ্টির জল জমিয়া গেল, এতক্ষণ সাইকেলের আলোকে পথের গর্ত্তগুলা দেখা যাইতেছিল, বৃষ্টির জলে পথ প্লাবিত হওয়াতে উঁচু ঢিপি ও গভীর গর্ত্ত সব

একাকার হইয়া গেল। পাছে গর্ত্তে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে রমেশ পথ ছাড়িয়া পথের পাশে পাশে ঘাসের উপর দিয়া যাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রমেশের বোধ হইল সে যেন ক্রমশঃ নিম্নভূমির দিকে নামিয়া যাইতেছে; তখন সাইকেল হইতে নামিয়া সে চারি দিক বিশেষ সন্তর্পণে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে ঘাসের উপর দিয়া যাইতে যাইতে সে অন্ধকারে পথিপার্শ্বস্থিত একটা চটাল পুকুরের গর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে। তখন সে সাইকেল ঠেলিতে ঠেলিতে অতিকষ্টে পথের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পথের উপর দিয়াই যাইতে লাগিল। এখন আর তাহার দ্রুত গমনের চেষ্টা নাই, কোন রূপে পতন বাঁচাইয়া অগ্রসর হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল না, কিছু দূর যাইতে-না-যাইতেই সাইকেল সহ একটা অগভীর গর্ত্তে পড়িয়া জামাকাপড় সমস্ত কাদায় মাখামাখি হইয়া গেল, সুখের বিষয় সাইকেলের আলোকটি নিবিয়া যায় নাই। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সাইকেল ঠেলিতে ঠেলিতে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিল, আবার পতনের ভয়ে সাইকেলে উঠিতে সাহস করিল না। কাদায় পড়িয়া যাওয়াতে তাহার গরদের পাঞ্জাবী ও ফরাসডাঙার ধুতির যে কি অবস্থা হইয়াছে, অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইল না।

সাইকেল ঠেলিতে ঠেলিতে আর কিছু দূর গিয়া তাহার বোধ হইল যে পথের দক্ষিণ পার্শ্বে যেন একখানা চালা ঘর রহিয়াছে। আশ্রয়ের আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে পথ ছাড়িয়া সেই চালাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া দেখিল চালা বটে তবে ঘর নহে, কারণ তাহার কোন দিকে প্রাচীর নাই। না থাকুক, বৃষ্টি হইতে আপাততঃ রক্ষা পাওয়া যাইবে ত। রমেশ সাইকেল সহ সেই চালায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাইকেলের আলোকে দেখিল একখানি নহে, সারি সারি পাঁচ-ছয় খানি সুদীর্ঘ চালা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নির্ম্মিত। দেখিয়াই বুঝিল যে এইখানে হাট হয়। যখন হাট রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই নিকটে গ্রাম আছে। সে একটা খুঁটিতে সাইকেলটা ঠেস দিয়া রাখিয়া আর একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল; বস্ত্র মলিন হইবার ভয় নাই; কারণ, বিধাতা পূর্ব্বে তাহাকে পথের কাদায় ফেলিয়া তাহার সে আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন।

রমেশ যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পকেট হইতে সিগারেট কেস ও দিয়াশলাই বাহির করিল, কিন্তু দিয়াশলাই জ্বলিল না, ভিজিয়া গিয়াছিল। সিগারেটগুলা কেসের মধ্যে থাকাতে সম্পূর্ণ ভিজিয়া যায় নাই; তখন রমেশ সাইকেলের আলোতে একটা সিগারেট ধরাইয়া মুখে দিল এবং সিক্ত পাঞ্জাবী ও গেঞ্জি খুলিয়া সাইকেলের উপরে, শুকাইবার জন্য ছড়াইয়া দিল, পরিধেয় বস্ত্রটা বেশ করিয়া নিংড়াইয়া ঝাড়িয়া পরিল এবং আবার সেই খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল। সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিবার সময় হাতঘড়িতে দেখিল, এগারটা বাজিয়া বাইশ মিনিট। সে ভাবিতে লাগিল এত রাত্রে, এই দুর্য্যোগে কোথায় আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিবে? সে-চেষ্টা না করিয়া এইখানে বসিয়াই রাত্রিটা কাটাইয়া দিবে। আর পাঁচ ঘণ্টা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরেই, রাত্রি প্রভাত না হইলেও অন্ধকার তরল হইয়া আসিবে, সেই সময় সে মেমারি অভিমুখে যাত্রা করিবে, এই কর্দ্দমাক্ত পরিচ্ছদে আর শ্বশুরবাড়ী যাইবার চেষ্টা করিবে না। রমেশ এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় সাইকেলের আলোটা দুই-তিন বার খাবি খাইয়া নিবিয়া গেল। রমেশের মনে হইল চারি দিক হইতে জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল। এমন ভীষণ অন্ধকার পূর্ব্বে সে কখনও দেখে নাই। বৃষ্টির বিরাম নাই।

রমেশ ভূতের ভয় করিত না, মানুষ মরিয়া ভূত হয়, সে শুনিয়াছিল, কিন্তু ভূতযোনিতে বিশ্বাস করিত না। আজ এই নিবিড় অন্ধকারে, জনহীন স্থানে একাকী বসিয়া আছে, এমন সময় সহসা যদি একটা বিকট মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সে কি করিবে? সে কি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবে? কেহ কি তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে? শুনিতে পাইলেই বা কে তাহার কাছে আসিবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ

চকিত হইয়া উঠিল, তাহার সংজ্ঞালোপের উপক্রম হইল। দারুণ পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় রমেশের শরীর ও মন পূর্ব্ব হইতেই অবসন্ন হইয়াছিল, সে আর চিন্তা করিতে পারিল না, সেইখানেই ভূমিতলে শয়ন করিয়া অল্পক্ষণ পরে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

৪

"ও মশাই শুনছেন? আপনার বাড়ী কোথা? কোথায় যাবেন?"

প্রশ্নকর্ত্তার করস্পর্শে রমেশের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে প্রথমে বুঝিতে পারিল না যে সে কোথায় রহিয়াছে। আগন্তুক দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিলে রমেশ চক্ষু চাহিয়া দেখিল এক জন গৌরবর্ণ ভদ্রলোক তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। রমেশ তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল এবং নমস্কার করিয়া বলিল, "রাত্রিতে সেই ভীষণ বৃষ্টির সময় পথের সন্ধান করিতে না পারিয়া এইখানে আশ্রয় লইয়াছিলাম। এটা কোন্ গ্রাম?"

ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, "সাতগেছে। আপনি কোথায় যাইবেন?"

রমেশ বলিল, "এই দিকে কোথায় বেগুনে ব'লে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামে যাইব বলিয়া আসিয়াছিলাম। এ অবস্থায় আর সেখানে যাইব না, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমার বাসাতে আসুন, সেই খানে আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিব।"

"আপনার বাসা কত দূর?"

"এই যে হাটের পাশেই, আসুন।"

রমেশ তাহার গেঞ্জি ও পাঞ্জাবীটা কাঁধের উপর ফেলিয়া সাইকেলখানা ঠেলিতে ঠেলিতে আগন্তুকের সহিত তাঁহার বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একখানা কালো রঙের তক্তায় বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "সাতগেছিয়া পুলিস আউট-পোষ্ট।" রমেশ বলিল, "এটা থানা? আপনি কি পুলিস অফিসার?"

ভদ্রলোকটি অভিবাদন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমি এই থানার দারোগা। আপনি বেগুনেতে কার বাড়ী যাইতেছিলেন?"

"ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী।"

"রায়-সাহেবের বাড়ী? তিনি আপনার কেহ হন নাকি?"

"তিনি আমার শ্বশুর।"

"সুভান আল্লা! আপনি রায়-সাহেবের জামাতা? শ্বশুরবাড়ীর পাশে আসিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে আপনাকে হাটতলায় বসিয়া কাটাইতে হইল? কি গ্রহ! মহাশয়ের নাম?"

রমেশ নিজের নাম বলিয়া দারোগা সাহেবের নামধাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার নাম মহম্মদ আফতাবুদ্দীন চৌধুরী।"

রমেশ বলিল, "আপনি মুসলমান? আমি আপনাকে বাঙালী মনে করিয়াছিলাম—"

রমেশের কথায় বাধা দিয়া দারোগা সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের মত ইয়ং ম্যান সেকালের বৃদ্ধদের সংস্কার হ'তে মুক্ত হ'তে পারেন না, এ বড় আশ্চর্য্য! আমি মুসলমান ব'লে যদি বাঙালী না হই, তা হ'লে আপনি হিন্দু হয়ে নিজেকে বাঙালী বলেন কিরূপে? আমরা পুরুষানুক্রমে বাঙালী, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই খাঁটি বাঙালী, আপনারই মত।"

রমেশ লজ্জিত হইয়া করজোড়ে বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করবেন।"

দারোগা সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ক্ষমা করতে পারি, যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন।"

"নিশ্চয়ই। কি করতে হবে বলুন।"

দারোগা সাহেব "গোব্‌রা" বলিয়া হাঁক দিবা মাত্র নীল পাগড়ী ও নীল জামাওয়ালা একজন চৌকিদার সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া আভূমি প্রণত সেলাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইলে দারোগাবাবু বলিলেন, "এই বাবু মুখ-হাত ধোবেন, এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যা" এই বলিয়া টেবিলের টানা হইতে এক বাক্স সিগারেট বাহির করিয়া রমেশের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "চলে?"

রমেশ হাসিমুখে "থ্যাঙ্কস্" বলিয়া একটি সিগারেট লইয়া গোবর্দ্ধনের সঙ্গে চলিয়া গেল। প্রায় মিনিট পনর পরে রমেশ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, টেবিলের উপর একখানা সুশুভ্র ধুতি, একটা পাঞ্জাবী ও একটা গেঞ্জি রহিয়াছে। রমেশকে দেখিয়া দারোগা সাহেব বলিলেন, "আসুন, কাপড় ছাড়ুন।"

বস্ত্রাদি দেখিয়া রমেশ সহাস্যে বলিলেন, "এ সব করেছেন কি? কাপড় ছাড়বার প্রয়োজন নাই, আমি এখনই কলিকাতায় যাইব।"

"যাইতে দিলে ত? জানেন আপনি পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছেন, সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন মনে করিয়াছেন? নিন্, আগে কাপড় ছাড়ুন। গোব্‌রা, আমার চা এইখানে পাঠিয়ে দিতে বল, আর এই বাবুর জুতাজোড়াটা বেশ ক'রে মুছে সাফ ক'রে কালি দিয়ে দে।"

গোব্‌রা জুতা লইয়া চলিয়া গেল; রমেশ কাঁদামাখা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দারোগার আনীত গেঞ্জি ও পাঞ্জাবী পরিধান করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলে দারোগা সাহেব বলিলেন, "আপনি হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, আপনার সঙ্গে আমার কুটুম্বিতা আছে, আপনি আমার শালীপতিভাই।"

রমেশ হাসিয়া বলিল, "কি রকম?"

"আপনার শ্বশুর ও আমার শ্বশুর এক স্কুলে এক ক্লাসের ছাত্র। শুনেছি তাঁরা দু-জনে ছেলেবেলা থেকে হুগলী কলেজে একসঙ্গে পড়তেন, দুই জনেই একসঙ্গে হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেন। আরও মজার কথা, দুই জনেই একসঙ্গে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি পরীক্ষা দিয়া একসঙ্গে চাকরি আরম্ভ করেন। আপনার শ্বশুর মহাশয় ভাগলপুরে এখন যে কাজে আছেন, আমার শ্বশুরও ঢাকাতে ঠিক সেই কাজই করেন।"

রমেশ বলিল, "তাঁর নাম কি?"

"খানসাহেব ইয়াকুব মহম্মদ।"

এমন সময় দারোগা সাহেবের একটি দশ-এগার বৎসরের মেয়ে দুই হাতে দুই কাপ চা এবং একটি বছর-আষ্টেকের ছেলে একখানা ডিশে করিয়া চারিটি সন্দেশ লইয়া প্রবেশ করিল এবং টেবেলের উপর চা ও সন্দেশ রাখিয়া দিল। দারোগা সাহেব কন্যাকে বলিলেন, "আমিনা, এঁকে সেলাম কর, ইনি তোমার মেসো হন; বেগুনেতে তোমার যে পারুল-মাসীমা আছেন, তাঁর বর।"

বালক ও বালিকা রমেশকে সেলাম করিলে রমেশ উভয়কে কাছে টানিয়া একটু আদর করিয়া দারোগা সাহেবকে বলিল, "শুধু চা-ই যথেষ্ট, আবার সন্দেশ কেন?"

"সমস্ত রাত্রি ত অনাহারে কেটেছে—"

"ঠিক অনাহারে নয়, কাল সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান স্টেশনে পেট ভরিয়া খাবার খাইয়াছিলাম।"

"বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিলেন। চলুন চা খেয়ে আপনাকে রায়-সাহেবের বাড়ীতে রেখে আসিগে, আটটার সময় আমার চাকরি আরম্ভ হবে।"

"আমি ভাবছিলেম ওখানে আর যাব না।"

"তা কি হয়, রায়-সাহেব জানতে পারলে আমাকে ক্ষমা করবেন না। ওরে গোব্‌রা, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি, তুই এই বাবুর কাদামাখা জামাকাপড় নটবর রজকের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমার নাম ক'রে বলিস যে আজ বৈকালেই চাই।"

থানার বাহিরে আসিয়া দারোগা সাহেব বলিলেন, "কাল আপনাদের জামাই-ষষ্ঠী গিয়াছে না? এবারে আপনার আর জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হইল না, জামাই-সপ্তমীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করুন।"

রমেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেগুনে কোন্ দিকে? কত দূর?"

"এই পথের পূর্ব্ব দিকটা সাতগেছে, আর পশ্চিম দিকটা বেগুনে, ঐ যে রায়-সাহেবের বাড়ীর ছাদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।"

* * *

রমেশ কলিকাতায় ফিরিয়া দুই মাস মতির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিল।

নির্মোক

"বনফুল"

১

সুপ্রিয়া সরকারকে ইনজেকশন দিতে গিয়া বিমল দেখিল বাহিরের ঘরটাতে এক সুব্রতবাবু ছাড়া আর কেহ নাই। এই শীর্ণকায়, উন্নতনাসা লোকটাকে দেখিলে বিমলের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। সুব্রতবাবু পড়িতেছিলেন, বিমলকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া আসিলেন,—ও আপনি এসে গেছেন। সুপ্রিয়ারা এখানে কেউ নেই, সব হীরালালবাবুদের বাড়ীতে গেছে। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন, আজ সেটা আমরা আন্দাজই করতে পারি নি। বসুন, খবর পাঠাই একটা—

বিমল উপবেশন করিল, সুব্রতবাবু বাহির হইয়া গেলেন। ভদ্রলোকের কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে বেশ সুমার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, লেখাপড়াও জানেন, প্রথম শ্রেণীর এম. এ. যখন, নিশ্চয়ই জানেন, অথচ কেমন যেন একটা শ্রীহীন ভাব ভদ্রলোকের! দেখিলেই মন বিমুখ হইয়া যায়। একটি চাকরকে বাইসিকেল-পৃষ্ঠে রওনা করিয়া দিয়া সুব্রতবাবু আবার আসিয়া বসিলেন।

—আচ্ছা, সুপ্রিয়াকে কি রকম দেখছেন বলুন ত! কাল আবার প্যালপিটেশন হয়েছিল খুব।

—তাই না কি?

বিমল চিন্তিত হইয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

সুব্রতবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—ওর অসুখটা কি বলুন ত?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—একটা কথা বলব যদি কিছু না মনে করেন!

—কি বলুন।

—আপনার স্ত্রীর সন্তান না হ'লে অসুখ সারবে না।

সুব্রতবাবু খানিকক্ষণ বিমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—কিন্তু মুশকিল এই যে সুপ্রিয়া ছেলে চায় না!

—কেন?

সুব্রতবাবু ইহার উত্তরে অনেকক্ষণ কিছু বলিলেন না, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা একটু হাসিয়া বলিলেন—আমার বিয়ে করাই ভুল হয়েছিল।

বিমল মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অজ্ঞাতসারে হয়ত কোন বেদনার স্থানে আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে। তবু সে প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না।

—কি হিসেবে ভুল বলছেন?

—সে আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি ঘর-জামাই নন!

সুব্রতবাবু যে ঘর-জামাই বিমল তাহা জানিত না, মনে মনে বিস্মিত হইয়া গেল। বাহিরে কিন্তু হাসিয়া বলিল—তাতে কি হয়েছে!

—অনেক কিছু হয়েছে। তার জন্যেই সুপ্রিয়া ছেলে চায় না, বলে শঙ্করাকে ডেকে আর দরকার নেই, নিজেদের ঠাঁই হয়েছে তাই যথেষ্ট!

বিমল বলিল—বেশ তা আলাদা থাকুন আপনারা, এখানে থাকবার দরকার কি?

সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া সুব্রতবাবু বলিলেন—চেষ্টা করছি না ভাবছেন, কিন্তু হচ্ছে না—কিছুতেই একটা চাকরি জোটাতে পারছি না। এম. এ.তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েও কিছু সুবিধে হয় নি। একটা কলেজে চাকরি খালি হয়েছে, দরখাস্ত ত করেছি, দেখি যদি হয়। ভরসা কিছু নেই, জীবনে অনেক দরখাস্তই করেছি অনেক জায়গায়।

সুব্রতবাবু হাসিলেন। করুণ হাসি!

—কোন্ কলেজে?

সুব্রতবাবু কলেজের নাম বলিলেন। কি আশ্চর্য্য বিমলের শ্বশুরই যে-সে কলেজের প্রিন্সিপাল! সেকথা বলিতেই সুব্রতবাবুর চোখে মুখে যেন আলো জ্বলিয়া

উঠিল। অবিন্যস্ত কেশভার বাঁ-হাত দিয়া কপালের উপর হইতে সরাইয়া তিনি বলিলেন—একটু চেষ্টা করবেন দয়া ক'রে!

—নিশ্চয়! কলেজ-কমিটির আরও দু-এক জনের সঙ্গে আলাপ আছে আমার, কালই চিঠি লিখব আমি।

—চলুন না যাই এক দিন। চিঠিপত্তর লিখে এ-সব ব্যাপার তেমন ঠিক হয় না। সুপ্রিয়াকে আর এক বার কলকাতা নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিল, চলুন না সব যাই একসঙ্গে।

—যাওয়া মুশকিল।

—না না, চলুন ডাক্তারবাবু প্লীজ—

দুই হাত দিয়া সুব্রতবাবু বিমলের হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিলেন। শীর্ণ শিরাবহুল হাত দুইখানার দিকে চাহিয়া বিমল "না" বলিতে পারিল না। বলিল—চেষ্টা করব। ছুটি না পেলে ত যেতে পারি না। আমারও ত চাকরি—

—আপনার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবার ভার আমি নিচ্ছি। কাকাবাবু ঐ ওধারের বারান্দায় আছেন, চলুন তাঁকে গিয়ে এখুনি বলি,—তিনি চেষ্টা করলে হয়ে যাবে।

—সৌরীনবাবু আছেন না কি বাড়ীতে?

—আছেন। আসুন।

সুব্রতবাবুর পিছনে পিছনে বিমল বারান্দায় গিয়া হাজির হইল। বারান্দার এক প্রান্তে একটি সুদৃশ্য চেয়ারের উপর সিগার-হস্তে সৌরীনবাবু বসিয়া ছিলেন, সম্মুখে একটি মিস্ত্রি বসিয়া কি যেন প্রস্তুত করিতেছে। পদশব্দ শুনিয়া সৌরীনবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইলেন এবং বিমলকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—আসুন আসুন, কতক্ষণ এসেছেন, ওরে ফকির চেয়ার বার কর।

বিমল দেখিল প্রকাণ্ড একটা খাঁচার মতন কি যেন প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ছোটবড় নানা মাপের এতগুলো আয়না কেন! গোল, তিন-কোণা, চৌকোণা নানা রকম আয়না।

—এ-সব কি?

সৌরীনবাবু সিগারে মৃদুগোছের একটা টান দিয়া বলিলেন—আর কিছু নয়, আমাদের হীরেমনটার মাথা খাবার চেষ্টা করছি!

—তার মানে?

—তার মানে ওর একটা বড়গোছের খাঁচা তৈরি করিয়ে তাতে নানা রকম আয়না 'ফিট' ক'রে দিচ্ছি। মানুষের সঙ্গে যখন বাস করছে তখন অতটা নিশ্চিন্ত ওকে থাকতে দেব কেন? কি বল সুব্রত! নিজেরই ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া ভাব যা হোক একটা কিছু করুক, আমরা দেখি। পাখীর মুখে কেষ্ট-নাম শুনে কি আর চারটে হাত বেরবে! তার চেয়ে ও যদি আয়নায় নিজের ছায়াটার সঙ্গে ঝাপটাঝাপটি করে, দেখে সুখ হবে খানিকটা! কি বলেন ডাক্তারবাবু!

ভদ্রলোকের উদ্ভাবনীশক্তি দেখিয়া বিমল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল!

সৌরীনবাবু বলিলেন—শুধু নিজের ছায়াই নয়, বাইরের অনেক কিছু দেখেও অকারণে ভয় পাবে কিংবা খুশী হবে। বেরালের ছায়া দেখে ভাববে, ওই রে বুঝি বেরাল খাঁচার ভেতরে ঢুকেছে—প্রাণপণে চেঁচাবে। অন্য একটা পাখীর ছায়া পড়লে আশ্চর্য্য হয়ে ভাববে, এ আবার কোথা থেকে এল! কিংবা হয়ত কিছুই করবে না, মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকবে—দেখাই যাক্। নানা রকম আয়না ত এনে জোটানো গেছে! ও যদি একদম কিছুই না করে তাহলে আপনাকে একদিন 'কল' দিতে হবে!

—আমাকে? কেন।

—ওকে তাহলে একটু মদ খাওয়াব, মাত্রাটা ঠিক ক'রে দেবেন আপনি! সুস্থমস্তিষ্কে যদি ও কিছু না করে, মাতাল হ'লে করতে পারে!

—পাখীটাকে শুধু শুধু ব্যতিব্যস্ত করছেন কেন?

—কারণ আমি মানুষ!

সৌরীনবাবুর সমস্যা এবং সুব্রতবাবুর সমস্যা এতই বিভিন্ন রকমের যে সুব্রতবাবুর কথাটা চট্ করিয়া পাড়া গেল না। বদিবাবুর কথাটাও বিমলের মনে পড়িল। পাঁচ রকম কথায় পাছে কথাটা ভুলিয়া যায় সেই জন্য বলিল—আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

—কি বলুন।

—এবার মিউনিসিপাল মিটিঙে আপনার ভোটটা নন্দীমশায়কেই দেবেন।

—বেশ, ফকির আমার ডায়েরিটা নিয়ে এস ত। কবে মিটিং?

—২৭শে।

ফকির নামক ভৃত্যটি ডায়েরি আনিল, সৌরীনবাবু লিখিয়া লইলেন।

বিমল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বিষয়ে ভোট, কিসের মিটিং কিছুই জিগ্যেস করলেন না যে বড়!

—আজ পর্য্যন্ত জীবনে কোন জিনিসের ভালমন্দ বিচার ক'রে ভোট দিই নি। বরাবর অনুরোধে পড়ে দিয়েছি। যে প্রথমে অনুরোধ করে তাকেই ভোট দিই, যদি কেউ অনুরোধ না করে কোন পক্ষেই দিই না। কি বিষয় কি বৃত্তান্ত তা নিয়ে মাথা-ঘামানো সুতরাং বৃথা। সবারই বোধ হয় আমার মত দশা; এ যুগে স্নেহের বরং চোখ আছে, ভোট একেবারে অন্ধ!

মোটর থামিবার শব্দ পাওয়া গেল এবং ক্ষণপরেই সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়ার মা ও সুধীর আসিয়া হাজির হইলেন। সুপ্রিয়ার মায়ের হাতে অসমাপ্ত সোয়েটারটা রহিয়াছে, এখনও শেষ হয় নাই। সেটার দিকে চাহিয়া সৌরীনবাবু মন্তব্য করিলেন, ওটা শেষ হ'লে কি করবে বউদি ভেবে রাখ এখন থেকে! আমার মোজা, কমফর্টার, সোয়েটার, সুপ্রিয়ার ব্লাউস, মাফলার সব ত হ'ল, সুব্রতরও ত কি একটা হয়েছে!

ভগবতী দেবী দেবরের এ-সব মন্তব্যের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না, তিনি একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন এবং আপন মনে বুনিতে লাগিলেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—আমার যদি বুদ্ধি নাও একটা নতুন জিনিস বাতলাতে পারি। এই সোয়েটারটা হয়ে গেলে উল-টুলের ভেতর আর যেও না তুমি! আমাদের যে ঐ গ্রামোফোনটা আছে, নিছক গান শোনান ছাড়া ওটার ত আর কোনই কাজ নেই, ঐ মেশিনটাকে যদি কোন কাজে লাগাতে পার মন্দ হয় না। ধর যদি ওতে আরও কিছু জুড়ে-টুড়ে এমন করা যায় যে দম দিয়ে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে গানও হবে, সঙ্গে ঘোল মওয়াও হবে, কিংবা ঐ রকম একটা কিছু—

ভগবতী দেবী উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রিয়া বলিলেন—কি যে আপনি কাকাবাবু, খালি খালি মাকে রাগাবেন!

সৌরীনবাবু বলিলেন—তোরা বুঝিস না, ওতে তোর মা খুশী হয়। না করলেই চটে যাবে। বাল্যকাল থেকে এ-কাজ করছি, আমাদের দু-জনের পরিচয় প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী যে, সে-কথা ভুলে যাস কেন!

বিমল বলিল—চলুন আপনার ইনজেকশনটা সেরে ফেলি।

—আপনাদের জ্বালায় আর পারি না আমি।

সৌরীনবাবু ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চক্ষু বুজিয়া সিগারে একটি মৃদু টান দিলেন।

ইনজেকশন শেষ করিয়া বিমল বাহিরে আসিতেই সৌরীনবাবু বলিলেন—সুব্রত কাজের লোক হয়ে উঠতে চাইছে, শুনেছেন?

—শুনেছি।

—এটা অহমিকার লক্ষণ, সুতরাং দুর্লক্ষণ, কি বলেন?

বিমল কিছু বলিল না, একটু হাসিল মাত্র।

—শুধু হাসলে চলবে না; হাঁ-না কিছু একটা বলুন, তর্ক অন্ততঃ একটা জমে উঠুক। বসুন।

বিমল বলিল—না আর বসব না, কাজ আছে আমার!

—কাজের লোক হওয়ার এই একটা প্রধান দোষ; সুব্রতও দিনকতক পরে ওই হয়ে পড়বে!

বিমল বলিল—সুপ্রিয়ার অসুখ সারাবার জন্যেই সুব্রত-বাবুর চাকরি নেওয়া উচিত!

—মানে, ইনজেকশনে কিছু হবে না?

—আমার ত মনে হয় না!

সৌরীনবাবু হতাশভাবে বলিলেন—ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের উপর ত হাত নেই!

সুপ্রিয়া সরকারকে ইনজেকশন দিয়া বিমল হীরালাল-

বাবুর ওখানে গিয়াছিল। সেখানে হীরালালবাবু এবং মতিলালবাবুর ইনজেকশন দেওয়ার কথা ছিল। ইনজেকশনেরই যুগ পড়িয়াছে! ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইন্‌জেকশন দিতে হয়। হীরালালবাবু ইনজেকশন লইয়া অনেকটা ভাল আছেন, কিন্তু মতিবাবুর ত কোন উন্নতিই হইতেছে না। ভদ্রলোকের ওখানে বেশীক্ষণ বসিতে ইচ্ছা করে না, অথচ ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়িতে চান না। এই কুষ্ঠরোগীদের অপরের সহিত মাখামাখি করিবার দিকে কেমন যেন একটা ঝোঁক আছে! কত রকম লোকের সহিতই ডাক্তারদের রোজ সাক্ষাৎ হয়, কত রকম লোকের কত রকম সমস্যা। সুপ্রিয়া, সুব্রত, সৌরীনবাবু, ভগবতী দেবী, নন্দীমহাশয়, অমর, বিনোদিনী প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সমস্যা! রাস্তায় ধুলা উড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে, নিদাঘ দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছে, বিমল একা বসিয়া ভাবিতেছে, বুক-পকেটটা টাকার ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সহসা বিমলের নজরে পড়িল ডান দিকের মাঠে গাছতলায় একটা লোক যেন পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটা যে আরাম করিয়া এই দুপুরে ওখানে শুইয়া আছে তাহা ত মনে হয় না। শুইবার ভঙ্গীটাও কেমন যেন অস্বাভাবিক, যেন মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে! বিমল মোটর থামাইতে বলিল। কাছে গিয়া যাহা সে দেখিল তাহাতে সে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। প্রচুর রক্ত জমিয়া শুকাইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই উপর মুখ গুঁজিয়া জরাজীর্ণ অস্থিপঞ্জরসার একটা লোক উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত, এই উত্তপ্ত নিষ্করুণ ধরণীকেই সে দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বিমল একটু ঝুঁকিয়া তাহার নাড়ীটা দেখিল—কোন স্পন্দন নাই! আর একটু ঝুঁকিয়া বাঁ-হাত দিয়া তাহার মাথাটা সরাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, দেখিয়া চেকাইয়া উঠিল! এ কি, এ যে সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখারী বুড়োটা যাহাকে সে এক দিন চড় মারিয়া হাসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল! ভিখারীর সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে! অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিবে, কি করিবে কিছুই তাহার মাথায় আসিল না। সহসা তাহার চমক ভাঙিল। ড্রাইভারটা বলিতেছে—ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে ওর!

—মরে গেছে!

ড্রাইভার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তাহলে আর কি হবে! চলুন। আমাকে আবার চারটের সময় সোয়ারি দিতে হবে। দিদিরা সতীশবাবুর ওখানে যাবেন, সেখানে জলসা আছে!

ঠিক তো! তাহারও সেখানে নিমন্ত্রণ আছে। কলিকাতার এক বিখ্যাত নর্ত্তকী মাত্র এক রাত্রির জন্য আসিয়াছেন!

মোটরে উঠিয়া বিমল বলিল—জোরে চালাও।

আইনতঃ তাহার থানায় খবর দেওয়া উচিত, থানার দারোগার উচিত মৃতদেহটাকে সদরে পাঠানো, সদরের ডাক্তারের উচিত মৃতদেহটাকে চিরিয়া ফাড়িয়া একটা সন্তোষজনক বিবৃতি প্রকাশ করা। শিয়াল-কুকুর-শকুনিতে ছেঁড়াছিঁড়ি না করিয়া এক জন কৃতবিদ্য ডাক্তার সেটা করিবে, হয়ত কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। তবু বিমল মোটর হইতে নামিয়া ড্রাইভারটার হাতে দশ টাকার একখানা নোট দিয়া বলিল—এই টাকা দশটা নিয়ে তুমি ওই লোকটা যাতে গঙ্গা পায় তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিও।

ড্রাইভার একটু বিস্মিত হইয়া গেল।

বিমল বলিল—হীরালালবাবুকে আমার নাম ক'রে ব'লো, তিনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। খবরটা আমিই দিচ্ছি! ওতে কুলুবে ত?

ড্রাইভার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—টাকাটা আপনি রাখুন ডাক্তারবাবু, আমি টাকা নিয়েছি শুনলে ছোটবাবু আমার ওপর রাগ করবেন।

—না, না কিছু না, আমার নাম ক'রে ব'লো তুমি।

বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া পারঘাটার নৌকায় চড়িল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল আর এক সমস্যা! মণিমালার পা পুড়িয়া গিয়াছে। ফুটন্ত দুধের কড়াটা নামাইতে গিয়া হাত ফসকাইয়া এই কাণ্ড। আরও এক মুশকিল হইয়াছিল, ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। জগদীশবাবু,

ভূধরবাবু সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, অবশেষে রেলের ডাক্তার জগুবাবু আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, দুলু নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাঁহাকেই ডাকিয়া আনিয়াছিল। বিমল দেখিল জগুবাবু সুব্যবস্থাই করিয়াছেন, এমন কি ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক একটা সিরাম পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন। সবই হইয়াছে, কিন্তু বিমল মনে মনে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। রাঁধুনী বামুন রাখা লইয়া মণির সহিত তাহার গোড়ায় গোড়ায় বেশ ঝগড়া হইয়া গিয়াছিল, বিমল ইচ্ছা করিয়াই রাঁধুনী রাখে নাই, দুই জনের মাত্র রান্না তাহার জন্যও রাঁধুনী! তাহার চেয়ে হোটেল হইতে আনাইয়া খাইলেই হয়। মণি যে হঠাৎ পুড়িয়া যাইতে পারে এ সম্ভাবনাটার কথা তাহার মনেই হয় নাই। তাহার উপর সে অন্তঃসত্ত্বা! বিমল বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। যদিও জ্বালা অনেকটা কমিয়াছে, তবু নানা রকম উপসর্গ হইতে পারে। মণির দিকে বিমল চাহিয়া দেখিল, মণির চোখে একটা দুষ্টুমিভরা হাসি উঁকি দিতেছে, ভাবটা যেন, রাঁধুনী রাখতে চাও নি যে, কেমন হয়েছে এবার! [ক্রমশঃ

রাত্রি

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কুসুমের পথ চিতাভস্মেতে শেষ
কুসুম-স্বপ্ন তবু তো দিয়েছ তুমি।
বৈকালী-মেঘে দিনগুলি মুছে গেল
আঁধারে নীরব রাত্রির বনভূমি।
ঝরা বকুলের নিবিড় আলিঙ্গনে
কুসুম-স্বপ্ন তবু তো দিয়েছ তুমি।

স্ফটিক-প্রাসাদে বাজাবে কি কিঙ্কিণী
স্ফটিক-স্বচ্ছ দিনে?
জীবনের শেষে কুসুমের সমারোহে
আসিবে কি পথ চিনে?
এখানে নীরব দীঘল দীঘির মায়া
জলজ কুসুমে ভাসে বুঝি ওফেলিয়া!

কবরের মাটি আজো তো দেখিয়ে দেয়
কঙ্কাল কত, কত ভাঙা হাড়, খুলি:
কবরের মাটি চাপা দিল পদরেখা
কবরের মাটি ভরেছে স্মৃতির ঝুলি।
তবুও তো আমি এক রাত্রির রাজা
একটি রাত্রি তুমিই তো দিয়েছিলে।

স্মৃতির দীঘল দীঘিতে রাতের ছায়া
জলজ কুসুমে ভাসে বুঝি ওফেলিয়া!

সারাদিন দেখি মেঘেদের আলপনা:
কখনো পাহাড়, কখনো প্রাসাদ, হ্রদ;
নীচে পৃথিবীতে দেবতার জুয়াখেলা
মানুষেরা শুধু দেবতার সম্পদ।
অতিথি তারারা স্বপ্নের পরী যেন
মিলায় কোথায়। দিনগুলি চোরাবালি।
তুমি করেছিলে এক রাত্রির রাজা
অজগর মেঘ তাই কি দিয়েছে সাজা?

স্ফটিক-প্রাসাদে বাজিবে না কিঙ্কিণী
সে-কথা তো আমি জানি;
কুসুমের পথ স্বপ্নে যে নয় শেষ
সে-কথা তো আমি মানি।
তবু শরতের মেঘেদের আলপনা:
প্রাসাদ, পাহাড়, হ্রদ—
ব্যবসায়ে আজ মূলধন বেশী নয়:
রাত্রির সম্পদ।

বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রাচীন মঠ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পদ্মা নদীর মধ্য দিয়া ষ্টীমার-যোগে যাঁহারা গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৃষ্টি প্রায়ই পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী কোন মঠ বা মন্দিরের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। কোনটি অতি কাছে, কোনটি বা দূরে আম হিজল সুপারি ও বাঁশ গাছের আড়াল দিয়া তাহাদের উচ্চ চূড়া দেখাইয়াই আবার অদৃশ্য হইয়া যায়। কি উত্তর-বিক্রমপুর, কি দক্ষিণ-বিক্রমপুর সর্ব্বত্রই মঠের সংখ্যা খুব বেশী। বরিশাল, ময়মনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও অবশ্য মঠ আছে, তবে বিক্রমপুরের ন্যায় সংখ্যায় এত অধিক নহে।

এক সময়ে আমরা রাজাবাড়ীর মঠ দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম যে বাসগ্রামের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছি, কিন্তু পদ্মার ভীষণ আক্রমণে আজ কয়েক বৎসর হইল রাজাবাড়ীর মঠ চিরদিনের জন্য পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। উত্তর-বিক্রমপুরের অনেক প্রাচীন ও আধুনিক মঠও একে একে পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বাংলা দেশের মঠ ও মন্দিরের গঠনের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য আছে। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে যে-সকল মঠ ও মন্দির দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কোনটি উচ্চচূড় ত্রিকোণাকৃতি, কোনটি দোচালা ঘরের মত, কোনটি একচূড়, কোনটি পঞ্চচূড়, কোনটি বা একবিংশচূড়—যেমন মহারাজা রাজবল্লভ-নির্ম্মিত পঞ্চরত্ন মঠ, নবরত্ন মঠ, একবিংশরত্ন মঠ প্রভৃতি ছিল। মঠগুলি বেশীর ভাগই ইষ্টক-নির্ম্মিত। দোচালা ঘরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মন্দিরগুলিও ইষ্টকগঠিত। বিক্রমপুরে প্রস্তরনির্ম্মিত কোনও মন্দির বর্ত্তমানে কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। এক সময়ে যে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীর চারি দিকের সীমা-মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আমরা পাই। প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরসমূহের স্তম্ভ, সোপানাবলী ইত্যাদি বিক্রমপুরের নানা স্থান হইতে মৃত্তিকা খননে পাওয়া যাইতেছে। তাহার কিছু কিছু ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বিক্রমপুরের স্তূপসমূহ এবং দেউলবাড়ী ও দীঘি-পুষ্করিণী খননের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিনিস আবিষ্কৃত হইয়া বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিবে বলিয়া মনে করি।

বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে অবস্থিত সমুদয় মঠের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে, এজন্য অল্প কয়েকটি মঠ ও মন্দিরের পরিচয় দিতেছি।

সতীঠাকরুণের মঠ

বাংলা দেশে এক সময়ে সতীদাহ-প্রথা বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালের শেষ ভাগ হইতেই সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা হইতে থাকে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল বাংলা ১২১৬ সালের ২৭শে চৈত্র রবিবার শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের দ্বিতীয়া পত্নী অলকামঞ্জরী বা অলকমণি স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। রামমোহনের প্রাণে ইহাতে অত্যন্ত বেদনা লাগিয়াছিল, তিনি এইরূপ মৃত্যুকে হত্যা বলিয়া উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে "সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব" বাংলায় প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরের ৩০শে নবেম্বর উহা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল। সে সময় হইতেই সহমরণ-প্রথা নিবারণকল্পে মহাত্মা রামমোহন যেরূপ শ্রম ও যত্ন করিয়া এই কুপ্রথা নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। "সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব" বহিখানি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হয়ত সঠিক তথ্য দিতে পারিবেন।

ঢাকা বিভাগে ১৮১৫ সালে ৩১ জন, ১৮১৬ সালে



মেঘমল্লার

শ্রীকমলকুমার সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

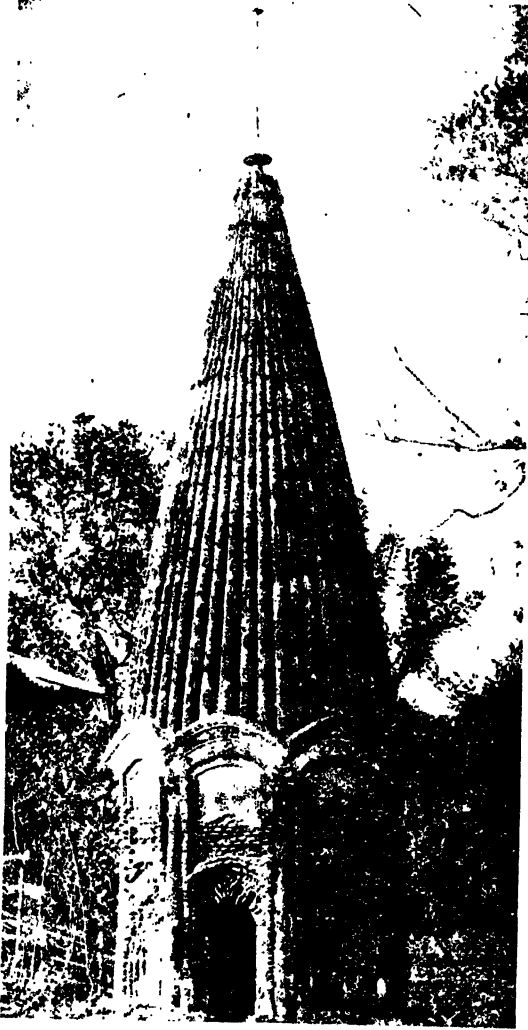
২৪ জন, ১৮১৭ সালে ৫২ জন, ১৮১৮ সালে ৫৮ জন, ১৮১৯ সালে ৫৫ জন, ১৮২০ সালে ৫১ জন, ১৮২১ সালে ৫২ জন, ১৮২২ সালে ৪৫ জন, '১৮২৩ সালে ৪০ জন, ১৮২৪ সালে ৪০ জন, ১৮২৫ সালে ১০১ জন, ১৮২৬ সালে ৬৫ জন, ১৮২৭ সালে ৪৯ জন এবং ১৮২৮ সালে ৪৭ জন মহিলা সহমৃতা হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিক্রমপুরের মহিলাদের মধ্যেই সহমরণের সংখ্যা ছিল বেশী। আমরা শৈশবে সহমৃতা মহিলাদের সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক গল্প শুনিয়াছি। বিক্রমপুরের কোন কোন গ্রামে অদ্যাপি সহমরণের স্মৃতিজ্ঞাপক মঠ ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যে বেজগাঁ গ্রামের সতীঠাকরুণের মঠটি বিশেষ বিখ্যাত।

সে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা, বিক্রমপুরস্থ বেজগাঁ গ্রামে এই সতীদাহ সংঘটিত হইয়াছিল। যে-পরিবারের পুত্রবধূ তদীয় মৃত পতির সহগামিনী হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ বংশ, মুন্সী-পরিবার বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর, ভরদ্বাজ গোত্র, ফুলিয়া মেল। এই বংশের রামমোহন মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্রেরা তৎকালে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কেহ কুমিল্লা, কেহ ফরিদপুর, কেহ বা ঢাকা জেলায় কার্য্য করিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতেন। কীর্ত্তিনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ দুই শাখার আটটি ভাই একই বাড়ীতে পৃথক্ রূপে বাস করিতেন এবং দুর্গোৎসব প্রভৃতি বৃহৎ ক্রিয়ার সময় সাংসারিক বহু কার্য্য একত্রই নিষ্পন্ন হইত।

এই বংশের কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় সরকারের কোনও সম্মানজনক কার্য্য করিতেন। সেকালে প্রবাসী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ বাড়ীতে আসিবার সময় কেহ বা নৌকাতে রৌশনচৌকি বাজাইয়া, কেহবা টিকারা বাজাইয়া, কেহ বা বাজি বন্দুক ছাড়িয়া আনন্দচিত্তে জগন্মাতার পূজোপলক্ষে বাড়ীতে আগমন করিতেন। কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নৌকায়ও রৌশনচৌকি বাজিত, সে-বাজনা শুনিয়াই বাটীস্থ আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসিগণ বুঝিতে পারিতেন যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটী আসিতেছেন। সেবার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী আসিতেছেন,—কই? তেমন করিয়া ত রৌশনচৌকি বাজে না! কাজেই বাটীস্থ আত্মীয়-স্বজন গ্রাম্য জনসাধারণ সকলেই উৎকণ্ঠিত। পরে যখন নৌকা আসিয়া তীরে পৌছিল, তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত সকলকে বলিলেন যে, আমার শরীর অতিশয় রুগ্ন, তাই খুব জোরে রৌশনচৌকি বাজাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। সকলে রুগ্ন কাশীনাথকে ধরাধরি করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয়নগৃহে লইয়া গেলেন, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী সাধ্বী মহামায়া দেবীর অনুরোধে পুনরায় সকলে তাঁহাকে তদীয় পত্নীর শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। সতী ভবিষ্যতের কোন্ করাল ছায়া দৃষ্টে রুগ্ন পতিকে নিজ শয়নগৃহে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন কেহ তাহা অনুমান করিতেও পারেন নাই, কারণ মহামায়া দেবী অতিশয় লজ্জাবতী রমণী ছিলেন; তাঁহার সহসা এইরূপ ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের বাংলার সমাজের সহিত বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের কত প্রভেদ! তখন স্বামীর প্রতি শত ভালবাসা থাকিলেও কেহ কাহারও নিকট লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে সাহসী হইত না। দিবাভাগে স্বামী-স্ত্রীতে দর্শন বা কথোপকথন বিশেষ অশোভন বলিয়া বিবেচিত হইত।

পত্নী মহামায়া প্রাণপণে পতির সেবাশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। রুগ্ন পতির শারীরিক ও মানসিক শান্তি ও সুখের জন্য দিন নাই, রাত্রি নাই, আহারনিদ্রার প্রতি তেমন লক্ষ্য নাই, সর্ব্বদা পতির নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শিশু পুত্র ও কন্যার প্রতিও কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু পত্নীর এত দূর যত্ন ও সেবাশুশ্রূষার দ্বারাও কাশীনাথের জীবন রক্ষা পাইল না। কাশীনাথের মৃত্যু হইল।

সকলে শোকমগ্ন, কিন্তু মহামায়া দেবী হাস্যময়ী, নয়নে অশ্রু নাই, বদনমণ্ডলে বিষাদের কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া সেই বিবাহের লোহিত পট্টবস্ত্র



সতীঠাকরুণের মঠ, বেজগাঁও

পরিধান করিয়াছেন, তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠ দুইখানি রক্ত-কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গৌরবর্ণা স্বভাবসুন্দরী মহামায়া দেবীকে কৈলাসবাসিনী উমাসুন্দরীর ন্যায় বোধ হইতেছে। লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, অনবগুণ্ঠিতা সাধ্বী আজ মৃত পতির পার্শ্বদেশে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে শ্বশুর, ভাসুর সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন।

শব শ্মশানে নীত হইল। সাধ্বী মহামায়া দেবীও চিতারোহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন, সকলে নিষেধ করিলেন, আত্মীয়স্বজনেরা শিশু পুত্র ও কন্যা দুইটিকে দেখাইয়া দিয়া কত প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতেই মহামায়া দেবী তদীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। আত্মীয়স্বজনেরা বিফলমনোরথ হইয়া থানায় সংবাদ দিলেন। দারোগা আসিলেন এবং মহামায়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি স্বেচ্ছাক্রমে পতির অনুগামী হইতেছেন কি না? মহামায়া দেবী বলিলেন, "হাঁ।" "তবে তাহার পরীক্ষা হউক।" মহামায়া দেবী তৎক্ষণাৎ অগ্নিমধ্যে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক হাসিমুখে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, দারোগা বিস্মিতচিত্তে চিতারোহণের অনুমতি দিলেন। চতুর্দ্দিকে এ-সংবাদ ঝড়ের মত ছড়াইয়া পড়িল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে শত শত নরনারী সহমরণের এই দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। ঘৃত, চন্দন ও কাষ্ঠ সংগৃহীত হইল। হাস্যমুখী মহামায়া ধীরমন্থর গমনে উপস্থিত জনসাধারণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সধবা মহিলারা তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিল, কেহ বা তাঁহার সধবা-সৌভাগ্যের চিরচিহ্ন হস্তস্থিত সিন্দুরের কৌটা হইতে বিন্দু বিন্দু সিন্দুর সংগ্রহ করিয়া লইল। তৎপরে মহামায়া দেবী চিতারোহণ করিয়া মৃত পতির শবদেহের বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেন। চিতা জ্বলিল। সমবেত জনমণ্ডলী চারিদিকে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আর্ত্তনাদ করা দূরে থাকুক, বিন্দুমাত্রও তাঁহার দেহ কম্পিত হইতেও কেহ দেখিল না। দেখিতে দেখিতে দম্পতির পাঞ্চভৌতিক দেহ চিতাভস্মে পরিণত হইল।

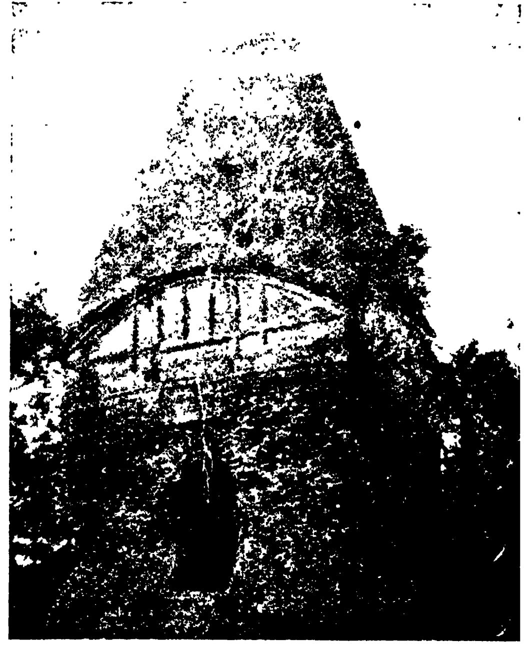
এই পুণ্যস্মৃতি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য উক্ত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতৃবৃন্দ সেই পবিত্র শ্মশানোপরি একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের সেই প্রাচীন মঠ এখন জীর্ণ, নিম্নাংশের ভিত্তি বহুল পরিমাণে মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। অতি কষ্টে নত-শিরে এখনও পূজারী প্রতিদিন মন্দিরমধ্যে গিয়া শিব-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট এই মঠটি 'সতীঠাকরুণের মঠ' নামে পরিচিত।

বারৈখালির মঠ

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বারৈখালি একটি পরিচিত গ্রাম। এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার সাড়ে পাঁচ হাজার হইবে। ইহার বেশীর ভাগই মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে বারুজীবী, গ্রহাচার্য্য (গণক ব্রাহ্মণ) ব্যতীত ধোপা, নাপিত, কৈবর্ত্ত, কুমার, কামার, জেলে, ঋষি, ভূঁইমালী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক্য, নমঃশূদ্র প্রায় সমুদয় বিভিন্ন জাতীয় লোকেরই বাস আছে। এই গ্রামে একটি মঠ আছে। মঠটি ধ্বংসোন্মুখ। ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রামগোবিন্দ সরকার।

এইখানে সরকার-পরিবারের ইতিহাস একটু বলিতে হইতেছে। সরকার-পরিবারের আদি পুরুষের মধ্যে দুর্লভ সরকারের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বতন কোন পুরুষের পরিচয় বারৈখালির সরকার-পরিবারের বর্ত্তমান বংশধরেরা কেহ দিতে পারেন না। সরকার-পরিবার বারৈখালি গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী কি না তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এই বংশ-সম্পর্কে কোন প্রাচীন দলিল পাওয়া যায় না। কথিত আছে, প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে এক বার ইঁহাদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল, তাহাতেই পুরাতন কাগজপত্র সব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রায় দশ-বারো বৎসর পূর্ব্বে কোনও মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে রাজা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়ের তরফ হইতে দুইখানি পুরাতন দলিল লইয়া যাওয়ায় আর কিছুই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ ঐ দলিল দুইখানিতে মঠ ও দীঘি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ ছিল। এখানে এই মঠের যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা এই বংশের বৃদ্ধদের প্রমুখাৎ জানা গিয়াছে।

দুর্লভ সরকারের পরে রামগোবিন্দ সরকারের উর্দ্ধতন তিন পুরুষের পরিচয়, এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কথিত আছে, এই বংশের রামগোবিন্দ সরকার বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁর সময় ঢাকা নবাব-সরকারে চাকরি করিতেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনে তাঁহার পিতার চিতার উপর একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটি দীঘি খনন করান। সেই বৃহৎ দীর্ঘিকাটি এখন বিশুষ্কপ্রায়। ঢাকা হইতে



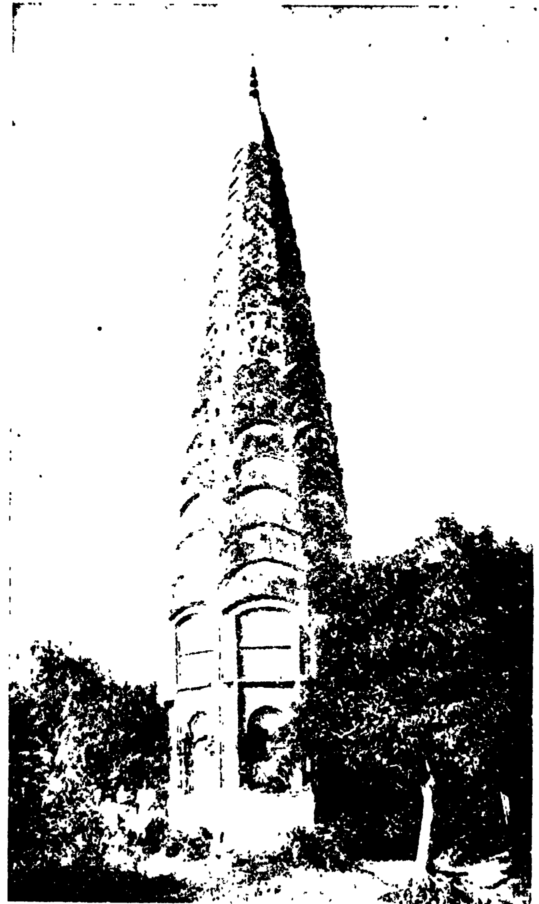
বারৈখালির মঠ

বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থানান্তরিত হইল। সে-সময়ে রামগোবিন্দ কর্ম্মত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীপ্রসাদ ও তৃতীয় পুত্র লালা কৃষ্ণপ্রসাদ নবাব-সরকারে কাজ পাইয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা কর্ম্মকুশলতার জন্য নবাব-সরকার হইতে লালা উপাধি লাভ করেন, এবং বিক্রমপুর পরগণার কিস্মৎ শ্রীধরখোলা, কেওটখালি, বারৈখালি, বিলরৈ জায়গীর-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ঐ সম্পত্তি পরবর্ত্তী কালে থাক-বন্দোবস্তের সময়ে তাঁহাদের ভ্রাতা বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা রামগঙ্গা সরকারের নামে ৪৯৪ নং তালুকের সৃষ্টি হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে অবস্থান-কালে লালা কৃষ্ণপ্রসাদ তথায় একটি আখড়া স্থাপন করেন। নবাব-সরকার হইতে বহু জমি জায়গীর-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উক্ত বিগ্রহের নামে তিনি দান করিয়া গিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত উক্ত বিগ্রহ দুইটি বর্ত্তমান আছে। লালা ভবানীপ্রসাদ এবং লালা কৃষ্ণপ্রসাদ

বারৈখালি গ্রামে বসতবাটীতে দালান নির্ম্মাণ করেন এবং মদনমোহন বিগ্রহ এবং প্রস্তরনির্ম্মিত সিদ্ধেশ্বরী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও সরকারদের প্রাচীন বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ এবং বিগ্রহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সরকার-বংশের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, তথাপি সরকার-বংশীয়েরা পূর্ব্বপুরুষপ্রদত্ত দেবোত্তর জমিজমার আয় দ্বারা দোল-দুর্গোৎসব এবং বিগ্রহসেবা করিয়া আসিতেছেন। বারৈখালির মঠটিও শ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত। এই মঠের বয়স প্রায় আড়াই শত বৎসর হইবে। বারৈখালির মঠটির গঠন-প্রণালী যশোহর জেলার ডামবেলীর মন্দিরের অনুরূপ।

আরিয়লের মঠ

বিক্রমপুরে আরিয়ল মঠটিও উল্লেখযোগ্য। মঠটির বয়স বেশী নহে, আনুমানিক দেড় শত বৎসর হইবে। এই গ্রামনিবাসী ঘনশ্যাম লস্করের সহমৃতা পত্নীর শ্মশানের উপর এই সতী-মঠটি প্রতিষ্ঠিত। আরিয়ল গ্রামের নাম দুই-তিন শত বৎসরের প্রাচীন দলিলপত্রে 'আইরল' লিখিত দেখা যায়। মধ্যপাড়া হইতে বিশ্বরূপ সেনের যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্ব্বে আড়িজলা পাটকের উল্লেখ আছে। আমার ছাত্র আরিয়লনিবাসী শ্রীমান্ জয়-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এসসি. আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, "অনেকে ইহাকে আড়িয়লের সহিত অভিন্ন মনে করেন।" এমন কি ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় প্রথম যখন আড়িয়ল আসেন তখন মন্তব্য করেন যে "আড়িজলা" নামটি সার্থক বটে। শব্দতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী আড়িজলা হইতে আড়িয়ল দাঁড়াইতে পারে। তবে পূর্ব্ববঙ্গে ড়-এর ত কোন উচ্চারণ নাই। কাজেই গ্রামের লোক গ্রামের নাম 'আরিয়াল' লিখে। এই গ্রামের নানা স্থান হইতে বিবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি, ইষ্টক-প্রাকার ও প্রাচীন সোপানাবলী আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহার দ্বারাও গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আড়িয়ল গ্রামের উৎসাহী যুবকগণ একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ স্থানে অনেক প্রাচীন পুঁথি, দলিলপত্র ও কয়েকটি স্থীমূর্ত্তি আছে। বিক্রমপুর আড়িয়ল চিত্র-শালাই বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রথম চিত্রশালা।

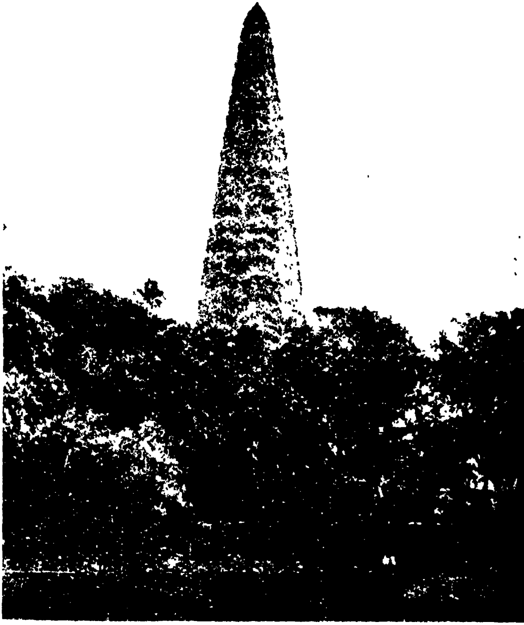


আড়িয়লের সতী-মঠ

ফেগুনাসারের মঠ

ধলেশ্বরী নদী হইতে তালতলার খালে আসিয়া পৌছিলেই দূর হইতে একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত মঠ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মঠটি ফেগুনা-সারের মঠ নামে বিখ্যাত। মঠটির উচ্চতা আনুমানিক ষাট-সত্তর ফুট হইবে। মঠটির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য গ্রাম্য জনসাধারণ ইহাকে "শিববাড়ী" নামেও অভিহিত করে। ফেগুনাসারে গ্রামের যে অংশে মঠটি

অবস্থিত তাহা "শ্যামরায়ের পাড়া" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। মঠটির ইতিহাস এইরূপ—প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে শ্যামসুন্দর রায় নামে বৈদ্য-বংশীয় এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের নবাবের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মাতৃশ্মশানোপরি এই মঠটি নির্ম্মাণ করিয়া শিবলিঙ্গ



ফেগুনাসারের মঠ

সংস্থাপিত করেন। মঠের পশ্চিম দিকে একটি বড় দীঘি আছে। দীঘিটির অবস্থা এখন সন্তোষজনক নহে। এই দীঘির উত্তর পাড়ে এখনও শ্যামরায়ের প্রাচীরবেষ্টিত দ্বিতল বাটীর এবং সিংহ-দরজার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। শ্যামরায়ের সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। কথিত আছে যে, শ্যামরায়ের মাতা খুব ধুমধামের সহিত প্রতি বৎসর চড়ক বা নীল পূজা করিতেন। এখনও সেই চড়ক-পূজার গজারি গাছটি বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান সময়েও প্রতি বৎসর ঐ স্থানে বিশেষ ধুমধামের সহিত চড়কপূজা হয় ও মেলা বসে। মেলায় বহু লোক সমাগম হয়। এ গ্রামে আর একটি বড় দীঘি ও একটি বড় বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। গ্রামবাসী ঐ বাড়ী লালা যশোবন্ত রায়ের বাড়ী বলেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কেহই তেমন কিছু বলিতে পারেন না। গ্রামবাসী কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তির মতে ফেগুনাসারের মঠটি রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

কামারখাড়ার মঠ

কামারখাড়ার মঠটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন। মঠটির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। আমরা বাল্যকালে



কামারখাড়ার মঠ

দিদিমা ও গ্রামের অন্যান্য প্রাচীনা মহিলাদের সহিত শিবরাত্রির দিনে আসিতাম। তখন বহু পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইতেন। সেকালের কামারখাড়া মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত চন্দ্রকুমার পারিহাল মহাশয় উপস্থিত নরনারীকে পরমসমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন, তাঁহাদের বাড়ীর সকলেই ঐরূপ জনসমাগমকে গৌরবের চক্ষে দেখিতেন। এই মঠটির প্রাচীন ইতিহাস ভাল করিয়া জানা যায় না। কথিত আছে, এই গ্রামবাসী বিদ্যালঙ্কার উপাধিধারী এক জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মহারাজা রাজবল্লভের রাজনগর গ্রামে মহারাজার সভার শোভাবর্দ্ধন করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী তদীয় পিতা ও মাতার শ্মশানোপরি এই মঠটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন।

ভুয়াল্লীর মঠ

ভুয়াল্লী গ্রামে এক সময়ে দুইটি মঠ বিদ্যমান ছিল। তাহার একটি পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। অপর মঠটি এখনও বিদ্যমান আছে। দূর হইতেই ইহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মঠটিও মাঠের মধ্যে; আম, বট ও তেঁতুল প্রভৃতি গাছ থাকায় মঠটিকে দূর হইতে আরও সুন্দর দেখায়।



লক্ষ্মীর বিবাহ
ত্রিবাঙ্কুরের প্রাচীন প্রাচীর-চিত্রের অনুকৃতি হইতে

নাম-মাহাত্ম্য

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

সারাটা বছর স্রেফ আড্ডা দিয়া ঠিক যখন কুড়িটি দিন বাকি, নেড়ামন্দিরের বুড়ো শিবের শরণাপন্ন হইলাম। পয়সা নয়, সিকি নয়, বাতাসা নয়, রোজ একটি ঝুড়ি করিয়া বিল্বপত্র, আর পাশ থেকেই এক ঘটি করিয়া গঙ্গাজল।..পাস করিয়া গেলাম। নিতান্ত মন্দও হইল না—সেকেণ্ড ডিভিশ্যন। বেশ বোঝা গেল আরও দশটা দিন আগে যদি বাবাকে মনে পড়িত, ফার্স্ট ডিভিশ্যনটা বাঁধা ছিল। যাক, ধর্মপথে পা দিয়া বেশী লোভটাও আবার কিছু নয়।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর পড়বি শৈলেন?"

আমাদের বাড়ীর সামনেই ধর্মদাসদের বেলগাছটা। সবুজের একটি চিহ্নমাত্র কোথাও রাখি নাই। ধর্মদাসরা নেহাৎ এখানে নাই তাই সম্ভব হইয়াছে। এমন করিয়া গাছ মুড়াইবার সুযোগ তো বারে বারেই পাওয়া যাইবে না?

গাছটার উপর থেকে দৃষ্টি সরাইয়া বলিলাম, "না বাবা, পড়ে যে এমন কি হবে তা তো বুঝতে পারছি না।"

"তবে? করবি কি?"

"একটা ব্যবসা-ট্যাবসা আরম্ভ ক'রে দিলে মন্দ হ'ত না বোধ হয়।"

"কিসের ব্যবসা করবি ভাবছিস?"

কোন্‌টার করিব তাহাও ভাবি নাই। কোন্‌টার যে না-করিব তাহাও ভাবি নাই। বলিলাম, "কিছু স্টেশনারি থাক, বলেন তো কিছু কাপড়চোপড়ও রাখি,—এক পাশে চাল ডাল, বেণে-মশলা এসবও থাক—যেটার কাটতি দেখব সেটাকে রেখে বাকি দুটো সরিয়ে দিলেই হবে। আপনি কি বলেন?"

নূতন উৎসাহের মুখে বাবা আর বাধা দিলেন না, নির্বিকারভাবে বলিলেন, "দেখ্ তবে।"

রাত্রে মা বলিলেন, "বলছিলেন—একসঙ্গে অতগুলো জিনিস সামলাতে পারবি?"

বলিলাম, "বুড়ো শিবের যদি দয়া থাকে তো চলে যাবে মা।"

নবজাগ্রত ভক্তি আর বিশ্বাসের মুখে মাও আর নিরুৎসাহ করিলেন না। বলিলেন, "সে ত ঠিকই, বাবা চাইলে কি না হ'তে পারে। বেশ দেখ্ চেষ্টা ক'রে তা হ'লে।"

এটা গেল ভক্তি আর বিশ্বাস উদ্গমের ইতিহাস। এত দিনে দুইটাই বোধ হয় যাইতে বসিয়াছে; এইবার তাহার ইতিহাস সুরু করি।

২

ঠিক ভক্তি আর বিশ্বাস যাইতে বসিয়াছে বলাটাও আবার ভুল হয়। যাইতে বসে নাই, আসলে আধার পরিবর্তন করিয়াছে। আগে ছিল দেবদেবীদের উপর, এখন আশ্রয় করিয়াছে...এঁদের কি বলিব? অভিধা লইয়া একটু মুশকিলে পড়া গিয়াছে। মনুষ্য-লোক ছাড়িয়া এঁরা জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেছেন, আরও কি কি লোক আছে এবং কোন্ লোকে যে শেষ পর্যন্ত এঁদের অধিষ্ঠান, কি করিয়া বলিব? সুতরাং ঐটুকু খালি রাখিয়া আপাতত: কাহিনীটাই বিবৃত করিয়া যাই।—

খুব সদর জায়গা দেখিয়া একটা ঘর ভাড়া করিলাম। চারিটা বড় বড় সড়কের চৌমাথা। ওদিক থেকে হাওড়ার বাস্ আসিয়া দাঁড়াইতেছে, এদিকথেকে চন্দননগর ভদ্রেশ্বর। সব রকম লোকের গতায়াতে গুলজার জায়গা। আর কাজের জায়গা—যাকে বলা চলে গঞ্জ। শতকরা পাঁচটা লোককে ভ্যাগাবণ্ডের দলে ফেলিলেও বাকি পঁচানব্বই একটা-না-একটা কিছু কিনিবেই, চাল ডাল নুন তেল,

মসলা, কাপড়, গেঞ্জি, লুঙ্গি, নস্য, চিমনি, হরলিক্‌স, বারসোপ, ডিম—কোন জিনিসটার জন্যই অন্য দোকান মাড়াইতে দিব না।...পাঁচু ঠাকুরের দোর ধরিয়া আমার জন্ম, সমস্ত ছেলেবেলাটা মা-শীতলার চরণাশ্রিত ছিলাম, জীবনের প্রথম তোরণ উত্তীর্ণ হইলাম বুড়া শিবের কৃপা-দৃষ্টির জোরে।...ওঁদের দয়াই আমার মূলধন;—সব শুভার্থীদের পরামর্শানুসারে এবং নিজের অন্তরের আশা এবং বিশ্বাস লইয়া দোকানের নাম রাখিলাম "অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার"। কলিকাতা থেকে প্রকাণ্ড ঝক্‌ঝকে সাইনবোর্ড তৈয়ার করাইয়া আনিলাম। বাঁ-দিকে একটা বড় বৃত্তের মধ্যে একটা চিত্র—কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি শিব অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, দেবী প্রসন্ন আননে একটা সোনার হাতায় করিয়া অন্নপরিবেশন করিতেছেন।...ভক্তির দৃষ্টিতে দেখুন, চক্ষু ফিরাইতে পারিবেন না; নিতান্ত আধুনিক ইকনমিক্সের দৃষ্টিতে দেখুন—ডিম্যাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের অর্থাৎ প্রয়োজন আর আয়োজনের এমন উচ্চ অঙ্গের প্রতীক খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ।

কথায় বলে দেব-দ্বিজে ভক্তি। পাঁজি দেখিয়া খুব একটা ভাল দিন বাছিয়া পাড়ার বাছাবাছা গুটি বারো পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে আহারে দক্ষিণায় পরিতুষ্ট করিয়া দোকান খুলিলাম। অবিলম্বেই মাথায় আর একটা বুদ্ধি আসিল। ঘরটা বড়ই পাইয়াছিলাম, হাত-তিনেক চওড়া আর হাত-ছয়েক লম্বা একটা জায়গা বাহির করিয়া লইয়া আমকাঠের তক্তা দিয়া আলাদা করিয়া লইলাম। মাঝখানে একটা অয়েলক্লথ-মোড়া লম্বা টেবিল, এক পাশে খান-ছয়েক টিনের চেয়ার। শেষের দিকে একটু খুবরিগোছের ঘিরিয়া লইয়া চা, ডিম, চপ আর ঢাকাই পরোটার আয়োজন করিলাম। এটুকুর আলাদা করিয়া নাম দিলাম "অন্নপূর্ণা কেবিন"। বাবা বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, চক্রবর্তী মহাশয় বুঝাইলেন, "তা হোক, মা'র নাম ক'রে করছে, সব শুদ্ধ হয়ে যাবে।"

"শৈল দোকান করেছে—শৈল দোকান করেছে" বলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই একটা রব উঠিয়া গেল। দোকান দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিল। সামনেই রাস্তার ধারে একটা ছোট বকুলতলায় এক ফালি ঘাসে-ঢাকা জায়গা। বিকালে রোদ পড়িয়া আসিলেই কতকগুলি টিনের চেয়ার পাতিয়া দেওয়া হয়। এ-পাড়া ও-পাড়া মিলাইয়া যত শুভার্থীরা আসিয়া এই সময় উপস্থিত হন। চক্রবর্তী-মশাই, ঘোষাল-মশাই, বৈকুণ্ঠ-কাকা, নটবর-কাকা, সনাতন চৌধুরী, ওপাড়ার অবিনাশ-ঠাকুর্দা, গোঁসাই ঠাকুর—এঁরা প্রায় নিয়মিতই পায়ের ধুলা দেন, এর ওপর যাওয়া-আসা, কর্তাদের সঙ্গে দু-একটা আলাপ-আলোচনা করা, প্রসাদী তামাকে দু-একটা টান দিয়া যাওয়ার লোক তো লাগিয়াই রহিয়াছে।

অন্নপূর্ণা কেবিনের "বয়" হারানের ত তামাক সাজিয়া দম ফেলিবার ফুরসৎ থাকে না। ভালমন্দ নানা রকম আলোচনায়, হাসিঠাট্টায়, তামাকের সুবাসে আমার দোকান যেন গম গম করিতে থাকে। হয়ত চক্রবর্তী খুড়ো তামাক টানিতে টানিতে সাবাসি দিবার ভঙ্গিতে আমার দিকে বাঁ-হাতের তর্জনীটা উঁচাইয়া বলিলেন, "না, বুকের পাটা আছে শৈলর; কি বয়েস বল? নয় পাসই করেছে, কিন্তু আমাদের কাছে ত সেই বালকটিই? তা কি রকম ফলাও ক'রে দোকানটি ফেঁদেছে দেখ!...ঠিক চলে যাবে, এই আমি প্রাতর্বাক্যে বলছি।"

এতগুলা কথার উপর খাতির দেখাইয়া বলিতেই হয়; অনেক ছাতু গুলেছি চক্রবর্তী-কাকা, সামলাতে পারব তো? ভাবনা হয় এক-এক বার .."

চক্রবর্তী একটু ধমকের সুরে বলেন, "আস্পদ্দা কম নয় তো! তুই সামলাবি? তবে সাইনবোর্ডের ওপর সোনার হাতা ধরিয়ে ও বেটীকে বসিয়ে রেখেছিস্ কি করতে?...যার ভাববার সে ভাবছে বাবা, তুই ব'সে ব'সে তামাশা দেখ।...বলে সামলাব কি ক'রে...উনি সামলাবার মালিক যেন! ..কথা শুনছ নটু?"

নটবর-কাকা হুঁকার জন্য হাতটা বাড়াইয়া বলিলেন, "একটা কথা দাদা লক্ষ্য করেছ কি না বলতে পারি না; জায়গাটার যেন চেহারাই বদলে গেছে।...না; বড় দোকান তো এখানে আগেও ছিল গো,—এই ঘরেই, কিন্তু এমন জলুসটি কখনও দেখেছ? মা যেন আলো ক'রে বসেছেন।"

ঘোষাল-মশাইয়ের সঙ্গে তাঁর ছোট নাতিটি থাকে,

অষ্ট্রেলিয়া

"অষ্ট্রেলিয়া" প্রবন্ধ দষ্টব্য, পৃ. ৩৭১



পার্থ, কুঈন্‌স্ গার্ডেন্‌স্



পার্থ, সরকারী উদ্যান



পার্থ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট



পার্থ, মাউন্টস্‌-বে রোড



পার্থ, সেণ্ট জর্জ টেরেস



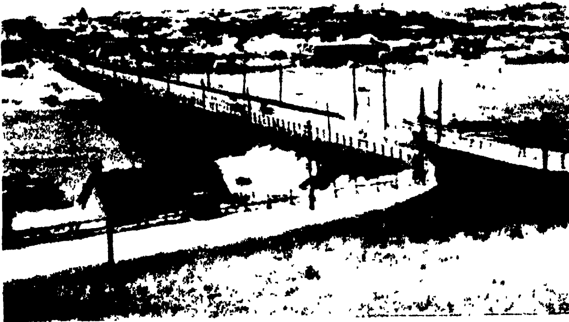
সোয়ান নদীর দৃশ্য



ফ্রিম্যাণ্টেল, বন্দরের দৃশ্য



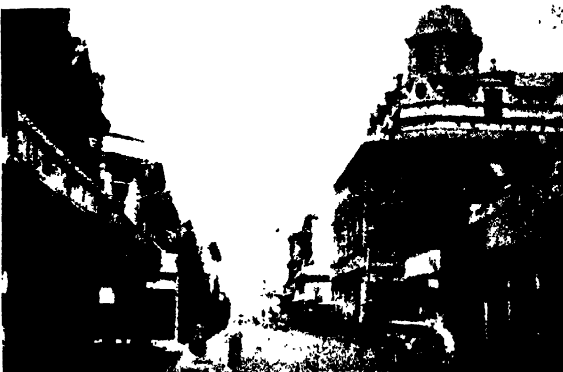
ফ্রিম্যাণ্টেলের দৃশ্য



ফ্রিম্যাণ্টেল, কনভিক্ট ব্রিজ



ফ্রিম্যাণ্টেলের বড় ডাকঘর



ফ্রিম্যাণ্টেল, রাজপথ



জেনোলান-গুহা ভবন

তাহার কাজ ঠাকুরদাদার হাঁটু জড়াইয়া ক্রমাগতই একটা-না-একটা বায়না ধরিয়া থাকা। তাহাকে ধমক দিয়া ঘোষালমশাই বলেন, "চপ্ ল্যাবাঞ্চুস্ কি আমি হাতে ক'রে ব'সে আছি? যা না তোর শৈলদা'কে বল গে যা না, তাতে ছেলের লজ্জা!··দেখ হে শৈলেন, তোমার ভাইপো কি বলে।···মায়ের কথা উঠল ব'লেই বলছি—কেন, এইখানে তো হারাধন কুণ্ডুর ছেলে মতি দোকান ফেঁদেছিল, তার পর সেই মেড়োর কাপড়ের দোকান, তার পর আমাদের মোল্লাপাড়ার এছাহুদ্দিনের ছোটভাই জুতোর দোকান খুললে—দোকান ছিল না কি ক'রে বলব? এক-জন-না-এক-জন ত রয়েছেই একটা কিছু নিয়ে—কিন্তু কখন এসে বসতে দেখেছ? না; তোমাদেরই কাউকে কখন দেখেছি দোকান মাড়াতে? আর এখন যেন টানে এই বকুলতলাটি! তার হেতু আর কিছু নয়—ঐ নাম আর সাইন-বোর্ড। ওর পেছনে কত বড় একটা হিঁদুয়ানি রয়েছে, কত বড় একটা নিষ্ঠা! এলেই যেন মনে একটা···"

বোধ হয় নাতিটি ততক্ষণে ফিরিল। ঘোষাল-মশাই হাত দুইটা ত্রস্তভাবে উঁচাইয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ এদিকে নয়; তুমি ওসব চপটপ খেয়ে হাত ধুয়ে তবে এস বাপু। চা খেয়েছিস?—না, আবার চায়ের জন্যে আবদার ধরবি?···মার্বেল?—সে এখন নয়, যাবার সময়; সর্বদাই ভ্যান্‌ভ্যান্ করিস্ নি বাপু, মনে করি শৈলর দোকানে পাঁচটা ভাল লোক এসে বসে, দুটো ভাল কথা হয়, বসি একটু গিয়ে; তা যা ল্যাংবোট জুটেছিস..."

খদ্দের জুটিলেও সকলে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করেন—সৎপরামর্শ দিয়া, দরদস্তুরিতে সহযোগিতা করিয়া। কখনও কখনও রাস্তা থেকেও খদ্দের ডাকিয়া তোলেন। যে কয় জন আসিয়া বসেন, লোক চিনিতে প্রত্যেকেই ঝানু।—

"কি চাই রে তোর বাপু?—শাড়ি—এই দোকান।... দাও হে শৈল, সর্দারকে ভাল একটা শাড়ি দাও দিকিন—হিন্দুস্থানীদের বারোহাতী শাড়ি···আর দেখ···"

আমি ফিরিয়া চাহিতে খদ্দেরকে লুকাইয়া হাতে কষিয়া একটা মোচড়ের ভঙ্গী করিলেন। অর্থ সুস্পষ্ট।

"তুই না দীনুর বাড়ীর চাকর? সওদা করতে এসেছিস? তা যা, ভেতরে যা, সব জিনিস এখানেই পাবি। ঐ ওপরে চেয়ে দেখ, পড়তে না পারিস ছবি চিনিস ত দেবদেবীদের?—যা ভেতরে।···দেখ হে শৈল, কি কি চায়, দীনেকে বলে দিয়েছিলাম, চাকর পাঠিয়েছে।"

দীনুর চাকরকে ফিরিতে হইল।···ধারে দিব না ঠিক করিয়াছি। চক্রবর্তী-মশাইয়ের নিকট গিয়া দাঁড়াইতে তিনি আবার সঙ্গে করিয়া নিজেই উঠিয়া আসিলেন। এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "ও-সব আবার কি ছেলে-মানষি করছিস শৈল। একে কি ধার বলে? ধার—যেখানে পয়সা ডোববার ভয় রয়েছে। দীনের বাড়ী, কি ঘোষালের বাড়ী, কি ওবিনেশদা'র বাড়ী—ওকি ধার নাকি? শৈলর ছেলেমানষি দেখ ওবিনেশদা'! ···নে, কি কি নিবি লিখিয়ে দে শৈলকে। আর হ্যাদেখ্, কোন্ দিক দিয়ে ফিরবি?···তা একটু উবগার কর্ দিকিন—শৈল সেরখানেক ঘি, সের দুয়েক আটা আর আধ সেরটাক চিনি দিচ্ছে, আমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাস্ দিকিন···লিখে রাখ শৈল।"

ঠিক করিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া অভয় দিয়া বলিলেন, "কিচ্ছু ভাবনা নেই, দীনের ওখানে টাকা তোর ডুববে না—ডুবতে পারে না। আমি রয়েছি কি করতে?"

গোঁসাইঠাকুর হাতে নস্য ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "দীনে কেন, এ-দোকানের টাকা যেখানেই পড়ে থাক, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আছে বুঝতে হবে! এ কি শৈলর দোকান? মা'র নিজের দোকান—কুবের বেটা যার কেশিয়ার।··· আমার সেই মাদ্রাজী নস্যিটা আনালি শৈল? মাগ্যি ব'লে কোন দোকানেই রাখতে চায় না এখানে।···এই দেখ্; ভুলেই গেছলাম! নস্যির কথায় মনে পড়ে গেল,—যাবার সময় দুটো হ্যারিকেনের চিমনি দিস ত শৈল। মনে ক'রে দিয়ে দিস বাবা, আমি বোধ হয় ভুলেই যাব, আজ ভুললে তোর জেঠাইমা আর কিছু বাকি রাখবে না।"

বৈকুণ্ঠ-কাকা এক সময়ে নিজে দোকান করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশের দাম অনেক। বলেন, "দোকান

চালান এমন কিছু মহামারী কাণ্ড নয়, শৈল; কিছু বাঁধা খদ্দের ক'রে ফেল, ব্যস; আজ ঐ যে উটকো খদ্দের দেখছ—আজ এ-দোকান, কাল ও-দোকান, ওদের ভরসায় ব্যবসা চলে'না। হাতে-কলমে করা কাজ, বোঝা আছে কিনা। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে দোকান করেছ, মা-ই সব জোগাড়যন্ত্র ক'রে দেবেন, আর আমরাই কি ব'সে আছি ভেবেছ বাবাজী? বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছি আর ভাবছি কি ক'রে একটা ঘর বেঁধে ফেলতে পারি ···"

মায়ের কৃপায় এবং শুভার্থীদের চেষ্টায় কাছাকাছি কয়েকটা পাড়ায় অনেকগুলি ঘরই বাঁধা খদ্দের হইয়া গেল। উটকো খদ্দের গোড়ায় কিছু জমিয়াছিল, ক্রমে দেখিলাম বোধ হয় রাস্তা থেকে খদ্দের টানিয়া তুলিবার জন্য, মোচড়ের ইসারা দেওয়ার জন্য খদ্দের-অখদ্দের নির্বিচারে সকলেই রাস্তার এদিকটাই এড়াইয়া চলিতেছে। বন্ধুবান্ধব পরিচিত প্রভৃতি সকলের নিকটেও কথাটা পাড়িলাম। বলিলাম, "তোদের ভরসাতেই দোকান করলাম, তোরা ওদিকই মাড়াস না···"

উত্তর করিল, "একে ত এসা সাইনবোর্ড হাঁকড়েছ, ঢুকতেই ভয় হয়—মনে হয় জগন্নাথের মন্দিরেই ঢুকছি, কি কালীঘাটেই এসেছি—গা ছম্ ছম্ করে···দোকানে এলাম, দুটো ফষ্টিনষ্টি হ'ল—মন খোলা ক'রে পাঁচটা ভালমন্দ জিনিস দেখলাম, তা নয়···ভেবে দেখ না, তোমার ঐ অন্নপূর্ণা কেবিনে ঢুকে ডিম ওড়াতে সাহস হয়?···তা'হলেও সেদিনে যাচ্ছিলাম ওদিকেই—বউয়ের কাপড়চোপড় আর নিজেরও গোটাকতক এদিক-ওদিক জিনিস দরকার ছিল, ভাবলাম নগদ পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কেনা-কাটা, লাভাংশটা শৈলর হাতেই যাক না। গলি থেকে বেরুতেই শুনি গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কবে কি বলেছেন না-বলেছেন তাই নিয়ে মাথাফাটাফাটি হবার উপক্রম হ'চ্ছে—চক্রবর্ত্তী, গোসাই, নটবর, দীনু রক্ষিত আরও এক পাল সব—ভাল ক'রে দেখতেও সাহস হ'ল না—ল্যাজ মুখে ক'রে তাড়াতাড়ি পেছিয়ে এসে সিদু-মাস্টারের দোকানে ঢুকলাম···রক্ষে কর ভাই···"

সবিস্তারে না বলিয়া মোটামুটি ধরণটা জানাইয়া দিলাম। আমার ব্যবসায়ে ভক্তিপর্বের এই ইতিহাস—অর্থাৎ দেবদ্বিজে ভক্তিপর্বের। চার মাসের পর নূতন খাতার হিসাব-নিকাশের সময় দেখা গেল চক্রবর্ত্তী-মশাইয়ের নিকট ২১৫৷৵৹, বৈকুণ্ঠ-কাকার নিকট ১৬৭।৹, গোঁসাই-ঠাকুরের নিকট ১০০৲, নটবর-কাকার নিকট ১৭০৸৹—এই ভাবে চারি দিকে একুনে হাজার-দেড়েকের কাছাকাছি কর্জ পড়িয়া গেছে। মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। বাবা দেশে নাই, কিন্তু আসিলে কি যে অবস্থা হইবে ভাবিয়া যেন কূলকিনারা পাইলাম না। তবুও সেদিন পর্য্যন্ত একটা আশা লাগিয়া রহিল—হাল-খাতায় কিছু মোটা রকম জমা হইবে, নিজের নিজের ঘাড়ের ঋণ তো সবার, সাধ্যমত হালকা করিবেই। প্রথম হালখাতার উৎসব, বেশ ঘটা করিয়াই করিলাম। চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ কয়েক জন সমস্ত দিন থাকিয়া সাহায্য করিলেন। কিছুতেই কার্পণ্য করিলাম না—প্রায় ১২৫টি টাকা খরচ হইল। চৌমাথাটা গুলজার হইয়া উঠিল সে-রাত্রে। নটবর-কাকা ছোট ছেলে দুইটিকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। বকুলতলায় আসিয়া দুই পা পিছনে হটিয়া সাইনবোর্ডের চিত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আহা, মা যেন হাসছেন।"

জমার অঙ্কে পড়িল• নগদ সাতাশটি মুদ্রা, তেরটি অচল।

৩

বাবা লিখিয়াছেন, মাসখানেকের ছুটি লইয়া তিনি শীঘ্রই এক বার আসিতেছেন। অত্যন্ত অশান্তিতে কাটিতেছে। নববর্ষের উৎসবের পর থেকে বাঁধা খদ্দের আরও জুটিয়াছে—শুভার্থীদের সুপারিস ঠেলিতেও পারি না। চক্রবর্ত্তী-মশাই বলেন, "তুমি ব'সে শুধু তামাশা দেখ, একটু যারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ সব একে একে এসে জুটবে।···কি রকম একটা নাম বেরিয়ে গেছে! যেখানেই পাঁচটা ভাল লোক—অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের কথা···"

সন্ধ্যার জমায়েৎ আরও বিপুলতর হইয়া উঠিতেছে টিনের চেয়ারে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকাও অসুবিধা, সবচেয়ে বেশী অসুবিধা চা খাওয়া। বৈকুণ্ঠ-কাকা বলিলেন, "গরম

কাপ আর ডিশ হাতে ক'রে এক মহা ফ্যাসাদ শৈল, একটা চৌকিটৌকি পেতে দে বকুলতলাটায়।"

সে-রাত্রে একে একে সবাই উঠিয়া গেলে চক্রবর্তী-মশাই একটা ছুতা করিয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, "হুঁঃ, একে আবদার বলে না?"

আমি বিমূঢ়ভাবে মুখের পানে চাহিতে বলিলেন, "চৌকি কেন, চা খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে—হুকুম হয়ে গেল! পয়সা লাগে না নতুন চৌকি কিনতে?...খবরদার তুই নতুন চৌকি কিনবি নি শৈল। আমার একটা পুরনো আছে কাল পাঠিয়ে দেব, এক-আধ জায়গায় মেরামত ক'রে তাতেই কাজ চালাবি। তার পর দেখা যাবে দামের কথা,—না হয় আমার নামে ঐ বাবদে দশটা টাকা জমা ক'রে রাখিস্..."

সেই দিন দোকানে তালা দিয়া বাহির হইবার সময় একবার আপনিই যেন চক্ষু দুইটা সাইনবোর্ডের মূর্তির উপর গিয়া পড়িল, একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আপনি আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "মা, ডুবলাম এবার।"

মায়ের দয়া কি না বলিতে পারি না, তবে নিষ্কৃতি আসিল অদ্ভুত ভাবে।

পরের দিন চৌকির প্রসাদে সুখাসীন হইয়া বসিবার সুবিধা হওয়ায় বৈঠক আরও জমিয়া উঠিল। আমি ভিতরেই আছি। হিসাব খতাইতে গিয়া খতিয়ানের উপর দৃষ্টি আটকাইয়া গিয়াছে,—সতের টাকার বিক্রয়, তিন টাকার নগদ, বাকি ধার। চক্রবর্তী মশাইয়ের বাড়ীতেই প্রায় এগার টাকার জিনিস গিয়াছে—লক্ষ্মীপূজা ছিল। চক্রবর্তী-মশাই গঙ্গাস্নানের পথে আমায় বলিয়া গেলেন, "বাড়ীতে শাসিয়ে এসেছি, পুজোর একটাও জিনিস যদি অন্য দোকান থেকে নেওয়া হয়েছে শুনি তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দোব।...এক্ষুনি ফিরিস্তিটা নিয়ে আসছে ঝি, দিয়ে দিস। না, পুজোর জিনিস ওসব "এণ্ড কোম্পানী" কি "লিমিটেড" ফিমিটেডের দোকান থেকে আসবে না, আমি বেঁচে থাকতে নয়, নামেই যেন একটা ম্লেচ্ছ-ম্লেচ্ছ ভাব!"

বিমূঢ়ভাবে খতিয়ানের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছি, ওদিকে চা আর গীতায় বকুলতলা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় নটবর-কাকা একটি সন্ন্যাসীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। পায়ে খড়ম, পরনে গেরুয়া, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মস্তক মুণ্ডিত। রাস্তা থেকেই বলিতে বলিতে আসিলেন, "নিয়ে এলাম বৈকুণ্ঠদাদা, আপনাকে আজ বলছিলাম না তখন?—এই এঁরই কথা। আসতে কি চান? না জো আছে আসবার?—কিছু নয় ত পঞ্চাশ জন লোকে ঘিরে আছে। আমারও জিদ ধরে গেল, বাবার পায়ের ধুলো একবার দোওয়াবই শৈলর দোকানে। কাল থেকে দরবার ক'রে ক'রে শেষকালে..."

"আসুন, আসুন।" করিয়া সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চৌকির মাঝখানে খানিকটা জায়গা করিয়া দিল। প্রসন্ন হাস্যে বাবাজী গিয়া উঠিয়া বসিলেন।

চারি দিক থেকে ব্যস্ত প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবাজীর? কত দিন থাকা হবে? কি সম্প্রদায়ভুক্ত? কত দিন আসা হয়েছে এখানে?..."

নটবর-খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, "ঐখানেই একটু মুশকিল—বাঙালী নয়।"

সকলে চক্ষু কপালে তুলিয়া পরম সমীহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তবে?"

নটবর-কাকা সমীহ আরও উদ্রিক্ত করিয়া বলিলেন, "মদ্রদেশীয়। বোঝেন বাংলা, তবে বলতে পারেন না।"

চক্রবর্তী-মশাই বলিলেন, "এক কথায় শঙ্করাচার্য, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দেশের লোক বল না!"

সন্ন্যাসী সস্মিত আননে মাদ্রাজী প্রথায় ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া কথাটা অনুমোদন করিলেন। তাহার পর হাত আঙুল নাড়িয়া, চোখ নাচাইয়া, মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "উঁ-উঁ-গীতা-গীতা সম্প্রতি গীতা আলোচনাং ভবতু।"

নটবর-কাকা বলিলেন, "বলছেন—গীতার আলোচনা হোক।...তা বাবা, আপনার সামনে আমরা অর্বাচীনেরা যে গীতা মুখেই আনতে সাহস পাচ্ছি না..."

সন্ন্যাসী সেইরূপ স্মিত হাস্যের সহিতই অঙ্গুলি সঞ্চালন

করিয়া ইশারা করিলেন, চলুক—মুখে বলিলেন, "ভক্তিম্ ভক্তিম্।"

চক্রবর্ত্তী-মশাই বলিলেন, "সে কথা ত খুবই ঠিক, ভক্তিই তো সব জিনিসের সার; কিন্তু তাই কি আমাদের আছে, বাবা? ওরে শৈল, তোর হিসেব রেখে এক বার আয় ত, বাবার পায়ের ধুলো নে—এত বড় একটা মহাপুরুষ এসেছেন—কত ভাগ্যে দেখা হয় এঁদের! একি আর আমাদের বাংলা দেশের হেঁজিপেঁজি গেরুয়াধারী?"

অগত্যা আসিয়া পায়ের ধুলা লইলাম। চক্রবর্ত্তী-মশাই আমার পিঠে হাত দিয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভক্তি বলেন ত এই এর আছে; দোকান করেছে, তাতেও ঠাকুর-দেবতাদের ভুলতে পারে নি। ঐ দেখুন না।" বলিয়া সাইনবোর্ডের চিত্রের দিকে বাবাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

বাবাজী অর্দ্ধেক বোঝা অর্দ্ধেক না-বোঝা গোছের করিয়া একটু হাসিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "উন্নতিম্ উন্নতিম্..."

ক্রমে অল্প অল্প করিয়া সবাই গীতার এবং সাধারণভাবে ধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল, এবং যখন দেখা গেল সন্ন্যাসী চক্ষু বুজিয়া ঘাড় নাড়া ভিন্ন বিশেষ কিছু করিতেছেন না, তখন আলোচনা বেশ জোর হইয়া উঠিল। কি জানি কেমন করিয়া লোকটার প্রতি আমারও ভক্তি জমিয়া উঠিতেছিল অল্প অল্প করিয়া। হইতে পারে স্বজাতি নয় বলিয়া, হইতে পারে কথা প্রায় কয় না বলিয়া, হইতে পারে মাথায় হাত দিয়া "উন্নতিম্ উন্নতিম্" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল বলিয়া, কিংবা আরও কোন নিগূঢ় অজ্ঞাত কারণেও হইতে পারে যাহার জন্য আমাদের শিরদাঁড়াটা সন্ন্যাসী দেখিলে আপনিই ঝুঁকিয়া আসে। একবার উঠিয়া কেবিনে গিয়া হারানকে বেশ ভাল করিয়া চা করিতে বলিয়া আসিলাম। চায়ের পর বিদায় লইবার পূর্ব্বে ফল এবং মিষ্টান্নে বাবাজীকে প্রীত করিয়া করজোড়ে বলিলাম —পরের দিন যেন সন্ধ্যার সময়ই তিনি দয়া করিয়া পায়ের ধুলা দেন। ভক্তি দেখিয়া শুভার্থী-মহলে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। নটবর-কাকা বলিলেন, "আমি কি না-বুঝেই ডেকে এনেছিলাম বাবাকে?"

৪

চার দিন পরে মনের কথাটা বলিবার সুযোগ পাইলাম। দ্বিজ লাহিড়ীর মেয়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল, কেহ দোকানে আসে নাই। সন্ধ্যার খানিকক্ষণ পরে আমিও দোকান বন্ধ করিয়া যাইব, এমন সময় বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রোজই নটবর-কাকার সঙ্গে আসেন, আজ একা। আমি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া হারানকে ভাল করিয়া চা করিতে বলিয়া দিলাম।

বাবাজী আসন গ্রহণ করিয়া ইসারায় প্রশ্ন করিলেন— এরা কোথায়? শুনিয়া চক্ষু নাচাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ, ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ।"

তাহার পর একটু থামিয়া নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাতটা ঘুরাইয়া লইলেন। প্রথমটা মনে হইল বুঝি এবার দেহরক্ষা করিবেন বলিতেছেন, কিন্তু পরে বারণসী, মথুরা এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করায় বুঝিলাম এবার এই স্থান ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে যাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে যাওয়া হবে বাবা?"

প্রথমে বাংলাটা বুঝিতে পারিলেন না, তাহার পর একটু যেন ভাবিয়া মানেটা ধরিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কল্যমেব—স্বপ্নাদেশং।"

স্বপ্নাদেশ হইয়াছে, কালই যাইবেন। ষোল আনা খাঁটি সন্ন্যাসী, একরত্তি ভেজাল নাই! ...আমি একেবারে মনস্থির করিয়া ফেলিলাম। বাবাজীকে সনির্বন্ধ করজোড়ে এক বার "বস্যতাম্" বলিয়া হারানের কাছে গিয়া বলিলাম, "যা চট ক'রে যা, ততক্ষণ উনুন ধরছে—এই টাকাটা নিয়ে ছিদামের ওখানে সব্বার চেয়ে যা ভাল খাবার আছে আর বাদবাকির ভাল ফল—কালু শেখের দোকান থেকে—যা—আবার বেটা হাঁ ক'রে চেয়ে রইল!..."

তাহার পর ফিরিয়া গিয়া কতকটা বাংলায়, কতকটা হিন্দিতে, কতটা হাত-পা নাড়িয়া এবং কতকটা ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত আয়ত্ত করা ঐ "বস্যতাম্"-এর মত অপ-সংস্কৃততে আগাগোড়া সব দুঃখের কথা বলিয়া গেলাম— এমন কি লক্ষ্মীপূজার কথা, চৌকি ঘাড়ে চাপানর কথা পর্য্যন্ত। আবার পাছে ভক্তদের নিন্দা করিতেছি মনে

করিয়া পাছে চটিয়া যান, মনে মনে সেই জন্য বলিলাম—"ওঁরা সবাই আমায় খুবই স্নেহ করেন বাবা, তবে দৈব আমার প্রতিকূল; এখন সেই প্রতিকূল, বিরূপ দৈব যাতে অনুকূল হয়ে ওঠেন তার জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিন—জলপড়া ধুলোপড়া বিভূতি—যা হয় একটা কিছু, নইলে আমি পা জড়িয়ে প'ড়ে থাকব, কোন মতেই যেতে দোব না, বাবা।"

বাবাজী ধীরভাবে সমস্ত শুনিয়া মাথা নাড়িয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "গ্রহশান্তিম্—কবচম্—কবচম্।"

আমি বলিলাম, "কবচ হ'লে ত কথাই নেই। কত খরচ পড়বে বলুন—কিম্—খরচম্—সবই যখন যেতে বসেছে…"

বাবাজী অমায়িক হাস্যের সহিত হাত নাড়িয়া জানাইলেন—খরচ কিছুই পড়িবে না, শুধু কালি, কলম, আর খানিকটা কাগজ দরকার। সংগ্রহ করিয়া দিলে আমায় সরিয়া যাইতে ইশারা করিয়া দোকানের কড়া আলোকে কবচ-রচনায় বসিয়া গেলেন। আমি সেবার আয়োজনে কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

বেশ পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়া বাবাজীর পায়ের কাছে একটি দশ টাকার নোট রাখিয়া বলিলাম, "এই সামান্য পাথেয়, বাবা, ভক্তের নিবেদন…"

বাবাজী খানিকটা ইতস্তত করিয়া নোটটা তুলিয়া লইয়া একটা খাম এবং আরও একটা কিসের ইঙ্গিত করিলেন। আমি শেষেরটা বুঝিতে না পারায় বলিলেন, "গন্দম্—গন্দম।"

খাম এবং গঁদ আনিয়া দিলে আমায় আর এক বার একটু সরিয়া যাইতে বলিলেন। তাহার পর, আবার মিনিট দু-এক পরে ডাকিয়া গঁদ দিয়া সাঁটা খামটা হাতে দিয়া বলিলেন, "কল্য মধ্যাহ্নে—একাকী…নতুবা…"

বাকিটা ইসারায় জানাইয়া দিলেন যে এর ব্যতিক্রম হইলে কবচ একেবারেই নিষ্ফল হইবে, তখন আর কোন উপায়ই থাকিবে না।

* * *

পরদিন ঠিক দুপুরে বাড়ীর চিলের ছাদে গিয়া খামটা সন্তর্পণে খুলিলাম…কবচ নয়, একখানি চিঠি। সংস্কৃতও নয়, তামিলও নয়, তেলেগুও নয়, খাঁটি বাংলা। লেখা আছে—

"বাপু হে, এ কি ব্যবসা হচ্ছে, না, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান? তিন দিন ব'সে ব'সে স্বচক্ষে দেখলাম, কিছু বাইরে থেকেও খোঁজ নিয়েছিলাম, বাকি সব তোমার মুখেই শুনলাম। ব্যবসা করবে ত কায়মনোবাক্যে ব্যবসা কর; যেমন এই আমি করছি, এখন বুঝছ ত? ব্যবসার গোড়ার কথা হচ্ছে—মানুষের আছে কতকগুলি প্রয়োজন আর কতকগুলি দুর্বলতা; এই দুই রাস্তা দিয়ে খুব সন্তর্পণে তার টাকার সিন্দুকের মধ্যে ঢুকে সিন্দুক সাবাড় করতে হবে। এই ব্যবসার শাস্ত্র, এই ব্যবসার স্বধর্ম। করেছ কি? একেবারে "অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার!" পারবে সামলাতে?—ছিলেন অন্নপূর্ণা, আর ওদিকে ঐ একা শিব। তুমি গেরস্ত বাঙালীর ছেলে, পুঁটি মাছের প্রাণ—ঐ একপাল বুভুক্ষু শিবের ম্যাঁও সামলাতে পারবে? হাড়মাস কালি ক'রে কপ্‌নি সার ক'রে ছেড়ে দেবে একেবারে।

"তোমায় পাঁচ ভূতের পাল্লায় প'ড়ে নাজেহাল হ'তে দেখে মনে বড় কষ্ট হওয়ায় একটু আত্মপ্রকাশ করলাম, নয়ত ব্যবসায় আত্মপ্রকাশ করা অধর্ম। কাল আর আমি এখানে নেই, এ ব্যবসার এই নিয়ম। তুমি সমপেশা অর্থাৎ ব্যবসাদার লোক, উচিত না হ'লেও বলি—তের দিনে নেহাৎ মন্দ হ'ল না—এগার জোড়া বস্ত্র, তার মধ্যে একটি গরদের জোড়, টাকা, পয়সা, সিকি, দোয়ানি মিলিয়ে তিপ্পান্নটি টাকা, আরও এটা, ওটা, সেটা। মূলধন তো ধুনীর ছাই, মিছে কথা, মৌন ভাব আর জবাই করা সংস্কৃত,—সে-হিসাবে মন্দ কি? ভগবানও কেমন সহায় দেখ,—ভেবেছিলাম যখন 'গন্দম্' বললাম, ধরে ফেলবে।

"যাক্, কবচের ভূমিকা বেশী হয়ে যাচ্ছে, কাজের কথায় আসা যাক্, অর্থাৎ আসল মন্ত্রে বা মন্ত্রণায়…"

এর পর এক দুই করিয়া সাতটি উপদেশ আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করিতে হইবে। পরিশেষে লেখা আছে, "নোটটি আর নিতে পারলাম না বাপু। ব্যবসার দিক দিয়ে একটু অধর্ম হ'ল, কিন্তু এটুকু দুর্বলতা

আর কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। ফেরত দিয়ে যাচ্ছি।”

৫

এই গেল ওদিককার ইতিহাস। আজ মাস দু-এক হইল বাবাজীর (আমি বাবাজীই বলিব) দুই নম্বর উপদেশ অনুযায়ী সদর চৌমাথার দোকান তুলিয়া দিয়া ভিতরের দিকে একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তার উপর নূতন দোকান খুলিয়াছি। পাঁচ নম্বর উপদেশ অনুযায়ী চাল-ডালের অংশটা তুলিয়া দিয়াছি। বাবাজী (আরও গৌরবপূর্ণ আখ্যা দিতে ইচ্ছা করিতেছে) লিখিয়াছেন— ওগুলা নিছক প্রয়োজনের দ্রব্য,—রাখিলেই আবার চক্রবর্তীর দল জুটিবে। কাপড়ের বিভাগটা টেলারিঙে পরিণত করিয়াছি। স্টেশনারি আছে—কাটছাঁট করিয়া, কেবিনটির উন্নতি হইয়াছে। অর্থাৎ এখন রহিল— টেলারিং, স্টেশনারি আর রেস্তরাঁ, মানে মানুষের সিন্দুকে পৌছবার সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা—তাহার দুর্বলতার দিক।

সবচেয়ে বড়—আগাগোড়া আণ্ডারলাইন করা এক নম্বরের উপদেশটা, অর্থাৎ নামকরণ।

আমার নূতন দোকানের নাম হইয়াছে—“বনলতা ভেরাইটি স্টোরস্ এণ্ড রেস্তরাঁ”। বাবাজী নিজেই দিয়া গিয়াছেন। (প্রভু হে কোথায় গেলে ছলনা করিয়া!)

সাইনবোর্ডের যেখানটা একটি বৃত্তের মধ্যে সোনার হাতা হাতে অন্নপূর্ণা ছিলেন সেখানে একটি বিরাট্ তারকার অভ্যন্তরে ফুলের তোড়া হাতে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ সিনেমা-জ্যোতিষ্ক মিস্ বনলতা। তাহার পরেই জলজলে অক্ষরে ঐ নাম—“বনলতা ভেরাইটি স্টোরস্ এণ্ড রেস্তরাঁ”।

বিক্রয়?—নিজের মুখে বলিতে নাই, আলাদীনের প্রদীপও হার মানিয়াছে। এই দুই মাসে প্রায় হাজার-খানেক টাকা তুলিয়া লইয়াছি, প্রত্যেক আধলাটি নগদ। চক্রবর্তী-মশাইয়ের বড় নাতি রামদুলাল একাই দিয়াছে দেড় শ'টি মুদ্রা,—টেলারিঙে দুইটি স্যুট, পাঞ্জাবী আর কামিজে ৬৩৲ টাকা, রেস্তরাঁ মারফতে দুই মাসে ৫২॥৵১০, আর স্টেশনারি-বিভাগে এসেন্স, সাবান, রুমাল, তেল ইত্যাদি ইত্যাদিতে প্রায় ৩৩৲ টাকা। ছোকরা শৌখীন আর চক্রবর্তী-মশাইয়ের একমাত্র নাতি, তায় নূতন বিবাহ হইয়াছে। এদিকে মনটা দরাজ, রেস্তরাঁতে কখনও একলা প্রবেশ করে না। বলে, “শৈলদা, কি ফ্যাসাদেই ফেলেছিলে। কতবার ওদিক দিয়ে গেছি, নাকে মোগলাই খানার গন্ধ যাচ্ছে, মনে হয় এক বার ঢুকি,— বাব্বাঃ, যা গীতার ধাক্কা! আর এক বারও একটুখানির জন্যে কি খালি করবে জায়গাটা?”

রামদুলাল ছাড়া আরও সব ছোকরার দল; যাঁহারা ওখানে আসিয়া পায়ের ধুলা দিতেন তাঁদেরই বাড়ীর ছেলেরা—সবারই অবস্থা যে ভাল তাহা নয়, কিন্তু সবাই সাধ্যমত পয়সা দেয়, কোথা থেকে পায় তাহারাই জানে, কিন্তু পায়। চমৎকার খদ্দের সব, ওদিকে চুরির ভয় না রাখুক এদিকে দেনার ভয় বা লজ্জাটা আছে। বলি— “ভাই, তোমাদের ভরসাতেই তো এই দোকানটুকু ফাঁদা, আর তোমরা সব নিজের লোক, জানই ত কি লোকসানটা দিয়ে এসেছি ওদিকে।”…খোসামোদ করি— সুখ আছে খোসামোদ করিয়া; নিজেরা প্রাণ খুলিয়া নগদ মূল্যে খায়, মাখে, পরে; আরও পাঁচটাকে জুটাইয়া আনে। ওদিককার খবরও আনিয়া হাজির করে।— “শুনছ শৈলদা, আসছি, শুনি চক্রবর্তী গোঁসাইকে বলছে— ‘আরে রামঃ, আবার ওদিকে?…ছেলেটা শেষে এমন অধঃপাতে গেল’!”…

এখন সন্ধ্যার সময় সিনেমা-জ্যোতিষ্কের প্রসন্ন দৃষ্টির নীচে আমার দোকানের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। তিনটে বিভাগই গমগম করিতেছে; বসিয়া অলস তামাকের সঙ্গে গীতার কর্মযোগের আলোচনা নয়,— যাওয়া-আসা, ফরমাশ, পছন্দ, নগদ মূল্যের ঝনঝনানি। একটা লোকে পারে না, প্রত্যেক বিভাগে একাধিক করিয়া লোক, তবু এক সময় খদ্দের সামলাইতে হিমসিম খাইয়া যায়। আলাপ-আলোচনাও হয় বইকি,—এ-বছরের শ্রেষ্ঠ মূকচিত্রাভিনয়—এ-সপ্তাহের সবচেয়ে বড় রিলীজ, বম্বের রেণুকা দেবী বড়, কি কলিকাতার এরা…বনলতাকে নাকি হলিউড টানিতেছে?—সর্বনাশ, তাহা হইলেই ত

বাংলা অন্ধকার!···কেবিনে দলের মাঝে বসিয়া রামদুলাল বলে, "বনলতার যে-ছবিটা এঁকেছে তোমার সাইনবোর্ডে শৈলদা, হুবহু তার মতন—মার্ভেলাস্! আর ঐ ওর ফেভারিট পোজ্···"

একটু ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর হয়, "কথা বলছিস যেন তোর চাক্ষুষ জানাশোনা!"

রামদুলাল উগ্র হইয়া ওঠে, টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলে, "আলবৎ চাক্ষুষ জানাশোনা, তোদের মত হ্যাণ্ডবিলের ছবি দেখে রামদুলাল চক্রবর্তী কখনও একটা ওপিনিয়ন দেয় না। এই রকম একসঙ্গে ব'সে চা খেয়েছি—বনলতা ওদিকে, আমি এদিকে। চায়ে চিনি কম হয়েছে, চামচে ক'রে কাপে চিনি তুলে দিয়েছি,—আর কি চাস্?"

একটু চুপচাপ থাকে,—অতি-বিস্ময়ের নিস্তব্ধতা; তাহার পর ঈর্ষান্বিত কৌতূহলের প্রশ্ন হয়, "কোন্‌খানে রামদুলুদা?"

"ওদের স্টুডিওতে, আর কোন্‌খানে?"

আর এক জন একটু শঙ্কিত ভাবে বলে, "স্টুডিও ছাড়া বাইরে ওঁদের কারুর সঙ্গে মেলামেশা করবার হুকুম নেই,—বড্ড কড়া পাহারা; ঠিক নয় কি রামদুলুদা?"

রামদুলাল বিদ্রূপ-মিশ্রিত হাস্যের সহিত বলে, "হ্যাঁ, মোগল হারেমের বেগম সব!···তবে হ্যাঁ, এ-কথা বলতে পার যে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা না হ'লে ওরা নিজেই বাইরে বেশী মেশে না কারুর সঙ্গে।···তা ভাই মিছে গুমর করব না, তত বেশী দহরম-মহরম নেই আমার সঙ্গে, অন্ততঃ এখনও হয় নি·"

জমিয়া ওঠে। টেলারিং স্টেশনারি ডিপার্টমেণ্টের খদ্দেররা ভিড় করিয়া কেবিনে জড় হয়। অনুযোগ হয়, "না, তোমার কেবিন বাড়াও শৈলদা, আরও টেবিল দাও, চেয়ার আন,—কি এক হাত × দেড় হাতের কেবিন করেছ মাইরি!···"

চা, চপ, কাটলেট, ডিম, পরোটার টান পড়ে, হারানকে আরও দুই জন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দিয়াছি, তাহারা থই পায় না, দর্জি-বিভাগ থেকে ছোকরা টানিতে হয়।

বনলতার চিত্রাঙ্কিত হাজার-দেড়েক দেয়াল-পঞ্জিকা ছাপাইয়া লইয়াছি, বিলি করি। রামদুলাল ক্যালেণ্ডারটা খুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া ওঠে, "হুবহু! —ওর বিষাদের পোজ্ (ভঙ্গী)।" তাহার পর বলিয়া ওঠে, "বাই দি বাই, তোমরা সবাই এখন এখানে রয়েছ— আসছে মাসে ওর জন্মদিন, বাইশ বছরে পড়বে। ঠিক করেছি বনলতা-জয়ন্তী করব—ওকে টেনে নিয়ে আসব, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের স্টুডিওর কয়েক জন মাতব্বরকেও। দেখ, রাজি সবাই? এক দিনে আমাদের জায়গাটার নাম বেরিয়ে যাবে—চাঁদা দিতে হবে কিন্তু মোটা রকম···"

একটা উল্লসিত অনুমোদন ওঠে। থামিলে রামদুলাল আমার দিকে চাহিয়া বলে, "তোমায় কিন্তু সমস্ত হ্যাপাটি সামলাতে হবে শৈলদা—অতগুলি লোকের খাওয়ান-দাওয়ান—আর সে তোমার গরান্ কাঠের চা আর ইঁদুরের চপে চলবে না ব'লে দিচ্ছি···আর এক কথা, চাঁদা দিতে হবে, ভাবছ যে লাভের দিকটাই থাকবে, চাঁদার বেলা অষ্টরম্ভা দেখাবে, সেটি হচ্ছে না। ভেবে দেখতে হবে কার নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছ শৈলদা; অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারও ত দেখা আছে আমাদের···"

তা আর অস্বীকার করিতে পারি কি? কৃতজ্ঞ চিত্তে বলিলাম, "নিশ্চয় দোব ভাই, তোমরা যা ধার্য ক'রে দেবে। নাম ভাঙিয়ে খাওয়া না-খাওয়ার কথা নয়!— তোমরা অত বড় একটা ইয়ের জয়ন্তী করছ—আমার দোকানেই···কত বড় একটা সৌভাগ্য এটা আমার?"



কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯

বউভাতের নিমন্ত্রণও সাঁওতালেরা গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। শুভার্থী সকলেই নিষেধ করিয়াছিল—হেমাঙ্গিনী বার-বার বলিয়াছিলেন—দেখ আমি বারণ করছি, ও তুমি ক'রে না। বিয়ের রাত্রে যখন আসতে দেয় নি, ওদের, তখন আবার নেমন্তন্ন ক'রে বেচারাদের বিপদে ফেলা কেন? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

সুনীতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—ঝগড়া-বিবাদ ক'রে কাজ নেই দাদা!

ইন্দ্র রায় কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, চোখ বুজিয়া গভীর চিন্তায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিলেন—না। সে হয় না। তার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—উলুখাগড়ার প্রাণ যায় বলে দুঃখ করছ, কিন্তু ও মিথ্যে দুঃখ। এমনি ভাবে মরবার জন্যেই উলুখাগড়ার সৃষ্টি।

হেমাঙ্গিনী সুনীতি দু-জনেই ইন্দ্র রায়ের হাসির ভঙ্গি দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন; ক্ষুরের মতই ক্ষুদ্রপরিসর এবং মর্মান্তিক তীক্ষ্ণধার সে হাসি। ধীরে ধীরে সে হাসিটুকু রায়ের মুখ হইতে মিলাইয়া গেল—গম্ভীর ভাবে এবার বলিলেন—এ সংসারে যার ইজ্জত নেই, তার জাত নেই। এ হ'ল রায়-বাড়ীর চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর ইজ্জত নিয়ে কথা; এ ব্যাপারে তোমরা কথা ব'লো না। তিনি ওপারের চরে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন, শুধু সাঁওতালদের নিকটই নয়, চরের সকলের নিকট—এমন কি বিমলবাবুর নিকট পর্য্যন্ত। নিমন্ত্রণ লইয়া গেল এক জন গোমস্তা ও এক জন পাইক। এক বিমলবাবু ব্যতীত সকলের নিকট মৌখিক নিমন্ত্রণই পাঠানো হইল—কেবল বিমলবাবুর নিকট পাঠানো হইল একখানি পত্র।

চূড়া মাঝি বিব্রত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; অন্যান্য সাঁওতালেরাও নীরবে চিন্তান্বিত মুখে চূড়ার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মুখরা মেয়েগুলি শুধু মৃদুস্বরে আপনাদের মধ্যে দুই-চারিটা কথাবার্ত্তা বলিতেছিল।

গোমস্তাটি বলিল—যাস যেন সব। বুঝলি?

এতক্ষণে চূড়া বলিল—কি ক'রে যাব গো বাবু? দু-বেলা খাটতে হ'ছে যি সায়েবের কলে!

গোমস্তা একটু হাসিয়া বলিল—ভাল। যাস নে তা হ'লে! আর কোন কথা না বলিয়া সে চলিয়া আসিল। কিছুদূর সে চলিয়া আসিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে চূড়া তাহাকে ডাকিল—

—বাবু মাশয়! গোমস্তাবাবু!

—কি?

—বাবু মাশয়; সাহেব যি রাগ করছে গো! বুলছে তুদের বাড়ী যেলে পরে—ইখান থেকে—তাঁড়ায়ে দিবে!

—আচ্ছা—তাই বলব আমি কর্ত্তাবাবুকে।

চূড়ার বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল—সে বলিল—না গো বাবু মাশয়; তা বুলিস না গো; সায়েবটি রাগ করবে গো!

গোমস্তা কোন উত্তর দিল না, অতি সূক্ষ্ম ঘৃণার হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল। চূড়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, ভয়ে তাহার পা দুইটি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, আঃ—কেন সে এ-কথাটা তাহাকে বলিল!

সাঁওতালেরা আসিল না।

শুধু আসিল না নয়, সন্ধ্যা হইতেই চরের বুকে মাদল, করতাল ও বাঁশীর সমবেত ধ্বনিতে একটি উৎসবের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল। বিমলবাবু পাকা ব্যবসায়ী; এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে সাঁওতালদের মনঃক্ষুণ্ণতার কথা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তিনি অপরাহ্ণে তাহাদের

ডাকিয়া প্রচুর পরিমাণে মদের এবং দুইটা শূকরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বলিলেন—খুব নাচগান করতে হবে তোদের।

'হাঁড়িয়া'র কথা শুনিয়াও প্রথমটা কেহ উৎসাহ প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বিমলবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়াও কোন কথা বলিলেন না, একেবারে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট অচিন্ত্যবাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—একখানা দশ টাকার ভাউচার করুন তো। সাঁওতালদের বকশিশ। আর মদের দোকানের ভেণ্ডারকে একখানা স্লিপ লিখে দিন, সাঁওতালদের যে যত খেতে পারে মদ দেয় যেন। আপ-টু-টেন রুপিজ।

টাকাটা হাতে পাইয়া তাহাদের মন ঈষৎ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। তার পর মদের দোকানে আসিয়া তাহারা পরস্পরের মধ্যে খানিকটা জোর তর্ক আরম্ভ করিয়া দিল; কেহ কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতেছিল না, সকলেই বলিতেছিল—

—রাঙাবাবু কি বুলবে?

—উয়ার শ্বশুরটি? বাবা রে, বাঘের মতন তাকানি উয়ার! উ কি বুলবে?

—রাগ কোরবে, ধোরে লিয়ে যাবে! তখুন কি হবে?

—ইধারে সায়েব রাগ কোরছে। বাবারে, উ তো কম লয়! উয়ার আবার বন্দুক আছে—মেরে ফেলাবে গুলি দিঁয়ে।

এই তর্কের মধ্যেই মদ আসিয়া পৌঁছিল। কিছুক্ষণ পর তাহাদের তর্ক ভীষণাকার ধারণ করিল—উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করিয়া সকলেই বলিতেছিল—কি কোরবে রাঙাবাবুর শ্বশুর আমাদের? আমরা উয়াকে মানি না।

—আমাদের সায়েব রইছে, উয়াকেই আমরা মানব—হেঁ—!

অতঃপর মেয়েদের জন্য প্রকাণ্ড জালাতে করিয়া মদ লইয়া তাহারা পাড়ায় ফিরিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাদল করতাল বাঁশী বাজাইয়া প্রচণ্ড উৎসাহে নাচগান জুড়িয়া দিল।

* * *

বউভাতের খাওয়ান-দাওয়ানের জের তখনও মেটে নাই, তবে প্রধান অংশ শেষ হইয়া আসিয়াছিল। পরিবেশনকারীর দল ও ঠাকুর-চাকরদের খাওয়ান হইতেছিল। ইন্দ্র রায় নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের খাওয়ার তদারক করিতেছিলেন। মাদল-করতাল-বাঁশীর উচ্ছ্বসিত ধ্বনি আসিয়া কানে প্রবেশ করিতেই তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। মনে মনে ব্যাপারটা তিনি অনুমান করিয়া লইলেন।

অমল কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত ছিল—তাহাকে ডাকিয়া খাওয়ান-দাওয়ানের ভার দিয়া তিনি রামেশ্বরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। রামেশ্বর খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার প্রায়-পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আলোকিত উন্মত্ত সঙ্গীতমুখর ওই চরটার দিকেই চাহিয়াছিলেন।

রায় ডাকিলেন—রামেশ্বর!

রামেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—কে?

—আমি ইন্দ্র!

—ইন্দ্র! এস, এস ভাই। খাওয়ান-দাওয়ান সব হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। আমি নিজে দাঁড়িয়ে সব শেষ ক'রে তোমার কাছে আসছি! যারা কাজকর্ম্ম করেছে তারাই খাচ্ছে এখন; অমল দাঁড়িয়ে দেখছে সেখানে।

রামেশ্বর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন—বউমা—বউমা!

রায় হাসিলেন, উমার শ্বশুর উমাকে ডাকিতেছেন। বধূবেশিনী উমা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বাবাকে দেখিয়া একটু হাসিল,—হাসিয়া সে শ্বশুরের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমাকে ডাকছিলেন?

রামেশ্বর বলিলেন—হ্যাঁ রে বেটী, হ্যাঁ। আমার মা হয়ে তোর কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই! দেখছিস না কে এসেছেন! সমস্ত দিন তোর বাড়ীতে খাটলেন, এখনও মুখে জল দেন নি। দে, হাত-পা ধোবার জল দে। খাবার জায়গা ক'রে দে! এ ঘরে নয়—অন্য ঘরে মা। চকিতে তাঁহার দৃষ্টি একবার আপনার হাত দুইখানির দিকে নিবদ্ধ হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

রায় হাসিয়া বলিলেন—হাত-মুখ আমি ধুয়েছি; খাবার জায়গা করতে নেই—ও থাক।

চকিত হইয়া রামেশ্বর প্রশ্ন করিলেন—কেন ইন্দ্র? খাবার জায়গা করতে নেই কেন?

—তুমি একটি মূর্খ! রায় হাসিয়া বলিলেন—কাকে কোলে ক'রে খেতে বসব? দাঁড়াও আমার দাদুভাইয়ের আগমন হোক, তবে তো!

বার-বার ঘাড় নাড়িয়া রায়ের কথা স্বীকার করিয়া রামেশ্বর বলিলেন—বটে, বটে! তুমি যখন দাদুভাইকে কোলে নিয়ে খেতে বসবে ইন্দ্র, সেদিন যে আমার ঘরের কি শোভাই হবে হে, আমি সে কল্পনাই করতে পারছি না। কবি কালিদাসও এর উপমা দিয়ে যান নি হে! কুমার কার্ত্তিকেয়কে গিরিরাজের কোলে দিয়ে তিনি দেখেন নি। সূর্য্যবংশের রাজারা তো পুত্র উপযুক্ত হ'লে গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকতেন না! আমাকেই একটা শ্লোক রচনা করতে হবে দেখছি!

উমা এ-কালের মেয়ে হইলেও বাঙালীর মেয়ে—সে লজ্জায় ঘামিয়া উঠিতেছিল, লজ্জার রক্তোচ্ছ্বাসে তাহার সুন্দর মুখের প্রসাধন-শুভ্রতাও রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর সারাটা মুখ ভরিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম। ইন্দ্র রায় তাহাকে পরিত্রাণ দিলেন—তিনি বলিলেন—উমা, তুই যা মা—তোর শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়া হ'ল কি না দেখ। তোর মাকেও বল একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিতে সব।

উমা পলাইয়া আসিয়া যেন বাঁচিল, ঘর হইতে বাহির হইয়া দরদালানের নির্জ্জনতায় আসিয়া পুলকিত সলজ্জ হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

বাড়ীর বাহিরের দিকের টানা বারান্দায় রেলিংয়ের উপর মাথা রাখিয়া সুনীতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেলে তিনি অবসর পাইয়া কাঁদিতে আসিয়াছিলেন মহীনের জন্য।

তাঁহার মহীন—দীর্ঘদেহ, সবলপেশী, উদ্ধতদৃষ্টি, উন্নতশির মহীন্দ্র! প্রথমে তো তাহারই বধূর কল্যাণঘট কাঁখে করিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিবার কথা! অহীন্দ্রের বিবাহে তাহারই দৃপ্ত উচ্চ আদেশ-ধ্বনিতে এ-বাড়ীর প্রতিটি কোণ মুখরিত হইয়া থাকিবার কথা!

এ সর্ব্বনাশ না হইলে হতভাগ্য ননী পালও আজ এ বাড়ীতে খাইয়া হাসিমুখে বলিত—আঃ খুব খেলাম বাপু!

বেচারা নবীন বাগ্দী আর তাহার সঙ্গী কয়জনকেও অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল। সেই অজানা মুসলমান লাঠিয়ালটি—যে নবীনের লাঠির আঘাতে মরিয়াছে, সে থাকিলে সেও আজ আসিয়া বকশিশ লইয়া যাইত—লুচি মিষ্টি খাইয়া যাইত!

একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি চন্দ্রালোকিত চরটার দিকে চাহিলেন। আজও সাঁওতালেরা খাইতে আসে নাই; কলের মালিকও খাইতে আসে নাই। ও-বাড়ীর দাদার মুখ থমথমে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে! তাহার উপর মাদল-করতাল-বাঁশী বাজাইয়া এ উহারা করিতেছে কি? না না না—এটা উহারা বিষম অন্যায় করিতেছে। স্তব্ধ হইয়া তিনি চরটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এত উচ্চ রূঢ় বাজনা কখনও বাজে না। বিরোধ বাধাইতে উহারা বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। ডঙ্কা বাজাইয়া চরটা যেন যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে! আতঙ্কে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পায়ের তলায় বাড়ীটা যেন দুলিয়া উঠিল—চোখের সম্মুখে চরটা যেন ঘুরিতেছে!

উমা আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল।

সুনীতি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন—উমা? বউমা?

অন্ধকারের মধ্যে মৃদু হাসিয়া উমা বলিল—আপনি খাবেন আসুন মা! পরক্ষণেই এই গিন্নীপনার জন্য লজ্জা অনুভব করিয়া সে বলিল—মা নীচে ডাকছেন আপনাকে। এই মা অর্থে তাহার মা হেমাঙ্গিনী।

সুনীতি যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিচলিত মস্তিষ্কের রক্তের চাপে স্নায়ু-শিরার চাঞ্চল্যে চরটাকে তিনি ঘুরিতে দেখিয়াছেন; ঐ মাদল ও করতালের উচ্চ ধ্বনির মধ্যে তিনি যুদ্ধোদ্যমের ঘোষণা শুনিয়াছেন! তাঁহার ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু মনও আজ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। এই মুহূর্ত্তেই সম্মুখে বধূকে দেখিয়া সে কম্পন-চাঞ্চল্য যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অহীন্দ্রের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কোন মতেই তাহাকে সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে তিনি দিবেন না। যেমন করিয়া হউক নিবারণ

তিনি করিবেন ; ও-বাড়ীর দাদার পায়ে তিনি উমাকে ফেলিয়া দিবেন। অহীন্দ্রের গৃহদ্বারের দুই বাজুতে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া তিনি নিজে দাঁড়াইবেন।

উমা আবার ডাকিল—মা!

উত্তরে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন—অহীন কোথায় বউমা?

উমা লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। সুনীতি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

অহীন্দ্র পড়ার ঘরে বসিয়াছিল। একখানা মোটা বইয়ের মধ্যে আঙুল পুরিয়া সে মানদার মুখের দিকে হাসিমুখে চাহিয়া তাহার তিরস্কার শুনিতেছিল।

মানদা তাহাকে তিরস্কার করিতেছিল—না বাপু এ কিন্তু আপনার কাজ ভাল নয় দাদাবাবু, সে আপনি যাই বলুন—হ্যাঁ! আজকে হ'ল মানুষের জীবনের একটা দিন! আজ পাঁচ জনা মেয়েছেলে এসেছে, ঠাট্টা-তামাশা করবে; গান করবে—ছড়া কাটবে—আপনি গান করবেন। ফুলশয্যের দিন! আর আপনি ইয়া মোটা একটা বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে বসে রয়েছেন।

অহীন্দ্র কোন উত্তর দিল না—মৃদুহাসিমুখেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মানদা কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল—বলি উঠবেন কি না বলুন? উঠে আসুন কাপড় ছাড়বেন, মেয়েরা সব গজগজ করছেন।

সুনীতি আসিয়া প্রবেশ করিলেন; মানদা অভিযোগ করিয়া বলিল—এই দেখুন, মা চলে এসেছেন। দেখুন মা ছেলের আপনার করণ দেখুন, আজকের দিনে একখানা গাঁদা বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে বসে রয়েছেন। এলাম যদি তা মানুষের খেয়াল নাই। কি রস যে ঐ কালির হিজিবিজির মধ্যে আছে—কে জানে বাপু!

সুনীতি বলিলেন—চল তুই মা, মানদা, আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

মানদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—নাও হ'ল! আপনি আবার ধম্ম-কথা আরম্ভ করুন এখন এক পহর! ওদিকে মেয়েরা সব চ'লে যাক।

—না রে, না। চল তুই, আমি এলাম ব'লে ওকে নিয়ে। এই উদ্‌ভ্রান্ত মনেও সুনীতি মানদার স্নেহের শাসনে হাসিয়া আনুগত্য না জানাইয়া পারিলেন না।

অহীন্দ্রও মনে করিল—সুনীতি তাঁহাকে ডাকিতেই আসিয়াছেন, সে বইখানার মধ্যে সুদৃশ্য একটি কাগজের লম্বা টুকরা দিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—চলেছি মা আমি। তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল—বইখানা বড় ভাল বই মা, পড়তে ব'সে আর ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।

—কি বই রে?

—পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা—জাতিতে তিনি জার্ম্মান, তাঁর নাম কার্ল মার্ক্স! আমরা যাঁকে বলি ঋষি, তিনি তাই। পৃথিবীর এই যে ছোটবড় ভেদাভেদ; অসংখ্য কোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস; রাজ্যসম্পদ নিয়ে এই যে হিংস্র পশুর মত মানুষের কাড়াকাড়ি—তিনি তার কারণ নির্দ্ধারণ করেছেন আর নিবারণের উপায়, পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন।

সুনীতি মুগ্ধবিস্ময়ে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পৃথিবীব্যাপী সম্পদ লইয়া কাড়াকাড়ি, হিংসাদ্বেষ, দারিদ্র্য নিবারণের উপায়! কয়েক মুহূর্ত্ত পর তিনি অভিভূতের মত বলিলেন—সে উপায় তবে কেন মানুষ নেয় না অহি?

অহি হাসিয়া বলিল—সে-পথে বাধার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদার ধনীর দল মা! আমরা—ওই বিমলবাবু! আমাদের এই প্রভুত্ব, এই পাকাবাড়ী, জমিদারী চাল, সুখস্বাচ্ছন্দ্য তা হ'লে যে থাকবে না মা! সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি যা করি আমরাই তো করি, নিরীহ গরীবের সম্পত্তি অর্থ কেড়ে নিয়ে আমরাই তো তাদের গরীব ক'রে দি। ঐ চরটার কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে। চর উঠল নদীর বুকে—একেবারে নূতন এক টুকরো মাটি—

সুনীতি মধ্যপথেই বাধা দিয়া বলিলেন—আমি ওই চরের কথাই তোকে বলতে এসেছি অহি! চর নিয়ে যে আবার বিরোধ বেধে উঠল বাবা!

অহীন্দ্র হাসিল, বিচিত্র সে হাসি। বলিল—বিরোধ

তো বাধবেই মা। এক দিকে জমিদার, অন্য দিকে মহাজন। এ বিরোধ যে অবশ্যম্ভাবী!

সুনীতি আর্ত্তভাবে বলিলেন—ওরে এ চরে আমাদের কাজ নেই, তুই বল' তোর শ্বশুরকে। ওটা বিক্রী করে দিন। ওই চর আমার সর্ব্বনাশ করবে রে!

অহীন্দ্র বলিল—ও-কথাটা তোমার স্বীকার করতে পারলাম না মা। অপরাধ চরের নয়—অপরাধ আমাদের।

—তুই জানিস নে অহীন—সে তোরা বুঝতে পারিস নে—সে তোরা দেখতে পাস নে! আমি বুঝতে পারি, দেখতে পাই! সুনীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—যেন সে-দৃষ্টির সম্মুখে চরটার রহস্যময় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া শূন্যলোকে ভাসিতেছে!

মায়ের সে ভয়কাতর বিবর্ণ মুখ দেখিয়া অহীন্দ্র স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল—তুমি এত ভয় কেন পাচ্ছ মা? কিসের ভয়?

—ওরে তুই বল চরটা বিক্রী ক'রে দেওয়া হোক। আর তুই যেন এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে যাস নে বাবা! ওরে তোদের বংশের রাগকে আমি বড় ভয় করি রে! রাগের বশে মহীন কি সর্ব্বনাশই করলে বল দেখি?

অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ননী পালের রক্তাক্ত দেহ! তার পরই সে দেখিল কাঠগড়ার মধ্যে তাহার দাদাকে; শীর্ণ কিন্তু দৃপ্ত মুখ, অনবনত ঋজু দেহ! একটা উন্মাদনা তাহাকে স্পর্শ করিল। ওই কুটিলচক্রী কলওয়ালা যাহাকে সাঁওতাল-রমণীরা বলিয়াছে পাহাড়ে চিতি, নিষ্ঠুর অজগর, উহার দেহটা যদি সে এমনি ভাবে লুটাইয়া দিত—!

সুনীতি কাতর স্বরেই ডাকিলেন—অহীন!

অহীন্দ্র চমকিয়া উঠিল। সুনীতি বলিলেন—চল, তুই এক বার চল—তোর বাপ আর ও-বাড়ীর দাদা বোধ হয় ঐ চরের কথাই বলছেন। তুই চল।

* * *

রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিয়া মাতাপুত্রে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রামেশ্বরের সে মূর্ত্তি অদ্ভুত; অহীন্দ্র জীবনে কখনও দেখে নাই, সুনীতি বহুপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন—এ-কালে সে-মূর্ত্তি আর স্মরণেও আনিতে পারিতেন না। স্থাণুদেহ তিনি সোজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছেন লোহার খুঁটির মত, শীর্ণ হাতের আঙুলগুলিতে তীক্ষ্ণ দৃঢ় বাঘনখের মত ভঙ্গি করিয়া রায়কে তিনি বলিতেছিলেন · মুণ্ডুটা তার ছিঁড়ে আনতে পারা যায় না ইন্দ্র—কিংবা অমাবস্যার রাত্রে মা সর্ব্বরক্ষার কাছে বলি?

রায় বলিলেন—না। সে কাল আর নেই রামেশ্বর; এখন আমাদের আইনের পথ ধ'রেই চলতে হবে। আইন বাঁচিয়ে দাঙ্গা করতে পেলে পেছুব না। আমাদের খাসের জমি—যেগুলো সাঁওতালদের ভাগে দেওয়া আছে—কালই সেগুলো দখল করতে হবে। আর ওই যে বললাম—কালিন্দীর বুকে বাঁধ দিয়ে পাম্প বসিয়েছে—ওটাকে তুলে দিতে হবে। বাধবে, দাঙ্গা ঐখানেই বাধবে!

অহীন্দ্র বলিল—মা একটা কথা বলছেন। তিনি চান না যে, চর নিয়ে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। তাঁর একটা অদ্ভুত সংস্কার রয়েছে যে, চরটা থেকে কেবল আমাদের অমঙ্গলই হচ্ছে। সেই জন্যে তিনি চান যে, চরটাকে বিক্রী ক'রে দেওয়া হোক—

বজ্রগর্ভ স্বরে রামেশ্বর বলিলেন—না।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় দৈহিক দুর্ব্বলতা, মানসিক বিহ্বলতা বিস্মৃত হইয়া রামেশ্বর অকস্মাৎ যেন পূর্ব্ব-রামেশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন।

রায় বলিলেন সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া—তোমার কাছে আমি এই কথাটা শুনব প্রত্যাশা করি নি বোন। যাক, তুমি কোন ভয় ক'রো না, যা করবার আমি করব।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই অমলের সঙ্গে দেখা হইল—অমল হাত-পা ধুইয়া অহীন্দ্রের সন্ধানেই উপরে আসিয়াছিল। তাহার স্বাভাবিক মুখরতা আজ আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল—বাপ রে, বাপ রে, খুব খাটিয়ে নিলে যা হোক। আমার বিয়েতে আমি এর শোধ নেব, দাঁড়াও না!

অহীন্দ্র একটু হাসিল—অর্থহীন হাসি; অমলের কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই পায় নাই। সে বলিল—চর নিয়ে আবার দাঙ্গা বাধল। কাল সকালে!

অমল বলিল—দাঙ্গাটাঙ্গা না ক'রে ঐ লোকটাকে, দ্যাট কলওয়ালাটাকে হুইপ করা উচিত।

অহীন্দ্র আবার একটু হাসিল। অমল বলিল—বিয়েটা না চুকতেই দাঙ্গাটাঙ্গাগুলো না করলেই হ'ত! কিন্তু না ক'রেই বা উপায় কি? লোকটা যেন দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে উঠেছে।

অহীন্দ্র হাসিয়া এবার বলিল—

বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী
দেখা দিবে রাজদণ্ড রূপে।

সুতরাং তার গতিরোধের চেষ্টা করা রাজকুলের স্বাভাবিক।

অমল হাসিয়া বলিল—তুমি যেন নিজেকে রাজকুল থেকে বাদ দিতে চাইছ মনে হচ্ছে! বুদ্ধদেব হয়ে উঠলে যে! ওরে উমা!

হাসিয়া বাধা দিয়া অহীন্দ্র বলিল—ভয় নেই, এ যুগে গৌতমেরা সংসার ত্যাগ ক'রে নির্ব্বাণের জন্য বনে যান না। এ যুগের নির্ব্বাণ নিহিত আছে সমাজের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে, রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে। ঘরে ব'সেই সে তপস্যা চলে; সুতরাং উমানামধারিণী গোপাকে ডেকে সাবধান করার কোন প্রয়োজন নেই।

৩০

জমিদার-পক্ষকে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। লোক জুটিয়া গেল বিস্তর। আদেশ অথবা অনুরোধ করিয়াও লোক ডাকিতে হইল না। আপনা হইতেই গ্রামের সমস্ত চাষী হাল-গরু লইয়া ছুটিয়া আসিল—দলের সর্ব্বাগ্রে আসিল রংলাল। চরের উর্ব্বর মাটির উপর লোভের নিবৃত্তি তাহাদের কোন দিনই হয় নাই। নিরুপায়ে সে কেবল নিরুদ্ধ হইয়াছিল। সংবাদটা পাইবামাত্র তাহারা পুলকিত হইয়া সাঁওতালদের সযত্নে-গড়িয়া-তোলা জমিগুলি দখল করিতে উদ্যত হইয়া উঠিল। বাগ্দীপাড়ার নবীনের দল এবং রায়দের অনুগত বাগ্দীর দল লাঠি হাতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর খাসদখলি জমির সীমানার মাথায় খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চাষীরা বিপুল উৎসাহে গরু-গুলিকে প্রচণ্ড চীৎকারে তাড়না করিয়া জমিগুলির উপর লাঙল চালাইয়া দিল—হেৎ! তা-তা-তা তা—! তা-হেৎ! হেৎ!

সাঁওতালদের পুরুষের দল আপনাদের পাড়ার প্রান্ত-ভাগে উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শক্তিমত্ত দখলকারী জনতার দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিল। তাহাদের পিছনে মেয়েদের দল ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। কেহ কেহ গালি পাড়িতেছিল আপনাদের পুরুষদের—কেন মিছামিছি রাঙাবাবুদের সহিত বিবাদ করিলি তোরা? এ তোদের উপযুক্ত হইয়াছে—ঠিক হইয়াছে! সায়েব ওদিকে জমি কাড়িয়া লইয়াছে, এদিকে রাঙাবাবু জমি কাড়িয়া লইল—এই বার কি করিবি কর! মরিতে হইবে, না খাইয়া, শুকাইয়া মরিতে হইবে।

এক বৃদ্ধা আক্ষেপ করিয়া বলিল—আমি তখুনি বললম গো—তুরা চিবাস মোড়লের কাছে লিস না—ধান ধার তুরা লিস না। 'কাই হড়' (পাপীলোক) বেটে-উ—; হিঁদু সাউয়েরা পুরানো বাঘ বেটে! হাড্ডি তাকাত্ চিবায়ে খাবে উ! লে—ইবার—হ'লো তো! আঃ হায় হায় গো!

এক জন বলিল—উয়ার কি দোষ হ'ল—? উ কি করবে?

—দোষটি তবে কার হ'লো? উ নোকটি যদি সায়েবকে খতগুলি বেচে না দিথো, তবে সায়েব কি ক'রে জমিগুলান লিথো? কি ক'রে জমিদার হথো উ?

একটি তরুণী বলিল—হে। তা হ'লে রাঙাবাবুর বিয়াতে যেতে কি ক'রে মানা করত?

চূড়া মাঝির স্ত্রী এবং আর কয়েক জন মাতব্বর মাঝির স্ত্রী অঝোরঝরে কাঁদিতেছিল—করুণ মৃদুস্বরে বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছিল—আঃ—আঃ—হায় হায় গো! সব জমিন-জেরাত চলে গেল গো! এখুন যে পরের দুয়ারে চাকর খাটতে হবে গো! নইলে ভিখ মাগতে হবে; গুঁগা (বোবা) ভিখ করে গো! কাঁড়া (অন্ধ) ভিখ করে গো! লেঢা (খোঁড়া) ভিখ করে গো! উয়াদিগে যেমন থো (থুথু) দেয় তেমুনি ক'রে থো খেতে হবে—হায় বাবা গো! হায় বাবা গো!

বাগ্দী লাঠিয়ালেরা প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে শূন্যের সহিত লড়াই জুড়িয়া দিল। অকারণে লাঠি ঘুরাইয়া, হাঁক মারিয়া, কুক্ দিয়া তাহারা যেন তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল। আসিয়াছিল তাহারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনায় সতর্ক ধীরতার সহিত সংযত পদক্ষেপে; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস আত্মপ্রকাশ করিল বাঁধ-ভাঙা জলের মত। জমির উপরে লাঙলগুলাও বিশৃঙ্খল গতিতে যেন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। চাষীরাও যেন উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে গরুগুলিকে ছুটাইয়া গরু-দৌড় প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই সমগ্র ভূমি-খণ্ডটাই এলোমেলো ভাবে কর্ষিত হইয়া গেল।

রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর দুই নায়েবই উপস্থিত ছিল। এই মাতনের ছোঁয়া তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাহারা দৃপ্ত উল্লাসে এইবার হুকুম দিল—কাটো এইবার কালিন্দীর বাঁধ। পাইপ-টাইপ সব উখার দেও! উত্তেজনায় খানিকটা হিন্দীও বাহির হইয়া গেল।

লাঠিয়ালের দল গিয়া পড়িল বাঁধের উপর; এইবার তাহারা একটু সতর্ক হইয়া সংযত হইল। কলের কুলির দল অদূরে জটলা বাঁধিয়া বসিয়া আছে।

আশ্চর্য্যের কথা—তাহারাও কেহ আগাইয়া আসিল না। ইহারা বাঁধ কাটিয়া পাইপ ছাড়াইয়া তছনছ করিয়া দিল—তাহারা দর্শকের মত দাঁড়াইয়া দেখিল মাত্র। জনতা হইতে দূরে একটি গাছতলায় একা দাঁড়াইয়া একটি দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েও সমস্ত দেখিতেছিল। 'এ-সবের কোন কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিল না, এ সমস্তের কোন অর্থই তাহার কাছে নাই।

মুখার্জ্জীসাহেব কাল হইতে তাহাকে বাংলোর আউট-হাউস হইতে সরাইয়া দিয়াছেন; কুলি-ব্যারাকের মধ্যে সে এবার বসতি পাতিয়াছে। সরকারবাবু শূলপাণি রায় বাছিয়া বাছিয়া বেশ ভাল ঘরখানিই তাহাকে দিয়াছে; খুব তেজী পাকি-হাঁড়িয়াও তাহাকে খাওয়াইয়াছে! তাহার মাথাটা এখনও কেমন করিতেছে! সে শুধু দেখিতেছিল—অনেক লোক—অনেক লোক; বাবা রে! রাঙাবাবু কই? না—সে নাই! সায়েব কই? লম্বা চোঙার মত বন্দুকটা লইয়া সে তো কই তাক করিয়া এখনও দাঁড়ায় নাই! বাবারে!

* * *

সত্য সত্যই বিমলবাবু এত বড় উত্তেজিত আহ্বানের উত্তরেও একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোন উদ্যম প্রকাশ তিনি করিলেন না। তিনি যে প্রস্তুত ছিলেন না তাও নয়। সংবাদ তিনি বেশ সময় থাকিতেই পাইয়া-ছিলেন। পূর্ব্বদিন রাত্রির প্রথম প্রহরেই সংবাদটা তাঁহার কানে আসিয়া পৌছিয়াছিল।

সংবাদ দিয়াছিলেন অচিন্ত্যবাবু। কথাটা কানে উঠিবা-মাত্র তিনি ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রায় মহাশয় ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর লাঠিয়ালেরা তো সামান্য জীব নয়—উহারা প্রত্যেকেই ডাকাত! নবীন বাগ্দীর এক লাঠির ঘায়ে মুসলমান লাঠিয়ালের মাথা ডিমের খোলার মত ফাটিয়া গিয়াছিল; ইহারা সব তাহারই সাকরেদ-দোসর! ওদিকে মিষ্টার মুখার্জ্জীর হিন্দুস্থানী কুলীর দল তো সাক্ষাৎ যমদূতের দল। তাহার উপর সাহেবের বন্দুক গুলি একেবারে তৈয়ারি হইয়াই থাকে। কোন রকমে যদি একটা তাগ ফস্কাইয়া বিপথে ছোটে, তবে যে কাহাকে খতম করিবে সে কে বলিতে পারে? হরেকে ত্যাগ করিয়া শঙ্করাকে মারাই বাঙালীর অভ্যাস! আর বাগ্দী-লাঠিয়ালের দল যদি আপিস চড়াও করে তবে তো ভীষণ বিপদ! তিনি তৎক্ষণাৎ পরদিন ছুটি লইবার সংকল্প করিলেন এবং সেই রাত্রেই নগদ দুই আনা পয়সা দিয়া একজন ডোমকে সঙ্গে লইয়া বিমলবাবুর বাংলোয় হাজির হইলেন।

বিমলবাবু তখন সারীকে বাংলো হইতে তাড়াইয়া দিয়া সবে পঞ্চম পেগ লইয়া বসিয়াছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—কি ব্যাপার? এত রাত্রে?

একখানা দরখাস্ত আগাইয়া দিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—আজ্ঞে ছুটি স্যার।

—ছুটি? কেন?

—আজ্ঞে আমার স্ত্রী—স্যার—

—ক-দিনের জন্যে?

—দু-দিন আজ্ঞে—দু-দিন স্যার!

—এর জন্যে এই রাত্রে আপনি জ্বালাতে এসেছেন? ননসেন্স! দরখাস্তখানা তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার বলিলেন—আচ্ছা আসবেন না দু-দিন।

অচিন্ত্যবাবু সবিনয়ে বলিলেন—আজ্ঞে আরও একটা খবর আছে; জমিদারেরা ফৌজদারী করবার জন্যে সাজছে!

—ফৌজদারী? বিমলবাবু সজাগ হইয়া বসিলেন।

সবিস্তারে সমস্ত বলিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন—সেই জন্যেই আমার আরও আসা স্যার।

বিমলবাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অচিন্ত্যবাবু সরিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

গভীর চিন্তা করিয়াই বিমলবাবু কোন উদ্যম প্রকাশ করিলেন না। সকালবেলা হইতেই যোগেশ মজুমদার এবং জমিদারী-বিদ্যা-বিশারদ হরিশ রায়কে লইয়া চার-পাঁচটি ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার আরজির খসড়া প্রস্তুত করাইতে বসিলেন।

* * *

ওদিকে দীর্ঘকাল পরে চক্রবর্ত্তীবাবুদের কাছারি-বাড়ী গম গম করিয়া জাঁকিয়া উঠিল। চাষী-প্রজার দল ও বাগদী-লাঠিয়ালেরা কাছারির বারান্দা পরিপূর্ণ করিয়া আসিয়া বসিল। নায়েব-গোমস্তারা ডেমিতে ভাগচাষের কবুলতি লিখিতেছে; ঐ সব দখল-করা জমি চাষীদের ভাগচাষে বিলি হইবে। রায় প্রসন্ন তৃপ্ত মুখে বসিয়া আছেন, তাঁহার মনের গ্লানি অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে। প্রসন্ন মনেই তিনি নূতন কোন দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা চিন্তা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্তানিবিষ্ট মনে বোধ করি আপনার অজ্ঞাতসারেই অজগরের মত মৃদু মৃদু ঢুলিতেছেন। সহসা একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উচ্চধ্বনি কানে আসিয়া পৌছিতেই প্রচ্ছন্ন কৌতুকের অস্পষ্ট হাসি হাসিয়া সজাগ হইয়া উঠিলেন। কণ্ঠস্বরটি অচিন্ত্যবাবুর; কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি পথ দিয়া চলিয়াছেন; —স্লো অ্যাণ্ড ষ্টেডী উইন্‌স্ দি রেস! ঈসপস্ ফেবল পড়েছ? দি হেয়ার অ্যাণ্ড দি টরটইজ গল্প? ইংরেজের আইনে—নো লাঠি অ্যাণ্ড নো ফাটি। ব্রেন অ্যাণ্ড মানি চাই। পাঁচ-পাঁচখানি ফৌজদারী মোকদ্দমা! অল বেষ্ট প্লীডার্স এনগেজ্‌ড্! সিরিয়স চার্জ্জ; রায়টিং ট্রেসপাস, অ্যাণ্ড—অনেক কিছু। এই চলল লোক—লরীতে চড়ে!

রায় হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—ও অচিন্ত্যবাবু! ও মশায়। তাঁহার কথাকে ঢাকিয়া দিয়াই অচিন্ত্যবাবুর ত্বরিত উত্তর ভাসিয়া আসিল—আই ডোণ্ট নো এনিথিং! আই ডোণ্ট নো!

আরও কিছু তিনি বলিলেন—কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান দূরত্ব হেতু সেগুলি এত অস্পষ্ট যে, তাহার কিছুই বুঝা গেল না। ইন্দ্র রায় কিন্তু অনেক বুঝিলেন—এবং খাড়া হইয়া বসিয়া গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করিলেন।

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—মিত্তির!

প্রবীণ মিত্তিরও কথাগুলির কিছু-কিছু বুঝিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কাজ ছাড়িয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রায় বলিলেন—সদরে যাবার পথে গ্রাম পেরিয়েই যে সাঁকোটা আছে ওটাকে—।

পাকা নায়েব মুহূর্ত্তে উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হ'লে আর লরী যেতে পারবে না। আদ্ধেকখানা খসিয়ে দিলেই হবে। সে-ব্যবস্থা আমি করছি। আমাদের চাষবাড়ীতে গাঁইতি আছে—আধ-ঘণ্টায় কাজ হাঁসিল হয়ে যাবে!

রায় বলিলেন—সকলের চেয়ে যে 'পাউড়ে' তাকে পাঠাও সদরে! মুখুজ্জে সেন আর সিংহীকে ওকালতনামার বায়না পাঠিয়ে দাও। ওদের চেয়ে ফৌজদারী উকীল আর ভাল কেউ নেই।

নায়েব লঘু দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

রায় ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন।

* * *

বাড়ীর ভিতরে বিবাহের গোলযোগ তখনও প্রায় পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। বউভাত মিটিয়া গিয়াছে—আজ বাসি ভোজ, পরিবেশক, ঠাকুর-চাকর, আত্মীয়বন্ধু-স্বজন-বর্গকে ভাল করিয়া খাওয়ানো হইবে। তাহার সঙ্গে এই দাঙ্গার সমস্ত লোকগুলিকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবাহের ভাণ্ডারে গ্রামেরই কয়েকজন পাকা দোকানদার

ভাণ্ডারীর কাজ করিতেছে। তাহারা লোক হিসাব করিয়া জলখাবার মাপিতে ব্যস্ত। মানদা চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে—বাড়ীর মধ্যে দাঙ্গার উত্তেজনাটাকে সে একাই বজায় করিয়া রাখিয়াছে। হেমাঙ্গিনী সমস্ত দিকের তদ্বির-তদারক করিতেছেন। সুনীতি সমস্ত সকালটা প্রাণহীন প্রতিমার মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ঐ চরটার কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন। চরের মাটি রক্তমাখা; দাঙ্গায় নিহত মানুষের হাত-পা-দেহ-মাথা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে! দুই চোখের জলের অনর্গল ধারায় তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। বার-বার তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকেই প্রশ্ন করিয়াছে, এ পাপ কাহার? সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে তাঁহার চোখ আপনি যেন বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

মানদা আসিয়া দর্পিত কণ্ঠে সংবাদ দিল—দাঙ্গায় আমরা জিতেছি মা! ওরা কেউ আসেই নাই ভয়ে; ল্যাজ গুটিয়ে ঘরে ঢুকেছে সব। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া সে গড়াইয়া পড়িল।

পরম আশ্বাসের একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন—তা হ'লে খুন-জখম কিছু হয় নি, না-রে মানদা?

হেমাঙ্গিনীও মানদার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন—না ভাই! তুমি এইবার ওঠ দেখি, উঠে ঠাকুরজামাইয়ের স্নান-টানের ব্যবস্থা কর। উমা হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ, তার ওপর জানাশোনাও তো নেই কিছু!

সুনীতি হাসিমুখে উঠিলেন, বলিলেন—আহা দিদি, মানুষের জীবন গেলে তো আর ফেরে না! সারা সকালটা আমার বুকে কে যেন পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছিল।

নীচে ইন্দ্র রায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কই রে, উমা কোথায় গেলি? তোর শ্বশুর কি করছেন রে?

উমার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি উপরে আসিয়া রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন; কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই গম্ভীর কণ্ঠের উচ্চ হাসির সঙ্গে শোনা গেল—ফৌজদারী মামলা ক'রে কলওয়ালা আমাদের জব্দ করবে! বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হাসি—হা-হা-হা-হা!

সে-হাসির শব্দের সঙ্গে নীচে বাগ্দী-লাঠিয়ালদের কলরব মিশিয়া সমস্ত মহলটা যেন গম গম করিয়া উঠিল। ভাণ্ডারের দুয়ারে তাহারা জলখাবার লইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানদা রেলিঙের উপর বুক দিয়া ঝুঁকিয়া বলিল—খুব তো চেঁচাচ্ছিস সব! সেই বিভীষণ মজুমদারের একটা ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে আস্‌তিস তবে বুঝতাম! কিংবা এক পাটি দাঁত।

বলিতে বলিতে সে সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

ভারী গলায় কণ্ঠনালী পরিষ্কার করিয়া লওয়ার উচ্চ-গম্ভীর শব্দ জানাইয়া দিল, রায় বাহির হইয়া আসিতেছেন। রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলেন—উমা!

মানদা ত্রস্তপদে গিয়া উমাকে ডাকিয়া দিল। উমা আসিয়া বাবার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া রায় বলিলেন—খুব যে বউ সেজে গেছিস মা! তোকে একেবারে দেখবারই জো নেই। বলিয়া উমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বিস্মিত এবং শঙ্কিত দুই হইয়া উঠিলেন—উমার মুখ নিশান্তের জ্যোৎস্নার মত সকরুণ পাণ্ডুর! পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল—কাল রাত্রে ফুলশয্যা গিয়াছে। হাসিয়া বলিলেন—তোর শাশুড়ীকে বল মা, রামেশ্বরের স্নান-আহ্নিকের ব্যবস্থা করে দিন। দুর্ব্বল শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তোরাও স্নান-টান করে সব বিশ্রাম কর।

উমাকেই তিনি রামেশ্বরের পরিচর্য্যার জন্য বলিবেন সংকল্প করিয়া ডাকিয়াছিলেন। গত রাত্রির রামেশ্বর আজ আর নাই, রায়ের উচ্চহাস্য, উল্লাস তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। রোগ যেন আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

রায় সত্য দেখিয়াও ভ্রম করিলেন। উমার মুখ সত্যই সকরুণ পাণ্ডুর, কিন্তু সে ফুলশয্যার রজনীর আনন্দের অবসাদে নয়। গোপন অন্তরে নিরুদ্ধ সুগভীর অভিমান ও দুঃখের দাহে তাহার মুখের লাবণ্যের সজীবতা এমন শুকাইয়া গিয়াছে। জীবনের প্রথম মিলন-বাসরে অহীন্দ্রের মধ্যে বাঞ্ছিত জনকে সে খুঁজিয়া পায় নাই, এমন কি এতদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু অহীন্দ্রেরও দেখা পায় নাই। শুষ্ক উদাসীন—এ যেন অস্বাভাবিক অপরিচিত এক অহীন্দ্র। দৃষ্টিপথ অবরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াও তাহার দৃষ্টিতে পড়া যায় না! সকাল হইতে এতটা বেলা পর্য্যন্ত বাহিরের বারান্দায় সে পায়চারি করিতেছে; কত বার তাহার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিয়াছে, উমার দৃষ্টি সুস্পষ্ট অভিমান জানাইয়া বার্ত্তা জানাইয়াছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি যেন বধির মূক হইয়া গিয়াছে; কোন বার্ত্তা সে-দৃষ্টির গোচরে আসে না, হয়তো উত্তরও দিতে পারে না।

মানদা অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, রায় নীচে চলিয়া যাইতেই বলিল—চলুন বউদিদি, চান করবেন চলুন। মুখ আপনার বড্ড শুকিয়ে গিয়েছে।

ক্রমশঃ



সূর্য্য-প্রতিমা

"সূর্য-প্রতিমা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৬৪ ;



নর্ত্তকী



সূর্য্য-প্রতিমা

[শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় গৃহীত:চিত্রাবলা



মণিপুরের কৃষাণ



মণিপুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ও রাজপুরী

আধুনিক মণিপুর

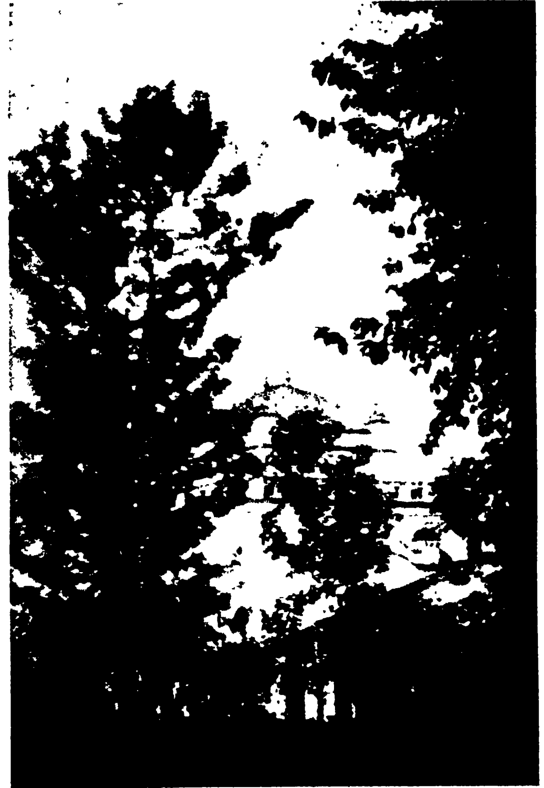
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ, এম. এসসি.

আজকাল সংবাদপত্রে মণিপুরে প্রজাদের আন্দোলনের খবর প্রায়ই পাই। কয়েক বৎসর পূর্বে মণিপুরে গিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। মণিপুর দেশ বিশেষ বড় নহে—আসামের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে গিরিমালাবেষ্টিত প্রায় আট হাজার বর্গমাইল পার্বত্য এবং সমতলভূমি লইয়া এই অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্য। সুউচ্চ নাগা, লুসাই এবং কাছাড় পর্বতশ্রেণী ইহাকে প্রায় চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পূর্ব-দিকেও শান, চীন, চিন্দুইন এবং বর্মার পার্বত্য জঙ্গলভূমি মণিপুরকে প্রকৃতির লীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমান মণিপুর রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য অঞ্চল, অবশিষ্ট অংশ একটি বৃহৎ উপত্যকা-বিশেষ। এই উপত্যকা বিশেষ উর্বর এবং প্রতি বৎসর শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া মণিপুরীদের অন্ন জোগাইয়া থাকে। এই উপত্যকার নিম্নতম ৩২ বর্গমাইল ভূমিখণ্ডে বিশাল লোক-টাক হ্রদ সারা বৎসরের বর্ষার জল ধারণ করিয়া থাকে। লোকটাকের দৃশ্য অতি মনোরম—মধ্যে মধ্যে পাহাড়, দ্বীপপুঞ্জে কৃষকদের বাস। কোথাও কোথাও ভাসমান কুটীর নির্মাণ করিয়াও লোকে বাস করিতেছে দেখিয়াছি। হ্রদটি কচুরিপানায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে—ছিপ ভিন্ন বড় নৌকা সর্বত্র যাইতে পারে না।

পার্বত্য অংশ হইতে বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া নাগা, কুকি প্রভৃতি আদিম জাতিরা জুমিং করিয়া ধাপে ধাপে চাষবাস করিয়া থাকে। মণিপুরের মোট জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষের মধ্যে এই আদিম জাতিদের সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। নাগা এবং কুকি জাতির কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শাখা মণিপুরে বাস করে—তাহাদের ভাষায় পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরের মিল নাই। কোল বলিতে যেমন হো, বীরহোর, মুণ্ডা, ওঁরাও, খাড়িয়া প্রভৃতি বুঝায়, তেমনি নাগা বলিতে আও, অঙ্গমী, লোটা, কাবুই, কোম, রেংমা, সেমা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। আবার কুকি বলিতে থাডো, লুসাই, আইমল, চিরু প্রভৃতি কত প্রকার কুকি আছে যাহাদের ভাষায় একত্ব নাই।

মণিপুরীগণ নিজেদের বলেন মিতাই। মিতাই ভাষা অসমীয়া ভাষা হইতে ভিন্ন, যদিও দুয়ের অক্ষর একই—



সোনাকৈথাল মন্দির, ইম্ফাল, পঞ্চদশ শতাব্দী

বাংলা বর্ণমালা। মিতাইগণ হিন্দু বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। গত আদমসুমারীতে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৫৭২৫৫, রাজ্যের মধ্যে কিছু খ্রীস্টান



পাহাড়তলীতে কুকি-গ্রাম, মণিপুর

(২০৪০১) ও মুসলমান (২২৮৬৮) আছে। খ্রীস্টানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ আদিম জাতিদের মধ্যে খ্রীস্টান পাদরিদের ধর্মপ্রচার।

মণিপুর যাইবার দুইটি পথ। প্রথম, আসাম-বেঙ্গল রেলপথের গৌহাটি-ডিব্রুগড় শাখার মধ্যে লামডিঙের পরের বড় ষ্টেশন মণিপুর রোড (ডিমাপুর) হইতে ১৩৪ মাইল দীর্ঘ এক পাকা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে অভ্রভেদী নাগা পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল পর্যন্ত। এই পথটিই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহার একটি কারণ, ইহা আসামের নাগা-হিল্‌স জেলার সদর কোহিমার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অন্য পথটি পুরাতন এবং মোটরযানের অনুপযুক্ত। এটি শিলচর হইতে লুসাই পর্বতকে অতিক্রম করিয়া লোকটাক হ্রদের মুখে বিষণপুর গ্রামে আসিয়া মিশিয়াছে। এই পথে পদচারী বা অশ্বারোহী যাত্রীরা আসিতে পারেন। ইহার দৈর্ঘ্য ১২৪ মাইল।

রাজধানী ইম্ফালের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক দৃশ্যও সুন্দর। নাগা পাহাড়ের কোলে চমৎকার অবস্থানে এই বর্দ্ধিষ্ণু শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দুই হাজার ফুটের উপর উচ্চে অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রায়ই কুয়াশায় ঢাকা থাকে; বারিপাতও খুব বেশী হয়। শহরের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ইম্ফাল নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ইম্ফাল শহর কেবলমাত্র রাজধানী নহে, প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র এবং বাণিজ্যকেন্দ্রও। কয়েকটি বিদ্যালয় আছে এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে একটি কলেজও স্থাপিত হইয়াছে। জনস্টন হাই-স্কুলই প্রধান স্কুল। মেয়েদের জন্যও উচ্চবিদ্যালয় আছে। রাজ্যের সমতল অংশে বালকদের জন্য চারিটি উচ্চবিদ্যালয় আছে। পার্বত্য অঞ্চলে এবং সমতল অংশে অন্যান্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬০।

রাজ্যের শাসনভার মহারাজা দরবারের উপর দিয়াছেন—দরবারের ছয় জন প্রতিনিধি মহারাজা কর্তৃক



মণিপুরের জঙ্গলে আইমলদের সহিত লেখক ও অন্যান্য

মনোনীত এবং এক জন ইংরাজ সিভিলিয়ান আসাম-গবর্ণরের দ্বারা মনোনীত, তিনিই দরবারের সভাপতি। ইহা ছাড়া আসাম-গবর্ণরের আর এক জন প্রতিনিধি আছেন পলিটিক্যাল এজেন্ট। দরবারের আইন প্রণয়ন ও বিচারের ক্ষমতা আছে এবং ইহা রাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল-কোর্ট।

ইম্ফাল মণিপুরের ব্যবসাকেন্দ্র—এখানকার দৈনন্দিন বৈকালিক বা সান্ধ্য বাজার একটি দেখিবার বস্তু। বেলা পড়িতে-না-পড়িতে মণিপুরীগণ পণ্যসম্ভার লইয়া এখানে মিলিত হইতে থাকে। সুন্দরী মণিপুর-রমণীগণ পণ্যদ্রব্য মাথায় লইয়া হাটে বসিয়া যায়। বক্ষের উপর হইতে হাঁটু পর্যন্ত আবরণ করিয়া রঙীন ডোরাকাটা একটি বস্ত্র এবং অঙ্গ ও মস্তক আবরণের জন্য সাদা, গৈরিক বা রঙীন চাদর একটি। পুরুষদের পোষাক বাংলা বা আসামের সাধারণ বেশভূষা হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। কিন্তু মহিলাদের বেশভূষায় উত্তর-বর্মা ও সান্-রাজ্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু বেশভূষায় নয়, মণিপুরী স্ত্রীলোকদের কোন কোন আচার-ব্যবহার ও আহার্যে প্রাচ্য জগতের যবদ্বীপ, বলি, সুমাত্রা, চীন, চিন্দুইন প্রভৃতি স্ত্রীস্বাধীনতার দেশগুলির প্রভাব দেখা যায়। মহিলাগণ খুব পরিশ্রমী, পুরুষ জাতিকে অর্থাৎ স্বামী-পিতা-পুত্রকে সুখে রাখিয়া নিজেরাই সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই জন্য উঁহাদের স্বাস্থ্য ও সম্মান বঙ্গনারী অপেক্ষা উন্নত।

মিতাই-গৃহিণীদের উপরে উপার্জ্জন ও সংসার-ব্যবস্থার ভার অনেকখানি আছে বলিয়া সমস্ত মণিপুর দেশটিতেই ধর্ম প্রাধান্য পাইয়াছে। ধর্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান পালনে মেয়েরাই সব দেশে বেশী উৎসাহী, সেজন্য প্রতিপত্তিশালিনী মণিপুরী রমণীগণের কল্যাণে বৈষ্ণব মিতাই জাতিকে ধর্মপ্রবণ হইতে হইয়াছে। শুধু ধর্ম কেন, মণিপুরের মৌলিক সংস্কৃতি ও শিল্পকলাগুলি অনেক পরিমাণে এখনও বাঁচিয়া আছে।

মণিপুর কৃষিপ্রধান দেশ, স্ত্রীলোকেরা ঘরে ঢেঁকিতে ধান ছাঁটিয়া চাউল বাহির করে, আজ সেখানে চালের কলের আমদানি হইয়াছে। ইম্ফাল শহরে আজ তের-চৌদ্দটি ছাঁটাই কল—দশ বারটি কলের মালিক মণিপুরের বাহিরের লোক। আমি যখন মণিপুরে গিয়াছিলাম তখনই দেখিয়াছিলাম চতুর মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী ব্যবসাদার সেই সুদূর অঞ্চলেও ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

মণিপুর প্রাচীন দেশ এবং এই রাজ্যের নারীজাতি চিরদিনই স্বভাব-সৌন্দর্যের অধিকারিণী, মহাভারতেও তাহার উল্লেখ পাই। বঙ্গদর্শনে কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন,

"বাংলা দেশে যত প্রকার পার্ব্বত্য জাতি আছে মণিপুরীগণ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী—প্রায় সকলেই গৌরবর্ণ। মণিপুরীয় মহিলাগণ যখন পুষ্পাভরণে সজ্জিত হন তখন আমাদের ঋষিবর্ণিত গন্ধর্ব্বকুমারী বলিয়া ভ্রম জন্মে।"

পাণ্ডব অর্জুনও রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বভ্রুবাহন নামে এক পুত্রও হইয়াছিল, কথিত আছে। মিতাইগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়গণ চন্দ্রবংশোদ্ভূত। সম্ভবতঃ অর্জুনের সহিত বহু ক্ষত্রিয়বীর আসিয়াছিলেন এবং মণিপুরী রমণীগণের পাণিগ্রহণপূর্বক কয়েক জন এইখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম গ্রহণের পর বোধ করি এই পৌরাণিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া মণিপুরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ পূর্ব-ভারতের দেশগুলিতে ক্ষত্রিয়বর্ণ নাই বলিলেও চলে।



মণিপুর-রমণী

হিন্দু মণিপুরীগণ পুরামাত্রায় বৈষ্ণব, মাছ-মাংস বড় একটা খান না এবং হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের পূজাই বেশীর ভাগ করিয়া থাকেন। পূর্বে তন্ত্রের প্রভাব বঙ্গেরই মত মিতাইদের অনিষ্ট করিতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম গ্রহণে মণিপুর তান্ত্রিকদের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়। আনুমানিক ১৫৭১ সাল মহাতান্ত্রিক শক্তক্রম এবং ১৫৭৭ সালে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতির লেখক পূর্ণানন্দ মণিপুরে তন্ত্র উপাসনা প্রচলিত করেন। পূর্ণানন্দ কামাখ্যাপীঠের পুনরুদ্ধার করেন। সেই সময় শ্রীহট্টের গোস্বামীগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিলে হিন্দু মিতাইগণ রাজাপ্রজা-নির্বিশেষে শক্তিপূজা ও তন্ত্র-মন্ত্র ছাড়িয়া দেন এবং এই সাত্বিক ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করেন। অদ্বৈতশাখার লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোত্তম অধিকারী ছিলেন পাণ্ডা। তিনি সদলে রাজা চিংতোমাখোম্বার আনুকুল্যে তাঁহাকে এবং রাজ্যের প্রজাদের বৈষ্ণবধর্ম দীক্ষা দিতে থাকেন।*

আমাদের বঙ্গদেশে তন্ত্রের প্রভাবে শাক্তরা যেমন প্রবলভাবে বৈষ্ণবদের সহিত দ্বন্দ্ব বাধাইবার সুবিধা পাইলেন, মণিপুরে কিন্তু তাহা হইল না, সকলেই বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন, ধর্মদ্বন্দ্বের হাত হইতে বাঁচিয়া হিন্দুর একত্ব বজায় রাখিলেন।

ইহারই পর হইতে রাসলীলা মণিপুরের প্রধান উৎসবে পরিণত হইয়াছে। মহারাজা চিংতোমাখোম্বার (ভাগ্যচন্দ্র) সময় হইতেই বিশেষ জাঁকজমকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের

* চিন্ময় বঙ্গ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রবাসী', ১৩৪৪

রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রতিবৎসর দেশময় গ্রামে গ্রামে, দেবালয়ে এবং রাজপ্রাসাদসংলগ্ন শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে একটি মাস ধরিয়া রাসলীলা-উৎসবপর্ব কীর্তন গান এবং নৃত্যে পালিত হইয়া থাকে। সেজন্য মণিপুরের অধিপতি শুধু রাজ্যের রাজা নহেন, দেশের ধর্মেরও অধীশ্বর। উৎসব-অনুষ্ঠানে ধর্ম বা সমাজ সম্বন্ধীয় কোন কিছু উপলক্ষে মণিপুরাধিপতিরা বরাবর উৎসাহী। এই জন্য প্রজারা তাঁহাদের ভালবাসে এবং ভক্তি করে।

মণিপুরের রাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিত মণিপুরী ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি। মণিপুরীগণ বলেন, গুরুসিদাবা দেব মানবের অধিপতি; তাঁহার দুই পুত্র—সেনামাহি এবং পাখংবা। কনিষ্ঠ পাখংবা ছিলেন পিতার পরম স্নেহভাজন সেই জন্য তিনি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। পাখংবার উত্তর-পুরুষ চেরাইবংবা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মণিপুর-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে চেরাইবংবা জীবনলীলা সাঙ্গ করিলে তাঁহার পুত্র গরিব নওয়াজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। গরিব নওয়াজ ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধর্মমাণিক্যের সমসাময়িক। ইনি ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন।

গরিব নওয়াজের তিন পুত্র—সামসাই, উগতসাই ও চিংতোমাখোম্বা বা ভাগ্যচন্দ্র। পিতা ও জ্যেষ্ঠকে বধ করিয়া উগত সিংহাসন অধিকার করেন। ভাগ্যচন্দ্র মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রজাদের সহিত যোগ দিয়া সিংহাসন পাইলেন—প্রজাপীড়ক উগত পলায়ন করে। ভাগ্যচন্দ্র শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি প্রায় দেবারাধনায় জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার সময়ে মণিপুরের অনেক উন্নতি ঘটে। তাঁহারই সময় মিতাই প্রাচীন গ্রন্থগুলি অধিকাংশ লিখিত হইয়াছিল।

মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের যত্নে ও অধ্যবসায়ে মিতাই ভাষাও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বর্ত্তমানে আসামের ন্যায় বাংলা অক্ষর গ্রহণ করিয়া মিতাই আরও সহজ এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে। ইহাতে বাঙালীর সহিত মিতাইগণের সৌহার্দ বাড়িয়াছে এবং চৈতন্যপ্রেমের দ্বারা এই প্রেমধর্মের জন্মভূমি বঙ্গদেশের সহিত প্রীতিবন্ধন দৃঢ়তর



মণিপুরের নাগা বালিকা

হইয়াছে। মণিপুরের অধিবাসিগণ অন্যান্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা বাঙালীকে, বাংলাকে এবং বঙ্গভাষাকে বেশী ভালবাসেন। কিন্তু উঁহারা আমাদের এদিকে আসেন খুব অল্পই। পুরুষেরা কিছু কিছু যদিও বা আসিয়া থাকেন, মহিলারা বড় আসেন না। মাঝে মাঝে তীর্থ করিতে মহারাজা, রাজবাড়ীর কেহ কেহ এবং সংগতিশীল মণিপুরী পরিবার নবদ্বীপধামে আসিয়া থাকেন।

ইম্ফাল শহরের যেদিকটায় বাঙালীরা সাধারণতঃ বাস করেন, সেটিকে 'বাবুপাড়া' বলে। বাবুপাড়ায় প্রবাসী বাঙালী সমাজের মিলনক্ষেত্র ভিক্টোরিয়া ক্লাব ৷ রাজ্যের রেজিস্ট্রার এখন আছেন শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাস—রাজ্যে প্রবেশপত্র লাভ করিতে ইঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। পূর্বে এই পদে ছিলেন শ্রীযুক্ত মনোমোহন কুণ্ডু। রাজদপ্তরে আরও কয়েক জন বাঙালী চাকুরী করেন; কয়েক জনের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা অতি আদরে আমাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া ক্লাবের হলে স্টেজ খাটানো থাকে, সময় সময় অভিনয় হয়।

মণিপুর রাজ্যের সহিত ব্রিটিশদের প্রথম মৈত্রী স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালে যখন বর্মীরা কাছাড়, মণিপুর এবং



মণিপুরের চিরু-কুকি

আসাম আক্রমণ করে। সেই সময় মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিং ব্রিটিশদের সাহায্যপ্রার্থী হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে হৃতরাজ্য ফিরিয়া পান। এই সাহায্যের প্রতিদানে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি এক জন ইংরেজ সিভিলিয়ান ইম্ফালে বাস করিতে থাকেন। ইনিই পলিটিক্যাল এজেণ্ট— বর্তমানে ইঁহার ক্ষমতা খুব বাড়িয়াছে। রাজ্যের পার্বত্য অংশ এখন ইনি নিজেই শাসন করেন। এই সব অঞ্চলে নাগা-কুকি প্রভৃতি আদিম জাতির বাস যাহাদের মধ্যে মস্তক শিকার খুব প্রবল ছিল। গত যুদ্ধে শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে কুকিরা ভীষণ বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাহার পর হইতেই এই ব্যবস্থা হয়। প্রায় শত বৎসর পূর্বে বর্মীরা যখন ব্রিটিশ-আসাম আক্রমণ করে তখন মণিপুরের তৎকালীন অধীশ্বর চন্দ্রকীর্তি সিং ইংরেজ সরকারকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে এক সখ্যচুক্তি সম্পাদন হয়। কিন্তু চন্দ্রকীর্তির পর তাঁহার পুত্র সুরচন্দ্র রাজা হন। তিনি একটু দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া ইংরেজদের প্রতিপত্তি কিছু বাড়িয়া যায়; মহারাজার অপর ভ্রাতাগণ কুলচন্দ্র, ত্রিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি এবং প্রজাসাধারণে মনে মনে তাহা পছন্দ করিতেন না। ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্রে সুরচন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ-রক্ষীদের সাহায্যে শিলচরে পলায়ন করেন। চন্দ্রকীর্তির চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার সুরচন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য নূতন রাজা কুলচন্দ্র এবং সেনাপতি ত্রিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন। ফলে নানারূপ আন্দোলন, খণ্ডযুদ্ধ এবং হত্যাকাণ্ড হয়। মহারাজ সুরচন্দ্রের ভাগ্যেও রাজ্য লাভ ঘটে নাই, এবং এখন বর্তমান মহারাজা সর্ চূড়াচন্দ সিং সিংহাসন অধিরোহণ করেন। ইনি ধর্মপ্রাণ এবং প্রজাবৎসল।

মণিপুরে দেখিয়াছি মেয়েরা কাঠের যন্ত্রে তুলা পিঁজিয়া চরকাতে সুতা কাটিয়া ঘরের তাঁতে সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনিয়া থাকে, সেই বস্ত্রকে আবার পাতার রঙে চোবাইয়া রঙীন করে। আজকাল অবশ্য বিদেশী কলের কাপড়ের আমদানিতে তাঁতের কাপড় কিছু কমিয়াছে। তুলার দর সস্তা। যেমনি ধানের চাষ তেমনি তুলার চাষ, চাউলের দরও অতি সুলভ ছিল, তাহার কারণ মহারাজার হুকুমে বাহিরে চাউল রপ্তানি হইত না। শুনিতেছি, বর্তমানে মণিপুরে মাড়োয়ারী বণিকদের দৌরাত্ম্যের ফলে এ সুবিধা আর নাই।

মণিপুরীগণ অশ্বারোহণে বিশেষ পটু। এখানে দ্রুতগামী ছোট আকারের ঘোড়া পাওয়া যায়। সেই জন্য পোলো-ক্রীড়া এখানে অন্যতম জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে। কথিত আছে, কলিকাতার ময়দানে প্রথম পোলো খেলা হয় ১৮৬৩ সালে মণিপুরী খেলোয়াড়দের আগমনে। সে-সময় মহারাজা চন্দ্রকীর্তি কলিকাতায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহার অনুচরবর্গ গড়ের মাঠে কুচকাওয়াজের সঙ্গে পোলো খেলা দেখায়। গোরা সৈনিকদের ইহা ভারি মনের মতন লাগে। তাহারা এই ক্রীড়া মণিপুরীদের নিকট শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া লইয়া বিলাতে ফিরিয়া চালু করে। অবশ্য পূর্বে বৈজন্তীয় রাজ-পরিবারে পোলো খেলা হইত এবং নিম্ন-য়ুরোপেও কিছু কিছু প্রচলিত ছিল।

এমনই আর এক মৌলিক জিনিস মণিপুরের নৃত্য যাহার শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটিয়াছে রাসলীলা-উৎসব প্রবর্তনার পর হইতে। পূর্ব-ভারতে এক মণিপুর ভিন্ন

উচ্চাঙ্গের খাঁটি হিন্দু লোকনৃত্য এক মণিপুরীদের মধ্যে ভিন্ন আর কোথাও নাই।

মিতাই মহিলাগণ নৃত্যে চিরদিন অভ্যস্ত। নৃত্য ও সঙ্গীত সকল উৎসবেরই অঙ্গস্বরূপ। এ-বিষয়ে সমাজ তাঁহাদের চিরদিনই উৎসাহ দিয়া থাকে। মণিপুর-দরবারও দেশের এই লোকনৃত্যের বিশেষ সহায়তা করেন। মহারাজকুমার প্রিয়ব্রত সিং দেশের কলাশিল্প সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত দরবারের অন্যতম সভ্য। তাঁহার উৎসাহে এবং অনুমতিতেই কলিকাতায় এই নৃত্য প্রদর্শনের আয়োজন হইয়াছিল।

ইম্ফালের রাজভবনের শ্রীগোবিন্দজীর নাটমন্দিরে প্রতিবৎসর রাসযাত্রার সময় একটি মাস ধরিয়া রাত্রে যিনি রাস গান এবং নৃত্য দেখিয়াছেন তিনি বিশেষ ভাগ্যবান।*

* মণিপুরী রাসনৃত্য সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"এ রাস এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ছিল। মণিপুরীরা অত্যন্ত সঙ্গীত-রসজ্ঞ এবং সঙ্গীতরসলিপ্সু। সঙ্গীতের চর্চ্চা ঘরে ঘরে। মহিলারা প্রায় সকলেই নৃত্যগীত শিখিয়া থাকেন। এই রাসযাত্রায় ইঁহারা বাংলাদেশের মতন মূর্ত্তি রচনা করেন না। নিজেরা রাসলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন সম্পন্ন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে বা নাটমন্দিরে পল্লীর সকল বালক-বালিকা মিলিয়া এই অভিনয় করেন। বৃত্তাকারে সুসজ্জিত বালিকারা প্রাঙ্গণটা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া যান। আট-নয় বছরের বালক-বালিকা হইতে আঠার বছরের অনূঢ়া যুবতী পর্য্যন্ত এই অভিনয়ে সামিল হইয়া থাকেন। বৃত্তের বাহিরে ইঁহাদের পিতামাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা মিলিয়া খোল কর্ত্তাল সহকারে রাসলীলা কীর্ত্তন করেন, আর ইঁহাদের বালক-বালিকারা হাতে হাতে ধরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অতি মৃদুমধুর নৃত্যকলা সহকারে এই লীলার অভিনয় করেন। যারা রাসে নাচে তাদের একটি করিয়া কৃষ্ণ সাজে ও তাহার দু-পাশে দুইটি করিয়া রাধা সাজে। দেশে বিদেশে অনেক নাচ দেখিয়াছি কিন্তু এই মণিপুরী নাচের মতন এমন সুন্দর, এমন নির্ম্মল, এমন নিপুণ নৃত্যকলা কোথাও দেখি নাই।"—"সত্তর বৎসর", প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৪

বর্তমান মণিপুরে যে আন্দোলন চলিয়াছে তাহার মূল কারণ আমাদের ব্রিটিশ-ভারতের অধিবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। প্রজারা নিজেদের সুখসুবিধার জন্য রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখিতে চায়। প্রথম গোলমাল বাধে 'কাচ্চা-নাগা'দের মধ্যে রাণী গাইডুলুর নেতৃত্বে। তার পর গণ্ডগোল বাধে নিখিল-মণিপুরী হিন্দু মহাসভা লইয়া। মাত্র পাঁচ বৎসর হইল ইহা স্থাপিত হইয়াছে। ধর্মসংক্রান্ত উদ্দেশ্য লইয়াই ইহা খোলা হয় এবং মহারাজা ইহার সভাপতি হন। কিন্তু ক্রমশঃ এই সংঘ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকিলে মহারাজা সভাপতিত্ব পরিত্যাগ করেন। প্রজাদের দলপতি শ্রীইরাবৎ সিং নূতন সভাপতি হইয়া দেশের শাসন-সংস্কারের জন্য আন্দোলন চালাইতে থাকেন। তিনি এখন রাজবন্দী।

এখন নিখিল-মণিপুরী মহাসভা জেলা-কংগ্রেস কমিটির অনুরূপ কাজ করিতেছে ও রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে। আসাম-গবর্ণর এবং বড়লাটের নিকট এবং মহারাজার নিকট দাবির ফিরিস্তি সহ এক আবেদনপত্র গিয়াছে।

প্রজাদের দাবি—

১। চাউল রপ্তানি বন্ধ করিতে হইবে।

২। ছাঁটাই কল তুলিয়া দিতে হইবে।

৩। দরবারের পরিবর্তে একটি আইন-সভা গঠন করিতে হইবে যাহার সভ্যসংখ্যা হইবে ১০০ জন। তন্মধ্যে ২০ জন স্বয়ং মহারাজা মনোনীত করিবেন এবং বাকী ৮০ জনকে প্রজারা নির্বাচন করিবে। প্রাদেশিক গবর্ণরের মত মহারাজা নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগুরুদলের নেতাকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে বলিবেন।

সভায় যে-সমস্ত আইন পাশ হইবে তাহা মহারাজার অনুমতির পর কার্য্যকরী হইবে। ইত্যাদি।

প্রজাদের এই সকল দাবি নিতান্ত অসংগত বলা চলে না।

পত্রালাপ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পং

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

তুমি চলে যাওয়ার পর আমাদের এখানকার আসর মুষড়ে পড়েছে। তার পরে আবার আকাশ অত্যন্ত ভ্রূকুটিল ভঙ্গী ধারণ করেছিল। কী করা যায়, আমি খুচরো কবিতা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব—সে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরি নয়। লক্ষ্মীর চেলারা দুঃসময়ের কাছে ভেবড়ে যায় কিন্তু সরস্বতীর চেলারা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিম্বা তার ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্বিগ্ন হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে।

আজ এই খানিকক্ষণ হ'ল সূর্যের আলো পরিণত শিমুলের তুলোর মতো ফেটে চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে আকাশে একটা দুশ্চিন্তার কালিমা লেপে গিয়েছিল সেটাকে মুছতে আরম্ভ করেছে। মনে আশা হচ্ছে কাছে হোক দূরে হোক একটা সহজ পরিণাম আছেই যার মধ্যে ভাগ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ পাবে। মানুষের মন হিসেবী, তাই সে ভীরু, তাই সে আশঙ্কার কারণ খতিয়ে খতিয়ে মাথা ধরিয়ে তোলে, মানুষের আত্মা বীর্যবান, সে নৈরাশ্যবাদী নয়, কেননা তার মাপকাঠি বহুদূরকে নিয়ে। তার মাপকাঠি রাজ্য-সাম্রাজ্য পেরিয়ে যাবে পৌঁছবে সেইখানে যেখানে সর্বমানবের চরম পতাকা অভ্রভেদ ক'রে আছে। সেই পতাকার বাহন কারা সে তকরার ক'রে লাভ নেই, নিশ্চয়ই ঝগড়াটে পরশ্রীকাতর বাঙালী নয়। তবু বাঙালীও হয়তো সেখানকার তীর্থযাত্রীদের জন্যে কিছু একটা পাথেয়ের জোগান দেবে। কিন্তু হায় রে, জগজ্জয়ী বীরের অন্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব কীট লাগিয়ে দিয়ে বাঙালী প্রতিদিন তাতে বিকার ঘটিয়ে দিচ্ছে। ওর মনের মধ্যে উয়ের বাসা, তৈরি জিনিষকে নষ্ট করতেই আছে। ওর কণ্ঠে সব চেয়ে যে স্বর অকৃত্রিম সে হচ্ছে দুয়ো দেবার স্বর।

তোমার প্রেরিত মৃচ্ছকটিকম্ এই মাত্র পেলুম। এই নাটকে বাস্তবিকতা আছে কিন্তু বিশ্বাসজনক নাট্যিক অভিব্যক্তি এবং বাঁধন নেই। লেখনী চাষ করছে না, আঁচড় কাটছে। যাহোক ভালো ক'রে পড়ে দেখব। এই নাটক অনেক দিন আগে পড়ে দেখেছিলুম, ভালো লেগেছিল কিন্তু মনে হয়েছিল তখনকার পাঠকদের দাবি করবার স্বভাব পাকা নয়, বিষয়বস্তুকে যেমন-তেমন ক'রে আলগা ক'রে গড়ে তুললেও লোকের অবকাশরঞ্জন হ'ত।

চেষ্টা ক'রে দেখছি য়ুরোপের ইতিহাসে পরে পরে দুটো দারুণ যুদ্ধের তাৎপর্য বুঝে দেখতে। এই নিয়ে যারা উত্তেজিত উৎসাহ প্রকাশ করছে তারা কাপুরুষ। তারা নিজেরা অক্ষম ব'লেই সক্ষমদের সংকটে উল্লাস বোধ করছে। এটা হচ্ছে দূর থেকে নিরাপদে দুয়ো দেবার প্রবৃত্তি।

যখন গরম বোধ করবে এখানে এসে ঠাণ্ডা হয়ে নিয়ো। ইতি ২৪।৫।৪০

২

নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী

দামামা ঐ বাজে,
দিন-বদলের পালা এলো
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
সুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়,
কেন্ এ অন্যায়।

অন্যায়ের এই সম্মার্জনী
উঠেছে আজ ঝেঁকে,
এ যে কঠিন পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা,
অনেক কালের লুব্ধ হালের চাষের মাটির থেকে
লুপ্ত করে নিস্ফলা চেহারা।
জমে ওঠা মৃত বালির স্তর
ভাসিয়ে নিয়ে ভর্তি করে লুপ্তির গহ্বর;
পলিমাটির ঘটায় অবকাশ,
মরুকে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস।

দুবলা ক্ষেতের পুরোনো সব পুনরুক্তি যত
অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।
অন্তরেতে মৃত,
বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে সঞ্চিত,
ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়
ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়।
বিত্ত ওদের করেছে বঞ্চনা,
ধরিত্রীকে অসম্মানে মাড়ায় অন্যমনা।
অপঘাতের ধাক্কা এসে পড়ে ওদের ঘাড়ে
জাগায় হাড়ে হাড়ে।
হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন ক্ষেতে।

শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে,
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে কী রইবে।
পালিস-করা জীর্ণতাকে চিন্‌তে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি'॥

৩১।৫।৪০



জ্যোতির্বাষ্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে বন্ধু সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই
এ-কথায় পূর্ণ সত্য নেই।
চিনি আমি সংসারের শতসহস্ররে,
কাজের বা অকাজের ঘেরে
নির্দিষ্ট সীমায় যারা স্পষ্ট হয়ে জাগে
প্রত্যহের ব্যবহারে লাগে,
প্রাপ্য যাহা হাতে দেয় তাই,
দান যাহা তাহা নাহি পাই।
অনন্তের সমুদ্রমন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।
উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি
আপনার চারিদিকে টানি।
নীহারিকা রহে যথা কেন্দ্রে তার নক্ষত্রেরে ঘেরি,
জ্যোতির্ময় বাষ্পমাঝে দূরবিন্দু তারাটিরে হেরি।
তোমা মাঝে শিল্পী তার রেখে গেছে তর্জনীর মানা,
সব নহে জানা।
সৌন্দর্যের যে পাহারা জাগিয়া রয়েছে অন্তঃপুরে
সে আমারে নিত্য রাখে দূরে॥

দেশ]

আধোজাগা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রে কখন মনে হোলো যেন
ঘা দিল আমার দ্বারে
জানি নাই আমি জানি নাই, তুমি
স্বপ্নের পরপারে।
অচেতন মনমাঝে
নিবিড় গহনে ঝিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিছে তখন বেণুবনবায়ু
ঝিল্লির ঝংকারে॥
জাগি নাই আমি জাগি নাই গো।
আধোজাগরণ বহিছে তখন
মৃদু মন্থর ধারে।
গভীর মন্দ্রস্বরে
কে করেছে পাঠ পথের মন্ত্র
মোর নির্জন ঘরে।
জাগি নাই আমি জাগি নাই, যবে
বনের গন্ধ রচিল ছন্দ তন্দ্রার চারিধারে॥

রূপ ও রীতি]

উপদেষ্টা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমারে পড়েছে আজ ডাক
কথা কিছু বলতেই হবে,
বিশ্রাম করা পড়ে থাক্,
পারো যদি মন দাও তবে।
ফিস্‌ফিস্ করো যদি ব'সে
খস্‌খস্ মেজেতে পা ঘসে
অভ্যাস হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত যত
যেন কিছু হয় নাই থাকি এই মতো।
গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান
শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান।
আমাদের কাল থেকে ভাই
একালটা আছে বহুদূরে,
মোটা মোটা কথাগুলো তাই
বলে থাকি খুব মোটা সুরে।
পিছনেতে লাগে নাকো কেউ
বৃদ্ধের প্রতি সম্মানে,
মারতে আসে না ছুটে কেউ
কথা যদি নাও লয় কানে।
বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদমুনির এই সাজ।
তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার
এ কাজটা সব চেয়ে কম চেষ্টার।
তবে শোনো—মন্দ সে মন্দই,
হোক না সে গুপিনাথ, হোক না সে নন্দই।
আর শোনো, ভালো যে সে ভালো,
চোখ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো।—
অল্প যা বললেম দেখো ভাই ভেবে
পাছে ভুলে যাও তাই নোট লিখে নেবে।
যদি বলো পুরাতন এই কথাগুলো,
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভুলো।
যদি বলো কথাগুলো যেন dry bones
রাগব না, ছুটি নিয়ে যাও ভাইবোনও।

ভাই-বোন]

মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র

[ঢাকা দীপালি সংঘ অনুষ্ঠিত মহিলা-সভায় কথিত। ১৩৩২]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাঁরা কর্ম্মী, তাঁদেরই পুরুষের কর্মক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় আদর; যারা কোনো বড় প্রয়োজন সাধন করবেন, পুরুষমণ্ডলীর কাছে তাঁরা বড় পুরস্কার পান। কিন্তু আজ আমি মেয়েদের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, তার মধ্যে কোন কর্ম্মের প্রাপ্তিস্বীকার নেই। তার মধ্যে তাঁদের যে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, সে আনন্দের কারণ এই যে, আমি মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে কিছু সুর যোগ করে দিয়েছি, যেটা বেদনাকে গানে বাজিয়ে তোলে, পৃথিবীর শ্যামলতার উপর হৃদয়ের লাবণ্য মাখিয়ে দেয়, সংসারকে তার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গহ্বর থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে চিরকালের আলোতে বের করে আনে। আজ মেয়েদের আনন্দধ্বনির মধ্যে যা আমাকে পুরস্কৃত করেছে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মজুরি-শোধের কথা নেই। অন্য যে-কোনো আকারে উপকারের কাজ করি, তার জন্যে মজুরির দাবি করা চলে, তার জন্যে বাইরের দিক্ থেকে পারিতোষিক প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু যদি কোনো কর্ম্মের সহায়তা না ক'রে কেবলমাত্র আনন্দের পাত্র ভরে দিয়ে থাকি সুর দিয়ে ছন্দ দিয়ে রস দিয়ে, তবে আনন্দই তার পুরস্কার।

সংসারে আনন্দভাণ্ডারের ভার তো মেয়েদেরই উপরে। মাধুর্য্যের অমৃত মেয়েদেরই হৃদয়ে। তাদের স্নিগ্ধ স্পর্শে জীবনযাত্রার কঠোরতা কম হয়, তাদের হাসি আর চোখের জলে দুঃখসন্তাপে শান্তি আসে, তাদের সেবায় ও নিষ্ঠায় গৃহ কল্যাণে শোভিত হয়। এই জন্যে কবিকে পুরস্কার দেবার ভার তো তাদেরই, যে-কবির কাজ হচ্ছে সংসারকে রসবর্ষণে শ্রী দান করা।

যতদিন আমি সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত আছি, অন্তরের মধ্যে এই আশ্বাস বার বার অনুভব করছি যে, দেশের মেয়েদের কাছে আমার কবিতা পৌঁছেছে। পুরুষদের মধ্যে সহজে রসভোগের বাধা তাদের বিদ্যার অভিমান, বুদ্ধির অহঙ্কার; বিদেশী সাহিত্যে নূতন অধিকারের উত্তেজনায় তারা পুথিগত তুলনার সাহায্যে রসের যাচাই করতে বসে। কিন্তু যাচনদার মূল্যনির্ণয় করতে গিয়ে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে আর পারে না। সহজ আনন্দ অনুভব করবার যে শক্তি, সেই শক্তিই কাব্যের রসটিকে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নেয়। শিক্ষার দ্বারা, নানা সাহিত্যে প্রশস্ত অধিকারের দ্বারা এ শক্তির উৎকর্ষ ঘটে, এ-কথা সত্য; কিন্তু যেখানে স্বভাবত সেই শক্তির দৈন্য, অথচ বই-পড়া শিক্ষার দ্বারা সাহিত্যবিচাররীতির একটা বাহ্য কাঠামো হাতে এসেছে, সেইখানেই দুর্বিপাক, সেইখানেই সাহিত্যরাজ্যে মত্তহস্তী পদ্মবন দলতে আসে।

আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট হয় নি বটে, কিন্তু তাদের চিত্তের মধ্যে সহজবোধের ঐশ্বর্য্য আছে। সেই কারণে আমার এই অহঙ্কারটুকু সত্য হতে পেরেছে যে, আমার কাব্য গ্রহণ করতে আমাদের দেশের মেয়েদের তেমন বাধা ঘটে নি। কখনো কখনো এমনো দেখেছি, আমার রচনা সম্বন্ধে বাইরের ঘরে যেখানে বিরুদ্ধতা, ভিতরের ঘরে সেখানে বেদনার সঙ্গে মেয়েরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাহিত্য মেয়েদের কাছে এই যে আতিথ্য পায়, এটি বিশেষ মূল্যবান্। মেয়েদের আনন্দ পুরুষের শক্তির উদ্বোধক।

মাধুর্য্যই শক্তির প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুর হাতে যে গদা আছে, বিষ্ণুর হাতের পদ্মই তার পূর্ণতা দেয়। যে-কোনো বড় দেশেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে পৌরুষের নানাপ্রকার উদ্যম দেখতে পাই, সেইখানেই এই উদ্যমের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে নারীচিত্তের প্রবর্ত্তনা আছে। সেখানে হাওয়ার মধ্যে একটা উৎসাহ নারীর মন থেকে প্রবাহিত হয়ে পুরুষের সাধনাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। যে সমাজে নারীমাধুর্য্যের সেই অলক্ষ্য উদ্দীপনা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সমাজই শৌর্য্যে বীর্য্যে কর্ম্মে সৌন্দর্য্যে বিচিত্রভাবে সফল হয়। গাছ আপন শিকড়ের জোরে মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়—এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার শক্তির প্রধান প্রেরণা আকাশের আলোয়, বসন্তের দক্ষিণ-বাতাসে। প্রাণলক্ষ্মীর এই দিব্যদূতগুলি অলক্ষ্য আকারে অশ্রুত পদসঞ্চারে দিকে দিকে বিহার করে, তারাই অরণ্যে অরণ্যে প্রাণের পাত্রকে তেজে পূর্ণ করে দেয়। মেয়েদের অনুপ্রাণনা পুরুষের শক্তিকে তেজ জোগাবার সেই অলক্ষ্য দূত। এই কারণেই ভারতবর্ষ স্ত্রীপ্রকৃতিতে শক্তির রূপ উপলব্ধি করেছে। এখনকার মনোবিজ্ঞান যেমন বলে যে, মনের গূঢ়চেতনলোকে আমাদের মর্ম্ম উদ্যমের প্রচ্ছন্ন উৎস; আমাদের দেশ তেমন করেই বলেছে পুরুষের দ্বারা গোচরে যে কাজ হয়, অগোচরে তার শক্তিকে সচেষ্ট করে রাখে নারীপ্রকৃতি।

কালে কালে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কর্ম্মক্ষেত্রে নব নব পরিণতি সাধন করতেই হয়। তখন পুরাতন অভ্যাসের জায়গায় নতুন উৎসাহের দরকার হয়। নতুন যুগের আহ্বান উপস্থিত হলে তবু যারা অপরিচিত পথের দুর্গমতা এড়িয়ে পুরাতন কালের কোটরে প্রচ্ছন্ন থাকতে চায় মৃত্যুর চেয়েও তাদের বড় শাস্তি,—তাদের শাস্তি জীবন্মৃত্যু। একদিন আমরা ভারতবর্ষে আত্মীয়-সম্বন্ধের বৈচিত্র্যে নিবিড়নিবদ্ধ একটি সমাজ পারিবারিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলাম। তাই আমাদের সংহিতাকাররা বলেছেন—গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নারীকে সেই আশ্রমের লক্ষ্মীরূপে পূজা করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেদিন ভারতবর্ষের এই গৃহধর্ম্মমূলক সভ্যতা ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পুণ্যে সৌন্দর্য্যে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তখন স্বভাবতই মেয়েদের উপর ছিল আতিথ্যের ভার, পূজার ফুলের সাজি সেদিন তারাই সাজিয়েছে; গৃহকে তারা সুন্দর করেছিল, পূর্ণ করেছিল। কিন্তু যে সুরক্ষিত সীমার মধ্যে এটি সম্ভব হয়েছিল, সেই সীমা আজ ভেঙে গেছে। আজ যুগসঙ্কটের দিনে ঘরের চেয়ে বাইরের দিকের ডাক বড় হয়ে উঠেছে। সে ডাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই অসম্মান। আজ আমাদের আশ্রয় একান্তভাবে গৃহের মধ্যে আর নয়। আজ সমস্ত পুরাণ

বাঁধ ভেঙে দিয়ে আমাদের প্রাণকে বাহিরে চারিদিকে দীনভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, তাতে আমাদের দীনতা মলিনতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সেই বিক্ষেপ থেকে নিজেদের বাঁচতে হবে নূতন ব্যবস্থায়। এই বাঁচাবার ভার বাইরের দিক থেকে পুরুষের, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মেয়েদের। যে নূতন উৎসাহে নূতন যুগের সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষদের এগোতে হবে, বিশ্বে আপন যোগ্য আসন অধিকার করতে হবে, সেই উৎসাহকে নিরন্তর সজীব রাখবে মেয়েরা। এই নূতন দিন আজ এসেছে। এ দিন পূর্ব্বে কখনো আসেনি, এমন নয়। ভারত একদিন পৃথিবীর সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা দেশে দেশে গিয়েছিলেন অমৃত বিতরণ করতে; যাঁরা সন্ন্যাসিনী তাঁরাও সর্ব্বমানবের মুক্তিদান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে মধ্য-এশিয়ার মরু-বালুকার মধ্যে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হয়েছে; সেখানে দেখছি ভারতীয় মৈত্রীদূতদের পদচিহ্ন, পাচ্ছি বিশ্বত্রাণ-সাধনার প্রাচীন বার্ত্তা; আজ আমাদের পরম অগৌরবের মধ্যে সেদিনকার মহিমার কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম যেদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়েছি, দেখলাম মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তির পায়ের কাছে বসে জাপানের এক ধীবর, বুদ্ধের শরণ নিলাম বলে প্রণাম করছে। রাত্রে দেখি পূর্ব্বকৃত পাপের অনুশোচনা নিয়ে বোধিদ্রুমের তলায় বসে সেই ভক্ত পাপ-মোচনের প্রার্থনা করছে। এমন দিন ছিল, যেদিন দূরদেশের মুক্তিকামীরা ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি ব'লে ভক্তি করছে। সেদিনকার বিশ্বযজ্ঞের দানক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ আজ কি আপনার হৃদয়কে একেবারে সঙ্কুচিত করতে পারে? অমৃতের পাত্র কি কখনো নিঃশেষে রিক্ত হয়? গৃহপরিধির বাইরে আজ আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করা চাই। বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজ দ্বার উন্মুক্ত, সর্ব্বত্র যাবার পথ অবারিত, আজ সেখানে আমরা কি নিয়ে যাব? যারা বণিক তারা পণ্য নিয়ে যায়, যারা দস্যু তারা লুট করবার অস্ত্র নিয়ে ছোটে, যারা জ্ঞানতাপস তারা আপনার জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে। ভারতের লোক কি কেবল এই বলে যাবে যে, আমরা পরের বুলি সংগ্রহ করতে এসেছি, আমরা অজ্ঞান, আমরা অশক্ত, আমরা অকিঞ্চন? তা নয়, বলতে হবে যে, আমাদের গুরুর মুখ থেকে আমরা অমৃতবাণী এনেছি। সেই কথা বলবার শুভ সময়কে তোমরা শ্রদ্ধার দ্বারা পুণ্যময় কর। বাহির-পৃথিবী থেকে অতিথি আসবে—তোমরা কল্যাণশঙ্খ বাজাও। তাদের বল, তোমরা শান্ত হও, সান্ত্বনা লাভ কর, তোমাদের ক্ষতবেদনা দূর হোক।

ভারতবর্ষ আতিথ্যকে বড় ধর্ম্ম বলেছে, কেননা আতিথ্যের দ্বারাই বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা স্বীকার করা হয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য, সে যে খুব বড়, তাকে অল্পপরিধির মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। খাঁচার মধ্যে যে আকাশটুকু আছে, তাতেই পাখীর ডানার সম্পূর্ণ সার্থকতা মেলে না। বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে ঘরের হাওয়ার যোগসাধন করলে তবে ঘরের হাওয়ার কলুষ দূর হয়। অতিথি গৃহীকে গৃহকর্ম্মের একান্ত সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে আসেন। এইজন্যে অতিথিকে দেবতা বলা হয়েছে, কেননা দেবতাই বড়র সঙ্গে যোগের দ্বারা ছোটকে উদ্ধার করে।

আজ যেমন বৃহৎভাবে ভারতের গৃহকর্ম্মের প্রয়োজনে আমাদের মন জেগেছে, তার অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতার কথা চিন্তা করছি, এই জাগরণের দিনে আজ তেমনি বড় করেই ভারতের ধর্ম্মসাধনের কথাও যেন ভাবতে পারি এই দুই চিন্তার পথেই মেয়েদের সেবাশক্তি ও শুভবুদ্ধির আহ্বান আছে। এই উভয় সাধনাতেই তোমাদের প্রবর্ত্তনা তোমাদের মঙ্গল-ইচ্ছা দেশকে শক্তি দেবে।

জয়শ্রী]

কলিকাতায় পৌরশাসনের সূচনাপর্ব্ব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি ও লটারি কমিটি

...গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতার আয়তন ও জনসংখ্যা আগেকার যুগের চেয়ে অতিমাত্রায় বাড়িয়াছিল, নানা অভাব-অভিযোগও দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তাহা নিরাকরণের কোনরূপ সুবন্দোবস্ত হয় নাই। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন বিধিবদ্ধ হইলে কয়েক জন জাষ্টিস নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইল রাস্তাঘাট সংস্কার করা, রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও রাস্তায় জল দেওয়া। কিন্তু আসল সমস্যার কোন সমাধান হইল না। লর্ড ওয়েলেস্‌লী ত্রিশ জন সভ্য লইয়া একটি টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি গঠন করিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারাও শহরের বিশেষ কোন সংস্কার সাধিত হইল না। অবশেষে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লটারি কমিটি শহর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। এ কমিটি পৌর উন্নতি বিধানে অতঃপর আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

'লটারি' কথাটির সঙ্গে আমরা এখন সকলেই পরিচিত। ভারতবর্ষে কলিকাতায়ই প্রথম ১৭৮৪ সালে লটারি আরম্ভ হয়। লটারি প্রথমে খোলা হয় সেণ্ট জন গীর্জ্জার গৃহনির্ম্মাণের জন্য। কিন্তু পরে ইহার অর্থের এক বৃহৎ অংশ শহরবাসীর উপকারার্থে ব্যয়িত হইতে থাকে। বহু পুষ্করিণী খনন করা হয়। আজ শহরের পূর্ব্ব দিকে যে খাল দেখিতেছি সেই বেলিয়াঘাটা খালও কাটা হয় এই লটারির টাকায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বাগবাজার হইতে উল্টাডিঙ্গি হইয়া বেলিয়াঘাটা পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে তাহাকে অনেকে ভ্রম করিয়া মারাঠা ডিচ বলেন। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের বহু পরে কর্ত্তিত ঐ খাল। মারাঠা ডিচ ছিল বর্ত্তমান আপার সারকুলার রোডে। পরে উহা বুজাইয়া এই নামের রাস্তা করা হইয়াছে। লর্ড ওয়েলেস্‌লী কলিকাতার টাউন হল নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া যান। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। লটারির টাকা দ্বারাই টাউন হলের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে।...

১৮১৪ হইতে ১৮৩৬ সন পর্য্যন্ত এই বাইশ-তেইশ বৎসর কলিকাতার পৌরকার্য্য এই লটারি কমিটি নির্ব্বাহ করেন। লটারি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করা বিলাতী কর্ত্তাদের মোটেই মনঃপূত হইল না। বিলাতে ইহা লইয়া খুবই আন্দোলন সুরু হইলে শেষোক্ত বৎসরে ইহা তুলিয়া দেওয়া হইল।...

শহরের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণীখননকার্য্য কমিটি পুরাদস্তুর করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত রাস্তাগুলির অধিকাংশই লটারি

কমিটির কীর্ত্তি। ষ্ট্রাণ্ড রোড ১৮২৮ সনে নির্ম্মিত হয়। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, উড ষ্ট্রীট, লাউডন ষ্ট্রীট, ময়রা ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট লটারি কমিটি নির্ম্মাণ করেন। গোল-দীঘি ও হেদুয়া পুষ্করিণী ১৮২৬ সনে খনন করেন।

ফিভার হস্‌পিটাল কমিটি

লটারি কমিটির এবম্বিধ পৌর সংস্কার কার্য্যেও কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হইল না। বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকা খনন করা হইলেও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। এজন্য প্রয়োজন অন্য রকম প্রতিষ্ঠানের। শহরে তখন জ্বর ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। শত শত লোক বর্ষা ও শরৎ কালে জ্বরে মরিতে থাকে। কলেরার আবির্ভাব হইত বসন্ত কালে। কলিকাতার দেশী ও বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই দুরবস্থা নিবারণের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফিভার হস্‌পিটাল কমিটিই এই চিন্তার ফল।

তখন জ্বর রোগের খুব প্রাদুর্ভাব হয়, ··· ধর্ম্মতলার নেটিভ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি লইয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হয়—প্রথমতঃ শহরের মধ্যভাগে সর্ব্বপ্রকার, বিশেষ করিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপন, দ্বিতীয়তঃ শহর ও শহরতলীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপায়াদি নির্দ্ধারণ ও সরকারে রিপোর্ট দান। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য সাধারণের গোচরীভূত করিবার জন্য ১৮৩৫ সনের ১৮ই জুন কলিকাতার টাউন হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সাব-কমিটির সভ্য সংখ্যা বাড়াইয়া দশ জন করা হইল। কমিটির দশ জন সভ্যের মধ্যে ছয় জন ইংরেজ ও চার জন ভারতবাসী। ইংরেজ সভ্যের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সর্ এডওয়ার্ড রায়াল, সর্ জন পিটর গ্রাণ্ট প্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিরা ছিলেন। ভারতীয়রা যথাক্রমে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, রসময় দত্ত ও রুস্তমজী কাওয়াসজী।

এক বৎসরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৮৩৬, ৩রা জুন তারিখে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড কমিটির উদ্দেশ্য অনুমোদন করিলেন ও ইহার সঙ্গে কলিকাতার কর নির্দ্ধারণ ও কর আদায়ের উপায় অনুসন্ধানের ভারও কমিটিকে দিলেন। তবে কমিটিকে সরকার-পক্ষের দুই জন বিশেষজ্ঞকে ইহার সভ্য নিযুক্ত করিতে হইল। ফিভার হস্‌পিটাল কমিটির নামেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। ইহার নাম দেওয়া হইল অতঃপর 'ফিভার হস্‌পিটাল এণ্ড মিউনিসিপ্যাল এন্‌কোয়ারী কমিটি।' সর্ হেনরি ইভান্ এ, কটন তাঁহার 'ক্যালকাটা ওল্‌ড এণ্ড নিউ' নামক পুস্তকে এই কমিটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It marks the beginning of the modern Municipal Government" অর্থাৎ বর্ত্তমান পৌর শাসনের সূত্রপাত হয় এই কমিটির স্থাপনায় সময় হইতে।···

কলিকাতার পৌর শাসনের যাবতীয় ব্যাপারই ইহার অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত ছিল। গৃহনির্ম্মাণপদ্ধতি, স্বাস্থ্য, নর্দ্দমা, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, গঙ্গায় খেয়ানৌকা চলাচলের ব্যবস্থা, কর নিরূপণ ও কর-সংগ্রহ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি সকল বিষয়ই কমিটি আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেন। তিনটি সাব-কমিটিতে বিভক্ত হইয়া ইহা কার্য্য করিয়াছিল। কমিটি তিনটি রিপোর্টে তাঁহাদের মন্তব্য সরকারে পেশ করেন। প্রথম রিপোর্ট দেওয়া হয় ১৮৪০ সনের জানুয়ারী মাসে, দ্বিতীয়টি ১৮৪৬ সনের আগষ্ট মাসে ও তৃতীয়টি ১৮৪৭ সনের অক্টোবর মাসে। কমিটির সভাপতিত্ব করিয়াছেন বরাবর সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি সর্ জন পিটার গ্রাণ্ট। সর্ জন পিটার ১৮৪৮ সনের মার্চ্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেন।···

কলিকাতার সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে ফিভার হস্‌পিটাল কমিটির সভাপতি গ্রাণ্ট সাহেবের কৃতিত্ব ভুলিবার নয়। তবে এ বিষয়ে দেশীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে, বিশেষ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজীও খুবই উদ্যোগী ছিলেন। রুস্তমজী গ্রাণ্ট সাহেবের সঙ্গে শহরের নানা স্থানে গিয়া তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতায় বসবাস করিয়া একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদের 'দুঃখদৈন্যদুর্দ্দশা তাঁহার চিত্ত ব্যথিত করিয়া তুলিত। তিনি কমিটির সভ্য হিসাবে সর্ব্বত্র গমন করিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কমিটিতে পেশ করেন। তৎকালীন কলিকাতার একটি পূর্ণ চিত্র তৎপ্রদত্ত বিবরণটি হইতে পাওয়া যায়।

১৮৩৬ সনের জুন মাসে সরকার ফিভার হসপিটাল কমিটিকে একটি সরকারী কমিটি বলিয়া স্বীকার করিয়া লন এবং ইহা পূর্ণোদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করে। তখন হইতেই নানা বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য্যও চলিতে থাকে। প্রথমেই কলিকাতার ঘরবাড়ীর কথা। চিৎপুর রোডের পশ্চিম দিকেই মূল কলিকাতা শহর অবস্থিত ছিল। এ-জন্য সে-যুগের বড়লোকের বাড়ী ও সওদাগরি আপিসগুলি এই জায়গায়ই অবস্থিত ছিল। ক্রমে শহর বাড়িয়া গেলে পূর্ব্বদিকে জন-বসতি স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। দরিদ্র, অর্থান্বেষীরা ক্রমে আসিয়া কলিকাতা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের তখনও কোন বাঁধাধরা নিয়ম হয় নাই। দরিদ্র লোকেরা প্রায়ই চালা-ঘর করিয়া বসবাস করিত। এই চালাঘরের বিপদ অনেক। খড় বা শণের ছাউনি হওয়ায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে অগ্নিদেব ইহার উপরে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিতেন। এক বার পুরাতন বালিগঞ্জে চালাঘরে আগুন লাগিলে লালবাজার পর্য্যন্ত যত চালাঘর ছিল সবই এই আগুনে ভস্মীভূত হইয়া যায়। শিয়ালদহ হইতে মাণিকতলা পর্য্যন্ত এক বার একই দিনে সব চালাঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী এই সম্পর্কে কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি বহুবার এইরূপ অগ্নিদেবের তাণ্ডবলীলা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন। ১৮৩৭ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১লা মে পর্য্যন্ত একটি হিসাবে দেখা যায়—আগুন লাগিয়া কলিকাতার শতকরা পনর খানা চালাঘর পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে।··· কমিটির, বিশেষতঃ রুস্তমজী কাওয়াসজীর চেষ্টায়, চালাঘরের বদলে খোলার ঘর নির্ম্মাণের প্রস্তাব সরকার কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয়। পুলিস হইতে এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় যে, নগর মধ্যে কেহ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার জল সরবরাহের কথা আসিয়া পড়ে। যখন আগুনে কলিকাতার বস্তির পর বস্তি একেবারে উজাড় হইয়া যাইত তখন জলাভাবে দমকলগুলি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না। রুস্তমজী কাওয়াসজী কমিটিতে বলেন যে, তিনি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছেন, এবং পরে ঐ অঞ্চলে নিজের জমিদারীতে বহু পুষ্করিণীও কাটিয়া দিয়াছেন। সরকার কিন্তু এদিকে তখনও মনঃসংযোগ করেন নাই। কলিকাতায় জলের অভাব তখনকার দিনের একটা প্রধান সমস্যা। লালদীঘিই তখন কলিকাতাবাসীর পানীয় জল জোগাইত। পূর্ব্ব-অঞ্চলের লোকদের পক্ষে অত দূর হইতে জল আনয়ন করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাহারা পচা খানাডোবার জল ব্যবহার করিত। ফলে অসুখবিসুখের অন্ত অবধি ছিল না। এই সময় বৈঠকখানা অঞ্চলের বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গীরা একযোগে পানীয় জলের অভাব মোচনের জন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী মারফত সরকারে দরখাস্তও করিয়াছিল।

জানবাজার হইতে শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত সার্কুলার রোডের পার্শ্বে অতঃপর বহু পুষ্করিণী খনন করাইয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করা হয়। পনর বৎসর পূর্ব্বেও মাণিকতলা হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত সার্কুলার রোডের দুই দিকে এইরূপ বহু পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হইত। এখন প্রায় সবগুলিই বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে।...

ফিভার হস্পিটাল কমিটিতে বাঙ্গালীর দান

মূলতঃ দরিদ্র জ্বররোগীদের সুচিকিৎসার জন্য ফিভার হস্পিটাল কমিটি গঠিত হয়। সাত জন গণ্যমান্য বাঙ্গালী এই উদ্দেশ্যে ষোল হাজার টাকা দান করেন।* ১৮৪৭ সনে চাঁদার পরিমাণ আটষট্টি হাজারে দাঁড়ায়। ফিভার হস্পিটাল কমিটির উদ্দেশ্য ব্যাপক হইয়া পড়ায় হাসপাতাল স্থাপনের ভার শিক্ষা-পরিষদের (Council of Education) উপর অর্পণ করে। মতিলাল শীল প্রদত্ত বার' হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড জমির উপর বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর এই হাসপাতালের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ইহাই এখনকার প্রসিদ্ধ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ফিভার হস্পিটাল কমিটির শেষ রিপোর্ট সরকারে পেশ করা হয় ইংরেজী ১৮৪৮ সনে। কিন্তু ইহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইতে বার বৎসর কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে ১৮৪৭ ও ১৮৫৬ সনে পৌর শাসন সংক্রান্ত দুইটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার ফলে পৌর সংস্কার কার্য্য কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। ইহার পর দ্রুত আরম্ভ—দুইটি আইন পাস হইল। কলিকাতা শহর সংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ির ভার দেওয়া হইল একটি কর্পোরেশনের উপর। কর্পোরেশন কথাটি এই সময় হইতেই চলন হয়। ১৮৫৯ সনে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নর্দ্দমা খননের ও রাস্তায় আলো দানের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা সুরু হয়। ষোল বৎসর পরে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়। বড় রাস্তাগুলির তলায় আটত্রিশ মাইল পরিমিত ইষ্টকের জলনিষ্কাশনপ্রণালী এবং ছোট অলিগলিতে এই জন্য সাঁইত্রিশ মাইল পরিমিত নল স্থাপিত হইল। এক শত পাঁচ মাইল পরিমিত রাস্তায় আলো দিবারও ব্যবস্থা হইল এই সময়ে। ফিভার হস্পিটাল কমিটির প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৮৭৬ সনে নূতন কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা অবধি এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল।...

অলকা]

* ইঁহারা যথাক্রমে—রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় (২,০০০৲), রাজচন্দ্র দাস (২,০০০৲), দ্বারকানাথ ঠাকুর (৫,০০০৲), মথুরানাথ মল্লিক (-,০০০৲) রুস্তমজী কাওয়াসজী (৩,০০০৲), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১,০০০৲), মাধব দত্ত (১,০০০৲)।

তরণী চলিয়া গেল

সি এফ এণ্ডরুজের স্মরণে

শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়

তরণী চলিয়া গেল দুরছন্দা উষার আহ্বানে
শ্যামল তটের স্নেহবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করি।
কে তারে বাঁধিবে ব্যর্থ জীবনের ব্যথাদীর্ণ গানে;
তবু অশ্রু দু-নয়নে অজস্র ধারায় পড়ে ঝরি।
ধূসর-পঙ্কিল স্রোতে উর্ম্মিক্ষুব্ধ আবর্ত্ত সঞ্চারি'
তরণী চলিয়া গেল রাত্রি হ'তে আলোকের দেশে।
উষার বিহ্বল স্বপ্নে স্বর্ণাভ ঝলিলে সিন্ধুবারি
সে প্রভাতে ধরণীরে মনে পড়িবে কি যাত্রাশেষে?

হৃদয়ের রক্তে রাঙা প্রীতিস্নিগ্ধ এক গুচ্ছ ফুল
অঞ্জলি অর্পিয়াছিনু তোমার জীবনতরী 'পরে,
সমাচ্ছন্ন অন্ধকার পার হয়ে অশ্রুসিন্ধুকূল
এ ধরার মুগ্ধস্মৃতি জাগাবে সে স্বর্গবায়ুভরে।
নিশার সন্ততি মোরা, হে নিশান্ত পথের পথিক,
নন্দন-আনন্দলোকে ধরিত্রীর সে স্নেহসৌরভ
জাগে যেন অনির্ব্বাণ বেদনার অক্ষয় প্রতীক;
এ নীরন্ধ্র অন্ধরাত্রে সেই মোর পরম গৌরব॥



আলোচনা



ছাত্র

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

প্র বা সী র শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করিয়া (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭, পৃ. ২৪১) বর্তমানে তাহা কেমন খাটে এই বিষয়ে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে নিম্নের কয় পঙ্‌ক্তি লিখিতেছি।

শব্দটি যে ছ ত্র হইতে হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা ছাদন করে, বা যাহা দিয়া ছাদন করা যায় তাহা ছ ত্র। রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে কষ্ট হয়, তাই মাথাকে ঢাকিয়া রাখে, বা তাহা দিয়া মাথা ঢাকা যায় বলিয়া ছাতাকে আমরা বলি ছ ত্র। কিন্তু ছ ত্র ও ছা ত্র এই উভয়ের মধ্যে যোগটা কেমন করিয়া, তাহা নিশ্চয় এক দিন অনেককে ভাবিতে হইয়াছিল। ইহাদের এক শ্রেণীর মত সম্পাদক মহাশয় বচন তুলিয়া ঠিকই দেখাইয়া দিয়াছেন "[ছত্রং গুরো বৈগুণ্যাবরণং শীলমস্য] অর্থাৎ গুরুর দোষ আবরণ করা যাহার স্বভাব।" এ ব্যাখ্যা আমাদের কাছে বহু কাল হইতে চলিতেছে। বহু স্থানে ইহা পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় একটি বচন তুলিয়াছেন। আর একটি তুলা যাউক। পাণিনির টীকা কা শি কা য় (৪. ৪. ৬২) আছে—"ছত্রং শীলমস্য ছাত্রঃ। গুরুকার্যেষ্বহিতস্তচ্ছিদ্রাবরণপ্রবৃত্তশ্ছত্রশীলঃ শিষ্যশ্ছাত্রঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, শিষ্য গুরুর কাজে অবহিত থাকিয়া তাঁহার ছিদ্র আবরণে প্রবৃত্ত থাকেন, তাই তিনি ছা ত্র।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা কেমন-কেমন মনে হয়, মনে লাগিতে চায় না। পতঞ্জলি নিজ ম হা ভা ষ্যে পাণিনির ঐ সূত্রেরই ব্যাখ্যায় আসল কথাটা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"কিং যস্য ছত্রধারণং শীলং স ছাত্রঃ।

কিং চাতঃ।

রাজপুরুষে প্রাপ্নোতি।

এবং তর্হি উত্তরপদলোপো দ্রষ্টব্যঃ। ছত্রমিব ছত্রম্। গুরুশ্ছত্রম্। গুরুণা শিষ্যশ্ছত্রবচ্ছাদ্যঃ। শিষ্যেণ চ গুরুশ্ছত্রবৎ পরিপাল্যঃ।"

ইহার অর্থ এইরূপ—

'ছত্র ধারণ করা যাহার স্বভাব সেই কি ছাত্র ?'

'তাহাতে কী ?'

'তাহাতে রাজার কোন লোককে ছাত্র বলিতে হয়। (কারণ, ছত্র ধারণ করা তাহারই স্বভাব, শিষ্যের নহে)।

'তাহা হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, এখানে পরের একটি পদ লুপ্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ এখানে ছত্র বলিতে ছত্রের মত)। গুরু হইতেছেন ছ ত্র (অর্থাৎ ছত্রের মত)। গুরু শিষ্যকে ছত্রের মত আচ্ছাদন করিয়া রাখিবেন (অর্থাৎ ছত্র যেমন শরীরটাকে ঢাকিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে, গুরুও তেমনি শিষ্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া বিপদ্‌-আপদ্‌ হইতে রক্ষা করিবেন)। আবার শিষ্যও গুরুকে ছত্রের মত পরিপালন করিবেন।'

পতঞ্জলির ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্ট। কা শি কা কা র এই ব্যাখ্যা লক্ষ্য করেন নাই কেন ভাবিবার বিষয়।

প্রবাসী-সম্পাদকের বক্তব্য।

ছাত্রের যেমন গুরুর প্রতি কর্তব্য আছে, গুরুরও তেমনই, বরঞ্চ তদপেক্ষাও অধিক, কর্তব্য আছে ছাত্রের প্রতি। সুতরাং যে ব্যাখ্যাতে উভয়েরই পরস্পরের প্রতি কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, তাহা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু আমি সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহীমাত্র হইলেও মনে যে-একটি সন্দেহ উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শিষ্য গুরুকে ছত্রের মত পরিপালন করিবেন বলিয়া যদি তাঁহার নাম ছাত্র হয়, তাহা হইলে গুরু ছত্রের মত শিষ্যকে বিপদ্‌আপদ্‌ হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া গুরুরও নাম কেন ছাত্র হইবে না ?

একটা অনুমান করিতে পারি কি ? ভর্তা শব্দটির ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ যিনি ভরণ করেন, প্রতিপালন করেন। কিন্তু বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীভিন্ন অন্য অনেকের প্রতিপালন করিলেও যেমন তাঁহাকে সাধারণতঃ স্ত্রীরই ভর্তা বলা হয়, সেইরূপ অতীত কালে অন্য অনেকে অন্য অন্য অনেকের মাথায় ছাতা ধরিলেও (যেমন রাজভৃত্যবিশেষে রাজার মাথায় ধরিত), গুরুর মাথায় ছত্রধারক শিষ্যই ছাত্র বলিয়া অভিহিত হইত।

ইহা আমার অনুমান মাত্র।

এরূপ অনুমানের একটা কারণও বলি। দোষ তো সব মানুষেরই আছে। তথাপি বেচারা গুরুদেরই দোষ ঢাকিবার জন্য শিষ্য আবশ্যক হইল এবং সেই কর্তব্য পালন করার শিষ্যেরা ছাত্র নামে অভিহিত হইলেন, ইহা মনে করিলে ও স্বীকার করিলে ইহাও মানিতে হইবে যে, অন্য সব মানুষের চেয়ে গুরুরাই অধিকতর দোষবহুল, অন্ততঃ সেকালে ছিলেন! ইতি।

বাঁকুড়ার প্রস্তাবিত ম্যুজিয়ম

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্. এ., মহাশয় ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে "বাঁকুড়ার পুরাকৃতি-রক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বাঁকুড়া জেলার অলিখিত ইতিহাসের প্রাচীনত্ব আলোচনা করেন, এবং বাঁকুড়া শহরে একটি প্রত্নভবন নির্মাণ করিয়া তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ও এখনও প্রাপ্তব্য প্রাচীন শিলামূর্তি আদি রক্ষার প্রস্তাব করেন। তাহাতে কত ব্যয় পড়িবে, তাহারও একটি আনুমানিক হিসাব তিনি দিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—



শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহার শিলালিপি

প্রত্যেক জেলাতেই পুরাবৃত্তের উপকরণ আছে। প্রত্যেক জেলাতেই উপকরণ সংগ্রহ ও রক্ষা, নূতন উপকরণ অন্বেষণ ও বিনিয়োগ নিমিত্ত যে নামেই হউক এক সমিতি স্থাপন কর্ত্তব্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কে জানিত দামোদরের দক্ষিণে মহানাদ নামক স্থানে পুরাকৃতি পাওয়া যাইবে? এক এক দিন যাইতেছে, কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু নষ্ট হইতেছে। পুরাকৃতির মূল্য নাই। আর যে মানুষ তাহার বাসভূমির বর্ত্তমান ও অতীত দশা স্মরণ না করে, সে অন্ধ থাকিয়া কাল কাটায়। স্বদেশের জ্ঞান নিমিত্ত আর কত কাল বিদেশীর কৌতূহলের প্রতীক্ষায় থাকিবেন? যে দেশ নূতন নূতন ধন উপার্জ্জন করে, সে দেশ ধন্য। আর, যে দেশ পৈতৃক ধন রক্ষা করিতে উদাসীন, সে কিসের গৌরব করিবে? বাঁকুড়ার যত প্রকারের যত উপকরণ আছে, রাঢ়ের অন্য কোন জেলাতে তত নাই।

বাঁকুড়া জেলায় পূর্বে প্রাপ্ত এবং এখনও প্রাপ্তব্য অগণিত পুথী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

এইরূপে দীর্ঘকালে বহু পুথী সঞ্চিত হইয়াছিল। কত পুথী ইন্দুর কাটিয়াছে, উই মাটি করিয়াছে, বর্ষার জল পচাইয়াছে, আগুনে ভস্ম করিয়াছে; নষ্ট পুথী ডোবার জলে ও সারকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথাপি গাড়ী গাড়ী পুথী স্থানান্তরিত হইয়াছে। "এশিয়াটিক সোসাইটি"র পুথীশালায়, "বিশ্বকোষ" কার্য্যালয়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীশালায়, কিছু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীর সংখ্যা বাড়াইয়াছে। সে সকল পুথী সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, সত্য; কিন্তু বাঁকুড়া নিঃস্ব হইয়াছে। আর যে কত পুথী, কত পুথীর পাতা গ্রন্থগৃধ্নু ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়া অজ্ঞাত দেশে লইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কাশীরামদাসের মহাভারতের তিনখানা পুথী. পাত্রসায়র হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীশালায় গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি কাশীরামদাসের নিজের পুথীর মাত্র পনর বৎসর পরে পাত্রসায়রে অনুলিখিত হইয়াছিল। "ধর্ম্মপূজাবিধানে"র ও রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণে"র পুথী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল। এত পুথী নষ্ট ও স্থানান্তরিত

হইবার পরেও যে বিষ্ণুপুরে আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর পুথী পাওয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্য বটে।

তিনি ঠিক্ই বলিয়াছিলেন, "যত দিন যাইতেছে, শিলাপ্রতিমা ও পুথীও তত নষ্ট ও স্থানান্তরিত হইতেছে।" ইহা বিবেচনা করিয়া বাঁকুড়ায় প্রত্নভবন নির্মাণের প্রস্তাব ১৩৪১ সালে সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আমরা ১৩৪১ সালের ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলাম :—

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঁকুড়া জেলার পুরাকৃতি অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি, ধাতু-মূর্ত্তি, শিলা বা ধাতুর তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁকুড়া শহরে একটি মিউজিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যার অন্যত্র মুদ্রিত হইল। আমরা তাঁহার প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি যে-সকল প্রাচীন জিনিষ রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা একবার নষ্ট হইলে বা বাঁকুড়া হইতে অন্যত্র অপসৃত হইলে আর পাওয়া যাইবে না, অথচ সেগুলি বাঁকুড়া জেলার অমূল্য সম্পদ। 'প্রবাসী'র পাঠকগণ বিক্রমপুরের একটি গ্রাম আড়িয়লের মিউজিয়মটি সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও করিতে পারেন। একটি গ্রামে যাহা হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে এবং যাহা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহা একটি শহরে নিশ্চয়ই হওয়া উচিত ও হওয়া সম্ভবপর।

প্রত্নভবনের পরিকল্পনা চণ্ডীদাস-স্মৃতিমন্দিরের অংশ রূপে কয়েক মাস পূর্বে আবার প্রকাশিত হইয়াছে। আশা আছে, এবার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইবে।

বাঁকুড়া ও তৎসন্নিহিত মানভূম জেলার প্রাচীনত্ব উভয় জেলায় দৃষ্ট অনেক জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি এবং প্রাচীন কোন কোন মন্দির হইতে প্রমাণিত হয়। বাঁকুড়া শহর হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া গেলে প্রায় ১৩।১৪ মাইল দূরে শুশুনিয়া নামে যে পাহাড় আছে, তাহার একটি গুহার শিলালিপিটির পাঠ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত রূপ করিয়াছিলেন :

"চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ
পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রী সিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রী চন্দ্র বর্ম্মণঃ কৃতিঃ"

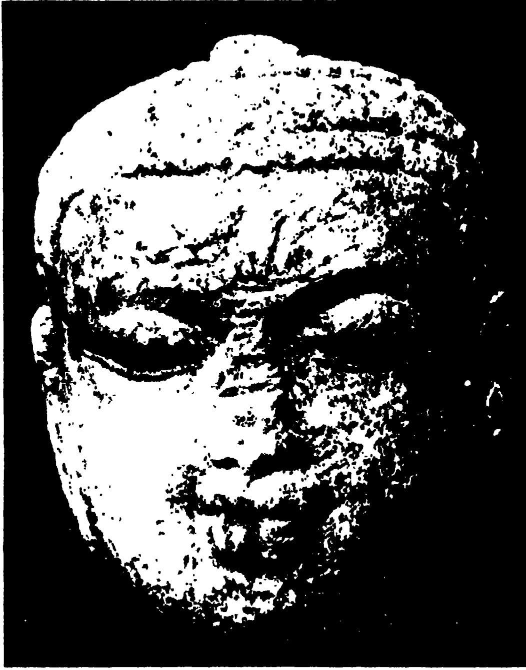
অনুবাদ। "চক্রস্বামীর দাসগণের প্রধান কর্তৃক উৎসৃষ্ট হইল। পুষ্করের অধিপতি মহারাজ শ্রী সিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রী চন্দ্রবর্ম্মার অনুষ্ঠান।"

এই চন্দ্রবর্মা কে, সে বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র রায়ের মত ভিন্ন ভিন্ন। লিপিপ্রাজ্ঞেরা লিপিটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বলিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা যায়, শুশুনিয়া পাহাড়ের সন্নিহিত অঞ্চল অন্যূন দেড় হাজার বৎসর পূর্বেও মানুষের আবাসস্থল বলিয়া বিদিত ছিল।



কার্ত্তিকেয়। সাধারণত "ধাঁদারাণী" বলিয়া পরিচিত।
শ্রীশরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় গৃহীত ফটোগ্রাফ

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩০৩ সালে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় শুশুনিয়ার শিলালিপিটির যে অনুলিপি দিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইল। লিপিটি এখন কি অবস্থায় আছে, বাঁকুড়ার প্রত্নতত্ত্বজিজ্ঞাসুদের তাহা দেখা কর্তব্য। একটি অনুলিপি লওয়াও আবশ্যক। কর্তৃপক্ষ গুহা ও লিপিটির রক্ষণের ব্যবস্থা যদি এখনও করেন, তাহা হইলে বঙ্গের প্রাচীনতম—অন্ততঃ অন্যতম প্রাচীনতম—পুরাকৃতি আরও কিছু কাল টিকিয়া থাকিবে।



বুদ্ধ বা শিব (?) মূর্তি

বাঁকুড়া জেলায় এখনও কিরূপ প্রাচীন মূর্তি আছে, তাহার কিছু চিত্র দিবার ইচ্ছা থাকায় আমরা বাঁকুড়া শহরের শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়কে কয়েকটি ফোটোগ্রাফ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন আমাদের অনুরোধে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও গিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যধিক উত্তাপবশতঃ তাঁহার তোলা ৩৫ খানি ফোটোগ্রাফের ফিল্ম নেগেটিভ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার তোলা সূর্যমূর্তি (২টি), নর্তকী-মূর্তি এবং ক্ষেত্রপাল-মূর্তির ফোটোগ্রাফ মুদ্রিত হইল। বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্তী একতেশ্বর শিবমন্দিরের বেষ্টনে "থাঁদারাণী" নামে অভিহিত মূর্তির শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় যে ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন তাহাও মুদ্রিত হইল। এই মূর্তিটি বালুকাশিলার (sandstoneএর)। ক্ষয় পাওয়ায় ভাল ফোটোগ্রাফ উঠে নাই। আবশ্যকমত আলো না থাকায় ক্ষেত্রপাল (?) মূর্তিটিরও ফোটোগ্রাফ ভাল উঠে নাই।

বাঁকুড়ার জেলা ও সেশ্যন জজ শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার মহাশয়ের নিকট যে দুটি মূর্তি আছে, দুইটিই সারেঙ্গা গ্রামে প্রাপ্ত। দুইটিই অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত। তিনি উভয়েরই ফোটোগ্রাফ অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যেটি নারীমূর্তি, চামুণ্ডা মূর্তি বলিয়া অনুমিত, তাহার ফোটোগ্রাফ অত্যন্ত অস্পষ্ট বলিয়া ছাপিলাম না। যেটি ছাপিলাম, তাহা শিবের মুখ কিংবা বুদ্ধদেবের মুখ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় চারটি মূর্তির যে পরিচয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নীচে দেওয়া গেল।



ক্ষেত্রপাল (?) মূর্তি

১। সূর্য-প্রতিমা। শিলা। কোতলপুরের নিকটস্থ এক দীঘির পঙ্কোদ্ধারকালে প্রাপ্ত। এখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাটীতে আছে। ইহার দুটি ফোটোগ্রাফ মুদ্রিত হইল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। নর্তকী-মূর্তি। শিলা। হদলনারানপুরের নিকটস্থ বারাসত গ্রামের শ্রীভোলানাথ রায় দামোদরের দক্ষিণতটে এক গর্তে পাইয়াছিলেন। এক্ষণে বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র পালিত মহাশয়ের নিকট আছে। বোধ হয়, প্রাচীন পোখর্না গ্রামের কোনও পাষাণ-প্রাসাদে নিবদ্ধ ছিল, স্রোতে চলিয়া আসিয়াছে।

৩। এক্তেশ্বরের মন্দিরের বেষ্টনের যে মূর্তি, নাসিকা ভগ্ন বা কর্তিত বলিয়া, "খাঁদারাণী" বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা নারীমূর্তি নহে। ইহা (যোগেশবাবুর মতে)

কার্তিকেয়-মূর্তি। বালুকাশিলা। পদ হইতে বক্ষ কঞ্চুকাবৃত। দ্বাদশ ভুজ। দশ হাতে অস্ত্র, অপর দুই হাত পার্শ্বের দুই ভক্তের মাথায়। মস্তকের উপরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সাতটি সর্পফণাবৎ ময়ূরপুচ্ছ-চন্দ্রিমা। ময়ূরমূর্তি লুপ্ত। অবিকল এই প্রতিমা কিন্তু ছোট আর এক মন্দিরে আছে। আর এক মন্দিরে বালুকাশিলার লম্বোদর-গজানন প্রতিমা আছে।

৪। ক্ষেত্রপাল (?)। বালুকাশিলা। ছাতনা গ্রামে। এইরূপ মূর্তি দূরে দূরে অন্য স্থানেও আছে। যথা, জয়পুর, ইন্দাস, সালতড়া, শুশুনিয়া, মৌলবনা ও তিলুড়ী গ্রামে।

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন, "কোথাও কোথাও লোকে এইরূপ মূর্তিকে ক্ষেত্রপাল বলে। আরও না দেখলে ক্ষেত্রপাল কিনা ব'লতে পারি না।"

বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হরিসাধন দত্ত মহাশয় হেমন্তবাবুকে নানা জায়গায় ফোটোগ্রাফ তুলিতে নানাবিধ সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

হৈমন্তী

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

হেমন্ত, থাকো, থাকো,
শিশিরান্ত-অনুগামী বসন্ত-বারতা তুমি আনো।
থাকো, থাকো।

বসন্ত মোর ক্ষণ-বসন্ত, হায়,—
আগমনী তার বিদায়ের আবাহনী।
হেমন্ত, থাকো, থাকো।
অপচীয়মান প্রমায়ু প্রহরগুলি,
প্রত্যাবৃত্তি মায়ামৃগতৃষ্ণিকা—
হায়, হেমন্ত, কৃপণের সঞ্চয়
রিক্তপ্রায় যে বসন্তমঞ্জুষা।
হেমন্ত, থাকো, থাকো।
যুগান্বিত করো বিদায় বৈকালিকী—
সন্ধ্যা-সোনায় না হয় স্বপ্ন দেখো
হারীত হিলোল শষ্প-সমুদ্রের
নিহিত বীজের সাম্প্রত অবসান।
তবে, হেমন্ত, তবে কেন ত্বরা তব?
হেমন্ত, থাকো, থাকো।

আমরা মানুষ বন্ধ্যাতা-অভিহত
আমাদের বীজে ধ্বংসের অভিশাপ
আমাদের পিছে উষরিত প্রান্তর
কীর্ণ হতাশা-কঙ্কাল-করোটিতে।
আমাদের তরে পিছনেতে চাওয়া নয়—
তাই, হেমন্ত, অলীক স্বপ্ন রচি
ভবিষ্য কোন্ আগামী বসন্তের—
আমরা মানুষ সুরসভাপতি কৌতুকবিদূষক

প্রাণের গহনে মৃত্যুবিষাণ শুনি
দূরাগত মহাসাগর আন্দোলন—
এই বসন্ত শেষ বসন্ত মোর?

হেমন্ত, থাকো, থাকো।

সূর্য-প্রতিমা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বছর পাঁচেক হ'ল, এক দিন প্রাতঃকালে এক অপরিচিত ভদ্রলোক গো-যানে শিলা-প্রতিমাটি এনে আমায় দিয়ে যান (চিত্র পশ্য)। আমি অবাক্। আমি ঠাকুর-প্রতিমা কোথায় রাখব, কি ক'রব ?

"যেখানে ইচ্ছা রাখুন, যা ইচ্ছা করুন।"

তাঁর নাম শ্রীযুগলকিশোর-সরকার, নিবাস কাক-দ্বীপে (কাকটো), স্থিতি রাহাগ্রামে, কোতলপুর হ'তে ছয় মাইল পশ্চিমে। প্রতিমাটি কোতলপুরের এক দীঘিতে পাওয়া গেছল। এখান হ'তে কোতলপুর চল্লিশ মাইল পূর্বে। নামধাম শুনে তাঁকে চিনতে পারলাম। তিনি একদা কোটেশ্বর দুর্গের (কোড়াসুর গড়ের) বর্ত্তমান অবস্থা আমায় জানিয়েছিলেন। যুবা বয়স, উৎসাহ আছে, কত পুরা-কৃতির সন্ধান দিতে পারতেন। কিন্তু দৈবগতিকে রাহাগ্রামে কবিরাজি ক'রছেন।

প্রতিমার নীচে সাতটি ঘোড়া দেখে বুঝলাম, সূর্যের। কিন্তু এই পর্যন্ত। আমি প্রতিমা-লক্ষণ কিছুই জানি না।

কিন্তু বারে বারে চোখ প'ড়তে লাগল। এমন সুন্দর সহাস্য মুখ, বীর-বপুঃ, ত্রিভঙ্গ। মস্তকে মুকুট, মস্তক বেষ্টন ক'রে প্রভামণ্ডল, কণ্ঠে হার, বক্ষে যজ্ঞোপবীত, কটিতে বস্ত্র, দ্বিতীয় বস্ত্রের কিয়দংশ স্কন্ধের উপরে। হাত দুখানি ভেঙ্গে গেছে। হাতে কি ছিল ? কিন্তু পায়ে কি 'বুটজুতা' ? ডান পায়ের সম্মুখে সারথি, অরুণ। কিন্তু দু-পাশে কে দুটি দাঁড়িয়ে ? এদের পায়েও 'বুট-জুতা' ? এদের দু-পাশে দুটি ধনুকধারী।

সূর্য-প্রতিমাটির পা হ'তে মুকুট পর্যন্ত আটাশ আঙ্গুল। পায়ের নীচে সাত আঙ্গুল। রথের চারিটি স্তম্ভ। মাঝে সমুখে একটি ঘোড়া, দু-পাশে তিনটি তিনটি ছয়টি। ঘোড়াগুলি ঊর্ধ্ব পদে ছুটছে। দু-পাশে (চিত্রে দেখা যাবে না) দুখানি চাকা। বাম চাকা চারি আঙ্গুল, দক্ষিণ চাকা তিন আঙ্গুল। বাম চাকায় এগারটি অর, দক্ষিণ চাকায় দশটি।

সূর্যের নরাকার কেমনে হয় ? সূর্য নূতন দেব নহেন, ঋগ্বেদের ঋষিদের বন্দ্য। ঋষিরা এঁর রূপ কল্পনা করেন নাই, ক'রবার প্রয়োজন ছিল না। যিনি প্রত্যহ দৃষ্ট হ'চ্ছেন, মহাদ্যুতি চক্র, অখণ্ড মণ্ডলাকার, তাঁর নরাকার কল্পনা বৈদিক হ'তে পারে না। ছয় বা সাত বা আট আদিত্যের রূপ কল্পিত হ'তে পারে, হয়ে'ও ছিল, যদিও সম্পূর্ণ নয়। কারণ আদিত্যেরা সূর্যের শক্তি। তাঁদের মাত্র কর্ম দেখছি। যে যে রূপ কল্পনা দ্বারা সে সে কর্ম সম্পাদিত হ'তে পারে, সে সে রূপ আদিত্যের হ'তে পারে। (আদিত্য কে, বুঝতে হ'লে বর্তমান বর্ষের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা পশ্য।) যেমন দশভুজার রূপ। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি, জ্বালাময়ী অগ্নি যার দ্যোতক, ইত্যাদি। তাঁর মূর্তি নাই, থাকতে পারে না। আমরা শক্তির প্রতিমা ধ্যান করি। সূর্যের চিত্র লিখতে হ'লে জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি চক্র হবে। আরও কিছু লিখতে হ'লে সপ্তাশ্ব-চালিত রথ দিতে পারা যায়।

সূর্য-প্রতিমা সূর্য-পুরুষের। সূর্য পুরুষরূপে কল্পিত। চন্দ্রের প্রতিমা আছে কিনা, জানি না। যদি থাকে, সেটিও চন্দ্র-পুরুষের। এই পুরুষ-কল্পনা এদেশের, বৈদিক আর্যদের নয়। বায়ুপুরাণ ("বঙ্গবাসী"র ৬৮।১২) লিখেছেন, "সূর্য ও চন্দ্রমা উভয়ে পূর্বে অসুরদিগের দেবতা ছিলেন, সম্প্রতি সুরদিগের হয়েছেন।" সামান্য অর্থে কথাটা অবিশ্বাস্য। সোম ও সূর্য বাদ দিলে সুরপুর শূন্য। এর অর্থ, নরাকার সূর্য ও চন্দ্রমা সুরপূজক আর্য-দের নয়। এখানে অসুর কে, তা বুঝা কঠিন। পুষ্কর দ্বীপের (মেসোপোটেমিয়া) কিম্বা অন্য দ্বীপের প্রজা হ'তে পারে। শাকদ্বীপেরও হ'তে পারে। পূর্বাপর

চিন্তা ক'রলে শাকদ্বীপবাসীকে অসুর ভাবতে হ'চ্ছে। এই অসুর অবশ্য স্বর্লোকের নয়। আমরা পুরাণের বহু উক্তি বুঝতে পারি না। এর প্রধান কারণ, প্রাচীনেরা মনে ক'রতেন, যা ভূলোকে আছে, তা স্বর্লোকেও আছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে (১৩৩৮, বৈশাখ) "প্রবাসী"তে পুরাণের দেশ দেখেছি। আফগানিস্থানের উত্তরে আরানা হ্রদ পর্যন্ত দেশ, শাকদ্বীপ। বৈদিক আর্যদের পূর্বপুরুষ শাকদ্বীপের উত্তরে ও পূর্বভাগে বাস ক'রতেন। সেটা মেরু দেশ, উত্তর কুরুবর্ষও বটে। দক্ষিণে আসবার সময় তাঁরা নিশ্চয় শাকদ্বীপ দিয়া এসেছিলেন। তাঁরা এক-কালে সকলেই স্বদেশ ত্যাগ করেন নাই। কত লোক পশ্চিম দিকে গেছলেন। শকেরাও দক্ষিণ দিকে এসে-ছিলেন, পশ্চিম দিকেও গেছলেন। শকেরা আর্যদের অপরিচিত ছিলেন না। পুরাণে দেখছি, শাকদ্বীপেও চারি বর্ণের মানুষ ছিল। শ্বেতবর্ণেরা সে দেশের ব্রাহ্মণ। তাঁরা শাকদ্বীপের মঙ্গ বা মগ প্রদেশে বাস ক'রতেন, এদেশে মঙ্গ বা মগ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। যেমন, 'বঙ্গ' ব'ললে বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশবাসী বুঝায়। মহাভারতে (ভীষ্ম।১১ অঃ) মঙ্গাঃ ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ। হয়ত এই ব্রাহ্মণ ও আর্য ব্রাহ্মণ একই জাতি, দেশান্তরে বাসহেতু মগ ব্রাহ্মণ পৃথক্ বিবেচিত হ'তেন। তাঁরা জ্যোতিষচর্চা ক'রতেন, এক নগরের নাম জ্যোতিষপুর বা প্রাগ্-জ্যোতিষপুর রেখেছিলেন। তাঁরা আসামে এসে স্বদেশের নামটি রেখেছিলেন। শাকদ্বীপের পূর্ব সীমায় মেরুর দক্ষিণে উদয়াচল, পশ্চিম সীমায় অস্তাচল। এই দুই পর্বত ভারতে নাই। তাঁরাই নরাকারে সূর্যের উপাসনা ক'রতেন। ভারতে এসে সূর্য-পূজা প্রচলিত ক'রে-ছিলেন। অদ্যাপি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা গ্রহবিপ্র, গ্রহা-চার্য, আচার্য নামে আখ্যাত আছেন। শকাব্দ, সে আচার্যদিগের জ্যোতিষিক গণনা-লব্ধ অব্দ। আমার বিশ্বাস, তাঁরাই সৌর মাসে বৎসর গণনার প্রবর্তক। আসাম হ'তে মাদ্রাজ পর্যন্ত সৌর মাস প্রচলিত।

শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন। কালক্রমে এঁরাই শকনামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁরা কত কাল পূর্বে ভারতে কিম্বা ভারত-সীমান্তে বাস আরম্ভ ক'রেছিলেন? কে জানে। এখানে পুরাণ মান্য। বায়ু (৮৮ অঃ) বিষ্ণুপুরাণ (৪।৩ অঃ) লিখেছেন, ইক্ষ্বাকু বংশের সগর রাজার কালে শক যবন (বেবিলোনী), পহ্লব (ইরাণী) ও তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণ ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। তৎকালে তাদের কতক লোক ভারতের পশ্চিমোত্তর ভাগে বাস ক'রত। ভারত-যুদ্ধ ১৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ধরে' ও পুরুষ গণে' সগর রাজার কাল খ্রি-পূ ২৯০০ অব্দ আসে। ভারত-যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত কৌরব পক্ষে ছিলেন। শক-জাতীয় সৈন্যও ছিল। যারা ভারতে একবার ঢুকেছে, তারা এদেশেই রয়ে গেছে। এদেশের অসংখ্য জাতির উৎপত্তি এইরূপে হয়েছে। বৃত্তি অনুসারে অনেক জাতি-নাম হয়েছে, উৎপত্তি দেখে হয় নাই। গৌতম বুদ্ধ শাক্যমুনি নামে খ্যাত। তিনি শক-ক্ষত্রিয় বংশে জন্মে'ছিলেন। যে সব শক ভারতের কোথাও কোথাও রাজত্ব ক'রেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় শক ব্রাহ্মণও স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে'ছিলেন। বোধ হয় এঁরাই সূর্য-প্রতিমা পূজা এদেশে প্রবর্তিত ক'রেছিলেন। ভারতের পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর ভাগ হ'তে পূর্বভাগে সৌর উপাসক সম্প্রদায় এসে থাকবে। আসাম হ'তে বাংলা দেশে ও উড়িষ্যায় আসবার লক্ষণ পাওয়া যায় না। রাঢ়ের রাজা শশাঙ্কের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল, গ্রহাচার্যেরা এই রোগের চিকিৎসা জানতেন, গ্রহযাগ, ও সূর্যার্ঘ দিয়া শান্তি ক'রতেন। লোকে বলে রাজা শশাঙ্ক তাঁদিকে রাঢ়ে এনেছিলেন। সে প্রায় ১৩৫০ বৎসর পূর্বের কথা। তার পর ভোজ রাজারাও রাঢ়ে রাজ্য ক'রেছিলেন। তাদের সহিত গ্রহাচার্যদের সম্পর্ক ছিল। 'ভোজক' অর্থে গ্রহাচার্য বুঝাত। আমার বিশ্বাস, 'ধর্ম'-পূজা-প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত গ্রহবিপ্র ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত গ্রহাচার্যেরাই চর্মরোগের চিকিৎসক ছিলেন, এবং এখনও বসন্তরোগে তাঁরাই চিকিৎসা করেন। বক-দ্বীপে (বগড়ী) ও কোতলপুরে অনেক আচার্যের বাস আছে। বিষ্ণুপুরের নিকটে আচার্যের এক গ্রাম আছে। উপস্থিত সূর্য-প্রতিমাটি কোতলপুরে পাওয়া গেছে। প্রতিমাটি এক হাত উচ্চ। (২০ ইঞ্চির

হাত, ২৪ আঙ্গুলে এক হাত) প্রতিমা-শাস্ত্রানুসারে এত উচ্চ প্রতিমা প্রাসাদে (মন্দিরে) স্থাপিত হ'ত। সেজন্য তলদেশে চতুরস্র মূল আছে। তদ্দ্বারা নিবদ্ধ ছিল। পূজক প্রতিষ্ঠাতা ধনবান্ ছিলেন, প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বোধ হয়, দীঘিটি তাঁরই খনিত। কোতলপুরে পাঠান-মোগলের সংঘর্ষ হয়েছিল। কোতলপুর নামেই প্রকাশ এটি কোতলু-খাঁর পুর। হয়ত এক যুদ্ধের কালে সূর্য-মন্দির ধ্বংস হয়, প্রতিমাটি দীঘিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এখন মন্দিরের চিহ্ন নাই, দীঘিটি আছে। সেখানে অনুসন্ধান ক'রলে পুরাতন কাহিনী শোনা যেতে পারে। এই অনুমান সত্য হ'লে প্রতিমাটি প্রায় চারি শত বৎসরের পুরাতন। অম্বিকা-নগরেও একটি প্রতিমা আছে। দুইটি প্রতিমা দেখতে পেলে আরও কিছু জানতে পারা যেত।

এখন সূর্য-প্রতিমার শাস্ত্রীয় লক্ষণ দেখি। বৃহৎ-সংহিতায় বরাহ-মিহির (৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) পুরাতন শাস্ত্র দেখে লিখেছেন (৫৯ অঃ),—

রবির নাসা ললাট জঙ্ঘা ঊরু গণ্ড বক্ষঃ উন্নত। বেশ উত্তরদেশীয়। পদ হ'তে বক্ষঃ লুক্কায়িত। হস্তে পদ্ম, মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, দেহ কঞ্চুক দ্বারা গুপ্ত, হার প্রলম্বিত, মুখ স্মিতপ্রসন্ন, প্রভামণ্ডল উজ্জ্বল, গ্রহগণে পরিবৃত।

যে দেশের প্রতিমা, সে দেশের বেশ হয়ে থাকে। ইহা সামান্য বিধি। এখানে রবি-প্রতিমার বেশ উত্তর-দেশীয়, অর্থাৎ পঞ্জাব কি শকদ্বীপের।

বরাহ-মিহির আরও লিখেছেন (৬০ অঃ),—

ভাগবতেরা বিষ্ণুর ব্রাহ্মণ, ভগেরা সূর্যের ব্রাহ্মণ, সভস্ম দ্বিজেরা শিবের, মাতৃমণ্ডলবিদেরা মাতৃগণের, শাক্যেরা বুদ্ধের, নগ্নেরা জিনের যে ব্রাহ্মণ যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি স্বীয় বিধি অনুসারে সে দেবতার পূজা করবেন।

লিখিত আছে। সূর্যের ব্রাহ্মণ 'ভগাঃ'। 'মঙ্গ' বা 'মগ' শব্দের বিকারে 'ভগ'। অতএব ৫০০ খ্রিষ্টাব্দেও মগ ব্রাহ্মণেরা সূর্য পূজা ক'রতেন। তাঁদের পা হ'তে বুক পর্যন্ত কঞ্চুক-টান জামায় ঢাকা থাকত, পায়ে লম্বা জুতা থাকত। তখনও তাঁরা বিদেশী।

অগ্নিপুরাণ লিখেছেন (৫১ অঃ),—

সূর্য সপ্তাশ্বচালিত একচক্র রথে অবস্থিত। দুই হস্তে পদ্ম। দক্ষিণে 'কুণ্ডী'; তার হাতে মসীপাত্র ও লেখনী। বামে 'পিঙ্গল', দণ্ডধারী, রবির গণ (দ্বারী)। পার্শ্বে ছায়া ও রাজ্ঞী [? সংজ্ঞা] ব্যজন করবেন। উপস্থিত প্রতিমার কুণ্ডীর মুখে দাড়ি, মাথায় মুকুট, পায়ে লম্বা জুতা, বাঁ হাতে মসীপাত্র, ডান হাতে লেখনী বটে। পিঙ্গলের মাথায় মুকুট, পায়ে লম্বা জুতা, হাতে খড়্গ ও খেটক। মুখে দাড়ি নাই। ছায়া সংজ্ঞা নাই। রথটি সপ্তাশ্ব বটে, কিন্তু দ্বি-চক্র।

মৎস্যপুরাণ লিখেছেন (২৬১ অঃ),—

দিবাকর রথস্থ, পদ্ম-হস্ত, সুলোচন, রথ একচক্র, সপ্তাশ্ব। শিরে মুকুট, নানাভরণভূষিত ভুজদ্বয়ে পদ্ম। লীলায় দুই স্কন্ধেও দুই পদ্ম। বপুঃ চোলক দ্বারা আচ্ছন্ন। পরিধানে বস্ত্রযুগ্ম। চরণ তেজোদ্বারা আবৃত 'তেজসাবৃত'। পার্শ্বে দণ্ডী ও পিঙ্গল নামে দুই খড়্গধারী প্রতিহার। লেখনীহস্তে ধাতা ও অপর দেবতা।

উপস্থিত প্রতিমার স্কন্ধের উপরে দুই পদ্ম আছে। পায়ে স্পষ্ট জুতা, তাকে তেজঃ ব'লতে পারা যায় না। দেহ চোলক (টান জামা) দ্বারা আবৃতও নয়।

বরাহ-মিহিরের দেশ উজ্জয়িনী, কাল প্রায় পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দ শতক। পুরাণের দেশ ও কাল নির্ণয় অতিশয় গাঢ়। কারণ আরম্ভ যত পুরাতন, সমাপ্তি তত নয়। অগ্নিপুরাণ সংগ্রহ গ্রন্থ, বোধ হয় মধ্য-প্রদেশের নবম খ্রিষ্টাব্দ শতকের। মৎস্যপুরাণের প্রতিমা-লক্ষণ তদপেক্ষা আধুনিক। কারণ দশভুজা কাত্যায়নীর লক্ষণে লিখিত আছে, ইনি অতসীকুসুমবর্ণাভা। অতসী পুষ্প নীলাভ, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নয়। এই ভ্রম ষোড়শ খ্রিষ্টাব্দ শতকের। মৎস্যপুরাণের দেশ পশ্চিম-ভারত, বোম্বাই। দেশভেদে ও কালভেদে প্রতিমা-লক্ষণের কিছু কিছু ভেদ হয়। কিন্তু মুখ্য লক্ষণ একই থাকে।

আগন্তুক লক্ষণ ত্যাগ ক'রলে সূর্যের প্রতিমায় হস্তে পদ্ম, পদ হ'তে বক্ষঃ চোলকাবৃত, একচক্র সপ্তাশ্ব রথে অধিষ্ঠিত। বরাহ-মিহির একচক্র সপ্তাশ্ব রথের উল্লেখ করেন নাই। এই লক্ষণ দিতে গেলে বেদ মানতে হবে,

সূর্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ছিলেন না। কিন্তু এদেশে বাসহেতু প্রতিমায় কিছু কিছু নূতন যোগ ক'রে থাকবেন। শাকদ্বীপে পদ্মের অভাব। সেটি কাশ্মীরে পেয়ে থাকবেন। প্রতিমার বেশটিও কাশ্মীরী। মনে হয় মগ ব্রাহ্মণেরা প্রথমে কাশ্মীরে বাস ক'রতেন।

প্রতিমার পা দুখানি কেন ঢাকা, বরাহ কিম্বা অগ্নি বলেন নাই। মৎস্য এক পৌরাণিকী কথায় রং ফলিয়ে 'তেজসাবৃত' এনেছেন। সে কথার মূল বৈদিক, জ্যোতিষিক রূপক। পুরাণ সেটা বাস্তব ও প্রাকৃত ক'রেছেন। বিষ্ণুপুরাণ (৩।২ অঃ), মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৭৭, ১০৬ অঃ), মৎস্যপুরাণ (১১ অঃ) কথাটি দিয়েছেন। সংক্ষেপে এই—সংজ্ঞা, বিশ্বকর্মার কন্যা, সূর্যের পত্নী। সংজ্ঞার গর্ভে মনু (বৈবস্বত) ও যমজ যম ও কালিন্দীর (নদী) জন্ম হয়। সংজ্ঞা ভর্তার তেজ সইতে না পেরে পিত্রালয়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁর ছায়াকে স্বস্থানে রেখে গেলেন। দিবাকর এই বঞ্চনা ধ'রতে পারলেন না। ছায়ার পুত্র হ'ল, আর এক মনু (সাবর্ণি) ও যমজ শনি ও তপতী (নদী)। এক দিন যম কুপিত হয়ে মায়ের প্রতি পা তুলেছিলেন, ছায়ারূপী মা শাপ দিলেন, পায়ে গলৎ কুষ্ঠ হউক। যম ভীত হয়ে পিতাকে জানালেন। দিবাকর ধ্যানস্থ হয়ে সংজ্ঞার বঞ্চনা বুঝতে পারলেন, ক্রুদ্ধ হয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলেন। শ্বশুর সংজ্ঞাকে গৃহে স্থান দেন নাই। কন্যাটি বড়বা রূপ ধরে' মেরুদেশে (মৎস্যে আছে 'মরু', হবে 'মেরু') উত্তর কুরুতে তপস্যা ক'রতে গেছলেন। দিবাকরও অশ্ব রূপ ধ'রে সেখানে উপস্থিত। সেখানে স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও রেবন্ত জন্মিলেন। এদিকে দিবাকর বিনা দেবতারা ব্যাকুল, সৃষ্টি লোপ হয়। বিশ্বকর্মা তাঁকে ভ্রমি-যন্ত্রে (কুঁদে) চড়িয়ে তাঁর তেজ চেঁচে ফেললেন, ষোড়শাংশ রইল, তেজ সহনীয় হ'ল, এখন পতি-পত্নী স্ব স্ব রূপে দেশে ফিরে গেলেন। এখানে মৎস্য ব'লছেন, বিশ্বকর্মা রবির পা দুখানি চাঁচতে পারেন নাই, এই কারণে পা দেখতে পাওয়া যায় না। যদি কেহ মূর্তিতে কিম্বা চিত্রে পা কল্পনা করে, তার কুষ্ঠরোগ হয়।

এখানে এই কথার ব্যাখ্যার স্থান নয়। দেখা যাচ্ছে, কুষ্ঠরোগের ভয় দেখিয়ে সূর্যোপাসনা প্রচারিত হয়েছিল। সৌরতেজে এই রোগের উপশম হয়, এই বিশ্বাস বহুকালের।

উপস্থিত প্রতিমাটির গড়ন অতি সুন্দর। পাথরটি রামথড়ীর, নাতি মৃদু নাতি কঠোর। এই পাথর বালেশ্বরে ও গয়াতে আছে, থালা বাটি হ'চ্ছে। কাটা চাঁচা ছোলার সময়ে শাদা, কিন্তু তেল মাখালে কাল। ঘি তেল যত মাখাবে, তত কাল হবে। বাঁকুড়া মেদিনীপুর বর্দ্ধমান হুগলী জেলায় এই পাথর নাই, পাথরের সূক্ষ্ম কাজও হয় না। শিশুনিয়া পাহাড়ে বেলে পাথর আছে, মোটা কাজও হয়। কিন্তু প্রতিমা-নির্মাণের যোগ্য নয়, রোদ বৃষ্টিতেও টেকে না। এই প্রতিমার তক্ষা কোন্ দেশী, ওড়িয়া না বিহারী? বোধ হয়, ওড়িয়া। বস্ত্র-নির্মাণ লক্ষ্য ক'রলে এই মনে হয়। ওড়িয়া তক্ষার খ্যাতিও ছিল। কোণার্কের মন্দিরে তার প্রমাণ। কিন্তু এই প্রতিমার তক্ষা রথটি দ্বিচক্র ক'রেছেন। এক চক্রে রথ চ'লতে পারে না, এই ভ্রম ক'রে থাকবেন। কিন্তু সূর্য-পথ বৃত্তাকার। তার নাভি মেরু-গিরিতে। তার মাথায় দীর্ঘ অক্ষের এক প্রান্ত স্থাপিত, চক্রের নাভিতে অপর প্রান্ত। অশ্ব চক্রের দুই পাশে ও সমুখে ঈষা-দণ্ডে যোজিত। দেখা যাচ্ছে, স্থাপক ও তক্ষা কল্পনাটি পান নাই।

কালীমোহন-স্মৃতি

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

১৯০৬ সাল। গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমার পিতৃভূমি বিক্রমপুর সোনারং গ্রামে আসিয়া শুনিলাম এক দল স্বদেশী-প্রচারক গ্রামে আসিয়াছেন। বৈকালে গ্রামের সভামধ্যে তাঁহাদের দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বক্তা, আর কেহ কেহ গান করেন। সকলের মধ্যে দেখিলাম কালীমোহন ঘোষই যেন প্রাণস্বরূপ। শরীরে কিছুই নাই, অথচ উৎসাহে পরিপূর্ণ চিত্ত, তাহারই সাক্ষ্য দিবার উপযুক্ত দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু। গ্রামের পুরন্ধ্রীরা এই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে স্নেহে ও বাৎসল্যে একেবারে ঘরের ছেলে করিয়া লইয়াছেন। কালীমোহনের সঙ্গে আলাপ হইল। বড় ভাল লাগিল। দেখিলাম এই উৎসাহ-মাত্র-সম্বল যুবকটির শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। একটু সেবা-যত্ন ও বিশ্রামের প্রয়োজন। গ্রামের মায়েরা সেবা ও যত্ন দিতে পারেন কিন্তু অবসর ও বিশ্রাম লইবার মত ধৈর্য্য কালী-মোহনের নাই।

কালীমোহন বিক্রমপুরে আরও কয়েকটি গ্রামে ঘুরিবেন। আমি তখন রবীন্দ্র-কাব্য ও কবিতা অধ্যয়নে রত ছিলাম। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে বাংলা দেশে বেড়াইতে আসিয়া রবীন্দ্র-কাব্য লইয়াই দিনগুলি কাটাইতে-ছিলাম। আমি কালীমোহনকেও সেই কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত করিতে চাহিলাম। কালীমোহন তাহাতে আনন্দে ধরাও দিলেন। কিন্তু বিক্রমপুরময় যে তিনি স্বদেশী প্রচার করিবেন সে উৎসাহ তাঁর গেল না। অবশেষে কয়েক দিন সোনারং ও আউটসাহী গ্রামে বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার আমাদের গ্রাম হইতে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

এই দুইটি গ্রামের মায়েরা কালীমোহনকে ইতিমধ্যে ঘরের ছেলের মত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারাও বাধা দিতে চাহিলেন। কালীমোহন এক দিন দারুণ রৌদ্রের মধ্যে মালখানগরের দিকে যাত্রা করিলেন। আমাকেও তাঁহার সঙ্গে লইয়া গেলেন। রবীন্দ্র-কাব্যের চর্চ্চা আমাদের চলিল কিন্তু তাঁহার বিশ্রাম চলিল না।

মালখানগরেও কালীমোহন দুই দিনে ঘরের ছেলের



কালীমোহন ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ

মতই হইয়া গেলেন। সেখানে শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত বসুর বাড়ী তাঁহার নিজের বাড়ীর মতই হইয়া গেল। এই গ্রামবাসী লোকের উদারতা ও আভিজাত্য দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। বিনা শিক্ষাতেও তখন বাংলায় মেয়েদের মধ্যে যে সহজ বুদ্ধি ও আভিজাত্য দেখিয়াছি, তাহা এখন বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।

এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া তালতলা, মধ্যপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে কালীমোহন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। স্বদেশী-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চাও চলিয়াছে। প্রচারের সকল শ্রম ও ক্লান্তি মিটিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দেশ-প্রেমে ও মানব-প্রেমে ভরপুর কাব্যের আলোচনায়।

কয়েক দিন পরে কালীমোহনকে বাধ্য হইয়া চাঁদপুরে ও তাঁহার স্বীয় গ্রাম বাজাপ্তিতে ফিরিতে হইল। ভাবিলাম এইবার হয়তো তিনি বিশ্রাম করিবেন। কিন্তু সেখানে আসিয়াও তিনি চাঁদপুর, হানারচর, বাবুর হাট, হরিণা, ফরকাবাদ, গোবিন্দিয়া, বাখরপুর, বালিয়া প্রভৃতি গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিতে লাগিলেন।

নরসিংপুর ষ্টেশন হইতে তাঁহার গ্রাম বাজাপ্তি তখন মাইল-চারেক দূরে ছিল। পথ ও গ্রাম সবই অতি সুন্দর। দেখিলাম নিজের দেশের মধ্যেও কালীমোহনের যথেষ্ট পসার আছে। বাবুরহাটের বৃদ্ধ শিক্ষাগুরু সারদা দত্ত মহাশয়ও তরুণ কালীমোহনের অনেক নির্দ্দেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন। কালীমোহনের বাড়ী ও গ্রামের লোকের সঙ্গে আমারও খুব ঘনিষ্ঠতা হইল।

তার পর আসিল আমার উত্তর-পশ্চিমে ফিরিবার সময়। ছুটিটা কালীমোহনের সঙ্গে কাটাইয়া একটি উৎসাহযুক্ত সেবা-নিবেদিত জীবন দেখিলাম। গ্রামের সহজ ও স্নেহময় একটি জগতের সঙ্গে পরিচিত হইলাম, তাই এক দিন দুঃখের সহিত বিদায় লইয়া সোনারং গেলাম ও সেখান হইতে কাশী গেলাম। কাশী হইতে আমাকে সুদূর পঞ্চনদ প্রদেশে কাশ্মীরের নিকটে হিমালয় প্রদেশে যাইতে হইল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে কালীমোহনের যে পরিচয় করাইয়াছিলাম তাহার প্রতিদানে কালীমোহন আমাকে কি দিয়াছিলেন সেই কথাই এখন বলিতে হইবে। হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে আমার দিন যাইতেছে এমন সময় হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের এক পত্র পাইলাম—আমাকে তিনি তাঁহার শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কাজে আহ্বান করিয়াছেন। কবিগুরুর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নাই। তবে এমন হইল কেমন করিয়া? যেমন করিয়াই তিনি আমার খবর জানুন না কেন, মোট কথা আমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়া যোগ দিতে হইল। ইহা ঘটিল ১৯০৮ সালে।

পরে জানিলাম কালীমোহন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়া তাঁহার কাছে জনসেবার কোন সুযোগ চাহেন। তখন শ্রীনিকেতনের জনসেবা-বিভাগ খোলে নাই, তবে শিলাইদহে আপন জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথের জনসেবার কাজ ছিল, তাহাতেই কালীমোহনের কাজের ক্ষেত্র রচনা করা হইল।* কালীমোহনই রবীন্দ্রনাথকে আমার কথা বলেন, এবং আমার পুরাতন বন্ধু ও কাশীর সতীর্থ শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্যও তাহা সমর্থন করাতে আমাকে শান্তিনিকেতনে আসিতে হয়।

কালীমোহন শিলাইদহে কাজ করিতে লাগিলেন। কাজের জন্য যতটুকু করা উচিত ততটুকু করিয়া তাঁহার মন মানিত না। তাহার ফলে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর

* পল্লীসংস্কারব্রতে কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহ ও সহায়তার কথা রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে স্মরণ ও উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি উদ্ধৃত হইল।—প্রবাসীর সম্পাদক

"একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চ্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ-কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চ্চা আজ থেকেই সুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হ'ল—আচ্ছা, আমিই এ-কাজে লাগব।

"এই সংকল্পে সহায়তা করবার জন্য সেদিন একটি মাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

"তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস।"—'রাশিয়ার চিঠি', পৃ. ২৮।

একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া আসিলেন। কালীমোহন এখানে আসিয়া অনেক কষ্টে সারিয়া উঠিলেন এবং এখানেই শিশুদের শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে না আসিলে তাঁহার আর রক্ষা ছিল না। তবু বহু দিন পর্য্যন্ত কালীমোহনের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই।

শিক্ষাকার্য্যে শিশুদের হৃদয় তিনি অনায়াসে জয় করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রধান আকর্ষণ ছিল জনসেবায়। চারি দিকের গ্রামের লোকের দুঃখকষ্ট অন্যায় অবিচারের কথা শুনিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। ছাত্র-অবস্থাতেও তিনি এই সব কারণে লেখাপড়া বেশী দূর করিতে পারেন নাই। কুচবিহার কলেজে আই. এ. পড়িতে পড়িতেই তাঁহাকে কলেজ ছাড়িতে হয়। তবে ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে কালীমোহনই ছিলেন নেতা।

অনেক সময়ে শরীরের জন্য কালীমোহন গিরিধি প্রভৃতি স্থানেও থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ হয়। স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর কাছে তিনি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষাও গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে মানুষের সেবাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম আদর্শের প্রতি তাঁহার পরিচয় ও শ্রদ্ধা দিন দিন গভীর হইতেছিল।

লোকশিক্ষাব্রতে কালীমোহন ব্রতী হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষার আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করিতে চাহিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির যুগ। বহু ইংরেজ কবি ও লেখক রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে কবিগুরু কালীমোহনকে পাঠাইলেন। কলেজে কালীমোহন বেশী অধ্যয়ন করেন নাই, তবু তাঁহার গভীর জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার মধ্যে যে একটি প্রগাঢ় মানব-প্রীতি ও সহজ প্রতিভা ছিল তাহার বলে তিনি বিলাতের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের সহিত অতি সহজেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। এজরা পাউণ্ড, রদেনষ্টাইন প্রভৃতির সঙ্গে কালীমোহনের গভীর যোগ স্থাপিত হইল।

কালীমোহন দেশে ফিরিয়া আবার শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। তাহার পরে যখন শ্রীনিকেতনে জনসেবার রীতিমত ব্যবস্থা হইল তখন কালীমোহনকে শান্তিনিকেতনের কাজ হইতে সেখানে যাইতে হইল। এই গ্রামসেবার কাজেই কালীমোহন আপন প্রতিভার স্বাভাবিক ক্ষেত্র পাইলেন। এই কাজে তাঁহার খ্যাতি সারা ভারতে প্রচারিত হইল। বহু স্থান হইতে তাঁহার কাছে গ্রামসেবকেরা কাজ শিখিতে আসিতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি নানা ভাবে নানা জাতীয় অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেও দাঁড়াইয়াছেন ও প্রজাদিগকে দাঁড়াইতে শিখাইয়াছেন।

এক সময় রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁহার নানা ভাবে বিরোধই চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে এই বিরোধের অবসান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে কালীমোহন নানা শ্রেণীর রাজপুরুষগণের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সেবায় দুঃখদুর্গতি ও অস্বাস্থ্যের প্রতিকারে প্রজাদের কল্যাণার্থ তিনি বার-বার রাজপুরুষদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়াছেন। গ্রামসেবার কাজে রাজপুরুষদের সহায়তা কালীমোহন কম পান নাই।

নিজের সেবা ছাড়া কালীমোহন আর সবারই সেবায় আনন্দ পাইতেন। নিজের শরীরের যত্ন কখনও তিনি করিতে জানিতেন না। তাই কিছু দিন হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। প্রায়ই তিনি পাথরী রোগে কষ্ট পাইতেন। ইদানীং রক্তের চাপের জন্যও মাঝে মাঝে তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হইত। তবু নিয়মিত স্নানাহার তাঁহার পক্ষে করা কঠিন ছিল। গত বৎসরখানেক তিনি বাধ্য হইয়া কাজ হইতে অনেকটা অবসর লইয়াছিলেন।

এবার মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার সঙ্গে যখন দেখা করিয়া ছুটিতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিলাম তখন কি বুঝিয়াছিলাম এই তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা? তিনি নিজেও কিছুই বুঝেন নাই। গত ১২ই মে বৈকালে তিনি বাহিরও হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শ্রীনিকেতনের কর্ম্মীদের সঙ্গে গ্রাম-সেবা বিষয়ে অনেকটা তর্কও করিলেন। কর্ম্মীরা বিদায় নিতে না-নিতেই কালীমোহন অসুস্থ বোধ করিলেন। স্ত্রীকে ডাকিলেন। ভৃত্য সত্যকে ডাকিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে সন্ন্যাস রোগে তিনি পরলোকে প্রয়াণ করিলেন। আশ্রমে অনেকে বুঝিতেই পারে নাই যে কালীমোহন চলিয়া গেলেন। বোলপুর ও নিকটস্থ গ্রাম হইতে অনেকে আসিয়া শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিতে যোগদান করিলেন। তিনি ছয়টি পুত্র ও একটি কন্যা ও স্ত্রীকেই যে কেবল অনাথ করিয়া শোকসাগরে ভাসাইয়া গেলেন তাহা নহে, আপন সকল আত্মীয়জনকে শোকশল্য হানিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন এক জন অকৃত্রিম সেবক হারাইল। দেশ এক জন কর্ম্মী হারাইল। আমরা এক জন যথার্থ বন্ধু হারাইলাম।

অষ্ট্রেলিয়া

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

যখন দেশের মাটি ছেড়ে অকূলে ভাসলাম তখন কোথায় গিয়ে তরী ভিড়বে, সে কেমন দেশ, এ-কথা জানবার জন্য মনটা যেমন উন্মুখ হয়ে ছিল, তেমনি যে-ভারতবর্ষ ছেড়ে চলেছি সেই ভারতবর্ষও মস্ত বড় হয়ে মানস-চক্ষে বার বার ভেসে উঠছিল। কলম্বো পৌছবার আগের রাতে যখন জাহাজে খবর পেলাম সেদিন রাতে আমরা কেপ কমোরিন থেকে লাইট-হাউসের আলো দেখতে পাব, ডেকে দু-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম। লাইট-হাউস থেকে আলো যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যায় দেখছিলাম তাকিয়ে। মাতৃভূমির বিদায়-আশীর্ব্বাদ। ধীরে ধীরে আলো দূরে স'রে গেল—আমরা অকূলে ভাসলাম।

জাহাজে অনেক দেশের অনেক রকম লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমাদের সঙ্গে চলেছেন এক ইহুদী জার্ম্মান ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও একটি ছেলে ও মেয়ে। (এ-জাহাজে প্রায় তিন-শ ইহুদী আছেন—অষ্ট্রেলিয়ায় চলেছেন হিটলারের তাড়া খেয়ে)। ইহুদী ভদ্রলোকটির মুখখানি হাসিতে সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত। স্ত্রীটি বেঁটে ছোটখাটো, মুখটিতে স্নিগ্ধভাব মাখানো, যেন ভারতবর্ষের মেয়ে। স্ত্রীটি ইংরেজী বলতে পারেন—তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি ভারতবাসী কিনা; বললেন, ভারতবাসীরা খুব ভদ্রলোক, এই জাহাজে অনেক ভারতবাসী ছিলেন তাঁরা বোম্বে নেমে গেছেন। বিদেশীর মুখে আমরা ভদ্র এ-কথা শুনলে সত্যি সত্যিই আনন্দ হয়।

ইহুদী ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী ভারতবর্ষের কথা অনেক জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমার আইডিয়াল ভারতবর্ষ অনেক বড় ক'রে ওঁদের সামনে ধরলাম। প্রায়ই আমরা ডেকে এক সঙ্গে বসতাম, পরিবারটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল।

এক জন হাঙ্গেরীয়ান স্কুল-মাস্টারের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। কন্টিনেণ্টের লোকেরা বেশ একটু ইনফর্ম্যাল ব'লে মনে হ'ল। এখানে যাঁরা ইংরেজ যাত্রী আছেন তাঁরা অষ্ট্রেলিয়ান বা হাঙ্গেরীয়ান সবাইকেই যেন এড়াতে চান। আমাকে ভারতীয় পেয়ে অনেকেই আলাপ করলেন। এক জন ইংরেজের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হ'ল। ইনি নিউজিল্যাণ্ডের একটি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। এক দিন সন্ধ্যের সময় পায়চারি করতে করতে ইনি জাহাজের অধিকাংশ যাত্রীকেই "ফানী লট্‌" ব'লে অভিমত প্রকাশ করলেন। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে নিউজিল্যাণ্ডে ফিরছেন। ভারতবর্ষে কোথাও যান নি শুধু এক দিন বোম্বাই শহর ঘুরে দেখেছেন। এঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য সমস্ত স্কুল দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। নানা রকম স্কুল এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন।



হাই ষ্ট্রীট, ফ্রিম্যাণ্টেল



জেনোলান গুহামুখে

আমি আমাদের গোয়ালিয়রের স্কুল ও ভারতীয় ছাত্রদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। গোয়ালিয়র দুর্গ ও আমাদের স্কুলের ছবির অ্যালবাম দেখে ইনি খুব মুগ্ধ হলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র অনুবাদ ও 'ক্রেসেণ্ট মুন্' এঁকে পড়তে দিলাম।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল পোর্ট-হোল দিয়ে তাকিয়ে দেখি কলম্বো বন্দর। বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "সিলোন ফর গুড টি"। বন্দর দেখে যে কি আনন্দ হ'ল বলবার নয়। পাসপোর্ট পরীক্ষার পর নৌকোতে ক'রে তীরে গিয়ে হাজির হ'লাম। অনেক দিন পর সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। মুাজিয়মে কিছু কাজ ছিল—কাজ সেরে বন্ধুদের নিয়ে সারাটা দিন খুব ঘুরে আসা গেল। রাত্রে খাবার পর জাহাজে ফিরে এলাম। রাত এগারটার সময় কলম্বো ছাড়লাম। এবারে লম্বা পাড়ি—এখান থেকে অষ্ট্রেলিয়ার বন্দর ফ্রিম্যাণ্টেল, ন-দিনের পথ। এ ন-দিন নাচগান ও নানা রকম খেলার প্রোগ্রাম।

সেদিন জাহাজে নোটিশ পড়ে গেছে যে আমরা ভোর ছ-টার সময় ইকোয়েটার পেরিয়ে চলব। কাজেই সারাদিন সবাই মিলে খুব আলোচনা হ'ল—ইকোয়েটার দেখতে কেমন হবে! এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন উনি স্বচক্ষে দেখেছেন—সোনার রং ইত্যাদি ইত্যাদি। হাঙ্গেরীয়ান ভদ্রলোকটি গম্ভীর মুখে বললেন, সত্যি সত্যিই ওদের একটা লাইন কেটে দেওয়া উচিত। পরের দিন সকাল বেলা অনেকেই অনেককে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কাল ভোরে জাহাজ যখন একটা ঝাঁকানি দিয়ে ইকোয়েটর পার হয়ে যায় তখন কেউ কেউ টের পেয়েছিলেন কিনা!

অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে প্রথমেই একটা জিনিস বিশেষ ক'রে মনে লাগল। ওখানে বিদেশী জিনিসের দাম অত্যন্ত বেশী। কাজে কাজেই আমাদের অষ্ট্রেলিয়ায় তৈরি জিনিস কিনতে হয়। এমনি ক'রেই ওরা দেশের বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নতির রাস্তা খোলা রাখে। ও-দেশের রাস্তাঘাট, পার্থ শহরটি, সোয়ান নদী ও তার ধারে ধারে পরিষ্কার রাস্তা ও ঘরবাড়ী, লাল টালির ঢালু ছাদ বড় সুন্দর লাগল। ফ্রিম্যাণ্টেলে পৌঁছে জেটিতে নেমে রাস্তায় পৌঁছানো গেল। ট্যাক্সি-ক্যাব-ওয়ালাদের হাত এড়িয়ে একটা কাঠের পুল পেরিয়ে শহরের ভিতর এলাম। 'পার্থ'-লেখা বাসে উঠে পড়লাম। বাস্-কণ্ডাক্টার একটি মেয়ে। আমি একটি অষ্ট্রেলিয়ান শিলিং হাতে দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই উনি বুঝে নিলেন আমি বিদেশী (যদিও গায়ের রংই তার পক্ষে যথেষ্ট পরিচায়ক) এবং জাহাজে ফিরে আসব—কাজেই নিজে থেকেই পার্থের একটি রিটার্ণ টিকিট দেবেন কিনা জিজ্ঞাসা ক'রে একটি টিকিট দিয়ে দিলেন এবং বাস্ থেকে নামবার সময় ব'লে দিলেন যে সব দেখে শুনে আবার এই জায়গাতেই ফিরে যাবার বাস্ মিলবে; ফ্রিম্যাণ্টেল থেকে পার্থ পর্য্যন্ত শহরটি মনে হ'ল তখনও ঘুমিয়ে আছে। পরে বুঝলাম সব লোক তখন শহরে আপিসে গেছে—কেউ কেউ ফিরবেন

হয়তো লাঞ্চ খাবার সময়, অনেকেই খেয়ে নেবেন আপিসে। জুলাই মাস, অষ্ট্রেলিয়ায় শীতকাল। আমি বেশ শীত অনুভব করছিলাম। বাস্ ছুটে চলেছে পার্থের দিকে, কন্‌কনে ঠাণ্ডা। রাস্তার দু-ধারে এক রকম ফুলের গাছ অনেকটা শিমুল জাতীয়। এঁরা নাম দিয়েছেন ফ্লেম্ ফ্লাওয়ার। নির্জ্জন রাস্তা, দু-ধারে সাজানো বাড়ী, ফুলে ভরা সারি সারি গাছ।



সমুদ্রতীরে স্নানার্থীর জনতা

পার্থ শহরে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানো গেল। আমি একমাত্র ময়লা রঙের লোক রাস্তায়, এই রকম মনে হ'ল। অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম। ওখানকার য়ুনিভার্সিটির লেকচার-হলের সিলিঙে 'কাঠের উপর গালার কাজের মত কিছু কাজ 'দেখা গেল। খোঁজ নিয়ে জানলাম দেশীয় কারিগরদের রচনা আঁকা, অবশ্য শ্বেতাঙ্গ আর্টিস্টদের পরিচালনায়। কাজগুলিতে প্রাচ্য-শিল্পের ছাপ ষোল আনা, যেমন জাভা বা বালিতে দেখা যায়। কুমীর, মাছ, এই সব সুন্দর নকশাতে আঁকা হয়েছে। এক দল সৈনিক ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধসাজে তৈরি। আমার তো মনে হ'ল সম্পূর্ণই দেশীয় কারিগরদের আঁকা। শ্বেতাঙ্গ কারিগরীর কোনো ছাপ ওতে নেই। অষ্ট্রেলিয়ার কালো লোক সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলাম নিউজীল্যাণ্ড-যাত্রী ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে। উনি বললেন ওরা প্রায় মৃত (ডায়িং রেস্), মস্তিষ্ক ব'লে ওদের কোনো জিনিষ নেই—একেবারে বুনো। পার্থ য়ুনিভার্সিটির সিলিঙের কাজ দেখে আমার কৌতূহল হয়েছিল—বোধ হয় খুঁজে দেখলে এখনও ঐ দেশীয় শিল্পীর খবর পাওয়া যাবে। যতদিন অষ্ট্রেলিয়ায় ছিলাম কখনও কালো লোক দেখি নি দু-এক জন ছাড়া। শুনেছি উত্তর দিকে ব্রিসবেনের আশপাশে জঙ্গলে ঐ বুনো জাত অল্পবিস্তর দেখা যায়। বিলেত থেকে 'সাদা লোক' এসে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন—অষ্ট্রেলিয়ানরা শহরের রাস্তায় এখন কালো লোক দেখলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আমাদেরও আর অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস করবার জো নেই। কালো বিদেশীদের জন্য রাস্তা বন্ধ।



জেনোলান গুহায় এক জাতের ছোট কাঙ্গারু



জেনোলান গুহার দৃশ্য

মেলবোর্ণ, অ্যাডিলেডের আর্ট-গ্যালারিতে অষ্ট্রেলিয়ান আর্ট ব'লে বিশেষ কিছু নজরে পড়ে নি। প্রকাণ্ড অট্টালিকা বড় বড় তৈলচিত্রে পরিপূর্ণ। সমস্তই পাশ্চাত্য শিল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়, শিল্পীরা সব বিলেতের আর্ট স্কুলের তৈরি আর্টিস্ট। নিউজীল্যাণ্ড, সামোয়া, .ফিজি বা সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে যেমন দেশীয় শিল্পের একটু স্পর্শ পাওয়া যায় অষ্ট্রেলিয়াতে খাঁটি অষ্ট্রেলিয়ান ব'লে সে-রকম কিছু নজরে পড়ে না। ওদের হাবভাব অনেকটা আমেরিকান, বাড়ীঘর ইউরোপের, আর অ্যাকসেণ্ট খাঁটি ককনী। বিলেত ওদের তীর্থস্থান। লোকগুলি কিন্তু মোটের ওপর ভাল। ইংরেজদের সঙ্গে বেশ মিশে যেতে পারে না, সর্ব্বদাই ইংরেজদের আভিজাত্যের কাছে মাথা নীচু ক'রে থাকে। ওদের অনেকেই বেশ মুখের উপর স্বীকার করে থাকে, "আমাদের দেশ মাত্র দেড় শ বছরের পুরোনো— এই তো সেদিনের। আমাদের গর্ব্ব করবার কিছুই নেই, ট্র্যাডিশন ব'লে কিছু নেই আমাদের। তবে আমরা মনে ও মুখে এক।" আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ সহজ ব'লে এরা আমেরিকানদের খুব ভক্ত।

সিডনীতে জাহাজ পৌঁছবার আগের দিন মনটা খারাপ লাগছিল। এতদিনকার সব একসঙ্গে ভেসে চলার বন্ধু। দু-এক জনের সঙ্গে তো খুবই ভাব হয়ে গিয়েছিল। সিডনী হার্‌বার খুব সুন্দর। সিডনী হেডে (Sydney head) যখন জাহাজ প্রবেশ করে, সমস্ত যাত্রীদের তখন ডেকে দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য দেখবার জন্য জাহাজে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

অষ্ট্রেলিয়াতে পৌঁছে যে আমার খুব উৎসাহ বোধ হয়েছিল তা নয়। তার প্রথম কারণ ইমিগ্রেশন অফিসারদের আচরণ। আমার যেন মনে হচ্ছিল আমার গায়ের রং ময়লা ব'লেই বিশেষ ক'রে



জেনোলান গুহার দৃশ্য



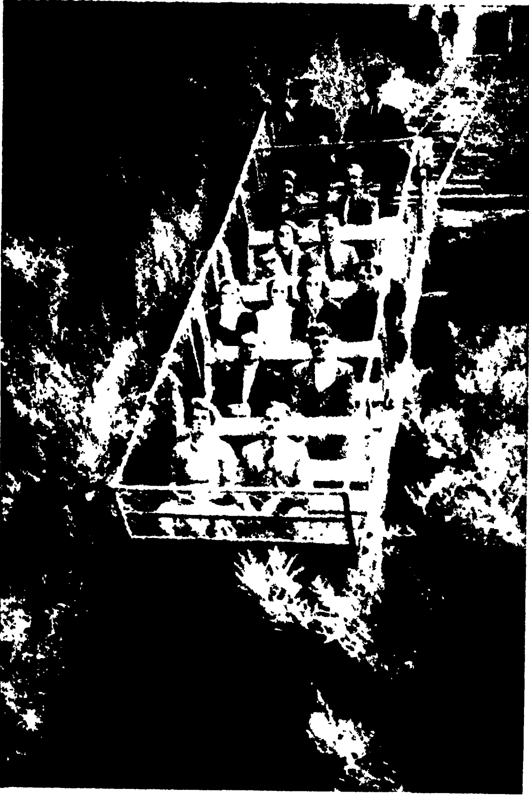
সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। এর প্রাচীরে লেখক চিত্রাঙ্কণ করেন।

ওদের অত সন্দিগ্ধ ব্যবহার। হয়তো ওদের মনে হয় পাছে কোনও ভারতীয় ফাঁকি দিয়ে এসে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করে! ওরা ভারতবর্ষকে ঠিক জানে না। যে-সব ভারতবাসী ফিজি যাবার পথে সিড্‌নীতে আসেন, তাঁরা ব্যবসা উপলক্ষেই আসেন। সেখানে শুধু পাউণ্ড-শিলিঙের কথা হয়, ভাবের আদান-প্রদান করবার সুযোগ ওখানে আদৌ নেই, কাজেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ওরা পায় না।

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতবর্ষ থেকে কেউ বড় যান না আর অষ্ট্রেলিয়ানরাও বিলেত যাবার পথে ভারতবর্ষের কিছুই জানে না। অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ ক্রিকেট খেলাতে প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষে আমরা এই কথাই জেনে থাকি। আর কলকাতার চিড়িয়াখানায় অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাঙ্গারু দেখে উৎসাহ প্রকাশ ক'রে থাকি। কাজেই আমাদের উভয়ের পরিচয় নেই। কিছুদিন আগে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু ব'লে এসেছিলেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির অ্যারুণ্ডেল সাহেব, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের কাজের কথাও আমি অষ্ট্রেলিয়ায় শুনেছি।

সিডনীতে ক্যাঙ্গারু দেখতে গিয়েছিলাম এক দিন। খাবার লোভে সব পায়ের কাছে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। ওখানকার ছোট ভালুক প্রসিদ্ধ। ঠিক খেলনার মত দেখতে। Bear farmএ ইউক্যালিপ্টাস গাছে ওদের বাসস্থান তৈরি ক'রে গবর্ণেমেণ্ট ওদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন—একটু অসাবধান হ'লেই মরে যায়। ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতা খেয়েই ওরা জীবন ধারণ করে। ইউক্যালিপ্টাস গাছ অষ্ট্রেলিয়াতে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়াতে এ গাছকে "গাম ট্রী" বলে। এখানকার অনেক আর্টিস্ট "গাম ট্রী" এঁকে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছেন। ছোট ভালুকগুলি দেখলাম অনেকেই ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে—বেশীর ভাগ সময়ই এরা ঘুমিয়ে কাটাতে চায়। আমাদের সঙ্গে ছিল ছোট একটি মেয়ে ও ছেলে। ওরা তো ক্যাঙ্গারুদের বাদাম খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। ছেলেটি নিজেও কিছু কিছু খাচ্ছে আর ক্যাঙ্গারুরা চার পাশে ঘিরে দাঁড়ানোতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের খাওয়াতে হচ্ছে। সারাটা দিন সবাই মিলে খুব আমোদ করা গেল।

রাত্রে কয়েক জন অষ্ট্রেলিয়ান আর্টিস্টের আসবার কথা ছিল—কাজেই তাড়াতাড়ি ফিরতে হ'ল। এঁরা অনেকেই উৎসাহিত ভারতবর্ষের শিল্পকলা সম্বন্ধে জানবার জন্য। পূর্ব্বেই বলেছি ভারতবাসী সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞান ফিজিবাসী ভারতীয় পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষ খুব পুরোনো দেশ, আমাদের শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন পৃথিবীর হাটে বেশ উঁচু স্থান পাবার যোগ্য—এ-কথা কেউ কেউ এখানে শুধু পুঁথিতেই পড়ে থাকেন। বাংলা দেশের প্রধান চিত্রকরদের আঁকা ও কিছু পুরোনো ছবির ছাপা প্রতিলিপি যা নিয়ে গিয়েছিলাম তাই দিয়ে একটি



ইলেক্‌ট্রিক রোপ ট্রলি

ছোট ঘরোয়া প্রদর্শনী খাড়া করা গেল। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি নিদর্শন এপিডায়স্কোপে দেখিয়ে কিছু বলতেও হ'ল। মূল ছবিগুলি কাস্টমস্‌ অফিসের হেফাজতে রেখে এসেছি, কাজেই ঠিক-মত প্রদর্শনী দাঁড় করাবার উপায় আপাততঃ নেই একথা জেনে অনেকেই দুঃখিত হলেন।

নিউ সাউথ ওয়েলস্‌এর শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি নিজে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য উৎসুক। শিক্ষা-বিভাগের অনেক প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এদের মারফৎ সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং কলেজের লাইব্রেরি-ঘরের দেওয়ালে ভারতীয় ছবি এঁকে দেবার জন্য অনুরোধ পাই। তখন আমার ভারতবর্ষে ফিরে যাবার বেশী দেরী নেই। তবু আমি এই ভেবে খুশি হলাম যে এতদূর এসে এখানে কিছু রেখে যেতে পারব। ভারতবর্ষ থেকে ভাসতে ভাসতে এতদূর এসেছি আবার কোথায় চ'লে যাব তবুও এ-দেশের লোক কিছুদিন আমাকে মনে রাখবে হয়তো। আর ভবিষ্যতে যদি কোনো ভারতীয় শিল্পী আসেন তাঁকেও এঁরা স্থান দেবেন।

যেদিন কাঠ-কয়লা নিয়ে কাজ সুরু করলাম সেদিন সবাই বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেছে যে কেমন ক'রে আমি মডেল ছাড়া ছবি আঁকি—সংবাদপত্র-ওয়ালাদের প্রশ্ন ও কৌতূহলী জনের কথার উত্তর দিতে হয়েছিল। রাতদিন খেটে ছ-সাত দিনের ভিতর কাজ শেষ ক'রতে হল।

এক জন আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ হ'ল ইনি এখানকার একটি শিল্প-বিদ্যালয়ে ডিজাইন শেখাবার ক্লাশ নিয়ে থাকেন। আর্ট সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, বিশেষ ক'রে জোর দিলেন ডিজাইনের উপর। যা-কিছু আমরা আমাদের চার পাশে দেখি সে-সব দিয়ে কিছু তৈরি করতে হবে, সেইখানেই আর্টিস্টের কেরামতী। এক দিন এঁর ষ্টুডিয়োতে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সেট স্কোয়ার ও জিয়োমেট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্সের সাহায্যে নানা রকম নকশা তৈরি করেছেন। দেখে ভাল লাগে নি। আরও এক জন রাশিয়ান ভাস্কর এসেছিলেন। বেশ আলাপী। বর্ত্তমান যুগে আর্ট কোন্‌ দিকে চলেছে—ভারতবর্ষে আর্টিস্টদের ছবিতে ফিউচারিস্টদের হাওয়া লেগেছে কিনা ইত্যাদি।

জাহাজে এক জন অষ্ট্রেলিয়ান যুবকের সঙ্গে বেশ সৌহৃদ্য হয়েছিল। ইনি আট বছর বিলেতে ছিলেন। এখন অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরে এলেন কিছু ব্যবসা সুরু ক'রবেন ব'লে। লাইব্রেরি-ঘরে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়। লোকটি খুব বই পড়তেন আর নাচের আসর থেকে একটু দূরে দূরেই সরে থাকতেন। লোকটিকে সাধারণ থেকে একটু ভিন্ন মানুষ ব'লে মনে হয়েছিল, তাই যেচে আলাপ ক'রেছিলাম—জিতেছি ব'লেই মনে হ'ল। এঁকে সিডনীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেলাম আমার বাসার দিকে। একটি মহিলা আর্ট-টীচার এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিন জনে অনেকক্ষণ আলোচনা করা গেল। মেয়েটির বিশেষ ইচ্ছে ভারতবর্ষে আসেন। আমাকে বার-বার বলছিলেন যে যদি আমার জায়গায় অস্থায়ীভাবে উনি এসে কাজ করেন এবং আমিও অস্থায়ী ভাবে ওঁর জায়গায় সিডনীতে থাকি তবে এটা সম্ভবপর হ'তে পারে।

সিডনীতে পরিচিত বন্ধুরা আমাকে এক জন ভারতীয় মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সিডনীতে আপাততঃ এক জন ভারতীয় মহিলাই আছেন। ইনি মাদ্রাজী মহিলা, বিয়ে করেছিলেন এক জন অষ্ট্রেলিয়ানকে—তিনি মারা গেছেন। ভদ্রমহিলা শান্তি-নিকেতনে কিছুদিন কাজ করেছিলেন বললেন। এখানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেতারে এক বৎসরে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন। এঁদের বাড়ীতেই আমাকে আসতে হ'ল হোটেল ছেড়ে—যতদিন অষ্ট্রেলিয়ায় ছিলাম এই বাড়ীতেই থেকেছিলাম। হোটেলের থেকে খরচ পড়্‌ল অনেক কম আর অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে ফিরে দেখবার স্থবিধে হ'ল বেশ। আর একটু যেন ঘরের ছায়ায় আশ্রয় পেলাম মনে হ'ল। এই বাসার পিছন দিকটাতে একটি বাগান আছে, বেশ একটু অগোছালো। সারাদিন সিডনী শহরে কাজ করবার পর সেখানে ব'সে শ্রান্তি দূর করা যেত।

এক দিন গেলাম এখানকার প্রসিদ্ধ 'ব্লু মাউণ্টেন্স' দেখতে। দূরের পাহাড় সবই যদিও নীল, কিন্তু এই পাহাড় একটু বিশেষ রকমের নীল, এঁরা এই কথা প্রচার ক'রেছেন। দৃশ্যাবলী যদিও খুবই সুন্দর, কিন্তু আমরা হিমালয়ের দেশের অধিবাসী, কাজেই আমি যেন ইচ্ছে ক'রেই বেশী আশ্চর্য্য হ'লাম না। এখানকার প্রায় সমস্ত চিত্রকরই ব্লু মাউণ্টেন্স এঁকেছেন। একটা টানেলের মুখে এলাম। খাড়া ঢালু সুড়ঙ্গ প্রায় ১০০০ ফুট হবে। নীচে গিয়ে একটা উপত্যকা থেকে সমস্ত দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ঘন নীল পাহাড় চার দিকে। যেতে হয় ইলেকট্রিক রোপ ট্রলির সাহায্যে। নামতে বেশ একটু নূতন রকমের আনন্দ পাওয়া যায়।

আশ্চর্য্য হলাম এখানকার জেনোলান কেভ্‌স্ দেখে। ভারতবর্ষে এ রকম গুহাবলী কোথাও নেই ব'লেই জানি। গাইডের সঙ্গে আমরা অনেক জন রওনা হলাম—এ-গুহা থেকে ও গুহায়। অনেকটা নীচের দিকে, পাহাড়ের বুকের ভেতর। যেন আরব্য উপন্যাসের গল্পের দৃশ্য। এক-একটা গুহা প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু ছাদ থেকে। অতখানি লম্বা নানা রকম স্বচ্ছ stalactite ও stalagmite বিচিত্র রকমের আকারে উপর থেকে নীচে ঝুলে আছে, মোমবাতি থেকে যেমন ক'রে গলে গলে পড়ে। অন্ধকার গুহায় এসে হাজির হলাম—গাইড বৈদ্যুতিক আলো টিপে দেওয়া মাত্র এক-এক রকমের অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতে লাগল। কোনও গুহার নাম রেখেছে এরা 'ইণ্ডিয়ান কেভ', কোনটির নাম 'ইজিপ্সিয়ান কলাম'। এ-রকম অনেক গুহা আছে। আমরা প্রায় দশ-পনেরটি গুহা দেখেই অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। চুন বালি জল জমে জমে হাজার হাজার বছরে এই রকম সৃষ্টি হয়েছে। শুনতে পেলাম কোনও রাখাল গরু চুরি ক'রে নিয়ে এসে এইখানে লুকিয়ে থাকে, তাকে ধরতে এসে এ-সব আবিষ্কার হ'য়ে যায়। এখন গবর্ণমেণ্ট নানা রকম বন্দোবস্ত করেছেন এখানে। বাইরে রেস্ট-হাউসে এসে বিশ্রাম ক'রে সিডনী ফিরে যেতে হ'ল। মোটর-ড্রাইভারটি আমাকে ভারতীয় দেখে অনেক রকম কথা বলছিল অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে, ওদের দেশ দেখে আমি যেন অবাক হয়ে যাই এই ওর বাসনা। পথে রাত্রে বেশ শীত। ড্রাইভারটির বড় ইচ্ছে আমরা "কাটুম্বা"র বাগান দেখে যাই। ম্যুনিসিপালিটি থেকে ঝরণার উপর ফ্লাড-লাইট ফেলে এ বাগানকে আরও সুন্দর করা হয়েছে। নানা রকম কুঞ্জবন, এদিকে-সেদিকে বসবার জায়গা। ঝরণা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের নীচে অনেক দূর চলে গেছে—অনেক নীচে পর্য্যন্ত ফ্লাড-লাইট ফেলে ঝরণাকে স্পষ্ট ক'রে দেখান হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সব দ্রষ্টব্য দেখে টাসমানিয়ায় যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠবে না বুঝতে পারলাম। তখন ইউরোপে লড়াই বেধেছে বেশ জোরের সঙ্গে। সমস্ত বন্দর, সমুদ্র-উপকূল রণপোতে ভর্ত্তি। ভারতবর্ষে ফিরে যাবার দিন স্থির করলাম—জাহাজ ছাড়বার কোনও স্থিরতা নেই—ছাড়বার আগে আমায় জানান হবে। রাত বারোটার সময় আমায় জাহাজে গিয়ে বসতে হবে, তার পর কখন জাহাজ ছাড়বে সে-কথা কেউ জানে না। অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে দেখতে বেরিয়ে গেলাম। দু-সপ্তাহ এখনও থাকব, তার মধ্যে এক সপ্তাহ সিডনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের দেয়াল-চিত্র শেষ

করতে লাগবে। অষ্ট্রেলিয়ার সব দেখে নিতে উঠে-পড়ে লাগলাম, তার পর কাজে ব'সে গেলাম রাতদিন। য়ুনিভার্সিটির আবহাওয়া মন্দ লাগছিল না। এদিককার য়ুনিভার্সিটিতে শিল্পকলার স্বতন্ত্র বিভাগ আছে; এক জন চিত্রকরের উপর তার ভার ন্যস্ত আছে। কাজেই সবাই উৎসুক শিল্পকলা সম্বন্ধে জানবার জন্য। অনেক ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক আমার কাজ দেখবার জন্য আসতেন, অনেকে সৌজন্যবশতঃ আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতেন তাঁদের বাড়ীতে, নানা রকম আলোচনা হ'ত।

খবরের কাগজওয়ালাদের দল আসতে সুরু হ'ল, ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হবে। অষ্ট্রেলিয়ান-দের বিলেত যাবার পথে ভারতবর্ষে নেমে ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করা উচিত এই কথা আমি ওদের বলেছি। আসবার আগে শুনে খুব খুশি হয়েছি যে অষ্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় ছাত্রদের জন্য তিনটি বৃত্তি এই বছর থেকে দেবেন ঠিক করেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া পরিধিতে ভারতবর্ষের চেয়ে বড় কিন্তু লোকবসতি ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। যদি কোনও ভারতীয় অষ্ট্রেলিয়ায় পা ফেলে থাকেন, তবে এত গোল করবার প্রয়োজন কি আমি বুঝতে পারি নি, এ-কথাও আমি ওদেশে অনেকের কাছে বলেছি।

...শেষ দিন অষ্ট্রেলিয়ান বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যে সাতটা পর্য্যন্ত দেয়ালের ছবি এঁকে শেষ ক'রে রাত এগারটার সময় জাহাজে এসে হাজির হলাম। সঙ্গে যে বন্ধুরা এগিয়ে দিতে এসেছিলেন লড়াইয়ের জন্য তাঁদের জাহাজে যাবার অনুমতি নেই, সবাই বিদায় নিলেন।...কত দেশ ঘুরে অষ্ট্রেলিয়ায় এসে কত বন্ধু জুটল—এখন বিদায়ের পালা, আবার স্বদেশের পথে।...

সায়াহ্নের নমস্কার

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

পথক্লান্ত রবিরশ্মি বিচিত্র বরণে
দিগন্তের তীরে তীরে
যেথা রহস্যের জাল সন্ধ্যার আকাশে
বুনে দেয় ফিরে ফিরে,
যেথা আঁধারের বুকে আলোকের বাঁশি
আঁকি দেয় ঘুরে ঘুরে

মরণের মর্ম্মবাণী স্বপ্নরসে ছানি
শব্দহীন সুরে সুরে—
সেথা দিনান্তের কূলে পথপাশে একা
দিয়ে যাই বার বার
বঞ্চিত মর্ম্মের মোর সঞ্চিত বেদন
সায়াহ্নের নমস্কার।

পুস্তক পরিচয়

সচিত্র শ্রীমদ্‌বালক-ভাগবত—শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনলিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫ চ্যাটার্জ্জিপাড়া রোড্, ঢাকুরিয়া, ২৪-পরগণা। মূল্য চারি টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপাখ্যানাংশ যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত ও অন্যান্য পুরাণাদি অবলম্বনে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া উপস্থাপিত করাই প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সার্থক হইয়াছে। তবে কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের পূর্ব্বে পঞ্চ পাণ্ডবের বিবরণ ও তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকৃত কার্য-বিশেষের বর্ণনা (তৃতীয় খণ্ড) এই উদ্দেশ্যের অনুকূল হয় নাই। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে গৃহীত অংশসমূহ আলোচ্য গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিলেও কালিদাসের শকুন্তলার উপাখ্যান এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা (পৃঃ ১৪৩-৫০) সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বালকদের জন্য লিখিত হইলেও গ্রন্থখানি বৃদ্ধদেরই বেশী কাজে লাগিবে। ভাষা আর একটু প্রাঞ্জল ও জড়তাশূন্য হইলে এবং স্থানে স্থানে বর্ণনা একটু সংক্ষিপ্ত করিলে ইহার আদর বৃদ্ধি পাইত বলিয়া মনে হয়। সূচীপত্রে গ্রন্থের প্রতি অংশের আকর নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিশেষ উপকৃত হইবেন। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও একথা সর্বথা স্বীকার্য যে গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা বাংলা ভাষায় পুরাণ-আলোচনার নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মহাভারতাদি সম্বন্ধেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হইলে সাধারণ পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইবে।

চারিধাম ভ্রমণ—উত্তর খণ্ড—কেদারবদরী-পশুপতিনাথ। লেখক ও প্রকাশক—শ্রীঅঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভেদিয়া, বর্দ্ধমান।

দিনপঞ্জিকার আকারে গ্রন্থকার এই গ্রন্থে কেদারবদরী ও পশুপতিনাথ দর্শনের খুঁটিনাটি বিবরণ অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যিকের নিকট এই গ্রন্থের মূল্য যাহাই হউক না কেন—তীর্থযাত্রীগণ ইহা পড়িয়া যে বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের আরও তিন খণ্ডে ভারতের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব ভাগের তীর্থদর্শনের এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে। আশা করি, এই খণ্ডগুলিও সত্বর প্রকাশিত হইবে।

কালগ্রাসে কালযবন—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। প্রাপ্তিস্থান—ইষ্টার্ণ ল হাউস্, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ছয়টি কৌতুককর পৌরাণিক গল্প এই পুস্তকে সরস সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পড়িয়া শিশুগণ যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

তথাপি—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য। কিশোর গ্রন্থালয়, ১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

রাশিয়ান সাহিত্যের দুঃখবাদের দুর্নাম আছে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে দুঃখবাদের আধিক্য রাশিয়াকে ছাড়াইয়া না যাক্, অনেকখানি কাছাকাছি যে পৌঁছিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য বইখানি এই দুঃখবাদেরই এক অভিব্যক্তি। "সুশিক্ষিত—মার্জ্জিত—সুপুরুষ" প্রণবেশ, যাহার জন্য একাধিক তরুণী ও তাহাদের পিতামাতা উন্মুখ, সে সহসা পল্লীর এক অনাথা বিধবার সুন্দরী মেয়েকে এক কথায় বিবাহ করিয়া বসিল,—এবং ফুলশয্যার রাত্রে আবিষ্কার করিল বৌ বোবা।

বাস্তববাদের খাতিরে লেখক মুখ্য চরিত্রগুলিকে প্রায় অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বোবা মেয়ে কল্যাণীর চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। বাকী চরিত্রগুলির মধ্যে কল্যাণীর বিধবা মা চমৎকার।

গল্পাংশ একটু অস্বাভাবিক হইলেও লেখার গুণে বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

কাড়াকাড়ি—শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী। প্রকাশক—পি, রায়, ৩ বি, শ্যামানন্দ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের নামে যাহা চলিতেছে, তাহার কথা না বলাই ভাল। অসম্ভব ও অবাস্তব দুঃসাহসিকতার কাহিনী দিয়া শিশুদের মনস্তুষ্টিসাধনের চেষ্টা আজকাল যে কেহ কলম ধরিতে পারেন, তিনিই করিয়া থাকেন। তাহাতে শিশুদের উপকার হয় অথবা উত্তমরূপে মস্তিষ্ক চর্ব্বিত হয়, সে প্রশ্ন তোলা বাহুল্যমাত্র।

যে কয়টি সত্যকার শিশুসাহিত্যিক বাংলা দেশে আছেন, সুবিনয়বাবু তাঁহাদের অন্যতম। অধুনালুপ্ত সন্দেশের পাতায় তাঁহার লেখা পড়িয়া খুশী হন নাই, বাংলা দেশের বর্ত্তমান তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক নিশ্চয় বিরল।

"কাড়াকাড়ি" বইখানি প্রকৃতই শিশুদের জন্য রচিত, এবং শিশুমনের সম্পূর্ণ উপযোগী। ভাষা অতি সুন্দর ঝরঝরে, এবং বিবিধ বিষয়ে পূর্ণ বইখানির মধ্যে অতি সরল ভাষায় সাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্য শিশুগণের বোধ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। গল্প ও কবিতাগুলিও ভাল।

কয়েকটি বিষয় ইংরেজী হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রকার গ্রহণ গুণী লোকের হাতে পড়িলে কত দূর মধুর হইতে পারে, ৺সুকুমার রায় চৌধুরীর "হযবরল" (Alice in Wonderlandএর প্রতি অস্পষ্ট ছায়া) এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খাতাঞ্চির খাতা" (Peter Pan) তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুবিনয়বাবুর লেখায় স্থানে স্থানে বিদেশী গন্ধ রহিয়া গিয়াছে। অন্ততঃ দুই-একখানি ছবি স্বদেশী করিয়া আঁকা চলিত।

শিশুদের বইয়ের ছবি ও বাঁধাই আরও চিত্তাকর্ষক হওয়া উচিত।

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, এম্-এ। ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় সমাজ ও জাতি সম্বন্ধীয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ

ও মতামতগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল তথ্যের জন্ম প্রবন্ধলেখক মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও উপন্যাসে উল্লিখিত মতামতের উপর নির্ভর করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক সমাজবৈজ্ঞানিক না হইলেও বাংলা ভাষায় সমাজ-বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিলে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দানও সামান্য বলিয়া গণ্য হইবে না। প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব যথেষ্ট। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া লেখক সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। তবে আলোচনা বড়ই সংক্ষিপ্ত এবং স্থানে স্থানে আরও কতকটা বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, এই বিষয়ে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত একত্র করিতে যে যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

স্বাস্থ্য চিরযৌবন ও দীর্ঘজীবন তত্ত্ব—রায়সাহেব শ্রীবিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক ঘোষ ব্রাদার্স, ৬৭।১ ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সরকার রোড, কলিকাতা। ২৬০ পৃষ্ঠায় প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ। মূল্য ২।০ টাকা।

সাধারণের জন্য সহজ ভাষায় লেখা ইহা সুখপাঠ্য স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থ। ইহা ঠিক বৈজ্ঞানিক পুস্তক হিসাবে লিখিত নহে, কিন্তু স্বাস্থ্যবিষয়ে যাঁহারা বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি পড়িতে চান তাঁহারা এই বইখানিতে নানা প্রকারের তথ্য জানিতে পারিবেন। প্রাচীন শাস্ত্রাদি ও কিম্বদন্তী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বিজ্ঞান পর্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে অনেক কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। মানুষের দৈনিক আহার-বিহার বিষয়ে যে সকল অভ্যাস জন্মায় তাহার দোষগুণ বিচার, স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিতে হইলে ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে কি কি নিয়ম পালন করা উচিত ও কি কি বর্জন করা উচিত, মোটামুটি তাহা লইয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। লেখক এই পুস্তক প্রণয়নে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বহু দেশী ও বিলাতী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের বিবরণীও ইহার শেষে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সাধারণে এই পুস্তক হইতে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবে। স্বাস্থ্য-বিষয়ে অজ্ঞ আমাদের বাংলা দেশে এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নারীত্বের প্রতিষ্ঠা—ডাঃ অভয়কুমার সরকার, এম. বি., ডি. পি. এইচ.। সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ রোড, ফরিদপুর। মূল্য ৫০ আনা।

বইখানি নারীজীবন সম্পর্কে লিখিত। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ইহাতে মেয়েদের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিবে, কিন্তু জ্ঞাতব্য অপেক্ষা উপদেশেই ইহা পরিপূর্ণ। উপদেশ দিবার অনেক লোক সমাজে আছে, উহা চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞের রাজত্ব নয়। তথাপি যিনি কোন রমণীকে কিছু উপদেশ শুনাইতে চান তিনি এই পুস্তকের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

দর্শন পরিচয়—শ্রীগোপালচন্দ্র সেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲টাকা।

"ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান ও দর্শন আলোচনায় আগ্রহ সকলেরই যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়—এই দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া 'দর্শন পরিচয়' রচিত হইয়াছে"—এই বলিয়া গ্রন্থকার নিবেদনমধ্যে অল্প কথায় এই গ্রন্থের যে উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কতকটা সফল হইয়াছে ইহা পাঠক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় মাধবাচার্য্যের "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে রচিত বলিতে পারা যায়। ইহাতে ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে ১। চার্ব্বাক, ২। বৌদ্ধ, ৩। জৈন, ৪। রামানুজ, ৫। পূর্ণপ্রজ্ঞ বা মাধ্ব, ৬। নকুলীশ-পাশুপত, ৭। শৈব, ৮। প্রত্যভিজ্ঞা, ৯। রসেশ্বর, ১০। বৈশেষিক, ১১। নৈয়ায়িক, ১২। জৈমিনি, ১৩। পাণিনি, ১৪। সাংখ্য, ১৫। যোগ এবং ১৬। শাঙ্কর দর্শন, যে ক্রমে, যে উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে সেই সকল দর্শন অপর কয়েকটি দর্শনের সহিত অন্য ক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার ক্রম প্রথম বৈদিক দর্শনের পরিচয়-মুখে ১। সাংখ্য, ২। যোগ, ৩। ন্যায়, ৪। বৈশেষিক, ৫। মীমাংসা, ৬। বেদান্ত, ৭। শৈব, ৮। পাণিনি, এই কয়খানির উল্লেখ করিয়া এই (৬) বেদান্ত দর্শনের মধ্যে ১। শঙ্কর, ২। রামানুজ, ৩। পূর্ণপ্রজ্ঞ বা মাধ্ব, ৪। গোবিন্দভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং (৭) শৈব দর্শনের মধ্যে ১। নকুলীশপাশুপতদর্শন, ২। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, এবং ৩। রসেশ্বর দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর বেদবিরোধীদর্শনের মধ্যে চার্ব্বাক দর্শন, ২। জৈন দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শনের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পর মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাবদর্শনের বর্ণনোপলক্ষে ১। নাথ-পন্থ, ২। সিদ্ধাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের চর্য্যাপাদ, ৩। সহজিয়া পন্থ, ৪। রাসাত্মিকা পদাবলী ইত্যাদি এবং ৫। তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ ইত্যাদি, এবং ৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এক দিকে গ্রন্থখানি যেমন বর্ত্তমানসময়োপযোগী হইয়াছে, অন্য দিকে তদ্রূপ সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহে যে দর্শনগুলির সূক্ষ্ম সম্বন্ধ ও ক্রমনির্দ্দেশরূপ অপূর্ব্ব চিন্তাধারার প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা থাকিলে গ্রন্থখানির আরও গৌরব বৃদ্ধি হইত। ইহাতে ভাবদর্শনমধ্যে নাথপন্থ এবং সহজিয়াপন্থ প্রভৃতি যে ছয়টি মতবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয় কবিরপন্থ, দাদূপন্থ প্রভৃতি অপর মতবাদগুলি পরিত্যক্ত হইল কেন? তদ্রূপ ইহাতে যখন গোবিন্দভাষ্য-মতের উল্লেখ দেখা যায় তখন মনে হয় নিম্বার্ক, ভাস্কর, শ্রীকণ্ঠ ও শ্রীকর ভাষ্যের মতগুলিই বা পরিত্যক্ত হইল কেন? উপক্রমণিকামধ্যে গ্রন্থকার দর্শন-আলোচনার যে উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আরও বিশদ হইলে ভাল হইত। সাংখ্যাদি কয়েকটি দর্শনের কথা বলিবার কালে গ্রন্থকার যে নানারূপ বিভাগ চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ্যে গ্রন্থের আদর হউক এবং গ্রন্থকার দার্শনিক সূক্ষ্ম কথাগুলি আরও সরলভাবে প্রকাশিত করুন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ)

একদা—শ্রীগোপাল হালদার। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। পৃ. ২৬৮। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাসখানি বর্ত্তমান বাংলার এক জীবনপিপাসু যুবকের সজাগ অন্তরের জীবন্ত ইতিহাস-স্বরূপ। নায়ক অমিতের কর্ম্মব্যস্ত একটিমাত্র দিনের পরিপ্রেক্ষিতে যে কয়টি পুরুষ ও নারী চরিত্রের আভাস লেখক দিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে সুযোগ সত্ত্বেও কোথাও তিনি অবান্তর বাগ্‌বিস্তার করেন নাই। পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুনীল, মনীশ, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি চরিত্রের প্রাণের উন্মাদনার এবং কর্ম্মের ঐকান্তিকতার যে সুনিশ্চিত নির্দ্দেশ অমিতের চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে করা হইয়াছে তাহাতেই চরিত্রগুলি সজীব ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্রগুলিকে

মাঝে মাঝে পথভ্রান্ত মনে হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মিথ্যাচারী বলিবার দুঃসাহস কাহারও হইবে না।

'একদা' আখ্যানপ্রধান উপন্যাস নহে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে গল্পের সুনির্দ্দিষ্ট সূত্র অনুসরণ করিয়া বিনা আয়াসে শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছিয়া মুড়িয়া তুলিয়া রাখিবার মত পুস্তক ইহা আদৌ নহে। লেখক নিজে পড়িয়াছেন এবং চিন্তা করিয়াছেন প্রচুর, অথচ তাহার ফলে তথাকথিত তরুণ ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল-দের মত জীবন-বিমুখী না হইয়া বরং বর্ত্তমান সমাজ-জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে তিনি নিজের বিচারের আলোকে যাচাই করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সুক্ষ্মবিচারশীল মনের সহিত চলিতে হইলে পাঠকেরও আপনার চিন্তা ও মননশক্তিকে সর্ব্বদা সজাগ রাখিতে হয়। নূতন যুগের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তার যে দ্বন্দ্ব তরুণ বাংলার চিন্তা-জগতেও বিপুল আলোড়ন জাগাইয়াছে, যে কর্ম্মপ্রেরণার উন্মত্ত আবেগে এবং সর্ব্বসঙ্কীর্ণতাবিমুক্ত যে উদার নবযুগের উদয়ের আশ্বাসে আজ অগণিত তরুণ প্রাণ জীবন-যজ্ঞে নিজেদের নিঃশেষে উৎসর্গ করিতেছে, তাহারই বেদনাগম্ভীর এক সংক্ষিপ্ত চিত্র লেখক অনুভূতির গাঢ় রস নিঙড়াইয়া আপনার অভিজ্ঞতা হইতে আঁকিয়াছেন।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্মশানে বসন্ত—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—ডি. এম. লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৩২, মূল্য ১॥০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের আসরে নবাগত সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কামাক্ষীপ্রসাদ অল্প দিনেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কবিতায় গল্পে ভাবে ভঙ্গিতে ভাষায় নূতনত্ব প্রবর্ত্তনের জন্য পরীক্ষামূলক চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন।

আলোচ্য বইখানির মধ্যে মোট এগারটি গল্প স্থান পাইয়াছে। আয়তনে এবং বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে গল্পগুলিতে ছোট গল্পের আদর্শ সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু অধিক মাত্রায় কাব্যধর্ম্মী ভাষা এবং ভাবপ্রবণতার আতিশয্যের বাধায় গল্পগুলি রসরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনা যাহা সাধারণ মানুষের চোখ এড়াইয়া যায় সেই সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মনের সুখ-দুঃখ লইয়া কারবার করিতে গেলে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া, অনুজ্জ্বলকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতে হয়, যেমন অণুবীক্ষণ-যন্ত্র চক্ষুর অগোচরকে বৃহদায়তন করিয়া দৃষ্টিগোচর করিয়া ধরে। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রত্যেক বস্তুটির অবয়বের আনুপাতিক আকার অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সম্মত সৃষ্টির ইহাই বিশেষত্ব। ভাবপ্রবণতায় এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া আনুপাতিক আকারকে ক্ষুণ্ণ করে; তাহার সহিত ভাষা কাব্যধর্ম্মী হইলে এই দোষ আরও প্রকট হইয়া উঠে।

এই দোষগুলি বর্জ্জিত হইলে গল্পগুলি সুন্দর উপভোগ-বস্তু হইতে পারিত। কামাক্ষীবাবুর দৃষ্টি সূক্ষ্ম—অন্তরের দরদের পরিচয়ও গল্পগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে; এই দোষগুলি কাটিয়া গেলে তাঁহার নিকট সত্যকার সুন্দর সৃষ্টি প্রত্যাশা করিতে পারি বলিয়াই ত্রুটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম।

ত্রিপুরা জেলাস্থ সাতমুড়া গ্রামের পালবংশের বিবরণ ও বংশাবলী—শ্রীবিধুভূষণ পাল। প্রকাশক—শ্রীনবেন্দুভূষণ পাল, ৩৯।৫এ গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

লেখক বাংলার পাল-পদবীবিশিষ্ট কায়স্থ-বংশসমূহের বিবরণকে সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জগৎ কোন্ পথে—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ. ১৯২। ১৯ খানি পূর্ণপৃষ্ঠ ছবি ও মানচিত্র। মূল্য এক টাকা।

উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত প্রধান প্রধান দেশের রাষ্ট্রিক ও আন্তঃরাষ্ট্রিক অবস্থা ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই সুলিখিত আলোচনা-গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিয়াছে ও অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইয়াছে। এই সংস্করণে বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের সূচনা ও আরম্ভকাল পর্য্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

পাতাল-কন্যা—শ্রীঅজিত দত্ত। কবিতা-ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

অজিতকুমারের কবিতাগুলি কবিতাই, আর কিছু নয়। অসমছন্দ, বিষম-ছন্দ বা নিঃছন্দ কবিতা-রচনার প্রতিও তাঁহার ঝোঁক নাই, আজিকার দিনে ইহা অত্যন্তই সাহসিকতার কথা। কবিতার সাহায্যে অর্থহীনতায় পরমার্থের সন্ধানও তিনি করেন না, যা কিছুকে তাঁহার ভাল লাগে সুন্দর ভাষায় সুন্দর করিয়া তিনি তাহাদের রূপ দেন এবং নিজের ভাল লাগাকে প্রকাশ করেন। কেবল যে রহস্য-উদ্ঘাটন তাঁহার কাম্য নয় তাহা নয়, নানা প্রকারে অযথা রহস্য সৃষ্টি করিয়া পাঠকের সঙ্গে রসিকতা করার প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। "সৌন্দর্য্যের সোনার কাঠির স্পর্শে" প্রতি-মানুষের মনের গোপনে যে রহস্যময়ী পাতাল-কন্যা রসের স্বর্গে জাগিয়া উঠে, আমাদের মনকে সেইখানে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা তাঁহার প্রতিটি রচনার মধ্যে চোখে পড়ে। এ চেষ্টায় তাঁহার কৃতকার্য্যতা সামান্য নয়।

অজিতকুমারের কুসুমের মাস পড়িয়া একটি সত্যকার কবিচিত্তের পরিচিতি লাভ করিয়াছিলাম, সেই পরিচয় পাতাল-কন্যা পাঠে আরও ঘনীভূত হইল।

স. চ.

"রামানন্দ বাবুর বিবৃতি"

গত ৩০শে বৈশাখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় "রামানন্দ বাবুর বিবৃতি" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমাদের রীতি অনুসারে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী ৩১শে বৈশাখ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই জন্য তাহার ছাপার কাজ ৩০শে বৈশাখ শেষ করিতে হইয়াছিল। এই জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন অংশ সম্বন্ধে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে কিছু লিখিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় কিছু লিখিতেছি।

৮ই মে ২৫শে বৈশাখ কলিকাতার টাউনহলে যে সভা হয়, আমি তাহার সভাপতি ছিলাম। এই সভা সম্বন্ধে কোন কোন দৈনিক কাগজে অনেক মিথ্যা ও আংশিক মিথ্যা কথা প্রকাশিত হওয়ায় আমি তদ্বিষয়ে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে কিছু লিখিয়াছিলাম। আমার এই লেখার মুদ্রিত আগাম প্রুফ, জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী বাহির হইবার আগেই, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও অন্য কয়েকটি দৈনিক কাগজে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। অন্য কাগজগুলি তাহা ছাপিয়াছিলেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছাপেন নাই। না-ছাপিয়া "রামানন্দ বাবুর বিবৃতি" প্রবন্ধে তাহার কোন কোন অংশের 'সমালোচনা' করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচনা করিতে গিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আমার লিখিত বাক্যগুলি ঠিক্ ঠিক্ উদ্ধৃত করেন নাই, বস্তুতঃ যাহা আমার উক্তি নহে আমাকে তাহারই জন্য দায়ী করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছেন :—

"রামানন্দবাবু নিজেই বলিতেছেন, সভার পূর্ব্বে, পরে অথবা সভার সময় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্তই তিনি দেখেন নাই বা শুনেন নাই ; কেবল তাহাই নহে, তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর নরেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্তা মজুমদার দণ্ডায়মান থাকায় তিনি দেখিবার সুযোগ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তখন উঁহারা কি বলিতেছিলেন, কি করিতেছিলেন, তাহাও তিনি শুনিতে পান নাই।"

আমি ঠিক্ যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা মুদ্রিত আকারে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও অন্য কোন কোন দৈনিককে পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আগেই বলিয়াছি। সুতরাং আমার কথাগুলি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ঠিক্ ঠিক্ উদ্ধৃত করিতে পারিতেন। আমি লিখিয়াছিলাম :—

"সমস্ত মিথ্যা ও আংশিক মিথ্যার প্রতিবাদ ও ভ্রম প্রদর্শন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ, সভারম্ভের পূর্ব্বে সভার কাজ চলিবার সময়ে ও তাহার পরে কতকক্ষণ পর্য্যন্ত টাউন-হলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সব কিছু আমি দেখি নাই ও শুনি নাই—বস্তুতঃ কেহই সমস্ত দেখেন নাই শুনেন নাই ; এবং যদি সমস্তই আমার দৃষ্টিগোচর ও কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলেও আমার যথেষ্ট অবসরের অভাব ও কাগজে স্থানের অভাবে সমস্ত কথা লিখিতে পারিতাম না। সেই জন্য আমি স্বয়ং যাহা বলিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, **তাহারই আবশ্যক কিয়দংশ** লিখিব। কারণ, আমি এই সভার সভাপতিরূপে কার্য্যারম্ভের আগে হইতে গুণ্ডামি থামিয়া যাইবার পর পর্য্যন্ত টাউন-হলে ছিলাম বলিয়া আমার এইরূপ কিছু লিপিবদ্ধ করা উচিত।"

আমার লেখার উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, **টাউন-হলের আলোচ্য সভায় উপস্থিত অন্য লোকদের মত** আমিও সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বশ্রোতা না হইলেও কিছু কিছু দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, আমার কোন প্রকার অনন্যসাধারণ অন্ধতা ও বধিরতা জন্মে নাই। আমি কিছুই না দেখিয়া শুনিয়া সভার সম্বন্ধে বিবৃতি লেখার মত নির্বুদ্ধিতার কাজ করি নাই যদিও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মুন্শিয়ানায় এই-রূপ ধারণা উহার পাঠকদের হইয়া থাকিতে পারে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছেন, "তাঁহার (অর্থাৎ আমার) সম্মুখে টেবিলের উপর নরেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্তা মজুমদার দণ্ডায়মান থাকায় **তিনি** (অর্থাৎ আমি) **দেখিবার সুযোগ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইয়া-**

ছিলেন"। ইহা আমি কোথাও লিখি নাই। আমি লিখিয়াছিলাম :—

"তিনি (নরেন্দ্রনারায়ণ বাবু) মাইক্রোফোনের সম্মুখে এবং পরে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের সহিত সভাপতির টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া সভাপতিকে তাঁহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগপ্রদর্শনপূর্ব্বক কি যেন বলিতেছিলেন, ইহা আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। কিন্তু সভাস্থলে তখন এরূপ বীভৎস হট্টগোলআদি চলিতেছিল, যে, আমি তাঁহাদের চীৎকারের একটি কথা, বা একটি বর্ণও শুনিতে পাই নাই।"

"আমি দেখিবার সুযোগ হইতে একেবারেই বঞ্চিত" হইয়াছিলাম, এরূপ কোন কথাই ত এখানে বলি নাই, অন্যত্রও বলি নাই। বস্তুত: টাউন-হলের হলটা এত চওড়া যে, যদি কেহ ইঙ্গিত করে, যে, হলে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তির সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে, দুই জন মানুষ দণ্ডায়মান হওয়ায় উপবিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিপথ দক্ষিণে বামে সম্মুখে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা হইলে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের দৈহিক স্থূলতা সম্বন্ধে হাস্যরস উদ্রেকের চেষ্টাই অনুমিত হইবে। কিন্তু নিজের দলের লোকদের কাহারও সম্বন্ধে এরূপ অপচেষ্টা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' করিতে পারেন না।

নরেন্দ্রনারায়ণ বাবু ও শ্রীযুক্তা মজুমদার সম্বন্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যে বাক্যগুলি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার শেষ কথাগুলির পর (অর্থাৎ "তাহাও তিনি শুনিতে পান নাই"-এর পর) উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছেন :—

যাঁহারা পুরোভাগে ছিলেন, তাঁহারা বলেন, ঐ সময়ে নরেন্দ্রনারায়ণের প্রস্তাব শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া সভায় গৃহীত হয়। কিন্তু রামানন্দবাবু "না শুনিতে পাইলেও" ঐ মর্ম্মে 'আনন্দবাজার' ও 'ষ্টাণ্ডার্ডে' যে সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কি 'আনন্দবাজার', কি 'ষ্টাণ্ডার্ড' কেহই বলে নাই যে, সভাপতির সম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তথাপি তিনি 'আনন্দবাজারে'র দোষ কীর্ত্তন করিলেন।

উপরে উদ্ধৃত শেষের কথাগুলি হইতে বুঝা যায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকার'ও মতে নরেন্দ্রনারায়ণ বাবুর প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, তখনও সভাপতি আমিই ছিলাম। সভাপতি যে প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, যাহা উত্থাপিত করিতে তিনি অনুমতি বা সম্মতি দেন নাই, যাহা গৃহীত হইল বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন নাই, তাহা কোন সভ্য দেশের সভ্য লোকদের সভায় বৈধভাবে গৃহীত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে বলিয়া আমি অবগত নহি।

বৈধতার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা আমি স্বীকার করিতে পারি না যে, সভার উদ্যোক্তাদের বৈধভাবে গৃহীত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাব অবৈধ ভাবেও উত্থাপিত, সমর্থিত বা গৃহীত হইয়াছিল। যাহার বিষয়ে সভাপতি আমাকে কিছুই জানানো হয় নাই, যাহা মোটেই আমার জ্ঞানগোচর হয় নাই, তাহা অস্বীকার্য্য।

বাহুল্যের আশঙ্কা থাকিলেও আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও অন্য কয়েকটি দৈনিককে জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র যে লেখা পাঠাইয়াছিলাম, তাহার একটি অংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

কলিকাতা টাউন-হলে বসু-লীগ চুক্তির সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই

আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতা টাউন-হলের সভায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার কর্ত্তৃক সমর্থিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যাহার একটি অংশে সুভাষচন্দ্র বসু ও মুসলিম লীগের চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছিল। এইরূপ একটি প্রস্তাব যে উত্থাপিত বা গৃহীত হইয়াছিল, তাহার সংবাদ সভার সভাপতি আমি প্রথম দেখি সভার তারিখের পরবর্ত্তী দিন বৃহস্পতিবারের প্রাতঃকালের আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে। তাহার আগে ওরূপ কোন প্রস্তাব আমার নয়নগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই।

কোন সভায় কোন মূল প্রস্তাব বা সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে সভাপতির অনুমতি ও সম্মতি লওয়া আবশ্যক;— তাঁহার অনুমোদন না থাকিলেও, অন্ততঃপক্ষে তাহা তাঁহার জ্ঞাতসারে হওয়া উচিত ও হইয়া থাকে। উত্থাপিত ও গৃহীত বলিয়া কথিত নরেন্দ্রনারায়ণ বাবুর প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আমি তাঁহাকে অনুমতি দি নাই, তিনি যে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে বা অনুমান করিতে পারি নাই। তিনি মাইক্রোফোনের সম্মুখে এবং পরে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের সহিত সভাপতির টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া সভাপতিকে তাঁহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগপ্রদর্শনপূর্ব্বক কি যেন

বলিতেছিলেন, ইহা আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। কিন্তু সভাস্থলে তখন এরূপ বীভৎস হট্টগোলআদি চলিতেছিল, যে, আমি তাঁহাদের চীৎকারের একটি কথা, বা একটি বর্ণও শুনিতে পাই নাই।

কোন প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হইবার পর যদি তাহার কোন বিরুদ্ধবাদ না হয়, তাহা হইলে সভাপতি তাহা গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে সভাপতি আমি তাহা করি নাই। করিবার কোন কারণই ঘটে নাই। কেননা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের তাৎকালিক দৈহিক দক্ষতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যে কোন-প্রস্তাব-বিষয়ক, তাহা আমার জ্ঞানগোচর, কিংবা আমার অনুমান বা কল্পনার বিষয়ীভূত ছিল না।

জনসাধারণের প্রকাশ্য সভার বৈধ রীতি অনুসারে নরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার সঙ্গীরা যাহা কিছু বলিতে করিতে চাহিবেন, তাহা তাঁহাদিগকে বলিতে করিতে দেওয়া হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা দেওয়া ও পাওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের রীতিবিরুদ্ধ আচরণের উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা উদ্যোক্তাদের আয়োজন পণ্ড করিতে চাহিয়াছিলেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার (অর্থাৎ আমার) সুদীর্ঘ বিবৃতির কোথাও একথা নাই যে, তাঁহার সম্মতিক্রমে অন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।" পত্রিকা বলিতে চান, আমি অন্য প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু লিখি নাই, অতএব সেরূপ কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু অন্য কোন কোন কাগজের এবং হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতার সত্য বিবৃতিতে যাহা বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক বলিয়া তাহা করা আমার অভিপ্রেত ছিল না। আনন্দবাজার পত্রিকা ও অন্য কতিপয় দৈনিককে অগ্রিম প্রেরিত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর লেখাটিতেই আছে, যে, "আমি স্বয়ং যাহা বলিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, তাহারই **আবশ্যক কিয়দংশ** লিখিব।" সব কিছু লিখিব বলি নাই, লিখিও নাই। সভার উদ্যোক্তাদের প্রস্তাব যে যথারীতি উপস্থাপিত, সমর্থিত এবং গৃহীত বলিয়া সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল, এই সত্য সংবাদ ঐ কারণেই আমার লেখায় ছিল না। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করিবার পর আমি ঘোষণা করি, যে, "এই সভার কার্য শেষ হইল"। তাহার পরও অনেকক্ষণ আমি হলে ছিলাম। তখন মারামারি চলিতেছিল। পরে কয়েক জন ভদ্র-লোকের অনুরোধে যখন পাশের একটা কামরায় গিয়াছিলাম, তখন সেখানে আহত অবস্থায় নীত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাথমিক চিকিৎসা চলিতেছে দেখিয়াছিলাম।

গত ১৩ই মে তারিখের হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডে লিখিত হইয়াছে যে, নরেন্দ্রনারায়ণবাবুরা যখন তাঁহাদের তথা-কথিত প্রস্তাব উত্থাপনাদি করিতেছিলেন তখন আমি হলে ছিলাম না ("he was not present at the hall at the time)। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আগেই লেখা হইয়াছে, সভার কাজ শেষ হইবার পরেও, গুণ্ডামির অনেকক্ষণ পর্যন্তও, আমি হলেই আমার আসনে উপবিষ্ট ছিলাম। নরেন্দ্রনারায়ণবাবুর ও শ্রীযুক্তা মজুমদারের বাচনিক সক্রিয়তার সমাপ্তির পর গুণ্ডামি আরম্ভ হয়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' সভার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এই প্রবন্ধে কেবল তাহারই আলোচনা করিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সম্বন্ধে উহাতে ও হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আলোচনার যোগ্য নহে।



অনুসরণ

শ্রীসুশীল জানা

বন্ধু বললেন, দিব্যি জায়গাটিতে আছ হে, আমার তো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

স্টীমার কোম্পানীর স্টেশন-মাস্টার আমি—থাকি একেবারে গ্রামিন্ পরিবেশে, বৈচিত্র্য নেই, বন্ধুবান্ধব নেই। স্টেশন, যাত্রী এবং বাংলো—গতানুগতিক দিনের পর দিন। কিন্তু বন্ধু উচ্ছল হয়ে রীতিমত কাব্য সুরু করলেন—এমন নিরালা জীবন, নদীর পাশ ঘেঁষে এক খানি ছোট্ট বাংলো, দক্ষিণের জানালা খুলে দিলে হু হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস এসে দূরগামী নদীর শান্ত সুদূর যাত্রা মনকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যায় আর বহুদূরের বয়ার আলোটা তার চার দিকে ঘন অন্ধকারে অনন্ত জলরাশির রহস্যময় এক কালো সমুদ্র রচনা ক'রে টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে।

বন্ধু একেবারে উচ্ছল হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ গল্প-স্বল্প করার পর বন্ধু শুতে গেলেন, পাশের ঘরেই তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলুম। আলো নিবিয়ে আমিও শুয়ে পড়লুম।

রাত্রে বন্ধুর চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলুম, বন্ধুও উঠে এসেছেন।

জিজ্ঞেস করলুম, কি হ'ল।

—ও কিছুই না। বন্ধু সপ্রতিভ হয়ে বললেন, ছি ছি, দিব্যি ঘুমুচ্ছিলে তুমি—আমি চেঁচিয়ে তোমার ঘুমটা নষ্ট করলুম।

—তাতে কি, কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে নাকি।

—হ্যাঁ, আমার আবার ও বদঅভ্যাস আছে কিনা। তুমি ঘুমোতে যাও—আমি একটু জেটির দিক থেকে ঘুরে আসি। আজ রাত্রে আর ঘুম হবে না।

বললুম, চল—আমিও যাই।

—না না, তুমি ঘুমোও গে। বন্ধু লজ্জিত হয়ে বললেন।

বললুম—কত দিন পরে দেখা, আজ একটা রাত্রি না হয় গল্প ক'রেই কাটাব—চল।

তার পর আমরা জেটিতে এসে বসলুম। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কেটে গেল। নদীর জলস্রোত জেটিতে বাধা পেয়ে অবিশ্রাম ছল্ ছল্ শব্দ করছে, মাঝে মাঝে এক-একটা ঢেউ আছড়ে পড়ে জেটির উপরে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল, আর একটানা হু হু বাতাস। খালের মুখে কালো কালো নৌকোগুলোর ভিড়, আর দিগন্তবিসারী অন্ধকার জলরাশির উপরে নিস্তব্ধ মস্ত আকাশটা নেমে এসেছে। ঢেউ লেগে জেটিটা দোলার মত অনবরত দুলছিল, চুপচাপ ব'সে থেকে কেমন তন্দ্রা আসছিল। হাই তুলে বন্ধুর দুঃস্বপ্ন ধরে টান দিলুম।—কি দুঃস্বপ্ন দেখলে?

বন্ধু বললে—ও কিছু নয়, মাঝে মাঝে দেখি ও-রকম।

—কি দেখ?

—শুধু একটা হাত—সামনে মেলে ধরা কৌতূহলী একখানি ছোট হাত। সেটা ক্রমশ বড়—মস্ত বড় হয়ে চোখের সুমুখে এগিয়ে আসে। এত বড় হ'তে সুরু করে যে ভয় লাগে।

—এই একই দুঃস্বপ্ন তুমি আগেও দেখেছ?

—হুঁ।

—কি রকম! এ তো ভাল কথা নয়।

—না, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি বুঝি, ওই একই দুঃস্বপ্ন আমি কেন বার-বার দেখি।

—কি রকম?

আমার অদম্য কৌতূহলের জেরায় পড়ে বন্ধু তাঁর গল্প বললেন। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল, কেমন যেন ভয়ও করতে লাগল। সেই কুরূপা এক হতভাগিনী ছায়ার মত তার আজন্ম দুর্ভাগ্য নিয়ে রাত্রির পর রাত্রি ধরে বন্ধুর ঘুম অনুসরণ ক'রে চলেছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম: উৎসব-মুখর একটি বাড়ী। কতকগুলি মেয়ে আমার বন্ধুকে ঘিরে আছে—তাদের মধ্যে সেই কুরূপা মেয়েটি। বন্ধু হাত দেখতে জানেন, মেয়েরা হাত দেখাচ্ছে। ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য জানবার এত কৌতূহল যে, হাত সকলেই এক সঙ্গে দেখাতে চায়। সে-বাড়ীতে বন্ধুটি আমার নিমন্ত্রিত, নিরুপায় ভাবে ভব্যতা রক্ষা ক'রে হাত দেখছেন। সুরূপা মেয়ের দলের পিছনে সেই কুদর্শনা মেয়েটি সকলের শেষে অপেক্ষা করছে, আর বিদ্রোহী উঁচু দুটো সুমুখের দাঁত ঠোঁট দিয়ে ঢেকে সুন্দর হবার চেষ্টা করছে। অদম্য কৌতূহল চেপে অপেক্ষা করছে জানবার জন্যে: তারও একটা ভাগ্য আছে। মাত্র বিশ বছরের কুমারী-জীবন তার, স্বপ্ন আছে, কামনা আছে—আর সৌভাগ্যও

আছে হয়ত। কিন্তু তার মত কুৎসিত অবহেলিত একটা মেয়ের আবার সৌভাগ্য—এই নিয়ে পাছে অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে চোখ-ঠারাঠারি হয়, তাই সকলের শেষ সে অপেক্ষা করছে। তার পর তার হাত এক সময়ে এগিয়ে এল—শ্রীহীন একটা হাত। হাত দেখে বন্ধু তার মুখের দিকে তাকালেন, থমকে গিয়ে বললেন, আপনার হাত খুব ভাল। খুব ভাল বিয়ে হবে আপনার—ইত্যাদি।

বন্ধুর মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ষণ শেষ হ'ল—কিন্তু হাতখানা তবু মেলাই রইল। আরও বলতে হবে—আরও অনেক, অনেক সৌভাগ্য, অনেক স্বপ্ন, অনেক কথা। নিরুপায় বন্ধু আবার কতকগুলো মিথ্যে কথা ব'লে চললেন। শেষকালে বললেন, আপনি খুব সুখী হবেন। তবু হাতখানা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে রইল সুমুখে। অগত্যা নিরুপায় বন্ধু বললেন, রাত্রে তো ভাল ক'রে দেখা যায় না, এক দিন দিনের বেলা ভাল ক'রে আপনার হাত দেখে দেব।

বন্ধু চুপ ক'রে বসেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—তার পর মেয়েটি কি মারা গেল?

—না। তার পর তার বিয়ে হয়েছিল। এক আর্টিস্ট তাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু মেয়েটি সুখী হয় নি। আমার সব মিথ্যে মিথ্যেই হ'ল কিন্তু আমার দুঃস্বপ্ন সত্যি হয়ে রয়ে গেল। বন্ধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

জিজ্ঞেস করলুম—মেয়েটি কি এখনও বেঁচে আছে?

বন্ধু ম্লান হেসে বললেন—অন্ততপক্ষে আমি যত দিন বেঁচে আছি তত দিন তো আছে। এক-এক সময়ে আমার মনে হয়, এ দুঃস্বপ্ন নয়—সত্যিই যেন সে আসে—চলে যায়। তার পায়ের শব্দ, শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ সমস্ত যেন আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। আজ যেমন সে এল, অন্ধকারে তার হাত মেলে ধরল। না, সে মরে নি—আমি যত দিন বেঁচে থাকব, সেও থাকবে, যেখানে যাই, এমনই অনুসরণ ক'রে চলবে। তুমি ভূতে বিশ্বাস কর?

নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রি আর দিগন্তবিসারী মূক অসহায়তা আমার চার দিকে ঘন হয়ে এল। চার দিকের থমথমে অন্ধকার আর একান্ত শূন্যতা হঠাৎ যেন অসহ্য হয়ে উঠল আমার। বললুম—সে-মেয়েটা তবে বোধ হয় মারাই গিয়েছে হে—তুমি খবর-টবর রাখ নি। আর মেয়েটা তোমাকে বোধ হয় ভালই বাসত।

বন্ধু বললেন, আজ বোধ হয়, আমিও তাকে ভালবাসতুম।

বন্ধু চুপ ক'রে কি ভাবতে লাগলেন। আমি বললুম, তুমি কি কোন দিনই জানতে পার নি—সে তোমাকে ভালবাসে? কোন দিনই টের পাও নি!

কোন উত্তর দিলেন না বন্ধু—চুপ ক'রে কি ভাবতে লাগলেন, বোধ হয় আমার কথা তাঁর কানেই যায় নি। কারণ, হঠাৎ বন্ধু অসংলগ্ন ভাবে বললেন—আর্টিস্টের খামখেয়ালী ভালবাসা তো! যে কোন একটা মেয়ের মর্মান্তিক দুঃখ—বিশেষ ক'রে একটা বিশ বছরের মেয়ের ব্যর্থ স্বপ্নের দুঃখ, কামনা-কল্পনার দুঃখ যখন চোখের সুমুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন তার স্থূল রূপের দিক্‌টা তো চোখে পড়ে না। মেয়ের চেয়ে তার দুঃখটাই তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে বেশী। আর্টিস্ট তাকে বিয়ে করলে—তাকে ভালবেসে নয়, তার নিজের আইডিয়াকে ভালবেসে।

তাই আর্টিস্টের দিক্ থেকে ছিল সহানুভূতি, সমবেদনা, বড় কিছু একটা করবার খামখেয়ালী আনন্দ। আর মেয়েটার দিক্ থেকে কি ছিল?—অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনার সুখ, সান্ত্বনা হয়ত, আরও কত কি। কিন্তু সব নষ্ট হ'ল তার—শুধু রইল একটা ঈর্ষা। আর্টিস্ট-স্বামীর সৌন্দর্য্য সে সহ্য করতে পারলে না—সর্ব্বক্ষণ সমস্ত অনুভূতি আর ইন্দ্রিয় দিয়ে নিজেকে সচেতন ক'রে রাখলে। তার কুৎসিত উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে স্বামী এক দিন সহজ ভাবে মিশে যেতে পারলে দিনের পর দিনের সঙ্গে—কিন্তু সে পারলে না।

একটা বেয়াড়া মেয়ে। বিরক্তিতে মন ভরে গেল আমার। আর্টিস্ট স্বামী, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে, রূপবান ভদ্রলোক—খেয়ালে পড়ে হোক আর যাই হোক, বিয়ে করলে যে মেয়েকে তার তো সৌভাগ্য ব'লেই মানা উচিত। বন্ধু হাত দেখে ভুল তো বলে নি। কিন্তু কি অদ্ভুত মেয়ে, নিজের ভাগ্যকে নিয়ে কোথায় অন্যান্য মেয়ের কাছে গর্ব্ব করবে—না, করলে অমন সুন্দর উদার স্বামীর রূপের হিংসা। কুনো মাথা-খারাপ মেয়ে একটা, কোন নিমন্ত্রণে যাবে না, কোন সামাজিকতার ধার ধারে না—মিশবে না কারুর সঙ্গে, পাছে তার রূপের আলোচনা হয়, পাছে কেউ বলে: অমন স্বামীর ঐ স্ত্রী।

আর্টিস্ট ভদ্রলোক, অনেক বন্ধু-বান্ধব তার, কত ভক্তও আছে হয়ত। তারা আসে, বৌ দেখতে চায়। কিন্তু বৌ দেখা দেবে না। রাগের কথা বইকি।

সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শয্যার উপর। স্বামী ঘুমোচ্ছে। সে জেগে আছে। ঠোঁট কামড়ে আবার সে কাঁদেও।

অকারণে স্বামীর দোষ হচ্ছে এই যে, নিজেরই আঁকা একখানা ছবি, হ্যাঁ—একটি মেয়ের ছবি, সুন্দর একটি

মেয়ের পোর্ট্রেট ঘরের মধ্যে টাঙানো। আরে ছবি—ছবি, কেমন সুন্দর তাই দেখ। না, হাঁদা মেয়ে ভাবলে, ছবিটা নিশ্চয়ই কোন একটা বিশেষ মেয়ের। তার চেয়ে অনেক সুন্দর সে, বাতাসে অনেক চুল তার উড়ছে, নীল শাড়ীটি উড়ছে, শান্ত সুন্দর চোখ দুটি যেন এমনই ঘুম ভেঙে চেয়েছে, কানে রুপোর ঝুমকো—দিব্যি ছবিখানি। ছবির উপরই হিংসে হ'ল তার—আর স্বামীর উপরে সন্দেহ।

যাই হোক, মাথায় তার এইটুকু বুদ্ধি এল যে, স্বামী তার ঐ রকম একটি ফিটফাট মেয়ে চায়। নতুন নীল শাড়ী এল তার, রুপোর ঝুমকো এল। ছবির দিকে চেয়ে আর আয়নার দিকে চেয়ে সারা দুপুর ধরে প্রসাধন করলে সে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে সারা পিঠময় ছড়িয়ে দিলে।

তার পর?

তার পর প্রসাধন শেষ হ'ল। ছবির দিকে তাকালে এক বার, আয়নায় দেখল তার পর নিজেকে। দেখে দেখে চোখের কোণ বয়ে এবার জলের ধারা নামল তার।

স্বামী জানালা দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন ব্যাপারটা, থমকে গেলেন—অবাক হলেন।

অবাক হওয়ার কথাই তো। এ এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। যাই হোক, আর্টিস্ট মানুষ—স্ত্রীর এই ব্যাপারে তিনি কি দেখলেন কি জানি, ছবি আঁকতে বসলেন। তবে গোপনে, স্ত্রী দেখে ফেললে আর রক্ষে নেই।

সেই যে ঘরে টাঙানো অমন সুন্দর ছবি—তাকেই দিলে ঘর থেকে বের ক'রে।

স্বামী বললে—ওর অপরাধ?

স্ত্রী হঠাৎ চীৎকার ক'রে বললে—না না, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও, এখান থেকে যেখানে খুশি নিয়ে যাও—এখানে না।

অমন সুন্দর ছবি, উত্তেজনার মাথায় সমস্ত ছবিটা একেবারে নষ্ট ক'রে দিলে—দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে ফোঁপাতে সুরু করলে।

দু-এক দিন পরে স্বামী ভদ্রলোক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললে, তোমার একটা ছবি আঁকব—অনেক দিন থেকে ভাবছি—

উত্তর হ'ল চেঁচামিচি ক'রে, কেন তুমি আমাকে অপমান ক'রতে চাও—কেন—

ফের কান্না।

সেই মেয়ে যদি জানতে পারে, তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের একটি ছবি আঁকা হচ্ছে—তা হ'লে আর রক্ষে নেই। আর্টিস্ট ভদ্রলোক খুব সংগোপনে ছবি আঁকতে লাগলেন দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে।

ষ্টুডিওতে বন্ধুবান্ধবরা আসে—ছবিটা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে খুব আলোচনা করে, তাদের মুখে প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

ছবি এক দিন শেষ হ'ল। বন্ধুরা এক বাক্যে বললে, অদ্ভুত। এ-রকম ছবি খুব অল্পই হয়েছে। এ-ছবিতে তুমি অমর হবে। একজিবিশন তো আসছে—পাঠিয়ে দাও ছবিটা।

স্বামীর অমন একটা বিখ্যাত ছবি—এত আলোচনা, এত প্রশংসা, স্ত্রীর ছবিটা দেখবার কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ষ্টুডিও-ঘরের দরজা-জানালা এমন ভাবে সব সময়ে বন্ধ থাকে—দেখবার সুবিধে হয় না।

এক দিন সুবিধে হ'ল, সেদিন কাঁদবার মত কোন আবেগ, কোন উচ্ছ্বাস রইল না তার। পাথরের মূর্ত্তির মত সে দাঁড়িয়ে রইল ছবিটার সুমুখে।

স্বামীও পিছনে এসে দাঁড়াল। বেচারী ভদ্রলোক—কি বলবে আর কি করবে, ভেবে পেলে না।

স্ত্রীই কথা কইলে আগে, বললে—এ-ছবি তুমি এক-জিবিশনে পাঠাবে?

মাথা চুলকে অপরাধী স্বামী ভদ্রলোক বললে—বন্ধু-বান্ধবরা তো তাই বলছে। ছবিটা নাকি খুব ভালই হয়েছে।

—তারা সবাই জেনেছে—এ ছবি আমার?

—না না, সে কি! তারা তো কেউ তোমাকে দেখে নি! স্বামী বেচারা বললে।

—এ ছবি তুমি একজিবিশনে পাঠিয়ো না। মেয়েটি বললে করুণ কণ্ঠে।

তার শ্রীহীন মুখের সমস্ত কাঠিন্য, সমস্ত রুক্ষতা অসহায়, করুণ হয়ে গেল। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামী ভদ্রলোক মুখ নীচু করলেন। কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না—তিনি চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। স্ত্রী তার সোফার পাশে এসে দাঁড়াল। ভারী গলায় বললে—জানি, এ ছবি তোমার প্রশংসা পাবে, সবাই ভাল বলবে, অনেক টাকায় বিক্রী হবে হয়ত। কিন্তু তবু এ ছবি তুমি পাঠিয়ো না। আমাকে তুমি এমনি ক'রে—

তার পর মেয়েটি ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে।

—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। তোমার কথাই রাখব। ব'লে স্বামী স্ত্রীর হাত ধরলে। বোকা মেয়ে, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলে স্বামীর কোলে মুখ গুঁজে। স্বামী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলে।—

আমাকে ভুল বুঝো না। ও-ছবি আমি কোথাও পাঠাব না—বরং নষ্ট ক'রে ফেলব।

কিন্তু নষ্ট ক'রে ফেলা হ'ল না। আর্টিস্টের মধ্যে যে যশের আকাঙ্ক্ষা লুকিয়েছিল—বন্ধুদের খোঁচায় জেগে উঠল আবার সেটা। এ ছাড়া সংসারের অভাবও তো আছে, ছবি বেচে যার চলে তার ছবি না বেচলে চলবে কেন, খাবে কি? আর্টিস্ট ভদ্রলোক একজিবিশনে ছবি পাঠাবার আগে নিজেকে এই ব'লে বোঝালে। তার পর গোপনে এক দিন ছবি চলে গেল একজিবিশনে।

স্ত্রীর চারি দিকে একটা নূতন ঔদাসীন্য নেমে এসেছিল। সেটা ক্রমশ ঘন হয়ে আসছিল যেন। স্বামীকে তার আর আগের মত হিংসা হয় না, অসহ্য মনে হয় না—কেমন যেন তার ভয় করে। স্বামীর দিক্ থেকে যখন ছিল অপর্য্যাপ্ত সমবেদনা সহানুভূতি আর নীরব সস্নেহ অমায়িকতা তখন সে-সব তার অসহ্য হয়ে উঠেছে, নিজের অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছতা আর অযোগ্যতা বার-বার মনে পড়ে তাকে পাগল ক'রে তুলেছে—সে কঠিন হয়ে আঘাত করতে চেয়েছে, কিন্তু যখন পরোক্ষভাবে এল আঘাত স্বামীর দিক্ থেকে তখন সে একেবারে অসহায় হয়ে গেল। স্বামীর করুণারও এমন কিছু যেন অবশিষ্ট রইল না যাকে অবলম্বন ক'রে সে আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ছবি পাঠাবার ব্যাপার সে কিছুই জানলে না, জানবার কৌতূহলও তার নেই। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সহায়-সম্বল সব যেন ফুরিয়ে গিয়েছে।

বন্ধুদের কথা মিথ্যে হ'ল না, আর্টিস্টের ছবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চার দিকে। সকলে বললে—অমন অদ্ভুত সুন্দর ছবি খুব কম দেখা যায়। ছবি বিক্রিও হ'ল মোটা টাকায়।

আর্টিস্টের বন্ধুরা কোলাহলে ছোট্ট স্টুডিও ঘরটা যেন ফাটিয়ে দিতে চাইলে। আর্টিস্ট-পত্নী ভয়ে ভয়ে আড়ি পেতে এসে শুনল, তার ছবিটারই কথা হচ্ছে। *সেই তার ছবি—একটা সুন্দর ছবির সুমুখে দাঁড়িয়ে তার* ছবি—চোখে জল, সেই ছবি হাজার লোকের প্রশংসা পেয়েছে, অনেক টাকা পাবে তার স্বামী, কাল পাবে—বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে।

শুনলে সে—তার পর আস্তে আস্তে চলে গেল নিজের ঘরে, আয়নার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল এক বার, এক বার তাকাল দেয়ালের দিকে—যেখানে সেই সুন্দর মেয়েটির ছবি টাঙানো ছিল; সেখানে আজ সেটা নেই। আবার আয়নার দিকে তাকালে, আজ কোন ছবির দিকে নয়, আয়নাতে নিজেকে দেখতে দেখতে তার চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা নামল।

পর দিন বারটা থেকে দুটোর মধ্যে আর্টিস্ট তার ছবি বিক্রির টাকা আনতে চলে গেল, যাওয়ার সময় ষ্টুডিও-ঘরের দরজা-জানালা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে গেল।

স্ত্রীর ঔদাসীন্যে একটু ইঙ্গিত ক'রে বললে—তুমি আমাকে আজও ক্ষমা করতে পারলে না—এখনও ভুল বুঝছ।

স্ত্রী ওর মুখের দিকে নীরবে তাকালে নির্ব্বোধের মত।

আর্টিস্ট ওর কাঁধে হাত রাখলে—মুখে হাসি এনে বললে—কথা কইছ না কেন বল তো। তোমার কথা তো আমি রেখেছি—সেই দিনই রাত্তিরে ছবিটা পুড়িয়ে ফেলেছি।

স্ত্রী আবার তার মুখের দিকে বোকার মত চাইলে।

আর্টিস্টের ঠোঁট ওর ঠোঁট স্পর্শ করলে—তার পর মৃদু হেসে আর্টিস্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্ত্রী কাঠের মত ব'সে রইল আর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল আর্টিস্টের চলে যাওয়ার দিকে। তার পর তার চোখ জালা ক'রে দুটি ফোঁটা জল চোখের কোণে এসে ঝক্‌মক্ করতে লাগল। বর্ষার দিনের মত ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে, ম্লান হয়ে থাকাই যেন ওর স্বভাব।

তার পর?

কি জানি, তার পর মেয়েটি ঠিক করলে কি ভুল করলে। তার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার যুক্তি কি আমি জানি নে, তবে সে আত্মহত্যা করলে।—এরকম শেষের জন্যে আমি তৈরি নেই। বোকা মেয়ে, হ্যাঁ, বন্ধু মিথ্যেই বলেছিল, জীবনে সে সুখী হ'তে পারে নি।

তার মৃত্যুশয্যার কাছে তার সেই সুন্দর স্বামী, আর জানালা দিয়ে সেই পরিচিত আকাশ আর পৃথিবী ক্রমশঃ

ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। সে মরবে না, সে বাঁচবে—তাকে শেষ বারের মত ক্ষমা করুক তার স্বামী, তাকে বাঁচাক—এ-সব কথা সে বলেছিল জড়িয়ে জড়িয়ে, তার পর তাও পারে নি। কেবল মরণোন্মুখ ঝাপসা চোখে বাঁচবার করুণ বোবা আগ্রহ তার চোখে ফুটে উঠেছিল—মৃত্যুর পরও সে চোখ স্তিমিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

একটি মেয়ে এমনি ক'রে মরে গেল।

মন বড় খারাপ হয়ে গেল। দূর জলপথে, অন্ধকারে আর একটানা হু হু হাওয়ায় কেমন একটা যেন অস্পষ্ট কান্না মিশে আছে ব'লে মনে হ'ল। মস্ত বড় আকাশটা নিতান্ত একটা অপরিচিত মেয়ের মর্ম্মান্তিক জীবনকাহিনী তার উধাও শূন্যতায় মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে যেন। হঠাৎ আমার চারি দিক্ দুঃখের পীড়িত আবহাওয়ায় ভরে গেল।

বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম—আজ তুমি তাকে দেখেছ?

অন্যমনস্ক বন্ধু উত্তর দিলেন—হুঁ।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকবার পর আমরা বাংলোর দিকে ফিরলুম। মনে হ'ল, বন্ধুর ঘর থেকে যেন একটি ছায়া সহসা অন্তর্হিত হ'ল। বাংলোর পাশে অশ্বত্থ গাছের তলে ঝরে-পড়া শুকনো পাতাগুলো হঠাৎ মর্ মর্ ক'রে উঠল। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম—বন্ধু একদৃষ্টে আমি যেদিকে তাকিয়ে ছিলুম, সেই দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি শুতে গেলুম—বন্ধুও তাঁর ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ ক'রে ভাল লাগল না—বাইরে বেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখলুম, বন্ধু একমনে লিখে চলেছেন; সম্ভবত ডায়েরী হবে।

বন্ধু চলে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি টিকিট দেওয়া শেষ ক'রে বন্ধুকে বিদায় দিতে চললুম।

বেশ ছিলুম ক-দিন, বন্ধুকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বললুম, আরও ক-দিন থাকলে পারতে।

—কি জানি—এখানে আর ভাল লাগছে না।

—এখানে আসবে আবার তো।

—ঠিক বলতে পারি নে।

অস্বীকার করব না—আবেগবহুল লোক আমি, উচ্ছ্বাস চাপবার জন্যে অন্য দিকে তাকালুম। বিভিন্ন রকম যাত্রীর ভিড়, কোলাহলে হাঁকডাকে সমস্ত জেটি ঘাটটা মুখরিত। একটা লোককে কয়েক জন লোক ধরাধরি ক'রে সাবধানে স্টীমারে তুললে—কি জানি, কি হয়েছে লোকটার, হয়ত পঙ্গু। তার সঙ্গী-সাথীর অনেকেই উঠে এল স্টীমার থেকে। লোকটা হঠাৎ কেঁদে বললে, আমি আর ফিরব না।

বন্ধুরা তার সান্ত্বনা দিলে, বললে—ভাল থাকবে সেখানে—সেরে উঠবে, এখানে পড়ে থেকে মিছিমিছি কত কষ্ট ভোগ করবে বল তো।

ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললুম বন্ধুকে—তুমি কোথায় যাচ্ছ এখন?

—ঠিক নেই কোথায় যাব। সেই পঙ্গু লোকটার দিকে বন্ধু তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন ম্লান হেসে, যেখানে কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই—এমন একটা দেশ, ঐ লোকটার মত যেখানে গেলে সমস্ত অসুখ সেরে যায়।

বন্ধুর স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, কাল রাত্রির কথা মনে পড়ল আর একটি মেয়ের জীবন-কাহিনী; আমার সমস্ত মন খারাপ হয়ে গেল। আজ স্পষ্ট দিবালোকে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না।

স্টীমার ছেড়ে দিলে। বন্ধু চলে গেলেন।

এই কিছুক্ষণ আগের কোলাহলমুখর জেটি-ঘাটটা একেবারে নীরব। বাতাসের একটানা সাঁ সাঁ শব্দ কানে এসে লাগছে আর ঢেউগুলো বাতাসে ফুলে উঠে জেটির উপরে সশব্দে বার-বার আছড়ে পড়ছে, টিকিট-ঘরটার পাশে মস্ত অশ্বত্থ গাছটার তলে একটা লোকও নেই। নদীর দিকে পিছন ফিরে তাকালুম এক বার—স্টীমারের ধোঁয়া দিগন্তে তখন মেঘ হয়ে গিয়েছে। গাঙচিলের সকরুণ চীৎকার আর উধাও আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উদাস মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা—চারি দিক্ কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'ল—মনে হ'ল সমস্তই যেন নিষ্প্রয়োজন।

বেলা তখন চারটে হবে।

টিকিট-ঘরে ফিরে এসে কাজে মন দেবার

চেষ্টা করলুম, পারলুম না। বন্ধুর কথা ভাবতে ভাবতে কখন সেই মেয়েটির জীবন-কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে গেলুম জানি নে। মনে হ'ল, আমি যেন তার সমস্ত জীবনটার সঙ্গে অন্তরে-বাইরে গভীর নিবিড় ভাবে জড়িয়ে গিয়েছি। দূরে ধূ ধূ নদী-পথের দিগন্তে উদাস মধ্যাহ্নের শুব্ধতার দিকে তাকিয়ে তার অন্তিম শয্যার কথা মনে পড়ল—সে যেন সেখানে বহুদিন ধ'রে নীরবে শুয়ে আছে, আকাশ যেখানে ফিকে নীল হ'য়ে বহুদূরে নদীর সঙ্গে ধোঁয়ার মত হয়ে গিয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে তার শেষ স্তিমিত দৃষ্টির কথা মনে পড়ল, সেখান থেকে সে যেন আজও ভারি করুণ, ভারি অসহায় দৃষ্টিতে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসের একটানা হু হু শব্দের সঙ্গে নদীস্রোতের ছল্ ছল্ শব্দ মিশে তার অবরুদ্ধ অস্পষ্ট কান্নার গোঙানি আমার কানের মধ্যে, আমার অন্তরের মধ্যে গুন্ গুন্ ক'রে উঠল। বন্ধুর উদাস পাণ্ডুর মুখ মনে পড়ল। মনে মনে বললুম—ওদের বিয়ে হ'লে ভাল হ'ত—ভাল হ'ত, সে সুখী হ'ত, সে অমন ক'রে মরত না।

কখন সন্ধ্যা হ'ল, সহকারী চলে গেল—দিগন্ত নদীপথ অস্পষ্ট কালো হয়ে গেল, রাত্রি বেড়ে চলল। বাংলোয় ফিরতে মন চাইল না—জেটিতে এসে খানিকক্ষণ পায়চারি করলুম।

স্টীমার-ঘাট ঘেঁষে একটা হোটেল। সেইখানে খাই। হোটেলে এসে খানিকক্ষণ ব'সে গল্প করলুম। বিদেশী জন-দুই ব্যবসাদার আছে হোটেলে—তাদের সঙ্গে দেশ-বিদেশের কথা কয়ে সময় কাটালুম খানিকটা। কথায় কথায় কেন জানি না, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—আমিও চলে যাব কোথাও। কেন বললুম জানি নে, তবে মনে হ'ল, এখানে আর ভাল লাগছে না। বন্ধুর চলে যাওয়াটাই বোধ হয় কারণ।

রাত্রি গভীর হ'ল। বাংলোয় ফিরলুম। আবার সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ল। বন্ধু যে ঘরে থাকতেন সেদিকে ভয়ে ভয়ে তাকালুম, যেদিকে কাল রাত্রে শুকনো পাতার মর্ম্মর শব্দ উঠেছিল সেদিকে তাকালুম। মনে পড়ল কাল সে এসেছিল। কিন্তু আজ কিছুই দেখতে পেলুম না। সমস্তটা অন্ধকারে কেমন শুব্ধ রহস্যময় হ'য়ে আছে।

বন্ধু মেয়েটাকে বিয়ে করলেই পারত। আর্টিস্ট হোক আর সুন্দরই হোক, তাকে মেয়েটা স্বীকার করতেই পারে নি। শেষকালে আত্মহত্যা ক'রে ভূত হয়ে আমার বন্ধুর পিছনে পিছনে ঘুরছে। আর আমার বন্ধুও··· পাষণ্ড। মুখ দিয়ে ফস ক'রে কথাটা বেরিয়ে এল।

আলো জেলে বন্ধুর ঘরে ঢুকলুম। চমকে উঠলুম, টেবিলের দিকে তাকিয়ে। কাল রাত্রে বন্ধু ডায়েরী লিখেছিলেন—সেটা সেইখানে পড়ে আছে। নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছেন বোধ হয়। টেবলের উপরে আলোটা রেখে ডায়েরীটা নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। তার পর কখন পড়তে সুরু করলুম জানি না। বন্ধু যে-কাহিনী আমাকে বলেছিলেন—সমস্তটা দিনের পর দিন ধরে ছড়ানো। নতুন কিছুই পেলুম না। শুধু জানলুম, আমার বন্ধুই আর্টিস্ট। একটা হতভাগা বদ্ধ পাগল, এখানে-ওখানে দিনের পর দিন ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এমন একটা দেশ সে খুঁজে বেড়াচ্ছে যেখানে দিব্যি মনের শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারবে সে, বেশ একটি সুন্দর দেশ। আবার লিখেছে কি, সে-দেশ আছে আমি জানি, মনে হয়, আমি যেন কবে দেখেছি—মনে করতে পারছি নে।

উঃ, কত জায়গায় ঘুরেছে লোকটা—আর তার পিছনে সেই ছায়ামূর্ত্তি।

ডায়েরীটা রেখে দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালুম। চারি দিকের অন্ধকারে অনন্ত জলরাশির সৃষ্টি ক'রে সেই বয়ার আলোটা দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে রইলুম অনেকক্ষণ, একেবারে অকারণ। তার পর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলুম এক সময়ে। ভেজান দরজা হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল, আলোটা নিবে গেল, বাতাসে ডায়েরীর পাতাগুলো ফর্‌ফর্ শব্দ ক'রে উঠল। একটা দমকা বাতাস অশ্বত্থ-তলার শুকনো পাতা উড়িয়ে মর্ম্মর শব্দ তুলে দূর নদীপথের দিকে হু-হু করে বয়ে গেল, দরজাটা আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। নাকে একটা ভারি মিষ্টি গন্ধ এসে লাগল। কি তেলের গন্ধ কি জানি, সেই মেয়েটি কি এই তেল মাখত! কি জানি। সে বোধ হয় খুঁজে গেল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্রিটিশ সম্রাট কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান

গত ২৪শে মে ব্রিটিশ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের উদ্দেশে রেডিওতে একটি বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি তাহার একটি অংশ :—

"There is a word which our enemies use against us, Imperialism. By it they mean a spirit of domination and lust of conquest. We, free peoples of the Empire, cast that word back in their teeth. It is they who have their evil aspirations. Our one object has always been peace, peace in which our institutions may be developed, the conditions of our peoples may be improved and the problems of government solved in a spirit of goodwill."

তাৎপর্য্য। একটি শব্দ আছে যাহা আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, (তাহা) সাম্রাজ্যবাদ। ইহার দ্বারা তাহারা বুঝাইতে চায় প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তি এবং (বিদেশ) জয়ের লালসা। আমরা, (ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যের স্বাধীন লোকেরা, এই (সাম্রাজ্যবাদ) কথাটা তাহাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করি। তাহাদেরই গর্হিত দুরাকাঙ্ক্ষা আছে। সকল সময়ে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ও আছে শান্তি—শান্তি যাহার মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকশিত হইতে পারে, আমাদের জনসমষ্টিসমূহের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালন সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধান সদিচ্ছা ও সদ্ভাবের মধ্যে হইতে পারে।

ব্রিটেনে একটি কথা ও মত চলিত আছে যে, ব্রিটিশ নৃপতি মন্দ ও অন্যায় কিছু করিতে পারেন না ("The King can do no wrong")। তাহার অর্থ এই যে, তিনি রাষ্ট্র সম্পর্কে যাহা কিছু বলেন করেন, মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে করেন। এই জন্য তাঁহার কোন সরকারী কাজ ও বক্তৃতা সম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য নহে।

ইংরেজী 'ইম্পীরিয়ালিজম' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'সাম্রাজ্যবাদ' চলিত হইয়াছে। তাহার অর্থ সম্রাটের বক্তৃতার উদ্ধৃত অংশে দেওয়া আছে। কয়েক মাস পূর্বে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন একটি বক্তৃতায় আরও বিশদভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যথা—

"If imperialism means the assertion of racial superiority, if it means the suppression of the political and economic freedom of other peoples, if it means the exploitation of the resources of other countries for the benefit of an imperialistic country, then, I say, that those are not the characteristics of this country, but they are characteristics of the present administration in Germany."

তাৎপর্য্য। সাম্রাজ্যবাদের অর্থ যদি হয় জাতিগত (racial) শ্রেষ্ঠতা কাজে ও কথায় ঘোষণা ও সমর্থন, যদি ইহার মানে হয় অন্য বহু লোকসমষ্টির রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাপা দেওয়া বা লোপ করা, যদি ইহার অর্থ হয় অন্যান্য দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য প্রভুদেশের উপকারের নিমিত্ত ব্যবহার, তাহা হইলে, আমি বলি, ঐগুলা এই দেশের (ব্রিটেনের) চরিত্রলক্ষণ নহে, প্রত্যুত সেগুলা জার্মেনীর বর্তমান শাসনতন্ত্রের চরিত্রলক্ষণ।

কয়েক মাস পূর্বে ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী সাম্রাজ্য-বাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন এবং কয়েক দিন পূর্বে ব্রিটিশ সম্রাট যাহা বলিয়াছেন, ব্রিটেনের লোকেরা, উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা এবং কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের লোকেরা তাহার কোন সমালোচনা না করিতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায়-স্বাধীন লোকদের মধ্যে আয়ারের লোকেরা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার বুঅরেরা তাহাতে সায় দিবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার কৃষ্ণকায়েরা ও তথাকার ভারতীয়েরাও সায় দিবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পরাধীন দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে যে উচ্চ দাবী করা হইয়াছে, ভারতবর্ষের লোকেরা তাহা মানিয়া লইতে পারিবে না। চেম্বারলেন সাহেব সাম্রাজ্যবাদের যে-যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, ভারতশাসনে এখনও সেগুলি স্পষ্ট আকারে বিদ্যমান।

দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। সাম্রাজ্যবাদের ব্রিটিশ সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞার দ্বিতীয় অংশটি পরদেশ-জয়-লালসা। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে ব্রিটেনের এখন এই লালসা নাই, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময়ও বহু পরদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এখন যে ব্রিটেনের পরদেশ আক্রমণ দ্বারা সাম্রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছা নাই, তাহার কারণ দুটি। একটি কারণ, এখন ব্রিটেনের সাম্রাজ্য যত বড় তাহা অপেক্ষা বড় সাম্রাজ্য তাহার পক্ষে অনাবশ্যক এবং বৃহত্তর সাম্রাজ্য রক্ষার সামর্থ্য তাহার নাই; দ্বিতীয় কারণ, ব্রিটেনকে আত্মরক্ষা ও বর্তমান সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্তই পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে—সাম্রাজ্য বৃদ্ধির কথা সে ভাবিতেই পারে না।

ব্রিটেন **সর্বদাই** শান্তি চাহিয়াছে, ইহা সত্য নহে। ইহা তাহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অবশ্যই হইতে পারে।

ব্রিটিশ সম্রাট ও ব্রিটিশ জাতি যদি এখন সাম্রাজ্যবাদী না হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য সকল পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদের সমুদয় লক্ষণ লুপ্ত করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে স্বরাজের অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কোন কোন অংশ দিলে চলিবে না। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত ডোমীনিয়ন করিলেও চলিবে না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা পৃথিবীর যে-কোন স্বাধীন দেশের সমান হওয়া চাই। সেই মর্যাদা লাভ করিয়া ভারতবর্ষ যথাসম্ভব ঐশ্বর্যশালী, শক্তিশালী, জ্ঞানোজ্জ্বল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারিবেন কি না, জগতের হিতে নিজের বিবেচনা ও স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন কি না, তাহা তাঁহার নিজের উপর নির্ভর করিবে।

—

ইউরোপীয় যুদ্ধের সঙ্গীন অবস্থা

ইউরোপীয় যুদ্ধ ক্রমেই মিত্রশক্তিদের পক্ষে অধিকতর সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। ডানকার্ক পরিত্যক্ত এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সমগ্র উপকূলভাগ জার্মেনীর অধিকৃত হইবার পর ৪ঠা জুন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় যুদ্ধের তাৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন, তাহা হইতে মিত্রশক্তিদের সৈন্যবল, অস্ত্রবল ও অন্যান্য সামরিক সম্ভারের যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উপলব্ধ হইবে। বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড তাঁহার সাহায্যকারী শক্তিদের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং নিজের মন্ত্রীদের সম্মিলিত মত অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক জার্মেনীর নিকট আত্মসমর্পণ করায় অবস্থা কিরূপ ভীষণ সঙ্কটজনক হয়, তাহা মিঃ চার্চিলের বক্তৃতা হইতে বুঝা যায়। এই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক বিপদে ব্রিটিশ ও ফরাসী সেনানায়ক ও সৈন্যেরা যে রণদক্ষতা ও পৌরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ হইতে হটিয়া আসিয়াছে ও ইংলণ্ড পৌঁছিয়াছে, তাহা, পরাভব সত্ত্বেও, এবং অতি বিরাট—সামরিক দুর্দৈব হওয়া সত্ত্বেও, যে গৌরবের কারণ, মিঃ চার্চিলের বিবৃতি হইতে এইরূপ প্রতীতি জন্মে।

বিবৃতির শেষে মিঃ চার্চিল বলেন :—

"স্ব স্ব অভীষ্টে ও প্রয়োজনে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ফরাসী সাধারণতন্ত্র সৎ সঙ্গীর মত তাহাদের শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত পরস্পরকে সাহায্য করিয়া তাহাদের জন্মভূমিকে আমৃত্যু রক্ষা করিবে। যদিও ইয়োরোপের বৃহৎ অনেক অঞ্চল এবং অনেক প্রাচীন বিখ্যাত রাষ্ট্র নাৎসী-শাসনের কবলে পতিত হইয়াছে, তথাপি আমরা টলিব না বা কর্তব্যচ্যুত ও ব্যর্থকাম হইব না। আমরা শেষ পর্যন্ত আগুয়ান হইতে থাকিব। আমরা ফ্রান্সে যুদ্ধ করিব, সাগর ও মহাসমুদ্রসমূহে যুদ্ধ করিব, ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস ও শক্তির সহিত আকাশে যুদ্ধ করিব, (জন অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের) ব্যয় যতই হউক আমাদের দ্বীপকে রক্ষা করিব; আমরা সমুদ্রতটে যুদ্ধ করিব, অবতরণভূমিসমূহে যুদ্ধ করিব, আমরা মাঠে, লোকালয়ের রাস্তাসমূহে এবং পাহাড় পর্বতে যুদ্ধ করিব। আমরা কখনও আত্মসমর্পণ করিব না, এবং এই দ্বীপের সমস্তটা বা ইহার একটা বৃহৎ অংশ যদিই বা শত্রুর দ্বারা বিজিত এবং অনশনক্লিষ্টও হয়—যাহা হইবে বলিয়া আমি মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না, তাহা হইলেও ব্রিটিশ রণতরীসমূহদ্বারা রক্ষিত ও সমরসজ্জায় সজ্জিত আমাদের সাগরপারের সাম্রাজ্য তখন পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইতে থাকিবে যখন ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট সময়ে এক নূতন জগৎ তাহার সমুদয় শক্তিসামর্থ্য লইয়া পুরাতন জগতের উদ্ধার ও মুক্তির জন্য কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিবে।"

এই প্রতিজ্ঞাঘোষণা বীর জাতির যোগ্য। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যোদ্ধার সংখ্যা বাড়ান হইতেছে, তাহাদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কারখানাসমূহে অস্ত্রশস্ত্র ও এরোপ্লেন নির্মাণ চলিতেছে। আগে আগে

স্থলযুদ্ধে অশ্বারোহী সৈন্যদের সাহস ও রণদক্ষতার তারতম্যের উপর জয়-পরাজয় অনেকটা নির্ভর করিত। এখন স্থলযুদ্ধে যন্ত্রারূঢ় বাহিনীর (mechanized troops) ও সাঁজোআ গাড়ীর (tanks) কার্যকারিতা অধিক। জার্মেনী যে যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে, তাহার অন্যতম কারণ তাহার বৃহত্তর ও প্রবলতর যন্ত্রসজ্জা। তাহার উপর জার্মেনী তাহার স্থলসৈন্যের সহায় ও রক্ষক হিসাবে বোমাবর্ষী বিমানবাহিনী ব্যবহার করিতেছে। ডাঙার ফৌজ ও আকাশের বাহিনীর একযোগে কার্যের ফলে জার্মেনী অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। যন্ত্র উদ্ভাবন ও নির্মাণে এবং নূতন নূতন রণকৌশল অবলম্বনে জার্মেনী পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বুঅর যুদ্ধে প্রথম প্রথম কতকটা এই কারণে বুঅরদের জিৎ হইয়াছিল; ইংরেজ সেনাপতিরা কেতাবী রণকৌশল অনুসারে যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু বুঅর নেতারা নিজেদের উদ্ভাবিত কৌশল অনুসারে লড়িতেছিলেন।

বর্তমান যুদ্ধে মিত্রশক্তিদ্বয়ের সেনাপতিদিগকে কেতাবী শিক্ষা অপেক্ষা নিজ নিজ সামরিক প্রতিভার উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে, এবং শক্তিদ্বয়কে যন্ত্রসজ্জা উৎকৃষ্টতর ও বৃহত্তর করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহারা মন দিয়াছেন।

জার্মেনী একজন মানুষের হুকুমে চলিতেছে বলিয়া তাহার ক্ষিপ্রকারিতা অধিক। যাহা করিবার, জার্মেনী তাহা অতি দ্রুত করিতেছে। মিত্রশক্তিদ্বয়কে ক্ষিপ্রকারিতায় অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। এ বিষয়ে তাঁহারা অবহিত হইয়াছেন।

জার্মেনীর এ পর্যন্ত জয়ের একটি অনুমিত কারণ এই যে, ব্রিটেন বা ফ্রান্স কেহই বোধ হয় প্রথম প্রথম বুঝিতে বা অনুমান করিতে পারেন নাই, যে, জার্মেনী যুদ্ধের কিরূপ বিরাট ও উৎকৃষ্ট আয়োজন করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধির নানা সর্ত দ্বারা জার্মেনীকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহারই ফলবত্তায় বোধ হয় তাহারা বিশ্বাসবান ছিল। এখন তাহারা বুঝিয়াছে যে, জার্মেনী পঙ্গু হয় নাই, বরং অধিকতর সংগ্রামসমর্থ হইয়াছে। এই বোধ অনুসারে ব্রিটেন ও ফ্রান্স নূতন উদ্যমে বৃহত্তর আয়োজন করিতেছে। আমাদের ধারণা, শেষ পর্যন্ত তাহারা জিতিবে।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, দানবের মত শক্তি থাকা ভাল কিন্তু তাহা দানবের মত ব্যবহার করা ভাল নয়। জার্মেনী আসুরিক শক্তি অর্জন করিয়া জগদ্বাসীকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু আসুরিক শক্তি বর্বরের মত প্রয়োগ করিয়া সে জগতের অধিকাংশ দেশের নিন্দাভাজন হইয়াছে।

—

সমুদ্রপারের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধায়োজন

প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল তাঁহার ৪ঠা জুনের বিবৃতির উপসংহারে, ব্রিটেন জার্মেনীর দখলে আসিলেও (যাহা আসিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না), সাগরপারের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্রিটিশ রণতরীর সাহায্যে যুদ্ধ চালাইতে থাকিবে বলিয়াছেন। তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য নহে। কিন্তু যুদ্ধ চালাইতে হইলে সাগরপারের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমরায়োজন যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমীনিয়নগুলির আপেক্ষিক ধনশালিতা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক। অর্থের দ্বারা যাহা হইতে পারে, সেরূপ যন্ত্রসজ্জা ও অস্ত্রসজ্জা তাহারা করিতে পারিবে। তাহারা স্বশাসক বলিয়া যাহা আবশ্যক মনে করে, তাহা যথাসাধ্য করিতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের লোকবল যথেষ্ট নহে। বর্তমান য়ুরোপীয় সংগ্রামে অভূতপূর্ব লোকক্ষয় হইতেছে। শুধু ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধেই জার্মেনীর হতাহতের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং সাগরপারের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইলে তাহার যে অংশ সর্বাপেক্ষা জনবহুল তাহার উপরই অধিকতর নির্ভর করা উচিত। ভারতবর্ষ সেই অংশ। কিন্তু শুধু ফ্ল্যাণ্ডার্সেই যত সৈন্য হতাহত হইয়াছে, ভারতবর্ষের সিপাহী ও গোরা সৈন্য তত নাই। প্রধান সেনাপতির ঘোষণা অনুসারে আরও এক লক্ষ সিপাহী বাড়াইলেও ভারতের যোদ্ধৃসংখ্যা পাঁচ লক্ষ হইবে না। অতএব আরও অনেক বেশী লোককে সেনাদলে ভর্তি করা উচিত। সৈন্য সকল প্রদেশ হইতে লওয়া উচিত। ন্যায়সঙ্গত নীতি অনুসারে কাজ

করিতে হইলে ইহা করা উচিত, সকল প্রদেশের লোক-দিগের সন্তোষ উৎপাদন ও বিশ্বাস অর্জন করিতে হইলে ইহা করা উচিত, এবং ভারতবর্ষের সৈন্যসংখ্যা তাহার মোট লোকসংখ্যানুযায়ী বৃহৎ করিতে হইলে ইহা করা উচিত।

ভারতবর্ষের সাঁজোআ গাড়ী ও অন্যান্য যন্ত্রসজ্জাও খুব বাড়ান আবশ্যক। ভারতবর্ষের সামরিক শক্তি যথাসম্ভব বাড়াইতে হইলে এবং তাহা মিত্রশক্তিদের কাজে লাগাইতে হইলে আর একটি সর্ত পালন একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ স্বশাসক ও স্বাধীন হইতে দেওয়া আবশ্যক। নতুবা মিত্রশক্তিদ্বয়কে সাহায্য করিবার যে উৎসাহ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের (U. S. A.র) পক্ষে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির পক্ষে স্বাভাবিক, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক হইবে না। স্বাভাবিক উৎসাহ ব্যতিরেকে যথাসম্ভব শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটে না।

ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে স্থলযুদ্ধের আয়োজনই যে খুব বাড়ান উচিত তাহা নহে, আকাশযুদ্ধের আয়োজনও খুব বাড়ান আবশ্যক। বর্তমান যে-কোন যুদ্ধে বিমানবাহিনী অত্যাবশ্যক। সরকারী উক্তি হইতে জানা গিয়াছে যে, ভারতে ইহা বর্তমানে যেরূপ আছে তাহার চারিগুণ অধিক করা হইবে। তাহা খুব দ্রুত করা উচিত। তাহাও অবশ্য যথেষ্ট হইবে না। প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়া ভারতবর্ষের নিকটতম এবং তাহার এরোপ্লেনের সংখ্যা খুব বেশী। ভারতবর্ষের এরোপ্লেনের সংখ্যা যথেষ্ট করিতে হইলে, এরোপ্লেন নির্মাণের জন্য কারখানা এদেশে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক ও উচিত। বাহির হইতে কিছু আনিবার জলপথ ভবিষ্যতে সর্বদা সকল অবস্থায় অবাধ থাকিবে এরূপ আশা করা যায় না।

ভারতবর্ষের রণতরীসমূহের সংখ্যাও খুব বাড়ান আবশ্যক। কিন্তু এক-একটি রণতরী নির্মাণের ব্যয় অত্যন্ত অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা যথাসম্ভব বাড়াইতে হইবে। রণতরী-নির্মাণে অনেক সময় লাগে। এই জন্য এই কাজ অবিলম্বে আরব্ধ হওয়া আবশ্যক।

সকল দিকে ভারতবর্ষের সমরায়োজন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটা আপত্তি সহজেই মনে আসিবে। ভারতবর্ষ গরীব দেশ, এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? ভারতবর্ষ প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদ সত্ত্বেও যে দরিদ্র, ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ শাসন তাহার জন্য কম দায়ী নহে। ভারতবর্ষ হইতে নানা ভাবে নানা উপায়ে ব্রিটেনে প্রভূত ধন গিয়াছে, ঋণশোধস্বরূপ তাহার কতকটা অংশ ভারতবর্ষকে ফিরাইয়া দিলে, সেই ন্যায্য ব্যবহার দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নহে, ব্রিটেনও উপকৃত হইবে।

—

অহিংসাপন্থীরা কি করিতে চান

ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার ও স্বাধীন রাখিবার নিমিত্ত অহিংসাপন্থীরা ঠিক্ কি করিতে চান, বর্তমান যুদ্ধে তাঁহারা মিত্রশক্তিদ্বয়কে ঠিক্ কি ভাবে সাহায্য করিতে চান, তাহা আমরা অবগত নহি। তাঁহাদের মতকে আমরা লঘুচিত্ততার সহিত উপেক্ষা করি না। আমাদের মনে তাহার প্রতি কোন তাচ্ছিল্যের ভাব নাই। আমাদের ধারণা, তাঁহাদের মত যাহা, ভবিষ্যতের আদর্শ তদনুসারেই গঠিত হইতেছে ও হইবে। কিন্তু প্রধান অহিংসাপন্থী মহাত্মা গান্ধী এক সময় বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় সৈন্যদলবিহীন ভারতীয় রাষ্ট্র তিনি কল্পনা করেন না বা করিতে পারেন না। তাঁহার কথাগুলি ঠিক্ মনে নাই। কিন্তু তাহার এইরূপ তাৎপর্য আমাদের মনে আছে যে, তিনি পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় স্বাধীন ভারতবর্ষের সৈন্যদল থাকা আবশ্যক হইবে মনে করেন। যখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ গান্ধীজীর অনুচর কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত হইত, তখন তাহার একাধিক প্রদেশে যুদ্ধশিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইতেছিল।

আমরা সম্পূর্ণ অহিংসাপন্থী নহি। আমরা যে ভারতবর্ষের পূর্ণ সমরসজ্জা চাহিতেছি, তাহা অহিংসার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক বিরোধিতাবশতঃ নহে।

সমরসজ্জাবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা যে মরণের পথ তাহা আমরা জানি। সে বিষয়ে পরে কিছু লিখিব।

—

মালদহ হিন্দু সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ

এক-একটি জেলায় যে হিন্দু সম্মেলন হইতেছে, তাহা

হইতেও সমগ্রভারতীয় হিন্দু মহাসভার মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষতঃ যখন কোন প্রতিষ্ঠাবান্ নেতা তাহার সভাপতির কাজ করেন। মালদহ জেলা হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণের চুম্বক ইউনাইটেড প্রেস্ নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন।

মালদহ ১লা জুন

মালদহ জিলা হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি স্তর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে একটি শক্তিশালী হিন্দু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্ত আবেদন জানান। আবেদনক্রমে তিনি ইহাও বলেন যে, বাংলার হিন্দুদিগকে তাঁহাদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্ত সমস্ত বিবাদ-বিরোধ বিস্মৃত হইয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। হিন্দুদের সমস্তাসমূহ সম্বন্ধে কংগ্রেস যে পথে চলিতেছে, স্তর মন্মথনাথ তাহার সমালোচনা করিয়া বলেন মুসলমান বা অন্ত কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য নহে। ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার, রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত যে গতিতে প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে হিন্দু স্বার্থরক্ষা করিবার জন্ত হিন্দু সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু যদি তাহার স্বার্থ ত্যাগ করে, জাতির জীবনমরণ প্রশ্নে হিন্দু যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান মিলন হইতে পারে না। ন্তায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সর্ত্তের উপরই কেবল হিন্দু-মুসলমানের স্থায়ী মিলন সম্ভব।

ভারত বিভাগের কথা তুলিয়া স্তর মন্মথনাথ বলেন যে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র হইয়া যাওয়ার এই পরিকল্পনাই হিন্দুদের পক্ষে অবিলম্বে হিন্দুসংগঠন আন্দোলনের সহায়তা করা কর্ত্তব্য, উক্ত পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবার জন্ত নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত।

অতঃপর বক্তা বলেন যে কংগ্রেস কেবল মাত্র দেশের একটি সুসংহত প্রতিষ্ঠানই নহে, ইহা চিরদিন দেশের স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিয়াও আসিতেছে। যতটুকু স্বায়ত্তশাসন দেশ পাইয়াছে, তাহা একমাত্র কংগ্রেসেরই সংগ্রামের ফল। কিন্তু বাংলার হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্ত কংগ্রেস কোন কথা বলে নাই।

সর্ব্বশেষে স্তর মন্মথনাথ বলেন যে, স্বীয় ন্তায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলা দেশের হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।

হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হওয়া যে একান্ত আবশ্যক এবং এই প্রয়োজন যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত নহে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু সংঘবদ্ধতার জন্য সর্বাগ্রে যে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করা এবং ভিন্ন ভিন্ন জা'তের (casteএর) উচ্চনীচতাসূচক সমাজ-ব্যবস্থা ও তদনুযায়ী বিশ্বাস বিলুপ্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা হিন্দু মহাসভার সকল নেতা মর্মে মর্মে অনুভব করেন কি না, তাহা তাঁহারাই ভাবিয়া দেখুন। যদি করেন, তাহা হইলে তাহা আশাপ্রদ।

মালদহ হিন্দু সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

দুই দিন অধিবেশনের পর মালদহ হিন্দু সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে :—

হিন্দুদের চরম লক্ষ্য পূর্ণ-স্বাধীনতা-লাভের সোপানস্বরূপ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাব এই সভা করিতেছে।

অপর একটি প্রস্তাবে সৈন্য-বিভাগে ভারতীয় গ্রহণের ব্যবস্থা অবিলম্বে করিবার জন্ত সভা গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত জাতীয় বাহিনী গঠনের দাবী জানাইয়াছেন। প্রদেশের যে-কোন স্থানে কোন গোলযোগের উদ্ভব হইলে যাহাতে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ যাইতে পারে, তজ্জন্ত প্রত্যেক জেলায় রক্ষী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও তাহাদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হিন্দুদিগকে করিতে বলা হইয়াছে এবং হিন্দু যুবকগণ যাহাতে দলে দলে এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে যোগ দেয় তজ্জন্ত তাহাদের অনুরোধ করা হইয়াছে।

সভা কর্পোরেশনে মুসলিম লীগের সহিত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের চুক্তির নিন্দা করিয়াছে এবং বসু-লীগ-চুক্তি হিন্দুর জাতীয়তা ও ন্যায়গত স্বার্থ ও অধিকারের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

লীগ-পরিকল্পিত "পাকিস্তানের" প্রস্তাবে উষ্মা প্রকাশ করিয়া সভা উক্ত জাতীয়তাবিরোধী হীন পরিকল্পনাকে বাধা দিবার জন্ত সকল হিন্দুকে মহাসভার পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্ত আহ্বান করিয়াছে, কারণ উক্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে ভারতের জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিকতার সমাধিলাভ হইবে।

হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে মালদহের হিন্দুদের যে শোচনীয় দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে সভা তাহার জন্ত গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে, এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি সম্বন্ধে অভিযোগ মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে করা হইয়াছে।

(১) হিন্দুদের শোভাযাত্রা, সংকীর্তন ও অন্যান্য ধর্মকার্যে বাধা দান।

(২) হিন্দু ও মুসলমানদের শোভাযাত্রায় লাইসেন্স দানে পার্থক্য প্রদর্শন।

(৩) সরকারী চাকুরীতে নিয়োগে মুসলমানদের অধিকতর সুবিধা দান।

(৪) হিন্দুদের বয়কট করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা।

(৫) স্কুলে হিন্দু ছাত্রদের চিরপ্রচলিত ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে আপত্তি প্রকাশ।

(৬) ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ সালিশী বোর্ড এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে হিন্দু প্রতিনিধি-প্রেরণে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ।

(৭) জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে গবর্মেণ্টের উপেক্ষা; কারণ মালদহ জেলার লোকসংখ্যানুপাতে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা কিঞ্চিদধিক তিন জন হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি গবর্মেণ্টের কোন লক্ষ্য নাই।

(৮) নবাবগঞ্জের অন্তর্গত হাজরাপুর গ্রামে মহানন্দা নদীর বন্যায় ধ্বংসলীলা হইতে হিন্দুদের রক্ষার ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীর উদাসীনতা।

হিন্দুদের উক্ত অভাব-অভিযোগগুলির প্রতিকার করিতে সভা হক-মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনুরোধ করিয়াছেন।—ইউ. পি.

—

দমননীতির ব্যাপক প্রয়োগ

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বহু কৃষক ও শ্রমিক নেতা এবং অন্যবিধ নেতা নানা প্রকারে দণ্ডিত হইতেছেন। অন্য দিকে কিন্তু যাহাতে দেশে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে সন্তোষের উদ্রেক ও বিস্তার হয়, গবর্মেণ্ট সেরূপ কোন নীতি অবলম্বন করিতেছেন না।

—

খাকসাররা কি নাৎসী অনুচর ?

পঞ্জাবে নাকি এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে মনে হয়, খাকসাররা নাৎসী-প্রভাব অনুসারে চলিতেছে এবং তাহাদের আর্থিক সচ্ছলতা জার্মান সাহায্য প্রাপ্তির ফল। আদালতে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

খাকসার প্রচেষ্টার সমুদয় ব্যবস্থা যে সামরিক এবং তাহার উদ্দেশ্য যে প্রথমে ভারতবর্ষে ও পরে সমুদয় পৃথিবীকে মুসলমান-প্রভুত্ব স্থাপন, তাহা এক জন যথেষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট লেখক জুন মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে দেখাইয়াছেন।

—

আসামের লাইন-প্রথা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

আসামের লাইন-প্রথা সমস্যার সমাধানকল্পে তথাকার রাজস্বসচিবের উদ্যোগে পরিষদের সদস্যদের যে সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আসাম-প্রবাসীদিগের জনমত এখনও জানা যায় নাই।

—

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

সম্প্রতি মেদিনীপুরে তথাকার সাহিত্য-পরিষদের উৎসব উপলক্ষ্যে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু 'ঐতিহাসিক' আলোচনা হইয়াছিল, দৈনিক কাগজে এইরূপ দেখিয়াছি। বঙ্গে এই আধুনিক ভারতীয় চিত্র-কলার সূত্রপাত সম্বন্ধে লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে গিয়া কেহই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বাদ দিতে পারেন না। অতএব, তিনি ইহার উদ্ভব সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা আধুনিক ইণ্ডিয়ান আর্টের কোন তথ্যপ্রিয় ঐতিহাসিক কিংবা অ-বিশেষজ্ঞ বক্তা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি সন ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'শান্তিনিকেতন পত্রে' লিখিয়াছিলেন, **"বাংগলার কবি (রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত করেন,** বাংগলার আর্টিস্ট (অবনীন্দ্র-নাথ) সেই সূত্র ধ'রে একলা একলা কাজ ক'রে চল্লো কত দিন—"। অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত "গোল্ডেন বুক অব্ টাগোর" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত হইয়া আছে।

'প্রবাসী' আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কিঞ্চিৎ সেবা করিয়াছে। নূতন কিছু কেহ করিলে কাহাকেও না কাহাকেও তজ্জন্য কটু উক্তি সহ্য করিতে হয়। 'প্রবাসী'র সেবা অন্ততঃ এইটুকু, যে, সে তাহা সহ্য করিয়া অপর সকলকে সেই অপ্রিয় কর্তব্য পালনের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই ব্যাপারটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জবানি বর্ণিত হওয়া ভাল।

১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে প্রবাসীর ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় যাঁহারা আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিঠি ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিঠি লিখিয়াছিলেন:—

ছেলেদের জন্যে বই লিখি কিন্তু সে-বই ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেবার ভারও নিজে নিতে হয়। শুধু এই নয়, ব্লক তৈরি করাতে ছুটতে হয় ফিরিঙ্গীর কাছে! হাফ্‌টোন এবং ত্রী-কলার বলে' দুটো জিনিবই তখন ছাপাখানা থেকে অনেক দূরে অজ্ঞাতবাস করছে। সেই সময়ে রামানন্দ-বাবুর মাথায় খেয়াল উঠলো সচিত্র প্রবাসী প্রকাশ

করার। আমি তখন আছি এলাহাবাদে চার্চ-রোডে জজ সাহেবের বাংলায়, আর রামানন্দ-বাবু থাকেন ভরদ্বাজ-আশ্রমের কাছাকাছি আর-একটা বাসায়—দুজনেই প্রবাসী আমরা! ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণি-বাবু তখন নতুন নতুন ছাপাখানাটা সুরু করেছেন। এক জন হিন্দুস্থানী চিত্রকর সে ছবি আঁকে বই সাজাতে। **বাংলার চিত্রকর সবাই ভবিষ্য অবস্থায় তখন,** কেবল সকাল হচ্ছে মাত্র। সেই সচিত্র মাসিক পত্রের আরম্ভের যুগে সেই সময়ে রামানন্দ-বাবুর দুঃসাহসে ভর করে' প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার দেখা দেবার আয়োজন আরম্ভ হ'য়ে গেল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা বার করার স্বপ্ন অনেক দিন এসেছিল আমাদের অনেকের মনে, কিন্তু সে পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের বিষয়ে সন্দেহ নিয়েই আসতো ভাবনাটা। তাই রামানন্দ-বাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলেম, কাগজটা চালাতে গিয়ে শেষ না বিপদে পড়েন! সেই প্রবাসী আর আজকের প্রবাসী সমান ভাবে চলে' এল, নতুন নতুন আর্টিষ্ট এল ছবি দিতে 'প্রবাসী'তে! এ যে হ'ল তার জন্যে দায়ী আমি নয়, রামানন্দ-বাবু। **নতুন বাংলার আর্টিষ্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর আলবমে তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হ'তে হয়েছে;** আর আমরা আর্টিষ্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপতো ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দ-বাবু? কোথায় ছিল তখন * "—", কোথায় "—", কোথায় "—", কোথায় বা "—"র পুরস্কার! প্রবাসীর সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বিনামূল্যে দেওয়া এবং নেওয়া সম্পর্ক বহু বৎসর আগে সেই প্রবাসে স্থির হ'য়ে গেছে। এখনকার আর্টিষ্ট তারা কেউ সত্যিই আমার ছাত্র—কেউ ছাত্র না হ'য়েও ঐ নামে চলে' যায়। সবাইকে প্রবাসী বিনা খরচে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সুতরাং তাদের সবার হ'য়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর আমার নিজের দিক্ থেকে বল্‌ছি, শোভন কীর্ত্তি তোমার হউক।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার উৎসাহদাত্রী বলিয়া যাঁহারা ভগিনী নিবেদিতার নাম করেন তাঁহারা ঠিক্ই করেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের নহে, অন্যান্য দেশেরও ললিতকলার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলার নূতন পর্য্যায়ের উৎকর্ষ বুঝিতে ও মর্ম্মজ্ঞ হইতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুমূর্ষু শাহজাহান" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিত্রের ব্যাখ্যা তিনি 'মডার্ণ রিভিয়ু'তেই করিতেন। কারণ, ঐ সকল চিত্রের বহুবর্ণ প্রতিলিপি ইংরেজী মাসিক কাগজের মধ্যে একমাত্র উহাতেই ছাপা হইত (এবং এখনও উহাতেই হয়)। অতএব ভারতীয় চিত্রকলার সেবক বলিয়া ঐ ইংরেজী মাসিকেরও নাম করিলে সত্যের অপলাপ হয় না। ভগিনী নিবেদিতা মডার্ণ রিভিয়ুতে অজন্টা গুহাবলীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

* নামগুলি বাদ দিলাম। প্রবাসীর সম্পাদক।

—

আমাদের বিরুদ্ধে 'ফরোআর্ড ব্লক' কাগজের অভিযোগ

গত ১৮ই মে তারিখের 'ফরোআর্ড ব্লক' কাগজের একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যের গোড়ায় আছে :—

"Sj. Ramananda Chatterjee, the esteemed editor of the *Modern Review,* has a well-deserved reputation for fairness and balanced judgment. It was, therefore, a painful surprise to us to find him levelling a grave charge against us which has absolutely no foundation in truth. In the course of a statement on the unfortunate happenings in a recent meeting at the Town Hall, Sj. Chatterjee incidentally remarked that we support the Pakisthan scheme of the Muslim League."

মন্তব্যটির শেষে আছে :—

"Sj. Chatterjee, we maintain, had no justification in making that damaging statement about us in a huff and for the sake of sheer justice he should now unreservedly withdraw it."

টাউন-হলের উল্লিখিত সভা সম্বন্ধে আমরা জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসীতে' কিছু লিখিয়াছিলাম, 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে নহে। লিখিয়াছিলাম :—

"মুসলিম্ লীগের সহিত চুক্তি যাহাদের দ্বারা হইতে পারে, ঐ লীগের পাকিস্তান-পরিকল্পনার কার্য্যতঃ প্রাণপণ বিরোধিতা তাহাদের দ্বারা হইবার সম্ভাবনা কম, সম্পূর্ণ বা অন্ততঃ কিছু রক্ষা বরং সম্ভবপর। তাহার লক্ষণও কিছু দেখা গিয়াছে। সুভাষবাবুর ফরোআর্ড ব্লক কাগজে 'কমনসেন্স' ছদ্মনামধারী এক ব্যক্তি যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে পাকিস্তানের পরোক্ষ যাকাই আছে।" ২৪৩ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা সত্য বলিয়া মনে করি। সুতরাং তাহা প্রত্যাহার করিতে পারি না। আমরা এরূপ কথা লিখি নাই, যে, 'ফরোআর্ড ব্লক' পাকিস্তান-পরিকল্পনা সমর্থন করেন। লিখিয়াছিলাম,

তাহার সহিত কিছু রফার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, এবং উক্ত কাগজের একটি প্রবন্ধে তাহার **পরোক্ষ** সাফাই আছে। তাহা যে নাই, এ-কথা স্পষ্টতঃ 'ফরোআর্ড ব্লক' বলেন নাই; বলিয়াছেন, কোন কাগজের কোন প্রবন্ধ-লেখকের মত অবশ্যই তাহার সম্পাদকের মত, এমন বলা যায় না। সত্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নাম দিয়া না লিখিয়া ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখিলে সম্পাদকীয় চিন্তাধারার সহিত তাহার অনেকটা মিল থাকিলে সাধারণতঃ তাহা ছাপা হয় নতুবা সচরাচর হয় না। আমাদের অভিজ্ঞতা এইরূপ।

'ফরোআর্ড ব্লকে'র আলোচ্য সম্পাদকীয় মন্তব্যটিতে ইহাও লিখিত হইয়াছে, যে, ঐ পত্রিকা একাধিক বার পাকিস্তান-পরিকল্পনার নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং টাউন-হলের মীটিঙে সুভাষবাবুর সহচরেরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সুভাষবাবু তো কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন আইনেরও বিরোধিতা বাক্যে করিয়াছিলেন, কার্যে কি করিতেছেন? কোন কোন প্রকার রাজনীতিকদের প্রকৃত মত কি, এবং কোন্‌টা চাল মাত্র, তাহা স্থির করা সহজ নয়। হিন্দু মহাসভা যে পাকিস্তান-পরিকল্পনার একান্ত বিরোধী, তাহার প্রমাণ এই, যে, উহার নিখিল ভারতীয়, প্রাদেশিক এবং জেলা কন্‌ফারেন্সসমূহে তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতেছে। সুভাষবাবুর দলের সমুদয় সভায় যদি তাহা হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও হয়, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিব এই দল বাস্তবিক পাকিস্তানের বিরোধী এবং 'কমন্ সেন্স'-লিখিত প্রবন্ধে পাকিস্তানের যে পরোক্ষ সমর্থন আছে, তাহা সুভাষবাবুর দলের প্রকৃত মতের বিরোধী। আমরা "হক্‌"-গ্রস্ত হইয়া লিখি না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিখি।

'প্রবাসী'র পূর্বোক্ত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যারই নিম্নমুদ্রিত মন্তব্যটি 'ফরোআর্ড ব্লক'-এর সম্পাদক বোধ হয় পড়েন নাই।

"এই সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, যে, সুভাষবাবুর ফরোআর্ড ব্লক কাগজে 'কমন সেন্স' কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধগুলিতে পাকিস্তানের পরোক্ষ সাফাই আছে। উক্ত লেখকের তৃতীয় প্রবন্ধটি বাহির হইবার আগে এই মন্তব্য লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তৃতীয় প্রবন্ধে অন্তবিধ উপকরণও অনেক আছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সংখ্যালঘু জাতিসমূহ সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানের বর্ণনা এই প্রবন্ধটিকে মূল্যবান্ করিয়াছে। তিনটি প্রবন্ধই পঠনীয়।"

—

দীনবন্ধু এণ্ডরূজের স্মৃতিরক্ষা প্রচেষ্টা

দীনবন্ধু এণ্ডরূজ সুপণ্ডিত, সুলেখক, ত্যাগী, মানব-প্রেমিক, দরিদ্রের বন্ধু, এবং ভারতভক্ত ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা সর্বথা সমর্থনযোগ্য। বিশ্বভারতীর সম্পর্কে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার যে পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবেদন কয়েকটি দৈনিকে ও সাপ্তাহিক 'হরিজন' কাগজে দেখিয়াছি, তাহার তিনটি অঙ্গ আছে। (১) শ্রীনিকেতনে প্রয়োজনীয় সমুদয় সরঞ্জামবিশিষ্ট অস্ত্রোপচার-কক্ষ-সমন্বিত একটি হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণ, (২) বীরভূম জেলার সর্বাপেক্ষা জলাভাবক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে 'দীনবন্ধু কূপ' খনন, (৩) খ্রীষ্টের উপদেশ ও চরিত্র অনুশীলন এবং সার্বজাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানার্থ তাহার প্রয়োগকল্পে শান্তিনিকেতনে একটি খ্রীষ্টীয়-সংস্কৃতি-ভবন নির্মাণ ও পরিচালন। এতদর্থে যে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা সহানুভূতিসম্পন্ন ভারতীয় ও বিদেশী লোকদের নিকট হইতে চাওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা আবেদনটিতে বলা হইয়াছে। তাহা, বর্তমানে বিশ্বভারতীর যে-সকল কাজ চলিতেছে তাহার স্থায়িত্ববিধান ("ensuring the permanence of the present established work")। ইহাও খুব প্রয়োজনীয়। ইহাকে পরিকল্পনাটির চতুর্থ অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

এই চারিটি অঙ্গের কোন্‌টির আপেক্ষিক গুরুত্ব কিরূপ, তাহা নিরূপণের চেষ্টা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, হাসপাতালটি স্থাপন ও কূপ-খনন সর্বাপেক্ষা জরুরী, এবং এই দুটির দীনবন্ধুতা সর্বাপেক্ষা সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে বোধ্য। জগতের বর্তমান বিক্ষুব্ধ অবস্থায় পাঁচ লক্ষ টাকা শীঘ্র পাওয়া না যাইতেও পারে। কিন্তু হাসপাতাল ও কূপের জন্য আবশ্যক কয়েক হাজার টাকা অপেক্ষাকৃত সহজে ও শীঘ্র পাওয়া যাইতে পারে। এই সব কারণে

উদ্যোক্তাদের নিকট আমাদের নিবেদন, হাসপাতাল ও কূপখননের জন্য আবশ্যক অর্থের একটি আনুমানিক পরিমাণ তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দৈনিক কাগজগুলির সাহায্যে জ্ঞাপন করুন। তাঁহাদের আপত্তি না থাকিলে, খ্রীষ্টীয়-সংস্কৃতি-ভবনের জন্য আনুমানিক কত টাকা আবশ্যক এবং বিশ্বভারতীর বর্তমান কাজগুলির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য কত তাঁহারা রাখিতে চান, তাহারও আনুমানিক পরিমাণ এই সঙ্গে জানাইলে ভাল হয়।

উদ্যোক্তাদের মনঃপূত হইলে, ইহাও বিজ্ঞাপিত হইলে ভাল হয়, যে, যে-কোন দাতা ইচ্ছা করিলে সমুদয় অঙ্গের বা কেবল একটি বা দুইটি অঙ্গের নাম করিয়া টাকা দিতে পারেন।

উদ্যোক্তাদের অবগতির নিমিত্ত আমাদের এই নিবেদন আমরা ইংরেজীতেও করিব।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও ঔপনিবেশিক ভারতীয়গণ

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ মহোদয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তাঁহার হৃদয়ের কথা যেরূপ জানিতেন, আমরা তাহা না জানিলেও তাঁহার বাহ্য কর্মশীল জীবনের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রাদিতে যেরূপ পড়িয়াছি, তাহা হইতে আমাদের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, যে, ভারতবর্ষের বাহিরে নানা ব্রিটিশ ও অন্য য়ুরোপীয় উপনিবেশের অধিবাসী ভারতীয়দের দুঃখ ও লাঞ্ছনা তাঁহার মর্মে বিঁধিয়াছিল। এই আন্তরিক সমবেদনা তাঁহাকে কত বার কত দূরদেশে লইয়া গিয়াছে, তাহা সংবাদপত্রপাঠকেরা জানেন। অনেক বার তিনি অসুস্থ দেহে বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা জানিয়াও এক বার গিয়াছিলেন। প্রত্যেক সমুদ্রযাত্রায় তিনি সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। সাগরপারের ভারতীয়দের পক্ষ অবলম্বন করাতে তিনি যত দুঃখ পাইয়াছেন ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এমন আর কিছুতে নহে। ব্রিটিশ-গিয়ানা প্রভৃতি হইতে প্রত্যাগত ও মাটিয়াবুরুজে অতি দীন অবস্থায় স্থিত ভারতীয়দের দুঃখ লাঘবের জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিতেন।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হইয়াছে, তাঁহার চরিত্র ও চরিতের এই দিক্‌টির স্মারক কিছু থাকিলে ভাল হয়। গান্ধীজী-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আমরা চাহিতেছি না। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতীয়েরা যদি শান্তিনিকেতনে নিজ ব্যয়ে একটি এণ্ড্রুজ আলয় (Andrews Home) স্থাপন করেন, সেখানে যদি তাঁহাদের সমস্যাসমূহ অনুশীলিত (studied) হয়, এবং সেখানে সাগরপারের দুই-চারিটি ভারতীয় ছাত্রী ও ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহা শোভন হইবে।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের স্মারকরূপে না হইলেও ভারতবর্ষে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। সেই প্রতিষ্ঠান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতিসমূহের মিলনকেন্দ্র বিশ্বভারতীর অন্যতম অঙ্গ হইলে, ব্যবস্থাটি সর্বাপেক্ষা যথাযোগ্য ও শোভন হইবে।

সামরিক আয়োজনের প্রতিযোগিতার মারাত্মক কুফল

জার্মেনী বাইশ বৎসর পূর্বে পরাজিত হইয়াছিল। সে যাহাতে আর মাথা তুলিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও অন্যেরা করিয়াছিল। কিন্তু সে মাথা তুলিয়াছে। বাইশ বৎসর আগেকার যুদ্ধের নিমিত্ত সে যে সমরায়োজন করিয়াছিল, তাহার বর্তমান আয়োজন তার চেয়ে অনেক বড়। গত মহাযুদ্ধে যাহারা জার্মেনীকে হারাইয়াছিল, এবার তাহারা যাহাতে শেষ পর্যন্ত পরাজিত না হয় তাহার নিমিত্ত তাহাদিগকে জার্মেনীর অপেক্ষাও বৃহৎ আয়োজন করিতে হইতেছে। যদি এবারও জার্মেনী হারে, তাহা হইলেই যে সে চিরকাল পরপদানত ও পঙ্গু হইয়া থাকিবে, তাহা থাকিবে না। সে নিজের মহিমায় আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত ও প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত এবারকার চেয়েও বৃহৎ ও উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচায়ক সমরায়োজন করিবে। পরাজয়ের পর হইতে এই চিন্তাই সর্বাভিভাবী হইয়া তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিবে।

ফ্রান্স যদি এবার পরাজিত হয়, তাহা হইলে তাহা ইতিহাসে তাহার প্রথম পরাজয় হইবে না। আগেও সে পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু পরাজয় সত্ত্বেও সে মাথা তুলিয়াছে

এবং জেতা হইয়াছে, সুতরাং এবার সে পরাজিত হইলেই তাহা চিরতরে পরাজয় বলিয়া মানিয়া লইবে না। জার্মেনী অপেক্ষাও বৃহত্তর সমরায়োজন সে করিবে। ফ্রান্সের এই একটা সুবিধা আছে, যে, এংলোস্যাক্সন বা টিউটনদের মত বর্ণ-কুসংস্কার (colour prejudice) বা বর্ণবিদ্বেষ (colour hatred) ফরাসীদের নাই। ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অধীন আফ্রিকার অংশসকলের কৃষ্ণকায়েরা পৌর অধিকারে ফরাসীদের সমান।

গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কোন বহিঃশত্রু ব্রিটেনে নামিয়া তাহার কোন অংশ দখল করিতে পারে নাই। এবার যদি তাহা ঘটে, তাহা হইলেও, মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন, ব্রিটেন হার মানিবে না, সাগরপারের সাম্রাজ্য লইয়া লড়িবে। তাহা পরহস্তগত হইলেই কি ইংরেজরা দাসত্ব মানিয়া লইবে? লইবে না। যে-কোন উপায়ে হউক, বৃহত্তর সমরায়োজন করিতে ব্রতী থাকিবে।

ডেনরা ও নর্থম্যানরা এক সময় এরূপ প্রবল ছিল যে, ডেনরা ইংরেজদিগকে হারাইয়া দিয়া ইংলণ্ডের নানা জায়গায় আড্ডা গাড়িয়াছিল। নর্থম্যান বা নর্ম্যানরা তো ইংলণ্ড জয়ই করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ব্রিটেনের অভ্যুদয় বিস্ময়কর। নর্থম্যানদের দ্বারা সমস্ত উত্তর-ইয়োরোপ উপদ্রুত হইত। সুইডেন নরওএর রাজা গস্টেভস্ এডল্ফস রাশিয়া জয় করিয়াছিলেন। আজ ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতির অবনত অবস্থার সহিত রাশিয়ার শক্তির তুলনা করিলে নানা জাতির ভাগ্যবিপর্যয়ে বিস্মিত হইতে হয়।

নানা জাতির এই যে উত্থান ও পতন, যুদ্ধের দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতে পারে না। সমরায়োজনের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা কতক মানুষকে অসুরে ও অন্য কতক মানুষকে পশুতে পরিণত করিতে পারে, কিংবা মানবজাতির ধ্বংস হইতে পারে। মানব-সভ্যতার যে-সকল অঙ্গ, যে-সকল বিদ্যা ও কলা, মানুষের যে-সকল গুণ মানুষকে জীবজগতে উচ্চতম স্থান দিয়াছে, সামরিক প্রতিযোগিতায় তাহা টিকিতে পারে না। যুদ্ধের বিলোপ হইলেই মানুষ মানবিকতা রক্ষা করিয়া ক্রমোন্নতির সোপান আরোহণ করিয়া চলিতে পারে।

—

নিরপেক্ষদের কর্তব্য

কোন গ্রামের বা শহরের কোন বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে যদি অন্যান্য বাড়ীর লোকেরা মনে করে ও বলে যে, "আমাদের বাড়ী তো আক্রান্ত হয় নাই, আমরা কেন আক্রান্তদের সাহায্য করিতে গিয়া আমাদের উপর ডাকাতদের রাগ টানিয়া আনি?" তাহা হইলে ডাকাতদের দস্যুতাটা অনেকটা সোজা হইয়া আসে, এবং তাহারা প্রশ্রয় ও উৎসাহ পাইয়া পরে অন্যান্য বাড়ীও আক্রমণ করিতে পারে। এই হেতু, প্রতিবেশীধর্ম, মানবিকতা, মৈত্রী প্রভৃতির জন্য না হউক, কোন বাড়ী আক্রান্ত হইলে স্বার্থবুদ্ধি ও আত্মরক্ষার ইচ্ছা হইতেও অন্যান্য বাড়ীর লোকদের আক্রান্ত বাড়ীর সহায় হওয়া উচিত।

বহুশতাব্দী পূর্ব হইতে ধর্মোপদেষ্টা ও মনীষীরা বলিয়া আসিতেছেন, সমুদয় মানবজাতি একটি বৃহৎ পরিবার। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ কবিসুলভ ভাবধারা হইতে প্রসূত উক্তি বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু উচ্চতর বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু ব্যবসাবাণিজ্যেও দেখা যাইতেছে এক-একটা দেশের বাজারদর কেমন অন্যান্য দেশের চাহিদা ও বাজারদরের উপর নির্ভর করে। এক পরিবারের কোন ব্যক্তির সুখদুঃখ যেমন অন্য ব্যক্তিদের সুখদুঃখের সহিত জড়িত, তেমনই এক দেশের ও জাতির সুখদুঃখ অন্যান্য দেশের ও জাতির সুখদুঃখের সহিত জড়িত। শান্তির সময় অপেক্ষা যুদ্ধের সময় ইহা আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। এখন যুদ্ধ হইতেছে ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের ও জাতির মধ্যে। কিন্তু তাহার প্রভাব পৃথিবীর সকল দেশের সকল ব্যাপারে অনুভূত হইতেছে।

এই জন্য, পৃথিবীর কোন দেশ অন্য কোন দেশকে আক্রমণ করিলে, অনাক্রান্ত দেশসমূহের নিরপেক্ষ না থাকিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করা কিংবা আক্রান্ত দেশের সাহায্য করা উচিত। লীগ অব্ নেশ্যন্সের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিজেদের সাম্রাজ্যরক্ষায় অধিকতর মনোযোগী থাকায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। অন্যায় আক্রমণের সূত্রপাতেই আক্রান্ত দেশের সাহায্য করা অন্য সকল জাতির—অন্ততঃ প্রবল জাতিদের, কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।

জাপানের দ্বারা আক্রান্ত চীনের, ইটালীর দ্বারা আক্রান্ত আবিসীনিয়ার সাহায্য কেহ করে নাই। স্পেনের গবন্মেণ্ট তথাকার বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে উহার গবন্মেণ্টের সাহায্য কোন জাতি করে নাই, ফলে হিটলার ক্রমান্বয়ে অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ডেন্মার্ক, নরোএর অধিকাংশ, হল্যাণ্ড, বেলজিয়মের অধিকাংশ এবং ফ্রান্সের কিয়দংশ অধিকার করিতে পারিয়াছে। যখন ব্রিটেন পোল্যাণ্ডের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, তখন ডেন্মার্ক, নরোএ ও বেলজিয়ম নিরপেক্ষ ছিল, জার্মেনীকে চটাইবার ভয়ে ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা পোল্যাণ্ডের সাহায্য করে নাই। ফিনল্যাণ্ড রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নরোএ তাহার সাহায্য করে নাই কিংবা ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যার্থ ব্রিটিশ সৈন্যাদি নরোএর ভিতর দিয়া যাইতে দেয় নাই। কিন্তু তাহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া কি জার্মেনীর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে? তাহারা আক্রান্ত অন্য দেশের সাহায্য করে নাই, কিন্তু নরোএ ও বেলজিয়ম স্বয়ং যখন আক্রান্ত হইল, তখন অন্যের সাহায্যের আশা করিয়াছিল এবং পাইয়াছিলও। অবশ্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে সম্পূর্ণ পরার্থপর ভাবে এই যুদ্ধে নামিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিদের কর্তব্য। তাহারা জিতিলে তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত অধীন জাতিদিগকে স্বাধীনতা না-দিতে পারে—না-দিবারই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কিছু দিন আগে পর্যন্ত যে-সব দেশ স্বাধীন ছিল বা এখনও আছে তাহারা এরূপ জাতিদের স্বাধীনতা লোপ করিবে না। অন্য দিকে, জার্মেনী জিতিলে কিছু দিন আগে পর্যন্ত যে-সব দেশ স্বাধীন ছিল কিন্তু এখন তাহার অধীন বা অংশতঃ অধীন, তাহাদিগকে সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিবে না, অধিকন্তু আরও অন্য অনেক স্বাধীন দেশেরও স্বাধীনতা লুপ্ত করিবার চেষ্টা করিবে।

একটা কোন দেশ কোন দস্যুজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেই অপর সকল দেশকে যদি আক্রান্ত জাতির সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অনেক স্থলেই হয়ত বিপদ নিজের উপর টানিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু একের বিপদকে সকলের বিপদ মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণ ব্যতীত পৃথিবীকে নিরাপদ করিবার অন্য উপায় নাই। ইস্কুলের ২।১টা গুণ্ডা ছেলের বিরুদ্ধে অন্য ছেলেরা দলবদ্ধ না হইলে, পাড়ার বা গ্রামের ২।৪টা গুণ্ডার বিরুদ্ধে অপরেরা দলবদ্ধ না হইলে সকলকেই অমানুষ হইয়া থাকিতে হয় এবং সকলেরই বিপদ ঘটিতে পারে। পৃথিবীর সব দেশ জাতি ও মানুষ সম্বন্ধেও এই যুক্তিমার্গ প্রযোজ্য।

গ্রাম-পুনরুজ্জীবনের ঐকান্তিক প্রয়োজন

আমরা সবাই জাতিগঠনের কথা বলি। এই যে জাতি, তাহার নিবাস কোথায়? বাংলা দেশের প্রত্যেক ১০০০ (এক হাজার) লোকের মধ্যে কেবল মাত্র ৭৩ জন শহরে বাস করে, বাকী হাজার-করা ৯২৭ জন গ্রামে বাস করে। শহরগুলারও অধিকাংশ গ্রাম। কারণ, যে-সকল লোকালয়ের লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার মাত্র, তাহাদিগকেও শহর বলিয়া ধরা হইয়াছে। সুতরাং ইহা কবি-উক্তি নহে যে, আমাদের জাতি বাস করে গ্রামে।

আমরা যদি বঙ্গে জাতিগঠন করিতে চাই, যদি জাতির উন্নতি করিতে চাই, গঠনমূলক কার্য করিতে চাই, তাহা হইলে গ্রামবাসী হাজার-করা ৯২৭ জন মানুষের কথা ভুলিয়া থাকিলে তো চলিবেই না, প্রত্যুত প্রধানতঃ তাহাদের উন্নতি-সাধনেই আমাদিগকে ব্যাপৃত হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ইহা বহু পূর্বে বুঝিয়াছিলেন এবং প্রথমতঃ নিজের জমিদারীতে গ্রামোন্নতির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন। পরে তিনি বিশ্বভারতীর গ্রামসংস্কার-বিভাগ খুলিয়া সুরুল গ্রামের শ্রীনিকেতনকে তাহার কেন্দ্র করেন। স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া গ্রামের জন্য আত্মোৎসর্গের মহনীয় দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

বাংলার মন্ত্রীদের "জাতিগঠনমূলক" কার্য

বাংলার মন্ত্রীদের 'দি বেঙ্গল উঈকলি' নামক একটি সাপ্তাহিক ইংরেজী কাগজ আছে। উহাতে প্রায়ই "জাতি-গঠনমূলক কার্য" (Nation-building works)-এর

বৃত্তান্ত থাকে। বঙ্গের মন্ত্রীদের অধিকাংশ মুসলিম লীগ দলের সভ্য। মুসলিম লীগ বলেন, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি প্রধান নেশ্যন বাস করে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এদেশে নেশ্যন কেবল একটি। জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহাদের নেশ্যন-বিল্ডিং কাজ কোন্ নেশ্যনের জন্য অভিপ্রেত?

—

আবার কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন

খবরের কাগজে খবর বাহির হইয়াছে যে, বঙ্গের মন্ত্রীরা কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন আবার সংশোধন করিবেন। খবর রটিয়াছে, এই সংশোধনের উদ্দেশ্য দুটা। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা মিউনিসিপালিটির কর্মচারী-নিয়োগের ক্ষমতা কৌন্সিলর ও অল্ডারম্যানদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া গবর্মেণ্টের অর্থাৎ মন্ত্রীদের তাঁবেদার এক পব্লিক সার্ভিস কমিশনের হাতে দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতা মিউনিসিপালিটি এখন বহু লক্ষ টাকার যে বহুবিধ কণ্ট্রাক্ট বা ঠিকা দেন, তাহা দিবার ক্ষমতাও কৌন্সিলর ও অল্ডারম্যানদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া মন্ত্রীরা কার্যতঃ নিজেদের হাতে লইবেন। এই উভয়বিধ ক্ষমতা কার্যতঃ নিজেদের হাতে লইবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কোন কাগজে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলেও "স্বায়ত্তশাসন" এরূপ আইন দ্বারা যে নামে মাত্র পর্যবসিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ আইন সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্মচারী নিয়োগ-প্রথায় যে দোষ ছিল, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টাকেই আরও ফলবতী করিবার উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। কুপোষ্যপোষক ও উৎকোচ-প্রদাতারা যাহাতে প্রশ্রয় পায়, কর্মচারী-নিয়োগ এবং কণ্ট্র্যাক্ট বিলি বিষয়ে এরূপ কোন রীতি অবলম্বন করা অনুচিত।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কার আইন

বাংলা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইতিপূর্বে বঙ্গের মন্ত্রীরা মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে যে বিল আইনে পরিণত করিতে চান বলিয়া খবরের কাগজে একাধিক বার সংবাদ বাহির হইয়াছিল, শিক্ষার সংস্কার তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত একটা বোর্ডের অধীন করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তদ্ভিন্ন, এখন পর্যন্ত হাইস্কুলগুলির উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষমতা আছে, তাহা লোপ বা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করাও অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। আমরা বক্তৃতায় এবং আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে এরূপ বিলের দোষ দেখাইয়া বিরোধিতা করিয়াছিলাম। নূতন বিল প্রকাশিত হইলে তাহারও সমালোচনা করিব।

শিক্ষার কাজে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকান অত্যন্ত গর্হিত। ইহাতে কেবলমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রকেই উৎসাহ দেওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য ও লাভকে প্রধান উদ্দেশ্য করিলে সম্প্রদায়বিশেষের অল্পসংখ্যক লোকের সুবিধা হইলেও সেই সম্প্রদায়ের শিক্ষার কোন উন্নতি হয় না। ইহা বাংলা দেশে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত স্বার্থান্ধ লোকের চোখ ফুটিতেছে না।

—

শ্রীকৃষ্ণের কুৎসা

বঙ্গের মুসলমান মন্ত্রীদের স্টার অব্ ইণ্ডিয়া নামক একটা ফিরিঙ্গী-সম্পাদিত ইংরেজী দৈনিক আছে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কুৎসা করা হইয়াছে। ইহা সাতিশয় নিন্দনীয়। ইহার সম্পাদককে গবর্মেণ্টের শাস্তি দেওয়া উচিত। যে-সব মুসলমান তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধান জানেন এবং সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব রক্ষা করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, এই কাগজটাকে ভৎর্সনা করা তাঁহাদের কর্তব্য।

—

কারারুদ্ধ রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক

ইয়োরোপের যুদ্ধের খবরের বাহুল্যে চীন-জাপান যুদ্ধের খবর চাপা পড়িয়াছে। তাহার উপর বঙ্গের দলাদলি ও বিবৃতি-যুদ্ধ আছে। সুতরাং আমাদের যে-

সকল স্বদেশবাসী রাজবন্দীরূপে জেলে পচিতেছেন, তাঁহাদের কথা এখন কম লোকেই ভাবে। কিন্তু তাঁহাদের মুক্তির জন্য আগে যেমন প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল, এখনও সেইরূপ হওয়া উচিত। বঙ্গের সমুদয় রাজনৈতিক দলের এই আন্দোলন করা কর্তব্য। তদ্ভিন্ন মহাত্মা গান্ধীর এবং কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেও রাজবন্দীদের মুক্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা উচিত।

—

বঙ্গে ট্রেনিং কলেজের অল্পতা

বাংলা দেশের লোকসংখ্যা অন্য যে-কোন প্রদেশের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী। ইহার হাইস্কুলগুলির সংখ্যাও অন্য যে-কোন প্রদেশের হাইস্কুলের সংখ্যার চেয়ে বেশী। কিন্তু বঙ্গে শিক্ষক ও ভাবী শিক্ষকদিগকে শিক্ষণকার্য্য শিখাইবার নিমিত্ত যথেষ্টসংখ্যক কলেজ নাই। কলিকাতায় একটি ও ঢাকায় একটি আছে। তাহাতে অল্পসংখ্যক ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর একটি খুলিতেছেন। এই তিনটি চলিতে থাকিলেও কিন্তু বাংলা দেশ এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হইবে না, যাহা তাহার লোকসংখ্যা ও উচ্চবিদ্যালয়-সংখ্যা অনুসারে তাহার হওয়া উচিত।

মান্দ্রাজ প্রদেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম, তথাকার উচ্চবিদ্যালয়-সংখ্যাও বঙ্গের চেয়ে কম। কিন্তু সেখানে ছয়টি ট্রেনিং কলেজ আছে।

বাংলা দেশে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র ট্রেনিং কলেজের প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা সমর্থনযোগ্য।

—

কলিকাতায় একটি নূতন নারী-কলেজ

নারীদের জন্য কলিকাতায় একটি নূতন কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাহা অনুমোদিত হইয়াছে।

নারীদের উচ্চশিক্ষার ক্রমিক বিস্তৃতি স্বাভাবিক। জ্ঞানের ও বিদ্যার সমুদয় শাখা নারীদের নিমিত্ত উন্মুক্ত থাকা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে নারী-জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষাও তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। পাশ্চাত্য কোন কোন দেশে উচ্চশিক্ষা অনেক উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তা নারীকে বিবাহবিমুখ ও সন্তানপালনবিমুখ করিয়াছে। আমাদের দেশে যাহাতে এরূপ কুফল না ফলে, তাহার উপায় অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ছুটির প্রস্তাব

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উৎসব কয়েক বৎসর হইতে ব্যাপক ভাবে হইতেছে। এ বৎসরও হইয়াছিল। যদি উৎসবের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারে ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার রচনাবলীর পাঠক বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলেই মনে করা যাইতে পারিবে যে, তাঁহার প্রতিভার বোদ্ধা দেশে বাড়িয়াছে। বাঙালীদের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রশস্তি অনেক স্থলে স্বজাতির বড়াইয়ের নামান্তর; যথা—"আমরা এত বড় একটা জাতি যে তাহার এক জন কবি বিশ্ববন্দিত।"

তাঁহার জন্মদিন পালন সম্বন্ধে আমাদের নিকট একটি প্রস্তাব আসিয়াছে যে, তাঁহার জন্মদিন একটি দেশব্যাপী ছুটির দিন বলিয়া ঘোষিত হউক। ইহা হইলে আনন্দের বিষয় হয় বটে; কিন্তু গবন্মেণ্ট তো তাহাতে রাজী হইবেন না। সুতরাং কেবল এই অনুরোধই করা যাইতে পারে, যে, সমুদয় বেসরকারী কলেজ ও বিদ্যালয় এবং অন্য সমুদয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (আপিস আদি) যেন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে বন্ধ রাখা হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া চাই বলিয়া, নানাবিধ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁহার জন্মদিনে বন্ধ রাখার প্রস্তাব সম্বন্ধে দুটা আশঙ্কার কথাও মনে উদিত হইতেছে। যদি কোন বেসরকারী কলেজ বা স্কুলের কর্তৃপক্ষ ঐদিন ছুটি দিতে না-চান, তাহা হইলে তাহার ছাত্রেরা ধর্মঘট করিলে তাহা সাতিশয় অশোভন হইবে। আবার ইহা লইয়া যদি কোথাও হিন্দু ছাত্র ও পাকিস্তানি ছাত্রদের মধ্যে বিবাদ বাধে, তাহাও অত্যন্ত অনিষ্টকর হইবে। এবং উভয়ই কবিকে মর্মান্তিক বেদনা দিবে।

—

"হিন্দুরা আমেরিকার আবিষ্কারক"

সাধারণতঃ এই মতই প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে যে, কোলাম্বাস এবং তাহার আগে কোন কোন য়ুরোপীয় আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের লোকেরা আমেরিকায় গিয়া সেখানে আপনাদের সংস্কৃতি বিস্তার করিয়াছিলেন এরূপ মতেরও কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়া থাকে। সম্প্রতি দিল্লীর শ্রীযুক্ত চমনলাল বহু প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে ইহার অনুকূল অনেক মত, প্রমাণ ও ছবি সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থ লাহোর হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল উপকরণের কিয়দংশ একটি সচিত্র প্রবন্ধের আকারে জুন মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়টি সাতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।

ভূমির ও খাজনার বন্দোবস্ত কমিশন

বাংলা দেশের ভূমির ও ভূমির খাজনার প্রচলিত বন্দোবস্ত পর্যালোচনা ও তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া গবন্মেণ্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবার নিমিত্ত বাংলা-সরকার একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। তাহার সভাপতির নাম অনুসারে তাহা ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্ট সর্ববাদিসম্মত হয় নাই, কয়েক জন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঠিক্ কি উদ্দেশ্যে এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, এরূপ কমিশনের কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত, তাহা বিবেচিত হইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লর্ড কর্ণওআলিসের আমলে যে 'চিরস্থায়ী' বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা এখন আর কালোপযোগী নাই, তাহার কুফল অনেক, অতএব তাহার উচ্ছেদ হইলেই চাষীদের ও দেশের মঙ্গল হইবে। জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদ হইলে তাহার জায়গায় খাস-মহলি-প্রথা প্রবর্তিত হইবে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু খাসমহলসমূহের প্রজাদেরও নানা অভাব-অভিযোগ আছে। গত বৎসর জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে খাসমহলের অত্যাচরিত প্রজাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং মোটামুটি ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে, জমিদারির পরিবর্তে খাসমহল-প্রথার প্রবর্তন বঙ্গের ভূমি ও খাজনাসংক্রান্ত সমস্যাসমূহের চূড়ান্ত সমাধান নহে।

ভূমিতে সর্বাপেক্ষা অধিক শস্য কি প্রকারে উৎপাদিত হইতে পারে এবং উৎপন্ন শস্য বা তাহার মূল্য কি প্রকারে কৃষকদের মধ্যে ও অপর সাধারণের মধ্যে বণ্টিত ও বিতরিত হইলে জাতীয় স্বস্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, ইহাই ভূমিসংক্রান্ত মুখ্য সমস্যা। কি প্রকার বন্দোবস্তে গবন্মেণ্টের আয় বাড়িতে পারে, অদূরদর্শী শাসকেরা ও সরকারের পরামর্শদাতারা তাহাকেই প্রধান সমস্যা মনে করিতে পারে। কিন্তু তাহা গৌণ। জাতির কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি কিসে হইতে পারে, তাহাই মুখ্য প্রশ্ন। আগের একটি প্রসঙ্গে আমরা যে বলিয়াছি, জাতি বাস করে গ্রামে, তাহাও মনে রাখিতে হইবে।

উৎপাদন ও বণ্টন নানা দেশে নানা রীতি অনুসারে হইয়া থাকে। জমি হইতে কি কি উপায়ে অধিকতর ও অধিকতম শস্য উৎপাদিত হইতে পারে, গবন্মেণ্ট সে-বিষয়ে পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, সিন্ধু, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে বাংলা দেশের চেয়ে বহুগুণ অধিক মনোযোগী গত শতাব্দী হইতে হইয়া আসিতেছেন। ঐ সকল প্রদেশে এই বহুগুণ অধিক মনোযোগ দুটি রূপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমতঃ, ঐ সকল প্রদেশে গবন্মেণ্ট অনেক আগে হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত বাংলা দেশ অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক কোটি টাকা জলসেচনের কৃত্রিম পূর্ত-কার্যের নিমিত্ত ব্যয় করিয়াছেন। বঙ্গের জন্য সরকারী এরূপ ব্যয় তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গের বাহিরে একাধিক প্রদেশে অনুর্বর উষর জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সুশৃঙ্খল ব্যাপক চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গে তাহা হইতেছে না। অধিকন্তু, অন্যান্য প্রদেশে নূতন ফসলের প্রবর্তন ও প্রচলিত ফসলের উন্নতিসাধন নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা হয়, বঙ্গে তাহা হয় না। প্রধানতঃ, কৃষিজীবী বঙ্গে আধুনিক সরঞ্জাম ও ব্যবস্থাবিশিষ্ট একটিও কৃষিগবেষণাগার ও কৃষি-কলেজ নাই, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

এই সকল কথা মনে রাখিলে, বাংলা-সরকার হঠাৎ কৃষির উন্নতিকামী ও কৃষককল্যাণকামী হইয়া ফ্লাউড কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস যাহাই করি বা না-করি, চাষীদের ও ভূমিশূন্য ক্ষেতমজুরদের মঙ্গল কিসে হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া গবন্মেণ্ট সমস্ত জমি যদি নিজের আয়ত্ত করেন, তাহার পর কি করিবেন বিবেচ্য। প্রত্যেক চাষী-পরিবারকে এবং ভূমিশূন্যক্ষেত-মজুরপরিবারকে সরকার প্রত্যেকের ভরণপোষণের উপযোগী এক-এক টুকরা জমি দিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু কৃষিবিৎ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা বলেন, বঙ্গে কর্ষিত ও চাষের উপযোগী জমি যত আছে, তাহা এইরূপে ভাগ করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। কিন্তু যদি যথেষ্ট হইত, তাহা হইলেও সমগ্র ভূমির এই প্রকার বহুখণ্ডীকরণ দেশে অধিকতম শস্য উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপায় বিবেচিত হইত না। চাষ সর্বাপেক্ষা অল্প ব্যয়ে ও সর্বাপেক্ষা ফল-দায়ক ভাবে চালাইতে হইলে, বড় বড় ভূখণ্ড আধুনিক নানা কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে চষা, সার দেওয়া ও শস্য আহরণ করা তাহার উপায়। প্রত্যেক চাষী-পরিবার ও ক্ষেতমজুর-পরিবারকে এক-এক খণ্ড জমি দিলে এই উপায় অবলম্বিত হইতে পারে না। অন্য দিকে, রাশিয়ার মত সমষ্টিগত ভাবে জমির চাষ (collectivization) সকল দিক্ দিয়া—বিশেষতঃ চাষীদের স্বাধীনচিত্ততার দিক্ দিয়া, বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। তাহা এ-দেশের উপযোগী কিনা তাহাও বিবেচ্য।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আমরা কিছু আভাস ও সঙ্কেত মাত্র দিলাম।

—

মহারাণা প্রতাপ-জয়ন্তী

প্রতি বৎসর মহারাণা প্রতাপসিংহের যখন জয়ন্তী উৎসব হয়, তখন তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও স্বদেশভক্তি ভারতভক্তদের আশা ও সাহস নবীভূত করে। সর্ব-সাধারণের সম্মিলিত উৎসব বৎসরে একবার মাত্র হয়, যেমন সম্প্রতি কলিকাতার আলবার্ট হলে হইয়া গিয়াছে। তখন সকলে মিলিয়া আমরা তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করি। কিন্তু প্রত্যেক ভারতীয়ের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের বিশেষ কোন দিনক্ষণ নাই। যেদিন যখনই তাঁহাকে মনে পড়ে, তখনই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয় এবং অবসন্ন হৃদয়েও নূতন বলের সঞ্চার হয়।

—

ছাত্রদের শিক্ষাবাহিনীর ২৪-পরগণায় প্রবেশ নিষিদ্ধ

বঙ্গীয় ছাত্র-ফেডারেশ্যনের একটি শাখার কতকগুলি ছাত্র কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে বয়স্ক নিরক্ষর লোক-দিগকে শিক্ষা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া চব্বিশ-পরগণার কতকগুলি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা বিষয়ে লোকদের ইচ্ছার উদ্রেক ও আগ্রহ বাড়াইতে সঙ্কল্প করে। তাহাদের এই সফর আরম্ভ হইবার কয়েক দিন পরেই চব্বিশ-পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম জারি করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে ঐ জেলা ছাড়িয়া যাইতে হইবে এবং (তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে) তথাকার কোন গ্রামে তাহারা ঢুকিতে পারিবে না। এই শিক্ষা-'বাহিনী'র উপর এরূপ হুকুমের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। এই যুদ্ধাতঙ্কের দিনে 'বাহিনী' কথাটা কি ভয়াবহ বিবেচিত হইয়াছে? যে সার্বজনিক শিক্ষা ইংরেজ গবন্মেণ্ট বঙ্গে আগেও দিতে চান নাই এবং বর্তমান মন্ত্রীরাও কার্যতঃ দিতে চাহিতেছেন না, তাহার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত করা কি গবন্মেণ্টদ্রোহিতা ও বঙ্গীয়-মন্ত্রিমণ্ডল-দ্রোহিতা বিবেচিত হইয়াছে?

—

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রীদের কৃতিত্ব

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় পারদর্শিতা অনুসারে শ্রীহট্টের সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী—শ্রীমতী কনক পুরকায়স্থ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ম্যাট্রিকুলেশ্যনে বালিকার প্রথম স্থান অধিকার এই প্রথম। সপ্তম স্থান একটি বালক ও একটি বালিকা অধিকার করিয়াছে। বালিকাটি কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশ্যনের শ্রীমতী লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবম স্থানের অধিকারী চারি জনের মধ্যে দুই জন বালিকা—ভবানীপুরের বেলতলা বালিকা-বিদ্যালয়ের শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত ও শ্রীমতী সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়। বালিকাদের ভাল পাস করা প্রশংসার বিষয় হইলেও আশ্চর্যের বিষয় নহে। তাহাদের বুদ্ধি বালকদের চেয়ে কম নহে। গৃহকর্মে তাহাদিগকে কিছু সময় দিতে হইলেও (যাহা বালকদিগকে সাধারণতঃ দিতে হয় না), তাহাদিগকে বালকদের চেয়ে কম সময় স্বদেশোদ্ধারের হট্টগোল ও সভাস্থলে মারামারি, পতাকাবহন, ফুটবল ম্যাচ দর্শন, ধর্মঘট পরিচালন প্রভৃতিতে ক্ষেপণ করিতে হয়।

—

স্বর্ণময়ী মহিলা বয়ন বিদ্যালয়

মৈমনসিংহের স্বর্ণময়ী মহিলা বয়ন বিদ্যালয় নারীগণকে উপার্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত এগার বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কাপড় বোনা, রঙান, সেলাই প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে শিক্ষা পাইয়া অনেকগুলি মহিলা স্বাবলম্বিনী হইতে পারিয়াছেন। ইহার তত্ত্বাবধায়িকা ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরিকা। সাতিশয় একাগ্রতা, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি বিদ্যালয়টির কাজ চালাইতেছেন। ইহার একটি নিজস্ব বাড়ী হইলে, বাড়ী-ভাড়ার টাকাটা বাঁচে ও সুতরাং ব্যয় কমে এবং বিদ্যালয়টির স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সরকারী লোকেরা ইহা দেখিয়া ইহার কার্য-কারিতার প্রশংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একাধিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক আছেন। বাড়ীটির অর্ধেক ব্যয় গবন্মেণ্ট দিতে রাজী হইয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে বঙ্গের ভূতপূর্ব গবর্ণর এক শত টাকা চাঁদা দিয়াছেন। চাঁদা সংগ্রহের নিমিত্ত একটি কমীটি নিযুক্ত হইয়াছে। সকলে যথাসাধ্য চাঁদা দিলে কাজটি সুসম্পন্ন হয়। চাঁদা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসুকে স্বর্ণময়ী মহিলা বয়ন বিদ্যালয়, মৈমন-সিংহ, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কেবল দুঃস্থ পরিবারের মহিলাদেরই যে উপার্জনক্ষম হওয়া উচিত, তাহা নহে। ভরণপোষণের জন্য যাঁহাদের উপার্জনের প্রয়োজন নাই, তাঁহারাও অর্থকর কোন কাজ

জানিলে তাঁহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সম্মান বাড়ে এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যদেরও ধারণা উচ্চতর হয়। এই জন্য নারীদের এইরূপ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

—

"যাত্রীদল"

হাবড়ায় যুবকদের "যাত্রীদল" নামক একটি সমিতি আছে। অল্প দিন পূর্বে আমি ইহার বার্ষিক সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। এই সভায় পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন উত্তরপাড়ার শ্রীমতী নীলিমা মুখোপাধ্যায়। এই সমিতি রাজনীতি ও ধর্ম ছাড়া সামাজিক আর সব জিনিসের সঙ্গে যোগ রাখেন। যথা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ব্যায়াম, চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলা। ধর্মকে ও রাজনীতিকে ইহাঁরা কিন্তু একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। কারণ গত বৎসরের ইহাঁদের দুইটি বিতর্ক-সভায় আলোচনার বিষয় ছিল—"সার্বজাতিক পরিস্থিতি," "বৈজ্ঞানিকেরা কি নাস্তিক ?" প্রথমটির আলোচনা রাজনীতির আলোচনা ভিন্ন চলে না, দ্বিতীয়টির আলোচনা ধর্মের সারতত্ত্বের আলোচনা ভিন্ন চলিতে পারে না।

এই সমিতি নিজের "যাত্রীদল" নাম কেন রাখিয়াছেন জানি না। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, যাত্রী হইতে হইলে একটি গন্তব্যস্থান, একটি লক্ষ্য থাকা চাই। সেই লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থান জীবনের প্রত্যেক বিভাগের আদর্শ। অনেক আদর্শ আছে—যেমন আধ্যাত্মিক আদর্শ, যাহার দিকে আমরা ক্রমশই অগ্রসর হইতে থাকি, কিন্তু যতই অগ্রসর হই না কেন, কখনও মনে করিতে পারি না যে আদর্শকে বাস্তব জীবনে পরিণত করিয়াছি। অতএব আমরা সবাই অনন্ত পথের যাত্রী।

যাত্রীদল নাম হইতে এই আর একটি উপদেশ পাওয়া যায়, যে, আমাদিগকে দল বাঁধিয়া চলিতে হইবে, সংঘবদ্ধ চেষ্টা করিতে হইবে। কাহাকেও বর্জন করিলে চলিবে না। দলে থাকিবেন, সমাজের সকল বিভাগের ও সকল অংশের লোক। নারী ও পুরুষ, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোক, সকল পেশার, জাতির ও বর্ণের লোক, ধনী ও নির্ধন, 'স্পৃশ্য' ও 'অস্পৃশ্য'—সকলেই যাত্রীদলে থাকিবেন। "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ।"

সমিতির লোকদিগকে আমি আরও বলিয়াছিলাম, যে, রবীন্দ্রনাথের দুটি গান তাঁহাদের নামের বিশেষ উপযোগী—"আগে চল্ আগে চল্ ভাই", এবং "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।"

—

পল্লী-সংস্কৃতিকেন্দ্র ও "উত্তম ফলার"

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসগ্রাম কোদালিয়ায় "রবিবাসর"-এর যে অধিবেশন হয় তাহার বৃত্তান্তে দেখিলাম ঐ অঞ্চলের অনেকগুলি গ্রাম সেকালে সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। কয়েকটি গ্রামের নাম কোদালিয়া, চাংড়িপোতা, হরিনাভি, রাজপুর,...। এই সমুদয় গ্রামের সহিত যে-সকল বিদ্বানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের নাম দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রমানাথ সরস্বতী, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ, তারাকুমার কবিরত্ন, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য,...।

রবিবাসরের এই অধিবেশনটির বৃত্তান্তের একটি অংশ পড়িলে যদিও "ঘ্রাণে অর্ধভোজন"ও হইবে না, তথাপি বিনি পয়সায় কাল্পনিক ভোজের সুখ পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাটী ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্মস্থান পরিদর্শন করিয়া সকলে হরিনাভি গ্রামে বাঙ্গলার আদি নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'-প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে রামনারায়ণ) মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। সেখানে তর্করত্ন মহাশয়ের প্রপৌত্র প্রেসিডেন্সী কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রবিবাসরের সদস্যগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহার অনুরোধে সেখানে সকলকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'কুলীন কুলসর্বস্ব' হইতে শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলার "উত্তম ফলার"-এর নিদর্শনস্বরূপ নিম্নলিখিত চারি লাইন,

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই
ছকা আর শাকভাজা মতিচুর জিবেগজা
উত্তম ফলার তারে কই।"

উদ্ধৃত-করা এক-একখানি মুদ্রিত পত্রিকা প্রত্যেকের হস্তে অর্পণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনামত "উত্তম ফলার" আসিয়া উপস্থিত হয়। অধ্যাপক মহাশয়ের আতিথেয়তার এই অভিনবত্বে সাহিত্যিকগণ বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন।—'আনন্দবাজার পত্রিকা'।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গের অনেক অঞ্চলের গ্রামগুলি অস্বাস্থ্যকর ও শ্রীহীন হইয়া যাওয়ায় এখন বর্তমান অবস্থায় সেগুলির আর সংস্কৃতিকেন্দ্র হইবার সম্ভাবনা নাই। সেগুলি আবার বাসযোগ্য, সুগম ও শ্রীসম্পন্ন হইলে পুনরায় সংস্কৃতির কেন্দ্র হইতে পারিবে—যদিও সে সংস্কৃতি ঠিক্ সাবেক সংস্কৃতির মত হইবে না। গ্রামগুলির উন্নতি সাধনের ঐকান্তিক প্রয়োজন আমরা এই সংখ্যাতেই অন্যত্র দেখাইয়াছি। এই স্থলে আলোচিত বিষয়টি হইতেও তাহা বুঝা যাইবে।

আমরা আজকাল যে শুধু পরিচ্ছদে ও কথাবার্তাতেও কতকটা বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা নহে,

সাধারণ আহার্য ও মিষ্টান্ন রন্ধনে ও প্রস্তুতিতেও বিদেশী-ভাবাপন্ন হইতেছি। কত সেকেলে তরকারি ও মিষ্টান্ন আজকাল অন্-ফ্যাশনেবল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নাম পর্যন্তও আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও এই অভিযোগ করিতেন। এহেন সময়ে সুব্রাহ্মণ ও সুভোক্তা অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় "উত্তম ফলার"-এর পুনরুজ্জীবন করিয়া সর্বসাধারণের—বিশেষতঃ ভোজনবিলাসীদের—হার্দিক ও ঔদরিক ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন।

—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী

উপরে প্রসঙ্গতঃ পরমভক্তিভাজন মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম উল্লিখিত হওয়ায় মনে পড়িল, গত বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁহার জন্মশতবার্ষিক সভার কাজ শেষ হইবার পর শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক দ্বিজেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। এ পর্যন্ত তাহা না-হওয়ায় মনে হইতেছে, বসু মহাশয় হয়ত ইহা ব্যক্তিগত ভাবে বলিয়াছিলেন, পরিষদের সম্পাদকরূপে নহে; কিংবা হয়ত পরিষদ কলেজ ও স্কুলসমূহের গ্রীষ্মাবকাশ-অন্তে কলিকাতা আবার অধ্যাপক শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাগমে 'গরম' হইয়া উঠিলে এই শতবার্ষিক উৎসব করিবেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছু কাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

—

আউটডোর ৫৮ দিন বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত

খবরের কাগজে দেখিলাম, বাংলা-গবর্মেণ্ট সরকারী হাসপাতালসমূহের আউটডোর বিভাগগুলি—যেখান হইতে রোগীরা ব্যবস্থা ও ঔষধ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়—বৎসরে ৫৮ দিন, রবিবার সমেত, বন্ধ রাখা স্থির করিয়াছেন। ইহা সুসিদ্ধান্ত বলিতে পারি না। ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস বৎসরে এক দিনও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে না, পুলিস-থানাও এক দিনও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে না। রোগে সাহায্য মানুষের সকল দিনই পাওয়া উচিত।

—

এখন আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতে গান্ধীজীর অস্বীকৃতি

ব্রিটেন এখন জার্মেনীর সহিত জীবনমরণ-সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত। এখন আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে বিব্রত করিতে গান্ধীজী রাজী নহেন। তিনি বলিয়াছেন, আমরা ব্রিটেনের ধ্বংসস্তূপের উপর আমাদের স্বাধীনতাসৌধ নির্মাণ করিতে চাই না। তাঁহার সিদ্ধান্ত মহানুভবতাপ্রসূত। আমরা ইহার সমর্থন করি।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা রক্তরঞ্জিত ও কালিমা-কলঙ্কিত। তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ বর্তমানেও অনেক আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, অহিংস সংগ্রাম এখন মুলতুবি রাখাই শ্রেয়ঃ। আমাদের যদি স্বাধীন হইবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে বিজয়ী ব্রিটেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহা আমরা ভবিষ্যতে অর্জন করিতে পারিব। দ্বৈরথ যুদ্ধে যেমন পীড়িত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করা অবৈধ, সেইরূপ ভারতবর্ষের অহিংস সংগ্রামে তাহার বিরোধী পক্ষকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থায় বিব্রত করা অনুচিত।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ চালাইতেছিলেন, তখন তথাকার গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে একটা ধর্মঘট হয়, কিন্তু গান্ধীজী তাহার সুযোগ গ্রহণ না-করিয়া সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছিলেন।

—

জাতীয় জাগরণে নারীর কৃতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মহিলা-সবকমীটির সম্পাদিকা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্তের একটি চিঠি 'ভারত' দৈনিকে দেখিলাম। নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটির মহিলা-শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী সুচেতা দেবী কয়েক দিন পূর্বে সকল প্রদেশের মহিলা-সবকমীটির সম্পাদিকা-দিগকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, বঙ্গের সম্পাদিকাও তাহা পাইয়া 'ভারতে' প্রকাশিত চিঠিটি লিখিয়াছেন। শ্রীমতী সুচেতা দেবীর চিঠিতে দুই ভাগে বিভক্ত একটি প্রশ্নাবলী আছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয় জাগরণের যে সকল উদ্যম ও প্রচেষ্টা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহাতে মহিলাগণের দান কতখানি এই প্রশ্নাবলীতে তিনি তাহাই জানিতে চাহিয়াছেন।

এই প্রশ্নাবলীর কোথাও স্পষ্ট ও আলাদা করিয়া শিক্ষার উল্লেখ নাই। অবশ্য তাহা 'ইত্যাদি'র মধ্যে ও প্রশ্নাবলীর দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চদশ প্রশ্নের মধ্যে আসিতে পারে। কিন্তু শিক্ষা এরূপ তুচ্ছ ব্যাপার নহে, যে, তাহার স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র উল্লেখ না করিলেও চলে। অবশ্য শিক্ষার প্রতি এই উপেক্ষার জন্য আমরা শ্রীমতী সুচেতা দেবীকে দায়ী করিতেছি না। দায়ী কংগ্রেসের নীতি ও কংগ্রেস-

নেতাদের মনোভাব। জাতীয় উন্নতির পথ ও প্রণালী প্রধানতঃ দুই প্রকার, সাংস্কারিক (reformistic) ও বৈপ্লবিক (revolutionary)। ভারতবর্ষে যাঁহারা শিক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁহাদিগকে সংস্কার-পন্থী বলিয়া বৈপ্লবিকেরা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন (যদিও অনেক প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সার্বজনিক শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা আরম্ভ করিয়া সংস্কারপন্থীই হইয়া পড়িয়াছিলেন!)। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, রাশিয়ার বৈপ্লবিক দল বিপ্লবের পূর্বে বহু দশক ধরিয়া শিক্ষাবিস্তারের কাজে মন দিয়াছিল এবং বিপ্লবের পরে এখনও দিতেছে। চীনদেশের বিপ্লবের অতীত ও বর্তমান বৃত্তান্তেও শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে, ১৯৩১-এর সেন্সস অনুসারে, শতকরা ৯।১০ জন লিখনপঠনক্ষম, শুধু নারীদের মধ্যে বোধ করি শতকরা ৩।৪ জন। অতএব, এদেশে প্রকৃত জাতীয় জাগরণ হইয়া থাকিলে সাংস্কারিক ও বৈপ্লবিক উভয় দলেরই শিক্ষাবিস্তারে একান্ত মনোযোগী হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ভারতীয়েরা বোধ হয় সাংস্কারিক নহি, বৈপ্লবিকও নহি; আমরা 'ইত্যাদি' বা 'বিবিধ' পর্যায়ভুক্ত।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্তের চিঠির যে অংশটি তাঁহার নিজের লেখা তাহাতে শিক্ষার স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"জাতীয় সংগ্রামে বাংলার মহিলাগণের কাজ তাঁহাদের আত্মাহুতি, নির্যাতন ভোগ ও দুঃখবরণ অন্য কোন প্রদেশ হইতে নূন ত নহেই বরং নির্যাতনের দিকে তাঁহারা যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। এতদ্ব্যতীত শিক্ষায়, সাহিত্যে, কলাবিদ্যায়, সমাজসংস্কার প্রভৃতিতে তাঁহাদের দান আজ কম নহে। এই সকল সম্পর্কে যে সকল প্রতিষ্ঠান এই প্রদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কোন দেশের গর্ব্বের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু এইগুলিকে একত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কংগ্রেস হইতে নূতন উদ্যম বাস্তবিকই সময়োচিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশ এই বিষয়ে সচেতন হইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাঁহারা যে পূর্ণ তথ্যসংগ্রহের চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুমান করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।"

ফল খাইতে অনুরোধ

জাতীয় শিল্পবাণিজ্যবিষয়ক পরিকল্পনা কমীটি (National Planning Committee) সকলকে আরও বেশী করিয়া ফল খাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, খবরের কাগজে দেখিলাম। চিকিৎসকেরা বহুদিন হইতে ইহা বলিয়া আসিয়াছেন—এবং ফল খাইতেও কিছু মন্দ নয়। ফলভোজন স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির বিশেষ অনুকূল। ধনবান্ ও সচ্ছল অবস্থার লোক না হইলে ফল খাওয়া যায় না, তাহা নহে—অন্ততঃ ছোট শহরের ও গ্রামের লোকদের সম্বন্ধে ত এ-কথা বলা যায় না। বঙ্গের সকল জেলাতেই, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, পেঁপের গাছ হয় ও হইতে পারে। পাকা পেঁপে খাইতে ভাল ও উপকারী, কাঁচা পেঁপের তরকারী খাইতে ভাল ও উপকারী। মফঃসলের ছোট-বড় প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাড়ীতে অন্ততঃ একটা পেঁপেগাছের স্থান হইতে পারে। আমাদের বাল্যকালে ও যৌবনে ছোট শহরের গৃহস্থ-বাড়ীতে গৃহস্থ-দিগকে বাড়ীর মধ্যেই লাউ কুমড়া শাক বেগুন বিলাতী বেগুন (tomatoes) লাগাইতে দেখিয়াছি। এখন এই কারণে নাকি অনেক গ্রামের লোকেরা তরকারী খাইতে পায় না, যে, তাহাদের গ্রামে বাজার নাই! কিন্তু তাহাদের নিজেদের তরকারী লাগাইবার একটু একটু জায়গা কি নাই? নিজের বাড়ীতে ২।৪ হাত জায়গা থাকিতেও যে তরকারী খাইতে পায় না, সে অতি অকর্মণ্য।

সেদিন কাগজে দেখিলাম, সিন্ধুদেশে ২৫ বৎসর আগে এক রকম উৎকৃষ্ট বীজবিহীন আঙুরের (Marsh's Seedless-এর) চাষ প্রবর্তিত হয়। এখন এ বিষয়ে সিন্ধু ভারতবর্ষে প্রথমস্থানীয়। পঞ্জাবেও নানা রকম ফলের চাষ খুব হইতেছে। বাংলা প্রদেশে শুষ্ক ও আর্দ্র, বারিপাতাল্প ও বারিপাতবহুল, ঠাণ্ডা ও গরম, সব রকম জায়গাই আছে। সিলিগুড়ি হইতে হিমালয় ক্রোড়ের যত উঁচু জায়গা পর্যন্ত বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত, তাহাতে গ্রীষ্মপ্রধান, নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান দেশসমূহের নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল, ফুল ও তরকারী হইতে পারে। তাহা দ্বারা যথেষ্ট অর্থাগমও হইতে পারে।

আমেরিকাকে রাশিয়ার সতর্কীকরণ

মস্কৌর "প্রাভ্‌ডা" সংবাদপত্রে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের উদ্দেশে এই সাবধান-বাণী প্রকাশিত হইয়াছে, যে, ঐ রাষ্ট্র য়ুরোপীয় যুদ্ধে যোগদান করিলে তাহার রণতরীসমূহকে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে লইয়া যাইতে হইবে। তাহাতে ডাচদের অধীন দ্বীপময় ভারতে (জাভা প্রভৃতিতে) এবং সম্ভবতঃ ফিলিপাইন্স দ্বীপপুঞ্জে যদৃচ্ছা কার্য করিতে জাপানের সুবিধা হইবে। ইহাও বলা হইয়াছে, যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিলে দক্ষিণ-আমেরিকায় তাহার বাজারগুলি জাপান ও ইটালী দখল করিবে, অর্থাৎ সে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে তাহার পণ্যশিল্পের কারখানাগুলি যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেই ব্যাপৃত থাকিবে, অন্য পণ্য উৎপাদন করিয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় পাঠাইতে পারিবে না, জাপান ও ইটালী তাহাদের পণ্য পাঠাইবে।

কিন্তু স্বার্থপরতা দ্বারাই চালিত হওয়া মানুষের একমাত্র কর্তব্য নহে। —

"বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ"

স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আভিজাত্যত্যাগের লক্ষণ স্বরূপ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম ছাড়িয়া সুরেন ঠাকুর নাম লইয়া, এই বহিখানি লিখিয়া গিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া (U. S. S. R) জাতীয় জীবনের লৌকিক সকল দিকে কিরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা জাতির সকল মানুষের শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা কথকতার ভঙ্গীতে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে ১৷৷০ মূল্যে ইহা পাওয়া যায়; ইহার কিয়দংশ ট্রেনে ও কিছু অন্যত্র আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। সমগুটি পড়া হইলে ইহার সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা আছে।

—

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত এই বৃহৎ অভিধানের ৬৭তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২১৩২, শেষ শব্দ 'বিরাম'। —

পাকিস্তান, শিখিস্থান, ও দ্রাবিড়িস্থান

মান্দ্রাজ প্রদেশের কতকগুলি লোক একটি আলাদা দ্রাবিড়িস্থান চাহিতেছে। তাহারা "আর্য" নামে অভিহিত সব কিছুরই বিরোধী। তাহাদের প্রচেষ্টা ঐ প্রদেশের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ঝগড়ার রূপান্তর।

পঞ্জাবের শিখরা ভারতবর্ষের খণ্ডীকরণের বিরোধী এবং পাকিস্তান-পরিকল্পনার দারুণ শত্রু। তাহারা বলিতেছে, যদি মুসলিম লীগের পাকিস্তান-পরিকল্পনা প্রশ্রয় পায় বা মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে তাহারা পঞ্জাবে শিখ-রাষ্ট্র চাহিবে; কারণ, ইংরেজরা পঞ্জাব লইয়াছিল শিখদের নিকট হইতে, মুসলমানদের নিকট হইতে নহে; পাকিস্তান-পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইলে, তাহারা শিখ-রাষ্ট্র চাহিবে না। —

কলেজে ছাত্রদের ও পরিচালকদের অধিকার কি কি

কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। কোনও মাতব্বর ব্যক্তির মধ্যবর্তিতায় তাহার অধ্যক্ষ ও ছাত্রদের অশোভন বিবাদ মিটিয়া গেলে ভাল হয়। অন্য সব কলেজেও এইরূপ বিবাদ ঘটিতে পারে। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং সমুদয় কলেজের কর্তৃপক্ষ একত্র হইয়া স্থির করিলে ভাল হয়, যে, কলেজে ছাত্রেরা কি কি অধিকার পাইবে। তাহা প্রত্যেক কলেজের ভর্তি হইবার দরখাস্তে মুদ্রিত থাকিবে এবং ছাত্রদিগকে ও তাহাদের অভিভাবকদিগকে ভর্তি হইবার সময় তাহাতে সম্মত হইতে হইবে। এইরূপ কিছু ব্যবস্থা হইলে আগে হইতে অনেক ঝগড়া ও ধর্মঘটের পথ রুদ্ধ হইবে। —

বাংলার সাতটি "জেলা" কংগ্রেস কমীটির অনুমোদন বাতিল

"ভারত" দৈনিকে লিখিত হইয়াছে,

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্বাহক সভার এক অধিবেশন গত ৩রা জুন সন্ধ্যায় সমিতির কার্য্যালয়ে হয়। যে সমস্ত জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি বিধিমত গঠিত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতেছে না এবং আনুগত্যপ্রকাশে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে, তাহাদের অনুমোদন খারিজ করা সম্পর্কে এই অধিবেশনে আলোচনা হয়।

সভার প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ ঐ সমস্ত জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, সাতটি জিলার রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রাদেশিক সমিতির নির্দেশ অমান্য করিয়াছে। তাহাদের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হওয়া কিংবা কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু তাহারা ক্রমাগত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন নিম্নতম রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং তৎসমস্ত জেলার বহু কংগ্রেস কর্মী বিধিমত গঠিত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আনুগত্য প্রকাশে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছে।

সম্পাদকের বিবৃতি আলোচনার পর সভায় এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে (১) উত্তর-কলিকাতা, (২) মধ্য-কলিকাতা, (৩) দক্ষিণ-কলিকাতা, (৪) হাওড়া, (৫) ফরিদপুর, (৬) ঢাকা ও (৭) মালদহ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতিকে খারিজ করা হইয়াছে। তবে এই সমস্ত জেলা সমিতির অন্তর্ভুক্ত নিম্নতম রাষ্ট্রীয় সমিতির মধ্যে যাহারা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতেছে, উক্ত প্রস্তাব তাহাদের উপর কোন-রূপেই প্রযোজ্য হইবে না।

বৈধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এই সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয়, যে, বাংলার কংগ্রেসী মহলে কলিকাতা, হাবড়া, ফরিদপুর, ঢাকা ও মালদহে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর যতটা প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, অন্য সব জেলায় ততটা নাই। প্রকৃত অবস্থা কি, বঙ্গের সমুদয় চারি-আনা-চাঁদাদাতা কংগ্রেস সভ্যদিগের ভোট লইতে পারিলে, তাহা নিঃসংশয়ে জানা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা জানা এরূপ জরুরী নহে, যে, তন্নিমিত্ত উদ্যোগ-আয়োজন যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইবে।

[ঘাটশিলায় ২৮শে জ্যৈষ্ঠ সমাপ্ত]



ডুবুরী জাহাজ ও টর্পেডো
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কোন্ সুদূর অতীতে মানুষ জলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছিল ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য মিলে না এবং ইহাও ঠিক যে, জলের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য আর্কিমিডিসের জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ক তথ্য নির্দ্ধারণের অপেক্ষা মানুষ করে নাই—পরিদৃশ্যমান পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান হইতেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জলে সাঁতার কাটা, দাঁড় টানা বা পালের সাহায্যে ভেলা চালাইবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিল। পাখী দেখিয়া তাহাদের মত আকাশে বিচরণ করিবার ইচ্ছা এবং মাছ দেখিয়া তাহাদের মত জলের নীচে চলাফেরা করিবার ইচ্ছা যে তাহাদের অন্তরে জাগরূক হয় নাই, এমন কথা বলা চলে না। কারণ, মাত্র বিগত শতাব্দী হইতে জলের নীচে জাহাজ চালাইবার কৌশল আয়ত্তাধীন হইয়া থাকিলেও আর্কিমিডিসের অনেক পূর্ব্বে অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে তাঁহার সমসাময়িক অনেকে জলের নীচে চলাফেরা করিবার বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিতেন, এমন কি টায়ার নগর অবরোধের সময় একটি ডুবুরী-জলযানও নাকি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বিশপ ক্লজম্যাগনাস্ বলিয়াছেন, তাঁহার সময়ে জলের উপরে ও নীচে ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ করিবার নিমিত্ত কোন কোন জলদস্যুরা একপ্রকার চামড়ার নৌকা ব্যবহার করিত। তিনি নাকি ১৫০৫ সালে অস্‌লোর গির্জ্জায় ঐরূপ দুইটি চামড়ার নৌকা দেখিয়াছিলেন। ১৫৩৮ সালে টলেডোতে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সমক্ষে সত্যসত্যই একখানা ডুবুরী জলযানের পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। তাহার প্রায় ২০ বৎসর পরে ডুবুরী জলযানের সাহায্যে ভিনিসিয়ানরা একখানি নিমজ্জিত জাহাজ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। আরও ২০ বৎসর অন্তে রাণী এলিজাবেথের নৌবিভাগীয় গোলন্দাজ উইলিয়াম বোর্ণ এক প্রকার ডুবুরী জাহাজ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই ক্ষুদ্রকায় জাহাজখানি ইচ্ছামত ডুবিতে অথবা ভাসিতে পারিত।

১৬২৬ সালে দ্বিতীয় জেম্‌স্, কর্ণেলিয়াস্ ডেবল নামে একজন ওলন্দাজকে ডুবুরী জলযান নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি যে ডুবুরী জাহাজটি নির্ম্মাণ করেন তাহা তের-চোদ্দ জন লোক লইয়া হাতে-টানা দাঁড়ের সাহায্যে টেম্‌স্ নদীর জলের নীচে চলাফেরা করিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ১৭৭৬ সালে ডুবুরী জাহাজের কার্য্যকরী ক্ষমতার বিষয় লোকে বিশেষভাবে অবহিত হয়। ডেভিড বুস্‌নেল নামে একজন আমেরিকান শত্রুপক্ষীয় জাহাজকে ঘায়েল করিবার জন্য এমন একটি অদ্ভুত জলযান নির্ম্মাণ করিলেন যাহা জলের নীচে ডুবিয়া শত্রুর অলক্ষ্যে বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে জাহাজকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে।

এই ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয় কলের জাহাজ নির্ম্মাতা রবার্ট ফুলটন উন্নত-ধরণের ডুবুরী জাহাজ বা সাবমেরিণ নির্ম্মাণে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। বিশ্ববিশ্রুত নেপোলিয়নের জ্ঞাতসারে ফ্রান্সে তিনি তাহার পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেক পরিশ্রমের পর তিনি অনেকটা আধুনিক ধরণেরই ডুবো-জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত ডুবো-জাহাজের আকৃতি ছিল একটা চুরুটের মত চতুর্দ্দিক আবদ্ধ। ডেকের উপর '.কানিং টাওয়ার'। সেখান হইতে চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। জাহাজখানিকে দাঁড় টানিয়া জলের উপর চালাইতে হইত। জলের নীচে ব্যবহারের জন্য উচ্চ চাপে বাতাস ভর্ত্তি করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। ইহার সাহায্যে জলের নীচে ডুবিয়া তিনি একখানি নিমজ্জিত জলযানের উপর সাফল্যের সহিত টর্পেডো প্রয়োগ করেন। এইরূপ সাফল্য লাভ সত্ত্বেও নেপোলিয়নের মত দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কলের জাহাজ ও সাবমেরিণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফুলটন যদি নেপোলিয়নকে এ-বিষয়ে উৎসাহিত করাইতে পারিতেন তবে বোধ হয় তাঁহাকে কোথাও পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করিতে হইত না। অবশেষে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর তিনি আমেরিকা পলায়নের মতলব করিয়াছিলেন এবং সেণ্ট হেলেনা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমেরিকায় সত্য সত্যই একখানি ডুবরী জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু যে কোন কারণেই হউক উহা আর সমুদ্রযাত্রা করে নাই।

১৮৬৪ সালে চার্লস্টনের অনতিদূরে টর্পেডোর আঘাতে একখানি জাহাজ ডুবিয়া যায়। এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। কাজেই এই ঘটনায় চতুর্দ্দিকে একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। সাবমেরিণ ও টর্পেডোর বিষয়ে লোকের অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। সেই সময়ে বারুদপরিপূর্ণ টর্পেডোর মত অস্ত্রকে ক্ষুদ্র জলযানের সম্মুখভাগে প্রসারিত একটি দীর্ঘ দণ্ডের অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া দীর্ঘ 'ফিউজে'র সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হইত। ইহার ফলে, আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, উভয়ে প্রায়ই একসঙ্গে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনিয়ারেরা টর্পেডোর উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করেন। ১৮২৬ হইতে ১৯০৫ সালের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া টর্পেডো বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিতেছি।

১৮৭৫ সালে ইয়োরোপে নরডেনফেল্ট এবং আমেরিকায় হল্যাণ্ড নামে দুই জন এঞ্জিনিয়ার উন্নত ধরণের সাবমেরিণ নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করেন। নরডেনফেল্ট এই কার্য্যে অনেকটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়া বিভিন্ন জাতির নৌ-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু বর্ত্তমান সাবমেরিণের তুলনায় তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় অতিশয় জটিল

ছিল। যাহা হউক, আমেরিকা কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ১৮৮৫ সালেই নৌ-বিভাগে সাবমেরিণ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৮৮৮ সালে ফরাসী এঞ্জিনিয়ারগণ সাবমেরিণ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ব্রিটেন কিন্তু তখনও সাবমেরিণ নির্ম্মাণে অগ্রসর হয় নাই। অতঃপর ১৯০০ সালে ইংল্যাণ্ডও সাবমেরিণ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

নরডেনফেল্টের সাবমেরিণ বাষ্পীয় শক্তিতে পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জলের নীচে ডুবিবার সময় আগুন নিবাইয়া ফানেলটিকে খুলিয়া দিতে হইত। বয়লারের সঞ্চিত বাষ্পই জলের নীচে চলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। খোলের অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই পার্শ্বের শয়ানভাবে অবস্থিত দুইটি প্রোপেলার ঘুরাইয়া জাহাজকে জলে ডুবাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জাহাজটি জলের উপর যে অবস্থায় ভাসিত ঠিক সেই অবস্থায়ই ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইত। সম্মুখের দিক নীচু করিয়া ক্রমশঃ জলের নীচে যাইত না। কারণ নরডেনফেল্টের ধারণা ছিল যে, সম্মুখের দিক নীচু বা উঁচু করিয়া ডুবুরী জাহাজকে জলে ডুবান বা ভাসান অসম্ভব। অন্যান্য অনেক অসুবিধার মধ্যে এই ডুবুরী জাহাজের প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, জলের নীচে কোন কারণে একটু ধাক্কা লাগিলেই বয়লার ও ট্যাঙ্কের সঞ্চিত জলে এমন আন্দোলন সুরু হইত যে জাহাজটি দাঁড়িপাল্লার মত অনবরত এদিক ওদিক দোল খাইতে থাকিত। সেই দোলন সহজে থামিত না। এমতাবস্থায় কাহারও পক্ষে সেখানে একদণ্ড সুস্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও অসম্ভব। এরূপ একটি সাবমেরিণ হইতে একবার টর্পেডো ছুড়িবার পর তাহার ধাক্কার টাল সামলাইতে না পারিয়া জাহাজটি জলের নীচে খাড়া ভাবে দাঁড়াইয়া গেল। অনেক চেষ্টার পর সে যাত্রা নাবিকদিগের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল। এই সকল কারণেই নরডেনফেল্টের ডুবুরী জাহাজ প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যকরী হয় নাই। এদিকে হল্যাণ্ড বিবিধ পরীক্ষার পর গ্যাসোলিন এঞ্জিন পরিচালিত এক প্রকার সাবমেরিণ প্রস্তুত করিলেন। জলে ডুবিবার জন্য ইহার অভ্যন্তরেও ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্ক ও দুই পার্শ্বে প্রোপেলারের ব্যবস্থা ছিল। জলের নীচে ডুবিবার সময় গ্যাসোলিন এঞ্জিন বন্ধ করিয়া তড়িৎশক্তির সাহায্যে জাহাজ চালানো হইত। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের জন্য উচ্চ চাপে বায়ু সঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। নরডেনফেল্টের সাবমেরিণ যেমন শয়ান ভাবেই জলে ডুবিত কিংবা ভাসিয়া উঠিত হল্যাণ্ড কিন্তু সেরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া জাহাজের সম্মুখভাগকে একটু অবনমিত কোণে রাখিয়া ধীরে ধীরে জলের নীচে প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উভয় পার্শ্বের প্রোপেলারের সাহায্যে তিনি জাহাজখানাকে নির্দ্দিষ্ট গভীরতায় চালাইতে পারিতেন। এই সব সুবিধার জন্যই ১৯০১ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হল্যাণ্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবমেরিণ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। তাহারা প্রথমে ছোট ছোট

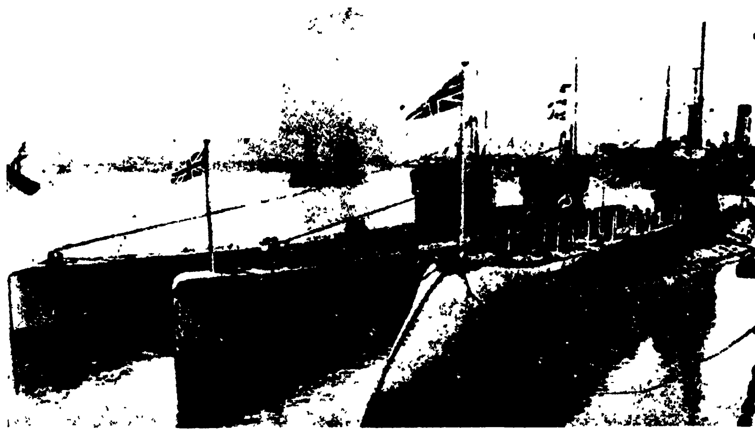
সাবমেরিণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কেবল গ্যাসোলিন এঞ্জিনেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, আবদ্ধ স্থানে গ্যাসোলিন এঞ্জিন হইতে প্রচুর পরিমাণে ধূম উৎপন্ন হইয়া সময় সময় ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটাইয়া থাকে। কাজেই গ্যাসোলিন এঞ্জিনের পরিবর্ত্তে মোটা তেল চালিত এঞ্জিনের প্রচলন হয়। প্রতি বছরই তেল-চালিত এঞ্জিন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও তাহা সঞ্চিত রাখিবার কৌশলের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। এই কয়টি বস্তুর যথোপযুক্ত উন্নতির অভাবেই সাবমেরিণ তখন আশানুরূপ সফলতা লাভে কৃতকার্য্য হয় নাই। দ্রুতগতিতে এঞ্জিন চালাইবার জন্য যথোপযুক্ত উচ্চ চাপে বায়ু সঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থাও তত সন্তোষজনক ছিল না। বাষ্পীয় শক্তি উৎপাদনে যথেষ্ট কয়লা সঞ্চিত রাখিতে হয়। গ্যাস-চালিত এঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক মোটরে সেরূপ অসুবিধা নাই। কাজেই বর্ত্তমান যুগের অতিকায় সাবমেরিণ নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে।

আধুনিক যুগের বিরাটাকার এক-একটি সাবমেরিণ একটানা ৬০০০ মাইলেরও বেশী চলিতে পারে। বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে জলের নীচে ইহা চলে ঘণ্টায় নয়-দশ মাইলেরও বেশী। ৩০ হইতে ৪০ জন লোক লইয়া একাদিক্রমে তিন ঘণ্টারও বেশী জলের নীচে ডুবিয়া থাকিতে কোনই অসুবিধা হয় না। পূর্ব্বেকার সাবমেরিণের আর একটা প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, জলের নীচে গেলেই তাহাকে অন্ধকারে আন্দাজী চলিতে হইত। দিক-নির্ণয়ের জন্য কম্পাসের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল না। এই কারণে অনেক সময়ই তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে। এখন বিদ্যুৎশক্তির বলে জলের নীচে অন্ধকারে থাকিতে হয় না। জাইরো-কম্পাস জলের নীচে নির্ভুলভাবে দিকনির্ণয় করে। ক্রোনোমিটার প্রত্যেক সেকেণ্ড ও তার ভগ্নাংশের সঠিক খবর দেয়। তাছাড়া বর্ত্তমান সাবমেরিণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ হইতেছে—ঊর্দ্ধে প্রসারিত কৃত্রিম চোখ। এই চোখটিই 'পেরিস্কোপ' নামে পরিচিত। এই পেরিস্কোপের সাহায্যে জলের নীচে থাকিয়াও সাবমেরিণের লোকেরা বাহিরের সকল জিনিষই দেখিতে পারে। টেলিস্কোপের চোঙের মত-খুব লম্বা একটি চোঙ সাবমেরিণের পৃষ্ঠদেশে খাড়াভাবে দণ্ডায়মান। নীচের দিক জাহাজের অভ্যন্তরে ক্যাপ্টেনের ঘরের টেবিলের উপর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। লম্বা চোঙটিকে প্রয়োজনমত ছোটবড় করা যায়। চোঙের শীর্ষদেশে কতগুলি প্রিজম্ বা ত্রিকোণ কাচ বৃত্তাকারে সজ্জিত। বাহিরের দৃশ্য হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি এই প্রিজমের ভিতর দিয়া সমকোণে বাঁকিয়া যায়, কাজেই চোঙের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি খাড়াভাবে নীচের দিকে চলিতে থাকে। চোঙের নিম্নপ্রান্তেও একখানা প্রিজম্ থাকে। আলোকরশ্মি সেখানেও আবার সমকোণে বাঁকিয়া কয়েকখানা লেন্সের ভিতর দিয়া দর্শকের চোখে পড়ে। ক্যাপ্টেন তাহার চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই সম্মুখে তাকাইলে বাহিরের সমস্ত দৃশ্য দেখিতে পারেন। তবে নলের শীর্ষদেশে প্রিজমগুলি চক্রাকারে সজ্জিত থাকায় চতুর্দ্দিকের দৃশ্যগুলি বৃত্তাকারে চোখে প্রতিফলিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাবমেরিণে সম্মুখ ও দূরের জিনিষ দেখিবার জন্য দুইটি বিভিন্ন পেরিস্কোপের ব্যবস্থা থাকে।

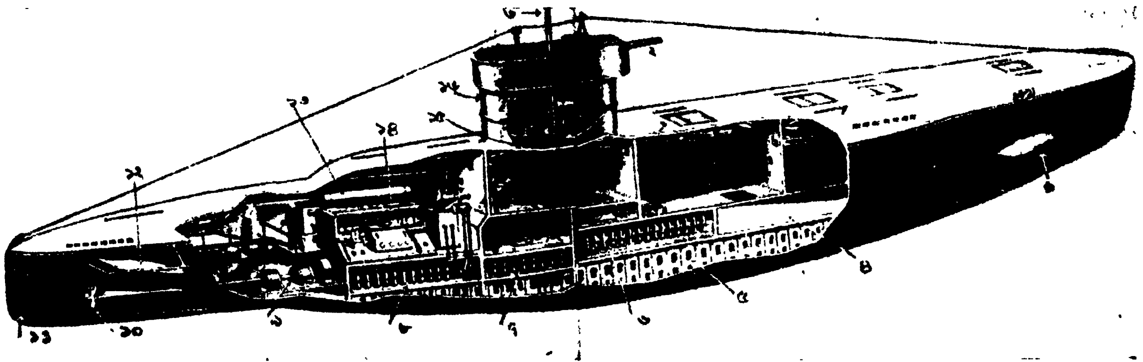
বর্ত্তমান ডুবুরী জাহাজকে ধাতুনির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি মাছের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহার চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় ধাতব পত্রে আবদ্ধ। কোন উপায়ে জল বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। আবদ্ধ খোলের মধ্য হইতে বাহিরে আসিবার জন্য কয়েকটি গোলাকার গর্ত্ত আছে। গর্ত্তগুলির মুখ ঢাকনা আঁটা। জাহাজ জলের নীচে ডুবিবার পূর্ব্বেই ঢাকনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই আবদ্ধ খোলের পিঠের উপর থাকে ছোট্ট একটি ডেক। ডেকের উপর ঢিবির মত একটি উন্নত স্থান আছে। ইহাকে বলে 'কোনিং-টাওয়ার'। এই কোনিং-টাওয়ার সুদৃঢ় ইস্পাত নির্ম্মিত হইলেও ভিতর হইতে পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত কতগুলি জানালা আছে। জাহাজ যতক্ষণ জলের উপরে ভাসে ততক্ষণ এই কোনিং-টাওয়ার হইতেই চতুর্দ্দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া তদনুযায়ী জাহাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কোনিং-টাওয়ারের নিম্নাংশ খোলের অভ্যন্তরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিম্নদেশে ঢাকনার বন্দোবস্ত আছে। কোন কারণে কোনিং টাওয়ারে জল প্রবেশ করিলেও নিম্নদেশের ঢাকনার জন্য খোলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। জাহাজের সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ও টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। জলে ডুবিবার পূর্ব্বেই জাহাজের কর্ম্মচারীদের নিকট বৈদ্যুতিক সঙ্কেতধ্বনি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোনিং-টাওয়ারও বন্ধ হইয়া যায়। ডেকের সম্মুখভাগে দ্রুতগতিতে গোলাবর্ষণ-কারী কামানও ডেকের নীচে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। আবার সঙ্কেত আসিলেই গ্যাস-চালিত এঞ্জিন বন্ধ করিয়া বৈদ্যুতিক মোটর চালাইতে সুরু করে। ইহার এক-একটি মোটর ৪০০ অশ্বশক্তির ক্ষমতা উৎপন্ন করে। সাবমেরিণকে ডাইনে বা বামে ঘুরাইবার জন্য যেমন খাড়াভাবে অবস্থিত হাল আছে তেমনি আবার উপরে ও নীচে ঘুরাইবার জন্যও পাশাপাশি ভাবে প্রসারিত হালের ব্যবস্থা রহিয়াছে. চলতি মুখেই শয়ানভাবে অবস্থিত হালের সাহায্যে জাহাজের সম্মুখভাগ নিম্নাভিমুখী করিয়া দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাসিবার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য ভিতরের ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্কের মধ্যে জল প্রবেশ করাইতে থাকে। ভিতরে যতই জল প্রবেশ করে ততই জাহাজ ডুবিতে থাকে। আবার জল বাহির করিয়া দিয়া ইচ্ছামত ভাসিয়া উঠে। জল ভিতরে প্রবেশ বা ভিতর হইতে বাহির করাইবার জন্য সুকৌশলে নির্ম্মিত অতিশক্তিশালী পাম্পের ব্যবস্থা আছে। তাহার সাহায্যে অতি অল্প সময়ে যেমন জল ভর্ত্তি করা যায় তেমনই আবার বাহির করিয়াও দেওয়া যায়। জাহাজকে জলের নীচে যে কোন নির্দ্দিষ্ট গভীরতার মধ্যে রাখিবার জন্য 'ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্ক' ছাড়াও স্বয়ংক্রিয় আরও কয়েকটি জটিল যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান সাবমেরিণ প্রায় ২০০ ফুট জলের নীচে ডুবিতে পারে তবে সাধারণ কার্য্যের জন্য ৫০ হইতে ১০০ ফুটই যথেষ্ট। পেরিস্কোপের সাহায্যে যেমন জলের নীচে ডুবিয়াও বাহিরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তেমনই রেডিওর সাহায্যে বাহিরের সঙ্গে খবর-বার্ত্তার আদান-

প্রদান হইতে থাকে। বিশ ফুট জলের নীচে নামিয়াও এরিয়েল বেতারবার্ত্তা ধরিতে পারে। আট-দশ ফুট জলের নীচ হইতে তো অতি সহজেই বহু দূরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এজন্য বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত বেতার-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার কলকৌশল সম্বন্ধে সাধারণের কিছু জানিবার উপায় নাই কারণ ইহা নৌ-বিভাগের গোপনীয় ব্যাপার। রেডিও ছাড়াও জলের উপরিভাগের জাহাজ হইতে খবর পাইবার জন্য প্রত্যেক সাবমেরিণেই অদ্ভুত এক প্রকার শুনিবার কলের ব্যবস্থা আছে। সমুদ্রের অবস্থা শান্ত থাকিলে এই যন্ত্র-সাহায্যে ৩০ মাইল দূরের খবরও পাওয়া যাইতে পারে।

জলের নীচে অতগুলি লোকের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের নিমিত্ত সুদৃঢ় লৌহ সিলিণ্ডারে প্রায় তিন দিনের আন্দাজ বায়ু ও অক্সিজেন সঞ্চিত থাকে। এক-একটা বৃহদাকার সাবমেরিণে চারটি হইতে আটটি পর্য্যন্ত কামানের নলের মত টর্পেডো ছুড়িবার টিউব আছে। উচ্চ চাপের বায়ুর সাহায্যেই টর্পেডোগুলি জলে ছুড়িয়া মারা হয়। অনেকেই জানেন ছুড়িবার সময় বিস্ফোরণের ফলে পিছনের দিকে ভয়ানক ধাক্কা লাগে। টর্পেডো ছুড়িবার সময় পিছন দিকে এই ধাক্কার বেগ শতগুণ প্রবল। পূর্ব্বেকার সাবমেরিণগুলি এই প্রবল ধাক্কার টাল সামলাইতে না পারিয়া প্রায়ই বানচাল হইত। একবার একটা সাবমেরিণ টর্পেডো ছুড়িবার ধাক্কায় এমন ভাবে দোল খাইতে আরম্ভ করিল যে, কিছুতেই আর দোল থামানো যায়না। তার ফলেই অবশেষে কলকব্জা বিগড়াইয়া খাড়া ভাবে পাথরের মত ডুবিয়া গেল। বর্ত্তমান সাবমেরিণে এই টাল সামলাইবার জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। টর্পেডো ছুড়িবার সময় ধাক্কা লাগিবামাত্রই বিভিন্ন 'ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্কে'র জল এমন কৌশলে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এক কুঠরি হইতে আর এক কুঠরিতে প্রবাহিত হয় যে, জাহাজে কোন ধাক্কাই অনুভূত হয় না। জলের নীচে থাকিবার সময় সাবমেরিণের ভিতরকার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক



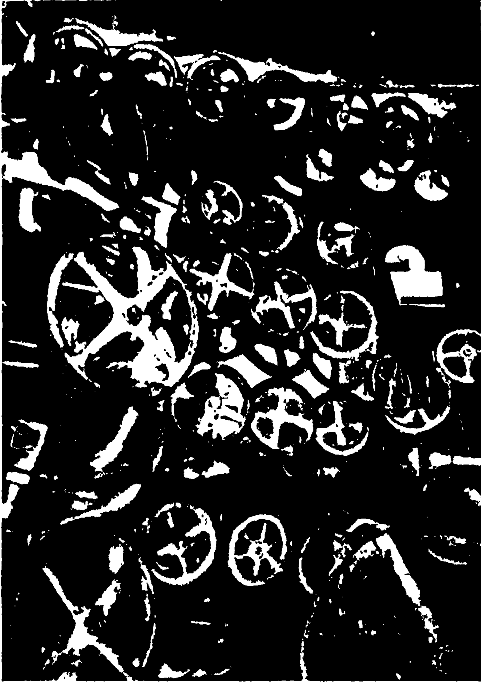
সাবমেরিনের বহির্দৃশ্য



সাবমেরিণের অভ্যন্তর

১। হাইড্রোপ্লেন। ২। অতিদ্রুত গোলা ছুড়িবার কামান। ৩। পেরিস্কোপ। ৪। এঞ্জিন চালাইবার তেল রাখিবার স্থান। ৫। ব্যালাষ্ট-ট্যাঙ্ক। ৬। ব্যাটারী ঘর ও উচ্চ চাপের বায়ুর পাত্র। ৭। উচ্চ চাপের বায়ুর পাত্র। ৮। অক্সিজেন গ্যাসে ভর্ত্তি পাত্রসমূহ। ৯। সাবমেরিণ জলের নীচে চালাইবার জন্য বিদ্যুৎ-চালিত মোটর। ১০। প্রোপেলার। ১১। হাল। ১২। পিছনের সি-প্লেন। ১৩। এঞ্জিন হইতে পরিত্যক্ত গ্যাসকে ঘনীভূত করিবার কন্‌ডেন্সার। ১৪। সাবমেরিণকে জলের উপরে চালাইবার ডিজেল-এঞ্জিন। ১৫। পেরিস্কোপের ঘর। ১৬। কোনিং-টাওয়ার।

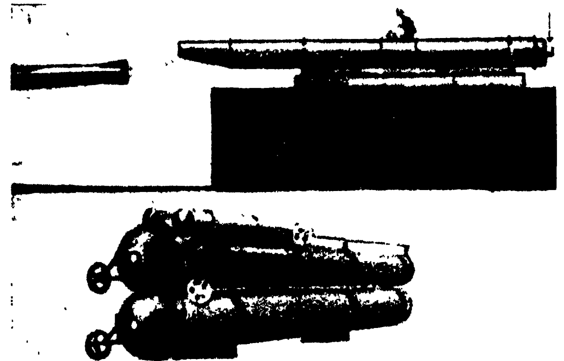
চুল্লীতে ৩০।৪০ জন লোকের রান্নাবাড়া হইয়া থাকে। প্রত্যেকের বিশ্রাম করিবার ও শুইবার ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে সাবমেরিণের অভ্যন্তরে সাদা ইঁদুর খাঁচায় পুরিয়া রাখা হইত। বাতাস একটু দূষিত হইতে আরম্ভ করিলেই ইহাদের অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাদের লক্ষণ দেখিয়া হাওয়া দূষিত হইবার পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বিত হইত। কিন্তু এখন আর সাদা ইঁদুর রাখিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ নূতন ব্যবস্থায় দূষিত কার্ব্বণ মনোক্সাইড মোটেই সঞ্চিত হইতে পারে না। বিগত যুদ্ধ হইতেই দেখা গিয়াছে, সাবমেরিণকে আর



সাবমেরিণের 'কণ্ট্রোল-রুমে'র দৃশ্য

ক্ষুদ্রকায় জলযান বলা যায় না, দস্তুরমত যুদ্ধ-জাহাজই বলা চলে। ইহারা যেমন টর্পেডো বহন করিয়া হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া থাকে, মাল বহন করিতেও সেরূপ সমর্থ। গত মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত জার্ম্মেণীর বিখ্যাত সাবমেরিণ ডয়েসল্যাণ্ড ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াইয়া অতি-প্রয়োজনীয় মাল বহন করাই ছিল ডয়েসল্যাণ্ডের প্রধান কাজ। কত ডেষ্ট্রয়ার, কত মাইন ও তারের জাল এড়াইয়া সে তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজকালকার সাবমেরিণ আবার সি-প্লেনও বহন করিয়া থাকে। জলের উপর চলিবার সময় দ্রুতগতিতে গোলার পর গোলা ছুড়িয়া যেমন শত্রু জাহাজের সঙ্গে লড়িতে পারে তেমনই আবার জলের নীচে টর্পেডো ছুড়িয়া ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজের সঙ্গে কয়েকখানি করিয়া সাবমেরিণ থাকে। দূরবীণের সাহায্যে দূরে কোন শত্রুপক্ষীয় জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র যুদ্ধ-জাহাজ হইতে বেতারে সাবমেরিণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ পাইবামাত্রই সাবমেরিণ তীরবেগে লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিতে থাকে। আদেশের প্রতীক্ষায় কর্ম্মচারীরা প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান। 'কোনিং-টাওয়ার' হইতে পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছে। শত্রুর জাহাজ এতক্ষণে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ক্যাপ্টেনের আদেশে গ্যাস-এঞ্জিন বন্ধ হইল। ইলেকৃট্রিক মোটর চলিতে সুরু করিল। এদিকে কোনিং টাওয়ার ও অন্যান্য গর্ত্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ক্যাপ্টেন ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা জাহাজের অভ্যন্তরে পেরিস্কোপের সম্মুখে বসিয়া বাহিরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং তদনুযায়ী কর্ম্মচারীদিগকে টেলিফোনে আদেশ প্রদান করিতেছেন। ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর নিকট আদেশ আসিল—জাহাজ দশ ফুট জলে ডুবাও। অমনি হুড়হুড় করিয়া ট্যাঙ্কে জল ভর্ত্তি হইতে লাগিল। দশ ফুট জলের নীচ দিয়া জাহাজ ছুটিয়া চলিতেছে। শত্রু-জাহাজের আরও নিকটবর্ত্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আদেশ হইল বিশ ফুট ডুবাও।

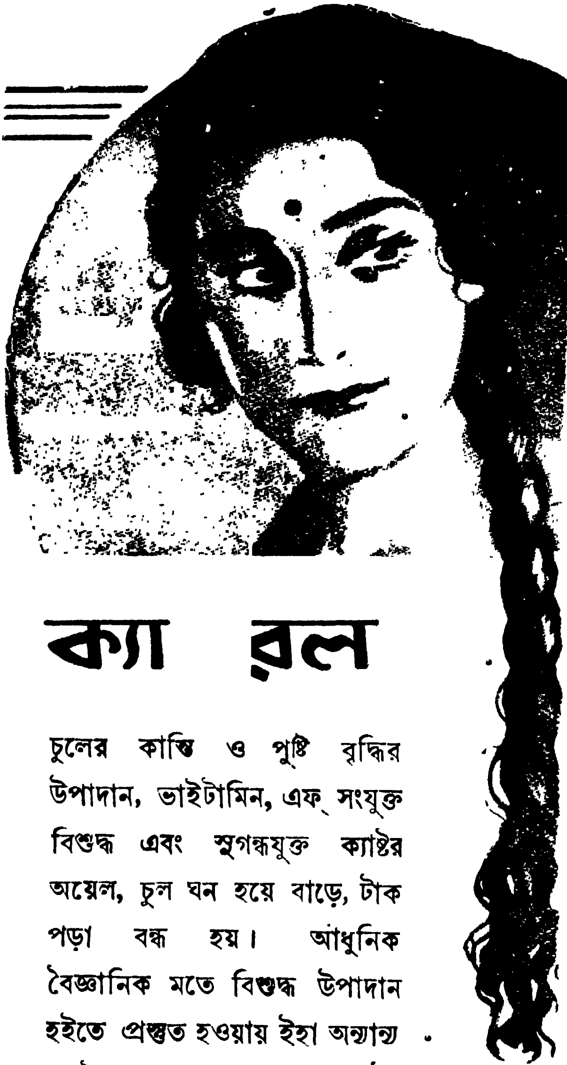


উপরে—জাহাজের উপর হইতে টর্পেডো ছুড়িবার ব্যবস্থা। টর্পেডো ছুড়িবার নলটী ডেকের উপর বসানো আছে। ইহাকে যে-কোন দিকে ঘোরানো যায়। পিছনের তীর-চিহ্নিত স্থানে বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে টর্পেডো জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে এবং নির্দ্দিষ্ট গভীরতার মধ্য দিয়া পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পথে ছুটে।
নীচে—সাবমেরিণের টর্পেডো ছুড়িবার নল। উচ্চ চাপের বায়ুর সাহায্যে এই নল হইতে টর্পেডো ছোড়া হয়।



ডেকের উপর হইতে টর্পেডো ছোড়া হইতেছে

আরও নীচে, আরও নীচে। অবশেষে পেরিস্কোপের অগ্রভাগটি জলের উপর রহিল। ঢেউ আসিয়া এক বার পেরিস্কোপটিকে ডুবাইয়া দিতেছে—আবার ভাসিয়া উঠিতেছে। ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে সাবমেরিণ শত্রু-জাহাজ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। লক্ষ্যস্থল হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বে আসিবামাত্র আদেশ হইল—জাহাজ আরও দশ ফুট নীচে নামাও। পেরিস্কোপের দৃষ্টি বন্ধ হইল। বাহিরের কিছুই আর দেখা যায় না। ক্রোনোমিটার, দিক্ নির্ণয় করিবার জাইরো কম্পাস ও দূরত্ব-পরিজ্ঞাপক যন্ত্রের উপরই ক্যাপ্টেনের এখন একমাত্র ভরসা। জাহাজ পূর্ণবেগে ছুটিতেছে। টর্পেডো ম্যান টেলিফোনে আদেশ পাইল—প্রস্তুত হও। তিন-চার জনে মিলিয়া টর্পেডোটিকে যন্ত্র-





সাহায্যে টিউবের মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া দিল—যেমন করিয়া কামানের মধ্যে শেল ভরে। টিউবের সম্মুখের ঢাক্না খুলিয়া রাখা হইল। ক্যাপ্টেন যেই দেখিলেন, প্রায় আধমাইল পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে—অমনি হুকুম হইল—I.OS. টর্পেডো-ম্যান বোতাম টিপিয়া দিল—মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভীষণ আন্দোলন করিয়া টর্পেডো ছুটিয়া চলিল, ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল বেগে। মাত্র দেড় মিনিট কি দুই মিনিটের মধ্যেই শত্রু-জাহাজের তলায় ভীষণ শব্দে বিস্ফোরণ ঘটিল। সে যে কি প্রলয় কাণ্ড অনুমানে বুঝিবার উপায় নাই। প্রবল ধাক্কায় সমুদ্রের জল ফোয়ারার মত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং লোকজন জাহাজ হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে। সেই ফাটল দিয়া প্রবল বেগে জল প্রবেশ করিয়া বিরাট বস্তুটিকে প্রায় ২৫।৩০ মিনিটে অতলে ডুবাইয়া দিল। এদিকে টর্পেডো ছুড়িয়াই সাবমেরিণ দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই শত্রু-জাহাজ হইতে অজস্র গোলা ও ডেপ্থ চার্জ্জ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। বেগতিক দেখিয়া আরও নীচে ডুবিয়া এক স্থানে চুপ করিয়া রহিল। ধ্বংসকার্য্য সমাধা হইলেই পুনরায় ভাসিয়া উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে যাত্রা করিবে।…

টর্পেডো কি বস্তু, ইহার গঠনপ্রণালী কিরূপ এবং কি উপায়ে ইহা ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সংসাধন করিয়া থাকে—সে-বিষয়ে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

টর্পেডো এক জাতীয় বিদ্যুৎ-মাছের নাম। কেমন করিয়া এই নামটি যে বিস্ফোরক অস্ত্রের প্রতি প্রযোজ্য হইল তাহা বলা শক্ত। তবে এই মাছের সঙ্গে ইহার আকৃতিগত না হউক, অন্ততঃ প্রকৃতিগত কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বোধ হয় কেহ কেহ ইহাকে টর্পেডো নামে অভিহিত করিয়াছিল। যত দূর জানা যায় তাহাতে আমেরিকার পৌর যুদ্ধের সময়ই এই মারণাস্ত্রের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য ছাড়া তখনকার অস্ত্রের সহিত বর্ত্তমান টর্পেডোর আর কোনই সামঞ্জস্য নাই।

প্রত্যেক বছরেই এক-একটা উন্নততর যান্ত্রিক কৌশলের আবিষ্কার ও টর্পেডোতে তাহার প্রযোজনার ফলে টর্পেডোর নির্ম্মাণব্যয় যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনই ইহা একটি অব্যর্থ অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

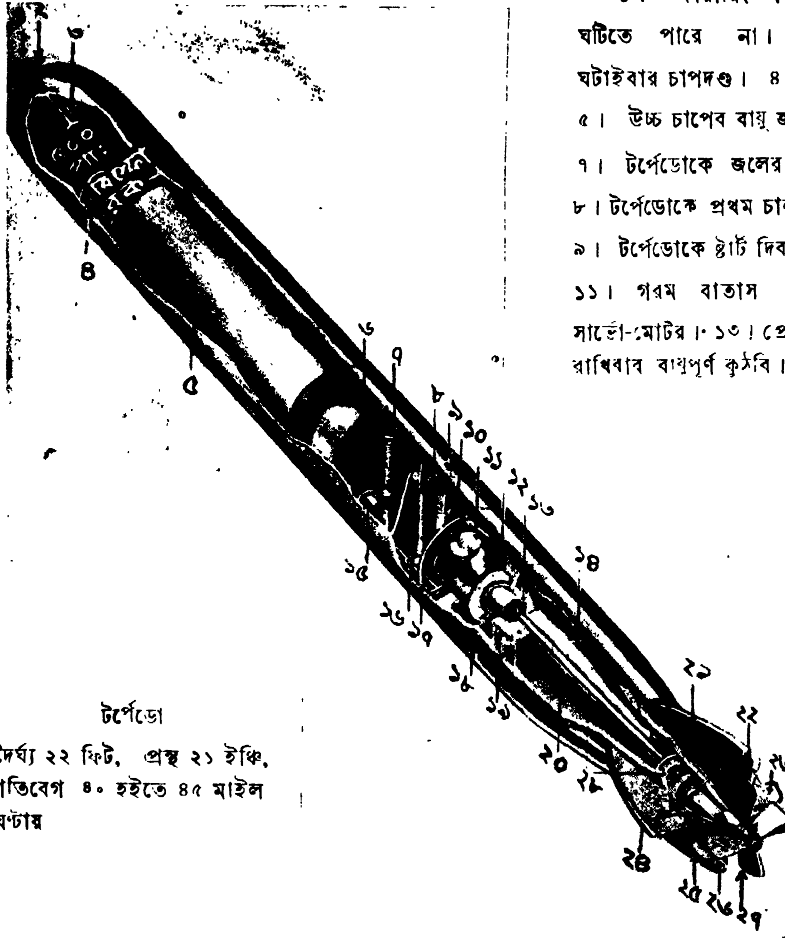
টর্পেডোর কার্য্যপ্রণালী অতি সরল; কিন্তু গঠনপ্রণালী অতি জটিল। ইহার ধাতুনির্ম্মিত লম্বা চোঙ দেখিতে কতকটা বর্ম্মা চুরুটের মত। টর্পেডো লম্বায় প্রায় ২২ ফুট, প্রস্থে ২১ ইঞ্চি। মাথার দিক ডিম্বাকৃতি পিছনের দিক সুচালো। জলের উপর হইতেই ছোড়া হউক, কি নীচ হইতেই ছোড়া হউক, সর্ব্বদাই ইহা জলের নীচ দিয়া লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়া যায়। কোন রকমে দিক পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ ঘটিলেও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-সাহায্যে নিজে নিজে হাল ঘুরাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিকেই অগ্রসর হইতে পারে। ধাক্কা লাগিবামাত্রই প্রচণ্ড বেগে বিস্ফোরণ ঘটিয়া জাহাজকেও ধ্বংস করে, নিজেও ধ্বংস হইয়া যায়। এ পর্য্যন্ত যত রকম জটিল কলকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে টর্পেডো তাহার অন্যতম। একটি টর্পেডো নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২৫ হইতে ৩০

হাজার টাকার মত ব্যয় হয়। প্রত্যেক টর্পেডোতে প্রায় ৬০০০-এর উপর বিভিন্ন যান্ত্রিক অংশ আছে। একটি ক্ষুদ্রতম হাত-ঘড়ির সূক্ষ্মতম অংশ তৈয়ারী করিতে যেরূপ নিপুণতার প্রয়োজন তাহা অপেক্ষাও অধিকতর নিপুণতার সহিত ইহার প্রত্যেকটি অংশ নির্ম্মিত। গরম বাতাস পরিচালিত তিন অথবা চার সিলিণ্ডারের এঞ্জিনটি আরও বিস্ময়ের বস্তু। ওজনে ইহা ২৫।৩০ সেরের বেশী না হইলেও শক্তি উৎপাদন করে ৫০০ অশ্ব-শক্তির।

টর্পেডোর অভ্যন্তর-ভাগ কতকগুলি বিভিন্ন কুঠরিতে বিভক্ত। লম্বা চোঙটার মাথার দিকে থাকে প্রায় ৫।৬ মণ ওজনের ভীষণ প্রকৃতির বিস্ফোরক গান্-কটন (চলতি কথায় T. N. T. নামে পরিচিত)। বন্দুকের ঘোড়া টিপিলেই যেমন বারুদে বিস্ফোরণ ঘটে, টর্পেডোর বারুদস্তূপে বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য তাহার সম্মুখভাগে পিচকারির হাতলের মত সেইরূপ একটি ধাতব দণ্ড বাহির হইয়া থাকে। ধাক্কা লাগিবা-মাত্রই দণ্ডটি অতিবেগে ভিতরে ঢুকিয়া প্রবল চাপে বারুদস্তূপে বিস্ফোরণ ঘটায়। বারুদকুঠরির পরেই থাকে টর্পেডোর ভারসাম্য, রক্ষা করিবার জন্য জলপূর্ণ ক্ষুদ্র কুঠরি। তার পিছনেই উচ্চ চাপে বায়ু সঞ্চিত রাখিবার কুঠরি। এই কুঠরি ঘাতসহ সুদৃঢ় ইস্পাতে নির্ম্মিত। বায়ুর সাধারণ চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাড়ে সাত সের। কিন্তু টর্পেডোর এই কুঠরিতে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ৩১ মণ ১০ সের। এই ভীষণ চাপের বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া আরও চাপ বাড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলে প্যারাফিন বাষ্প ও আলকোহল গ্যাস মিশ্রিত হইয়া এই বায়ু এঞ্জিনে প্রবেশ করে। এঞ্জিনের 'টারবাইন হুইল' দুইটি। ইহারা ঘোরে মিনিটে ১০ ০০০ বারেরও বেশী। হুইল দুইটির ঘূর্ণন-গতি পরস্পর বিপরীতাভিমুখী। ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রোপেলার-যন্ত্র দুইটি পিচকারির মত একটির অভ্যন্তরে আর একটি স্থাপিত। প্রোপেলার দুইটি টর্পেডোর সর্ব্বপশ্চাতে বহির্দ্দেশে অবস্থিত। 'ফ্লাই হুইল' দুটি যত জোরে ঘোরে, প্রোপেলার কিন্তু তত জোরে ঘোরে না। দাঁতওয়ালা চাকার সাহায্যে ঘূর্ণনবেগ কমাইয়া মিনিটে প্রায় ১৫০০ বার করা হয় নচেৎ অত জোরে ঘুরিলে প্রোপেলারের পিছনে 'এয়ার-পকেট' উৎপন্ন হইত এবং টর্পেডোর গতিবেগ অসম্ভবরূপে মন্দীভূত হইয়া যাইত।

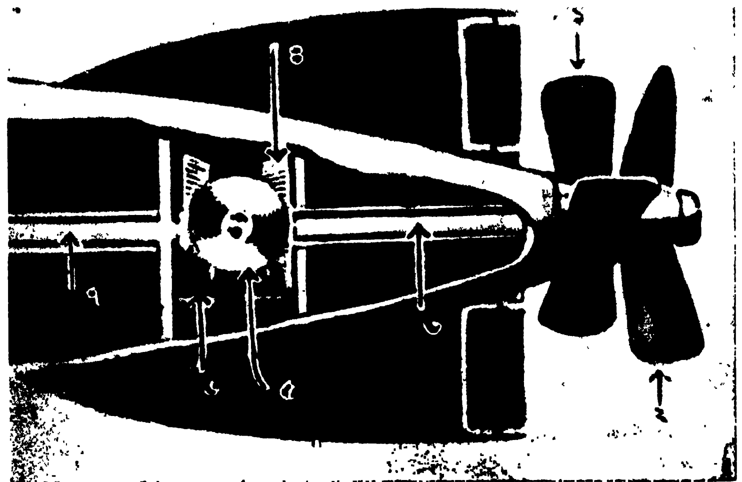
টর্পেডোর বায়ুকুঠরির পরেই থাকে 'ব্যালান্স চেম্বার,' তার পরে এঞ্জিন-ঘর। চলিবার সময় টর্পেডোকে জলের নীচে একটা নির্দ্দিষ্ট গভীরতায় রাখা দরকার। সেই জন্য 'ডেপথ-গিয়ার' নামে এক-প্রকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। নমনীয় একখানি ধাতু-পর্দাকে স্প্রিঙের টানে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। এই ধাতব-

১। ফায়ারিং পিন। এই পিনটী না খুলিলে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে না। ২। সেফটী স্ক্রু ৩। বিস্ফোরণ ঘটাইবার চাপদণ্ড। ৪। ভারসাম্য রক্ষার জন্য জলপূর্ণ কুঠরি। ৫। উচ্চ চাপের বায়ু জমা রাখিবার পাত্র। ৬। জলপূর্ণ কুঠরি। ৭। টর্পেডোকে জলের নীচে নির্দ্দিষ্ট গভীরতায় রাখিবার যন্ত্র। ৮। টর্পেডোকে প্রথম চালু করিবার ভাল্‌ভ্‌ ও চাপ-নিয়ামক যন্ত্র। ৯। টর্পেডোকে ষ্টার্ট দিবার ট্রিগার। ১০। তাপোৎপাদক যন্ত্র। ১১। গরম বাতাস পরিচালিত ৪-সিলিণ্ডার এঞ্জিন। ১২। সার্ভো-মোটর। ১৩। প্রোপেলার-দণ্ড। ১৪। টর্পেডোকে ভাসমান রাখিবার বায়ুপূর্ণ কুঠরি। ১৫। শয়ানভাবে অবস্থিত হাল নিয়ন্ত্রণ করিবার যন্ত্র। ১৬। প্যারাফিন পূর্ণ পাত্র। ১৭ ও ১৮। প্রোপেলার পরিচালক এঞ্জিনের (১১) কুঠরি। ১৯। জাইরোস্কোপ। ইহার সাহায্যে পিছনের খাড়া হাল আপনা আপনিই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ২০। প্রোপেলার-দণ্ড। ২১। টর্পেডোর উপরের দিকের খাড়া পাখনা। ২২। খাড়া হাল। ২৩। শয়ানভাবে অবস্থিত হাল। ২৪। পাশের দিকের পাখনা। ২৫। নীচের দিকের পাখনা ও হাল। ২৬। সম্মুখের প্রোপেলার। ২৭। পিছনের প্রেপেলার। ২৮। একসঙ্গে দুইটি চাকা দুইদিকে ঘুরাইবার আবর্ত্ত-বেগ কমাইবার গিয়ার বক্স।



টর্পেডো

দৈর্ঘ্য ২২ ফিট, প্রস্থ ২১ ইঞ্চি, গতিবেগ ৪০ হইতে ৪৫ মাইল ঘণ্টায়



টর্পেডোর পিছনের দিক

১ ও ২। সম্মুখের ও পিছনের প্রপেলার। ৩। ভিতরে ও বাহিরে দুইটি প্রপেলার-দণ্ড। ৪। কাঁপা প্রপেলার-দণ্ড ঘুরাইবার চাকা। ৫। প্রপেলারের আবর্ত্তাবেগ কমাইবার 'গিয়ার'। ৭। প্রপেলার-দণ্ড

পর্দাখানি এমন ভাবে স্থাপিত যে ইহার উপর সমুদ্রজলের চাপ পড়িতে পারে। চলিতে চলিতে টর্পেডো একটু উপরে উঠিলে বা একটু নীচে নামিলে জলের চাপের তারতম্য ঘটে। পর্দাখানি কয়েকটি 'লিভারে'র সহিত সংযুক্ত। লিভারগুলি আবার টর্পেডোকে উঁচু অথবা নীচু দিকে চালাইবার জন্য শয়ানভাবে অবস্থিত হালের সঙ্গে সংলগ্ন। কাজেই জলের চাপের তারতম্যানুযায়ী পর্দাখানি যেদিকে বাঁকে সেদিকের লিভারের উপর কাজ করিয়া শয়ানভাবে অবস্থিত হালের মুখ ঘুরাইয়া টর্পেডোকে নির্দ্দিষ্ট গভীরতায় লইয়া আসে। অধিকন্তু ইহার সহিত একটি ভারী 'পেণ্ডুলাম' বা দোলকও সংযুক্ত থাকে। জলের নীচে চলিবার সময় টর্পেডোর মুখ যদি কোনক্রমে ৩।৪ ডিগ্রির বেশী উন্নত বা অবনমিত হইয়া পড়ে তবে এই পেণ্ডুলাম-সংশ্লিষ্ট যন্ত্র-সাহায্যে তাহা সংশোধিত হইয়া যায়।

এঞ্জিন-কামরার পিছনেই থাকে জাইরোস্কোপ। ইহা একটি অদ্ভুত যন্ত্র। টর্পেডোকে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে এক দিকে চালাইবার জন্য এই যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। টর্পেডোকে সুনির্দ্দিষ্ট এক দিকে চালাইবার জন্য নির্ম্মাণকারীদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। সোজাসুজি চলিবার জন্য খাড়া হাল নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা না থাকিলে ইহা কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই হয়ত বৃত্তাকারে এক স্থানে ঘুরিতে থাকিত নচেৎ ঠিক লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছিয়া অন্যদিকে চলিয়া যাইত। অনেক রকম কলকব্জার সাহায্যে ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর জাইরোস্কোপের সাহায্যে তাঁহারা এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। কুমোরের চাকের মত খুব ভারী অথচ ছোট্ট একটি যন্ত্র লাটুর 'আলে'র মত উভয় দিকে প্রসারিত দুইটি 'আলের' উপর ঘোরে। এই 'আল' দুইটি আবার ঘূর্ণনক্ষম একটি ফ্রেমে আবদ্ধ। উচ্চ চাপের বায়ু অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ইহাকে অতি দ্রুতবেগে ঘুরানো হয়। ইহার আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহার অক্ষদণ্ড যেদিকে রাখিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, ঠিক সেই দিকেই সে অনবরত ঘুরিয়া থাকে, কোনক্রমেই দিক পরিবর্ত্তন হয় না। আজকাল বড় বড় জাহাজ, এরোপ্লেন প্রভৃতিকে নির্দ্দিষ্ট দিকে চালাইবার জন্য অথবা দোলন নিবারণ করিবার জন্য জাইরোস্কোপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টর্পেডোর পিছনের খাড়াভাবে অবস্থিত হালটির সহিত জাইরোস্কোপ এমন সুকৌশলে সংযুক্ত যে টর্পেডোর মুখ ডাইনে কিংবা বামে একটু ঘুরিতে চেষ্টা করিলেও তাহা আপনাআপনিই সংশোধিত হইয়া ঠিক পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিতে থাকে।

জাইরোস্কোপ কেমন করিয়া টর্পেডোকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট এক দিকে চালাইয়া লয় একটা দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনে করুন, উপর হইতে ঝুলানো লম্বা ও চৌকা একটা ফ্রেমের নীচের দিকে, উপরের দিক খোলা একটা বাক্স বসানো আছে। ফ্রেমের উপর দিক হইতে সরু ও লম্বা সুতার সাহায্যে বাক্সটার তলার একটু উপরে একটা ভারী পেণ্ডুলাম বাঁধা রহিয়াছে। ফ্রেমটাকে যদি সামনে ও পিছনে দোল দেওয়া যায় তবে ভারী পেণ্ডুলামটি সেই ফ্রেম হইতে ঝুলিয়া থাকা সত্ত্বেও প্রায় একই স্থানে স্থির ভাবে থাকিবে, ফ্রেমটির সঙ্গে দোল খাইবে না। ইহার ফলে এই হইবে যে, বাক্সটি যখন দোল খাইয়া পিছনে যাইবে তখন তাহার সম্মুখের খাড়া দেয়াল পেণ্ডুলাম স্পর্শ করিবে, আবার যখন সামনে আসিবে তখন তাহার পশ্চাদ্ভাগের খাড়া দিকটা পেণ্ডুলাম স্পর্শ করিবে। এখন যদি বাতাস-ভর্ত্তি একটা বেলুন হইতে হালুকা স্প্রিংয়ের সাহায্যে মুখবন্ধ দুইটি নল বাহির করিয়া পেণ্ডুলামের সমসূত্রে বাক্সের ভিতরের দিকের দেয়ালে আঁটিয়া দেওয়া হয় তবে দেখা যাইবে বাক্সের দোলনের ফলে যখন যেদিকের স্প্রিংটি পেণ্ডুলামের সহিত চাপ খাইতেছে তখনই সে একটু সরিয়া গিয়া বেলুনের বাতাস বাহির হইবার রাস্তা করিয়া দিতেছে। জাইরোস্কোপও সেরূপ একটি ভারী বস্তুর মত এক দিকে মুখ রাখিয়াই স্থির ভাবে ঘুরিতেছে। নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও সে যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে-ফ্রেমের মধ্যে জাইরোস্কোপ স্থাপিত, সে-ফ্রেমটাও আবার 'আলে'র উপর অবস্থিত। প্রয়োজন মত সেও আবার 'আলে'র উপর আবর্ত্তন করিতে পারে; কাজেই জাইরোস্কোপ টর্পেডোর মধ্যে স্থাপিত হইলেও তাহার সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক নাই। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই এক নির্দ্দিষ্ট দিকে কেন্দ্র রাখিয়া ঘুরিয়া থাকে। টর্পেডোকে সোজাভাবে চালাইবার জন্য খাড়া হালটির সঙ্গে সংযুক্ত বায়ুচালিত ছোট্ট একটি সার্ভো-মোটর আছে। এই মোটরে বায়ু প্রবেশ করিবার পথে দুইটি 'ভাল্‌ভ' জাইরোস্কোপের ফ্রেমের পাশে এমন ভাবে অবস্থিত যে টর্পেডো সোজা রাস্তা ছাড়িয়া যে কোন এক দিকে মোড় খাইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'ভাল্‌ভ' খুলিয়া যায় এবং সেই পথে বায়ু প্রবেশ করিয়া মোটর চলিতে থাকে। মোটর হালটিকে ঠিক করিয়া টর্পেডোর গতিপথ সংশোধন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার 'ভাল্‌ভ' বন্ধ হইয়া যায়। জাইরোস্কোপটিকে পেণ্ডুলাম এবং বাক্সটিকে টর্পেডোর মত ধরিয়া লইলে কৌশলটা অনুমান করিবার সুবিধা হইতে পারে।

টর্পেডোকে চালাইবার জন্য পিছনের দিকে দুইটি প্রোপেলার আছে। এই প্রোপেলার দুইটি একসঙ্গেই পরস্পর বিপরীত দিকে ঘুরিয়া থাকে। একটি প্রোপেলার চালিত হইলে টর্পেডো রাইফেলের গুলির মত পাক খাইতে খাইতে অগ্রসর হইত, তাহাতে অসুবিধা ছিল অনেক। এক সঙ্গে দুইখানি প্রোপেলার পরস্পর বিপরীত দিকে ঘুরিলে মোটেই পাক খাইবার সম্ভাবনা থাকে না। টর্পেডো ছুড়িবার পর নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে কোনক্রমে যাহাতে বিস্ফোরণ না ঘটিতে পারে সেজন্য ইহার সম্মুখভাগে পাখার মত একটি স্ক্রু ও একটি স্বয়ংক্রিয় পিন থাকে। চলিবার সময় জলের চাপে স্ক্রুটি ধীরে ধীরে খুলিতে থাকে এবং সময়মত পিনটি আপনা-আপনি সরিয়া যায়। স্ক্রুটি না খুলিলে এবং পিনটি না সরিলে ধাক্কা লাগিলেও বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে যাহাতে সেটি শত্রুর হস্তগত না হয় তাহার জন্যও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রহিয়াছে। হয় সেটি ফিরিয়া আসিবে নয় তো আপনা-আপনি ডুবিয়া যাইবে। টর্পেডোর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাহাজের চতুর্দ্দিকে তারের জালের ঘের দেওয়া হয়। কিন্তু এই জাল কাটিয়া অগ্রসর হইবার জন্যও টর্পেডোকে নূতন অস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এঞ্জিনের ও অন্যান্য অংশের নিয়ন্ত্রণ ও লুব্রিকেশনের জন্য যে সকল যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাও কম বিস্ময়কর নহে। জলের নীচে টর্পেডো চলে ঘণ্টায় প্রায় ৪০ হইতে ৪৫ মাইল বেগে। এই অভাবনীয় গতিবেগ রক্ষা করিতে ভিতরের কলকব্জা অসম্ভবরূপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় লুব্রিকেশন ভাল না থাকিলে হয় টর্পেডো জলের উপর লাফাইয়া উঠিবে নয় তো এক-আধ মিনিটের মধ্যেই অতিরিক্ত উত্তাপে সমস্ত কলকব্জা গলিয়া পিণ্ডাকার ধারণ করিবে। এই জন্য টর্পেডোর অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র যেমন বাহিরের জলের সাহায্যে ঠাণ্ডা রাখিবার ব্যবস্থা আছে তেমন আবার লুব্রিকেশনের জন্যও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রহিয়াছে।

মহিলা-সংবাদ

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীমতী অমিতা সেনের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার শিশুর মত সরলতা, মধুর স্বভাব ও সঙ্গীতমাধুর্যের জন্য ছোট-বড়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজন সকলেরই সে প্রিয় ছিল। তাহার শৈশবে শান্তিনিকেতনে তাহাকে "খুকু" বলিয়া জানিতাম, ডাকিতাম ও স্নেহ করিতাম। মৃত্যুকালে তাহার বয়স যে ছাব্বিশ হইয়াছিল, তাহার একটি ছোট বোনের একটি লেখা হইতে তাহা প্রথমে জানিতে ও বুঝিতে পারিলাম। সে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে খুকুই ছিল।

শিশুকাল হইতেই তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বাড়ীর একটি ছেলেকে পড়িতে দেখিয়া চারি বৎসর বয়সেই সে আপনার চেষ্টাতেই পড়িতে শিখে। তদবধি পাঠে তাহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। শান্তিনিকেতনের বৃহৎ গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহার সে করিত। বীণা-বাদন, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতিতেও তাহার 'হাত' ছিল, অভিনয়ে ও গল্প বলাতেও তাহার স্বাভাবিক পটুতা ছিল। কিন্তু অধ্যয়নানুরাগ ও অদম্য জ্ঞানপিপাসা তাহার প্রতিভার এই দিকগুলি বিকশিত হইতে দেয় নাই। পরীক্ষার জন্য পঠনীয় পুস্তক ব্যতীত অন্য অনেক বহি সে পড়িত বলিয়া সাধারণতঃ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিত না, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাহার জ্ঞানের পরিসর ও গভীরতা প্রশংসনীয় ছিল। বি.এ. পরীক্ষায় সে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

যখন গান্ধীজী প্রথম কারাবরণ করেন, তখন তাহার বয়স ৬।৭ বৎসর। তখনই সে তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব, ত্যাগ ও দেশভক্তির প্রশংসাসূচক একটি গান রচনা করিয়া নিজেই তাহাতে সুর বসাইয়া তাহা বাঁকীপুরের রামমোহন রায় সেমিনারির ময়দানে গাহিয়াছিল।

যদিও সে বিদুষী ছিল, সুগায়িকা বলিয়াই তাহার সমধিক খ্যাতি ছিল। সে কিছুদিন শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনে অধ্যাপিকার কাজ করিয়াছিল। সে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিষ্য ছিল। কবি তাহাকে এক বার একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "গান শুধু তোর কণ্ঠের কুশলতা নয়, তোর অন্তরের সম্পদ, বিধাতার দুর্লভ দান। এই কথা মনে করে তাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার ও যত্নের সঙ্গে রক্ষা করবি।"

রবীন্দ্রনাথের গীতাবলীর সে গভীর ভাবগ্রাহী ছিল। তৎসমুদয়ের আধ্যাত্মিক সম্পদ তাহার প্রাণের নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতায় ঝঙ্কার তুলিত। যখন সেই সকল গান গাহিত, ভাবে তন্ময় হইয়া গাহিত। গানে তাহার ক্লান্তি ছিল না। গাহিতে বলিলে অনেক গায়ক-গায়িকা কৃত্রিম বিনয় ও অনিচ্ছা দেখায়। তাহার সে রোগ ছিল না। গাহিতে বলিলেই প্রফুল্লচিত্তে গান ধরিত—যেন সে জীবন্ত গ্রামোফোন।



শ্রীমতী অমিতা সেন, এম্. এ.

আর্ত ও রোগীর সেবায় তাহার অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতে পারি।

দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভুগিবার পর যখনই তাহার আরোগ্যলাভের আশা হইয়াছে, তখনই সে সুস্থ হইয়া জগতের কল্যাণকর কি সব কাজ করিবে তাহারই সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিয়াছে, কল্পনায় নিজের জন্য কোন সাংসারিক-সুখের-ঘর বাঁধে নাই। ইহলোকে তাহার অভিলাষ অপূর্ণ রহিয়া গেল। কিন্তু

"যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা,
জানি গো জানি তাও
হয় নি হারা।"

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

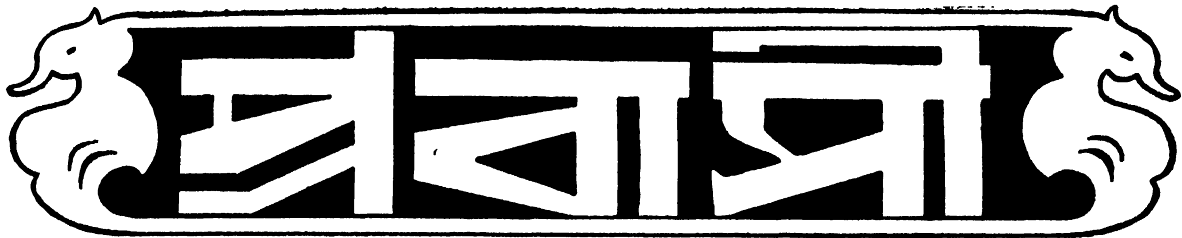
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



খেয়া

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

২য় সংখ্যা

সার্থকতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন দক্ষিণ অর্ণবে,
অতল বিরহ তার যুগযুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য অশান্তের
সীমানার ধারে।
ব্যথার ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া
বেড়ালো যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল সাথে।
অবশেষে রজনীপ্রভাতে
জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিঃশ্বাসবেগে একটুকু মল্লিকার কলি।
উদ্বারিল গন্ধ তার,
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার।
এই বার্তা ঘোষিল অম্বরে
সমুদ্রের উদ্বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে॥

৭ আশ্বিন
১৩৪৫

জানালায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেলা হয়ে গেল তোমার জানালা পরে
রৌদ্র পড়েছে বেঁকে।
এলোমেলো হাওয়া আমলকি ডালে ডালে
দোলা দেয় থেকে থেকে।
মন্থর পায়ে
চলেছে মহিষগুলি,
রাঙা পথ হ'তে
রহি রহি ওড়ে ধূলি,
নানা পাখিদের মিশ্রিত কাকলীতে,
আকাশ আবিল ম্লান সোনালির শীতে।
পসারী হোথায় হাঁক দিয়ে যায়
গলি বেয়ে কোন্ দূরে,
ভুলে গেছি যাহা তারি ধ্বনি বাজে
বক্ষে করুণ সুরে।
চোখে পড়ে খনে খনে
তব জানালায় কম্পিত ছায়া
খেলিছে রৌদ্রসনে।
কেন মনে হয় যেন দূর ইতিহাসে
কোনো বিদেশের কবি
বিদেশী ভাষায় ছন্দে দিয়েছে এঁকে
এ বাতায়নের ছবি।
ঘরের ভিতরে যে প্রাণের ধারা চলে
সে যেন অতীত কাহিনীর কথা বলে।
ছায়া দিয়ে ঢাকা সুখদুঃখের মাঝে
গুঞ্জনসুরে সুরশৃঙ্গার বাজে।
যারা আসে যায় তাদের ছায়ায়
প্রবাসের ব্যথা কাঁপে,
আমার চক্ষু তন্দ্রা-অলস
মধ্যদিনের তাপে।
ঘাসের উপরে একা বসে থাকি
দেখি চেয়ে দূর থেকে
শীতের বেলার রৌদ্র তোমার
জানালায় পড়ে বেঁকে॥

১৫।১।৪০

জন্মদিনে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বটগাছের দেহগঠনের উপকরণ অন্যান্য বনস্পতির মূল উপকরণ থেকে অভিন্ন। সকল উদ্ভিদেরই সাধারণ ক্ষেত্রে সে আপন খাদ্য আহরণ ক'রে থাকে। সেই সকল উপকরণকে এবং খাদ্যকে আমরা ভিন্ন নাম দিতে পারি, নানা শ্রেণীতে তাদের বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পারি। কিন্তু অসংখ্য উদ্ভিদরূপের মধ্যে বিশেষ গাছকে বটগাছ করেই গড়ে তুলছে যে প্রবর্তনা, তন্দুর্দর্শং গূঢ়-মনুপ্রবিষ্টং, সেই অদৃশ্যকে সেই নিগূঢ়কে কী নাম দেব জানি নে। বলা যেতে পারে সে তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া। এ কেবল ব্যক্তিগত শ্রেণীগত পরিচয়কে জ্ঞাপন করবার স্বভাব নয়, সেই পরিচয়কে নিরন্তর অভিব্যক্ত করবার স্বভাব। সমস্ত গাছের সত্তায় সে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু সেই রহস্যকে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। ভ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্—সেই একের বেগ দেখা যায় তার কাজ দেখা যায়, তার রূপ দেখা যায় না। অসংখ্য পথের মাঝখানে অভ্রান্ত নৈপুণ্যে একটিমাত্র পথে সে আপন আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য সঙ্গোপনে রক্ষা ক'রে চলেছে, তার নিদ্রা নেই, তার স্খলন নেই।

নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যের কথা আমরা সহজে চিন্তা করি নে কিন্তু আমি তাকে বার-বার অনুভব করেছি। বিশেষ ভাবে আজ যখন আয়ুর প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছি তখন তার উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবনের যেটা চরম তাৎপর্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্ছে, তাকে বুঝতে পারছি সে প্রাণস্য প্রাণং, সে প্রাণের অন্তরতর প্রাণ। আমার মধ্যে সে যে সহজে যাত্রার পথ পেয়েছে তা নয়, পদে পদে তার প্রতিকূলতা ঘটেছে। এই জীবনযন্ত্র যে-সকল মালমসলা দিয়ে তৈরি, গুণী তার থেকে আপন সুর সব সময়ে নিখুঁত ক'রে বাজিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু জেনেছি মোটের উপর আমার মধ্যে তাঁর যা অভিপ্রায় তার প্রকৃতি কী। নানা দিকের নানা আকর্ষণে মাঝে মাঝে ভুল ক'রে বুঝেছি, বিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার মন অন্য পথে, মাঝে মাঝে হয়তো অন্য পথের শ্রেষ্ঠত্বগৌরবই আমাকে ভুলিয়েছে। এ কথা ভুলেছি প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের পথের মূল্যগৌরব স্বতন্ত্র। নটীর পূজা নাটিকায় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাঁদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ ক'রে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণ-মনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।

আমার মনে সন্দেহ নেই আমার মধ্যে সেই রকম সৃষ্টিসাধনকারী একাগ্র লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে চলেছেন একটি গূঢ় চৈতন্য, বাধার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরই প্রেরণায়

অর্ঘ্যপাত্রে জীবনের নৈবেদ্য আপন ঐক্যকে বিশিষ্টতাকে সমগ্র ভাবে প্রকাশ ক'রে তুলতে পারে যদি তার সেই সৌভাগ্য ঘটে। অর্থাৎ যদি তার গুহাহিত প্রবর্তনার সঙ্গে তার অবস্থা তার সংস্থানের অনুকূল সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, যদি বাজিয়ের সঙ্গে বাজনার একাত্মকতায় ব্যবধান না থাকে। আজ পিছন ফিরে দেখি যখন, তখন আমার প্রাণযাত্রার ঐক্যে সেই অভিব্যক্তিকে বাইরের দিক থেকে অনুসরণ করতে পারি, সেই সঙ্গে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি তাকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে অদৃশ্য পুরুষ একটি সংকল্পধারায় জীবনের তথ্যগুলিকে সত্যসূত্রে গ্রথিত ক'রে তুলছে।

আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন ক'রে দেখতে হবে। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে-সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারিদিকে। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়ে ছিল, তার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমার ছিল না। সাম্প্রদায়িক গুহাচর যে-সকল অনুকল্পনা, যে-সমস্ত কৃত্রিম আচার-বিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত ক'রে আছে, বহু শতাব্দী জুড়ে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত আকারে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির দুর্বারতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে মজ্জাগত অন্ধসংস্কারে পরিণত ক'রে তুলেছে, মধ্যযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্য দেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে নয় অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হয়েছে, কিন্তু যা আমাদের দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজ-ব্যবহারে মারাত্মক সংঘাতরূপ ধরেছে তার চলাচলের কোনো চিহ্ন সদরে বা অন্দরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিল না। এ-কথা বলবার তাৎপর্য এই যে জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটে নি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয় নি।

এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়করতা আছে, চারিদিকেই আছে অনির্বচনীয়তা, তার সঙ্গে মিশ্রিত হ'তে পারে নি আমার মনে কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস, কোনো বিশেষ পার্বণ-বিধি। আমার মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ হ'তে পেরেছে এই জগতের। বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হ'তে পারে না, সেই পূজার দীক্ষা বাইরে থেকে নয়, তার মন্ত্র নিজেই রচনা ক'রে এসেছি।

বাল্যবয়সের শীতের ভোরবেলা আজো আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রাত্রের অন্ধকার যেই পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এসেছে আমি তাড়াতাড়ি গায়ের লেপ ফেলে দিয়ে উঠে পড়েছি। বাড়ির ভিতরের প্রাচীর-ঘেরা বাগানের পূর্বপ্রান্তে এক সার নারকেলের পাতার ঝালর তখন অরুণ-আভায় শিশিরে ঝলমল ক'রে উঠেছে। এক দিনও পাছে এই শোভার পরিবেষণ থেকে বঞ্চিত হই সেই আশঙ্কায় পাতলা জামা গায়ে দিয়ে বুকের কাছে দুই হাত চেপে ধরে শীতকে উপেক্ষা ক'রে ছুটে যেতুম। উত্তর দিকে ঢেঁকিশালের গায়ে ছিল একটা পুরোনো বিলিতি আমড়ার গাছ, অন্য কোণে ছিল কুলগাছ, জীর্ণ পাতকুয়োর ধারে; কুপথ্যলোলুপ মেয়েরা দুপুরবেলায় তার তলায় ভিড় করত। মাঝখানে ছিল পূর্বযুগের দীর্ণ ফাটলের রেখা নিয়ে শ্যাওলায় চিহ্নিত শান-বাঁধানো চানকা। আর ছিল অযত্নে উপেক্ষিত অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, নাম করবার

যোগ্য আর কোনো গাছের কথা মনে পড়ে না। এই তো আমার বাগান, এই ছিল আমার যথেষ্ট। এইখানে যেন ভাঙা কানাওয়ালা পাত্র থেকে আমি পেতুম পিপাসার জল। সে জল লুকিয়ে ঢেলে দিত আমার ভিতরকার এক দরদী। বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এই জন্যেই আমার আসা। আমি সাধু নই সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার, বার-বার বলতে এসেছি ভালো লাগল আমার। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নামবামাত্র পূবের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তেতলার ছাদের উপরকার আকাশে নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এসেছে ঘননীলবর্ণ মেঘের পুঞ্জ। মুহূর্তমাত্রে সেই মেঘপুঞ্জের চেয়ে ঘনতর বিস্ময় আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এক দিকে দূরে মেঘমেদুর আকাশ, অন্য দিকে ভূতলে নতুন-আসা বালকের মন বিস্ময়ে আনন্দিত। এই আশ্চর্য মিল ঘটাবার প্রয়োজন ছিল, নইলে ছন্দ মেলে না। জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে দেখার ঔৎসুক্যকে নিত্য পূর্ণ করবার আবেগ আমি অনুভব করেছি। এ দেখা তো নিষ্ক্রিয় আলস্যপরতা নয়। এই দেখা এবং দেখানোর তালে তালেই সৃষ্টি।

ঋগ্বেদে একটি আশ্চর্য বচন আছে,

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে।

হে ইন্দ্র তোমার শত্রু নেই, তোমার নায়ক নেই, তোমার বন্ধু নেই তবু প্রকাশ হবার কালে যোগের দ্বারা বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর।

যত বড়ো ক্ষমতাশালী হোন না কেন সত্যভাবে প্রকাশ পেতে হ'লে বন্ধুতা চাই, আপনাকে ভালো লাগানো চাই। ভালো লাগাবার জন্য নিখিল বিশ্বে তাই তো এত অসংখ্য আয়োজন। তাই তো শব্দের থেকে গান জাগছে, রেখার থেকে রূপের অপরূপতা। সে যে কী আশ্চর্য সে আমরা ভুলে থাকি।

এ-কথা বলব সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক মহলে। ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের যোগ। জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে অমৃতরূপে। সেইখানে জায়গা নেয় ইন্দ্রের সখারা।

অন্তি সন্তং ন জহাতি,
অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার ন জীর্যতি।

কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু দেখো সেই দেবের কাব্য সে-কাব্য মরে না জীর্ণ হয় না।

জন্তুদের উপর সৃষ্টিকর্তার ক্রিয়া অব্যবহিত। তার থেকে তারা সরে এসে তাঁকে দেখতে পায় না। কেবলমাত্র নিয়মের সম্বন্ধে মানুষের সঙ্গে তাঁর যদি সম্বন্ধ হ'ত তাহলে সেই জন্তুদের মতোই কেবল অপরিহার্য ঘটনার ধারার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মানুষ তাঁকে পেত না। কিন্তু দেবতার কাব্যে নিয়মজালের ভিতর থেকেই নিয়মের অতীত যিনি তিনি আবির্ভূত। সেই কাব্যে কেবলমাত্র আছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রকাশ।

এই প্রকাশের কথায় ঋষি বলেছেন,

"অবির্বৈ নাম দেবত র্তেনাস্তে পরীবৃতা
তস্যারূপেনেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ।

সেই দেবতার নাম অবি, তাঁর দ্বারা সমস্তই পরীবৃত—এই যে সব বৃক্ষ, তাঁরই রূপের দ্বারা এরা হয়েছে সবুজ, পরেছে সবুজের মালা।

ঋষি-কবি দেখতে পেয়েছিলেন কবির প্রকাশকে কবির দৃষ্টিতেই। সবুজের মালা-পরা এই আবির আবির্ভাবের এমন কোনো কারণ দেখানো যায় না যার অর্থ আছে প্রয়োজনে। বলা যায় না কেন খুশি ক'রে দিলেন। এই খুশি সকল পাওনার উপরের পাওনা। এর উপরে জীবিকাপ্রয়াসী জন্তুর কোনো দাবী নেই। ঋষি-কবি বলেছেন, বিশ্বস্রষ্টা তাঁর অর্ধেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিখিল জগৎ। তার পরে ঋষি প্রশ্ন করেছেন তদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ তাঁর বাকি সেই অর্ধেক যায় কোন্‌দিকে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর জানি। সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ, এই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ। বস্তুপুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহা অবকাশ না থাকলে অনির্বচনীয়কে পেতুম কোন্‌খানে। সৃষ্টির উপরে অসৃষ্টের স্পর্শ নামে সেইখানেই, আকাশ থেকে পৃথিবীতে যেমন নামে আলোক। অত্যন্ত কাছের সংস্রবে কাব্যকে পাই নে, কাব্য আছে রূপকে ধ্বনিকে পেরিয়ে যেখানে আছে স্রষ্টার সেই অর্ধেক যা বস্তুতে আবদ্ধ নয়। এই বিরাট্‌ অবাস্তবে ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রসখার ভাবের মিলন ঘটে। ব্যক্তের বীণাযন্ত্র আপন বাণী পাঠায় অব্যক্তে।

নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারদিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত ক'রে দেখি নি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।

এক দিন আমি বলেছিলুম,

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—

ঋগ্বেদের কবি বলেছেন,

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ
পুনঃ প্রাণমিহনো ধেহি ভোগম্‌
জ্যোক্‌ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্‌
অনুমতে মৃড়য় নয়ঃ স্বস্তি।

প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সবদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।

এই তো বন্ধুর কথা, বন্ধুর প্রকাশ ভালো লেগেছে। এর চেয়ে স্তবগান কি আর কিছু আছে? দেবস্য পশ্য কাব্যম্‌—মন বলছে কাব্যকে দেখো, এ দেখার অন্ত চিন্তা করা যায় না।

এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁর সঙ্গে কি আমার কর্মের যোগ হয় নি।

হয়েছে, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সে লোহালক্কড়ে বাঁধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়। কর্মরূপে সেও কাব্য। একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্রে—আহ্বান করেছিলুম এখানকার জল-স্থল-আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে

প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী-গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎসব-প্রাঙ্গণে উদ্বোধিত করেছিলুম।

এখানে প্রথম থেকেই বিরাজিত ছিল সৃষ্টির স্বত-উদ্ভাবনার তত্ত্ব। আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত ক'রে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।

বেদে আছে,

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন স ধীনাং যোগ মন্বোতি।

অর্থাৎ যাঁকে বাদ দিয়ে বড়ো বড়ো জ্ঞানীদেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না তিনি বুদ্ধিযোগের দ্বারাই মিলিত হন্, মন্ত্রের যোগে নয়, যাদুমূলক অনুষ্ঠানের যোগে নয়—তাই ধী এবং আনন্দ এই দুই শক্তিকে এখানকার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি।

এখানে যেমন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ, তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ ক'রে তুলতে। কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে সৃষ্টিপরতার জায়গায় নির্মাণপরতা আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায়। কবির সাহিত্যিক কাব্য যে ছন্দ ও ভাষাকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পায় সে একান্তই তার নিজের আয়ত্তাধীন। কিন্তু যেখানে বহু লোককে নিয়ে সৃষ্টি সেখানে সৃষ্টিকার্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব হয় না। মানবসমাজে এই রকম অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপস্যা সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে মুক্তি হারিয়ে পাথর হয়ে ওঠে। তাই এইটুকু মাত্র আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এই আশ্রমের মূলতত্ত্বকে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে দেবে না।

জানি নে আর কখনো উপলক্ষ্য হবে কিনা, তাই আজ আমার আশী বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত ক'রে যেতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনোই সম্ভবপর হয় না। তাই নিজেকে দেখতে হয় অন্তর্দিকের প্রবর্তনা ও বহির্দিকের অভিমুখিতা থেকে। আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বার-বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সেই আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি পশ্য দেবস্য কাব্যং, মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখ। আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার, তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়। যাঁরা প্রথম-অবস্থায় আমাকে এই আশ্রমের মধ্যে দেখেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ জানেন এই আশ্রমের স্বরূপটি আমার মনে কী রকম ছিল। তখন উপকরণবিরলতা ছিল এর বিশেষত্ব। সরল জীবনযাত্রা এখানে চারদিকে বিস্তার করেছিল সত্যের বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা। খেলাধূলায় গানে-অভিনয়ে ছেলেদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবারিত হ'ত নবনবোন্মেষশালী আত্মপ্রকাশে। যে শান্তকে শিবকে অদ্বৈতকে ধ্যানে অন্তরে আহ্বান করেছি তখন তাকে দেখা সহজ ছিল কর্মে। কেননা কর্ম

ছিল সহজ, দিনপদ্ধতি ছিল সরল, ছাত্রসংখ্যা ছিল স্বল্প, এবং অল্প যে কয়জন শিক্ষক ছিলেন আমার সহযোগী তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন এতস্মিন্ খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ—এই অক্ষর-পুরুষে আকাশ ওতপ্রোত। তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারতেন তমেবৈকং জানথ আত্মানম্—সেই এককে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্যেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে নয়, মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়বুদ্ধিতে নয়, আত্মার প্রেরণায়। এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তখনকার দিনকৃত্যের অর্থদৈন্যে ছিল ধৈর্যশীল ত্যাগধর্মের উজ্জ্বলতা।

সেই এক দিন তখন বালক ছিলাম। জানি নে কোন্ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতসূর্যের আলোক এসে সমস্ত মানবসম্বন্ধকে আমার কাছে অকস্মাৎ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান ক'রে দেখিয়েছিল। যদিও সে আলোক প্রাত্যহিক জীবনের মলিনতায় অনতিবিলম্বে বিলীন হয়ে গেল, তবু মনে আশা করেছিলুম পৃথিবী থেকে অবসর নেবার পূর্বে একদিন নিখিল মানবকে সেই এক আত্মার আলোক প্রদীপ্তরূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে পারব। কিন্তু অন্তরের উদয়াচলে সেই জ্যোতিপ্রবাহের পথ নানা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তা হোক্ তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে যেতে পারলুম। এই আশ্রমে এক দিন যে যজ্ঞভূমি রচনা করেছি সেখানকার নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে সেই মানবের আতিথ্য রক্ষা করতে পেরেছি যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হয়েছে অতিথিদেবো ভব। অতিথির মধ্যে আছেন দেবতা। কর্মসফলতার অহংকার মনকে অধিকার করে নি তা বলতে পারি নে—কিন্তু সেই দুর্বলতাকে অতিক্রম ক'রে উদ্বেল হয়েছে আত্মোৎসর্গের চরিতার্থতা। এখানে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি বুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধিকে নিষ্কাম সাধনায় সম্মিলিত করতে।

সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে এখানে আমি শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখবার শুভ অবকাশ ব্যর্থ করি নি। বার-বার কামনা করেছি

স একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

শান্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ, ১৩৪৭



মামলা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাসাখানি গায়ে লাগা আর্মানি গির্জার—
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু-দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার।
হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁসে,
নালিশটা কী নিয়ে যে জানে না তা কেহ সে।
সে কি ল্যাজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তকরার,
হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার।
কিংবা মিয়াঁও ব'লে থাবা তুলে ডেকেছিল,
তখন সামনে তার দু-ভাইয়ের কে কে ছিল।
সাক্ষীর ভিড় হোলো দলে দলে তা নিয়ে,
আওয়াজ যাচাই হোলো ওস্তাদ আনিয়ে।
কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে।
চাঁই চাঁই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, প্যাঁচ মারে কুস্তির,
জজ সা'ব কী করে যে থাকে বলো সুস্থির।
সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সর্দার
চলে এল উটে চড়ে, পিছে ঝাড়ু-বরদার।
উটেতে কামড় দিল, হোলো তার পা-টুটা,
বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।
খেসারৎ নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের,
ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।
বাজারে মেলে না আর আখরোট খোবানি,
কাঁউসিল ঘরে আজ কী নাকানি চোবানি।
মোবারক শেখ বলে ফুটো করে গুলিতে
আলুবোখারার এই তিন বোঝা ঝুলিতে।
ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণা-বিভাগে
এ কাবুলি বিড়ালের নাড়ীতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই
মার্জার গুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি।

এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরী,
নাইল-তটিনীতটবিহারিণী কিশোরী।
রোয়াঁতে সে ইরানি যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে
এখনি পাঠানো চাই Wimবিলডনেতে।
বাঙালী থীসিসওলা পড়ে গেছে ভাবনায়
ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়।
আরমানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
কোনোখানে এক তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে।
কেম্‌ব্রিজ খালি হোলো আসে সব স্কলারে,
কী ভীষণ হাড়কাটা করাতের ফলা রে।
বিজ্ঞানীদল এল বর্লিন ঝাঁটিয়ে,
হাত-পাকা, জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ঘাঁটিয়ে।
জজ বলে "বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
আইডেন্‌টিটি তার আদালতে আনা চাই।"
বিড়ালের দেখা নাই ঘরেও না বনে না,
মিআঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।
জজ বলে, "সাক্ষীরে কোন্‌খানে ঢুকোলো,
অত বড়ো ল্যাজের কি আগাগোড়া লুকোলো?"
পেয়াদা বললে, "ল্যাজ গেছে মিউজিয়মে,
প্রিভিকৌঁসিলে দেওয়া আইনের নিয়মে।"
জজ বলে, "গোঁফ পেলে র'বে মোর সম্মান,"
পেয়াদা বললে, "তারো নয় বড়ো কম মান।
মিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ যত্নেই,
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।"
"বিড়াল ফেরার হোলো নাই নামগন্ধ";
জজ বলে "তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ?"
তখনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পা-চারি,
থেকে থেকে হুংকারে কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, "গেল কোথা ফরিয়াদি আসামী,"
"হুজুর"—পেয়াদা বলে, "বেটাদের চাষামী।
শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়,
ব'লে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায়।
কণ্ঠে এমনি ফাঁস এঁটে দিল জড়িয়ে,
মোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে॥"

উদয়ন

১৮।২।৪০

নির্মোক

"বনফুল"

৪

শ্রীযুক্ত হীরালাল মৌলিক তাঁহার দশ পার্সেণ্ট স্থগার সত্ত্বেও আহার কমাইতে প্রস্তুত নহেন। বিনা চিনিতে চা খাওয়া যায় না কি! দুই বেলা আহারের পর মধুরেণ সমাপয়েৎ করাটাও তাঁহার চিরকালের অভ্যাস, রাবড়ি-সন্দেশ রোজ তাঁহার চাইই। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিতে হইলে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ অনিবার্য্য এবং নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া নিক্তির ওজনে চলাও অসম্ভব। এবম্প্রকার নানাবিধ মুশকিলের কথা বিবৃত করিয়া হীরালালবাবু আসল কথাটি পরিশেষে বলিলেন—আসল কথা জানেন কি ডাক্তারবাবু, ভয়ানক লোভী লোক আমি, কিছুতেই লোভ সামলাতে পারি না। বাঙালীর ছেলে ভাত না খেয়ে থাকতে পারি না, আলুটা আমার অতি প্রিয় খাদ্য, মিষ্টির তো কথাই নেই! আর সব রকম খাওয়া যদি আপনারা বন্ধই ক'রে দেবেন তাহলে বেঁচেই বা লাভ কি বলুন পৃথিবীতে, মরে গেলেই হয়!

হীরালালবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিলে তাঁহার খুত্ খুত্ খুত্ খুত্ করিয়া একটা শব্দ হয়, চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া যায়, চিবুকের তলার চর্ব্বি আন্দোলিত হইতে থাকে।

বিমল বুঝিল হীরালালবাবুকে আহার-সংযমের উপদেশ দেওয়া মানে অরণ্যে রোদন করা। 'ইন্‌সুলিন্' ইনজেকশনের ব্যবস্থা করাই সমীচীন। তাহাই করিল। হীরালালবাবু বলিলেন—রোজ নিতে হবে?

—রোজ।

—লাগবে না কি?

সকলেই এ-কথা জিজ্ঞাসা করে, সকলকেই বলিতে হয় 'কিছু না', সকলেই সে কথা অবিশ্বাস করে, তবু সকলেই ইনজেকশন লয়।

হীরালালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনজেকশন নিলে তো আর খাওয়ার বাধা থাকবে না?

—না, বরঞ্চ বেশী ক'রে খাবেন।

—বেশ, লাগান তাহলে।

বিমল হীরালালবাবুর চিকিৎসা স্থরু করিয়া দিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—আর একটি রুগীর ভার আপনাকে নিতে হবে, আমার মেজদা'র।

—কি হয়েছে তাঁর?

—তাঁর হয়েছে…মানে,…চলুন নিজের চোখেই দেখবেন। তিনি ঐ পেয়ারা-বাগে আছেন। কলকাতার ডাক্তাররা ওঁকে আলাদা থাকতে বলেছেন, চলুন।

মোটরে করিয়াই যাইতে হইল। পেয়ারা-বাগ নিতান্ত কাছে নয়। হীরালালবাবুদের প্রকাণ্ড একটা পেয়ারাবাগান আছে, তাহারই মধ্যে ছোট বাঙ্‌লোটির নাম পেয়ারা-বাগ। পেয়ারা-বাগে মতিলালবাবু একটি চাকর মাত্র সম্বল করিয়া একাই বাস করিতেছেন।

ঘরে ঢুকিয়াই বিমল বুঝিতে পারিল মতিলাল বাবুর কি হইয়াছে। ফোলা নাক, ফোলা কান, ভুরুর উপরও ফোলা ফোলা, ভুরুতে চুল নাই, সিংহের মত মুখভাব—কুষ্ঠ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। নমস্কার-বিনিময়াদির পর মতিলালবাবু বলিলেন—আমার ব্যায়রাম কি তা দেখেই বুঝতে পারছেন আশা করি। আমি কলকাতা গিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলাম, এ-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তাঁরা একটা ওষুধ খেতে, একটা লাগাতে আর একটা ইনজেকশন করতে দিয়েছেন। জগদীশবাবুকে ডেকেছিলাম তিনি আপনার কথাই বললেন! বললেন বুড়ো হয়ে গেছি ওসব ইনট্রাভারমল ইনজেকশন আমার দ্বারা ভাল হবে না, বিমলবাবুকে ডাকুন আপনারা।

বিমল বলিল—কতগুলো ইনজেকশন দিতে বলেছেন ওঁরা?

—অন্তত একশোটা।

বিমল এখানে আসিলে সাধারণত দশ টাকা করিয়া 'ফি' লয়। একশোটা ইনজেকশন দিতে হইবে শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসচক্ষে এক হাজার টাকার অঙ্কটা ভাসিয়া উঠিল। এক হাজার টাকা তুচ্ছ করিবার মত জিনিস নয়। বলিল—ইনজেকশন দেবার পিচকিরি-টিচকিরি কিন্তু আপনাকে কিনতে হবে, এখানেই থাকবে সেগুলো।

—সব এনেছি আমি।

মতিলালবাবু একটি চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া দেখাইলেন, সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। মতিবাবুর চিকিৎসার ভারও বিমল লইল। সেই দিনই একটা ইনজেকশন দিয়া দিল। মতিবাবুর ওখান হইতে ফিরিবার মুখে বিমল হীরালালবাবুকে সাবধান করিয়া দিল।

—আপনি যেন ওখানে যাবেন না বার-বার, আপনার ডায়াবিটিস রয়েছে, আমার উচিত আপনাকে সাবধান ক'রে দেওয়া, ছোঁয়াচে রোগ তো!

হীরালালবাবু বলিলেন—তা তো জানি সব, কিন্তু নিজের দাদা, তাকে তো ত্যাগ করতে পারি না। এক বার অন্তত যেতেই হবে রোজ খোঁজখবর করতে, উনি আবার ভারি অভিমানী লোক!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—আরে ছেড়ে দিন মশাই আপনাদের ও-সব থিয়োরি-ফিয়োরি! যিনি যতই সাবধান হন সব মিঞাকেই এক দিন মরতে হবে, মাঝথেকে ছোটলোক হয়ে মরি কেন—

খুত্ খুত্ করিয়া হীরালাল হাসিয়া উঠিলেন, চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া গেল এবং চিবুকের নীচে চর্ব্বি থলথল্ করিতে লাগিল। মোটর থামিলে হীরালাল বলিলেন—আপনাকে আর একটি রুগী দেখাব ডাক্তারবাবু, ঠিক রুগী অবশ্য নয়, আসুন—ওরে কমলিকে ডাক—

উভয়ে আবার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। একটু পরেই কমলি আসিল। সতের-আঠার বছরের একটি মেয়ে।

—দেখুন ত একে, মুখময় ব্রণ হয়েছে মশাই কিছুতে সারছে না। গেলে গেলে মুখময় দাগ ক'রে ফেলেছে। বিয়ের বাজার বুঝতেই পারছেন মুখময় দাগড়া-দাগড়া হয়ে গেলে বিশ্রী দেখতে হবে, কেউ তখন পছন্দ করবে না।

বিবাহপ্রসঙ্গে কমলি লজ্জিত হইয়া একটু মাথা নীচু করিল।

বিমল ব্রণগুলি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি যাও—

কমলি চলিয়া গেল।

—কি উপায় করা যায় বলুন তো! ইনজেকশন, মলম, লোশন সব রকম হয়ে গেছে।

বিমল নূতন একটা পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিল, সেইটাই লিখিয়া দিল।

—দেখুন এটাতে যদি সারে।

বিমল বাড়ি ফিরিবার মুখে একখানি খামের চিঠি পাইল। মেয়েলি হাতের ঠিকানা লেখা; সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তাক্ষর। পথেই দাঁড়াইয়া সে চিঠিখানি খুলিল, খুলিয়া বিস্মিত হইল। বিনোদিনীর চিঠি! লিখিয়াছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটি বিশেষ কথা জানবার জন্যেই আপনাকে গোপনে এ চিঠিখানি লিখছি, আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনার বন্ধু আজকাল দিনরাত্রি দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যে চারিদিকে অন্ন-বস্ত্র-চাঁদা সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছেন, নাইবার খাবার অবসর নেই, বাড়িতে অধিকাংশ দিনই রাত্রে আসেন না। দূরের সব গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়, প্রায়ই ফিরতে পারেন না। আমি যে তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর একটু সাহায্য করব তা তো হবার উপায় নেই জানেন, তিনি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান সব সময় আমি তা জানতেও পারি না। কোথায় খান, কি খান, কোথায় শোন কিছুই জানি না, সুতরাং ওঁর সম্বন্ধে আমার ভয়ানক একটা দুর্ভাবনা হয়েছে। তার ওপর সেদিন আর একটা জিনিস দেখতে পেয়ে ভয়ানক চিন্তিত হয়েছি আমি। সেদিন বাড়ি এসেছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কি একটা ওষুধ খাচ্ছেন, আমাকে দেখতে পেয়ে লুকিয়ে ফেললেন সেটা। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে তোমার, ওষুধ খাচ্ছ কেন—হেসে বললেন কিছু হয় নি। অনেক ধরাধরি করাতে বললেন, ভাল হজম হয়

না ব'লে বিমল একটা হজমের ওষুধ দিয়েছে। ব'লেই বেরিয়ে গেলেন, আজ তিন দিন হ'ল এখনও ফেরেন নি। আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝতেই পারছেন। ওঁর কি হয়েছে? দয়া ক'রে আমাকে সব খুলে লিখবেন, কিছু লুকোবেন না। ওঁকে ত চেনেনই, খামখেয়ালি মানুষ, একটা-না-একটা কিছু নিয়ে সর্ব্বদাই মেতে থাকেন। ধর্ম্ম নিয়ে দিনকতক মেতে কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, থিয়েটার নিয়ে দিনকতক কাটালেন. এইবার দুর্ভিক্ষ নিয়ে পড়েছেন। এর পরই কলকাতায় খেলার হিড়িক লাগবে তখন নিশ্চয়ই কলকাতা চলে যাবেন। চারদিকে এত হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ালে শরীর ভাল থাকবে কি ক'রে বলুন তো। আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে ভাল ক'রে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আপনার কথা খুব মানেন। আর আমাকে একটু জানাবেন দয়া ক'রে সত্যি ওঁর কোন অসুখ হয়েছে কিনা। নিশ্চয়ই হয়েছে, তা না হ'লে ওষুধ খাবেন কেন শুধু শুধু। অসুখটা কি সেটা আমি জানতে চাই। আশা করি অবিলম্বে আপনি আমার চিন্তা দূর করবেন। মণিমালাকে নিয়ে আসুন না, আমাদের বাড়ি। মণি ও আপনি আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানবেন। ইতি

বিনোদিনী

হঠাৎ বিমলের মনে হইল পিছন দিকে কে দাঁড়াইয়া আছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল গুপিবাবু কম্পাউণ্ডার, চশমার কাচের উপর দিয়া পত্রটার পানেই চাহিয়া আছেন। বলিলেন—হাসপাতালে একটা 'ফ্র্যাক্‌চার কেস্' এসেছে।

—কোথায় ভেঙেছে?

—বাঁ হাতটা।

—চলুন যাচ্ছি, আপনি সব ঠিক করুন গে।

—যে আজ্ঞে।

গুপিবাবু চলিয়া গেলেন। বিমল চিন্তিত মুখে চিঠিখানি পকেটস্থ করিয়া হাসপাতালের দিকে নয়, বাড়ির দিকেই অগ্রসর হইল। বড় ক্লান্ত লাগিতেছে। সর্ব্বাগ্রে এক কাপ চা খাওয়া প্রয়োজন। বিনোদিনীকে সে কি উত্তর দিবে! মিথ্যা কথাই কিছু একটা লিখিতে হইবে। রোগীর গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার নাই, তাহার স্ত্রীর কাছেও না।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন অমরও আসিয়া পড়িল।

ফ্র্যাক্‌চারটা বাঁধিয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় মহাসমারোহে হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া, পতাকা উড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে অমরের দল ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হাজির হইল। দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা চাই। বিমলের সহসা মনে হইল ইহাই বাঙালীর চিরন্তন রূপ, যে-কোন একটা জিনিসকে উপলক্ষ্য করিয়া সে উৎসব করিবে। হুজুগে না মাতিলে বাঙালী কিছুই করিতে পারে না। দেশের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে একথা প্রতিদিনই সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, কিন্তু ঠিক এই ভাবে দ্বারে দ্বারে চাঁদা চাহিয়া না বেড়াইলে কেহই চাঁদা দিবে না। অনাহারক্লিষ্ট দেশবাসীর দুঃখে বিগলিত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা পাঠাইয়া দিবে এরূপ লোকের সংখ্যা কম। চাঁদা আদায় করিতে হইবে; এই আদায় করা ব্যাপারটাকে বাঙালী তাহার স্বকীয় প্রতিভাবলে একটু মনোরম করিয়া লইয়াছে মাত্র।

চাঁদা দিয়া বিমল অমরকে বলিল—তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, তুই কি ঐ দলের সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে ঘুরবি না কি এখন?

—আমি না ঘুরলেও চলে, ওরাই যথেষ্ট।

—তাহলে ওদের যেতে বলে দে, চল্ আমরা একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।

—চল্।

বিমল অমরকে বিনোদিনীর পত্রখানি দেখাইয়া বলিল—এই খানিকক্ষণ আগে পেয়েছি! কি ওষুধ খাচ্ছিলি তুই?

অমর একটা কবিরাজি পেটেণ্ট ঔষধের নাম করিল। বলিল—খেয়ে অনেকটা ভাল আছি।

—বিনুকে তোমার এখন কি লিখি বল!

—সত্যি কথাটা ছাড়া আর যা খুশী লিখতে পার।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—এমন ক'রে হৈ হৈ ক'রে ঘুরিস কেন, বিনুর কাছাকাছি থাকলে অন্ততঃ সে বেচারা একটু সন্তুষ্ট থাকে! তোদের ওই হারেমের মধ্যে একা একা সে বেচারির কি কষ্ট বল্ তো!

—কি করব বল্, উপায় কি, তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ান ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখতে পাই না!

—তা ব'লে দিনরাত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবি, বেশ তো!

ম্লান হাসিয়া অমর বলিল—মর্ফিয়া দিয়ে তোরা যেমন শরীরের যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিস, কাজ নিয়ে তেমনি আমি মনের যন্ত্রণাটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। কিন্তু মনে হচ্ছে আর যেন পাচ্ছি না! আমার দোষ হয়েছে তা এক-শ বার স্বীকার করছি, কিন্তু একবার পা ফস্‌কালেই সারাজীবন ধরে তার শাস্তি চলবে এ যে বড় দুঃসহ ব্যাপার ভাই। এর ওষুধও নেই, ক্ষমাও নেই?

—ক্ষমা আছে কি নেই তা তো তুমি যাচাই ক'রে দেখ নি এখনও, বিনু তো কিছুই জানে না।

অমর নিস্তব্ধ হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বিমল অমরকে বলিল—আমার মনে হয় বিনুকে সব কথা খুলে বলা উচিত। যার সঙ্গে আজীবন বাস করতে হবে তার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা ক'রে চিরকাল চলা শক্ত। তাকে বলাই ভাল।

অমর হাসিয়া বলিল—এখন সে হয় না ভাই, আমি যে এত দিন ভণ্ডামি ক'রে এসেছি, তার কাছে অকলঙ্কিত ধার্ম্মিক ব'লে নিজেকে দেখিয়েছি, হঠাৎ এখন কি ক'রে তাকে বলব যে আমি একটা চরিত্রহীন ব্যাধিগ্রস্ত লোক—

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—শান্তি পাবার ঐ একমাত্র উপায়। পাপকে চেপে রাখতে নেই। আমরা যেমন শরীরের কোথাও পুঁজ হ'লে সেটাকে বের ক'রে দি, তেমনি মনের গ্লানিও বের ক'রে দেওয়া উচিত। তাতেই শান্তি পাওয়া যায়।

অমর কিছু বলিল না—দূরদিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। অস্তমান সূর্য্যকিরণে জল-স্থল-আকাশ সুরঞ্জিত। পাল তুলিয়া দুইখানা নৌকা কেমন চমৎকার ভাসিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ একটা নৌকার পাল যদি ছিঁড়িয়া যায়, হঠাৎ যদি ঐ সুরঞ্জিত আকাশপটে কেহ খানিকটা আলকাতরা লাগাইয়া দেয়, হঠাৎ যদি এই গলিত স্বর্ণবৎ নদীজল পঙ্কিল দুর্গন্ধ হইয়া ওঠে—

দূরে হার্ম্মোনিয়াম ও গানের আওয়াজ শোনা গেল।

অমর বলিল—এইবার ওঠা যাক্।

—কোথা যাবি এখন?

—কুবেরগঞ্জ।

—সে তো দশ মাইল এখান থেকে—

অমর একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

৫

বিমলের ইচ্ছা করিতে লাগিল জমিরুদ্দিন সাহেবের মুখের উপর শুনাইয়া দেয় যে আপনার ঐ টাঙানো কম্বলটা তো ঠিক আছে, ওটা তো দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে না, আমি তো ওইটাই রোজ দেখিতেছি! রোগিণীকে দেখিতেই পাই না, তাহার ভাল-মন্দের দায়িত্ব কি করিয়া লইব। ইচ্ছা করিল, কিন্তু সত্য সত্যই সে একথা বলিতে পারিল না। আমাদের অধিকাংশ সদিচ্ছাই মনে মনে থাকিয়া যায়—বাঙ্ময় হইতে পায় না। যদিই বা সেটাকে প্রকাশ করিতে পারি, কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। আমরা চিন্তাবীর, কর্ম্মবীর নই।

বনিয়াদি মুসলমান পরিবার; পর্দার খুব বাড়াবাড়ি। রোগী তো বোর্কা পরিয়া আছেই, তাহার বিছানার সামনে প্রকাণ্ড একটা কম্বলও টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রোগী কম্বলের ভিতর দিয়া হাতটা একটু বাহির করিয়া দেয়, বিমল দুটি আঙুল দিয়া নাড়ীটা দেখিবার একটু সুযোগ পায়। ঐ নাড়ী দেখিয়াই যতটুকু হয়। আজ জমিরুদ্দিন সাহেব বলিলেন যে রোগের অবস্থা ভাল নয়, দিন দিন যেন খারাপই হইতেছে।

বিমলের শুনিয়া রাগ হইল, কিন্তু রাগ সে প্রকাশ করিল না। ভূধরবাবুর কথাটা তাহার মনে পড়িল, আপনি হাল ছেড়ে দিলে আর এক জন এসে হালে বসবে!

অসুখ সারুক আর না সারুক তাহার তো প্রত্যহ কয়েকটা করিয়া টাকা হইতেছে। অপ্রিয় কয়েকটা সত্য কথা ইহাদের শুনাইয়া দিয়া লাভ নাই। সে যদি রাগ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, আর এক জন আসিয়া ঐ অদৃশ্য রোগীরই চিকিৎসা করিতে বসিবে, এই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারের প্রতিবাদ করিবে না, তাহার স্পষ্টবাদিতার

সুযোগ লইয়া স্বচ্ছন্দে তাহার স্থানটি দখল করিয়া বসিবে।

বিমল চিন্তিত মুখে বলিল—সিভিল সার্জ্জন আর লেডী ডাক্তারকে ডাকা দরকার!

—বেশ।

রোগীটিকে যে ভাল করিয়া সর্ব্বাগ্রে দেখা দরকার তাহা বলিয়া লাভ নাই। সেকালের কবিরাজ এবং হকিমরা নাড়ী দেখিয়াই সব কিছু করিতেন, রোগীর হাতে সুতা বাঁধিয়া সেই সুতাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া আগেকার অসাধারণ চিকিৎসকগণ অলৌকিক সব কাণ্ড করিয়াছেন, একালেই বা সমগ্র রোগীটাকে দেখিবার জন্য এ আগ্রহ কেন! একাল-সেকালের তুলনায় একালকেই চিরকাল হার মানিতে হয়। হার মানিয়া চুপ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিমল টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

৬

এক দিন সকালে দাঁতন-হস্তে বদিবাবু আসিয়া দেখা দিলেন।

—ডাক্তার, এবার নন্দী-মশায়কে একটু সন্তুষ্ট না করলে চলছে না। সে-বার হেরে গিয়ে উনি বড্ড মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন।

মিউনিসিপালিটির ব্যাপারের বিমল ইদানীং কোন খবরই রাখিত না। সুতরাং সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

—কিসের ব্যাপারে?

বদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—আহা ঐ যে ইলেকট্রিক স্কীম্!

বিমল শঙ্কিত হইয়া বলিল—আবার প্রবন্ধ লিখতে হবে না কি?

—না, তার চেয়েও বেশী, ক্যানভাস করতে হবে।

—বলেন কি?

বদিবাবু বলিলেন—আপনার তো আজকাল সর্ব্বত্র অবারিতদ্বার। মথুরবাবু, সৌরীনবাবু, হীরালালবাবু, জমিরুদ্দিন, চৌধুরি-মশাই এমন কি হরেন বোস অবধি আপনার করায়ত্ত হয়ে গেছেন, সবাইকে একবার ক'রে ব'লে দেবেন যেন নন্দীকেই ভোট দেয়। এবার হেরে গেলে নন্দী ক্ষেপে যাবে।

বিমল বলিল—আচ্ছা, এই শহরে ইলেকট্রিসিটি নেবার মতন কি মিউনিসিপালিটির অবস্থা! গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা ধার করে! আপনি কি মনে করেন?

বদিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁতন ঘষিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আমরা উন্মাদ হ'তে পারি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তো আর উন্মাদ নয়! আমরা অনুরোধ করলেও গবর্ণমেণ্ট টাকা দেবে না। খালি নন্দী মশায়ের মুখরক্ষের জন্যেই এ-সব করা, আর কিছু নয়। আপনি একটু চেষ্টা করবেন!

—আচ্ছা। মথুরবাবু কিন্তু শুনবেন না আমার কথা!

—এক জন না শুনলে আর কি হবে!

নন্দী-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বদিবাবু অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসা বলিলেন—অনেকেরই তো চিকিৎসা করছেন, এবার আমারও একটু চিকিৎসা করুন।

—কি হয়েছে আপনার?

—আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার কোন অসুখ করেছে? অবশ্য টাকটাকে যদি অসুখের মধ্যে গণ্য করেন তাহলে—

বদিবাবু অকৃত্রিম আনন্দভরে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

—বেশ বলেছেন এটা,।

তাহার পর আরও খানিকক্ষণ দাঁতন ঘষিয়া বলিলেন —না, শরীরে কিছু গড়বড় হয়েছে, সেদিন পাটনায় সেটা বুঝলাম।

—পাটনায় গিছলেন না কি?

—হাঁ, পাটনা হাইকোর্টে একটা কাজ ছিল। সেদিন পাটনায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মশাই গল্প করছি হঠাৎ একটা টমটমওয়ালা একটা ছোট ছেলেকে চাপা দিয়ে ছুট! বদি চাটুজ্যের কাছে এ চালাকিটি চলবার উপায় নেই! আমিও ছুটলাম তার পেছনে, ধরলাম কিছু দূর গিয়ে, খুব উত্তম-মধ্যম দিলাম ব্যাটাকে! চাপা না হয় দিয়ে ফেলেছিস, টমটমটা থামিয়ে ছেলেটাকে হাসপাতালে

পৌঁছে দে, তা নয় পালাচ্ছিস! বদি চাটুজ্যের সামনে এ চালাকি চলবে কেন!

বদিবাবু বিমলের মুখের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন।

—ঠিক করি নি?

—ঠিক করেছেন।

—ও ব্যাপার তো মিটে গেল, কিন্তু আমার হাঁপানি আর কিছুতে থামে না মশাই, প্রায় ঘণ্টাখানেক ব'সে হাঁপালাম। আমাদের কলেজের ফুটবল টিমে লেফট্ উইঙে খেলতাম আমি, আমার নাম ছিল ঝড়! ভীষণ ছুটতে পারতাম আমি, কই সেকালে কখনও এত হাঁপিয়েছি ব'লে তো মনে পড়ে না।

বিমল হাসিয়া বলিল—বয়স বাড়ছে! চলুন আপনার হার্টটা দেখি—আসুন ঐ বাইরের ঘরটায়—

বাহিরের ঘরটায় ঢুকিবার মুখে কয়েকটা পেঁয়াজের খোসা লক্ষ্য করিয়া বদিবাবু বলিলেন—আপনি খুব মাংস খান শুনেছি—

—প্রত্যহ।

—বলেন কি! শাকসব্জী খান না একেবারে?

বিমল হাসিয়া বলিল—না।

—শুনেছি শাকসব্জীতে খুব ভিটামিন আছে!

—থাকতে পারে কিন্তু আমি ও-সবের ধার ধারি না।

বদিবাবুর হার্টটা দেখিয়া বিমল বলিল—না বিশেষ কিছু নয়; আপনি কিছু দিন বিশ্রাম নিন।

—তা তো আপাতত অসম্ভব! আচ্ছা খবরের কাগজে কিছু দিন আগে হার্ট নিয়ে যে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল—

—ওগুলো পড়বেন না! খবরের কাগজের ঐ সস্তা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো সবাইকে সবজান্তা ক'রে দিয়ে মহা মুশকিলে ফেলেছে আমাদের!

—কেন ওগুলোতে কি ভুল খবর থাকে না কি?

—ভুল ঠিক নয়, কিন্তু পুরো খবর থাকে না! আর ঐ স্বল্প বিদ্যা আহরণ ক'রে ভয়ঙ্কর মুশকিল হচ্ছে, আপনাদেরও আমাদেরও।

বদিবাবু কিছুক্ষণ বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—আমার কোন ওষুধ টষুধ ব্যবস্থা করবেন না কি!

—বিশ্রামই আপনার ওষুধ, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন কিছু দিন!

—সে তো অসম্ভব। আচ্ছা, চলি তাহলে!

বদিবাবু চলিয়া গেলে পরেশ-দা আসিলেন।

—তোমার যে আজকাল টিকিই দেখা যায় না হে?

—না থাকলে দেখবেন কি ক'রে! কোথা যাচ্ছেন?

—আমি যাচ্ছি 'হরিমোহন মেমোরিয়াল' কাপের টাইগুলো সব ঠিক করতে! তুমি কমিটিতে আছ জান তো?

—শুনেছি। আমাকে কেন ওর মধ্যে ঢোকালেন শুধু শুধু।

কেন ঢুকাইয়াছেন তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ না দেখাইয়া পরেশ-দা হাসিমুখে বলিলেন—বাঃ, সে কি হয়! হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার এউদির ঐ ওষুধটাই চলবে না কি!

—জ্বর ছেড়ে গেছে তো?

—কালই।

—আরও চলুক এক দিন।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন, বিমল বাড়ির ভিতর ঢুকিতে যাইতেছে এমন সময় মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স-কলেক্টার ভুবনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

—ওহে ডাক্তার, আমার সর্ব্বাঙ্গ যে খোসে ভরে গেল, একটা কিছু ব্যবস্থা কর ভাই। রক্তটাকে যদি পরীক্ষা করতে চাও তাই না হয় কর, আর তো পেরে উঠছি না।

বিমল দেখিয়া বলিল—কি ওষুধ লাগাচ্ছেন?

—সব রকম লাগিয়েছি, গাঁজার তেল, গন্ধক, শেয়ালকাঁটা গাছের শেকড়, আলকাতরা, তুঁত—

বিমল হাসিয়া ফেলিল।

ভুবনবাবু বলিলেন—তুমি তো এ অঞ্চলে ইনজেকশন-সম্রাট হয়ে উঠেছ, তাই তোমার কাছে এলাম, যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পার!

বিমল বলিল—বেশ, আজ হাসপাতালে যাবেন, একটা ইনজেকশন দেব আপনাকে। কিন্তু আমার হাসপাতালের

ওষুধ যে আবার ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, এইবার আপনি কিছু ট্যাক্স্ আদায় ক'রে দিন। হয়েছে কিছু ট্যাক্স্ আদায়? এত দিন তো আমি ভিক্ষে ক'রে চালালাম—

ভুবনবাবু এদিক-ওদিক চাহিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন—ট্যাক্স্ কাদের বাকী জান?

— কাদের?

—ঐ সব হোমরা-চোমরাদের! এক মথুরবাবু ছাড়া আর সকলের কাছে ট্যাক্স্ পাওনা রয়েছে! কিন্তু ওঁরা মালিক, ওঁদের কাছে তো আর বার-বার তাগাদা করতে পারি না। নন্দী-মশায়কে একটু তাগাদা করেছিলাম, তিনি এমন ভাবে চোখ গরম ক'রে চাইলেন আমার দিকে যে আমার পিত্তি শুকিয়ে যাবার জোগাড়!

বিমল এ-কথা জানিত না, চুপ করিয়া রহিল।

ভুবনবাবু বলিলেন—যত তম্বি গরিবদের উপর, তারা ট্যাক্স্ না দিলে তাদের ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি বিক্রি কর, অথচ ওঁদের যে প্রত্যেকেরই এক কাঁড়ি ক'রে বাকি রয়েছে সেদিকে কারও দৃক্‌পাত নেই।

বিমল বলিল—আচ্ছা হাসপাতালে চলুন আপনি, আমি যাচ্ছি একটু পরে!

ভুবনবাবু বৃদ্ধ লোক। বিমলকে খুব স্নেহ করেন। তাই বোধ হয় এই গোপন কথাগুলি বলিলেন। গমনোন্মুখ বিমলকে ডাকিয়া আবার বলিলেন—এ-সব কথা যেন প্রকাশ না পায়, দেখো! কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি—চাকরিটা গেলে খেতে পাব না!

—না, না, আমি কাউকে কিছু বলব না।

ক্রমশঃ

জগতের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দিক্

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হালদার, এম. এসসি., এম. এ.

মানব-মনের লীলাময়ী কল্পনা সীমাহীন, বাধাহীন। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র পরমাণু হইতে এই অসীম বিশ্ব পর্য্যন্ত কোন ব্যাপারেই তাহার অসাধ্য কিছু নাই। নিমেষে শতকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়েও যাহার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, সেই অঘটন-ঘটন-বিধায়িনী কল্পনাও যাহাতে প্রতিহত হইয়া ব্যর্থচেষ্টায় ফিরিয়া আসে আমাদের এই অনুভূতিলব্ধ বিশ্বচরাচরের সেই অজ্ঞাত দিক্ কোথায়, কোন্ দিকে?

কোনও রন্ধ্রমাত্রহীন রুদ্ধদ্বার কক্ষমধ্য হইতে কাহারও বহির্গমন কি সম্ভব? কোন্ পথে এরূপ বাহিরে আসা যাইতে পারে তাহা কি কল্পনাও করিতে পারা যায়? অথচ আমরা কল্পনা করিতে পারি না বলিয়াই যে তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব এ-কথাই বা বলি কি করিয়া? সংস্কার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমাদের মনের স্বাধীনতাই বা কতটুকু? সেই অদ্ভুত দিক অনুভবোপযোগী ইন্দ্রিয়ের অভাব বশতঃই আমরা হয়ত বলি—এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাহিরে আমাদের এই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অনধিগম্য আর কোনও দিক্ নাই।

এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে একটা বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক—তাহা এই জগতের বা জাগতিক বস্তুসমূহের বিস্তৃতি বা dimension। মনে করা যাক কালি-মাখানো একটি ছোট কীট ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে টেবিলের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় একটি রেখা অঙ্কিত হইল। সুতরাং বিস্তৃতিহীন ক্ষুদ্র কীটের গতিতে পাইলাম এক দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি রেখা। আবার মনে করা যাক একটি সরু কাঠি টেবিলের উপর কালি-মাখানো অবস্থায় পূর্ব্ব-পশ্চিমে পড়িয়া আছে। যদি সেটাকে উত্তরাভিমুখে চালাইয়া লইয়া যাওয়া যায় তবে টেবিলের উপরিভাগ

কালি-মাখানো হইয়া যাইবে। সুতরাং এক দিকে (অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে) বিস্তৃত কাঠির অপর দিকে (অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে) গতির ফলে আমরা পাইলাম টেবিলের দ্বিবিস্তারযুক্ত উপরিভাগ বা তল। আবার মনে করা যাক টেবিলটির উপর একখানি চতুষ্কোণ কাগজ পড়িয়া আছে। যদি উপরি-উপরি অনেকগুলি কাগজ তাহার উপর সজ্জীকৃত হয় তাহা হইলে আমরা পাইব একটি কাগজের স্তূপ। সুতরাং দ্বিবিস্তারযুক্ত কাগজগুলি অপর তৃতীয় দিকে (অর্থাৎ উচ্চতার দিকে) সজ্জিত হওয়ায় পাইলাম ত্রিবিস্তারযুক্ত স্তূপ। সেইরূপ এই ত্রিবিস্তারযুক্ত স্তূপের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার বাহিরেও এক চতুর্থ দিক্ কি থাকিতে পারে না? অন্য ভাবে বলিতে গেলে কক্ষের বিস্তার তিন দিকে—ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থসম্পন্ন এবং উর্দ্ধাধঃ দিকে উচ্চ। ইহা ছাড়াও এমন চতুর্থ দিক্ কি থাকিতে পারে না যেদিকে এই কক্ষ বিস্তৃত? পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ উর্দ্ধ-অধঃ সব দিক্ রুদ্ধ থাকিলেও যে দিক্ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পড়িয়া থাকে—যে রহস্যময় দিক্ দিয়া রুদ্ধ কক্ষ হইতে বহির্গমন সম্ভব?

আপাততঃ এই আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এক নূতন জগৎ কল্পনা করা যাক্। সেখানে পর্ব্বত নাই, উপত্যকা নাই, বৃক্ষলতাগুল্ম এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত নাই। এক কথায় যাহা কিছু উচ্চতাসমন্বিত তাহা নাই। এ জগৎ দর্পণবৎ সমতল। এই বৈচিত্র্যহীন জগতের জীবগণ ভূপতিত বৃক্ষ-পত্রের ন্যায় ঐ সমতল ক্ষেত্রে সমানভাবে পড়িয়া আছে ও ভূতল-সংলগ্ন থাকিয়া ইতস্ততঃ চলিতে ফিরিতে পারে। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের আদান-প্রদান করিতে পারে এবং শরীরের সীমারেখা দ্বারা পরস্পরকে স্পর্শ করিতে পারে। একে অপরকে ভালভাবে পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সরিয়া সরিয়া শরীরের সীমারেখাগুলি দেখিতে পারে। কিন্তু কোন জীবেরই ভূমিতল হইতে শরীর বিচ্ছিন্ন করিয়া উঠিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং উচ্চতা সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই। আমরা যেমন একখানি কাগজের উপর আর একখানি কাগজ রাখিতে পারি তাহারা তাহা পারে না এবং কেমন করিয়া যে তাহা সম্ভব, তাহার ধারণাও করিতে পারে না।

আমাদের মত তাহাদের বাসগৃহও আছে। তাহা কেমন? অনুচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত সমতলক্ষেত্র। সেই প্রাচীরের এক অংশ সরাইয়া লইলেই তাহা হইবে গৃহ-প্রবেশের দ্বার—যে-পথে তাহারা সমতলের উপর আপন শরীর ঘর্ষণ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসা করে। সামান্য উচ্চতাবিশিষ্ট কোন কিছু আনিয়া সেখানে স্থাপিত করিলেই গৃহদ্বার হইবে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ। আমাদের মত তাহারাও ভাবিয়া উঠিতে পারে না—এই রুদ্ধদ্বার গৃহে আবদ্ধ জীব কেমন করিয়া বাহিরে আসিতে পারে! এখন মনে করুন তাহাদের জগতে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। আমাদের জগতের একটি জীব তাহাদের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হইল। তাহারা তাহাকে কিরূপ দেখিবে? তাহার পায়ের চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পদতলের সীমারেখা পরীক্ষা করিয়া তাহারা তাহাকে নিজেদের মতই দ্বিবিস্তারযুক্ত বা চ্যাপ্টা জীব মনে করিবে। তাহার উর্দ্ধে কোন কিছু লক্ষ্য করিবার উপযোগী ইন্দ্রিয়ই তাহাদের নাই। এখন যদি সেই নবাগত জীবটি তাহাদের মধ্য দিয়া পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায় তাহাই বা তাহাদের নিকট কিরূপ প্রতিভাত হইবে? ভূপৃষ্ঠ হইতে পা উঠাইলেই তাহা তাহাদের দ্বিবিস্তারযুক্ত জগতের বাহিরে গেল—মনে হইল উহা হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। কিয়দ্দূরে আবার পদক্ষেপ হইল—মনে হইল যেন উহা আবার হঠাৎ আবির্ভূত হইল। আবার অন্তর্দ্ধান আবার আবির্ভাব। এইরূপে সঞ্চরণশীল আলেয়ার আলোর মত যেন জলিয়া নিবিয়া তাহা দূরে মিলাইল।

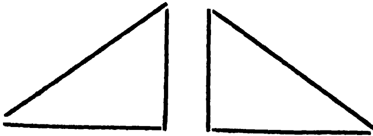
আবার মনে করুন, সেই সমতল জগতের রুদ্ধদ্বার গৃহে—আমাদের দৃষ্টিতে যাহার উপরিভাগ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত সেই গৃহে—একটি জীব আবদ্ধ আছে। যদি আমরা কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া তাহাদের গৃহ-প্রাচীরের বাহিরে স্থাপিত করি, তাহারা ভাবিয়া অবাক হইবে 'এ কেমন করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। ঘরের পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চারি ধারই তো বন্ধ।' বলা বাহুল্য, উর্দ্ধাধঃ বলিয়া যে আর একটা দিক্ আছে তাহা উপলব্ধি করিবার

উপযোগী ইন্দ্রিয় তাহাদের নাই। সেইরূপ আমরাও যখন বলি 'ঘরের পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ উর্দ্ধ-অধঃ সব দিকই তো বন্ধ, এ ঘর হইতে বাহির হয় কি করিয়া?' তখন ঐ সমতলবাসী জীবের উক্তির মতই শোনায় না কি? সম্ভবতঃ এ-ঘরের চতুর্থ দিকে বিস্তৃতি আছে, যে দিক্ সম্বন্ধে আমাদের আদৌ ধারণা নাই, যে দিকে—আমাদের জানা সব দিক্ বন্ধ থাকিলেও—ঘর খোলা পড়িয়া থাকে।

আমাদের সম্বন্ধে আমরা জানি—

'দেহটা যেমন ক'রে ঘোরাও যেখানে
বাম হাত বামে থাকে ডান হাত ডানে।'

সেইরূপ এই সমতলবাসিগণও যেমন ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াক না কেন, ঐ সমতলবাসিগণের দক্ষিণ ও বাম অঙ্গের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মনে করা যাক, সেখানে এইরূপ দুইটি ত্রিভুজাকার জীব আছে। একটির



সূক্ষ্মাগ্রভাগ বাম দিকে অর্থাৎ উহা বামমুখী এবং অপরটি দক্ষিণমুখী। বলা বাহুল্য, কোন উপায়েই সে-জগতের জীবরা একটিকে অপরটির মত করিতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি কেহ একটিকে তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া রাখি তবে অবশ্য দুইটি জীবই একমুখী হইবে। তেমনই যদি কেহ আমাদের কাহাকেও আমাদের এই ত্রিবিস্তারযুক্ত জগৎ হইতে চতুর্থ দিকে একটু উঠাইয়া উল্টাইয়া আবার আমাদের এই জগতে স্থাপিত করে তবে সে-ক্ষেত্রে কবির উক্তি খাটে না—তখন বাম হাত আর বামে নাই, তাহা ডান হাতের স্থান অধিকার করিয়াছে, আর ডান হাতও ডানে নাই, তাহা এখন বাম দিকে।* আমাদের জগতে এই দক্ষিণ ও বামের সমতা বা bilateral symmetry এক রহস্যময় ব্যাপার। মেঘ পর্ব্বত প্রভৃতিতে উহা নাই। যেখানে জীবনের খেলা সেখানেই, কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকলের বেলাতেই, এই সমতা লক্ষিত হয়। জীবদেহের মধ্যে কোন্ রহস্যময় শক্তি তাহাদিগকে এইরূপ দক্ষিণে ও বামে সমভাবে বিন্যস্ত করে?

প্লেটো এক দল বন্দীর কথা কল্পনা করিয়াছেন, তাহারা গুহামুখে শৃঙ্খলিত ও সম্মুখস্থ প্রাচীরের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি। কোনও প্রকারের অঙ্গসঞ্চালন শক্তি তাহাদের নাই। সুতরাং প্রাচীরগাত্রে তাহারা তাহাদের নিজেদের ছায়া ও নিজেদের সংস্পর্শে যাহারা আসিতেছে তাহাদের ছায়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। কালে তাহারা নিজেদের সব অভিজ্ঞতাই ঐ ছায়ার সঙ্গে জড়িত মনে করিবে এবং নিজকে নিজের ছায়ার সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করিবে। সেইরূপ মানুষ আপনার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। ছায়া ত্রিবিস্তারযুক্ত জগতের দ্বিবিস্তারযুক্ত প্রতিরূপ। ত্রিবিস্তারযুক্ত পদার্থ কঠিন স্থূল। ছায়াতে তাহার কতটুকু আভাস পাই? আমাদের ত্রিবিস্তারযুক্ত জগতও চতুর্ব্বিস্তারযুক্ত জগতের ছায়া মাত্র। যেমন কাগজের উপর কাগজ সাজাইয়া কাগজের স্তূপ পাই, তেমনই কঠিন পদার্থের উপর **চতুর্থ দিকে** কঠিন পদার্থ চাপাইয়া চতুর্ব্বিস্তারসম্পন্ন অতি কঠিন পদার্থ (hyper solids) পাই। কাগজের স্তূপের তুলনায় যেমন একখানা পাতলা কাগজ, সেই অতীন্দ্রিয় জগতের তুলনায় আমাদের স্থূল কঠিন জগৎও তাই।

সমতল জগতের জীবগণ কল্পনা করিতে পারে না দুইটি জীবের মধ্যে একটিকে কেমন করিয়া আর একটির উপর রাখা যায়। তাহারা মাত্র জানে এক জীবের সহিত অপর জীবের বাহিরের সীমারেখার স্পর্শ। তেমনই আমরা জানি আমাদের জগতের দুইটি প্রাণীর মধ্যে এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের বাহিরে স্পর্শ হইতে পারে, দুইটি প্রাণী একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। চতুর্থ দিক্ থাকিলে কিন্তু দুইটি জিনিস এক স্থানে থাকিতে পারে। একটির মধ্য দিয়া অন্যটি চলিয়া যাইতে পারে। দুর্ভেদ্য কঠিন প্রস্তরপ্রাচীরের ভিতর দিয়াও চলিয়া যাওয়া সম্ভব।

সমতল জগতের জীবগণের সমস্ত অংশই আমরা তৃতীয় দিক্ অর্থাৎ উচ্চতার দিক্ হইতে দেখিতে পারি, তেমনই আমাদের শরীরের সমস্ত অংশই চতুর্থ দিক্ হইতে

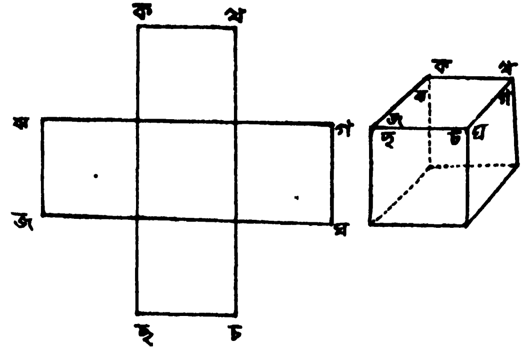
* এই প্রসঙ্গে অনেকের এইচ. জি. ওয়েলসের The Plattner Story নামক গল্পটি মনে পড়িতে পারে।

চতুর্ব্বিস্তারযুক্ত জীবগণ দেখিতে পায়। শরীরের 'ভিতর' বলিয়া কোন জিনিষ নাই। কেন-না, সেই অদ্ভুত দিক্ হইতে শরীরের প্রত্যেক কণাটিই দৃষ্টিপথে পড়িতেছে। আমরা উপর হইতে সমতলবাসী জীবগণের অজ্ঞাতে তাহাদের সকল কার্য্যই লক্ষ্য করিতে পারি। তাহারা পরস্পর হইতে অনতিউচ্চ প্রাচীরের আড়ালে আপনাদিগকে গোপন করিতে পারে কিন্তু তৃতীয় দিকে অবস্থিত আমাদের নিকট কিছুই গোপন করিতে পারে না। আমরা তেমনই চতুর্ব্বিস্তারযুক্ত জগতের অতীন্দ্রিয় জীবগণের নিকট কিছুই গোপন করিতে পারি না।

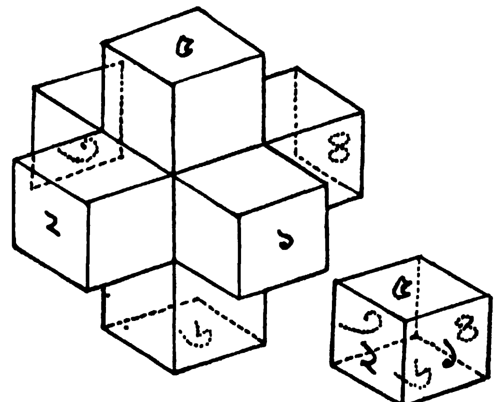
চতুর্থ দিক্ থাকিলে আরও কত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে। কোনও সূতার দুই প্রান্ত একবারে না নড়াইয়া মধ্যের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলা যায়। লৌহ-শৃঙ্খল না ভাঙিয়া তাহার কড়াগুলি এক একটি করিয়া খুলিয়া লওয়া যায়। সম্পূর্ণ অক্ষত টেনিস-বল সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় উল্টাইয়া ফেলা যায় অর্থাৎ বাহিরের পৃষ্ঠ ভিতরে ও ভিতরের পৃষ্ঠ বাহিরে আনা যায়। ডিম না ভাঙিয়াই অমলেট প্রস্তুত করা যায়।

ত্রিবিস্তারযুক্ত জগতে যেমন গোলক ঘন বস্তু (cube) প্রভৃতি কঠিন পদার্থ আছে, চতুর্ব্বিস্তারযুক্ত জগতেও তদনুরূপ অতি কঠিন পদার্থ আছে। এক ইঞ্চি দীর্ঘ রেখাকে ঐ রেখার লম্বাভিমুখে এক ইঞ্চি সরাইলে এক বর্গ-ইঞ্চি পরিমিত বর্গক্ষেত্র পাই। এই বর্গক্ষেত্রকে ঐ ক্ষেত্রের লম্বাভিমুখে এক ইঞ্চি সরাইলে এক ঘনইঞ্চি পরিমিত স্থানব্যাপী একটি ঘন বস্তু উৎপন্ন হয়। আর ঐ ঘন বস্তুকে চতুর্থ দিকে এক ইঞ্চি সরাইলে চতুর্ব্বিস্তারযুক্ত অতি কঠিন ঘন বস্তু (hyper cube অথবা tesseract) পাওয়া যায়। আমরা জানি রেখা বিন্দুর দ্বারা সীমাবদ্ধ। তল বা পৃষ্ঠ রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ। কঠিন বস্তু তলের দ্বারা আবদ্ধ। তেমনই চতুর্ব্বিস্তারসম্পন্ন অতি কঠিন বস্তু সাধারণ কঠিন বস্তু দ্বারা সীমাবদ্ধ।

চতুর্থ দিকের কি কোন ধারণাই করা যায় না? আপনারা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি পথনির্দ্দেশ করিতেছি মাত্র। পূর্ব্বোল্লিখিত সমতল জগতে একটি বর্গক্ষেত্রের চারি পাশে আর চারিটি বর্গক্ষেত্র কল্পনা করুন। এই চারিটি বর্গক্ষেত্র সমান ভাবে উচ্চতার দিকে মুড়িলে উপরিভাগ খোলা একটি বাক্স পাওয়া যাইবে। কখ, গঘ, চছ, জঝ এই চারিটি বহিঃপ্রান্তস্থ রেখা একটি বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করিবে।

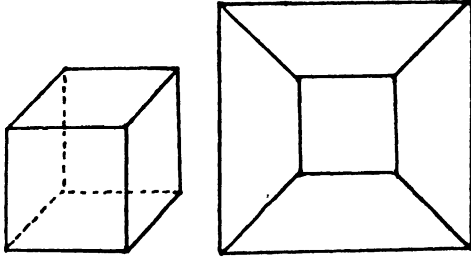


এই বর্গক্ষেত্রের স্থানে বাক্সের একটি ডালা কল্পনা করিলেই একটি সমান দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতাসম্পন্ন বাক্স বা ঘন বস্তু পাওয়া যাইবে। তেমনই একটি ঘন বস্তুর দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, উপরে ও নীচে উহার সহিত সংলগ্ন অপর ছয়টি ঘন বস্তু কল্পনা করুন। এই ছয়টি ঘন বস্তু, মূল ঘন বস্তুর সহিত সংলগ্ন রাখিয়া সমানভাবে অতীন্দ্রিয় চতুর্থ দিকে মুড়িলে এক পাশ খোলা চতুর্ব্বিস্তারসম্পন্ন অতি কঠিন বস্তু পাইব। আর ঐ ছয়টি ঘন বস্তুর বহিঃপ্রান্তস্থ ছয়টি বর্গক্ষেত্র সম্মিলিত হইয়া একটি শূন্যগর্ভ কিউব উৎপন্ন করিবে। সেই শূন্য স্থানে একটি সাধারণ ঘন বস্তু কল্পনা করিলেই অতি কঠিন ঘন বস্তু পাওয়া যাইবে—যাহা আটটি কঠিন বস্তু দ্বারা সীমাবদ্ধ।



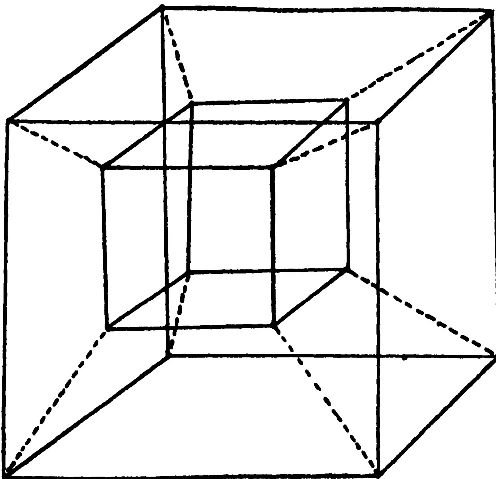
বামে: মূল ঘন বস্তুর ছয় পার্শ্বে ছয়টি ঘন বস্তু
দক্ষিণে: চতুর্থ দিকে মুড়িবার ফলে উৎপন্ন অষ্টম ঘন বস্তু

জিনিসটার কোন ধারণা করিতে পারিলেন কি? বোধ হয় না। আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। পূর্ব্বোক্ত সমতল জগতে যদি একটি কাচের স্বচ্ছ ঘন বস্তু রাখি এবং উপর হইতে তাহা দেখি তবে উহা যেরূপ প্রতীয়মান হইবে তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইল।



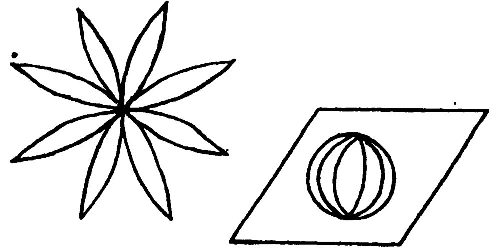
উপর হইতে দৃষ্ট স্বচ্ছ ঘন বস্তু

আমরা ত্রিবিস্তারযুক্ত জগতের লোকেরা ইহার অর্থ করিতে পারি:—মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রটি ঐ ঘন বস্তুর দূরবর্ত্তী পৃষ্ঠ মাত্র এবং বাহিরের বৃহৎ বর্গক্ষেত্রটি নিকটবর্ত্তী পৃষ্ঠ, আর বলা বাহুল্য চারি পাশের চারিটি চতুর্ভুজ ঐ ঘন বস্তুর অপর চারিটি পৃষ্ঠ। এখন এক-বার নীচের চিত্রটির দিকে লক্ষ্য করুন। ইহা চতুর্থ দিক্ হইতে দৃষ্ট স্বচ্ছ অতি কঠিন ঘন বস্তুর প্রতিরূপ। মধ্যের ছোট ঘন বস্তুটি উহার দূরবর্ত্তী প্রান্ত এবং বাহিরের ঘন বস্তুটি উহার অপর প্রান্ত—যাহা দর্শকের নিকটবর্ত্তী নহে। প্রকৃতপক্ষে একটি অপরের মধ্যবর্ত্তী নহে।

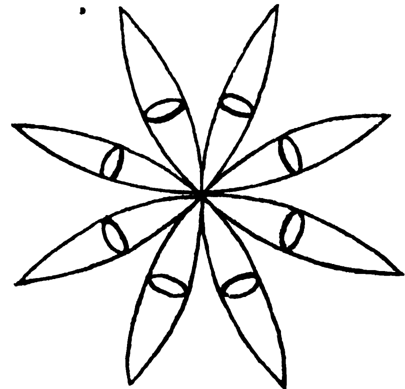


চতুর্থ দিক হইতে দৃষ্ট স্বচ্ছ অতিঘন বস্তু

আর ছয় দিকের ছয়টি ছিন্নশিখর পিরামিড (Frustum of Pyramid) ঐ অতি কঠিন পদার্থ বেষ্টনকারী ছয়টি ঘন বস্তুমাত্র। চতুর্বিস্তারযুক্ত জগতের লোকের পক্ষে এ চিত্রের অর্থ করা আদৌ কঠিন নয়। তবে আপনারা এক বার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বোধ হয় এবারও জিনিসটার খুব স্পষ্ট ধারণা হইল না। তবে আর এক বার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।



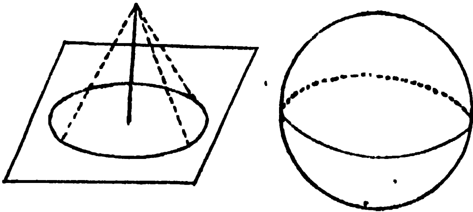
উপরের চিত্রে দেখিতেছেন বহু দলবিশিষ্ট ফুলের আকারে কাটা এক টুকরা চামড়া। মনে করুন, উহা সমতল জগতে পড়িয়া আছে। যদি ঐ দলগুলিকে উচ্চতার দিকে সমান ভাবে নোয়াইয়া তাহাদের বহির্ম্মুখী সূক্ষ্ম প্রান্ত-গুলিকে একত্র করি এবং কিনারাগুলি মিলাইয়া সেলাই করি তবে তাহা হইবে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত গোলক অর্থাৎ ফুটবল। কিন্তু সে ফুটবলের কথা ঐ সমতল জগৎবাসি-গণ স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারিবে না, কেন-না, উহা যে তাহাদের জগতের বাহিরে। এখন এক বার এই চিত্রটির দিকে লক্ষ্য করুন।



ইহা কতকগুলি স্থুলমধ্য সূক্ষ্মাগ্রভাগ সিগারের মত কঠিন বস্তু। তাহাদের এক প্রান্ত এক বিন্দুতে মিলিত

হইয়াছে এবং বহির্ম্মুখী প্রান্তগুলি সজারুপৃষ্ঠস্থ কণ্টকের ন্যায় বা কদম্বকেশরের মত সকল দিকে খাড়া হইয়া আছে। এখন যদি ঐ সিগারগুলিকে ক্রমশঃ চতুর্থ দিকে সমান ভাবে নোয়ানো যায় তবে অবশেষে বহির্ম্মুখী প্রান্তগুলি এক বিন্দুতে মিলিত হইবে এবং যে-বস্তুটির উদ্ভব হইবে তাহা চতুর্থ দিক্‌বিহারী জীবগণের খেলিবার ফুটবল। তাহা লইয়া খেলিবার সৌভাগ্য আমাদের কখনও না হইলেও চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন জিনিসটা কল্পনা করিতে পারেন কিনা।

বোধ হয় এবারও এ চেষ্টায় বিশেষ সুফল হইলেন না। তবে শেষ বার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্‌। সমস্যাটি যথাসাধ্য সহজ ও সরল ভাবে উত্থাপিত করিতেছি। সমতলবাসিগণ সমতল-জগতে এমন কোন স্থান কল্পনা করিতে পারেন না যেখান হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তের পরিধির প্রত্যেক বিন্দু সমদূরবর্ত্তী (অবশ্য কেন্দ্র ছাড়া)। কিন্তু আমরা জানি ঐ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়া যদি ঐ সমতলের একটি লম্ব অর্থাৎ ঐ সমতলের উচ্চতার দিকে একটি রেখা অঙ্কিত করি, তবে ঐ লম্বস্থ যে কোন বিন্দুই পরিধিস্থ বিন্দুসকল হইতে সমদূরবর্ত্তী।



এখন কোনও গোলকের কেন্দ্র হইতে চতুর্থ দিকে সোজা যে লাইন চলিয়া গিয়াছে তাহার যে কোন বিন্দু গোলকপৃষ্ঠস্থ প্রত্যেক বিন্দু হইতে সমদূরবর্ত্তী। এখন আপনারা একবার প্রাণপণে কল্পনা করিতে চেষ্টা করুন—নিজেকে আমাদের জগতের বাহিরে এমন স্থানে স্থাপিত করিতে যেখান হইতে ঐ গোলকের উপরের প্রত্যেক বিন্দু সমদূরবর্ত্তী। এবারেও যদি না পারেন তবে আমি নাচার!

চতুর্থ দিকে বিস্তৃতির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নাই। চতুর্থ দিক্‌ কল্পনা করিলে জগৎ-ব্যাপারে কোথাও কোন অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হয় না। কিন্তু এ প্রশ্ন উঠিতে পারে—চতুর্থ দিক্‌ আছে তাহার প্রমাণ কি? যাহা প্রমাণ বলিয়া উত্থাপিত হয় তাহা যদি হিপ্‌নটিজম্‌ ইন্দ্রজাল বা ঐরূপ কোন মিথ্যা হইতে মুক্ত বলিয়া বৈজ্ঞানিকের কূটপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবে জগতের চতুর্থ দিকে বিস্তার আছে বিশ্বাস করিবার সময় আসিবে। আপাততঃ চতুর্থ বিস্তারাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ।

অতি বিশ্বস্ত সূত্রে বহুবিধ অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণ শোনা যায়। যদি সে সকল ঘটনা সত্য হয় তবে চতুর্থ দিকের অস্তিত্ব কল্পনা করিলে এই দুর্ব্বোধ্য ঘটনাসকলের যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, যদি চতুর্থ দিক্‌ থাকে তাহা অপেক্ষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আশ্চর্য্যের ব্যাপার আর কিছুই নাই। বিশ্বসৃষ্টির আদি হইতে যুগে যুগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে বা কল্পিত হইয়াছে তাহাদের অদ্ভুততম ব্যাপারটিও আমরা কল্পনা করিতে পারি। তবু উন্মত্ততম কল্পনাতেও চতুর্থ দিক্‌ সম্বন্ধে আমরা বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে পারি না। বৃথাই আমাদের কল্পনা সেই রহস্যের তিমিরাবরণ ভেদ করিতে চেষ্টা করে। এ বিশাল বিশ্বের কাহারও কল্পনায় কি সে রহস্যের অবগুণ্ঠন একটুও অপসারিত হইয়াছে? কে জানে?

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

শান্তিনিকেতনকে যে কয়জন অসাধারণ ব্যক্তি শান্তিনিকেতন করিয়া তুলিয়াছেন এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। সেখানে আমি বহু লাভ করিয়াছি, যাহা না হইলে আমার জীবনের গতির এমন হইবার সম্ভাবনা ছিল যাহা আমার বস্তুত কল্যাণের জন্য হইত বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার ঐ সমস্ত লাভের একটি প্রধান হইতেছে এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গ। শান্তিনিকেতনে না থাকিলে ইহা আমার হইত না। ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের ফল।

এণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন সমগ্র ইংরেজ জাতির সদ্‌গুণসমূহের মূর্তি। তাঁহার দিকে তাকাইলে ইংরেজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় আনত হয়। তিনি ইংরেজ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন তাহার অতীত। যদি কোন জাতির নামে তাঁহার জন্মের কথা উল্লেখ করিতে হয়, তবে বলিতে হয় তিনি বিশ্বমানব জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমাদের শাস্ত্রে বৈষ্ণবের লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, যেমন বৈষ্ণব হইবেন নিজে অমানী, কিন্তু মানদ, শান্ত, তিতিক্ষু, কারুণিক, ধীর ইত্যাদি। ইহাই যদি হয়, তবে আমি বলিব এণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে পরম বৈষ্ণব।

অপর দিকে তিনি ছিলেন পরম খ্রীষ্টান। লাহোরে জালিয়ানবালাবাগের ভীষণ কাহিনী এখনও সকলের মনে স্পষ্ট রহিয়াছে। সেই সময়ে পঞ্জাবে কী ঘোর অত্যাচার হইয়াছিল তাহাও জানা কথা। তখন সেখানে লোকেরা ভয়ে সর্বদা থরহরি কম্পমান। পঞ্জাবের বাহিরেও কেহ সাহস করিয়া কিছু প্রতিবাদ করিবার সাহস পায় নাই। একাকী রবীন্দ্রনাথ তখন সরকারের দেওয়া 'সার' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সরকারী অনুসন্ধান আরম্ভ করা হয়। স্বতন্ত্র ভাবে এণ্ড্রুজ সাহেবও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ বন্ধু, আমার প্রিয় 'ভজনানন্দ ভাই সাহেব', করাচীর শ্রীগুরুদয়াল মল্লিক মহাশয়। গ্রামের লোকেরা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে কেহ কিছু বলিবার সাহসই করিত না। তাঁহাদিগকে যৎসামান্য কিছু খাইবারও দিতে পারিত না। এক দিন কোন গ্রামে এক জন শিখ এণ্ড্রুজ সাহেবের অনুরোধে নিজের প্রতি অত্যাচারের কথা আর গোপন করিতে না পারিয়া কেবল নিজের দেহখানিকে নগ্ন করিয়া দিল। এণ্ড্রুজ সাহেব তাহার দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, আর জোড়হাতে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "আমি সমস্ত ইংরেজ জাতির হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর, তুমি সমগ্র ইংরেজ জাতিকে ক্ষমা কর।" এ কথা উক্ত মল্লিক মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন।

এণ্ড্রুজ সাহেব বিশ্বের কল্যাণের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। নিজ-পর বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তাঁহার ছিল "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি অপ্রিয় করিয়াও আত্মীয়ের উপকার করিতেন, যদিও আত্মীয়েরা তাহা বুঝিত না। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য এণ্ড্রুজ সাহেব এত চিন্তা, এত কাজ করিয়া গিয়াছেন যে, বলিবার নহে। আমার মনে হয়, স্বয়ং ভারতীয়দের মধ্যে এমন কেহ এ পর্যন্ত করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। এই কার্যেরই উদ্দেশ্যে তিনি একবার পূর্ব-আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। সেখানকার প্রবাসী ইউরোপীয়েরা একজোটে কোন কোন বিষয়ে এমন ব্যবস্থা করিতেছিলেন যে, তাহা সেখানকার আদিম অধিবাসী ও ভারতীয়দের নিতান্ত ক্ষতি হইত। এণ্ড্রুজ সাহেব সেখানে ইহার তীব্র

প্রতিবাদ করেন। ইহাতে সেখানকার ইংরেজেরা এণ্ডরুজ সাহেবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁহার নিজের কাছে আমি শুনিয়াছি, এই সময়ে এগার-বার দিন ধরিয়া দিবারাত্র তিনি রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ ইংরেজেরা তাঁহাকে গাড়ীতে এই সময়ে নানারূপে অপমান ও নির্যাতন করিয়াছিল, কেহ কেহ গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার দাড়ি ধরিয়া টানিয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টান এণ্ডরুজ তাহাতে একটুও বিচলিত হন নাই, কোনও প্রতিবাদ করেন নাই, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। এ ঘটনা সেই সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলে আমি যখন তাঁহার কাছে ইহা উল্লেখ করি, তখন তিনি একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, উহা কিছুই নহে।

এণ্ডরুজ সাহেবের সত্য, দম, তপ, তিতিক্ষা, ত্যাগ ইত্যাদি দেখিয়া আমি তাঁহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতাম। ব্রাহ্মণ দুই রকমের, বর্ণব্রাহ্মণ বা জাতি-ব্রাহ্মণ, আর গুণব্রাহ্মণ। যাঁহারা কেবল বর্ণে বা জাতিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহারা বর্ণব্রাহ্মণ বা জাতিব্রাহ্মণ। সমাজে ইহারা খুব হেয়। এখনও অনেককে বর্ণব্রাহ্মণ বলা হয়, যদিও যাঁহারা অন্যকে বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাঁহারা কম বর্ণব্রাহ্মণ নহেন। ইঁহাদিগকেই ব্রহ্মবন্ধু বলা হয়। ব্রহ্মবন্ধু শব্দের তাৎপর্য এই যে, নিজে অর্থাৎ নিজের গুণে ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নহে, কিন্তু কোন বস্তুত ব্রাহ্মণ তাহার বন্ধু বা জ্ঞাতি, কোন বস্তুত ব্রাহ্মণকে যে নিজের বন্ধু বা জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দেয় সেই ব্রহ্মবন্ধু। বুদ্ধদেব ইঁহাদিগকে ভো বা দী বলিতেন। অর্থাৎ যাহারা নিজের গুণে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে না পারিয়া লোকজনকে ডাকিয়া বলে যে, 'ওহে আমি ব্রাহ্মণ' তাহারা ভো বা দী। এণ্ডরুজ সাহেব ছিলেন গুণব্রাহ্মণ, বস্তুত ব্রাহ্মণ, আমার চোখে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ। তাই আমি তাঁহার পায়ের ধূলি লইয়া প্রণাম করিতাম। আমি ইহা সকলের সামনেই করিতাম, গোপনে নহে। এণ্ডরুজ সাহেবের মহত্ত্বই আমাকে ইহা করাইয়াছিল। আমি অতি সঙ্কোচে উল্লেখ করিতেছি, আমরা উভয়েই উভয়কে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতাম। হঠাৎ এক দিন দেখি এণ্ডরুজ সাহেব আমার পায়ে হাত দিয়াছেন। আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইলাম, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার মহত্ত্বের একটা গভীর রেখাপাত হইল। আমি থাকিতে পারিলাম না। আমারও হাত তাঁহার পদস্পর্শ করিল। সেই হইতে আমাদের নমস্কার-পদ্ধতি এইরূপ হইয়াছিল।

এণ্ডরুজ সাহেবের চরিত্রের মহত্ত্ব ও মাধুর্য কত গভীর ছিল তাহা যে এক বার তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। তাঁহার হৃদয় করুণায় ও প্রেমে ভরা ছিল। যেখানে দুঃখ-দারিদ্র্য-কষ্ট সেইখানেই এণ্ডরুজ—জাতিব্যক্তিনির্বিশেষে। তিনি সকলকেই কোল দিতেন, বড়-ছোট, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র এ ভেদ তাঁহার কাছে ছিল না। তাঁহার কাছে যে ব্যক্তি যে-কাজ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারই তিনি তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তা তাহা খুব বড়ই হউক আর খুব ছোটই হউক। এ জন্য আবশ্যক হইলে বড় লাটকে পর্যন্ত তিনি ধরিতেন।

ভারতবর্ষ তাঁহাকে দীনবন্ধু বলিয়া তাঁহার চরিত্রের একটা দিককে উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছে। ভারতে দীনের সংখ্যা কম নহে। তাহারা তাঁহার মধ্যে বস্তুতই এক বন্ধুকে পাইয়াছিল। এণ্ডরুজ সাহেবের অভাব সমগ্র বিশ্ব অনুভব করিবে। আমাদের সৌভাগ্য তাঁহাকে আমরা নিকটে পাইয়াছিলাম, আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁহাকে আমরা হারাইলাম।

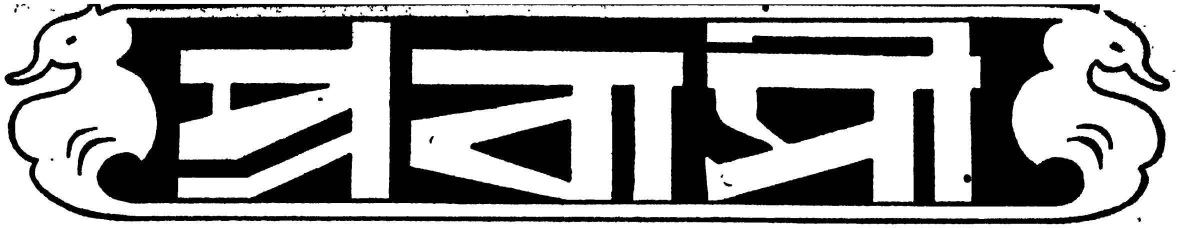
ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্বে আমি তাঁহার একটি প্রশস্তি লিখিয়াছিলাম, আজ নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

সম্পদং স্বয়মুপাগতাং পুরো, মন্যসে ননু তৃণায় লীলয়া।
স্বেচ্ছয়োরসি পুনর্বিপৎততিং, মালিকামিব নবাং বিভর্ষ্যহো ॥১॥
ত্যজ্যসে যদি জনৈর্নিজৈরপি, ছিদ্যসে কুবচনৈশ্চ মর্মসু।
পীড্যসেঽথ সততং যথা তথা, সত্যমন্যমপি নোৎসৃজস্যহো ॥২॥
নাত্মনে কিমপি নাম কাম্যতে, দীনদৈন্যদলনে ধৃতং ব্রতম্।
দুষ্করং জনহিতায় কুর্বতা, খিদ্যতে ন কলয়াপি চ ত্বয়া ॥৩॥
সাধুনা জয়সি তত্র সাধু যৎ, প্রীয়সে বিবৃতি চাপি সন্ততম্।
কুপ্যতেঽপি নহি কুপ্যসি ক্রমে, হ্যপ্যেবমেব চরিতং তবাদ্ভুতম্ ॥৪॥
একতঃ সুচিরবাসতঃ স্বয়ং, দৃষ্টমত্র তব যৎ স্বচক্ষুষা।
চিন্তয়ৎ তদখিলং নিরন্তরং, চিত্তমস্তু মম বিস্মিতং পরম্ ॥৫॥
বাচ্যমন্যদিহ কিং বিচারয়ন্, বেদ্ম্যহং মনসি সুস্ফুটং খলু।
ব্রাহ্মণোত্তমতয়া ত্বমেব মে, নেত্রয়োঃ পতসি ভারতেঽধুনা ॥৬॥
তাং ত্বদীয়ঘনবাহুবন্ধনাশ্লেষণোত্থসুখাবগাঢ়তাম্।
বিস্মরেন্ ননু কথং মনো মম, ত্বাং নমামি শিরসা সুহৃদ্বর ॥৭॥

শান্তিনিকেতনম্
১৯৭৭ বি. স.
চৈত্রশুক্লতৃতীয়া



জীবনসন্ধ্যা



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৭

৪র্থ সংখ্যা

মানসী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে
মনখানা উড়ো পক্ষী,
বাদল হাওয়ায় দিকে দিকে ধায়
অজানার পানে লক্ষ্যি।
যাহা খুশি বলি স্বগত কাকলি
লিখিবারে চাহি পত্র,
গোপন মনের শিল্পসূত্রে
বুনানো দু-চারি ছত্র।
সঙ্গীবিহীন নিরালায় করি
জানা-অজানার সন্ধি,
গরঠিকানিয়া বন্ধু কে আছ
করিব বাণীর বন্দী।
না জানি তোমার নামধাম আমি
না জানি তোমার তথ্য।
কিবা আসে যায় যে হও সে হও
মিথ্যা অথবা সত্য।
নিভৃতে তোমারি সাথে আনাগোনা
হে মোর অচিন মিত্র,
প্রলাপী মনেতে আঁকা পড়ে তব
কত অদ্ভুত চিত্র।

যে নেয় নি মেনে মর্ত্য শরীরে
বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে
তার সাথে মন করেছি বদল
স্বপ্নমায়ার দৌত্যে।
ঘুমের ঘোরেতে পেয়েছি তাহার
রুক্ষ চুলের গন্ধ,
আধেক রাত্রে শুনি যেন তার
দ্বার খোলা দ্বার বন্ধ।
নীপবন হ'তে সৌরভে আনে
ভাষাবিহীনার ভাষ্য।
জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
মণিহার-ছেঁড়া হাস্য।
সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া,
রিমি ঝিমি বারি বর্ষে,
মনে মনে ভাবি কোন্ পালঙ্কে
কে নিদ্রা দেয় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ুর
কবি-কাব্যের রঙ্গে
স্বপ্নপুলকে কে জাগে চমকি
বিগলিত চীর অঙ্গে।
বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ে যায় চিত্তে।
তারার আলোকে ভরে সেই সাকী
মদিরোচ্ছল পাত্র,
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
নাই বিচ্ছেদমাত্র।
ওগো মায়াময়ী আজি বরষায়
জাগালে আমার ছন্দ
যাহা খুশি সুরে বাজিছে সেতার
নাহি মানে কোনো বন্ধ।

দন্তুর সভ্যতা

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৌরীপুর ভবন, কালিম্পং

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদাগরী শাবক প্রসব করতে সুরু করেছিল। তারা খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এশিয়া-আফ্রিকার পাড়ায়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ গিলেছিল মোটা মোটা পিণ্ড চর্ব্য চোষ্য লেহ্য নানাবিধ আকারে। এই ভোজের লোভনীয় মাংসগন্ধ পৌঁছচ্ছিল য়ুরোপীয় নাসারন্ধ্রে। যে সব বঞ্চিত শাবকদের জিবে জল আসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের জঠরানল ঠাণ্ডা ছিল না। অবশেষে ভুক্ত অভুক্ত দুই পক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়াকামড়ি। একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার সুরু হ'ল শিকারী এবং শিকারীর পালা। য়ুরোপ-জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ। আজ সে কাতরকণ্ঠে বলছে শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি তো বাইরে থেকে আসে না ভিতরে তার উৎস। লুব্ধ অভ্যাসবশত অন্যদের না খেয়ে যাদের চলে না সেই মাংসাশীদের মধ্যে হনন-নীতি কিছুতেই থামতে পারে না। বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে কারো বা কসের দিকে গোপনে দাঁতগুলি কী অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলছিল আজকের দিনে বড়ো ক'রে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণ ভাবে সেটা প্রকাশ পেল। এটা যে না হ'লে নয়। শিকারকে চিবোতে যদি দাঁতের দরকার হয় তাহলে পাশের শিকারীকেও দাঁত খিঁচোবার জন্যে দাঁতের দরকার হবেই। আজকের হানাহানিতে যে জিতল কালকের আশঙ্কা নিবারণের জন্যে তাকে উঠে পড়ে বৈজ্ঞানিক ডেন্টিস্ট্রির চর্চা করতেই হবে। শ্বাপদ সভ্যতার শিক্ষামন্দিরে এই আত্মঘাত-চর্চাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে বাধ্য। এই কামড়ের ঘূর্ণাচক্র অন্তহীন বেগে বাড়তেই থাকবে। আজ যারা কামড়ায় নি কামড় খেয়েছে তারা দায়ে পড়ে কালই কামড়-বিদ্যার পাঠশালা খুলবে। য়ুরোপের উত্তর অংশে অনেক দিন অহিংস্র শান্তিকে আশ্রয় ক'রে যথার্থ সভ্যতার মহৎ রূপ বিরাজ করছিল, আজ তারা খ্যাপা জন্তুর কামড় খেয়েছে, কাল তাদের ঠাণ্ডা রাখবে কিসে? তাহলে এই বিরাট্ পশুশালার মধ্যে মানুষের সন্ধান পাবে কোথায়। ডারুয়িন বলেছেন বানরের অভিব্যক্তি মানুষে, কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তি কোন্ জানোয়ারে। প্রাণীজগতের আদি যুগে বর্মে চর্মে ভারাক্রান্ত বিকট জন্তুরা আস্ফালন ক'রে পৃথিবীকে দলিত করেছিল তারা তো প্রাণলোকের অসহ্য হয়ে উঠল, টিকতে পারল না—সৃষ্টিবিভাগে সেই ব্যর্থ পরীক্ষার স্মৃতি এখনি কি লুপ্ত হয়েছে। আবার সেই বর্মের বোঝা বেড়ে উঠে মানবধর্মকে অন্তরে অন্তরে ফেলছে পিষে। মানবসৃষ্টির জন্যে যিনি দায়ী তিনি বলছেন, লজ্জা দিলে, এ চলবে না, এদের পিঠের থেকে বর্ম নামিয়ে নেওয়া গেল মনের মধ্যে সেটা ঢুকে সর্বনেশে হয়ে উঠল, এ তো বাঁচবার লক্ষণ নয়। প্রাচীন ডাইনোসারদের সঞ্চরণক্ষেত্র আজকের

দিনের যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে তার প্রেত উঠেছে জেগে, যে-রাস্তা দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হয়েছে সেই রাস্তা দিচ্ছে দেখিয়ে।

তবু সেই বর্মমস্থর জন্তুরাই যে মানুষের ভবিষ্যৎ বর্ত্মের পথপ্রদর্শক এ-কথা মন মানতে চায় না। কেন না সমস্ত বিরোধের মধ্যে মানুষকে দেখেছি। মাথা-গুনতিতে তারা অল্প, কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। আজ যে বৈশ্য-য়ুরোপ ব্রাহ্মণের বিদ্যা ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র শূদ্রের দাস্য নিজের শক্তিক্ষেত্রে অপহরণ ক'রে অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে এই তো দেখছি বিনাশের ঢালুতটে তার পা পড়ল। টিঁকে থাকবার শক্তি তার নয়, সে-শক্তি তাদেরই যারা অলুব্ধ, যারা নম্র, যারা শান্ত, যারা বিশ্বাসপরায়ণ, যারা প্রমাণ করতে এসেছে মনুষ্যত্ব পরস্পরকে গিলে গিলে নয়, পরস্পরে মিলে মিলে, তারা কোনো একটা বিশেষ জাতি নয়, তারা সকল জাতির মধ্যেই ব্যক্তিগত ভাবে অখ্যাত হয়ে আছে। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার যাত্রা, এই কথা সে প্রমাণ করবে যে, সে মৃত্যুঞ্জয়। ইতি ২০।৬।৪০

মহামানবের তপস্যা

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

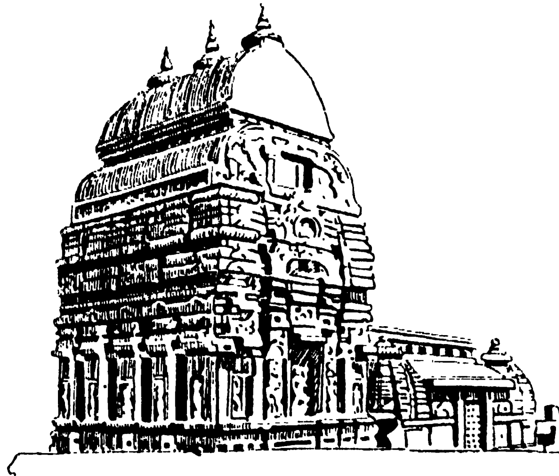
গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু,

এই মাত্র তোমার দ্বিতীয় চিঠি পেলাম। তোমাকে একটা চিঠি আজ সকালেই লিখেছি। কিন্তু তোমার চিঠির ঠিক উত্তর দেওয়া হয় নি। যেমন সমস্ত জীবাণুকোষ মিলে এক দেহ, তেমনি প্রত্যেক মানুষকে মিলিয়ে এক মহামানব এ বিশ্বাস আমি পূর্বেই জানিয়েছি। দেহকোষের এক অংশে আঘাত লাগলে সব দেহই পীড়িত হয়। ঐক্যের অনিবার্য ধর্মই তাই। ঐক্যের বেদনা যাঁরা নিজেরই মধ্যে উপলব্ধি করেন তাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি। আমাদের ধারণার অতীত যে বিরাট্ মহাপুরুষে এই বোধ সম্পূর্ণ হয়ে আছে, উপনিষদে তাঁকে বলেন সর্বানুভূঃ, তিনি সমস্তই অনুভব করেন। প্রত্যেকে তাঁর মধ্যে, অথচ তিনি প্রত্যেকের অতীত। এই জন্যে তিনি নির্মমভাবে প্রত্যেককে বিচার করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন সমগ্রের মধ্যে ভুল ঢুকেছে অতএব তাকে ত্যাগ করতে হবে, তিনি বলতে পারেন নতুন ক'রে আরেক সমগ্র রচনা করা চাই। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতার একটা আদর্শ আছে—স্পষ্ট বুঝতে পারি প্রথম যুগের উদ্ভিদ পশুপক্ষী কী কুশ্রী ছিল, অভিব্যক্তির তপস্যায় সমস্তই একটা সুশ্রীতায় পৌঁছচ্ছে, এই অভিব্যক্তি তাঁরই আত্মোপলব্ধির সোপানপরম্পরা। দেখছি এতে স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না ওজনের ভুল হয়, বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেই জন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী ক'রে। আমাদের সেই চেষ্টাই নৈতিক চেষ্টা যে চেষ্টায় কাটাকুটির কারণের

শোধন হয়, জগদ্‌গুরুরা তারি ধ্যান করেছেন। এই ধ্যানে তাঁরা পেয়েছেন মূলগত শোধনের উপায় প্রেম ও ত্যাগ—তাই তাঁরা প্রচার করেছেন। বলেছেন, মা গৃধঃ, বলেছেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। তাঁদের এই বাণী বিরাট্‌ মহাপুরুষের বাণীর অন্তর্গত।

আমাদের আশার কথা এই বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সুতরাং ক্রমশ যুগ যুগ ধরে এ বীজের মতো কাজ করবে, নইলে এমন সব আশ্চর্য কথা ভাষা পেতই না—এ কথার মতো অদ্ভুত কথা নেই যে আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। বহু শতাব্দী ধরে এই নীতির ব্যতিক্রম হয়ে চলেছে—কিন্তু ব্যতিক্রমের ভিতর দিয়েই তাড়া চলে, যেমন ক'রে আমরা কবিতা লিখি। এই ব্যতিক্রম টেনে আনে মূর্তি গড়ায় হাতুড়ি পেটানো, তাতেও যখন বিরাটের মনের মতো হয় না তখন নতুন সৃষ্টির সংকল্প আসে—পশুসৃষ্টিতে এই রকম প্রলয়ের কাজ যুগযুগান্তর দেখেছি, মানুষ-সৃষ্টিতেও রক্তের অক্ষরে কতবার পালটিয়ে লেখা দেখেছি। এক দিন যদি চরম ফেল করবার কাটা দাগ সেই ইতিহাসের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত চিহ্নিত হয় তবে পাতার কিছু অংশ বাকি থাকবে তাই নিয়ে পরের অধ্যায়ের পত্তন হবে—আজ যাঁরা সেই বাকির দলে, খবরের কাগজে মোটা শীর্ষ লাইনে তাঁদের নাম ওঠে না, কাটা পড়ার দলই চলেছে ডঙ্কা বাজিয়ে, যে পর্যন্ত তারা না পৌঁছয় মহতী বিনষ্টিতে। উপনিষদে আছে স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যা করেছেন। স তপস্তপ্‌ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ—তপস্যায় উত্তপ্ত হয়ে তিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ তো সর্বশক্তিমানের পরিচয় নয়—এর মধ্যে বিপুল প্রয়াস সুতরাং বিপুল দুঃখের উদ্দীপনা আছে এবং এই তপস্যার কেন্দ্রস্থলে আছে পরিপূর্ণ কল্যাণের আদর্শ। তা যদি না হ'ত তবে যাঁরা সত্যের জন্যে মঙ্গলের জন্যে martyr হয়েছেন তাঁদের পাগল বলতুম। উলটে এই কি প্রমাণ হচ্ছে না যে যারা তাঁদের বিদ্ধ করেছে, তারাই মত্ত তারাই অন্ধ।—তোমার কবিতা খুবই ভালো লাগল, আমি যা বলতে চাই তোমার স্বকীয় ভাষায় চমৎকার ক'রে বলেছ। হোমানলের দারুণ উত্তাপের মধ্যে তপস্বীকে তুমি দেখেছ। তাঁর জয় হোক। ইতি ২০।৬।৪০



নির্ম্মোক

"বনফুল"

৮

মণিমালা ভাল হইয়া গেল।

মণিমালা ভাল হইয়া গেল বটে, কিন্তু ঘোষেদের বাড়ীর যে-মেয়েটি পুড়িয়া গিয়াছিল সে আর ভাল হইল না। সে বাঁচিতে চাহেও নাই, চাহিলে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া তাহা কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া নিজ হাতে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিত না! সতর-আঠারো বছরের অবিবাহিতা মেয়ে, নানা কারণে জীবন তাহার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার করুণ কথাগুলি বিমলের কানে বাজিতেছিল,—আমি বাঁচতে চাই না ডাক্তারবাবু, আমাকে তুমি যেন বাঁচিয়ে দিও না গো!

এ ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়, প্রায়ই শোনা যায়। তবু বিমলের মনটা কেমন যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। নন্দী-মহাশয়ের পুত্র রমেনের নাম মেয়েটার সহিত যুক্ত করিয়া যে-সব কুৎসা রটিতেছে তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি বিমলের ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল আমরা কোথায় চলিয়াছি! আমাদের এত শিক্ষা-দীক্ষা, বক্তৃতা-আড়ম্বর কোন কিছুই ত মনের গুহাবাসী পশুটার নখদন্তের তীক্ষ্ণতা এতটুকু কমাইতে পারিতেছে না। বরং নানা ছুতায় আমরা সেই নখদন্তকে শাণিততর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। আজকাল এই যে ঘরে ঘরে মারি স্টোপস্, ফ্রয়েড এবং হ্যাভেলক এলিস পড়ার ধুম—তাহা কি কেবল নিছক জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য? এই যে আজকাল পথে ঘাটে অশ্লীল গল্প-কবিতার ছড়াছড়ি এ কি নিছক সাহিত্য-প্রীতির জন্যই? এই যে দলে দলে লোক সিনেমায় নাচে যায়, এই যে রাশি রাশি অশ্লীল ছবি গোপনে ও প্রকাশ্যে ক্রীত-বিক্রীত হয় ইহা কি নির্জলা আর্ট-প্রীতি ছাড়া আর কিছু নহে? আমরা নানা উপায়ে পশুটাকে লোলুপ করিয়া তুলিতেছি, অথচ তাহার আহার জুটাইবার সঙ্গতি ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হইতেছি না, অভদ্রভাবে অসদুপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য নানা ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ছদ্মবেশটা ধরা পড়িয়া গেলে অনেক সময় লজ্জিত হই বটে, কিন্তু সেটা চক্ষুলজ্জা, সামাজিক লজ্জা, আন্তরিক নৈতিক লজ্জা নহে। নীতি আবার কি! বাঁচিয়া থাকা এবং যত দূর সম্ভব জাঁকজমক করিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই ত শ্রেষ্ঠ নীতি! সকলেই বুদ্ধিমান্, সকলেই বুদ্ধির আলোক দিয়া সব জিনিস যাচাই করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে এবং তাহারই জোরে ভগবান্ ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কার-গুলিকে অনায়াসে বাতিল করিয়া দিয়াছে। যে অন্ধ-বিশ্বাসের বলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাপকর্ম্ম হইতে বিরত এবং পুণ্যকর্ম্মে নিরত থাকিতে চেষ্টা করিতেন, সে অন্ধবিশ্বাস ত আর নাই। আজকাল সকলেই চক্ষুষ্মান—সকলেই প্রত্যেক জিনিসটার লাভ-ক্ষতি খতাইয়া দেখিতে জানে। প্রাচীন ধাপ্পায় আজকাল আর কেহ ভোলে না। বিবাহ আজকাল অবশ্যকরণীয় সামাজিক কর্ত্তব্য নহে, বিবাহ আজকাল ইচ্ছাধীন ব্যাপার। নানা দিক্ দিয়া অঙ্ক কষিয়া যদি সুবিধাজনক মনে হয় তবেই লোকে বিবাহ করে, সাধ করিয়া এত বড় দায়িত্ব কে লইতে যাইবে, কেহই লইতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে হয়ত বাড়্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলাও কাটিয়া ফেলিয়া মানুষ নিজেকে আরও হাল্কা করিয়া ফেলিবে, দেহরক্ষার জন্য এখন যতটা খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন ততটা হইবে না। সব জিনিসই লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে ওজন করাই বৈজ্ঞানিক রেওয়াজ! ঘরে ঘরে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার অনিবার্য্য ফলও ফলিতেছে! নারীরা জননী বলিয়াই তাহাদের শাস্তি বেশী। আমরা জননী লইয়া কবিতা লিখি, উচ্ছ্বসিত

হই, কিন্তু জননীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাই না, বরং মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দিই। ব্যভিচারী পুরুষ দরিদ্র হইলে তাহার নিন্দা করি, হয়ত শাস্তিও দিই, কিন্তু ধনী হইলে চুপ করিয়া থাকি এবং প্রয়োজন হইলে পূজাও করি। অর্থাৎ আজকাল সমাজে টাকাই ভগবান্, কুবেরেরই জয়-জয়কার। বিমল ভাবিতে লাগিল সে নিজেই বা কি করিতেছে। সে-ও কি কুবেরেরই উপাসনা করিতেছে না? কই আজকাল ত সে আর আগেকার মত ঠিক সময়ে হাসপাতালে যায় না। এ-পারের 'কল'গুলা সারিয়া হাসপাতালে পৌঁছিতে প্রায়ই তাহার ন-টা সাড়ে ন-টা বাজিয়া যায়। গুপিবাবুকে সে বলিয়া দিয়াছে যে, পুরাতন রোগীগুলার ঔষধ যেন তিনি 'রিপিট' করিয়া দেন অর্থাৎ পুরাতন ঔষধই যেন আবার দিয়া দেন। প্রথম যেদিন সে গুপি-বাবুকে এ-কথা বলিয়াছিল এবং এ-কথা শুনিয়া গুপিবাবু তাঁহার চশমার কাচের উপর দিয়া যে-ভাবে বিমলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, তাহা বিমলকে লজ্জিত করিয়াছিল। গুপিবাবুর সে নীরব দৃষ্টি যেন ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিতেছিল—এই যে এইবার মুখোসটা খুলিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি! প্রথম-প্রথম সকলেই অমন ভাল-গিরি ফলায়, বাহাদুরিটা শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু টিকে না। এই বয়সে অনেক দেখিলাম। মুখে কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন—যে আজ্ঞে, তাই করব। সেদিন ওপারে একটা 'কল' ছিল, অনেকগুলা কালাজ্বর রোগীর ইনজেকশনও বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে দিতে গিয়া দুই জন রোগীর শিরার বাহিরে পড়িয়া গেল। ভীষণ যন্ত্রণা। গুপিবাবু এবং জানকীর ধমকের চোটে বেচারারা স্পষ্ট করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেও পারিল না। সেদিন একটা টিউমার কাটিয়াছে, সেপটিক হইবার কথা নয় কিন্তু সেটা সেপটিক হইয়া গিয়াছে, পুঁজ দেখা দিয়াছে, জ্বর হইতেছে! কই, আগে ত এমন সেপটিক হইত না! আগে সে নিজে যত্ন করিয়া ড্রেস করিত, এখন যা করে ছুলু। ঐ শূয়ারে-চেরা রোগীটার কিন্তু ভাগ্য ভাল, সে ভাল হইয়া উঠিতেছে! অবশ্য তাহার পেটের মাঝামাঝি একটা হার্ণিয়ার মত হইয়া থাকিবে, তা থাকুক, প্রাণে ত বাঁচিয়াছে! ছেলেটির নাম কাঙালী। সে বলিতেছে যে বিমলকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইবে না, বিমলই তাহার জীবন বাঁচাইয়াছে, বিমলের সেবাতেই সে জীবনটা নিয়োজিত করিবে। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, সে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। বেতন চাই না, শুধু দুটি খাইতে পাইলেই যথেষ্ট।

—ডাক্তারবাবু?

—কে?

বিমল বাহির হইয়া দেখিল নন্দী-মহাশয়ের এক জন কর্ম্মচারী।

—কি?

—গুরুঠাকুরের জ্বর হয়েছে কাল থেকে, আপনি এক-বার চলুন, ভূধরবাবু জগদীশবাবু ব'সে আছেন।

—চল।

ভৈরবের স্ত্রীও এক পাশে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কোলে ছোট একটি শিশু। সে বলিল যে ছেলেটির দুই দিন হইতে জ্বর হইয়াছে, সে কম্পাউণ্ডার বাবুর নিকট হইতে অবস্থা বলিয়া দুই দিন ঔষধ লইয়া গিয়াছে, কিন্তু অবস্থা যেন ক্রমেই খারাপ হইতেছে, ডাক্তারবাবু যদি একটু দয়া করিয়া দেখেন—

নন্দী-মহাশয়ের কর্ম্মচারীটি বলিলেন—এখন ডাক্তার-বাবু আমাদের ওখানে যাচ্ছেন, পরে আসিস।

বিমল তাহাকে বলিল—তুমি হাসপাতালে যাও, নন্দী-মশায়ের ওখান থেকে ঘুরে এখুনি যাচ্ছি আমি।

নন্দী-মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বিমল দেখিল আবহাওয়া বেশ গুরুগম্ভীর। নন্দী-মহাশয়ের গুরুদেব এই প্রথম তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন এবং আসিয়াই জ্বরে পড়িয়া গিয়াছেন। নন্দী-মহাশয়ের মাথায় যেন বজ্রপাত হইয়াছে। বিমল আসিতেই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া পশ্চাতের বীজননিরত ভৃত্য দুইটিকে আরও জোরে বাতাস করিবার ইঙ্গিত করিলেন এবং তাহার পর ডাক্তার তিন জনের দিকে বাষ্পাকুল নয়নে চাহিয়া বলিলেন—এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন আপনারা! গুরুদেব এ কি পরীক্ষায় ফেললেন আমাকে!

জগদীশবাবু বলিলেন—কাতর হয়ে ত লাভ নেই, ব্যায়ারাম তার নিজের রাস্তায় ঠিক যতক্ষণ চলবার তা চলবে।

বিমল বলিল—ক-দিনের জ্বর ?

নন্দী-মশায় বলিলেন—প্রকাশ পেয়েছে কাল থেকে, উনি ত সহজে কিছু বলেন না, আমার বিশ্বাস কয়েক দিন আগে থেকেই হয়েছে।

ভূধরবাবু বলিলেন—ইনফ্লুয়েঞ্জা-গোছের মনে হচ্ছে।

জগদীশবাবু ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া কপালের চামড়া কুঁচকাইয়া ছাতের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা হাসিয়া বলিলেন—তা কি বলা যায় চট্ ক'রে !

কথাটা বলিলেন ভূধরবাবুকে, কিন্তু চাহিলেন বিমলের দিকে। বিমল দেখিল তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটি সন্তর্পণে উঁকি মারিতেছে। অদ্ভুত তাঁহার এই জিবটি !

ভূধরবাবু বিমলকে বলিল—যান আপনি দেখে আসুন, তার পর সবাই মিলে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে।

মূল্যবান্ পালঙ্কে মহার্ঘ শয্যায় শায়িত এই বলিষ্ঠ বিপুলকায় ব্যক্তিটিকে খুব পীড়িত বলিয়া ত বিমলের বোধ হইল না। জ্বর হইয়াছে বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। বিমলকে দেখিয়া গুরুঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও সশব্দে বার-দুই হাঁচিয়া বিমলের দিকে আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন—আপনিও কি ডাক্তার নাকি ?

নন্দী-মহাশয়ের প্রৌঢ়া পত্নী শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতেছিলেন, মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া ছিল, তিনি ফিসফিস করিয়া বিমলের পরিচয় দিলেন।

গুরুঠাকুর বলিলেন—ও, আসুন বসুন। এই ত দু-জন দেখে গেলেন ! রাখাল বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেখছি !

প্রথামত বিমল গুরুঠাকুরের বুক পিঠ পেট জিব চোখ সবই দেখিল, বিশেষ কিছুই পাইল না। তাহারও ধারণা হইল ইনফ্লুয়েঞ্জাই হইয়াছে। তাঁহার দেখা হইয়া গেলে গুরুঠাকুর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—কি রকম দেখলেন খাঁচাখানা !

—ভালই।

—আদা দিয়ে এক কাপ চা খেতে পারি ?

—বেশ ত খান না।

নীচে যাইতেই ভূধরবাবু বলিলেন—কি রকম, ইনফ্লুয়েঞ্জা নয় ?

—তাই ত মনে হচ্ছে, তবে—

বিমল কথাটাকে ইচ্ছা করিয়াই সম্পূর্ণ করিল না। জগদীশবাবু বলিলেন—পিঠের নীচের দিক্‌টায় দেখেছেন ডান দিকে ? খুব ফাইন ক্রিপিটিশনের মত রয়েছে—

বিমল শুনিতে পায় নাই তবু বলিল—হ্যাঁ তা ত আছে। তা থাকা আর অসম্ভব কি, ইনফ্লুয়েনজাল নিমোনিয়া হ'তে পারে, তা যদি হয় বড় সঙীন ব্যাপার !

—নয় কি ?

জগদীশবাবু হাসিয়া ভূধরবাবুর দিকে চাহিলেন।

নন্দী-মহাশয় বলিলেন—দেখুন, ওসব ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই আমি। উনি আমার গুরুদেব, ওঁর চিকিৎসা-বিষয়ে আমি কোন প্রকার খেদ রাখতে চাই না, দরকার মনে করেন কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান আপনারা। ওপারের মথুরবাবুর ভায়রাভাই দুর্লভবাবুও এঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। এক বার সেই দুর্লভবাবুর বাড়ীতে ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, তিনি একটা ডাক্তার ডাকেন নি। নিজে বই দেখে হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করছিলেন। নারায়ণের কৃপায় বাড়াবাড়ি কিছু হ'ল না তাই, যদি হ'ত কি করতিস তুই ? দুঃখ রাখবার জীবনে জায়গা পেতিস ?

জগদীশবাবু অতি সুমিষ্ট একটি হাসি হাসিয়া বলিলেন—দেখুন নন্দী-মশায়, কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে অল্পই আছে ! ভাল জিনিস পৃথিবীতে বেশী থাকে না, থাকতে নেই।

পুলকিত নন্দী-মহাশয় লাল গামছাটি দিয়া বগলের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—অত প্রশংসার যোগ্য অবশ্য আমি নই, আমার গুরুদেবটি ভাল হয়ে গেলে বাঁচি আমি ! আপনারা সকলে সুচিকিৎসকও বটেন, সুহৃদ্‌ও বটেন, আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম, যা ভাল বিবেচনা করেন করুন। টাকা খরচ করতে আমি পিছপাও হব না এইটুকু জানিয়ে দিয়েই আমি খালাস !

জগদীশবাবু বলিলেন—বেশ একটা দিন দেখা যাক। বিমলবাবু রক্তটাও পরীক্ষা ক'রে দেখুন !

ভূধরবাবু বলিলেন—আমি কিন্তু আগে মশাই এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি দিয়ে দেখতে চাই!

জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—বেশ ত, দিন এক ফোঁটা, ক্ষতি কি!

নন্দী-মহাশয়ের গুরুদেবের ব্যবস্থা করিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। বিমল হাসপাতালে ফিরিয়া দেখিল ভৈরবের স্ত্রী তাহার অপেক্ষায় তখনও বসিয়া রহিয়াছে। বিমল ছেলেটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—বেশ জ্বর আছে, কেমন যেন নিঝ্‌ঝুম হইয়া পড়িয়াছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও যেন কষ্ট। বিমলের কেমন যেন সন্দেহ হইল, গলাটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল; ঠিকই ত, এই যে প্যাচ রহিয়াছে। ডিপথিরিয়া! গুপিবাবু দুই দিন পুরাদমে কুইনাইন মিকশচার দিয়া ছেলেটিকে আরও কাহিল করিয়া ফেলিয়াছেন!

—গুপিবাবু, ডিপথিরিয়া অ্যান্‌টিটক্‌সিন্ একটা দিন তো।

গুপিবাবু খানিকক্ষণ তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—ও ত আর নেই, সেবারে চৌধুরী-মশায়ের নাতির অসুখে সব খরচ হয়ে গেছে!

বিমল স্তম্ভিত হইয়া গুপিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ-কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। বলিল—এখানে দেখুন ত জগদীশবাবুর দোকানে—

জানকী বিমলের চিঠি লইয়া ছুটিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—পাওয়া গেল না এখানে। অর্থাৎ শিশুটি মরিবে!

ধনী চৌধুরী-মহাশয়কে খুশী করিবার জন্য বিমল হাসপাতালের এমন একটা মূল্যবান্ ঔষধ স্বচ্ছন্দে দান করিয়াছে এবং প্র্যাকটিসের তাড়ায় পুনরায় আনাইয়া রাখিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

বিমল তখনই ঔষধের জন্য কলিকাতায় একটা টেলিগ্রাম করিল বটে, কিন্তু ইহাও মনে মনে বুঝিল যে ঔষধ আসিবার পূর্ব্বেই শিশুটি চলিয়া যাইবে।

গরীবদের জন্যই হাসপাতাল, কিন্তু গরীবদের সেখানে স্থান কোথায়?

হাসপাতালের ভাল ভাল ঔষধ ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট রোগীদের জন্য খরচ হয় এবং তাহাদের অধিকাংশই ধনী। গরীবরা সেখানে দুই বেলা ভিড় করে এবং কাঙালী-বিদায় করার মত তাহাদের রোজ বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, আর কিছু হয় না।

বিমলের কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল।

ভৈরবের স্ত্রী করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—ডাক্তারবাবু, ছেলে কি আমার বাঁচবে না?

—শক্ত অসুখ করেছে, এখানে ত ওষুধ পাওয়া গেল না, তার ক'রে দিচ্ছি যদি কলকাতা থেকে এসে পড়ে, তবে দিয়ে দেব।

ভৈরবের স্ত্রীর সমস্ত অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। তাহার ছেলের ওষুধের জন্য ডাক্তারবাবু নিজের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় তার করিতেছেন! মানুষ না দেবতা!

বিমল হাসপাতালে একা চুপচাপ বসিয়া ছিল।

সেই টিউমার-কেসটা জ্বরের ঘোরে ছটফট করিতেছে, খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। রীতিমত সেপটিক হইয়া গিয়াছে! বিমল ধীরে ধীরে তাহার বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

—বড় কষ্ট, বড় শীত!

—এখুনি কম হয়ে যাবে, জানকী আর একটা কম্বল আন তো—

জানকী আর একটা কম্বল আনিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সে চাবিটা লইয়া ঔষধের আলমারিটা খুলিয়া ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বাহির করিল। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গ্লাসে ঢালিয়া নির্জ্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিল। আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই তাহাকে ব্র্যাণ্ডি খাইতে হইতেছে। হাসপাতালের বোতলটা ত ফুরাইয়া আসিল। আর এক বোতল আনাইয়া রাখিতে হইবে।

•

গঙ্গার ধারে গিয়া বিমল বসিয়া ছিল। নিজের

স্বরূপ দেখিতে পাইয়া আজ হঠাৎ কেমন যেন সে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ভৈরবের ছেলের মুখটা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া অসহায় পশুর মত মারা যাইবে! বিমল বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল, আর এক বার দেখিয়া আসা যাক। যদি দরকার হয় সে শ্বাসনালীতে ফুটা করিয়া তাহাকে আজ রাতটা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে, কাল সকালে 'সিরাম' নিশ্চয়ই আসিয়া পড়িবে। গিয়া দেখিল অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হইয়া আসিতেছে, শ্বাসনালীতে ফুটা করিবার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই, নালী ঠিক আছে। তবু সে ভৈরবের স্ত্রীকে বলিয়া আসিল যে রাত্রে যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বাড়ে তাহাকে যেন খবর দেওয়া হয়। অন্ধকারে একা একা গলির ভিতর দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কানে গেল—আমাদের বিমল ডাক্তার ভৈরবের ছেলেকে নিয়ে তাহ'লে একেবারে হামলে পড়েছে বল! হরেন বোসের কণ্ঠস্বর। গুপিবাবুর কণ্ঠস্বরও শোনা গেল।

—হ্যাঁ, আজ নিজের পয়সা খরচ ক'রে কলকাতায় তার করলেন!

—ভাল, ভাল, মাগির কপাল ভাল!

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—অমন জুতোমোজা-পরা শিক্ষিতা বউ ঘরে থাকতে এত নীচু নজর কেন ভদ্দরলোকের! আমাদের দারোগাও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা! ইহার উত্তরে গুপিবাবু কি বলেন তাহা শুনিবার ধৈর্য্য আর বিমলের রহিল না। সে বারান্দায় উঠিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িল।

—গুপিবাবু, গুপিবাবু আছেন এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ত্রস্ত গুপিবাবু বাহির হইয়া আসিলেন।

—আপনি তিন ডোজ্ ষ্টিমুল্যাণ্ট মিকশ্চার নিয়ে ভৈরবের বাড়ী যান, এক ঘণ্টা অন্তর তার ছেলেটাকে দেবেন, আর পাল্‌স্ রেসপিরেশন প্রতি ঘণ্টায় গুনে আমাকে খবর দেবেন।

গুপিবাবু নীরবে বিমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হরেন বোস বলিলেন—এটা ডাক্তারবাবু আপনার জুলুম করা হচ্ছে গুপিবাবুর উপর। উনি হাসপাতালের চাকর, আপনার ত চাকর নন?

—আপনি চুপ ক'রে থাকুন।

তাহার পর গুপিবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—আপনি যদি না যান, আপনাকে সাস্‌পেণ্ড করব আমি, আপনি সেদিন আমার প্রেসক্রপশনে কুইনিন দেন নি, সে শিশিটা আমার কাছে আছে এখনও, সেটা নিয়ে যদি রিপোর্ট করি চাকরি থাকবে না আপনার!

গুপিবাবু বলিলেন—আজ্ঞে আমি যাচ্ছি এখুনি!

হরেনবাবুর দিকে একবার তাকাইয়া গুপিবাবু বাহির হইয়া গেলেন। গুপিবাবু চলিয়া গেলে বিমল হরেনবাবুকে বলিল—দেখুন আপনাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার সম্বন্ধে এ রকম আলোচনা যদি ভবিষ্যতে আপনি করেন, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আপনার।

হরেন বোস প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিমল চলিয়া গেল।

রাত্রে বিমল নিজের বাসার বাহিরের ঘরটায় বসিয়া নন্দী-মহাশয়ের গুরুঠাকুরের রক্তটা পরীক্ষা করিতেছিল। অনেক খুঁজিয়াও ম্যালেরিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, তবু সে খুঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার কানে গেল, দরাজ গলায় কে যেন বলিতেছে, একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টি, চৌষট্টি। মিহি গলায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—ও কি, অতটা সরিয়ে সরিয়ে মাপলে চলবে কেন?

বিমল বাহির হইয়া দেখিল প্রতাপবাবু ও রমেশবাবু। প্রতাপবাবু একটা কাঠি দিয়া জমি মাপিতেছেন এবং রমেশবাবু লণ্ঠন ধরিয়া আছেন। প্রতাপবাবুর বাড়ী হইতে গঙ্গার ঘাট কত দূর ইহাই তর্কের বিষয় এবং হাতে কলমে তাহা তাহারা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বিমলের এই বৃদ্ধ দুইটির প্রতি সহসা কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা হইল। কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না, নিজেদের লইয়াই মশগুল আছেন।

একটু পরে আসিয়া গুপিবাবু খবর দিলেন ভৈরবের ছেলেটি মারা গিয়াছে।

৯

সেদিন একটি চিঠি পাইয়া বিমলের ভারি ভাল লাগিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমির মধ্যে এই ছোটখাট ঘটনাগুলি ভারি একটা মাধুর্য্য সঞ্চার করে। চিঠিখানি লিখিয়াছেন শম্ভুকাকা। বিমলের রক্ত-সম্পর্কের খুল্লতাত নন, সম্পর্কটা স্নেহের। শম্ভুকাকা জাতিতে গন্ধবণিক্। এই শম্ভুকাকাই বিমলের প্রথম শিক্ষক, ইঁহারই নিকট বিমল বর্ণপরিচয় আরম্ভ করে। সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস, শম্ভুকাকা অর্থাভাব-প্রযুক্ত আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি উদ্যমশীল লোক, গ্রামের কয়েকটি ছেলে পড়াইয়া, ছোটখাট একটি দোকান করিয়া, সুদে টাকা খাটাইয়া তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারই জোরে, নিজের অধ্যবসায়ের গুণে এবং বিমলের পিতার সাহায্যে তিনি জোগাড়যন্ত্র করিয়া কম্পাউণ্ডারিটা পাস করিয়া ফেলেন। কিছু দিন চাকরি করিয়াছিলেন, এখন চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বিমলদেরই গ্রামে প্র্যাকটিস করিতেছেন। বিমলের বাল্যকালে তিনি শম্ভু মাস্টার নামে পরিচিত ছিলেন, এখন সকলে তাঁহাকে শম্ভু ডাক্তার বলিয়াই জানে। বিমল বাল্যকালে তাঁহাকে শম্ভুকাকা বলিয়া ডাকিত। শম্ভুকাকার সহিত বহুকাল দেখা নাই, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বোধ হয় এক বারও শম্ভুকাকার কথা তাহার মনে পড়ে নাই। সেই শম্ভুকাকাই এত দিন পরে সহসা চিঠি লিখিয়াছে।

প্রিয় বিমল,

অনেক দিন তোমার কুশল-সংবাদাদি পাই নাই। আশা করি সপরিবারে মঙ্গলমত আছ। তুমি স্বর্গীয় সুরেন-দাদার একমাত্র বংশধর, কৃতবিদ্য হইয়াছ এবং বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছ, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি দিন দিন তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক। তুমি অনেক দিন গ্রামে আস নাই, তোমার পৈত্রিক বাড়িটি মেরামত-অভাবে প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে। নিবারণদার মুখে শুনিলাম তুমি জমির বাকী খাজনা এবং সুরেনদার ঋণগুলি শোধ করিয়াছ। শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে। তুমি যদি অনুমতি দাও তোমার পৈত্রিক বাড়ীটি নিজব্যয়ে সারাইয়া তাহাতে আমি আমার ডিস্পেনসারি করি। বাড়ীটা গ্রামের মধ্যস্থলে, আমার সুবিধা হইবে। তুমি যে কখনো আসিয়া উহা সারাইয়া বসবাস করিবে তাহার আশা দেখি না। যদি অবশ্য কখনও তুমি আইস, আমি তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিব, একথা বলাই বাহুল্য। আমার হাতে একটি পুরাতন হাঁপানি রোগী আছে, কিছুতেই সারিতেছে না। তুমি যদি একবার এ অঞ্চলে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করিয়া দাও, বড়ই ভাল হয়। লোকটির অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কিছু কৃপণও বটে, পঞ্চাশ টাকার বেশী দিতে পারিবে না। তাহাকে তোমার কথা বলিয়াছি, রাজি হইয়াছে। যদি আসিতে চাও, কবে আসিবে জানাইবে। আমি ষ্টেশনে হাজির থাকিব। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। গ্রামের অনেকেই তোমাকে দেখিবার জন্ম উৎসুক। যদি এক বার এক দিনের জন্ম আসিতে পার বড়ই আনন্দিত হই। আসিলে সাক্ষাতে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইবে। নিতান্তই যদি না আসিতে পার ঐ বাড়ীটি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি তাহা পত্রযোগে জানাইবে। ভগবানের চরণে সততই তোমার কুশল কামনা করি। ইতি তোমার শম্ভুকাকা।

বহুকাল পূর্ব্বে দেখা শম্ভুকাকার মুখখানি বিমলের মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। এখনও কি তাঁহার তেমনি গোঁফদাড়ি আছে? মনে পড়িল বাল্যকালে ঐ গোঁফ-দাড়িসমন্বিত ব্যক্তিটি মনে বড়ই ত্রাস সঞ্চার করিত। বিমল তখনই শম্ভুকাকার পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। লিখিয়া দিল যে তিনি স্বচ্ছন্দে বাড়ীটি সারাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। তাহার এখন যাইবার সুবিধা নাই। সুবিধা পাইলেই সে গিয়া হাঁপানি রোগীটিকে দেখিয়া আসিবে। যাইবার পূর্ব্বে জানাইবে।

—কাকে চিঠি লিখছ?

পিছনে মণিমালা আসিয়া দাঁড়াইল।

—শম্ভুকাকাকে।

—কে তিনি?

—তুমি চেন না, আমাদের গ্রামের লোক। আমাদের বাড়ীটাকে নিজের খরচে সারিয়ে ডিসপেনসারি করতে চান। লিখে দিলাম তাই করতে, কি বল?

—যা তোমার ইচ্ছে, আমি আর কি বলব?

—বাঃ তুমি হ'লে সহধর্ম্মিণী, তুমি বলবে না ত কে বলবে!

—আহা!

বিমল চিঠির ঠিকানাটা লিখিয়া উঠিয়া পড়িল।

—এই ত এলে, আবার যাচ্ছ কোথায় ?

—নন্দী-মশায়ের ওখানে যেতে হবে, কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আসছে, হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার।

—তুমি তাহলে একটু খেয়ে যাও।

—কি ?

চোখমুখ রহস্যময় করিয়া ভুরু নাচাইয়া মণিমালা বলিল—একটা জিনিস করেছি আজ।

—কি ?

—পেয়ারার জেলি।

—ফের তুমি উনুন-গোড়ায় গেছ।

—আহা, চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না কি! আর যা তোমার ঠাকুর!

মণিমালা বাহির হইয়া গেল এবং একটা প্লেটে করিয়া খানিকটা পেয়ারার জেলি আনিয়া বলিল—দেখ কেমন সুন্দর রং হয়েছে।

—চমৎকার হয়েছে, বাঃ খেতেও সুন্দর।

জেলিটুকু খাইতে খাইতে বিমল পুনরায় বলিল—তুমি কিন্তু আর উনুন-গোড়ায় যেও না, ফের কি কাণ্ড ক'রে বসবে!

—ভাল লাগে না চুপ ক'রে ব'সে ব'সে।

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—একটা গ্রামোফোন কিনে দাও তাহলে ব'সে ব'সে বাজাই।

বিমল হাসিয়া বলিল—পাড়ার লোকে বিরক্ত হবে তাহলে।

মণি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—ভারি বয়ে গেছে!

বিমল আর বেশীক্ষণ বসিল না, নন্দী-মহাশয়ের ওখানে এখনই যাওয়া দরকার। গুরুঠাকুরের জ্বরটা ছাড়ে নাই।

নন্দী-মহাশয়ের ওখানে বিমল যখন পৌছিল, তখন অপর কেহ আর আসেন নাই; নন্দী-মহাশয় একাই বসিয়া ছিলেন। বিমলকে দেখিয়া বলিলেন—কাল থেকে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি, ফাঁক আর পাচ্ছি না।

—কি বলুন ত ?

—ঘোষেদের ঐ যে হতভাগী মেয়েটা পুড়ে মোলো তা নিয়ে আবার কিছু গোলমাল হবে না ত মশাই, শুনেছেন ত সব ঘটনা—

—শুনেছি। গোলমাল আর কি হবে, সে ত যা হবার চুকে বুকে গেছে।

—কিছু বলা যায় না, শত্রুর ত অভাব নেই!

তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চক্ষু দুইটি পাকাইয়া নন্দী-মহাশয় বলিলেন—একমাত্র পুত্র না হ'লে গুলি ক'রে মেরে ফেলতাম আমি ওকে। নচ্ছার কুলাঙ্গার কোথাকার!

বিমল বুঝিল রমেনের কথাটা নন্দী-মহাশয়ের কানে গিয়াছে। পুত্রের উপর খুবই চটিয়াছেন তিনি। কিন্তু ক্ষণপরেই বিমলের সে ধারণা অপনোদিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রমেন প্রবেশ করিল এবং নন্দী-মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বাবা রমেন, গুরুদেবের জন্যে কলকাতা থেকে ফলটা এল কি না ইষ্টিশানে একবার খোঁজ কর ত বাবা! গাড়ীটা নিয়েই না হয় যাও!

অতি মোলায়েম কণ্ঠস্বর, কিছুমাত্র উত্তাপ নাই।

রমেন চলিয়া গেলে নন্দী-মহাশয় বলিলেন—আমাদের ঘোষালবাবু খাসা লোক ছিলেন, জিনিসপত্র এলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। এ লোকটা জুটেছে অতি ব্যাদড়া! ঘোষালবাবু সম্প্রতি বদলি হইয়া গিয়াছেন।

ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, নন্দী-মহাশয় আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া বলিলেন—ওরে হাওয়া কর।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—গুরুদেব কেমন আছেন ?

—এ বেলা জ্বরটা যেন কিছু কম। তবে শ্লেষ্মা এখনও বেশ রয়েছে! কলকাতা থেকে ত উনি আসছেনই আজ রাত্রে, তার কি সব ব্যবস্থা করতে হবে আপনারা তিন জনে ব'সে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে ফেলুন। কেসের হিষ্ট্রিটা ভূধরবাবু টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ভূধরবাবু ইদিকে বেশ ইয়ে আছেন! ডাকতে পাঠিয়েছি সব, এলেন ব'লে।

ভূধরবাবু ও জগদীশবাবুর প্রত্যাশায় বিমল বসিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ

রেজাউল করীম, এম. এ, বি. এল.

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যে এক জন যুগপ্রবর্ত্তক সাধক ছিলেন তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার উপর শ্লেষাত্মক টীকাটিপ্পনী করিবার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক জন শ্রেষ্ঠ সংগঠক বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে কাহারও আপত্তির কোন কারণ নাই। সুতরাং এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক সাহিত্যরসিক তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে অনেক মুসলমান সাহিত্যিক বঙ্কিমকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন; কারণ, তাঁহাদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র এক জন ঘোর মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা না কি বঙ্কিমের বিরাট্ সাহিত্য-ভাণ্ডারে মুসলিম-বিদ্বেষের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগকে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম-বিদ্বেষের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা কি-প্রকৃতির বিদ্বেষ, তাহার স্বরূপ কি? তাহা বাস্তবিকই মুসলিম-বিদ্বেষ, না আর কিছু?

বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম-বিদ্বেষী আর তাঁহার সাহিত্য মুসলিম-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ—এই অভিযোগ কে করিল ও কবে করিল? বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বহু যুগ পূর্ব্বে। তাঁহার কোন গ্রন্থে কেহই কোন পরিবর্ত্তন করে নাই। তিনি যে-আকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, আমরা আজিও তাহা সেই আকারে পড়িয়া থাকি। তৎসত্ত্বেও এত যুগ ধরিয়া তাঁহার গ্রন্থমালা সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর মত তাহা মুসলমানও পড়িয়াছে, শিখিয়াছে এবং নির্ব্বিচারে অনুসরণ করিয়াছে এবং সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে সাহিত্য-সম্রাট্ বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছে। কিন্তু এত দিন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠে নাই, আজ উঠিবার কারণ কি? এত দিন যে-বিদ্বেষকে কেহই আমল দেয় নাই, তাহাই লইয়া আজ কেন এত আন্দোলন উঠিতেছে? বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম-বিদ্বেষের পরিচয় আছে সেই জন্য, না অন্য কারণে? বঙ্কিমের যে গ্রন্থকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুসলিম-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেই 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তর্কস্থলে ধরিয়া লইলাম যে, 'আনন্দমঠ' মুসলিম-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, উহা ভারতবর্ষে হিন্দু-রাজ স্থাপনের জন্য উদ্দীপনা জাগাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উপেক্ষা করিলে চলিবে না। 'আনন্দমঠ' হিন্দুকে মুসলিম-বিদ্বেষী করিতে সাহায্য করিয়াছে, না জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রেরণা জোগাইয়াছে? 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পরেই উহা এরূপ লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল যে তাহার তুলনায় অন্য কোন পুস্তক টিকিতে পারে নাই। বাংলার বহু লোক 'আনন্দমঠ' পাঠ করিয়াছিল, আদর করিয়াছিল এবং উহার আদর্শ অনুযায়ী দল গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মুসলিম-বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র ছিল না। সুতরাং অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, 'আনন্দমঠ' হিন্দুকে মুসলিম-বিতাড়নের আদর্শে দীক্ষিত করে নাই, দীক্ষিত করিয়াছে স্বদেশ-মন্ত্রে। 'আনন্দমঠ' প্রকাশের তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। যাঁহারা কংগ্রেসের উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই যে 'আনন্দমঠ' পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখন তাঁহারা হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেন নাই অথবা হিন্দু-স্বার্থ রক্ষার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন নাই। তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর জন্য জাতীয় কংগ্রেস, সকল সম্প্রদায়ের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি মিলনকেন্দ্র। বঙ্কিম-সাহিত্যের তথাকথিত

মুসলিম-বিদ্বেষ কোনও কার্য্যকর হয় নাই। 'আনন্দমঠে'র পর ক্রমে ক্রমে 'রাজসিংহ', 'সীতারাম', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' বাহির হইল। এগুলিকেও মুসলিম-বিদ্বেষপূর্ণ গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত সব "বিদ্বেষপূর্ণ" গ্রন্থ থাকিতেও দেশে জাতীয় আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমানও সেই আন্দোলনে যোগদান করিল; আর হিন্দুর মুখ হইতে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ভালবাসার বাণী উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই দীর্ঘ যুগে হিন্দুরা হিন্দু-স্বার্থের নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে নাই, অথবা বঙ্কিম-সাহিত্য হইতে মুসলিম-বিদ্বেষের আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই। কোন মুসলমান-নেতাই 'আনন্দমঠে'র মুসলিম-বিদ্বেষের দিক্‌টাকে বড় করিয়া দেখেন নাই। মুসলিম-বিদ্বেষে পূর্ণ বলিয়া কেহ উহাকে বাজেয়াপ্ত করিবার দাবিও করেন নাই। 'আনন্দমঠ' ও জাতীয় আন্দোলন পাশাপাশি ভাবে চলিতে লাগিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন যে-অবলম্বনকে কেন্দ্র করিয়া সজীব হইয়া উঠিল, যাহা বাংলার মরা গাঙে নবজীবনের জোয়ার বহাইয়া দিল—তাহা 'আনন্দমঠ' ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বদেশী-যুগের কর্ম্মীদের 'আনন্দমঠ' ছিল বাইবেল স্বরূপ। কিন্তু সে-যুগের কোন কর্ম্মীই মুসলিম-বিদ্বেষে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, মুসলিম-বিরোধী কোন ভাবধারা তাঁহাদের অন্তরকে কলুষিত করে নাই। মুসলমানের সুবিধা হইবে না, এই ভয়ে অনেক মুসলমান স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের যোগ না-দেওয়ার মূলে সাক্ষাৎ ভাবে কিংবা পরোক্ষ ভাবে 'আনন্দমঠ' ছিল না। তাঁহারা যে-সব কারণ দর্শাইয়া মুসলমান-সমাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'আনন্দমঠে'র নামগন্ধ ছিল না। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল—কংগ্রেসের আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন, হোম-রুল আন্দোলন—কত কি আসিল। এই সময় 'আনন্দমঠ' ও বঙ্কিমের অন্যান্য গ্রন্থ হু হু করিয়া বাজারে চলিতেছিল, কিন্তু কোথাও মুসলিম-বিদ্বেষের কথা এক বারও কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। তার পর আরম্ভ হইল খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন—এই যুগেও বঙ্কিম-সাহিত্যের সমাদর কমে নাই। হিন্দুরা দলে দলে খিলাফতে যোগ দিল—মুসলমানগণ দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিল—হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। 'আনন্দমঠে'র মুসলিম-বিদ্বেষ এখানে কার্য্যকর হইল না। মধ্যে মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামাও হইয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার মূলে বঙ্কিম-সাহিত্যের নামগন্ধও পাওয়া যাইবে না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সহিত মিলিয়াছে, আবার কাটাকাটি করিয়াছে—আবার মিলিয়াছে আবার ঝগড়া করিয়াছে—ইহার মধ্যে বঙ্কিমকে টানিয়া আনিলে চলিবে কেন? আমরা ঝগড়া করিয়াছি সত্য, কিন্তু কখনও বঙ্কিম-সাহিত্যের নজির দেখাই নাই। এত দিন বঙ্কিম-সাহিত্যের মুসলিম-বিদ্বেষের জীবাণু পাই নাই, আজ আমাদের এক দল নেতা হঠাৎ তাহার সন্ধান পাইয়া ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, তাই 'আনন্দমঠে'র বহ্নি-উৎসব হইতে লাগিল। বঙ্কিম-সাহিত্যে এই যে মুসলিম-বিদ্বেষের সন্ধান লাভ, ইহা নূতন ও আনকোরা কথা। বাস্তবতার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক অভিসন্ধির কাজে সাহিত্যকে নিযুক্ত করিলে পরিশেষে সাহিত্যেরই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হয়। বঙ্কিম-সাহিত্যে বাস্তবিকই যদি কোথাও মুসলিম-বিদ্বেষ থাকে, তবে তাহা সে-যুগেও যেমন হিন্দুকে মুসলিম-বিদ্বেষী করিতে পারে নাই, এ-যুগেও তাহা পারিবে না। দেশ ও জাতি বঙ্কিম-সাহিত্য হইতে যে-রসের আস্বাদন পাইয়া আসিতেছে তাহাই তাহাকে যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। দু-একটা গালি-মন্দের ছিটেফোঁটা বিরাট বঙ্কিম-সাহিত্যের মহিমাকে আদৌ ম্লান করিতে পারিবে না।

বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম-বিদ্বেষের স্বরূপটা বিচার করিবার পূর্ব্বে আর একটা বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। সাহিত্য-বিচার করিবার মানদণ্ড কি? সাহিত্যের একটা ধর্ম্ম আছে, আদর্শ আছে, বৈশিষ্ট্য

আছে। সেই ধর্ম্ম, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ব্যতীত কোন রচনাই সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

রসসৃষ্টি সাহিত্যের একটি প্রধান ধর্ম্ম। যেখানে রসবোধ নাই সেখানে সাহিত্য নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আদর্শ দ্বারা সাহিত্যের বিচার হইয়া থাকে। যে সাহিত্য এক যুগে সচল থাকে, তাহাই পরবর্ত্তী যুগে অচল হইয়া যায়। আবার যাহা এক যুগে অচল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হয়ত পরবর্ত্তী যুগে সচল হইয়া পড়ে। কিন্তু এমনও লেখা আছে যাহা যুগের আক্রমণ সহ্য করিয়া অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া থাকে। যে-সব বৈশিষ্ট্যগুণে সাহিত্য যুগের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে তাহা যদি তোমার রচনায় থাকে, তবে তুমি অমর ও কালজয়ী। তুমি কাহাকে আক্রমণ করিয়াছ, কাহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছ তাহা দেখিবার বিষয় নহে। সেই আক্রমণের মধ্যে তুমি রসসৃষ্টি করিতে পারিয়াছ কি না তাহাই দেখিতে হইবে। যদি পার, তবে তোমার রচনা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে আদরণীয় হইবে। রুশো ও ভলটেয়ারের কথা ধরা যাক। তাঁহাদের অনেক লেখা আক্রমণাত্মক। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহারা নিরঙ্কুশ লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাদের গ্রন্থ কোথাও আদৃত হয় নাই। প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদের গ্রন্থাবলী ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং তাঁহারা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিদেশে নির্ব্বাসন-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভিক্টর হিউগোকেও নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। টমাস পেনকে সমগ্র জীবন অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা ধর্ম্মব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা—কোন কিছুকেই আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহাদের এই সব বিরুদ্ধ সমালোচনার অনেকগুলি নিতান্ত বাজে ও অযৌক্তিক। কিন্তু তাঁহাদের রচনার মধ্যে চিরন্তন সত্য ও সাহিত্যের সম্পদ ছিল বলিয়া আজিও তাহা সর্ব্বদেশে আদৃত হইতেছে। গালাগালি ও আক্রমণ আছে বলিয়া আজ কেহই রুশো, ভলটেয়ার ইত্যাদিকে অসম্মান করে না। বরং গত কোন যুগে লোকে তাঁহাদের প্রতি যে অসম্মান দেখাইয়াছিল, আজ আমরা সমুচিত সম্মান দেখাইয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। ভাষার সৌন্দর্য্য, ভাবের গভীরতা, আনন্দের উপাদান, সৃষ্টির বৈচিত্র্য—এই সব থাকিলেই সাহিত্য অমর হইয়া রহিবে, মানবের চিত্তপটে অপূর্ব্ব প্রভাব আঁকিয়া দিবে। ঠিক এই ভাবে বঙ্কিম-সাহিত্যকে আলোচনা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি নবাব-বাদশাহ সম্বন্ধে কি কথা বলিয়াছেন, তাহাদিগকে কেন ভালভাবে চিত্রিত করেন নাই, তাহা বড় কথা নয়, তাহা মোটেই ধর্ত্তব্যের বিষয় নহে। তিনি রসসৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন কি না কেবল তাহাই দেখিতে হইবে; যদি পারিয়া থাকেন তবে তিনি প্রত্যেক যুগের সাহিত্য-রসিকের নিকট চির-আদরণীয়, চিরবরণীয় হইয়া রহিবেন। বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম-বিদ্বেষ আছে? থাকিলই বা, তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাহা অতি সামান্য বিষয়। রুশো ভলটেয়ারকে যেমন আমরা ক্ষমা করিয়াছি, বঙ্কিমকেও সেইরূপ ক্ষমা করিতে হইবে। কারণ বঙ্কিম-সাহিত্যের চারি দিকে হীরা-জহরৎ এমন ভাবে ছড়াইয়া আছে যে তাহার প্রলোভনে সামান্য একটু কাদাময়লাকে ভয় করিলে চলিবে না।

২

এখন দেখিতে হইবে বিদ্বেষ বলিতে কি বুঝায়? মুসলিম-বিদ্বেষ, হিন্দু-বিদ্বেষ প্রভৃতি কথা আজকাল প্রায় শুনা যায়। অনেকে ইহার মর্ম্ম বিন্দুমাত্র বুঝেন না। তাই কাহারও সম্বন্ধে কোনরূপ অপ্রীতিকর আলোচনা করিলেই অথবা প্রচলিত ধারণার বিপরীত কোন কথা বলিলেই তাহাকে বিদ্বেষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্বেষ তাহা নহে। আক্রমণ, প্রতিকূল সমালোচনা অথবা প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ মাত্রই বিদ্বেষ নহে। তাহা হইলে বিশ্ব-সাহিত্যের প্রধান প্রধান সাহিত্যরচনা সে-দোষ হইতে অব্যাহতি পাইবে না; এমন কি, কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তকও বাদ যাইবে না। সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে লিখিত রচনাতে প্রচলিত আচার-পদ্ধতি ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনেক কথাই আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বিদ্বেষপূর্ণ রচনা নহে।

কাহারও দোষত্রুটি ধরিয়া দিলে বিদ্বেষ হয় না। ইতিহাস-আলোচনার কালে বহু ঘটনাকে অস্বীকার করিলে বিদ্বেষ হয় না; জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও ক্ষুদ্র করিবার জন্য সত্যকে অস্বীকার ও গোপন করিয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিয়া যদি কেহ আক্রমণ করে কিংবা অপরের তীব্র সমালোচনা করে, তবে তাহাকে বিদ্বেষ বলা যায়। কোন গোপন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অথবা পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য লোকে যে-সব ব্যবহার করে তাহাকে বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার বলা যাইতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ পেশাদার ধর্ম্মপ্রচারকদের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা অপর ধর্ম্মকে অযথা আক্রমণ করিয়া নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকে। মুইর, সেল, স্প্রেন্‌জার, জুয়েমার, মারগালুইথ প্রভৃতি লেখকগণ ইসলাম ধর্ম্মকে হেয় করিবার জন্য, ইসলামের মতসমূহকে নিন্দা করিবার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সব গ্রন্থ বিদ্বেষপূর্ণ ভাবধারায় পরিপূর্ণ। বহু মুসলমান লেখক ঐ সকল খ্রীষ্টান লেখকের বিদ্বেষপূর্ণ গ্রন্থের প্রত্যুত্তর সেইরূপ বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায় দিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ সাহেব "যিশু কি নিষ্পাপ" এই নাম দিয়া একটি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন এবং ইসলাম মিশনের পক্ষ হইতে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকাখানি খ্রীষ্টান-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ খ্রীষ্টান লেখকগণ যে নিন্দিত পথ অবলম্বন করিতেন, কতকগুলি মুসলমান লেখক সেই পথই অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আজ রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপে এই সব আক্রমণের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। এত দিন হিন্দু লেখকদের উপর আমাদের নেতাদের শ্যেন দৃষ্টি পতিত হয় নাই। রাজনৈতিক কারণে তাঁহারা সেই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন এবং হঠাৎ সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রকে পাকড়াও করিয়া বসিলেন। আজ বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম-বিদ্বেষের যে নিদর্শন পাইয়াছেন তাহার নিদারুণ জ্বালা কিছু দিন পূর্ব্বেও তাঁহারা অনুভব করেন নাই। বঙ্কিমের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে তাঁহার প্রভাবে যখন ভারতের চারি দিকে নবযুগের সূচনা দেখা দিল, যখন লোকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে যখন মানুষ উদারভাবে সকল বিষয় আলোচনা করিতে শিখিল, ঠিক সেই সময় ফতোয়া জারি হইল বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এক জন ঘোর মুসলিম-বিদ্বেষী। যে-যুগে লোকে কদর্য্যতার মধ্যে সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে সেই যুগে পরমতম সুন্দরের মধ্যে কদর্য্যতা আবিষ্কার করিবার জন্য আর এক দল লোকের কি বিপুল উৎসাহ! কি অক্লান্ত অভিনিবেশ! ধর্ম্মান্ধতার ইহাই পরিণতি।

ধর্ম্মপ্রচারকদের রচনায় যে-ধরণের বিদ্বেষ পরিদৃষ্ট হয়, বঙ্কিম-সাহিত্যে তাহা আছে কি না তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে সে-ধরণের কোনরূপ বিদ্বেষপূর্ণ ভাবধারা নাই। কেহ কি দেখাইতে পারিবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কোথাও ইসলাম ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন? ইসলামের শিক্ষা, সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ—এ সকলকে কি তিনি কোথাও আক্রমণ করিয়াছেন? হজরত মহম্মদের প্রতি কি তিনি কোথাও অশ্রদ্ধার ভাব দেখাইয়াছেন? ইসলামের রীতিনীতি, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির উপর তিনি কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন? তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ইসলাম-বিদ্বেষী অথবা মুসলমানের শত্রু মনে করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। তিনি যদি কাহাকেও আক্রমণও করিয়া থাকেন, তবে তাহারা ত এক-এক জন ব্যক্তি। ভারতে মুসলমান নৃপতিগণের কয়েক জন, তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতির কয়েকটি নীতি, সেনা-বিভাগের কয়েক জন কর্ম্মচারী, অথবা নবাব-বাদশাহদের কুমার-কুমারী ইহারাই তাঁহার আক্রমণের বিষয়। ইহাদিগকে লইয়া কি সমস্ত ইসলামের কাঠামো রচিত, যে, ইহাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিলেই লেখককে ইসলাম-বিরোধী বলিতে হইবে? মুসলমানের উপর তাঁহার এমন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না যে তাহা মিটাইবার জন্য তিনি সব ছাড়িয়া দিয়া ইসলামকে হেয় প্রমাণিত করিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়া যাইবেন। একটা কথা অনেকে বলিতে পারেন, তবে কেন তিনি ভারতীয় বাদশাহ-নবাবকে দেবতারূপে চিত্রিত

করেন নাই? আওরঙ্গজেবকে কেন পামর বলিয়াছেন? জেবউন্নিসাকে কেন দেবী বলেন নাই? ইত্যাদি ইত্যাদি কেন তিনি করেন নাই। ইহার সহজ উত্তর এই যে, বঙ্কিমের যুগে মুসলিম-ভারতের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হয় নাই। আরবী-ফারসীতে যে-সব গ্রন্থ লিখিত ছিল তাহার সবগুলির অনুবাদ হয় নাই। বর্ত্তমানে গবেষণা করিয়া যে-সব তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তখন তাহা হয় নাই। উপন্যাস-লেখককে বাজার-প্রচলিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া মালমসলা সংগ্রহ করিতে হইত। তাছাড়া মুসলিম-ভারতের বহু ঘটনা বিতর্কমূলক ছিল, আজিও সে-সব তর্কের অবসান হয় নাই। এমন অনেক ঘটনা আছে যাহার সম্বন্ধে আজিও দুই শ্রেণীর লোক দুই প্রকার মত পোষণ করেন। আজ ইতিহাস উদ্ধারের জন্য নানারূপ গবেষণা হইতেছে। প্রাচীন নথিপত্র হইতে, শিলালিপি হইতে, পুরাতন চিঠিপত্র হইতে, কীটদষ্ট ছিন্ন কেতাব হইতে, মুদ্রা ও অন্যান্য চিহ্ন হইতে কত নূতন নূতন কথা ও তথ্য লোকলোচনের গোচরীভূত হইতেছে। এই সব বিষয় আবিষ্কৃত না হইলে আমাদের অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে এই সব নূতন তথ্য জানিবার কোন উপায় ছিল না। সে-যুগের প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য ঘটনা হইতে যতই বিপরীত হউক না কেন, তাহার জন্য তিনি মোটেই দায়ী নহেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ ও প্রধানতঃ ঐতিহাসিক ছিলেন না যে প্রকৃত ঘটনা যাচাই করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবেন্। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টির জন্য হাতের কাছে যাহা পাইয়াছিলেন তাহাই বাছিয়া লইয়াছিলেন। সে-যুগে স্কুল-কলেজে যে-সব ইতিহাস পঠিত হইত তাহা একেবারেই মিথ্যাবিবর্জ্জিত নহে। এলফিনস্টন, ষ্টুয়ার্ট, বার্ণিয়ার, ট্রাভারনিয়ার প্রভৃতি একদেশদর্শী ইতিহাস-পুস্তকই বিদ্যালয়ে চলিত। অধ্যাপকগণ ও শিক্ষকগণ তাহাই পড়াইতেন ও পড়িতেন। আর তাহাই বিশ্বাস করিতেন। এ সমস্ত ইতিহাস-পুস্তকের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যুগ তখনও আরম্ভ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ স্কুল-কলেজেই পড়িয়াছিলেন, সুতরাং মুসলিম-যুগের কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সাধারণের মতই হইয়াছিল। ভারত-ইতিহাসের যে-সব ঘটনাকে আজ আমরা বিতর্কমূলক বলিয়া মনে করি, বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত প্রচলিত বিশ্বাস-মতে সে সম্বন্ধে একটা সুস্থির ধারণা করিয়াছিলেন। মিরকাশিম ও তকি খাঁকে তিনি উচিত সম্মান দেখান নাই সত্য কথা, কিন্তু তখনও ইঁহাদের সম্বন্ধে সত্য তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই। সে-যুগের কথা ত দূরের কথা, আমরা বাল্যকালে যে ইতিহাস পড়িয়াছি তাহাতে তকি খাঁ ও মিরকাশিম পামর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন। আজিকার মানদণ্ড দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচার করিলে চলিবে না। মুসলমান নবাব-বাদশাহকে মুসলমান যে-ভাবে দেখে, অন্য কেহ যদি ঠিক সেইভাবে দেখিতে না পারে তবে তাহাকে মুসলিম-বিদ্বেষী বলিবার কাহারও অধিকার নাই। খ্রীষ্টানগণ যিশু-খ্রীষ্টকে যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, মুসলমানগণ সেই ভাবে তাঁহাকে দেখেন না। তবে কি বলিব যে মুসলমানগণ খ্রীষ্ট-বিদ্বেষী?

আর একটা কথা সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ইতিহাস ও উপন্যাস এক বস্তু নহে। ইতিহাসে থাকে সত্য ঘটনার সমাবেশ, তাহাতে মিথ্যার স্থান নাই, মতামতের স্থান নাই, কল্পনাও সেখানে অচল। এমন কি, খুব বিবেচনাসঙ্গত না হইলে লেখকের সিদ্ধান্ত সেখানে চলিতে পারে না। ইতিহাসশাস্ত্র কতকটা বিজ্ঞানশাস্ত্রের মত—যাহা ঘটিয়াছে তাহারই বাহুল্যবর্জ্জিত নিখুঁত বর্ণনাই ইতিহাসের প্রাণবস্তু। কিন্তু উপন্যাস ইতিহাস নহে। উপন্যাসে চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির জন্য লেখক অনেক ঘটনাকে বাদ দেন; কল্পনার আশ্রয়ে এমন অনেক নূতন ঘটনার সৃষ্টি করেন যাহার সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ অতি অল্প। ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা উপন্যাসে পাওয়া যাইবে না, আর উপন্যাসের রসমাধুরী হইতে ইতিহাস বঞ্চিত। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক। তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য ইতিহাস লেখেন নাই, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য তিনি লিখিয়াছেন্ উপন্যাস। সুতরাং তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রকে সুন্দররূপে ফুটাইবার জন্য তিনি কতকগুলি

কাল্পনিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রচলিত ইতিহাসের পটভূমিকায় তিনি কতকগুলি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে বিদ্বেষ অথবা অদ্বেষের কথা উঠিতেই পারে না। ইতিহাসের কোন অজ্ঞাত বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার উপন্যাস পড়ি না, সে উদ্দেশ্যে তিনি উপন্যাসও রচনা করেন নাই। আমরা তাঁহার উপন্যাস পড়ি সাহিত্যের জন্য, আনন্দের জন্য, চিত্ত-বিনোদনের জন্য। আমরা যাহা চাই তাহা যদি প্রচুর পরিমাণে পাই, তবেই যথেষ্ট। কাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন, কাহার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন—এই সব বিষয় ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা সমালোচকের বিদ্বিষ্ট মনের পরিচয় দেয়।

উপন্যাস আর প্রবন্ধের মধ্যে একটা পার্থক্য সহজ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। প্রবন্ধের প্রত্যেকটি লাইনে লেখকের মনের কথা ধরা পড়ে। কিন্তু উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের কোন্ কথাটা লেখকের, আর কোন্ কথাটা কাল্পনিক চরিত্রের তাহা নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত মুশকিল। হয়ত এক জন পাপী ধর্ম্মকে নিন্দা করিল, ভগবান্ অস্বীকার করিল, অথবা পঞ্চমুখে পাপের প্রশংসা করিল। আমরা কি তবে ধরিয়া লইব যে লেখকই এই কথা বলিতেছেন? অনেক ক্ষেত্রে হয়ত ইহা লেখকের কথা নয়। আবার কেহ অপর এক জনকে সাধুবাদ করিল তাহাও হয়ত লেখকের মনের কথা নয়। সুতরাং লেখকের মনের কথা জানিতে হইলে সমগ্রভাবে তাঁহার উপন্যাসখানি পড়িতে হইবে এবং সমষ্টিগতভাবে তাঁহার মূলকথাটা জানিয়া লইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন চরিত্রের মুখ হইতে মুসলমান সম্বন্ধে কতকগুলি অশোভন কথা উচ্চারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা যে বঙ্কিমেরই কথা এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 'আনন্দমঠে'র এক স্থানে সত্যানন্দ বলিতেছেন, "এ বাবুয়ের বাসা—শূকরের খোঁয়াড় ভাঙিয়া ফেল।" অনেকে মনে করেন মুসলমানকে ধ্বংস করিয়া হিন্দু-রাজ স্থাপনের জন্য প্রেরণা দিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল। বঙ্কিমের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, যে-চরিত্রের মুখে যে-কথা সাজে তিনি অপূর্ব্ব পটভূমিকায় তাহার মুখে ঠিক সেই কথাই বলাইয়াছেন। যে-যুগের কথা লইয়া 'আনন্দমঠ' রচিত সেই যুগের রাজনৈতিক অবস্থাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুলিখোর মিরজাফর রাজ্যশাসনে উদাসীন, ঘুষখোর সিতাব রায় ও রেজা খাঁ প্রজাপীড়নে রত, আর বিদেশী বণিক্ দেশলুণ্ঠনে ব্যস্ত—এই অবস্থার অবসান করিবার জন্য সন্তানদল সমগ্র জীবন পণ করিয়াছে। তাহাদের নেতা সত্যানন্দ এহেন রাজাকে শূকরের খোঁয়াড় ও বাবুয়ের বাসা বলিবেন না ত কি বলিবেন? স্বরচিত পটভূমিকায় যাহার মুখে যাহা সাজে, ঠিক সেই কথা বলাইবার কৌশলে শেক্সপীয়র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'জুলিয়াস সিজারে'র একটি দৃশ্যের কথা স্মরণ করিতে বলি। সিজার নিহত হইয়াছেন। আদর্শবাদী ব্রুটাস রোমের নাগরিকদের নিকট তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য যে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা ঠিক তাঁহারই অনুরূপ হইয়াছিল। আর সুকৌশলী এনটোনিও তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারই অনুরূপ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রেরও এই আর্ট ভালভাবে জানা ছিল। তাই তিনি বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়া ঠিক অনুরূপ কথাই বলাইয়াছেন। সেই সব কথাগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম-বিদ্বেষের প্রমাণ-স্বরূপ নজির দিলে চলিবে কেন? রাজসিংহের চঞ্চলকুমারীর আচরণ দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতে পারি। কিন্তু জিজিয়া কর প্রবর্ত্তনের পর এক দল হিন্দু যে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। যাহারা আওরঙ্গজেবকে ঘৃণা করিত, তাঁহার পতন বাসনা করিত, চঞ্চলকুমারী তাহাদেরই এক জন। তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহারই অনুরূপ হইয়াছে। বস্তুতঃ 'রাজসিংহে' আওরঙ্গজেবের তসবিরের উপর যে লাথি মারিয়াছে সে বঙ্কিম নহে, সে সেই যুগেরই এক জন লোক যে সম্রাটের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম-বিদ্বেষের পরিচয় দেয় না। এই ঘটনা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, সে-যুগে আওরঙ্গজেবের সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে একটা প্রবল বিদ্রোহের অনল ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল। কথোপকথনের বিষয় বাদ দিয়া চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কতক লোককে মন্দভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, সেইরূপ কতককে তিনি ভাল ভাবে আঁকিয়াছেন—কেবল মুসলমানকেই কুৎসিত ভাবে আঁকেন নাই, কিংবা কেবল হিন্দুকেই দেবতার আসন দেন নাই। তাঁহার ভাল-মন্দ চরিত্রের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে। আয়েশা বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, স্বর্গের মাধুরী ও পবিত্রতা তাঁহার সারা অঙ্গে লেপিয়া দিয়াছেন। তাহারই পার্শ্বে শৈবলিনীকে, রোহিণীকে দাঁড় করাইলে বঙ্কিমচন্দ্রের নিরপেক্ষ মনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১

শুধু ইন্দ্র রায়ই নয়, হেমাঙ্গিনীও ভুল করিলেন।

ফুলশয্যার দিন দুই পরেই বর ও কন্যার জোড়ে কন্যার পিত্রালয়ে আসার বিধি আছে, 'অষ্টমঙ্গলা'র যাহা কিছু আচার-পদ্ধতি সবই কন্যার পিত্রালয়েই পালনীয়; সুতরাং অহীন্দ্র ও উমা রায়-বাড়ীতে আসিল। হেমাঙ্গিনী ও বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিলেও উমাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। সুযোগ তিনি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করেন নাই, হাজার হইলেও তিনি মেয়ের মা, নদী-কূলের বাসিন্দার মত, বন্যা রূপ নিন্দার ভয় যে মেয়ের মায়ের অহরহ। কঠোরভাবে তিনি কন্যার জননীর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, উমার কাছে গিয়া এক দিন বসেন নাই পর্য্যন্ত। মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই, কে হয়তো এখনই বলিয়া বসিবে যে, মেয়েকে তিনি কোন গোপন পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন।

আপন গৃহে কন্যাকে পাইয়া তিনি কন্যার মুখ দেখিয়া প্রথমটা শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিলেন, তাঁহার স্বামীর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। রায় সেদিন বাড়ী আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে সে কথাটি বলিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন—ওদের তো আমাদের মত অজানা-অচেনা নয়, আর পনেরো বছরের বর, দশ বছরের কনেও নয়।

রায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তা বটে!

হেমাঙ্গিনী মৃদু হাসিয়া উমার কপালে খসিয়া-পড়া চুল-গুলিকে আঙুলের ডগা দিয়া তুলিয়া দিয়া বলিলেন—স্নান ক'রে খেয়ে দেয়ে বেশ ভাল ক'রে একটু ঘুমো দেখি।

উমা নিতান্ত ছোট মেয়ে নয়, সে মায়ের মৃদু হাসি ও কথাগুলির অর্থ দুই বেশ বুঝিতে পারিল; দুঃখে অভিমানে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল কিন্তু প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া সে-আবেগ সে রোধ করিল। সে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। মা মনে করিলেন—কন্যার লজ্জা। তিনি আবারও একটু হাসিয়া অহীন্দ্রকে জলখাবার দিতে উঠিলেন। বিবাহ উপলক্ষে সমাগতা তরুণী কুটুম্বিনীর দল উমার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া গিয়াছিল—উমার আজ তাহাদের মধ্যেই থাকিবার কথা। ভাঁড়ারের দিকে চলিতে চলিতে হেমাঙ্গিনী আবার হাসিলেন।

অমল বাড়ীতে নাই, ইন্দ্র রায় তাহাকে সদরে পাঠাইয়াছেন। ঐ চরের ব্যাপার লইয়াই সে খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক দরবার করিতে গিয়াছে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর প্রতিনিধি হইয়াই সে গিয়াছে। কল-ওয়ালার অত্যাচারে চরে প্রজা উৎখাত হইয়া যাইতেছে, জোরপূর্ব্বক নদীতে বাঁধ দিয়া পাম্প করিয়া জল তোলায় চাষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে; এমন কি গরীবদের গার্হস্থ্য-জীবন পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। যাওয়া উচিত ছিল অহীন্দ্রের। কিন্তু বিবাহের আচার-আচরণগুলির জন্য তাহার যাওয়া চলে না বলিয়াই অমল গিয়াছে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর প্রতিনিধিস্বরূপে। কলওয়ালার অত্যাচারে চরের প্রজা উৎখাত হইয়া যাইতেছে, এই অভিযোগ। ইন্দ্র রায় অহীন্দ্রকে সেই কথাই বুঝাইতেছিলেন।

অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জলখাবার লইয়া আসিয়া রায়কে বলিলেন—না বাপু, তুমি কিন্তু অদ্ভুত মানুষ; জমিদারি, মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এই ছাড়া কি আর কথা নেই তোমাদের? অমলকে তো পাঠিয়ে দিলে সদরে, এই বার অহীনকে পার তো হাই-কোর্ট পাঠাও।

রায় হাসিয়া বলিলেন—জান, আকবর শা বাদশা বারো বছর বয়সে হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছিলেন। জমিদারের ছেলে জমিদারীর কাজ না শিখলে হবে কেন? জেলার হাকিমদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখতে হবে, বিষয়-

সম্পত্তি কোথায় কি আছে জানতে হবে; তবে তো! মোটামুটি আইন-কানুন এগুলোও জেনে রাখতে হবে। আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা এগুলোও একটু আধটু শিখতে হবে বই কি। জান তো—'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের'! একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া রায় আবার বলিলেন—দাঙ্গাই বল আর হাঙ্গামাই বল—আসলে হ'ল যুদ্ধ। রাজায় রাজায় হ'লেই হয় যুদ্ধ, আর জমিদারে জমিদারে হ'লেই হয় দাঙ্গা। আসলে হলাম আমরা রাজা। ছোট অবশ্য—গরুড় আর চামচিকে যেমন আর কি। বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তার পর উঠিয়া বলিলেন—তা হ'লে তুমি ব'স বাবা। আমি এক বার দেখি, সেরেস্তার কাজ অনেক বাকী পড়ে গেছে। অমল এই বেলাতেই এসে পড়বে।

অমল ফিরিল অপরাহ্ণে—অপরাহ্ণের প্রায় শেষভাগে। অহীন্দ্র তখন বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। স্বভাবধর্ম্ম অনুযায়ী অমল সোরগোল তুলিয়া ফেলিল। সে উমাকে এক নূতন নামে চীৎকার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল—উম্‌নী—উম্‌নী—এই উম্‌নী!

হেমাঙ্গিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ও কি? উম্‌নী আবার কি?

হাসিয়া অমল বলিল—উমার নতুন নাম বের করেছি আমি!

দাদার সাড়া পাইয়া উমা ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসি মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, অমল বলিল—তোর নতুন নাম দিয়েছি উম্‌নী। পছন্দ কি না বল? সে আপনার সুটকেসটি খুলিতে বসিল।

উমা কোন জবাব দিল না, হাসিতেছিল—হাসিতেই থাকিল। অমলকে পাইয়া তাহার মন যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া উঠিয়াছে।

অমল স্যুটকেসের তালায় চাবিটি পরাইয়া বলিল—বল-বল, শীগ্‌গির বল—yes or no?

উমা এবার বলিল—খারাপ নাম আবার কেউ পছন্দ করে নাকি?

—ও-সব আমি বুঝি না। Say, yes or no!

ঘাড় নাড়িয়া উমা বলিল—No!

—No! আচ্ছা তবে থাকল, পেলি না তুই। অমল স্যুটকেস হইতে হাত সরাইয়া লইল।

উমা উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল—কি?

—সে জেনে তোর দরকার কি?

অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উমা এবার বলিল—না না না—তবে no নয় no নয়। yes! yes!

অমল স্যুটকেস খুলিয়া বাহির করিল—সাঁওতাল তাঁতীর বোনা মোটা সুতার একখানি সাঁওতালী শাড়ী। সাদা ধবধবে দুধের মত জমির প্রান্তে লাল কস্তায় চওড়া সাঁওতালী মই-পাড় শাড়ীখানি দেখিয়া উমার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অমল শাড়ীখানি উমার হাতে দিয়া বলিল—Queen of Santhals—মহামহিমান্বিতা—উম্‌নী ঠেক্‌রুণ! যা পরে আয়, এক্ষুনি পরে আয় দেখি কেমন মানায়! যা।

উমা গেল, কিন্তু চঞ্চল উৎসাহিত গমনে নয়; মন্থর গতিতে চলিয়া গেল।

অমল হাসিয়া বলিল—তিন দিনে দেখছি উম্‌নীর তেত্রিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে! মেয়েটার লজ্জা এসে গেছে!

হেমাঙ্গিনী একটু ধমক দিয়াই বলিলেন—তোর আর জ্ঞানবুদ্ধি কোন কালে হবে না অমল! নে মুখ হাত ধুয়ে নে। অহীন বেড়াতে গেছে—তুই বরং একটু বেরিয়ে তাকে নিয়ে আয়।

—উত্তম কথা। উম্‌নী ঠেক্‌রুণকেও তা হ'লে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। বলিয়াই সে হাঁকিতে আরম্ভ করিল—উম্‌নী—উম্‌নী!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—না। গাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী; ও সব তোমার খেয়াল-খুশী মত হবে না। শ্বশুরবাড়ীর কথা ছেড়ে দিয়েও তোমার বাপ শুনলে রাগ করবেন।

উমা সাঁওতালী শাড়ী পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। অদ্ভুত রকম দেখাইতেছিল উমাকে। হেমাঙ্গিনী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—বলিলেন—যা যা ছেড়ে ফেল গে!

অমল বলিল—সাঁওতালদের মত চুলটা বাঁধতে পারিস? একটা ফটো তুলে নি তা হ'লে।

ফটোর নামে উমা আবার একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল।

*   *   *

অমল আসিয়া উপস্থিত হইল কালিন্দীর ঘাটে। সে ঠিক জানে অহীন্দ্রকে কোথায় পাওয়া যাইবে। ঘাটের পাশে অল্প একটু দূরে একটা ভাঙনের মাথায় ঘাসের উপর অহীন্দ্র বসিয়াছিল। ভাঙনটার ঠিক সম্মুখে ওপারে চরের উপর সাঁওতাল-পল্লীটি দেখা যাইতেছে। পল্লীটি স্তব্ধ; চরের ওপাশে কারখানায় হিন্দুস্থানী শ্রমিক-পল্লীতে একটা ঢোল বাজিতেছে। পচুই মদের দোকান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে উচ্ছৃঙ্খল কলরব। অহীন্দ্র স্থাণুর মত বসিয়া ওপারের দিকে চাহিয়াছিল। অমল পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাতেও অহীন্দ্রের একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হইল না। অমল বিস্মিত হইয়া সশব্দে অগ্রসর হইয়া অহীনের পাশে বসিয়া বলিল—ব্যাপার কি বল তো? ধ্যান করছ না কি?

এ আকস্মিকতায় অহীন্দ্র চমকিয়া উঠিল না, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিভরেই সে অমলের আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলাইয়া দেখিল—তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল—তুমি!

হাসিয়া অমল বলি—হ্যাঁ আমি। কিন্তু তোমার যে দেখি ধ্যানী বুদ্ধের মত অবস্থা!

অহীন্দ্রও একটু হাসিল—তার পর বলিল—ভাবছি ওই চরটার কথা।

—ওই চরটাই তোমাকে খেলে দেখছি! ও-সব ভাবনা ছাড়, ওর ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি। কালেক্টার খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। বললেন—ইমিডিয়েটলি এর ব্যবস্থা তিনি করবেন; আরজেণ্ট নোট দিয়ে তিনি আমার সামনে এস-ডি-ওকে এনকোয়ারির ভার দিলেন। সাঁওতালদের জমি সম্বন্ধে একটা স্পেশাল আইন আছে। তাতে ওদের জমি বিক্রী হয় না। সেই আইন এখানে চালানো যায় কি না দেখবেন।

কথা বলিতে বলিতে অমল অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল কলওয়ালা বিমলবাবুর উপর। বলিল—স্কাউণ্ড্রেলটার সমস্ত কথা আমি বলেছি কালেক্টরকে। দ্যাট পুয়োর ইনোসেণ্ট গার্ল—ওই সারী ব'লে মেয়েটার কথা সুদ্ধ বলেছি।

অহীন্দ্রের মুখে ফুটিয়া উঠিল এক অদ্ভুত হাসি। সে হাসি দেখিয়া অমল আহত ও বিরক্ত না হইয়া পারিল না, বলিল—হাসছ যে তুমি?

—হাসছি ওই লোকটার ওপর তোমার রাগ দেখে।

—কেন? রাগের অপরাধটা কি?

—অপরাধ নয়, অবিবেচনা। মানে—ও লোকটা আর নতুন অন্যায় কি ক'রেছে বল? চিরকাল পৃথিবীতে বুদ্ধিমান শক্তিশালীরা দুর্ব্বল নির্ব্বোধের ওপর যে আচরণ ক'রে এসেছে তার বেশী কিছু করেনি ও লোকটা। সম্রাট বাদশা রাজা দিগ্বিজয়ী থেকে আরম্ভ ক'রে রায়হাটের জমিদারবংশের পূর্ব্বপুরুষেরা পর্য্যন্ত সকলেই এই একই আচরণ ক'রে এসেছেন—আপন আপন সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী। আমরাও সুযোগ পেলে এবং সামর্থ্য থাকলে তাই করতাম। হয়তো ভবিষ্যতে করব।

অমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল, শুধু বিস্ময়েই নয়—অন্তরে অন্তরে সে একটা তীব্র জ্বালাও অনুভব করিল। সে ঈষৎ উষ্মাভরেই প্রশ্ন করিল—হোয়াট ডু ইউ মীন?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল—বিশ্বচরাচরে আদিকাল থেকে যা ঘটে ওই চরেও ঠিক তাই ঘটল। সাঁওতালগুলোকে ওই ভাবে বঞ্চিত হ'তেই হ'ত—ওই মেয়েটারও ওই দুর্দ্দশাই ঘটত—সে তোমার ওই লোকটা না এলেও ঘটত। চরটা এবং তোমার মধ্যেকার টাইম অ্যাণ্ড স্পেসের ডাইমেনসন বাড়িয়ে নাও না, দেখবে চরটা বেমালুম পৃথিবীর সঙ্গে মিশে গেছে, কোন পার্থক্য নেই।

অমল এবার স্তব্ধ হইয়া গেল। অহীন্দ্রের কথায় এবং তাহার কণ্ঠস্বরের সকরুণ আন্তরিকতা তাহাকে প্রতিবেশীর শোকের মত স্পর্শ করিল, আচ্ছন্ন করিল। সেই বিচিত্র অর্দ্ধস্ফুট হাসিটুকু অহীন্দ্রের মুখে লাগিয়াই রহিল, সেই অবস্থাতেই সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর অমল জোর করিয়া চিন্তাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—হ্যাং ইয়োর বিশ্বপ্রেম। ওঠ এখন সন্ধ্যে হয়ে গেল।

অন্যমনস্ক ভাবে অহীন বলিল—এ্যাঁ?

—ওঠ ওঠ। সন্ধ্যে হয়ে গেল। যত সব উদ্ভট চিন্তা; চল এখন বাড়ী চল।

আচ্ছন্ন স্বপ্নাতুরের মতই অহীন্দ্র উঠিল এবং অমলের সঙ্গে রায়-বাড়ীর দিকে পথ ধরিল। চলিতে চলিতে অমল বলিল—দিস্ ইজ ব্যাড—অহীন!

অহীন্দ্র কোন উত্তর দিল না।

অমল তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—এই চিন্তাকুল মনুষ্য!

—হ্যাঁ।

—আরে রাম রাম, তুমি দেখছি শেষ পর্য্যন্ত পাগল হয়ে যাবে।

অহীন্দ্র আবার কথার কোন জবাব দিল না। তাহার কানে কোন কথা যেন প্রবেশই করিতেছে না, শব্দ কর্ণপটহে আঘাত করিলেও অর্থ মন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেছে না। তাহার মনের অবস্থা ঠিক যেন ভাটার সমুদ্রের মত। তাহার পরিচিত পৃথিবীর সুন্দর শ্যামল তটভূমি ক্রমশঃ যেন মিলাইয়া একাকার হইয়া যাইতেছে—দূর হইতে দূরান্তরে অস্পষ্টতার অপরিচয়ের মধ্যে। অথচ কোন্ অতল গোপন পথে কেমন করিয়া যে জীবনের সকল ঊর্দ্ধমুখী জলোচ্ছ্বাস নিম্নমুখে নিঃশেষিত হইয়া চলিয়াছে সে রহস্য তাহার অজ্ঞাত।

উমা উত্তেজিত হইয়া ড্রেসিং টেবিলের কোণটা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেশভূষা-প্রসাধন লইয়া প্রচণ্ড একটা ঝড় বহিয়া গেছে ইহারই মধ্যে। সে কোনমতেই বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন করিবে না, যেমন আছে তেমনি থাকিবে। হেমাঙ্গিনী মেয়ের উপর ভীষণ চটিয়া গিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন—বলিয়াছেন—ঘি দিয়ে ভাজো নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত,—তোর দোষ কি বল!

উমা কোন উত্তর করে নাই, কিন্তু তাহার কালো বড় চোখ দুইটি হইয়া উঠিয়াছিল বিদ্যুতালোকিত মেঘের মত। হেমাঙ্গিনী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভাজ—উমার মামীমা—তাঁহাকে শান্ত করিয়া মৃদু স্বরে বলিয়াছেন—ঠাকুরঝি, ও-সব হচ্ছে আজকালকার ফ্যাশান। তুমি রাগ করছ কেন?

উমা সেই হইতে ড্রেসিং টেবিলটির কোণ ধরিয়া তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। সেই সাঁওতালদের মত সিঁথি বিলুপ্ত করিয়া দিয়া চুল বাঁধা, পরণে মোটা সুতার সাঁওতালী শাড়ী; এক নজরে উমাকে চিনিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। অকস্মাৎ উমা চকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আয়নার মধ্যে ছায়া পড়িল অহীন ও অমলের। অহীন ও অমল ঘরে প্রবেশ করিতেই উমা বিব্রত হইয়া উঠিল—সাঁওতালী শাড়ীটা অবগুণ্ঠন দিবার মত পর্য্যাপ্ত দীর্ঘ নয়। অমল হাসিয়া বলিল—লেট মি ইনট্রডিউস, উমণী ঠেকরুণ অ্যাণ্ড রাঙাবাবু!

উমা দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু অমল বলিল—ব'স পোড়ারমুখী ব'স! একবারে যেন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির কলাবউ।

অন্যমনস্ক অহীন্দ্র পর্য্যন্ত এই অভিনব সজ্জায় সজ্জিতা উমার দিকে চাহিয়া সমস্ত ভুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া-রহিল, তাহার চোখে প্রদীপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টি। উজ্জ্বল মুগ্ধ হাসি হাসিয়া সে এবার বলিল—বস না উমা! ও তুমি বুঝি ঘোমটা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? সাঁওতালেরা কাপড়ের আঁচলে ঘোমটা দেয় না।

আলনা হইতে উমার লাল ডুরে গামছাখানা টানিয়া লইয়া অহীন বলিল—ওরা গামছায় ঘোমটা দেয়, এমনি ক'রে। সে অগ্রসর হইয়া গামছা দিয়া উমার মাথায় ঘোমটা দিয়া দিল।

অমল হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, চায়ের ব্যবস্থা করি। তার পর ওকে আজ সাঁওতালদের মেয়েদের মত নাচতে হবে। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

উমা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অহীন অকস্মাৎ অনুভব করিল উমা কাঁদিতেছে। সে সবিস্ময়ে চিবুকে ধরিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিল অনর্গল ধারায় উমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। অহীন্দ্র তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে উমা?

উমা জোর করিয়া চিবুক হইতে অহীনের হাত সরাইয়া দিয়া তাহারই বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অহীন সস্নেহে তাহার মাথায়

হাত বুলাইয়া বলিল—কি হয়েছে বলবে না আমাকে ?

উমা তাহার বুকের মধ্যেই সবেগে মাথা নাড়িল—না। অহীন দুই হাতে তাহার মুখখানি আবার তুলিয়া ধরিল। উমা চোখ বন্ধ করিল। অকস্মাৎ অহীন চুমায় চুমায় তাহার মুখখানি ভরিয়া দিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

আকাশে যেন পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, জীবনের রিক্ত বালুময় বেলাভূমি জলোচ্ছ্বাসের আবরণে আবৃত হইয়া গিয়া—চিরপরিচিত তটভূমি অসীম আগ্রহে বুকের কাছে আগাইয়া আসিতেছে !

* * *

পরদিন তখনও অন্ধকারের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই। উমা এবং অহীন্দ্র উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল—কালো ছায়ার মত সারিবদ্ধ হইয়া কাহারা সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সমস্ত রাত্রির মধ্যে উমা ও অহীন্দ্র ঘুমায় নাই। অহীন্দ্র উমাকে বলিয়াছে অন্তরের সকল চিন্তা সকল বেদনার কথা। উমা নিতান্ত অজ্ঞ পল্লীকন্যা নয়, সে শহরে বড় হইয়াছে, স্কুলে পড়িয়াছে। সে অহীন্দ্রের কথার প্রতি শব্দটি না বুঝিলেও আভাসে বুঝিয়াছে অনেক। তাহার তরুণ চিত্ত অহীন্দ্রের গৌরবে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

অহীন্দ্র ওই কালো ছায়ার সারি দেখিয়া সবিস্ময়ে উমাকে প্রশ্ন করিল—কারা বল দেখি ?

উমা শঙ্কিত হইয়া বলিল—ডাকাত নয় তো ?

অহীন্দ্র উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় দরজাটা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। পুরুষ-নারী-শিশু, গরু-মহিষ-ছাগল সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। পুরুষদের কাঁধে ভার, মেয়েদের মাথায় বোঝা, গরু-মহিষের পিঠে ছালায় বোঝাই জিনিসপত্র; নীরবে তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কয়খানা গরুর গাড়ীও চলিয়াছে ধীরমন্থর গতিতে সকলের পিছনে। বোঝাগুলার মধ্যে কোথাও আছে মুরগীর পাল—আসন্ন নিশাবসানের আভাসের তাহাদেরই একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা।

উমাও অহীন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে অহীন্দ্রকেই বলিল—সাঁওতাল ?

—তাই মনে হচ্ছে। পরক্ষণেই সে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল—কে ? কারা যাচ্ছ তোমরা ?

মেয়েদের মৃদুগুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল—তাহার মধ্যে অহীন্দ্র ও উমা বুঝিল একটা শব্দ—রাঙাবাবু।

কে এক জন পুরুষ উত্তর দিল—আমরা গো, মাঝিরা !

—মাঝিরা ? কোথায় যাচ্ছিস সব ?

—ইখান থেকে আমরা উঠে যাছি গো! হুই—মৌরক্ষীর ধারে নতুন চরাতে।

—উঠে যাচ্ছিস তোরা ? চলে যাচ্ছিস এখান থেকে ? একেবারে ? ব্যথিত আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে উমা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল।

—হঁ গো! অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথার উত্তর দিল, কথা শুনিবার বা উত্তর দিবার জন্য মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষাও করিল না।

—সবাই চলে যাচ্ছিস তোরা ? সকরুণ মমতায় উমা নিতান্ত শিশুর মতই অর্থহীন প্রশ্ন করিতেছিল। অহীন্দ্র নীরব—তাহার চোখে গভীর একাগ্র নিষ্পলক দৃষ্টি, মুখে ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ স্বল্পপরিসর হাসি ! জীবনের সকল উচ্ছ্বাস স্তিমিত হইয়া ভাটায় নামিয়া চলিয়াছে !

উমার প্রশ্নের উত্তরে কে জবাব দিল—উই বজ্জাত চূড়া মাঝিটো আর ক-ঘর থাকল গো! উয়ারা সাহেবের সঙ্গে সাঁট করলে, উয়ার কলে খাটবে। বলিতে বলিতে দলটি অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। মানুষের পশুর পায়ে গাড়ীর চাকায় পথের ধুলা উড়িতেছে। রহস্যময় প্রত্যুষালোকের মধ্যে ধূলার আবরণ যবনিকার মত কালো কালো মানুষগুলির পিছনে প্রসারিত হইয়া তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিল।

ধীরে ধীরে আঁধার কাটিয়া আসিতেছিল। চরের উপর বয়লারে সিটি বাজিয়া উঠিল। প্রভাতের আলোকে লাল সুরকীর পথ—সুদীর্ঘ চিমনী, নূতন মিল হাউস, কুলি ব্যারাকের বাড়ী-ঘর সমস্ত লইয়া একটি নগরের মত ঝলমল করিতেছে।

৩২

ইহার পর বিরাট্‌ একটি মামলা-পর্ব্ব।

সাঁওতালদের জমি এবং নদীর বাঁধ উপলক্ষ করিয়া কলওয়ালার সহিত ইন্দ্র রায় ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর ছোট বড় ফৌজদারী দেওয়ানী মামলা একটির পর একটি বাধিয়া উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

সদর হইতে এস-ডি-ও আসিয়া তদন্ত করিয়া গেলেন। অমলের আনীত অভিযোগ তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, সাঁওতালেরা ভূমিহীন হইয়া অধিকাংশই এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, যাহারা আছে তাহাদেরও জমি নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে বে-আইনী কিছু দেখিলেন না। বিমলবাবু ঋণের দায়ে জমিগুলি খরিদ করিয়াছেন, সাঁওতালেরাও স্বেচ্ছায় বিক্রী করিয়াছে, চূড়া মাঝি ও তাহার অনুগত মাঝি কয়জন—যাহারা এখানে থাকিয়া গিয়াছে, তাহারাই সে কথা স্বীকার করিল। সারী সম্পর্কিত অভিযোগের তদন্ত করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন—সে-কথা সত্যের খাতিরেও পুরাপুরি লেখা চলে না। বর্ব্বর জীবনের সঙ্গে লোভ এবং নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ--এক-একটা জীবনে অত্যুগ্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হইয়াছে। বর্ব্বর, লোভপরবশ, উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটির পরিণতি ভয়াবহ রূপে দুঃখজনক হইলেও ইহা স্বাভাবিক। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে তাহা প্রত্যক্ষ—কিন্তু সে-অবস্থার কথা লেখা চলে না।

মোটামুটি অভিযোগের বিষয়গুলি বাহ্যতঃ প্রত্যক্ষ হইলেও অন্তর্নিহিত সত্য ইহার মধ্যে কিছুই নাই; ইহার অন্তর্নিহিত সত্য—জমিদারের সহিত কলের মালিকের প্রতিপত্তি লইয়া বিরোধ। কলের মালিক এখানে কল স্থাপন করিয়া সমগ্র অঞ্চলের একটি বিশেষ উপকার করিয়াছেন। দীনদরিদ্রের মজুরির সুবিধা হইয়াছে, আখের চাষের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে; চারি দিকের পথঘাটের উন্নতি হইয়াছে। তবে এ-কথা সত্য যে, জমিদারের প্রাপ্য ন্যায্য খাজনা বন্ধ করিয়া কলের মালিক আইন বাঁচাইয়াও অন্যায় করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, কোন স্থানের প্রজারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট করিলে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিত এ-ক্ষেত্রে একক তিনি কৌশলে সেই বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছেন।

কিন্তু ইহাতেও কিছু ফল হইল না।

উভয় পক্ষই একটির পর নূতন একটি বিবাদ বাধাইয়া চলিলেন। ইন্দ্র রায়ের স্বাভাবিক জীবন আর একরকম হইয়া উঠিল; তাঁহার গোঁফজোড়াটা পাক খাইয়া খাইয়া ভোজালির মত বাঁকা এবং তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। জমিদারী কাগজপত্র ও ফৌজদারী দেওয়ানী আইনের বইয়ের মধ্যে তিনি ডুবিয়া আছেন। অন্দরমহল পর্য্যন্ত এ উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য প্রভাতে আজ আবার নূতন কি ঘটিবে তাহারই আশঙ্কায় আশায় সকলে কল্পনা-মুখর মস্তিষ্কে শয্যাত্যাগ করিয়া থাকেন।

অহীন্দ্র অমল কলিকাতায়। অমল ভালভাবেই আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে; অহীন্দ্র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সে নাকি খাড়া সোজা হইয়া বিদ্যা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়াছে। অমল ইহার মধ্যে বার-দুয়েক বাড়ী আসিয়াছিল—কিন্তু অহীন্দ্র আসে নাই।

হেমাঙ্গিনী অভিযোগ করিয়াছিলেন—তাকে ধ'রে নিয়ে এলি নে কেন তুই?

ভ্রূ কুঁচকাইয়া অমল বলিয়াছিল—সে হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, হীরের টুকরো—আমরা হ'লাম কয়লার টুকরো। সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হ'লেও তার স্থান হ'ল সোনার গয়নায় আর আমরা যাব চুলোয়। তার নাগাল আমি পাব কেমন ক'রে বল?

হেমাঙ্গিনী একটু আহত হইয়া চুপ করিয়াই ছিলেন; একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অমল আবার বলিয়াছিল—জান মা, অহীন আজকাল আমার সঙ্গে ভাল ক'রে মেশেই না। তার এখন সব নতুন সঙ্গী জুটেছে; অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে অহীনের।

হেমাঙ্গিনী দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন—অহীনের হয়তো দোষ আছে অমল, কিন্তু দোষ তোমাদেরও আছে। ভগ্নীপতির সঙ্গে তোমাদের গুষ্টীরই কোন কালে বনে না। ভগ্নীপতির কাছে মাথা নীচু করতে তোমাদের মাথা কাটা যায়।

ঠিক এই সময়েই হেমাঙ্গিনীর ডাক পড়িয়াছিল—রায় মহাশয় নিজে ডাকিতেছিলেন।—এক বার তোমার বেয়ানের কাছে যাও দেখি; ব'লে এস পুরনো দলিলগুলো এক বার দেখা দরকার। মানে আমাদের রায়-বাড়ির মূল বণ্টন-নামায় চক আফজলপুর মধ্যম তরফকে দেওয়া হয়েছিল—এখন চক আফজলপুরের কি চৌহদ্দী—

—এত সব কথা তোমার আমিও বুঝি নে, সুনীতিও বুঝবে না। কি বলছ তাই বল। তোমাদের মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামায় আমাদের সুদ্ধ আহারনিদ্রা ঘুচে গেল।

—দলিলের বাক্সগুলো এক বার দেখতে হবে। সে-গুলো পাঠিয়ে—না থাক্, ব'লে এস, আমিই যাব সন্ধ্যে-বেলায়, দলিলগুলো সব দেখব। রামেশ্বরের ঘরেই যেন বাক্সগুলো বের করিয়ে রাখেন। হ্যাঁ—আরও ব'লো—মঙ্গলবারে মা সর্ব্বরক্ষের পূজো হবে। কালিন্দীর বাঁধের মোকদ্দমায় আমাদের একরকম জিতই হয়েছে। বাঁধ দিতে হ'লে বছর বছর একটা ক'রে খাজনা দিতে হবে—কলওয়ালাকে; তার অর্দ্ধেক পাবে চক্রবর্ত্তীরা—ওপারের চরের মালিক হিসেবে; আর অর্দ্ধেক রায়হাটের মালিকেরা পাবে। বর্ষা পড়লেই বাঁধ কেটে দিতে হবে!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—যাব; এখন অমল এল, তাকে জল খাইয়ে সঙ্গে নিয়েই যাব।

রায় বলিলেন—আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে অমলের। তিনি হাসিলেন—সে হাসিটুকু একান্তভাবে দোষক্ষালনের জন্য অপ্রতিভের হাসি। তার পর তিনি বলিলেন—কই অমল কই? একখানা আইনের বইয়ের জন্যে লিখেছিলাম; অমল—অমল! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতেই তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন, তাঁহার আজিকার পদক্ষেপে সিঁড়িটা যেন কাঁপিতেছিল।

* * *

হেমাঙ্গিনী অমলকে তিরস্কার করিয়াছিলেন—কিন্তু পূজার ছুটিতে অহীন্দ্র বাড়ী আসিলে তাহাকে দেখিয়া তিনি নিজেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অহীন্দ্রের দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, শরীরের প্রতি অমনোযোগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট; অমনোযোগ না বলিয়া অত্যাচার বলিলেও অন্যায় হয় না। তাহার শীর্ণ দেহের মধ্যে চোখ দুইটি শুধু জল জল করিতেছে নিশান্তের পাণ্ডুর আকাশে শুকতারার মত।

তিনি সস্নেহে অহীনের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—শরীর তোমার এত খারাপ কেন বাবা?

অল্প একটু হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল—শরীর? তারপর আবার একটু হাসিল—আর কোন উত্তর দিল না, যেন হাসির মধ্যেই উত্তর দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—হাসির কথা নয় বাবা, শরীর বাঁচিয়েই সকল কাজ করতে হয়। এই গোটা সংসারটি তোমার মুখপানে তাকিয়ে আছে।

অহীন আবার একটু হাসিল।

হেমাঙ্গিনী যাইবার সময় কন্যাকে সতর্ক করিয়া দিলেন—উমা, তুই একটু যত্নটত্ন কর্ ভাল ক'রে।

উমা মাথা হেঁট করিয়া নীরব হইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—আমাদের কালের ঘোমটা দেওয়া কলাবউ তো নন্! বেশ ক'রে রাশ একটু বাগিয়ে ধরবি, তবে তো!

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলে, উমা মৃদু হাসি মুখে মাখিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, অহীন বলিল—সুস্বাগত বাঙালিনী।

—গুড আফ্‌টারনুন সায়েব। চমৎকার শরীরের অবস্থা কিন্তু সায়েবের।

—বাঙালিনীর অভাবে সায়েবের এই অবস্থা। এখন তো কাছে পেয়েছ, এইবার বেশ গ্রাস-ফেড মাটন ক'রে তোল।

উমা হাসিয়া বলিল—উঁ-হু মাটন না, ওয়েল-ফেড হর্স্। মা ব'লে গেলেন—রাশ টেনে ধরতে। হাড়পাঁজরা ঝুর-ঝুরে আকাশে-ওড়া পক্ষীরাজকে মাটিতে নামতে হবে।

—এবং নাদুসনুদুস হয়ে বাঙালিনীকে পিঠে ক'রে থুপ থুপ করে চলতে হবে।

ঘর পরিষ্কার করিয়া বিছানা করিবার জন্য দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল মানদা। উমা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মানদা অহীন্দ্রকে দেখিয়া গালে হাত দিয়া বলিল—কি চেহারা হয়েছে দাদাবাবু!

সুনীতি কেবল কিছু বলিলেন না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

কয়েক দিন পর, এক দিন রাত্রির অন্ধকারে মা আসিয়া ছেলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কোজাগরী পূর্ণিমা পার হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে অমাবস্যা আগাইয়া আসিয়াছে; অন্ধকারের মধ্যে অহীন্দ্র ছাদে একা বসিয়া ছিল। এমনই করিয়া সে এখন একা অন্ধকারে বসিয়া থাকে। কাছারি-প্রাঙ্গণের নারিকেল-বৃক্ষশীর্ষগুলি ছাদের আলিসার অল্প দূরে শূন্যলোকে জটাজুটময় অশরীরী দলের মত স্তব্ধ হইয়া সভা করিয়া বসিয়া আছে; ঝাউগাছ দুইটার শীর্ণ দীর্ঘ-তনুময় শীর্ষদেশ হইতে একটা ছেদহীন কাতর দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে; তাহারই মধ্যে সুনীতি নিঃশব্দে অহীন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অহীন্দ্র জানিতে পারিল না।

সুনীতি ডাকিলেন—অহীন!

চকিত হইয়া অহীন মুখ ফিরাইয়া বলিল—মা?

—হ্যাঁ, আমি।

—এস মা, বস। কিছু বলছ?

—বলব। অন্ধকারে অহীন্দ্র মায়ের মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরের সুরে সে বেশ অনুভব করিল যে তাঁহার মুখে সেই বিচিত্র করুণ মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে—যে-হাসি তাহার মা ছাড়া বোধ হয় এ পৃথিবীতে কেউ হাসিতে পারে না।

সুনীতি ছেলের পাশে বসিলেন—তাহার মাথাটি আপনার কোলের উপর টানিয়া লইয়া রুক্ষ চুলগুলি সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া দিয়া বলিলেন—তোর কি হয়েছে বাবা?

—কিছুই তো হয় নি! অহীনের কণ্ঠস্বরে কপটতার লেশ ছিল না।

—তবে?

—কি মা?

—তুই আমাদের কাছ থেকে এমন দূরে চলে যাচ্ছিস কেন বাবা?

—দূরে চলে যাচ্ছি? সবিস্ময়ে অহীন প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ। মা বলিলেন—হ্যাঁ—দূরে চলে যাচ্ছিস, আমরা যেন তোর নাগাল পাচ্ছি নে।

অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। মা আবার বলিলেন—প্রথমে ভেবেছিলাম, বুঝি তুই আমার কাছ থেকেই সরে গেছিস। বউমা—; কণ্ঠস্বরে তাঁহার লজ্জার রেশ ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—বিয়ের পর বউয়ের উপর ছেলের একটা টান হয়, তখন মায়ের কাছ থেকে ছেলে একটু সবে যায়। আমি ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু বউমার মুখ দেখে বুঝলাম তাও তো নয়। মাঝে মাঝে তার হাসিমুখ দেখি—কিন্তু আবার দেখি তার মুখ শুকনো। আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি অহীন, শুকনো মুখই তার বেশীর ভাগ সময় চোখে পড়ে।

অহীন্দ্র যেমন স্তব্ধ হইয়া ছিল, তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া মা বলিলেন—উমা তো অপছন্দের মেয়ে নয় অহীন!

—না মা না! উমাকে নিয়ে আমি অসুখী নই তো। অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বরে আন্তরিক শ্রদ্ধার আভাস ফুটিয়া উঠিল।

—তবে? মা প্রশ্ন করিলেন—তবে?

—তবে? কি উত্তর আমি দেব মা? কথা শেষ করিয়া মুহূর্ত্তপরেই সে সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—তুমি কাঁদছ মা? তাহার কপালের উপর উষ্ণ অশ্রুবিন্দুর স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল।

মা বলিলেন—নিরুচ্ছ্বসিত অথচ উদাস কণ্ঠস্বরে—জানি নে তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস কিনা! কিন্তু তোর সমস্ত চেহারার মধ্যে এক নূতন মানুষ ফুটে উঠেছে অহীন। তুই কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভাল ক'রে দেখিস নি? আমার সর্ব্বশরীর শিউরে ওঠে মধ্যে মধ্যে তোর চোখের দৃষ্টি দেখে।

অহীন্দ্র বলিল—আমি আজকাল একটু বেশী চিন্তা করি, সে-কথা সত্যি। কিন্তু আমার দৃষ্টি কিংবা আমি নাগালের বাইরে—এ-সব তোমার কল্পনা মা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন—জানি নে। কিন্তু আমার মন কেন এমন হয়ে উঠছে অহীন? যেন আমার কত দুঃখ কত শোক! দুঃখ আমার অনেক,

যাদের জন্যে দুঃখ তাদের মুখ তো মনে পড়ে না আমার; তোর মুখই কেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে?

—জীবনে তুমি কঠিন আঘাত পেয়েছ মা, সে আঘাতের বেদনা এখনও তুমি সহ্য করে উঠতে পার নি —ও সব চিন্তা তারই ফল। তুমি কেঁদ না, তোমার কান্না আমি সইতে পারি নে।

—কিন্তু তুই এত কি ভাবিস আমায় বল দেখি?

—ভাবি? অহীন্দ্র হাসিল, বলিল—তুমি যা ভাবতে শিখিয়েছ—তাই ভাবি, আর কি ভাবব! ভাবি মানুষের দুঃখকষ্টের কথা। মানুষ মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করে সেই কথা ভাবি।

সুনীতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, দুঃখ তাঁহার গেল না, কিন্তু শোকের মধ্যে সান্ত্বনার স্নেহস্পর্শের মত একটি আনন্দের আভাস তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করি তুই মানুষের দুঃখ দূর কর।

আবার তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল; কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন—কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিস বাবা—আমরা—আমি উমা;—

—মা! মা রয়েছেন নাকি? আচ্ছা মানুষ বাপু আপনি। সুনীতির কথায় বাধা দিয়া মানদা ঝি ঝঙ্কার দিতে দিতে ছাদের দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কথার সুর ও ভঙ্গির মধ্যে বক্তব্যের স্বরূপের একটা প্রচ্ছন্ন আভাস থাকে—মানদার কথায় সুনীতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—কি রে মানদা?

—বাবা! এই অন্ধকারে মায়ে পোয়ে ছাদে বসে রয়েছেন তা কি ক'রে জানব বলুন! সারা বাড়ী খুঁজে হয়রাণ। দাদাবাবুর শ্বশুর এসেছেন, শাশুড়ী এসেছেন, খুঁজছেন আপনাকে। দাদাবাবুর সম্বন্ধী এসেছেন।

ব্যস্ত হইয়া সুনীতি বলিলেন—নীচে আয় অহীন। বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, অহীনও তাঁহার অনুসরণ করিল। কোথাও কিছু পড়িয়া আছে কিনা দেখিতে দেখিতে মানদা আপন মনেই বলিল—কথায় বলে কাতির শিশিরে হাতী পড়ে। কার্ত্তিক মাসের শিশির মাথায় ক'রে এই অন্ধকারে—আচ্ছা মানুষ বাবা!

* * *

রায় আসিয়াছিলেন বৈষয়িক প্রয়োজনে; মামলা পরিচালনা সম্পর্কে একটি—একটি বিশেষ পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। রামেশ্বরের ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন। ঘরের মধ্যে মৃদু প্রদীপের আলো তেমনি জ্বলিতেছে, রামেশ্বর খাটের উপর বসিয়া আছেন। রায়ের অদূরে রামেশ্বরের খাটের সম্মুখে এবং নিকটে বসিয়া আছেন হেমাঙ্গিনী, উমা ঘরের কোণে টেবিলের উপর বই গুছাইয়া রাখিতেছে। শ্বশুর ও পুত্রবধূতে মিলিয়া কাব্যালোচনা হইতেছিল। উমার কল্যাণে রামেশ্বর অল্প একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

সুনীতি যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন সদ্য কোন হাস্যপরিহাস শেষ হইয়াছে, সকলের মুখেই হাসির রেখা ফুটিয়া রহিয়াছে। কেবল হেমাঙ্গিনী অপ্রতিভ মুখে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—কথায় আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না। আমি হার মানছি।

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—তাহ'লে আপনার কাছে আমার মিষ্টান্ন প্রাপ্য হ'ল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—মিষ্টান্ন আমাকেই আপনার খাওয়ান উচিত কারণ আপনি জিতেছেন।

রামেশ্বর হাসিতে হাসিতেও দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আপনার কথায় বড়ই দুঃখ পেলাম দেবী। রায় হ'ল রাজশব্দের অপভ্রংশ; রায়-গিন্নী আপনি—আপনি হলেন রাণী। মিষ্টান্ন বস্তুটা চিরদিন রাণী এবং রাজকুল কথায় পরাজিত হয়ে বয়স্যগণকে কর-স্বরূপ প্রদান ক'রে এসেছেন। আজ সেই বস্তুতে যদি আপনার হস্ত প্রসারিত হয় তবে সে হস্তকে রাজহস্তে সমর্পণ করা ছাড়া তো গত্যন্তর দেখি না।

হেমাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে উমার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন—উমা, অমল বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখ তো মা।

উমা চলিয়া গেল, উমার নামোচ্চারণে রামেশ্বর সংযত হইয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

রায়ও হাসিতেছিলেন, তিনিও অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কাজের কথা পাড়িয়া বসিলেন—এমনি একটি সুযোগের প্রতীক্ষাই তিনি যেন করিতেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ

থাকিয়া—গলা ঝাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন—রামেশ্বর, তোমার সঙ্গে কয়েকটি জরুরী বিষয় আলোচনার জন্যে এসেছি।

গম্ভীর ভাবেই রামেশ্বর হাসিলেন—বলিলেন, চক্ষুষ্মান পথভ্রান্ত হ'লে নিরুপায়ে অন্ধের কাছেও পথ জিজ্ঞাসা করে। কি বলছ, বল! দিক বলতে না পারি সম্মুখ পশ্চাৎ দক্ষিণ বাম এগুলো বলতে পারব। পথের পারি-পার্শ্বিক চিহ্নের কথা বলতে পারব না তবে বন্ধুরতার বিষয় বলতে পারব।

রায় বলিলেন—মানমর্য্যাদা নিয়ে মোকদ্দমা, অথচ টাকার অভাব হয়ে পড়ল রামেশ্বর। আমার হাত পর্য্যন্ত শুকনো হয়ে এল। এ ক্ষেত্রে—

রামেশ্বর বলিলেন—অধর্ম্মকে বর্জ্জন ক'রে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী রামের শরণাপন্ন হয়ে বিভীষণ অমর হয়ে কলঙ্ক বহন করছেন। মামলা শেষ পর্য্যন্ত লড়তেই হবে ইন্দ্র। টাকা না থাকে ঋণের ব্যবস্থা কর।

—না। রায় গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না। ঋণ করতে গেলেই শেষ পর্য্যন্ত ওই কলওয়ালার কবলস্থ হ'তে হবে। লোকটা ধরাট দিয়েও সে খত কিনবে। আর সুদখোরদের মত ধূর্ত্ত এবং লোভী এ সংসারে আমি তো কাউকে দেখি না, তারা অর্থের লোভে বিক্রী করবেই।

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, রায় বলিলেন—মহলে যে-সব খাস-জোত আছে তারই কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়াই ভাল।

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন, তিনি চিন্তা করিতে-ছিলেন—কিছুক্ষণ পর তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। শূন্য অর্থহীন স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

রায় তাঁহাকে ডাকিলেন—রামেশ্বর।

রামেশ্বর নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ইন্দ্র!

—তা হ'লে তাই করি, কি বল?

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা স্মরণ করিয়া সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—হ্যাঁ সেই ভাল। ঋণ—না ভাল নয়। শেষ পর্য্যন্ত বডি-ওয়ারেণ্ট করে!

বাতাসেরও কান আছে।

দুই-তিন দিন মধ্যেই গ্রামের চাষীরা ছুটিয়া আসিয়া পড়িল—জমি যখন বন্দোবস্তই করিবেন তখন চরের ওই ভাগের জমিটা আমাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিন। এক-শ বিঘা জমির বিঘাপিছু ত্রিশ টাকা হিসাবে সেলামী এবং দুই টাকা হারে খাজনা দিতে আমরা প্রস্তুত। দলটির সর্ব্বাগ্রে ছিল রংলাল।

রায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—এত টাকা তোরা পাবি কোথায়?

রংলাল বলিল—আজ্ঞে আমরা তিরিশ জনায় লোব। জনাহি এক-শ টাকা আমরা জোগাড় করব কোন রকমে।

অকস্মাৎ সে রায়ের পা-দুটি জড়াইয়া ধরিল—হেই হুজুর! নইলে এ চরণ আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

রায় অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন—এত বেশী টাকা অন্য মহলে জমি বন্দোবস্ত করিয়া পাওয়া যাইবে না।

যোগেশ মজুমদার আসিয়া পাঁচ হাজার টাকা সেলামী দিতে চাহিল, কিন্তু রায় হাসিয়া বলিলেন—না।

দিল্লী এক্সপ্রেস

হাওড়া—মধুপুর—মোগলসরাই

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কল্পনা করি নাই ট্রেনে এমন ভিড় হইবে।

লম্বা ছুটির মুখে রেল কোম্পানীর সস্তা টিকেট ও অনেক সুবিধাজনক সর্ত্তের আশ্রয় লইয়া ভ্রমণ-পিপাসুর দল যেমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়া থাকেন—এ সময়ে তেমনটি অবশ্য আশা করি নাই এবং যাঁহারা কিঞ্চিৎ আগে আসিয়া শয্যা বিছাইয়া পুরা এক-একখানি বেঞ্চ দখল করিয়া রাত্রির ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন—তাঁহারাও সে কামনা করেন নাই। কাজেই কোনক্রমে কাহারও প্রসারিত শয্যার প্রান্তদেশে অর্থাৎ পদপ্রান্তে একটু বসিবার স্থান পাইলাম। স্থান পাইয়া আমিও যেমন ধন্য হইলাম, তাঁহারাও তেমনি নিশ্চিন্ত মনে গভীরভাবে নিদ্রিত (?) হইয়া রহিলেন। তাঁহারা মানে—সকলেই নহে। দুই-এক জন ছাড়া আর সকলেই দেহ প্রসারিত করতঃ চক্ষুর দৃষ্টিকে কোন একটি স্থানে নিবদ্ধ করিয়া আগ্রহ ও বিস্ময়ে পলকহীন করিয়া রাখিয়াছেন। আমিও তাঁহাদের দৃষ্টির অনুসরণ করিলাম।

কোণের দিকে একখানি পুরা বেঞ্চ দখল করিয়া দুইটি তরুণীসমভিব্যাহারে এক তরুণ মৃদুস্বরে কি কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। তরুণের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়; এবং পুরা সুটে তাহাকে য়ুরোপযাত্রী বলিয়াই ভুল হয়। পাশের তরুণী দুইটির মাথার বেণী হইতে হাই-হীল জুতা পর্য্যন্ত চৌরঙ্গী-ফ্যাশান দুরস্ত। কিন্তু তরুণ যে য়ুরোপ-প্রবাসী হইবেন না তাহা ট্রেনের জাতি নির্ণয় করিলে অনায়াসেই বোঝা যায়। এটি নামে দিল্লী এক্সপ্রেস, কাজে প্যাসেঞ্জার শ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নততর। দয়া করিয়া নিতান্ত নগণ্য কয়েকটি স্টেশনে বিশ্রাম না করিয়া অভিজাত-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে! এমন আভিজাত্যের নমুনা এই ভারতবর্ষের বহু স্থলেই ত পাওয়া যায়!

তরুণ চুরুট টানিতেছিলেন অত্যন্ত ধীরে, ধোঁয়া ছাড়িতেছিলেন ততোধিক মন্থর আলস্যে এবং কথা কহিতেছিলেন নিতান্ত না বলিলে নয় বলিয়া। তরুণী দুটির দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা ও কথাবার্ত্তার সঙ্গে খানিকটা ম্লান হাসির আভাস—ট্রেনের ওই কোণের দিকে একখানি আসন্ন বিয়োগবেদনাভরা নাটিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিতে-ছিল। দর্শকবৃন্দ কিন্তু পরম কৌতূহলভরে ও পরিতৃপ্তি-সহকারে সে নাটিকার অভিনয় দেখিতেছিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ীর ঘণ্টা পড়িতেই ওই তিনটি প্রাণী সচকিত হইয়া উঠিল। তরুণ দাঁড়াইল দুয়ারের কাছে—তরুণী দুটি নীচে নামিয়া ছল ছল নেত্রে তরুণের পানে চাহিল ও একে একে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চোখের ধারাকে মুক্ত করিয়া দিল।

ট্রেনের সকলের বিস্ময় বাড়িল বইকি।

বিস্ময় এবং কৌতুক। উহাদের চোখের জলে বিদায়-দৃশ্যের যে করুণ যবনিকাখানি রেল কোম্পানীর নিপুণতায় (নিপুণতা এই জন্য যে, কোম্পানীর দায়িত্বজ্ঞান এক্ষেত্রে যথেষ্টই দেখা গেল; কোনরূপ শৈথিল্যের দরুন ট্রেন ছাড়িতে এক সেকেণ্ডও বিলম্ব ঘটিল না।) অকস্মাৎ পড়িয়া গেল, এদিকের দর্শকবৃন্দের চোখে মুখে সেই করুণ দৃশ্য রূপান্তরিত হইয়া মৃদু হাসির আভাস ফুটাইয়া তুলিল। চোখের জলে যে-যবনিকা পড়িতেছিল, ট্রেন গতিলাভ করিতেই হাতনাড়ানাড়ির চাঞ্চল্যে তাহা কিছুক্ষণ আধ-হাতটাক শূন্যে পড়ি-পড়ি করিয়া দুলিতে লাগিল—সখের থিয়েটারের বাঁশে-আটকানো যবনিকাখানির মত।

তরুণ চোখে রুমাল চাপিয়া বিষণ্ণবদনে কোণের বেঞ্চে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং চোখে হাত ঢাকা দিয়া নিস্পন্দ হইয়া গেল। এদিকে দর্শকদের চোখে চোখে ইসারায়

কৌতুকবার্ত্তা চয়ন চলিতে লাগিল। মনের ভাবটা, দেখলে এক বার ঢং!

শ্রেণীটা মধ্যম, কাজেই সকলেই শয়নের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন এবং চীনাবাদাম ও পাপর চিবাইবার শব্দ, ময়লা কাপড়চোপড়ের ও বায়ুনিঃসরণজনিত দুর্গন্ধ এবং ঠাসাঠাসি বসিয়া অপরিমিত কোলাহলের সৃষ্টি—কোনটাই সুনিদ্রার প্রতিকূলে যায় নাই।

* * *

অথচ ভোরবেলাতেই ঘুম ভাঙিয়া গেল। তা ঘুমাইবার একটু জায়গা অবশেষে মিলিয়াছিল বইকি। যাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়াছিলাম, তিনি, অবশ্য করুণা করিয়া নহে, নিজের পদপ্রসারণের অসুবিধা বিধায়, ব্যঙ্কের উপর হইতে তাঁহার জিনিসগুলি নামাইয়া লইয়া বিনীত হাস্যে আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন,—বাবুজী, তক্‌লিফ করবেন কেনো, শুয়ে পড়ুন।

সুতরাং গাড়ীর ঝাঁকানিতে যতটুকু সুনিদ্রা হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছিল।

রাত্রি চারিটার সময়, গাড়ী তখন মধুপুরে, সমবেত যাত্রীর কোলাহলে ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, কুলি ডাকিয়া ঘটা করিয়া সেই ম্রিয়মান স্যুট-পরিহিত ছোকরা নামিয়া গেল। অমনই গাড়ীসুদ্ধ লোক সজাগ হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে একচোট প্রাণখোলা হাসি, অতঃপর মন্তব্য। সেই কর্ণরোচক মন্তব্যে সকলেই সাতিশয় প্রীত হইয়া বিবিধ টীকাটিপ্পনী সহযোগে সেটিকে বিস্তৃততর করিতে লাগিলেন। ভোরবেলা। নূতন করিয়া ঘুমের আয়োজন করার চেয়ে নূতনতর বিষয়ের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলে আত্মিক শক্তির বিকাশলাভ ঘটে! সে শক্তি-চর্চ্চায় কাহাকেও বিশেষ অমনোযোগী দেখা গেল না। প্রথম বক্তা (আমাকে যিনি দয়া করিয়া ব্যঙ্কে স্থাপন করিয়াছিলেন) এক জন মাড়োয়ারী। কিন্তু বহু কাল বাংলার জলহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় বাংলা ভাষার উপর কিছু দখল লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই নমুনা-স্বরূপ অনর্গল বাংলাতেই মন্তব্য চালাইতে লাগিলেন:

—ও মোশায়, আমি বলি বুঝি বাবুজী বিলেত-টিলেত কোথাও যাবেন! যে রকম ঘটা ক'রে বিদায় নিলেন; আঁখের জলে—

এবার বক্তা বাঙালী। দেওঘরে বাড়ী করিয়া দেওঘরবাসী হইয়াছেন। কিছু জমিজমা আছে, কোন একটা ব্যবসাও হয়ত করেন; তাহারই কল্যাণে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে খানিকটা নির্ব্বিঘ্ন।

—দেখেছিলেন—মেয়ে দুটোর কান্না! যেন কত দূর দেশে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছে! মধুপুর! আমি বলি বুঝি 'ওয়ারে' যাচ্ছে?

আর এক জন বাঙালীর গলা শোনা গেল। ইনি পাটনায় থাকেন। এখনও বাড়ী করিয়া বাংলা দেশ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কথা কহিতে গেলেই কাসির বেগটা তাঁহার বৃদ্ধি পায় ও গলায় একটা 'সাঁই সাঁই' শব্দ উঠে। অথচ সেই কাসি থামাইয়া মন্তব্যও কিছু করিতেছিলেন।

—বুঝলেন না, ওসব রিহার্সাল দিচ্ছিল! আজকালকার ফিল্ম দেখে দেখে ওদের মনেও সাধ হয়েছিল।

দেওঘরবাসী বলিলেন—তা ঢুকুকগে না ফিল্ম কোম্পানীতে, কদর হবে! অ্যায়সা জমিয়ে তুলেছিল—সত্যি আমার চোখেও এক ফোঁটা জল বেরুব বেরুব করছিল।

কথাশেষে তিনি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং সেই হাসির গমকে কয়েক ফোঁটা জলও তাঁহার চোখ হইতে বাহির হইল।

মাড়োয়ারী কহিলেন—তাহলে শুনেন বাবুসাব। আমি মোটরে ক'রে আসলাম, দেখি বাবুসাব টেক্‌সি ক'রে আসলেন আমার সামনে। চলতে চলতে বাবুসাবের গায়ে—এই গেটের কাছে—একটু ধাক্কা লাগছিল। বাবুসাব চটে বললে, আপ অন্ধা হ্যায়, দেখতা নেই? আরে বাবা, সে কি গোসা! ভাবলুম বাবুসাব বিলেত যাবে—তাই এত গোসা!

দেওঘরবাসী বলিলেন—ওই যা বলেছেন; নতুন পাস-টাস ক'রে বেরিয়েছে, নতুন সমাজে মিশছে তাই ভাল ক'রে রিহার্সেল দেবার জন্যে মেয়ে দুটোকে সঙ্গে ক'রে এনেছিল। আরে মশাই, শিখিয়ে পড়িয়ে না আনলে কি অমন হু-হু ক'রে চোখের জল বেরয়?

অতঃপর গাড়ী জেসিডি জংসনে না-পৌছানো পর্য্যন্ত আজকালকার শিক্ষা, সমাজ, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তীব্র ও কটু মন্তব্যের ঝড় বহিয়া গেল। এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন, প্রৌঢ় অথবা তরুণ জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের কণ্ঠই প্রাচীন কালের ঋষিপ্রদর্শিত পন্থার প্রশংসায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চড়িতে লাগিল।

চোখের জল ফেলিয়া তরুণী বন্ধুর কাছে বিদায় লওয়াটা কি সত্যই অভিনয়ের বিষয়বস্তু, না বেশী দূর না-যাওয়ার অপরাধটাই গুরুতর বুঝিতে পারিলাম না। পায়ে হাঁটার দিনে দশ-বিশ ক্রোশ ব্যবধানকে লোকে কত গুরুতরই না মনে করিত, আর আজ যন্ত্রযুগের মানুষ দু-চার হাজার ক্রোশকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না! আমাদের যুগের এ একটা অভিশাপ বইকি!

* * *

পাটনা স্টেশনে গাড়ী যেমন খালি হইল, তেমনি ভর্ত্তিও হইল। আমি ততক্ষণে ব্যাঙ্ক হইতে নামিয়া একখানি বেঞ্চ দখল করিয়া বসিয়াছি। পাটনায় ভাল চা পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টায় যেমন সামান্য ক্ষণের জন্য জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়াছি, অমনই চোখের পলক পাল্টাইয়া দেখিলাম, আমার বেঞ্চের অর্দ্ধেকখানি দখল হইয়া গিয়াছে। ঝগড়া করিব কি না চিন্তা করিতেছি (হাসিবেন না; কিছুক্ষণ পুরা একখানি বেঞ্চ দখল করিয়া বসিলে তাহার উপর যে স্বত্ব জন্মায় তাহা ত্যাগ করিবার মত ঔদার্য্য খুব কম যাত্রীরই আছে। তখন তাহার প্রথম প্রবেশক্ষণটির কথা ও স্থানপ্রাপ্তির পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ থাকে না। উট ও দরজীর গল্পটা তো নিছকই গল্প নহে!) ইত্যবসরে আগন্তুক ভদ্রলোক আমার প্রসারিত শতরঞ্চিখানি গুটাইয়া দিয়া নিজের বিছানাটি পাতিয়া লইলেন। শুধু ভদ্রলোক নহেন, সঙ্গে তাঁহার স্থূলাঙ্গী অর্দ্ধাঙ্গিনী ছিলেন। ঐ স্থূলাঙ্গী মহিলাটি আমারই দিক্ ঘেঁষিয়া বসিয়া কিঞ্চিৎ জোরে শ্বাস টানিতে লাগিলেন। কাজেই আমি স্থানসমেত সঙ্কীর্ণতর হইলাম। সামনের বেঞ্চের এক ভদ্রলোক আমার বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সাদরসম্ভাষণ জানাইলেন—বাবুজী, ইধার বৈঠিয়ে।

স্থানত্যাগ করিয়া আমি যত না সুস্থ হইলাম, ভদ্রমহিলাটি ততোধিক কৃতজ্ঞ হইয়া কটমট দৃষ্টিতে আর একবার আমার পানে চাহিয়া মাথার ঘোমটাটা অল্প একটু টানিয়া দিলেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-মাখান দৃষ্টির মধ্যে অমন প্রখরতা কেন ফুটিল?

ভদ্রমহিলার রূপ বর্ণনা রীতিবিরুদ্ধ, নতুবা সাগ্রহে সে কার্য্য করিতাম। তিনি স্থূলাঙ্গী ও গহনার প্রাচুর্য্যে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পটভূমিকাখানি অনায়াসেই যে-কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

চা সংগ্রহ করিয়া পান করিলাম। কিন্তু স্থানচ্যুত হওয়ায় চা-পানে তৃপ্তি লাভ করিলাম না। কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, কৃতজ্ঞতা-মাখান দৃষ্টি কি করিয়া অমন তীব্র হয়?

মহিলাটি ততক্ষণে পানের কৌটা খুলিয়া গুটি দুই পান মুখে দিলেন ও অঞ্চলগ্রন্থি হইতে একটি ক্ষুদ্রকায় রৌপ্য-নির্ম্মিত কৌটা বাহির করতঃ বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী সহযোগে কিঞ্চিৎ সুগন্ধি জরদা উঠাইয়া মুখবিবরে নিক্ষেপ করিলেন। জরদা খাওয়ার অভ্যাসটি তাঁহার বহু দিনের—তাহা মিশকালো দাঁতগুলি দেখিলেই বোঝা যায়।

ভদ্রলোক ততক্ষণে বাক্স বিছানা গুছাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া মৃদুমন্দ টান দিতেছেন।

ভদ্রমহিলা জানালার বাহিরে প্যাচ করিয়া পানের 'পিক' ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় নামবে?

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—বেনারস।

ভদ্রমহিলার চোখে সেই তীব্র দৃষ্টির বিদ্যুৎকণা খেলিয়া গেল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর মুহূর্ত্তে যেমন দেখিয়াছিলাম।

—বেনারস? কাশী?

—হাঁ।

ভদ্রলোক নির্ব্বিকারচিত্তে সিগারেট টানিতে লাগিলেন।

ভদ্রমহিলার চোখের দৃষ্টি তীব্রতর হইল।

—লজ্জা করল না তোমার ও কথা বলতে! কাশী! নামাব-অখন তোমায় কাশী!

ভদ্রলোক অপাঙ্গে স্ত্রীর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—একটা লেমনেড খাবে?

উগ্রভাবে ঘাড় নাড়িয়া স্ত্রী জবাব দিলেন—না। নামবে ত কাশী ?

ভদ্রলোক আপন মনেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—তবে সোডা একটা বরফ দিয়ে ?

—না, না। বলি কাশী নামবে কি না ?

—তবে দু-খানা টোস্ট আর দু-খানা কেক—আর চা।

ততক্ষণে দানাপুর স্টেশনে ট্রেনের গতি মন্থর হইয়া আসিতেছে। স্ত্রীর সম্মতি পাইয়া ভদ্রলোক কেলনারের বয়কে ডাকিলেন।

চা কেক খাইয়াও কিন্তু বিবাদ কাটিল না। মহিলাটি আবার পান মুখে দিলেন, জরদার কৌটা খুলিলেন ও পানের 'পিক' ফেলিয়া বলিলেন—বলি কাশী নামবে তো ?

এবার ভদ্রলোক একটু উষ্ণ ভাবেই জবাব দিলেন—হাঁ গো হাঁ, নামব।

ভদ্রমহিলাও চড়া গলায় বলিলেন—তা নামবে না ? সেখানে যে ইয়ার-বন্ধুরা হাঁ ক'রে ব'সে আছে। সেখানে না নামলে আমোদ ফূর্ত্তি হবে কেন !

একটু থামিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া আরম্ভ করিলেন—চিরটা কাল আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করেছ, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—একটু রেহাই দাও, আমায় দু দণ্ড শান্তিতে থাকতে দাও।

শেষের দিকে মিনতির ভারে কণ্ঠস্বর তাঁহার করুণ হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক চারি দিকে চাহিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গাড়ীর সকলেই উৎসুক চোখ ও কান পাতিয়া ওদিক্‌কার রহস্যের সন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

ভদ্রলোকের কাকুতি-মিনতিতে মহিলাটি ফোঁস করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন। চারি দিকে এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

বোধ হয় বক্সারই হইবে, মহিলাটি পুনরায় উঠিয়া পান ও জরদা মুখে দিয়া যথারীতি পানের 'পিক' ফেলিলেন ও সংবাদপত্রে নিবিষ্টচিত্ত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—তাহ'লে কাশীতেই নামবে তো ?

ভদ্রলোক সংবাদপত্র হইতে মুখ না তুলিয়া বলিলেন—না হ'লে কোথায় নামব ?

কোথায় ? জ্যামুক্ত ধনুকের মত সোজা হইয়া বসিয়া তীব্রকণ্ঠে মহিলাটি আরম্ভ করিলেন—চুলোয়। নামব হিল্লী দিল্লী—লাহোর—যেখানে আমার খুশী। কাশীতে নেমে আমায় যে দগ্ধে মারবে সে হবে না। তোমার ইয়ার-বন্ধু, বাগান-বাড়ী, বাইজীর গ্যালা, মদের নদী এসব আমায় সইতে হবে ! দিনে দিনে পলে পলে আমায় দগ্ধে মারবার কত ছলাকলাই যে তোমরা জান তা ঈশ্বরই জানেন। তোমরা সবাই অত্যাচারী—তোমার মা, বাবা, তোমার ভাইয়েরা, তোমার নহলা-দহলা বোনেরা, কে নয় ? কে আমার উপর অত্যাচার না করেছে বল ? আমি মেয়েমানুষ, কত সইব—কত সইব আর। বক্ষে করাঘাত করিয়া মহিলাটি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কি করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য ! মহিলাটির অগ্নিময়ী ভাষার প্রবাহে চিরঅত্যাচারী শাসকবর্গের এক অনাবিষ্কৃত ইতিহাস ক্রমশঃ যেন চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। উহাদের চালচলন ও অলঙ্কার আসবাবে বোঝা যায়, ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু মনের শান্তি ? এক অবলার প্রতি অত্যাচার—

ততক্ষণে মহিলাটির বাক্যপ্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে।

—এরা সবাই অত্যাচারী—এই পুরুষজাতটাই। তোমার নহলা-দহলা বোনেরা—স্বর্ণলতা আর যমুনা কম জ্বালানটা জ্বালিয়েছে আমায় ! তোমার ভাইয়েরা সব বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার—নামজাদা ঘর পাটনায়। আইন তোমাদের হাতে, ক্ষমতা তোমাদের হাতে ; একটা মেয়েমানুষকে তোমরা যে পিষে মারবে তা আর আশ্চর্য্য কি ! উঃ, কত সহ্য হয়—কত সহ্য হয়। আবার বুক-চাপড়ানি ও রোদন।

পুরুষটি দুই-এক বার সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলেন। যে-ঝড়তুফান বহিতেছে তাহা যেন একান্তই বাহিরের, তাঁহার সংসার-পুস্তকের গোপন পৃষ্ঠাগুলি যেন ঐ অত্যাচরিতা মহিলার করুণ আবৃত্তির দ্বারা উদ্ঘাটিত হইতেই পারে না।



মহিলাটি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—নামব না আমি কাশীতে, দেখি তুমি কি করতে পার। অনেক সয়েছি অত্যাচার, আর সইব না। আমার বিষয় আমার নামে লেখাপড়া ক'রে দাও—যা আছে আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি—কাণা কড়িটির হিসেব আমায় দিয়ে যে চুলোয় খুশী তুমি যাও। আমি বলবও না, কইবও না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ অনেক দিন শেষ হয়েছে—চাই না আমি সে সম্বন্ধের জের টানতে। আমি ত তোমার ভাড়াটে বাইজী নই। আজই ফিরে চল পাটনায়—মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল ক'রে এখনই ফিরে চল। কাল বিষয়সম্পত্তি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে—যমের বাড়ী গেলেও আমি দুঃখ করব না। তুমি মলে কি রইলে—তাতে আমার বড়ই যায় আসে।

ভদ্রলোক মহিলাটির দম লইবার অবসরে একবার চারি দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—চা খাবে?

—আর সোহাগে কাজ নেই, ঢের হয়েছে! শুধু তুমি কেন, এই পুরুষজাতটাই অত্যাচারী। এই গাড়ীর সবাই অত্যাচারী, এদের মা, ভাই, বোন, সবাই অত্যাচারী। এরা আমায় কম জ্বালিয়েছে? বলিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কয়েকটি নিশ্বাস ফেলিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন।

আমার পাশেই যে সাত্ত্বিক-গোছের বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন তিনি আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া চক্ষুর ইঙ্গিতে ভদ্রলোককে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন—ব্যাপারটা কি মশাই? উনি কি—

সংবাদপত্রখানি কোলের উপর রাখিয়া মৃদু হাসিয়া মহিলাটির স্বামী উত্তর দিলেন—হাঁ। দু-বছর রাঁচিতে ছিলেন, কিছু উপকারও হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে গরম হয়ে ওঠেন। ডাক্তারের উপদেশ, যাতে সুস্থ থাকেন সেই রকম ভাবে আমাদের চলতে হবে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন—তা নাইবা নামলেন কাশীতে? কাশীর নামে যখন অমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—কাশীতে না নামলে যাব কোথায় মশায়? আমার ছেলেমেয়েরা সব যে সেখানে।

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিলেন—ছেলেমেয়ে—সব?

—হাঁ। আর তা ছাড়া ওখানেই আমাদের ব্যবসা—অন্ন-উপায়ের জায়গা। আর কোথায় যাব বলুন! দেখুন না এখনই সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি। ওর খেয়াল তো!

ভদ্রলোক কথাশেষে ওদিকের বেঞ্চে গিয়া বসিলেন।

গাড়ীর গতি তখন মন্থর হইয়া আসিতেছে। অদূরে দিলদার নগরে সে তখন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে।

ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। দিলদার নগরে প্রকাণ্ড একটা ট্রেতে করিয়া মাংস, পাউরুটি, কাটলেট, কেক, বিস্কুট, চা ইত্যাদি কেলনারের বাচ্চা চাপরাসী দিয়া গেল। দুই-এক বার অনুরোধের পর মহিলাটি উঠিয়া কাচের ডিকাণ্টার হইতে জল ঢালিয়া মুখ ধুইলেন, কেলনারের তোয়ালেতে মুখ মুছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রীতে মুখোমুখি বসিয়া কাঁটা চামচ সহযোগে গম্ভীর মুখেই ধীরে ধীরে আহারকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। গাড়ী যখন মোগলসরাই জংশনে আসিয়াছে তখনও তাঁহাদের ভোজন-কার্য্য শেষ হয় নাই। অভুক্ত জিনিসগুলি পড়িয়া রহিল, তাঁহারা তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন।

গাড়ী ছাড়িলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন—দেখলেন তো যুগলমিলন। গলায় গলায় ভাব। একবারও আপত্তি করলে না মশায়! পাগলের ধারাই ঐ।

মনে মনে একটি প্রশ্ন আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, কিন্তু কেন? কেন?

ডাঃ ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বমূলক পুস্তকগুলি আর একবার পড়িবার ইচ্ছা হইল।

সমবায় বিভাগ ও সমবায় আন্দোলন

শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., এম. এল. এ.

বহুদিন হইতে সরকারী সমবায় বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অক্ষমতা ও অযোগ্যতা লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ও সংবাদপত্রে অনেক প্রকারের আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান সচিব-সংঘ তথা সমবায় বিভাগ কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা ত দূরের কথা, তাহার কোনও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতেও এ-পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই; বরঞ্চ তাঁহারা তাঁহাদের চিরাচরিত পন্থা অনুসরণ করিয়া সমবায় আন্দোলনের প্রকৃত সমবায়-নীতি ক্ষুণ্ণ করিবার পথেই ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন।

উপরন্তু দেখা যাইতেছে যে, সম্প্রতি সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বেঙ্গল উইকলী"তে সমবায় বিভাগের কার্য্যের সমর্থন করিয়া ৬ই, ১৩ই ও ২০শে মে তারিখে তিনটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উইকলীর যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, অর্থাৎ জনসাধারণের ভিতর সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর সঠিক সংবাদ প্রচার করা, তাহা যদি ঐ প্রবন্ধগুলিতে করা হইত তাহা হইলে কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিত না।

অজ্ঞ সমালোচনা অথবা বিগত তিন বৎসর ধরিয়া সমবায় বিভাগ যে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি দেখাইয়াছে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিয়া যে-সব সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় বিভাগ তাহাদের "ভাল কাজে"র ফিরিস্তি লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সমবায় বিভাগের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখেন তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে বিভাগের এই অভিনব পন্থা একটি বিশেষ অপকৌশল মাত্র। আশঙ্কা হয়, ইহার ফলে লোকচক্ষে ধূলি নিক্ষিপ্ত হইবে এবং জনসাধারণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিপথে চালিত হইবে।

সমবায় বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের নীতি হইল উপস্থিত সমিতিগুলিকে সুসংহত অবস্থায় রাখা (consolidation) এবং সম্প্রসারণকল্পে নূতন সমিতি গঠনকার্য্যে সতর্কতা অবলম্বন করা (cautious expansion)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। গত ১৯৩৮ সনের ৩০শে জুন যে বর্ষ শেষ হইয়াছে সেই বর্ষের সমবায়-সমিতিসমূহের কার্য্যকলাপসমন্বিত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে সেই বিবরণী দৃষ্টে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে সুসংহতির পরিবর্ত্তে সমবায় সমিতির অবস্থা ক্রমবর্দ্ধমান অবনতির পথেই চলিয়াছে। ইহার সত্যতা নিম্নলিখিত সমিতির উৎকর্ষানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের ক্রমবর্দ্ধমান খেলাপী ঋণের টাকার পরিমাণ হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

সমবায় সমিতির শ্রেণী ও সংখ্যা

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
১৯৩৫-৩৬	৪৫	৩৮৪	১৩,৬৯৩	২,৮০১	১,৯৯৫
১৯৩৬-৩৭	৩৬	৩৭৫	১৩,২১৪	২,৯৩৫	২,৩৩৫
১৯৩৭-৩৮	৩৫	৩৭৪	১২,৩৮৬	৩,০৯৪	২,৬৩৯

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাপ্য টাকা

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে সমিতিগুলিতে দাদনী টাকা	তন্মধ্যে খেলাপী	তন্মধ্যে খারাপ ও আদায় বিষয়ে সন্দেহের যোগ্য
১৯৩৭-৩৮—১১১ লক্ষ	৪৬½ লক্ষ	—
১৯৩৮-৩৯—১২৮ "	৫৭ ১/১০ "	২৬ লক্ষ

যে সতর্কতামূলক সম্প্রসারণ-নীতি উপরে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অনুসৃত ত হয়ই নাই বরং ইহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, নচেৎ ১৯৩৯ সালের মাত্র দুই মাসের ভিতর মরিয়া হইয়া অতি দ্রুত সম্প্রসারণের চেষ্টার ফলে প্রাদেশিক সরকারী তহবিল হইতে ফসল-ঋণ দানের (crop loan) নিমিত্ত ৬,৫০০ সমিতির সৃষ্টি সম্ভব হইত না। এই নবজাত সমিতিগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদে

যে-সব উক্তি হইয়াছে তাহার কোনও সন্তোষজনক উত্তর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ পর্য্যন্ত দিতে সমর্থ হন নাই। মনে হয় যেন সমবায় বিভাগের কার্য্যকলাপের অপ্রীতিকর ছবি জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রাখিবার ও সমবায় বিভাগের সক্রিয়তা ও সজীবতা প্রমাণ করিবার জন্যই এই সব সমিতির সৃষ্টি।

সমবায় বিভাগ দাবি করেন যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে যে টাকা ধার দেয় তাহার সুদ শতকরা আট টাকা হইতে পাঁচ টাকায় কমান হইয়াছে। কিন্তু এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের আর্থিক অবস্থার বিবরণী (১৯৩৭ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট এবং ১৯৩৯ এর ৩০শে জুনের ষাণ্মাসিক রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) যাহা রেজিষ্ট্রার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ২৯ সংখ্যক স্তম্ভে লিখিত আছে যে, প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহে যে টাকা ঋণ দান করা হয় উহার সুদের হার সাধারণতঃ পাঁচ হইতে ছয় টাকা; উপরন্তু প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালের উদ্বর্ত্ত-পত্র হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে ঐরূপ দাদনী টাকার সুদের হার শতকরা সাত টাকার কাছাকাছি। ১৯৩৭-৩৮ সনের উদ্বর্ত্ত-পত্রে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমিতিগুলিকে ১১১ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দাদন দেওয়া দেখান হইয়াছে এবং ঐ চলতি বৎসরেরই প্রাপ্য সুদ সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা উল্লিখিত আছে—মোটামুটি হিসাবে ইহাতে সুদের হার শতকরা প্রায় সাত টাকা পড়ে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ঐ বৎসরেই প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রাপ্ত সুদের উপর প্রায় দুই লক্ষ টাকা রিবেট দিয়াছে। এই রিবেট যখন হাল ও বকেয়া সুদের উপর দেওয়া হইয়াছে ধরা যাইতে পারে যে উহার অন্যূন অর্দ্ধেক টাকা চলতি সনের সুদের উপর রিবেট দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে সুদের হার শতকরা সাত টাকারও অধিক দাঁড়ায়।

সমবায় বিভাগ প্রচার করেন যে তাঁহাদের চেষ্টাতেই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের আমানতকারিগণ তাহাদের আমানতী টাকার প্রাপ্য সুদের হার শতকরা তিন টাকায় কমাইতে আপোষ-সূত্রে রাজী হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতকারী হইবার মত দুর্ভাগ্য যাহাদের হইয়াছে তাহারা সকলেই জানে যে বহু ক্ষেত্রে সুদ বন্ধ করিয়া দিবার ভয় প্রদর্শন করাতে তাহারা সুদ হ্রাসের প্রস্তাবে নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া সম্মত হইয়াছে। বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট জিজ্ঞাস্য যে এই কমতি হারেও সুদ আদৌ দেওয়া হইতেছে কিনা? সুদের হার কমানোই বড় কথা নহে কমতি হারেও সুদ দেওয়া হইতেছে কিনা তাহাই আসল কথা।

সমবায় বিভাগের "ভাল কাজে"র নমুনা স্বরূপ তাঁহারা বিভাগের কার্য্য-পরিচালনা হইতে হিসাব পরীক্ষা ব্যাপারটি স্বতন্ত্রীকরণের পরিকল্পনার বিষয় সুযোগ পাইলেই উল্লেখ করেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ডিভিসনাল অডিটারগণ দ্বিবিধ প্রভুর অধীনে কার্য্য করিতেছেন; প্রথমতঃ তাঁহারা বিভাগীয় কার্য্য-পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত সহকারী রেজিষ্ট্রারদের নিয়ন্ত্রণাধীন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা চীফ অডিটারের অধীনে—বলা বাহুল্য ঐ চীফ অডিটার আবার স্বয়ং রেজিষ্ট্রারের নিকট দায়ী। ইহা নিখুঁত স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থাই বটে! যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিসাবপরীক্ষক কর্ম্মচারীবর্গকে রেজিষ্ট্রার ও সমবায় বিভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রীকরণ শুধু নামে মাত্রই হইবে, কদাচ প্রকৃত, কার্য্যকরী, সম্পূর্ণ এবং সন্তোষজনক হইবে না।

সমবায় বিভাগ জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্য সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে ঐ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি শুধু বিভাগের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন বাংলার ঐ জাতীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর সহিত মাদ্রাজের জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্যের তুলনা করিয়া তাঁহাদের প্রচারিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন। এখানকার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী দৃষ্টে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ঐগুলি এ পর্য্যন্ত অতি সামান্য কাজই করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিভাগের কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে আরও দশটি নূতন জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের

বিবেচনাধীন আছে। এই কথায় আমরা সকলেই আশ্বস্ত হইতাম। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে ১৯৩৮ সনের ৩০শে জুন যে বর্ষ শেষ হইয়াছে ঐ সনের সমবায় সমিতি-সমূহের কার্য্যবিবরণীর ২১ নম্বর প্যারাতে লেখা আছে "(জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের) সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে এক পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং এক্ষণে উহা সরকারের বিবেচনাধীন," তখন ইহা সুস্পষ্ট যে ঐ পরিকল্পনা সরকারের নিকট দুই বৎসরেরও অধিক কাল পড়িয়া আছে এবং এ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক ঐ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয় নাই এবং কখনও কিছু করা হইবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিলে কাহাকেও দোষী করা চলে না।

সমবায় বিভাগ প্রচার করিয়া থাকেন যে "বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্স" সমগ্র বাংলার সমবায় আন্দোলনের বেসরকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। ইহা সত্য নহে। বর্ত্তমানে ইহা সরকারী সমবায় বিভাগের বেসরকারী 'বেনামদারে' রূপান্তরিত হইয়াছে। স্বাধীন ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-রূপে যে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতিটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কিরূপে সমবায় বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের দ্বারা ঐ বিভাগের উপাঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে তাহা বলিতে গেলে একটা ইতিহাস হইয়া পড়িবে। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অ্যালায়েন্সের এ বৎসরের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে সমবায় বিভাগ কি ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত চিঠির অংশ দেখিলেই নিঃসন্দেহে বোঝা যাইবে: "রেজিষ্ট্রারের ১৯।১।৪০ তারিখের চিঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যাহাতে অ্যালায়েন্সের প্রাথমিক নির্ব্বাচনের বিষয়ে নির্দ্দেশ আছে।" এই চিঠি কোন সহকারী রেজিষ্ট্রার তাহার এলাকাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের সম্পাদকদিগকে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা কি সত্য নহে যে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির সেণ্ট্রাল বোর্ডের কোন এক অধিবেশনে যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভাপতি কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কতিপয় সদস্যের নাম উক্ত সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত ঘোষিত হইবার পরই বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রারের প্রভাবে তাহা নাকচ হইয়া যায়: যাঁহারা নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন তাঁহারা রেজিষ্ট্রারের প্রতি কথা দ্বিধাশূন্যচিত্তে মানিয়া লইতে পারিবেন না আশঙ্কায় তাঁহাদের নাম পরে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

সমবায় সমিতিগুলিকে কঠিন আইনের নিগড়ে বন্ধন করিতে পারিলেই উহারা সমবায়-নীতি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না—আর কঠোর শাসনের অভাবে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ যথেচ্ছাচারী হইয়া সমিতিগুলিকে তথা সমবায় আন্দোলনকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, এই অমূলক নিছক কল্পনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ইহার প্রতিকারকল্পে বিভাগের রেজিষ্ট্রারকে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া বাংলার সরকার একটি সমবায় সমিতি বিল আগামী ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বিবেচনা ও মঞ্জুরীর জন্য আনয়ন করিবেন।

বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ভুলিয়া গিয়াছেন যে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে এই উদ্দেশ্যেই সমবায় সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি কঠিন আইনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভাগের অবিদিত থাকিবার কথা নহে যে সমিতিগুলির তথা সমবায় আন্দোলনের অবস্থা এই আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে অবনতির পথেই চলিতেছিল। ফলে ১৯৩৯ সালে যে অনুসন্ধান সমিতি বিহার প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশের জন্য গঠিত হইয়াছে তাঁহারা অন্যান্য নির্দ্দেশের মধ্যে বর্ত্তমান আইনটির পরিবর্ত্তন সুপারিশ করিয়াছেন। এখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বিহার বর্ত্তমানে যে আইনটি বাতিল করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে সেই আইনকে ভিত্তি করিয়া ১৯৩৬ সালে যে-বিলের খসড়া বাংলা সরকার কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহাকেই নবকলেবর ধারণ করাইয়া বর্ত্তমান সরকার কায়েম করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বাংলা-সরকার যদি একটি উপযুক্ত নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অনুসন্ধান-কমিটি কর্ত্তৃক বাংলার সমবায় আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণের পর বিলটি প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে ব্যাপারটি শোভন

হইত এবং কাহারও কোন অসন্তোষের কারণ থাকিত না।

এই পন্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা জানি না, বাংলা-সরকার কেন সাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবি উপেক্ষা করিয়া কোনও প্রকার স্বাধীন ও বেসরকারী কমিটির দ্বারা অনুসন্ধান না করাইয়া নিজেদের ইচ্ছানুরূপ বিল প্রণয়ন করিলেন। ইহা মনে হওয়া কি অসঙ্গত যে বিভাগের বহু গলদ এই অনুসন্ধানের ফলে জনসাধারণের গোচরে আসিতে পারে এই আশঙ্কায় এইরূপ একটি অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত হয় নাই? যে দীর্ঘ দুই বৎসর বিলটি ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত হইবার পর প্রায় অতিবাহিত হইতে চলিল তাহার ভিতর অনুসন্ধান-কমিটি তাহাদের কার্য্য নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন করিতে পারিত।

সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে বা কাহারা, কাহার দায়িত্ব কতটুকু সে-বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা না করিয়া এইটুকু বলিলে অসত্য হইবে না যে এই দায়িত্ব হইতে সমবায় বিভাগকে কোনও রকমে মুক্ত করা যায় না। সমবায় বিভাগের তথা রেজিষ্ট্রারের অযোগ্যতা অন্যান্য কারণের সহিত যুক্ত হইয়া বাংলার সমবায় আন্দোলনকে বর্ত্তমান দুরবস্থায় আনয়ন করিয়াছে।

বর্ত্তমান বিলে সমিতির সভ্য ও কর্ত্তৃপক্ষকে সক্ষম করিয়া তোলা ত দূরের কথা, যাহাতে তাহাদের ক্ষমতার কোনও স্ফুরণ না হইতে পারে প্রতি পদে পদে রেজিষ্ট্রারকে ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর রেজিষ্ট্রার যাঁর অযোগ্যতা সমবায় আন্দোলনের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে বর্ত্তমান বিলে তাঁহার যোগ্যতা-নির্দ্দেশক কোনও বিধানের ব্যবস্থা নাই। যে সমস্ত গুণাবলী রেজিষ্ট্রারের থাকা উচিত বলিয়া ম্যাকল্যাগ্যান কমিটি এবং রাজকীয় কৃষি-কমিশন এর রিপোর্টে নির্দ্দেশ আছে এবং যাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন সেই সমস্ত গুণাবলী সম্বলিত রেজিষ্ট্রারের নিয়োগ হইলে আজ বাংলার সমবায় আন্দোলনের এইরূপ দুর্গতি হইত না।

সমবায় বিল সম্বন্ধে আমার অধিকাংশ বক্তব্য আমার অসম্মতিসূচক বিবৃতিতে (note of dissent) সন্নিবেশ করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

উপসংহারে শুধু এই কথাটি বলিয়াই শেষ করিব যে বর্ত্তমান বিল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আইনে পরিণত হইলে সমবায় নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। আইন করিয়া সমবায় আন্দোলনকে বিভাগের কুক্ষিগত করিয়া নির্জীব করা যাইতে পারে, সজীব করিয়া তোলা যাইবে না। সজীব করিতে হইলে চাই সমবায় নীতিতে বিশ্বাসবান্ স্বাধীনচেতা কর্ম্মী, আর চাই সমবায় বিভাগের ও এই সকল কর্ম্মীদের একটা প্রকৃত মিলনক্ষেত্র যেখান হইতে পরস্পরের সহিত পরস্পরের ভাবের ও মতের আদান-প্রদান হইয়া এই সকল কর্ম্মীদের শক্তিস্ফুরণের ক্ষেত্র রচনা হইবে।



আমরা যে বাঁচিয়া আছি

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

আমাদের গ্রামের উত্তর দিকে যে সান্যালদের আমবাগান, তাহার পশ্চিম দিকেই একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ। তাহার নীচে সেঁয়াকুলের দুর্ভেদ্য বন। বটবৃক্ষ তাহার অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া সেঁয়াকুলের বনকে সযত্নে রক্ষা করিতেছে যেন। মাঝে মাঝে কতকগুলি গুলঞ্চ-লতা বটবৃক্ষের ঝুরিগুলিকে অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িয়াছে। আশেপাশে বাবলার অসংখ্য চারা—বর্ষার কিছু আগে তাহাদের ফুল ধরিত। গ্রামের গোয়ালারা গরুগুলিকে খাওয়াইবার জন্য বাবলার ডালপালা কাটিয়া লইয়া যাইত—নির্দ্দয়ভাবে। কর্ত্তিত বাবলার ঝোপগুলির দিকে চাহিয়া আমাদের কি যে এক দিন মনে হইল—মনে হইল গোয়ালাদের ডাকিয়া বলি, ওহে তোমাদের বাড়ীর পাশেই ত রহিয়াছে কত ঝোপঝাড়; সে-সব দিকে লক্ষ্য দিতেছ না কেন? দেখ ত, বাবলাবন কাটিয়া সাবাড় করিয়াছ, মাঠের শ্রী-শোভা দেখ একবারটি। কিন্তু সাহস হইল না; তাহারা বড় নিদারুণ, রাগিলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আর তাহাদের গিঁটওয়ালা লাঠিগুলির দিকে চাহিলে বড় ভয় হয়। সুতরাং যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইল না। তবে মনের বাসনা অন্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল; মাধবকে ডাকিয়া বলিলাম—ওহে মাধব, এস আমরা বট-বৃক্ষের নীচেকার সেঁয়াকুলবন কাটিয়া উড়াইয়া দিই।

সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—কেন?

কহিলাম—কেন আবার! বন কাটিলে জায়গাটা বেশী রকম ফাঁকা হইয়া যাইবে। তখন আমরা ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি! ভাবিতেছি, একটা কালীমূর্ত্তি আনিয়া পূজা দিব।

মাধব কহিল—বেশ কথা। এস বন কাটা যাক।

ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। অন্য কাজ কিছু ছিল না। দুই জনে দা আনিলাম, কোদাল আনিলাম এবং দেখিতে দেখিতে বটবৃক্ষ তাহার সযত্নরক্ষিত সেঁয়াকুলবন হারাইল। আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে জুটিয়া ডাণ্ডাগুলি খেলিতাম —হৈ হৈ করিতাম। তবে কালীমূর্ত্তি আর প্রতিষ্ঠা করা হইল না।

মাধবের বিমাতা। মাধব ইহার উপর বিবাহও করিয়াছে। একটি ছেলে তাহাদের হইয়াছে। পিতা বিদেশে থাকেন, চাকরি করেন। মাধব বাড়ীতে থাকিয়া খেত-খামার দেখে। গ্রামের পাঁচটা লোকের উপকার করে, তাহাদের অসুখবিসুখ হইলে মাধব তিন ক্রোশ দূর হইতে তাহাদের জন্য ঔষধ বহিয়া লইয়া আসে—প্রয়োজন হইলে তাহাদের পথ্য রাঁধিয়া দেয়। রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রি জাগিতেও তাহাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। আমি ছুটিতে বাড়ী আসিয়া তাহার সঙ্গে জুটিয়া যাই—তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াই, মাঠে, বনে, পুকুরের ধারে ধারে, মাছ ধরি, খেলা করি এবং দেখি মাধব কি একটা অদ্ভুত শক্তিবলে নিজেকে ভুলিয়া যায়, অপরের সেবা করে। আর দেখি, তাহাকে দেখিলে চাষী লোকগুলির মুখ প্রফুল্ল হয়। তাহারা অসঙ্কোচে তাহার কাছে তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা চলে।

অধিকাংশ সময়ে মাধব খালি গায়ে থাকে। জুতা তাহাকে পরিতে খুব কমই দেখা যায়। তাহার বুকখানা ছিল বিশাল। তাহার উপর পৈতাগাছটি পড়িয়া থাকিত। মাজায় কাপড় বাঁধিয়া জল-কাদা ভাঙিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সে ঘুরিয়া বেড়াইত। কোথাও হয়ত সে জমির বন্দোবস্ত করিতেছে, কখন বা বাড়ীর সংলগ্ন ফুল এবং তরিতরকারির বাগানে জনমজুর খাটাইতেছে। কখনো বা দেখিতাম সে আটচালা ঘরের চালের উপর উঠিয়া বাঁশের মজবুত বাতা নিজেই বাঁধিতেছে।

মাঝে মাঝে তাহাকে বড় বিষণ্ণ দেখিতাম। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যাহা বলিত, তাহাতে বুঝিতাম,

তাহার বিমাতাই তাহার বিষাদের কারণ। সম্ভবতঃ তাহার বিমাতা তাহাকে অকর্ম্মণ্য মনে করিতেন এবং মাঝে মাঝে যথোপযুক্ত বাক্যবাণে তাহার কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করিতেন। হয়ত এই কারণে তাহাকে মাঝে মাঝে বিষণ্ণ দেখিতাম। সে বিবাহিত, সন্তানবান্, তাহার নিজের, একেবারে যাহাকে একান্ত নিজের বলা চলে,—এ প্রকার চিন্তা বা কর্ম্ম করার অধিকার বা দায়িত্ব তাহার ছিল। অথচ পিতৃসংসার সে ছাড়িয়া যাইবেই বা কি প্রকারে? সুতরাং এই প্রকার মানসিক অবস্থায় বিমাতার বাক্যবাণ এবং তাঁহার সাময়িক উপেক্ষা তাহার মনে বড় বাজিত।

আমাদের গ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামের মধ্যে এক বিশাল প্রান্তর ব্যবধান। আমাদের সেই বটবৃক্ষ আমাদের গ্রামের সীমানায় প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। কিছু দূরে বড় সড়কের উপর দিয়া ধুলা উড়াইয়া গরুর গাড়ী যায়—তাহার ভারী চাকার ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ আসে। মাঝে মাঝে হাটুরেরা আলপথ ধরিয়া ঝোলাঝুলি এবং পুঁটুলি লাঠি লইয়া চলিয়া যায়। অনেক দূর হইতে কৃষাণের ডাক শোনা যায় এবং বহুদূর হইতে তাহার ক্ষীয়মাণ সাড়া শুনিতে পাওয়া যায়। বহুদূর পশ্চিমে বাবলা-বনের ফাঁকে ফাঁকে ভাগীরথী একটি প্রকাণ্ড বাঁক লইয়া দক্ষিণাভিমুখিনী হইয়াছেন। সেই নীল জলরেখা মাঝে মাঝে রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন প্রান্তরে ঈশানের ভাবস্তিমিত নেত্রের মত মনে হয়।

এই মাধব এবং এই মাঠ।

এইবার আমার গল্পের পারিপার্শ্বিকের উপর হইতে অস্পষ্ট যবনিকা তুলিয়া দিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে সান্যালদের আমবাগানের পথে একটি বকুলগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি। টুপ্ টাপ্ করিয়া শুষ্ক বকুলফুলগুলি মাটিতে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। ভাবিতেছিলাম, আধুনিক পদ্ধতিতে পল্লী-সংস্কারের কথা। আমি ত বাড়ীতে থাকি না, যদি মাধব আমার কথা শুনিয়া চলে, তাহা হইলে পল্লীশ্রী আবার ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় কি না এই কথা ভাবিতেছি,—এমন সময় আমবাগানের প্রান্ত হইতে মাধব হাতছানি দিয়া আমাকে ডাকিল, চীৎকার করিয়া বলিল—আয় বেড়াইয়া আসি। দৌড়াইয়া তাহার কাছে গেলাম এবং তাহার সহিত আমাদের সেই বটবৃক্ষের পাশ দিয়া ফাঁকা মাঠে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথ চলিতে চলিতে সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—দেখ, আমার বাড়ীতে বড় গুমট বোধ হয়। নিজের অপরাধ কিছুই খুঁজিয়া পাই না, তবু বিমাতার ব্যবহার আর ভাল লাগে না। ইচ্ছা হয়, দু-দিন কোথাও চলিয়া যাই।

বলিলাম—ও এই কথা! বিমাতা যখন, তখন এ ত জানা কথা। ঠিক এই রকমটি না হইলে 'মাতা' শব্দের আগে 'বি' বসিত না। তা দু-দিন কোথাও ঘুরিয়া আসিতে পার। আবার ত এখানেই আসিতে হইবে।

সে কথা কহিল না। নীরবে পথ চলিতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় আকন্দ ফুল ফুটিয়াছে। তাহারই মৃদু সৌরভ সন্ধ্যার বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

আলপথের পাশে কণ্টিকারীর বন, সেদিকে চাহিয়া সে নতমুখে বলিল—ধর যদি একেবারেই কোথাও চলিয়া যাই, আর না ফিরি, কোন রকমে একটা-আধটা ছোটখাট চাকরি জোগাড় করিয়া লই, তাহা হইলে কি রকম হয়! আর যদি না ফিরি!

একটু চিন্তিত ভাবে বলিলাম—ভাবিয়া দেখিতে পার। তবে তুমি ত বেশী দূর পড় নাই, চাকরি কি তোমার মিলিবে? এই কথা বলিয়া ফাঁকা মাঠের দিকে চাহিয়া তাহার মনের দুঃখ আমার মনে গ্রহণ করিলাম। বুঝিলাম, তাহার পক্ষে সে কিছুই অন্যায় বলে নাই। আর কোন কথা হইল না। দু-জনে নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছে।

মাধব বাড়ী ফিরিয়া গেল। গোয়ালের সাঁজালের ধোঁয়ায় ভরা অন্ধকার গ্রামপথ বাহিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ীতে তখন কাহাকেও দেখিলাম না। শুধু রান্নাঘর হইতে নানা প্রকার মশলার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিলাম। সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিলাম।

অন্ধকারে উন্নতশীর্ষ নারিকেলবনমর্ম্মরে স্বরচিত একটি কবিতার কথা ভাবিতে লাগিলাম। মাধবের কথা তখন সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সাধারণতঃ এমনই হয়। মন আমাদের এমনি চঞ্চল; কখন কি ভাবিতে কি ভাবিয়া বসি, পূর্ব্ব হইতে তাহার কোন আয়োজন থাকে না। আমার সম্মুখে ঘন অন্ধকারে ঢাকা নারিকেল-বনের পত্রচ্ছেদের অবকাশে যেমন চঞ্চল বনান্তবায়ু বহিয়া যাইতেছে, আমার মনের মধ্যেও তেমনি কোথা হইতে এক উন্মাদ কবি জাগিয়া উঠিয়া বন্ধুর দুঃখ-বেদনা ভুলিয়া কবিতাতত্ত্ব লইয়া মাতিয়া উঠিল। বেশীক্ষণ এ অবস্থায় থাকা হইল না। নীচে বাবা ডাকিতেছেন, স্পষ্ট ডাক শুনিতে পাইলাম—সুরেন, এক বার নীচে এস—

নীচে নামিয়া গেলাম। কয়েক জন প্রৌঢ় বাহিরের দালানে বসিয়া আছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা বাবার কাছে কোন দরকারে আসিয়া থাকিবেন। বাবা বলিলেন—তুমি ইঁহাদের সঙ্গে গল্প-টল্প কর, কথাবার্ত্তা বল, আমি ততক্ষণ একটু কাজ সারিয়া আসি। বাবা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। মাথার মধ্য হইতে কবিতার পদগুলি মিলাইয়া গেল, তাহারা একেবারে অদৃশ্য হইল। যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় রত হইলাম। তাঁহারা বলিলেন, আমরা নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাত্রী দেখিতে আসিয়াছিলাম। কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইল দেখিয়া আপনাদের আশ্রয়ে জুটিয়াছি। রাত্রিটা এখানে কাটাইয়া সকালে রোদ না উঠিতে বাড়ীর পথে রওনা দিব।

বলিলাম—বেশ ত, মাঝে মাঝে এমন অনেকে আসেন। পথে রাত্রি নামিলে দূর পথ যাওয়াও কঠিন। এই বলিয়া চাকরকে ডাকিয়া তাঁহাদের হাত-মুখ ধুইবার জল দিতে বলিলাম এবং বাড়ীর মধ্যে গিয়া তাঁহাদের থাকিবার এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

...তাঁহারা হাতমুখ ধুইয়া চা-পানান্তে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার একটু পর হইতেই আমাদের গ্রামের সামান্য কর্ম্মকোলাহল থামিয়া যায়। শুধু কয়েকটি ডোবার পার হইতে বাগ্দীদের সম্মিলিত কণ্ঠের গান শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা বহুক্ষণ ধরিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া করিয়া এক সময়ে কখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে—তার পরে প্রহরে প্রহরে শিবাদলের দীর্ঘস্বর এবং ঝিল্লীঝনিত অন্ধকারের নিগূঢ় স্পন্দন। যাহারা এমন গ্রামে কখনও থাকে নাই, তাহাদের ভয় হয়। ভয় হইবারই কথা। আগন্তুকেরা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমাদের যে-গ্রাম, সে-গ্রাম এত নির্জ্জন নয়। এ যে একেবারে জনহীন। একটি প্রাণীরও যে সাড়া পাওয়া যায় না।

হাসিয়া বলিলাম—হাঁ, জনহীনই বটে। সামান্য কয়েক ঘর চাষাভূষো আছে। আর আছে ঐ বাগ্দীরা। ওরাই গ্রামখানিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

তাঁহারা বলিলেন—হাঁ বাগ্দীদের মুরদ আছে বটে। ওদের সাহসও খুব। আমাদের গ্রামের কয়েক ঘর বাগ্দী একবার ডাকাত মারিয়া তাড়াইয়াছিল। তবে তারা স্বদেশী ডাকাত নয়, বন্দুকও ছিল না, ছোরাছুরিও ছিল না, শুধু সড়কি, আর বাঁশের লাঠি।

কৌতূহলী হইয়া ব্যাপার কি জানিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময়ে ভিতর হইতে খাবার ডাক আসিল। তাঁহাদের আসনের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাদের খাওয়ার তদারক করিতে লাগিলাম। ডাকাতের কথা শুনিয়া প্রাণে ভয় হইয়াছিল। এক্-এক বার সন্দেহ হইতেছিল, হয়ত ইহারাই ডাকাত। এমন অনেক ভদ্রবেশী ডাকাতের কথা শুনিয়াছি—কাগজে পড়িয়াছিও। গৃহস্বামী যত্ন করিয়া অতিথি ভদ্রবেশীদের আহার ও থাকার বন্দোবস্ত করিলেন। রাত্রে হঠাৎ তাঁহাদের বিশ্রামকক্ষ হইতে মশাল জলিয়া উঠিল এবং বেচারা গৃহস্বামী উৎপীড়িত বিপর্য্যস্ত এবং সর্ব্বস্বহারা হইলেন—এ রকম ঘটনা একেবারেই বিরল নহে। লণ্ঠনের আলোয় ভয়ে ভয়ে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম তিন জনেই প্রৌঢ়-বয়স্ক। কাঁচাপাকা দাড়িতে তিন জনেরই মুখ বোঝাই। তাঁহারা নিঃশব্দে খাইয়া চলিয়াছেন। কোথাও যে কখনও ডাকাত পড়িয়াছিল এবং ভবিষ্যতে কোথাও কখনও পড়িতে পারে, এ-কথা তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না।

তথাপি মন হইতে সন্দেহ গেল না।



হাওয়াইয়ানরা সমুদ্রে নৌকা ভাসাইতেছে—সমুদ্র যেন ইহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র।

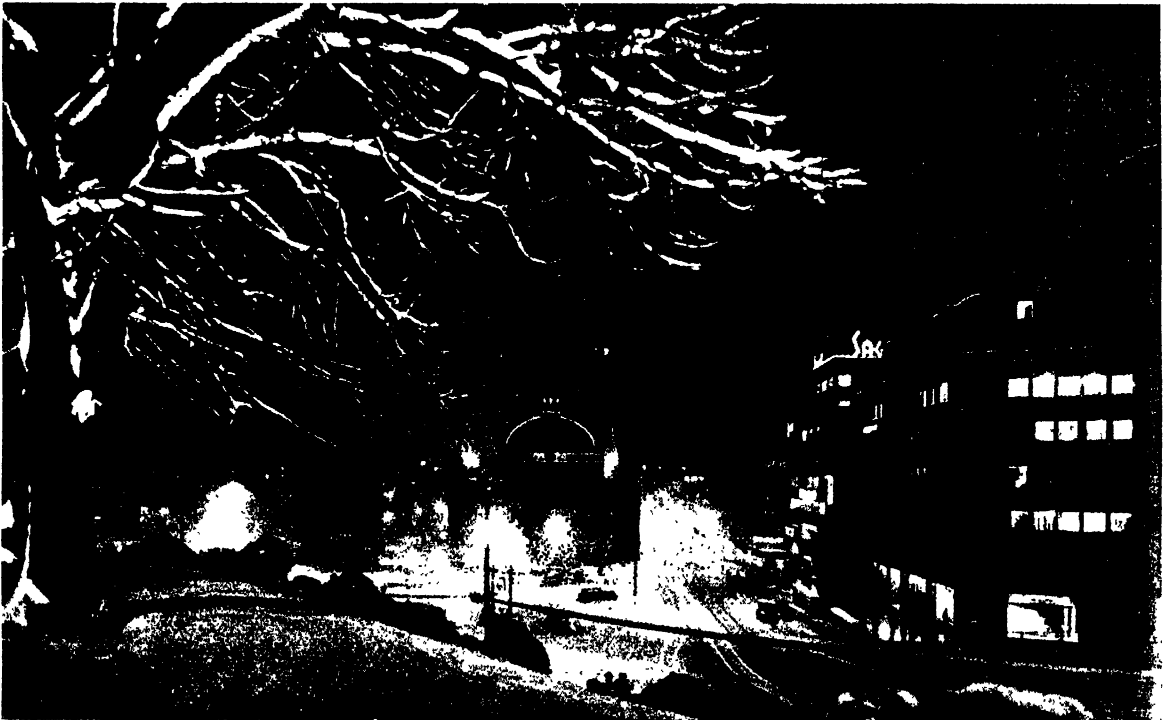


অগ্নি-দেবতার বন্দনা-উৎসব, হাওয়াই

["হনলুলু" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য



নরওয়ে, অসলো। নরওয়ের রাজা তাঁহার রাজপদ ত্যাগ করিবার প্রস্তাবে সম্প্রতি দৃঢ় অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন।



অসলোয় রাত্রি

বাহিরের ঘরে তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা হইল। বাহিরের ঘর এবং ভিতর-বাড়ীর সংযোগস্থলে যে দরজা আছে, তাঁহাদের শয্যা-আশ্রয়ের পর সেই দরজায় যতগুলি খিল ছিল, লাগাইয়া দিয়া বাড়ীতে আসিলাম।

লোচন হরকরা জাতে বাগ্দী। সে অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সাহসী—সে রাত্রে আমাদের বাহির-বাড়ীতে আসিয়া শুইয়া থাকিত। একগাছি লাঠি এবং সড়কি তাহার সঙ্গে থাকিতই। সে তখনও আসে নাই। বাবাও ফিরিয়া আসিলেন না, কোথায় গিয়াছেন কে জানে? ডাকাতের ভয় কিছুতেই মন হইতে গেল না। বাড়ীর এক পুরাতন সিন্দুকের মধ্যে নেপালীরা যে-প্রকার কুকুরি ব্যবহার করে, সেই প্রকার কুকুরি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সিন্দুক হইতে তাহা বাহির করিলাম। খাপসমেত কুকুরিটা হাতে লইয়া আমার উপরের পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া তাকের উপর রাখিয়া দিলাম।

অনেকক্ষণ পরে বাবা আসিলেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল। বাবা বলিলেন—সুরেন, তুমি ছাদে শুইয়া থাক। আজ বড় গরম। আমি ভাবিতেছি মাদুর বালিশ লইয়া বাহিরের রকে শুই।

আমি মুখে কিছুই বলিলাম না। কিন্তু অন্তর আমার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। চোখের সম্মুখে দেখিলাম মশাল জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ভদ্রবেশী ডাকাতরা···

দেখিলাম, বাবা মাদুর বালিশ লইয়া বাহির-বাড়ীতে শুইতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে লোচন হরকরা লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে শুইতে আসিল, স্পষ্ট টের পাইলাম।

ছাদে শুইয়া তারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া কেবলই মনে হইতেছিল আমরা এত ভয় পাই কেন? বিশেষ করিয়া রাত্রি যেন মনের মধ্যে এক প্রকার অদ্ভুত আশঙ্কার সৃষ্টি করে, অথচ তাহার কোনই কারণ নাই। মাঝে মাঝে দক্ষিণের বাঁশের ডগাগুলি বাতাসে আস্ফালন করিতেছিল। তারায় উজ্জ্বল আকাশে তাহাদের সেই দীর্ঘায়িত আস্ফালন দেখিয়া মনে ভয় হইতেছিল। পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

ভিতর-বাটীতে মেয়েরা ঘুমাইয়াছেন। বাহির-বাড়ীতে সড়কি লইয়া লোচন হরকরা। আর, রকে মাদুর বিছাইয়া তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া বাবা শুইয়া আছেন। সমস্ত গ্রাম প্রসুপ্ত। ঝিল্লীর আর্ত্ত দীর্ঘস্বর যেন নারিকেলবন-মর্ম্মরকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে দূরের নিবিড় বনভূমি হইতে কি একটা অজানা পাখী কুক্ কুক্ করিতেছে।··· শৈশবে শোনা কত ভয়ের গল্প যেন মনের মধ্যে ভিড় পাকাইয়া তুলিয়াছে। আবার পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

হঠাৎ শুইয়া শুইয়া মনে হইল, এই ভাবে ঘুমাইয়া পড়িব। আবার সকাল হইবে। উঠিতে আবার একটু দেরি হয়। হাঁসগুলি ডাকিতে ডাকিতে পুকুরের দিকে চলিয়া যাইবে। ঝিরা নারিকেলের ছোব্ড়া দিয়া মাজিবার জন্য ডোবার ঘাটে বাসনের গাদা লইয়া বসিবে। মাছের ঝাঁকা মাথায় লইয়া মেছুনীরা চিতার বেড়ার পাশ দিয়া হাত দুলাইতে দুলাইতে বকিতে বকিতে দূরের হাটের দিকে যাইবে। রাখালেরা কোঁচড় ভরিয়া মুড়ি লইয়া চিবাইতে চিবাইতে নানা বর্ণের গাভীর দল লইয়া মেঠো পথ ধরিবে। কাছারি-বাড়ীতে গোমস্তারা পুকুরে বহুক্ষণ ধরিয়া মুখ ধুইয়া পাটকাটি-ধরানো উনুনে চায়ের কেৎলি চাপাইয়া লাল রঙের খাতাপত্র লইয়া বসিবে। একটি দুটি করিয়া অনেক কৃষাণ আসিয়া কাছারি-প্রাঙ্গণে জমা হইবে। মুদীখানায় বাগ্দীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ময়লা কাপড় পরিয়া সরিষার তৈল কিংবা লবণ আনিতে যাইবে। তাহার পরে গ্রাম্যবধূর দল কচার বেড়া, চিতার বেড়া আর গুলঞ্চ-লতার মালঞ্চের পাশ দিয়া পিতলের ঘড়া কাঁখে করিয়া দীঘির দিকে চলিবে। ঘাটে কলসী ভাসাইয়া দিয়া আকণ্ঠ শীতল জলে নিমজ্জিত হইয়া একে অপরের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। খারাপ খবর থাকিলে চিন্তিত ব্যাকুল মুখে ভগবানের নাম লইবে। যে সম্মুখে নাই, তাহার সমালোচনা নিন্দাবাদ হইবে, তাহা লইয়া বচসা বাধিবে।...হয়ত দূর মাঠে ধানক্ষেত লইয়া মোড়লে মোড়লে বিবাদ বাধিবে এবং তাহা কাছারি-বাড়ি পর্য্যন্ত গড়াইবে।···এমনি করিয়া মানুষের প্রাণপণ চেষ্টার ফলস্বরূপ তাহার নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবনযাত্রা মন্দাক্রান্তা ছন্দে দুলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইবে। ইহারই মধ্যে একে অপরের দিকে করুণ দৃষ্টি তুলিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে—কেমন

ভাল আছ ত? উত্তর শুনিবে—না ভাল নাই। তখন স্বভাবতই তাহার মনে আশঙ্কা আসিবে, সমবেদনা আসিবে—কি করিলে মানুষ ভাল থাকে এ-প্রশ্নও মনে আসিবে—কি করিলে মানুষের জীবনযাত্রা আরও নিরাপদ হয়, আরও নিরাশঙ্ক হয়—এ-চেষ্টা আসিবে। এমনি করিয়া সুখে দুঃখে নির্ভাবনায় ভাবনায় গড়াইয়া গড়াইয়া মানুষের জীবনযাত্রা স্পন্দিত হইতেছে, গতিমান্ হইতেছে: মনে হইল আশঙ্কাই সত্য, স্বাচ্ছন্দ্য কিছু নয়—স্বাচ্ছন্দ্য ভোজবাজির মত, মায়ার মত উড়িয়া চলিয়া যায়—ঠিক এমনি সময়ে নীচে একটা গোলমাল শুনিতে পাওয়া গেল। ঘুম আর হইল না। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম—মনে ভয় ত বরাবরই ছিল। কুকরিখানা তাকের উপরেই ছিল; সেখানি হাতে লইলাম।

নীচে নামিয়া দেখি সকলে ঘুমাইতেছেন। শুধু লোচন হরকরার ঘুম ভাঙিয়াছে—সে উঠিয়া লাঠি লইয়া নীচে ঘাস-বিছানো উঠানে নামিয়াছে। সেখানে লণ্ঠন লইয়া দু-তিন জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। লোচন তাহাদেরই সহিত কি কথাবার্ত্তা বলিতেছে—দূর হইতে সেটা গোলমালের মত শুনাইল। সে যাহা হোক্, তাহাদের কাছে আসিলাম। দেখিলাম তাহাদের সকলের মুখই শঙ্কা-ব্যাকুল। কাছে আসিতেই লোচন বলিল—দাদাঠাকুর, চক্রবর্ত্তীদের মাধবকে কিসে কামড়াইয়াছে, চলুন যাই!

বলিলাম—তাই নাকি? কিসে?

—কিসে যে জানি না, অনুমান হয় সাপে! তাড়াতাড়ি চলুন। কুকরিখানা হাতেই ছিল। সেখানা হাতেই রহিল। একদৌড়ে মাধবের বাড়ী আসিলাম। বাবা শুইয়াছিলেন, তাঁহাকে আর ডাকিবার সময় পাইলাম না। লোচন এবং আর দুই জনও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল। তখন রাত্রি বোধ হয় দ্বিপ্রহর।

মাধবের বাড়ীতে দেখিলাম, অনেকেই আসিয়াছে। মাধব বাহিরের রোয়াকে হাঁটু দুইটি তুলিয়া পা বাড়াইয়া দিয়া বসিয়া আছে। তাহার একটু দূরে তাহার বিমাতা এবং দুটি ছোট ছোট ভাই-বোন বসিয়া আছে। উঠানে অনেক লোক। মাধবের পাশেই দু-এক জন বসিয়া আছে। মাধবের কাছে গিয়া দেখিলাম সে দিব্য হাসিতেছে, গল্প করিতেছে। বলিলাম—কি ব্যাপার?

সে হাসিতে হাসিতে বলিল—ভাই, বোধ হয় ইঁদুরে কামড়াইয়াছে।

বলিলাম—পায়ে বাঁধন দেখিতেছি না যে! ইঁদুর-কি কি—তা যখন জান না, তখন—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সে বলিল—এই যে বাঁধন।

দেখিলাম, উরুর কাছে একটা এবং হাঁটুর নীচে একটা, এই দুইটি বাঁধন সে বেশ শক্ত করিয়া দিয়াছে।

বলিলাম—কোথায় কামড়াইয়াছে? আলো ত কখনও সঙ্গে নাও না! ঘরে কি আলো ছিল না?

সে হাসিয়া বলিল—না আলো ছিল না। জানালার বেদীর উপর একটা পা রাখিয়া পাশের বাড়ীর দিদিকে ডাকিতে গিয়াছি, যে পা-টা মেঝেয় ছিল, তারই বুড়ো আঙুলে কি যেন কট্ করিয়া কামড়াইল। জ্বালা করিতে লাগিল—তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া আলো আনিতে গিয়াছি। আলো আনিতে গিয়া দেখি ঘরে কিছুই নাই, কিন্তু আমার পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়া রক্ত পড়িতেছে। কি ভাবিয়া শক্ত দড়ি দিয়া পা বাঁধিলাম। তার পর খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তোমরা এই আসিলে।

আমি আর দেরি করিলাম না। আমার সেই কুকরি আগুনে পুড়াইয়া তাহা দিয়া তাহার পায়ের বুড়ো আঙুলের দষ্ট অংশ চিরিয়া ফেলিলাম এবং কুকরির অগ্নিদগ্ধ রক্তাভ অংশ সেখানে চাপিয়া ধরিয়া জায়গাটিকে পুড়াইয়া দিলাম।

সে যন্ত্রণায় দুই-এক বার পা সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিল। তাহার পর সে আর দ্বিরুক্তি করিল না। কানাই মোড়ল বলিল—বাঁধন আরও বেশী করিয়া দেওয়া হউক। আরও বাঁধন দেওয়া হইল এবং গ্রামের যে দুই-চারি জন ওঝা ছিল, তাহারা নিমের ডাল ভাঙিয়া আনিয়া তারস্বরে মন্ত্র আওড়াইয়া তাহাকে ঝাড়িতে লাগিল। মন্ত্র আওড়াইয়া বিষ ঝাড়া যায় এবং রোগী শেষ পর্য্যন্ত সারিয়া উঠে এ বিশ্বাস আমার ছিল। কাজেই একটু দূরে দাঁড়াইয়া বিষ-ঝাড়া দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, মাধব একটু একটু

ঢুলিতেছে। ওঝাদের মধ্যে এক জন তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া এক ঘড়া জল আনিয়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিল। তাহার পর বিষঝাড়া সমানে চলিতে লাগিল। আমার এক বার মনে হইল দূর গ্রামের কোন ডাক্তারকে খবর দিলে ভাল হইত। লোচনকে সে-কথা বলিতেই সে তাহার লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল; বলিয়া গেল, দেরি হইতে পারে, তবে বিষঝাড়া যেন বন্ধ না হয়। সাপেই তাহাকে কামড়াইয়াছে, নহিলে সে ঢুলিবে কেন? লোচনকে ডাক্তারের কাছে পাঠাইয়া আমি আবার মাধবের কাছে গেলাম। পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, মাধবের মা কাঁদিতেছেন। পাছে লোকে দেখিতে পায় সেজন্য তিনি আঁচলের খুঁট দিয়া চোখ মুছিতেছেন। মাধবের ছোট ছোট বৈমাত্রেয় ভাই-বোন দুটি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। তাহারা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। আর মাধবের চোখ অর্দ্ধনিমীলিত, ঘড়ার জল তাহার সমস্ত দেহ সিক্ত করিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে; এবং সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে মাধবের জলসিক্ত বিশাল বক্ষ বড় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহার পিছনে গিয়া তাহার মাথাটা আমার বুকে রাখিয়া বসিলাম।

মাধব বুঝিতে পারিল আমি আসিয়াছি। বুঝিতে পারিয়া সে বলিল—ভাই ইঁদুরের কামড় বোধ হয় নয়।

বলিলাম—এতক্ষণে তাহা বুঝিতেছ।

সে একটু ম্লান হাসিয়া বলিল—হাঁ ভাই।

ওঝারা তখন নখীন্দরকে ভেলায় উঠাইয়াছে এবং স-রবে বেহুলার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। আর উঠানের পাশে নেবুগাছের কাছে যে জটলা হইয়াছে সেখান হইতে কবে কোন্ ওঝা কি ভাবে সর্পদষ্ট রোগীকে সারাইয়া তুলিয়াছে, তাহারই আলাপ-আলোচনা শোনা যাইতেছে।

বুকের উপরেই মাধবের মাথা। দেখিলাম, তাহার মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতেছে। তখনই বুঝিলাম মাধবকে আর বাঁচানো যাইবে না। ওঝাদের চেষ্টা বৃথা হইল। মাধবের স্ত্রী-পুত্র কেহই তাহার কাছে ছিল না। তাহাদের কথা ভাবিয়া মনে দুঃখ হইল। রোয়াকে চাহিয়া দেখিলাম, মাধবের মা ঠিক তেমনি ভাবেই আঁচলের খুঁট দিয়া চোখ মুছিতেছেন। ডাক্তার এখনও আসিলেন না। কিছু পরেই মাধবের সংজ্ঞা লোপ পাইল। তাহার মুখ দিয়া তখনও ফেনা বাহির হইতেছে এবং তাহার বুকের মধ্য হইতে একটা বড় গভীর বড় আশ্বাসের স্বর বাহির হইতেছে—নারায়ণ, নারায়ণ!···

কিছু পরেই মাধব স্থির হইয়া আমার বুকের উপর যেন ঘুমাইয়া পড়িল। বাড়ীতে তখন কান্নার রোল উঠিয়াছে। আমার সে অবস্থায় চোখ দিয়া জল বাহির হইল না। আমি তখন মাধবের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। মৃত্যুকে এমন করিয়া মুখোমুখি কোন দিন দেখি নাই। তখনও সে আমার বুকের উপরেই শুইয়া আছে। তাহার বিশাল বক্ষের হৃৎস্পন্দন থামিয়া গিয়াছে কিন্তু আমার কানে যেন এখনও তাহার সেই অসীম রহস্যময় অনুভব, মৃত্যুপথযাত্রীর সেই গভীর আশ্বাসময় সান্ত্বনাময় গাঢ় কণ্ঠস্বর বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে—নারায়ণ, নারায়ণ!

···বাহিরে আবার গোলমাল উঠিল। চাহিয়া দেখি, বাবা এবং সেই তিন জন ভদ্রলোক সদ্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। বাবা সব দেখিলেন, শুধু বলিলেন—আমাকে কেন ডাকিয়া উঠাও নাই?···

সন্ধ্যার সময় মাধব বলিয়াছিল, ভাই কোথাও চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, কোন দূর দেশ—যদি আর না ফিরি। তার পরে সেই সভীর রাত্রেই সে কোন অজ্ঞাতের অভিযানে বাহির হইল। সত্যই সে আর ফিরিয়া আসিবে না।

···ভোরের দিকে মাধবের শবদেহ লইয়া আমরা কয় জন বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই ভদ্রলোক কয় জনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গত রাত্রে তাঁহাদের প্রতি কেমন যেন সন্দেহ হইয়াছিল। যে কুকরিখানা বাহির করিয়াছিলাম, তাহা কাজে লাগিল কি অদ্ভুতভাবে।

···গঙ্গার নীলজলে মাধবের দেহ অন্তর্হিত হইল। সর্পদষ্ট শব পোড়াইতে নাই। সর্পদষ্ট নখীন্দর বাঁচিয়াছিল, আরও কেহ কেহ বোধ হয় বাঁচিয়াছিল, নহিলে এ সংস্কার কেন?

বাবলাবন, খর রৌদ্র, চষা জমি এবং কাঁটাবনের মধ্য দিয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছি। দূরে দীঘির ধারের নারিকেল বন এবং ঘন ঝোপঝাড়ের দিকে চাহিয়া বড় ক্ষুধা বোধ হইল এবং পিপাসাও লাগিতেছে বলিয়া মনে হইল। বাবাকে বড় শুষ্ক এবং বড় মর্ম্মাহত বলিয়া মনে হইল। তবু সাহসে ভর করিয়া বলিলাম—শ্মশানে মনে হইতেছিল জগৎ মিথ্যা, কিছুই কিছু নয়; এখন দেখিতেছি ক্ষুধা বোধ হইতেছে এবং অত্যন্ত জলপিপাসা পাইতেছে।

বাবা একটু হাসিলেন, বলিলেন—আমরা যে বাঁচিয়া আছি!

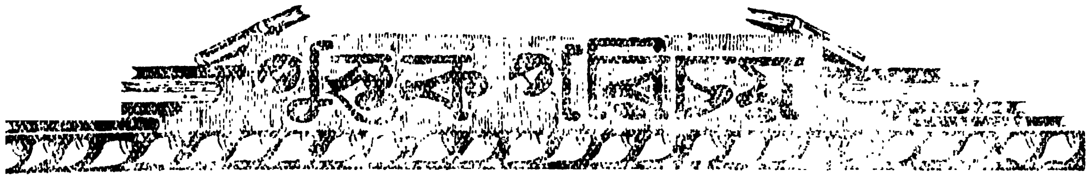
১৭ই ফাল্গুন

শ্রীকল্পিতা দেবী

সকালবেলা একটা কোকিলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল
সে ভাবলে আজকের দিনটি বুঝি ভালই যাবে।
চান ক'রে পরল কুসুম-রঙা শাড়ী
লাল পাড়ের আঁচল ঝুলছে কাঁধের উপর
চাবি বাঁধা—
বড় একটা সিঁদুরের টিপ কপালে, খোলা চুল
মুখের চারি দিকে ঘিরে নেমে পড়েছে থাকে থাকে,
হাঁটুর কাছ পর্যন্ত, কালো রঙের ঢেউ।
দূরে সিন্দুকের উপর ভাঁজ-করা চেলি,
মনে করিয়ে দিল তার বিয়ের দিন,
সেদিন আজ এসেছে এই ১৭ই ফাগুন।
আপিস-পালানো পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে উপরে এল,
আবার দুড় দুড় করে গেল নেমে,
ব্যাগ ভরে নিয়ে গেল নোট দিয়ে।
আজকের দিনের কোনো মানে নেই ওর মনে।
কেবল মনে আছে মোহনবাগানের খেলা।
দীর্ঘনিঃশ্বাস গুমরে উঠল মেয়েটির বুকে,
দাঁড়াল এসে জানালার ধারে।
রাস্তায় খুব ভীড়, ট্রামে লোক ঠেসাঠেসি,
রেলিং ধরে ঝুলছে কত মানুষ বারণ মানছে না।
নানা ট্যাক্সির নানা আওয়াজ
নকশা কেটে চলেছে শহরের বাতাসে।
দেওয়ালে টিক্ টিক্ করছে বড়ো ঘড়িটি
লোকালয়ের বুকের স্পন্দন গুনছে, বৃহৎ সহরের বৃহৎ ভিড়
হঠাৎ বেজে উঠল তিনটে।
মারলে বিরহিণীর বুকে কালের কঠোর আঘাত।

২

অভ্যেস বশে বিকেলে আসন পাতে, সেবার—
আয়োজন করে জলখাবার—
রেকাবির উপর যত্নে গোলাপের পাপড়ি ঢাকা মেঠাই,
নানা রঙের ফল, হাতের কায়দা দিয়ে সাজান,
তারি মাঝে রূপোর গেলাসে সুগন্ধ ঢালা রুরকী,
এক কোণে তবক-দেওয়া মিঠে পান।
এনে রাখল আসনের সামনে,
থালার কিনারা ঘিরে মেঝের উপর
সাদা আলপনা, তার আঙুলের তুলি সাজিয়ে দিয়েছে,
সাধের লতাপাতার রূপ।
সন্ধ্যে হয়ে এল, পাশের বাড়ীতে কনে-চানের উলু পড়ে।
সেখানে আজ কারুর বিয়ে।
তখন খড়খড়ি খুলে দাঁড়িয়ে থাকে পথের দিকে—
কৃষ্ণচূড়ার গাছে লাল ফুলের আগুন জ্বলেছে।
আজ বুঝি দেবিকারানীর অচ্ছুৎ কন্যার সিনেমা
বিজ্ঞাপনীওয়ালা গোরুর গাড়ী রাস্তা দিয়ে চলে গেল
মালী নিয়ে আসে জুঁয়ের গড়ে, চাঁপার তোড়া,
চেলিখানা ছড়ানো আছে খাটের উপর,
ঘরের ভিতর সন্ধ্যের ঘোলাটে আলো, প্রদীপ তখন জ্বলে নি
বাইরে থেকে কচি গলা চেঁচিয়ে বললে, "বৌদি, দাদা
গেলেন সিনেমা, ফিরতে রাত হবে।" ঝনাৎ ক'রে চাবির গোছা
পড়ে গেল মেঝের উপর, শুকিয়ে উঠল তালু।
এখন বাজছে বিয়ের সানাই পাশের বাড়ীতে,
আকাশজোড়া একটি অবিশ্রাম ঠাট্টা
হাঁপিয়ে উঠে সে ব'সে পড়ল মেঝেতে।
ইচ্ছে করল মাথাটা ঠোকে কিছুর উপর।
গোড়ে মালাটা নিয়ে ছিঁড়তে লাগল একে একে
ফুলের পাপড়িগুলো।



ইহলোক ও পরলোক—শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত। প্রকাশক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৬২ এল্, তিলভাণ্ডেশ্বর, বেনারস সিটি। পৃ. ২২০, মূল্য পাঁচ সিকা।

পরলোকের অস্তিত্ব একটা প্রাকৃতজনসুলভ বিশ্বাস মাত্র নয়, এ সম্বন্ধে কঠোর যুক্তিসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণও রহিয়াছে, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে নানা জায়গায় নানা ভাবে প্রেতাত্মার আবির্ভাব গ্রন্থকার দেখিয়াছেন; এবং এই উপলব্ধি হইতে তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "মানুষের দেহত্যাগের পর তাহার আত্মার ও সূক্ষ্ম দেহের নাশ হয় না এবং আমরা চেষ্টা করিলে আবার তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারি এবং তাহাকে দেখিতে পারি" (পৃ. ২২০)।

এই ধরণের বইয়ের সমালোচনার দুইটি দিক্ আছে। প্রথমতঃ, গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় কি ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া তাঁহার লিখন-শক্তির নিন্দা বা প্রশংসা করা চলে। আর দ্বিতীয়তঃ, আলোচিত বিষয় সম্বন্ধেও একটা মত প্রকাশ করা যায়। প্রথমোক্ত দিক্ দিয়া বিচার করিলে এ-কথা সহজেই বলা যায় যে, গ্রন্থকারের ভাষা স্পষ্ট, যুক্তিতর্কের অবতারণা বৈজ্ঞানিক বিচারের অনুগত এবং তাঁহার সিদ্ধান্তও অস্পষ্ট নয়, সুতরাং তিনি প্রশংসার যোগ্য। দ্বিতীয় প্রকারে বিচার করিলে আমরা বলিতে বাধ্য যে এত সব যুক্তিতর্কের এবং প্রমাণের অবতারণার পরও আমরা প্রশ্নটিকে অমীমাংসিত মনে না করিয়া পারিতেছি না। অবশ্যই ইহা ব্যক্তিগত মতের কথা এবং ইহা বিস্তারিত করিতে গেলে সমালোচনা প্রবন্ধের আকার ধারণ করিবে। সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা মাত্র আমরা এখানে উল্লেখ করিতে চাই।

(১) বিজ্ঞানের experiment এর মত seance বা চক্রদ্বারা আত্মা আনয়নের ব্যাপারটা কোন স্পষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তী নয়। চক্রে যে-কোন আত্মা আসিয়া উপস্থিত হয়—কোন অভীপ্সিত আত্মাকে আনা সহজ নয়। অথচ, যে-সব আত্মা আসে তাহারা সর্ব্বত্রই চক্রে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের জানা ভাষায় কথা বলে। সেখানকার কেউ জানে না এমন কোন আত্মা আসে না এবং সেখানকার সকলের অজানা ভাষায় সে কথাও বলে না।

(২) আগত আত্মা এবং চক্রে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কথোপকথন সর্ব্বত্রই একই ধরণের দেখা যায়।

(৩) পরলোকবাসী আত্মারা সেখানকার সংবাদ আমাদের চেয়ে বেশী জানে বলিয়া কোথাও বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। চক্রে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের জানা কথা,—এখানকার কোন অতীত ঘটনার সংবাদ —তাহারা অতি সহজেই দিতে পারে; কিন্তু তাহাদের নূতন বাসস্থানের কথা বড় বেশী বলে না। এই বইয়ে দেখিতেছি (পৃ. ১৪৭), এক আত্মা পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকারের এবং আমাদের অজানা কোন তত্ত্ব দিতে পারেন নাই; বরং শেষটায় অনেকটা হতাশভাবেই বলিয়াছেন, "এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ দিতে পারিলাম না" (পৃ. ১৪৮)।

অবশ্যই কেহ কোন দেশে বাস করিলেই যে দেশের সব সংবাদ দিতে পারিবে, এমন নয়। কিন্তু সে যে সে-দেশে বাস করে এমন প্রমাণ ত দিতে পারিবে? অথচ ওপারের আত্মারা আসিয়া প্রায় সব জায়গায়ই এপারের অতীত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করেন, ওখানকার সংবাদ আমাদিগকে দিতে চান না। এ অবস্থায় তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব, ভাবিবার বিষয়।

অমীমাংসিত এবং বিবাদাধীন বিষয়ে সমালোচকের সহিত গ্রন্থকারের ঐকমত্য সব জায়গায় আশা করা যায় না, এবং তাহা দ্বারা গ্রন্থের মূল্যও নির্দ্ধারিত হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তাঁর বক্তব্য বিষয় গুছাইয়া বলিয়াছেন সুতরাং বইখানা ভালই হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আলালের ঘরের দুলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর। সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭। মূল্য দেড় টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে-সকল পুস্তক আধুনিক বাঙ্গালা ও সাহিত্যের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই ছদ্মনামে রচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহা যে-সময় রচিত হইয়াছিল তাহা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের নবযুগের সন্ধিক্ষণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার পূর্ব্বে যে প্রাচীন রচনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা সংস্কৃতের প্রভাবে দীর্ঘসমাসবদ্ধ ও অলঙ্কার-কণ্টকিত বাগ্রীতির দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া সহজবোধ্য বা সহজসাধ্য ছিল না। তৎকালীন সাহিত্যও ইংরাজী বা সংস্কৃত গ্রন্থের সারসঙ্কলন অথবা অনুবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভাষা ও সাহিত্যকে দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী ও বৈচিত্র্যবিশিষ্ট করিয়া তুলিবার প্রথম চেষ্টার নিদর্শন হইয়াছিল, রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্মিলিত পরিচালনায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, 'মাসিক পত্রিকা' এই সামান্য নামে অভিহিত, একটি স্বল্পায়তন পত্রিকা। এই পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা হইতে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। পুস্তকাকারে ইহার প্রকাশের কাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ লেখকের জীবদ্দশাতেই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান সংস্করণ এই দ্বিতীয় সংস্করণকেই আদর্শ করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে যে সমস্ত মুদ্রণ-অশুদ্ধি ছিল, তাহা প্রথম সংস্করণ হইতে সংশোধিত করিয়া সংশোধন পত্রিকায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত পুস্তকের একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সংস্করণ ছিল না। যে-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাচীন প্রথার সঙ্কীর্ণ পথ হইতে মুক্ত করিয়া, প্রথম সহজ গদ্যের ও সরস সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার যে কোনও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ এত কাল ছিল না, তাহা বাঙ্গালা দেশের মত দেশেই সম্ভব। এই অভাব পূর্ণ করিয়া কৃতী ও সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকের

ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহা যে কেবল মূল আদর্শ অনুযায়ী নিখুঁত ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার ভূমিকায় লেখক ও রচনা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রমাণসহ নিপুণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে এমন অনেক চল্‌তি কথা ও বাক্যবিন্যাস আছে, যাহার অর্থ এখন সর্ব্বজনবোধগম্য নহে; এই সকল অপ্রচলিত ও প্রবাদবাক্যের অর্থ বিশেষ যত্নের সহিত পরিশিষ্টে সংগৃহীত হইয়া এই সংস্করণের মূল্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্করণটি কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই, সাধারণ পাঠকেরও উপকারী ও উপযোগী করা হইয়াছে। পুস্তকটি এখন বাংলা দেশের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে; বর্ত্তমান সংস্করণ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যলভ্য হইয়া, আশা করা যায়, ইহার বহুল প্রচার ও আলোচনার সহায়তা করিবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

উপমা কালিদাসস্য—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্. এ। প্রকাশক শ্রীরাধেশ রায়, রসচক্র সাহিত্য-সংসদ, ২১এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা।

কালিদাসের বিভিন্ন কাব্য ও নাটক-গ্রন্থে সাদৃশ্যমূলক যে সমস্ত অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, বিষয়বস্তু ও কাব্যধর্ম্মের দিক্ দিয়া তাহাদের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। গ্রন্থকারের রচনাশৈলী মনোহর। সমালোচনা-সাহিত্য—বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যালোচনা-বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। কালিদাসের কাব্যের রসগ্রহণে ইহা পাঠকের যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

স্তুতিমালিকা— শ্রীকৈলাসচন্দ্র কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ-ভট্টাচার্য্যেণ বিরচিতা প্রকাশিতা চ। ইটা দর্শন চতুষ্পাঠী। পোঃ পাঁচগাও, জিলা শ্রীহট্ট।

বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকারের স্বরচিত বিভিন্ন দেবতার ছয়টি সংস্কৃত স্তোত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্তবগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে মাধুর্য ও গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

অনূঢ়কন্যাশৌচব্যবস্থানির্ণয়ঃ— শ্রীমৎ কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সঙ্কলিত। ইটা দর্শন চতুষ্পাঠী, পোঃ পাঁচগাঁও, জিলা শ্রীহট্ট।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গ্রন্থকার বিবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণাদি বিচারপূর্বক প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, অবিবাহিতা কন্যা শ্রাদ্ধাধিকারিণী হউন বা না-হউন পিতামাতার মৃত্যুতে তাঁহার পক্ষে পূর্ণাশৌচই পালনীয়। সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম প্রশংসনীয়। প্রতিপাদ্য বিষয় প্রচলিত মতের অনুকূল না হইলেও গ্রন্থকারের দেশাচার হিসাবে প্রসিদ্ধ। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে রঘুনন্দনাদির মতের বিরোধী এইরূপ বহু আচার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থের বহুল প্রচারের ফলে এই সমস্ত আচার আজকাল ক্রমে পণ্ডিতসমাজেও উপেক্ষিত ও অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে। স্মৃতির পণ্ডিতগণ যদি নিজ নিজ অঞ্চলের এই সকল আচারের সংকলন ও সমালোচনকার্য্যে ব্রতী হন তাহা হইলে সমাজের বিশেষ উপকার হইবে—দেশের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ উপকরণ সংগৃহীত হইবে। এই আলোচনার জন্য অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ও সম্যক্ অনুশীলনও অপরিহার্য—একথাও ভুলিলে চলিবে না। কারণ, রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে যে-সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন গ্রন্থের পুঁথি হইতে সেই সকল অংশ সম্যক্ আলোচনা না করিলে সেগুলির বিশুদ্ধি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সর্বত্র নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আশা করি, এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া গ্রন্থকার একখানি বিস্তৃততর ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

খাদ্য-পরিচয়— শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস, বি. এস্‌সি., এম্. ডি. (হিউরণ)। প্রকাশক শ্রীসনৎকুমার দাস, ১৩।১ ফকির চক্রবর্তী লেন, কলিকাতা। পৃ. ৮৬। মূল্য ১।০।

আধুনিক খাদ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণের উপযোগী যতই পুস্তিকাদি লিখিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। শরীরের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের নির্দিষ্ট প্রকার বিধান করা এখন বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, উহার নির্দেশমত চলা কঠিন নয়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে খাদ্যবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সকলের আয়ত্ত করা প্রয়োজন। সাধারণকে উহার সুযোগ দিবার জন্য এই পুস্তিকাখানি লিখিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তবে ইহার ভাষা যদি আরও কিছু সহজ হইত এবং বিষয়বস্তুগুলি আরও ব্যাপকভাবে আলোচিত হইত, তাহা হইলে উহাতে জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

কাব্যগুচ্ছ—শ্রীকুমুদনাথ দাস। প্রকাশক: বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা। পৃ. ৩০৪। মূল্য ২।০।

এই কাব্যগ্রন্থখানি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। এক-এক ভাবের কবিতা এক-এক খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদও আছে। অধিকাংশ কবিতা নীতিপূর্ণ এবং প্রাঞ্জল, কিন্তু রসোত্তীর্ণ নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কামাল পাশা ও নবীন তুরস্ক—মৌলভী আবদুল কাদের। মোসলেম পাবলিশিং কনসার্ণ, ২৫ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৮০।

নবীন তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার অন্যতম ভাস্কর, গাজী মোস্তাফা কামাল পাশা ছিলেন এক জন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তাঁহার জীবনকাহিনী উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক; তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অপরাজেয় মানসিক শক্তি, দেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণ উদ্যম শুধু যে পাঠকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে তাহা নহে, ইহা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। গ্রন্থকার এই মহাপুরুষের জীবনের প্রতি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিপ্লবী কামাল ও বিদ্রোহী কামাল জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছেন; স্বদেশকে য়ুরোপের অন্যান্য রাজ্যসমূহের নিকটে বরণীয় করিবার জন্য কামালের সংগ্রাম গ্রন্থকার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। নব্য তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তাহার প্রথম সভাপতি কামালের বহুমুখী সংস্কারসাধন অতি বিশদভাবে সহজ ও সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ও সমাজের ক্ষেত্রে কামালের সংস্কারচেষ্টা বিস্ময়কর। গ্রন্থকার দুই-এক স্থানে কামালের সমাজসংস্কার-প্রয়াসের

তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ কামালের পর্দ্দাবিরোধকে তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন। অবশ্য, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত মত। কামালের চরিত্রদোষটা এতটা বড় করিয়া তিনি না বর্ণনা করিলেও পারিতেন। এই গ্রন্থ নানা দিক্ হইতে অতি উপাদেয় হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা বেশ সহজ এবং উর্দ্দু কথার প্রাচুর্য্যবর্জ্জিত।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

ভারতের পণ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীকালীচরণ ঘোষ। সরস্বতী লাইব্রেরী, ১।১ বি, কলেজ স্কোয়ার ঈষ্ট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ ও ২৷০। পৃ. ২০৪ এবং ৩১২।

আলোচ্য পুস্তকখানি সুললিত ভাষায় লিখিত, এমন কি অব্যবসায়ী পাঠকও ইহা আগ্রহ সহকারে পড়িতে পারেন। ইহার প্রথম খণ্ডে চাল, ডাল ও নানাবিধ তৈলবীজের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে নানাবিধ তন্তুপ্রদ বৃক্ষ এবং চা, নীল, তামাক প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রতি পদার্থের উৎপত্তি, ব্যবহার এবং আমদানী-রপ্তানির সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে; অতএব সাধারণ পাঠক ভিন্ন ব্যবসায়িগণও ইহার মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট সামগ্রী পাইবেন।

বাঙালীর ভূগোল-সংক্রান্ত জ্ঞান অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিখণ্ডে ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র সংযোজিত হইলে ভাল হইত।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

বাংলার ব্যাঙ্কিং—ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহ, এম, এসসি., পিএইচ. ডি.। পৃ. ১৯৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানির ভূমিকায় গ্রন্থকারকে যথোপযুক্ত ধন্যবাদ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পঁয়ষট্টি বৎসরের পূর্ব্বেকার উক্তি পুনরুল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"যিনি অর্থশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিবেন, তিনি দেশের পরম উপকার করিবেন।"

ডক্টর সিংহের পুস্তকখানি পড়িয়া আমরাও অকুণ্ঠিত ভাবে গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করিতেছি। বাংলা ভাষায় এ যাবৎ অর্থনীতি ও ব্যাঙ্কিং বিষয়ে যে-সব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার তুলনায় ডক্টর সিংহের পুস্তক যেমন তথ্যবহুল তেমনি সুখপাঠ্য হইয়াছে। অতি অল্প কথায় বাংলার ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ পরিস্ফুট করিয়া বর্ত্তমান দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের বিশদ ব্যাখ্যা যেভাবে গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ও ব্যাঙ্ক-পরিচালনায় কার্য্যকরী অভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

আহার ও ধর্ম্ম—কালিকানন্দ স্বামী। প্রকাশক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাশিপুর, বরিশাল। পৃ. ১১৬। মূল্য ।৵০।

অনেকের বিশ্বাস—নিরামিষাহার সাত্ত্বিক ও শাস্ত্রসম্মত এবং আমিষাহার তামসিক ও অশাস্ত্রীয়। লেখক যুক্তি দ্বারা ও বহু শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, উপরোক্ত বিশ্বাস ভিত্তিহীন। আহার্য্য সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকা উচিত নহে। ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাস্থ্যানুযায়ী আহার্য্য নির্দ্ধারিত হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

হিন্দুজাতির পতনের কারণ—শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, মাইজদি, নোয়াখালি। পৃ. ২৪৪। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় স্পষ্ট। আলোচনায় গ্রন্থকার যে সাহস ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য। হিন্দুর তথা ভারতের ইতিহাস বুঝিবার যে নূতন পদ্ধতির অবতারণা তিনি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুর সমাজগঠনে ব্রাহ্মণদের দান এবং দায়িত্ব কতটুকু তাহাও তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; আর তাহা হইতে হিন্দুজাতির বর্ত্তমান অধঃপতিত দশার জন্য দায়ী কাহারা, তাহাও তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ভারত-ইতিহাসের বড় বড় ঘটনার নিষ্পত্তি যে ব্রাহ্মণদের হস্তক্ষেপ ছাড়া হয় নাই, ইহা বোধ হয় সত্য। রামায়ণ এবং মহাভারতের যুদ্ধের জয়-পরাজয় শুধু ক্ষাত্র-শক্তি দ্বারাই মীমাংসিত হয় নাই। যে-পক্ষ ব্রাহ্মণদের সহানুভূতি ও সহায়তা বেশী লাভ করিয়াছিল, অন্তিমে সেই পক্ষই জয়ী হইয়াছিল; এবং সেই জয়ই ধর্ম্মের জয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধির সাহায্যে ক্ষত্রিয়ের জয় আর ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধির নিকট ক্ষত্রিয়ের পরাজয় ভারত-ইতিহাসে বহু ঘটিয়াছে। মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠাও এরূপ ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

আর, ইহাও অসত্য নয় যে, ভারতীয় সমাজ গঠনে ব্রাহ্মণদের প্রচুর প্রভাব ছিল। ইউরোপের মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় সমাজগঠনে যেমন ধর্ম্মাচার্য্যদের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল, তেমনই হিন্দুর সমাজে ব্রাহ্মণেরাও প্রভুত্ব করিয়াছেন। সুতরাং এই সমাজের দোষত্রুটির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে দায়ী করিবার অধিকার ইতিহাসের আছে।

ক্ষমতার অপব্যবহার ইতিহাসে অনেক হইয়াছে, এখনও হয়। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার কখনও কখনও করিয়াছেন, ইহা বলা চলে। আর প্রমাদ এবং অদূরদর্শিতা মানুষের সাধারণ ধর্ম; সুতরাং ব্রাহ্মণেরাও ইহা হইতে মুক্ত ছিলেন না, ইহাও সত্য। ক্ষত্রিয়কে পঙ্গু করিয়া স্ত্রী ও শূদ্রকে তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং আরও নানা ভাবে ব্রাহ্মণ যে অদূরদর্শিতা এবং অনেক সময় যে স্বার্থপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহারই ফলে হিন্দুর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, ইহাই আলোচ্য গ্রন্থের মূল কথা। কথাটা একেবারে অসত্য মনে করিবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু একটা কথা ভাবিবার আছে। মানুষের কাজের ফল যাহা হয়, সব সময়ই মানুষ তাহা ইচ্ছা করে, এমন নয়। সদুদ্দেশ্য লইয়া যে কাজ করা যায়, অনেক সময় তাহার ফলও মন্দ হয়। ভাল হইবে মনে করিয়া অত্যধিক শাসন করিয়া পিতা ছেলেকে শক্তিতে এবং বুদ্ধিতে পঙ্গু করিয়া দিতে পারেন। কাজের ফল মন্দ হইলেও সেটা তাঁহার ঈপ্সিত নয়। বুঝিবার ত্রুটি থাকিলেও পিতার সেখানে কোন নৈতিক অপরাধ নাই। হিন্দুসমাজের দোষত্রুটি সমস্তই ব্রাহ্মণদের কর্ম্মের ফল, ইহা বোধ হয় সত্য নয়। আর যতটার জন্য ব্রাহ্মণদের ক্রিয়া দায়ী, তাহার মধ্যেও সবটাই হয়ত তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। হিন্দুর অধঃপতনের জন্য ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব কতটুকু, তাঁহাদের নৈতিক অপরাধ কতটুকু, আর তাঁহাদের বুঝিবার ভুল কতটুকু—একটু বিস্তৃত অথচ সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

আরও একটা কথা এই যে, ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখিলে উহাতে একটা বিরাট্ ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ অনুমান করা চলে। তখন শ্রেণীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ নিমিত্তমাত্র হইয়া দাঁড়ায়, তাহার কর্ত্তৃত্বটা তত বড় দেখায় না। সে ভাবে দেখিলে ইতিহাস জাগতিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন জগৎ-ব্যাপারের ন্যায় ইতিহাসেও পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ এবং কার্য্যকারণ-পরম্পরা যতটা বিবেচ্য হইয়া পড়ে, দোষগুণের বিচার ততটা নয়। অপরাধ

নির্ণয়ের পর অপরাধীর শাস্তির কথা আসিয়া পড়ে। নিন্দাও এক প্রকার শাস্তি, সুতরাং অপরাধীকে অপরাধী বলিয়া নিন্দা করিলেও তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাসের অপরাধীরা নিন্দা-স্তুতির বাহিরে। কাজেই তাহাদের অপরাধ নির্দ্ধারণ করিয়াও লাভ নাই।

হিন্দুসমাজের বেলায় আরও একটু ভাবিবার বিষয় এই যে, ইহার অধঃপতনের জন্য কাহাকেও অপরাধী সাব্যস্ত করিলেই ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় আবিষ্কার করা হয় না। অথচ শেষেরটিরই আমাদের প্রয়োজন বেশী।

আলোচ্য গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে একটু গতিহীন এবং অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৫৭ পৃষ্ঠার "প্রণব-তত্ত্বে"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলির যে-কোন একটিকে আলাদা করিয়া ধরিলে আপাতঃ অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে। ব্যাকরণের ভুলের কথা বর্ত্তমান প্রগতি-যুগে বোধ হয় না তোলাই ভাল। তথাপি "ষড়াক্ষরী মন্ত্র" (পৃ. ৪) অত্যন্ত কানে ঠেকে।

কিন্তু ভাষার ত্রুটি গ্রন্থকারের চিন্তাকে খর্ব্ব করে নাই। জ্ঞান, সাহস ও চিন্তাশীলতার জন্য তিনি প্রশংসা পাইবেন; আর তাঁহার সমাজহিতৈষণার জন্য তিনি লোকের শ্রদ্ধার যোগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সপ্তদশী—শ্রীপারুল দেবী, শ্রীতুষার দেবী ও শ্রীঅজয় গুপ্ত প্রণীত, এবং কলিকাতা, ১৬৭।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে পাবলিসিটি ষ্টুডিও কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত। পৃ. ৩৫৬+২০। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

"সপ্তদশী" সতেরটি রচনার সমষ্টি। বইখানিতে নূতনত্ব আছে। ছোট গল্প, উপন্যাস ও কবিতা—এই লইয়া সতেরটি রচনা। মুখবন্ধে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার পাঠকসমাজে লেখাগুলির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীঅজয় গুপ্তের লিখিত ভূমিকাটিতে বানান-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাকে প্রবন্ধ বলা চলে। এক খণ্ড বাঁধানো মাসিক পত্র ছাড়া একখানি পুস্তকে এরূপ রচনা-বৈচিত্র্য বড় দেখা যায় না। লেখাগুলির মূল্য বৈচিত্র্যেই পরিসমাপ্ত নয়। তিন ভ্রাতাভগ্নীতে মিলিয়া বইখানি লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ছোট গল্প আটটি শ্রীপারুল দেবীর রচনা। উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন শ্রীতুষার দেবী। কবিতাগুলির লেখক শ্রীঅজয় গুপ্ত। শক্তি ও রুচি অনুযায়ী লেখকলেখিকাগণ পরস্পরের মধ্যে সাহিত্যের এই যে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন তাহার সীমারেখা কেহ অতিক্রম করেন নাই। উপন্যাসখানি উপভোগ্য। নাম "প্রতীক্ষা"। রচয়িত্রী শ্রীমতী তুষার দেবীর আদর্শে অনুরাগ, রচনার পটুত্ব এবং কল্পনায় বৈচিত্র্য আছে। জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এই নবীনা লেখিকার সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষমতা যে অধিকতর পরিপুষ্টিলাভ করিবে তাহার নিদর্শন "প্রতীক্ষা"য় পরিস্ফুট। শ্রীঅজয় গুপ্ত কবিশক্তির অধিকারী। মুখবন্ধ-লেখকের ভাষায়, "কবিতাগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত, তাহাদের ভাব-অর্থের গাঢ়তা ও ভাষার পরিচ্ছন্নতা তেমনই লক্ষণীয়।" বোঝা যায় শ্রীঅজয় গুপ্তের এ চর্চ্চা নূতন নয়। লেখকের নিভৃত কাব্যসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

"মহাপ্রলয়ের বাহিরে দাঁড়ায় আত্মকামী
শান্ত চিত্তে পরম বিত্তে লভিব আমি।"

"বায়ু বহে পুরবৈয়া" নামক নাতিদীর্ঘ কবিতাটি ভাবে ও রূপে সুন্দর ও গম্ভীর। জীবন-সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ ধারণা, ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য ভাবের স্পষ্টতা এবং দরদী অন্তরের আত্মসমাহিত প্রশান্তি কবিতাগুলিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। শ্রীমতী পারুল দেবীর রচনা "প্রবাসী"র পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে। "সপ্তদশী"তে প্রকাশিত আটটি ছোট গল্পই ইতিপূর্ব্বে "প্রবাসী"তে বাহির হইয়াছে। এই শক্তিশালিনী লেখিকা, পূজারিণীর আনন্দপ্লুত আল্পনার মতই সুনিপুণ হস্তে চিত্রাঙ্কন করিয়া যান। সে সৃষ্টি শুধু কল্পনাই নয়, নারীসুলভ অজস্র অভিজ্ঞতা, জীবনের অন্তঃপুরে সঞ্চিত নানা সুখ-দুঃখের বৈচিত্র্য, স্বতঃস্ফূর্ত্ত করুণা, শান্ত সুষমা এবং স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে সে চিত্র মণ্ডিত। তাঁহার ছোট গল্পগুলি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনায়াস ভঙ্গিমা এবং আনন্দময় নবীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাষার স্বচ্ছতা, বর্ণনার অবিরাম গতি এবং কাহিনীর সরসতায় হৃদয়গ্রাহী, "সপ্তদশী"তে প্রকাশিত শ্রীমতী পারুল দেবীর গল্পগুলি কৌতুকের কৌতূহলে স্নিগ্ধোজ্জ্বল নির্ঝরিণীর মতই অব্যাহত প্রবাহে চলিয়াছে। এই অভিনব পুস্তকখানি নানাভাবে উপভোগ্য।

মানস-বিরহ—শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী রচিত, এবং কলিকাতা, ২এ, কুপার ষ্ট্রীট হইতে বাগ্‌চী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

"মানস-বিরহ" কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম "বাস্তবিকা", দ্বিতীয় ভাগ "মানস-বিরহে"র নামেই পুস্তকখানির নাম। হেমচন্দ্র বাগ্‌চী সুকবি। এ পুস্তকে তাঁহার কবিতার সুকুমার ভাবগুলি হৃদয়াবেগে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

"শুনিলাম চন্দ্রালোকে ছল ছল পদ্মার ক্রন্দন,—
ব্যাকুল সর্পিল নদী দিগন্ত-সীমায়!
কি অস্ফুট কালো ভাষা দুই তটে করিছে গুঞ্জন—
সে যেন তোমারি স্বপ্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায়।"

"মানস-বিরহ" স্বপ্ন বা বাস্তবের অন্তহীন বিরোধের আকুল প্রশ্ন।

"তবু সেই স্বপ্ন মোর নহে শুধু অপার সংশয়!"

হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাধাহীন গানে আত্মপ্রকাশ করে।—

"ছন্দে ধরি মানসের লীলাময় সঙ্গীত অবাধ,
সুরে যার গলি' যায় সহস্র হৃদয়।"

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বঙ্গবার্ষিকী ও বাণিজ্য-বিবরণী—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. সম্পাদিত। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বা বাংলা বাজার, ঢাকা। মূল্য বারো আনা, বাঁধাই এক টাকা।

এই বার্ষিকী গ্রন্থে বাংলার জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও খনিজ সম্পদ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কংগ্রেসের ইতিহাস, ভারতশাসন আইন, আইন-আদালত, রেলওয়ে ও ডাকঘর প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় নানা নিয়ম ও সংবাদ, বাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী ও ব্যাঙ্কের তালিকা, বীমা-আইন, বাল্য-বিবাহ দমন আইনের বিভিন্ন ধারা, ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরিচয়, কলিকাতার ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরী প্রভৃতিও সংকলিত হইয়াছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী—শিক্ষা ও বিবিধ। সম্পাদক-সংঘ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষে রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। প্রবাসীর আকারের ১৩+৭৭৬+১০ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট পুরু এণ্টীক কাগজে বড় অক্ষরে সুমুদ্রিত। মূল্য আট টাকা। মলাটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রদ্যোতক একটি আলেখ্য আছে।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এই শেষ খণ্ড প্রকাশিত করিয়া বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতি তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিবেন, এবং সর্বসাধারণের ধন্যবাদ লাভেরও তাঁহারা অধিকারী হইলেন। সম্পাদক-সংঘ এই আত্মপ্রসাদ ও ধন্যবাদের একটি বিশিষ্ট অংশের অধিকারী। "এই পুস্তক মুদ্রণের বিপুল ব্যয়ভার সাহিত্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী ঝাড়গ্রামের জমিদার কুমার নরসিংহ মল্লদেব, বি. এ., মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বহন করিয়া" কীর্তিমান হইলেন এবং সর্বসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইলেন। মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের চেষ্টা ও নেতৃত্বে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতি গঠিত হয়। তিনি কাহারও অপেক্ষা কম আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবেন না, ধন্যবাদও তিনি পাইবার অবশ্যই অধিকারী।

সুসম্পাদিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর এই খণ্ডে আছে, বাঙ্গালার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, জীবনচরিত, বোধোদয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী—প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, নীতিবোধ, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব, বামনাখ্যানম্, নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস, সংস্কৃত রচনা, শ্লোকমঞ্জরী, ভূগোল খগোল বর্ণনম্।

তদ্ভিন্ন, ইহাতে সমিতির সম্পাদকত্রয়, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীপার্বতীচরণ চক্রবর্তী, একটি "বিবৃতি" দিয়াছেন, সম্পাদক-সংঘ যত্ন ও পরিশ্রমসাপেক্ষ একটি "ভূমিকা" লিখিয়াছেন এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত সবিশেষ অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমের ফল বিদ্যাসাগর-গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সম্পাদক-সংঘ তাঁহাদের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্মবিষয়ক বিশ্বাস ও মত সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবাসীতে ধর্মবিষয়ক আলোচনা সাধারণতঃ করা হয় না। এই জন্য এ বিষয়ে কিছু লিখিতে বিরত থাকিলাম।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরেজী ও বাংলা চিঠিপত্র মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে 'গ্রন্থাবলী'র কোনও অঙ্গহানি হয় নাই, কারণ সেগুলি 'গ্রন্থ' নহে। তাঁহারা যদি এই সংগ্রহের নাম 'বিদ্যাসাগর-রচনাবলী' দিতেন, তাহা হইলে চিঠিপত্রগুলিও মুদ্রিত করা অবশ্যকর্তব্য হইত। কিন্তু তাহা না হইলেও সেগুলি প্রকাশ করা আর এক কারণে উচিত। গ্রন্থাবলীর এই খণ্ডে যে বহিগুলি "শিক্ষা" অংশে ছাপা হইয়াছে, সেগুলি বিদ্যার্থীদের নিমিত্ত রচিত পুস্তক, রচয়িতার শিক্ষাবিষয়ক মতামতের বিবৃতি নহে। তাঁহার ইংরেজী চিঠি ও মন্তব্যাদিতে এইরূপ বিবৃতি আছে মনে হয়। অতএব সেগুলি ছাপা উচিত। বাংলা চিঠিপত্রেও তাহা থাকিতে পারে। যে-ভাষাতেই হউক, সার্বজনিক (public) কোন বিষয়ে তাঁহার লেখা সব চিঠিই প্রকাশ করা আবশ্যক।

ঝাড়গ্রামের কুমার নরসিংহ মল্লদেব এই সব চিঠিপত্র প্রকাশেরও ব্যয় নির্বাহ করিলে তাঁহার কীর্তি উজ্জ্বলতর হইবে।

বীর আশানন্দ—শ্রীচণ্ডীচরণ দে। প্রাপ্তিস্থান—নিউ বুক ষ্টল, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য আট আনা।

এই সচিত্র পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত। ইহা তাহাদের খুব প্রিয়; হইবারই কথা। অসাধারণ দৈহিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের বলের পরিচয়ের আখ্যান ছোট বড় সকলেই পড়িতে ভালবাসে। এরূপ আখ্যান পাঠ সবিশেষ সুখকর ও হিতকর হয়, যখন দৈহিক বল দুষ্টের দমন এবং বিপন্নের ত্রাণের জন্য প্রযুক্ত হয়, কিংবা নির্দোষ কৌতুকের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। বীর আশানন্দ তাঁহার শক্তির এইরূপ ব্যবহারই করিতেন।

মা ও খুকু, খুকুর ছড়া, সপ্তবৈচিত্র্য, নাগরদোলা—অধ্যাপক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্ এ.। আশুতোষ লাইব্রেরী। মূল্য যথাক্রমে ।০, ৵০, ।৶০, ও ।৵০ আনা।

এই চারিখানি বহি রচনায়, ছবিতে, ও মুদ্রণপারিপাট্যে শিশুদের সম্পূর্ণ উপযোগী। প্রত্যেকটির পুরু শক্ত মলাটের উপর সুন্দর রঙীন ছবি আছে।

গাছপালার গল্প—অধ্যাপক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্ এ। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য ১॥০।

গ্রন্থকার উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধ্যাপক। তিনি উদ্ভিদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য বাংলা দেশের সাধারণ গাছপালার সাহায্যে অতি সোজা ভাষায় ছেলেমেয়েদের সম্মুখে মনোজ্ঞভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। ছবিগুলি তাঁহার নিজের আঁকা। সেগুলি পাঠকদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও মনোরঞ্জনের সাহায্য করিবে।

এই বইখানি যদিও ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত, তথাপি বড়দিগকেও ইহা পড়িতে সবিনয় অনুরোধ করি। কারণ, আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোক আমরা আমাদের আশপাশের উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ বলিলেও চলে। শিক্ষিতা মহিলাদের এরূপ বহি পড়া ত একান্ত কর্তব্য। পড়িলে তাঁহাদের জ্ঞান বাড়িবে এবং শিশুদের বহু প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা দিতে পরিবেন। বহিখানিতে আছে গাছপালার জন্মকথা, খাদ্য সংগ্রহ, 'প্রাণিহিংসা, ফুল, ফল ও বীজ, বংশ-বিস্তার, আত্মরক্ষা। মলাটের ছবি সুন্দর।

অতীতের কথা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পৃথিবী ও গাছপালা, তৃতীয় খণ্ড জীবজন্তু, চতুর্থ খণ্ড মানব—অধ্যাপক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্ এ। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ১॥০, ১॥০, ও ১॥০ টাকা।

সৌরজগৎ ও আমাদের পৃথিবী কেমন করিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, গাছপালা, 'ইতর' প্রাণী ও মানুষ কেমন করিয়া ক্রম-বিকাশ সূত্রে ধাপে ধাপে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, হেমেন্দ্রবাবু তাহা সোজা ভাষায়, বৈজ্ঞানিক সত্যের কোনও অপলাপ না করিয়া, তাহার বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া, এই তিনখানি বহিতে বিবৃত করিয়াছেন। সুমুদ্রিত রঙীন ও অন্য ছবিগুলি তাঁহার জ্ঞানদানচেষ্টার সহায় হইয়াছে।

বহি তিনখানি বালকবালিকাদিগের জন্য লিখিত এবং তাহাদের উপযোগী, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকবয়স্কদের, প্রৌঢ়দের, ও বৃদ্ধদেরও পাঠযোগ্য—অবশ্য যদি তাঁহারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিতে চান। অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের সেরূপ জ্ঞান থাকিতে পারে, আছে; কিন্তু অধিকাংশের নাই। সেই জন্য, যে কারণে গ্রন্থকারের "গাছপালার গল্প" শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলাদিগকে পড়িতে সবিনয় অনুরোধ করিয়াছি, সেই কারণে এই তিনটি বহিও পড়িতে তাঁহাদিগকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি। ভ.

অপঘাত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে ;
বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূর নদীয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়িবাঁধা বাছুর চলিছে।
রাজবংশী পাড়ার কিনারে
পুকুরের ধারে
বনমালী পণ্ডিতের বড়ো ছেলে
সারাক্ষণ বসে আছে ছিপ ফেলে।
মাথার উপর দিয়ে গেল ডেকে
শুকনো নদীর চর থেকে
কাজলা বিলের পানে
বুনোহাঁস গুগ্‌লি সন্ধানে।
কেটে নেওয়া ইক্ষুক্ষেত, তারি ধারেধারে
দুই বন্ধু চলে ধীরে শান্ত পদচারে
বৃষ্টি ধোওয়া বনের নিশ্বাসে,
ভিজে ঘাসে ঘাসে।
এসেছে ছুটিতে,---
হঠাৎ গাঁয়েতে এসে সাক্ষাৎ দুটিতে।
নব বিবাহিত একজনা,
শেষ হোতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশেপাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদু গন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হোলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে॥

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

কাঠের ব্যবসা

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কাঠের ব্যবসায় অতি বৃহৎ এবং ব্যাপক, উহার একটি অংশ ব্রহ্মদেশীয় সেগুন কাঠই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শিক্ষিত লোক মাত্রেই টীক্ বা সেগুন কাঠের সহিত পরিচিত। উহার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না থাকিবারই সম্ভাবনা। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এদেশে বর্ম্মা টীকের পরিচয় ছিল কিনা তাহা গবেষকদের বিচার্য্য বিষয়। পরবর্ত্তী কালে সরকারী কার্য্যের জন্যই সেগুন কাঠ প্রথম ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রগামী জলযান প্রস্তুত করিতে সেগুন কাঠ সমগ্র পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহে, চট্টগ্রামে সমুদ্রগামী পালের জাহাজ প্রস্তুত করিতে ইহার প্রথম ব্যবহার হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কলিকাতা বন্দরে পণ্য হিসাবে উহার আমদানী আরম্ভ হয়। দেশের রেলবিস্তারে ইহার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন হওয়ায় বাসগৃহ এবং গৃহের আসবাব প্রস্তুত করিবার জন্য সেগুন কাঠের আমদানী আরম্ভ হয়। কলিকাতা বন্দরের আমদানী পণ্যের মধ্যে সেগুন কাঠের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুঁড়িকাঠখানাকে (trunk) কলের করাতে কাটিয়া যে চতুষ্কোণ কাঠ প্রস্তুত হয় তাহাকে এই ব্যবসায়ের পরিভাষায় স্কোয়ার বলে। অবশিষ্ট অংশ হইতে যে সরু-মোটা নানা প্রকার তক্তা প্রস্তুত হয়, ব্যবসায়ের পরিভাষা অনুসারে তাহার নাম scantlings বা কলিকাতায় সাইজ-কাঠ বলিয়া পরিচিত।

পোর্টের আমদানী হিসাবানুসারে ১৯১১ সন হইতে উক্তরূপ স্কোয়ার এবং স্ক্যাণ্টলিং বা সাইজ-কাঠ কত টন আসিয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে। এই টন ওজনের টন নহে। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ৫০ ঘন-ফুট কাঠে এক টন ধরিয়া ব্যবসা পরিচালনা করা হয়।

সন	স্কোয়ার বা চৌকা কাঠ টন	স্ক্যাণ্টলিং বা সাইজ-কাঠ টন	মোট আমদানী টন
১৯১১	২৫৬৯৪	২০৭৯৮	৪৬৪৯২
১৯১২	১৪৬৭৪	২৬৬৯৮	৩১৩৭২
১৯১৩	১৯০৬৮	২০২৩৭	৩৯৩০৫
১৯১৪	২৪১২৯	১৬৪১২	৪০৫৪১
১৯১৫	১২৫৮০	১৪৭৬০	২৭৩৪০
১৯১৬	১৫১৫৮	২০৩৭৫	৩৫৫৩৩
১৯১৭	—	—	৫২৪৩১
১৯১৮	—	—	৬৬০৯২
১৯১৯	২৪৬৫৩	৩১৮৬৬	৫৬৫১৯
১৯২০	৩২৮৪৩	৩২৯১৫	৬৫৭৫৮
১৯২১	২৬২৭৭	২৭১৮৪	৫৪২৬১
১৯২২	১৯৩৩২	২৭০৮৮	৪৬৪২০
১৯২৩	২৭৩৪৫	৩২১৭২	৫৯৫১৭
১৯২৪	১৬৯১৩	২৮৮৮৬	৪৫৭৯৯
১৯২৫	২৯৭১৫	৩৫০৭০	৬৪৭৮৫
১৯২৬	২১৭৫২	২৯৬০৬	৫১৩৫৮
১৯২৭	৩২৩৮৩	৩৫৫৬০	৬৭৯৪৩
১৯২৮	২০৯৫৭	২৮৯২২	৪৯৮৭৯
১৯২৯	১৯৭৩৮	৩২৮৩৩	৫২৫৭১
১৯৩০	১৯৯৬৩	২৬১৭২	৪৬১৩৫
১৯৩১	৯৭৪৮	২২৪৯৫	৩২২৪৩
১৯৩২	২৫২৪	২০৪৬৩	২২৯৮৭
১৯৩৩	৪২২২	২৪৮২২	২৯০৪৪
১৯৩৪	৯৬০৮	৩২৬৩১	৪২২৩৮
১৯৩৫	১২৩০৪	৩৪১৮৭	৪৬৪৯১
১৯৩৬	১৫১১৫	৪০৪৪৮	৫৫৫৬৩
১৯৩৭	১৪৮৬২	৩৫৯৮৬	৫০৮৪৮
১৯৩৮	১৬২৩২	৩৫৮৪০	৫২০৭২

এত দীর্ঘ হিসাব দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে সেগুন কাঠের আমদানীর হ্রাসবৃদ্ধির যে একটা সুসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা দেখান। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ সেগুন

কাঠ কলিকাতা বন্দরে আসিত, ১৯৩৪-৩৫ সালেও তদনুপাতে কাঠ আসিয়াছে। যুদ্ধের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসামান্য সাড়া পড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমদানীও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ১৯২২ সনে ব্যবসায়ে প্রথম মন্দা আসিয়া আমদানীও কিঞ্চিৎ কমিয়া গেল। ১৯২৩ সন হইতে পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আমদানী দেখিতে পাই ১৯২৭ সনে। ১৯২৮ সন হইতে আমদানী কমিতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩২ সনে এমন কমিল যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যবসায়ীদের মহাত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। যেমন বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ের মন্দা একটু কাটিল, অমনি ১৯৩৪-৩৫ সনে সেগুন কাঠের আমদানী তাহার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিল। এই আমদানীর ধারা বিচার করিলে দেখা যায়, যদিও সেগুন কাঠ আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে নয়, তবুও আমাদের জীবন-যাত্রার ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। পুনরায় এই আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া এখন ৫০ হাজার টনের উপর দাঁড়াইয়াছে।

ব্যবসায়ের বিশ্বব্যাপী মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৯২৫-২৬-২৭ এই তিন বৎসরে দেখিতে পাই, গড়ে প্রতি বৎসর তেষট্টি হাজার টনের উপরে সেগুন কাঠ আমদানী হইয়াছে। এই আমদানীর একটা সামান্য অংশ যাহা রেলসমূহ টেণ্ডার আহ্বান করিয়া ক্রয় করে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কোন হাত থাকে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আমদানীর পরিমাণ বার্ষিক ৫০ হাজার টন ধরিয়া লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। রেঙ্গুন এবং মৌলমেন এই দুইটি প্রসিদ্ধ বন্দর হইতেই যাবতীয় সেগুন কাঠ আমদানী হয়। এই দুই বন্দরে যথাক্রমে ১৯৩৮ সনে রপ্তানীর আনুপাতিক অংশ (৩৫৬২৮ ও ১৬৪৪৪ টন) শতকরা ৬৮ ও ৩২। সেগুন কাঠের আমদানী মূল্য প্রতি কিউবিক ফুট গড়ে সাড়ে তিন টাকা বা প্রতি টন ১৭৫৲ ধরিলে ৫০ হাজার টন আমদানী কাঠের মোট মূল্য সাতাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। এই বিরাট ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের করায়ত্ত। অপর সাধারণ ব্যবসা অপেক্ষা কাঠের ব্যবসার বিশেষত্ব এই যে, এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধনের তুলনায় অপরাপর আমদানী ব্যবসা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ লোকের কর্ম্মসংস্থান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্নের ব্যবস্থাও হয়। বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মদেশের অপর পণ্য যাহা আমরা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করি, সেই চাউলের সহিত তুলনা করিতেছি। এক টন চাউল রেঙ্গুন-আগত জাহাজ হইতে নামাইয়া গুদামে রাখিয়া বিক্রয় করিতে বাজারের সাধারণ অবস্থায় প্রতি টনে মাল-খালাসী বাবদ ১৲, গুদামভাড়া বাবদ ॥০, লোকজনের বেতন বাবদ ॥০, মোট ২৲ খরচা হয়, পক্ষান্তরে এক টন কাঠ জাহাজ হইতে নামাইয়া গোলাজাত করিতে খরচ হয় দশ টাকা। নিমতলাতে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের পশ্চিম পার্শ্বের জমি সবটাই কলিকাতা পোর্ট কমিশনারদের। তাহাদের তিন শত কাঠা জমি, প্রতি কাঠা ৩০৲ মাসিক ভাড়া হিসাবে কাঠ-আমদানীকারী মহাজনগণ ভাড়া খাটাইতেছেন। নিমতলার কাষ্ঠব্যবসায়ীদের গৃহীত মোট জমির ইহা এক-তৃতীয়াংশ হইবে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, কেবল নিমতলার ব্যবসায়ীরাই বৎসরে তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা জমির ভাড়া দিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বহু কাঠ জাহাজ হইতে নামাইয়া শালিমার শিবপুর, শালখিয়া, উল্টাডিঙ্গির খালে নানা স্থানে, টালীর নালার ভিতর দিয়া খিদিরপুর, কালীঘাট, চেতলা প্রভৃতি স্থানে নামান হয়। এই সব জমির এবং জমির উপর নির্ম্মিত গুদামবাড়ী প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ এবং ভাড়ার পরিমাণ নির্দ্ধারণ একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। পঞ্চাশ হাজার টন কাঠ জাহাজ হইতে নামাইয়া কেবল মাত্র গোলায় তুলিতেই দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়। কাষ্ঠব্যবসায়ীদের নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা নির্ণয় এবং তাহাদের আয় নির্দ্ধারণের কোন সহজ উপায় নাই, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে কাষ্ঠব্যবসায় বহু লোকের অন্নসংস্থান করিতেছে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৩৭ সনে যেমন ৫০,৮৪৮ টন সেগুন কাঠ আমদানী হইয়াছে, তেমনি আবার ব্রহ্মদেশ এবং আন্দামান প্রভৃতি স্থান হইতে অপরাপর কাঠও ৫২,০৬৯ টন আমদানী হইয়াছে। পরিমাণহিসাবে ইহা সেগুন কাঠ হইতে বেশী, সুতরাং

অধিকসংখ্যক লোকের অন্ন জোগাইতে এই সব জঙ্গলী কাঠের ক্ষমতা কাঠের রাজা সেগুন কাঠ হইতে বেশী। সেগুন কাঠ অপেক্ষা ইহার মূল্য আনুমানিক অর্দ্ধেকের কিছু বেশী হইবে বলিয়া নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণও ন্যূনাধিক ৫০ লক্ষ টাকা হইবে।

কলিকাতা বন্দরে সেগুন কাঠ বার্ষিক গড়ে ৫০ হাজার টন এবং মূল্য ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। কাঠের কাজের আনুষঙ্গিক ব্যয় এত বেশী যে পূর্ব্বোক্ত ৮৭,৫০,০০০ টাকা মূল্যের কাঠ সর্ব্বপ্রকার খরচা বহন করিয়া বিভিন্ন মহাজনদের পাইকারী বিক্রয়ের গোলায় বিক্রয়যোগ্য অবস্থায় পৌছিতে ইহার মূল্য ন্যূনাধিক এক কোটি টাকায় পৌছায়।

সেগুন কাঠের বিক্রয় বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ ধারেই হইত। এখনও শতকরা ৮০ ভাগ ধারে বিক্রয় হয় এবং ২০ ভাগ এক মাসের কড়ারে বিক্রয় হয়। শতকরা ৮০ ভাগ যাহা ৯০ দিনের কড়ারে বিক্রয় হয় তাহারও টাকা আদায় হইতে প্রকৃতপক্ষে গড়ে ছয় মাসেরও অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এইরূপ দীর্ঘ মেয়াদে মূল্য-পরিশোধের চুক্তিতে অন্য কোনও পণ্য বিক্রয় হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই। কাঠের ব্যবসা স্বভাবতই একটু জটিল, তাহার উপর দীর্ঘ মেয়াদের বিক্রয়-প্রথাতে ইহার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। যদি বিক্রীত মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ এক মাসে এবং শতকরা ৮০ ভাগ গড়ে ছয় মাসে আদায় হয় ধরিয়া লই, তাহা হইলে দেখিতে পাই কলিকাতায় সেগুন কাঠের ব্যবসা পরিচালনায় সমষ্টিগতভাবে ৪০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। যদি এই পণ্য নগদ মূল্যে অথবা এক মাসের কড়ারে বিক্রয় করিয়া ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভব হইত, তবে ১৫ লক্ষ টাকার বেশী মূলধন প্রয়োজন হইত না। নিমতলা এবং শালিমারে পাইকারী বিক্রয়কারী মহাজনদের নিকট বাজারের সাধারণ অবস্থায় সাত-আট হাজার টন মাল মজুত থাকে। উহার আনুমানিক মূল্য পনর লক্ষ টাকা। রেঙ্গুন এবং মৌলমিনের করাত-কলের মালিকগণের মধ্যে কেহ কেহ টাকা পরিশোধের নিমিত্ত তিন মাস সময় দেওয়ার ফলেই ধারে বিক্রয়ের প্রথা দাঁড়াইয়াছে। এখন এই প্রথা এমন ভাবে দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, গোলাওয়ালাদের অনেকের বিশ্বাস যে এই ব্যবসায় ধারে ভিন্ন চলিতে পারে না। ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই ধারে ক্রয়-বিক্রয় পছন্দ করেন। সুতরাং যে ব্যবসা সমষ্টিগতভাবে পনর লক্ষ টাকা মূলধনে চলিতে পারিত, তাহার পণ্য দীর্ঘ মেয়াদের মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে বিক্রয় হয় বলিয়া চল্লিশ লক্ষ টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইতেছে। এই অতিরিক্ত পঁচিশ লক্ষ টাকা কাষ্ঠব্যবসায়ী মহাজনগণ কাষ্ঠবিক্রয়ের আড়াল দিয়া দাদন খাটাইতেছেন বলিলে অন্যায় হইবে না। এই পঁচিশ লক্ষ টাকা অপ্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে গোলাওয়ালা, মূলতঃ ক্রেতাসাধারণ,—কম পক্ষে শতকরা দশ টাকা হিসাবে সুদ ধরিলেও আড়াই লক্ষ টাকা এবং ধারে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য যে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আরও আড়াই লক্ষ টাকা—মোট পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মূল্য দিয়া থাকেন এবং ইহাতে কলিকাতা শহরের অংশ আনুমানিক ৭৫ ভাগ। কলিকাতায় বাড়ী করিবার সময় সকলেই প্রায় ধীরে ধীরে সেগুন কাঠ এবং তৎসংক্রান্ত আসবাবপত্রের মূল্য পরিশোধ করেন। এই প্রথায় পণ্যমূল্য আপনা-আপনি বাড়িয়া যায়। সেগুন কাঠের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আনুমানিক মূলধন চল্লিশ লক্ষ টাকার মধ্যে শতকরা দশ ভাগ বাঙালীদের, বাকী ৯০ ভাগ মাড়োয়ারী মহাজনদের।

কলিকাতা বন্দরে বার্ষিক আমদানী সেগুন কাঠ খরচসহ কোটি টাকা যাহা ধরা হইয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ কলিকাতা এবং উহার শহরতলীর নগরসমূহ ক্রয় করে। বাংলা দেশের অভ্যন্তরে ৫ ভাগ বিক্রয় হয়; পাটনা, টাটানগর এবং বিহার প্রদেশের অন্যান্য স্থানে ৫ ভাগ বিক্রয় হয়। যুক্তপ্রদেশের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ এবং দিল্লী ও পঞ্জাবের অংশ শতকরা ১৫ ভাগ। কলিকাতার অংশ ৭৫ ভাগের মধ্যে আরও ১০।১৫ ভাগ খুচরা বিক্রয়ের অন্তর্গত হইয়া তিনটি প্রসিদ্ধ রেলপথ (বি. এন. আর, ঈ. আই. আর, ও ঈ. বি. আর) এবং নদীপথ ছাড়া বাংলা বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, সংযুক্ত-প্রদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

যখন এই এক কোটি টাকার সেগুন কাঠ দেশের সর্ব্বত্র খুচরা বিক্রয়ের জন্য ছড়াইয়া পড়ে তখন নানা প্রকার খরচা বহন করিয়া এবং খুচরা বিক্রয়কারীদের মুনাফা যোগ করিয়া ইহার পণ্যমূল্য সওয়া কোটিতে পৌঁছায়। আমাদের হিসাবে যে অতিশয়োক্তি নাই তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সওয়া কোটি টাকাকে বাৎসরিক আমদানী ৫০ হাজার টন দিয়া ভাগ করিলে দেখিতে পাই প্রতি কিউবিক ফুট সেগুন কাঠের মূল্য গড়ে পাচ টাকা হয়। একটু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে খুচরা সেগুন কাঠ গড়ে পাঁচ টাকার কম মূল্যে বিক্রয় হয় না।

পঞ্চাশ হাজার টন সেগুন কাঠের আমদানী-মূল্য এবং খুচরা বিক্রয়-মূল্যের মধ্যে ব্যবধান হইতেছে সাঁইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার। এই অর্থ নৌকার মাঝি, ঘাটের কুলী, গোলার নিযুক্ত কুলী, গাড়োয়ান, জমির ভাড়া, সাধারণ কর্ম্মচারীবর্গ, পোর্ট কমিশনারদের শুল্ক, দালালী, কমিশন, টাকার সুদ, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার লাভ প্রভৃতি বহুপ্রকার পন্থায় বহু লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সর্ব্বপ্রকারে নিযুক্ত লোকের আয় যদি গড়ে মাসিক পঁচিশ টাকা ধরা হয় তবে সাড়ে বার হাজার লোকের কর্ম্ম সংস্থান করে। যদি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণভাবে থাকিবার খরচা বার্ষিক ৫০০৲ ধরিয়া লওয়া হয়, তবে দেখা যায় যে এই বিরাট্ ব্যবসায় সাত হাজার পাঁচ শত বাঙালী পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ।

কাঠের ব্যবসায়ে যে-সমস্ত কুলীমজুর এবং তাহাদের সরদার এবং ঠিকাদার প্রভৃতি নিযুক্ত হয় তাহারা তুলনায় অন্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত সমশ্রেণীর লোক অপেক্ষা বেশী উপায় করে। একটি সাধারণ কুলীর কলিকাতায় দৈনিক মজুরি আট আনা, কিন্তু কাঠগোলার নিযুক্ত কুলী দৈনিক বার আনা, মাসিক ২০৲ বেতনের কমে পাওয়া যায় না; কারণ কাঠের ব্যবসায়ে তাহাদের নিজস্ব পরিভাষা আছে, যে-সব কুলী উহাতে অভ্যস্ত এবং দামী সেগুন কাঠ যথাযোগ্যভাবে সাজাইয়া রাখিতে সমর্থ তাহাদের আদর বেশী, বেতনও বেশী। শ্রমসাধ্য কার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কাঠগোলার মালিক হইয়াছেন এইরূপ দৃষ্টান্ত কাষ্ঠব্যবসায়ে খুব বিরল নহে।

করাতে কাঠ চেরার কাজ।—সেগুনের চৌকা-গুঁড়ি-কাঠ এবং আমদানী সাইজ-কাঠকে ভিন্ন সাইজে পরিণত করার জন্য করাতী প্রয়োজন হয়। কলিকাতার কাঠগোলায় এবং রাস্তার আশেপাশে কাঠ চিরিতে আমরা প্রায়শঃ দেখিতে পাই; এই কার্য্যে কত লোক নিযুক্ত আছে তাহার মোটামুটি হিসাব আমরা কলিকাতায় আমদানী বা চৌকাগুঁড়ি কাঠের হিসাব হইতে পাইতে পারি। ১৯৩৮ সনে ১৬,২৩২ টন গুঁড়িকাঠের আমদানী হইয়াছে। উহাতে রেলওয়ে কারখানাসমূহে এবং কলিকাতার বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে এই পরিমাণের অর্দ্ধেক। প্রতি এক টন গুঁড়ি হইতে তক্তা চেরাইতে টনপ্রতি পঁচিশ টাকা খরচ হয়। উহাতে বাৎসরিক ব্যয় ২,০২,৯০০ টাকা সাইজ-কাঠ এবং মোটা তক্তা হইতে পাতলা তক্তা পরিণত করিতেও সমপরিমাণ ব্যয় হয়। গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত কচ্ছদেশের লোকেরাই শুধু কলিকাতা নহে, কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র করাতীর কাজ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ইহারা পরিশ্রমে পটু, স্বল্পভাষী এবং কাজে ফাঁকি দেয় না। প্রতিদিন দু-জন লোক (একখানা করাত) চারি টাকা দৈনিক মজুরিতে কাজ করে। ধরিয়া লইতে পারি কলিকাতা বন্দরের আমদানীকৃত সেগুন কাঠ কাটিয়াই ইহারা বাৎসরিক ৪।৫ লক্ষ টাকা উপায় করে। প্রবন্ধলেখক ঢাকা এবং বরিশাল হইতে নমঃশূদ্র করাতী আনাইয়া এই কার্য্যে ব্রতী করাইতে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হন নাই।

কাঠের ব্যবসায়ে লেখাপড়ার কাজে যে-সব লোক নিযুক্ত হয়, তাঁহারা এই ব্যবসায়ের নিজস্ব পরিভাষায় জ্ঞানলাভ করেন বলিয়া তুলনায় অপর ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা বেশী বেতন পাইয়া থাকেন। এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রেই কালক্রমে ব্যবসায়ের মালিক হইয়া থাকেন। কারণ ব্যবসাটি অত্যন্ত জটিল। এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী ব্যতীত

নূতন লোকের পক্ষে অল্প কিছু দিন দেখিয়া শুনিয়া এই ব্যবসায় করায়ত্ত করা সম্ভবপর নহে বলিয়া, মালিক অবসর গ্রহণের সময় পরিশ্রমে অপটু নিজের ঘরের ছেলের অপেক্ষা অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর হাতে ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়া অনেক সময় সঙ্গত মনে করেন।

আমরা দেখিতে পাই গৃহনির্ম্মাণে প্রয়োজনীয় কাঠের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে গড়ে প্রতি ঘনফুট কাঠে দুই টাকা মজুরি আবশ্যক হয়। আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে ন্যূনাধিক তিন টাকা আট আনা মজুরি দরকার। বাস-ট্রাম রেল-ষ্টীমার প্রভৃতিতে ব্যবহৃত কাঠের প্রতি ঘন-ফুটের মজুরিও কম হইবে না। এ-কথা বলা যাইতে পারে যে কলিকাতায় আমদানী ৫০ হাজার টন সেগুন কাঠকে অবলম্বন করিয়া ন্যূনাধিক সত্তর লক্ষ টাকার মজুরির কাজ হয়। এক জন ছুতার-মিস্ত্রীর মজুরি বার্ষিক দুই শত পঞ্চাশ টাকা ধরিলে ২৮ হাজার সূত্রধর এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে বলিতে কোন অসুবিধা হয় না।

সেগুন কাঠ অবলম্বনে যে-সব শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে আসবাব-প্রস্তুত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে-নগরের অধিবাসীর সংখ্যা অন্যূন দশ হাজার সেইখানেই অল্পাধিক পরিমাণে এই শিল্পের ব্যবসায় আছে। কলিকাতায় ইহার ব্যাপক ব্যবহারের সহিত জনসাধারণ এত সুপরিচিত যে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। কলিকাতায় বৌবাজারের প্রায় অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া এই ব্যবসায়ের প্রধান বাজার অবস্থিত, পার্ক ষ্ট্রীটেও আজকাল অনেকগুলি দোকান হইয়াছে। দক্ষিণ-কলিকাতার অভাব মিটাইবার জন্য রসা রোডেও দোকান হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বেও ইণ্টালীতে বহুসংখ্যক শিল্পী এবং ব্যবসায়ী এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ইণ্টালীর একটি পল্লীকে 'খাট মহাল' বলা হইত এবং সমগ্র কলিকাতায় যত আসবাব বিক্রয় হয় উহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ইণ্টালীতে প্রস্তুত হইত। এখন এই সব শিল্পী কলিকাতার নানা স্থানে ও শহরগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাণিকতলা পুলের নিকট বহু শিল্পী বাস করে। তাহারা হাল্‌কা আলমারী প্রস্তুত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ। হাওড়া পঞ্চাননতলাতে বহু ছুতার-মিস্ত্রী সুলভ মূল্যের টেবিল প্রস্তুত করে। ছুতারপাড়ার আশে-পাশে যে কত ছুতার খাটে তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সুদৃশ্য চেয়ার এবং নানা প্রকার কৌচ তৈয়ার করিবার জন্য ফরাসডাঙ্গার খ্যাতি এখনও অটুট, ষ্টীলের ট্রাঙ্ক ও ক্যাশ বাক্স বহুল প্রচলন হইলেও চিৎপুরের বাক্সপটিতে এখনও বহু দোকান আছে। কেবলমাত্র ইলেট্রিকের কেসিং, ক্যাপিং, সুইচ-বোর্ড, বাক্স, ডিষ্ট্রিবিউটর প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য সুপরিচালিত কলকারখানা অন্যূন দশটি আছে। আহিরী-টোলা অঞ্চলে কেবলমাত্র মুখ-দেখা আয়নার ফ্রেম ও ছবির ফ্রেম তৈয়ারী করিবার জন্য ছোটবড় বহু কার-খানা আছে। চাঁদনীর বাজারে প্রচুর পরিমাণে পর্দার রড, বড় ব্রাকেট, স্যাণ্ডেল প্রভৃতি বিক্রয় হয়। বাগবাজারের নিকট খড়ম প্রস্তুতের কারখানা আছে। এতদ্ভিন্ন বহু শিল্পী নিজ বাড়ীতে বা আশেপাশে ছোট কারখানা করিয়া নানা প্রকার আসবাব প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং নিজেরাই আপিসসমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করেন। ছাপাখানা মাত্রেই কাঠের সরঞ্জাম অপরিহার্য্য। র‍্যাক, গ্যালি, কেস প্রভৃতি ছাপাখানার সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য কাঁসারিডাঙ্গাতে বহুসংখ্যক কারখানা আছে।

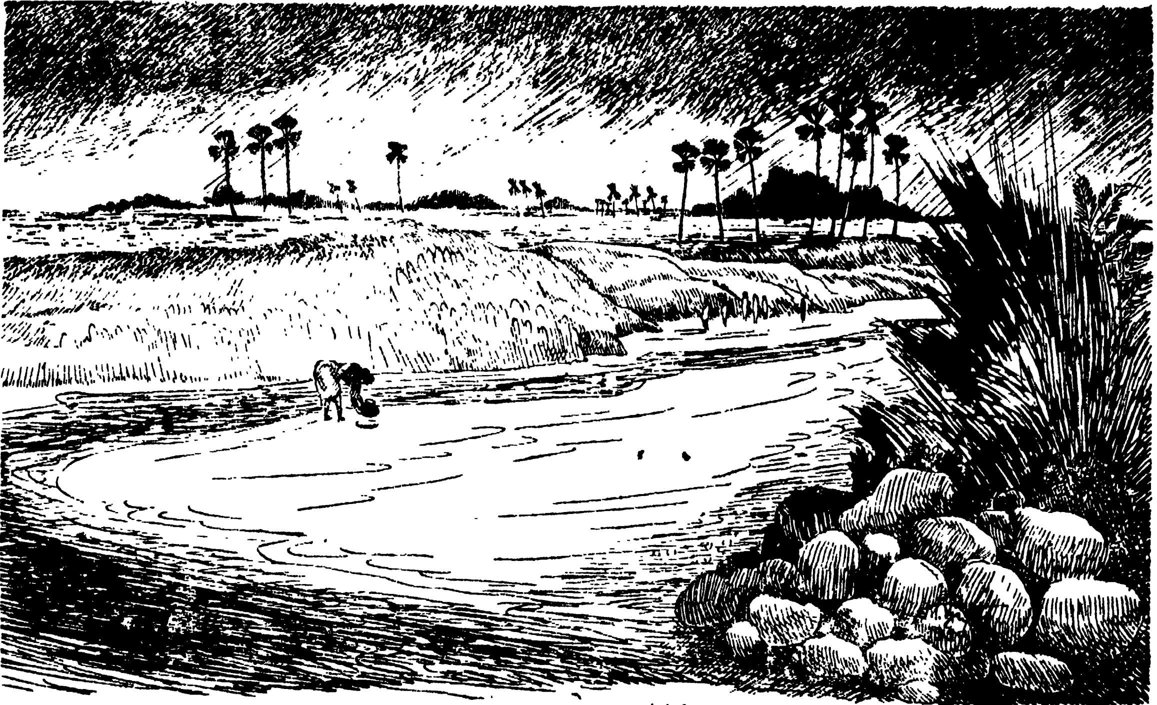
এই ব্যবসায়ের একটি বিশেষত্ব এই যে, যাঁহারা নক্‌শা করিতে পারেন এবং যাঁহাদের মিস্ত্রী খাটাইবার অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা অতি অল্প মূলধনে এই শিল্প অবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন।

সেগুন কাঠকে অবলম্বন করিয়া সূত্রধরদের মধ্যে দুয়ার জানালা ও আসবাব যাহা আমরা প্রায়শঃ দেখিয়া থাকি তাহা ভিন্নও বহু প্রকার কার্য্যে শিল্পী নিযুক্ত হয়; যেমন ঢালাই কারখানার প্যাটার্ণ-মেকার, মোল্ড-মেকার, কাঠ-খোদাই বা নানা প্রকার জীবজন্তুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা, ফুলকাটাই (chiseling), বাটালী দ্বারা সুদৃশ্য লতাপাতা ফুল ও প্রাকৃতিক দৃশ্য কাঠের উপর ছিকয়া দেওয়া। কুঁদের কাজ (wood turning),

গ্রামোফোন এবং রেডিওর বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্যের জন্ম বিশেষভাবে সুদৃশ্য ক্যাবিনেট প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে।

এই সকল কাষ্ঠশিল্পী ব্যতীত অন্য যে-সব শিল্পী সেগুন কাঠকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। প্রথমেই বলা যাইতে পারে পালিশ-মিস্ত্রীর কাজ। সেগুন কাঠের সুদৃশ্য রংটিকে নয়নরঞ্জন রূপে ফুটাইয়া তুলিতে ইহাদের কৃতিত্ব অনেকখানি। এ-কথা না বলিলেও সহজে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে পালিশ বাদ দিলে আসবাবের ব্যবসা অচল হয়। সমগ্র কলিকাতায় বৎসরে কত টাকার আসবাবের কারবার হয় তাহা অনুমান করা সহজ হইবে না। তবে আসবাবের মূল্য মধ্যে শতকরা পনর ভাগ এই কাজে ব্যয়িত হয় বলিয়া এই বৃত্তি অবলম্বনে বহু লোকের অন্নসংস্থান হয়। পালিশের কাজ আরম্ভ করিয়া অনেক চৌকস লোক বহুবাজার অঞ্চলে আসবাব বিক্রয়ের দোকান করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন।

বাঙালীদের এই কাঠের ব্যবসাটি অবলম্বনের পক্ষে অনেক সুবিধা আছে। সেগুন কাঠকে অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু প্রস্তুত হয় তাহার শতকরা নব্বুই ভাগ কুটীরশিল্প। বাকী দশ অংশে অবশ্য ইলেকট্রিসিটি এবং আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তবে তাহাও আমাদের সহজ আয়ত্তের মধ্যে।



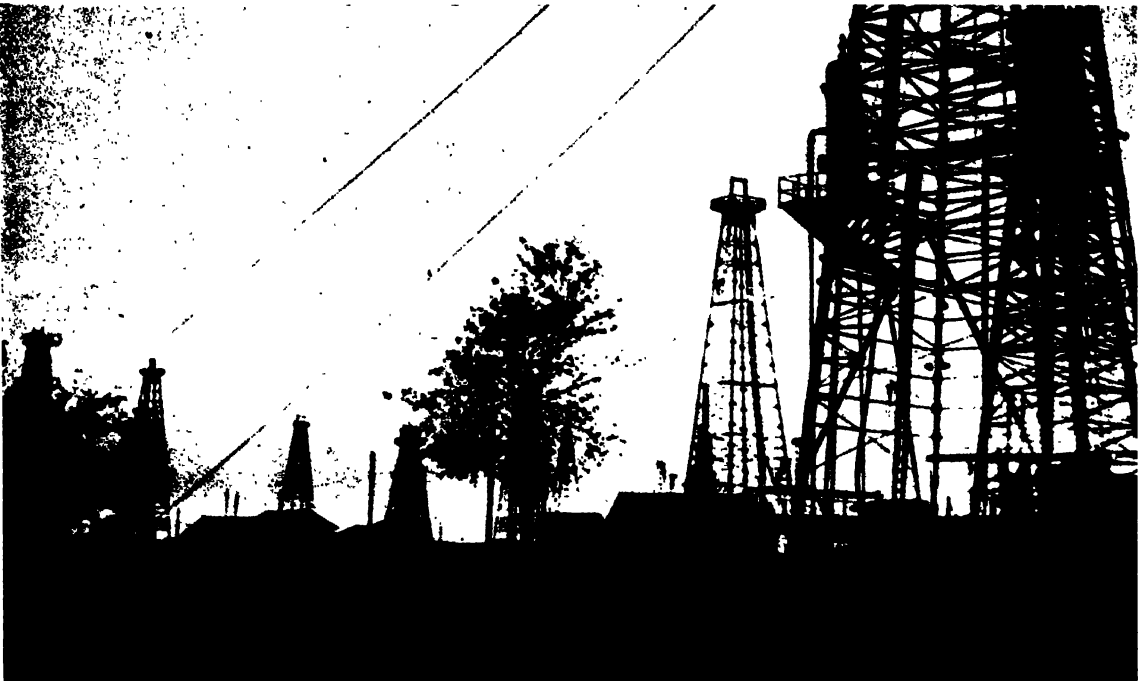
বর্ষা



রুমানিয়া। কৃষ্ণসাগরের উপকূলে কন্‌স্টান্টা বন্দর। পেট্রল-ট্যাঙ্ক দেখা যাইতেছে।

বুকারেষ্টের উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশে পেট্রল-প্রধান অঞ্চল

রুমানিয়ার একটি বিশাল পেট্রল-পরিষ্করণ কারখানার দৃশ্য



রুমানিয়ার একটি পেট্রল-কারখানা—সায়ংকালীন দৃশ্য

বাবুইহাটীর সাধু

শ্রীবিমল সেন

দীর্ঘদিনের পর দেশে ফিরিতেছি, তাই দেখি ঘাটে বহু লোকের ভিড়। ঐ ত সব ছেলেবেলার বন্ধুরা—ঐ ত সিতু দাশ, নেহু গাঙ্গুলী, টুনু রাহা…আর, ঐ যে আমার নিকটতম বন্ধু, নিমে রায়। চেনা-অচেনা আরও অনেকে বসিয়া।

কিন্তু সকলেই নীরব। চোখে তাহাদের তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এবং সে দৃষ্টি আমারই প্রতি নিবদ্ধ। যেন, মনে মনে বলিতেছে—খবরদার, প্রথমেই কাছে ভিড়িয়া নিজের মানের হানি করিও না; আগে যাচাই করিয়া লও, লোকটা বিদেশী-ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে কি না। তার পর কথা কহিও।

আমি অত শত বুঝিয়াও বুঝিলাম না। নিমে রায়কে দেখিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া, ছুটিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং এত দিনের অভ্যাস-মত তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিলাম—কি রে নিমে!…চিনতে পারিস?

নিমে ব্রীড়ানম্রা কিশোরীর মত মাথা নত করিয়া মুচকি হাসিতে লাগিল। কোন কথা কহিল না।

তাহার নিকট হইতে সাড়া না পাইয়া, একে একে অন্যান্য সকলের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে লাগিলাম।

—কি সিতু…নেহু…টুনু, ভাল আছ ত সব?

তাহারাও অস্ফুট কণ্ঠে কি যে বলিল, বোঝা গেল না।

আমার প্রতি ছেলেবেলার বন্ধুদের এই আচরণ একেবারেই নূতন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেও বাংলা দেশের বাহিরেই থাকিতাম। কিন্তু বৎসরে দুই-তিন বার যখনই দেশে ফিরিয়াছি এবং ইহাদের সহিত দেখা হইয়াছে, তখনই কেহ হয়ত ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে; কেহ পিঠের উপর ভীষণ এক ঘুসি বসাইয়া দিয়া সম্ভাষণ জানাইয়াছে; কেহ আবার অতি নিন্দনীয় এক সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া সম্বোধন করিয়াছে। যাহারা আমার এত আপনার বন্ধু, দীর্ঘদিনের অদর্শনে তাহারা এত দূরেই সরিয়া গেল?

অগত্যা আবার নিমের কাছে গিয়া বলিলাম—এ কি, আমার সঙ্গে কথা কইবে না নাকি তোমরা? না, সত্যি সত্যিই চিনতে পারছ না?

নিমে এবার কথা কহিল, তেমনি সসঙ্কোচ ভাব—আমরা আর চিনতে পারব না কেন? তোমার পায়া নিয়েই কথা—সায়েব মানুষ!

বলিলাম—আমি ত ভাই চিনতে পেরে আগেই তোমাদের সঙ্গে কথা কয়েছি। তোমরাই যে দেখছি সাড়া দিতে চাও না।

নিমে বলিল—ভয় করে যে! হয়ত 'এটিকেট'-এর খেলাপ কিছু ব'লে বসব, আর তুমি 'অফেন্স' নেবে।

সিতু, নেহু, টুনু এবং আরও জনকয়েক নিমের এ-কথায় চাপা হাসি হাসিল।

ব্যাপার বুঝিলাম। ভারতের মাটিতে পা দিবার পর হইতেই দেখিতেছি, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য পরিচিত লোকেরা দেখা হইলেই 'সায়েব' বলিয়া খোঁটা দিয়া পুলক অনুভব করিয়া থাকেন। নিতান্ত অনাবশ্যক এবং মিথ্যা ঐ খোঁটায় ব্যথা পাইয়াছি। কারণ, মনের দিক দিয়া—এবং বাহিরের দিক দিয়াও—কোন প্রকারেই আমাকে সে অপবাদ দেওয়া চলে না।

তাই নির্ম্মলের কথা শুনিয়া এবং অন্য সকলকে হাসিতে দেখিয়া, তাহাদের আর অধিক না ঘাঁটাইয়া বলিলাম—আমি সায়েব-টায়েব কিছুই হই নি ভাই। ও তোমাদের ভুল ধারণা…যাক্, দু-দিনেই বুঝতে পারবে।—বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

বাড়ীতেও অনেক লোক। গ্রাম ঝাঁটাইয়া আত্মীয়-কুটুম্বেরা সকলে জড় হইয়াছেন। তাঁহাদের চোখেও

কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি। যেন আজব এক জন্তু ধরিয়া আনা হইয়াছে, তাহাই দেখিতে আসিয়াছেন।

বয়োজ্যেষ্ঠ সকলকেই গড় করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া কুশল প্রশ্ন করিলাম। আত্মীয়েরা প্রায় প্রত্যেকে একই ধাঁচের জবাব দিলেন—আর বাবা, আমাদের থাকা না-থাকা সমান। কোন প্রকারে মরে বেঁচে আছি।... আমার 'অমুক' যে আমাকে একেবারে ধনে-প্রাণে মেরে রেখে গেছে, বাছা। ভাবি, এত লোকে ত যায়, পোড়া আমাকেই কি যম চোখে দেখতে পান না?

বলিয়া, হয়ত আট বৎসর পূর্ব্বে চলিয়া-যাওয়া 'অমুকে'র শোকে নূতন করিয়া কিছু অশ্রুজল ব্যয় করিয়া, তাঁহার যে কেন এখনও মরণ হইতেছে না, সেই মহাশ্চর্য্য ব্যাপারের জন্য আর এক বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া, শেষে প্রশ্ন করিলেন—তুমি ভাল আছ ত, বাবা?

ইহাই যেন দেশের নিয়ম। সর্ব্বত্র ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। কিছু দিনের অদর্শনের পর, দেখা হইলেই আত্মীয়েরা বহুদিন পূর্ব্বেকার শোকতাপগুলি ঘাঁটাইয়া বাহির করিয়া প্রথমেই একচোট কাঁদিতে বসেন। এত দিনের পর, মনে কত আনন্দ, কত উৎসাহ লইয়া যাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি, তিনিই ঐ ভাবে আলাপ সুরু করিয়া মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তার পর চলিয়াছে অভাব-অনটন রোগ-পীড়ার সেই একঘেয়ে কাহিনী। দেখা করিবার আনন্দ এক মুহূর্ত্তে উধাও হইয়াছে; প্রাণ পালাই পালাই করিয়াছে।

অভাব-অনটন, রোগ-শোক যথেষ্ট পরিমাণে আছে জানি। তবু আমরা যেন ঐ সবগুলিকে বুকের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতেই ভালবাসি। দুঃখ-শোক একটু না করিলে যেন ভাল লাগে না। সেই জন্য অনেক সময়ে বিনা কারণেও বহু লোককে বলিতে শুনি—আমার আর ক-দিন! এবার যেতে পারলে বাঁচি।

তাই ভাবি, অভাব এবং রোগ-শোকই কি আমাদের মনের এই বিষম দৈন্যের জন্য ষোল আনা দায়ী? না, ইহা চরিত্রগত দোষে দাঁড়াইয়াছে?

যাক্ সে-কথা। জ্যেষ্ঠদের প্রণামাদি সারিয়া দেখি, এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে আমার সমবয়স্ক দূর-সম্পর্কীয়া এক পিসি। শীর্ণ, কঙ্কালসার দেহ, ফ্যাকাশে চেহারা, যেন সাত বুড়ীর এক বুড়ী। তবু দেখিয়াই চিনিলাম। সানন্দে কাছে গিয়া বলিলাম—আরে, খেঁদু যে! তুই যে দেখছি একেবারে দিদিমা হয়ে গেছিস!...ভাল ত?

খেঁদুর মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল—কই, আমাকে বুঝি একটা পেন্নামও করতে নেই?...আর ছেলেপুলের সামনে তুই আমাকে ঐ নামে ডাকলি?

কথা শুনিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়াই তাড়াতাড়ি প্রণামটা সারিয়া লইলাম। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আমার কাছে আর কিছু ছিল না। সে-ই খেঁদু—বয়সে আমার অপেক্ষা হয়ত দুই-এক মাসের ছোটই হইবে; ছেলেবেলায় যাহার সহিত সর্ব্বদা খেলা করিয়াছি, প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে তাহার সহিত যখন শেষ বারে দেখা হইয়াছিল, তখনও সুযোগ পাইলেই চুলের মুঠি ধরিয়া পিঠের উপর বেপরোয়াভাবে ঘুসি বসাইয়াছি—তাহাকেই আজ প্রণাম করি নাই বলিয়া সে ত্রুটি ধরিল!

* * *

সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। ইহার পূর্ব্বে যখনই দেশে আসিয়াছি, বাড়ীতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা আসিয়া আড্ডা জমাইতে বসিয়াছে। গুরুজনদের প্রণাম করিবার অবসরটুকুও হয়ত মেলে নাই। এবার সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইল দেখিয়া নিজেই বাহির হইলাম দেখা-সাক্ষাৎ করিতে। সকলে আমাকে মস্ত বড় সাহেব মনে করিয়া এড়াইয়া চলে। এ ভুল ধারণা আমাকে ভাঙিতেই হইবে।

গ্রামের বড় রাস্তা ধরিয়া যাইতেছিলাম। পূর্ব্ব-পরিচিত যাহা কিছু দেখি, তাহাই যেন দুই হাত দিয়া বুকের উপর আঁকড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। ঐ ত পোষ্ট আপিস। পোষ্ট আপিসের পরই সরকারী ডাক্তারখানা। তাহার পর বাজার। সেই বাজারের ঠিক মাঝখানে, নদীর তীরে গ্রামের শ্মশান। পুব-পাড়ার নন্দ বামুনী সেই দিনই কলেরায় মরিয়াছে শুনিয়াছিলাম। তাহারই হাড় ক'খানা সেখানে পুড়াইয়া শেষ করা হইতেছিল। বাজারের দোকান এবং নিকটস্থ বাড়ীগুলি চিতার ধোঁয়ায়

ভরিয়া গিয়াছে। গ্রামের ঘিঞ্জির ভিতর—এমন একটি বিশিষ্ট স্থানে—ঐ কুব্যবস্থাটি আজও তেমনি চলিতেছে। 'বহুকেলে পুরনো' শ্মশান যে!

শ্মশানের দুই পাশে দুইটি বড় ঘাট। মেয়েরা কলসীতে ক'রিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। নদীর জলে, শ্মশান হইতে পোড়া কাঠ, এবং নন্দ বামনীর ব্যবহৃত ছেঁড়া কাঁথা, বালিশ প্রভৃতি ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু জলে ঢেউ খেলাইয়া, সেগুলি একটু তফাতে ভাসাইয়া দিয়া, সকলে গা ধুইয়া, জল তুলিয়া ঘরে ফিরিতেছে। আঁৎকাইয়া উঠিলাম। সর্ব্বনাশ! কলেরার রুগী ছিল না?

কিন্তু পরক্ষণেই চোখে পড়িল—সামনের অন্য ঘাটে এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া আমাদের গ্রামের পরম শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধ রাম ভট্চায দুই হাত জোড় করিয়া, গদ গদ কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে বলিতেছেন—ওমা শ্মশানকালী, করুণাময়ী, তারা, মাগো!—এই ত সেদিন গ্রাম ঝেঁটিয়ে এতগুলোকে নিয়ে গেলি, আবার এরই মধ্যে তোর রুদ্র মূর্ত্তি কেন?…রক্ষা কর, মা, তোর ও রূপ আর দেখাস্ নে। তুই যে পতিতপাবনী, কল্যাণময়ী মা! সেই রূপেই আয় মা বিপদহারিণী! গ্রামটাকে আর ধ্বংস করিস নে।

বলিয়া, জলে-ভাসিয়া-আসা নন্দর চিতার একখানা পোড়াকাঠ আরও একটু দূরে ভাসাইয়া দিয়া, তিনি ক্রমাগত ডুব দিতে লাগিলেন।

গ্রামে বৎসরের প্রথম কলেরা দেখা দিয়াছে। তাই বুঝি এ আয়োজন। সে ঘাটে আরও অনেকে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণের করুণ আরাধনা শুনিতেছিলেন। ভক্তিরস চারি দিক হইতে একেবারে যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। আমিও বিভোর হইয়া দেখিতেছিলাম। একটু পূর্ব্বে যে ভয়ে প্রাণ আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। আনন্দে আপ্লুত হইয়া মনে মনে বলিলাম—আর ভয় কিসের? ঐ পুণ্যশ্লোক রাম ভট্চায যখন এত নিষ্ঠার সহিত এমন কাতর ভাবে স্তব করিতেছেন, তখন নিশ্চয় শ্মশানকালীর মন গলিয়া জল হইয়া যাইবে। বাবুইহাটী এবার নন্দনকানন না হইয়া যায় না। আহা-হা, এই জন্যই ত বলি, সোনার বাংলা!… সোনার বাবুইহাটী!

—বলি, বিলিতি ডাক্তার বাবাজি, চল্লে কোথা?

চমকিয়া চাহিয়া দেখি, এরই মধ্যে পাঁচ-সাতটি চেনা-অচেনা লোক আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং তাহাদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া তারিণী চক্কোত্তি মহাশয় আমাকে সম্বোধন করিতেছেন। তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া, জবাব দিলাম—এই, একটু বেরিয়েছি; সকলের সঙ্গে দেখা-শুনো—

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া চক্কোত্তি বলিলেন—বেশ, বেশ, এত দিন বাদে দেশটাকে যে মনে পড়ল—তাই আমাদের ভাগ্যি।…ডাক্তার হয়ে এসেছ শুনেছি। তা দেখ, আমার মেয়েটার কাল থেকে পেট নাবাচ্ছে। তাকে একবারটি গিয়ে দেখে আসতে হবে কিন্তু বাবাজি।

বলিলাম—নিশ্চয়ই যাব। খাওয়া-দাওয়ার কোন অনিয়ম হয়েছিল নাকি?

—নাঃ, অনিয়ম ত কিছুই হয় নি। পরশু ছিল একাদশী। সারাদিন উপোস ক'রে রাত্রে কাঁটাল আর আম দিয়ে দুটি চিড়ে খেয়েছিল—এ-ই। তার পর থেকে আজ এই অবস্থা। আবার দু-বার বমিও হ'ল।…যেও কিন্তু; দেখে-শুনে ভাল একটা বিলিতি 'পেস্‌কিপ্‌শান্' লিখে দিও।

অদূরে নন্দর নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতার দিকে চাহিয়া আর একবার শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম—আচ্ছা, আমি ফেরবার পথে দেখে যাব।

তাহার পর, বাজারের ঐ পথটুকু অতিক্রম করিতে গিয়া যাহার সহিত দেখা হইয়াছে, সে-ই গৃহে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। বাড়ীতে অসুখ। অধিকাংশরই পেটের গোলমাল, না হয়, ম্যালেরিয়া, নয়ত 'থাইসিস'। যে ক'টি দিন গ্রামে ছিলাম, একটিও সুস্থ লোক দেখি নাই। পথে-ঘাটে যখনই যাহার সহিত দেখা হইয়াছে, সাম্‌নে ডাক্তার পাইয়া অম্‌নি যেন তাহাদের নিজেদেরও কোন-না-কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

যাক, সকলকেই যাইবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। না দিয়া উপায় ছিল না। গ্রামের লোক, অনেকে

আবার গুরুজনস্থানীয়। আপত্তি করিলে খারাপ দেখায়।

বাজার ছাড়াইয়াই নিমে রায়ের সহিত দেখা। হাতে ঔষধের তিনটি শিশি। ব্যস্তসমস্ত হইয়া চলিয়াছে। বলিলাম—কি হে নির্ম্মল! তোমার বাড়ীতেই যাচ্ছিলুম।

নির্ম্মল বলিল—আমি যে একটু বেরিয়েছি, ভাই। ডাক্তারখানায় যেতেই হবে।

—কার অসুখ?

নির্ম্মলের কিশোরী ভাব তখন আর ছিল না। তড়াক করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আঙুল গুণিয়া বলিল—শোন, বলি—বড় মেয়ের আমাশা; মেজটির সারা গায়ে ফোড়া; সেজ আর তার পরেরটির দু-দিন থেকে পেটের অসুখ; সবার ছোট ছেলেটাও আজ থেকে রিহার্সে'ল দিতে আরম্ভ করেছে—তাদের মা আর একটিকে পেটে নিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন, তাঁর মুখ ফোলা, হাত-পা ফোলা; অ্যানিমিয়া, না, অমনই আর কোন্ এক 'মিয়া' এসে স্কন্ধে ভর করছেন; মা'র জর; বাবার বাতের অসুখ; ছোট ভাইয়ের লিভার খারাপ—হজম হয় না; বাড়ীর চাকরটা বোধ হয় শীগ্‌গির মরবে—ঐ আমাশা···

বলিয়া যেন দম লইয়া আবার বলিল—বাকি রইলুম আমি।···এই সব দেখেশুনে আমার দেখা দিয়েছে হার্টের ব্যারাম। বুক ধড়ফড় করে, উঠতে বসতে চোখে অন্ধকার দেখি।

দুঃখিত হইয়া বলিলাম—ভারি বিপদে পড়েছ ত!

—বিপদ বইকি।···তবু এই ত সংসার।

একটু থামিয়া বলিল—তুমি আজ এলে; আজই আর ধ'রে নিয়ে গিয়ে রুগী দেখাতে চাই না। ডাক্তারখানা থেকেই ওষুধ নিয়ে আসি গিয়ে। কাল কিন্তু ভাই সকালে এক বার—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই; এ-বেলা তা হ'লে আর যাব না।

—সেই ভাল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার তা হ'লে উপস্থিত চারটি ছেলেমেয়ে?

—হ্যাঁ, ভাই। অন্নবস্ত্র জোটে না বটে, কিন্তু মা-ষষ্ঠীর কৃপা সকলের উপরই আছে। বন্ধুদের ভিতরই দেখ না; টুনু রাহার চারটি, নেড়ু গাঙ্গুলীর পাঁচটি, আর সিতু দাশ সবার উপরে—আটটি।

অবাক হইয়া বলিলাম—বল কি হে? তোমরা যে দেখছি এক-এক জন প্রবীণ ব্যক্তি।

নির্ম্মল বোধ হয় এ কথায় কান না দিয়া বলিল—আর দেখ গিয়ে, প্রত্যেকের বাড়ীতে অন্ততঃ তিনটি ক'রে সর্ব্বদা অসুখে ভুগছে।···তুমি বেশ আছ ভাই। এখনও বিয়ে-থা কর নি—আমাদের বাংলা দেশে ও যে কি মজা, তা বুঝতে পারবে না।···আচ্ছা, আসি তা হ'লে, কাল যাব সকালে।

নির্ম্মল চলিয়া গেল। সত্যই তো ইহারা চারটি-পাঁচটি-আটটি সন্তানের জনক হইয়া ঘোর সংসারী এবং বুড়া হইয়া গিয়াছে। অথচ, আমি অবিবাহিত; মনের দিক দিয়া এখনও তরুণ যুবা। আমার সহিত ইহাদের আর খাপ খাইবে কেন? তাহাদের আর আগের মত একটানা আড্ডা দিবার সময় কোথায়? পূর্ব্বে কখনও কখনও মনে দুঃখ হইত, জীবনের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইয়া গেল, এখনও বিবাহটা অবধি করিলাম না। সবই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

কিন্তু আজ বার-বার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতে লাগিলাম—ভগবান্, আমার প্রতি অশেষ করুণা করিয়াছ—তাই আজও মতিচ্ছন্ন হয় নাই। সাতটা-আটটা সন্তানের জন্ম দিয়া, অসুখে-বিসুখে, অভাবে-অনটনে পাগল হইয়া বেড়াইতে হইতেছে না। সংসারের স্বর্গসুখ আমার মাথায় থাকুক, লোকে কাপুরুষ বলে বলুক—কিন্তু সাধ করিয়া ঐ দিল্লীকা লাড্ডু খাইবার মোহ যে পাইয়া বসে নাই, সেজন্য ভগবানকে কোটি কোটি ধন্যবাদ!

* * *

বন্ধুদের সহিত সেদিন আর দেখা করিব না স্থির করিয়া সোজা হাঁটিয়া চলিলাম। তবু এক জনের সহিত দেখা করিবার জন্য আমার সারা মন আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। কিন্তু নানা সঙ্কোচের বাধা এড়াইতে না

পারিয়া, তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া হাঁটিয়া গেলাম—ভিতরে প্রবেশ করিতে ভরসা হইল না।

—কাকাবাবু।

রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া, একটি চোদ্দ-পনর বৎসরের বালক আমাকে ডাকিল। অনেক ঠাহর করিয়া দেখিয়াও আমার পরিচিত কোন ভাইপো বলিয়া চিনিতে না-পারিয়া বলিলাম—আমাকে ডাকছ ?

ছেলেটি বলিল—হ্যাঁ, পিসিমা আপনাকে ডাকছেন।

—তোমাকে যে চিনতে পারলুম না হে।

সে চিনাইয়া দিল—আমি উপেন সেন—শ্রীযুক্ত ভবানী সেনের ছেলে।

তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলাম। উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম—ও, ভবানীদার ছেলে তুমি? এত বড়টি হয়েছ! চল, চল, দেখা ক'রে আসি। আমি যে এসেছি, তা তোমার পিসিমা এরই মধ্যে টের পেয়েছেন ?

উপেন বলিল—তিনি জানলা দিয়ে আপনাকে যেতে দেখলেন কি না।

বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতেছিল। সাধনা নিজেই আমাকে স্মরণ করিয়াছে? এত কালের পর, দূর হইতে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছে? আশ্চর্য্য!

বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত খেঁদু পিসি আর এই সাধুই ছিল আমার খেলার সাথী। গ্রামে আসিলেই ছুটিয়া যাইতাম তাহাদের খোঁজ লইতে। পুরুষ বন্ধুরা তখনও পিছনে পড়িয়া ছিল। ঠাকুর্দ্দা মধ্যে মধ্যে দাঁত খিঁচাইয়া বলিতেন—সারা দিন ওদের সঙ্গে তোর কি খেলা রে ?

ঠাকুমা কাছে থাকিলে জবাব দিতেন—তা বুঝি জান না? বাবু যে ঐ সাধুকে বিয়ে করতে চান।

সত্যই সাধুকে ভালবাসিতাম। আমার বয়স যখন কুড়ি এবং সাধুর উনিশ, তখন তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিলাম। দ্বিধা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া এক দিন ঠাকুর্দ্দাকে এ-কথা জানাইতেই তিনি আবার দাঁত খিঁচাইয়া বলিয়াছিলেন—ও যে তোর প্রায় একবয়সী রে মুখ্যু! তোর মাথার সমান। ওকে বিয়ে করলে যে—

বলিয়া, ঐ ধিঙ্গী মেয়েকে বিবাহ করিলে আমাকে কি কি বিপদ এবং দুর্ঘটনার ভিতর যে পড়িতে হইবে—তাহা অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—ও-সব খেয়াল ছাড়, বাবু।

আমার চোখে দুনিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। দুই দিন অন্ন স্পর্শ করিলাম না; ঘরের বাহির হইলাম না; মনে মনে স্থির করিলাম—বিবাগী হইয়া যাইব; বাহিরে জানাইলাম আত্মহত্যা করিব।

কিন্তু সে সত্যাগ্রহের ফলে লাভ হইল এই যে, আমাকে গ্রাম ছাড়িতে হইল, দুই বৎসরের ভিতর আর ফিরিবার অনুমতি পাইলাম না। তার পর, যথাসময়ে সাধু ও খেঁদুর বিবাহ হইয়া গেল; এবং বিবাহের এক মাস যাইতে না যাইতেই সাধু আবার ফিরিয়া আসিল বাপের বাড়ী—বিধবার সাজে।

আমার সহিত সাধুর আর দেখা হয় নাই। বিদেশে বেশ যত্নসহকারেই এ সংবাদটি আমার কানে দেওয়া হইয়াছিল। তার পর হইতেই সুরু হইল, আমার ভবঘুরে জীবন। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এত দিনে তাহাকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

দীর্ঘ দিনের পর, আজ বাবুইহাটীতে ফিরিয়া, খেঁদু পিসিকে দেখিয়াই সাধুর কথা আবার মনে পড়িয়াছিল। খোঁজ লইতে খেঁদু বলিয়াছিল—তার কথা আর বল কেন! ছারকপালি হয়ে কোন প্রকারে বেঁচে আছে। আজকাল আবার মাথা-খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে—কি বলে, কি করে, তার ঠিক নেই।

সেই জন্যই সাধুর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সে এক প্রকার ছুটিয়া আসিয়াই গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। তার পর বলিল—ওমা, এত কাল বিলেতে থেকে এলে, তুমি যে দেখছি যেমন তেমনিই আছ।…খালি একটু ফরশা হয়েছ, আর, মাথায় টাক পড়ে এসেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সাধুই বটে! হাল্কা গেরুয়া রঙের শাড়ী পরনে; গায়ে সেই

রঙেরই সেমিজ ; রুক্ষ চুলগুলি মাথার কাপড়ের এক পাশে এলাইয়া আছে। কঠিন সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্যের ফলে তাহার দেহে জ্যোতি ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে। নিটোলদেহা, স্থির-যৌবনা—তাহাকে যেন অতুলনীয়া বলিয়াই মনে হইল। সে-ই সাধু! বিধবা সাধু! খেঁদুর সহিত তাহার কত প্রভেদ!

—ওকি, অমন ক'রে চেয়ে রইলে—চিনতে পারছ না বুঝি?

চোখ দুইটা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলাম—পেরেছি, সাধু!

তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চুপি চুপি বলিল—নিজের দেওয়া নামটি মনেই আছে দেখছি। তাই ত বলি···

ছোট-বড় চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে কেহ মুখে আঙুল দিয়া, কেহবা হাঁ করিয়া, কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আন্দাজে বুঝিলাম তাহারা সাধুর দাদা আমাদের ভবানীদার ছেলে-মেয়ে। তাহাদের মা-ও পাশের ঘর হইতে জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার সহিত দু-চারিটা কথা কহিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—ঘরে গিয়ে বসুন, ঠাকুরপো। আমার ত দেখছেন, এই অবস্থা—মাথা তুলতে পারছি না।

বলিয়া তিনি বুঝিবা আবার বিছানায় শুইতে চলিলেন।

সাধু আমাকে ঘরে লইয়া গিয়া একটা হাত-ভাঙা ইজি-চেয়ারে বসাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—আহা, কি সুন্দর চুল ছিল তোমার! ওদেশে বুঝি খুব চুল ওঠে?

প্রশ্ন করিয়াই হঠাৎ আবার দূরে সরিয়া গেল। মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বলিল—থাকবে ত কিছুদিন?

ইহার জবাব না দিয়া বলিলাম—ভাল আছ, সাধু?

—হ্যাঁ, আমার অসুখ-বিসুখ কিছু হয় না। দিনও কেটে যাচ্ছে। তুমি কিন্তু বড্ড রোগা হয়ে গেছ।

—রোগা হয়ে গেছি, মাথায় টাক পড়েছে, ফরশা হয়েছি—এ-সব সত্ত্বেও জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েই চিনতে পারলে?

সাধু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—ওমা, রোজ যার মুখখানা মনে পড়ে, তাকে দেখতে পেয়েও চিনতে পারব না?

চমকিয়া চাহিলাম। খেঁদুর কথাগুলি মাথার ভিতর ঘুরপাক খাইয়া গেল—'আজকাল আবার মাথা-খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কি বলে, কি করে, তার ঠিক নেই।'

সে-কথাই কি ঠিক?

সে আবার বলিল—বরং, তুমিই যেন বাড়ীতে ঢুকতে দ্বিধা বোধ করছিলে। তাই ত ডেকে পাঠালুম।···কই, আমার কথার জবাব দিলে না ত! ক'দিন থাকবে দেশে?

—দেখি ; যত দিন ভাল লাগে।

পাশের টেবিলের উপর হইতে কি একটা সেলাই তুলিয়া লইয়া, ছুঁচে সুতা পরাইতে পরাইতে বলিল—বিলেতের কথা কিছু বল, শুনি। ক'টি মেমকে ভালবাসলে ···আর ক'টিকেই বা বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছিল?

—একটিকেও না।

—ভাল যে বাসতে পারবে না, বিয়ে করবারও উপায় নেই—তা অবিশ্যি আমি জানি। কিন্তু, কখনও কারও প্রতি সামান্য মোহও কি দেখা দেয় নি?

—ভাল যদি বাসতুমই, আর বিয়েও যদি করতুম—তাহলে, আমাকে কে ঠেকাতে পারত, সাধু? উপায় নেই, বলছ যে?

ছুঁচে সুতা পরাইয়া, গেরো দিতে দিতে সে জবাব দিল—তা যে হ'তেই পারে না। বিধাতার বিধান যে অন্য রকম গো।

—কি বিধান?

—সে ত তুমি জানই।···সেই বিধানের বিপক্ষে যাওয়া হয়েছিল ব'লেই না আজ আমার এই দশা—আর তুমি ভবঘুরের মত ভেসে বেড়াচ্ছ!

বুকের পুরাতন ক্ষতস্থানটা আজ আবার ব্যথা করিতে লাগিল। সেলাই করিতে করিতে সাধু বলিল—ঠাকুমা বলতেন, 'ওকি আর যেমন-তেমন সম্পর্ক রে? জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। পিরথিবীতে জন্মাবার অনেক আগেই তা ঠিক হয়ে থাকে।'···কথাটা কত দূর সত্যি দেখ

দিকি। লোকে সে বিধান বুঝতে না পেরে ভুল করলে। তাই, আমি দিন-কয়েক কি সব ছেলেখেলা করে, আবার ঘরে ফিরে এলুম—তুমি আজও বিয়ে-থা করলে না।

একটু থামিয়া বলিল—নইলে, এমন সোনার চাঁদ ছেলে তুমি, তোমাকে পেলে যে-কোন মেয়ে ধন্য হ'য়ে যেত—তবু, তোমার বিয়ে হ'ল না কেন ?...কি ক'রে হবে ? সে-তপস্যা যে আর এক জনে ক'রে রেখেছিল !

আমি তখন বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। কথা কহিবার প্রয়োজনও ছিল না। দ্বিধাসঙ্কোচহীন, নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে সে নিজের কথা বলিয়া যাইতেছিল। মনে হইল, সে যেন আমাকে শুনাইয়াও কিছু বলিতেছে না। একবারও ফিরিয়া দেখে নাই, কথাগুলি কি ভাবে গ্রহণ করিতেছি। না, না, ইহা ত পাগলের লক্ষণ নহে। ইহা যে কি, তাহা যে একমাত্র আমারই বুঝিবার কথা।

বলিলাম—তোমার কথাই হয়ত ঠিক, সাধু। ও গভীর সত্য, এমন ক'রে আগে বুঝতে পারি নি।

—আমি পেরেছিলুম। জানতুম, কে আমার সত্যি-কারের বর—সে-ই যখন এতটুকু ছিলুম; তখন থেকে।

সাধু উঠিল। সেলাইটা টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া, ইতঃস্তত ছড়ান বই-খাতা প্রভৃতি সাজাইতে সাজাইতে বলিল—যাক্‌, তপস্যার হয়ত কোথাও কিছু খুঁৎ ছিল। তাই, এবার সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

বলিয়া, এতক্ষণে সেই প্রথম আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তার পরই কাছে আসিয়া, আবার আমার মাথায় হাত রাখিয়া বলিতে লাগিল—অপরাধ আমারই। কিন্তু, দিব্যি ক'রে বলছি তোমাকে, এবার আর কোন খুঁৎ বাকি থাকবে না।...এই ত দেখ, তোমার দেওয়া নামটি আমি যত দূর সম্ভব সার্থক ক'রে তুলছি। আমার পাপের জন্যেই এবার তোমাকে এত কষ্ট সইতে হ'ল—তবু, আমার উপর রাগ ক'রোনা লক্ষ্মীটি! আমি সারা মন-প্রাণ দিয়ে শুধ্‌রে নেবার চেষ্টা করছি। আর ক'টা দিনই বা! জীবনের অর্দ্ধেক ত শেষ হয়ে গেল—সামনের বারে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।...আমাকে ক্ষমা ক'রো—কেমন? তা না হ'লে কিন্তু বড্ড দুঃখু পাব। ...ইস্‌, চুলগুলো একেবারে যে...আচ্ছা, চা খাওয়া বোধ হয় আজকাল আরও বেড়েছে ?

মুখে তাহার কি অপরূপ জ্যোতি ! আমার প্রতি কতই যেন অপরাধ করিয়াছে, তাহারই জন্য ক্ষমাভিক্ষার কী করুণ মিনতি-ভরা দৃষ্টি তাহার চোখে! কত দেশ-বিদেশেই ত ঘুরিলাম ; কিন্তু, এমন সরল, অকপটবিশ্বাস, এমন প্রাণজুড়ানো মাধুরী ত আর কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। এক দিন সাধুকে পাইবার জন্য পাগল হইয়াছিলাম। কিন্তু, তাহার মনের সন্ধান এমন করিয়া পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। আমার জীবনও যে কেন এমন সৃষ্টিছাড়া, গোষ্ঠীছাড়া, ভবঘুরের বাসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণও আজ প্রথম আমার কাছে ধরা পড়িল ।

ধরা গলায় বলিলাম—তোমার উপর আমি যে চেষ্টা ক'রেও রাগ...

আমাকে ঐখানেই থামাইয়া দিয়া, ছোট্ট খুকীর মত ঘাড় দোলাইয়া সাধু বলিল—সে-সব কথা আমি জানি গো মশাই—খুব জানি।...তবু, ক্ষমা চেয়ে রাখলুম। ...খুব ক্রীম-ট্রিম মাখতে বুঝি? তাই এ দশা হয়েছে! এখন থেকে, রোজ সর্ষের তেল মেখো দিকি ; আবার তেমনি চুল গজাবে, দেখো।...চায়ের ব্যবস্থা ত ঘরে নেই ; ব'সো, একটু জল-টল দিই।

বলিয়া সাধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

পরের দিনটা আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা করিতেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর, সেদিনকার মত সব কাজ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে দেখি, গ্রামের ভিতর বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংবাদ লইয়া জানিলাম, আরও দুইটি লোক কলেরায় মারা গিয়াছে। রাম ভট্‌চায্যের স্তব-স্তুতি তখনও বোধ হয় মা-কালীর কাছে পৌঁছাইতে পারে নাই। আর আমার গত রাত্রের লেখা 'ভাল বিলিতি পেস্‌কিপ্‌-শানে'র মর্য্যাদাও তারিণী চক্কোত্তির মেয়ে রাখেন নাই। বাজারের সেই শ্মশানের ঠিক সামনেই আমাদের বাড়ী। এতক্ষণে হয়ত শ্মশানের ধোঁয়ায় ঘরদোর

ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা আর রহিল না। পা দুইটা টানিয়া লইয়া উপস্থিত করিল সাধুর কাছে।

সেদিনও সে তেমনি হাসিমুখে আমাকে ঘরে তুলিল। কিন্তু মুখখানি শুষ্ক মলিন দেখিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমাকে আজ অমন দেখাচ্ছে কেন, সাধু? অসুখ করেছে নাকি?

সে তাহার সেই নির্লিপ্ত, ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলিল—শরীরটা ভাল নেই।·· ও কিছু নয়; ব্যস্ত হ'তে হবে না।

সেদিনও অনেক কথা হইল। এক সময়ে বলিলাম—ভবানী-দার কথা কাল আর জিজ্ঞাসা করাই হ'ল না। তিনি ত আজকাল সিনেমার মস্তবড় অ্যাক্টর হয়েছেন—দেশ-জোড়া নাম শুনতে পাই।

সাধু বলিল—হ্যাঁ, দাদা ত এখন স্বনামধন্য লোক। ছ-সাত মাস অন্তর এক বার ক'রে আসেন; দিন-দুই-তিন থেকে দেখে-শুনে যান।

—কলকাতা থেকে এত কাছে, তবু ছ-মাস অন্তর আসেন?

—কাজের মানুষ, সময় কোথায়? মাসে মাসে কুড়িটে ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিয়েই তিনি খালাস।

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—বল কি, গ্রামের উপর তোমরা দুটি মেয়েমানুষ—এতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে মাত্র কুড়ি টাকা সম্বল ক'রে চালাও কি ক'রে?

—চলে যায় কোন প্রকারে। ঐ বৌদিদির দশটি ছেলেপুলে। বছরের ভিতর দশ মাস তিনি ছেলে পেটে ধরে বিছানায় পড়ে থাকেন; তার পর এক মাস কাটে আঁতুড় আর ছেলে হবার ধাক্কা সামলাতে। বাকি রইল আর একটি মাস; তা কাটে, ঐ যে এখন যেমন দেখছ, জ্বর, হাঁপানি, বাতের ব্যথা এই-সব নিয়ে।···বৌদি চালান এই ভাবে।

—আর তুমি? সব ত তাহ'লে তোমাকেই করতে হয় দেখছি।

—আর কে করবে? আমি আবার সাধু মানুষ, গাঁজাটা অবিশ্যি খাই না; তবে, পুজো-আচ্চা, সন্ধ্যাহ্নিক আছে; আমার নিজের আলাদা জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা আছে। তা ছাড়া, গ্রামের লোকদের মাঝে মাঝে জামাটা, ফ্রকটা তৈরি ক'রে দিই—তাতেও সামান্য কিছু ঘরে আসে।··· আমার চলে এই ভাবে।

—তোমার আবার আলাদা জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা কিসের?

—ঐ ত কালই বললুম যে গো! পুরুষমানুষের কি ভোলা মন রে বাবা!

পাগল সাধু! কি যে বলে, কি যে করে, তার ঠিক নাই!

বলিলাম—তোমার সব সয়, তাই হয়ত পার। কিন্তু এখন একটু সাবধানে থেকো সাধু। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। তোমার শরীরও আজ ভাল নেই। কি হয়েছে বল না?

সাধু স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিল। কথার জবাব না দিয়া এক সময়ে বলিল—সত্যিই অনেক ফরশা হয়েছ। আগের চেয়েও যেন এখন ভাল দেখায়।···

* * *

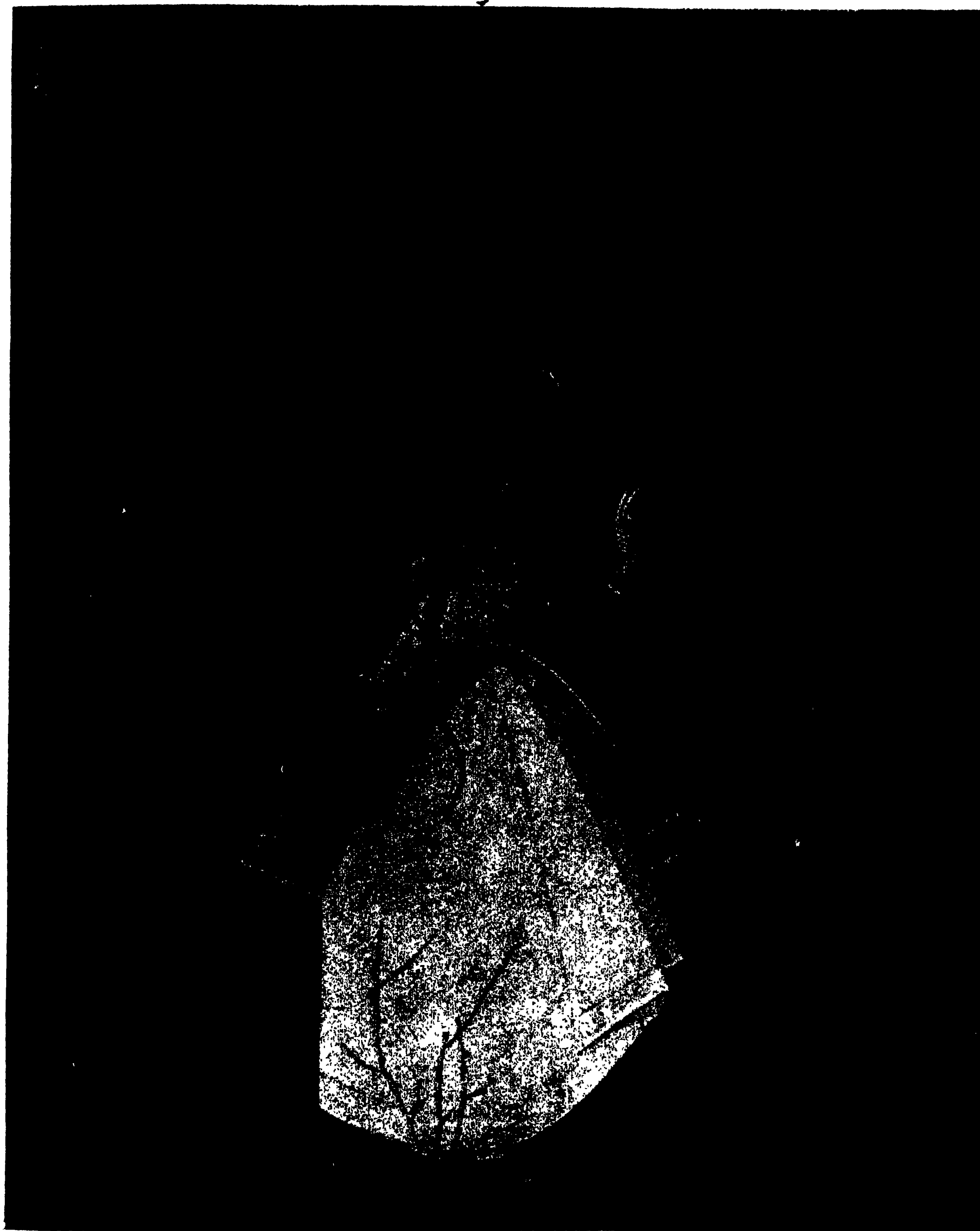
সারারাত শ্মশানের হরিধ্বনিতে জাগিয়া কাটাইয়া সকালে কিছুক্ষণ উস্‌খুস্‌ করিয়া আবার যখন পৌঁছিলাম সাধুদের বাড়ীতে, দেখি, ভবানী-দার স্ত্রী ঘরের বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া হাঁপাইতেছেন। আমাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন—ও ঠাকুরপো, ঐ দেখ ঠাকুরঝি বুঝি সর্ব্বনাশ করে গো!···

সে কি কথা! ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরে গিয়া দেখিলাম, বিছানায় সাধু শুইয়া আছে। তাহার চেহারার বর্ণনা আর দিতে পারিব না। তবে, মাত্র একটি রাত্রের ভিতর মানুষের শ্রী যে কেমন করিয়া, কিসের জন্য এমন ভাবে বদলাইয়া যায়, তাহা আমি চিকিৎসক বলিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম।

কাছে গিয়া, তাহার মাথায় হাত রাখিতে, চোখ মেলিয়া চাহিল। শেষে শুষ্ক হাসি হাসিয়া, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—এসেছ?···এক্ষুনি ডাকছিলুম।

সজল চোখে বলিলাম—এ কি করেছ সাধু?

সে বলিল—সংসারের হট্টগোলে, সারা মন-প্রাণ দিয়ে আমার তপস্যাটুকু ত করতে পেতুম না, তাই মা-কালী মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন আর কোন বাধা হবে না।



প্রতীক্ষা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

ঐ কয়টি কথা কহিয়াই সে হাঁপাইতে লাগিল।

বলিলাম—কি হয়েছে আমাকে বল, শীগ্‌গির।

—তা আর শুনে কি করবে?…যা বলি শোন। আমি কিন্তু শীগ্‌গিরই ডেকে পাঠাব। তৈরি থেকো… কেমন?

চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলাম—রাত্রে আমাকে খবর দিলে না কেন? আমি ওষুধ-টষুধ……

—ও কথা থাক। তোমাকে আমার বড় দরকার ছিল, সেই জন্যেই ডাকছিলুম।……আমার বালিশের তলায় চাবি আছে; ঐ হাতবাক্সটা একবার খোল ত গিয়ে।

পা দুইটা অবশ হইয়া আসিতেছিল। উঠিয়া বাক্স খুলিলাম।

সাধু বলিল—ওপরেই একটা কাগজের মোড়ক আছে। ওটা তোমার পকেটে রাখ, বাড়ীতে গিয়ে দেখো।…বাক্সে রেখে আর লাভ কি! লোকে দেখতে পাবে, তার পর বলবে, কি ভীষণ অসতীই না ছিলুম।

তাহাই করিলাম। বাক্স বন্ধ করিয়া, আবার বসিতে যাইতেছিলাম, সে বাধা দিয়া বলিল—না, না, আর থেকো না এখানে—ঐ পেছনকার দোর দিয়ে বেরিয়ে যাও। সোজা বাড়ীতে গিয়ে উঠো, মাঝে কোথাও দাঁড়িও না, কারুর সঙ্গে কথা ব'ল না…যাও।

আপত্তি করিয়া বলিলাম—না সাধু, আমি কিছুতেই এখন এখান থেকে যেতে পারব না। তোমার চিকিৎসা…

—কথা শোন, লক্ষীটি!…নইলে দুঃখ পাব। যাও, আর দেরি ক'র না। বিকেলে না হয় এক বার এসো।

বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল; তবু তাহার কথাই রাখিলাম।

বাড়ী আসিয়া নিজের ঘরে গিয়া, সেই কাগজের মোড়ক খুলিতেই একটি বহু পুরাতন জিনিষ বাহির হইল—কিশোর কালে সাধুকে লেখা আমার একমাত্র চিঠিখানা। মোটামোটা, গোটাগোটা অক্ষরে লেখা—

সাধু,

তোমাকে আমি বড় ভালবাসিয়াছি। আর একটু বড় হইলেই আমি তোমাকে বিয়ে করিব। আমার কনে হইবে ত? ইহার ভিতর আর কাহাকেও বিয়ে করিয়া বসিও না যেন, ভাই! মাথার দিব্যি!

বিকালে পাড়ার কয়েক জনে সাধুকে কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া আসিয়া, যখন বিকট চীৎকার করিতে লাগিল—স্যুটকেসটা হাতে করিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া আসিলাম। কেহ টের পাইল না।

ঘাটের এক মাঝিকে ডাকিয়া বলিলাম—মাঝি, আমাকে নিয়ে যাবি?

সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবেন, বাবু? ইষ্টিশানে?

শ্মশানের দিকে চাহিয়া বলিলাম—ইষ্টিশানেই ত যেতে চাই রে! পারবি পৌঁছে দিতে?



পূর্ব্ব-আফ্রিকা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ভারতবর্ষ থেকে আফ্রিকাতে যেতে হ'লে পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রথম বন্দর আসে মোম্বাসা। এই বন্দর ব্রিটিশ-পূর্ব্ব-আফ্রিকার অন্তর্গত কেনিয়া প্রদেশের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এইখানে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আফ্রিকা দেশে



টাঙ্গানিকার রমণী কন্দমূল গুঁড়ো করছে

রওয়ানা হবার পূর্ব্বে অনেকে আমাকে নানা রকম ভয়াবহ গল্প বলেছিলেন, 'ইয়োলো ফিভারে'র কথা ব'লে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কেউ বা আমাকে শেষ বিদায় দিয়েছিলেন। যাঁরা এ-সকল কথা আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁদের, জ্ঞাতার্থে লিভিংষ্টোনের কথা উল্লেখ করতে পারি – তাঁর নাম সকলের কাছে পরিচিত। তিনি রোডেসিয়া দেশটা একরূপ আবিষ্কারই করেছিলেন। এখনও তাঁর বৃহৎ মূর্ত্তি ভিক্টোরিয়া-প্রপাতের কাছে সুরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সেই লিভিংষ্টোন যখন জাঞ্জিবারে থাকতেন, তখন অনেক ভারতবাসী তাঁকে অর্থ দিয়ে অন্ন দিয়ে সাহায্য করেছিল, তাদের বংশধর এখনও জাঞ্জিবারে বাস করছে। বোম্বাই থেকে জাঞ্জিবার জাহাজে গেলে মাত্র এগার দিন লাগে, ভাড়াও অল্প। দেশের শিক্ষিত লোকদের কারও কারও ঐ সকল দেশ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে আসা উচিত। কিন্তু তা ত হবার জো নেই। ভ্রমণ করাটা এখনও খামখেয়ালির অঙ্গ হয়েই রয়ে গেছে এবং সে-জন্য অর্থব্যয় অপব্যয় মাত্র ব'লেই অনেকের ধারণা। অতএব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র যে-সংবাদ চোখের কাছে এনে ধ'রে দেয়, তাতেই সন্তুষ্ট হ'তে হয়—তাতে আছে ইয়োলো ফিভারের কথা, মরণের বিভীষিকার কাহিনী; কিন্তু যে-দেশে মরণ তাণ্ডব-নৃত্য করছে, সেই দেশে যেতে গেলে ইমিগ্রেশন-বিভাগ এত কড়াকড়ি করেন কেন তার সংবাদ কোনও সংবাদপত্রে নেই।

পূর্ব্ব-আফ্রিকার ইমিগ্রেশন-বিভাগ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া থেকেও আমার কাছে কড়া ব'লে মনে হ'ল। পর্ত্তুগীজ-পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে প্রবেশ করতে হ'লে, চার-শ পঞ্চাশ পাউণ্ড জমা রাখতে হয়। রোডেসিয়াতে ভারত-বাসীর প্রবেশ নিষেধ। ন্যাসাল্যাণ্ডে ভারতবাসী গি[য়ে] বসবাস করতে পারে, কিন্তু কোনও সামান্য রকমে[র] কাজকর্ম্ম করবার অধিকার নেই। এর মানে, মজুর এব[ং] দরিদ্র ভারতবাসী এ-দেশে এস না। তুমি যদি ধনী হ[ও] অনেক মজুর খাটাতে পার, তবে এদেশে এস। ব্রিটিশ-পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে যেতে হ'লে বোম্বাইয়ে যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিতে হয়, তা এক চমকপ্রদ ব্যাপার। ধরে নিলা[ম]

ভারতবাসী অশিক্ষিত, নির্ব্বোধ, তাদের প্রতি সরকারী অফিসারদের দুর্ব্বাক্য সহনীয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা বিদেশে যেতে চায় তাদের ত স্বাস্থ্য খারাপ নয়। আমি যেদিন স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য গিয়েছিলাম সেদিন যারা সঙ্গী ছিল তাদের কয়েক জন ছাড়া সকলেই আমার মতে পল্টনে ভর্ত্তি হবার উপযুক্ত। কিন্তু যারা অনুপযুক্ত ছিল, তাদের কাছে ছিল ধর্ম্মের উর্দ্দি। সেই জন্যই বোধ করি সাহেব-ডাক্তার বিনা-পরীক্ষায় তাদের জাহাজে বসতে দিয়েছিলেন। আর যারা একটু আত্মসম্মান-বোধ দেখিয়েছিল তারা অযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিল। আমিও তাদের মধ্যে এক জন ছিলাম। কিন্তু যখন কর্ত্তৃপক্ষ জানলেন, আমি আফ্রিকায় বসবাস করবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি না এবং আমার সঙ্গে প্রচুর টাকা আছে, তখন আর নাড়ী না-টিপেই জাহাজে গিয়ে বসতে বললেন। এরূপ করেই একটা বৃহৎ দেশের ধনরত্ন থেকে আরম্ভ ক'রে কাঁচামাল পর্য্যন্ত নিজ নিজ দেশে ইচ্ছামত লুটে নেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকায় ভারতবাসীর দরজা বন্ধ হ'তে বসেছে, এশিয়াবাসীরও দরজা বন্ধ হচ্ছে, তাই ইমিগ্রেশনের কড়া পাহাড়া।

আফ্রিকা মহাদেশটি ভারতীয় শিক্ষিত লোকের কাছে অজ্ঞাত হ'তে পারে, কালো ভূতের রাজ্য হ'তে পারে, বন্য জীবের বাসস্থান হ'তে পারে, কিন্তু গুজরাতী এবং মহারাষ্ট্র-দেশীয় মাঝিদের কাছে পূর্ব্ব-আফ্রিকা অপরিচিত নয়। মরাঠী মাঝিদের কাছে এখনও সমুদয় পূর্ব্ব-আফ্রিকাটা "অজানা" দেশ রূপে পরিচিত। এখনও কাথিওয়াড়ের ভবনগর ষ্টেটের পোরবন্দর থেকে দেওয়ালীর দশ দিন পরে, দেশী মাঝিদের পরিচালনায়, দেশী ডিঙ্গা "অজানা" দেশের দিকে রওয়ানা হয়। তারা পোরবন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে মস্কট, এডেন, সাতদ্বীপ, জিবুতি, মোম্বাসা, টাঙ্গা, জাঞ্জিবার, দার-এস-সেলাম প্রভৃতি স্থানে যায়, এবং ব্যবসা করে। বর্ষার পূর্ব্বে তারা দু-বার যাওয়া-আসা করে। মস্কট থেকেও ঠিক সেরূপ ডিঙ্গি আফ্রিকার বন্দরগুলিতে যাওয়া-আসা করে। অনেক সময় সেই ব্যবসাসূত্রে আরব মাঝি এবং ভারতীয় মাঝিতে বেশ দাঙ্গা হয় এবং তার বিচারও মেরিন কোর্টে হয়ে থাকে।



জাঞ্জিবারের লবঙ্গ-বাগানে নিগ্রো মজুরণী

কখন থেকে ভারতীয় মাঝিরা পূর্ব্ব-আফ্রিকার বন্দর-গুলিতে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করেছে, সে-কথা আমার জানা নেই। টাঙ্গানিকার টাঙ্গা শহরে যাবার পর কয়েক জন বয়োবৃদ্ধ ভারতবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তারা সকলেই কাথিওয়াড়ের লোক এবং জা'তে লোহানা। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে লোহানা অর্থাৎ বেনে-জাতীয় লোকই সর্ব্বপ্রথম ব্যবসা করতে আসেন, এবং তাঁদের কাজকর্ম্মসূত্রে মাঝি-জাতীয় লোক আসে। বর্ত্তমানেও বোম্বাই শিপিং আপিসে গেলে দেখা যায় হিন্দু খালাসীরা জাহাজে ভর্ত্তি হবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে এবং বি. আই. এস. এন. কোম্পানীতে অনেক গুজরাতী মাঝি-জাতীয় লোক ফায়ারম্যান থেকে আরম্ভ ক'রে সেলার-সারেঙের কাজ করছে। পোরবন্দর, সুরাত এই দুই বন্দর থেকেই লোহানাগণ ব্যবসা করবার জন্য সদাসর্ব্বদা



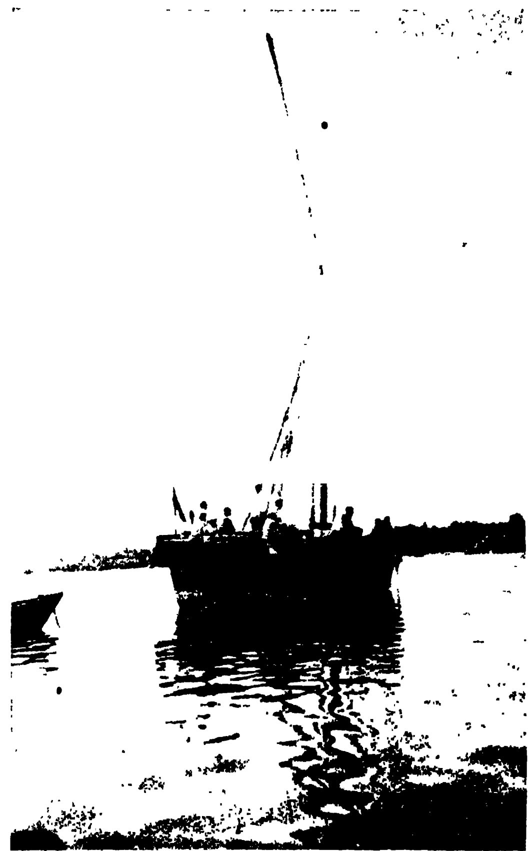
নিগ্রোরা কন্দমূল গুঁড়ো করছে

ডিঙ্গি নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। বাণিজ্য করা ছাড়া তাঁদের অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। সেই মতলব হ'ল উপনিবেশ স্থাপন করা। টাঙ্গাতে এখনও তাঁদের পুরাতন উপনিবেশের অস্তিত্ব আছে।

ভারতে মুসলিমদের আগমনের সময়ে হিন্দুদের অনেক নিয়মকানুনের পরিবর্ত্তন হ'ল। বিদেশে বাণিজ্যযাত্রাও বন্ধ হয়ে গেল। পোরবন্দরের রাজা এবং সুরাতের রাজা বিদেশে ব্যবসার ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। আফ্রিকার সঙ্গে অনেক দিনের সম্বন্ধ এক দিনে কেটে গেল বটে, কিন্তু যে-সব গুজরাতী এবং কাথিওয়াড়ি আফ্রিকায় ছিল, তারা হয়ত মরে গিয়েছিল, নয়ত আরবদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এই হ'ল তাদের পুরাতন কথা। অনেকের ধারণা ন্যাস-ল্যাণ্ডের ন্যাসা-হ্রদের পূর্ব্বতীরে যে-সকল মন্দির দেখা যায়, এ সকল মন্দির তাদের দ্বারাই তৈরি হয়েছিল। ন্যাসা-হ্রদেরপূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে যে-সকল নিগ্রো বাস করে তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যাদের চুল আমাদের চুলের মতই, শরীরের গঠনও অনেকটা আমাদের মতই। কিন্তু জার্ম্মান পর্য্যটক ব্যতিরেকে সকল ইউরোপীয় পর্য্যটকই মন্দিরের চূড়াকে দুর্গের চূড়া ব'লে থাকেন, এবং বলেন যে এ-সকল পুরাতন ইমারত আরব-দের দ্বারা তৈরি হয়েছিল। আমি সেই ইমারত দেখতে জাহাজের কাপ্তানকে নিয়ে যাই এবং ভাল ক'রে দেখবার পর কাপ্তেনকে বলি এ-সকল ইমারত ভারতের লোকের তৈরি, কারণ আরব দেশ ঘুরে তথায় এমন কোনও গুম্বজ দেখি নি, যার উপরভাগটা একদম নিটোল। আরবরা মিনার রাখে দুই কারণে, এক কারণ হ'ল শত্রুর গমনাগমন মিনার হ'তে দেখা, দ্বিতীয় কারণ হ'ল যদি মসজিদ হয় তবে তাতে দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া, কিন্তু এ যে একেবারে নিটোল; ভারতীয় মন্দিরের মত উঁচু হয়ে চলেছে, সেখানে দাঁড়াবার স্থান নেই।

ভারতে মুসলিম-রাজ্য স্থাপনের পর কাথিওয়াড়ের অনেক স্থান এবং গুজরাতের সুরাত মুসলমানগণ দখল করেন, এবং যে-সকল লোহানা মুসলিম ধর্ম্ম কবুল করে তারাই আবার পুরাতন ব্যবসা সুরু করে। ক্রমে বাণিজ্য-বৃদ্ধি হয় এবং হিন্দুরাও যাওয়া-আসা করতে থাকে। পর্ত্তুগীজদের সহায়তায়, হিন্দু লোহানারা আবার হিন্দু মাঝি নিয়ে ব্যবসায় অগ্রসর হন, কিন্তু যে পর্ত্তুগীজ রক্ষক হয়ে ভারতীয় ডিঙ্গি সমুদ্রপথে রওয়ানা করে, তারাই আবার ভক্ষক হয় এবং তার পর ভারতীয়দের মধ্যে ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু ছাড়া সকলেই ব্যবসা পরিত্যাগ করে। পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে যখন ব্রিটিশ-প্রাধান্য বাড়ে তখন থেকেই আবার গুজরাতী হিন্দুগণ, গুজরাতী এবং কাথিওয়াড়ী মুসলমানদের কেরাণীরূপে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় যাওয়া-আসা করতে থাকেন এবং ক্রমে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই নূতন আগমনকারীদের মধ্যে লোহানা, ভাটিয়া, নাগোর, ব্রাহ্মণ এবং যোশী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। তার অনেক পরে নানাজাতীয় গুজরাতী তথায় যেতে আরম্ভ করেন। তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে সংখ্যায় বেশী বর্ত্তমানে আগা-খানি খোজা। তাদের বিস্তৃত কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা এবং ন্যাসাল্যাণ্ড পর্য্যন্ত হয়েছে। এরা পূর্ব্বে সকলেই লোহানা শ্রেণীর হিন্দু ছিল। দ্বিতীয় হ'ল পাটেল বা কৃষক। বর্ত্তমানে তারাও শিক্ষায় অনেক উন্নতিলাভ করেছে, বিঠলভাই ও বল্লভভাই পাটেলের মত লোক তাঁদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার পর অন্যান্য অনেক শ্রেণীর লোক গুজরাত থেকে গিয়েছেন। ইস্নসেরী খোজা, বোরা, মেমানক্ষেত্রী, মেমান, সুরতী (সকলেই মুসলমান), পারসি, ব্রাহ্মণ, ছত্রী, কর্ম্মকার, শুক্লবৈদ্য, চন্দ্রবৈদ্য, মুচি, এবং অন্যান্য বর্ণের হিন্দু। শিখ এবং পাঠান নামমাত্র বললেও দোষ হয় না।

গুজরাতী এবং কাথিওয়াড়ী মুসলমান আফ্রিকাতে গিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে মেলামেশা করা তেমন পছন্দ করেন নি। তাঁরা শাসক এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে মধ্যম ব্যক্তির কাজ ক'রে আসছিলেন পূর্ব্বাপর। মেমান-শ্রেণীর লোকের আফ্রিকা-প্রবেশের পর ভারতবাসীদের সম্বন্ধে পর্ত্তুগীজ, ব্রিটিশ এবং ডাচদের মনের ভাবের



জাঞ্জিবারে ভারতীয় তরণী

পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে। মেমানদের পোষাক এবং দাড়ি কাটবার ধরণ অনেকটা আরবদের মতই, তাই কেউ কেউ তাদের আরব বলেই ধারণা ক'রে থাকে। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় আরবদের এবং সোমালীদের মর্য্যাদা নিগ্রোদের মতই। এদিকে এক মেমান-শ্রেণীর লোক ছাড়া, অন্যান্য ভারতীয়েরা যাতে তাদের উপর আরব-নিগ্রোর পদমর্য্যাদা না এসে পড়ে সেজন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করতে থাকে। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। টাঙ্গানিকায় জার্ম্মানরা ভারত-বাসীকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করে। এক শ্রেণী হ'ল আরব এবং অন্য শ্রেণী হ'ল বানিয়া। এখনও বানিয়ারা ভারতীয় মুসলিমদিগকে "ইণ্ডিয়ান" ব'লে স্বীকার



দার-এস-সেলামের হিন্দু যুবকদের সঙ্গে লেখক

করে না, এবং ভারতীয় মুসলমানরাও তার পাণ্টা জবাবে বানিয়াদের ইণ্ডিয়ান ব'লে স্বীকার করে না, অবশ্য কথাটা ঘরানা। আগাখানী, ইস্‌নেসেরী এবং বোরা রকম দেখে বানিয়া-ঘেঁষা হয়ে পড়ল এবং টাঙ্গানিকায় বানিয়াদের সঙ্গে একত্রে বাণিজ্য করতে লাগল; জার্ম্মানরা বুঝল এরাও ভারতীয়, তবে ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী। কেনিয়াতে মেমানদের সংখ্যা কম থাকায়, নবাগত ব্রিটিশার ভারতবাসীদের আরব এবং নিগ্রোদের দলে না ফেলে অন্যান্য এশিয়াবাসীর দলে ফেলেছিল এবং তার এখনও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি। মর্য্যাদা ঠিক হয় পোল ট্যাক্স দিয়ে। ইউরোপীয়রা দেন পঁয়তাল্লিশ শিলিং, ভারতীয় এবং অন্যান্য এশিয়াবাসী দেন পঁয়ত্রিশ, আরব এবং নিগ্রোরা পঁচিশ শিলিং। অবশ্য এই পোল ট্যাক্স সব প্রদেশে সমান নয়। এমন কি এই ট্যাক্স সম্বন্ধে নানা সুবিধা-সুযোগও ইউরোপীয় এবং এশিয়াটিকদের দেওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই ভারতবাসী পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে গিয়েছিলেন। সে-জন্য তাঁরা প্রায়ই শহরে থাকতেন। শহরগুলি বর্ত্তমানে আয়তনে দ্রুত বড় হচ্ছে, পূর্ব্বে সেরূপ হ'ত না। পূর্ব্বের শহরগুলি ছিল ছোট ছোট এবং এলোমেলো। শহরগুলির অবস্থান ছিল প্রায়ই সমুদ্রতীরে। ইউরোপীয়দের আসার সঙ্গে সঙ্গেই শহর উচ্চভূমিতে গড়ে উঠতে লাগল। শহর-গড়ার একমাত্র কারণ হ'ল ভারতবাসী। তারা যা অর্থ অর্জ্জন করেছিল, যাওয়া-আসার সুবিধা না-থাকাতে সেই অর্থ খরচ করেছে বড় বড় দালান, বড় বড় বাগিচা প্রভৃতি তৈরি করতে। আরব এবং নিগ্রোরা শহরে সেরূপ সুবিধা পায় নি, কারণ তাদের রাত্রে শহরে থাকতে দেওয়া হ'ত না, এখনও নিগ্রোরা রাত্রে শহরে থাকতে পারে না। তাই ভারতীয়দের সত্বর প্রসার হ'তে থাকে।

আফ্রিকার একখানা রিলিফ মানচিত্র দেখলে বুঝতে পারা যাবে, আবিসিনিয়া হ'তে এক পর্ব্বতমালা হঠাৎ মাথা উঁচু ক'রে ক্রমশঃ দক্ষিণ-দিকে একদম কেপটাউন পর্য্যন্ত চলে গেছে। এই পর্ব্বতমালার উপর অনেক সমতল ভূমি দেখা যায়, সে ভূমি এত উর্ব্বরা যে ভারতে কোথাও সেরূপ উর্ব্বরা ভূমি দেখা যায় না। যাঁরা ভারতের বাইরে যান নি তাঁরা এই পর্ব্বতমালার উপরিভাগে কি ক'রে লোকের বসবাস হয়, কি ক'রে বন্য জীব "বুস্‌" নামক জঙ্গলে বেড়ায়, তা ধারণা করতে পারবেন না। আফ্রিকার পর্ব্বতমালার সঙ্গে ভারতীয় পর্ব্বতের আকৃতি-প্রকৃতি মোটেই মেলে না। আফ্রিকার যত বড় বড় পথ, তা এক পর্ব্বতের শৃঙ্গের সঙ্গে অন্য পর্ব্বতের শৃঙ্গের যোগ ক'রে দেওয়া হয় মাত্র। তাদের বড় বড় ট্রাঙ্ক রোডগুলি পর্ব্বতের উপর দিয়ে চলে, আর আমাদের দেশে সমতল ভূমির উপর দিয়ে চলে। পর্ব্বতের উপরিভাগে কৃষি-কর্ম্মের জন্য প্রচুর জল পাওয়া যায়, অথচ নিম্নভূমিতে জলের সন্ধানও পাওয়া যায় না। সে-জন্যই নিম্নভূমিতে কেউ গিয়ে মামুলী ভাবে কোনরূপ চাষ করতে রাজি হয় না।

কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং টাঙ্গানিকাতে ক্রমশঃ ভারতীয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক ব্যবসা দ্বারা সকলের চলে না দেখে অনেকে কৃষিকর্ম্ম করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, এমন কি অনেকে নানা স্থানে গিয়ে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভও ক'রে দেয়। কিন্তু এতে মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় বাসিন্দা একেবারে খাপ্পা

হয়ে ওঠেন, কারণ তাঁরা অনেকেই কৃষক। আফ্রিকাতে কৃষিকর্ম্মে অনেক সুবিধা আছে। সস্তা মজুরী, সুলভ গৃহপালিত পশু, এবং জমির কম খাজনা। দ্বিতীয় কথা হ'ল, যদি ভারতীয়েরা নিগ্রো শ্রমজীবীদের আপন আপন কাজে লাগাতে আরম্ভ করে, তবে নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হবে, হয়ত তারা ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ না ক'রে ভারতীয়দের অনুবর্ত্তী হবে। তৃতীয় কথা হ'ল, আফ্রিকাতে যে-সব ভারতবাসী আছে তাদের মন নিগ্রোদের সম্বন্ধে অনেক উদার হয়ে গেছে। তারা অনুভব করতে পেরেছে, যদি আফ্রিকায় বসবাস করতে হয়, তবে আর মধ্যম ব্যক্তির কাজ ক'রে দিন কাটালে চলবে না, হয় ইউরোপীয়-দের সঙ্গে মিলেমিশে ভূমিপুত্র হ'তে হবে, নয়ত নিগ্রোদের জাগিয়ে তুলে তাদের সাহায্যে আপন কার্য্য সিদ্ধি করতে হবে। ইউরোপীয়গণ এবং ভারতীয়দের একত্র বসবাসের কোনও উপায় নেই, কারণ পূর্ব্ব-আফ্রিকার ভারতবাসীরা আপন আপন দেশীয় পোষাক, আচার-ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত বজায় রেখেছে।

ভারতবাসী যাতে পরস্পর একত্র না হ'তে পারে, সে-জন্য আমার মনে হয় ভারতবর্ষ থেকে ভাড়াটে ধর্ম্ম-প্রচারকগণ তথায় যান এবং আর্থিক দিক দিয়ে ভারত-বাসীদের মধ্যে যে একতা আপনা হ'তে আসে তার ধ্বংস ক'রে চলে আসেন। কিন্তু নব্যভারতের নবযুবকগণ আজ আফ্রিকার সর্ব্বত্র "কালচারাল সোসাইটি" করেছে। এই সব সংঘে যেমন উদার ভাবে কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে অন্যত্র সেরূপ দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থা রয়েছে সেই পুরাতন পাপীদের হাতে, সেজন্যই "কালচারাল সোসাইটি" কিছুই ক'রে উঠতে পারছে না।

পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে মাসাই ব'লে একজাতীয় লোক সাধারণতঃ গো-দুগ্ধ ও গো-রক্ত পান করেই জীবনধারণ করে, এবং তারা কোনও কাজকর্ম্মে ভুলেও মন দেয় না; বনে-জঙ্গলে আপন গরু চরায়। এই বন্য লোকদের কাজে লাগাবার জন্য নানারূপ ফন্দি আঁটা হয়েছিল, কোনও



কাম্পালা সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
শ্রীকালীপদ দাসগুপ্ত

মতেই তাদের কায়দায় আনা যায় নি। শেষটায় স্থির হ'ল যে তাদের এই গরুগুলিকে যদি যমালয়ে পাঠান যায় কোনও ভান করে, তবেই মাসাই কাজে লেগে যেতে বাধ্য হবে। পশুচিকিৎসক ফতোয়া জারি করলেন, গরুর রোগ আরম্ভ হয়েছে, এদের যদি হত্যা করা না হয় তবে মাসাই জাতি পৃথিবীতে থাকবে না। এদিকে ভারতীয় যুবকগণ শিখিয়ে দিল মাসাইদের যে এ-সব বাজে কথা মাত্র, তোমাদের ক্ষুধার যন্ত্রণায় ব্যাকুল ক'রে কাজে লাগানোই আসল উদ্দেশ্য। তোমরা তোমাদের গরু চারিদিকে ঘিরে ব'সে থাক, এবং বল তোমাদের মৃত্যু না হ'লে কেউ তোমাদের গরু তোমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে না। মাসাইরা ভারতীয় যুবকদের কথা বর্ণে বর্ণে পালন করল, গরুর রোগ চলে গেল, আবার মাসাই বনে-জঙ্গলে স্বাধীন ভাবে আনন্দে বেড়াতে লাগিল।

হলওয়েল-স্মৃতিস্তম্ভ—কলঙ্ক কাহার?

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

সম্প্রতি হলওয়েল-স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ করা অথবা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সন্তোষবিধান, অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন—যে কারণেই এই আন্দোলন উত্থাপিত করা হউক না কেন, আন্দোলনকারীরা সভাসমিতিতে, বক্তৃতায় এবং সংবাদপত্রে লিখিত প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ করিতেছেন যে, উক্ত স্মৃতিস্তম্ভ "বাঙালী জাতির কলঙ্ক" এবং "সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক"। এই উক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

বর্তমান হলওয়েল-স্তম্ভগাত্রে যে প্রস্তরলিপি আছে, উহাতে কাহারও "কলঙ্কের" কথা লিখিত আছে বলিয়া মনে হয় না। "অমুক অমুক লোক অন্ধকূপে প্রাণ হারাইয়াছে, অমুক অমুক দুর্গরক্ষার জন্য যুদ্ধে মারা গিয়াছে, অমুক অমুক অন্য প্রকারে মারা গিয়াছে"—এই রকম লিপি দ্বারা উল্লিখিত মৃত্যুর জন্য কাহাকেও দায়ী করা হয় কি প্রকারে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। হলওয়েল স্বয়ং যে স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, উহাতে স্পষ্ট লিখিত ছিল যে, অন্ধকূপহত্যার জন্য সিরাজ দায়ী। লর্ড কার্জন-স্থাপিত বর্তমান স্তম্ভে ঐরূপ উক্তি ইচ্ছা করিয়াই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং স্তম্ভগাত্রে লিপির মধ্যে "সিরাজে"র অথবা "বাঙালী জাতি"র কোন কলঙ্কের কথা উক্ত না থাকিলেও উল্লিখিত "কলঙ্ক" পরোক্ষভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, মনে করিয়া লইতে হইবে।

আন্দোলনকারীদের যুক্তি বোধ হয় এইরূপ:—(১) স্তম্ভে অন্ধকূপহত্যার কথা আছে। (২) অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনী নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী। (৩) উহার জন্য সিরাজ দায়ী অর্থাৎ তাঁহাকে দায়ী করা হইয়াছে। (৪) সুতরাং ঐ নির্মমতারূপ কলঙ্ক সিরাজের। বাংলার নবাব সিরাজের যাহা কলঙ্ক, তাহা বাঙালীরও কলঙ্ক।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উক্ত হয় যে, অন্ধকূপহত্যার কথা হলওয়েল-রচিত নির্জলা মিথ্যা।

একে "কলঙ্ক" তার উপর উহা "মিথ্যা কলঙ্ক" হইলে নিশ্চয়ই অসহ্য।

মিথ্যাই হউক, সত্যই হউক, এই "কলঙ্ক" কাহার?

যাঁহারা অন্ধকূপহত্যাকে মিথ্যা বলিয়াছেন, তাঁহারা ত সিরাজকে নির্দোষ বলিয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। স্তম্ভগাত্রে "অন্ধকূপ" এই কথাটি থাকার জন্যই কি মনে করা হয়, যে, সিরাজের উপর "কলঙ্ক" আরোপ করা হইয়াছে? কিন্তু তাহা হইলে ভুল করা হইবে; কারণ, যাঁহারা অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীকে সত্য মনে করেন, এরূপ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরাও সিরাজ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে উহার জন্য দায়ী, ইহা বলেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজ-রচিত দুইখানি প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে (*Oxford History of India* এবং *Cambridge History of India*) অন্ধকূপহত্যার কাহিনী সত্য, ইহা কথিত হইলেও সিরাজের আদেশেই ঐ নিষ্ঠুরকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, এরূপ বলা হয় নাই। বরং ডক্টর ভিন্সেণ্ট স্মিথ এবং মিঃ ডড্‌ওয়েল উভয়েই (*Oxford History* এবং *Dupleix and Clive* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন যে, সিরাজ ব্যক্তিগতভাবে ও সাক্ষাৎভাবে উহার জন্য দায়ী নহেন। আরও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা অনাবশ্যক।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐতিহাসিকেরা আধুনিকতম প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া যখন বলিতেছেন যে, অন্ধকূপ-হত্যার জন্য সিরাজ ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী নহেন, তখন অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিচিহ্ন "সিরাজের

কলঙ্ক" এইরূপ ঘোষণা একান্তই শূন্যগর্ভ নহে কি ? বর্তমান স্তম্ভ লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সাধারণের সমক্ষে উন্মোচিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতায়ও সিরাজের ব্যক্তিগত দায়িত্বশূন্যতার ইঙ্গিত আছে। সুতরাং, ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, অন্ধকূপহত্যা সিরাজের "কলঙ্ক" এরূপ বলা ভুল; কারণ উক্ত কার্য তাঁহার আদেশে সম্পাদিত হয় নাই।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—সিরাজের কর্মচারীরাই যদি করিয়া থাকেন, তবে তাহাই "বাঙ্গালীর" কলঙ্ক। ইহার উত্তর এই যে, সিরাজের কর্মচারীরাও বুঝিয়া এবং ইচ্ছা করিয়া অন্ধকূপহত্যা করিয়াছিল, ঐতিহাসিকদের এরূপ মত নহে। যাঁহারা এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, উক্ত ঘটনা আকস্মিক এবং রাজকর্মচারীদিগের বোকামির ফল (Dodwell—"accident", Wilson—"stupidity")। অর্থাৎ তাঁহারাও আগে বুঝিতে পারেন নাই যে ঐ কার্যের ঐরূপ শোচনীয় ফল হইবে। অজ্ঞানকৃত এরূপ কার্যের জন্য, নির্বুদ্ধিতার "কলঙ্ক" দেওয়া যায় বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরতার নহে। সুতরাং, এক্ষেত্রে "বাঙ্গালীর" কলঙ্কের কথা না তোলাই বুদ্ধিমানের কার্য। সিরাজের অথবা সিরাজের কর্মচারীদের এবম্বিধ কোন কোন কার্যকে "বাঙ্গালীর" বলিয়া দাবী করার সঙ্গতি বা অসঙ্গতির আলোচনা একান্তই নিরর্থক। অন্ধকূপহত্যার কাহিনী সিরাজের এবং বাঙালীর কলঙ্ক না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে অন্য কাহারও কলঙ্ক বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, হলওয়েল-স্তম্ভ-ভঙ্গ-আন্দোলনকারীদের অনেকে বোধ হয় তাহা জানেন না।

অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী মিথ্যা—এই কথা প্রমাণ করিতে সর্বপ্রথম চেষ্টিত হইয়াছিলেন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' পুস্তক প্রকাশের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে জে. এইচ. লিট্‌ল্ সাহেব ঐ একই কার্যে প্রবৃত্ত হন। মৈত্রেয় মহাশয় এই মাত্র প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, হলওয়েল-বর্ণিত কাহিনী মিথ্যা; লিট্‌ল্ সাহেব উক্ত কাহিনী মিথ্যা ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি উহার পরিবর্তে একটি "সত্য" কাহিনী খাড়া করিলেন, এবং কলিকাতা-ইতিহাস-সমিতির (Calcutta Historical Societyর) অন্ধকূপবিতর্ক-সভায় (Black Hole Debateএ) মৈত্রেয় মহাশয় লিট্‌ল্ সাহেবকে সমর্থন করিলেন। লিট্‌ল্ সাহেবের ব্রিটিশ-অভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল এই জন্য যে, হলওয়েল-বর্ণিত কাহিনী ভীরুতা ও কাপুরুষতার কাহিনী। এতগুলি ব্রিটিশ যোদ্ধা কাপুরুষের মত দেশীয় লোকদের কাছে আত্মসমর্পণ করিল, ভীরু কুক্কুরের মত বিনাযুদ্ধে সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া জঘন্য ভাবে প্রাণত্যাগ করিল—এই অপযশ লিট্‌ল্ সাহেবের অসহ্য হইয়াছিল। তাই তিনি হল্‌ওয়েল-কাহিনীকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়া একটি "সত্য" ব্রিটিশ বীরত্বের কাহিনী দাঁড় করাইলেন। কাহিনীটি এই :—সিরাজ কলিকাতা-দুর্গ আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ বীরগণ সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। সংখ্যায় অল্প হইলেও অকুতোভয়ে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যখন ব্রিটিশেরা সংখ্যায় মাত্র নয়-দশ জন বাকী রহিলেন, তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া বন্দী হইলেন। কিন্তু ইহা বীরের মত বন্দী হওয়া। ইহাতে অগৌরব কিছু ছিল না। যাহা হউক, এই নয়-দশ জন ব্রিটিশ-বন্দী (হলওয়েল ইহাদের অন্যতম) ছোট একটা ঘরে আবদ্ধ ছিল। গ্রীষ্মকাল; ঘরের জানালা বেশী অথবা বড় ছিল না। সুতরাং সাহেবেরা গরমে কষ্ট পাইলেন; হাত-পাখার বদলে টুপি নাড়িয়া বাতাস খাইলেন, ইত্যাদি। পরদিন তাঁহারা মুক্ত হইলেন, কেহই রুদ্ধ বাতাসে ভীষণ ঠেসাঠেসিতে (যেমন হলওয়েলের বর্ণনা) মারা যান নাই। লিট্‌ল্ সাহেবের মতে এই হইল 'প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু এই যে বীরের মত যুদ্ধ হইল, ইহার আর একটু বিস্তৃত বর্ণনা দরকার। লিট্‌ল্ বলেন, এই যুদ্ধে ব্রিটিশেরা যে-বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, সে-বীরত্বের তুলনা মিলে—গত মহাসমরের মন্‌সের যুদ্ধে, ইপ্রেসের যুদ্ধে। গ্যালিপোলির যুদ্ধে নিজের কাহিনীটি সম্বন্ধে লিট্‌ল্ সাহেবের সগর্ব উক্তি এই :—

"It presents to the British Nation a band of heroes not unworthy to rank with those who turned at bay in the retreat from Mons, with those who held the trenches at Ypres or those who stormed the blood-stained heights of Gallipoli."

হলওয়েল-কাহিনী বর্জন ও তাঁহার কাহিনী গ্রহণ করিলেই ব্রিটিশ বীরদিগের প্রতি সম্মান দেখান হইবে, লিট্ল্ সাহেব এ-কথাও বলিয়াছিলেন :—

"If you accept this evidence the Black Hole story disappears at once and brave men come to their own again…"

সুতরাং হলওয়েল-কাহিনী এবং উহার স্মারক স্তম্ভ ব্রিটিশ বীরত্বের উপর অর্পিত কলঙ্ক; এই হইল লিট্ল্ সাহেবের মত। এই মতের সমর্থন করিলেন স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয়। তিনি বলিলেন যে, হলওয়েল-কাহিনী (সুতরাং স্তম্ভও) কেবল ব্রিটিশ-বীরত্বের কলঙ্ক নহে, উহা ব্রিটিশের সত্যবাদিতার উপর অর্পিত কলঙ্কও বটে।

"It is an undoubted libel against some at least of the British heroes, who sacrificed their lives in doing their duty—nay, it is also a general libel against the British love of truth."—অন্ধকূপ-বিতর্ক (Black Hole Debate) দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা সম্প্রতি হলওয়েল-স্তম্ভ-অপসারণ-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, মনে হয় তাঁহাদের আদর্শ ও প্রমাণ 'সিরাজদ্দৌলা' পুস্তক। তাঁহারা কি জানেন যে, কুড়ি বৎসর পরে মৈত্রেয় মহাশয় হলওয়েল-স্তম্ভকে সিরাজউদ্দৌলার অথবা বাঙালীর "কলঙ্ক" বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন, উহা ব্রিটিশের বীরত্বের কলঙ্ক এবং ব্রিটিশের সত্যবাদিতার কলঙ্ক। আন্দোলনকারীরা কি জানিয়া-শুনিয়াই এই "ব্রিটিশের বীরত্বের কলঙ্ক" এবং "ব্রিটিশ-সত্যপ্রিয়তার কলঙ্ক" অপসারণ দ্বারা ইংরেজ-বাঙালীর সাম্প্রদায়িক প্রীতি বর্ধনে চেষ্টিত আছেন? জানিতে কৌতূহল হয়।

বর্তমান যুদ্ধে নৃশংসতা ও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপের যুদ্ধে নিরস্ত্র ও অসহায় বালবৃদ্ধবনিতার প্রতি নৃশংস আচরণের কাহিনী যখন পাঠ করি, তখন মনে হয় যে, এত শতাব্দীর সভ্যতা ও বিকাশের পরে, মানুষের কি এই পরিণতি?

প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনেক উচ্চে ছিল। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের প্রথম অধ্যায়ে আছে যে, কুরু ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের প্রারম্ভেই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের নিয়ম স্থির করা হইল।

ততস্তে নিয়মং চক্রুঃ কুরুপাণ্ডবসোমকাঃ।
ধর্মান্ সংস্থাপয়ামাসুর্যুদ্ধানাং ভবতর্ষভ!।
নিবৃত্তে বিহিতে যুদ্ধে স্যাৎ প্রীতির্নঃ পরস্পরম্।
যথা পুরা যথা যোগং ন তৎ স্যাচ্ছলনং পুনঃ।
বাচা যুদ্ধে প্রবৃত্তে নো বাচৈব প্রতিযোধনং।
নিষ্ক্রান্তাঃ পৃতনামধ্যান্ন হন্তব্যাঃ কদাচন।
রথী চ রথিনা যোধ্যো গজেন গজধূর্গতঃ।
অশ্বেনাশ্বী পদাতিশ্চ পাদাতেনৈব ভারত।
যথাযোগং যথাকামং যথোৎসাহং যথাবলম্।
সমাভাষ্য প্রহর্তব্যং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে।
একেন সহ সংযুক্তঃ প্রপন্নো বিমুখস্তথা।
ক্ষীণশস্ত্রো বিবর্মা চ ন হন্তব্যঃ কদাচন।
ন সূতেষু ন ধুর্যেষু ন চ শস্ত্রোপনায়িষু।
ন ভেরীশঙ্খবাদেষু প্রহর্তব্যং কথঞ্চন।

সকল যুদ্ধেই হয়ত যোদ্ধার আচরণ এই আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে যখন এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হইত, তখন যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে কোনও নিষ্ঠুরতা-বর্বরতা কল্পনার অতীত ছিল বলিয়া মনে হয়।

রায়-বংশের রামায়ণী

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

একটি ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় ইতিহাসের আরম্ভ এবং আর একটি অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় ইতিহাসের শেষ।

১২৪৪ সালের এক মধ্যাহ্নে বাংলার এক অখ্যাত জমিদার-বাড়ী হইতে ছোট ছেলে ধর্ম্মদাস রায় সস্ত্রীক বাহির হইয়া গেলেন। অথবা বিতাড়িত হইলেন। কারণ, যে-ছেলে বাপের অনভিমতে চতুর্থ বার বিবাহ করিতে পারে, গৃহে তাহার স্থান না হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রথম বিবাহ অবশ্য বাপ-মাই দিয়াছিলেন। আর সে বিবাহের সময় ধর্ম্মদাসের বয়স ছিল এগারো, কাজেই তাহার মতামতের কথা উঠিতেই পারে না। নববধূ নয় বৎসর বয়সে শ্বশুরালয়ে পা দিল, এবং বছর-খানেকের মধ্যেই সিঁথির সিঁদুর ও লালপেড়ে শাড়ী লইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল। ধর্ম্মদাস নামক বালকটির কিছু কাল খেলার সাথীর অভাব বোধ হইল বটে, কিন্তু তাহার পরে সে-ও ভুলিয়া গেল।

তাহার পরে অনেক দিন কেহ আর ধর্ম্মদাসের বিবাহ লইয়া মাথা ঘামায় নাই। কারণ, বাপের তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, পৌত্রমুখ দেখিবার জন্য চট্‌ করিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে অভাব উপরের ছয়টি ছেলে দিয়া পূরণ হইতে পারে।

দীর্ঘ আট বৎসর বিপত্নীক-জীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মদাস বিবাহের জন্য উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জমিদারের ছেলে হইলেও ধর্ম্মদাস সপ্তম এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাহার উপর মোটেই সুপুরুষ নয়। কাজেই সমান ঘরে ধর্ম্মদাসের জন্য স্বরূপা মেয়ে জুটিল না। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই দ্বিতীয় বার তাহার বিবাহ দেওয়া হইল বনিয়াদী ঘরের পাঁচপাঁচি চেহারার একটি মেয়ের সঙ্গে। অনিচ্ছাটা বাপ-মা'র দিক্ দিয়া, ধর্ম্মদাসের দিক্ দিয়া নহে। ধর্ম্মদাস বধূ পাইয়াই মোটের উপর খুশী ছিলেন।

বিবাহকালে বধূর বয়স ছিল বারো। চার বছর স্বামীর ঘর করিয়া সে-ও পূর্ব্বতন সপত্নীর পথে যাত্রা করিল। ধর্ম্মদাস প্রথমে খানিকটা চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন, তাহার পরে বাড়ীর আর কাহারও চোখে জল না দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিলেন। অবশেষে শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিয়া গেলে বাড়ীর এক প্রৌঢ় চাকরকে সঙ্গে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেক কাল কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না।

মা কাঁদিলেন, ভাইরা এবং ভ্রাতৃবধূরা নাক সিঁটকাইল, বাপ বলিলেন, "মরুক হারামজাদা।" অর্থাৎ সপ্তম, কনিষ্ঠ, এবং কুরূপ পুত্রের সম্বন্ধে যতটা উৎকণ্ঠা দেখানো চলে, তাহাও কেহ দেখাইল না।

তিন মাস পরে ধর্ম্মদাস ফিরিলেন; সঙ্গে চাকর এবং আরও একটি লোক। তাঁহার তৃতীয়া স্ত্রী।

মা আবার কাঁদিলেন। ধর্ম্মদাসের অনুপস্থিতি অনেকখানি গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল, শোকের উচ্ছ্বাস থাকিলেও ভিতরের প্রাবল্য ছিল না। কিন্তু সে যদি ফিরিয়াই আসিল, তবে আবার এ কি করিয়া আসিল? রায়-বংশের মুখে কি এমনি করিয়াই মসীলেপন করিতে হয়! কে জানে কোন্ অজ্ঞাতকুলশীল হা-ঘরের মেয়ে? ভরার মেয়ে কি না তাই বা কে জানে?

বাপ বলিলেন, হারামজাদাকে মেরে দূর ক'রে দাও। ছয় ভাই অবিলম্বে আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু সঙ্গের অবগুণ্ঠিতা মেয়েটিকে লইয়া বিপদে পড়িল। তাহাদের নিজের নিজের স্ত্রী ঠ্যাঙানো অভ্যাস থাকিলেও ভাদ্রবধূ—এবং নববধূ—তাহাকে ঠ্যাঙানো চলে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। আর নববধূর সামনেই বা তাহার স্বামীর উপর দিয়া ভূমিকম্প চালানো যায় কি করিয়া? অতএব ধর্ম্মদাস বাঁচিয়া গেলেন এবং সস্ত্রীক বাড়ীতে স্থান পাইলেন; অনেকটা মায়ের চোখের জলের জোরে।

বধূ সুন্দরী। বড় ছয় বৌ কুৎসিত নহে, কিন্তু শশিমুখীর পায়ের ধারেও তাহারা দাঁড়াইতে পারে না। তবু নববধূর আগমনে প্রায় অবশ্যম্ভাবী ঈর্ষার উৎপত্তি হইল না—শুধু তাহার স্বভাবের গুণে। এমন কি প্রথমাবধি বিরূপ শ্বশুরের মনও অবিলম্বে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু বধূর সন্তানাদি হইল না। চৌদ্দ বছর বয়সে বিবাহ হইয়া উনিশ বছর পর্য্যন্ত নিঃসন্তান থাকিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক। কিন্তু শশিমুখী নিজের গুণে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিল, তাই এত বড় খুঁৎটাও কেহ দেখিয়াও দেখিল না। সে ফল-বিহীন লতার মত পুষ্পসম্ভার লইয়া লোকচিত্ত মুগ্ধ করিয়া চলিল, ফলের অভাব কাহারও মনে আসিল না।

কিন্তু সহসা এক দিন শশিমুখী পুকুরঘাটে স্নান করিতে গিয়া ডুবিয়া গেল, আর উঠিল না।

প্রথমা ও দ্বিতীয়ার মৃত্যুতে যাহা হয় নাই, এইবার তাহা হইল। রায়-বাড়ীতে শোকের বন্যা বহিয়া গেল। বধূর জলস্ফীত বীভৎস দেহের চারিদিক ঘিরিয়া ছয় জায়ে কাঁদিল। মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিলেন। শ্বশুর শিশুর মত উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। ছয় ভাসুর সজল নয়নে বধূর মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিল। শুধু যাহার সবচেয়ে বেশী কাঁদা উচিত ছিল, সে চুপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। কেহ তাহার চোখে এক বিন্দু জল দেখিতে পাইল না।

দুই দিন পরে ধর্ম্মদাস পুরাতন চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠিক আগের বারের মত। এবারেও মা কাঁদিলেন, কিন্তু ছেলের জন্য নহে, মৃতা বধূর শোকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীতে একটা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার ছায়া পড়িল, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় যেমন হয়। আশঙ্কা যে অকারণ নহে তাহা দুই মাস পরে জানা গেল, যখন ধর্ম্মদাস চতুর্থা এবং শেষ বধূকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

তাঁহার নদীঘাট পর্য্যন্ত আগমনবার্ত্তা বাড়ীতে আগেই পৌঁছিয়াছিল। জমিদার-বাড়ীর বহির্বাটী উৎসুক জনতায় ভরিয়া গেল তামাশাটা কেমন দাঁড়ায় দেখিবার জন্য। দ্বারদেশে পিতা স্বয়ং কাষ্ঠপাদুকা হস্তে উপস্থিত থাকিলেন। অভ্যর্থনা একটু গুরুতর রকমেরই হইল, কারণ শশিমুখীর শোক শ্বশুর তখনও ভুলেন নাই।

মা কাঁদিলেন কিনা টের পাওয়া গেল না। শ্বশুর প্রাচীরের বাহিরে দণ্ডায়মানা সঙ্কুচিতা লাল চেলিপরা মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার তো কোন দোষ নেই মা, তুমি এস। কিন্তু ও হারামজাদাকে আমি চৌকাঠ পার হ'তে দেব না।

অবগুণ্ঠনের মধ্যেই মাথা নাড়িয়া বধূ অসম্মতি জানাইল। বধূ বয়স্থা, বছর ষোল বয়স হইয়াছে; এবং দুঃখ-দুর্দ্দশার বিদ্যালয়ে খানিকটা বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে।

নৌকা তখনও ঘাটে বাঁধা ছিল। ভবিষ্যদ্দর্শী ধর্ম্মদাস এ বন্দোবস্তটুকু আগেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে উজানের মুখে ধর্ম্মদাস এবং তাঁহার চতুর্থা পত্নী নীরদাকে লইয়া নৌকা ভাসিয়া চলিল, কেহ একবারও পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন না।

নদীর বাঁকে নৌকা ঘুরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মদাসের গ্রাম, তাঁহার তিরিশ বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত ছায়াশীতল পিতৃপিতামহের ভিটা চিরকালের মত পিছনে পড়িয়া রহিল।

নদীপথে কয়েকটি বৈচিত্র্যবিহীন দিনরাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরে নববধূর হাত ধরিয়া গুটিকয়েক মাত্র টাকা সম্বল করিয়া ধর্ম্মদাস কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

তখন কোম্পানীর যুগ। জীবনের অনেকগুলি বৎসর বিবাহে ব্যয় করিলেও ফাঁকে ফাঁকে ধর্ম্মদাস খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এইবার তাহা কাজে লাগিল। ধর্ম্মদাস নয় টাকা বেতনে একটি কাজ জোগাড় করিয়া ফেলিলেন।

স্ত্রীভাগ্যে ধন কথাটি যদি সত্য হয় তবে ধর্ম্মদাসের চতুর্থা স্ত্রীর ভাগ্য ভালই ছিল। কারণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই ধর্ম্মদাসের অবস্থা দিব্য ফিরিয়া গেল।

তাহার পরে আসিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ। ধর্ম্মদাস অটল হইয়া কোম্পানীর সেবা করিলেন, অর্থাৎ তিনগুণ মূল্যে গোরা সৈন্যের রসদ জোগাইলেন। অবশেষে গোলমাল মিটিয়া গেলে, এবং মহারাণী রাজ্যভার

গ্রহণ করিলে লাভ-লোকসান হিসাব করিয়া দেখা গেল, লোকসান—শূন্য। লাভ—প্রায় লক্ষ টাকা।

বিজয়সিংহ পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মদাসও এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রাম কলমীতলা ত্যাগ করিয়া চিৎপুর অঞ্চলে নূতন করিয়া রায়-বংশের পত্তন করিলেন।

ধর্ম্মদাসের প্রথম তিন স্ত্রী যাহা দিতে পারে নাই, নীরদা তাহাই দিয়াছিল ; সন্তান।

ছেলে অবশ্য খুব সুশ্রী হয় নাই। কারণ বাপ ও মা উভয়ের এক জনেরও রূপ ছিল না। কিন্তু ছেলের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, গুণে রূপের অভাব পোষাইয়া গিয়াছে, ব্যবসাবুদ্ধিতে ছেলে বাপের উপর দিয়া যায়।

ইতিমধ্যে ধর্ম্মদাস কালিদাসের বিবাহ দিয়াছিলেন ; রূপ দেখিয়া নহে, মেয়ের বাপের টাকা দেখিয়া। বাপের একমাত্র মেয়ে, এবং ছেলে নাই। অতএব শ্বশুরের টাকার অঙ্কটাও কালিদাসের হিসাবের খাতায় জমার ঘরে আশ্রয় লইল।

ক্রমাগত অর্থার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মদাস যখন একটু বিশ্রাম লইবার চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহার বয়স সত্তর হইয়াছে। ছেলে কালিদাসের বয়স হইয়াছে প্রায় চল্লিশ। বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ত তখনও হইত না, যদি না সহসা কয়েক দিনের জ্বরে নীরদার মৃত্যু হইত। ছেলের উপর ব্যবসা-পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার দিয়া ধর্ম্মদাস ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলেন।

কিন্তু অপরিমিত পরিশ্রমের মধ্যে যাহারা জীবন কাটাইয়াছে, জীবন-সায়াহ্নে তাহাদের পূর্ণ বিশ্রাম সহ্য হয় না। কর্ম্মবিরতির অলস জীবন ধর্ম্মদাসের সহিল না—বছর-দেড়েকের মধ্যেই গুরুতর অসুখে পড়িলেন।

কবিরাজ বলিলেন, "মিছে ভয় পাচ্ছেন রায়-মশায়, আপনার শরীর এখনও খাসা তাজা রয়েছে, মাসখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন। এই পাঁচনটা, আর এই—"

ধর্ম্মদাস বাধা দিয়া বলিলেন, "ও পাঁচনে আর কাজ নেই, তার চেয়ে বরং কালিদাসকে পাঠিয়ে দিন।" জীবনে ধর্ম্মদাসের এক দিনের জন্যও অসুখ করে নাই, কাজেই বাহাত্তর বৎসরের এই অসুস্থতা যে প্রথম এবং শেষ অসুস্থতা সে-বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

কালিদাস আসিল, পৌত্র শিবদাস আসিল। শিবদাসের বয়স কুড়ি, বছর-দুই আগে লেখাপড়ার পাট তুলিয়া দিয়া অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মদাস বলিলেন, "শিবু, এ কারবার আমি কেমন ক'রে গড়ে তুলেছি, জান ত?"

শিবদাস জানে।

"তোমার বাবা তৈরি কারবারে ঢুকেছিল। তুমি তার চেয়েও ঢের বেশী তৈরি কারবারে ঢুকেছ। একে বাঁচিয়ে রেখো। রায়-বংশের মান যেন ঠিক থাকে।"

রায়-বংশের মান ঠিকই থাকিবে। প্রথম-যৌবনে দুস্তর সমুদ্রে ফুটা নৌকা ভাসাইয়া ধর্ম্মদাস পাড়ি জমাইয়াছিলেন। সগৌরবে তীরে আসিয়াছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে একটি মাত্র জিনিষের চিন্তা তাঁহার মন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা অর্থ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন অর্থাগম হইল, প্রয়োজন যখন আর রহিল না, তখনও অর্থের নেশা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না। পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে না, টাকার থলি, নোটের তাড়া ও কোম্পানীর কাগজের চারিদিকে ঘোরে, এ সত্য ধর্ম্মদাস প্রথম যৌবনেই জানিয়াছিলেন।

সেই প্রবল অর্থচিন্তার মধ্যে কালিদাসের জন্ম। তাহারই পুত্র শিবদাস। অতএব অর্থের দিক্ দিয়া রায়-বংশের সম্মানরক্ষা সম্বন্ধে কোন চিন্তার কারণ ছিল না।

শেষ দিনে পুত্র, পৌত্র, দুই কন্যা এবং গুটিকয়েক দৌহিত্র-দৌহিত্রী-পরিবৃত অবস্থায় মুমূর্ষু ধর্ম্মদাস বলিলেন, "তোমরা কেঁদো না, আমি তার কাছে যাচ্ছি।"

তার কাছে অর্থে নীরদার কাছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তিনী সর্ব্বমঙ্গলা, বিরাজমোহিনী, এবং শশিমুখীর সম্বন্ধে ধর্ম্মদাসের মতামত জানা গেল না।

কবিরাজ সূচিকাভরণ লইয়া শেষ চেষ্টা করিতে গেলেন। ধর্ম্মদাস বলিলেন, "চুলোয় যাও।" তাহার পর মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল, মনে হইল কি যেন বলার চেষ্টা করিতেছেন। কিছু শোনা গেল না, শুধু নিমীলিত দুই চোখ দিয়া দুইটি

জলরেখা বহিয়া গেল। রোরুদ্যমানা বড় মেয়ে বাপের মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কিছু বলছেন?" তিনি চুপিচুপি বলিলেন, "কলমীতলার জন্তে মন কেমন করছে।"

কিন্তু আর সময় নাই। কলমীতলায় ফিরিবার লগ্ন বহু বহু বৎসর আগে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান, তাঁহার শৈশব-কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র, ছায়াচ্ছন্ন বনানীবেষ্টিত কলমীতলার জন্য আজ আর মন কেমন করিলেই বা কি? সাতচল্লিশ বৎসর আগে যে-গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছেন, আজ তাহা বহু দূরে পড়িয়া আছে, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আর নাই।

সে পুরাতন রায়-বংশেরই বা কি হইয়াছে, কে জানে? আর একটি লক্ষ্মীর মত রূপসী কিশোরী, তাঁহার বার্দ্ধক্যের জীবনের মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে যাহার স্মৃতি উঁকি মারিয়াছে, কি ছিল তাঁহার নাম? ধর্ম্মদাস মনে করিতে পারিলেন না।

মধ্যরাত্রিতে বিকারের ঘোরে ধর্ম্মদাস সহসা অস্পষ্ট স্বরে কাহাকে যেন ডাকিলেন, "শশিমুখী!" ছেলেমেয়ে নাম শুনিয়া কিছু বুঝিল না, অবাক হইয়া রহিল।

একটু পরে ধর্ম্মদাস মারা গেলেন।

·

এমনি করিয়া বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। কত শীত-গ্রীষ্ম-বসন্তের আবর্ত্তন, কত দুর্ভিক্ষ, কত রাষ্ট্রবিপ্লব। ধর্ম্মদাস গেলেন, কালিদাস গেলেন, শিবদাসও গেলেন। পুরুষানুক্রমে একটি জিনিসের ধ্যানে তিন পুরুষের জীবন কাটিল, বাহিরের পৃথিবী, যেখানে আকাশে চাঁদ ওঠে, বসন্তে বন পুষ্পসম্ভারে ভরিয়া যায়, যে পৃথিবীতে মানুষ ভালবাসে, দুঃখকষ্টবেদনায় জর্জ্জরিত হয়, এবং সেই দুঃখের মধ্য দিয়া সুখ খুঁজিয়া বাহির করে, এই জন্মমৃত্যু-আনন্দবেদনার আবর্ত্তনময় পৃথিবী, তাহার সংবাদ কেহ রাখিলেন না। অগণিত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গেল, অন্ধকার রাত্রির আকাশে কত তারকা কত দীপ জ্বালিল, এ-সব তাঁহাদের চোখে পড়িল না।

শিবদাস পিতা ও পিতামহের মত দীর্ঘজীবী হন নাই। কাজেই পুত্র দেবীচরণ যখন কারবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ত্রিশ। দেবীচরণ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। লেখাপড়া অর্থে ব্যবসায়ের কাজে যতটুকু লাগে ততটুকু নহে, সে-রকম লেখাপড়ায় তাঁহার আগের তিন পুরুষও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু দেবীচরণ যে-যুগে জন্মিয়াছিলেন, সে-যুগে ইংরেজী না-শিখিলে চলে না। দেবীচরণ স্কুল ও কলেজে পড়িয়া কালোপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া তবে ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছিলেন।

বিপদ বাধিয়াছিল ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী লইয়া। দেবীচরণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেন, তখন দেবীচরণের বয়স পঁয়তাল্লিশ। সাধারণ অবস্থায় সে বয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহ না করিলেও চলে, কিন্তু দেবীচরণের সাধারণ অবস্থা নহে, তাঁহার ব্যবসায়, তাঁহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার রাশি, সে-সবের ত একটা সদ্গতি হওয়া দরকার? দেবীচরণ আবার বিবাহ করিলেন, গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া। এবং দুই বৎসর পরে পঞ্চম পুরুষ অসিতরঞ্জনের জন্মের পর দেখা গেল, রায়-বংশে নূতন জিনিস আসিয়াছে, রূপ। কিন্তু ছেলেকে জন্ম দিতে গিয়া মায়ের জীবন শেষ হইয়া গেল, কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সম্মিলিত চেষ্টাতেও তাঁহাকে বাঁচান গেল না। দেবীচরণ ছেলেকে বুকে লইয়া স্ত্রীর শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, হয়ত ভুলিলেনও।

সান্ত্বনার কারণ ছিল। রায়-বংশের অতুল বৈভব ভোগ করিবার মত উত্তরাধিকারী আসিয়াছে। যে উত্তরাধিকারীর জন্য দেবীচরণকে একান্ত অনিচ্ছায় প্রৌঢ় বয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে হইয়াছিল।

অসিতের পঁচিশ বৎসর বয়সে দেবীচরণ পুত্রবধূ আনিলেন। রূপবান্ ছেলের জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন অসামান্য রূপ। সে-রূপ ধনীর ঘরে পাওয়া গেল না; পাওয়া গেল দরিদ্র কেরাণীর ঘরে। কিন্তু অসিতের জন্য বহু টাকার মালিক শাঁসালো শ্বশুরের প্রয়োজন নাই, টাকা তাহার ঘরেই আছে।

সুমিত্রার রূপ যেন আগুনের শিখা। কিন্তু তাহাতে

দাহ নাই, আছে স্নিগ্ধ প্রভা, যাহা শুধু বাংলা দেশেই মেলে।

দেবীচরণ বৃদ্ধ বয়সে আফিং ধরিয়াছিলেন। কারবারের কাজ ছেলের হাতে দিবার ফলে যে অবসরটুকুর সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহা ভরাট করিবার উদ্দেশ্যে। আফিঙের নেশায় মানুষের দেহটাকে যেমন ঝিমাইয়া দেয়, সম্ভবতঃ মনটাকে তেমনি সক্রিয় করিয়া তোলে। দেবীচরণ যৌবনকালের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সে স্বপ্নের বিষয়বস্তু ছিল তাঁহার প্রথমা পত্নী মহামায়া এবং—টাকা।

কিন্তু সহসা বিধবা বোন আসিয়া চুপি চুপি এমন একটি সংবাদ দিয়া গেলেন, যে এক মুহূর্ত্তে তাঁহার মনের বয়স কুড়ি বছর কমিয়া গেল, সিকি ভরি পরিমাণ আফিংও যাহা করিতে পারে নাই। রায়-বংশে নূতনতম উত্তরাধিকারী আসিতেছে, নবপর্য্যায়ের ষষ্ঠ পুরুষ।

সে যে উত্তরাধিকারী না হইয়া উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে, সে সম্ভাবনা তাঁহার মনে আসিল না। নাতির নাম কি দিবেন, ভাবিতে ভাবিতে ডাকিলেন, "বৌমা!"

সুমিত্রা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আহ্বানের কারণটা অনুমান করিয়া মুখে আসিয়াছিল রক্তাভা। বলিল, "ডাকছেন বাবা?"

গড়গড়ার নলটা নামাইয়া চোখ মেলিয়া দেবীচরণ বলিলেন, "হ্যাঁ, ডেকেছিলাম, কিন্তু এখন আর দরকার নাই। আর দেখো, বেশী যেন ছুটাছুটি ক'রো না।"

বধূ পলাইয়া বাঁচিল।

তাঁহার পৌত্রের নামের জন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। দেবীচরণ তাক হইতে অভিধান-খানা খুলিয়া বসিলেন।

রায়-বংশের আগামী ষষ্ঠ পুরুষ। তাহার নাম চট করিয়া দেওয়া চলে না, আগমনসম্ভাবনা হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়!

গোলমাল বাধাইল অসিত। মাস-চারেক পরে এক দিন আপিস হইতে ফিরিয়া বলিল, "বাবা, আমার একটু যে না বেরোলে চলে না!"

দেবীচরণের ঝিমানি আসিয়াছিল। তন্দ্রা ভাঙিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ! বেরোতে হবে? কোথায়?"

"বিলেতে। বেশী না, মাস-ছয়েকের জন্যে।"

দেবীচরণের সিকি ভরি আফিঙের নেশা এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল। ইজি-চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া অব্যক্ত স্বরে বলিলেন, "তার মানে?"

বিলাতের যে-কয়টি কোম্পানীর সহিত ইহাদের ব্যবসাসূত্রে সম্বন্ধ, স্বয়ং গিয়া এক বার তাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া উপযুক্ত চাল চালিতে পারিলে লাভের যে আশা আছে, তাহার সহিত তুলনায় সাময়িকভাবে ভারত হইতে অনুপস্থিতি কিছুই নহে। দেবীচরণ ধর্ম্মদাস রায়ের প্রপৌত্র, ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সময় লাগিল না।

বলিলেন, "কিন্তু বৌমা?"

বিদেশগমনের বিপক্ষে ইহার চেয়ে বড় যুক্তি আর হইতে পারে না। অসিতরঞ্জন দিন-পনের ধরিয়া সংশয় দোলায় দুলিল, তাহার পর রায়-বংশের উপযুক্ত প্রতি-নিধির মত যাওয়াই স্থির করিল। বেশী দিনও আর নয়! মাস-ছয়েক; কমও হইতে পারে।

বধূ আপত্তি করিল না। অবশ্য মৌখিক আপত্তি না করিলেও তাহার মৌন আপত্তির পরিমাণ উপলব্ধি করিতে অসিতের কষ্ট হয় নাই, তাই হাওড়া স্টেশনে বিদায়কালে যখন সে সুমিত্রাকে বলিল, "ভেবো না সুমি, কোন রকমে চোখ-কান বুজে এই কটা দিন কাটিয়ে দাও, কেমন?" তখন বধূ অশ্রুগোপনের কোন চেষ্টা করিল না। এক প্লাটফর্ম জনতার সামনেই ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গাড়ী প্লাটফর্ম ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। দেবীচরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "দুর্গা, দুর্গা!"

পর দিন বধূর চোখমুখের চেহারা লক্ষ্য করিয়া দেবী-চরণ শঙ্কিত হইলেন। বলিলেন, "বৌমা, অসুখ করে নি ত?"

বধূ মাথা নাড়িল।

শ্বশুর চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তাই ত!" একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দিনকতক তোমার বাবার কাছে বেরিয়ে এসো।" বধূ ইহাতেও সম্মতি দিল না। রায়-

বংশের বধূ কথায় কথায় কেরাণী পিতার বাড়ী গেলে বংশ-মর্য্যাদা যে খানিকটা ক্ষুন্ন হয়, পিসিমার মারফত সে খবর সে আগেই পাইয়াছিল। বাহির হইতে মনে হইতে পারে পিসিমা দেবপূজা ও জপের মালা ছাড়া আর কিছু জানেন না, কিন্তু সে ধারণা ভুল হইবে। সুমিত্রা যে গরীবের মেয়ে হইয়াও এ বাড়ীর বধূরূপে আসিতে পারিয়াছে, তাহা যে নিতান্তই পূর্ব্বজন্মের অশেষ পুণ্যফলে, তাহারও আভাস-ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। ইঙ্গিতের উপরে বেশী দূর উঠিতে পারেন নাই, কারণ তিনি ভাই এবং ভাইপোকে ভয় করিতেন। কিন্তু ঐটুকুই সুমিত্রাকে বুঝানোর পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল, সুমিত্রা বুদ্ধিমতী মেয়ে।

মাসখানেক আগে বধূ এক বার বাপের বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছে, কয়েক দিনের জন্য। আবার ইহারই মধ্যে আর এক বার যাওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। অগত্যা ঠিক হইল কলিকাতার বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া। শ্বশুর এই বার নিজের অসুস্থ শরীরের দোহাই পাড়িলেন, ফলে বধূ আপত্তি করিতে পারিল না।

কিন্তু কালিম্পং দূরে থাক, বাড়ীর বাহির হওয়াই ঘটিয়া উঠিল না।

জিনিসপত্র গাড়ীতে উঠানো হইয়াছে। দেবীচরণ বধূর সাহায্যে নামিতে গেলেন। নামিবার জন্য যে সত্যই সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, তাহা নহে। সত্তর বৎসর বয়স হইলেও দেবীচরণ ততটা অশক্ত হন নাই। কিন্তু বার্দ্ধক্যের খানিকটা বিলাসিতা তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; যতটা পরিশ্রম না করিলে নয়, তাহার বেশী খাটিতে তিনি রাজী ছিলেন না।

সিঁড়ির কার্পেটে সম্ভবতঃ কোন দোষ ছিল, দেবীচরণের পা হড়কাইয়া গেল। পড়িয়াই যাইতেন, শুধু বধূ ধরিয়া থাকার ফলে সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু টাল সামলাইতে না পারিয়া সুমিত্রা বাকী পনের-ষোলটা ধাপ দিয়া গড়াইয়া নীচে পড়িল।

দুর্ঘটনার ইতিহাস ইহাই।

চাকর-বাকর ছুটিয়া আসিল, পিসিমা আসিলেন। সুমিত্রার অচেতন দেহ লইয়া ড্রইং-রুমে সোফার উপর শোয়ানো হইল। শোফার গাড়ী লইয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল।

ডাক্তার যখন আসিলেন, তখন দেবীচরণ প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছেন। শুধু তাঁহার পতন নিবারণ করিতে গিয়াই যে দুর্ঘটনাটা ঘটিল, ইহাতে তিনি অধীর হইয়াছিলেন আরও বেশী। কি দুর্ঘটনার গুরুত্ব তখন পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ডাক্তার রোগিণীকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

দেবীচরণ খানিকটা ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "হাসপাতাল? হাসপাতাল কি হবে?"

কিন্তু আপত্তি টিকিল না। অচেতন সুমিত্রাকে লইয়া গাড়ী হাসপাতালের দিকে ছুটিল। দেবীচরণ ড্রইং-রুমের এক প্রান্তে নির্জ্জীবভাবে বসিয়া রহিলেন, একটি কথাও কহিলেন না, সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাবও করিলেন না।

রাত বারোটার সময় ডাক্তার আবার আসিলেন। দেবীচরণ তখনও তেমনি ভাবেই বসিয়া আছেন। ডাক্তার একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিলেন, "মিঃ রায়!"

দ্বিতীয় বার ডাকার পর দেবীচরণ মুখ তুলিলেন। এতক্ষণে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। যে কোন দুঃসংবাদের জন্য তিনি প্রস্তুত। বলিলেন, "বৌমা এখনও বেঁচে আছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "না না, সে কি, সে ভয় করবেন না। বৌমা ভালই আছেন, মানে যতটা ভাল থাকা সম্ভব। আপনি বরং কাল এক বার গিয়ে দেখে আসবেন। কিন্তু—"

ডাক্তারকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া দেবীচরণ বলিলেন, "কি? আমি সব শুনতে পারব। বৌমার পেটের সন্তান—"

"আর নেই", বাকী কথাটা ডাক্তার পূরণ করিয়া দিলেন।

দেবীচরণ রাত্রির অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

যে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর জন্য এত উৎসাহ, এত আনন্দ, যাহার জন্য ছ-মাস ধরিয়া চিন্তা করিয়াও উপযুক্ত

নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহার নামেরই কোন প্রয়োজন হইল না। কাহার অপরাধে?

দেবীচরণ স্থির করিলেন, অপরাধ তাঁহারই, আর কাহারও নহে।

অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দুর্ঘটনা এমন কিছু বড় নহে, এ রকম ত হামেসাই হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর যে-সব শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মাতৃগর্ভেই বিদায় লয়, তাহারা ত কেহ রায়-বংশের উত্তরাধিকারী নহে!

রায়-বংশের উত্তরাধিকারী! দেবীচরণ বার-কয়েক মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করিলেন, তাহার পরে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাহার জন্য? অজাত শিশুর শোকে? রায়-বংশের উত্তরাধিকারীর শোকে? না, তাঁহারই দোষে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিল, তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া, সেই লজ্জায়? দেবীচরণ নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

হাসপাতাল হইতে ফিরিতে সুমিত্রার দিন-পনের লাগিল। যেদিন প্রথম বাড়ী ফিরিল, সেদিন কিন্তু বধূকে দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বধূর স্বাস্থ্যহীন মুখ, পাণ্ডুর বর্ণ দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল। দেবীচরণ বধূকে বুকে লইয়া কাঁদিলেন। তাহারই জন্য, উত্তরাধিকারীর শোকে নহে।

দুর্ঘটনার বিবরণ অসিতকে লেখা হইয়াছিল। আহত সে হইয়াছিল, কিন্তু এতখানি শোকাচ্ছন্ন হওয়ার কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। লিখিয়াছিল, "আমাদের প্রথম সন্তানের শোকে এতখানি অভিভূত হয়ে পড়লে চলবে না। তোমার শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করব না। শুধু একটা কথা বলব—courage! জীবনপথে অনেক বিপদ আসে, এ শুধু তাদেরই একটা: এ বিপদ আমাদের তুচ্ছ ক'রে চলতে হবে।"

কিন্তু সুমিত্রা সান্ত্বনা পাইল বলিয়া মনে হইল না।

চার মাস পরে অসিত ফিরিল। দেবীচরণের শরীর ভাল ছিল না, তিনি স্টেশনে গেলেন না। বধূর পক্ষে তখনও যাওয়া সম্ভব নয়। অসিত স্টেশন হইতে একাই বাড়ী আসিল।

পিসিমা তারস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ অসিতের আগমনে তাহার ছেলের শোক তাঁহার বেশী করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। অসিত সেদিকে তাকাইলও না; এমন কি তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য প্রণামটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল।

সুমিত্রা কাঁদিতেছে। অসিত দুই হাতে তাহাকে উঠাইয়া বলিল, "ছিঃ সুমি, আজও কাঁদছ? এতটুকু কষ্ট যদি সহ্য করতে না পার, তাহ'লে এর চেয়ে বড় দুঃখ যদি কোনদিন পাও, তখন কি করবে?"

কিন্তু সুমিত্রা তাহার চেয়েও বড় দুঃখ পাইয়াছে। অজস্র অশ্রুর মধ্যে সে দুর্ঘটনার ইতিহাস খুলিয়া বলিল। অসিত বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রায়-বংশের উত্তরাধিকারী আর আসিবে না। একটি ক্ষুদ্র দুর্ঘটনার ফলে সুমিত্রার মা হওয়ার অধিকার চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

এক শত বৎসর আগে ধর্ম্মদাস রায় নূতন করিয়া যে রায়-বংশের পত্তন করিয়াছিলেন, পঞ্চম পুরুষে আসিয়া সেই রায়-বংশ নিঃশেষ হইয়া গেল।

পিসিমা ডাক ছাড়িয়াই কাঁদিতেন, শুধু অসিতের চোখের দিকে তাকাইয়া ক্রন্দনের মাত্রা সংযত রাখিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদাকে কে বলবে?"

দেবীচরণকে কেহ বলিবে না। যে আঘাত অসিত ও সুমিত্রা পাইয়াছে, বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য দেবীচরণকে তাহার অংশীদার করিয়া লাভ কি?

পিসিমা কান্না থামাইয়া বলিলেন, "আমি বলব'খন।" অসিত খানিকক্ষণ তাঁহার দিকে চুপ করিয়া তাকাইয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, "তাহ'লে তোমাকে আমি খুন করব।"

কিন্তু অবশেষে পিসিমাই বলিলেন। দেবীচরণ শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন, কথা বলিলেন না।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। সুমিত্রার স্বাস্থ্য খানিকটা ফিরিয়াছে, কিন্তু তাহার মনে হয়, না ফিরিলেই ছিল ভাল।

রায়-বংশের দেশজোড়া নাম, বিপুল অর্থ, নাই শুধু উত্তরাধিকারী। এ সমস্যার সমাধান করিবে কে?

সমাধান ছিল। সে-সমাধান সর্ব্বপ্রথম পিসিমার মাথাতেই আসিল। এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তিনি দেবীচরণের কাছে কথাটা উত্থাপন করাই স্থির করিলেন। কারণ তাঁহার কাছে দুইটি ক্ষুদ্র নরনারীর সুখদুঃখের চেয়ে বড় কথা ছিল, তাহা রায়-বংশের স্থায়িত্ব। তিনি থাকিতে, এবং উপযুক্ত উপায় থাকিতে, রায়-বংশ এমন করিয়া লোপ পাইবে, এ চিন্তা অসহ্য।

দেবীচরণের ঘরে গিয়া অর্দ্ধসুপ্ত দেবীচরণকে তিনি ডাক দিলেন, "দাদা।"

দেবীচরণ অসুস্থ ছিলেন বলিয়াই পিসিমা সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

যে সুমিত্রা বৃদ্ধ শ্বশুরকে এমনি করিয়া বাঁচাইয়াছে, শুধু বংশরক্ষার জন্য তাহার অবমাননা করিয়া অসিতের বিবাহ দেওয়ার কল্পনা পিসিমার পক্ষে সহজ হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে নহে। তিনি মানুষ, কসাই নহেন।

পিসিমা আপন মনে গজগজ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। খুব বেশী আহত হইলেন না, কারণ এ-রকম যে হইবে, তাহা তিনি আগে হইতেই আন্দাজ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মাসখানেক পরে এক দিন চাকর সন্ধ্যাবেলায় দেবীচরণের ঘরে গিয়া দেখিল তিনি ইজিচেয়ারে শুইয়া আছেন, দৃষ্টি নিষ্প্রভ।

যে দেবীচরণকে বাঁচাইতে গিয়া দুর্ঘটনা, এবং যে দুর্ঘটনার এই পরিণতি, বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনিও বিদায় লইলেন। অসিত খবর পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া সংক্ষেপে কহিল, "যাক্, বেঁচে গেছেন।"

সুমিত্রার দিন আর কাটিতে চায় না। যে ভবিষ্যতের আশায় মানুষ শত দুঃখের মধ্যেও সাহসে বুক বাঁধিয়া বসিয়া থাকে, সেই ভবিষ্যৎই যখন এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যায়, তখন সান্ত্বনার আর কিছু বাকী থাকে কই? এক-একটি দিনকে এক যুগ বলিয়া মনে হয়।

তবু দিন কাটে। যেমন করিয়া পথের ভিখারীর কাটে, কোটিপতির কাটে, তেমনি করিয়া। হেমন্তের দিন ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসে, শীতের কুয়াশায় গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। আবার ধীরে ধীরে নিষ্পত্র শ্রীহীন গাছগুলি নবকিশলয়ে ভরিয়া উঠে, আমগাছে মুকুল ধরে—

কিন্তু তাহার জীবনে শীতের আগমনে সতেজ সবুজ পাতা শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া ঝরিয়াই গেল, বসন্তের আবির্ভাবে নূতন পাতা আসিল কই? এমনি করিয়া নিষ্পত্র নিষ্ফল জীবন তাহার কত দিন চলিবে? যে অন্ধকার রাত্রির অবসান নাই, সে-রাত্রি হইতে নিষ্কৃতি কবে?

সে তেমনি সুন্দরী রহিয়াছে! কিন্তু এ নিষ্ফল রূপ লইয়া চিরবন্ধ্যা নারীর জীবন লইয়া সে কি করিবে? তাহার বৃহত্তম কর্ত্তব্যই ত সে পালন করিতে পারিল না! রায়-বংশের উত্তরাধিকারী কোথায়?

চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যায়।

পিসিমা পরমসাহসে আবার কথা পাড়িলেন। অসিত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "রাঁচি যাবে?"

পিসিমা ললাটে করাঘাত করিয়া সরোদনে বলিলেন, "এই না হ'লে আমার কপাল! না হ'লে নিজের ভাইপো, নিজের মায়ের পেটের ভায়ের ছেলে, সে এমনি কথা বলে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর?"

অসিত যথাসম্ভব সংযতস্বরে বলিল, "কে তোমাকে চুরি করতে বলেছে, আমি?"

"তুই বল্‌বি কেন? কিন্তু আমি ত এই রায়-বংশের মেয়ে, বংশটা যাতে থাকে, সেটা দেখা ত আমার কাজ! দাদাকে বললাম, মারতে এলেন। দাদা গেলেন, তোকে বললাম, তুই,—" ক্ষোভে, অপমানে, পিসিমা ফোঁপাইয়া উঠিলেন।

অসিত চলিয়া গেল।

অথচ এ সম্ভাবনাটা যে তাহার মনেও উদয় না হইয়াছিল, তাহা নহে। বংশরক্ষার কথা ভাবিয়া তত নহে, যতটা তাহার বিপুল অর্থের ভবিষ্যৎ মালিকের কথা ভাবিয়া। তাহার এবং সুমিত্রার অবর্ত্তমানে এত টাকার কি গতি হইবে?

সন্তানের জন্য সন্তান, এবং টাকার জন্য সন্তান, কোন্‌টা মুখ্য, তাহাই শুধু ভাল করিয়া বুঝা গেল না।

অসিত আপন মনেই বলিল, "কিন্তু আমি ত কসাই নই, আমি মানুষ!"

যেন কসাইরা মানুষ নহে।

হয় পিসিমার ধৈর্য্য অসাধারণ, অথবা তিনি অসিতের কথার ভাবে কোন রকম দ্বিধার আভাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, বার-কয়েক অধ্যবসায় সহকারে বুঝাইলেই অসিত শুধু ক্লান্ত হইয়াই বিবাহে মত দিবে। অতএব তিনি আবার এক দিন সন্ধ্যায় নিভৃতে অসিতকে ধরিলেন।

অসিত বলিল, "চুপ কর।" পিসিমার কানে গলার স্বরের মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা ধরা পড়িল। তিনি আশান্বিত হইয়া বলিলেন, "বাবা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই আর একটা বিয়ে কর। বউমাকে ত ত্যাগ করতে বলছি নে, বৌমা আমার সোনার পিত্তিমে—" দক্ষ রাজনীতিকের মত তিনি চোখে আঁচল দিলেন। সময় বুঝিয়া অশ্রুমোচন করিলে যে সময়ে সময়ে আশাতীত ফল লাভ করা যায়, তাহা তিনি জানিতেন।

অসিত অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "ও ঘ্যানর ঘ্যানর আমার ভাল লাগে না। যা পারব না—"

পিসিমা বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন পারবি নে বাবা আমার? তোর ঠাকুরদার ঠাকুরদা পর-পর চারটে বিয়ে করেছিলেন।"

অসিত বলিল, "বড় কাজই করেছিলেন।"

অথচ তিনি চতুর্থ বার বিবাহ না-করিলে রায়-বংশেরই উৎপত্তি হইত না। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও উত্তরাধিকারীর যুগ্ম সমস্যাও উঠিত না। এক হিসাবে ভালই হইত। অন্ততঃ অসিতের তাহাই মনে হইল।

পিসিমা ইনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোকে ত আমি আর চারটে বিয়ে করতে বলছি নে। আর একটা বিয়ে কর, ঘরে সোনার চাঁদ ছেলে আসুক, আমি রায়-বাড়ীর বংশধর দেখে চোখ বুজি। ধর্ম্মদাস রায়ের নাতির নাতি তুই, তিনি করেছিলেন চার-চারটে বিয়ে—"

একই কথার পুনরাবৃত্তি অসিতের ভাল লাগিতেছিল না। বলিল, "কিন্তু তিনিও এক স্ত্রী বেঁচে থাকতে আর একটা বিয়ে করেন নি।"

পিসিমা একটা কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা কাহার পদশব্দে চুপ করিয়া গেলেন। অসিত পিছন ফিরিয়া দেখিল সুমিত্রা।

সুমিত্রা অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, "বেশ ত লোক তুমি! আপিস থেকে ফিরে না খেয়ে-দেয়েই গল্প জুড়েছ! উমানন্দকে বলি, খাবার দিক!"

অসিত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। তাহা হইলে তাহাদের আলোচনা সুমিত্রার কানে যায় নাই!

সবটা যায় নাই, শেষের কথা কয়টি গিয়াছিল।

সমস্যার এমন একটা সহজ সমাধান হাতের কাছেই রহিয়াছে, অথচ তাহার একবারও খেয়াল হয় নাই! আশ্চর্য্য!

এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অসিত আবার বিবাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু স্ত্রীর অবর্ত্তমানে ত আর কোন বাধা নাই! আর সে বাধা ত সে নিজের হাতেই সরাইয়া দিতে পারে!

আঘাত! আঘাত ত লাগিবেই! অসিতকে সে ভালবাসে, শুধু মেয়েমানুষে যেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, তেমনি ভাবে। কিন্তু জীবনের বন্ধুর পথে বিনা ব্যথায় কোন্ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে? আর, সে আত্মহত্যা করিবে শুধু প্রেমাস্পদকে সুখী করিবার জন্য। আঘাত সেখানে তুচ্ছ।

শুধু একটি কথা ভাবিয়া কূলকিনারা মেলে না, অসিতকে সে বিনা দ্বিধায় ছাড়িয়া যাইবে কি করিয়া। এই তিন বৎসর যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে বাঁচিয়া আছে, অসীম দুঃখের মধ্য দিয়া যাহার সন্নিধানে সে অপরূপ সুখ পাইয়াছে, এক কথায় তাহাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বাইশ বছরের পরিচিত পৃথিবীকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে, কোন্ অজ্ঞাত দেশে?

ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্য হইতে এতটুকু আলো দেখা যায় না। সে যদি বাঁচিয়াই থাকে, তাহাতেই বা লাভ কি? হয়ত অসিত এখনও তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু

সুদূর ভবিষ্যতেও যে বাসিবে, কে বলিল। কবে কোন্ বিপুল অর্থের নিঃসন্তান অধিকারী বন্ধ্যা স্ত্রীকে চিরকাল ভালবাসিতে পারে? এক দিন যদি অসিতের প্রেম সে হারায়, তবে সে দোষ দিবে কাহাকে? অসিত ত দেবতা নহে, মানুষ মাত্র!

তাহার চেয়ে আত্মহত্যা অনেক সোজা। অসিত শোকে অধীর হইবে, হয়ত বহুকাল শোকাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু সময় তাহার সহায়। আটাশ বছরের যুবক চিরদিন মৃতা পত্নীর স্মৃতি বুকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে না।

এক দিন নববধূ আসিবে আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে। সেই মেয়েটাই এক দিন অসিতকে সুমিত্রার শোক ভুলাইয়া দিবে। আরও বেশী করিয়া ভুলাইবে রায়-বংশের উত্তরাধিকারীর জন্মের পর। শুধু এইটুকুর আশাতেই ত সে এত শীঘ্র স্বেচ্ছায় চিরকালের মত অসিতকে ছাড়িতে প্রস্তুত হইতেছে!

হয়ত এক গভীর নিশীথে সুন্দরী নববধূকে বক্ষে লইয়া সহসা সুমিত্রার কথা মনে পড়িবে, ক্ষণিকের জন্য। হয়ত অসিতের দীর্ঘ দুই চোখ মুহূর্ত্তের জন্য ঝাপসা হইয়া আসিবে; তাহার পরে আবার ভুলিয়া যাইবে।

শুধু এই স্মৃতিটুকু যদি ক্ষণে ক্ষণে অসিতের ভবিষ্যতের রঙীন দিনগুলিকে দোলা দেয়, তাহাতেই সে খুশী। শুধু, যেন অসিত তাহাকে একেবারে ভুলিয়া না যায়, চির-বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে তাহার স্মৃতি লুপ্ত না হয়।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সুমিত্রা ডাকিল, "ভগবান্, আমাকে বল দাও, সাহস দাও!"

যেন অনন্ত আকাশের এক কণা ধূলির জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠার অবধি নাই! যেন তিনি সর্ব্বদাই পৃথিবীর শত কোটি নির্ব্বোধ মানুষের কাতর প্রার্থনা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া আছেন!

তখন ইউরোপের দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবী সভ্য মানুষের অসভ্য বর্ব্বরতার দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া আছে, কখন কাহার পালা আসে কেহ জানে না।

অসিতের আপিস হইতে ফিরিতে আজকাল রাত হইয়া যায়, সুমিত্রা জানালার পাশে একাকী বসিয়া থাকে। সময় কাটে, অতি ধীরে—এত ধীরে, যে মনে হয় কাল স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

সুমিত্রা মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক দিন আগে দেবীচরণের অসুখের সময় নানা রকম ঔষধ আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটা মালিশের ঔষধ ছিল। গায়ে লেখা আছে "Poison", এবং নীচে একটা নরকপাল ও দুই টুকরা হাড়ের ছবি আছে। সুমিত্রা ভাল করিয়া নামটা পড়িয়া দেখিল। বিষই বটে! হয়ত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু নাও হইতে পারে, কিন্তু পুরা এক শিশি সেবনে এক সময় না এক সময় মৃত্যু আসিবেই। হয়ত অতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু, কিন্তু সে যন্ত্রণা সহিবার শক্তি তাহার আছে।

রাত নয়টা বাজিয়াছে। অন্ধকারে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে একটিও তারা নাই।

ভবিষ্যৎ এই বর্ষণাকুল আকাশের চেয়েও অন্ধকার। অন্ধকার কালো মেঘের পশ্চাতে শুক্লা-দ্বাদশীর চাঁদ আছে, সহস্র কোটি তারার মালা আছে, কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ তাহার জন্য কি রাখিয়া দিয়াছে কে জানে?

স্বর্গ-নরক বলিয়া সত্যই কিছু আছে কি? যদি থাকে, তবে ভগবানের বিচারে আত্মহত্যার শাস্তি অনন্ত নরক। হোক না, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

অথবা হয়ত মৃত্যুর পরপারে আছে অনন্ত বিস্মৃতি। যেখানে দেহাতীত আত্মা অনন্তকালব্যাপী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে, যেখানে এই ছোট পৃথিবীর সুখদুঃখ, আনন্দ-বিষাদ কিছুরই তরঙ্গ পৌঁছায় না।

সুমিত্রা চিঠি লিখিতে বসিল। তাহার শেষ চিঠি, শেষ প্রণয়লিপি। বার-কয়েক পড়িয়া চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কি হইবে চিঠি দিয়া?

সহসা সুমিত্রা শিহরিয়া উঠিল। এ কি করিতেছে সে? চিরকাল ধরিয়া শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে আত্মহত্যা মহাপাপ, সে শিক্ষা হঠাৎ ভুলিয়া গেল কেমন করিয়া?

যদি অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলোর রেখা পাইত!

কিন্তু তাহার তমসাচ্ছন্ন জীবনের পথে এক দিন যে আলো অসিত জালিয়াছিল, সে আলো আর জলিল না, সে আলো আর জলিল না, সে আলো আর জলিল না—

সিঁড়িতে কাহার পায়ের শব্দ। অসিত আসিয়াছে। আজকের মত মাহেন্দ্রক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে, আর সময় নাই। হয়ত কাল আবার সময় মিলিবে। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি শিশিটা লুকাইয়া রাখিল।

অসিতের মুখ উজ্জল। হয়ত কোন সুখবর আছে। হয়ত কারবারে লাভের অঙ্ক আশাতিরিক্ত মোটা হইয়াছে। কিন্তু সুমিত্রার তাহাতে কি আসিয়া যায়? নিঃসন্তান অসিতের উত্তরাধিকারীবিহীন রায়-বংশেরই বা তাহাতে কি আসিয়া যায়?

সুমিত্রা শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, "খবর কি? এত খুশী যে?"

অসিত স্মিতমুখে বলিল, "সুখবর আছে।"

"সুখবর?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা সুমি, আমাদের বংশের টাকার ইতিহাস তুমি জান?"

"জানি। তোমার পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মদাস রায় প্রথম কারবার আরম্ভ করেন, তাই না?"

"তাই। তিনি পাঁচ পুরুষ আগে যে রায়-বংশের পত্তন করেছিলেন, পঞ্চম পুরুষে এসে তা শেষ হয়েছে। যে টাকার আরম্ভ তাঁর থেকে, তাও শেষ হ'ল পঞ্চম পুরুষেই।"

"সে কি গো? তার মানে?"

"মানে কারবার ফেল পড়েছে।"

"সর্ব্বনাশ!" মৃত্যুপথের পথিকের এ-সব কথায় এত অনাবশ্যক কৌতূহল সুমিত্রার কাছে একটুও আশ্চর্য্য ঠেকিল না।

"সর্ব্বনাশ কোথায় দেখলে। কত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল বুঝতে পারছ না? ছেলে চাচ্ছিলাম কেন? টাকার উত্তরাধিকারীর জন্যেই ত? সেই টাকাই যখন নেই, তখন ছেলেরও দরকার নেই। সুখবর নয়?"

সমস্ত ব্যাপারটা সুমিত্রার মাথায় ঢুকিতেছিল না। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "কি ক'রে কারবার গেল?"

"যেমন ক'রে অনেক কারবার গিয়ে থাকে। যুদ্ধের পড়তি বাজারে টাল সাম্‌লাতে পারল না। সবই প্রায় গেছে, এ বাড়ীটাও যাবে, হয়ত দেনা মিটিয়ে হাজার কয়েক টাকা হাতে থাকতে পারে। নাও থাকতে পারে।"

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা।

সহসা অসিত বলিল, "আচ্ছা সুমি, সেদিন ।পসিমার সঙ্গে আমার যা কথা হচ্ছিল তার খানিকটা কথা তুমি শুনেছিলে, না?"

সুমিত্রা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

কালো রঙের শিশিটা অনাদৃত অবস্থায় এক পাশে পড়িয়া রহিল।

সুমিত্রা কহিল, "এখন আমরা কি করব?"

"চাকরি জুটিয়ে নেব।" অসিতের কণ্ঠস্বর পরিতৃপ্ত চিন্তালেশহীন।

"কিন্তু তোমার ছেলে?"

"দরকার নেই। যে টাকা ভোগ করবার জন্যে দরকার ছিল, তাই যখন নেই, তখন ছেলেরও দরকার নেই। শুধু তুমি চিরকাল আমার কাছে থাক, তা হ'লেই হবে।"



 # বিবিধ প্রসঙ্গ 

কংগ্রেস চান ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতা-স্বীকৃতির ঘোষণা

নূতন দিল্লীতে পাঁচ দিন বৈঠকের পর কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাবী সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নীচে তাহার বাংলা মর্মানুবাদ দেওয়া হইল।

"যে-সকল গুরুতর ঘটনার বশে ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিশ্চলতার অবসান ঘটাইবার নিমিত্ত নূতন করিয়া অনুরোধের আবির্ভাব হইয়াছে, ওআর্কিং কমীটি তৎসমুদয় অবধান করিয়াছেন, এবং কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্টীকরণ বাঞ্ছনীয় বলিয়া জাগতিক ব্যাপারসমূহের সর্বাধুনিক ঘটনাবলীর আলোকের সাহায্যে তাঁহারা সমগ্র পরিস্থিতি পুনরায় ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত পরীক্ষা করিয়াছেন।

"আগেকার কোন সময় অপেক্ষা ওআর্কিং কমীটি অধিকতর নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করেন যে, গ্রেট ব্রিটেন দ্বারা ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতা স্বীকার ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের সম্মুখস্থ সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান; এই হেতু কমীটির মত এই যে, ব্যর্থবিহীন একটি এইরূপ ঘোষণা অবিলম্বে করা উচিত এবং ইহাকে সদ্য-সদ্যই কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থাস্বরূপ কেন্দ্রে একটি সাময়িক গবর্মেণ্ট গঠিত হওয়া উচিত; তাহা, অচিরস্থায়ী ভাবে গঠিত হইলেও, এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন উহা কেন্দ্রীয় আইন-সভার নির্বাচিত সকল দলের সদস্যদের আস্থাভাজন হয় এবং প্রাদেশিক দায়িত্বশালী গবর্মেণ্টসমূহের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

"ওআর্কিং কমীটির মত এই যে, পূর্ব্বোল্লিখিত ঘোষণা করা না হইলে এবং তদনুসারে কেন্দ্রে অবিলম্বে জাতীয় গবর্মেণ্ট গঠিত না হইলে, দেশের নৈতিক ও জড়ীয় সম্পৎসম্ভার দেশরক্ষার নিমিত্ত সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়োজিত করিবার সমুদয় চেষ্টা কোন অর্থেই জাতীয়স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইবে না অথবা কোন স্বাধীন-দেশপ্রসূতবৎ হইবে না, এবং তজ্জন্য অ-কার্য্যকর হইবে।

"ওআর্কিং কমীটি ঘোষণা করিতেছেন যে, যদি এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে দেশরক্ষার শৃঙ্খলাবদ্ধ উদ্যোগের নিমিত্ত চেষ্টায় কংগ্রেস নিজের পূর্ণ শক্তি ও প্রভাব নিয়োগ করিতে পারিবে।"

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির এই সিদ্ধান্ত বিচক্ষণতা-প্রসূত ও বিজ্ঞজনোচিত হইয়াছে। তাঁহারা এই মুহূর্ত্তেই ব্রিটেনের সহিত সম্পর্কবিহীন পূর্ণস্বাধীনতা চান নাই, অথবা শেষ পর্য্যন্ত যে পূর্ণস্বাধীনতাই চান তাহা গোপন রাখিয়া মাঝামাঝি রকমের কোন বন্দোবস্তও চান নাই। তাঁহারা অবিলম্বে যাহা চাহিয়াছেন, তাহা একটা অস্থায়ী মাঝামাঝি বন্দোবস্ত বটে, কিন্তু সেটা যে অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাহার অবসানের পর পূর্ণস্বাধীনতার ব্যবস্থা চাই, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

—

গ্রেট ব্রিটেনকে ঘোষণা করিতে বলার অর্থ

ওআর্কিং কমীটি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতাস্বীকৃতির ঘোষণা গ্রেট ব্রিটেনকে করিতে হইবে। ইহার ঠিক অর্থ এই যে, পার্লেমেণ্টে গৃহীত কোন প্রস্তাব অনুসারে বা পার্লেমেণ্টে প্রণীত কোন আইন অনুসারে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে এই ঘোষণা করিতে হইবে। কারণ, পার্লেমেণ্টের কমন্স ও লর্ডস উভয় কক্ষেই বিনা প্রতিবাদে এই অভিমত প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে যে, কোন ভারতীয় বড়লাট, কোন ভারতসচিব, কোন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীর প্রদত্ত কোন প্রতিশ্রুতি, এমন কি স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরেরও কোনও প্রতিশ্রুতিও, মানিতে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট বাধ্য নহেন যদি তাহা তাঁহাদের নিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হয়। অর্থাৎ পার্লেমেণ্টের ইচ্ছাই সকলের উপর বলবৎ ও চূড়ান্ত, সুতরাং কোন ঘোষণা পার্লেমেণ্টের স্পষ্টরূপে ব্যক্ত মত অনুসারে হইলে তদনুসারে কাজ হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। নতুবা সন্দেহ থাকে। অতএব, যদি কোন ঘোষণা হয়, তাহা পার্লেমেণ্টসম্মত ঘোষণা কিনা দেখিতে হইবে। আমরা যাহা বলিলাম, তাহার প্রমাণ নীচে পাদটীকায় দিতেছি।*

* The following passages are taken from *Labour's Way With The Commonwealth* by the late Mr. George Lansbury, published in 1935 by Methuen & Co. Ltd., London, pp. 76-77.

আপাততঃ ডোমীনিয়নত্বকামীদের প্রতি

যাঁহারা যুদ্ধান্তে ডোমীনিয়নত্ব লাভের প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন বা চান, কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির দাবীতে তাঁহাদের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। কারণ, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট রাজী হইলে ভারতবর্ষ ত সত্যসত্যই ডোমীনিয়নত্বের সমতুল্য কিছু পাইবে। অবশ্য যাঁহারা কোন কালেই ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতা কামনা করেন না, কংগ্রেসের পূর্ণস্বাধীনতার দাবীতে তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে। এই প্রকার লোকদিগকে আমাদের কিছু বলা বৃথা।

এমন অনেক লোক আছেন বা থাকিতে পারেন যাঁহারা কূট রাজনীতি অনুসারে, আপাততঃ যাহা কাম্য তাহাই বলিয়া, পূর্ণস্বাধীনতার দাবীটা গোপন রাখার পক্ষপাতী; কারণ তাঁহাদের বিবেচনায় ঐ দাবী উত্থাপন করায় অস্থায়ী কেন্দ্রীয় জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের দাবীটাও ব্রিটেন অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ব্রিটেন যখন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করিতেছে ঘোষণা করিয়াছে তখনই স্বাধীনতার দাবী করিবার প্রশস্ততম সময়—যদিও অবশ্য পরাধীন জাতির যে-কোন সময়েই সেরূপ দাবী করিবার অধিকার আছে। একবার ডোমীনিয়নত্বের বা কেন্দ্রীয় জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের দাবী আদায়ের চেষ্টা, তাহার পর আবার পূর্ণস্বাধীনতা আদায়ের চেষ্টা—বার বার এরূপ না-করিয়া একেবারে বনিয়াদ পাকা করিয়া কাজ করাই ভাল।

"Indeed, Conservative members of the Select Committee have made it clear beyond the possibility of doubt that we in this country are not bound by any pledge to India except in so far as it is contained in an Act of Parliament. The Chairman of the Conservative M. P.s Indian Committee, Sir John Wardlaw-Milne, stated in the House of Commons: 'No pledge given by any Secretary of State or any Viceroy has any real legal bearing on the matter at all. The only thing that Parliament is really bound by is the Act of 1919.'—(*Hansard*, 10th December, 1934, Vol. 296, No. 15, p. 142).

"Lord Rankeillour, who was for many years Chairman of Committees and Deputy Speaker in the House of Commons, and so may be assumed to speak with some authority, said that we were bound by the Preamble to the Government of India Act of 1919, but by nothing else. And speaking of these pledges he added these words: 'No statement by a Viceroy, no statement by any representative of the Sovereign, no statement by the Prime Minister, indeed no statement by the Sovereign himself, can bind Parliament against its judgement.' (*Hansard*, House of Lords, 13th December, 1934, Vol. 95, No. 8, Col. 331)."

—

এখন ঠিক্ "জাতীয়" গবর্ন্মেণ্ট হইবে না

বর্তমান কেন্দ্রীয় আইন-সভার সকল দলের নির্বাচিত সদস্যসমূহের আস্থাভাজন জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট গঠন করিতে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি ব্রিটেনকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা তাহাতে আপত্তি করি নাই; কারণ, এখন অবিলম্বে দেশরক্ষাবিষয়ে কিছু করিতে হইলে এইরূপ গবর্ন্মেণ্টকেই জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এরূপ গবর্ন্মেণ্ট বস্তুতঃ ঠিক্ জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট হইবে না। কারণ, যাঁহাদের আস্থাভাজন ইহাকে করিতে হইবে, তাঁহারা নিজেই সমগ্র জাতির প্রতিনিধি নহেন।

কেন্দ্রীয় আইন-সভায় দেশী রাজ্যের আট কোটি প্রজাদের কোনও প্রতিনিধি নাই, কেবল কয়েক শত নরেন্দ্রের প্রতিনিধি আছে। যে-সভায় জাতির আট কোটি লোকের প্রতিনিধি নাই, তাহাকে জাতীয় আইন-সভা বলা যায় না। তদ্ভিন্ন, কোন সদস্যই মহাজাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সম্মিলিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত না-হওয়ায় তাঁহারা সব সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিনিধি নহেন; তাঁহারা এক-একটা সম্প্রদায় ও শ্রেণীর আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত ও তাহাদেরই প্রতিনিধি; সুতরাং মহাজাতির প্রতিনিধি নহেন।

অধিকন্তু, নরেন্দ্রেরা সংখ্যায় কয়েক শত মাত্র হইলেও তাঁহাদিগের মনোনীত সদস্যদের নিমিত্ত এক-তৃতীয়াংশ আসন রাখা হইয়াছে; হিন্দুরা ভারতবর্ষের লোকসমষ্টির

শতকরা সত্তর জনেরও অধিক হইলেও তাহাদিগকে শতকরা ৪০টা আসন মাত্র দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদিগকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হইয়াছে; অন্য দিকে মুসলমানদিগকে তাহাদের সংখ্যা অনুসারে আসন না দিয়া অনেক বেশী আসন দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রকার নানা অন্যায্য ব্যবস্থাদুষ্ট সভাকে জাতীয় আইন-সভা বলা যায় না, তাহাদের নির্বাচিত সদস্যদের অনুমোদিত গবর্মেণ্টকে জাতীয় গবর্মেণ্ট বলা যায় না।

তাহা না বলিবার আরও একটি কারণ আছে। এই সদস্যেরা বহু বৎসর আগে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখনকার জনমত অনুসারে নির্বাচকদের প্রতিনিধি ছিলেন। এখনকার সমস্যাসকল তখন দেশের সম্মুখে ছিল না। এখন নির্বাচকদের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে বর্তমান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে নির্বাচকদের মতের সহিত মতের ঐক্য দেখাইয়া নির্বাচিত হইতে হইবে। অর্থাৎ নূতন নির্বাচন দরকার হইবে। কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ, হঠাৎ করা যায় না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাও হঠাৎ বদলান যাইবে না। অতএব, অগত্যা ওআর্কিং কমীটি যেরূপ গবর্মেণ্ট চাহিয়াছেন, তাহাকেই আপাততঃ জাতীয় গবর্মেণ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

—

ইংরেজ-প্রভুত্বের অবসানে অরাজকতা হয় নাই

ইংরেজ রাজপুরুষেরা অনেক দিন হইতে বার-বার বলিয়া আসিতেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইলে ভীষণ অরাজকতা আরম্ভ হইবে, রক্তগঙ্গা বহিবে, ইত্যাদি। ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বরাজ (অর্থাৎ হোমরুল) চাহিলেও ৩০।৩৫ বৎসর আগে এইরূপ ভয় দেখান হইত—পূর্ণস্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিলে ত কথাই নাই। ইংরেজ রাজপুরুষেরা বার-বার এইরূপ বলিতেন বলিয়া আমরা ১৯০৭ সালের জুন মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে, অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর আগে, একটি প্রবন্ধ ছাপিয়াছিলাম। তাহার নাম "Contemporary India and America on the Eve of Separation from England." ("সমসাময়িক ভারত এবং ইংলণ্ডের সহিত বিচ্ছেদের প্রাক্‌কালে আমেরিকা")। তাহাতে দেখান হইয়াছিল, যে-সব ব্রিটিশ উপনিবেশ আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে তাহাদিগকেও ভয় দেখান হইত যে তাহারা ইংলণ্ডের পক্ষপুটের বাহিরে গেলে তাহাদের অবস্থা ভীষণ হইবে। এইরূপ কথা আমাদিগকেও এখনও বলা হয় বলিয়া উল্লিখিত ৩৩ বৎসর আগেকার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিতেছি। বাহুল্যভয়ে কেবল বাংলা অনুবাদ দিব।

বার্ণেবি নামক এক জন তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষক ১৭৫৯ ও ১৭৬০ সালে আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভ্রমণান্তে লিখিয়াছিলেন :—

আগুন ও জল উত্তর আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশগুলির চেয়ে বিসদৃশ নহে।......সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহাদের মধ্যে স্বভাবচরিত্রের, রীতিনীতির, ধর্ম্মের, স্বার্থের এবং বর্ণের প্রভেদ এরূপ, যে, আমি মনে করি, যে, আমি যদি মানব-মন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ না হই তাহা হইলে, উপনিবেশগুলিকে স্বেচ্ছায় চলিতে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অন্তর্যুদ্ধ হইবে; এবং আদিম আমেরিকানরা ও নিগ্রোরা অধৈর্য্যের সহিত শ্বেতকায়দিগকে সমূলে নষ্ট করিবার সুযোগ খুঁজিবে।"

কিন্তু বার্ণেবির ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নাই। উপনিবেশগুলি স্বাধীন হইবার পর হইতে পরস্পরের গলা-কাটাকাটির খেলায় ব্যাপৃত হয় নাই। তাহাদের সমষ্টি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষায় শক্তিতে ও ঐশ্বর্য্যে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে, যে, গত মহাযুদ্ধে প্রধানতঃ তাহাদেরই সাহায্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জয়ী হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান যুদ্ধেও ব্রিটেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের ভরসা রাখে। স্বাধীন হইবার সত্তর বৎসর পরে আমেরিকায় যে অন্তর্যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বার্ণেবি-কথিত কোন কারণে নহে, তাহা বস্তুতঃ দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ লইয়া। স্বাধীন হইবার পর উপনিবেশগুলির মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বরং বাড়িয়াই ছিল। নতুবা তাহারা এত বড় একটা মহাজাতি হইতে পারিত না।

ওটিস্ নামক আমেরিকার এক জন বিখ্যাত স্বদেশ-প্রেমিক ১৭৬৫ সালে, বার্ণেবির মতই লিখিয়াছিলেন :—

"এই উপনিবেশগুলিকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে

যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে, ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবার পূর্বেই, আগামী কল্যই আমেরিকা একটা কসাইখানাতে পরিণত হইবে।"

ওটিসের ভবিষ্যদ্বাণীও বার্ণেবির ভবিষ্যদ্বাণীর মত মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল।

আমাদের বিশ্বাস ও আশা এই যে, স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবে।

—

বোম্বাইয়ে সুরাবিরোধী আইন টিকিল না

কংগ্রেসী গবর্মেণ্টের আমলে বোম্বাইয়ে সুরা বিক্রয় ও পান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু আইনের খুঁটিনাটি ধরিয়া বোম্বাই হাইকোর্ট কংগ্রেসী গবর্মেণ্টের আদেশ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে উক্ত গবর্মেণ্টের একটি মহত্তম ব্যবস্থা পণ্ড হইল। এখন যদি বোম্বাইয়ে কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট থাকিত, তাহা হইলে নূতন আইন করিয়া মন্ত্রীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন। বর্তমান আমলাতান্ত্রিক গবর্মেণ্টের ইংরেজরা সুরাপান-বিরোধী না-হইতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক সুরাপানবিরোধী। সুরাপান তাহাদের প্রধান প্রধান শাস্ত্রে নিন্দিত, দেশাচার লোকাচার অনুসারেও নিন্দনীয়। এহেন দেশে সুরাপানবিরোধী ব্যবস্থা আইনের ছিদ্র ধরিয়া নাকচ করা সম্পূর্ণ অসমীচীন ও অনুচিত।

—

সুভাষবাবুর গ্রেপ্তার

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ভারতরক্ষা-আইনের কোন-না-কোন ধারা অনুসারে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ও হইতেছে। এরূপ গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলনও হইতেছে। সুভাষবাবু গ্রেপ্তার হওয়ায় আন্দোলনটা স্বভাবতই প্রবলতর হইয়াছে। কারণ, তিনি প্রসিদ্ধতর ব্যক্তি এবং একটা দলের নেতা।

বাংলা-সরকার বলেন নাই, তাঁহাকে কেন গ্রেপ্তার করা হইল। কেবল ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাঁহাকে ভারতরক্ষা-আইনের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যে-ধারা অনুসারেই হউক, বিনা বিচারে এবং বিচারান্তে দোষী প্রমাণিত না-হইলে কাহাকেও কোন শাস্তি দেওয়ার আমরা বরাবরই বিরোধী। সুভাষবাবুকে যে-ধারা অনুসারে বন্দী করা হইয়াছে, তদনুসারে ধৃত ব্যক্তিকে পনের দিন পর্য্যন্ত আটক রাখা যায়। এই হেতু অনুমিত হইয়াছে যে, তাঁহাকে যে-কারণে আটক করা হইয়াছে তাহা গুরুতর কিছু নয়, তাহা হলওয়েল-স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের নিমিত্ত দাবীর তাঁহার দ্বারা পুনরুত্থাপন। কিন্তু ইহা ছোট বা বড় কোন দোষই নহে। অন্যজাতীয় ও অন্যধর্মাবলম্বী লোকদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ পাদরী স্পেন্সার সাহেব ইহার পক্ষে, প্রধান ইংরেজ পাদরী স্বয়ং বিশপ ফস ওয়েস্টকট ইহার পক্ষে, এবং গৃহীতাবসর সিবিলিয়ান পি. জে. গ্রিফিথস ইহার পক্ষে। তা ছাড়া, ভারত-রক্ষার সহিত হলওয়েল-স্মৃতিস্তম্ভ থাকা না-থাকার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই। তাহা অপসারণের নিমিত্ত আন্দোলন সুভাষবাবুর গ্রেপ্তারে থামে নাই, বরং বাড়িয়াছে; তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টাও থামিয়া যায় নাই। তাঁহাকে বন্দী করার পরও ঐ চেষ্টার জন্য অনেকে ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছে।

সুভাষবাবু দেশের স্বাধীনতা চান, ইহা একটা অপরাধ নহে। বিখ্যাত অবিখ্যাত অনেকেই তাহা চান এবং সে ইচ্ছা তাঁহারা বাক্যে ও লেখায় প্রকাশও করিয়া থাকেন। গবর্মেণ্ট ত তাঁহাদের সকলকে বন্দী করেন নাই।

নাৎসীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে একটা অপরাধ বটে। কিন্তু সুভাষবাবু ফাসিষ্ট বা নাৎসী মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং একেশ্বর হইতে চান, এরূপ অনুমান বা সন্দেহ অনেকেই করিয়া থাকিলেও, নাৎসীদের সঙ্গে তাঁহার যোগ আছে এরূপ উৎকট সন্দেহ তাঁহার প্রবলতম কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি কেহ করিতেন বা করেন, তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

সৈন্যসংগ্রহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা দেওয়া সাধারণ আইন ও ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে আর একটা

অপরাধ। কিন্তু সেরূপ বাধা সুভাষবাবু দিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যতটা জানি দেন নাই।

যে-সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ভারতরক্ষার কার্য্যকর সুব্যবস্থা হওয়ার দুর্লঙ্ঘ্যতম বাধা তাঁহারা নহেন। অন্তঃশত্রুর উপদ্রবে বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভবিষ্যতে যদি ভারতবর্ষকে বিপন্ন বা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, তাহা এই সকল ব্যক্তির কোন কাজের বা কোন কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য হইবে না; হইবে ভারতরক্ষা সম্বন্ধে গবন্মেণ্টের যথাসময়ে যথোচিত প্রস্তুতির অভাবের জন্য।

বাংলা-সরকার সুভাষবাবুকে বন্দী করিয়া নিজেদের কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই; সুবিধা ও উপকার করিয়াছেন সুভাষবাবুর ও তাঁহার দলের লোকদের। গ্রেপ্তারের ফলে তাঁহার ও তাঁহার দলের বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগগুলা আপাততঃ চাপা পড়িয়া গেল এবং তাঁহার ও তাঁহার দলের লোকদের লোকপ্রিয় ও প্রভাবশালী হইবার পথ খুলিয়া গেল। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ সুভাষবাবুর গ্লানিমোচনের নিমিত্ত যে বাণীর প্রচার করাইয়াছেন, তাহা হইতেও এই সুবিধা কিছু হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। ইহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে না যদি সুভাষবাবুর দলের লোকেরা এই সুযোগে খাঁটি দেশসেবার সুপথ ধরেন ও তাহাই অবলম্বন করিয়া চলেন। সেরূপ আশা করা যায় কি না, আমরা বলিতে অসমর্থ।

—

সেকালে ও একালে মাতৃভূমির অপমান-বোধ

বর্ত্তমান যুদ্ধে ও অতীত কালের বহু যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মাতৃভূমি ও মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থ প্রাণ দিয়াছে। সে-বিষয়ে অতীতের মানুষ ও বর্তমানের মানুষে কোন প্রভেদ নাই।

ফ্রান্সের বর্তমান গবন্মেণ্ট রাজধানী ও দেশের কতকটা অংশ জার্ম্যানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য বিষয়েও জার্মেনীর তাঁবেদারি করিতে রাজী হইয়াছেন। বহু ফরাসী মাতৃভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছেন। সেইরূপ বহু সহস্র ইংরেজ তাঁহাদের মাতৃভূমি গের্নসী ও জর্সী দ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছেন। সেখানে জার্মেনরা অবতীর্ণ হইয়া দখল করিতেছে। এই ফরাসী ও ইংরেজরা স্বদেশ-প্রেমিক ও সাহসী নহেন বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু মাতৃভূমির অপমান সম্বন্ধে সেকালের ও একালের ধারণার একটু প্রভেদ আছে। তাহার আভাস দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। তাহা "নকলগড়" শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পুরাতন কবিতাটি হইতে বুঝা যাইবে।

জলস্পর্শ করব না আর—
　　চিতোর-রাণার পণ—
বুঁদির কেল্লা মাটির পরে
　　থাকবে যতক্ষণ।
কী প্রতিজ্ঞা, হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন ক'রে সাধবে তা আজ,
　　কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, সাধ্য না হয়
　　সাধব আমার পণ।

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
　　যোজন তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই
　　মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে থানা
ভয় কারে কয় নাইকো জানা,
তাহার সদ্য প্রমাণ রাণা
　　পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
　　যোজন তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি—
　　আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
　　নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
　　হবেন আত্মঘাতী।—
মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে
　　নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য
　　হারাবংশী বীর
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
　　স্কন্ধে ধনুতীর।
খবর পেয়ে কহে—কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে

হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির।
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর।

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
রাণা মহারাজ।
দূরে রহ—কহে কুম্ভ,
গর্জে যেন বাজ।
বুঁদির নামে করবে খেলা
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ।
কহে কুম্ভ—দূরে রহ
রাণা মহারাজ।

ভূমির পরে জানু পাতি
তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।
রাণার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলা-গড়ের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি পর
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।

রাণার ভৃত্য কুম্ভ একালের স্বদেশভক্তদের মত বুদ্ধিমান্ ছিল না। কিন্তু তথাপি তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। একালে লোকে আসল মাতৃভূমি ও তাহার রাজধানী বিধ্বস্ত হইতে দিতে বাধ্য হয়। সেকালে তাহার নকলের উপর উদ্যত আঘাতও অসহনীয় মনে হইত।

—

নূতন উদ্ভাবনের দরখাস্ত বঙ্গে অধিকতম

কেহ কোন নূতন যন্ত্র প্রক্রিয়া প্রভৃতি উদ্ভাবন করিলে তাহার স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত পেটেণ্ট আপিসে দরখাস্ত করিতে হয়। তাহা নূতন বলিয়া গৃহীত হইলে আবেদককে পেটেণ্ট অর্থাৎ তাহা ব্যবহারে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ উভয় বৎসরই ভারতবর্ষে এইরূপ দরখাস্ত বাঙালীরা সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়াছিল একটি সরকারী রিপোর্টে ইহা দেখা যায়। ইহাতে বাঙালীর উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভাবিত যন্ত্র প্রক্রিয়াআদি কাজে লাগান হয় কি না এবং যদি হয় তাহা হইলে বাঙালীর বা অন্য কাহারও মূলধনের সাহায্যে ব্যবহারে আনা হয় তাহা জানা আবশ্যক। তাহা জানিবার উপায় আছে কি? উদ্ভাবনীশক্তি বাঙালীর থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ফলভোগ বাঙালী করে কি?

—

জাতীয় প্রয়োজনের সর্বাধিক কারখানা বঙ্গে

ভারত-গবর্নেণ্ট বলিয়াছেন, জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত কার্যে ব্যাপৃত ভারতবর্ষের বৃহৎ আটাশটি বেসরকারী কারখানার মধ্যে আঠারটি বঙ্গে অবস্থিত। শুধু এইটুকু জানিয়াই আমরা তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। এই কারখানাগুলির মধ্যে কয়টি বাঙালীর মূলধনে বাঙালী বিশেষজ্ঞ ও প্রধানতঃ বাঙালী শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত তাহাও জানিতে চাই। ফ্যাক্টরিগুলির নামধাম এই :—

Angus Engineering Works, Hooghly. A. B. Ry. Loco and Carriage Workshop, Chittagong. B. N. Ry. Loco and Carriage Workshop, Kharagpur. Braithwaite and Company (India) Kidderpore. Britannia Engineering Works, Tittagur. British Indian Electric Construction Works, Calcutta. Burn and Company Ltd., Howrah Iron-Works, Calcutta Tramways Company's factory, Nonapukur.* G. T. R. Company Engineering Works, Dum Dum. Guest Keen Williams Ltd., Railway Works Howrah, the Indian Electric Works, The India General Navigation and Ry. Company, Garden Reach. Indian Standard Wagon Company, Santa Works, Burnpur, Jessop and Company Ltd., Dum Dum; Maya Engineering Works Tollygunj, Port Engineering Works, Howrah, Saxby and Farmers Railway Signal Works, J. Stone and Company (India) Kidderpore.

নাম দেখিয়াই মনে হইতেছে, সব না হউক প্রায় সব কারখানাই অ-ভারতীয় ও অ-বাঙালীর। সুতরাং অধিকাংশ এই সব কারখানা বঙ্গে অবস্থিত বলিয়া আমাদের কোন গৌরব বোধ হইতেছে না, বরং ইহা ভাবিয়া দুঃখ ও লজ্জাই বোধ হইতেছে যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশই সর্বাপেক্ষা অধিক এক্সপ্লয়টেড।

এখানে বলা আবশ্যক যে, জাতীয় প্রয়োজনের সরকারী মানে এই প্রসঙ্গে যুদ্ধোপকরণ-প্রস্তুতি।

—

বৈজ্ঞানিক গবেষণা বোর্ডের সদর আপিস কলিকাতায় আসিবে

এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছে যে, যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বোর্ডের এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ দিল্লী হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবে, এবং অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা বোর্ডের ডিরেক্টরের আপিসও এখানে আনা হইবে। ডিরেক্টর ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভটনাগর বৎসরে আট মাস এখানে থাকিবেন। তিনি খুব যোগ্য লোক। সম্বৎসর ভাল করিয়া যাহাতে বোর্ডের কাজ চলে তাহার নিমিত্ত এক জন ডেপুটি ডিরেক্টর অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন। তিনিও অ-বাঙালী হইবেন কি না জানি না। অ-বাঙালীরা আমাদের বন্ধু, শত্রু নহেন। কিন্তু অন্যত্র যাহাই হউক, বঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠানে বাঙালীর স্থান না-হওয়া বা অপ্রধান স্থান হওয়া (যেমন ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন প্রভৃতিতে) অবাঞ্ছনীয়। জাতীয় কার্যকারিতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান কতক কতক কলিকাতায় অবস্থিত হওয়া সন্তোষের বিষয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি এখানে থাকিলেই চলিবে না। তাহাতে বাঙালীদের যথাযোগ্য স্থানও হওয়া চাই।

—

বঙ্গে জাহাজ নির্মাণ

বঙ্গে জাহাজ নির্মাণের একটা পরিকল্পনা হইতেছে শুনিতেছি, কিন্তু তাহা বাঙালীদের দ্বারা নহে—বোম্বাই-ওয়ালাদের দ্বারা। বঙ্গে আগে জাহাজ নির্মিত হইত—যেমন এখনও ছোট ছোট জাহাজ চট্টগ্রামে নির্মিত হয়।

বঙ্গে সকল কার্যক্ষেত্র হইতে ক্রমশ বাঙালীর অপসরণ দুঃখকর। এখন কেরানীগিরিও বঙ্গে বাঙালীর একচেটিয়া নহে। বাঙালী যে কুলিমজুর মাঝির কাজ করিয়া খাইবে, সে আশাও কম। সে সব কাজ প্রধানতঃ পর-হস্তগত।

আমরা জানি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যে বাঙালীরা আগেকার চেয়ে অধিক ব্যাপৃত হইতেছে। ইহা সন্তোষ-জনক ও উৎসাহপ্রদ। বঙ্গে বাঙালী যাহাতে সকল দিকেই অগ্রসর হইতে ও থাকিতে পারে, সেদিকে সকলকে দৃষ্টি রাখিতে বলি।

—

বঙ্গে বাঙালী হিন্দুর সরকারী চাকরী পাইবার বাধা বৃদ্ধি

বঙ্গে শতকরা কতগুলি চাকরী বঙ্গের হিন্দুরা পাইবে, কতগুলি বঙ্গের মুসলমানরা পাইবে, তাহার ভাগবাঁটো-আরা হইয়া গিয়াছে। এই বাঁটোআরা দ্বারা বঙ্গের সরকারী নানা বিভাগের কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা কমিয়াছে, বাঙালী হিন্দুদের প্রতি খুব অবিচার হইয়াছে, এবং তাহাদের খুব অসুবিধা হইয়াছে। কারণ, যোগ্য লোকের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বেশি। চাকরীপ্রার্থী হিন্দু যদি খুব যোগ্য হয় এবং চাকরীপ্রার্থী মুসলমান যদি খুব অযোগ্য হয়, তাহা হইলেও মুসলমানদের ভাগের কোন চাকরী যোগ্যতম হিন্দুও পাইবে না। কিন্তু সরকারী অনেক বিভাগে, যেমন এঞ্জিনীয়ারিং ডাক্তারী ইত্যাদি বিভাগে, এমন কোন কোন চাকরী খালি হয়, যাহার জন্য বাঙালী মুসলমান উমেদার পাওয়াই যায় না। এই সব চাকরী কি যোগ্য বাঙালী হিন্দু উমেদারকে দেওয়া যাইতে পারে? না, তাহার জন্য বঙ্গের বাহির হইতে অ-বাঙালী মুসলমান আমদানী করিতে হইবে? এই প্রশ্ন বঙ্গের পাব্লিক সার্ভিস কমিশন বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলের সম্মুখে গত বৎসর আগষ্ট মাসে উপস্থিত করেন। মন্ত্রীমণ্ডল সম্প্রতি যে উত্তর দিয়াছেন সংক্ষেপে তাহা এই।

মন্ত্রীরা দুই শ্রেণীর চাকরীর মধ্যে একটা প্রভেদ-রেখা টানিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সেই সব বিভাগের চাকরী যাহার সম্বন্ধে নিয়ম আছে যে, সেগুলি কেবল বঙ্গজাত বাঙালীকে কিম্বা বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা ("ডোমি-সাইল্ড") অন্যকে দিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে সেই সব বিভাগের চাকরী যেগুলি সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম প্রয়োগে কড়াকড়ির পরিবর্তে শিথিলতার ব্যবস্থা আছে,

কিম্বা বলা আছে যে, যদি ঐরূপ কোন চাকরীর জন্য বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের দ্বিবিধ উমেদারই থাকে, তাহা হইলে বঙ্গের লোককেই অধিকতর নিয়োগযোগ্য মনে করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর চাকরীগুলির ক্ষেত্রে, যথাযোগ্য বাঙালী মুসলমান উমেদার না-থাকিলে, মন্ত্রী-মণ্ডল বলিতেছেন অ-মুসলমান বাঙালী উমেদারকে চাকরী দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোন মন্ত্রীর অধীনস্থ কোন বিভাগে এরূপ উপলক্ষ্য ঘটিলে, অর্থাৎ কোন চাকরীর জন্য বাঙালী মুসলমান উমেদার না-থকিলে, সেই মন্ত্রী মন্ত্রী-মণ্ডলের নিকট বিষয়টি পেশ করিয়া নিয়মের ব্যতিক্রম করাইতে অধিকারী হইবেন, অর্থাৎ বঙ্গের বাহিরের মুসলমান ঐ চাকরীর জন্য আমদানী করাইতে পারিবেন। মন্ত্রীমণ্ডল মুসলমানপ্রধান। সুতরাং পেশ-করা এ-রকম ব্যাপারে বাহিরের মুসলমান আমদানী করিবার সপক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলের মত সহজেই পাওয়া যাইবে।

সুতরাং ব্যাপারটা কার্যতঃ দাঁড়াইতেছে এই, যে, প্রথম শ্রেণীর চাকরীগুলিতেও (যেগুলি কেবল বাংলা-দেশের লোকদেরই প্রাপ্য বলিয়া সরকারী নিয়ম আছে তাহাতেও) মুসলমানদের ভাগের কোন চাকরীর উপযোগী বাঙালী মুসলমান উমেদার না-থাকিলে তাহা অ-মুসলমান বাঙালীকে না দিয়া বঙ্গের বাহিরের কোন মুসলমানকে দেওয়া হইবে। অন্ততঃ তাহাকে দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে। বাংলা দেশের প্রতি যাহাদের কোনই দরদ থাকিবার কথা নয়, এবং বাংলার রাজস্বের আধ পয়সাও যাহারা দেয় না, বঙ্গের অন্ন এরূপ অ-বাঙালীরা খাইবে, কিন্তু হিন্দু বাঙালী পাইবে না—যদিও বাংলার রাজস্বের অধিকতম অংশ হিন্দু বাঙালীরা দেয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরীগুলি সম্বন্ধে বঙ্গের মুসলমান-প্রধান মন্ত্রীমণ্ডল স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে, মুসলমানদের ভাগের এরূপ কোন চাকরীর জন্য বাঙালী মুসলমান না পাওয়া গেলে, অ-মুসলমান বাঙালীকে তাহা দিবার পূর্বে বঙ্গের বাহির হইতে মুসলমান আনিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। বঙ্গীয় যে-যে বিভাগের চাকরী সম্বন্ধে এই স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম:—

(১) পশুচিকিৎসা-বিভাগ উচ্চতর শাখা (Bengal Higher Veterinary Service), (২) কৃষি-বিভাগের উচ্চতর শাখা (Bengal Higher Agricultural Service), (৩) এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগের উর্দ্ধতন চাকরী সমূহ (Bengal Senior Service of Engineers), (৪) চিকিৎসা-বিভাগ (Bengal Medical Service), (৫) এঞ্জিনীয়ারিং-বিভাগ (Bengal-Engineering Service), (৬) পশুচিকিৎসা-বিভাগের নিম্নশাখা (Bengal Lower Veterinary Service), (৭) কৃষি-বিভাগের নিম্নশাখা (Bengal Lower Agricultural Service), (৮) কারখানাসমূহের সার্ভিস (Bengal Factory Service), (৯) বয়লার সার্ভিস (Bengal Boilers Service), (১০) ধোঁয়াজনিত অসুবিধা নিবারণ সার্ভিস (Bengal Smoke Nuisance Service), (১১) অরণ্য-বিভাগ (Bengal Forest Service) এবং (১২) গবর্মেন্টের বাংলা অনুবাদক ব্যতীত সাধারণ বিভাগের সব চাকরী (All posts in the Bengal General Service other than the post of Bengali Translator to Government)।

'জেনারাল সার্ভিস' নামক কোন বিভাগ আছে কি? না উহা শাসন-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, জেল-বিভাগ, পুলিস-বিভাগ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত নাম?

মুসলমানপ্রধান মন্ত্রীমণ্ডলের নির্দেশের নিগূঢ় অর্থ এই যে, বঙ্গের বাহিরের যে কোন দেশ বা প্রদেশের মুসলমান বঙ্গের অ-মুসলমানদের চেয়ে বাঙালী মুসলমানের অধিকতর সুখদুঃখভাগী, অধিকতর উপকারী, ইত্যাদি। অর্থাৎ বাঙালী মুসলমানেরা বঙ্গে অ-বাঙালী মুসলমানদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুল-কলেজে শিক্ষা পাইয়াছেন ও পাইয়া থাকেন, দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন ঝড় ভূমিকম্প মহামারীতে বিপন্ন বাঙালী-মুসলমানদের সাহায্য ও সেবা বঙ্গের বাহিরের অবাঙালী মুসলমানেরা দলে দলে প্রচুর মোহর টাকা পয়সা সঙ্গে আনিয়া দিয়া থাকেন, সমগ্র বঙ্গের বাঙালী-মুসলমান কারিগর মজুর প্রভৃতি বঙ্গের বাহিরের অ-বাঙালী মুসলমানদের নিকট হইতেই কাজ ও মজুরী পাইয়া থাকে ইত্যাদি।

মুসলমান মন্ত্রীরা ও তাঁহাদের তাঁবেদার হিন্দু মন্ত্রীরা

হয়ত মনে করেন, হিন্দু সম্প্রদায়কে তাঁহারা যত প্রকারে পারেন বঞ্চিত করিতে থাকিবেন, কিন্তু বোকা উদার-প্রকৃতির হিন্দুরা তাহাদের পরার্থপরতা কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করিবে না। সুতরাং বাঙালী-মুসলমানেরা গাছেরও খাইবে, তলারও কুড়াইবে, এবং বরাবর এইরূপ মজা চলিবে।

—

সরকারী চাকরী কি তুচ্ছ ও হেয়

অনেকে মনে করেন কিংবা মনে-করার ভান করেন, যে, সরকারী চাকরী ক'টাই বা, এবং ওগুলা গোলামী মাত্র। আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, যোগ্যতম লোকদের দ্বারা সরকারী সব কাজ না-করাইলে সরকারী কাজ ভাল করিয়া হয় না, ফলে সমগ্র দেশের, দেশের সমুদয় অধিবাসীর (অনুগৃহীত সম্প্রদায়েরও) অনিষ্ট ও ক্ষতি করা হয়। আমরা মনে করি, সরকারী চাকরী করা শুধু টাকা-রোজগারের উপায় নহে; ইহাও এক প্রকার দেশসেবা ও জনসেবা, এবং আমরা যে-পরিমাণে স্বরাজ পাইতে থাকিব সেই পরিমাণে এই প্রকার দেশসেবা ও জনসেবার মর্য্যাদা উৎকর্ষ ও মূল্য বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং কেবল ধর্ম্মমতের জন্য যোগ্যতম এক জন লোককেও এই সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়।

আর সরকারী চাকরী যদি কেবল রোজগারেরই পথ হয়, তাহা হইলেই বা ধর্ম্মমতের জন্য এক জন মানুষকেও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন সেই পথ অবলম্বন করিতে দেওয়া হইবে না? কোন গবর্মেণ্ট, এমন কি দুনিয়ার সেরা বাংলা-গবর্মেণ্টও, এমন নিয়ম ত করেন নাই, যে, মুসলমান বলিয়াই কতকগুলি লোক খুব যোগ্যতা সত্ত্বেও সারেঙ, খালাসী, রাজমিস্ত্রী, দরজি, বাবুর্চি, মোটর-ড্রাইভার, চাষী, গাড়োআন প্রভৃতি হইতে পারিবে না? ইহারা যে কাজ করে তাহার আয় সাধারণ কেরানীগিরি মাষ্টারির চেয়ে কম নয়, তুচ্ছও নয়।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গের মন্ত্রীরা প্রকারান্তরে দেশে অন্তর্যুদ্ধ, বৃত্তিযুদ্ধ, পেশাযুদ্ধ লাগাইয়া দিয়াছেন, যাহার ফলে নেশ্যন গড়িয়া তোলা অসাধ্য—অন্ততঃ দুঃসাধ্য—হইবে, যাহার ফলে বেসরকারী সমুদয় ব্যাপারে মুসলমানের হিন্দুকে ও হিন্দুর মুসলমানকে কাজ না দিবার ইচ্ছা জন্মান হইবে এবং সে ইচ্ছাকে দীর্ঘজীবী করা হইবে। কোন কোন ইংরেজ রাজনীতিক সময়-বিশেষে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ নামে না হইলেও কার্যতঃ 'ডোমীনিয়ন ষ্টেটস' ("Dominion status in action") পাইয়া গিয়াছে। বাংলার মন্ত্রীরাও বলিতে পারেন, তাঁহারা নামে না হইলেও **কার্যতঃ পাকিস্থান** প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কিন্তু পাকিস্থান পরিকল্পনা বস্তুতঃ ভারতীয় মহাজাতিত্ব আদর্শের গোরস্থান।

—

হরগঙ্গা কলেজের বি-এ শ্রেণীর অঙ্গীভবন নামঞ্জুর

মুন্সীগঞ্জে হরগঙ্গা কলেজ নামে যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে বি-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত স্বীয় অঙ্গীভূত ('affiliated') একটি কলেজ বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষ বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যাপনার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলা-সরকার বি-এ শ্রেণী-গুলির এই অঙ্গীভবন নামঞ্জুর করিয়াছেন, বলিয়া সংবাদ বাহির হইয়াছে। নামঞ্জুরির কারণ ঐ সংবাদের সহিত বাহির হয় নাই। পাকিস্থানে 'হরগঙ্গা' রূপ নাপাক নাম বিশিষ্ট বড় কলেজ থাকা অসঙ্গত, প্রকৃত কারণ কি এবম্বিধ কিছু?

শিক্ষাবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান বাংলার মন্ত্রীদের চেয়ে বহুগুণ অধিক। অধিকন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর এক জন প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা। তিনি পর্য্যন্ত যাহাতে সম্মত, মুসলমান মন্ত্রীরা তাহাতে অসম্মত কেন?

মুন্সীগঞ্জ কলেজে অধ্যয়নের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। অপেক্ষাকৃত ব্যয় কম হয় বলিয়াই যে মফস্বলে কলেজ বৃদ্ধি ও তথায় অধিকসংখ্যক ছাত্রদের অধ্যয়ন বাঞ্ছনীয়, তাহা নহে। দেশের স্বাধীনতার জন্য কিংবা ছাত্রদের জৈবনিক সুশিক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক নহে এরূপ আন্দোলন ও হুজুক কলিকাতায় লাগিয়াই থাকে, মফস্বলে

তত নহে। এই সব হুজুক সুশিক্ষার ও জ্ঞানলাভের অন্তরায়। এই জন্যও মফস্বলে অধ্যয়ন বাঞ্ছনীয়।

—

গুড় ও চিনি

চিনির কারখানায় শাদা দানাদার চিনি হয়। বিদেশী চিনির উপর শুল্ক বসানতে এদেশে কারখানা স্থাপন করিয়া চিনি উৎপাদন বিশেষ লাভজনক হওয়ায় প্রধানতঃ বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অনেক ধনী ব্যক্তি কারখানা স্থাপন করিয়া এত লাভ করিয়াছেন, যে, কেহ কেহ তিন চার বৎসরেই লাভ হইতে সমুদয় মূলধন ফিরিয়া পাইয়াছেন। ধনী ব্যক্তিদের প্রভাব বেশী ও তাঁহারা দলবদ্ধ। তাঁহাদের কারবারের কোন অসুবিধা হইলে তাঁহারা চীৎকার জুড়িয়া দেন এবং খবরের কাগজে খুব লেখালেখি চলিতে থাকে। অন্য দিকে, যাহারা গুড় উৎপাদন করে তাহারা গরীব, ও দলবদ্ধ নহে। তাহাদের পক্ষে আন্দোলন হয় না বা সামান্যই হয়। অথচ গুড়ে পুষ্টিকর খাদ্যের অংশ চিনির চেয়ে বেশি আছে শুনিয়াছি। গুড়ের আর একটা গুণ এই যে, ইহা কয়েকটা মাত্র বড় বড় কারখানায় উৎপন্ন হইয়া অল্পসংখ্যক ধনীর ধন বাড়ায় না, ইহা বহু সহস্র অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোক উৎপাদন করে বলিয়া ইহা হইতে লাভ হইলে লাভের টাকাটা দেশের মধ্যে বেশি ছড়াইয়া পড়ে। ধন অল্পসংখ্যক লোকের হস্তগত থাকা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়াটাই জাতির শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃষ্টতর উপায় ও প্রমাণ। এই জন্য গুড় উৎপাদনের দিকে বেশি মন দেওয়া উচিত।

অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশের পক্ষে গুড়-উৎপাদনে মনোযোগী হওয়া আরও দরকার। কেন না, যে-কারণেই হউক, বঙ্গে চিনির কারখানার সংখ্যা কম এবং তাহারও অধিকাংশ বাঙালীর নহে। তা ছাড়া, বঙ্গের একটা সুবিধা এই আছে যে, এখানে আকের গুড় ও খেজুরের গুড় দুই-ই হইতে পারে; অধিকন্তু বিদ্যাটা আয়ত্ত করিতে পারিলে তালের রস হইতেও গুড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

গুড় শুধু উৎপাদন করিলেই চলিবে না, উহার কাটতি বাড়ানও চাই। তাহা করিতে হইলে আমাদের শ্বেত-পক্ষপাতিত্বটা কমাইতে হইবে। আটা ময়দার চেয়ে খাইতে সুস্বাদ ও পুষ্টিকর। তথাপি ময়দা অপেক্ষাকৃত শাদা বলিয়া তাহার লুচি ভক্ষণই আভিজাত্যসূচক! সেইরূপ, কম পুষ্টিকর মাজাঘষা চালের ধবধবে ভাত খাওয়াটাও আভিজাত্যব্যঞ্জক! এরূপ অবস্থায় শ্বেত চিনির পরিবর্ত্তে অ-শ্বেত গুড় খাইতে বলিলে তাহা অপমানকর বোধ হইতে পারে। তাহা সত্ত্বেও যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত 'রাষ্ট্রবাণী'তে গুড়ের পক্ষে অনেক কথা লিখিতেছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

গুড় অধিক পরিমাণে উৎপাদন ও সস্তা দরে বিক্রী করিতে হইলে প্রধানতঃ দুই বিষয়ে মন দিতে হইবে। আমাদের দেশে বিঘা-প্রতি যত মণ আক উৎপন্ন হয়, জাভায় তার চেয়ে অনেক বেশি হয়। জমিতে সার দিয়া ও ভাল জা'তের আক লাগাইয়া আমাদের উৎপাদন বাড়ান চাই। আমাদের আকশালগুলিতে যে আক মাড়াই হয়, তাহাতে আকের অনেকটা রসই ছিবড়ার মধ্যে থাকিয়া যায়। অতএব আক মাড়াইয়ের কলের এরূপ উন্নতি আবশ্যক যাহাতে যথাসম্ভব বেশি রস আক হইতে বাহির করিয়া লওয়া যায়।

—

ভারতবর্ষের রণতরী বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের নৌবহর আছে, কিন্তু প্রায় নামে মাত্র। সম্প্রতি নৌসেনাপতি ফিজ্‌হার্বার্ট সাহেব বলিয়াছেন, রণতরীর সংখ্যা বাড়ান আবশ্যক। যদিও কিঞ্চিৎ দেরিতে বলিয়াছেন, তবু ন্যূনতাটা যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও ভাল। এখন বাড়ানর ভাগ্যে কি ঘটে দেখা যাইবে।

—

ভারতীয় সেনানায়ক ও গোরা সৈন্য

ভারতীয় সামরিক অফিসাররা অধুনা কেবল সিপাহী পল্টনের নায়কত্ব করিতেন। ভারত-গবর্মেণ্ট সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা গোরা পল্টনেও অফিসারি করিতে পারিবেন। এই পরিবর্ত্তন ন্যায়সঙ্গত। সিপাহী-যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত এইরূপ রীতিই ছিল।

আর একটা ন্যায্য পরিবর্ত্তন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলের কয়েকটি জাতিকেই সৈনিক হইবার উপযুক্ত মনে করা হয়। ইহা ভ্রান্ত ও ন্যায়বিরুদ্ধ ধারণা। সকল প্রদেশের সকল জাতি হইতেই যোগ্য লোক বাছিয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা উচিত। অল্পসংখ্যক বাঙালীকে গোলন্দাজি কাজে লওয়া হইয়াছে বটে। কিন্তু আরও বেশী করিয়া লওয়া উচিত।

—

অসবর্ণ বিবাহ ও তাহার সমর্থন জন্য পদচ্যুতি

"সঞ্জীবনী"তে নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে।

"কুষ্টিয়ার মিউনিসিপ্যাল একাডেমির শিক্ষক শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায় কুষ্টিয়ার গার্ল'স স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস ও বৈদ্য-শ্রেণীর শ্রীমতী মায়া মজুমদারকে হিন্দুধর্ম্মমতে বিবাহ করেন। বিবাহ-সভায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিল। ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে বালিকা-বিদ্যালয় কমিটি উক্ত হেড মিষ্ট্রেসকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং যেহেতু দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ভক্তি দত্ত উক্ত অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করিয়াছিলেন ও সাহায্য করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকেও কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন।"

বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য আছে মনে করিলে, প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি।

—

"বঙ্গপ্রতিভা"

কোন বাংলা বহিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে কিছু লেখা বাহির হইয়াছে কি না জানিতে কৌতূহল ছিল। জানিতে পারি প্রয়াগের শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় প্রণীত "বঙ্গপ্রতিভা" পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থকার তাঁহার নিজের বহিটি আমাদিগকে দেখিতে দিয়া বাধিত করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধটি ভক্তিতে উচ্ছল। তাহাতে এরূপ তথ্য ও ঘটনার বৃত্তান্ত কিছু কিছু আছে যাহা দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত অন্য কোন প্রবন্ধে দেখি নাই। তিনি এই ঋষিকল্প সুপণ্ডিত, ভক্ত ও স্বদেশ-প্রেমিক মনীষীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিয়াছেন।

"বঙ্গপ্রতিভা" পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত, (১) ইতিবৃত্ত ও (২) পরিচয়। ইতিবৃত্ত খণ্ডে জীবিত ও মৃত দশ জন প্রসিদ্ধ বাঙালীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে। সকলেরই চারিত্রিক কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনারীতির গুণে তাঁহার প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য।

—

হলওএল-স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের দাবী

হলওএল-স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন দ্বারা কাহার কলঙ্ক চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা হইয়াছে, অথবা, অনভিপ্রেত হইলেও, তাহার দ্বারা কাহার কলঙ্কের স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে এই মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তদ্বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়া আবশ্যক।

এই মনুমেণ্টটার ধ্বংস বা অপসারণ যে উচিত, সে বিষয়ে অনেকেই একমত। কিন্তু ওটা থাকিলেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে, না-থাকিলেও ভারতের স্বাধীনতা এক পা-ও আগাইয়া আসিবে না। সুতরাং ওটা লইয়া একটা হুজুক করা, আন্দোলন চালান ও গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ডিত হওয়া বৃথা শক্তিক্ষয়। অধিকন্তু তদ্দারা সাধারণের, বিশেষতঃ যুবকদের, মন প্রকৃত দেশহিত ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনাবশ্যক উত্তেজনাগ্রস্ত হইতেছে। এই মনুমেণ্ট স্থানচ্যুত হইলে যদি আন্দোলন-কারীরা বলেন তাঁহারা ভারি একটা কেল্লা ফতে করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

বিশাল স্বাধীনতা-সংগ্রাম ত সম্মুখে রহিয়াছেই। তদ্ভিন্ন, এখন কলিকাতাবাসীদের সম্মুখে সর্বপ্রধান সমস্যা রহিয়াছে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধক ২ নং বিল। হলওএল মনুমেণ্ট আন্দোলকেরা তাহাতে 'মন দিতেছেন না।

যানবাহন-চলাচলের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ মনুমেণ্টটা সরাইবার পক্ষপাতী। স্পেন্সার নামক এক জন পাদরী এবং স্বয়ং লর্ড বিশপ ইহার অপসারণ শ্রেয়ঃ মনে করেন। অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান পী. জে. গ্রিফিথস্‌ও তাহা চান। মুসলমান ছাত্রসমাজ এবং

অন্য বহু মুসলমান ইহা চান। হিন্দুরা ত বরাবরই ইহার স্থায়িত্বের বিরোধী।

লর্ড কার্জনের আমলে যে দিল্লী দরবার হয়, তাহার উদ্যোগ কালে রবীন্দ্রনাথ "অত্যুক্তি" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি ভারতীয় অত্যুক্তি ও বিলাতী অত্যুক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ও উভয়ের দোষ দেখাইয়া তাহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখান। এই প্রবন্ধটি তাঁহার "রাজা প্রজা" গ্রন্থে আছে। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ঠিক খাঁটি বিলাতী অত্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেণ্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সামনে পাথরের স্তম্ভ দিয়া স্থায়ী ভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তাই সেটা হঠাৎ মনে পড়িল। তাহা অন্ধকূপহত্যার অত্যুক্তি।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামী। আমরা কিছু প্রাচুর্য্যপ্রিয়, আঁটাআঁটি আমাদের সহে না। দেখো না আমাদের কাপড়গুলা ঢিলাঢালা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি—ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই—এমন কি, আমাদের মতে তাহা আঁটিতে আঁটিতে ও কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা, হয় প্রচুররূপে নগ্ন, নয় প্রচুর রূপে আবৃত। আমাদের কথাবার্তাও সেই ধরণের,—হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি, নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত, নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

"কিন্তু ইংরেজের অত্যুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য্য নাই,—তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্ব্বকায়। তাহা আপনার অমূলকতাকে নিপুণভাবে মাটিচাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির অতিটুকুই শোভা, তাহাই তাহার অলঙ্কার, তাহা অসঙ্কোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির অতিটুকুই গভীর ভাবে ভিতরে থাকিয়া যায়—বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া পড়ে।

"আমরা হইলে বলিতাম, অন্ধকূপের মধ্যে হাজার লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে এক ঠেলায় অত্যুক্তির মাঝ-দরিয়ায় মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হলওয়েল সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট হিসাবে গণনা করিয়াছেন। সে সত্যের মধ্যে কোথাও কোন ছিদ্র নাই। ওদিকে যে গণিতশাস্ত্র তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে, সেটা খেয়াল করেন নাই। হলওয়েলের মিথ্যা যে কত স্থানে কতরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ভালরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জ্জন সাহেবের নিকট স্পর্দ্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝ-খানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।"

—

কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের ঘাড়ে দ্বিতীয় কোপ্

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধক প্রথম বিল এখন আইনে পরিণত। উহার এবং বস্থ-লীগ চুক্তির সম্মিলিত প্রভাবে মুসলিম লীগ এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে রাজত্ব অথবা, বাস্তবিক, নায়েবত্ব করিতেছেন। কিন্তু প্রভুত্বটা সম্পূর্ণ হয় নাই। এই হেতু, তাহা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, সংশোধক ২ নং বিল রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বিল দুটা সংশোধক নহে, **সংহারক**। হিন্দুমতে, বলি দিতে হইলে এক কোপেই সংহার শেষ করা বিধেয়, একের অধিক কোপ্ পড়িলে দোষ অর্শে। মুসলমানী মতে একই প্রাণীকে দু-বার জবাই করা চলে কি না, জানি না।

এই বিলটা ঢাকার খেতাবী নবাব খাজা হবীবুল্লার দস্তখত লইয়া হাজির হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এমন খাঁটি যে, তিনি লিখিয়াছেন, ঠিকা (contract) দেন মেয়র বা ডেপুটি মেয়র। বস্তুতঃ তাঁহারা কণ্ট্র্যাক্ট দেন না। তাহা দিবার কমীটি আছে।

মফস্বলের মিউনিসিপালিটিসমূহের উপর গবর্ন্মেণ্টের প্রভুত্ব খুবই আছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির উপর প্রভুত্ব খুব কমই ছিল। ১ নং সংহারক বিল দ্বারা ও বসু-লীগ চুক্তি দ্বারা তাহা অনেকটা বাড়িয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করা চাই। কলিকাতাকে পাকিস্তানের অন্তর্গত করা চাই। ২ নং বিলটা সেই উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। ইহা আইনে পরিণত হইয়া গেলে মফস্বলের মিউনিসিপালিটিসমূহের যতটুকু স্বাধীনতা বাকী আছে, তাহাও হরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে, অনুমান করি।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডসমূহ সম্বন্ধে মন্ত্রীরা কলিকাতা মিউনিসিপাল (সংশোধক) বিলের মত কোন আইন করিবার চেষ্টা করিতেছেন না।

তাহার কারণ, বঙ্গের অধিকাংশ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে মুসলমান-রাজত্ব স্থাপিত হওয়ায় সেগুলাতে মুসলিম লীগের কিছু করিবার নাই।

সংশোধক এই বিলটা পেশ করিবার মুসলমান মন্ত্রীদের একটা অজুহাত, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির দৈনন্দিন কাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রভাব অনুভূত হয়। ইহা একটা অদ্ভুত যুক্তি! পৃথিবীতে এমন কোন প্রতিনিধিত্বমূলক সভা সমিতি আছে কি যাহাতে বৃহত্তম দলের প্রভাব কার্যকর হয় না? এই অদ্ভুত যুক্তিটা উপস্থিত করিয়া মুসলিম মন্ত্রীরা অনভিপ্রেত ভাবে নিজেদের গোপন উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন; তাহা কলিকাতায় সংখ্যালঘু মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রভাবকে সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করা। কোন প্রতিষ্ঠানের উপর কোন দলের প্রভাব পড়াটাই দোষের হয় যদি সেই প্রভাবটা অবিমিশ্র অকল্যাণের বা প্রধানতঃ অকল্যাণের কারণ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধানতম দলের প্রভাব সেরূপ অনিষ্টকর হয় নাই, ইষ্টই বেশি হইয়াছে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে দোষ-ত্রুটি আছে বটে —কোন্ প্রতিনিধিত্বমূলক সভাসমিতি একেবারে নিখুঁত? কিন্তু এই মিউনিসিপালিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সব দিকে শহরের বিস্তর উন্নতি করিয়াছে। আমরা প্রায় ষাট বৎসর আগে যখন কলিকাতায় আসি, তখন এই মিউনিসিপালিটিতে এবং তাহার অনেক বৎসর পর পর্য্যন্তও সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের পুরা প্রভুত্ব ছিল। তখন শহর যেরূপ নোংরা ও দুর্গন্ধময় ছিল, এখন তাহা নয়। এখন রাস্তাঘাট যতটা ভাল, রাত্রে আলোক যত উজ্জ্বল, অপরিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত জল যত পাওয়া যায়, যত হাজার হাজার বালক-বালিকা মিউনিসিপাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায়, যত লাইব্রেরীতে কর্পোরেশুন যত টাকা দেন, যত স্বাস্থ্যসমিতি সাহায্য পায়, স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নতির জন্য যত চেষ্টা হয়, প্রসূতি ও শিশুরা যত সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্য পায়, সেকালে কোন দিকেই এরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা ছিল না। শহরের যে এত উন্নতি হইয়াছে, তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের চেষ্টায় হইয়াছে— তাহাদিগকে হিন্দু বলুন আর কংগ্রেসীই বলুন।

কিছু দোষত্রুটি থাকিলে তাহার সংস্কার কর্তব্য, সংহার নহে। বঙ্গের মন্ত্রীদের শাসনের দোষ দেখান যাইতে পারে বলিলে কম বলা হয়, দেখান বার বার বহু পরিমাণে হইয়াছে বলাই ঠিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা গণতান্ত্রিক আইনসভা ও তাহা হইতে নির্বাচিত সদস্যদের মন্ত্রিত্ব লাভের উচ্ছেদ চাই না; এই রীতির সংস্কার চাই। আগেকার সিবিলিয়ানি রাজত্ব বর্তমান মন্ত্রিদের রাজত্বের চেয়ে ভাল ছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা সিবিলিয়ানি রাজত্বে ফিরিয়া যাইতে চাই না।

ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, ফিলিপাইন্সে,…ব্যবস্থাপক-সভাসমূহের ও মিউনিসিপালিটিসমূহের বহু দোষ বহুবার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাহার ফলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধিত হইয়াছে, সংহার কেহ করিতে চায় নাই।

বর্তমান যুদ্ধে হিটলারের যুদ্ধায়োজন এবং তাহার রণকৌশল স্থলযুদ্ধে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য বিলাতের পার্লেমেণ্টের উচ্ছেদ করিয়া হিটলারি নীতির প্রবর্তন ইংরেজরা চাহিতেছে না। তাঁহারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বজায় রাখিয়া যথোচিত সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

আমেরিকার দেশপতি রুজভেল্ট বলিয়াছেন, যে-দেশে সব ক্ষমতার সমষ্টি এক জনের মুঠার মধ্যে, যেমন জার্মেনীতে, তথাকার গবন্মেণ্ট অধিক কার্যকুশল ("efficient") আমেরিকার অনেক লোক এইরূপ মত পোষণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু আমেরিকায় এরূপ লোক আছেন বলিয়া আমেরিকানরা নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সব ভাঙিয়া দিয়া হিটলারি চালাইতে মনঃস্থ করে নাই। গণতান্ত্রিকতা বজায় রাখিয়াই তাহারা আপনাদের কার্যকুশলতা ও ক্ষিপ্রকারিতা বাড়াইতে সমর্থ হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশুনের দোষত্রুটির অছিলায় মুসলমান মন্ত্রীরা ইহার গণতান্ত্রিকতারূপ প্রাণ বধ করিয়া কেবল বাহিরের ঠাটটা বজায় রাখিতে চান। ইহার প্রতিবাদ শুধু হিন্দুদের নহে, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের করা উচিত, রাজনৈতিক সকল দলেরই করা উচিত;

কারণ ইহার দ্বারা সকলেরই প্রকৃত নাগরিক অধিকার লুপ্ত হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিন্দার মানে কংগ্রেসী দলের নিন্দা; কারণ, বর্তমান বৎসরের আগে বহু বৎসর তাঁহারাই কর্পোরেশ্যনে প্রধান দল ছিলেন। দুঃখের বিষয়, যাঁহাদের নিন্দাকে ভিত্তি করিয়া এই বিল রচিত, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা এ পর্যন্ত (২৭শে আষাঢ়) আন্দোলন করেন নাই। বঙ্গে কংগ্রেসের দুই দল। সুভাষবাবুর দল ত মুসলিম লীগের সহিত চুক্তিই করিয়া বসিয়াছেন, তিনি জেলের বাহিরে থাকিলে কি করিতেন জানি না। অন্য দল সেরূপ কোন চুক্তি করেন নাই। আশা করি তাঁহারা এই বিলের বিরুদ্ধে যথোচিত আন্দোলন করিবেন।

—

কলিকাতা-কর্পোরেশ্যন-সংহারক বিলে কি আছে

মিউনিসিপালিটিগুলির উদ্দেশ্য স্থানীয় করদাতাদিগের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শহরের রাস্তাঘাট আলোক স্বাস্থ্য প্রভৃতির সুব্যবস্থা করা। এই রকম সব কাজকে সংক্ষেপে বলা হয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। কলিকাতায় এই স্বায়ত্তশাসন থাকায় শহরের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা আগে লিখিয়াছি। মফস্বলে পর্যন্ত মিউনিসিপালিটিগুলির কাজের মোটের উপর ক্রমশঃ উন্নতিই হইতেছে। এ বিষয়ে সাবেক সকৌন্সিল গবর্ণরদের অনেক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এত বৎসর পরে কিন্তু মুসলমান মন্ত্রীরা আশঙ্কার ভান করিতেছেন যে, বাংলা দেশের সেরা শহর কলিকাতার কর্পোরেশ্যনের কোন কোন বিভাগের বা সমুদয় কর্পোরেশ্যনেরই এমন গুরুতর অকর্মণ্যতা, অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটিতে পারে যে, তজ্জন্য সেই সেই বিভাগের ক্ষমতা লোপ করা বা সমুদয় কৌন্সিলর ও অল্ডারম্যানদিগকে অপসৃত করা আবশ্যক হইতে পারে। তাহা করিবার ক্ষমতা এখন গবর্ন্মেণ্টের নাই। গবর্ন্মেণ্টকে (অর্থাৎ কার্যত স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে) এই বিলে সেই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাহার মানে, বিল পাস হইবার পর হইতে পৌর-প্রতিনিধিদিগকে প্রত্যহ নিজেদের পদ হইতে অপসৃত হইবার অপমানকর আশঙ্কার বশে কাজ করিতে হইবে।

কোন মিউনিসিপালিটি বা অন্য কোন প্রতিনিধি-সভাকে যদি কোন কাজ করিতে হয় এবং তজ্জন্য তাহাকে দায়ী করিতে হয়, তাহা হইলে কর্মকর্তার নিয়োগ পদচ্যুতি ইত্যাদির ক্ষমতা তাহার থাকা উচিত। ইহা অত্যাবশ্যক ক্ষমতা। বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশানের এই ক্ষমতা আছে। কিন্তু নূতন বিলটাতে প্রধান কার্যনির্বাহকের নিয়োগ প্রভৃতির ক্ষমতা গবর্ন্মেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, গবর্ন্মেণ্ট কোন সরকারী কর্মচারীকে (সিবিলিয়ানকে বা বঙ্গীয় শাসন বিভাগের অন্য কর্মচারীকে) এই পদে নিযুক্ত করিবেন। সুতরাং বিলটার এই ব্যবস্থা দ্বারা কর্পোরেশ্যনকে গবর্ন্মেণ্টের একটা বিভাগে পরিণত করা হইবে।

সর্বোচ্চ কর্মচারী নিয়োগাদির ভার ত কর্পোরেশ্যনের হাত হইতে গবর্ন্মেণ্টের হাতে যাইবে। নিম্নপদসকলের কতক বেতন পর্যন্ত কর্মচারী নিয়োগ করিবেন এই সরকারী সর্বোচ্চ কর্মচারী; কর্পোরেশ্যনের তাহাতে কোন হাত থাকিবে না। তাহার উপরের পদগুলিতে নিয়োগ একটি পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে করিতে হইবে, তাহার ব্যতিক্রম করা চলিবে না। ছোট বড় সব চাকরীতে কত হিন্দু কত মুসলমান ইত্যাদি নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহার নিয়ম গবর্ন্মেণ্ট বাঁধিয়া দিবেন, কিন্তু নিয়মগুলি বিলে দেওয়া নাই, আইনেও থাকিবে না; সরকার যাহা খুশি তাহাই করিতে পারিবেন!

এই পাব্লিক সার্ভিস কমিশন নিয়োগ গবর্ন্মেণ্ট করিবেন। ইহার এক জন চেয়ারম্যান থাকিবেন এবং তিনি হইবেন সরকারী চাকর্যে—খুব সম্ভব ইংরেজ, এবং দু-জন সভ্য থাকিবেন। তাহার মধ্যে এক জনের মুসলমান হওয়া চাই-ই চাই। অপর ব্যক্তি অ-মুসলমান হইবেন, অর্থাৎ তিনি ইহুদী, ফিরিঙ্গী, পারসী, আরমানি, দেশী খ্রীষ্টিয়ান, কিম্বা বর্ণ হিন্দু বা তপসিলি হিন্দু হইতে পারিবেন। তাহার মানে এই যে, যে-হিন্দুরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির এলাকার অধিবাসীদের তিন-চতুর্থাংশ, মিউনিসিপালিটির মোট আয়ের শতকরা ৮০৮২ টাকা

যাহারা দেয়, কলিকাতার শিক্ষিত ব্যক্তি ও সার্বজনিক-হিতকর্মী যাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক, এবং কলিকাতার বর্ত্তমান উন্নতি প্রধানতঃ যাঁহাদের কাজের ফল, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে তাঁহাদের এক জন লোক থাকিতেও পারে, না-থাকিতেও পারে!

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সব কাজ করাইতে হয় উচ্চতম হইতে নিম্নতম চাকরোদের দ্বারা। তাহারা নিযুক্ত হইবে, কতক সরকার-নিযুক্ত সরকারী প্রধান কার্যনির্বাহকের দ্বারা, কতক সরকারনিযুক্ত পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা। চাকরেরা যাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত বরখাস্ত ইত্যাদি হয়, তাঁহাদিগেরই মন জোগাইবে, পৌরপ্রতিনিধিদিগকে মানিবার তাহাদের কোন গরজ থাকিবে না। এ-রকম কর্মচারীদের দ্বারা পৌর-প্রতিনিধিরা কাজ আদায় কতটা করিতে পারিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ মিউনিসিপালিটির কাজে কোন দোষত্রুটি ঘটিলে তাহার এক একটা বিভাগ বন্ধ, এমন কি সব কৌন্সিলর ও অল্ডারম্যান অপসৃত হইতে পারিবে! কাজ আদায় করিবার মত প্রভাব হইতে যাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে, কাজ ভাল না-হইলে শাস্তি ও অপমান হইবে তাহাদেরই! ন্যায্য ব্যবস্থা বটে!

বিলের আর একটা ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া আমরা শেষ করি। সব কথা বলিবার স্থান নাই।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি একটা ছোট রাজ্যের মত। ইহার আয় মোটামুটি আড়াই কোটি টাকা। ইহার নানা রকম সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। তাহার কণ্ট্র্যাক্ট দিতে হয়; কোন কোন কাজও ঠিকা দিয়া করাইতে হয়। এই সব কণ্ট্র্যাক্ট মিউনিসিপালিটি কমীটি দ্বারা দিয়া থাকেন। বিলে ব্যবস্থা করা হইতেছে, অতঃপর কণ্ট্র্যাক্ট করিবার ক্ষমতা সরকার-নিযুক্ত সরকারী প্রধান কার্য-নির্বাহকের হাতে যাইবে এবং তিনি দশ হাজার টাকার পর্যন্ত এস্টিমেট মঞ্জুর করিতে এবং ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করিতে পারিবেন।

সুতরাং অতঃপর কণ্ট্র্যাক্টারদের দ্বারা জোগান জিনিষের কমতি বা তাহার অপকর্ষের জন্য বা তাহাদের কৃত ঠিকা কাজের জন্য কৌন্সিলর ও অল্ডারম্যানরা কৈফিয়ৎ চাহিলে কণ্ট্র্যাক্টররা তাহাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিবে।

—

আলবার্ট হলে মিউনিসিপাল বিলের প্রতিবাদ

কলিকাতার আলবার্ট হলে গত ২৪শে আষাঢ় 'প্রবাসী'র সম্পাদকের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে নাগরিকদিগের যে সভা আহূত হয়, তাহা হিন্দু মহাসভা আহ্বান করিয়া থাকিলেও তাহাতে সর্বসাধারণের জনমত ব্যক্ত হইয়াছিল। এই সভায় একটি মাত্র প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা মিউনিসিপাল বিলটা গণতন্ত্রবিরোধী, স্বাজাতি-কতাবিরোধী, ইহার দ্বারা কলিকাতার পৌর কার্য্যনির্বাহে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি পর্য্যন্ত উৎখাত হইবে, এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান কীর্ত্তি বিনষ্ট হইবে। প্রস্তাবে গবন্মেণ্টকে বিলটা প্রত্যাহার করিতে বলা হয়।

সভাপতি সকল সম্প্রদায়ের লোককে বিলটার প্রকাশ্য সমবেত বিরোধিতা করিতে অনুরোধ করেন, এবং কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে সভা করিয়া প্রত্যেক পল্লীর কৌন্সিলারদিগকে ইহার বিরোধিতা করিবার নিমিত্ত উপদেশ (mandate) দিতে করদাতাদিগকে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবটি ভূতপূর্ব মেয়র সনৎকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত এবং নরেন্দ্রনাথ দাস (এম্ এল্ এ) নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পদ্মরাজ জৈন ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা সমর্থিত হয়। ইঁহারা সকলেই সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

—

মুসলমান সম্প্রদায় ও গণতান্ত্রিকতা

মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের একছত্র নেতা, বঙ্গের মুসলমান মন্ত্রীরা ঐ লীগের লোক, এবং তাঁহারাও ঐ রকম একছত্র নেতৃত্ব স্থাপন করিতে চান। এই জন্য অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা যে বলি, "অমুক আইন দ্বারা গণতান্ত্রিকতা নষ্ট হইবে", তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই; কেন-না মুসলমান সম্প্রদায় স্বৈর একনায়কত্বের ভক্ত; তাহারা বাদশাহী, নবাবী, সুলতানী বুঝে ও চায়, গণতন্ত্র বুঝে

না ও চায় না। ইহা ভুল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের বিখ্যাত অনেক নেতাই সর্ সৈয়দ আহমদের আমল হইতে এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজনীতিকদের প্রভাবে মত গঠন ও প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তাহা খাঁটি মুসলমান মত নহে। খাঁটি মুসলমানী মত জানিতে হইলে, মুসলমানরা গণতান্ত্রিকতা পছন্দ করে বা স্বৈর একনায়কত্ব পছন্দ করে বুঝিতে হইলে, স্বাধীন দেশের মুসলমানদের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও অবস্থা এবং আচরণ ও মনের ভাব লক্ষ্য করিতে হইবে।

চিরাগত মামুলি সাধারণতন্ত্র (যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) ও সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র (যেমন রাশিয়ার সোভিয়েট-সমূহ) খাঁটি গণতন্ত্রের এই দুটা রূপ। তাছাড়া, রাজা আছেন অথচ দেশ গণতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিকতার এরূপ দৃষ্টান্তও আছে।

ভারতের বাহিরের অধিকাংশ মুসলমান এই দু-রকমের কোন-না-কোন গণতন্ত্রে বাস করে ও তাহাতে অভ্যস্ত।

ভারতবর্ষের বাহিরে সকলের চেয়ে বেশী মুসলমানের বাস চীনদেশে। চীন সুবৃহৎ সাধারণতন্ত্র। তথাকার মুসলমানেরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী চীনাদের সহিত একপ্রাণ হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। সে দেশে সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ নাই। চীনের শক্তিমত্তার ইহা একটি কারণ।

সকলের চেয়ে শক্তিশালী মুসলমান দেশ তুরস্ক। ইহা সাধারণতন্ত্র। স্বৈর একনায়কত্বই যদি মুসলমানদের প্রকৃতিগত, স্বভাবসম্মত, হইত, তাহা হইলে মুসলমানদের খলিফা তুরস্কের সুলতানকে তাড়াইয়া তুর্করা সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিত না।

আজেরবৈজান (Azerbaijan) সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্র। তুর্কিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকি-স্তান, প্রভৃতি আরও অনেকগুলি সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র রাশিয়ার সম্মিলিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহাদের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মুসলমান।

দ্বিতীয় প্রকারের গণতান্ত্রিক দেশের, অর্থাৎ যে-সব দেশে ইংলণ্ডের মত রাজা আছে এবং পার্লেমেণ্টও আছে সেই রকম দেশের দৃষ্টান্তও মুসলমান-জগতে আছে। আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও ঈজিপ্ট (মিশর) এইরূপ দেশ।

বস্তুতঃ, এক আরব দেশের ভিন্ন ভিন্ন ছোট কয়েকটি রাজ্য ছাড়া, ভারতবর্ষের বাহিরের সমুদয় স্বাধীন মুসলমান দেশে কোন-না-কোন রকমের গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত। আরব দেশের প্রধান রাজ্য ইব্‌ন্ সৌদ কর্তৃক স্থাপিত রাষ্ট্রও নিছক একনায়কত্বের দৃষ্টান্ত নহে। সেখানে মন্ত্রীসভা ও অন্যান্য পরামর্শদাতা সভা এবং পরামর্শদাতা ব্যবস্থাপরিষদ (Legislative Assembly) আছে। অতএব, ইহা কোন সন্দেহ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান জগতে অধিকাংশ মুসলমানের রাজনৈতিক মত গণতান্ত্রিক। ভারতবর্ষের যে-সব মুসলমানের মত অন্য রকম, তাহারা জগতের মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় নহে।

—

ব্রিটেন ও ফ্রান্স

ব্রিটেনের সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা ছিল। ফ্রান্স যুদ্ধে পরাজিত ও বিপন্ন হইয়া জার্মেনীর সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি করিয়াছে, মিত্র ব্রিটেনের সম্মতি লইয়া তাহা করে নাই। ব্রিটেনের সম্মতি পাওয়া যাক বা না-যাক, তাহার সম্মতি পাইবার চেষ্টা করা ফ্রান্সের উচিত ছিল। ফ্রান্স তাহা না করায় ব্রিটেন ক্ষুণ্ণ হইলেও ফ্রান্সকে বেশী কিছু কড়া কথা বলে নাই। ফ্রান্সের বাহিরে যত ফরাসী আছে ও ফ্রান্সের যত উপনিবেশ ও অন্য অধীন দেশ আছে তাহারা সকলে ফ্রেঞ্চ গবর্ন্মেণ্টের এই পরাজয় স্বীকারে সায় দেয় নাই। অনেকে যুদ্ধ চালাইয়া ফ্রান্সকে আবার স্বাধীন করিতে চায়। ব্রিটেনেরও ইচ্ছা সেইরূপ। ফ্রান্সের কোন কোন রণতরী ব্রিটিশ বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল। যুদ্ধ চালাইতে সেগুলি কাজে লাগিবে। কিন্তু অধিকাংশ অন্যত্র ছিল। যুদ্ধবিরতির সর্ত অনুসারে সেগুলি ব্যবহার করিবার ফ্রান্সের অধিকার ছিল না। অবশ্য জার্মেনী ও ইটালী যে সেগুলিকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিবে এরূপ সর্তও ছিল না। কিন্তু ফ্রেঞ্চ গবর্ন্মেণ্ট জার্মেনীর মুঠার ভিতর যাওয়ায়, হিটলার

সর্ত ভঙ্গ করিয়া সেগুলিকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করিলে উক্ত গবর্মেণ্ট বাধা দিতে পারিত না। হিটলারের সেরূপ গোপন অভিপ্রায় থাকা মোটেই বিচিত্র নহে, কারণ জার্মেনীর জলযুদ্ধশক্তি কম। ফ্রান্সের এই নৌবহর ও ইটালীর নৌবহর একযোগে ইংলণ্ডের নৌবহরকে আক্রমণ করিলে তাহা সঙ্গীন ব্যাপার হইত। তাহাতে ইংলণ্ড বিপন্ন হইতে পারিত। তাহা হইলে ফরাসীদের আবার স্বাধীন হইবার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত হইত।

এইরূপ বিপৎপাত নিবারণের নিমিত্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ব্রিটেনের কিছু করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তাই তাহাকে একাধিক জলযুদ্ধে ফ্রান্সের কয়েকটি রণতরীকে নষ্ট বা ঘায়েল ও অব্যবহার্য্য করিতে হইয়াছে, অন্য কয়েকটিকে ব্রিটিশ কোন কোন বন্দরে রাখিতে হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব মিত্র-দেশের সহিত এরূপ ব্যবহার দুঃখকর। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। এবং ইহাতে বস্তুতঃ ফ্রান্সের কোন অনিষ্ট হইবে না। বরং এই জাহাজগুলি জার্মেনী ও ইটালীকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করিতে না-দেওয়ায় ব্রিটেনের জয় অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, এবং ব্রিটেন জিতিলে ফ্রান্সের নষ্ট-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার হইবে।

ফ্রান্স বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রিটেনের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

—

ফ্রান্স জার্মেনীর পক্ষ অবলম্বন করিলে—?

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মিত্র-দেশ শত্রু হইয়া বসে, শত্রুদেশ মিত্র হয়—সব সম্পর্কই অস্থায়ী; অসম্ভব কিছু নহে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্পর্কে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঘটিবে বলিয়া কেহ কিছু দিন আগেও অনুমান করে নাই। কিন্তু এখন যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে এই আশঙ্কা স্বভাবতই মনে উদ্রেক হয় যে, হয়ত বা ফ্রান্স জার্মেনী ও ইটালীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। তাহা হইলে ফল কি হইবে, নিশ্চিত বলা যায় না। যদি তাহা ঘটে, তাহা হইলে যে-সকল ফরাসী ও ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্যের যে-সকল অংশ জার্মেনীর নিকট বর্তমান ফ্রেঞ্চ গবর্মেণ্টের নতি স্বীকারে সায় দেয় নাই, তাহারা নিশ্চয়ই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিবে না।

—

ফরাসী-ভারতের কি হইবে ?

যদি ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ফ্রান্সের অধীন যে-সকল জায়গা আছে, সেগুলির দশা কি হইবে কে জানে। সেগুলির মোট লোকসংখ্যা ১৯৩৫ সালে ছিল ২,৮২,২৯৭। জায়গাগুলির নাম রোম্যান অক্ষরেই দিতেছি, কারণ অধিকাংশের ঠিক্ উচ্চারণ জানি না:—Pondichery, Oulgaret, Villenour, Tiroubouvane, Bahour, Nettapacom, Modeliarpeth, Ariancoupom, Karikal, Tiruoular, Grande Aldee, Neravy, Nedounkadou, Catchery, Chandernagar, Mahe, Yanaon.

বর্তমান অবস্থায় ফ্রান্সে ও ব্রিটেনে যুদ্ধ হইলে ফরাসী সাম্রাজ্যের এই সামান্য অংশগুলিকে নিজের অধিকারে রাখিবার নিমিত্ত ফ্রান্স রণতরী ও স্থলসৈন্য পাঠাইতে পারিবে না—তত রণতরী ও স্থলসৈন্য তাহার আয়ত্তে নাই, এবং পাঠাইবার পথও ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই জায়গাগুলি যে নিজেরাই নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারিবে, এরূপ সামর্থ্যও তাহাদের নাই।

ফ্রান্সে ও ব্রিটেনে যুদ্ধ না-বাধাই সর্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে উল্লিখিত জায়গাগুলির পক্ষে, সন্ধি হওয়া পর্য্যন্ত, ব্রিটিশ হেফাজতে থাকাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয় হইবে।

—

মনরো মত বা নীতি (Monroe Doctrine)

আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অন্য কোন মহাদেশের কোন জাতির হস্তক্ষেপের অধিকার নাই, যুক্তরাষ্ট্রের (য়ুনাইটেড্ স্টেটসের) অন্যতম ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি মনরো এবম্বিধ মতের পূর্বাভাস দিয়াছিলেন বলিয়া ইহা মনরো ডক্ট্রিন নামে বিদিত। উত্তর-আমেরিকার কানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; তা ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ

আমেরিকার নিকটবর্তী কতকগুলি দ্বীপ ইংরেজ, ফরাসী, বা ওলন্দাজদের অধিকারভুক্ত। এই সবগুলি তাহাদের দখলে থাকায় যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি করে না। কিন্তু য়ুরোপীয় এই তিন দেশের কোনটি অপর দেশের নিকট পরাজিত হইলে বিজেতা দেশ যদি পরাজিত দেশের অধিকারভুক্ত আমেরিকার কোন দ্বীপ বা অন্য অংশ দখল করিতে চায়, তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র আপত্তি করিবে ও বাধা দিবে। উত্তর-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকা উভয় মহাদেশের (কানাডা ভিন্ন) সব দেশ ও অংশ স্বাধীন। ইউরোপের কোন দেশ কিম্বা জাপান আমেরিকার উভয় মহাদেশের (continentএর) কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে বা দখল করিতে চাহিলে, যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে আপত্তি করিবে ও বাধা দিবে।

মন্‌রো ডক্‌ট্রিন্ কী, তাহা উপরের মন্তব্যগুলি হইতে মোটামুটি বুঝা হইবে।

বর্তমান সময়ে ইহার আলোচনার কারণ, নাৎসীরা দক্ষিণ-আমেরিকার কোথাও কোথাও ষড়যন্ত্র করিয়া তথায় জার্মান প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে (উরুগুয়ে দেশে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে), এবং হল্যাণ্ড জার্মেনীর তাঁবে আসায় ও ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায় ও অনেকটা জার্মেনীর তাঁবে আসায় জার্মেনী ওলন্দাজ গিয়ানা ও ফ্রেঞ্চ ওএস্ট ইণ্ডীস্ দখল বা অন্ততঃ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) তাহা করিতে দিবে না। তাহার এইরূপ মনোভাব ন্যায়সঙ্গত।

—

এশিয়ায় মন্‌রো ডক্‌ট্রিন

জাপান এশিয়াতেও মনরো ডক্‌ট্রিন প্রয়োগের পক্ষপাতী। কিন্তু আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের মনরো নীতি সমর্থন এবং জাপানের এশিয়ায় উহা সমর্থনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় নিজে কোন দেশ বা ভূখণ্ড দখল করিতে চায় না, ঐ উভয় মহাদেশের স্বাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চায়, এবং কানাডা ও দ্বীপগুলির বর্তমান রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও অবস্থা বজায় রাখিতে চায়। জাপান শুধু ইহাই চাহে না যে, জাভা প্রভৃতি দ্বীপ হল্যাণ্ডের পরাজয় প্রযুক্ত জার্মেনী যেন দখল না করে ও ফ্রান্সের পরাজয়ে জার্মেনী ইন্দো-চীন দখল না করে, পরন্তু সে নিজেই অন্ততঃ জাভা প্রভৃতি বৃহৎ দ্বীপগুলি (এবং সুযোগ পাইলে ইন্দো-চীনও) দখল করিতে চায়। "চায়না উইক্‌লি রিভিয়ু" নামক বিখ্যাত চৈনিক সাপ্তাহিকের ১লা জুনের সংখ্যার ৩২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

আমরা এশিয়ায় মনরো নীতি এই অর্থে সমর্থন করিতে পারি যে, এশিয়ার সব দেশ স্বাধীন হইবে, অন্ততঃ যে-দেশগুলি পরাজিত বা পরাধীন কোন দেশের অধীন সেগুলি সদ্যসদ্যই স্বাধীন হইবে, বর্তমানে পরাধীন কোন দেশের নূতন পরাধীনতা ঘটিবে না, এবং কোন স্বাধীন দেশকে পরাধীন করিবার বা কোন পরাধীন দেশের প্রভু পরিবর্তন করিবার চেষ্টা হইলে এশিয়ার সকল দেশ তাহাতে বাধা দিবে। জাপানী গবন্মেণ্ট জাপান ছাড়া এশিয়ার অন্য কোন দেশের অভিভাবক ও রক্ষক নহে। সে এরূপ কোন দাবী করিলে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সম্পূর্ণ অস্বীকার্য্য।

—

জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সশস্ত্র যুদ্ধ কি ব্যর্থ?

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি তাহার গত ব্বর্ধা (Wardha) বৈঠকে বলিয়াছেন:

"It (the war in Europe) has demonstrated the inefficacy of organized violence on however vast a scale for the defence of national freedom and the liberties of peoples."

তাৎপর্য্য। যত বৃহৎ পরিমাণেই হউক সুশৃঙ্খল ও দলবদ্ধ বল-প্রয়োগ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যে অকেজো তাহা ইয়োরোপের বর্তমান যুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছে।

ইহা পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এইরূপ অদ্ভুত ও অমূলক উক্তি দ্বারা অহিংস-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইবে না। হিংসার চেয়ে অহিংসা ভাল, তাহা আমরাও মানি, কিন্তু এরূপ কোন কারণে নহে।

জাতীয় স্বাধীনতার নিমিত্ত সশস্ত্র যুদ্ধ যে ব্যর্থ, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশই যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে

পারে নাই। কিন্তু প্রত্যেক মহাদেশের ইতিহাসেই যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা লাভ ও স্বাধীনতা রক্ষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

যদি শুধু বর্তমান যুদ্ধের বিষয়ই বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও ওআর্কিং কমীটির উক্তির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। নিজের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসী দেশ যত দূর সম্ভব বৃহৎ যুদ্ধায়োজন করিলেও পরাজিত হইবেই, বর্তমান যুদ্ধ তাহা মোটেই প্রমাণ করে না। ফিনল্যাণ্ড ব্যর্থকাম হইয়াছে তাহার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট ছিল না বলিয়া, বাহির হইতে সাহায্যও সে যথেষ্ট পায় নাই বলিয়া। নতুবা প্রথম প্রথম ফিনদের সাহস ও রণকৌশল তাহাদিগকে ত জয়ীই করিতেছিল। অন্য সব পরাজিত দেশের দৃষ্টান্ত একটি একটি করিয়া বিচার করিবার স্থান নাই, বৃহত্তম পরাজিত দেশ ফ্রান্সের কথাই লওয়া যাক। ফ্রান্সের পরাজয় ঘটিয়াছে তাহার সেকেলে রণকৌশলের জন্য, সৈন্যদলের যথেষ্ট যন্ত্রসজ্জা ছিল না বলিয়া, এবং যথেষ্ট সৈন্য ছিল না বলিয়া। সম্ভবপর বৃহত্তম যুদ্ধসজ্জা সত্ত্বেও সে হারিয়াছে, ইহা সত্য নহে। ইংলণ্ডপ্রবাসী ফরাসী সেনাপতি দ গলের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায়।

ব্রিটেন নিজের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সম্ভবপর বৃহত্তম যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, এখনও হারে নাই, খুব সম্ভব হারিবে না। যদি হারে, তখন ওআর্কিং কমীটি যা খুশি বলিতে পারেন।

—

গান্ধীজীর ও ওআর্কিং কমীটির মতানৈক্য

গান্ধীজী মানুষের সকল অবস্থাতেই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে অহিংস থাকিবার পক্ষে। কোন মানুষ নিজে আক্রান্ত হইলে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রহীন বা সশস্ত্র বল প্রয়োগ না করিয়া বরং নিহত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। ভীরুদের কথা বলিতেছি না। খুব সাহসী সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক এরূপ অবস্থায় অহিংস থাকিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী এই প্রকার ব্যক্তিগত অহিংসা ত চানই, অধিকন্তু তিনি মনে করেন, পরাধীন জাতি অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, এবং স্বাধীন দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলেও তাহার যুদ্ধ না করিয়া অহিংস বাধা দেওয়া উচিত—রক্তপাত করা উচিত নহে। অহিংস উপায়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আমরা পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। কিন্তু অতীতে যাহা ঘটে নাই, ভবিষ্যতেও তাহা ঘটিতে পারে না, আমরা এরূপ মনে করি না। অহিংসায় গান্ধীজীর বিশ্বাস যেরূপ আমাদের সেরূপ নহে। তথাপি আমরা তাঁহার অহিংসায় পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি, এবং আমাদের বিশ্বাস কখনও সেরূপ হইলে আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিব।

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি গান্ধীজীর মত পূর্ণমাত্রায় অহিংসাবাদী নহেন বলিয়া, ৰ্ধায় গৃহীত তাঁহাদের প্রস্তাবে আভ্যন্তরীণ উপদ্রব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষার নিমিত্ত কংগ্রেস যাহা করিবেন, মহাত্মা গান্ধীকে তাহার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতালাভের নিমিত্ত কংগ্রেস ব্রিটেনের সহিত যে সংগ্রাম চালাইতেছেন, তাহা পূর্ববৎ সম্পূর্ণ অহিংসই থাকিবে। আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও উপদ্রবাদি নিবারণকল্পে কংগ্রেস প্রয়োজনমত বল প্রয়োগ করিবেন। ওআর্কিং কমীটি ইহার কারণ এই বলিয়াছেন যে, যে-সব মানুষের সঙ্গে কংগ্রেসকে ব্যবহার করিতে হয় ও হইবে তাহাদের স্বভাবচরিত্রে 'অপূর্ণতা' ও ত্রুটিবিচ্যুতি ("the present imperfections and failings in this respect of the human elements they have to deal with") আছে। ইহা সত্য কথা যে, বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষ যদি সকল অবস্থাতেই যুক্তি ও বিবেক বা ধর্মবুদ্ধি মানিবার মত মানুষ বা মনুষ্যসমষ্টি হয়, তাহা হইলে অহিংস উপায়েই কাজ চলিতে পারে। কিন্তু এদেশের ও বিদেশের অনেক মানুষেই সকল অবস্থায় সেরূপ থাকে না। এই হেতু কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উপর যখন সাতটি প্রদেশের ভার ছিল, তখন তাঁহাদিগকে পুলিসের ও কখন কখন ফৌজেরও সাহায্য লইতে হইয়াছিল। পরেও তাঁহাদের উপর দেশ-শাসনের ভার পড়িলে তাহাদের সাহায্য লইতে হইতে পারে বা হইবে। তদ্ভিন্ন, এখন, যখন দেশের কোন

অংশের শাসনের ভার কংগ্রেসের নাই তখনও, কংগ্রেসকে দেশে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত বে-সরকারীভাবে উপদ্রবকারী-দের উপর বাহুবল ও অস্ত্রবল প্রয়োগ করিতে হইতে পারে।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার নিমিত্ত বা দেশ রক্ষার সাহায্যার্থও কংগ্রেসকে সশস্ত্র বল প্রয়োগ করিতে বা সেরূপ বল-প্রয়োগে সাহায্য করিতে হইতে পারে; কারণ বহিশত্রুরা যুক্তি ও বিবেক বা ধর্মবুদ্ধি মানিবে না, বাহুবল ও অস্ত্রবলেরই প্রাধান্য মানিবে।

কংগ্রেস যে তাঁহার অতীত ও অহিংসার সহিত সঙ্গতিহীন সম্ভাবিত ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর জন্য দায়িত্ব হইতে গান্ধীজীকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে।

কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির বর্ধা সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি বা বিচারবৈষম্য আছে। স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত তাঁহারা বলিয়াছেন, কংগ্রেস ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবেন সম্পূর্ণ অহিংসভাবে, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা বা উপদ্রব নিবারণে এবং বহিঃশত্রুর প্রতিরোধ নিবারণে কংগ্রেসকে বাহুবল ও অস্ত্রবলের সাহায্য লইতে হইবে। শেষোক্ত দুই ক্ষেত্রে ইহা করিতে হইবে এই জন্য যে, যাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, যে-যে বিপক্ষকে অনিষ্টচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত বা অনিষ্টচেষ্টার সামর্থ্যরহিত করিতে হইবে, তাহারা কেবল সুযুক্তি ও বিবেকের বশ নহে, বাহুবল ও অস্ত্রবল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে।

কিন্তু ওআর্কিং কমীটি যখন বলিতেছেন, স্বাধীনতা-লাভের জন্য ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবন্মে্ন্টের সহিত সংগ্রামে কেবল অহিংস উপায়ই অবলম্বিত হইবে, তখন এরূপ সিদ্ধান্তের পশ্চাতে এই বিশ্বাস আছে অনুমান করা অসঙ্গত নহে, যে, ভারতবর্ষের যে-সব লোক উপদ্রব ঘটাইতে পারে এবং বাহিরের যে-সব জাতি বহিঃশত্রু-রূপে ভারত-আক্রমণ করিতে পারে, তাহারা এখনও এত উন্নত হয় নাই যে, শুধু সুযুক্তিতে ও বিবেক-বাণীতেই সাড়া দিবে, তাহাদের 'সুবুদ্ধি' জাগাইবার নিমিত্ত বলপ্রয়োগও আবশ্যক, কিন্তু ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবন্মে্ন্টের আধ্যাত্মিক উন্নতি এতটা হইয়াছে যে, কেবল সুযুক্তি ও 'ধর্মের কথা'ই তাহাদের সাড়া পাইবার পক্ষে যথেষ্ট—অনাত্মিক বল প্রয়োগ করিয়া তাহাদের সুবুদ্ধি জাগাইতে হইবে না। কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটির যদি ব্রিটিশ জাতি ও গবন্মে্ন্ট সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণা থাকে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের পক্ষে খুবই উচ্চ প্রশংসা। কিন্তু বাস্তবিকই কি এরূপ ধারণা কমীটির আছে?

—

ব্রিটেনকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে গান্ধীজীর অনুরোধ

কুড়ি বৎসর ধরিয়া যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর সহচর ও অনুচর রূপে কাজ করিতেছেন এবং যাঁহারা অনেক বিষয়েই অন্তরের সহিত তাঁহার মত গ্রহণ ও কার্যতঃ অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি পূর্ণ অহিংসাবাদী করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি জার্মেনীর দ্বারা আক্রান্ত ইংরেজদিগকে, তাঁহাদের যিনি যেখানেই থাকুন, অস্ত্রত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত অহিংস প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। জানি না তিনি সাত্ত্বিকতায় ইংরেজদিগকে তাঁহার অন্তরঙ্গতম সহ-কর্মীদিগের চেয়েও অহিংসার পথ গ্রহণের অধিকতর যোগ্য মনে করেন কি না। কিন্তু তাঁহার এই অনুরোধ অহিংসায় তাঁহার গভীর বিশ্বাস, মানুষের সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভের ক্ষমতায় বিশ্বাস, ও তাঁহার সাহসের পরিচয় দেয়। তজ্জন্য তিনি সম্মানার্হ। ইংরেজ জাতি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবে, মনে হয় না।

—

শত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থ যুদ্ধ ও অহিংস উপায়

আক্রান্ত হইলে সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া কোন জাতি আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে কিনা, তাহার আলোচনা সংক্ষেপে হইতে পারে না। "দেশ পরাধীন হয় হউক, তথাপি দেশরক্ষার নিমিত্ত আমরা অস্ত্র ব্যবহার করিব না," কোন জাতির এরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত কি না বা সম্ভব কি না, তাহার আলোচনাও সংক্ষেপে হইতে পারে না। আত্মরক্ষা, বিপন্নের রক্ষা,

ও দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রব্যবহার হিংসা কি না, অর্থাৎ অস্ত্রব্যবহার মাত্রই হিংসা কি না, তাহাও সংক্ষেপে আলোচনা করা যায় না, মনের মধ্যে আক্রমণকারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া আক্রমণ প্রতিহত করিবার নিমিত্ত অস্ত্র ব্যবহার করা যায় কি না, তাহার মীমাংসাও এক কথায় হয় না।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় স্বাধীনতাকে যে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করেন, সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা অহিংসাবাদী নহেন এবং স্বাধীনতাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করেন, তাঁহারা বলিবেন, "কেহ আমাদের দেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিলে আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিব; তাহাতে যদি শত্রুর প্রাণ বা আমাদের প্রাণ যায়, ক্ষতি নাই।" মহাত্মাজী বলিবেন, তিনিও প্রাণপণ করিয়া শত্রুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণ যায়, ক্ষতি নাই, কিন্তু শত্রুর প্রাণ তিনি বধ করিবেন না; মরিতে তাঁহার আপত্তি নাই, মারিতে আপত্তি।

অন্যে তাঁহার রক্তপাত করে করুক, কিন্তু তিনি অন্যের রক্তপাত সকল অবস্থাতেই অবিধেয় মনে করেন। আমরাও রক্তপাত চাই না, মানুষের কোন প্রকার অকালমৃত্যু ঘটে, তাহা আমরা চাই না। কিন্তু যদি শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত রক্তপাতহীন অসামরিক সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আমরা সেই উদ্দেশ্যে অগত্যা সশস্ত্র যুদ্ধ করা অনুচিত মনে করি না, বিধেয় মনে করি। অবশ্য, স্বাধীনতা রক্ষার এরূপ চেষ্টাও ব্যর্থ হইতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার্থ সকল রকম চেষ্টাই করিয়া দেখা উচিত। এবং সশস্ত্র যুদ্ধ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সফল চেষ্টার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছেও অনেক, কিন্তু অহিংস উপায়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নাই।

ইহা আমরা স্বীকার করি, যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যদি যুদ্ধ না করা যায়, তাহা হইলে রক্তপাত হয়ই না, কিম্বা যুদ্ধ অপেক্ষা কম রক্তপাত হয়। কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যুই একমাত্র অকালমৃত্যু নহে। দেশের স্বাধীনতা যদি রক্ষিত না-হয়, দেশ যদি পরাধীন হয় (শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধার্থে কেবলমাত্র অহিংস উপায় অবলম্বন করিলে দেশের পরাধীন হইবারই সম্ভাবনা অধিক), তাহা হইলে দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে এবং দৈহিক-অপুষ্টি-জনিত ব্যাধিআদিতে বহুগুণ অধিক মানুষ মরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুদ্ধে যত মানুষ মরিয়াছে দেখা যায়, পরাধীন-ভারতের ইতিহাসে ঐ সব কারণে তাহার চেয়ে অনেক বেশীগুণ মানুষ মরিয়াছে জানা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন, পরাধীনতা জাতীয় অধোগতি ও অবনতির একটি প্রধান কারণ। এরূপ অধোগতি অপেক্ষা মৃত্যু বরং ভাল। পরাধীনতায় যে জাতীয় অবনতি হয়, কংগ্রেসওআলাদিগকে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কোনও ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। কেন-না তাঁহারা নিজেই প্রতি বৎসর "স্বাধীনতা দিবসে" ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবনতির কথা বলিয়া থাকেন—যদিও আমরা তাঁহাদের এই কথায় পুরা সায় দি না।

—

আধ্যাত্মিক ও জান্তব দ্বিবিধ উৎকর্ষই চাই

যুদ্ধটা বিশুদ্ধ আত্মিক ক্রিয়া নহে, সত্য। ইহার অনেকটাই পাশব বা জান্তব। কিন্তু ইহাও আবশ্যক হয় এই কারণে যে, মানুষ কেবল আত্মা নহে। তাহার আত্মা আছে; আবার, জন্তুদের মত, দেহও আছে। জন্তুদের মত শক্তি ও প্রবৃত্তিসমূহ মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক ও হার্দিক সদ্গুণসমূহের সাহায্যে প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিলে তাহাই হয় মানুষের বৈশিষ্ট্য। যে-সব মানুষের ও যে-সব জাতির জন্তুত্ব অধিক, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইলে বাহুবল ও অস্ত্রবল প্রয়োগ করিয়া তাহা-দিগকে প্রথমে পরাস্ত করিতে হয়। তাহার পর তাহাদের উপর আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করা চলে।

স্বাধীন ভাবে এবং সভ্য ও উন্নত অবস্থায় টিকিয়া থাকিতে হইলে জাতির যেমন মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি চাই, সেইরূপ বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও নির্ভীক জন্তুও হওয়া চাই। সংস্কৃতি সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার আতিশয্যে কিংবা, বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাবশতঃ জান্তব বলিষ্ঠতা ও নির্ভীকতা হ্রাস পাওয়ায় সভ্যতর জাতি যে অসভ্যতর কিন্তু জন্তু হিসাবে বলিষ্ঠতর, কর্মঠতর ও নির্ভীকতর জাতির নিকট পরাজিত ও তাহার অধীন হইয়াছে, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম প্রভৃতির ইতিহাসে তাহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

কেমন করিয়া সংস্কৃতি সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতায় অগ্রসর হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে জান্তব বলিষ্ঠতা, কর্মঠতা ও নির্ভীকতা রক্ষা করা যায়, তাহা স্থির করা কঠিন সমস্যা। কিন্তু তাহার সমাধানের উপর স্বাধীন ও উন্নত ভাবে জাতির টিকিয়া থাকা নির্ভর করে।

—

ফ্রান্সে ডিক্টেটরি

মার্শ্যাল পেতাঁ ফ্রান্সের ডিক্টেটর বা সর্বাধ্যক্ষ হইয়াছেন। বার জন মন্ত্রীর সাহায্যে তিনি রাষ্ট্রের কাজ চালাইবেন। খবর রটিয়াছে যে, তিনি জার্মেনীর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে স্থিত ভার্সাইকে রাজধানী করিবার নিমিত্ত জার্মেনীর অনুমতি চাহিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার

খেতাবী সম্রাট যেমন জাপানের হাতের পুতুল, মার্শ্যাল পেতাঁ কি সেইরূপ হিটলারের তাঁবেদার হইতে চান? নতুবা, জার্মেনীর আয়ত্তের বাহিরে ত ফ্রান্সের অনেক জায়গা এখনও আছে; তাহার কোনটি নূতন ফ্রেঞ্চ গবর্ন্মেণ্টের পীঠস্থান কেন হইতে পারে না?

ফ্রান্স জার্মেনীর নিকট যুদ্ধবিরতির প্রার্থনা করিয়া যেমন বাহিরের পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, গণতান্ত্রিকতার পরিবর্তে ডিক্টেটরি চালাইয়া সেইরূপ হিটলারের নিকট আত্মিক পরাজয়ও স্বীকার করিল।

—

ছাত্রদের ছাত্রত্ব আবশ্যক কি না

চাষী চাষ না করিলে তাঁহার চাষী নাম থাকে না, মজুরী না করিলে তাঁহার মজুর নাম ঘুচিয়া যায়। এইরূপ বণিক, ডাক্তার, মোক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি নিজের নিজের নামের অনুযায়ী কাজ না করিলে সে নাম আর ব্যবহৃত হয় না, তাহার সার্থকতাও থাকে না। আর, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পৈত্রিক, মাত্রিক, শ্বাশুরিক সম্পত্তি বা অন্য আয় নাই, তাঁহাদের নামের অনুরূপ কাজ না করিলে চলেও না; কারণ এগুলি সব পেশা। কিন্তু ছাত্রত্ব পেশা নয়, ছাত্রদের ব্যয় নির্বাহ করেন পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক; ছাত্রদিগকে উপার্জ্জন করিতে হয় না। এই জন্য, ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টরিতে যাহাদের নাম আছে, তাহাদের মধ্যে যাহাদের বাস্তবিক ছাত্রত্বের লক্ষণ অধ্যয়নাদি দ্বারা বিদ্যা অর্জন নাই বলিলেও চলে, তাহারাও ছাত্র বলিয়া পরিচয় দেয়।

অনেক রাজনৈতিক নেতা উপনেতা সম্পাদক ছাত্রদিগকে পুরাপুরি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে, একেবারে "ঝাঁপ দিয়া পড়িতে," বলেন ও উৎসাহিত করেন। আমরা কোন কালেই তাহা বলি নাই, এখনও তাহা বলিতেছি না। এমন কথাও বলি না যে, রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত ছাত্রদের বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ থাকিবে না। আমরা বলি, ততটুকু সংস্পর্শ নিশ্চয়ই থাকিতে পারে, এবং থাকা উচিত, যাহাতে ছাত্রত্বের, অধ্যয়নাদি দ্বারা বিদ্যা অর্জ্জনের, ব্যাঘাত না জন্মে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এরূপ উন্মাদনা আছে যে, উহাতে পূর্ণমাত্রায় গা ঢালিয়া দিলে অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতিক হইলে ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য যাহা তাহাতে অবহেলা হইবেই। এই নিমিত্ত আমরা ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিক হইবার বিরোধী। ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধী ইহার বিরোধী। এ বিষয়ে তিনি অনেক বার অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কিছু মন্তব্য নীচে উদ্ধৃত হইল।

"Whilst I have pleaded for the removal of restrictions on the speech and movements of students, I am not able to support political strikes or demonstrations. Students should have the greatest freedom of expression and of opinion. They may openly express sympathy with any political party they like. But in my opinion they may not have freedom of action whilst they are studying. A student cannot be an active politician and pursue his studies at the same time. It is difficult to draw hard and fast lines at the time of big national upheavals. Then they do not strike or if the word 'strike' can be used in such circumstances it is a wholesale strike; it is a suspension of studies. Thus what may appear to be an exception is not one in reality."—"Students and Strikes," 1937.

রাজনীতি ছেলেখেলা নয়। বিচক্ষণ রাজনীতিক হইতে হইলে রাজনীতি-বিজ্ঞানের জ্ঞান ত চাই-ই, অন্য বহুবিধ জ্ঞানও চাই। যাহারা ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং মনে করে যে তাহার দ্বারা তাহারা "বিপ্লবী মনোভাব" জাগাইতেছে ও বাড়াইতেছে, তাহাদের অবগতির নিমিত্ত আমরা জগতের সকলের সেরা বিপ্লবী লেনিনের নিম্নমুদ্রিত মতটি আবার প্রকাশ করিতেছি।

"It would be a serious mistake to suppose that one can become a Communist without making one's own the whole sum of human knowledge"···Therefore he urged the youth "to acquire the whole sum of human knowledge,..." —*The Life and Teachings of Lenin,* by R. Palme Dutt, pp. 63-64.

তাৎপর্য্য। "মানব জ্ঞানের সমগ্র সমষ্টি নিজের আয়ত্ত না করিয়া সাম্যবাদী হওয়া যায় মনে করিলে বিষম ভ্রম হইবে।" সেই জন্য তিনি তরুণদিগকে "মানব জ্ঞানের সমগ্র সমষ্টি অর্জন করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন"।

জ্ঞানী না হইয়া যখন সাম্যবাদীও হওয়া যায় না, তখন অন্য রকম ভাল রাজনীতিক ত হওয়া যায়ই না।

—

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

পুনা ও বোম্বাইয়ে যে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, অশীতিপর অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কারবে তাহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পুরা নাম "শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর ঠাকরসী ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।" ইহাতে যিনি পনর লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতার নাম অনুসারে এই নাম রাখা হইয়াছে। ইহাতে সমস্ত শিক্ষা ভারতীয় ভাষার মধ্য দিয়া দেওয়া হয়, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় রূপে শিখান হয়। গত মাসে ইহার সমাবর্ত্তন (কনভোকেশন) অনুষ্ঠিত হয়।

মহীশূরের বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার সর্ মোক্ষগুণ্ডম্ বিশ্বেশ্বরায়্যা তাঁহার অভিভাষণে ইহার ছাত্রীদিগকে, জাপানের মত, বধূপনা ও গৃহিণীপনা শিক্ষার দিবার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

—

মৈমনসিংহে উপনির্বাচন

পূর্ব মৈমনসিংহের প্রতিনিধির পদ ব্যবস্থা-পরিষদে খালি হওয়ায় তাহার প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন দুই জন। বৈধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটি কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। বসু-দল অন্য এক জনকে খাড়া করিয়াছেন। আমরা বাহিরের লোক, কংগ্রেসের সভ্য নহি, অন্য কোন রাজনৈতিক দলেরও লোক নহি। আমাদের বিবেচনায় যাঁহারা কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিতে চান, সতীশ বাবুকেই তাঁহাদের ভোট দেওয়া উচিত। কংগ্রেসীপ্রার্থী তিনিই।

—

চীনের সঙ্কল্প

গত মাসে চীন-জাপান যুদ্ধ চতুর্থ বৎসরে পা দিয়াছে। সেনাপতি চিয়াংকাইশেক ঘোষণা করিয়াছেন, যত দিন পর্য্যন্ত জাপান চীন হইতে তাহার সমুদয় সেনা অপসৃত না-করিতেছে, চীন তত দিন লড়িবে। চীনের স্বদেশপ্রেম, অধ্যবসায় ও সাহস দৃষ্টান্তস্থানীয়।

অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের নিমিত্ত আবশ্যক অন্যান্য জিনিস বাহির হইতে আমদানী করিতে চীনকে বহু বাধা অতিক্রম করিতে হয়। চীন-সেনাপতির উক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হইবার পর আর একটি গুরুতর বাধা ঘটিয়াছে। ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া চীন যুদ্ধোপকরণ আমদানী করিতে পারিবে না। জাপানের এই দাবী ব্রিটেন মানিয়া লইয়াছে, অধিকন্তু তাহার এই অপমানকর প্রস্তাবেও সম্মত হইয়াছে যে, জাপানীরা রেঙ্গুনে থাকিয়া লক্ষ্য করিবে; ব্রিটেন সর্ত ঠিক্ মত পালন করিতেছে কি না। এখন চীনের পক্ষে কেবল রাশিয়ার পথটিই খোলা রহিল। ৩১শে আষাঢ় প্রকাশিত সংবাদ এই যে, এ-বিষয়ে ব্রিটেনে জাপানে চুক্তি এখনও পাকা হয় নাই, কথাবার্তা চলিতেছে।

—

রাশিয়ার চাল

রাশিয়া আগে বাল্টিক দেশগুলি করায়ত্ত করিয়াছিল। পরে রুমানিয়ার কতক অংশ দখল করিয়াছে। ব্রিটেন এখন তাহার সঙ্গে একটা সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে—আগে করিলে অপেক্ষাকৃত সহজে হইত এবং ফলও ভাল হইত। রাশিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত।

—

তুরস্ক ও আয়ারল্যাণ্ড

জার্মেনী দ্বারা আক্রান্ত হইলে আয়ার্ল্যাণ্ড প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিবে, কিন্তু এখন নিরপেক্ষ আছে ও পরেও থাকিবে বলিতেছে।

তুরস্কও জার্মেনী দ্বারা আক্রান্ত হইলে বাধা দিবে।

—

ইটালী

ইটালী যুদ্ধে নামিয়া সুবিধা করিতে পারিতেছে না। তাহার কেবল ক্ষতিই হইতেছে।

—

জার্মেনীর ব্রিটেন আক্রমণ

জার্মেনী আকাশপথে ব্রিটেন আক্রমণ করিয়া কিছু ঘড়বাড়ী পুড়াইতেছে এবং অল্পসংখ্যক মানুষ মারিতেছে বটে, কিন্তু এরূপ করিয়া তাহার ব্রিটেন-জয় সম্ভবপর নহে। জাহাজে করিয়া বহু লক্ষ সৈন্য ব্রিটেনে নামাইতে পারিলে তবে তাহা একটা আক্রমণের মত আক্রমণ হইত। কিন্তু জলে ব্রিটেনের শক্তির সে কাছ দিয়াও যায় না।

—

আবিসীনিয়া

ব্রিটেন এখন বিপন্ন হইয়া আবিসীনিয়ার সম্রাট হেল সেলাসীর গবর্মেণ্টকে তথাকার বৈধ গবর্মেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতেছে ও আবিসীনিয়াকে মিত্র বলিয়া স্বীকার করিতেছে। কিন্তু ইটালীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যখন হেল সেলাসী ব্রিটেনের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তখন ব্রিটেন সাহায্য দেয় নাই।

—

সুভাষবাবুর গ্রেপ্তারের কারণ

ভারতসচিব পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন, সুভাষবাবু হলওএল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব করিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে! কিন্তু অভিযান ত চলিতেছে। অভিযানের অনুষ্ঠাতাদের বুদ্ধি এবং সুভাষবাবুকে গ্রেপ্তার করিবার মন্ত্রণাদাতাদের বুদ্ধি—উভয়েরই বহুৎ বহুৎ তারিফ প্রাপ্য। অনুষ্ঠাতাদের বুদ্ধির গুণে একটা বাজে আন্দোলন করিয়া অনেক লোক শাস্তি পাইতেছে, এবং অপর পক্ষের বুদ্ধির গুণে সুভাষবাবুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ দেশের স্থানে স্থানে হওয়ায় গবর্মেণ্টের প্রতি অসন্তোষ বাড়িতেছে।

ইহাও তাজ্জব ব্যাপার যে, যে মুসলিম লীগের সঙ্গে সুভাষবাবু প্যাক্ট করিলেন, তাহার মন্ত্রীরাই তাঁহাকে জেলে পাঠাইলেন! ইয়োরোপে ব্রিটেনকে মিতা ফ্রান্সের রণতরী ঘায়েল করিতে হইল, বাংলা দেশে মুসলিম লীগের কর্তাকে মিতা বসু-দলের কর্তাকে বন্দী করিতে হইল! জগতের রাজনীতি-রাজ্যটা কী অ-রাজ-ক!

জমিয়ৎ-উল-উলেমা পাকিস্থান-বিরোধী

কোয়েটায় জমিয়ৎ-উল-উলেমার অধিবেশনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে বলা হইয়াছে এবং পাকিস্থান-পরিকল্পনার নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জিন্নার কতকগুলি অনুচর ভিন্ন অন্য মুসলমানেরা ক্রমশ বুঝিতেছেন যে, পাকিস্থান কায়েম করিতে হইলে ভারতবর্ষে গোরস্থান বাড়িবে এবং হয়ত ভারতবর্ষ পাতিস্থানে পরিণত হইতে পারে।

—

"দি রেফিউজ"

"দি রেফিউজ" নামে পরিচিত কলিকাতার যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী অসহায় আতুরদিগের আশ্রয়ভবনটির সমিতির সভাপতি সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় (অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট)। ইহা সকল সম্প্রদায়ের লোকদের সাহায্য পাইবার যোগ্য উৎকৃষ্ট জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হকের সভাপতিত্বে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তিনি ইহাকে সরকারী সাহায্য দিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন।

এই আতুরনিবাসটি বর্ত্তমান নাম দিয়া চালাইয়াছিলেন স্বর্গত শ্রীযুক্ত আনন্দ বিশ্বাস নামক এক জন সহৃদয় খ্রীষ্টিয়ান ভদ্রলোক। গত শতাব্দীতে ১৮৯০ সালে "দাসাশ্রম" নামে যে আতুরাশ্রমটি পরলোকগত মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী (হাইকোর্টের উকীল) এবং তাঁহাদের পত্নীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, "দি রেফিউজ" তাহারই বৰ্দ্ধিতায়তন রূপান্তর। দাসাশ্রমের সেবাবাণী প্রচারার্থ ও ব্যয়নির্বাহার্থ "দাসী" নামক একটি মাসিক পত্র ছিল, এবং ব্যয়নির্বাহার্থ দাসাশ্রম মেডিক্যাল হল নামক একটি ঔষধের দোকানও ছিল।

—

বন্যায় বিপন্ন উড়িষ্যা

এ বৎসরও বন্যায় উড়িষ্যার নানা স্থান বিপন্ন হইয়াছে। শুধু বালেশ্বর থানার এলাকাতেই ৫০০০ পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। যাঁহারা বন্যায় বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখে আমরা ব্যথিত।

উড়িষ্যার বন্যার স্থায়ী প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণার্থ অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। উড়িষ্যায় এখন কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্ট থাকিলে মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই সদ্য সদ্য সাহায্য দানের ও স্থায়ী প্রতিকারের সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। সদ্য সদ্য সাহায্য দানের চেষ্টা ভারতভৃত্য সমিতি করিতেছেন। অর্থ, The Secretary, Servants of India Society, Poona, 4, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ

মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজের বি-এ শ্রেণীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অঙ্গীভবন (affiliation) বাংলা-সরকার মঞ্জুর করেন নাই, এই সংবাদ একাধিক দৈনিকে দেখিয়া আমরা এ-মাসের প্রবাসীর ৫১৪ পৃষ্ঠায় এ-বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী সংবাদ এই যে, হরগঙ্গা কলেজে বি-এ ক্লাস চালান মঞ্জুর হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে, শিক্ষামন্ত্রী প্রধান মন্ত্রী এইরূপ আবেদন পাইয়া বিষয়টি বিবেচনাধীন রাখিয়াছেন ও উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন। এই সংবাদ সত্য অনুমান করিয়া আমরা ৫১৪ পৃষ্ঠার "নামঞ্জুরিকরণ" হইতে "অসম্মত কেন?" পর্য্যন্ত কথাগুলি প্রত্যাহার করিতেছি। মুন্সীগঞ্জের কলেজ যে বি-এ, বি-এস্‌সি, পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত উচিত, তাহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

—

স্বামী পরমানন্দ

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরমানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ৩৪ বৎসর সেখানে অগণিত বক্তৃতা, গদ্যে ও পদ্যে ২৬টি গ্রন্থ রচনা, মেসেজ অব্ দি ঈস্ট নামক পত্রিকা সম্পাদন, বহু প্রবন্ধ রচনা, কয়েকটি আশ্রম স্থাপন, এবং সর্ব্বোপরি, নিজ আত্মোৎসৃষ্ট পবিত্র জীবন দ্বারা ঐ মহাদেশে ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে যে সভা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত বাণী পঠিত হয়।

> "আমেরিকায় ভ্রমণকালে একদিন স্বামী পরমানন্দের আতিথ্যলাভ করেছি এবং দেখেছি সেখানে জনসমাজে তাঁর কী সম্মান। আমাদের দেশের পক্ষে তাঁর অকালমৃত্যু শোচনীয়। পাশ্চাত্য মহাদেশে তিনি ভারতবর্ষের নামকে জয়যুক্ত করেছেন। এই তাঁর কীর্ত্তির জন্য তাঁর স্বদেশের সকৃতজ্ঞ স্মৃতিকে তিনি সঙ্গে বহন করে নিয়ে গেলেন একথা ভোলবার নয়।"

সভায় স্বামীজীর ভগিনী শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী তাঁহার জীবনের বহু অজ্ঞাত কথা বলেন। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এবং ডক্টর কালিদাস নাগও সেইরূপ অনেক কথা বলেন। তদ্ভিন্ন অধ্যাপক অতুল সেন, বিনয়কুমার সরকার ও জিতেশ গুহ এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। মিঃ বি সি চ্যাটার্জি, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করিবেন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহ সভায় আসেন নাই।

চুম্বক-মাইন

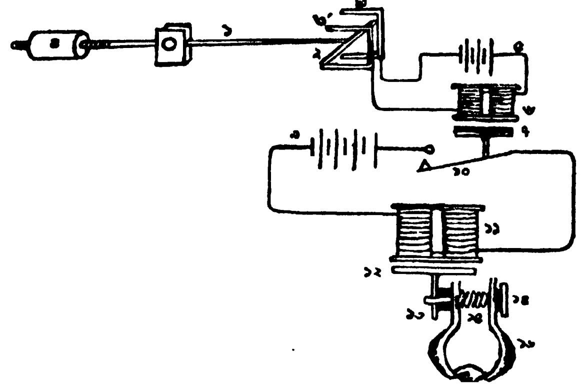
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মাইন ও টর্পেডো গত মহাযুদ্ধে কিরূপ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জাহাজের চতুর্দ্দিক তারের জালে ঘিরিয়া এবং মাইন-সন্ধানী জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া সেবারের উপদ্রব অনেক পরিমাণে প্রশমিত করা সম্ভব হইয়াছিল। তখনকার মাইন ছিল অর্দ্ধনিমজ্জিত এক একটা প্রকাণ্ড বয়ার মত, বিস্ফোরক পদার্থে পরিপূর্ণ। মাইনের চতুর্দ্দিকে থাকিত সুদীর্ঘ নাকের মত কতকগুলি লম্বা নল। নাকের ডগায় কাচ-বর্ত্তুলের ভিতর রাখা হইত খানিকটা এসিড। জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া কাচ-বর্ত্তুলটি ভাঙিয়া গেলেই জলের চাপে এসিড ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া বিস্ফোরণ ঘটাইত। কোন কোন মাইনে বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য মার্কারি ফুল্‌মিনেটও ব্যবহৃত হইত। অবশ্য এ ধরণের মাইন আজকালও ব্যবহৃত হইতেছে। যে-কোন রকম মাইনই হউক না কেন জাহাজের সংস্পর্শে না আসিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। মাইন-সন্ধানী জাহাজ এগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া সমুদ্রপথ নিরাপদ রাখিতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল। তাছাড়া কতকগুলিকে দূর হইতে গুলি করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছিল। গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে মাইনের উপদ্রব প্রতিরোধকল্পে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই দেখা গেল—এবার নূতন ধরণের এক প্রকার মাইনের উপদ্রব সুরু হইয়াছে। এই মাইন ভাসমান অথবা অর্দ্ধনিমজ্জিত নহে। ইহা একেবারে সমুদ্রের তলদেশে অবস্থান করে। মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বহু জাহাজ এই অজ্ঞাত মারণাস্ত্রের কবলে পড়িয়া বিপন্ন হইতে লাগিল। কি যে ব্যাপার পরিষ্কার কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। এটুকু কেবল জানা গেল, শত্রুপক্ষ চুম্বক-মাইন নামে এক প্রকার অদ্ভুত মারণাস্ত্রের সাহায্যে এইরূপ উপদ্রব ঘটাইতেছে। কিন্তু পদার্থটার গঠনকৌশল সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা গেল না। দিনের পর দিন উৎপাত বাড়িয়াই চলিতেছিল। এক-এক জন এক-এক প্রকার অনুমান করিতে লাগিল। কেহ বলিল, ইহা আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত চুম্বক পাহাড়ের মত কিছু একটা পদার্থ হইতে পারে। চুম্বক পাহাড়ের আকর্ষণে সিন্দবাদের জাহাজ যেমন করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ইহার কার্য্যপ্রণালীও বোধ হয় কতকটা সেইরূপ। চৌম্বক আকর্ষণে লৌহনির্ম্মিত জাহাজ ধীরে ধীরে তাহার আওতার মধ্যে গিয়া পড়িতে বাধ্য হয় এবং অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বিস্ফোরণ ঘটিবার ফলে ধ্বংস হইয়া যায়। কেহ বলিল, তাহা অসম্ভব। মাইনের চৌম্বক শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, বিশালকায় একটা জাহাজকে তাহার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তবে ইহা সম্ভব যে, লৌহবর্ম্মাবৃত বিরাটকায় জাহাজের আকর্ষণে মাইনগুলি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে লাগে এবং প্রবল ধাক্কায় বিস্ফোরণ ঘটিয়া আকর্ষণকারী জাহাজের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে। কথাটা কতক পরিমাণে সমীচীন বোধ হইলেও প্রকৃত তথ্য না জানা পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চিত হইতে পারিতেছিল না। জোর অনুসন্ধান চলিতেছিল। নাৎসীরা অতি সঙ্গোপনে সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে মাইন পাতিয়া যায়। কিন্তু বেশী দিন তাহারা মিত্রশক্তির সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হইল না। শত্রুপক্ষীয় সী-প্লেনকে এক বার মাইন পাতিতে দেখিয়া মাইন-সন্ধানী জাহাজের সাহায্যে তাহাকে সেই স্থান হইতে উদ্ধার করে। বিশেষভাবে নির্ম্মিত ধাতু-বর্জ্জিত পোষাক পরিধান করিয়া অতি সতর্কতার সহিত বিভিন্ন অংশ খুলিয়া লইয়া পরীক্ষা সুরু হইল। পরীক্ষার ফলে চুম্বক-মাইনের নির্ম্মাণকৌশল জানিয়া লইবার পর ইহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় আবিষ্কৃত

হয়। গেল বছরের নবেম্বর মাসের বেতার বক্তৃতায় তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন প্রচার করেন যে, চুম্বক-মাইনের নির্ম্মাণকৌশল সকলই জানিতে পারা গিয়াছে এবং ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

চুম্বক-মাইন কিরূপ পদার্থ এক নম্বর চিত্র হইতে তাহা মোটামুটি অনুমান করা সম্ভব হইবে। মাইনটিকে ধাতু-নির্ম্মিত একটি অতিকায় ডিম বলা যাইতে পারে। ডিমটি লম্বায় আট ফিট, চওড়া দুই ফিট এবং ওজনে প্রায় পনর মণ। এই বিরাট্ ডিমের খোলাটি এরূপ এক প্রকার ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত যাহা চৌম্বক শক্তি দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হয় না। খোলের অভ্যন্তরে কতকগুলি জটিল কলকব্জা ও বিস্ফোরক পদার্থ থাকে। অভ্যন্তর ভাগ সাধারণতঃ তিন অংশে বিভক্ত। ডিমের সরু দিক্‌টার উপরিভাগে থাকে গুটানো একটি প্যারাশুট। মধ্যভাগে নানা প্রকার কলকব্জা ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। চওড়া দিক্‌টা বিস্ফোরক পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রায় আট মণ ওজনের ভীষণপ্রকৃতির বিস্ফোরক ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন (T. N .T. নামে পরিচিত) প্রলয় কাণ্ড ঘটাইয়া তোলে। চওড়া মুখে খোঁটার মত কয়েকটি পদার্থ বাহিরের দিকে প্রসারিত হইয়া আছে। এইগুলিকে মাইনের পা বলা যাইতে পারে। স্রোতের টানে যাহাতে উল্টাইয়া বা ভাসিয়া না যায় তাহার জন্যই এই পাগুলির ব্যবস্থা। পাগুলি সমুদ্র-তলের বালির মধ্যে আটকাইয়া যায়। ডিমের সরু মুখের খানিকটা অবধি প্যারাশুটটির উপর অর্দ্ধবৃত্তাকার লম্বাটে একজোড়া ঢাকনা থাকে। বিস্ফোরণ ঘটাইবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি মধ্যস্থলে স্থাপিত।

চুম্বক-মাইন নাম হইতে মনে হয়, উহার ভিতর না জানি কত শক্তিশালী চুম্বকের খেলা চলিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চুম্বকের একটি অতি সাধারণ জিনিস ইহাতে আছে। সেটি হইতেছে—সূক্ষ্ম একটি চুম্বক-শলাকা। যাহাতে মাইনের অপর কোন অংশ চৌম্বক শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয় তাহারই ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সামান্য চুম্বক-শলাকাটিই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সম্পাদনের জন্য দায়ী। মাইনটির মধ্যস্থলে চুম্বক-শলাকাটি ঢেঁকিকলের উপর শয়ান ভাবে স্থাপিত। শলাকার এক দিকে একটি ভারী বস্তুর সাহায্যে ইহাকে সাম্যাবস্থায় রাখা হয়। লৌহ বা চুম্বক ধর্ম্মী কোন পদার্থ নিকটবর্ত্তী হইলেই আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণের ফলে শলাকাটির অগ্রভাগ হয় উপরের দিকে উঠিবে, নয় তো নীচের দিকে নামিবে। শলাকার অগ্রভাগে সমকোণী বাহুর মত উভয় দিকে প্রসারিত একটি ক্ষুদ্র ধাতব দণ্ড আছে। শয়ানভাবে অবস্থিত দুইটি 'ফর্কে'র মধ্যে এই সমকোণী দণ্ডটি উপরে নীচে খেলিতে পারে। 'ফর্ক' দুইটি ব্যাটারী সংলগ্ন দুইটি তড়িৎ লাইনের প্রান্ত-ভাগে অবস্থিত। চুম্বক-শলাকার অগ্রভাগ উপরেই উঠুক কিংবা নীচেই নামুক তাহার সমকোণী বাহুর সাহায্যে তড়িৎস্রোতের বিচ্ছিন্ন পথকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দেয়। তড়িৎস্রোত তখন একটি 'রিলে'কে (Relay) কার্য্যকরী করিয়া তোলে। 'রিলে' কার্য্যকরী হইবামাত্র তৎসংলগ্ন অপর একটি তড়িৎ পথ উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে জোরালো স্প্রিং সংলগ্ন একটি সুদৃঢ় ধাতব দণ্ডকে মুক্ত করিয়া দেয়। ইঁদুরের কল যেমন করিয়া আটকা পড়ে, স্প্রিঙের টানে মাইনের অভ্যন্তরস্থ দণ্ডটি সেইরূপ বারুদস্তূপে ভীষণ আঘাত করিয়া বিস্ফোরণ ঘটায়।



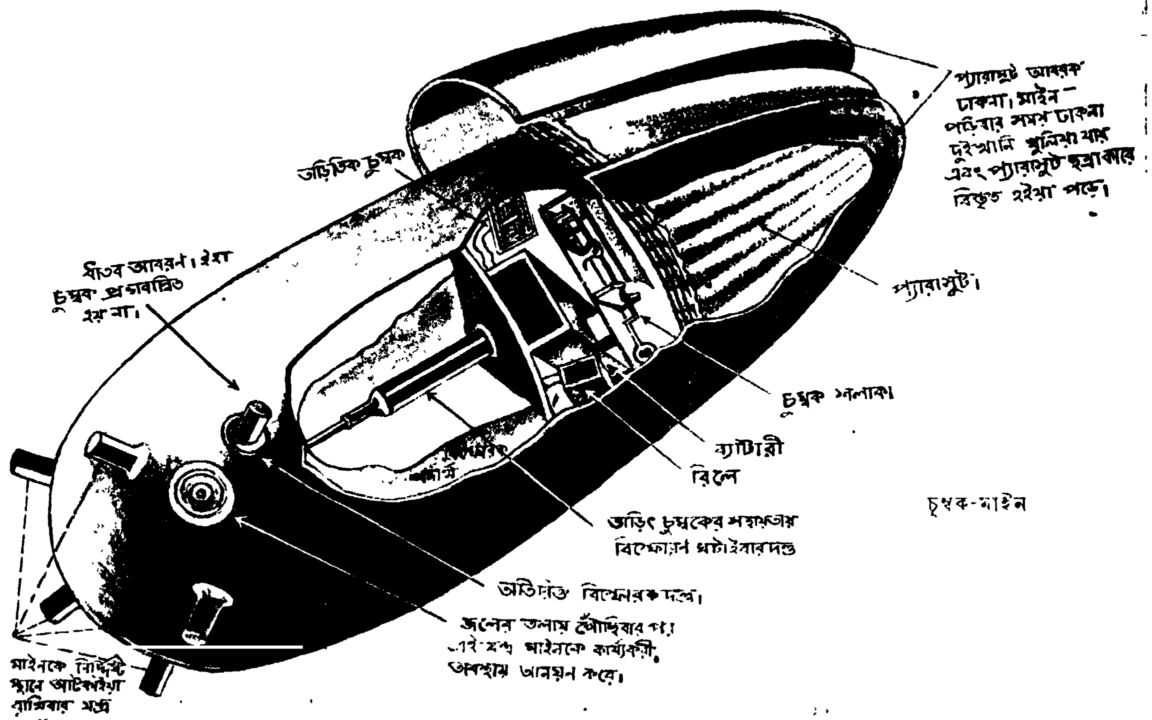
চুম্বক-মাইনের বিস্ফোরণ ঘটাইবার যান্ত্রিক কৌশল

সর্ব্বদাই চুম্বক-মাইন অগভীর জলে স্থাপন করা হয়। ভাসমান অথবা অর্দ্ধনিমজ্জিত মাইন হইলে সমুদ্রের যে-কোন স্থানে স্থাপন করা চলিত। কিন্তু এগুলি ভাসমান মাইন নহে। সমুদ্রের তলদেশেই অবস্থান করে। কাজেই গভীর জলে স্থাপন করিলে ইহা হইতে বিপদের আশঙ্কা খুবই কম থাকে। সি-প্লেনের সাহায্যে উপর হইতে মাইন জলে নিক্ষেপ করা হয়। দুইটি টর্পেডো টিউবের মধ্যে দুইটি চুম্বক-মাইন লইয়া সি-প্লেন উপযুক্ত স্থান দেখিবামাত্র বোতাম টিপিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাইনটি টিউব হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং স্প্রিংএর চাপে একটি 'ট্রিগার' মুক্ত হইয়া যায়। 'ট্রিগারে'র সহিত প্যারাসুট ও তাহার আবরণ দুইখানি যান্ত্রিক কৌশলে সংলগ্ন। 'ট্রিগারটি খুলিবামাত্র আবরণ দুটি খুলিয়া যায় এবং স্প্রিঙের চাপে প্যারাসুট ছত্রাকারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মাইনটি তখন ধীরে ধীরে জলের উপর অবতরণ করিতে থাকে। প্যারাসুটের সাহায্য ব্যতিরেকে উপর হইতে অতবড় ভারী বস্তু ছাড়িয়া দিলে জলের সহিত ধাক্কা লাগিয়া ভিতরের সূক্ষ্ম কলকব্জা বিগড়াইয়া যাইতে পারে অথবা অতিরিক্ত চাপে বিস্ফোরণও ঘটিতে পারে। প্যারাসুটটি মাইনের সহিত এমন ভাবে সংলগ্ন যে জলে পড়িবামাত্রই তাহা মাইন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মাইন জলের নীচে গিয়া সমুদ্রের তলায় খাড়াভাবে আটকাইয়া থাকে। স্রোতের টানে স্থানচ্যুত হইবার সম্ভাবনাও থাকে না।

চুম্বক-মাইনের সহিত আর একটি অদ্ভুত যন্ত্র সংলগ্ন থাকে। ইহা এক প্রকার "হাইড্রোষ্ট্যাটিক ডিভাইস"। মাইনটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে না পৌছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে অর্থাৎ স্বাভাবিক উপায়ে কোনক্রমেই বিস্ফোরিত হইতে পারে না। কারণ ব্যাটারীর তড়িৎপ্রবাহের পথ তখন বন্ধ থাকে। কিন্তু জলের নীচে নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে পৌছাইবামাত্রই সক্রিয় হইয়া উঠে অর্থাৎ বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। "হাইড্রোষ্টাটিক ডিভাইস" বা জলচাপ যন্ত্রের কৌশলে এই ব্যাপারটি সম্ভব হইয়াছে। মাইনটি চওড়া প্রান্তের এক স্থানে নমনীয় একখানি গোলাকার পর্দ্দা এমন ভাবে স্থাপিত যে, তাহার উপর সমুদ্রজলের চাপ পড়িতে পারে। নির্দ্দিষ্ট একটা চাপে পর্দ্দাখানি ভিতরের দিকে অবনমিত হয়। অবনমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎসংলগ্ন "লিভারে"র যান্ত্রিক কৌশলে তড়িৎপ্রবাহের পথ খুলিয়া যায় এবং মাইন তাজা বা সক্রিয় অবস্থায় উপনীত হইয়া শিকারের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। কোন জাহাজ নিকটবর্ত্তী হইলেই লৌহ-বর্ম্মের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে মাইনের অভ্যন্তরস্থ চুম্বক-শলাকা নড়িয়া উঠে এবং নিমেষের মধ্যেই প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া যায়।

লৌহনির্ম্মিত জাহাজ কিছুদিন চলাচল করিবার পর পৃথিবীর স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তির প্রভাবে বেশী বা কম একটি অখণ্ড চুম্বকের মত ব্যবহার করিয়া থাকে। স্থল-বিশেষে অবস্থানের ফলে ইহার উপরিভাগে দক্ষিণ মেরু এবং নিম্নভাগে উত্তর মেরু অথবা বিপরীত ভাবে চুম্বক-শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ কোন জাহাজ চুম্বক-মাইনের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে মাইনের চুম্বক-শলাকা উর্দ্ধদিকে উঠিতে পারে অথবা সমমেরুর সম্মুখীন হইলে নিম্নগামীও হইতে পারে। উপরে বা নীচে যে কোন দিকেই কাঁটা নড়ুক না কেন সকল অবস্থাতেই কেমন করিয়া বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে দুই নম্বর চিত্র হইতে তাহার একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

ঢেঁকিকলের উপর শয়ানভাবে অবস্থিত (১) চুম্বক-শলাকাটির অগ্রভাগে উভয়দিকে প্রসারিত সমকোণে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দণ্ড (২) আছে। পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ফর্কের (৩, ৩´) মধ্যে এই দণ্ডটি (২) এমন ভাবে স্থাপিত যে সাধারণ অবস্থায় কাহারও গায়ে না ঠেকিয়া মধ্যস্থলে থাকিবে। শলাকার অপর দিকে একটি ভারের (৪) সাহায্যে অনায়াসেই এরূপ করা যাইতে পারে। ক্ষীণ শক্তির ব্যাটারী (৫) হইতে দুইটি তার ৩ ও ৩´ নম্বরের 'ফর্ক' দুইটির সহিত সংলগ্ন। ফর্ক দুইটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত বলিয়া তড়িৎশক্তি তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে শলাকাটি যদি উপরের দিকে আকর্ষিত হয় তবে শলাকার অগ্রভাগে স্থাপিত ক্ষুদ্র' দণ্ডটি (২) ফর্কের উপরের দুই বাহু স্পর্শ



চুম্বক-মাইন

করিবে এবং ব্যাটারী হইতে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। নীচের বাহু স্পর্শ করিলেও ফল একই রূপ দাঁড়াইবে। এই প্রবাহের পথে যদি একটি তড়িৎ-চুম্বক (৬) থাকে, তবে তাহা চৌম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ৭ নম্বরের লৌহ-পাতখানি উপরের দিকে টানিয়া লইবে। ইহাই 'রীলে'র ব্যবস্থা। ৭ নম্বরের লৌহপর্দ্দাখানির সহিত ৯ নম্বরের অপর একটি শক্তিশালী ব্যাটারীর তড়িৎপ্রবাহ পথের কর্ত্তিত অংশ সংযুক্ত। কাজেই ৭ নম্বরের লৌহপর্দ্দাটির উপরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ১০ নম্বর স্প্রিঙের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে, ফলে ১১ নম্বর তড়িৎ-চুম্বক ১২ নম্বরের লৌহপর্দ্দাখানিকে উপরে টানিয়া তুলিবে। মাইনের ভিতরের ১৭ নম্বর বিস্ফোরক দণ্ডটি ১৬ নম্বর ক্ল্যাম্পের সাহায্যে জোর করিয়া উপরে টানিয়া রাখা হইয়াছে। ১৫ নম্বরের স্প্রিং ক্ল্যাম্পের দুইটি বাহুকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চাহে। ১৪ নম্বর পিনের সাহায্যে ক্ল্যাম্পের দুইটি বাহু পরস্পর সংলগ্ন। ১২ নম্বর পর্দ্দা-সংলগ্ন ১৩ নম্বর খাড়া পিনটি ১৪ নম্বর পিনের ভিতর গলিয়া ক্ল্যাম্পটিকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখিয়াছে। চৌম্বক আকর্ষণে ১২ নম্বরের লৌহপর্দ্দাখানি উপরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে পিনটি খুলিয়া গিয়া ক্ল্যাম্পটিকে ফাঁক করিয়া দিবে, এবং ১৮ নম্বর স্প্রিঙের টানে বিস্ফোরক দণ্ড তৎক্ষণাৎ বারুদস্তূপে আঘাত করিয়া বিস্ফোরণ ঘটাইবে। এতদ্ব্যতীত মাইনটির গায়ে বাহিরের দিকে প্রসারিত অতিরিক্ত বিস্ফোরক দণ্ডও রহিয়াছে। কোন কঠিন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে ইহাদের সাহায্যে ও বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে।

যাহা হউক, চুম্বক-মাইনের এই যান্ত্রিক কৌশল অবগত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রশক্তি ইহার উপদ্রব নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রতি-কারের উপায় আবিষ্কারের পর হইতে চুম্বক মাইনের উপদ্রবের কথা শোনা যাইতেছে না। "ডি-গসিং" ব্যবস্থায় ইহার প্রতিকার সম্ভব হইয়াছে। এই সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকু জানিতে পারা গিয়াছে যে, তড়িৎপ্রবাহ পরি-

চালিত করিয়া জাহাজকে চুম্বক প্রভাব মুক্ত করিয়া রাখা হয়।

জার্মান বৈজ্ঞানিক Friedrich Gauss-এর নামানুসারে চৌম্বক শক্তির এক এক মাত্রার নামকরণ হইয়াছে Gauss. যে-ব্যবস্থা দ্বারা কোন পদার্থকে চৌম্বক প্রভাব মুক্ত করিতে পারা যায় তাহাকে "de-Gaussing equipment" বলা হয়; সংক্ষেপতঃ ইহা D. G. equipment নামে পরিচিত। জাহাজের খোলের বহির্ভাগে জলের উপর তাহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া কতকগুলি তারকুণ্ডলী বেষ্টন করা হয়। এই তারকুণ্ডলীকে তড়িৎপ্রভাবান্বিত করিয়া কোন অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় জাহাজকে চৌম্বক প্রভাব মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি লৌহ দণ্ডের চতুর্দ্দিকে একমুখী করিয়া কয়েক ফেরতা ইনসুলেটেড তার জড়াইয়া তড়িৎ পরিচালন করিলে দেখা যায় সাধারণ লৌহ চৌম্বক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তারের তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চৌম্বক শক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু একমুখী করিয়া এক ফেরতা তার জড়াইবার পর তাহারই মুখ ঘুরাইয়া বিপরীত দিকে আর এক ফেরতা জড়াইয়া তড়িৎপ্রবাহ পরিচালনা করিলে লৌহদণ্ডটিতে চৌম্বকশক্তির উন্মেষ ঘটে না। ইহাকে নন ইনডাকটিভ ওয়াইণ্ডিং বলা হয়। জাহাজটিকে এক খণ্ড অখণ্ড লৌহ ধরিয়া চতুর্দ্দিকের নন-ইনডাকটিভ ওয়াইণ্ডিং-এর তারকুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করাইলে ইহার চৌম্বক আবেশ তথা চৌম্বক ক্ষেত্র বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এই উপায়েই হয়তো কোন জটিল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা নৌ-বিভাগের গোপনীয় ব্যাপার বলিয়া এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার উপায় নাই।



"ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে"
শ্রীপরিতোষ সেন

প্রাণযাত্রা

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

বিস্ময়ে অভিভূত কবি ভাবলেন এ অতিথি কোথা থেকে এল? কোন্ অতলস্পর্শ অতীতের গভীরতায় এর বীজীভূত কারণ লুকান ছিল? আজ যা প্রকাশিত তা আজই সৃষ্ট নয়—আজকের সৃষ্টি বিচ্ছিন্নভাবে অসংলগ্নভাবে সত্য নয়, যুগ-যুগান্তরের মধ্যে প্রবহমান ধারায় তার ইতিহাস—সেই ইতিহাসের সঙ্গে যুক্তভাবেই প্রত্যেক প্রাণজগৎ সৃষ্টি করেছে। বীজের ভিতর গোপন থাকে পল্লবিত বৃক্ষ, এক দিন সজল ভূমিতে হয় তার অঙ্কুরোদ্গম, তার পর ক্রমে ক্রমে তার বিচিত্র বিকাশ। প্রথম প্রাণহীন জড় ধরণীতে এসেছিল প্রাণ, সেই অঙ্কুরোদ্গত বীজের মধ্যে আজকের পল্লবিত, বিচিত্র, অসংখ্য, প্রাণধর্ম্মীর বীজীভূত কারণ ছিল। কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে নানা সৃষ্টির ভিতর



দক্ষিণ-আফ্রিকার ফুসফুসবিশিষ্ট কতগুলি মাছ উভচর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। যখন ডাঙায় আসে তখন কান্‌কো বন্ধ করিয়া ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে।

প্রাণধর্ম্মীর যথার্থ অর্থ। যে-শিশু আজ জন্মগ্রহণ করেছে কোন্ সুদূর অতীতের মধ্যে ছিল তার কারণপরম্পরা কত রূপ-রূপান্তরের ভিতর দিয়ে সে তার আজকের মূর্ত্তিতে ক্ষণিকের জন্য সম্ভূত হয়েছে। কবি তাই বলেছেন "Out of the deep, my child, out of the deep—

সেই কালের গভীর থেকে, দূরান্তর থেকে আগত প্রাণযাত্রা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার চেষ্টা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যে প্রাণ কোন্ বিস্মৃত যুগে এই পৃথিবীর ছায়ালোকে তার প্রথম অপরিস্ফুট ক্ষীণ যাত্রা সুরু করেছিল, সেই প্রাণধারা নিজেকে নানা রূপে বিকশিত ক'রে, নানা অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে বিচিত্র ভাবে সম্বদ্ধ হয়ে, অস্ফুট থেকে স্ফুট হয়ে, কত বিভিন্ন ধারা সৃষ্টি ক'রে নূতন নূতন রূপ নিয়ে এই বিচিত্র দিয়ে সংক্ষিপ্ত থেকে বিচিত্র এই প্রাণজগৎ উদ্ভূত হয়েছে সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসকে বলা হয় ক্রমবিকাশ (evolution)। এই ক্রমবিকাশের তথ্য আজ অত্যন্ত সুপ্রচলিত এবং অনেকেই এই মতটি স্বীকার করতে ইতস্তত করেন না, কিন্তু প্রথম যখন মানুষকে পশুর সঙ্গে এক ক'রে একই যাত্রার একটি স্তর হিসাবে বলা হয় তখন অনেক মত-বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল।

বিপক্ষ দল বিদ্রূপ ক'রে বলতেন ক্রমবিকাশবাদ একটি অপূর্ব্ব তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ, যার প্রধান আশ্রয়-স্থল হচ্ছে আকস্মিকতা (accident)। কি ক'রে যে প্রকৃতিক নির্ব্বাচনে আকস্মিক বৈষম্য দ্বারা যা ছিল না সেইটি গড়ে ওঠে, এবং ওঠে কি না সে নিয়ে বহু তর্ক বহু


সরীসৃপ হইতে পাখীর বিবর্ত্তন—আদিম যুগের পাখী

মতভেদ। ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে অধুনাস্বীকৃত যে-সব মত আছে সেগুলি সত্য হোক বা না হোক তার দ্বারা ক্রমবিকাশের সত্যতা-অসত্যতা নির্দ্ধারিত হয় না। কারণ যাই হোক, বিকাশ যে ঘটেছে রূপ থেকে রূপান্তরের মধ্যে প্রাণ যে তার ঊর্দ্ধমুখী প্রবাহকে প্রবাহিত ক'রে নিয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে আজ আর প্রমাণের অন্ত নেই। ভূতত্ত্বের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান প্রাণীজগতের সুদীর্ঘ অতীত ইতিহাসের সন্ধান ক্রমবিকাশের ধারণার সপক্ষে এত আশ্চর্য প্রমাণ উদ্ঘাটিত করেছে যা লামার্ক বা ডারউইনের আশার অতীত ছিল।

যদি প্রাণযাত্রার এই ক্রমবিকাশমান রূপকে স্বীকার করতে হয় তাহ'লে তার প্রথম প্রমাণস্বরূপ অধুনালুপ্ত বা অধুনাজীবিত সকল প্রাণীকে তার পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীর সঙ্গে জন্ম-সম্বন্ধে যুক্ত করা চাই। যেমন স্তন্যপায়ী জীবের পূর্ব্বপুরুষ যদি শীতরক্ত ডিম্বজ সরীসৃপ হয় তাহ'লে সরীসৃপ-যুগের পূর্ব্বে স্তন্যপায়ীর কোনও চিহ্ন থাকতে পারে না। যদি সরীসৃপের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সিংহ ব্যাঘ্র বা কোনও স্তন্যপায়ীর একটি সামান্য চিহ্নও আবিষ্কৃত হয় তাহলে সমস্ত ক্রমবিকাশের ধারণা ধূলিসাৎ হতে বাধ্য। অতএব ক্রমবিকাশবাদের প্রধান আশ্রয় ও প্রধান প্রমাণ এই যুগবিভাগ। জলের প্রবাহে বাহিত ও চালিত মৃত্তিকা বালুকা ও অন্যান্য অসংখ্য বিচিত্র পদার্থে স্তরে স্তরে গ্রথিত এই ধরণী তার স্তরে স্তরে বয়সের রেখাপাত করে চলেছে। তারমধ্যে চক্, লাইম-ষ্টোন, ইত্যাদি সর্ব্বদাই একটি নিয়মে স্তরীভূত থাকে। যেমন চকের নীচে সর্ব্বদাই গল্ট ক্লে, (gault clay), এবং গ্রীন স্যাণ্ড (geen sand) সর্ব্বদাই গল্ট ক্লের নীচে থাকে এবং এই সকল স্তরে যে-সব ফসিল বা দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায় তারাও সর্ব্বদাই একই নিয়মে সজ্জিত। এই সময়ের নিয়মে একভাবে পরম্পরাক্রমে সজ্জিত ধরণীর রেখা দ্বারাই কেমন ক'রে এক যুগের একটি জীব অন্য যুগে অন্য জীবে পরিণত হ'তে পারে তার সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন পদার্থে গ্রথিত ধরণীর অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়, বিশেষ রেডিয়াম জাতীয় পদার্থ যুক্ত মিনারেল তার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কণা বিচ্ছুরিত ক'রে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে পরিণত হয়। এই পরিণতির অবস্থা বিচার ক'রে ও আরও অন্যান্য বহু উপায়ে তত্রস্থ স্তরের কাল-নির্ণয় হয়। সে বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে সেই উপায়ে নির্দ্ধারিত কালবিভাগ দ্বারা যুগবিভাগগুলিই প্রমাণ করেছে অনুন্নত শ্রেণীর দেহ থেকে উন্নত শ্রেণীর দেহে জীবের ক্রমে ক্রমে আবির্ভাব। প্রথম যুগের স্তরে

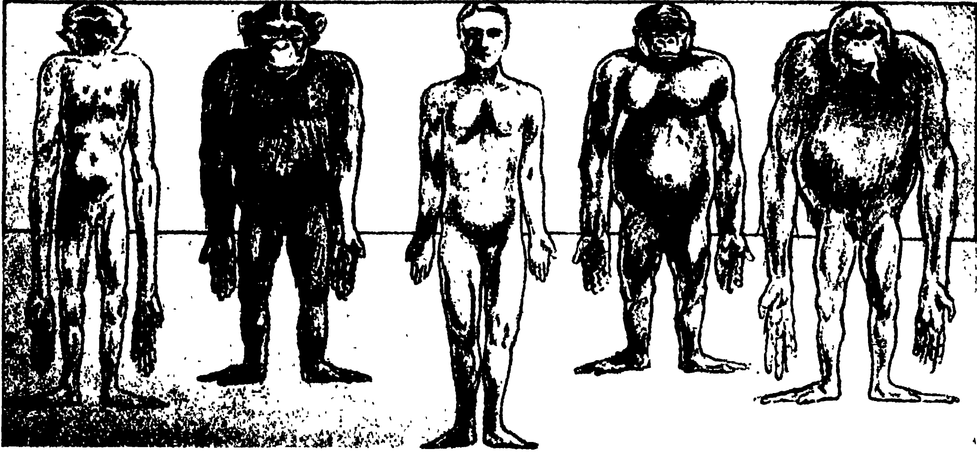
জীবনের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না। যেখান থেকে প্রথম প্রাণের প্রকাশ তার পর বড় পাচটি যুগবিভাগ। এই যুগগুলিকেও আবার ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে প্রাণীদেহাবশিষ্টের আধুনিক থেকে আধুনিকতর গতির প্রতি লক্ষ্য ক'রে।



আদিম যুগের ঘোড়া। বর্ত্তমান যুগের বিভিন্ন জাতীয় ঘোড়া ইহাদেরই বংশধর। বিবর্ত্তনের ফলে এরূপ ঘটিয়াছে।

অবশ্য প্রথম যখন আরকেওসোয়িক (Archeozoic) যুগে ফসিল রূপে জীবনের চিহ্ন পাওয়া যায় তার বহু পূর্ব্বেই জীবন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, কারণ প্রথম দিকের প্রাণীগুলির দেহ ছিল নরম, যা পাথরের ও মাটির চাপে অনায়াসে পিষ্ট হয়ে গেছে। পেলিওসোয়িক (Paleozoic) যুগে প্রাণী ছিল কৃমিজাতীয়। কিন্তু প্রায় ত্রিশ কোটি বৎসর পর্য্যন্ত সেই যুগে কোনও পাখী, স্তন্যপায়ী বা ঐ জাতীয় উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর চিহ্ন পাওয়া যায় না। অবশ্য পেলিওসোয়িক যুগের শেষ ভাগ পারমিওন (Permion)-এ প্রথম অতিকায় সরীসৃপের আবির্ভাব, সরীসৃপের যুগ প্রায় সাড়ে-বার কোটি বৎসর পর্য্যন্ত। অবশেষে স্তন্যপায়ীর যুগ মাত্র পাঁচ কোটি বৎসর হয়েছে।

অবশ্য ধরণীর অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র সমান ভাবে এই স্তরগুলি সজ্জিত হয়ে কালনির্ণয়কে একেবারে নির্ভুল ও সহজসাধ্য করবার সুযোগ প্রকৃতি দেয় নি। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে কোথাও বা শত শত যোজন ভূমি বিদারিত ক'রে নীচে পড়ে গিয়েছে কোথাও বা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। কোথাও বা মৃত্তিকা এত শীঘ্র বালুকায় পরিণত হয়েছে যে তত্রস্থ মৃত্তিকাবাসী প্রাণীরা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হবার সুযোগ পায় নি, ফলে তাদের লোপ ও সেখানে অন্য স্থান থেকে আগত অন্য প্রাণী আবির্ভূত হয়ে স্তরে স্তরে ক্রমবিকাশমান জীবনের ইতিহাস উদ্ঘাটন করা কঠিন করেছে। কোনও কোনও স্থানে উপরিস্থিত ভূমির চাপে ও অন্যান্য নানা কারণে দীর্ঘ দীর্ঘ বিস্তার দগ্ধ হ'য়ে তত্রস্থ সকল প্রাণীর চিহ্নসমূহ লোপ করেছে। এ ছাড়াও মুশকিল এই যে, লক্ষ লক্ষ প্রাণীর ভিতর একটি-দুটিই মাত্র তাদের যুগের সাক্ষী স্বরূপ রক্ষিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করে। তথাপি রজন বা আঠা জাতীয় জিনিষ যেগুলি এম্‌বার হয়ে গিয়েছে তার মধ্যে রক্ষিত কীট, বরফের মধ্যে সুরক্ষিত অস্থিমাংস সহিত প্রাণী, বালুময় মৃত্তিকায় প্রোথিত অস্থিসমূহ, অনেক সাক্ষ্যই দিয়েছে। অনেক স্থলেই যেগুলিকে 'ফসিল' মনে হয় সেগুলি কোনও জীবিত প্রাণীর শরীর বা শরীরের অংশ নয়—সেগুলো তাদের শারীরিক ছাপ-মারা বা ছাঁচে-ঢালা মৃত্তিকাময়, প্রস্তরময় কখনও বা খনিজবস্তুময় প্রতিমূর্ত্তি। ভূগর্ভে স্থিত অস্থি বা দেহগুলি যখন অতি ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়েছে, সেই সময়ে তেমনি ধীরে ধীরে সেই ক্ষতি অন্য পদার্থের দ্বারা পূরিত হয়েছে। এই ভাবে অবশেষে একটি সম্পূর্ণ অন্য পদার্থে গঠিত অথচ সেই দেহটির ছাঁচে ঢালা মূর্ত্তি বা তথাকথিত ফসিল তৈরি হয়েছে। কালিফোর্ণিয়ায় একটি জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বে চটচটে আলকাতরা ছিল, জলান্বেষী বহু সরীসৃপ সেই ফাঁদে ধৃত হয়েছিল—তাদের কঙ্কাল এই দুষ্পাঠ্য ইতিহাসের অনেক মর্ম্ম উদ্ঘাটন



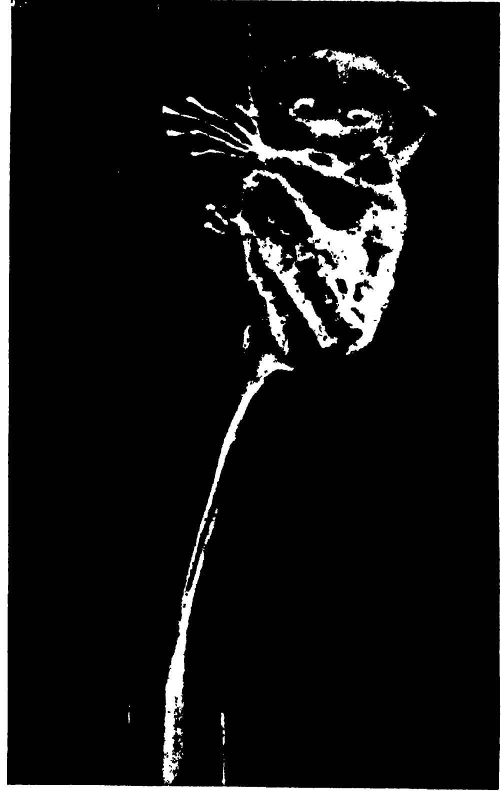
মানুষের মত চার প্রকার পরিণতবয়স্ক বানরজাতীয় জানোয়ারের ছবি। বাম হইতে গিবন শিম্পাঞ্জি, মানুষ, গরিল্লা ও ওরাংওটাঙের ছবি। অনেকাংশে সুস্পষ্ট বৈষম্য থাকিলেও প্রত্যেকের মধ্যেই মানুষের সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্য পরিস্ফুট।

করেছে। কখনও কখনও শুধু পদচিহ্ন বা দেহচিহ্ন বিস্মৃত যুগের জীবনের সাক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু যথেষ্ট ফসিল না পাওয়ায় সব প্রাণীর এক জীবন থেকে অন্য জীবনে পরিণতির প্রত্যেক স্তরগুলি সাজান যায় নি। এক জীবন থেকে অন্য স্পষ্ট-পরিবর্ত্তিত জীবনের মধ্যে স্বল্প-পরিবর্ত্তিত অনেক ধাপ আছে। সেই ধাপগুলি যেখানে সাজান যায় নি সেই মাঝের ফাঁকগুলিকেই বলা হয় মিসিং লিঙ্ক (missing link) অর্থাৎ ছিন্ন শৃঙ্খল। কিন্তু এমন কখনও ঘটে নি যে পরবর্ত্তী জীবনের চিহ্ন তার পূর্ব্ববর্ত্তীর সঙ্গে এক সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে যেমন এক-আঙুল-যুক্ত ঘোড়া কখনও চার-আঙুল-যুক্ত ঘোড়ার পূর্ব্বে ছিল না। অশ্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি সুসম্পূর্ণ ও সংলগ্নভাবে পাওয়া যায়—মিসিং লিঙ্ক নেই বললেই চলে।

সি আরচিন্ (sea urchin) প্রভৃতি আরও বহু জীবের ইতিহাস ও এমনি প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সাক্ষী রেখে একটি ক্রমবিকাশমান ধারাকে প্রকাশ করেছে। অশ্বের ইতিহাসটি অত্যন্ত বিস্তৃত। আজকের দিনের এক-আঙুল-যুক্ত অশ্ব একটি মাঝারি কুকুরের আকারের, চার-আঙুল-যুক্ত ইওসিন (Eocene) যুগের প্রথম দিকের জীব থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই জীবটির ঘোড়া-জীবনের পরিণতি অভিমুখে যাত্রার প্রত্যেকটি ধাপেরই দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায়। ঘোড়ার বিশেষত্ব তার দাঁতে ও তার এক-আঙুল-যুক্ত দীর্ঘ চারটি পায়ে। গর্দ্দভ ও জেব্রাও অবশ্য অশ্বশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অশ্বের প্রধান শক্তি তার দ্রুত-গমনশীলতায় ও রুক্ষ ঘাস পাতা অনায়াসে চর্ব্বণ করায়; তার আঙুলটি (toe) অন্যান্য পাঁচ আঙুল যুক্ত প্রাণীর মধ্য আঙুলের স্থানে আছে ও তার খুরটি নখেরই একটি অবস্থাবিশেষ। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের মধ্যে দুটি ছোট ছোট হাড় তার অধুনালুপ্ত দুটি আঙুলের স্থানে আজও লুকান আছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নখরও যুক্ত হয়। তার পায়ের জানু থেকে লম্বমান একটি মাত্র হাড়। সেই জন্য তার চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছন্দে দেহ ঘোরানর খুব সুবিধে নেই কিন্তু একটি কঠিন লম্বমান হাড়ের সঙ্গে যুক্ত একটি সুদৃঢ় নখরের উপর ন্যস্ত স্থূল দৃঢ় আঙুলের উপর ভর দিয়ে ঘোড়া অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা কঠিন সমতল ভূমিতে দ্রুতচলনশীল। সাধারণত সকল প্রাণীই দ্রুতধাবনের সময় পদতলের সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ আঙুলের উপর ভর দিয়ে দৌড়ে থাকে। কিন্তু কর্দ্দমাক্ত স্থানে ঘোড়ার সমূহ বিপদ, কারণ ভূমিতে প্রসারিত পদতলে ফাঁকযুক্ত আঙুলগুলির সুবিধে তার নেই। ঘোড়ার দাঁতেরও নানা বিশেষত্ব। আট বছর

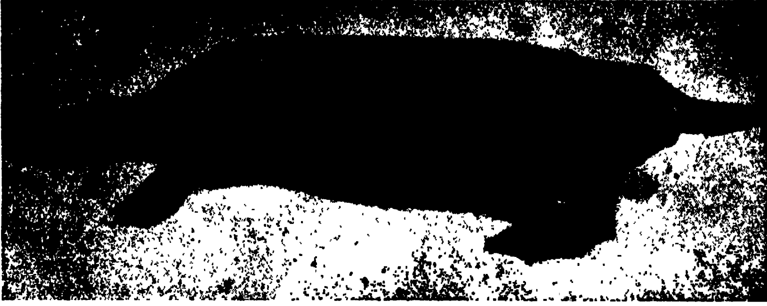
বয়স পর্য্যন্ত তাদের মূল থাকে না অর্থাৎ যেমন ব্যবহারে ক্ষয়ে যায় তেমন নখের মত বাড়তে থাকে। তার দাঁত-গুলি কঠিন এনামেলে আবৃত থাকে ও দন্তোদ্গম হবার পর তাদের গহ্বর এক প্রকার সিমেন্টে ভরে যায়। ব্যবহারে দাঁত, তার এনামেল ও তত্রস্থ সিমেণ্ট, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষয়ে উঁচু নীচু কর্কশ হয়ে যায় ওরুক্ষ ঘাস-পাতা চর্ব্বণের উপযুক্ত হয়। ঐ জিনিষগুলির ক্ষয়ের অবস্থা দেখে ঘোড়ার বয়স নির্ণয় করা যায়। সেনোসোয়িক (Cenozoic) যুগের প্রথম ভাগ Eocene যুগে প্রায় সকল স্তন্যপায়ী জীবই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি পাঁচ আঙুল যুক্ত ও এম অক্ষরের মত খাঁজওয়ালা কষের দাঁত যুক্ত ছিল। তাদের সঙ্গে আধুনিক কালের কোনও প্রাণীর সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এই যুগেই ঘোড়ার পূর্ব্বপুরুষকে পাওয়া গিয়েছিল যদিও তখন তাকে চেনা যায় নি। পরে ক্রমে ক্রমে সকল মিসিং-লিঙ্ক আবিষ্কার হ'তে হ'তে সূত্রটি তার কাছে উপস্থিত হয়েছে সেই জীবটির নাম হাইরাকোথিরিয়াম (Hyracotherium)। সর্ব্ব প্রথম ভাগের ঘোড়ার পূর্ব্ব-পুরুষের আকৃতি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মাঝারি চেহারার কুকুরের মতন—সামনের পায়ে চারটি আঙুল, চারটি খুর ও পিছনের পায়ে তিনটি ক'রে আঙুল ও খুর এদের মধ্যে কারু কারু বা পিছনের পায়েও দুটি ক'রে সংক্ষিপ্ত অস্থি-খণ্ড দেখা গিয়েছে, তখন লুপ্তপ্রায় প্রথম ও পঞ্চম আঙুলের চিহ্ন স্বরূপ। এদের দাঁতও ঘোড়ার দাঁতের মত নয়। অশ্বের ইতিবৃত্ত বা বংশ-পরিচয়ের প্রমাণ স্বরূপ Eocene যুগ থেকে ক্রমাবিবর্ত্তিত ২৬০ শ্রেণীর অশ্ব ও অশ্বপূর্ব্বজীবের দেহাবশিষ্ট বা 'ফসিল' পাওয়া গিয়েছে। এই ইতিহাসে যদিও প্রধানত একটি ধারাকে আধুনিক অশ্বের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় তবুও একই পূর্ব্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন শাখা বেরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করবার চেষ্টার পথে যে বিনষ্ট হয়েছে তারও চিহ্ন পাওয়া যায়।

মেসোসোয়িক যুগের মধ্যভাগে অর্থাৎ সরীসৃপ যুগের শেষের দিকে প্রথম পক্ষবিশিষ্ট প্রাণী পাওয়া যায়। ঐ প্রাণীটি সরীসৃপ ও পাখীর মাঝামাঝি অবস্থা। বেভেরিয়ার একটি স্থানে এই আদিম গরুড়ের অতি সুরক্ষিত



লেমুর, বানর-জাতীয় প্রাণী। লেমুরের সঙ্গে মানুষের কতগুলি বিষয়ে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন লেমুর-জাতীয় প্রাণী হইতেই মানুষের ধারা বিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দেহ পাওয়া গিয়েছে। সরীসৃপ ও পাখীর প্রধান পার্থক্য সরীসৃপের সম্মুখের পদযুগল পাখীর ডানায় পরিবর্ত্তিত হয়ে এবং তাদের থাবা দুটি ডানার মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু ঐ সরীসৃপ-পক্ষীর (Archaeopteryx) সামনের পা-দুটিতে সংলগ্ন থাবা দুটি লুপ্ত হয় নি। তার গিরগিটির মত দীর্ঘ লাঙ্গুল এবং দন্তহীন চঞ্চুর বদলে লম্বমান চোয়ালে দু-সারি দাঁত। তার পর ক্রেটেসাস (Crataceous) যুগে অর্থাৎ মেসোসোয়িক-এর শেষ ভাগে আরও অনেক পক্ষীদেহাবশিষ্ট পাওয়া যায় যারা ডানা ও পুচ্ছে সম্পূর্ণ পক্ষীত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, অথচ তাদের চোয়াল-বিশিষ্ট চঞ্চুপুটের মধ্যে তখনও দাঁত বিদ্যমান। তার পর ইয়োসিন যুগের মধ্যভাগে এই শ্রেণীর পক্ষী অন্তর্হিত হয়েছে।



প্ল্যাটিপাস বা হংসচঞ্চু। ইহারা ডিম পাড়ে অথচ স্তন্যপায়ী। মুখের অগ্রভাগ হাঁসের ঠোঁটের মত স্তন্যপায়ী জীব হইলেও পাখীর সহিত কতটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

জীবনে, তাও স্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নি। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ওদের লুপ্ত হয়ে যাবার কথা, কোনও কারণে প্রকৃতি বিস্মৃত হয়ে থাকবে।

এই রকম অর্দ্ধ-মানুষ বা মানুষ-বানরের বহু দেহাবশিষ্ট কেমন ভাবে পরম্পরাক্রমে মানুষকে তার পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে যোগসূত্রের সন্ধান দিয়েছে, সে ইতিহাস সুদীর্ঘ।

উষ্ণরক্ত স্তন্যপায়ী জীবরাও ঐ শীতরক্ত ডিম্বজ সরীসৃপেরই বংশধর। সরীসৃপের স্তন্যপায়ী জীবে রূপান্তরিত হবার মুখে একটি প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে এর রক্ত শীত ছিল কি উষ্ণ ছিল তা জানা নেই—কিন্তু দাঁতের গঠন ও মাথার গঠন স্তন্যপায়ীর মতন। বিশেষ এর চোয়াল সরীসৃপের মত অনেকগুলি অস্থি সমষ্টির দ্বারা নির্ম্মিত, স্তন্যপায়ীর মত এক অস্থিবিশিষ্ট নয়।

স্তন্যপায়ী জীবের কানের মধ্যভাগে (middle ear) তিনটি অস্থি, অন্যান্য স্থলচর মেরুদণ্ডধারীর একটি মাত্র। সরীসৃপরে চোয়ালের অস্থিগুলিই যে ক্রমে সরে সরে এসে চর্ব্বণ কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে শ্রবণ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছে ঐ প্রাণী সে কথা প্রমাণ করে।

এ ছাড়া সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় অতীত যুগের জীবনের জীবন্ত অবশিষ্ট স্বরূপ হংসমুখ প্ল্যাটিপাস (platypus) নামক জীবটি পাওয়া গিয়েছে। ঐ জীবটি সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীতে রূপান্তরিত হবার পথে আছে। দন্তবিহীন অণ্ডজ হংস-মুখের দেহ লোমাবৃত, রক্ত ঈষৎ উষ্ণ, সন্তরণক্ষম আঙুল-গুলি জোড়া—যখন তাদের সদ্যোজাত সন্তানরা মাতার বক্ষতল ঘর্ষণ করে তখন ত্বক বিদীর্ণ হয়ে মাতৃদেহ থেকে এক প্রকার রস বা দুগ্ধ নিঃসৃত হয়ে ঐ শিশুদের পুষ্ট করে। কিন্তু পরে কোথা থেকে ঐ দুগ্ধ নিষ্ক্রান্ত হয়েছে তা বোঝা যায় না। অর্থাৎ তারা ডিমও পাড়ে, দুধও দেয়—সরীসৃপ থেকে সদ্য রূপান্তরিত হবার পথে ছিল ঐ হংসমুখ, প্রকৃতি ওদের কোন্ পথে নেবে—পক্ষী-জীবনে, কি স্তন্যপায়ীর

সমস্ত প্রাণীর অবয়ব-গঠনের মধ্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও অনেক ঐক্য আছে। তার মধ্যে কতকগুলো প্রাণীর ঐক্য আবার নিবিড়। এই সব ঐক্য ও পার্থক্য অনুসারেই তাদের নানা প্রকার ভাগ,—কেউ বা মেরুদণ্ডহীন, কেউ বা মেরুদণ্ডধারী, কেউ বা সরীসৃপ, কেউ বা স্তন্যপায়ী, কেউ বা খগ, আবার কেউ বা জলচর। কিন্তু কোনও ভাগকেই অন্য ভাগ থেকে নির্ম্মম ভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সর্ব্বদাই একটি অন্যটিতে লীন হয়। একটি প্রাণ তার সকল অবয়ব নিয়ে ক্রমে অন্য আকৃতি ধারণ করেছে। তার দুই প্রান্তর দিকে লক্ষ্য করলে প্রভেদ দুর্লঙ্ঘ্য কিন্তু তাদের মাঝখানের মিলন-সেতুগুলি বহন ক'রে নিয়ে চলেছে নিগূঢ় ঐক্য। পাখীর ডানায় ও স্তন্যপায়ীর সম্মুখের দুটি হাতে যে মিল আছে তা আবিষ্কার করা কঠিন নয়। সকল কীটেরই মুখের দিকে অর্থাৎ দাঁড় হুল বা শুঁড় এর সংস্থান প্রায় একই রকম। বসন্ত কালে বিভিন্ন বৃক্ষে প্রস্ফুটিত বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে আপাত-দৃষ্টিতে কতই না পার্থক্য, অথচ তাদের অবয়বে অংশে অংশে মিল। এই সকল বাহ্যিক আকৃতি বা অবয়ব সংস্থানের মিল ছাড়াও ধমনীতে প্রবহমান রক্তধারায়ও আছে কত নিগূঢ় ঐক্য। শীল ও সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি জলবাসী প্রাণীদের সঙ্গে বিড়াল প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীর সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে যাঁরা মনে করেছিলেন ঐ প্রাণীরা পূর্ব্বে স্থলচর মাংসাশী প্রাণীদের জ্ঞাতি ছিল, রক্তপরীক্ষা তাঁদের সমর্থন করেছে। এই ভাবে পাওয়া যায় ঘোড়ার সঙ্গে

গন্ধভের রক্তের মিল, আর মানুষের সঙ্গে তার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীদের, অর্থাৎ প্রথম লাঙ্গুলহীন ওরাং ওটাং প্রভৃতি বানর, তার পর লাঙ্গুলযুক্ত বানর ও তার পর লেমুরের সঙ্গে পরম্পরাক্রমে তার রক্তের ঘনিষ্ঠতা অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের অপেক্ষা বেশী।

সকল প্রাণীর শরীরেই এমন অনেক অঙ্গ আছে যা তার এখন কোনও কাজে আসে না অথচ তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর বা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীর শরীরে এখনও ঐ অঙ্গসমূহের ব্যবহার হয়। এ থেকে মনে হয় ঐ অঙ্গগুলি এক দিন তার কাজে আসত কিন্তু ক্রমে ক্রমে অপ্রয়োজনে ও অব্যবহারে নষ্ট ও নষ্টপ্রায় হয়ে গিয়েছে। সেই অবশিষ্টাঙ্গ গুলিকেই বলা হয় "পদচিহ্ন" (vestiges)। তিমি মাছের পিছনের দুটি পায়ের কোনও চিহ্নই বাইরে থেকে বোঝা যায় না অথচ তার দেহাভ্যন্তরে পিছনের পায়ের স্থানে অপূর্ণ দুটি অস্থি তার পূর্ব্বজীবনের স্মরণ চিহ্ন, যে জীবনে চতুষ্পদ বিশিষ্ট রূপে, সে ছিল স্থলচর। ঘোড়ার পায়ে আজও তার দুটি আঙ্গুলের চিহ্নস্বরূপ দুটি ছোট ছোট অস্থি লুকানো আছে। হংসমুখ platypus-এর দন্তবিহীন চঞ্চুর মধ্যে লুকান থাকে সুসম্পূর্ণ দু-পাটি দন্ত, যার কখনই উদ্গম হয় না। সরীসৃপ-বংশোদ্ভূত পক্ষীদের কেবল বাম ডিম্বকোষ ও ডিম্বনালীটি ব্যবহার হয়, কিন্তু তার দক্ষিণ দিকের যন্ত্র দুটি আজও বিদ্যমান, যদিও অব্যবহার্য্য এবং সংক্ষিপ্ত। মানুষের দেহটিও এই রকম অসংখ্য অবশিষ্টাঙ্গে পূর্ণ। তার দেহের লোমরাজি এখন আর ব্যবহারে আসে না, এক দিন এর আবরণ তার প্রধান আচ্ছাদন ছিল, তখন শীতকালে ঐ লোমরাজিকে ফুলিয়ে তার ফাঁকে ফাঁকে পর্য্যাপ্ত বাতাস আহরণ ক'রে সে দেহকে উত্তপ্ত রাখত—আজও তার লোমের গোড়ায় গোড়ায় তাদের খাড়া করবার ব্যবস্থা রয়েছে, আজও ঠাণ্ডায় তার রোমাঞ্চ হয়, কিন্তু তাতে তার লাভ নেই, তাকে শাল নিতে হয়, ওভারকোট চাপাতে হয়। মানুষেরও কর্ণ সঞ্চালনের জন্য অব্যবহার্য্য পেশীসমূহ বর্ত্তমান। ওরাং ওটাং প্রভৃতিরও ঐ পেশীগুলি অব্যবহার্য্য। বানররা কর্ণসঞ্চালনে সক্ষম কিন্তু স্বচ্ছন্দে নয়। বানরের পায়ের মত মানুষের সদ্যজাত শিশুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি অন্য আঙ্গুল থেকে অনেকটা দূরে থাকে। ক্রমে সে দূরত্ব কমে আসে। আক্কেল-দাঁতও ঐ রকম অব্যবহার্য্য হওয়ায় লুপ্ত হবার চেষ্টা করছে, কোনও কোনও মানুষের মধ্যে হংসমুখের দাঁতের মত তাদের উদ্গমই হয় না। সদ্যোজাত শিশুর দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি এত শক্তি রাখে যে সে তার সমস্ত দেহভারটি ঝুলিয়ে রাখতে সক্ষম। অভ্যাস করলে তার হাতের জোর ফিরে আসে। এক দিন ছিল যখন ঐ রকম ভাবে মাতৃদেহে বিলগ্ন হয়ে থাকবার ক্ষমতা-অক্ষমতার উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করত। এ ছাড়া আরও বহু স্মৃতিচিহ্ন মানুষের দেহে আছে।

ক্রমবিকাশের আর একটি প্রধান প্রমাণ মানুষের জন্মের পূর্ব্বাবস্থা। সে-সমস্ত জীবন-পরম্পরার মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে প্রাণ তার আধুনিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। মাতৃগর্ভে অত্যন্ত দ্রুতভাবে সে তার সেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে। যতই গোড়ার দিকে যাওয়া যায় ততই মানুষ, বানর, পাখী, সরীসৃপ, মাছ, সকলের আকৃতি একই রকম থাকে এবং পরে তারা কে কি আকার ধারণ করবে তা অনুমান করা দুঃসাধ্য হয়। যতই তারা বাড়তে থাকে ততই ক্রমে ক্রমে তাদের পার্থক্যগুলি ফুটে উঠতে থাকে। শুধু যে প্রথম দিকে ঐ সব প্রাণীর আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য হয় তা নয় তারা একই রকম ভাবে পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে। সকলেরই হার্ট ও প্রধান প্রধান শিরা (arteries) এবং গলার কাছটি মাছের মত গঠনপ্রাপ্ত হয়। মানুষের হার্টও দক্ষিণে ও বামে বিভক্ত না হয়ে একটি অবিভক্ত রক্তনিষ্কাশন-যন্ত্ররূপে প্রকাশ পায়। মাছের ন্যায় গলার কাছে সারি সারি চেরার মত হয়, মাছ যেখান দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করে অর্থাৎ যাকে মাছের ফুল্কা (gill slit) বলে সেই রকম দেখায়। অবশ্য সে সেখান দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করে না। কিন্তু মানুষের ভ্রূণ তাই বলে টিকটিকিও নয় মাছও নয়, এগুলো শুধু তার দ্রুতপরিবর্ত্তনশীল অবস্থার এক-একটি ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব। কিন্তু উভচর ব্যাঙ-জাতীয় প্রাণীরা ব্যাঙাচি অবস্থায় ঐ gill slit দিয়ে নিশ্বাসও গ্রহণ করে।

আজ যারা স্থলচর এক দিন তারা জলচর ছিল। গর্ভস্থ অসম্পূর্ণ শিশু সেই পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়।

সকল প্রাণীর মধ্যেই কিছু না কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটে, বিশেষত বহুকোষধারী জীবের মধ্যে ঐ ঝোঁক সুস্পষ্ট। যে প্রাণধারা সুদূর বিস্মৃত যুগ থেকে কত আবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে আজও তাদের প্রত্যেকটি জীবকে সেই সুদীর্ঘ যাত্রাটি অতি দ্রুতগতিতে পার হ'তে হয়।

কালের গর্ভ থেকে উৎসারিত জন্মে জন্মে সংলগ্ন প্রাণযাত্রাকে একটি প্রবহমান বিকাশমান সত্যরূপে এত সুস্পষ্ট ভাবে মানুষ বেশী দিন জানবার সুযোগ পায় নি। কিন্তু নানা দেশে নানা ভাবে বহুকাল থেকেই মানুষ লক্ষ্য করেছে আপাতদৃষ্টিতে পৃথক জীবনের অন্তর্নিহিত ঐক্য। পৌরাণিক গল্পে বলে সাপ আর পাখী, বাসুকি আর গরুড়, জন্মেছিল এক বংশে, কশ্যপের দুই স্ত্রীর সন্তান তারা—এটা যদিও নিছক একটি গল্পের উদ্ভট কল্পনা কিন্তু এ কল্পনার কারণ কি তাদের প্রধান ঐক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নয় যে তারা উভয়েই অণ্ডজ ?

ডারউইনের পূর্ব্বে লামার্ক লক্ষ্য করেছিলেন যে ক্রমে প্রাণীদের আকারে পরিবর্ত্তন ঘটছে। তিনি মনে করেছিলেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাড়নাই তার কারণ। লম্বগ্রীব জিরাফ প্রয়োজনের তাড়নায় ধীরে ধীরে করেছে তার গ্রীবা প্রসারিত। এ-কথা আমরা সকলেই জানি ব্যবহারের ইতরবিশেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটে। সব্যপাণির চেয়ে দক্ষিণপাণি কিছু পৃথক—তন্বীর সুকোমল করপল্লবের সঙ্গে কৃষকের লাঙ্গল-চষা হাতের কিছু পার্থক্য, গায়কের বক্ষ কিছু স্ফীত, ব্যায়ামবীরের পেশীসমূহ অনেক দৃঢ় ও পুষ্ট কিন্তু এগুলি সবই এ-জন্মে উপার্জ্জিত বিশেষত্ব যাকে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন acquired characteristics। অতএব এই বিশেষত্বগুলি সন্তানে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব কি না তা নিয়ে বহু তর্ক। লামার্কের মতের মধ্যে ঐ কথাটি ধরে নেওয়া হয়েছে। ডারউইনও আপত্তি করেন নি। তিনি যদিও বলেছেন আকস্মিক ভাবেই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে তার মধ্যে সুবিধাজনক পরিবর্ত্তনগুলি জীবনসংগ্রামে সাহায্যকারী হয়ে ক্রমে ক্রমে ঘটায় বিবর্ত্তন।

আমরা সকলেই জানি কোনও মানুষই তার পিতামাতার ছায়ানুরূপ নয় কিন্তু তাই ব'লে ঐ সকল বৈষম্যগুলি অবলম্বন করে প্রকৃতির দ্বারা নির্ব্বাচিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা চালিত হয়ে এক জীব অন্য জীবে পরিবর্ত্তিত হয়ে, এই বৈচিত্র্যময় প্রাণজগৎ সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা সকলে একবাক্যে মেনে নিতে রাজী হন না। কিন্তু এই সব ব্যাখ্যা সত্য হোক বা না হোক কি কারণে এক প্রাণী তার কলেবর পরিবর্ত্তন ক'রে অসম্পূর্ণ জীবন থেকে সম্পূর্ণতর জীবনের মধ্যে যাত্রা করে চলেছে তা ঠিক করে বলা সম্ভব হোক বা না হোক তার দ্বারা ক্রমবিকাশমান প্রাণযাত্রার সত্যতা ব্যাহত হয় না। মানুষ যদি কোনও দিন তার কারণ না খুঁজে পায় তবুও অস্বীকার করা চলে না যে প্রাণধারা এসেছে অতি দূরান্তর থেকে, অস্ফুট বিকচোন্মুখ রূপ থেকে পরিস্ফুট রূপান্তরে ক্রমাগত নিজেকে ব্যক্ত করে এবং সে চলেছে আজও, কোন্ অদৃষ্ট সুদূর ভবিষ্যতে কোন্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবার তার লক্ষ্য তা কে জানে ?

"ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবনমেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি
বক্ষ তোর ওঠে রণরণি
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা
মনে আজি পড়ে সেই কথা
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।"

হনলুলু

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

নিউজীল্যাণ্ড থেকে হাওয়াই দ্বীপ পর্য্যন্ত যতগুলি দ্বীপ আছে তার সবগুলিতেই প্রাকৃতিক সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে আছে। হাল্কা গাঢ় নানা রকম সবুজ রঙের ছোপ, 'হিবিসকাস' ফুলের অপর্য্যাপ্ত ফসল, সুন্দর পাহাড় সমুদ্র থেকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকলের চেয়ে মনোরম এদের মধ্যে। এক দল লোক ভারতবর্ষের দিক থেকেই পালের নৌকাতে ভেসে ভেসে এই সব দ্বীপ আবিষ্কার ক'রে বসবাস সুরু করেছিল, এই রকম কথিত আছে। টাহিটি ও ঈষ্ট ইণ্ডিজ থেকে যে দল ছড়িয়ে পড়ে সামোয়া ও হাওয়াইয়ের দিকে, তারা পলিনেসিয়ান নামে পরিচিত। যে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জল কেটে আমাদের এই সাদা জাহাজখানা তার অতি-আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে ভেসে চলেছে, এক দিন অনেক বছর আগে আমাদেরই মত কতকগুলি লোক তাদের সাবেক কালের ভেলায় ভেসে ভেসে এই দিকে যায়, আকাশের দিকে তাকিয়ে তারার পথ দেখতে দেখতে ভেসে চলে। মনে হচ্ছিল পলিনেসিয়ানদের কথা। কেমন ক'রে তারা জানতে পারলে এই অকূলে ভেসে কোনও দিন ডাঙার সন্ধান মিলবে কি না। দিক্‌চক্রবালের দিকে বিশেষ আকৃতির মেঘের রেখা দেখে তারা বুঝতে পারলে ঐ দিকেই ডাঙা মিলবে, আর তীর থেকে যে-সব পাখী আসে সমুদ্রের দিকে—তারা আসে হাওয়ার উল্টো দিকে আর সেই হাওয়াতেই গা ভাসিয়ে ডাঙায় ফিরে যায়—সেই রকম হাওয়ার স্রোতে ফিরতিমুখী পাখী দেখে বুঝতে পারে ঐ দিকেই ডাঙা মিলবে। সেকালে আর একালে অনেক তফাৎ।

সামোয়া ছেড়ে হনলুলুর দিকে জাহাজ ছুটল। এখান থেকে একটানা পাঁচ দিনের পথ। এই সময়টাতে তৈরি হয়ে নিতে হবে হাওয়াই য়ুনিভার্সিটিতে প্রদর্শনী ও ও ভারতবর্ষের শিল্পকলা সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য।



"আলোহা" স্তম্ভ



হাওয়াইর নৃপতিশ্রেষ্ঠ কামেহামেহার মূর্ত্তি

হনলুলু বন্দরে প্রবেশ করবার আগে জাহাজ এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, এইখানে স্বাস্থ্যপরীক্ষার পালা। নৌকা ক'রে হাওয়াইয়ানরা জাহাজের কাছে এসে সাঁতার কাটতে লাগল এবং যাত্রীদের অনুরোধ করতে লাগল একটা 'সেণ্ট' ছুঁড়ে ফেলবার জন্য। অনেকেই ছুঁড়ে ফেলতে লাগল আর এরা নিপুণতার সঙ্গে ডুবে ডুবে সেগুলো হাতে ক'রে বা মুখে ক'রে তুলে তাদের কৌশল দেখাতে লাগল।

দূর থেকে আলোহা (Aloha) টাওয়ার দৃষ্টিগোচর হ'ল। Aloha শব্দ হাওয়াইয়ান, অভিবাদন বা বিদায় সম্ভাষণ এর অর্থ। ছাড়পত্র পরীক্ষা ও তীরে নামবার অনুমতিপত্রের অপেক্ষায় সার দিয়ে দাঁড়ালাম।

অধ্যাপক সিনক্লেয়ার (হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিট্যুট বা প্রাচ্যতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ) ও যাঁর ওখানে অতিথি হয়ে থাকব, দু-জনেই এসে দেখা করলেন। কাষ্টম্‌সের হাত থেকে ছাড়া পেলাম প্রায় চার ঘণ্টা পর।

দু-দিন পরে আমার প্রদর্শনী ও বক্তৃতার দিন ধার্য্য হয়েছে। প্রদর্শনী হবে য়ুনিভার্সিটির লাইব্রেরি-ঘরে।

হনলুলু একটি অতি-আধুনিক শহর। আমার ধারণা ছিল হনলুলু যাকে "প্যারাডাইস অব প্যাসিফিক" বা প্রশান্ত মহাসাগরের স্বর্গভূমি বলা হয়—হাওয়াইয়ান সঙ্গীত, নারকেল গাছ, সমুদ্রের তীর আর বসন্তের হাওয়া এই সবই সেখানকার প্রধান সম্পদ। কিন্তু আমেরিকানদের আধিপত্যে হনলুলুর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কল চালিয়ে তাকে অতি-আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। সেখানকার সিনেমা-হাউস, রাস্তাঘাট, ট্রাম-বাস, নাইট-ক্লাব ইত্যাদিতে সভ্য জগতের ছাপ পুরোপুরি। যদিও রাস্তাঘাটে শান্তিপ্রিয় অলসগামী হাওয়াইয়ান পথিক এখনও দেখতে পাওয়া যায় এবং শহরের বাইরে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নানারকম সবুজ রঙের গাছপালা, সুগন্ধি ফুলপাতা, ঘোর ঘন নীল সমুদ্রের জল ও অপূর্ব্ব রঙের প্রবাল মনকে মুগ্ধ করে। কিন্তু শহর যাকে বলা হয় সেটি অতি-আধুনিক। আমেরিকানদের ছুটির সময় বিশ্রাম করবার জায়গা বটে। অনেক ধনী আমেরিকান এখানে বাড়ী তৈরি ক'রে রেখেছেন, অনেক আমেরিকান এখানকার স্থায়ী অধিবাসী। চীনা ও জাপানী স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যাও খুব বেশী। অষ্ট্রেলিয়াতে বা জাহাজে আমার তো অনেক সময়ই মনে হ'ত আমার গায়ের রং অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ভয় ছিল হনলুলু বা কি রকম ভাবে আমায় গ্রহণ করবে। কিন্তু হনলুলুর রাস্তাঘাটে চীনা, জাপানী, হাওয়াইয়ান ও আমেরিকান এ-সব জাতের অপূর্ব্ব মিলন লক্ষ্য করবার বিষয়। ভারতীয়

অধিবাসী এখানে মাত্র দু-জন আছেন। হাওয়াইয়ানরা সঙ্গীতপ্রিয় জাত, একটু অলস ও স্থূলকায়, গায়ের রং ময়লা। চীনা ও জাপানী হাওয়াইয়ানদের সঙ্গে মিশে গিয়ে চীনে ও জাপানী হাওয়াইয়ান জাতির সৃষ্টি হয়েছে—আরও একটা জাত আছে আমেরিকান হাওয়াইয়ান। আমেরিকান হাওয়াইয়ান মেয়েদের সুন্দরী বলা যেতে পারে। খাঁটি হাওয়াইয়ান খুব অল্পসংখ্যকই চোখে পড়েছিল। হাওয়াইয়ান পুরুষদের ভিতর প্রায়ই সুগঠিতাবয়ব লোক নজরে পড়ে, যাদের চেহারাতে খানিকটা ভারতবর্ষ ও খানিকটা জাভা ও বালি দেশের আভাস লক্ষ্য করবার বিষয়। হাওয়াইয়ান মেয়েরা কেউ কেউ আসামী পাহাড়ী মেয়েদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "ওয়াইকিকি" সমুদ্রবেলা এখানকার সন্ধ্যাবেলা বেড়াবার বা দিনের বেলা স্নান করবার জায়গা। সেখানে নানা রকম পরিচ্ছদে সজ্জিত আমেরিকান যুবক-যুবতীর সমাবেশ। আমেরিকানরা একটা নূতন কিছু করবার জন্য বরাবরই উদ্গ্রীব। হাওয়াই দ্বীপে এরা খুব রকমারি পোষাকে ঘুরে বেড়ায়। এখানকার সেরা হোটেল রয়েল হাওয়াইয়ান হোটেলে এক দিন ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। খুব কম লোকই ডিনারের পোষাকে এসেছিল দেখলাম। আমি কালো আচকান ও চুড়িদার পাজামা পরে গিয়েছিলাম। সবাই দেখি খুব তাকিয়ে দেখছিল হয়ত বা প্রশংসার চোখে, নয়ত ভাবছিল—এ আবার কি অদ্ভুত সাজ! ভারতবর্ষের মেয়েদের পোষাক এরা সবাই জানে এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে থাকে। ভারতবর্ষের পুরুষদের পোষাক এদের জানা নেই।

অতিথিদের ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। ফুল যেমন এখানে প্রচুর তেমনি ফুলকে আদর ক'রতেও এরা বেশ জানে। নানা রকম রঙের ফুল ও তার সুবাস উৎসব-অঙ্গনকে মধুর ক'রে রাখে। ফুলের মালাকে হাওয়াইয়ান ভাষায় "লেই" বলা হয়।

আমাদের টেবিলে এক জন বিখ্যাত কুস্তিগীর ছিলেন। এঁর নাম জিম লণ্ডোস। নিউইয়র্কে ইনি বসবাস ক'রছেন। এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল, কুস্তি দেখবার জন্য আমায় নিমন্ত্রণ ক'রলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁর খুব কৌতূহল। ভারতবর্ষের কুস্তিগীর গোবর ও গামার বিষয় অনেক প্রশ্ন করলেন। গোবর সম্বন্ধে ইনি উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রে থাকেন। বারবার বলছিলেন, গোবর বেশ শিক্ষিত কুস্তিগীর।



হাওয়াইর রমণী

সেদিন ছিল ওখানকার সেরা "হুলা"-নর্ত্তকীর নাচ। হাওয়াই দ্বীপের নাচের নাম শুনেছি। দূর থেকে অনেক কিছুই শুনতে পাওয়া যায়, কাছে এলে কল্পনার সে



আধুনিক হাওয়াইর তরুণী

ছবির সঙ্গে বাস্তবের অমিল হ'লে মনটা খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না।

হাওয়াইয়ান সঙ্গীত বেশ ভাল লাগল। হাওয়াইয়ান ভাষায় স্বরবর্ণের বাহুল্য—ব্যঞ্জনবর্ণ কম প্রয়োগ করা হয়। আর প্রায়ই একটি শব্দ দু-বার ক'রে উচ্চারণ করা হ'য়ে থাকে। স্বরবর্ণের প্রাদুর্ভাববশতঃ সঙ্গীত যেন ভেসে ভেসে চলে। বড় করুণ ও নরম সুর—সঙ্গে হাওয়াইয়ান "গীটার" ওকে আরও করুণ ক'রে তোলে। অনেক রাত পর্য্যন্ত হুলা নাচ ও গান উপভোগ করা গেল।

বাইরে এসে সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানো গেল। "টর্চ ফিসিং" (torch fishing) এখানকার একটি দেখবার জিনিস। রাত্রে সমুদ্রের জলে টর্চের মত আলো জ্বালিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে, তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়ে মাছকে গেঁথে ফেলে।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলতে হবে। এপিডায়স্কোপের সঙ্গে ছবি ও কথার সাহায্যে বিষয়টি চিত্তাকর্ষক করা যেতে পারে। অধ্যাপক সিনক্লেয়ারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এ-সব বিষয়ে আলোচনা হ'ল।

একটু উঁচু পাহাড়ের উপর অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ী। সাম্‌নে হনলুলুর প্রসিদ্ধ "ডায়মণ্ড হেড"—সোজা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উঠে মাথা উঁচু ক'রে আছে—তার গোড়া থেকে ঢালু হয়ে শহর ও তার আলো ও রাস্তা, ওপাশটাতে সমুদ্র—অপূর্ব্ব দৃশ্য! মিঃ সিনক্লেয়ার নূতন বাড়ী তৈরি ক'রেছেন। ড্রয়িং-রুমের এক দেয়ালে একটি পুরোনো মোগল চিত্র, সামনের দেয়ালে একটি চীনে চিত্র বিলম্বিত, দরজার উপরে রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাক্ষরিত ছবি। রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে লিখে দিয়েছেন—To Gregg Sinclair। উনি উৎসাহের সঙ্গে ছবিখানি উপর থেকে নামিয়ে দেখালেন। এই ঘরটি ভারতীয় জিনিসপত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখবার ইচ্ছে ওঁর। ভারতবর্ষ থেকে এত দূরে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির এক জন অনুরাগীর সঙ্গলাভ ক'রে আনন্দ পাওয়া গেল। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যতত্ত্ব-বিভাগে ভারতবর্ষের কোনও আসন এ পর্য্যন্ত গড়ে তোলা যায় নি, এ জন্য উনি বেশ দুঃখিত; 'ওরিয়েণ্টাল' অর্থে এখনও শুধু চীন ও জাপান।

পরদিন ছবির প্রদর্শনী। এখানকার অনেক শিল্পীর সঙ্গেই পরিচিত হওয়া গেল। এ-দেশে মহিলা-শিল্পীর সংখ্যা যথেষ্ট, বাণিজ্যসহায় শিল্প বা কমার্শিয়াল আর্টের চর্চা তাঁদের অনেকে করেন। অনেকে নিউইয়র্কে কাপড়ের দোকানে নানা রকম নক্‌শা এঁকে জীবিকানির্ব্বাহ ক'রে থাকেন। সুন্দরীদের মহলে কোনও নক্‌শার আদর হ'লে আর্টিষ্ট বেশ কিছু রোজগার ক'রে নিতে পারে। তা ছাড়াও অনেক নাম-করা শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমেরিকান আর্টিষ্ট অনেকেই ফ্রান্সে শিক্ষালাভ ক'রে থাকেন—তাই এঁদের চিত্রে ঐ দেশীয় প্রভাব বেশী। অনেক শিল্পীর চিত্রে গগ্যাঁর শিল্পরীতির প্রভাব তাদের অজ্ঞাতসারেও এসে গেছে। অনেক শিল্পী Surrealism-এর প্রভাবে পড়ে গেছেন। গতানুগতিক ধারাকে

অস্বীকার ক'রে নূতন কিছু সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলছে। এখানে কয়েক জন চীনে ও জাপানী শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাঁরা দেখি প্যারিসেই বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন, নিজেদের দেশের বিশেষত্ব ওঁদের মধ্যে নেই। অনেকেই বেশ ভাল পোর্ট্রেট এঁকে থাকেন। এঁদের মধ্যে এক জন জাপানী শিল্পী আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন।

হাওয়াইয়ানদের দেশীয় শিল্প বিদেশীয়দের প্রভাবে এক রকম লুপ্ত হ'য়ে গেছে। অবশ্য এজন্য আমেরিকানদের চলে না। আমেরিকানরা তাদের অধিকৃত জাতির উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। সেখানকার শিক্ষা সভ্যতা সমস্তই তারা তাদের নিজের দেশের মতই দিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান ও হাওয়াইয়ান উভয়কেই আমেরিকান বাসিন্দা হিসেবে সমান অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সভ্য জাতের বাইরের চাকচিক্য দেখে হাওয়াইয়ানরা তাদের নিজের দেশের শিল্প গেল ভুলে। আমেরিকানদের বিলাসিতা আচার ব্যবহার সবই এরা গ্রহণ ক'রে নিলে।

নিউজীল্যাণ্ডে মাওরীরা কিন্তু তাদের ঐতিহ্য অনেকটা বজায় রেখেছে।

এক জন মহিলা-শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি আমেরিকান। এঁর স্বামী ছিলেন এক জন বাঙালী ভদ্রলোক, উপেন্দ্রনাথ দাস, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি হনলুলুতে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যান। কাপড়ের দোকানে পোষাক-আসাকের নক্শা এঁকে ও কমার্শিয়াল আর্ট অবলম্বন ক'রে ভদ্রমহিলা বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। আমি ভারতীয় ব'লে ইনি আমাকে বিশেষ সাহায্য ও সৌহৃদ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। এঁর চেষ্টায় ও উৎসাহে' আমাকে আরও একটি ঘরোয়া প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত ক'রতে হয়। সেখানে হনলুলুর শিল্পী ও শিল্পোৎসাহী বহু অতিথি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলল। অনেকেরই ধারণা ভারতবর্ষের লোকেরা গঙ্গাজল ও দেবদেবী নিয়েই বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত ক'রে থাকে। বর্ত্তমান সভ্যতার হাওয়া ভারতবর্ষে



হাওয়াইর তরুণী

কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছেছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তা ছাড়া কর্ম্মের দিক দিয়ে ভারতবর্ষের চিন্তার ধারা কোন্ দিকে, দেশটা কেমন, এ-সব জানবার জন্য অনেকেই কৌতূহলী। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে অনেকেই জানতে উৎসুক।

দূর থেকে ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে দেখবার সুযোগ ঘটল এই প্রসঙ্গে। ভারতবর্ষের ভালমন্দ অনেক কিছু বেশ পরিষ্কার হয়ে মানসচক্ষে ভেসে উঠেছে। তাই ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কোনও আলোচনায় উৎসাহ সহকারে যোগ দিয়ে আমাদের দেশের যা কিছু বড় তাকে আরও বড় ক'রে এদের চোখের সামনে দাঁড় করাবার দুর্দ্দমনীয় লোভকে সংবরণ করা কঠিন হয়ে উঠত।

এক জন জাপানী যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হনলুলু এঁর জন্মস্থান, জাপানে কখনও যান নি। শিল্পশিক্ষা হয়েছে প্যারিসে, নিউইয়র্কে কাটিয়েছেন অনেক দিন। এঁর সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছি এক সঙ্গে। এঁর স্টুডিও দেখে, ভারতবর্ষের বাইরে এসে এই প্রথম আমি নিজের জায়গা খুঁজে পেলাম মনে হ'ল। শহর থেকে অনেকটা দূর গিয়ে এক পাহাড়ের নীচে নানা রকম লতাগুল্মে আচ্ছাদিত এক কাঠের ঘর। মাকাল বা ঐ



নুউউআনু পর্ব্বতশৃঙ্গ। কামেহামেহা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের একচ্ছত্র অধীশ্বর হবার পথে দেশীয় যে সৈন্যদল বাধা দিয়াছিল এইখানে তাহারা সম্পূর্ণ নিধনপ্রাপ্ত হয়েছিল।

জাতীয় এক লতায় ঢাকা ফলের গাছ। মাথা হেঁট ক'রে স্টুডিও ঘরে ঢুকতে হয়। ঘরের ভিতর একরাশ ক্যান্‌ভাস্, কোনটি কেবল শুরু হয়েছে, কোনটি খানিকটা এগিয়েছে, এই রকম ছবিতে ভর্ত্তি। দুটি চেয়ার আর একটি উঁচু ধরণের কুর্সি—গাঁয়ের থিয়েটারে রাজার সিংহাসন হিসেবে সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে—ঘরের আর এক কোণে প'ড়ে আছে। বোধ হয় মডেলের বসবার জায়গা। আমি দেখে উৎসাহের সঙ্গে বললাম—আমি এইবার মনের মত জায়গা পেয়েছি এত দিন পর। চক্‌চকে মেজে ও নানারকম আসবাবপত্রে ভর্ত্তি আমেরিকান ড্রয়িং-রুম দেখে দেখে হয়রান হয়ে গিয়েছি।

এখানকার aquarium একটি দেখবার জিনিষ। নানা রকম মাছ, সুন্দর রঙের বিচিত্র নক্‌শা আঁকা এদের গায়ে। হাওয়াই দ্বীপের গাছপালা, পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ফুল-পাতা প্রকৃতির বাছাই করা শিল্পনিদর্শন। চার পাশের সমুদ্রের জল যেমন সুন্দর নীল এমন আর কোথাও দেখি নি। হাওয়াইয়ান সাগরে প্রবাল যেমন বিচিত্র ও সুন্দর অন্য কোথাও তত নয়। এখানকার সমুদ্রে হাঙ্গরের উৎপাত একেবারেই নেই। ছোট ছোট নৌকো ক'রে বলিষ্ঠ হাওয়াইয়ান মাঝি মার্কিন যুবক-যুবতীদের নিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলতে খেলতে চলে—ঝাঁপিয়ে পড়তেও ইতস্ততঃ করে না।

হনলুলু মিউজিয়ম অভিনিবেশ সহকারে দেখবার যোগ্য। পলিনেসিয়ান, মেলানেসিয়ান ও মাইক্রোনেসিয়ানদের রণসাজ, রাজপোষাক এবং নানা রকম হাতিয়ার, নৌকো প্রভৃতির এত বড় সংগ্রহালয় বড় দেখা যায় না। প্রশান্ত মহা-



ওয়াইকিকির সমুদ্রবেলা

সাগরের দ্বীপগুলির অধিবাসীদের ইতিহাস এবং তাদের শিল্পসভ্যতা সমস্ত অধ্যয়ন করবার একমাত্র স্থান বলা চলতে পারে।

বাইরে ঘুরে ঘুরে সেদিন দু-জন বন্ধু নিয়ে চললেন পাহাড়ের রাস্তায় এঁকেবেঁকে নানা রকম ফুলে ভরা বনের পাশ দিয়ে। সুন্দর রাস্তা। একটি জায়গায় এসে বন্ধুটি বললেন, "তোমায় বিশ্বাস করতে পারি কি?" আমি বললাম, "নিশ্চয়"। ওঁদের হুকুম হ'ল এইখান থেকে আমায় চোখ বন্ধ ক'রে থাকতে হবে যতক্ষণ ওঁরা না খুলতে বলেন। মনে আছে চোখ খুলে যে-দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল তা অপূর্ব্ব। "নুউউআনু" উপত্যকা দিয়ে "পালি"তে এসে হাজির হয়েছি। "পালি" হাওয়াইয়ান শব্দ, ইংরেজিতে একে cliff বলা যেতে পারে। এই স্থানে সর্ব্বদা এত হাওয়া বইতে থাকে যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবপর নয়। পাহাড়ের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। এখান থেকে প্রায় দেড় হাজার ফুট নীচে নীল প্রশান্ত মহাসাগর। যতদূর দৃষ্টি যায়, জল। তীরের দিকে চমৎকার সবুজ রঙের জল এবং তার পর ঘন নীল—আকাশের রঙের চেয়েও অনেক বেশী গাঢ়। এইখানেই "ওয়াহু" দ্বীপের শেষ সৈন্যদল রাজা কামেহামেহার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। বর্শার আঘাতে এদের এইখান থেকে অনেক ফুট নীচে গড়িয়ে ফেলা হয়। ইংরেজীতে এই জায়গাকে—"Where a war ended and a nation began" বলা হয়ে থাকে।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন কুক প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ অবিষ্কার ক'রে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হনলুলুতে এসে পৌঁছেন। ইনি আর্কটিক মহাসাগর দিয়ে ঘুরে ইউরোপ যাবার সঙ্কল্প নিয়ে বেরোন। শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের ভিতর ইনিই প্রথম হনলুলু আবিষ্কার করেন। এদেশের লোক এঁকে "White God" ব'লে অভ্যর্থনা করে। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্কটিক মহাসাগরে বরফের জন্য ইনি এগিয়ে চলতে না পেরে এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হন। কিছুদিন গত হ'লে দ্বীপবাসীদের মনে "সাদা দেবতার" দেবত্বে সন্দেহ জন্মায়। হনলুলুতে লোহা জন্মায় না—ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজে লৌহের প্রাচুর্য্য দেখতে পেয়ে দ্বীপবাসীদের অপহরণস্পৃহা জেগে ওঠে। এক দিন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এদের সঙ্গে জাহাজের নাবিকদের লড়াই বাধে। এক জন নাবিক আঘাত পেয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকে। তখন দ্বীপবাসীদের "সাদা দেবতা" একেবারেই যে সাধারণ মানুষ এই ধারণা



হাওয়াই ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিট্যুটে লেখক ও অধ্যাপক সিনক্লেয়ার। ভারতবর্ষের একটি দীপাধার লেখক ইনষ্টিট্যুটে উপহার দিয়াছিলেন।

দৃঢ় হয়। ক্যাপ্টেন কুককে এরা আক্রমণ করে এবং ক্যাপ্টেন কুক এইখানেই নিহত হন। এক খণ্ড পাথর এখনও সেই জায়গায় তাঁর স্মৃতিফলক স্বরূপ বিদ্যমান। সেইখানে দাঁড়িয়ে কাপ্টেন কুকের কথা মনে উদয় হ'ল। ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে পালতোলা জাহাজে ভাসতে ভাসতে এঁরা কত দেশই আবিষ্কার করেছেন এবং নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করেছেন!

হনলুলু ছেড়ে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে।

যাবার আগের দিন রাত্রে আমার নিমন্ত্রণ হনলুলুর আর্টিষ্টদের তরফ থেকে। কদলীকুঞ্জ ও "কাহেলি" ফুলের মালায় হাওয়াইয়ান আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হ'য়েছে। হাওয়াইয়ান গীটার ও গায়কবৃন্দ এসেছেন। টেবিলে কলাপাতায় হাওয়াইয়ান "পোয়ি" খাদ্যের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মিসেস দাস অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্ত্রী। মান্দ্রাজের শ্রীযুক্তা স্বামীনাথন্ ও তাঁর মেয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী মৃণালিনী দেবীও ছিলেন নিমন্ত্রিত—এঁরা নিউইয়র্কে যাচ্ছেন। এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছোট একটি বক্তৃতা দিয়ে আমায় একটি পোর্টফোলিও উপহার দিলেন তাতে স্থানীয় আর্টিষ্টদের আঁকা অনেক ছবি।

এবার আমার কিছু বলবার পালা। পৃথিবীর অন্য অর্দ্ধ থেকে এসে এত বন্ধুর সঙ্গে পরিচয়—আবার ফিরে যেতে হবে সেই পৃথিবীর আর এক প্রান্তে— ভারতবর্ষে।

পরদিন নানা রকম ফুলের মালা, উপহার, বিদায়-সম্ভাষণ, করমর্দ্দন, "বিদায়! বিদায়!"—জাহাজের নাবিকদের চীৎকার—"friends ashore"। জাহাজ ছাড়ল হনলুলুর জেটি। রঙীন ফিতে জাহাজ থেকে জেটির উপর বন্ধুদের হাতে ছুঁড়ে ফেলা। যতক্ষণ পারা যায় প্রিয়জনকে ছুঁয়ে থাকবার আকাঙ্ক্ষা। হাতে যখন কুলোয় না তখন ফিতে দিয়ে। সেও গেল ছিঁড়ে। সেই হনলুলুর "Aloha Tower"; জাহাজ মোড় ঘুরল। হঠাৎ দেখি দ্বীপের আর এক প্রান্তে কয়েক জন বন্ধু মোটরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। এতটুকু ছোট দেখাচ্ছে। হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছেন। অনেকক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলুম এখন আর তীরের আলোও দেখা যাচ্ছে না। এঞ্জিনের শব্দ। ছুটেছি ফিজি ও নিউজীল্যাণ্ডের দিকে। মাথায় হাত ঠেকিয়ে মনে মনে বললাম "Aloha"।



দেশ-বিদেশের কথা

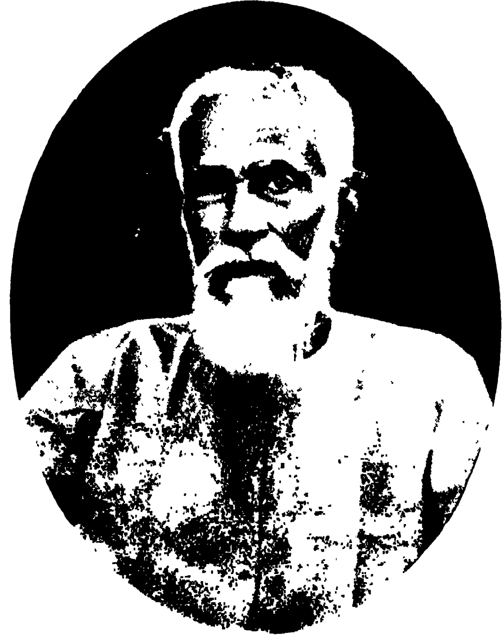


জানকীনাথ দত্ত

গোয়ালিয়র-প্রবাসী, তত্রত্য ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক অধ্যক্ষ ও উক্ত ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাসচিব জানকীনাথ দত্ত সভাভূষণ মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে সম্প্রতি লস্কর শহরস্থিত আবাসে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গোয়ালিয়র রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসের সহিত তাঁহার জীবন বিশেষভাবে জড়িত।

যে সময়ে জানকীবাবু গোয়ালিয়র ষ্টেট বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন, তখন উক্ত ষ্টেটের শিক্ষা-সংস্কার সাধিত হইতেছিল। কর্ম্মকুশলতায় এবং বুদ্ধিমত্তায় জানকীবাবু অল্পদিনের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন এবং তাহার ফলে তাঁহাকে শিক্ষাসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শিক্ষা-সম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে, ষ্টেটে উচ্চশিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত একটি কলেজ স্থাপিত হইলে জানকীবাবু সেই কলেজে সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। এই শিক্ষামন্দিরই পরে ভিক্টোরিয়া কলেজে পরিণত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল জানকীবাবু অধ্যাপক এবং প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, কিরূপে কলেজের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। তাঁহারই পরিচালনায় কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে কলেজের কার্য্যবিবরণীতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইয়াছিল যে জানকী-বাবুর প্রেরণাতেই অধিকাংশ শিক্ষাসংস্কার-কার্য্য কৃতকার্য্যতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

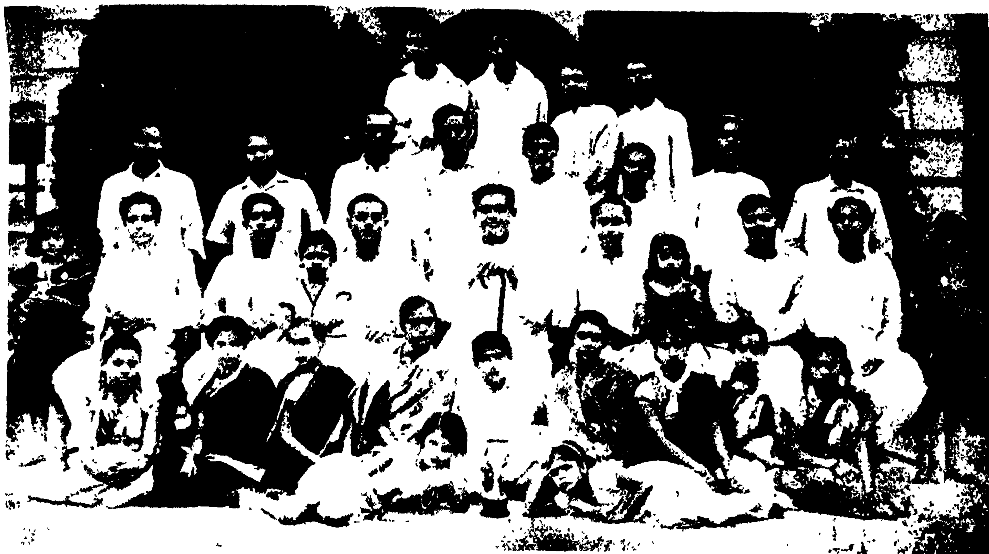


জানকীনাথ দত্ত

ফটোগ্রাফ শ্রীধিমানবিহারী দের সৌজন্যে

"Most of the reforms which have been successfully carried through are due to his initiative; not one of them could have lasted for a day without his unvarying support and advice."—Annual Report of the College for 1912-13.

গোয়ালিয়র ভিক্টোরিয়া কলেজে বরাবরই এক জন ইংরাজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু জানকীবাবুর প্রভূত অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতা গুণে প্রীত হইয়া দরবার তাঁহাকে অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। তৎপরে শিক্ষাবিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হইলে, ষ্টেটের সর্ব্বত্র সাধারণ বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, ট্রেনিং স্কুল, শ্রমশিল্প-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইল, তখন তিনি ঐ বিভাগের একজন ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। এই পদেও তিনি বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। কিছু কালের জন্য তিনি স্থানীয় নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দুই বার ষ্টেট সেন্সাসের কার্য্য দেওয়া হয়। ১৯১১ সালের সেন্সাসের সময় লস্কর সহরে প্লেগ ব্যাধি দেখা দেওয়ায় গণনার কার্য্য অতীব জটিল ভাব ধারণ করে। অশিক্ষিত লোকের ধারণা হয় যে, সরকার হইতে জবরদস্তি করিয়া তাহাদের



লক্ষ্ণৌতে বাঙালী অনুষ্ঠান
বৈশাখী সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ



লাহোরে বাঙালী প্রতিষ্ঠান
কলাপরিষৎ রূপচক্রের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যগণ

দেহে প্লেগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইবে। তখন তাহারা দলে দলে শহর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ষ্টেটের অপর কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা ঐ গণনাকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার আশা নাই দেখিয়া, অবশেষে জানকীবাবুকে উহার ভারার্পণ করা হইল; তিনি তাহা তৎপরতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি বিদেশী হইলেও সহরের সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৯২১ সালের গণনার সময় গোয়ালিয়র-দরবার জানকী-বাবুকে সেন্সাস কমিশনার (Census Commissioner, Gualior State) নিযুক্ত করেন। তিনিই গোয়ালিয়র ষ্টেটের সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন সেন্সস কমিশনার হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার লিখিত ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট (Govt. of India Census, Volume XX Gualior State, 1921) তাঁহার কার্য্য-কুশলতার পরিচায়ক। এই কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ অতিরিক্ত বেতন ব্যতীত, তিনি মহামান্য স্বর্গীয় মহারাজ স্যার মাধব রাও সিন্ধিয়া আলিজা বাহাদুরের নিকট বিশিষ্ট সম্মানজনক "সভাভূষণ" উপাধি এবং মূল্যবান পরিচ্ছদ ইত্যাদি উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর জানকীবাবু অস্থায়ী ভাবে গোয়ালিয়র শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল এবং শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন।

গোয়ালিয়রের সরকারী পদ ব্যতীত জানকীবাবু আরও কয়েকটি বেসরকারী কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে লস্কর মিউনিসিপালিটির কমিশনার ও চেয়ারম্যানের পদ, কন্যাধর্ম্মসংবর্দ্ধিনী সভা, মাধব ফ্রী রীডিং রুম ও লাইব্রেরী, অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষালয় এবং আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য পদ উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘকাল প্রবাসী হইয়াও তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র পৈতৃক ঘিকমলা গ্রামকে বিস্মৃত হন নাই। উচ্চ পদাভিষিক্ত থাকিয়াও তিনি কখনও বিদেশী গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী



নাথীবাই দামোদর ঠাকরসী ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পদবী সম্মান-বিতরণ সভায় উপাধিপ্রাপ্তা তরুণীগণ

সঙ্কশস্য

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

প্রতিধ্বনি যে ধ্বনির কাছে ঋণী, সেই কথাটা গোপন করিবার জন্যই নাকি তাহার ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করার প্রচেষ্টা—অন্ততঃ কবির কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়। আমরা সাধারণতঃ যে-সকল প্রতিধ্বনির সহিত পরিচিত, সেগুলি শুনিলে সত্য সত্যই ভ্যাংচান বলিয়া মনে হয়, যদিও প্রতিধ্বনির রকমফের আছে।

প্রতিধ্বনির প্রকৃতিনির্ণয় কঠিন বৈজ্ঞানিক সমস্যা। সাধারণ ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। যেমন কয়েক বছর আগে আল্পস্ পাহাড়ের ভিতর এক রেল-সুড়ঙ্গের মধ্যে ২৮ টন ডিনামাইট বিস্ফোরণ হয়। শব্দটা যে খুব জমকালো রকম হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কারণ কুড়ি মাইল দূর হইতে তাহার আওয়াজ পাওয়া গিয়াছিল। ২৫।৩০ মাইল দূর হইতে কিছু শোনা যায় নাই। কিন্তু মজার কথা এই যে, ১০০ মাইল উত্তরে জার্মান সীমান্তের কাছে এই শব্দ পরিষ্কার শোনা গিয়াছিল। অবশ্য আসল শব্দ নয়, প্রতিধ্বনি এবং এই প্রতিধ্বনি আসিয়াছিল দূর আকাশের মেঘে ব্যাহত হইয়া। মাঝের আশী মাইল স্থান ধরিয়া ইহার কোন হদিসই পাওয়া যায় নাই।

বিখ্যাত মার্কিন হাস্যরসিক মার্ক টোয়েন এক প্রতিধ্বনির বর্ণনা করিয়াছিলেন। এক জায়গায় একটি শব্দ একবার উচ্চারণ করিলে ১৫ মিনিট ধরিয়া প্রতিধ্বনি সেই শব্দ পুনরুচ্চারণ করিত, পৌনঃপুনিক দশমিকের মত।

ওয়েল্স্ প্রদেশে মিনাই দোদুল্যমান সেতুতে একপ্রকার মজার প্রতিধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়। একটি হাতুড়ির ঘা মারিলে সেই শব্দ সেতুর প্রত্যেকটি "কড়ি" হইতে প্রতিধ্বনি হয়, নদীর সমস্ত প্রস্থ, অর্থাৎ ৫৭৬ ফিট স্থান ব্যাপিয়া।

এ-সব নিম্নস্তরের প্রতিধ্বনি, কয়েকটি প্রতিধ্বনি এ রকম সস্তা নাম কিনিতে চায় না। রোমান কাম্পানায় একটি সমাধির নিকটে একটি ছোটখাট কবিতা আবৃত্তি করিলে প্রতিধ্বনি কবিতাটি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত পরম সৌজন্য সহকারে অপেক্ষা করে, তাহার পরে প্রত্যেকটি শব্দ পুনরুচ্চারণ করে। ভারতবর্ষে

মধ্যপ্রদেশের অধুনাত্যক্ত মাণ্ডু নগরে একটি স্থানে একটি দীর্ঘ বাক্য উচ্চারণ করিলে প্রতিধ্বনি আগাগোড়া বাক্যটি ফিরাইয়া দেয়।

এই ধরণের প্রতিধ্বনির সৃষ্টির জন্য যে "শব্দদর্পণ" প্রয়োজন, তাহা এত দূরে হওয়া দরকার যে শব্দ ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলা যায়। শব্দের গতি ৫ সেকেণ্ডে এক মাইল আন্দাজ। কাজেই ৫ সেকেণ্ড ব্যাপী বাক্য যে প্রতিফলক ফিরাইয়া দেয়, তাহার দূরত্ব আধ মাইল (যাওয়া আসায় এক মাইল)। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ও প্রতিফলকের এমন কতকগুলি গুণ থাকা দরকার যাহা সচরাচর পাওয়া যায় না। কাজেই এই ধরণের প্রতিধ্বনি অতি বিরল।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ (concave) দর্পণে মুখ দেখিলে (দাড়ি কামাইবার সময় হয়ত অনেকেই দেখিয়াছেন) মুখের আকার প্রকাণ্ড দেখায়। শব্দের এইরূপ অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন খুব বিরল নহে। সিসিলি দ্বীপে একটি গিরিগুহায় এক টুকরা কাগজ হাতে করিয়া মড়মড় আওয়াজ করিলে প্রতিধ্বনিতে মেশিনগানের শব্দের মত শোনায়।

মার্ক টোয়েন নাকি একটি প্রতিধ্বনির সন্ধান পাইয়াছিলেন যাহা জার্মান ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষার তোয়াক্কা রাখে না। ইংলণ্ডে এক স্থানে প্রতিধ্বনিতে পুরুষের গলা শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু নারীকণ্ঠের বাচন স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত হয়।

মহৎ ব্যক্তি অপকারীর উপকার করিয়া থাকেন, কর্কশ কণ্ঠের উত্তর মধুর স্বরে দিয়া থাকেন। এমন প্রতিধ্বনি আছে, যাহা অতি তীব্র কর্কশ শব্দ সুমধুর সঙ্গীতে পরিণত করে।

ইংলণ্ডে সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রালের whispering galleryর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এখানে বৃহৎ গুম্বজের নীচে দেয়ালের গায়ে অতি মৃদুস্বরে কথা বলিলে, শব্দ সারা দেওয়ালে ব্যাহত হইয়া ১০২ ফিট দূরে বিপরীত দিকে শ্রোতার কানে স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত হয়। এই ধরণের ব্যাপার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে হয়ত কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন। হলের এক পার্শ্বে যে বৃহদাকার ন্যুব্জপৃষ্ঠ প্রতিফলক আছে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কথা বলিলে ঘরের এক অংশে বিবর্দ্ধিত শব্দ শোনা যায়।

একটি গল্প। "প্রতিধ্বনির প্রতিহিংসা" নাম দিলে ভুল হয় না।

বহুবৎসর পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপের একটি গির্জ্জায় এক ভদ্রলোক বেদীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া ছিলেন, সহসা তাঁহার কানে আসিল, "পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি পাপ করিয়াছি—"

ভদ্রলোক চমকিয়া চারি দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। কাছে কেহই নাই। অথচ তাঁহার কানে এই গোপন পাপস্বীকৃতি সমান ভাবেই আসিতেছে। ভদ্রলোক বুঝিলেন এক শত ফিট দূরে স্বীকৃতি-প্রকোষ্ঠ (confessional booth) হইতে এই শব্দ আসিতেছে। তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া একটু নড়িতেই শব্দ থামিয়া গেল। ভদ্রলোক বুঝিলেন তিনি যেখানে নতজানু হইয়া ছিলেন, শুধু সেই স্থান হইতেই এই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

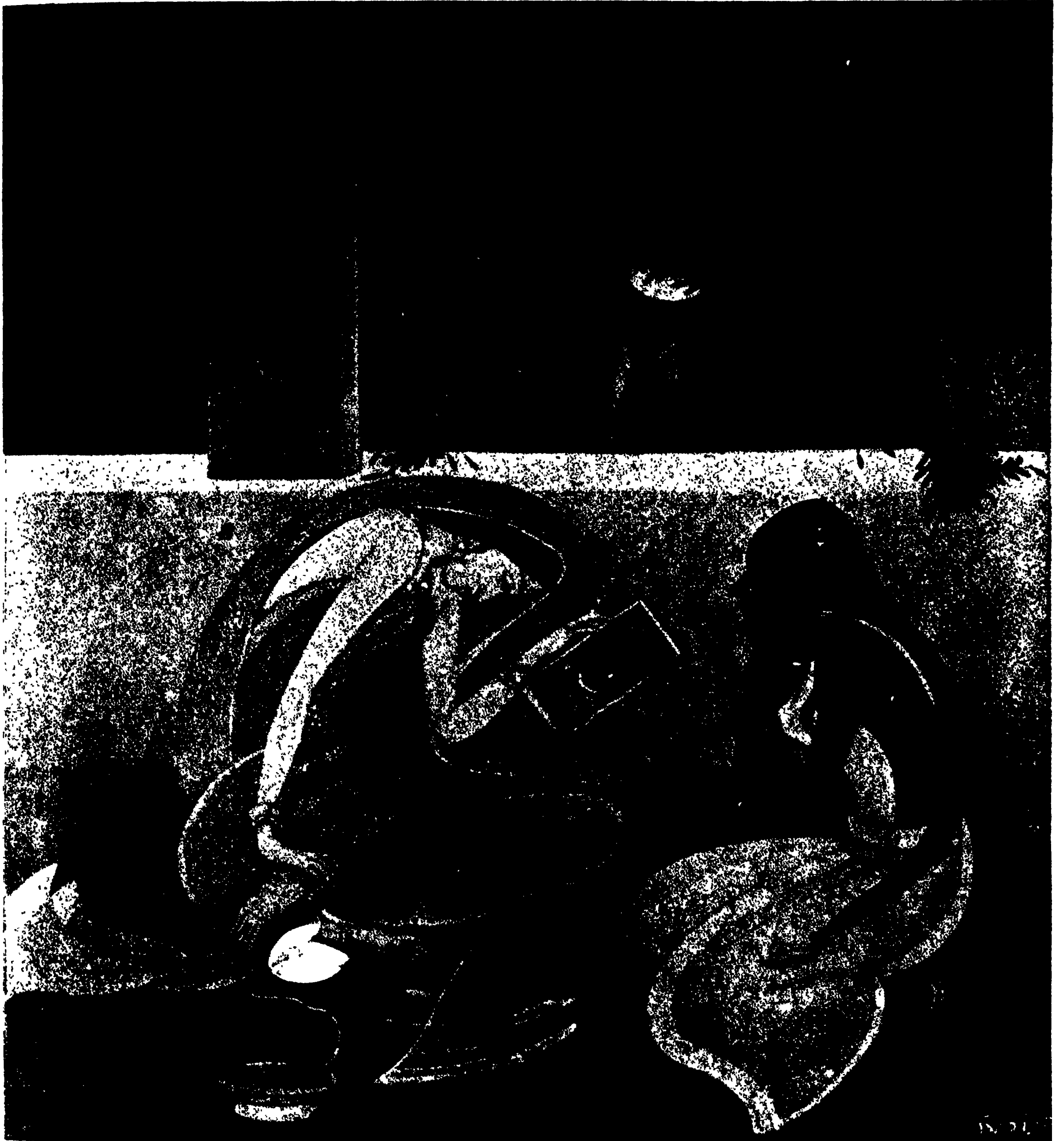
ভদ্রলোক পরমানন্দে কয়েক জন বন্ধুকে সেই স্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এই মজা শুনাইবার জন্য। লোকে গোপনে যাজকের কাছে নিজের পাপ ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে, এত সহজে তাহা শুনিতে পাওয়ার মত মজা আর কি থাকিতে পারে? এবং এই অপচেষ্টার ফলে প্রথমবারেই তিনি শুনিলেন, তাঁহারই স্ত্রী যাজকের নিকট নিজের জীবনের গোপন কাহিনী ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে কোন স্বামীই প্রাণ থাকিতে যে-সব কথা শুনিতে চায় না।

স.



সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কে প্রবাসী-সম্পাদক

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



আলেখ্য-দর্শন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৪৭

৫ম সংখ্যা

বিমুখতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন যে তাহার হঠাৎ-প্লাবনী
নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কী টানে
বাঁকিয়া যায়,
সে তার সহজ গতি,
সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
যতই করুক ক্ষতি।
বাঁধাপথে তা'রে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিলে খরপ্রবাহিণী নদী
ফিরে ফিরে তা'র ভাঙিয়া ফেলিবে কূল
ভাঙিবে তোমার ভুল।
নয় সে খেলার পুতুল, নয় সে
আদরের পোষা প্রাণী,
মনে রেখো তাহা জানি।
মত্ত প্রবাহ বেগে
দুর্দম তার ফেনিল হাস্য
কখন উঠিবে জেগে।
তোমার প্রাণের পণ্য আহরি
ভাসাইয়া দিলে ভঙ্গুর তরী,

হঠাৎ কখন পাষাণে আছাড়ি
করিবে সে পরিহাস,
হেলায় খেলায় ঘটাবে সর্বনাশ।
এ খেলারে যদি খেলা বলি মানো,
হাসিতে হাস্য মিলাইতে জানো
তাহলে র'বে না খেদ।
ঝরণার পথে উজানের খেয়া
সে যে মরণের জেদ।
স্বাধীন বলো যে ওরে
নিতান্ত ভুল ক'রে।
দিক্-সীমানার বাঁধন টুটিয়া
ঘুমের ঘোরেতে চমকি উঠিয়া
যে উল্কা পড়ে খ'সে
কোন্ ভাগ্যের দোষে
সেই কি স্বাধীন, তেমনি স্বাধীন এও,
এরে ক্ষমা ক'রে যেয়ো।
বন্যারে নিয়ে খেলা যদি সাধ
লাভের হিসাব দিয়ো তবে বাদ,
গিরিনদী সাথে বাঁধা পড়িয়ো না
পণ্যের ব্যবহারে।
মূল্য যাহার আছে একটুও
সাবধান করি ঘরে তারে থুয়ো,
খাটাতে যেয়ো না মাতাল চলার
চলতি এ কারবারে।
কাটিয়ো সাঁতার যদি জানা থাকে,
তলিয়ে যেয়ো না আওড়ের পাকে,
ভাসিতে না জানো রৌদ্র পোহায়ো
বসিয়া স্রোতের পারে;
যতই নীরস হোক না সে তবু
নিরাপদ জেনো তারে।
"সে আমারি" ব'লে বৃথা অহমিকা
ভালে আঁকি দেয় ব্যঙ্গের টিকা।
আলগা লীলায় নাই দেওয়া পাওয়া,
খোলা দ্বার দিয়ে শুধু আসা যাওয়া,
শুধু ভুলে যাওয়া শিখা।

কালিন্দী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩

আরও মাস তিনেক পর।

মাঘ মাসের প্রথমেই এক দিন প্রাতঃকালে কলের মালিক অকস্মাৎ সমস্ত চরটাই দখল করিয়া বসিলেন—রংলাল প্রমুখ চাষীরাও যে-জমিটা অল্প দিন পূর্ব্বে জমিদারের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল সে-অংশটা পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইলেন।

মোটর-সংযুক্ত বিলাতী লাঙল চালাইয়া চরের সমস্ত আবাদী জমি এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত চষিয়া এক করিয়া দিল। সংবাদ পাইয়া সমগ্র রায়হাট গ্রামখানাই বিস্ময়ে কৌতূহলে উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিল। চরের উপর কলের লাঙল আসিয়াছে। গরু নাই, মহিষ নাই, কোন লোক লাঙলের মুঠা ধরিয়া নাই—অথচ চাষ হইয়া চলিয়াছে। কেবল এক জন লোক গাড়ীর মত কলটার উপর বাবুর মত বসিয়া আছে, হাতে পায়ে দুই-একটা কল ঘুরাইতেছে টিপিতেছে, আর গাড়ীটা চলিতেছে—পিছনে ইয়া মোটা মোটা মাটির চাঁই উল্টাইয়া পড়িতেছে। ওটা না কি মোটরের লাঙল, ঠিক মোটরেরই মত ধোঁয়া ছাড়ে, শব্দ করে। ভট্ ভট্ শব্দ করিয়া বুনো বরার মত এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে; বাধা-বিঘ্ন বলিয়া কিছু নাই, উঁচু-নীচু খাল-ঢিপি সব উখড়াইয়া দিয়া চলিয়াছে!

গ্রামের আবালবৃদ্ধ কালিন্দীর ঘাট হইতে চর পর্য্যন্ত ভিড় জমাইয়া ছুটিয়া আসিল। বনিতারা সকলে না আসিলেও অনেকে আসিয়াছিল। তাহারা কালিন্দীর এ-পারেই দাঁড়াইয়াছিল। চাষীদের বউগুলি দাঁড়াইয়া ঘোমটার অন্তরালে কেবলই কাঁদিতেছিল। তাহারা কল দেখিতে আসে নাই—তাহারা দেখিতেছিল, তাহাদের জমি চলিয়া যাইতেছে। দূরান্তর হইতে প্রিয়জনের মৃত্যুশয্যার শিয়রে যেমন মানুষ আসিয়া অঝোর ঝরে কাঁদে আর নির্নিমেষ নেত্রে মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে চাহিয়া থাকে—এ দেখিতে আসা তাহাদের সেই দেখিতে আসা। তাহাদের চোখে সেই সজল মমতাকাতর দৃষ্টি। চাষীরা কিন্তু আসে নাই। সমবেত জনতা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যাশা করিতেছিল—চাষীদের সঙ্গে ছোট রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পাইকেরা 'রে রে' করিয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া। কিন্তু বহুক্ষণ চলিয়া গেল তবু কেহ আসিল না। ওদিকে চরটা সমস্তই চষিয়া ফেলিয়া কলটা স্তব্ধ হইল।

রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পাইকদের না আসিবার কারণ ছিল। তাহারা আর কোন দিন আসিবে না; চর লইয়া জমিদার ও কলের মালিকের দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটিয়াছে; জমিদার-পক্ষ সমস্ত মামলায় হারিয়া গিয়াছেন। গত কাল অপরাহ্ণে বিচারকের রায় বাহির হইয়াছে, সংবাদটা এখনও সকলের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই।

মামলায় পরাজয়ের সংবাদ সুনীতিও জানিতেন না। ইন্দ্র রায় সে-সংবাদ এখনও জানাইতে পারেন নাই, সুনীতি কেন, হেমাঙ্গিনীকেও জানাইতে তাঁহার বাধিয়াছে। কলের মালিক কলের লাঙল চালাইয়া চর দখল করিতেছেন সংবাদ পাইয়া সুনীতি নূতন দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কায় উদ্বেগ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, ভাঁড়ার বাহির করিতে গিয়া তাঁহার হাত-পা কাঁপিতেছিল। নীরবে নতমুখে বঁটির উপর বসিয়া উমা শ্বশুরের জন্য আনারস ছাড়াইয়া কুটিতেছিল। এমন সময় মানদা ছড়া কাটিয়া ভনিতা করিয়া বাড়ী ফিরিল—সেও কলের লাঙল দেখিতে গিয়াছিল। চোখ দুটি বড় করিয়া গালে হাত দিয়া বলিল—'যা দেখি নাই বাবার কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে!' কালে কালে আরও কত হবে—বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব!

সুনীতি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন—কোন খুনখারাপী হয় নি তো রে?

—না গো, না। কেউ যায়ই নি। দিব্যি কলের লাঙল চালিয়ে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্য্যন্ত চষে নিলে কলওয়ালা!

সুনীতি পরম স্বস্তিতে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। মানদার আসল বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিয়াই গেল—গরু নাই, মোষ নাই, চাষা নাই, লাঙলের ফাল নাই, এই একটা গাড়ীর মতন—ফট্ ফট্ শব্দ ক'রে চলছে আর জমি চাষ হয়ে যাচ্ছে। এক দণ্ডে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্য্যন্ত চাষ হয়ে গেল!

উমা মৃদু হাসিয়া বলিল—ওটা হ'ল মোটরের লাঙল, মোটরগাড়ী তো আপনি চলে দেখেছ, এও তেমনি চলে। নীচে বড় বড় ধারাল ইস্পাতের ছুরি লাগান আছে, মোটরটা চলবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো মাটি কেটে উল্টে দিয়ে যায়।

মানদা সবিস্ময়ে মৃদু স্বরে বলিল—তাই সবাই বলছে বউদিদি, আর ধোঁয়া ছাড়ছে কলটা—তার গন্ধ নাকি অবিকল মোটরের ধোঁয়ার গন্ধের মত। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে বলিল—আঃ, অনাথা গরু-মোষের অন্নই মারা গেল আর কি!

এবার সবিস্ময়ে উমা মানদার দিকে চাহিল—মানদা বলিল, গরু-মোষ তো আর কেউ পালবে না বউদিদি, না খেতে পেয়েই ওরা মরে যাবে।

উমা এবার বেশ একটু জোরেই হাসিয়া উঠিল, সুনীতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তা এতে এমন ক'রে হাসছ কেন বউমা? ও বেচারার যেমন বুদ্ধি তেমনি বলেছে।

মানদা এমন একটি সমর্থন পাইয়া বেশ জাঁকিয়া উঠিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু নবীন বাগ্দীর স্ত্রী মতি বাগ্দিনী হন্তদন্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ায় সে-কথা তাহার বলা হইল না। মতির মুখে চোখে প্রচণ্ড উত্তেজনার উচ্ছ্বাস, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল—রাণীমা!

—কি রে? কি হয়েছে বাগ্দীবউ? সুনীতি শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—চরে কি আবার—

—চরে নয় মা; রংলাল মোড়লের একপাটি দাঁত লাথি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন রায়-হুজুর।

—সে কি? কেন?

—ওই চরের জমির লেগে মা। চরের জমি নিয়ে চাষীরা নাকি কলের সায়েবের সঙ্গে ষড় করেছিল। সায়েব আজ চর দখল করলে কি না!

সুনীতির মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। রংলালের মুখ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, নির্ব্বোধ দৃষ্টি, ঘোলাটে চোখ, পুরু ঠোঁটে বিনীত তোষামোদভরা হাসি;—আহা সেই মানুষকে।—টপটপ করিয়া চোখের জল মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল।

উমা বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে জমিদার-কন্যা জমিদার-বধূ হইলেও নবীন যুগের মেয়ে, তাহার উপর মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল অহীন্দ্রকে। মানুষের মুখে লাথি মারার কথা শুনিয়া সে যে কি বলিবে;—হয়ত কিছু বলিবে না, কিন্তু অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে, ক্ষুরধার মৃদু হাসি হাসিবে। সে বলিল—আমি এক বার ও-বাড়ী যাব মা।

সুনীতি বলিলেন—মানদা সঙ্গে যা মা। তুমি দেখ বউমা, আর যেন কোন উৎপীড়ন না হয় গরীবের উপর। ব'লো—ও-চর আমি চাই না, ও যাওয়াই ভাল।

উমা ও মানদা চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মতিও গেল। সাধ্যমত প্রহরিণীর কাজ করিয়া মতি স্বামীর কাজ করিবার চেষ্টা করে। প্রয়োজন হইলে লাঠি হাতে লইতেও লজ্জিত হয় না।

সুনীতি স্তব্ধ উদাস হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সর্ব্বনাশা চর! ঐ চরের জন্যই এত। তাঁহার মনে পড়িল, এই চর লইয়া দ্বন্দ্বের প্রথম দিন হইতেই রংলাল জড়িত আছে। খানিকটা জমির জন্য বেচারা চাষীর কি লোলুপ আগ্রহ! নবীনদের দাঙ্গার মোকদ্দমাতেও রংলাল জড়িত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়িয়া গেল একটা দিনের কথা। নবীনদের মোকদ্দমার সময়েই এক দিন তিনি চরটাকে যেন ঘুরিতে দেখিয়াছিলেন। এই বাড়ীটিকে কেন্দ্র করিয়া চক্রান্তের চক্র সৃষ্টি করিয়া চরটা ঘুরিতেছিল। সেটা কি আজও ঘুরিতেছে? নহিলে

ঐ নিরীহ চাষীর মুখ দিয়া এমন করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল কেন ?

তাঁহার ভাবপ্রবণ অনুভূতিকাতর মন শিহরিয়া উঠিল। না, ও-চরের সঙ্গে আর কোন সংস্রব তিনি রাখিবেন না! অহীনকে তিনি আজই পত্র লিখিবেন, সে আসুক—চর বিক্রী করিবার ব্যবস্থার জন্য সে আসুক। সে আজ পনর দিনের উপর পত্রও দেয় নাই। সে আজকাল কি যে হইয়াছে!

* * *

প্রাতঃকাল হইতেই রায় গুম হইয়া বসিয়াছিলেন।

ভোর-রাত্রে সদর হইতে মামলার সংবাদ লইয়া লোক ফিরিয়া আসিয়াছে; সমস্ত মামলাতেই জমিদার-পক্ষ পরাজিত হইয়াছেন। চর লইয়া সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়া নিস্পন্দের মত নীরবে তিনি বসিয়া রহিলেন। তাহার পরই সংবাদ আসিল কলের মালিক মোটর-লাঙল চালাইয়া চর দখল করিতেছে—এমন কি, হালে বন্দোবস্ত-করা চাষীদের জমি পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইতেছে। রায় সোজা হইয়া বসিলেন, আবার একটা সুযোগ মিলিয়াছে। চাষীদের সম্মুখে রাখিয়া আর এক বার লড়িবেন তিনি! নায়েব ঘোষকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—জলদি বাগ্দীদের আর কাহারদের তলব দাও। আর চাষীদের ডাকাও দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটিল। রায় আবার গোঁফে পাক দিতে আরম্ভ করিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষমান গুহাচারী অস্থির বাঘের মত বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময়েই রংলাল আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, ডাকিবার পূর্ব্বে সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রায় সস্নেহে বলিলেন—ওঠ্, ওঠ্, কোন ভয় নেই। আমি লাঠিয়াল দিচ্ছি, তোদের কিছু করতে হবে না, তোরা কেবল দাঁড়িয়ে থাকবি, দেখবি।

রংলাল ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—আমরা যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি হুজুর!

রায় চকিত হইয়া উঠিলেন, এই নির্ব্বোধদের তিনি ভাল করিয়াই জানেন, ইহাদের সকলের চেয়ে বড় নির্ব্বুদ্ধিতা এই যে, ইহারা নিজেদের ভাবে অতি বুদ্ধিমান, ভীষণ চতুর। বৈষয়িক জটিল বুদ্ধির প্রতি, কুটিল চাতুরীর প্রতি ইহাদের গভীর আসক্তি। সচকিত হইয়া রায় বলিলেন—কি করেছিস্ সত্যি ক'রে বল্ দেখি ? ছাড়, পা ছাড়। তিনি আবার চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

হাতের তালুর উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রংলাল বলিল—আজ্ঞে হুজুর, ঐ মজুমদারের ধাপ্পায় পড়ে—উনিই বললেন হুজুর—

—মজুমদার কি বললে ?

—টাকার ভাবনা কি ? আমি টাকা দোব।

—কিসের টাকা ?

—আজ্ঞে সেলামীর টাকা। আমাদের টাকা ছিল না হুজুর। উনিই আমাদিগকে টাকা দিয়েছিলেন। আমাদের 'বাপুতি' সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে দলিল ক'রে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—চরের জমি বন্দোবস্ত হয়ে গেলে এ দলিল ফেরত দিয়ে চরের জমি বন্ধক দিয়ে দলিল ক'রে দিতে হবে। এখন নতুন দলিলে সই করিয়ে নিয়ে বলছে হুজুর, জমি তোদের বিক্রী হয়ে গেল, এ দলিল কবলা দলিল।

অজগরের মত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রায় বলিলেন—হুঁ।

—হুজুর আমাদের কি হবে ?

—দলিল তোরা রেজিষ্ট্রী করিস নে।

—দলিল যে রেজেষ্টারী হয়ে গেল হুজুর। নইলে যে সাবেক বন্ধকী দলিল ফেরত-দিচ্ছিল না। রংলাল আবার ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

রায় রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত বসিয়া রহিলেন। এই নির্ব্বোধ অথচ কূটমতি অপদার্থগুলির উপর ক্রোধের তাঁহার আর সীমা রহিল না। তাঁহার জমিদার-মন হতভাগ্যদের নিরুপায় দিকটা দেখিতে পাইল না। হতভাগ্য অন্ধ বাঘের লেজে পা দিলে বাঘ তাহার অন্ধত্ব দেখিতে পায় না।

রংলাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, রায়ের কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার তাঁহার পা দুইটি

চাপিয়া ধরিল। আর রায়ের সহ্য হইল না, প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন, রংলালের মুখে সজোরে লাথি মারিয়া আপনার পা ছাড়াইয়া লইলেন। সেই আঘাতে রংলালের সম্মুখের দুইটা দাঁত উপড়াইয়া গিয়া তাহার নির্ব্বোধ মুখখানাকে রক্তাক্ত করিয়া দিল।

হেমাঙ্গিনী কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু উমা করিল। বাপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছি ছি ছি, এ কি করলেন বাবা? সে যাই হোক, সে তো মানুষ!

রায় নীরবে ঘরের মধ্যে একা পদচারণা করিতেছিলেন—তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন—মেয়ের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—পাপ করেছি মা। মানুষ আমি, মতিভ্রম হয়েছিল, কিন্তু রংলালের পায়ে ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত তো করতে পারব না।

এ-কথার উত্তরে উমা আর কিছু বলিতে পারিল না, সে যেন এতটুকু হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় ডাকিলেন—তারা—তারা মা!

উমা এবার লজ্জিত হইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—আপনি একটু বসুন বাবা, আমি বাতাস করি।

রায় হাসিলেন, কিন্তু কন্যার কথা উপেক্ষা করিলেন না—বসিলেন। বসিয়া বলিলেন—মানুষের দিন যখন শেষ হয় তখন এমনি ক'রেই মতিভ্রম হয়। আমাদের দিন শেষ হয়েছে মা।

উমা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—ও কি বলছেন বাবা?

—মরণের কথা বলছি না মা; আমাদের সুদিনের কথা বলছি। চাষীরা সব আমাদের বিপক্ষ হয়ে কলের মালিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অথচ এক দিন খুন করলেও তারা আমাদের বিপক্ষে কথা বলে নি; বিচার ব'লে মেনে নিয়েছে।

উমা চুপ করিয়া রহিল।

রায় বলিলেন—আর একটা কথা মুখ দিয়ে বের করতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে মা। অথচ তোর শ্বশুর-শাশুড়ীকে না বললেই নয়, বলতেই হবে। তুইই সে কথাটা ব'লে দিবি মা?

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া উমা বলিল—বলুন।

—চরের সমস্ত মোকদ্দমায় আমাদের হার হয়েছে উমা।

উমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বলব।

—আমার অনেক লজ্জা মা। জেদের বশে তোর শ্বশুরদের আমি অনেক অনিষ্ট ক'রে দিলাম। সম্পত্তি তো শুধু অহীন্দ্রেরই নয়—মহীন্দ্রও ফিরে আসবে। লজ্জা আমার তার কাছেই হবে বেশী। আমার ইচ্ছা কি জানিস? আমার ইচ্ছা আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি অহীন্দ্রকে উপলক্ষ ক'রে ওদের দু-জনকেই দিই। অহীন্দ্রের শ্বশুর-হিসেবে নয়, সুনীতির ভাই-সম্বন্ধ নিয়ে দিতে চাই।

উমা বলিল—বেশ তো, বিবেচনা ক'রে যা হয় করবেন। কিছুদিন যাক, নইলে ওঁরা ভাববেন আপনি ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন।

রায় হাসিয়া বলিলেন—কিছুদিন সময় আর আমার নেই মা। আমি আর সংসারে থাকব না, আমি কাশী যেতে চাই।

উমা মৃদু স্বরে বলিল—সংসারে হারজিত তো আছেই বাবা। তার জন্যে কাশী কেন যাবেন?

হেমাঙ্গিনী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে শরবতের গ্লাস। উমা আসিয়াছে এই সুযোগে তিনি রায়কে শরবৎ খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

রায় বলিলেন—আজ আহ্নিকে ব'সে জপ ভুলে গেলাম—মায়ের রূপ ধ্যান করতে পারলাম না! শুধু বললাম—চর, চর—মামলা, মামলা, আর ধ্যান করলাম—ঐ রংলাল আর কলওয়ালার মুখ! আর নয়। আর সংসার নয় মা, আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি, আমি কাশী যাব।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—বেশ, তাই হবে। কিন্তু সে তো আর এখুনি নয়। এখন শরবৎটা খাও দেখি।

* * *

চরের মামলায় পরাজয় হইয়াছে, চরটার সহিত সকল প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—সংবাদটা শুনিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। দুঃখের দীর্ঘ-

নিশ্বাস। অথচ এই কামনাই তিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও করিয়াছিলেন, শুধু কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই নয়—চর লইয়া দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবার পর হইতেই অহরহই তিনি এই কামনা করিয়া আসিয়াছেন। বার বার তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিলেন—ভালই হইয়াছে, ভাগ্যবিধাতা নিষ্ঠুর চক্রান্ত হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। কিন্তু স্মৃতির মমতা তাঁহাকে তাহা ভাবিতে দিল না। তাঁহার মহীন দ্বীপান্তরে গিয়াছে ঐ চরের জন্য; নবীন গিয়াছে ঐ চরের জন্য—তিনি নিজে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়াছেন ঐ চরের জন্য! সংসারে চরম দুঃখের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায় তাহার এক পরম মূল্য আছে।

আজ অহরহ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল মহীনকে। দিনান্তে সন্ধ্যার সময় তিনি বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চরের উপর আজ উচ্চরোলে বাজনা বাজিতেছে, আনন্দোন্মত্ত মানুষের কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। পশ্চিমদেশীয় কুলিদের ঢোলক-করতাল বাজিতেছে, সাঁওতালদের মাদল বাজিতেছে, আরও কি কি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি যেন শোনা যাইতেছে। কলের মালিক বোধ হয় বিজয়োৎসব জুড়িয়া দিয়াছে! তিনি ছাদে গিয়া উঠিলেন—ছাদ হইতে চর—কালিন্দীর গর্ভ পরিষ্কার দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্র ও কোলাহলের শব্দ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল—দূরে চরের উপর আলো জ্বলিতেছে, আলোর ঘটা আজ অনেক বেশী। কালিন্দীর শুষ্ক গর্ভে বালির উপর একটা আলোর সমারোহ; মশালের আলোর মত দুই-তিনটা আলো জ্বলিতেছে—রক্তাভ আলো। ক্ষুদ্র একটি জনতা—সেই জনতার মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়ে হাত ঘুরাইয়া, দেহ বাঁকাইয়া নানা ভঙ্গিতে নাচিতেছে।

—মা।

সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন—কে? পরক্ষণেই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—বউমা?

উমাই ডাকিতেছিল, সে বলিল—এই আলোয়ানখানা গায়ে দিন মা, বড় কনকনে হাওয়া দিচ্ছে।

সত্য, এবার শীতটা বেশ ঘন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুনীতি আলোয়ানখানি গায়ে দিয়া সস্নেহে বধূর দিকে চাহিয়া রহিলেন। উমা আজ মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিল, তাহার বাবা আজ সকালে যে বলিয়াছিলেন—'আমি জেদের বশে ওদের অনেক ক্ষতি ক'রে দিয়েছি'—সেই কথাটা তাহার মনের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। সে মাথা হেঁট করিল। অন্ধকারের মধ্যে সুনীতি উমার মুখ দেখিতে পাইলেন না বলিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সস্নেহেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—আর কিছু বলছ বউমা?

—না। বলিয়া উমা মন্থর পদক্ষেপে সিঁড়ির দরজা অতিক্রম করিয়া নীচে নামিয়া গেল। সুনীতির সম্মুখে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কাছারি প্রাঙ্গণের নারিকেল গাছগুলির মাথা—অন্ধকারের মধ্যে জটাজুটধারী তমোলোকবাসীদের মত শূন্যলোকে সভা করিয়া বসিয়া আছে, দীর্ঘ পাতাগুলির মধ্যে কি যেন গোপন কথার কানাকানি চলিতেছে। সুদীর্ঘশীর্ষ ঝাউগাছ দুইটা মর্ম্মন্তুদ বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

অকস্মাৎ সুনীতির মনে পড়িয়া গেল অহীনের কথা। বেশী দিন নয়, অল্পদিন পূর্ব্বেই এই ছাদে তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কেন, তুই দূরে চলে যাচ্ছিস, অহীন? আমরা যে তোর নাগাল পাচ্ছি'নে বাবা? তাঁহার আজিকার বিচলিত মন একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল।

অহীন আজ পনের দিন পত্র দেয় নাই। পূজার ছুটির পর সেই গিয়াছে—আর আসে নাই। যে-পত্র সে লেখে সেও যেন কেমন-কেমন, মাত্র দুই-তিন ছত্র। উমা চলিয়া গেল—তাহার মন্থর গতি এখন একটা অর্থ লইয়া জাগিয়া উঠিল। উমা শুকাইয়া গিয়াছে! তাহাকেও কি সে এমনি ভাবে পত্র লেখে? সেও কি তাঁহারই মত তাহার নাগাল পায় না? দ্রুত ছাদের সিঁড়ির মুখে আসিয়া তিনি ডাকিলেন—বউমা! বউমা! উমা!

—মা!

উমা আসিয়া আবার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

—অহীন তো তোমাকে পত্র দেয় নি বউমা?

উমা নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

—অহীন কেন এমন হ'ল? আমার মন যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে।

আজ সমস্ত দিনটা উমার মনও বিচলিত হইয়াছিল, সে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। অন্ধকারের মধ্যে কম্পনত্রস্ত দেহ দেখিয়া উমার কান্না অনুমান করিয়া সুনীতি উমার মুখে হাত দিয়া চমকিয়া উঠিলেন—বলিলেন—কাঁদছ কেন বউমা? কি হয়েছে মা? আমাকে বলবে না?

উমা আর গোপন করিতে পারিল না; নূতন যুগের মেয়ে সে—আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সহিত পরিচয়ের ফলে—অহীনের যে-কথা সে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, কঠিন উদ্বেগ আশঙ্কা সহ্য করিয়াও গোপন করিয়া রাখিয়াছিল—আজিকার এই বিচলিত চরম মুহূর্ত্তটিতে সুনীতির কাছে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সবটা সে জানিত না, যতটুকু জানিত ধীর কণ্ঠে ততটুকুই বলিল।

সুনীতির সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত ব্যাপারটা না বুঝিলেও—তাহা যে ভয়ঙ্কর কিছু ইহা তিনি অনুভব করিলেন; ব্যাকুল আশঙ্কায় অধীর হইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—এরা কি চায় মা?

—ঠিক জানি না, তবে মনে হয় এরা চায়—মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন ভেদ থাকবে না, জমি ধন সব সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেবে। সেই জন্যে তারা বিপ্লব ক'রে এ রাজত্ব উল্টে দিতে চায়। সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

সুনীতির মনে পড়িল; অহীন্দ্র তাঁহাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিল—তিনি তাহা বুঝিতে পারেন 'নাই। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর উমা বলিল—সে আজ আর কথাগুলি গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না—বলিল—সাঁওতালদের চরের জমি কেড়ে নেওয়ার পর তারা যেদিন চর থেকে উঠে চলে গেল, সেদিন আমায় বলেছিলেন—এ পাপ আমাদের পাপ। পুরুষ-পুরুষ ধ'রে এই পাপ আমাদের জমা হয়ে আসছে, কলের মালিক একা এর জন্যে দায়ী নয়। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে। আমি সেদিন বুঝতে পারি নি মা। এবার পুজোর সময় আমি বুঝতে পারলাম; স্যুটকেস খুলে কাপড় গোছাতে গিয়ে—ক'খানা চিঠি থেকে বুঝতে পারলাম—আর সে বলিতে পারিল না—অনর্গল ধারায় চোখের জল তাহার মুখ ভাসাইয়া ঝরিতে আরম্ভ করিল।

অনেকক্ষণ পর সুনীতি বলিলেন—চল বউমা, দাদার কাছে যাই। তিনি ভিন্ন কে আর উপায় করবেন?

উমা অতি ব্যগ্র কাতর ভাবে বলিয়া উঠিল—না না, মা। তাতে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হ'তে হবে, সমস্ত দল ধরা পড়ে যাবে মা। না না!

সুনীতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উমাও নীরব।

ওপারের চরে বাজনা উচ্ছৃঙ্খলতায় উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। নদীর চরের উপর লাল আলোর মধ্যে সেই দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েটা উন্মত্ত আনন্দে যেন তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। লম্বা ফালি সর্ব্বনাশা চরটা যেন ঐ দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েটার রূপ ধরিয়া সর্ব্বনাশীর মত নাচিতেছে!

৩৪

নিতান্ত বিস্মৃতিবশতই খান-দুই ইস্তাহার এবং একখানা পত্র স্যুটকেসের নীচে-পাতা কাগজের তলাতে রহিয়া গিয়াছিল; ঝাড়িয়া মুছিয়া স্যুটকেস গুছাইতে গিয়া উমা সেগুলি পাইয়াছিল। লাল অক্ষরে ছাপা ইস্তাহারখানা পড়িয়াই উমা ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তার পর সেই পত্রখানা—তাহার মধ্যে সব সুস্পষ্ট। চিঠির শেষের কয়টি লাইনের পাশে অহীন দাগ দিয়া লিখিয়াছে, "আবছা অন্ধকারের মধ্যে সাঁওতালেরা চর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি চোখে দেখিয়াছি।"

উমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে একে একে সমস্ত কথাই সুনীতিকে প্রকাশ করিয়া বলিল। বলিতে পারিল না কয়েকটি কথা; অহীন্দ্র ঠিক এই সময়েই আসিয়া পড়িয়াছিল, উমার হাতে কাগজ ও চিঠি দেখিয়া সে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল—এ তুমি কোথায় পেলে?

উমা যেমন ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া চিঠিখানা পড়িতেছিল

তেমনি ভঙ্গিতেই দাঁড়াইয়া ছিল—ঠোঁট দুইটি কেবল থর থর করিয়া কাঁপিয়াছিল, উত্তর দিতে পারে নাই।

অহীন্দ্র হাসিয়াছিল, হাসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বলিয়াছিল, "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" এই নবজাগরণের ক্ষণে তুমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির লেখাপড়া-জানা মেয়ে হয়ে কেঁদে ফেললে উমা? নাঃ, নিতান্তই তুমি বাঙালিনী দেখছি! তার পর সে তাহাকে বলিয়াছিল—লেনিনের সহধর্ম্মিণীর কথা, রাশিয়ার বিপ্লবের যুগের মেয়েদের কথা।

উমার তরুণ রক্তে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। স্বামীর সাধনমন্ত্র নিজেরও ইষ্টমন্ত্রের মত সে এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ একটি বিচলিত মুহূর্ত্তে স্বামীর বেদনা-বিচলিত মায়ের কাছে সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, সব প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

সুনীতি স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন।

তিনি যেন পাথর হইয়া গেলেন। বজ্রগর্ভ মেঘের দিকে যে স্থির ভঙ্গিতে পাহাড়ের শৃঙ্গ চাহিয়া থাকে সেই ভঙ্গিতে অপলক দৃষ্টিতে তিনি ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

* * *

মাস দুয়েক পর একদা সে-বজ্র নামিয়া আসিল।

উমার হাত ধরিয়া সুনীতি নিত্যই ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিকারের উপায় কিছু দেখিতে পান নাই। অহীন্দ্রকে বাড়ী আসিবার জন্য বার বার আদেশ অনুরোধ মিনতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু অহীন্দ্র আসে নাই, কোনও উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই। অমল জানাইয়াছে—অহীন্দ্র কোথায় গিয়াছে সন্ধান করিয়াও সে জানিতে পারে নাই; ফিরিলেই সে খবর দিবে। কোনও বন্ধুর সহিত সে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে।

সুনীতি ও উমা নীরবে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া অবশ্যম্ভাবীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হেমাঙ্গিনী বা ইন্দ্র রায়ের নিকটেও গোপন করিয়া রাখিলেন। ওদিকে রায় কাশীযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে ব্যস্ত;—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবারও অবসর তাহার নাই। হেমাঙ্গিনী স্বামীর তাড়নায় ব্যস্ত, তা ছাড়া তিনি যেন বড় লজ্জিত, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অনেক অনিষ্ট রায় করিয়া দিয়াছেন।

সেদিন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি; রাত্রি প্রথম প্রহর শেষ হইয়া আসিয়াছে। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা অকালবর্ষা দেখা দিয়াছিল, আকাশে সেই অকালবর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ চারিদিকে জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে সচল দীর্ঘাকৃতি অন্ধকারপুঞ্জের মত কালিন্দীর বালি ভাঙিয়া চলিয়া আসিতেছিল অহীন্দ্র। গায়ে একটা বর্ষাতি জামা, মাথায় বর্ষাতি টুপি। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া এই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া সে তাহার মা ও উমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। পুলিস তাহাদের ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মহাযুদ্ধের পর তখন ভারতের গণ-আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে, নূতন অধ্যায়ের সূচনায় রাশিয়ার আদর্শে সমাজতন্ত্রবাদী যুবক-সম্প্রদায়ের এক গুপ্ত ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। ভারতের নানা স্থানে খানাতল্লাসী এবং ধরপাকড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অহীন ছিল ইউ. পি.র কোন একটা শহরে, সেখান হইতে আত্মগোপন করিয়া সে চলিয়া আসিতেছে। আবার আজই রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। দৃঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে বালি ভাঙিয়া কূলে আসিয়া উঠিল।

এ কি? এ তো রায়হাটের ঘাট নয়—এ যে চরের ঘাট। পাকা বাঁধানো রাস্তা, ওই তো অন্ধকারের মধ্যেও সুদীর্ঘ চিমনিটা, ওই বোধ হয় বিমলবাবুর বাংলোয় একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে! কুলি-ব্যারাকের সুদীর্ঘ ঘরখানার খুপরির মত ঘরে ঘরে স্তিমিত আলোর আভা; যেন একটা স্তব্ধগতি ট্রেনের মত মনে হইতেছে। রায়হাট ওপারে। সে ফিরিল কিন্তু আবার দাঁড়াইল। অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল—কাশ ও বেণাঘাসের জঙ্গলে ভরা সেই চরখানি, জনমানবহীন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। কত দিন নদীর ওপার হইতে দাঁড়াইয়া সে দেখিয়াছে। তার পর এক দিন এইখানেই সরু একটি পথের উপর দিয়া সারিবদ্ধ

কালো মেয়ের দলকে বাহির হইতে দেখিয়াছিল, মাটির ঢিপির ভিতর হইতে যেমন পিপীলিকার সারি বাহির হয় তেমনি ভাবে। সত্য সত্যই উহারা মাটির কীট! মাটিতেই উহাদের জন্ম, মাটি লইয়াই কারবার, মাটিই উহাদের সব। সেদিন সঙ্গে ছিল রংলাল। সেই সারির মধ্যে সারীও নিশ্চয় ছিল মুকুটের মধ্যস্থলের কালো পাখীর দীর্ঘ পাখার মত। এই পথ দিয়াই সে চরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিল—আদিম বর্ব্বর জাতির বসতি, মাটির কীটদের মাটির গড়া বাসস্থান। সচল পাহাড়ের মত কমল মাঝি—বৃদ্ধা মাঝিন—প্রায়-উলঙ্গ, কালো পাথরে গড়া মানুষের দল। চিত্রিত বিপুলদেহ মৃত অজগরের মাংসস্তূপ। রাশীকৃত কুরচির ফুল—সাঁওতালদের মেয়েদের নাচ। মাটির উপর রংলালের কি প্রলোভন! নবীন বাগ্দীর দলকেও মনে পড়িল। জমিদারদের অলস উদরের লোলুপ ক্ষুধা! মনে পড়িল তাহার দাদাকে। ননী পালের মৃত্যু। শ্রীবাস মজুমদারের ষড়যন্ত্র। দাঙ্গা—নবীনের দ্বীপান্তর। কলওয়ালা বিমলবাবু। চোখে তাহার জ্বলিয়া উঠিল—সরলা সাঁওতালদের মেয়ে সারীকে জোর করিয়া করায়ত্ত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিল—সাঁওতালদের জমি আত্মসাৎ করিল; তাহারা নিজেরা—তাহার শ্বশুর—তাহার বাবা—বাকীটুকু কাড়িয়া লইলেন; রাত্রিশেষের অস্পষ্ট আলোকময় অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো মানুষের সারি—কাঁধে ভার, মাথায় বোঝা—সঙ্গে গরু-ছাগল-ভেড়ার পাল—নিঃশেষে ভূমিহীন হইয়া চলিয়া গেল। যুগে যুগে এমনি করিয়াই উহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্রমে কাল-সমুদ্রের কিনারার উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অহীন্দ্রের চোখ অন্ধকারের মধ্যে শ্বাপদের মত জ্বলিয়া উঠিল। ঐ বিমলবাবুটাকে—পকেট হইতে ছোট কালো ভারী একটা বস্তু বাহির করিল। ছয়টা চেম্বার বোঝাই-করা রিভলভার! বিকারগ্রস্ত রোগীর মত অস্থির অধীর হইয়া উঠিল সে। এক বার সতর্ক দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল। আশেপাশে সম্মুখে—চরখানা তেমনি, এখানে-ওখানে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছে মাত্র, মানুষ দেখা যায় না; পিছনে কালিন্দীর গর্ভেও কেহ নাই—ওপারে রায়হাট স্তব্ধ অন্ধকার—শুধু গাছপালার মাথার উপর একটা আলোর ছটা—একটা বাড়ীর খোলা জানালায় আলো! তাহাদেরই বাড়ী, হ্যাঁ—তাহাদেরই বাড়ীর জানালার আলো! আলোকিত ঘরের মধ্যে দুটি মানুষ; স্ত্রীলোক; মা আর উমা! সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা আসিয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন—স্পষ্ট মা! কিছুক্ষণ পর রিভলভারটি পকেটে পুরিয়া সে চরকে পিছনে ফেলিয়া রায়হাট অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইল। পুরানো গ্রামের বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন পথ অতিবাহন করিয়া সে সেই আলোকিত জানালার তলে আসিয়া দাঁড়াইল—অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট স্বরে ডাকিল—মা!

—কে? কে? শঙ্কিত অথচ ব্যগ্র কণ্ঠস্বরে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন।

—মা!

—অহীন!

—হ্যাঁ।

—যাই যাই—দাঁড়া।

মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া রেন-কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে মৃদু হাসিল—ছলনা করিয়া মাকে ভুলাইবার জন্যই হাসিল।

সুনীতি অপলক চক্ষে অহীনের দিকে চাহিয়াছিলেন—চোখে জল ছিল না, কিন্তু ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—অহীনের হাসি দেখিয়া তাঁহার কম্পিত অধরেও একটি অস্পষ্ট বিচিত্র হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—আমি সব শুনেছি অহীন!

অহীন চমকিয়া উঠিল।

সুনীতি বলিলেন—বউমা আমাকে সব বলেছেন রে।

—ও বাড়ীর ওঁরা? তা হ'লে কি—তোমরাই—?

তাহার সন্দেহ হইল হয়তো প্রাচীন জমিদার-বংশ তাহাকে রক্ষার্থে রাজভক্তি দেখাইয়া পুলিসের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

—না, আর কেউ জানে না। আমাকে না ব'লে

বউমা বাঁচবে কি ক'রে বল্? এত দুঃখ সে কি লুকিয়ে রাখতে পারে? কিন্তু এ তুই কি করলি বাবা?

কোটের শেষ বোতামটা খুলিয়া অহীন মৃদু হাসিয়া বলিল,—আজই রাত্রে আমাকে চলে যেতে হবে মা, পুলিস আমাদের দলের সন্ধান পেয়ে গেছে। সুনীতি সমস্ত শুনিয়াছেন জানিয়া সে আর ভূমিকা করিল না, সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না—একেবারে কঠিনতম দুঃসংবাদটা শুনাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। এক বার মৃদু হাস্যমুখে মুখ ফিরাইয়া উমার দিকে চাহিল। খাটের বাজু ধরিয়া উমা দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাহাকে বলিল—একটু চা খাওয়াও দেখি উমা! সঙ্গে কিছু খাবার—খিদে পেয়ে গেছে।

* * *

সুনীতি মৃদু বলিলেন—তুই যদি বিয়ে না করতিস অহীন, আমার কোন আক্ষেপ থাকত না।

অহীন্দ্র উত্তরে উমার দিকে চাহিল, উমার মুখে বেদনার্ত ম্লান হাসি; কিন্তু কোন অভিযোগ সেখানে ছিল না, তাহার জলভরা চোখে স্বচ্ছ জলতলে বাড়ব বহ্নিদীপ্তির মত তরুণ প্রাণের আত্মত্যাগের বাসনা জ্বল জ্বল করিতেছে। অহীন্দ্র মাকে বলিল—উমা কোন দিন সে কথা বলবে না মা; উমা এ-যুগের মেয়ে।

সুনীতি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর বলিলেন—একটু বিশ্রাম ক'রে নে বাবা, আমি ঠিক ভোর বেলা তোকে জাগিয়ে দেব। তিনি উঠিয়া গেলেন, বধূকে বলিলেন—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও বউমা।

উমা দরজা বন্ধ করিয়া অহীনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অহীন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার ভয় হইতেছিল—মুহূর্তে উমা হয়ত ভাঙিয়া পড়িবে।

কথা বলিল উমা নিজে, বলিল—শুয়ে পড়, একটু ঘুমিয়ে নাও।

অহীন্দ্র একান্ত অনুগতের মতই শুইয়া পড়িল। উমা তাহার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া যেন তাহাকে ঘুম পাড়াইতে বসিল।

ভোরবেলা, একটু রাত্রিও তখন ছিল—সুনীতি আসিয়া ডাকিলেন—বউমা, বউমা।

উমা কখন ঘুমে ঢলিয়া অহীন্দ্রের পাশেই শুইয়া ঘুমাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও উদ্বেগকাতর মন জাগিয়া ছিল—দুই বার ডাকিতেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে অহীন্দ্রকে ডাকিয়া তুলিল। অহীন্দ্র উঠিয়া জানালা খুলিয়া একবার বাহিরটা দেখিয়া লইল, তার পর একবার গভীর আবেগে উমাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার কম্পিত অধরে প্রগাঢ় একটি চুম্বন করিল; কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্য—পরমুহূর্তেই সে জামা পরিয়া জুতার ফিতা বাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উমা দরজা খুলিয়া দিল, সুনীতি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, অহীন্দ্র আর কাহারও মুখের দিকে চাহিল না পর্য্যন্ত, হেঁট হইয়া মায়ের পায়ে একটি প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহির হইয়া গেল—দরজায় দাঁড়াইয়া সুনীতি ও উমা দেখিলেন—রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারের মধ্যে অহীন মিশিয়া গেল।

কিন্তু বেলা দশটা না হইতেই অহীন আবার ফিরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে পুলিস; রেল-স্টেশনে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইউ. পি. হইতে পুলিস জেলা-পুলিসকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। পুলিস এখন বাড়ীঘর খানাতল্লাস করিয়া দেখিবে।

অভিযোগ গুরুতর—রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রাজকর্ম্মচারী হত্যার ষড়যন্ত্র।

* * *

দশটা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত খানাতল্লাসী করিয়া পুলিসের কাজ শেষ হইল। ইন্দ্র রায়ের বাড়ীও খানাতল্লাস হইয়া গেল। বাড়ীর আশেপাশে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও চোখই শুষ্ক ছিল না, হ্যাণ্ডকাফ দিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া অহীনকে লইয়া যাইতে দেখিয়া সকলেরই চোখ সজল হইয়া উঠিল। তাহার মধ্যে অঝোর ঝরে কাঁদিতেছিল কয়েক জন—মানদা, মতি বাগ্দিনী—প্রিয়জনবিয়োগে শোকার্ত্তের মতই তাহারা কাঁদিতেছিল; আর কাঁদিতেছিল যোগেশ মজুমদার।

লজ্জা এবং অনুতাপের তাহার আর সীমা ছিল না, সমস্ত কিছুর জন্য সে অকারণে আপনাকে দায়ী করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। অচিন্ত্য-বাবু একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া বেশ স্ফুটভাবেই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিলেন—এই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দুর্ব্বল মানুষটি কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না! রংলালও কাঁদিতেছিল। কেবল একটি মানুষ ক্রোধভরে আস্ফালন করিতেছিল—হুঁ হুঁ বাবা—এয়ার্কি—গবরমেণ্টোর সঙ্গে চালাকি! সে শূলপাণি—সদ্য গাঁজা টানিয়া অভিজাত-কুলধ্বজটি জ্ঞাতিশত্রুনিপাতের তৃপ্তিতে আস্ফালনমুখর হইয়া উঠিয়াছে।

পুলিস অহীন্দ্রকে লইয়া চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী আছাড় খাইয়া পড়িলেন, উমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, চোখভরা জল আঁচলে মুছিয়া সে মাকে ডাকিল—ওঠ মা! কেঁদ না!

হেমাঙ্গিনী মুখ তুলিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

ইন্দ্র রায় মাথা নত করিয়া পায়চারি করিতেছিলেন। রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর মিলিত জীবন-পথ আবার ভাঙিয়া গেল! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ডাকিলেন ইষ্টদেবীকে—তারা—তারা মা! তার পর বলিলেন—ওঠ গিন্নী, ওঠ!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—ওগো, আর নয়—তুমি কাশী যাবে বলছিলে—কাশী চল।

—যাব। অহীনের বিচার শেষ হোক। মা যে বাধা দিলেন। উমা, তোর শাশুড়ী কোথায় গেলেন দেখ্ মা!

সুনীতি মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া মাটির প্রতিমার মতই পড়িয়াছিলেন—মৃদু নিশ্বাসের স্পন্দন ছাড়া এতটুকু আক্ষেপ সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কোথাও ছিল না; মহী যেদিন আত্মসমর্পণ করে সেদিনও ঠিক এমনি ভাবেই তিনি পড়িয়াছিলেন।

সম্মুখে খাটের উপর রামেশ্বর বসিয়া ছিলেন পাথরের মত।

গভীর রাত্রি।

রামেশ্বর তেমনি পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া ছিলেন। তেমনি দৃষ্টি তেমনি ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে তেমনি স্বল্প আলোক, আলোক-পরিধির চারি পাশে তেমনি নিথর অন্ধকার। সুনীতি তেমনি উপুড় হইয়া মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন। উমাকে হেমাঙ্গিনী লইয়া গেছেন, মানদা নীচে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে।

সহসা গিয়া রামেশ্বর বলিলেন—জল। শুষ্ক কণ্ঠ হইতে রব বাহির হইল না—কিন্তু ভাষা বোঝা গেল।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন, মনে তাঁহার অনুতাপ হইল—আজ রামেশ্বরের খাওয়া পর্য্যন্ত হয় নাই। উঠিয়া তিনি দেখিলেন, উমা জলখাবার সাজাইয়া কোণের টেবিলের উপর নিয়মমত রাখিয়া গিয়াছে। সুনীতি জলখাবারের থালা ও জলের গ্লাসটি আনিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—খাও কিছু; আমি ভুলে গেছি। মনে করতে পারি নি।

জলের গ্লাসটি শুধু তুলিয়া লইয়া নিঃশেষে পান করিয়া রামেশ্বর খাদ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—না।

সুনীতি এতক্ষণে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রামেশ্বর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন—অহীনের কি ফাঁসি হবে?

আর্ত্তস্বরে সুনীতি বলিয়া উঠিলেন—না না, সে তো খুন করে নি—বিপ্লবের, খুনের ষড়যন্ত্র করেছিল—খুন তো করে নি।

রামেশ্বর বলিলেন—তোমার পুণ্য, উমার ভাগ্য তাকে বাঁচিয়েছে।

সুনীতি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রামেশ্বর বলিলেন—আচ্ছা ওরা আমাকে সাজা কেন দিক না; অহীন তো আমারই ছেলে। দোষ তো আমারই।

আবেগপীড়িত কণ্ঠে সুনীতি বলিলেন—না না, আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট। তোমার দোষ নয়, আমার ভাগ্যের দোষ! আমার গর্ব্বের দোষ!

অতি ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন—না।

তারপর বহুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন—জান না তুমি, কেউ জানে না। আমারই রক্তের দোষ। ছায়া-

মূর্ত্তির মত মৃদু সঞ্চালনে হাত তুলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐখানে তোমার দিদিকে, রাধারাণীকে আর আমার প্রথম সন্তানকে গলা টিপে মেরেছিলাম।

সুনীতি আতঙ্কে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রামেশ্বর বলিতেছিলেন—এক দিন দেখলাম রায়-বাড়ীতে রাধারাণী সুন্দর একটি ছেলের সঙ্গে হাসছে। সে তার মাসতুত ভাই। আমার চরিত্রদোষ ছিল কি না; আমার সন্দেহ হ'ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—সংসারের এই নিয়ম—'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।' যে অন্ধ সে পৃথিবীকে অন্ধকারই দেখে, এ প্রকৃতির নিয়ম। রামেশ্বর নীরব হইলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—ছেলেটা হ'ল—তার চোখ-চুল কালো হ'ল—আমাদের মত পিঙ্গল হ'ল না। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ঠিক মনে হ'ল ছেলেটা তার মত দেখতে। এক দিন শুয়ে ছিল ছেলেটা—গলা টিপে দিলাম।

সুনীতি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—না না না। ব'লো না—ব'লো না!

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পর আবার অকস্মাৎ বলিলেন—কিন্তু রাধারাণী বুঝতে পেরেছিল। হয়ত দেখেছিল। সে কাঁদলে না। শুধু বললে, যে চোখে তুমি এমন 'কু' দেখলে—ঐ চোখ তোমার অন্ধ হয়ে যাবে।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—সে কাউকে কিছু বললে না, বাপের বাড়ী গেল না; এক দিন কাউকে কিছু না ব'লে কাশী যাবে ব'লে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল; একাই গিয়েছিল। আমি সেই রাত্রেই স্টেশন থেকে ফিরিয়ে এনে—ঐখানে গলা টিপে—। যখন তার গলা টিপে ধরলাম—সে অভিশাপ দিলে—শুধু চোখ নয়—ওই দুই হাতেও তোমার কুষ্ঠ হবে।

সুনীতির যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে, স্থান-কাল-পাত্র সব ঝাপসা হইয়া গিয়াছে; বিহ্বল দৃষ্টিতে তিনি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, নির্ব্বোধের মত তিনি এবার বলিলেন—তোমার তো কই কুষ্ঠ হ'ল না? চোখ তো অন্ধ হয় নি?

—হয়েছিল; ভাল হয়ে গেল। মহীন আর অহীন ভাল ক'রে দিলে। একটি হাত ও একটি চোখ দেখাইয়া বলিলেন—এইটে অহীন আর এইটে মহীন। তার পর মৃদুস্বরে বলিলেন—তোমার গর্ভের দোষ নয়—আমারই রক্তের দোষ। জান সুনীতি, আমাদের বংশ পাপের বংশ। নবাবরা দেওয়ালে পুঁতে মানুষ মারত। আমার কিন্তু সব পাপ নষ্ট হয়ে গেল। সব রোগ ভাল হয়ে গেল।

সুনীতি নীরবে বসিয়া রহিলেন, সুতা-কাটা ঘুড়ির মত মন তাঁহার জীবনকেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আকর্ষণ করিতে আর কিছুতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরই বাহিরে পাখীরা কলরব করিয়া প্রত্যুষ ঘোষণা করিয়া দিল। রামেশ্বর চকিত হইয়া বলিলেন—ভোর হয়ে গেল? বলিতে বলিতে বিছানা হইতে নামিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, বলিলেন-নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে—। আকাশের বার্ত্তা বহন করিয়া মৃত্তিকার বুকে লক্ষ লক্ষ যোজন অতিক্রম করিয়া উদয়াচল হইতে ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, সমস্ত দেখা যাইতেছে, জীর্ণ রায়হাট, শীতের শীর্ণা কালিন্দী, ওপারের চর—আকাশে উদ্ধত চিমনী, কলের সারি সারি অট্টালিকা—প্রশস্ত সুগঠিত পথ, লোকজনে ঐশ্বর্য্যময়ী চর।

চরটা চোখে পড়িতেই সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন। সর্ব্বনাশা চর! ব্যাকুলভাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি, তুমি কি, আমার সতীনের দেহ ওই—ওই—ওই চরে পুঁতেছিলে?

সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া রামেশ্বর বলিলেন—না তো; বাড়ীতে কূয়োর মধ্যে। সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

সুনীতি বিহ্বল বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—তবে? দিশাহারা বিহ্বল মনে উদ্ভট চিন্তা, উদ্ভট প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল! সতীনের কঙ্কালের উপর তো চরটা গড়িয়া উঠে নাই, তবে কেন এমন হইল?

রামেশ্বর সে-কথায় কান দিলেন না—মুখ ফিরাইয়া আপনার দুটি হাত শূন্যলোকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। তখন দিগন্তশিখরে সূর্য্য দেখা দিয়াছে, আরক্তিম আলোক অরূপণ দীপ্তি ও উত্তাপ লইয়া রামেশ্বরের হাতের উপর ছড়াইয়া পড়িল। হাতের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর বলিলেন—আঃ কোন দাগ নেই—একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

অস্থিচর্ম্মসার রক্তহীন বিবর্ণ দুখানি হাত।

চরটার দিকে চাহিয়া সুনীতি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার বিহ্বল মনে তখন নূতন প্রশ্ন উঠিয়াছে—তবে কি চরটা লইয়া হানাহানি রক্তপাত আজও শেষ হইল না?

সমাপ্ত

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.

[আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে নিজে জীবনের স্মৃতি আলোচনা করার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু যে একটি বৎসর আমি শৈশবে শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করিয়াছি আমার নিকট তাহা অমূল্য। যাঁহাদের সংস্রবে আসিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছিলাম, তাঁহারা প্রায় সকলেই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের স্মৃতির সৌরভ আমার জীবনে বিনষ্ট হয় নাই এবং শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে তাঁহারা ভুলিবার মত মানুষ নহেন। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য আমার জীবন-গ্রন্থের সেই প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করিবার চেষ্টা করিব।]

আমার বয়স তখন ছয় বৎসর। সালের খবর রাখি না, তবে মনে পড়ে আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম সেই সময়ে গুরুদেবের "নৈবেদ্যে"র কয়েকটি গান আমাদের সর্ব্বপ্রথম শুনিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তখন শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের বাড়ী ছাড়া একটি মাত্র পাকা ইমারৎ ছিল। উহার সম্মুখভাগে "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম" স্পষ্ট অক্ষরে খোদিত ছিল। আশ্রমের সংলগ্ন বৃক্ষরাজির অন্তরালে চারিদিকে তখন মাঠ ধূ ধূ করিত।

মনে পড়ে, আমার জ্যাঠামহাশয়, স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়কে আজও বাংলা দেশ ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার ধর্ম্মচিন্তা, রাষ্ট্রীয় প্রয়াস ও শিক্ষার আদর্শ এত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার জীবনকে নানাদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিল যে তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আমি কিন্তু এ-সব কিছুই বুঝিতাম না। আমি শুধু জানিতাম, তিনি আমার জ্যাঠামহাশয়। তিনিও হয়ত আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন যে এই শিশুকে যথার্থ শিক্ষার ন্য পারিবারিক বন্ধভূমি হইতে সরাইয়া আনিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রশস্ত ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দেওয়া তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। তাই এক দিন বর্ষাকালে সন্ধ্যার কিছু পরেই, উপাধ্যায় মহাশয়ের হাত ধরিয়া আমি সেই অল্প বয়সে আশ্রমে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বেশ মনে পড়ে, তখন আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ছড়াইয়া থাকিলেও জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কিরণে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম পুলকিত হইতেছিল, আশ্রমের সম্মুখে মাত্র জনকয়েক ছাত্র ও শিক্ষকে পরিবেষ্টিত হইয়া গুরুদেব গান গাহিতেছিলেন। আমি জ্যাঠামহাশয়ের হাত ছাড়িয়া অবাক্ হইয়া গুরুদেবকে দেখিয়াছিলাম। তার পরই এমন এক জনের স্নেহস্পর্শ আমি লাভ করিয়াছিলাম যাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। আমার জীবনের তিনিই প্রথম মাষ্টারমহাশয়, স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়। ঘরছাড়া শিশুকে তিনি বুকের মধ্যে জড়াইয়া লইয়াছিলেন এবং সে-রাত্রে যাহা কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল, জননীর ন্যায় তিনি সমস্তই নিষ্পন্ন করিয়া আমাকে রাত্রির মত বিশ্রাম দিয়াছিলেন।

পর দিন যখন শান্তিনিকেতনে প্রভাত হইল সে আমার জীবনে এক নূতন প্রভাত। ঘুম ভাঙিতেই অনুভব করিলাম, আমার মা-বাবা কেহই আমার কাছে নাই। জ্যাঠামহাশয় নিকটেই কোথাও ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কাছে পৌঁছান আমার পক্ষে শক্ত, কারণ জ্যাঠামহাশয় নিজে আমাদের কাছে না আসিলে তাঁহাকে নিকটে পাওয়া আমাদের পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। কাজেই বুঝিলাম, আমি একা। কিন্তু মানুষ যখন নিতান্তই একা বোধ করে, তখনই সে সাথী পায়। আজও শান্তিনিকেতনে নূতন বালকবালিকাগণ যেমন নিজ নিজ সঙ্গী খুঁজিয়া লইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিয়া থাকে আমার নিকটেও সেদিন সেই পথ খোলা ছিল। আমার সময় শান্তিনিকেতনে মাত্র দশ-বারো জন ছাত্র ছিলেন বলিয়া আমার মনে পড়ে। বয়সে সব চেয়ে বড় ছিলেন স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহাদের সহিত মিশিতে আমরা সাহস পাইতাম না, যদিও তাঁহারা অবসর

বা সুবিধা পাইলেই আমাদের সঙ্গে হাস্যকৌতুক করিতেন ও কথাবার্ত্তা বলিতেন। আশ্রমের মধ্যে আমি সব চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম। আমার সমবয়সী অথবা কয়েক মাসের মাত্র ছোট আর একটি ছাত্র ছিল, গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শমীন্দ্রনাথ। জগদানন্দবাবু যেমন আমার প্রথম মাষ্টারমহাশয়, শমী সেইরূপ আমার জীবনের প্রথম বন্ধু। সে বড় লাজুক ছিল। আমার তাহাকে খুব ভাল লাগিত। আমার মনে হয়, আমি তাহাকে যত ভালবাসিতাম সে আমাকে তার চেয়েও অনেক বেশী ভালবাসিত। শান্তিনিকেতনে আমার প্রথম যেরূপ নির্জ্জন ও একাকী বোধ হইত, তাহাতে শমীর সঙ্গটুকু আমার সমস্ত মনপ্রাণকে ভরিয়া তুলিয়াছিল। আমরা দুই জনেই পড়াকে কতকটা খেলার মত দেখিতাম এবং খেলাতে পড়ার চেয়ে বেশী আনন্দ পাইতাম। বোধ করি তাই সকালে পড়ার সময়, জগদানন্দবাবু আমাদের কত গল্প, কত কবিতা শুনাইতেন; তিনিই পড়িতেন, আমরা শুধু শুনিয়া যাইতাম—কতক বুঝিতাম কতক বুঝিতাম না, কতক মনে রাখিতাম কতক রাখিতাম না। জগদানন্দবাবু আমাদের পড়ার ক্ষুধা মিটাইয়া আমাদের সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া যে অসীম আনন্দের পারে আমাদিগকে পৌছাইয়া দিতেন, তাহাই আমার ছাত্র-জীবনের সবচেয়ে মধুময় স্মৃতি। আজও মনে পড়ে, যখন দুপুরবেলা হাতের লেখা লিখিয়া তাঁহার কাছে দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতাম, তখন তিনি কখনও লক্ষ লক্ষ কখনও বা কোটি কোটি নম্বর আমাদিগকে দিতেন। আমরা তখন এক-শ'র বেশী অঙ্ক অনায়াসে পড়িতে পারিতাম না। তাই প্রতিদিনই তাঁর দেওয়া নম্বর পড়িতে পড়িতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না এবং কতখানি কৃতিত্ব যে অর্জ্জন করিলাম তাহার হিসাব করিতে করিতে বেলা বাড়িয়া যাইত। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, পরবর্ত্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যখনই বেশী নম্বর পাইয়াছি তখনই মনে হইয়াছে জগদানন্দের মত কেহ নম্বর দিতে পারিবে না ও সঙ্গে সঙ্গে এই নম্বর পাওয়ার প্রতি আসক্তি দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য মন অধীর হইয়া উঠিত। মনে হয় বেশী পড়িয়া পড়ার প্রতি বীতরাগ হওয়ার চেয়ে কম পড়িয়া আরও পড়িবার আগ্রহ রাখাই শ্রেয়। জগদানন্দ আমাদিগকে এই দিকেই উৎসাহ দিতেন।

নিজের মাষ্টারমহাশয়ের সম্বন্ধে যতটুকু সে-বয়সে জানিয়াছিলাম এবং এখনও তাঁর যে-স্মৃতি অন্তরে গভীর হইয়া রহিয়াছে তাহা জানাইলাম। যাঁহার রচিত বিজ্ঞানের পুস্তকাবলী আজও বাংলার ছাত্রছাত্রীদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে সেই পণ্ডিতপ্রবর জগদানন্দ রায় যে কত বড় জ্ঞানী ও ভাবুক ছিলেন, তাঁহার বিশেষত্ব যে কি ছিল তাহা তখনও সম্পূর্ণ জানিতাম না, এখনও জানাইতে পারিব না। তবে নিজের বাল্যবন্ধুর কথা আরও একটু বলিতে চাই।

শমীন্দ্রনাথ আমার খেলার সাথী ও পড়ার বন্ধু ছিল। তাহার মত শান্তিপ্রিয়, অল্পভাষী এবং সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত আমি কোন মতেই হইতে পারিতাম না। আমি বড় অস্থির ছিলাম, ঝোঁকের মাথায় কাজ করিয়া বসিতাম। তাই সব সময়ে আমার মনে হইত, আমি যদি শমীর মত হইতে পারিতাম। আজ আমার সেই স্বর্গীয় বন্ধুর উদ্দেশ্যে আমি অন্তরের ভালবাসা জানাইতেছি। হয়ত সে আজ খেলার নূতন সঙ্গী পাইয়াছে, হয়ত পড়ার বন্ধুরও তাহার আর অভাব নাই। কিন্তু আমার জীবনে শমীন্দ্রনাথ যে স্থানটি আজও জুড়িয়া আছে তাহা শুধু সেই জানিতে ও বুঝিতে পারে।

শমীর সহিত দিন কাটিত বলিয়াই হয়ত আমার জীবনে আমি আর এক জনের স্নেহের পরিচয় অত্যন্ত সহজে পাইয়াছিলাম। আজও মনে পড়ে, এক দিন সকালে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া, শমী, আমি ও আমাদের মাষ্টারমহাশয় জগদানন্দবাবু ক্রিকেট খেলায় মত্ত ছিলাম, এমন সময়ে মাঠের পথে দুইটি ভদ্রমহিলাকে যাইতে দেখিলাম। পরে জানিয়াছিলাম, তাঁহারা শমীর মা ও পিসিমা। শমী ব্যাট ফেলিয়া তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া গেল। আমি বল কুড়াইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম, শমীর পশ্চাতে পশ্চাতে আমিও ছুটিলাম। কেন যে ছুটিয়াছিলাম তাহা আজও বলিতে পারি না—বোধ হয়, শমী যাহা করিত তাহাই আমারও করিতে ভাল লাগিত বলিয়া

যাহা হউক, আমি কতক দূর মাত্র ছুটিয়া গিয়াছি, দেখিলাম, শমী তাহার পিসিমার কাছে পৌছাইয়া গিয়াছে ও তাহার পিসীমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতেছেন। আমার গতি থামিয়া গেল, আমি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলাম। মনে হইল, আমি কেন ছুটিয়া যাইতেছি, আমাকে কোলে বা বুকে লইবার এখানে তো কেহ নাই। কতক্ষণ হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না। তার পরই অনুভব করিলাম, শমীর মা আমার কাছে আসিয়া আমাকে তাঁহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন আমার পক্ষে আর শান্ত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমার দুই চক্ষু দিয়া যে অশ্রুধারার বর্ষণ হইয়াছিল, তাহার ফলে শমীর মা আমারও মা হইয়া গেলেন। তাঁর সেদিনকার প্রাতভ্র্মণের ব্যাঘাত ঘটিল, আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজ গৃহে ফিরিলেন। সেদিন প্রায় সমস্ত ক্ষণই আমি তাঁহার কাছে কাছে ছিলাম এবং পরে তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তার পর হইতে তাঁহার কাছে আমি প্রায়ই যাইতাম, তাঁহার শয়ন-ঘরে ঘুমাইতাম। শমীর মা ত শুধু আমার মা ছিলেন না, আমরা যে তাঁহাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া জানিতাম! তিনি কত সময়ে আশ্রমের রান্নাঘরে আসিয়া আমাদের জন্যও কত কি যে রান্না করিতেন। মনে পড়ে, সে-সময়ে আমরা আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতাম ও কখন তিনি আমাদের ডাকিবেন ও খাইতে দিবেন তাহার জন্য অধীর হইয়া থাকিতাম।

শান্তিনিকেতনে আমি যাহা পাইয়াছিলাম তাহার কিছু আভাস দিলাম। কেহ হয়ত বলিবেন, গুরুদেবের সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কি বলিব, জানি না। জীবনে দিন যত যাইতেছে, ততই আমার মনে হইতেছে, গুরুদেব ত শুধু আমাদেরই নহেন, যে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে তিনি তাহারই। তবে শান্তিনিকেতনে যখন ছাত্র ছিলাম, তখনকার জীবনে আমরা কত রকমে যে তাঁহাকে কাছে পাইতাম তাহা ভুলিবার নহে। জ্ঞান ও প্রেম ছাড়া মানব-জীবনের আর একটি পরম মূল্যবান পাথেয় এবং যাহা শান্তিনিকেতনের নিজস্ব সম্পদ সেই শান্তির সন্ধান আমরা গুরুদেবের সাহচর্য্যে নানা ভাবে পাইতাম। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গুরুদেবের গান, গল্প ও আবৃত্তি আমাদের নিত্য ভোগ্য ও সাধনার বস্তু ছিল। তাহা ছাড়া বর্ষার দিনে, বৃষ্টি আসিবার পূর্ব্বেই অনেক সময় গুরুদেব আমাদের খেলার সঙ্গী হইতেন। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে পর বর্ষার গান তাঁহার মুখে শুনিতে ও তাঁহার সঙ্গে গাহিতে আমাদের কত ভাল লাগিত! সব শেষে সকলে মিলিয়া যখন যেদিন যেরূপ ব্যবস্থা হইত, খাইতাম। বর্ষার দিনে গাছতলায় পড়াশুনা বা খেলা কিছুই হইতে পারিত না বলিয়া আমরা অনেক সময় গুরুদেবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতাম।

একটি বিশেষ দিনের ঘটনা এ-স্থলে জানাইলাম। মনে পড়ে, সকালবেলা স্নান সারিয়া চেলির বস্ত্র পরিয়া, আসন পাতিয়া, আমরা প্রত্যেকে এক-একটি গাছের তলায় প্রার্থনা করিবার জন্য বসিতাম। আমি তো প্রার্থনা করিতে জানিতাম না, নিজের কথাই চিন্তা করিতাম। কখনও বা বাড়ীতে মায়ের কাছে আমার মন চলিয়া যাইত ও আমার সমস্ত অভাব তাঁহাকে মনে মনে জানাইতাম। যখন দেখিতাম অন্যান্য সাথীরা প্রার্থনা সারিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, তখন চক্ষের জল ভাল করিয়া মুছিয়া আমিও ফিরিয়া আসিতাম। এক দিন এই অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছি, দেখি গুরুদেব দাঁড়াইয়া আছেন। আমি কাছে যাইতেই গুরুদেব আমাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কি প্রার্থনা করিলাম। তিনি কিরূপ উত্তরের আশা করিয়াছিলেন জানি না, আমি কিন্তু অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বোধ হয় আমার উত্তর দেওয়া হইয়াছিল। কারণ তার পর অবসরমত সেইদিন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁর গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন ও একটি আলমারি হইতে বৃহৎ এক পুস্তক বাহির করিয়া, খানিক ক্ষণ কি ভাবিয়া, একখানি বড় কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে গায়ত্রীমন্ত্র লিখিয়া আমাকে দিয়াছিলেন এবং আমি মুখস্থ করিতে পারিব কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তার পর অনেক ক্ষণ ধরিয়া তিনি

আমাকে সেই মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়াছিলেন। আমি তাহা অবাক্ হইয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে-বয়সে অর্থের চেয়ে মন্ত্রের প্রতিই আমার আগ্রহ বেশী ছিল। তখন হইতে প্রার্থনার সময় আমি গায়ত্রীমন্ত্র আবৃত্তি করিতাম। ইহা আমার পক্ষে এমনই সহজ হইয়াছিল যে পরবর্ত্তী জীবনে অনেক সময়ে অসুস্থ অবস্থায় বা স্বপ্নের মধ্যে ভয় পাইলে নিজের অজ্ঞাতসারে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। যখন আমার উপনয়ন হইল, তখন এই গায়ত্রীমন্ত্রেই দীক্ষা লাভ করিয়া আমি পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। এইরূপে আমার সামান্য জীবনে গুরুদেবের নিকট যে পরম আশ্রয়ের সংবাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা কোন দিন ভুলিব না।

যদি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এক বৎসরের ভিতরেই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য না হইতাম তাহা হইলে শান্তিনিকেতনের সহিত আমার জীবনের আরও কত ঘনিষ্ঠ যোগ সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু সেই কয়েকটি মাসেই আমি যাহা পাইয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া মন আজও গর্ব্বে ভরিয়া উঠে, এবং সমস্ত অন্তর ব্যাপিয়া নিরন্তর ঝঙ্কৃত হইতে থাকে :

"আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে ক-জন আছে?
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন,
তাই আমি তাঁর চেলা রে।"

কনে-দেখা আলো

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গলা পিচ নেই, প্রথম বর্ষা আকাশে আঁকা
সারাদিন শেষে জমামেঘ-ভাঙা হঠাৎ আলো,
হৃদয়ে আমার রূপার দিনের বাসনা বাজে :
সন্ধ্যায় শুধু নগরের এই প্রলাপী গলি।

তবুও তিক্ত। সূর্য্য পূজারী আকাশে চায়।
সূর্য্যের ছুটি, কামনার তীর বেঁধে নি তাকে।
ধোঁয়াটে মেঘেরা ধূসর চাদরে, আকাশ তাদের-
কনে-দেখা আলো সন্ধ্যার নীল আবছায়ায়।

মেঘের মিনারে বাঁকানো অশনি জাফরি কাটে
বর্ষার দিন, এ তোমারি দিন, কঠিন নয়।
আকাশের কোনে কনে-দেখা আলো স্বপ্ন আনে—
প্রলাপী গলির অনেক উর্দ্ধে মেঘলা মিছিল।

কনে-দেখা আলো কোনো মরীচিকা বিছাবে না।
গলা পিচ নেই। স্মৃতির হাঙর বর্ষা-দিনে।
বহুদিন আগে বর্ষার দিন তোমারি ছিল
ধোঁয়াটে মেঘের ধ্বংসের স্তূপ কবর গড়ে।

নির্মোক

"বনফুল"

১০

চালতাপুর নামক একটি দূর গ্রামে বিমল রোগী দেখিতে গিয়াছিল। গ্রামটি বেশ দূর আছে। নদী পার হইয়া কিছু দূর মোটরে গিয়া তাহার পর হস্তিপৃষ্ঠে যাইতে হইয়াছিল। গ্রামটি নিতান্ত ছোট নয়। দুই-তিন জন পাস-করা ডাক্তারই আছেন। রোগীর টাইফয়েড হইয়াছে, বিশেষ কিছু করিবার নাই, যাহা কর্তব্য তাহা ওখানকার ডাক্তাররাই করিতেছিলেন। কিছু করিবার থাকিলেও এত দূর হইতে গিয়া আধ ঘণ্টা বড়জোর ঘণ্টাখানেক রোগীর নিকট বসিয়া তাহা করা যায় না। কিন্তু যেহেতু শ্রীমান্ ডুলুর উক্ত গ্রামে মামার বাড়ী এবং যেহেতু উক্ত রোগীর বাড়ীর কর্তৃপক্ষ ডুলুর মামাদের বাধ্য সেই হেতু বিমলকে যাইতে হইয়াছিল। বেশ মোটা টাকাই পাওয়া গিয়াছে। বিমল চালতাপুর হইতে মোটরযোগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিতেছিল, মথুরবাবুর বাড়ীতে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছিতে হইবে। কলিকাতা হইতে আগত বিখ্যাত চিকিৎসকটি আসিবার ঘণ্টা-দুই পরেই নন্দী-মহাশয়ের গুরুঠাকুরের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার ডাক্তারের এক দাগ মাত্র ঔষধ পেটে পড়িয়াছিল! রোগী সারাইতে হইলে ভাগ্য থাকা চাই। মথুরবাবুও কলিকাতার ডাক্তারবাবুকে আজ বৈকালে 'কল' দিয়াছেন, তাঁহার কন্যা শেফালির মাঝে মাঝে হাঁপানির মত হইতেছে তাহাকে একবার দেখাইবেন। পাঁচটার সময় তাঁহার আসিবার কথা, বিমলকে তাহার মধ্যে পৌঁছিতে হইবে। বিমল হাত-ঘড়িটা এক বার দেখিল, পৌনে চারটে। পাঁচটার মধ্যে ঠিক পৌঁছিতে পারিবে, দশ মাইল যাইতে আর কতক্ষণ লাগিবে।

মোটরে বসিয়া বিমল চালতাপুরের ডাক্তার গাঙ্গুলী-মহাশয়ের কথা ভাবিতে লাগিল। গাঙ্গুলী-মহাশয়ের কায়দাকরণ একেবারে অন্য প্রকার। অন্য ডাক্তার রোগী আসিলে খুশী হয়, গাঙ্গুলী-মহাশয় চটিয়া যান। সহজে দেখাই করিতে চান না, বেশী পীড়াপীড়ি করিলে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া যান। দেখিতেও প্রিয়দর্শন নহেন, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, রোগা চেহারা।

কেহ অসুখের কথা বলিলে বলেন—তোমার অসুখ হয়েছে তাতে আমার কি!

—একটু ওষুধ।

—ওষুধ-ফসুদ আমার কাছে নেই, বিরক্ত ক'রো না।

লোকে তবু ছাড়ে না, ঐ কটুভাষী কুদর্শন লোকটির দ্বারে ধরণা দেয়। কাতারে কাতারে রোগী বসিয়া আছে, বিমল স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাই বলিয়া গাঙ্গুলী-মহাশয় যে একেবারেই চিকিৎসা করেন না তাহা নয়। অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক পীড়াপীড়ির ফলে কটুকাটব্য করিতে করিতে দুই-চারিটি রোগী তিনি বেশ মোটা দক্ষিণা লইয়া তবে চিকিৎসা করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি স্পর্শই করেন না। লোকের তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস, বাড়ীর সামনে সর্ব্বদা ভিড়।

মথুরবাবুর বাড়ী পৌঁছিয়া বিমল দেখিল কেহ তখনও আসে নাই। মথুরবাবু একা বাহিরে বসিয়া রহিয়াছেন। বিমল জিজ্ঞাসা করিল—অমর কই?

—দুর্ভিক্ষ সমস্যা সমাধান ক'রে তিনি কলকাতা গেছেন। এবার কোন্ খেলোয়াড়ের ফর্ম কি রকম, রেফারি চরিত্রবান্ লোক কি না, যে-দল জিতবে তার জেতবার ন্যায্য দাবী আছে কি না—এই সব নানা মূল্যবান্ খবর সংগ্রহ করতে সময় লাগবে ত কিছু দিন! ফিরতে দেরি আছে।

বিমল হাসিয়া একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে বিমলের দিকে চাহিয়া মথুরবাবু বলিলেন—বড়লোকের ছেলে, করবেই না বা কেন! এ-দেশে বড়লোকের ছেলেরা আগে বেড়ালের বিয়ে, বুলবুলির

লড়াই, এই জাতীয় জিনিস নিয়ে থাকত, ওই সবেই হাজারো হাজারো টাকা খরচ করত। আজকাল রুচিটা বদলেছে!

বিমল বলিল—শেফালির হাঁপানিটা কি বেড়েছে না কি আজকাল?

—বাড়া-কমা ত কিছু বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে যখন হয় খুবই কষ্ট পায়। দেখি তোমাদের বড় ডাক্তার কি বলেন।

বিমল একটু হাসিল।

মথুরবাবু বলিলেন—হ্যাঁ আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তোমার নামে একটা দরখাস্ত গেছে কাল সিভিল-সার্জনের কাছে. আমিও তাতে সই করেছি। হরেন বোস এনেছিল দরখাস্তটা।

—কি লেখা ছিল তাতে?

—সত্যি কথাই লেখা ছিল। লেখা ছিল যে তুমি আজকাল ক্রমাগত প্র্যাকটিস ক'রে বেড়াচ্ছ, হাসপাতাল মোটেই দেখছো না। গুপিই এখন হাসপাতালের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! গুপি হাসপাতালে বসেই রীতিমত পয়সা নিতে আরম্ভ করেছে। সেদিন এপারেরই একটি গরীব লোক বলছিল যে পয়সা না দিলে ঘায়ে লাগিয়ে দেয়। তুমি ত অপারেশন ক'রে খালাস, ড্রেস করে ত ওই!

—দু-জনে মিলে করে, গুপিবাবু আর দুলু।

—গুপিবাবুকে পয়সা না দিলে গুপিবাবু ঘায়ে খোঁচা দিয়ে ঘা আরও বাড়িয়ে দেন শুনেছি।

বিমল বলিল—বাজে কথা।

—না, না, একটুও বাজে কথা নয়। জগদীশবাবু নিজে আমাকে একথা বলেছেন! মোট কথা, আমি যা বলে-ছিলাম ঠিক তাই হয়েছে কি না। পঁচাত্তর টাকাতে একটা ভাল লোক থাকবে কি ক'রে। এই যে আমরা আমাদের আমলাদের কারো মাইনে পাঁচ টাকা, কারো দশ টাকা ক'রে দিই, তার মানে আমরা তাদের চুরি করতে বলি। আমি এবার আমলাদের মাইনে সব বাড়িয়ে দেব ভেবে-ছিলাম, কিন্তু সককলের তাতে আপত্তি, এমন কি তোমার বন্ধু অমরের পর্য্যন্ত। বলে, যা চলছে চলুক! বেশ চলুক, আমি আর ক'দিন আছি। দিন-পনর পরেই সরে পড়ছি এ-দেশ থেকে।

—কোথায় যাবেন?

—মথুরা।

—মথুরা! হঠাৎ মথুরা কেন?

—আর এ-দেশ ভাল লাগে না। কাঁহাতক সকলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে 'বাথরুমে' ব'সে থাকি, বল! কারো সঙ্গে মতে মেলে না। এ-দেশে চিন্তায় আর কার্য্যে এত আকাশ-পাতাল তফাৎ যে কোন কিছুই হবার উপায় নেই। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব সমান। বরং শিক্ষিতগুলো বেশী পাজি। সবাই জানে পণপ্রথা খারাপ তবু সবাই পণ দিচ্ছে নিচ্ছে, সবাই জানে ঘুষ দেওয়া খারাপ, সবাই ঘুষ দিচ্ছে নিচ্ছে। কোন্ উচিত কার্য্যটা আমরা করি! একটাও না! এই যে তুমি একটা শিক্ষিত ডাক্তার পচাত্তর টাকা মাইনেতে এখানে জুটে গেলে, তুমি কি জানতে না যে পচাত্তর টাকায় তোমার চলা অসম্ভব, তোমাকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ত করলেই হাসপাতালের ক্ষতি হবে!

—কি করি বলুন, কিছু ত একটা করতে হবে।

—আরে এ-কথা ত একটা অশিক্ষিত কুলিও বলে! তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, বড় আদর্শের জন্যে তোমরাই ত লড়বে, তোমরা যদি 'কিছু ত একটা করতে হবে' ব'লে অন্ত্যজের দলে ভিড়ে যাও তাহলে চলে কি ক'রে!

বিমল বলিল—কটা লোক বড় আদর্শ অনুসারে চলতে পারে বলুন!

মথুরবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—বড় আদর্শের কথা ছেড়ে দাও, কোন্ আদর্শটা মানি আমরা! জানলা খুলে শোওয়া খুব একটা বড় আদর্শ? যেখানে-সেখানে থুথু না ফেলা খুব একটা বড় আদর্শ? আসল কথা কি জান, আমাদের আদর্শ-ফাদর্শের বালাই নেই, আমরা সুবিধাবাদী, যখন যা সুবিধা তাই করি। ছেলেরা লেখা-পড়া শেখে মানে কতকগুলো বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষার সময় সেগুলো উগ্‌রে দিয়ে আসে একটা ডিগ্রীর লোভে। চাকরি যদি পায় ভালই, না যদি পায় রাস্তায় রাস্তায়

ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায়! শিক্ষিত হ'লে এ দুর্দ্দশা হ'ত না।

বিমল বলিল—তাহলে এ-দেশে উপায় কি?

—উপায় বাথরুমে লুকিয়ে ব'সে থাকা, আর তা অসহ্য হয়ে উঠলে মথুরায় পালান।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

মথুরবাবু বলিলেন—মথুরাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম, মথুরাতেই দেহত্যাগ করব। আর ফিরছি না এ-দেশে!

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মথুরবাবু আবার বলিলেন—তোমার নামে কিন্তু খুব সঙীন দরখাস্ত গেছে কাল! তোমার সে পেটোয়া সিভিল-সার্জনও বদলি হয়ে গেছে, এসেছে সায়েব। সুতরাং সাবধান!

বিমল হাসিয়া বলিল—যা হবার হবে, আমারও আর ভাল লাগছে না চাকরি!

মথুরবাবু হাসিয়া বলিলেন—চাকরি ছাড়া বড় সোজা কথা নয়। এক বার যে ও-স্বাদ পেয়েছে তার পক্ষে ছাড়া কঠিন, অনেকটা আপিঙের নেশার মত। চাকরিতে অনেক কষ্ট, কিন্তু মাসের শেষে মাইনের করকরে টাকা-গুলো হাতে এলে সব কষ্টের অবসান হয়ে যায়। জননীর সন্তানমুখ-দর্শনের মত; ছেলের মুখটি দেখলেই দশ মাসের এত দুঃখকষ্ট আর কিছু মনে থাকে না।

মথুরবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। মথুরবাবু বলিলেন—ঐ বোধ হয় কলকাতার ডাক্তারবাবুকে নিয়ে জগদীশবাবু এলেন! চল, অভ্যর্থনা করা যাক!

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতার ডাক্তারবাবু বলিলেন—আমি একটা ইনজেকশন লিখে দিচ্ছি, ওটা আনিয়ে ওকে অন্তত: দুটো কোর্স দেবেন, অর্থাৎ সবসুদ্ধ চব্বিশটা।

একটা কাগজে তিনি ইনজেকশনের নামটা লিখিয়া মথুরবাবুর হাতে দিলেন।

মথুরবাবু জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওটা আর আমি নিয়ে কি করব, আপনি ওষুধটা পাঠিয়ে দেবেন, কিংবা আপনি একেবারে এনে ইন্‌জেকশন সুরুই ক'রে দিন কাল থেকে!

—কাল ত আমার অবসর নেই বোধ হয়, বিমলবাবুই না হয় এসে দিয়ে যাবেন।

—না, বিমলকে আমি ডাকি না, কারণ ও ফি নিতে চায় না।

—বেশ আপনি ইন্‌জেকশনটা পাঠিয়ে দিন, আমি না হয় ভূধরকে ডাকতে পাঠাব।

জগদীশবাবু এতক্ষণ ইনজেকশনটা কি তাহা পড়িয়া দেখেন নাই। পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পড়িয়া বলিলেন—এই ইনজেকশন তো আমার কাছে নেই।

কলিকাতার ডাক্তারবাবু তখন বলিলেন—এ কলকাতায় হয়ত পেতে পারেন, হয়ত বলছি এই জন্যে যে সেদিন এক জন পায় নি। বম্বেতে অবশ্য পাবেন ঠিক!

মথুরবাবু বললেন—এ ইনজেকশন কি খুব বেশী ব্যবহার করেন নি আপনি? এত দুষ্প্রাপ্য যখন—

এরূপ প্রশ্নের জন্য ডাক্তারবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—মানে খুব নতুন বেরিয়েছে এটা, জার্ম্মেনীতে অবশ্য অনেকে—

মথুরবাবু বলিলেন- আপনি নিজে বেশী ব্যবহার করেন নি?

—নিজে অবশ্য বেশী করি নি, তবে জিনিসটা ভাল!

মথুরবাবু জগদীশবাবুর হাত হইতে প্রেসক্রুপশানখানি লইয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁহার প্রাপ্য দক্ষিণা দিয়া দিলেন। এক-আধ টাকা নয়, অনেকগুলি টাকা।

ডাক্তারবাবু তাঁহার ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন—ছ-টা বাহান্নতে ট্রেন বললেন বুঝি নন্দীমশায়?

—হ্যাঁ।

—তা হ'লে ত এবার উঠতে হয়। আচ্ছা চলি তবে, নমস্কার, অনেক ধন্যবাদ। আপনার মেয়ে কেমন থাকেন জানাবেন আমাকে।

মথুরবাবু ডাক্তারবাবুকে গাড়ীতে চড়াইয়া প্রায় তাঁহার সামনেই একটু ঘুরিয়া প্রেসক্রুপশনখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ডাক্তারবাবু দেখিতে

পাইলেন কি না ভগবান্ জানেন। তিনি আবার গলা বাড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা নমস্কার!

মথুরবাবু স্মিতমুখে হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

বিমল বলিল—এ কি করলেন?

মথুরবাবু বলিলেন—আমার মেয়ের শরীর এক্সপেরিমেণ্ট করবার জায়গা নয়।

জগদীশবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে তাঁহার জিহ্বা সকৌতুকে উঁকি দিতে লাগিল।

১১

সুব্রতবাবুর অনুরোধ এড়ানো গেল না। ছুটি লইয়া কলিকাতা যাইতেই হইল। সুপ্রিয়া সঙ্গে গেলেন, মণিমালাও ছাড়িল না। বিমল ব্যবস্থা করিয়াছিল যে-দুই দিন সে থাকিবে না পরেশ-দা'র স্ত্রী রাত্রে আসিয়া শুইবেন, বাহিরের ঘরটায় ভুলুও আসিয়া শুইবে। এতৎসত্ত্বেও মণি বলিল, সে একা থাকিতে পারিবে না। তা ছাড়া বাবা-মাকে সে কত দিন দেখে নাই, মন কেমন করে না বুঝি! এখানে ঘরে একা একা বসিয়া বসিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, বিমল ত সমস্ত দিন মজা করিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় মোটরে, নৌকায়, পাল্‌কিতে; হাতীতে! তাহার যে কি করিয়া দিন কাটে তাহা সে-ই জানে। এখানকার লাইব্রেরির সমস্ত বই তাহার পড়া, দুই-চারিখানা অপঠিত ছিল তাহাও সে পড়িয়া শেষ করিয়াছে। এমন হতভাগা লাইব্রেরি যে কিছুতেই নূতন বই আনাইবে না। না, সে কোন কথা শুনিবে না, সে যাইবে। ঠোঁট ফুলাইয়া যখন সে এই কথাগুলি বলিল তখন তাহা অগ্রাহ্য করা বিমলের পক্ষে শক্ত হইল। সুতরাং বাক্স-প্যাটরা গুছাইয়া মণিও সঙ্গ লইল। তোরঙ্গ এবং গহনার বাক্স এখানে রাখিয়া যাইবে কাহার ভরসায়! যা চোরের উপদ্রব। তাহার জিনিসপত্র সবই সে সঙ্গে লইল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সে মণিকে লইয়া শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া উঠিল। সুব্রতবাবু এবং সুপ্রিয়া হোটেলে গেলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া মণির বাবা-মা খুবই সুখী হইলেন। হঠাৎ আগমনের কারণ শুনিয়া মণির বাবা বলিলেন—বেশ, আমি খুব চেষ্টা করব। ভদ্রলোক ফার্স্ট ক্লাস যদি হন, হয়ে যাবে বোধ হয়। তোমার সঙ্গে ত চেনা আছে আমাদের কমীটির দু-চার জনের। তাঁদেরও গিয়ে ধর। এ-সব ছাড়া আর একটা সুপারিশ যদি জোগাড় করতে পার তা হ'লে ত নির্ঘাত হয়ে যায়।

তিনি এক জন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম করিলেন।

বিমল বলিল—আমার সঙ্গে ঠিক চেনা নেই, তবে ওঁর ছেলের সঙ্গে আমি পড়তাম। আচ্ছা দেখি চেষ্টা ক'রে—

বিমল চা জলখাবার খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সুব্রতবাবুর কপাল ভাল, বেশী বেগ পাইতে হইল না। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটিও ভাগ্যক্রমে বাড়ীতে ছিলেন এবং তিনি পুত্রের অনুরোধে একটা সুপারিশ-পত্রও দিয়া দিলেন। যোগাযোগ যখন ঘটে তখন এমনই ভাবেই ঘটিয়া যায়। সাধে মানুষ অদৃষ্টে বিশ্বাস করে।

•

কলিকাতায় গেলে সিনেমা-দেখা একটা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রাসাদের মত প্রকাণ্ড বাড়ী, আলোয় আলোয় চতুর্দ্দিক যেন দিনের মত হইয়া রহিয়াছে! প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল যে অপূর্ব্ব শিল্পকলা চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলিবেন তাহার তুলনায় প্রবেশ-মূল্য কিছুই নয়। এমন একটা প্রাসাদের সুশীতল আবেষ্টনীতে অমন সুন্দর আরামজনক একখানা আসনে দুই ঘণ্টা নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিতে পাওয়ারই কি মূল্য কম! বিমল, মণিমালা, সুব্রত ও সুপ্রিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঠিক একটু আগে গিয়া উপস্থিত হইল। বসিতে-না-বসিতে আলো নিবিয়া গেল, সাদা পরদা বিচিত্র হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর, রুদ্ধশ্বাসে সকলেই দেখিতেছে। একটি আসন খালি নাই, সমস্ত পরিপূর্ণ। সব বয়সের, সব অবস্থারই লোক রহিয়াছে। থাকিবে না কেন, না-থাকাটাই অস্বাভাবিক। যাহা স্বপ্ন তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ছায়া-লোকে মূর্ত্ত দেখিতে সকলে চায়। অপূর্ণ সাধ, অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থ কামনার ক্ষোভে ক্ষুব্ধ মন অল্প ক্ষণের জন্যও এই মায়ালোকে বসিয়া সেই ছবি দেখে যাহা সে জীবনে

পায় নাই, পাইবে না। ছবিতে দেখিয়াও তবু খানিকটা তৃপ্তি আছে। ছবি দেখিয়াই সে খানিক ক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে চায়। খানিক ক্ষণের জন্য নিজেকে ভুলিয়া থাকাটাই কি কম লাভ! চতুর্দ্দিকের নানা প্রলোভনে সকলেই অহরহ পীড়িত, চেতন ও অবচেতন মনের নানা অসম্ভব তাগিদে সকলেরই অন্তর পরিশ্রান্ত, দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর কদর্য্যতায় সকলেরই সমস্ত সত্তা যেন কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে বাহিরে শান্তি কোথাও নাই, শান্তির আশাও নাই, শান্তি অর্জ্জন করিবার মত মানসিক সম্পদ নাই। দুর্ব্বল বিলাস-কাতর আর্ত্ত নর-নারীর দল তাহাদের ব্যর্থ জীবনযাত্রার ক্ষোভ দুঃখ জ্বালা দ্বন্দ্বের উপর খানিক ক্ষণের জন্য ঐ সুরঞ্জিত পরদাখানা টাঙাইয়া ধরে, উহারই আড়ালে আত্মগোপন করিয়া খানিক ক্ষণের জন্যও নিজেকে ভুলাইয়া রাখে। বিমলের দুখীরামকে মনে পড়িল, সে বেচারা তাড়ি খায়। উদ্দেশ্য একই, আত্মবিস্মৃতি। তাড়ি খাইয়া রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়াটা বর্ত্তমান সভ্য-জগতে অচল, তাই দুখীরাম ঘৃণ্য। সভ্য-জগতে সিনেমার এখনও জাত মারা যায় নাই, তাই ফরসা কাপড়-জামা-পরা শিক্ষিত দুখীরামের দল এখানে আসিয়া রোজ ভিড় করে। আর্ট? কয় জন লোকে আর্ট বোঝে? রসোত্তীর্ণ ভাল ছবিতে কই এত ভীড় হয় না ত? মদও ত পরিমিত মাত্রায় পান করিলে উপকার হয়! কিন্তু শরীরের উপকারের জন্যই কি দুখীরাম তাড়ি খায়? ও-সব কিছু নয়, আসল কথা নেশা। এই উত্তেজনাপূর্ণ প্রলোভনময় বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নেশা না-হইলে কাহারও চলে না। মানুষ কোন রকমে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়, না হইলে অন্তরের হাহাকার শুনিতে শুনিতে সে পাগল হইয়া যাইবে। এই অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে যাহারা ঐ সকল ছায়া-ছবির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, তাহারা সকলেই অর্দ্ধ-উন্মাদ, যাহাতে একেবারে উন্মাদ না-হইয়া যায় তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। বিমলের সহসা সেই ভিখারীটার কথা মনে পড়িল, তাহার মৃত দেহটার ছবি মুহূর্ত্তের জন্য মানসপটে ফুটিয়া উঠিল,—রক্তের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! সে কি কখনও সিনেমা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল? ঐ যে মোহিনী নায়িকাটি ক্ষণে ক্ষণে নানা ছুতায় নিজের দেহের মাধুরী অনাবৃত করিতেছে, তাহার খবর পাইবার সুযোগ তাহার হইয়াছিল কি? হয়ত হয় নাই, সুদূর মফস্বলে ভিক্ষা করিয়া এবং রোগে ভুগিয়াই তাহার জীবনটা কাটিয়াছে। কলিকাতা শহরে থাকিলে হয়ত সে সুযোগ পাইলেও পাইতে পারিত। মাত্র কয় গণ্ডা পয়সা ত! হয়ত এই দলের মধ্যে ভিখারীও অনেক আছে···কে জানে!

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আহার করিবার সময় শাশুড়ী-ঠাকুরাণী নিকটে আসিয়া বসিলেন। একথা-সেকথার পর বলিলেন—আমি মনে করছি বাবা, মণিকে না হয় রেখেই দিই এ ক-মাস! ছেলে-টেলে হ'লে একেবারে যাবে, কি বল?

বিমল বলিল—তার ত এখন অনেক দেরি।

—ছ-মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এটা প্রথম বার কিনা তাই ভয়, এখানে কলকাতা শহরে সব রকম সুবিধে আছে। তোমাদের মফস্বল জায়গা, তুমি হয়ত বাড়ীতে থাকবে না—তার চেয়ে ও থাকুক এ ক-মাস!

বিমল কিছু না বলিয়া আহার করিতে লাগিল।

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী পুনরায় বলিলেন—ওর যে পা পুড়ে গেসল সে কথা ত আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাও নি কিছু তোমরা! ভাগ্যিস বেশী কিছু হয় নি। ঠাকুর না হ'লে কি চলে বাবা, ও কি পারে রাঁধতে, রান্নার জানেই বা কি।

একটা অপ্রিয় কথা বিমলের তুণ্ডাগ্রে আসিয়া থামিয়া গেল। সে নীরবেই আহার সমাধা করিল। শাশুড়ী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—তাহলে মণি থাক, কি বল?

—দেখি, মণিকে জিগ্যেস করি!

—ও ত থাকতে পেলে আর কিছু চায় না। তোমাদের ঐ মফস্বল জায়গায় না আছে সিনেমা, না আছে রেডিও, মেয়ে ত একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছেন!

বিমল কিছু না বলিয়া একটু হাসিল।

সেদিন রাত্রে মণিমালাও বিমলকে ওই কথাই বলিল।

—মায়ের কাছে থাকি, কেমন?

—বেশ।

—না, তুমি ভাল মুখে বল।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিমল বলিল—বেশ ত থাক না।

—রাগ করছ তুমি!

—রাগ করব কেন, থাক।

—মন কেমন করলে চলে যাব, কেমন?

—বেশ।

পরদিন বিমল একাই ফিরিয়া আসিল। মণি, সুব্রত, সুপ্রিয়া কেহ আসিল না।

১১

দেখিতে দেখিতে আরও দুই মাস কাটিয়া গেল।

ডাক্তারের দৈনন্দিন জীবন যেমন ভাবে চলে তেমনি ভাবে চলিতে লাগিল। রোগী আসে যায়, বাঁচে, মরে। মাঝে মাঝে এক-আধটা রোগী বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। কেহ হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁচিয়া যায়, কেহ অপ্রত্যাশিত ভাবে মরে, অপ্রত্যাশিত উপায়ে মাঝে মাঝে দুই-একটা রোগ-নির্ণয়ও হইয়া যায়। যাহাকে কালাজ্বর বলিয়া মনে হইতেছিল হঠাৎ দেখা যায় তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে, যে অসহ্য মাথা-ধরার যন্ত্রণায় চশমার পর চশমা বদলাইয়া, খাদ্য সংযম করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না, হঠাৎ রক্ত পরীক্ষা করিয়া জানা যায় পিতার পাপের শাস্তি সে ভোগ করিতেছে। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের গোলমাল লইয়া বিকটাকার কোন রোগী হয়ত হাজির হয়, তাহাকে লইয়া খানিকক্ষণ বেশ কাটে। এই ভাবেই চলিতেছিল। হরেন বোসের দল দরখাস্ত করিয়া বিমলের কিছু করিতে পারে নাই, কারণ সাহেব সিভিল-সার্জন বিমলের নিকট সমস্ত সত্য কথা শুনিয়া কাগজে কলমে কিছু করিলেন না, মুখে বিমলকে আর একটু 'ট্যাক্‌ট্‌ফুল' অর্থাৎ কৌশলী হইতে উপদেশ দিলেন, বলিলেন যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করিলে চলে না তাহা ঠিক, কিন্তু সব দিক বাঁচাইয়া তাহা করিতে হইবে। ইউ মাস্ট্‌ বি ট্যাক্‌ট্‌ফুল!

মথুরবাবু সত্য সত্যই সস্ত্রীক মথুরা চলিয়া গিয়াছেন। নন্দী-মশায় নিরঙ্কুশভাবে চেয়ারম্যানগিরি করিতেছেন। তাঁহার ইলেক্‌ট্রিক স্কীম সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। মথুরবাবু মিটিঙে ছিলেন না, সুতরাং একটি লোকও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। বদিবাবু সম্প্রতি একটি মন্দির-সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত আছেন। কোথায় একটা পাহাড়ের উপর না কি একটা মন্দির আছে, জৈনরা সেটাকে নিজেদের মন্দির বলিয়া দাবি করিতেছে এবং হিন্দুদের সেখানে ঢুকিতে দিতেছে না। বদিবাবু হিন্দুদের পক্ষ লইয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজকাল তিনি এখানে নাই, বম্বেতে এই উপলক্ষেই গিয়াছেন। তাঁহার তিলমাত্র অবসর নাই। ইনসিউলিন লইয়া হীরালালবাবু অনেকটা সুস্থ আছেন, মতিলালবাবুর ইন্‌জেকশন এখনও চলিতেছে। সুব্রতবাবুর চাকুরি হইয়াছে এবং তিনি সুপ্রিয়াকে লইয়া কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। সৌরীনবাবু ঠিক তেমনই আছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার নিজের এলাকার সমস্ত গরুর পায়ে ঘুঙুর পরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। বলিতেছেন এটা ব্যাপকভাবে করিতে পারিলে গোধূলিটা সত্যই মনোরম হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে গোধূলিতে ধূলি ছাড়া আর কিছু নাই। পরেশ-দা বদলি হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে যিনি আসিয়াছেন তিনি মুসলমান, বিমলের সহিত এখনও তেমন আলাপ হয় নাই। বিনোদিনীকে লইয়া অমর প্রকাশ্য দিবালোকেই এক দিন তাহার বাসায় আসিয়াছিল। অমর বিনোদিনীকে এখনও তাহার পাপের কথা বলিতে পারে নাই। এ-অঞ্চলে যাহাতে 'নাইট স্কুল' হয় তাহারই চেষ্টায় সে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিনোদিনীর সহিত বিমলও প্রকাশ্যভাবে নানা স্থানে আজকাল ঘুরিতেছে। মথুরবাবু নাই, সুতরং পরদা ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া হরেন বোস গুপিবাবুর দলে কানাঘুসাও চলিতেছে। প্রতাপবাবু ডাক্তার এবং রমেশবাবু মোক্তার ভাঙা চৌকিতে বসিয়া এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই তর্ক করিয়া চলিয়াছেন। সেদিনই হাসপাতাল যাইতে যাইতে বিমল শুনিতে পাইল রমেশবাবু বলিতেছেন যে আজকাল যে এত অনাবৃষ্টি

তাহার কারণ পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপবাবুর মত ভিন্ন প্রকার, তাঁহার মতে ইংরেজ রাজত্বই ইহার কারণ! উভয়ের তর্ক চলিতে লাগিল, বিমল সবটা শুনিতে পাইল না।

মণিমালা ভালই আছে, প্রায়ই চিঠি লেখে। প্রায়ই চিঠি লেখে বটে, চিঠিতে বিমলের জন্য উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করে, কিন্তু কেমন যেন মন ভরে না। বিমলের মনে হয় সে রেডিও, সিনেমা, ভাই-বোন, মা-বাবা, শাড়ী-ব্লাউস এই সকল লইয়াই বেশী মাতিয়া আছে, লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্যই মাঝে মাঝে তাহাকে চিঠি লেখে। চিঠিতে নানা রকম কথা থাকে, কিন্তু কিসের যেন একটা অভাবও থাকে, ঠিক যে সেটা কি তাহা বিমল বুঝিতে পারে না। তাহার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় মণিমালা বোধ হয় তাহাকে পছন্দ করে নাই, তাহার স্বামীর আদর্শের অনুরূপ হয়ত সে নয়। সে ত প্রায়ই গল্প করিত তাহার কোন বান্ধবী আই. সি. এস.কে বিবাহ করিয়াছে, কাহার খুব বড় জমিদারের ঘরে বিবাহ হইয়াছে, এক জনের স্বামী নাকি ব্যারিস্টার, তাহাদের না কি তিন খানা মোটর, আর এক জনের না কি কোন এক দালালের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে সে না কি 'অসম্ভব' বড়লোক। ইহাদের কাহারও সহিত বিমল পাল্লা দিতে পারে না, মানুষ হিসাবে সে হয়ত ইহাদের সমকক্ষ, কিন্তু মানুষটাকে মণিমালা চিনিয়াছে কি? বিমল ঠিক বুঝিতে পারে না। হয়ত এ-সব কিছুই নয়, সমস্তই তাহার কল্পনাপ্রবণ মনের সৃষ্টি, হয়ত মণিমালা সত্যই তাহাকে ভালবাসে!

আর একটা বিষয়েও বিমলের মনে অশান্তি ছিল। তাহার বিবেকের সহিত তাহার আচরণের কিছুতেই মিল হইতেছিল না। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের খরস্রোতে সে ভাসিয়া চলিয়াছিল, ইচ্ছা করিলেও সে আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না, হাস-পাতালের দীন দরিদ্র রোগীর দল গুপিবাবুর কবলেই পড়িতেছিল, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও বিমলের কিছু করিবার উপায় ছিল না। ডাক আসিলে যাইতেই হয়, অর্থের জন্য না হইলেও খাতিরে পড়িয়া যাইতে হয়। কাহাকে ফিরাইবে সে! দুই-চারি বার কনসালটেশনে আসিয়া সাহেব সিভিল-সার্জনের উগ্রতাও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। হরেন বোস তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও আর কিছু করিতে পারিবে না। হরেন বোস ইদানীং আর বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহেও না, বরং তাহার সহিত ভাব করিবার জন্যই ব্যগ্র! এমনি করিয়াই দিনের পর দিন কাটিতেছিল এবং আরও কিছু দিন হয়ত কাটিত কিন্তু সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। সহসা এক দিন সকালে আয়নায় মুখ দেখিতে গিয়া বিমল লক্ষ্য করিল তাহার মুখময় লাল লাল চাকা চাকা কি যেন বাহির হইয়াছে। মতিবাবুর সিংহের মত মুখখানা তাহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল। সে সভয়ে বিস্ফারিত চক্ষে আয়নাটার দিকে চাহিয়া রহিল। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য





ভাদ্রশ্রী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বাংলা টাইপরাইটার ও যুক্তাক্ষর-বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশৈলজানন্দ মহলানবিশ

বাংলা ভাষাকে সর্ব্বপ্রকারে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে বাংলা টাইপরাইটারের কথাও আমাদিগকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। বাংলা অক্ষরের সংখ্যাধিক্য হেতু বাংলা ভাষায় ছাপার কাজে যে-সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, লাইনোটাইপের উদ্ভাবনে সেই অসুবিধা বহুলাংশে হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়; কিন্তু তাহাতেও বাংলা টাইপরাইটারের অসুবিধাগুলি সম্যক্ দূরীভূত হইবে না।

কি ব্যবসায়ী মহলে, কি ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে, কিংবা আপিস-আদালত ইত্যাদিতে এখন টাইপরাইটারের আদর ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। লেখায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও দ্রুত লিখন—এই দুইটি টাইপরাইটারের প্রধান বিশেষত্ব। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই টাইপ-রাইটার বাজারে আছে, কিন্তু বাংলা টাইপরাইটারের প্রচলন অতি কম।

ইংরেজী টাইপরাইটারের ব্যবহারাধিক্যের অনুবিধ কারণ থাকিলেও বাঙালীর নিকট বাংলা টাইপ-রাইটারেরই আদর হওয়া বেশী স্বাভাবিক। বাঙালীর সহিত বাঙালীর চিঠিপত্রাদির আদান-প্রদানে, বাঙালীর আপিসে, মহাজনের গদীতে, জমিদারী সেরেস্তায়, বাঙালীর ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে, গ্রন্থকারের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লিখনে, আইনজীবীর সেরেস্তায়, সরকারী আপিস-আদালতে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে যেখানেই এখনও কাগজপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, সেখানেই বাংলা টাইপ-রাইটারের ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ বাঙালীর নিকট ইহা নিজস্ব লিখনযন্ত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙালীর নিকটও বাংলা টাইপরাইটারের তেমন আদর হইতেছে না। ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে বাংলা অক্ষরের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। এই সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ বাংলা লিখনে বহুসংখ্যক যুক্তাক্ষরের ব্যবহার। এই যুক্তাক্ষরগুলি বর্জ্জন করিতে না পারিলে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করিয়া বাংলা টাইপরাইটার নির্ম্মাণের আশা করা যায় না।

বাংলা বর্ণমালায় ৫২টি বর্ণ আছে। তন্মধ্যে স্বরবর্ণ ১২টি (ঋৢ ও ৯৯ র ব্যবহার নাই বলিয়া বর্ণমালা হইতে আজকাল এই দুইটি বর্ণ বাদ দেওয়া হয়) এবং বর্গীয় বর্ণ ও য র ল ব শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ এই কয়টি বর্ণে মিলিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি। ক্ষ এই যুক্তাক্ষরটিকেও কেহ কেহ বর্ণমালা সামিলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বর্ণ-গুলির মধ্যে একই আকৃতিবিশিষ্ট ব দুইটি আছে বলিয়া ক্ষ এই যুক্তাক্ষরটিকে বর্ণমালা-মধ্যে স্থান দিলেও ৫২টি টাইপ বা অক্ষরে বাংলা ভাষায় সমস্ত বর্ণ লিখা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইংরেজীতে ২৬টি বর্ণ থাকিলেও প্রত্যেকটি বর্ণের ছোট হাতের ও বড় হাতের অক্ষর ভেদে দুই প্রকার অক্ষর আছে বলিয়া ইংরেজী লিখনে ২৬টি বর্ণের জন্য ৫২টি টাইপ বা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। বাংলা বর্ণগুলির ইংরেজীর ন্যায় দ্বিবিধ অক্ষর নাই। এই হিসাবে উভয় ভাষায় অক্ষরসংখ্যা সমান। ইংরেজী ন্যায় বাংলাতেও যদি মূলবর্ণগুলির কোনরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়া কেবল মূল অক্ষরেই যাবতীয় বাক্য লিখন চলিত, তাহা হইলে কি মুদ্রাযন্ত্রে, কি টাইপরাইটারে বাংলা লিখনে ইংরেজী ভাষায় যে যে সুবিধা বর্ত্তমান রহিয়াছে, বাংলা ভাষাতেও সেই সেই সুবিধা পাওয়া যাইত। কিন্তু বাংলা ভাষায় তাহা হইতেছে না যেহেতু ইংরেজী লিখনে ইংরেজি অক্ষরগুলির ব্যবহারে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়, বাংলা লিখনে বাংলা অক্ষরের ব্যবহারে তাহার সঙ্গে অনেক পার্থক্য আছে।

বাংলা ভাষায় যদিও অক্ষরসংখ্যা পূর্ব্বোক্ত মত ৫২টি এবং ইংরেজী অক্ষরের মত বাংলা অক্ষরগুলি দ্বিবিধ

রূপবিশিষ্ট নয়, তথাপি বর্ণগুলির পরস্পর সংযোগে অনেকগুলি যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কতকগুলি বর্ণের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। ইংরেজীতে দুই-একটি ডিপথং ছাড়া কোন যুক্তাক্ষর দৃষ্ট হয় না এবং তাহার ব্যবহারও অতি কম, কিন্তু বাংলায় পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক।

বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণগুলি পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হইলে অ ও ৯ এই দুইটি স্বরবর্ণ ব্যতীত অন্য স্বরবর্ণগুলির পরিবর্ত্তে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে অ বর্ণটির লোপ হয় এবং ৯টি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হয়। এই চিহ্নগুলিকে আমরা স্বরচিহ্ন বলিয়া থাকি। ৯কার সহ স্বরচিহ্ন ১১টি, তন্মধ্যে ৯কারের ব্যবহার কচিৎ দৃষ্ট হয়। স্থলবিশেষে অকারের লোপ হইলে লুপ্ত অকারের একটি চিহ্ন থাকে, কিন্তু উহাকে আকারাদি স্বরচিহ্নের সামিলে ধরা হয় না।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে য র ল ব ম ন ণ এই কয়টি বর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ইহাদের পরিবর্ত্তেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বা পরিবর্ত্তিত রূপ ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে আমরা এই সকল বর্ণের ফলা বলি। র পরবর্ত্তী বর্ণে যুক্ত হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে একটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নটিকে আমরা (ˊ) রেফ্ চিহ্ন বলি। এই জন্য এই ৭টি বর্ণের ৮টি ব্যঞ্জন চিহ্ন আছে।

এতদ্ব্যতীত বাংলায় একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগে অনেকগুলি যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যুক্তাক্ষরগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন টাইপ আছে। আবার স্বরচিহ্ন ও ব্যঞ্জনচিহ্ন যোগেও মূলবর্ণ এবং যুক্তাক্ষরের বহুবিধ টাইপ আছে। বাংলায় মুদ্রণকার্য্যে এই টাইপগুলির সমস্তই ব্যবহৃত হয়। এই জন্য যদিও বাংলা ভাষায় মূল অক্ষরসংখ্যা পূর্ব্বোক্ত মত ৫২টি, তথাপি বাংলা ভাষায় মুদ্রণকার্য্যে যে-সমস্ত টাইপ ব্যবহৃত হয়, তাহার সংখ্যা অত্যধিক। এই জন্যই ইংরেজী ভাষায় যে-স্থলে ৫২টি অক্ষরে যাবতীয় কথা মুদ্রণ করা যায় এবং এই ৫২টি অক্ষরেই যে-স্থলে টাইপরাইটারে যাবতীয় কথা লিখিত হয়, সে-স্থলে বাংলা ভাষায় ৫২টি অক্ষরের বহুবিধ পরিবর্ত্তন হেতু বহুসংখ্যক টাইপের প্রয়োজন হয় বলিয়া ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় অক্ষরসংখ্যা সমান হইলেও মুদ্রণকার্য্যে ও টাইপরাইটারের লিখনে আমরা বাংলা ভাষায় ইংরেজী ভাষার ন্যায় সুবিধা পাইতেছি না।

উপরে আমরা বর্ণগুলি সম্পর্কে যে-সমস্ত টাইপের কথা বলিয়াছি, তাহা ছাড়াও সংখ্যা ও নানাবিধ চিহ্নের ব্যবহার জন্য বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই আরও কতকগুলি টাইপের ব্যবহার আছে। এই টাইপগুলির সংখ্যা উভয় ভাষাতেই প্রায় সমান এবং ইংরেজী বা বাংলা যে-কোন ভাষায় লিখনে ইহাদের ব্যবহার অপরিহার্য্য। বাংলা টাইপের সংখ্যাধিক্য হ্রাস করা হইলেও এই টাইপগুলি বাদ দেওয়া যায় না; এই জন্য উভয় ভাষায় অপরিহার্য্য এই টাইপগুলি সম্পর্কে আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ কোন কথা উল্লেখ না করিয়া শুধু বর্ণগুলি সম্পর্কে যে-সমস্ত টাইপের ব্যবহার আছে তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। আমরা কোন কথা উল্লেখ না করিলেও যাবতীয় ইংরেজী বা বাংলা লিখনে সংখ্যা ও চিহ্ন লিখনের জন্য বর্ত্তমানে যে-সব টাইপের ব্যবহার আছে তাহা অপরিহার্য্য, এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

ছাপার লেখার সঙ্গে টাইপরাইটারের লেখার সামঞ্জস্য না থাকিলে টাইপরাইটারের লেখার আদর হয় না। দ্রুত লিখন যেমন টাইপরাইটারের একটি বিশেষত্ব, ছাপার লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লিখনও টাইপরাইটারের একটি অতি আবশ্যক কার্য্য। আমরা ইংরেজী টাইপরাইটারে এই উভয়ের সমাবেশ দেখিতে পাই। ইংরেজীতে যে ৫২টি টাইপ দ্বারা যাবতীয় ইংরেজী বাক্য মুদ্রিত হয়, সেই ৫২টি টাইপেই টাইপরাইটারে যাবতীয় কথা লিখিত হয়, এই জন্য ছাপার লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া টাইপরাইটারে যাবতীয় ইংরেজী লিখন সম্ভব হইতেছে। কিন্তু বাংলা টাইপরাইটারে তাহা সম্ভব হয় না। বাংলা ভাষায় ছাপার কাজে যে বহুসংখ্যক টাইপ যুক্তাক্ষর লিখনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের সকলের স্থান টাইপরাইটারে করা সম্ভব নয় বলিয়া টাইপরাইটারে

বাংলা লিখনের জন্য বাংলা-টাইপরাইটারে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে ছাপার লেখার সঙ্গে টাইপরাইটারের লেখার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। এজন্য বাংলা টাইপরাইটারের বা যাঁহারা বাংলা টাইপরাইটার নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহাদের দোষ ধরা চলে না, বরং বর্ত্তমান লিখনপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া টাইপরাইটারে বাংলা লিখন জন্য যতটুক ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা করিয়া টাইপরাইটার-নির্ম্মাণকারিগণ বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বাজারে অধুনা যে-সকল বাংলা টাইপরাইটার আছে তাহাতে দেখিতে পাই বাংলা যুক্তাক্ষরগুলি টাইপ করার ব্যবস্থার জন্য যথোচিত চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটি নির্ম্মাণকারীরা করেন নাই কিন্তু তাহাতেও ছাপার লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমস্ত যুক্তাক্ষর টাইপ করার ব্যবস্থা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই টাইপরাইটারগুলিতে কতকগুলি যুক্তাক্ষরের টাইপ আছে এবং আরও কতকগুলি যুক্তাক্ষর টাইপ করার জন্য কতকগুলি বর্ণের ভগ্ন অংশের বা চিহ্নের টাইপ আছে যাহার দ্বারা অন্য টাইপের সঙ্গে একাধিক আঘাতে কতকগুলি যুক্তাক্ষর টাইপ করা যায়। কিন্তু ইহাতেও বাংলায় যতগুলি যুক্তাক্ষর আছে তাহাদের সমস্ত টাইপ করার সুবিধা হয় না। পরন্তু এই যুক্তাক্ষরগুলির ব্যবস্থা করিতে গিয়া নির্ম্মাণকারীরা টাইপরাইটারে কতকগুলি মূল অক্ষর বাদ দিয়াছেন যাহা টাইপ করিতে একাধিক আঘাতের প্রয়োজন হয়। এই জন্য তাঁহাদিগকে keyর সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। আমরা বাংলা টাইপরাইটারে টাইপ করিতে অভ্যস্ত নই। তথাপি এই টাইপরাইটারগুলির টাইপের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় ইংরেজী টাইপরাইটারের ন্যায় বাংলা টাইপরাইটারে টাইপ করা সহজ নয় এবং দ্রুত টাইপ করার পক্ষেও অসুবিধা আছে। এই সকল অসুবিধা দূর করিতে হইলে বাংলা লিখনে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার বাদ দিয়া টাইপের সংখ্যা অনেক হ্রাস করিতে হইবে। লাইনোটাইপের উদ্ভাবনে টাইপ-সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু লাইনোটাইপেও যুক্তাক্ষর ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকায় এখনও টাইপের সংখ্যা এরূপ কম মাত্রায় পৌঁছে নাই যাহা দ্বারা লাইনোটাইপের লেখার সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বাংলা টাইপরাইটার দ্বারা যাবতীয় বাংলা লিখন চলিতে পারে। যদিই বা keyর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লাইনোটাইপের টাইপের ব্যবস্থা টাইপরাইটারে করা সম্ভব হয় তাহা হইলে keyর সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু দ্রুত অঙ্গুলী চালনায় অসুবিধা হইবে এবং তাহাতে দ্রুত লিখনও ব্যাহত হইবে। এই জন্য টাইপরাইটারের অসুবিধা দূর করিতে হইলে বাংলা টাইপের সংখ্যা লাইনোটাইপের টাইপ-সংখ্যা হইতেও আরও হ্রাস করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে বাংলা লিখনে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করাই একমাত্র পন্থা।

এই যুক্তাক্ষর বর্জ্জন শুধু টাইপরাইটারের লেখাতেই করিলে চলিবে না। ছাপার কাজে ও হস্তলিপিতেও যুক্তাক্ষরের ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, টাইপরাইটারের জন্য টাইপ-সংখ্যা কমাইতে যুক্তাক্ষর-বর্জ্জন আবশ্যক হইলেও ছাপার কাজে যুক্তাক্ষর-বর্জ্জনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ছাপার লেখার সঙ্গে টাইপরাইটারের লেখার সামঞ্জস্য বিধান না করিতে পারিলে বাংলা টাইপরাইটারের লেখার আদর হইবে না। এই জন্য টাইপরাইটারকে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে টাইপরাইটার হইতে যেমন যুক্তাক্ষর বাদ দিতে হইবে, ছাপার কাজ ও হস্তলিপিতেও তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাতে ছাপার কাজে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না, বরং টাইপ-সংখ্যা কমিয়া গেলে ছাপার কাজ আরও সহজ হইবে।

যুক্তাক্ষরের ব্যবহার উঠাইয়া দিলে ছাপার কাজ ও টাইপরাইটারে বাংলা লিখনই যে কেবল সুবিধা হইবে তাহা নয়, প্রথম-শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাংলা লিখন ও পঠন আরও সহজ হইবে। গুরুমহাশয়দেরও আর সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে যুক্তাক্ষর শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেগ পাইতে হইবে না। এই যুক্তাক্ষরগুলির সঙ্গে পরিচিত হইতে এবং এই যুক্তাক্ষরগুলির পাঠ ও লিখন শিক্ষা করিতে যে সময় নষ্ট হয় সেই সময়টুকু বালক-বালিকা-

দের শিক্ষার জন্য অন্য ভাবে ব্যয় করিলে তাহাদিগকে এই সময় মধ্যে আরও কত কিছু শিখান যায়। এই হিসাবেও যুক্তাক্ষর-বর্জ্জনের একটা সার্থকতা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় সহজে বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য বানান-পদ্ধতির সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। এই সময় যদি লিখন-পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করিয়া যুক্তাক্ষরের ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে পারেন তাহা হইলে প্রথম-শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাংলা লিখন ও পঠন যেমন সহজ হইবে, অন্য দিকে ছাপার কাজে ও টাইপ-রাইটারের লিখন-ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হওয়ার দরুন বাংলা ভাষা নানা দিক্ দিয়াই অধিকতর কার্য্যকরী হইবে।

যুক্তাক্ষরের ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্ব্ব হইতেই অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন; এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও আলোচনা হইয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের এই আলোচনা নূতন নয়, পুরাতনেরই পুনরালোচনা মাত্র।

এই যুক্তাক্ষরের ব্যবহার বাদ দেওয়ার জন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে স্বরান্ত করিয়া না লিখিয়া সর্ব্বদাই হস্ চিহ্ন যুক্ত করিয়া খাঁটি ব্যঞ্জনবর্ণ ভাবে দেখাইতে হইবে এবং স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন-বর্ণের জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার না করিয়া মূলবর্ণদ্বারাই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যুক্তবর্ণ স্থলে যে-যে বর্ণ যুক্ত হইয়াছে তাহা পৃথক পৃথক্ ভাবে দেখাইতে হইবে। তাহাদের মতে 'বন্দেমাতরম্' লিখিতে হইবে 'ব্অন্দ্এম্আত্অর্অম্'। অভ্যাস দ্বারা সবই হইতে পারে কিন্তু ইহাতে বানানেও এক নূতন পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হইবে এবং এই ভাবে পুনঃ পুনঃ হস্ চিহ্নের ব্যবহার হস্তলিখনে বিরক্তি উৎপাদন করিবে।

কেহ কেহ আবার এই মতটি একটু পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিতে বলেন। তাঁহাদের মতে অকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণটিকে হস্ চিহ্নদ্বারা ব্যঞ্জনান্ত করার আবশ্যক নাই। ইহাতে লিখনে বর্ণসংখ্যা কমিয়া যাইবে। তাঁহাদের মতে "বন্দেমাতরম্" লিখিতে "বন্দ্এম্আতরম্" এই ভাবে লিখিতে হয়। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা হইতে পারে।

আবার কেহ কেহ বলেন ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে যখন স্বরবর্ণের যোগ হয় বা ব্যঞ্জনচিহ্নের ব্যবহার হয় তখন ব্যঞ্জনবর্ণে হস্ চিহ্নের ব্যবহার করিতে হয় না বলিয়া শুধু যুক্তাক্ষরের সময়ই ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে হস্ চিহ্ন দিয়া পৃথক্ করিয়া দেখান ভাল। অন্যত্র যেখানে ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ যুক্ত থাকে বা স্বরচিহ্ন কি ব্যঞ্জন-চিহ্নের ব্যবহার থাকে সেখানে ব্যঞ্জনবর্ণে হস্ চিহ্ন যোগ করার কোন আবশ্যক থাকে না। তাঁহাদের মতে স্বরচিহ্ন ও ব্যঞ্জনচিহ্নের ব্যবহার বাদ দেওয়ার আবশ্যকতা নাই এবং বর্ণের দ্বিবিধ অক্ষর না রাখিয়া হস্ চিহ্নের জন্য পৃথক্ টাইপের ব্যবস্থা থাকিলেই চলে। এই মত অনুসরণ করিলে 'বন্দেমাতরম্' লিখিতে, লিখিতে হইবে "বন্দেমাতরম্"। পূর্ব্বোক্ত মতে যতগুলি টাইপের আবশ্যক হইতে পারে এই মতটিতে টাইপের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে কিন্তু ইহাতে কতকগুলি সুবিধাও আছে।

আমরা শেষোক্ত মতটিই একটু পরিবর্ত্তিত আকারে সমর্থন করি। আমরা যুক্তাক্ষরের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করার জন্য হস্ চিহ্নটির পরিবর্ত্তে এমন একটি চিহ্ন গ্রহণ করিতে চাই যাহা দ্বারা শুধু বর্ণগুলির সংযোজন-ক্রিয়াই ধরিয়া লওয়া যায় এবং সেই চিহ্নটি এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে কোন সময়েই অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন চিহ্নের সঙ্গে ভ্রান্তি উৎপাদনের কারণ না হয়। হস্ চিহ্নটি ব্যবহারে সময় সময় পাঠবিভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। শব্দের মধ্যস্থিত যুক্তাক্ষর বিচ্ছিন্ন করা কালে হস্ চিহ্নের ব্যবহারে উচ্চারণের তালে পাঠে কোন অসুবিধা না হইলেও শব্দের আদিস্থিত যুক্তাক্ষর প্রদর্শনে, বিশেষতঃ যদি তাহার সঙ্গে স্বর বা ব্যঞ্জন চিহ্নাদির যোগ থাকে তাহা হইলে, পাঠবিভ্রম হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী থাকে। বন্দেমাতরম্ লিখিতে বন্দেমাতরম্ এই ভাবে লিখিলে পাঠবিভ্রম না-হইতে পারে, কিন্তু "ষ্টেশন" লিখিতে যদি ষ্টেশন লিখি তাহা হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে পাঠবিভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। হস্-চিহ্ন দ্বারা যুক্তাক্ষর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে বানান-পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করিতে হইবে।

এই জন্য আমরা অন্যান্য চিহ্ন হইতেপৃথক্ একটি চিহ্ন দ্বারা যুক্তাক্ষরের বর্ণগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান সমীচীন মনে করি। আমরা যুক্তাক্ষর বিচ্ছিন্ন করিয়া, বিচ্ছিন বর্ণগুলির মধ্যে (/) এই চিহ্নটি বসাইয়া বর্ণগুলির সংযোগ প্রকাশ করা সুবিধাজনক মনে করি। (/) এই চিহ্নটি যুক্তাক্ষরের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সংযোগ হওয়া ছাড়া অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করিবে না। হস্তলিখনেও এই চিহ্নটির ব্যবহার মোটেই অসুবিধাজনক নহে। আমরা অতঃপর এই চিহ্নটিকে যৌগিক চিহ্ন বলিয়া অভিহিত করিব। এই চিহ্নটির ব্যবহার করিয়া বন্দেমাতরম্ ও ষ্টেশন লিখিতে হইলে বনে/দমাতরম্, ষে/টশন এই ভাবে লিখিতে হইবে। এখানে বানান-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যক করে না। প্রথম-প্রথম পাঠে যে অসুবিধাটুকু হইবে অল্পায়াসেই তাহা দুরীভূত হইবে।

শেষোক্ত অভিমতটির অনুসরণে স্বরচিহ্নগুলি বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী আমরাও নই। তবে টাইপরাইটারের সুবিধার জন্য ব্যঞ্জন চিহ্নগুলির মধ্যে ´ (রেফ চিহ্ন), ্য (যফলা), ্র (রফলা), ্ব (বফলা) ও ম (মফলা) ব্যতীত ন-ফলা, ণ-ফলা ও ল-ফলা আমরা বাদ দিয়া যৌগিক চিহ্নটির যোগে মূল অক্ষর দ্বারা এই তিনটি ফলার কার্য্য সম্পাদন করার মত পোষণ করি। য-ফলা, র-ফলা ও রেফ-চিহ্ন এই তিনটি ফলা-চিহ্নের মূলবর্ণের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য থাকে না বলিয়া এবং ব-ফলা ও ম-ফলার ব্যবহারে ইহাদের মূলবর্ণের উচ্চারণ ঠিক থাকে না বলিয়া এই বিশেষত্বগুলির জন্য ইহাদিগের ব্যবহার বাদ দিতে ইচ্ছা করি না। পক্ষান্তরে ল-ফলা, ন-ফলা ও ণ-ফলা যুক্ত হইলে তাহাদের মূলবর্ণের উচ্চারণ অনেকাংশে ঠিক থাকে বলিয়া ইহাদিগকে ফলা-মধ্যে গণ্য না করিলেও চলিতে পারে অথবা যৌগিক চিহ্নসহ মূলবর্ণ দ্বারাই এই ফলাগুলি প্রদর্শন করিলে মূলতঃ কোন দোষ হয় না।

স্বরচিহ্ন ও ফলাগুলির জন্য পৃথক্ পৃথক্ টাইপের ব্যবস্থা করিলে ইহাদের যোগে বর্ত্তমানে মূলবর্ণের যে বহুবিধ টাইপ হয় তাহার প্রয়োজন থাকিবে না। আমরা দেখিয়াছি এই পন্থা অবলম্বন করিয়া যদি যুক্তাক্ষরগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা যায় তাহা হইলে এক দিকে ছাপার কাজ যেমন সহজ হইবে, অন্য দিকে বাংলা টাইপরাইটারগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে কার্য্যকরী করিয়া গড়িয়া তোলা কষ্টসাধ্য হইবে না।

নিম্নে কতকগুলি আদর্শ দ্বারা আমাদের প্রস্তাবটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ক্ক — ক/ক ; পক/ক ; চিক/কণ।

ঙ্ক = ঙ/ক ; অঙ্ক = অঙ/ক ; পঙি/কল।

গ্ধ = গ/ধ ; দুগ/ধ ; মুগ/ধ।

ঙ্ঘ্য = ঙ/ঘ্য ; দুর্লঙ/ঘ্য।

ন্ত্র্য = ন/ত্র্য ; স্বাতন/ত্র্য।

তীক্ষ/ণ ; বিঘ/ন, অল/প, অম/ল, পদ্ম, বিল্ব ইত্যাদি। দম/ভ ও অহঙ/কার যুক/ত কাম ও রাগ দবারা পে্রিত হইয়া যাহারা শাস/ত্রীয বিধি বিহীন ঘোর তপ করে সেই মূঢ়েরা শরীর মধ্যস/থ পঞ/চ মহাভূত ও অন/তঃকরণস/থ আমাকেও কষ/ট দেয়।

এই ভাবে একটি চিহ্নবিশেষ দ্বারা লিখন-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিলে নিম্নলিখিত টাইপগুলি দ্বারাই বাংলায় যাবতীয় মুদ্রণকার্য্য চলিতে পারে।

১২টি স্বরবর্ণের জন্য (আ বর্ণ বাদ দিয়া) ...	১১টি টাইপ
স্বর চিহ্নের জন্য (ওকার বাদে) ...	১০টি টাইপ
হস্ চিহ্ন যোগে ত অক্ষরটি দ্বারা ৎ লিখনের ব্যবস্থা করিয়া এবং একটি ব বাদ দিয়া ব্যঞ্জনবর্ণগুলির জন্য ...	৩৮টি টাইপ
´ (রেফ চিহ্ন), ্য (যফলা), ্র (রফলা), ম (মফলা), (বফলা) এই কয়টির জন্য ...	৫টি টাইপ
(্) হস্ চিহ্ন ও পূর্ব্বোক্ত (/) যৌগিক চিহ্নের জন্য	২টি টাইপ
ক্ষ ও শ্রী লিখন জন্য ...	২টি টাইপ*
	৬৮টি টাইপ

* যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়া হইলেও ক্ষ ও শ্রী এই দুইটিকে আমরা বাদ দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। বিশিষ্ট উচ্চারণের জন্য এবং ব্যবহারাধিক্যের জন্য ক্ষ-কে কেহ কেহ বর্ণমালা সামিলেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রী এই অক্ষরটিরও একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ আছে এবং নামের পূর্ব্বে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার হয়। এই জন্য ইহাদের জন্য পৃথক্ টাইপের ব্যবস্থা রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

উপরোক্ত ৬৮টি টাইপ ছাড়াও সংখ্যা-লিখন ও চিহ্নাদির জন্য বর্ত্তমানে যে-সকল টাইপের ব্যবহার হয় সেই সমস্ত টাইপও আবশ্যক হইবে।

বর্ণসম্পর্কে যে-সমস্ত টাইপের ব্যবহার হইবে তাহা ছাড়াও সংখ্যালিখন জন্য ১০টি টাইপের ব্যবস্থা টাইপ-রাইটারে করিয়া চিহ্নাদির জন্য যে-সমস্ত টাইপ মুদ্রাযন্ত্রে ব্যবহৃত হয় তাহার সকলগুলির স্থান টাইপরাইটারে হয় না, এই জন্য সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি চিহ্নের ব্যবস্থা টাইপরাইটারে রাখিলেই মোটামুটি সর্ব্ব-প্রকার লিখনই টাইপরাইটারে চলিতে পারে। ইংরেজী টাইপরাইটারেও সেইরূপ ব্যবস্থাই আছে।

বাংলা টাইপরাইটারে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলির ব্যবস্থা থাকিলেই চলিতে পারে, যথা :—

। (দাঁড়ি চিহ্ন) , (কমা) : (কোলন) — (ড্যাশ) ? (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) ( ) (বন্ধনীদ্বয়) ' (কোটেশন চিহ্ন) — (লাইন টানার জন্য একটি চিহ্ন) ৵ (দুই পণ) ৶ (তিন পণ) ৷ (তিন চোক) ৎ (গণ্ডা লিখন জন্য ইলেক) ৲ (কাহন চিহ্ন) × (গুণন চিহ্ন) + (যোগ চিহ্ন) ˙ (আনা ও দশমিক চিহ্নের জন্য বিন্দু চিহ্ন)। এই কয়টি চিহ্ন থাকিলেই মোটামুটি লিখনে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা পাওয়া যাইবে।

সেমিকোলন (;) চিহ্নটি, কমা ও কোলন যোগে এবং কোটেশন-চিহ্ন ও কোলন-চিহ্ন বা বিন্দু-চিহ্ন যোগে (!) আশ্চর্য্যবোধক চিহ্নটি টাইপ করা যাইবে। তবে কোটেশন চিহ্নটি ' কমার মত না দিয়া আশ্চর্য্যবোধক চিহ্নটির উপরি অংশের চিহ্নটির (।) মত করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এক পণ বা ক্রান্তি কিংবা সের পোয়া ইত্যাদির চিহ্ন (⁄) পূর্ব্বোক্ত যৌগিক চিহ্নটি দ্বারাই দেওয়া যাইবে। দাঁড়ি চিহ্নটি দ্বারা এক চোক দুই চোক লিখা যায়।

বর্ত্তমানে বাংলায় যে টাইপরাইটার আছে তাহাতে keyর সংখ্যা বেশী থাকায় তাহার মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত টাইপেরই স্থান করা যাইবে, এমন কি আমরা যে তিনটি ফলা বাদ দিতে বলিয়াছি তাহার স্থানও হইতে পারে। তবে আমরা দেখিয়াছি কয়েকটি টাইপ dead keyতে (যে-সমস্ত keyতে আঘাত করিলে রোলার সরিয়া যায় না) রাখিয়া ৪২টি keyর মধ্যেই প্রয়োজনীয় সকল টাইপ-গুলির ব্যবস্থা হইতে পারে। নিম্নে আমরা তাহাই দেখাইব।

অ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

এই ১০টি স্বরবর্ণের জন্য	১০টি টাইপ
বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য	২৫টি টাইপ
য ল শ ষ স হ ং : ক্ষ শ্রী এই কয়টির জন্য	১০টি টাইপ
(া) আকার (ি) (ী) ঈকার (ু) উকার (ূ) ঊকার (ৃ) ঋকার (ে) একার (ৈ) ঐকার (ৌ) ঔকারের অংশ— এই ৯টি স্বরচিহ্নের জন্য	৯টি টাইপ
(্য) য-ফলা (্ব) ব-ফলা (্ম) ম-ফলা এই তিনটির জন্য	৩টি টাইপ
পূর্ব্বোক্ত যৌগিক চিহ্নটির জন্য (⁄) একটি	১টি টাইপ
সংখ্যা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০ এই দশটির জন্য	১০টি টাইপ
(×) গুণন চিহ্নটির জন্য…	১টি টাইপ
৵ ৶ ৷ ৎ (ইলেক) ৲ (কাহন-চিহ্ন) …	৫টি টাইপ
।, : - ? ( ) ' — . এই দশটি চিহ্নের	১০টি টাইপ
	৮৪টি টাইপ

এতদ্ব্যতীত (ঁ) চন্দ্রবিন্দু, (́) রেফ চিহ্ন, (্র)র-ফলা ( ) ব দ্বারা র লিখার জন্য একটি বিন্দু চিহ্ন, dead key-তে রাখিতে হইবে। dead key-তে হস্ চিহ্ন ও (+) যোগচিহ্নটিও রাখিতে পারি। যোগচিহ্ন ও × (গুণনচিহ্ন) যোগে * (তারকা-চিহ্নটি) টাইপ করা যায়। আমরা বাংলা টাইপরাইটারে যে dead key-র ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি তাহা নূতন নয়। dead key বর্ত্তমানেও বাংলা টাইপরাইটারে আছে।

উল্লিখিত টাইপগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, আমরা মূল বর্ণ হইতে স্বরবর্ণ মধ্যে আ ও ঌ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে র য় ড় ঢ় এবং ৎটি বাদ দিয়াছি। অ এই বর্ণটির সঙ্গে া এই চিহ্নটি যোগ করিয়া দুই আঘাতে আ লিখা

যাইবে। ঌ র ব্যবহার বড় নাই তবুও ঌ সংখ্যাটি দ্বারা ঌ টাইপ করা যাইবে। র য় ড় ঢ় এই বর্ণ dead key-স্থিত বিন্দুর সঙ্গে ব য ড ও ঢ এই কয়টি বর্ণের যোগে দুইটি আঘাতে লিখিতে হইবে। এই ৪টি বর্ণমধ্যে র ও য় এই দুইটি বর্ণের ব্যবহার বেশী, তবুও dead keyর সঙ্গে ডবল আঘাতে সময় বেশী নষ্ট হইবে না, বিশেষতঃ ব য ড ও ঢ এই dead keyর বর্ণগুলির সঙ্গে শূন্য যুক্তেই যখন ইহাদের উচ্চারণ, তখন dead keyর শূন্যটির কথা সঙ্গে সঙ্গেই মনে উদিত হইবে। তবুও যদি র ও য় এই দুইটির স্থান সচল keyতে করিতে হয় তাহা হইলে বফলা ও মফলা দুইটিকে dead keyতে স্থান দিয়া সচল 'কী'তে স্থান করা যাইবে কিন্তু আমাদের মতে dead keyর সংখ্যাও বেশী বৃদ্ধি করা সঙ্গত নয়।

ঁ ও ´ রেফচিহ্ন সাধারণতঃ বর্ণের উপরে বসে এবং রফলা বর্ণের নীচে বসে বলিয়া আমরা এগুলির স্থান dead keyতে করিয়াছি। কাহন-চিহ্নটি দ্বারাই হস্ চিহ্নের কাজ চলে এবং দাঁড়ি চিহ্ন ও ড্যাশ চিহ্নের যোগে যোগ-চিহ্ন টাইপ করা যায় বলিয়া ইহাদের জন্য dead key না রাখিলেও চলিতে পারে। ৎ টির কাজ হস্ চিহ্ন যুক্ত ত বর্ণ দ্বারাই করা যায়। আমাদের মনে হয়, যুক্তাক্ষরের ব্যবহার তুলিয়া দিয়া বর্ত্তমান লিখনপদ্ধতির সংস্কার সাধন করা হইলে যদি বাংলা টাইপরাইটারগুলি নূতন ভাবে নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে ইংরেজী টাইপরাইটারের ন্যায় বাংলা টাইপরাইটারেও বাংলা লিখন তত দ্রুত না হইলেও বর্ত্তমান টাইপরাইটারের চেয়ে ঐগুলিতে অনেক দ্রুত লিখন সম্ভব হইবে এবং যুক্তাক্ষর লিখনের জন্য কতকগুলি বর্ণের ভগ্ন অংশ যোগ করিয়া, বর্ত্তমানে বাংলা টাইপরাইটারগুলি দ্বারা বাংলা লিখনে যতটা অসুবিধা মনে হয়, উক্ত টাইপরাইটারে সেই অসুবিধা থাকিবে না বলিয়া বাংলা টাইপরাইটারে বাংলা লিখন আরও সহজ ও সরল হইবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, একটি চিহ্ন-বিশেষ মাত্র ব্যবহারে যুক্তাক্ষর-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে বাংলা ভাষা নানা দিক্ দিয়াই অনেক উপকৃত হইবে। যুক্তাক্ষরগুলি বাদ দিলেও এরূপ ব্যবস্থায় যুক্তাক্ষর ব্যবহার দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হইত সেই উদ্দেশ্যের কোন হানি হইবে না, পরন্তু বাংলা ভাষায় মুদ্রণকার্য্য, টাইপরাইটারে বাংলা লিখন, এমন কি নূতন শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাংলা লিখন ও পঠন এবং পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগের পক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া কত সহজ হইবে। আমরা যে প্রণালীটির কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে স্বর-চিহ্ন ও ব্যঞ্জন-চিহ্নের জন্য পৃথক্ কতকগুলি টাইপের ব্যবস্থা করা ছাড়া নূতন কোন প্রকার বর্ণের টাইপের আবশ্যক হইবে না। লাইনোটাইপের জন্য স্বরচিহ্ন ও ব্যঞ্জনচিহ্নের জন্য ইতিমধ্যেই পৃথক্ পৃথক্ টাইপ প্রস্তুত হইয়াছে। যৌগিক চিহ্নটিও নূতন নয়। ছাপাখানায় এরূপ টাইপের ব্যবহার আছে। বানান-পদ্ধতিরও বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্যক করিবে না। লিখনপদ্ধতিতে কেবল যুক্তাক্ষরের ব্যবহার সম্পর্কেই সংস্কার সাধন করিতে হইবে। পাঠেও যে বিশেষ অসুবিধা হইবে তাহা মনে করা যায় না। প্রথম-প্রথম একটু অসুবিধা হইলেও অল্প দিনেই এই অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে।

তবুও সংস্কার বেশীই হউক আর কমই হউক তাহাকে সংস্কার বলিতেই হইবে এবং রক্ষণশীল যাঁহারা তাঁহারা ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিবেন। কিন্তু ইহাও ঠিক যে নানাবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াই জগতে যত কিছু সংস্কার হয়। সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা হইলেও যদি দেখা যায় সংস্কারহেতু অনেকগুলি সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে যাঁহারা প্রথমে বিরোধিতা করেন তাঁহারা পরে এই সংস্কারকেই মানিয়া লন। লেখার পরিবর্ত্তন আরও যে না হইয়াছে তাহা বলা চলে না। প্রাচীন পুঁথির লেখাগুলিই বর্ত্তমানে অনেকেই পড়িতে পারেন না। যদি বাংলা হরপগুলি অন্য কোন হরপ হইতে আসিয়াছে স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও কোন কথা বলাই চলে না। প্রাচীন পুঁথির লেখা বর্ত্তমানের লেখা হইতে একটু ভিন্ন ধরণের হইলেও প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধারের জন্য বাধা পড়িতেছে না। বর্ত্তমানে প্রচলিত লিখনপদ্ধতির সংস্কার করিয়া বাংলা লিখনে বা মুদ্রণে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিলে হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ-

বংশীয়দের পক্ষে কোন দিন বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রিত পুস্তকাদি বা হস্তলিখিত কাগজাদি পাঠে একটু অসুবিধা হইবে। আর এই অসুবিধা শুধু যুক্তাক্ষরের ব্যবহার সম্পর্কেই হইতে পারে বলা যাইতে পারে। পুরাতনের সঙ্গে যোগ রাখিয়াই নূতন পদ্ধতিতে লোক ক্রমে অভ্যস্ত হয়। এই জন্য পুরাতনের সঙ্গে অপরিচিত হইতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এই অবস্থায় আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়েরা যে সময়ে বর্ত্তমান পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবে না সে সময় এখনও বহু দূরে। ইতিমধ্যে কত লেখা কত পুস্তক লোপ পাইবে, কত পুস্তকের নূতন নূতন সংস্করণ বাহির হইবে তাহা কে জানে। কিন্তু একথা নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে যে তখনও এই সমস্ত লেখা বা পুস্তকের পাঠোদ্ধারের লোকের অভাব হইবে না। বর্ত্তমানে লাইনোটাইপেও লিখনপদ্ধতির কতকটা সংস্কার সাধন করিয়াছে, বিশেষতঃ লাইনোটাইপে বহু যুক্তাক্ষরের নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে। যদি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়দের বর্ত্তমান পুস্তকাদি পাঠে কোন অসুবিধা হয় তাহা হইলে লাইনোটাইপের প্রচলনেও তাহা হইবে। এতটা দেখিতে গেলে সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রাচীনকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। সংস্কার দ্বারা কোন বিষয়েরই উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে না।

মূক

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

তোমার কাছে বলতে এলাম, এমন ক'রে ক'দিন কাটে,
স্নেহ-বিহীন, বন্ধু-বিহীন এই পৃথিবীর হাটের মাঝে!
এর-চেয়ে সেই পাখীর জীবন বেশ ছিল মা, বনের নাটে
নিত্য নূতন সুর জাগাতাম আপন মনে সকাল-সাঁঝে!
তার চেয়ে মা, বেশ ছিল সেই বন্য সোনাপোকার জীবন,
সোনার বরণ মহুয়া-ফুল ফুটত আমায় আড়াল করি—
মধুর নেশায় ফুলরাণীদের বক্ষে হ'তাম নিদ্রামগন,
আমার পাখার সোনার লোভে ছুটত পিছে বনের পরী।
তার চেয়ে মা, ছিলাম যখন ভূমিলতা ভূমির তলে,
বৃষ্টিভেজা সোঁদা মাটির ঠাণ্ডা বুকে ছিলাম সুখে,—
নিশুত্ রাতের শিশিরকণা পড়ত পাতায়, পুষ্পদলে,
গন্ধমাখা সেই শিশিরই পড়ত আমার চক্ষে-মুখে!
সুখে ছিলাম যখন ছিলাম বনের বিরাট বনস্পতি
কত দেশের কত পাখী বাঁধত বাসা আমার ডালে,
তাদের কত দুঃখ-সুখ আর সারাদিনের লভ্য-ক্ষতি
কইত তারা আমার পাতার কানে কানে সন্ধ্যাকালে!
একটা ডালে বাস করিত অজগর এক বিরাট্ দেহ,
পায়ের তলায় সিংহশিশু মায়ের সাথে করত খেলা;
সবার বাড়া ছিল মা সেই দ্রাক্ষালতার নিবিড় স্নেহ,
তারা সবাই সঙ্গী ছিল—সাথী আমার ছিল মেলা!

আরও সুখে ছিলাম মাগো, যখন ছিলাম তুচ্ছ তৃণ
বনভূমির অঙ্গখানি শ্যামল শাড়ীর মতন ছেয়ে
হরিণ-শিশুর সঙ্গ আমি হারাই নি মা একটা দিনও,
আমার বুকে নিত্য এসে করত খেলা বাঘের মেয়ে!
শিলা হয়ে ছিলাম যখন সুখে ছিলাম তারও চেয়ে
ঝরণা-ধারা বইত আমার সারা দেহ প্রক্ষালিয়া,
আমার বুকে পরশ দিত ডাগর আঁখি হরিণ-মেয়ে,
শশকশিশু বসত এসে ঝরণাসলিল পান করিয়া!
তারও আগে, দূর অতীতে ছিলাম নীহারিকার কণা,
বিশ্বব্যাপী আঁধারকোলে ছিলাম জ্যোতির বিন্দু আমি;
তুই ছিলি, আর কেউ ছিল না, ছিল না জড়-চেতনা,—
আজকে মনে পড়ছে আমার, সেদিন ছিল কেমন দামী!

দূর অতীতের স্মৃতির মাঝে ডুবতে আমার চাইছে যে মন;
কি-যেন-কি হারিয়ে গেছে—কি-যেন ধন এইছি ভুলে,—
আবার কি মা পাই নে ফিরে বিহগ-বনস্পতির জীবন,
পাথর হ'তে, 'ইথার' হ'তে পারি নে কি সৃষ্টিমূলে!

অতীত আমায় ডাকছে মাগো, মায়ের স্নেহ-সজল স্বরে
ভাষা আমায় হারিয়ে গেছে, সাড়া দেব কেমন ক'রে!

কাঁটানটে

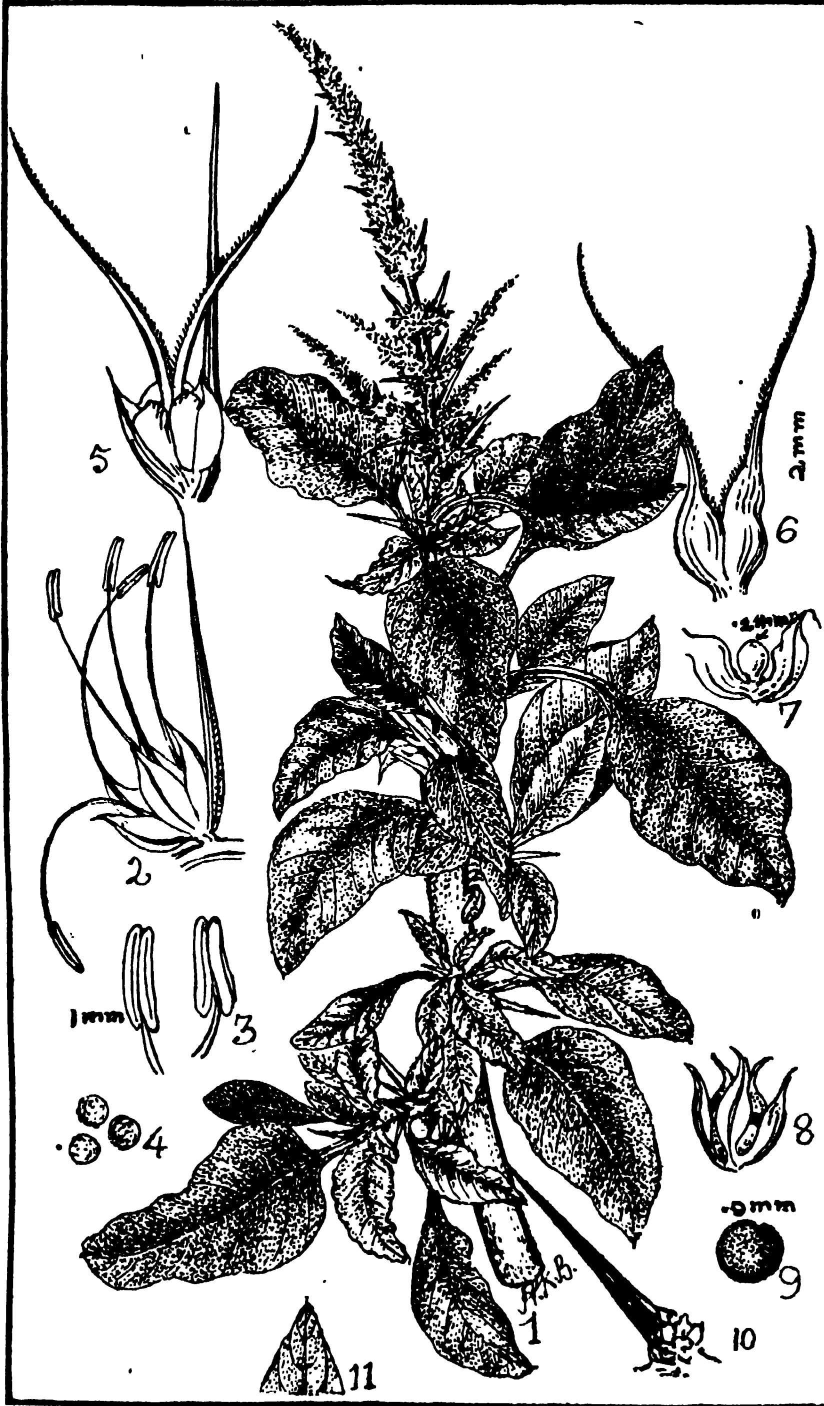
অধ্যাপক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.

কাঁটানটে গরিব পল্লীবাসীর বিশেষ পরিচিত উদ্ভিদ্। সুসভ্য নাগরিকের কর্ণেও উহার নাম শৈশবে বহুবার উচ্চারিত হয়। সেজন্য কাঁটানটে অন্ততঃ স্বনামে প্রায় সকলের নিকটেই পরিচিত। সাধারণতঃ লোকে যাহা চায়, যাহা পাইলে খুশী হয়, সেই রূপ-রস-গন্ধের কিছুই উহাতে নাই; সুতরাং উহার এই পরিচয় যে খুব মধুর নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়। আশৈশব অনাবৃত পায়ে চলার পথে গরিব পল্লীবাসীর সহিত কণ্টকাঘাত দ্বারা উহার যে পরিচয় হয়, তাহা কখনই ভুলিবার নহে; কেননা এই পরিচয় শুধু শৈশবেই সীমাবদ্ধ নহে। কাঁটানটে সুসভ্য নগরবাসীর পদচুম্বনের সুযোগ না পাইলেও প্রত্যেক রূপকথার শেষে যে-ছড়া শিশুমুখে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়, তাহার ভিতর উহার নামের উল্লেখ থাকাতে, উহা প্রায় সকলের নিকটেই শৈশব হইতে পরিচিত। সেই ছড়াতেও অবশ্য উহার প্রতি ঘৃণার ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে, কেন-না কাঁটানটের মুণ্ডপাতই সেই ছড়ার ভাবার্থ। শিশুর অনাবৃত পায়ে বাল-সুলভ অসতর্ক পদক্ষেপের সময়, উহার কণ্টকাঘাতজনিত যন্ত্রণায় শিশুকে সান্ত্বনা দান জন্য জানি না কোন্ অতীতে, কোন্ বঙ্গজননীর মুখে এই ছড়া প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, যাহার ফলে কাঁটানটের নাম বহু লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছে। বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত রক্‌সবার্গ (W. Roxburgh) সাহেবের চক্ষেও উহা একটি নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক উদ্ভিদ্ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার "ভারতীয় উদ্ভিদ্" (*Flora Indica*) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উহাকে, বিশেষভাবে শীত এবং বর্ষাকালে, একটি যন্ত্রণাদায়ক আগাছা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।*

কিন্তু জীবন-সংগ্রামের দিক্ দিয়া কাঁটানটের পক্ষে এই কণ্টকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; সুতরাং অনাবশ্যক কিংবা অবান্তর বলা যায় না।

জীবন-সংগ্রামে পরাজিত বহু বিরাটাকার উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বংশ যে চিরতরে পৃথিবীবক্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ভূগর্ভে স্তরের ভিতরে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ অতি নগণ্য সাধারণ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ আজও তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহার আত্মরক্ষার দক্ষতা যে কোথায়, তাহা কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি। নগণ্য উদ্ভিদ্ কাঁটানটের অস্তিত্ব এবং বিস্তৃতির প্রধান কারণ যে তাহার কণ্টক, তাহার প্রমাণ তাহার সমশ্রেণীর কণ্টকহীন অন্যান্য উদ্ভিদের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলেই সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। অবশ্য চারা-অবস্থায় কাঁটা যত দিন পর্য্যন্ত সুপুষ্ট না হয়, তত দিন কাঁটাকে আত্মরক্ষার সাহায্যকারী অঙ্গ বলিয়া কখনই ধরা যাইতে পারে না। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া চারা অন্ততঃ পাঁচ-ছয় ইঞ্চি উঁচু না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও সুগঠিত সবল কাঁটা গঠিত হয় না। সুতরাং অতি শৈশবে উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণী হইতে আত্মরক্ষার পক্ষে কাঁটা যে উহাকে কোন সাহায্য করিতে পারে না সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন এক দিকে যেমন চারাতে সুপুষ্ট কাঁটার অভাব থাকে, তেমনি আবার ছোট বলিয়া ছাগল-গরুর দৃষ্টিও উহাদের উপর তেমন ভাবে পতিত হয় না। অধিকন্তু কাঁটানটের প্রভূত সুপুষ্ট বীজ উৎপাদন ও বিস্তারের সুব্যবস্থা তাহার বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগেই একাধিক শাখাবিশিষ্ট পুষ্পগুচ্ছে প্রভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুং-পুষ্প হইতে তুলনায় স্ত্রী-পুষ্পের সংখ্যা

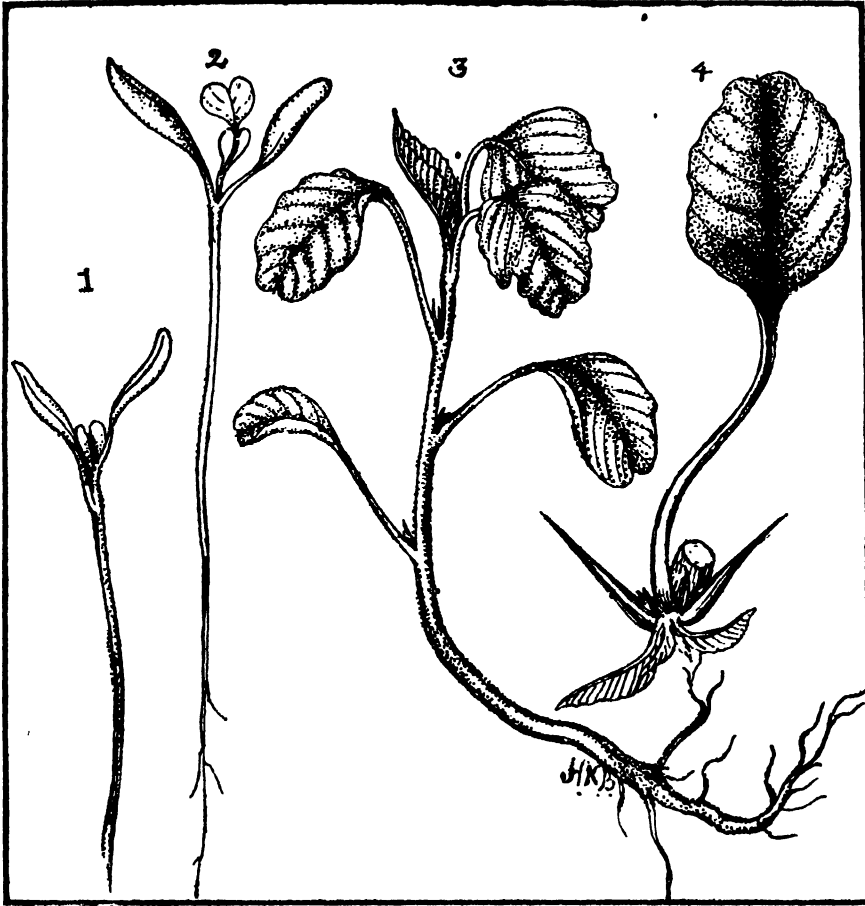
* "A very troublesome weed, particularly during the rainy and cold seasons."



কাঁটানটে (Amarantus Spinosus Linn.)

১। পত্রপুষ্প-সমন্বিত কাণ্ড। ২। পুংপুষ্পে মঞ্জরীপত্র কণ্টকে পরিবর্ত্তিত দেখান হইয়াছে। ফুলে দলের সংখ্যা পাঁচটি। উহারা স্বচ্ছ এবং অগ্রভাগের আকার সুচাল। ছবিতে পাঁচটি পরাগধানী (anther) দীর্ঘ দণ্ডে বসান দেখান হইয়াছে। ৩। বাঁ-দিকের ছবিতে পরাগধানীর সম্মুখ দিক্ এবং ডান দিকের ছবিতে উহার পিছন দিক্ দেখান হইয়াছে। ৪। তিনটি পরাগের ছবি। ৫। স্ত্রীপুষ্প,—উহাতেও মঞ্জরী পত্র কণ্টকে পরিবর্ত্তিত এবং দল-সংখ্যা যে পাঁচটি তাহা দেখান হইয়াছে। রোম-সমাকীর্ণ সুদীর্ঘ দুইটি গর্ভ-মুণ্ডের (stigma) আকৃতিও উহাতে দেখান হইয়াছে। ৬। পূর্ণাঙ্গ গর্ভাধার (ovary)। ৭। অপরিণত বীজ (ovule)। ৮। সুপক্ক ফল। ৯। সুপক্ক বীজ। ১০। একটি সুগঠিত কণ্টক। ১১। একটি পূর্ণাঙ্গ পাতার অগ্রভাগ।

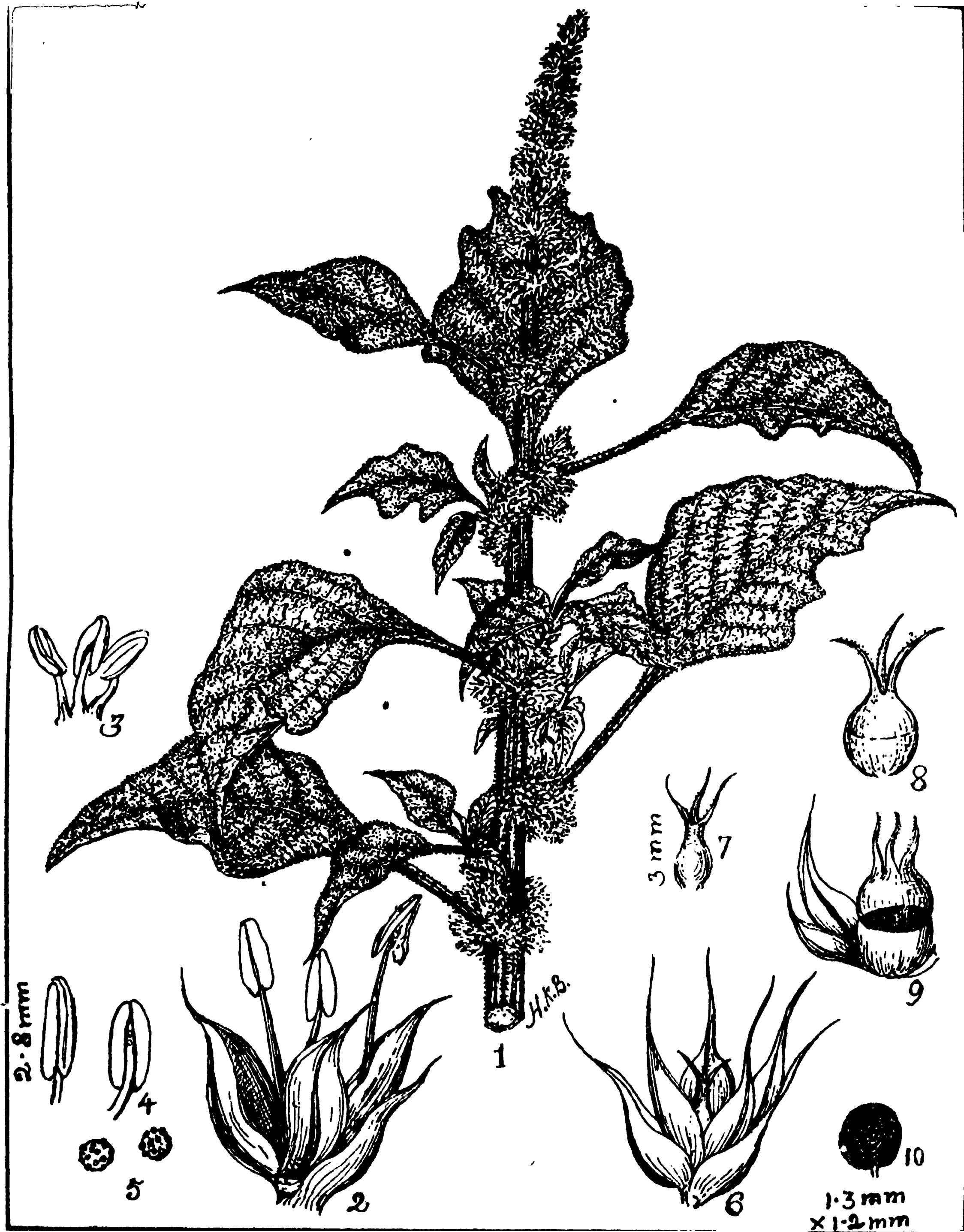
অত্যন্ত বেশী; সুতরাং প্রত্যেক গাছেই প্রচুর সুপুষ্ট বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ ফলের যে সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর আবৃত থাকে সেই আবরণ সহ সুপক্ক বীজ ভূমিতে পতিত হয়। আবার বর্ষাকালই উহার বীজ উৎপাদনের প্রকৃষ্ট সময়; সুতরাং বর্ষার বৃষ্টির জল যখন ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায় তখন উহার



কাঁটানটের চারা ও কাঁটানটে

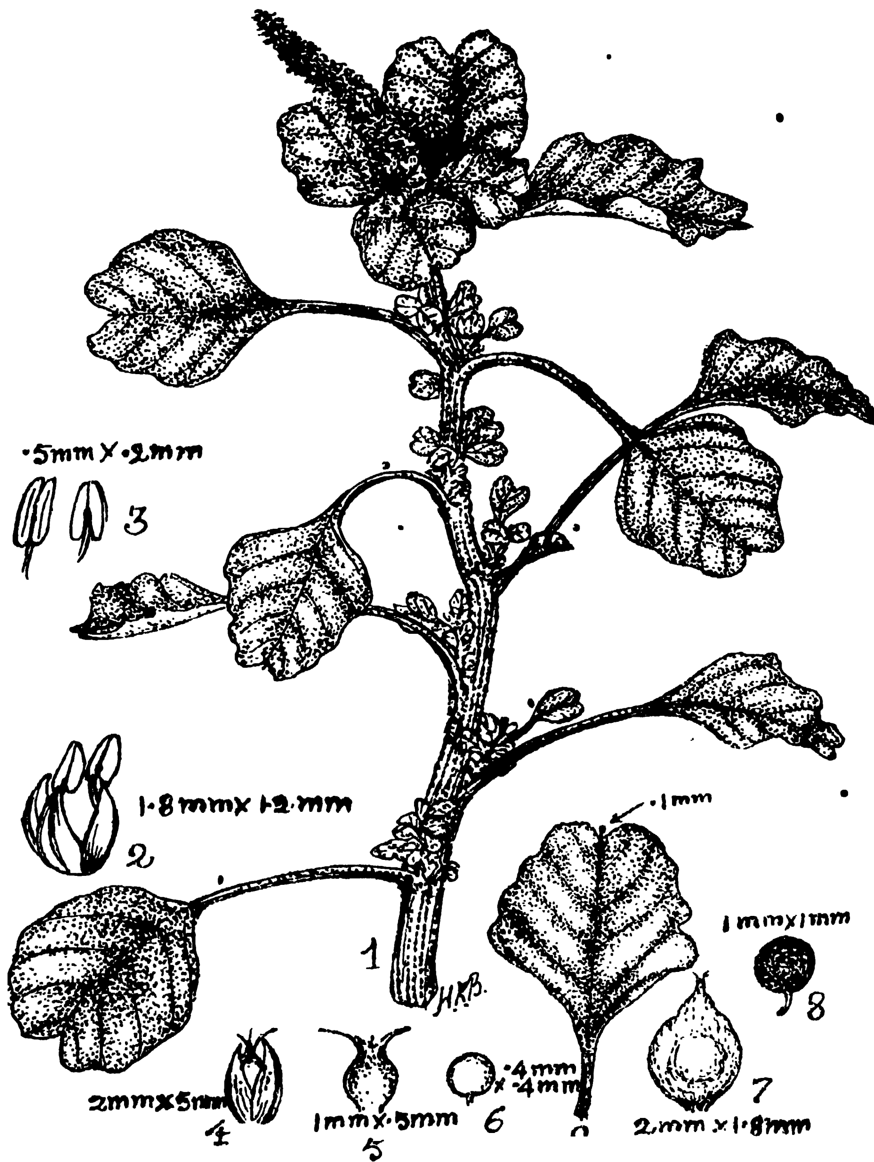
১। চারার প্রথম অবস্থা। উহাতে বীজদলের উপর মাত্র একটি পাতা গঠিত হইয়াছে। ২। চারার দ্বিতীয় অবস্থা। উহাতে বীজদলের উপর দুইটি পাতার আবির্ভাব হইয়াছে। ৩। চারার এই অবস্থায় পাতার কোণে কুঁড়িতে কোমল কাঁটা দেখা দেয় তাহাই দেখান হইয়াছে। ৪। পাতার কোণে কুঁড়ির নীচের দিকে ক্রমান্বয়ে পাতা পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কাঁটার উৎপত্তি হয় তাহা দেখান হইয়াছে।

শুষ্ক ফল সেই স্রোতে ভাসিয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয়। নানা কারণে কাঁটানটের বীজপূর্ণ মৃত্তিকা স্থানান্তরে নীত হওয়ার সময়েও, সেই মাটির সঙ্গে সঙ্গে উহার বহু বীজ স্থানান্তরে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এইরূপে উহার বীজের বহুল বিস্তার সাধিত হওয়ায়, কোন কোন স্থানে উদ্ভিদ্‌-ভোজী প্রাণীর অত্যাচারে চারাগুলি ধ্বংস হইয়া গেলেও উহাদের বংশবৃদ্ধির তেমন কোন গুরুতর অন্তরায় ঘটে না। কয়েক মাসের মধ্যেই চারা বড় হইয়া ফল দানের পর কাঁটানটে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃষ্টির জল পতিত হইলে সেই গাছের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত স্থান ব্যাপী যে অসংখ্য চারার উৎপত্তি হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এক-একটি গাছ হইতে কি পরিমাণ চারার উৎপত্তি হইতে পারে তাহার অনুমান করা যায়। সুপুষ্ট বীজ উৎপাদন সম্পর্কে পরতঃ সম্মিলন (cross-pollination) একটি বিশেষ ফলপ্রদ ব্যবস্থা। পুং-স্ত্রীভেদে কাঁটানটের গাছে দুই রকমের ফুল উৎপন্ন হওয়াতে পরতঃ সম্মিলনই উহার পরাগ-সংযোগের এক মাত্র উপায়। স্বতঃসম্মিলন (self-pollination) সুপুষ্ট বীজ উৎপাদনের যে এক বিশেষ অন্তরায়, কাঁটানটে কিংবা তাহার সমশ্রেণীর উদ্ভিদের পক্ষে, সেই অন্তরায় ঘটিবার কিছুমাত্র



ডাঁটা (Amarantus Gangeticus Linn.)

১। পত্রপুষ্পসমন্বিত কাণ্ড। ২। পুং-পুষ্প মঞ্জরীপত্রের কোণে তিনটি স্বচ্ছদল ও তিনটি পরাগধানীবিশিষ্ট পুষ্প। ৩। তিনটি পরাগধানী। ৪। বামদিকের ছবিতে পরাধানীর সম্মুখ দিক্ এবং ডান দিকের ছবিতে উহার পিছন দিক্ দেখান হইয়াছে। ৫। ছুইটি পরাগ। ৬। স্ত্রী-পুষ্প,—ফুলের ভিতর গর্ভাধার দেখান হইয়াছে। ৭। উন্মুক্ত গর্ভাধার। ৮। সুপক্ক ফল। ৯। ফল হইতে বীজমুক্তির জন্ত ফলের মধ্যভাগ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ১০। সুপক্ক বীজ।



জেল চুম্‌লী বা গেণ্টিনটে (Amarantus tennifolius Linn.)

১। পত্রপুষ্পসমন্বিত একটি শাখা। ২। পুং-পুষ্প,— ফুলে দুইটি পরাগধানী ও তিনটি দল দেখান হইয়াছে। ৩। বামের ছবিতে পরাগধানীর সম্মুখ দিক ও ডান দিকের ছবিতে উহার পিছন দিক দেখান হইয়াছে। ৪। স্ত্রী-পুষ্পে গর্ভাধার। ৫। উন্মুক্ত গর্ভাধার। ৬। অপরিণত বীজ। ৭। সুপক্ক ফল। ৮। সুপক্ক বীজ। ৯। একটি পাতার অগ্রভাগ।

সম্ভাবনা নাই। কাঁটানটের অসংখ্য উৎপন্ন চারার কতক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও যাহা থাকে, তাহাই উহার বংশ-বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট, সুতরাং প্রভূত বীজ উৎপাদন ক্ষমতাও কাঁটানটের বংশবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কাঁটানটের দেহে কাঁটা না থাকিলে উহার অবস্থা যে অন্য রকম হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

কাঁটানটের সমশ্রেণী, আমাদের নিতান্ত পরিচিত ডাঁটা, জেল চুম্‌লী বা গেণ্টিনটে ও অন্যান্য উদ্ভিদে বীজের প্রাচুর্য্য এবং বংশবিস্তারের এইরূপ যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, কাঁটার অভাবের দরুণ তাহাদের বংশ কাঁটানটের মত বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। বাগানের ভিতর কিংবা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থানে তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও কাঁটানটের তুলনায় উহাদের স্বাভাবিক বিস্তৃতি খুবই কম। ডাঁটা মানুষের আশ্রয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, ডাঁটাগাছের সংখ্যা আবার জেল চুম্‌লী কিংবা এই শ্রেণীর কণ্টকহীন বন্য অন্যান্য উদ্ভিদের চেয়ে অনেক বেশী। এই সকল কণ্টকহীন সুকোমল উদ্ভিদ, চারা অবস্থা হইতে ফল ও বীজ উৎপাদন কাল পর্য্যন্ত, উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণীর নজরে পড়িলে ধ্বংস হওয়ার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য উহাদিগকে বাগানের ধারে কিংবা অন্যান্য সুরক্ষিত স্থানেই সচরাচর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। মানুষ খাদ্যহিসাবে যেমন বহু ডাঁটাগাছ ধ্বংস করে, তেমনি আবার প্রয়োজনের দায়ে তাহাদের বংশরক্ষা করিবার পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। সব্জীবাগান ব্যতীত, অরক্ষিত উন্মুক্ত মাঠে ডাঁটাগাছ কদাচিৎ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। জীবন-সংগ্রামে অন্যের সাহায্য ব্যতীত জয়ী হইতে হইলে যাহা প্রয়োজন, কাঁটানটের তাহা আছে, তাই তাহার প্রাচুর্য্যের কোন কালেই হ্রাস হয় না। কাঁটানটের কণ্টকহীন সমশ্রেণীর উদ্ভিদের বংশ বিস্তার সম্পর্কে, তাহার মত অন্যান্য সকল প্রকার সুবিধা-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, শুধু কাঁটার অভাবে তাহাদের তেমন উন্নতি কিংবা বিস্তৃতি হইতে পারে নাই। কাঁটা না থাকিলে কাঁটানটের অবস্থাও যে তদ্রূপই হইত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কাঁটানটে নানা কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। উহাকে যতটা উপেক্ষার চক্ষে দেখা হয়, ধীরভাবে বিবেচনা করিলে উহাকে মোটেই উপেক্ষার জিনিষ বলিয়া মনে হইবে না। প্রাচুর্য্যের দরুণ সহজলভ্য হওয়াতে বহু অত্যাবশ্যক জিনিষেও সময় সময় উপেক্ষার ভাব আসিয়া পড়ে। কাঁটানটের প্রতি অবহেলার ভাবের ইহাও একটি কারণ। উহার কোমল কাণ্ড ও পাতা গরিব পল্লীবাসীকে খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। উহার কাণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া গরুর পুষ্টিকর খাদ্যহিসাবেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সুতরাং উহার প্রয়োজন সাধারণেরও যে অজ্ঞাত নয় তাহা বেশ বুঝা যায়। সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় চিকিৎসকগণ পরম উপকারী ভেষজহিসাবে নানা রোগে উহাকে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কবিরাজী গ্রন্থে উহার ভেষজ গুণসম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

তণ্ডুলীয় মেঘনাদঃ কাণ্ডেরস্তণ্ডুলেরকঃ।
ভণ্ডীর স্তণ্ডুলী বীজো বিষঘ্ন স্বল্প মারিষ॥
তণ্ডুলীয় লঘুঃশীতো রুক্ষঃ পিত্ত কফাস্রজিৎ।
সৃষ্ট মূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বীষহারকঃ॥

কাঁটানটের বিভিন্ন নাম ও গুণের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হইয়াছে। কাঁটানটের বিভিন্ন নাম যথা,—তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলীবীজ, বিষঘ্ন, অল্প মারিষ। উহার বিভিন্ন গুণ যথা—লঘু ও শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, রুচিক, অগ্নিদীপক, পিত্ত, কফ, রক্তদুষ্টি ও বিষ নাশক।

কীর্ত্তিকার ও বসু সংকলিত ও প্রণীত এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ্" (*Indian Medicinal Plants*) নামক সুবৃহৎ প্রামাণিক পুস্তকে রোগবিশেষে উহার ব্যবহারে যে বিশেষ ফল পাওয়া যায় তাহা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণসহ বর্ণনা করা হইয়াছে। সুবিজ্ঞ জর্জ ওয়াট সাহেব সঙ্কলিত "ভারতীয় উৎপন্ন সম্পদ" (*Economic Products of India*) নামক অভিধানে খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে উহার ব্যবহারের কথার সঙ্গে সঙ্গে উহার সাহায্যে রং ইত্যাদি প্রস্তুতির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে উহার ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ফোড়াতে উহার মূলের পুল্টিশ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। লাল বর্ণের কাণ্ডবিশিষ্ট কাঁটানটের মূলই কবিরাজী চিকিৎসকদিগের মতে রক্তামাশয়ের

বিশেষ উপকারী ঔষধ। উহার পাতা, কাণ্ড, মূল সকলই বিষপ্রতিষেধক ও রক্তদুষ্টিনাশক।

সুপুষ্ট বীজ হইতেই কাঁটানটের উৎপত্তি হয়। কচি চারাতে দুইটি দীর্ঘাকৃতি বীজদল (Cotyledons) বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া কাণ্ডবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। উহারা কাণ্ডের একই গ্রন্থিতে বিপরীত দিকে সংলগ্ন থাকে। বীজদল ভূমির উপরে উত্থিত হইয়া সাধারণ পাতার মত সবুজ বর্ণ ধারণ করে। সুতরাং সাধারণ পাতার মত উহাদেরও খাদ্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা হয় এবং ঝরিয়া না-পড়া পর্য্যন্ত চারার জন্য খাদ্য প্রস্তুতির কাজ করিয়া থাকে। চারার প্রধান মূল বর্দ্ধিত হইয়া ভূমির ভিতর প্রবেশ করিয়া খাদ্য সংগ্রহের জন্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। চারার কিংবা বয়স্ক নটেগাছের কাণ্ডে অন্যান্য পত্রের বিন্যাস বীজদল হইতে ভিন্ন রকমের। প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করিয়া, পত্র পর পর গুছান দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের প্রত্যেক কোণেই পাতার কুঁড়ি উৎপন্ন হয়। চারা গাছের পত্রের অগ্রভাগ ভিতরের দিকে ঢুকান থাকে। প্রথম উৎপন্ন দুই-তিনটি পাতার পরেই প্রত্যেক পাতার মধ্য-দণ্ডের (mid-rib) অগ্রভাগে সূক্ষ্ম সূচাল একটি অংশের উৎপত্তি হয়। উহা এত ক্ষুদ্র যে লেন্সের সাহায্য ব্যতীত সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। জেল চুম্‌লীর পত্রের অগ্রভাগও ঠিক এই আকারের। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাঁটানটে গাছের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পত্রের বিস্তৃত অংশ যেমন দীর্ঘতর হইতে থাকে, তেমনই পত্রের অগ্রভাগের ঢুকান অংশও ক্রমশঃ পূর্ণ হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু জেল চুম্‌লীর পত্রের মধ্যদণ্ডের সেই ক্ষুদ্র সূচাল অংশ সব অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। ডাঁটার পাতার অগ্রভাগ সকল অবস্থাতেই ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া বর্দ্ধিতাকারে ঝুলান থাকে। পাতার অগ্রভাগের আকারে এইরূপ বিশেষত্বের প্রধান কারণ এই যে, এই শ্রেণীর উদ্ভিদের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি সাধারণতঃ বর্ষাকালেই হইয়া থাকে এবং উহাদের পাতা অতীব কোমল। বৃষ্টির জল যাহাতে পাতার উপর দাঁড়াইয়া কোন অনিষ্ট করিতে না পারে তাহার জন্যই উহাদের পাতার অগ্রভাগের আকারে এই সকল বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঁটানটের কাণ্ড সাধারণতঃ মসৃণ এবং গোলাকার। উহার রং অধিকাংশ গাছেই সবুজ কিন্তু লাল রঙেরও হইতে দেখা যায়। জেল চুম্‌লীর কাণ্ড নাই বলিলেই হয়। উহার লাল রঙের মূলের গোড়ার দিকে প্রায় এক ফুট দীর্ঘ কয়েকটি শাখার উৎপত্তি হইয়া ভূমির উপরে বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। ডাঁটার কাণ্ড দীর্ঘ। কচি অবস্থায় উহা খুবই কোমল থাকে। গাছ বড় হইলে বাহিরের অংশ অপেক্ষাকৃত কঠিন; ভিতরের অংশ কোমলই থাকে। ডাঁটার এই কোমল কাণ্ডই প্রধানতঃ খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য উহার কোমল পাতাও সুখাদ্য শাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ডাঁটার কাণ্ডের রং সবুজ, লাল, সব রকমেরই হইতে পারে। কোন কোন কাঁটানটে ও ডাঁটার পাতার মধ্যভাগ, লাল চিহ্নে চিহ্নিত দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁটানটের কচি পাতাতেই এই চিহ্ন সচরাচর দেখা দিয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন পাতা পুষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চিহ্ন ক্রমশঃ লোপ হইয়া যায়। কাঁটানটের পাতার কোণে যে পাতার কুঁড়ি উৎপন্ন হয় তাহাতে নীচের দিকের পাতা পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণতঃ ছোট বড় পাঁচটি কাঁটার উৎপত্তি হয়। প্রথম যে দুইটি কাঁটার উৎপত্তি হয় তাহারা সবিশেষ পুষ্ট এবং সূচাল হইয়া থাকে। চারাতে এই সকল কাঁটার আকার কিঞ্চিৎ বাঁকা থাকে। চারার আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কাঁটা ক্রমশঃ সোজা এবং দৃঢ়তর হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক কাঁটার নিম্নাংশ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত এবং গভীর। উহার ভিতরেও কুঁড়ি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাঁটার উৎপত্তিস্থান, গঠন এবং উহার কোণে কুঁড়ির উৎপত্তি দৃষ্টে, উহা যে পাতা পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাঁটানটের পুষ্পগুচ্ছেও (Inflorescence) যথেষ্ট কাঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্পগুচ্ছের প্রত্যেক কাঁটা মঞ্জরীপত্র (bract) পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎপন্ন হয়। সুকোমল পুষ্পগুচ্ছে এই কাঁটা থাকার দরুণই উদ্ভিদভোজী প্রাণী হইতে পুষ্পগুচ্ছ রক্ষা পাইয়া থাকে।

কাঁটানটের সমশ্রেণী, আমাদের নিতান্ত পরিচিত ডাঁটা, জেল চুমুলী বা [illegible] বী[illegible]

[illegible] চুমুলীর পত্র, কাণ্ড, ফুল, ফল [illegible] বিবরণ এর সঙ্গে [illegible] ছবি [illegible] তাহাদের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন [illegible] হইতে উহাদের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন [illegible] পরস্পর তুলনা করিয়া উহাদের সাদৃশ্য এবং বৈষম্য বুঝিবার সুবিধা হইবে।

কাটানটের বর্তমান স্বাভাবিক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্তরূপ সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের দিকে লক্ষ্য করিলে গবাদি পশুর সহজলভ্য উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। মানুষের খাদ্য, সুলভ শাকসবজী হিসাবেও ডাঁটার ন্যায় উহার বহুল ব্যবহার সম্ভবপর হইবে। কাঁটানটের সমশ্রেণীভুক্ত ডাঁটা, জেল চুমুলী ও অন্যান্য আরও কতিপয় কণ্টকহীন উদ্ভিদ্ পূর্ব্বোক্ত অভিধানে ভারতীয় সম্পদ্ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন উদ্ভিদ্ স্থান-বিশেষে খাদ্যশস্যহিসাবে চাষ করা হয়। বঙ্গদেশে খাদ্যশস্যের এখনও তেমন অভাব হয় নাই, তাহা হইলেও অন্ততঃ দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধিকল্পেও এ সকল উদ্ভিদের চাষ

প্রবাসী

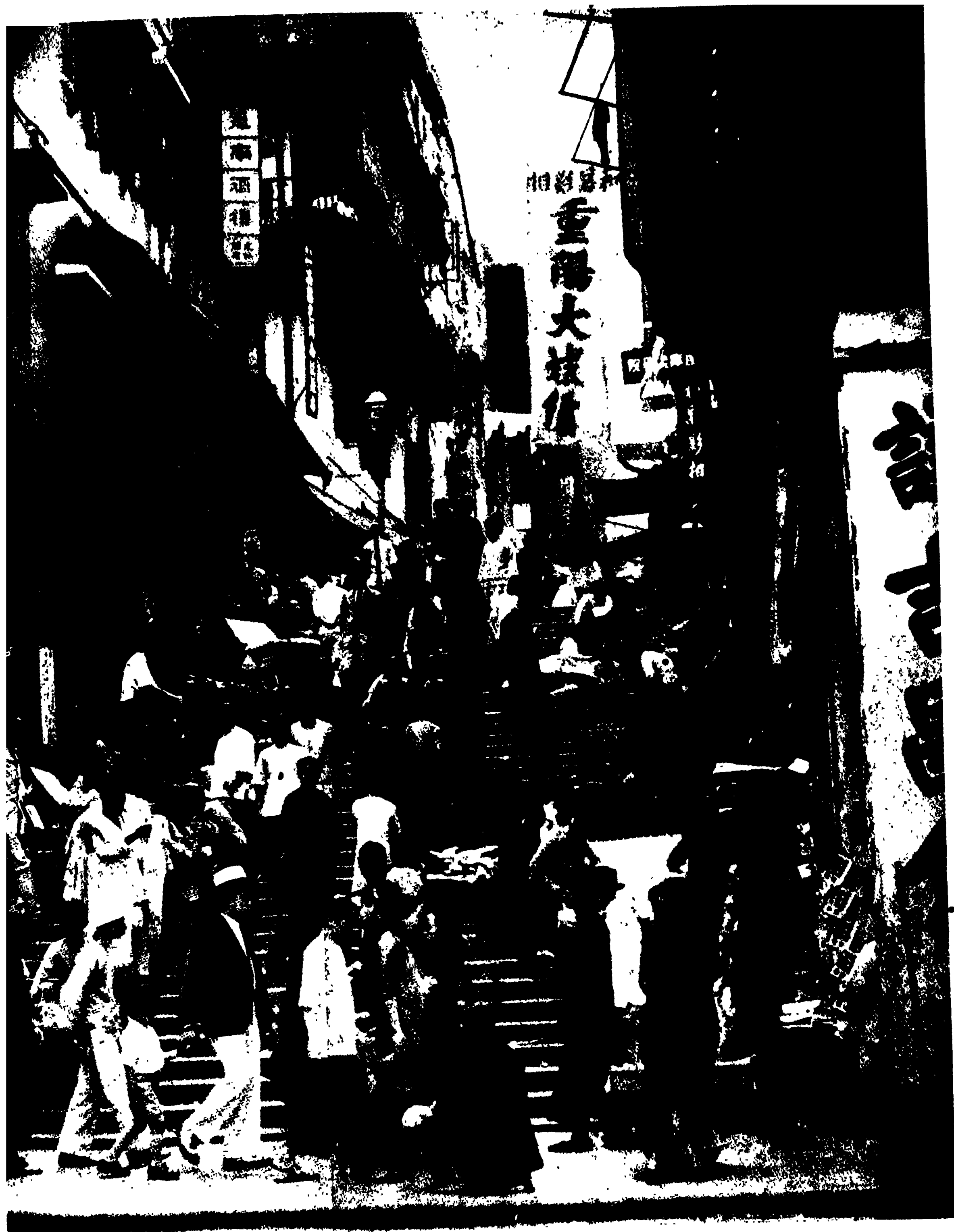
ও উন্নতি সাধনে তৎপর হওয়া উচিত। যে যেন চুমুলীর [illegible] বিষয় এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার [illegible] কাণ্ডের কোমল অগ্রভাগ গরিব পল্লীবাসী এখনও শাক হিসাবে ব্যবহার জন্য সংগ্রহ করে। এই শ্রেণীর অন্যান্য বন্য উদ্ভিদের তুলনায় উহার সংখ্যা কিঞ্চিৎ বেশী বলিয়া মনে হয়। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তার ধারে একটু লক্ষ্য করিলেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। জেল চুমুলী সাধারণতঃ ভিজা স্যাঁৎসেতে অনাবাদী স্থানেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত অভিধানে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে উহার চাষ করা হইয়া থাকে বলিয়া উল্লেখ আছে। ডাঁটার ন্যায় কাঁটানটের সমশ্রেণী এই সকল কণ্টকহীন বন্য উদ্ভিদ্ ডাঁটার ন্যায় মানুষের সাহায্য লাভ করিলে, মানুষের সম্পদ্ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। নতুবা অরক্ষিত অবস্থায় উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণীর অত্যাচারে অদূর ভবিষ্যতে উহাদের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনও নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নহে।

অবসান

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মৃত্যুতে

শ্রীকল্পিতা দেবী

তোমাকে দেখেছিলুম প্রলয়-মুহূর্তে
অজ্ঞান অন্ধকার আবিলতায়।
তোমার মুখের উপর থেকে
আত্মপ্রকাশের আবরণ গিয়েছিল সরে;
মূর্চ্ছাভারাক্রান্ত গোধূলির ধূসরতা
ঘনিয়ে এসেছিল দেহমনে,
আচ্ছন্ন চেতনার আলোড়ন
দেহের অণুপরমাণুকে করেছিল অস্থির,
তাদের আকর্ষণের জাল ছিন্ন হোতে দেরি নেই;
সামনের আকাশে তারায় লেপা আলপনা,
ঝাপসা চোখে ঠিকরে পড়ছে
দিনান্তের ম্লায়মান আবেগের আভা,
দেহমুক্ত অনুভূতি বেরিয়ে এল
অন্তিম আসক্তির আবেষ্টন থেকে
চৈতন্য-নীহারিকা বিলুপ্ত হয়ে গেল অতল তমিস্রায়।
বন্ধনহীন সত্তা তার মীড়ের কাঁপন দিতে লাগল
চৈত্রসন্ধ্যার আকাশে।
মন্থর প্রাণের অবসন্ন মাধুরী,
শেষ সকরুণ টান দিয়ে গেল মনের পর্দায়।



হংকঙের পথ

ব্রহ্মপুত্রে সন্ধ্যা
শ্রীনীরদ রায় গৃহীত চিত্র





দার্জ্জিলিঙে পাইন-বীথি
শ্রীকামাক্ষী চট্টোপাধ্যায় গৃহীত চিত্র

শিক্ষায় চলচ্চিত্রের স্থান

শ্রীভগবতীচরণ গুহ

কিছু দিন যাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে সিনেমার উপযোগিতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। জার্ম্মেনীতে শিক্ষণীয় সকল বিষয়েই যাহাতে ফিল্ম তোলা চলিতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। যে রাশিয়া পনের বৎসর পূর্ব্বেও শিক্ষায় ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহের তুলনায় পশ্চাতে ছিল, আজ তাহা সিনেমার কল্যাণে অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকায় যে শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতেই হাজার হাজার রীল শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ছবি তোলা হইতেছে তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যও এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিশুর নিকট তাহার শিক্ষাবস্তুকে অর্থপূর্ণ, প্রাণবান্ ও সংহত করিতে ফিল্ম শিক্ষককে প্রভূত সাহায্য করিতে পারে। শিক্ষণীয় বিষয়ে শিশুর মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করাই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা। সুতরাং চলন্ত ছবি যে এ-বিষয়ে শিক্ষককে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিবে, ইহা বলা বাহুল্য। ছবি ছেলেদের মনের উপর অতি দ্রুত ও স্থায়ী রেখাপাত করে, ইহা চিরদিনই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, কিছু কাল হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাও চলিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমেরিকায় মোটামুটি একই প্রকার বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন দুই দল ছাত্রকে (আজকাল নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে), একই বিষয়বস্তু দুই বিভিন্ন নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়; এক দলের উপর সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করা হয় এবং অপর দলকে সিনেমার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় কিছু দিন পরে নিঃসন্দেহে দেখা গেল যে, দ্বিতীয় দল অনেক বেশী উপকৃত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়াতে প্রফেসর সীজেল গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সিনেমার সাহায্য লইলে ধারণা ও স্মৃতিশক্তি প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়।

চলচ্চিত্র ছেলেদের মনে ঘটনাপরম্পরা সম্বদ্ধভাবে গুছাইয়া রাখিতে সাহায্য করে। ইহা শিশুকে চিন্তা করিতে, বিচার করিতে শিখায়, তাহাকে সমালোচক করিয়া তোলে। শৈশবে যে-সকল ভুল ধারণা একবার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া পরবর্ত্তী জীবনেও কষ্টসাধ্য। সিনেমার ব্যবহার হইলে এরূপ ভুল ধারণা থাকিবার সম্ভাবনা অনেকাংশে দূর হইবে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় স্কুল, কলেজ ও ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণী-বিভক্ত ছবি (graded film) প্রস্তুত করা হইতেছে। কিন্তু সকল বিষয়ের ছবিই শিক্ষার দিক হইতে সমান কার্য্যকরী হয় না। যাহাতে রচনাকৌশলের প্রয়োজন হয়—হস্তলিপি, রন্ধন, প্রভৃতি—তাহাতে চলচ্চিত্র আদৌ উপযোগী কিনা সন্দেহ। গীতবাদ্য, চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতি রুচি-বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয় নাই বলিয়া এখনও সঠিক কিছু বলা চলে না। আজ পর্য্যন্ত এ-বিষয়ে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রকৃতিবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ও স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে ছবি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আশা করা যায়, কালে টেক্‌নিকের উন্নতির সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও চিত্তাকর্ষক ছবি উদ্ভাবিত হইবে।

কি করিয়া পাঠ্য-বিষয়ক—যেমন ভূগোলের—ছবি তুলিতে হইবে, তাহার সামান্য আভাস এখানে দেওয়া হয়ত অসঙ্গত হইবে না। উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মদেশ ধরা যাউক। সেখানকার প্রাকৃতিক গঠন, কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য, বিশিষ্ট জন্তু ও উদ্ভিজ্জ, আমদানী ও রপ্তানী প্রভৃতি এবং অধিবাসীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য ছবিতে অনায়াসে দেওয়া চলিতে পারে। ঐ দেশবাসীদের ধর্ম্মসম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করিতে হইলে কারুকার্য্যখচিত বিরাট্ প্যাগোডার

মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, ঐশ্বর্য্যের আভাস দিতে হইলে তৈল ও চাউলের কল, সেগুনকাঠের কারখানা, এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ছবি দেখাইতে হইবে। পাম্পের সাহায্যে কি করিয়া খনি হইতে তৈল তুলিয়া উহা শোধন করিয়া পেট্রোল ও পেট্রোলিয়মে পরিণত করা হয়, চাউলের কলে কি প্রকারে তুষ নিষ্কাশিত হইয়া চাউল পরিষ্কৃত হয়, পার্ব্বত্য বন হইতে কি প্রকারে প্রকাণ্ড সেগুন কাঠের ভেলা ভাসাইয়া বহু দূরে লইয়া যাওয়া হয় ও তক্তা তৈয়ারী হয়, চুনি পান্না ও অন্যান্য মূল্যবান্ পাথরের এবং রৌপ্য ও সীসা প্রভৃতির খনি, প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রের ছবিও দেখান আবশ্যক।

শিশুদের মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্য-বিষয়ক ছবি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ছবি দেখাইবার জন্য সাধারণতঃ দশ হইতে পনের মিনিটের প্রয়োজন হয়; তাহার পর সেই বিষয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবশিষ্টাংশ শিক্ষক ব্যাখ্যা ও আলোচনা প্রভৃতি করেন। আলোচনার সময় কয়েকখানা সাধারণ আলোক-চিত্র বা lantern slide ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমাদের এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সবাক্ চিত্রও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দূর করিতে পারে না, তাহা শিক্ষকের কার্য্যে সহায়তা করে মাত্র। শিক্ষার্থীর মনের উপর এবং চরিত্রগঠনে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের যে প্রভাব, তাহা কখনই যন্ত্রদ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে নানারূপ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করা হয়। ভারতবর্ষেও এরূপ প্রচার ব্যাপক রূপে হওয়া আবশ্যক এবং এ-সম্বন্ধে সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হওয়া দরকার। বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত যাহাতে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহেও ছবির প্রচলন হইতে পারে। এ সম্পর্কে কি প্রকারে জার্ম্মান বিদ্যালয়ে ঐরূপ ছবির প্রচলন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

১৯৩৪ সালে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চলচ্চিত্রের প্রবর্ত্তনের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ঐ বিভাগে অতি প্রশংসনীয় কাজ হইয়াছে এবং আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের নিকট হইতে সেখানে সামান্য চাঁদা আদায় করা হয়। কলেজের ছাত্রদের প্রতি তিন মাসে এক মার্ক ও স্কুলের ছেলেদের উহার এক-পঞ্চমাংশ দিতে হয়। ছবি তোলা ও অন্যান্য যন্ত্রাদির ব্যয়ভার অধিকাংশ ঐ অর্থ হইতেই বহন করা হয়। বিষয়-নির্ব্বাচন, ছবি তোলা ও প্রতি স্কুলে ছবি পাঠাইবার জন্য ভারতবর্ষেও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রবর্ত্তন হইতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ সকল ছাত্রের উপযোগী ছবি তুলিবে এবং প্রত্যেক প্রদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ক ছবি তুলিবার দায়িত্ব থাকিবে প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর। আমাদের ছাত্রদের নিকট হইতেও সামান্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়ত একান্ত অসম্ভব হইবে না। তবে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের এ-বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। ভারতীয় ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি-বোর্ড এ-বিষয়ে দৃষ্টি দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযোগী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই বোর্ড এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে উদ্যোগী নিখিল ভারতীয় যে-কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রচেষ্টার সহিত বোর্ড সহ-যোগিতা করিতে সম্মত আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে সহযোগিতা করিবেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি বাংলা-গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত একটি পরিকল্পনার কথা জানা গিয়াছে। সেই প্রস্তাবমতে চলচ্চিত্র-প্রেক্ষাগৃহের লাইসেন্সধারী সত্ত্বাধিকারীদের প্রতি মূল ছবির সহিত শিক্ষা এবং সংবাদবিষয়ক চিত্র প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। চলচ্চিত্রকে কেবল মাত্র মনোরঞ্জনের উপাদান হিসাবে গণ্য করিবার অবস্থা আর নাই।

সিনেমার সাহায্যে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য অতি সহজে এবং অল্প ব্যয়ে করা যাইতে পারে। বেতার হইতেও চলচ্চিত্র এ-বিষয়ে অনেক উপযোগী; কারণ ইহাতে আমোদ ও

শিক্ষা উভয়ই একসঙ্গে পরিবেশিত হয় বলিয়া সহজেই মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষতঃ, কথা শোনা অপেক্ষা ছবি দেখায় বিষয়বস্তু সাধারণতঃ অনেক বেশী সহজ, সরল ও সুবোধ্য হয়। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রাশিয়া ও জাপানে সিনেমার সাহায্যে যে-পরিমাণ অজ্ঞতা দূর করা হইয়াছে, তাহা সুবিদিত। আমাদের দেশের জনসাধারণকেও উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য, গোপালন-বিধি, স্বাস্থ্যবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার যে প্রয়োজন আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতীয়দের মধ্যে মানুষের ন্যায় বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা ও শক্তি জাগাইতে চলচ্চিত্র প্রভৃত সাহায্য করিতে পারে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের এ-বিষয়ে সামান্য দৃষ্টি পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও উল্লেখযোগ্য কিছুই করা হয় নাই।

স্ত্রী-শিক্ষা

শ্রীকমলা দেবী, এম. এ.

শিক্ষা সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের প্রাচীন ও নবীন শিক্ষাব্রতী মনীষিগণ অনেক চিন্তা অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন; তাঁহাদের যুগ-যুগব্যাপী গবেষণা ও ভূয়োদর্শনের সঞ্চিত জ্ঞান আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি। মানুষের কোন জ্ঞানই যেমন তার শেষ ধাপে পৌঁছে নাই, শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা সত্য। শিক্ষা-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের জন্য পশ্চিম মহাদেশের শিক্ষাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদের নব নব পরীক্ষার আর বিরাম নাই। মনোবিজ্ঞানবিদ্যাও এখন এ-বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনেক সাহায্য করিতেছে। ফলে, দিন দিনই মানুষের নৈতিক মানসিক বিকাশ সাধনে শিক্ষাবিজ্ঞান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, শিক্ষার প্রয়োজন এবং সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তর চিরদিনই এক। শিক্ষাই মানুষকে বর্বরতা হইতে সভ্যতায়, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বের দিকে অগ্রসর করিতে পারে—আর কিছুই পারে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে কল্যাণময়, আনন্দময়, পরমসুন্দর সত্তার প্রকাশই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বিশ্বের জ্ঞানীগুণিগণ, কবি-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকগণ এক মত। মানুষকে এই আত্মপ্রকাশে সাহায্য করাই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য। যে-শিক্ষা সাহায্যে মানুষ এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে তাহাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষার প্রণালী ও পন্থা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অল্পাধিক মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উহার কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে সকলেই এক মত। শিক্ষাকে বর্জন করিলে, বহু শতাব্দী পূর্বে মানুষ যে বর্বরতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে আবার সেই অবস্থাতে ফিরিয়া যাইতে তাহার বেশী দিন লাগিবে না।

যত্নে অর্জিত শিক্ষার ফলই বিদ্যা। এই বিদ্যাকে দুইটি স্থূল অংশে ভাগ করা হইয়াছে—পরা বিদ্যা (religious) ও অপরা বিদ্যা (secular)। জীব-যাত্রার জন্য যে-বিদ্যার প্রয়োজন, তাহাই অপরা বিদ্যা। বাঁচিয়া থাকিতে মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাস্তর প্রয়োজন। এই অভাব মোচনের চেষ্টায় মানুষ পশু-পালন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যা আবিষ্কার ও অধিগত করিয়াছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া উহার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু এখানেও মানুষ শুধু অভাব দূর করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—তাহার অশন-বসন-বাসগৃহকে নয়নমনোহর করিতে, তাহার দেহকে সুন্দর শোভন

করিতে তাহাকে প্রাণপাত চিন্তা ও শ্রম করিতে হইয়াছে, হইতেছে। ইহারই বাহিরের ফল মানুষের সভ্যতা—তাহার রাজ্য-সাম্রাজ্য, তাহার নগর-জনপদ, তাহার স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য-শিল্প-সম্পদ।

কিন্তু কেবল খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিয়াই মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে নাই। তার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, তার অফুরন্ত অনুসন্ধিৎসা, তার অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়কে জানিবার দুর্ণিবার পিপাসা, ভূমাতেই তাহার সুখবোধ তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। সেই অজানার বাঁশীর সুরে মানুষ পাগল হইয়া ছুটিয়াছে তাহাকে জানিতে, বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে। সেই অজানা হইতে অজানায় তার নিরন্তর পথ-চলার চিহ্নগুলিই মানুষের কাব্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র। মানুষের এই ভূমার অনুসন্ধানই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ইহাই পরা বিদ্যা।

মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হইতে হইলে নরনারীনির্বিশেষে মানুষকে এই উভয় বিদ্যাই অর্জন করিতে হয়, এবং সে-জন্য চাই শিক্ষা। পৃথিবীর মানব-সমাজের যে-অংশে এই শিক্ষার অধিকতর সুব্যবস্থা হইয়াছে সেই অংশই মনুষ্যত্বের পথে অধিক অগ্রসর হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ইতিহাসের সুরু হইতেই মানুষের এই জয়যাত্রার পথে নারী পুরুষের পশ্চাতে রহিয়াছে। সে পুরুষের পাশে-পাশে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলিতে পারে নাই। তাহার মাতৃত্ব তাহাকে দৈহিক শক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল করিয়াছে, সেই দুর্বলতার সুযোগ পুরুষ অনুচিত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া নারীর জন্য সর্বদেশে সর্বকালে এমন বিধি-বিধান রচনা করিয়াছে যাহা নারীকে পুরুষের পশ্চাতে ফেলিয়াছে। কিন্তু "পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" তাই মানব-সভ্যতা তাহার যুগ-যুগ-সঞ্চিত জ্ঞান-গরিমা সত্ত্বেও যথোচিত অগ্রসর হইতে পারে নাই। মানুষের বুদ্ধির বিকাশ যতটা হইয়াছে তাহার হৃদয়ের বিস্তার তদনুরূপ হয় নাই। তাই, "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।"

পুরুষেই কিন্তু প্রথমে তাহার ভুল ধরিতে পারিয়াছে এবং তাহার প্রতিকারে সচেষ্ট হইয়াছে। যে-সকল উদার-হৃদয় পুরুষের চিত্তে এই ন্যায়পরতা প্রবলভাবে জাগ্রত হইয়াছে মহামতি জন্ স্টুয়ার্ট মিল তাঁহাদের অগ্রণী। এই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠের নিকট সমস্ত মানুষের মাথা নত হওয়া উচিত; কারণ, মানব-সভ্যতার প্রগতি-পথের একটা দুরতিক্রমণীয় বাধা ঠেলিয়া ফেলিতে অপরিমেয় সহায়তা করিয়াছেন এই সব মানব-প্রেমিক মহাপুরুষ।

"প্রজনার্থংমহাভাগা," 'মাতৃত্বেই নারীর চরম ও পূর্ণ-বিকাশ,' ইত্যাদি মিষ্ট বচন চিরদিন সকলেই বলিয়া আসিয়াছে; এবং শুনিতে শুনিতে উহা এমনই অভ্যস্ত সংস্কারে পরিণত হইয়াছে যে নারীও যে মানুষ, পত্নীত্ব-মাতৃত্বেরও উর্ধ্বে তাহারও যে একটা মনুষ্যত্ব আছে—অন্ততঃ থাকা উচিত, মানুষ এ-কথাটা ভাবিতেও ভুলিয়াছে। পুরুষেরও তো পিতৃত্ব আছে; তাহার সে দায়িত্বও নারীর মাতৃত্বের দায়িত্বের অপেক্ষা একটুও কম লঘু নয়। কিন্তু পিতৃত্বেই পুরুষের পরিপূর্ণ বিকাশ এ-কথা তো বাতুলেও বলে না! যাহা হউক, এই সব বহুদিনের পুরাতন ও সযত্নলালিত সংস্কারের বাধা এবং নানা প্রতিকূল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধি-বিধানের শৃঙ্খল সত্ত্বেও ইতিহাসে এক-এক সময় নারীকে পুরুষের পাশে পাশে চলিতে দেখা যায়।

ভারতেতিহাসের এক সুপ্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল যুগে নারীকেও পুরুষের মত ব্যবহারিক জীবনের অপরিহার্য অপরাবিদ্যার সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা করিতে দেখিতে পাই। ইহা এখন বালকেও জানে যে বেদের কোন কোন অংশ ব্রহ্মবাদিনী নারীর রচনা। সে-যুগের প্রকৃত পৌরুষসম্পন্ন বীর্যবান পুরুষ নারীকে তাহার সকল দুরূহ কর্মের সঙ্গিনী করিয়াছে—পরাবিদ্যার পুণ্য অঙ্গনেও তাহাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখে নাই। নারীও তাহার সেই মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই; সেও উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছে—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?" সাম্যবাদী বৌদ্ধ ধর্মও নারীকে সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা দেয় নাই।

তার পর ভারতেতিহাসের এক দুর্যোগময় অমানিশায় ভারতের পুরুষ তাহার গৌরবের আসন হইতে ভ্রষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে নারীও তাহার মনুষ্যত্বের মহিমার আসন হারাইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিরাট্ মানব-

সমাজের মহাযজ্ঞশালার একটি নির্বাপিত অমুজ্জল অবজ্ঞাত কোণে ভারতের পুরুষগণ কূর্মনীতি অবলম্বনে কোন রূপে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিল। সেই দুর্দিনে ভারত-নারী আর পুরুষের সংকটের পথের সহচরী নহে, দুরূহ চিন্তার অংশ গ্রহণে অক্ষম, কঠিন ব্রতের সহায় হইতে অশক্ত। তখন পথে "নারী বিবর্জ্জিতা"! তখন কেবল সমাজের জৈব-প্রয়োজন সাধনে তাহার সকল অস্তিত্ব পর্যবসিত। বসন-ভূষণে সুখ-সন্তুষ্ট হইয়া নিজেকে পুরুষের শুধু নর্ম-সহচরী ও খেলাঘরের পুতুল হইতে দেওয়ায় নারীর যে লজ্জাকর অসম্মান ও আত্মাবমাননা আছে সে বোধও তখন সে হারাইয়াছে। এই নিবিড় অন্ধকারে কদাচিৎ দুটি একটি তারা যে না ফুটিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু তাহার স্নিগ্ধ জ্যোতি সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারকে নিবিড়-তর করিয়াছে!

বহু শতাব্দীর তমসাচ্ছন্ন রজনীর অবসানে সহসা এক দিন ভারত-গগনে অরুণালোক প্রকাশিত হইল। এক জীবন-চঞ্চল বিদেশীয় সভ্যতার প্রচণ্ড সংঘাতে ভারতবর্ষ তাহার সুদীর্ঘ সুপ্তিভঙ্গে আলস্যজড়তা ত্যাগ করিয়া আবার জাগিয়া উঠিল। বিগত উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে এই নবজাগরণের সূচনাতেই নব-শিক্ষার উদ্বোধন হইল। একটা মহাদেশতুল্য বিশাল দেশের দিকে দিকে শত-সহস্র লোক এই শিক্ষার আলোকে নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিল। শুধু পুরুষের নহে, নারীরও শিক্ষার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে সেই উষাকালের প্রথম-পথিকদেরও কাহারও কাহারও মনে কোন সংশয় রহিল না। সেই অগ্রদূতদের মধ্যেও যাঁহার নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি টোলে-পড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, অথচ যাঁহার চিন্তা বাক্য ও কর্ম অত্যন্ত আধুনিক—যাহাকে ইংরেজীতে বলে মডার্ন। তিনি পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর। প্রায় শতাব্দ-কাল ধরিয়া বহু মনীষীর প্রাণপাত পরিশ্রমে দেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারায় অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে পশ্চিম-মহাদেশের নারী-সমাজ অতি-কঠিন আয়াস ও শক্তিসাধ্য বহু কর্মে নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্র-শক্তিকে সাহায্য করিয়া এমন সব অধিকার অর্জন করিয়াছে যাহা বহু বর্ষের আন্দোলনেও পাইত কি না সন্দেহ। অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলন এদেশের নারীসমাজের মধ্যেও বিস্ময়কর পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে।

আজ ভারতবর্ষেও একান্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই স্বীকার করেন যে মানুষের শিক্ষণীয় সকল বিষয়েই নারীর শুধু অধিকার নয় প্রয়োজন আছে। ব্যবহারিক জীবনে পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক অনৈক্য আছে বলিয়াই নারীর ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা সকল বিষয়েই পুরুষের শিক্ষার অনুরূপ হওয়া শুধু অনুচিত নহে, ভ্রান্ত। ইহা লইয়া যে-সকল নারী পুরুষের সমকক্ষতা করিতে চাহেন বা করেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। ইহাতে নারীর inferiority complex-ই প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হয়। পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে—ইহাও যেমন সত্য, নারীও পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে ইহাও তেমনই সত্য। উভয়ে উভয়ের সম্পূরক—complement স্বরূপ। একের অভাবে আর এক জন অসম্পূর্ণ। ছোট-বড়, উচ্চ-নীচের কোন কথাই উঠে না।

মানব-সভ্যতার বুদ্ধিশক্তি ও রসবোধের ক্ষেত্রে, আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান; স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীত প্রভৃতি কলা; নগর, জনপদ, বর্ত্ম, যান, বাহন—সর্বত্রই পুরুষের নব-নব-উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি ও অসামান্য শক্তির পরিচয় পাই। ইতি-হাসের পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে পুরুষের এই জয়গৌরবের সাক্ষ্য বিদ্যমান। কৃষ্ণ, জরথুস্থ, বুদ্ধ, কংফুস, খ্রীষ্ট; কালিদাস, শেক্সপীয়র, গ্যেটে, শেলী, রবীন্দ্রনাথ; দা-ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলো, রেমব্রাণ্ট, রাফায়েল, নন্দলাল; তানসেন, মোজার্ট, বিঠোফেন, বাগ্‌নার; গ্যালিলিয়ো, কেপলার, নিউটন, লাপলাস, আইনস্টাইন; ডারউইন, জগদীশ, ফ্রয়েড; মার্কস্, সান্-ইয়াটসেন্, লেনিন, কেমাল, গান্ধী—সকলেই পুরুষ। কোথাও নারীর কোন শ্রেষ্ঠ অবদানের চিহ্ন নাই এবং না থাকিবারই কথা। তাহার প্রধান কারণও গোড়াতেই বলা হইয়াছে। মানব-সভ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে যদি নারীও পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে নিজেকে কাজে লাগাইতে পারিত তবে মানুষের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এতটা রক্ত-কলঙ্কিত হইত না বলিয়া

মনে করিবার সংগত কারণ আছে। মানুষের যে-বুদ্ধি ও বাহুবল এতকাল ধরিয়া তাহার বীভৎস লোভ-ক্ষুধানলকে ইন্ধন জোগাইয়া আসিতেছে, তাহাই পৃথিবীকে এতদিনে নন্দনকাননে পরিণত করিতে পারিত—যদি নারীও পুরুষের সঙ্গে তাহার কর্মের অংশ সমান ভাবে গ্রহণ করিতে পাইত; যদি নারীর পালনীশক্তি সম্যক্ স্ফূর্তির সুবিধা পাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'যাত্রী' পুস্তকে এবং অন্যান্য স্থানে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে যে-সকল মহাশক্তিশালী পুরুষ মানব-সভ্যতাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহার মোড় ফিরাইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই জীবনের অন্তরালে থাকিয়া প্রেরণা জোগাইয়াছেন তাঁহাদের জননী, কিংবা ভগিনী, কিংবা প্রেয়সী। নারীকে দীর্ঘকাল পশ্চাতে রাখিয়া, অশিক্ষিত রাখিয়া কোন দেশের কোন কালের মানুষই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে—নব নব কীর্তি অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই।

সুতরাং, এই বিশাল দেশের কোটি কোটি মানুষকে যদি মানুষের মত বাঁচিতে হয়, এই পরাধীন দেশের মানুষ যদি কোনদিন বিশ্ব-মানব সমাজে মর্যাদার আসন পাইতে চায়—তবে পুরুষ ও নারীর সমান ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহার কোথাও কোন ফাঁকি চলিবে না। ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞান যে সত্য উদ্ঘাটিত করে তাহা শুধু পুরুষের জন্যই নহে, নারীরও সে সত্য জানিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে নব-শিক্ষার সূচনা হইয়াছে প্রায় শত বর্ষ পূর্বে; কিন্তু দেশের লোকের নানা চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে সময়ে সময়ে যে হাস্যকর অসামঞ্জস্য ও লজ্জাকর মূঢ়তা দেখিতে পাওয়া যায়—গৃহে মাতা ভগিনী ও ভার্যার অশিক্ষা ও কুশিক্ষা জাত বদ্ধমূল সংস্কারই তাহার উৎস। যে-শিক্ষা এদেশের পুরুষেরা পাইলেন সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা হইতে নারী সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকায় সেই শিক্ষা যথোচিত সার্থক হইতে পারে নাই,—দেবযানীর অভিশাপই ফলিয়াছে—

—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ;—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ!

রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলা দেশের নারীদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত চেতনা, চঞ্চলতা জাগিয়াছে। বাংলার অনেক জেলাতে এবং প্রধান কেন্দ্র কলিকাতায় বালিকাদিগের জন্য অনেক উচ্চ শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। শিক্ষালাভের জন্য মেয়েদের মধ্যে ব্যাকুল আগ্রহও দেখা যাইতেছে। দেশের লোক স্ত্রী-শিক্ষার যতটুকু আয়োজন করিতে পারিয়াছেন তাহা যথেষ্ট না হইলেও নারীকে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা যেন গড্ডলিকা প্রবাহে—ফ্যাশানে পর্যবসিত না হয়; এই শিক্ষায়োজনের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। নারীকেও পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা করিতে হইবে। তাহাকে দেহে শক্তি, বুদ্ধিতে দীপ্তি ও চরিত্রে দৃঢ়তা অথচ নারী-সুলভ কমনীয়তা অর্জন করিতে হইবে। তবেই নারীর মাতৃ-স্বসৃ-পত্নী-দুহিতৃ-কর্তব্য যথোচিত ভাবে পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্য-কাব্যের শেষের দিকে চিত্রাঙ্গদার মুখে যে-কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহার সেই অনুপম কাব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন, মনে হয় সর্ব-দেশ-কালের নারীকে—এবং পুরুষকেও—সেই বাক্যের অন্তর্নিহিত সত্য ও আদর্শকে স্বীকার এবং জীবনে রূপায়িত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন আছে। কবি নারীর যে-পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন মানুষ সে-পরিচয় পাইলে মানব-সভ্যতা হাজার হাজার বৎসরের পঙ্ক-স্নান-মুক্ত হইয়া মানুষকে সেই সত্যলোকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে যাহাকে 'দিব্যধাম' বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন উপনিষদের ঋষি।

মহাকবির অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত সেই শ্লোকাংশটি উদ্ধৃত করিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই:

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।...

বিক্রমপুর

শ্রীবিনোদবিহারী রায়, বেদরত্ন

বর্ত্তমানে আমরা দুইটি বিক্রমপুরের নাম শুনিতে পাই—(১) নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম রেল ষ্টেসন হইতে ৪ ক্রোশ দূরে এক বিক্রমপুর মৌজা আছে। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে এই বিক্রমপুর যথাস্থানে চিহ্নিত হইয়াছে। (২) ঢাকা জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর। এই নামে কোন মৌজা এই জেলায় নাই। এজন্য এই বিক্রমপুর মৌজা ঠিক কোথায় ছিল, কি বরাবরই ছিল না, কি পদ্মা নদীতে ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করা যায় না, এজন্য এই বিক্রমপুর এখনও তর্কের বিষয় হইয়া আছে।

বিক্রমপুর প্রাচীন নাম নহে। কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার নাম নাই। ইহা বর্ম্মচন্দ্র ও সেন বংশের রাজধানী ছিল। এখান হইতে বহু তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরই বর্ম্মচন্দ্র সেন বংশের রাজধানী ছিল।

রাজা হরি বর্ম্মার তাম্রশাসনে প্রথম বিক্রমপুর রাজধানীর সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি এই স্থান হইতেই তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছেন। ঐ সমস্ত ভূমিই বঙ্গের 'ব' দ্বীপে ছিল।

"ব" দ্বীপের নাম তখন কি ছিল তৎসম্বন্ধে একটু গোলযোগ দেখা যাইতেছে। হরি বর্ম্মার তাম্রশাসনে যেখানে "বঙ্গে (বেজনি) সারশ্চসীমাবধি" পাঠ ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পাঠ করিয়াছেন, ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় সেখানে "যথোপরিলিখিতা ভূমিরিয়ং স্বসীমাবচ্ছিন্না" পাঠ করিয়াছেন। ইহাতে "বঙ্গ" নামটি বাদ গিয়াছে। তাম্রশাসনখানি দগ্ধ হইয়া একরূপ পাঠের অযোগ্য হইয়াছে, তাই এক-এক জন এক-এক রূপ পাঠ করিতেছেন। ৺রাখালবাবুও ৺নগেন্দ্রবাবুর পাঠ কতকটা যাচাই করিয়াছিলেন। তিনি 'বঙ্গ' পাঠ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন নাই। 'বঙ্গ' পাঠ সম্ভব কিনা তাহা আমরা পরে দেখিব।

এই বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত সামল বর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনের পাঠ বৈদিক কুল-পঞ্জিকায় পাওয়া যায় তাহাতে "বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্ত্যন্তে" পাঠ আছে। কিন্তু এই তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকগণ জাল সাব্যস্ত করিয়া প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন না। তাঁহাদের মতে এই তাম্রশাসনখানি বিশ্বরূপের তাম্রশাসন দেখিয়া জাল করা হইয়াছে। আমার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক ঐতিহাসিকগণ যখন এই তাম্রশাসনখানি স্বীকার করেন নাই, তখন আমিও ইহাকে বাদ রাখিয়াই বিচার করিব। পরে এ সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। এই তাম্রশাসনখানি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই।

এই 'ব' দ্বীপে প্রাপ্ত সমাচার দেব প্রভৃতির প্রদত্ত ৪ খানি তাম্রশাসন একদিন জাল সাব্যস্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ এক দিন সামল বর্ম্মার এই তাম্রশাসনখানি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দেখিয়া এখানি জাল করা হইয়াছে কি এইখানি দেখিয়া বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের মুসাবিদা হইয়াছে তাহা এখনও বিচার্য্য।

সামল বর্ম্মার তাম্রশাসন বাদ দিলে বিক্রমপুরের সহিত 'বঙ্গ' নাম আমরা প্রথম পাই কেশব সেন বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে। যথা—

১। কেশব সেনের তাম্রশাসনে—

"পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে"

২। বিশ্বরূপ সেনের "মদন পাড়" তাম্রশাসনে—

"পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে"

৩। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষদে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে—

(ক) "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে নাব্যে"

(খ) "বিক্রমপুর ভাগে"

এই তিনখানি শাসনে ৪ দফা দানের ভূমি সমস্তই 'ব' দ্বীপে সুতরাং বঙ্গে অবস্থিত। অতএব 'ব' দ্বীপের নামই বঙ্গ। হরি বর্ম্মা, চন্দ্র ও ভোজবর্ম্মার এবং সামল বর্ম্মার তাম্রশাসনের ভূমি 'ব' দ্বীপে সুতরাং বঙ্গে অবস্থিত। এ সময় 'ব' দ্বীপ পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত ছিল। কেশব ও বিশ্বরূপ সমতটস্থিত রাজধানী ফল্গুগ্রাম হইতে দান করিয়াছেন। তখন 'ব' দ্বীপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সামিল হইয়াছিল।

বর্ম্ম ও চন্দ্রবংশের তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতি বঙ্গ এবং সেনবংশের তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি বঙ্গ অর্থ কি ?

১০২৩ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল উত্তর রাঢ় পর্য্যন্ত জয় করিয়া ঐ দেশ নিজ রাজ্যভুক্ত না করিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার সেনাপতি হেমন্ত সেন উত্তর রাঢ়ের এবং অপর সেনাপতি বজ্রবর্ম্ম দক্ষিণ রাঢ়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ১০৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময় কল্যানের (নিজাম রাজ্যে) চালুক্য রাজ আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমাদিত্য পিতার আদেশে গৌড় জয় করেন। সম্ভবতঃ তিনি 'ব' দ্বীপে নিজ নামে বিক্রমপুর স্থাপন করতঃ পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি "ত্রিভুবন-মল্ল মর্মাড়িদেব" উপাধি গ্রহণ করতঃ কল্যাণে পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে দক্ষিণ রাঢ়ের তাৎকালিক রাজা হরিবর্ম্মদেব বিক্রমপুর জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভট্টভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধন সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন। তিনি হরিবর্ম্মাকে বিক্রমপুর জয়ে বাধা দিলে হয়ত জাতবর্ম্মা সহ যুদ্ধ হইয়া থাকিবে। এই যুদ্ধে গোবর্দ্ধন পরাজিত হইয়া থাকিবে। তাই ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে জাত বর্ম্মা গোবর্দ্ধনের শ্রীকে নষ্ট করিয়াছিলেন। জাত বর্ম্মা সম্ভবতঃ হরিবর্ম্মার ভ্রাতা হইতেন। সম্ভবতঃ বজ্র বর্ম্মার দুই পুত্র ছিল (১) হরিবর্ম্মা, (২) জাত বর্ম্মা। ভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসনে হরিবর্ম্মাকে "বান্ধব" বলা হইয়াছে। জাত বর্ম্মাকে ভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসনে শান্তনুপুত্র গাঙ্গেয় ভীষ্ম দেবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ইহাতে অনুমান হয় তিনি সেনাপতিরূপে ভীষ্মের ন্যায় রাজ্য জয় করিয়া শ্রী লাভ করিয়াছিলেন।

'ব' দ্বীপ জয় করিয়া হরি বর্ম্মা একখানি তাম্রশাসন দ্বারা তথাকার ভূমি দান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি 'ব' দ্বীপে বঙ্গে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। ইহার পূর্ব্বে রাজধানী হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার সামিল বলিয়া 'ব' দ্বীপকে পৌণ্ড্র ভুক্তির অন্তর্গত বলা হইয়া থাকিবে।

সেন বংশের রাজা বিজয় সেন উত্তর বঙ্গের পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের অন্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সামিল সমতটের রাজা ছিলেন। তিনি ভোজ বর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া 'ব' দ্বীপ (বঙ্গ) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার এবং তাঁহার পুত্র বল্লাল ও পৌত্র লক্ষণ সেনের তাম্রশাসনে 'ব' দ্বীপকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া লেখা হইয়াছে। বিজয় সেন স্বীয় তাম্র-শাসনে বিক্রমপুরকে "উপকারিকা" অর্থাৎ "অস্থায়ী আবাস" লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ বল্লাল সেন হইতেই বিক্রমপুর রাজধানী হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিতে জানা যায় তিনি কখনও গৌড়ে (বরেন্দ্র), কখনও বিক্রমপুরে (নদীয়া) এবং কখন সোনার গাঁয়ে (সুবর্ণগ্রাম) থাকিতেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে সমতটে সোনার গাঁ সেন বংশের রাজধানী ছিল, তথায় বিক্রমপুর নামে স্থান তখন ছিল না। এখনও নাই। মিনহাজ উদ্দিন তাঁহার তবকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থে লিখিয়াছেন লক্ষণ সেন পলাইয়া "সঙ্কনাতে" অর্থাৎ সমতটে গিয়াছিলেন। সুতরাং তখনও সমতটে বিক্রমপুর হয় নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক "বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" অর্থ কি ? চন্দ্রদ্বীপের রাজা শ্রীচন্দ্র হরিবর্ম্মার পুত্রকে পরাজিত করিয়া বিক্রমপুরে রাজা হইয়াছিলেন। ইনি সমতটে রাজত্ব করেন নাই। ইহার একখানি তাম্রশাসনে দান কৃত ভূমির নাম খদিরবিল্লি, তিবরবিল্লি, বল্লিমুণ্ডা এবং ইক্কড়াশী লিখিত আছে। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই গুলির বর্ত্তমান নাম খল্লী, তিল্লি বালিগুড়া এবং একাশী ও তাহা সমতটে অবস্থিত দেখিয়া মনে

করিয়াছেন শ্রীচন্দ্র সমতটে রাজত্ব করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। পদ্মা অর্থাৎ তাৎকালিক গঙ্গা নদী পাবনা জেলার কানসোনা (কর্ণসুবর্ণ) মৌজার নিকট যখন ছিল, সেই সময় এই তিল্লি প্রভৃতি মৌজার উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইত। সমুদ্র তখন বিনয় তিলকের ('ব' দ্বীপের) পূর্ব্বদিকে ছিল। সুতরাং তিল্লি প্রভৃতি তখন 'ব' দ্বীপের সামিলই ছিল; তাহাই শ্রীচন্দ্র তাম্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছেন।

অতএব পৌণ্ড্রভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এক নহে। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া ভুক্ত বলিয়া হয়ত হরিবর্ম্মা "ব" দ্বীপকে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত বলিতেন। উত্তর বঙ্গে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সামিল পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত প্রদেশকে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তি বলা হইত। *Inscriptions of Bengal* Vol. III-র সম্পাদক ৺ননীগোপাল মজুমদার, এই দুইকে এক বলিয়াছেন। তিনি বলেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সংক্ষিপ্ত নাম পৌণ্ড্রভুক্তি, তাহা ঠিক নহে।

সামলবর্ম্মা শ্রীচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া বিক্রমপুর রাজধানী এবং বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসনে জানা যায় জাত বর্ম্মার বংশে তিনি প্রথম মঙ্গলকারী অর্থাৎ তিনি প্রথম রাজা। তিনি বঙ্গের রাজা হইয়া শ্রীচন্দ্রের পৈত্রিক রাজ্য চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি বিক্রমপুরভুক্ত করিয়া বিক্রমপুরভুক্তি নাম দিয়া থাকিবেন। তাঁহার তাম্রশাসন জাল হইলেও বিক্রমপুরভুক্তি নামটা জাল না হওয়াই সম্ভব। কারণ কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে "বিক্রমপুর ভাগে" শব্দ আছে এবং তদ্দ্বারা 'ব' দ্বীপের ভূমিই দান করা হইয়াছে। ভাগ ও ভুক্তি এক কথাই। বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগ ভুক্ত যে ভূমি তাহাই দান করা হইয়াছে। সুতরাং তাহা 'ব' দ্বীপেরই ভূমি। "বঙ্গে নাব্যে" অর্থ বঙ্গের নিম্নভূমি বা নূতনগঠিত ভূমি। এই দানের ভূমি বিনয় তিলকের পূর্ব্ব সীমায় সমুদ্র ছিল। সুতরাং তখন ইহা নিম্নও বটে, নূতন ভূমিও বটে। এই সময় 'ব' দ্বীপের সীমানা—উত্তরে গঙ্গা বা পদ্মা নদী, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্ব্বে সমুদ্র। 'ব' দ্বীপ ও সমতটের মধ্যে এই সময় সমুদ্র ছিল। এ সময় 'ব' দ্বীপের নামই বঙ্গ ছিল। পূর্ব্ববঙ্গ নাম তখনও হয় নাই।

এই বঙ্গ প্রাচীন বঙ্গ নহে। পূর্ব্ববঙ্গ ও প্রাচীন বঙ্গ নহে। তবে প্রাচীন বঙ্গ কোথায়? এ সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিব। বিস্তারিত ভাবে স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

চন্দ্র নামে এক প্রাচীন রাজা (শ্রীচন্দ্র নহে) বঙ্গ জয় করিয়া বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ে এক খোদিত লিপি রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঐ সময় অঙ্গ দেশের দক্ষিণস্থিত প্রদেশ বঙ্গ নামে কথিত হইত। বাঁকুড়া তখন এই বঙ্গ মধ্যে ছিল। ঐ সময় এই বঙ্গের দক্ষিণে প্রবঙ্গ প্রদেশ ছিল। এখনও মেদিনীপুর জেলায় ঐ প্রবঙ্গ সবঙ্গ মৌজা ও পরগণা নামে কথিত হইতেছে। বৃহৎ সংহিতায় দেখিতে পাই ঐ সময় 'ব' দ্বীপের নাম উপবঙ্গ ছিল। রাজেন্দ্র চোলের উত্তর রাঢ় পর্য্যন্ত জয়ের সময় এই 'ব' দ্বীপ "বাঙ্গালা" নামে কথিত হইত। প্রাচীন বঙ্গ রাঢ় ও সুহ্ম নামে কথিত হইলে 'ব' দ্বীপ বঙ্গ নামে কথিত হইয়াছে। সেন বংশের রাজত্বের পর কোন সময় হইতে সমতটে বিক্রমপুর নামে কোন স্থান ছিল না অনুমান করা যাইতে পারে। 'ব' দ্বীপ বা বঙ্গমধ্যস্থিত এই বিক্রমপুর ভুক্তি পরে বিক্রমপুর পরগণা হইয়াছে। পদ্মা ভাঙ্গিয়া বিক্রমপুর ভুক্তি বা পরগণার মধ্য দিয়া যখন প্রবাহিত হইত তখন উভয় পারেই এই পরগণার ভূমি পড়িয়াছে। তাই আমরা পদ্মার উত্তর পারে বিক্রমপুর পরগণা দেখিতে পাই।

অতএব পদ্মার উত্তর পারে বিক্রমপুর নাই। নদীয়া জেলার বিক্রমপুরই বর্ম্ম চন্দ্র সেন বংশের রাজধানী ছিল। বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে হইলে এখান হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। সেন বংশের বহু কাল পরে আদাবাড়ী তাম্রশাসনে সমতটের বিক্রমপুর নাম শুনিতে পাই। বৈদ্য বল্লাল সেনের রাজধানী সমতটের বিক্রমপুরেই ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

রামচরিতের লিখিত "দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বালবলভীর বিক্রমরাজ"—অর্থ দেবগ্রামের নিকটস্থিত 'ব' দ্বীপের বিক্রমপুর রাজ। ইহাই নদীয়া জেলার বিক্রমপুর রাজধানী।

মানসী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

তুমি কি ভেবেছ প্রিয়া, প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায়,
গেয়ে যাব স্তুতি তব বৈশাখের প্রবল ঝঞ্ঝায়,
আষাঢ়ের ঘনকৃষ্ণ চঞ্চলিত মেঘের অম্বরে,
আন্দোলিত বলাকায়, ঝলকিত বিদ্যুত ডম্বরে,
সলিলবসনা অব্ধি, যেথা নাচে মেঘের উল্লাসে,
বীচিক্ষোভ-বিসর্পিত মুক্তাশুভ্র ফেন-মেখলায়,
গম্ভীর অম্বরনাদী সাগর নির্ঘোষে নিরন্তর ;
মূঢ় রাত্রে এলায়িত ঘনকৃষ্ণ তব কেশভার
লক্ষ কোটি তারকার জ্যোতির উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত ;
শুব্ধ রাত্রে চেয়ে থাকি, বাক্যহীন নিস্পন্দ স্তিমিত,
চিন্তাহারা বিস্ময়ের তলহীন প্রমুষ্ট স্মৃতির,
অন্ধকার কুক্ষিতলে, যেন জানা অজানায় লীন
হয় স্পর্শ মাঝে অলৌকিক ; ঝিল্লীর নিরর্থ তান
ভাঙিয়াছে নিদ্রা মোর, ভাঙিয়াছে মূর্ত্ত জাগরণ ;
কিন্তু তুমি ছিলে কোথা ? অলক্ষ্যে তুমি তো কোন কহ
নাই কথা, দেও নাই হাত মোর হাতে, অনুগ্রহে
আনন্দে বা প্রেমের উল্লাসে ; তোমাতে হয়েছি লীন,
বোঝ নাই তুমি তাহা, এক বার আস নাই নিজে,
অভিসারিকার সজ্জা লয়ে ? কবরীর নীল পদ্ম
ঝরে নাই পথে ; ঝরে নাই হার হতে, মুক্তাফল,
দাম হতে পুষ্প এক বার ; কপোলে কপোলে তব
কভু কি আপনি এসে, রেখেছিল প্রিয়ের আদরে ?
অধন্য আমার লাগি কাঁপে নাই বক্ষ তব এক বার !
নীলাম্বরে অঙ্গ ঢাকি, অশ্রু রাখি সবুজ পাতায়,
এসেছ সম্মুখে মোর চলে গেছ আপন ইচ্ছায়।
প্রভাতে অরুণরাগে খুলেছ তোমার মধু মুখ,
হাসির জোয়ার ভেসে গেছে তীরোপান্তে বিকসিত
ধবলিত কাশগুচ্ছে ; এনেছ শ্রাবনে শেফালিকা
তরুতলচ্ছায়ে ; বিদ্রাবিত লাবণ্যের সুকুমার
দেহহীন সৌরভের পুণ্য নবনীতে ; শুদ্ধ শুভ্র
মেঘের পল্লবে পারিজাত পুষ্পদল আকম্পিত
পবনে পবনে বহমান। কারে দেখে হাসি তব
উঠেছিল শ্রাবণের ভরা বন্যাধারে, সে তো নহে
আমার প্রেমের উপহার ; কদম্বের শিহরণ
চম্পকের আভরণ দোলা, পত্রদলচ্ছায়া হতে
কুসুম কটাক্ষে নিরীক্ষণ ; ওরে মূঢ় মায়াবিনী,
ছলনা কলনা কলা কল্পনায় নিত্য বিহারিণী !
প্রিয়তমে, নিখিল-বিহগ-কণ্ঠে মঞ্জু-প্রভাষিণী,
কে তুমি চটুল চারু মনোরমা কার সোহাগিনী ?
তবু তুমি কাছে এসে কভু কারে ধরা নাহি দাও,
নিরন্তর নেচে ফের, আপনারে কোথা না বিলাও,
সবুজ চিক্কণ ঘাসে চেয়ে থাকি, চোখ আসে বুজে,
বক্ষে এসে নাড়া দেও, চোখ মেলে বাহিরে তাকাই ;
অকস্মাৎ লুপ্ত হও, যত চাই, পাই না তো খুঁজে ;
কাব্যের ছন্দের মাঝে তোমার চরণ দ্বন্দ্ব চাহি,
কি লিখিতে কি লিখি যে, আনমনে বসে গান গাহি।
নাহি যদি কথা কও, না দেখাও মমতা তোমার,
কেন আস বার বার, নয়নের কটাক্ষ খেলাও ?
তুমি কি গো বাক্যহীনা, মৌনকণ্ঠী সুন্দরী আমার
তুমি কি গো মোর কণ্ঠে ভাষারূপে আপনারে সদা
করিতে প্রকাশ সমুৎসুক ? তাই কি ফিরছ সাথে
হৃদয়-বন্দিনী আনন্দিনী ! নাহি জান ভালবাসা।
মৃগশিশু সম, তুমি কি গো নিতান্তই অসহায় !
নেচে যাও, থমকি' দাঁড়াও, নয়নে কটাক্ষ হান,
অর্থহীন, বস্তুহীন ; বর্ণের বৈচিত্র্যে ঝলমলি ;
উত্তরীয়ে দোলা দেও, দোলা দেও বসনভূষণে,
বিলাসে বিভ্রমে তব ইঙ্গিতের ছায়া ভেসে আসে,
মদনের উন্মাদিনী তপ্তসুরা আন পাত্র ভরি' ;
কিছুই জান না তুমি, আপন সৌন্দর্য্যে সংজ্ঞাহীন
চাপল্যবিহীন তুমি আপন লীলায় নিরন্তর,
এ তোমার আপনাতে আপনার অনন্ত উল্লাস ;
ভালবাস কি না বাস জানিবারে তাহা নাহি চাহি,
তোমার বন্দনাগীতি যাব আমি চিরকাল গাহি।



আলোচনা



ফেগুনাসারের মঠ

শ্রীঅরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে "বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রাচীন মঠ" প্রবন্ধে ফেগুনাসারের মঠের যে বিবরণ দিয়াছেন (পৃ. ৩২৪-২৫), তাহা ভ্রমপূর্ণ। যোগেন্দ্রবাবু যে মঠটিকে "শিববাড়ী" নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা "শিববাড়ী" নহে; আসল "শিববাড়ী" আধুনিক ধলেশ্বরীর একেবারে তীরে অবস্থিত। এইখানেই একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এইখানেই "প্রতিবৎসর বিশেষ ধুমধামের সহিত চড়ক-পূজা হয় ও মেলা বসে।" কিন্তু এই "শিববাড়ী"র পশ্চিম দিকে কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বড় দীঘি নাই এবং উহার উত্তর পাড়ে "শ্যামরায়ের প্রাচীরবেষ্টিত দ্বিতল বাটীর এবং সিংহ-দরজার ভগ্নাবশেষ" কোনও কালে দেখা যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে শিববাড়ী এবং ফেগুনাসারের মঠ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নিদর্শন। আসল ফেগুনাসারের মঠ গ্রামের দক্ষিণাংশে অবস্থিত; তাহারই পশ্চিম তীরে একটি বড় দীঘি আছে, কিন্তু ঐ মঠে কোন শিবলিঙ্গ নাই। অধিকন্তু, "শিববাড়ী" একটি মন্দির, "মঠ" নহে।

যোগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "ফেগুনাসারের মঠটি রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি" বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু রাজা রাজবল্লভের নাম ফেগুনাসারের মঠের সঙ্গে জড়িত নহে, তাহা আসল শিববাড়ীর সঙ্গেই জড়িত। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই শিববাড়ীর কিছু পূর্ব্বে অধুনা-ভগ্নপ্রায় একটি সেতু আছে; শোনা যায়, ঐ সেতুও না কি রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি। মনে হয় যোগেন্দ্রবাবু ফেগুনাসারের দুইটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের কথা অবগত নহেন; তিনি একটির কথাই জানেন, এবং অনুসন্ধানের অভাবে দুইটির বিভিন্ন বিবরণ একত্র জড়িত করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-প্রণেতার অবহেলাজনিত এইরূপ ভ্রম দর্শনে আমরা দুঃখিত।

অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষের গুহা

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী

আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রভাত নিয়োগী লিখেছেন যে অষ্ট্রেলিয়ার জেনোলান্ কেভ্স-এর মত কোন গুহা ভারতবর্ষে আছে ব'লে তিনি জানেন না। তাঁর এবং আরও যাঁরা জানেন না তাঁদের অবগতির জন্য লিখছি যে শ্রীহট্ট শহরের মাত্র ২০।২১ মাইল দূরে শ্রীহট্ট-শিলং 'মোটর রাস্তায়' তিন মাইলের মধ্যে রূপনাথ পাহাড়ে জেনোলান্ কেভ্স-এর মত Stalagmite ও Stalactite গুহা আছে। জনপ্রবাদ সেগুলি ভূগর্ভের পথে কামাখ্যা পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়েছে। আমি নিজে ও আমার সহকর্ম্মী শ্রীঅশোকবিজয় রাহা ঐ গুহাগুলির মধ্যে গিয়েছি, তবে উপযুক্ত উদ্যোগ-আয়োজন করা সাধ্যে কুলোর নি ব'লে বেশী দূর এগতে পারি নি। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি যে চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে চেরাপুঞ্জির খুব কাছেই তিন মাইল দীর্ঘ একটা Stalagmite ও Stalactite পাথরের গুহা আছে।

শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত নলিনী ভদ্র রূপনাথ সম্বন্ধে প্রবাসীতে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু এই গুহাগুলি যে Stalagmite ও Stalactite পাথরের এ খবরটা তিনি তাতে দেন নি। রূপনাথ নামটার বিশেষত্ব সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন নি। দক্ষিণ-ভারত শিবের নাম দিয়েছে নটরাজ, অখ্যাত পূর্ব্ব-ভারত তাঁরই নাম রেখেছে রূপনাথ, এর সঙ্গে পুরাণের দানবদের শিবভক্তির কাহিনী মিলিয়ে প্রাগার্য্য সভ্যতা সম্পর্কে একটু নূতন পথে কিছু অনুসন্ধানও করা যেতে পারে।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য। ভারতবর্ষে ঐরূপ গুহা নাই এ-কথা প্রবন্ধ-লেখক বলেন নাই। তিনি উহার কথা অবগত ছিলেন না, এই কথা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন। অবগত না থাকার কারণ, অষ্ট্রেলিয়ার গুহাগুলি যেরূপ যত্নের সহিত সাধারণের দর্শনযোগ্য করিয়া রাখা হইয়াছে, এদেশে ঐরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। পত্রলেখক মহাশয় রূপনাথের গুহার বাহিরের ও ভিতরের দৃশ্যের ফটোগ্রাফ পাঠাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে।]

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রকাশ-কাল

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী'তে মৌলবী রেজাউল করীমের "বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ" নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের প্রকাশের তারিখ সম্বন্ধে অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন, "আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে।"—৪৩৩ পৃ।..."আনন্দমঠের পর ক্রমে ক্রমে রাজসিংহ, সীতারাম, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর বাহির হইল"—পৃ. ৪৩৪।

আনন্দমঠ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, ইহা সত্য; কিন্তু অপর চারিখানা উপন্যাসের মধ্যে মাত্র সীতারাম ব্যতীত অন্য তিনখানাই আনন্দমঠের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জীবনী' হইতে উক্ত গ্রন্থগুলির প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।—

১। মৃণালিনী, প্রথম সং—১০ই নবেম্বর, ১৮৬৯।
২। চন্দ্রশেখর, প্রথম সং—১লা জুন, ১৮৭৫।
৩। রাজসিংহ, প্রথম সং—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২।
৪। আনন্দমঠ, প্রথম সং—১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮২।
৫। সীতারাম, প্রথম সং—৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৮৭।

—পৃ. ২১২-১৪ (৩য় সংস্করণ)।

যন্ত্র বনাম কুটির-শিল্প

শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত তাঁহার "কেন এই দুঃখ" প্রবন্ধে (পৌষ, ১৩৪৬) যন্ত্রচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির প্রতিবন্ধকতার কথা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু মহাত্মাজীর যন্ত্র-বিরোধিতার কথা উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন। যন্ত্রচালিত শিল্প সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত অকার্য্যকর ও ভ্রান্ত হইতে পারে কিন্তু তাঁহার মতামতের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় অস্ত্রবল, দৈহিক শক্তি ও রণকুশলতার তুলনায় শিল্পসম্ভার ও অর্থবলের প্রাধান্য বিধায় বর্ত্তমান কালকে বৈশ্য-যুগ বলা হয়। দেশের আর্থিক উন্নতি তথা সমৃদ্ধি যান্ত্রিক শিল্পের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে, মহাত্মাজীও দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং বাস্তবতাকে পরিহার করিয়া একান্ত ভাবে আধ্যাত্মিক জগতেই বিচরণ করেন না। এই অবস্থায় কোন্ যুক্তিতে তিনি যন্ত্রচালিত শিল্পের বিরোধিতা করেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আশা করি যে দেশের চিন্তানায়কগণ বিস্তৃতভাবে ও সরল ভাষায় এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করিবেন।

শুনিতে পাই মহাত্মাজী যন্ত্রমাত্রেরই বিরোধী নহেন। কিন্তু যে-সব যন্ত্র স্বল্পব্যয়ে প্রচুর উৎপাদন দ্বারা কুটির-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে এবং পরিণামে কুটিরশিল্প ধ্বংস করিবে তিনি সেই রূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠারই বিরোধী। তাঁহার এই বিরুদ্ধ মনোভাবের পক্ষে অনেক যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জগতের অন্যান্য দেশ ও রাষ্ট্র যখন যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্পায়াসে প্রচুর পণ্য উৎপাদন করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে থাকিবে তখন তাহাদের সহিত অসম-প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির-শিল্পীরা কিরূপে বাঁচিবে? কুটির-শিল্পের আনুকূল্যে যান্ত্রিক শিল্পের উপর উচ্চ হারে আমদানী-শুল্ক বসাইতে গেলে ভারতবর্ষ বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং হয়ত ঘোরতর যুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হইতে হইবে। শুধু জনগণের কুটির-শিল্প-প্রীতির উপর নির্ভর করাও সম্ভব নয়। অপর এক পথ আছে—যন্ত্রজাত পণ্যব্যবহারকারীদের উপর বিশেষ কর ধার্য্য করা, কিন্তু সেই কার্য্য অতিশয় জটিল ও বিপজ্জনক, তাহাতে আভ্যন্তরীণ ক্ষোভ ও বিদ্রোহের আশঙ্কা আছে।

তবে মহাত্মাজী যন্ত্রশিল্পের উচ্ছেদ কামনা করেন কেন? উত্তর হয়ত এই যে, তিনি ভারতের স্বাধীনতায় যেরূপ বিশ্বাসী, বিশ্বশান্তিতেও তাঁহার বিশ্বাস অনুরূপ অটল। বর্ত্তমান জগতের অধিকাংশ অন্তর্বিরোধ ও আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটের মূল কারণ যন্ত্রশিল্প; যন্ত্র বহু মানুষকে বেকার করে এবং প্রচুর পণ্য উৎপাদন করিয়া বিশ্বের বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতা উপস্থিত করে; ফলে শ্রমিকবিরোধ, ধর্ম্মঘট হইতে আরম্ভ করিয়া লোকক্ষয়কর মহাসমর পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। অর্থাৎ মানব-সমাজের বহুবিধ দুঃখযন্ত্রণার কারণ এই যন্ত্র। যন্ত্রের ভিতর দিয়া শুধু মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারই বাহির হইতেছে না, হিংসার বীজও উহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইতেছে।

যে ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিয়া মহাত্মাজী তাঁহার কর্ম্মপথ স্থির করিয়াছেন শত বৎসর পূর্ব্বে যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবের সূচনাতেই জগতের অনেক চিন্তাশীল মনীষী এই সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সতর্কবাণীকে ভ্রূকুটি করিয়া মানুষের হাতে-গড়া যন্ত্র আজও মানুষকেই ক্রমাগত সঙ্কটের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। অতএব মহাত্মাজীর যন্ত্র-শিল্প-বিরোধিতা এবং কুটীর-শিল্প-প্রীতি শুধুই ভাবপ্রবণতাজাত বা পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

কিন্তু যন্ত্রের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া সেখানে মানুষের আধিপত্য স্থাপন করা কি সম্ভব নয়? কুটির-শিল্পের অপ্রচুর উৎপাদন দ্বারা প্রতিযোগিতা রহিত করা অপেক্ষা শিল্পজাতের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশন কি অধিকতর কঠিন বা অসম্ভব? আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিরোধিতাশূন্যভাবে যন্ত্রকে মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত করা কঠিন সত্য, কিন্তু তাহা যদি অসম্ভব বিবেচিত হয়, তবে প্রাগ্ যন্ত্র-যুগে ফিরিয়া যাওয়াই কি সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়?



পুস্তক-পরিচয়

রবীন্দ্র-রচনাবলী—চতুর্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—কাগজের মলাট ৪॥০, রেক্সিনের বাঁধাই ৫॥০, মোটা কাগজে ছাপা ও রেক্সিনের বাঁধাই ৬॥০, কবির স্বাক্ষর সহ বিশিষ্ট সংস্করণ চামড়ার বাঁধাই ১০৲।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই বড় বড় খণ্ডগুলির নিয়মিত প্রকাশ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের প্রশংসার বিষয়।

এই চতুর্থ খণ্ডে স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার রবীন্দ্রনাথ, 'সাধনা'-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, ত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথ, এবং পিতৃশ্রাদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ, কবির এই চারিখানি ছবি আছে। তদ্ভিন্ন 'বিদায়-অভিশাপ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার ছবি আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফটিতে যে কঠোর দৃঢ় সঙ্কল্পের ব্যঞ্জনা লক্ষিত হয়, তাঁহার অন্যান্য ফোটোগ্রাফে তাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না।

এই খণ্ডে আছে—কবিতা ও গান "নদী" ও "চিত্রা"; নাটক ও প্রহসন "বিদায় অভিশাপ", "মালিনী" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা"; উপন্যাস "প্রজাপতির নির্বন্ধ", এবং প্রবন্ধ "ভারতবর্ষ" ও "চারিত্রপূজা"।

"ভারতবর্ষ" গ্রন্থখানি কবি স্বদেশী আন্দোলনের সময় লিখিয়াছিলেন। ইহার অনেক প্রবন্ধ পরে আর কোনও গ্রন্থে প্রচলিত ছিল না। রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে আছে 'নববর্ষ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ব্রাহ্মণ', 'চীনেম্যানের চিঠি', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা', 'বারোয়ারি-মঙ্গল', 'অত্যুক্তি', 'মন্দির', 'ধম্মপদং', ও 'বিজয়া-সম্মিলন'। 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে হলওয়েল মনুমেণ্ট সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন, আমরা শ্রাবণের "প্রবাসী"তে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

"চারিত্রপূজা" গ্রন্থে আছে 'বিদ্যাসাগর-চরিত' ১, 'বিদ্যাসাগর-চরিত' ২, 'রামমোহন রায়', 'মহর্ষির জন্মোৎসব', 'মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষ্যে প্রার্থনা' ও 'মহাপুরুষ'।

শ্রাবণ মাসে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা অনেক জায়গায় হইয়া গিয়াছে। সেইগুলির অন্ততঃ কোন কোন বক্তা ও শ্রোতা তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুটি পড়িয়া থাকিলে উপকৃত হইয়াছেন।

চতুর্থ খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়'টি সাতিশয় মূল্যবান্। কবির অনেক রচনা প্রথমে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, পরবর্তী কোন কোন সংস্করণে তাহার কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের উল্লেখ ও পুনঃপ্রকাশ এই গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাইবে। কোন কোন রচনার কবির স্বকৃত ব্যাখ্যাও ইহাতে আছে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা। ডাকমাসুল স্বতন্ত্র।

এই বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট অভিধানের ৬৮তম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ "বীজ" ও শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ২১৬৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলেজ-সমূহের ও উচ্চবিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারে ইহা রাখা আবশ্যক। যে-সকল পরিবারের বৃহৎ পুস্তকসংগ্রহ আছে, তাঁহাদেরও ইহা ক্রয় ও ব্যবহার করা উচিত।

সৈনিক বাঙালী—১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে ফ্রান্স, মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্তানে বাঙালী পল্টন। সুবেদার শ্রীমনবাহাদুর সিংহ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান ১ ডি, প্রিয়নাথ ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, ও সকল পুস্তকালয়, কলিকাতা।

১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণের "প্রবাসী"তে এই পুস্তকখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ উপলক্ষ্য করিয়া ঐ মাসের বিবিধ প্রসঙ্গেও অনেক কথা লেখা হইয়াছিল। সেই সকল কথা এখনও বলিবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু মাসিক পত্রে একই কথা বার বার বলা চলে না, দৈনিকে চলিতে পারে।

বহিখানির প্রথম সংস্করণ ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে বাহির হয়, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪০-এর জুন মাসে বাহির হইয়াছে। এই সংস্করণে ছবি বেশী আছে, অন্যান্য জিনিষও কিছু কিছু বেশী আছে।

শিক্ষিত বাঙালীদের ইহা পড়া উচিত।

পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে ও তাহার প্রকাশ উপলক্ষ্যে প্রবাসীতে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা বর্তমান সংস্করণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওআলিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

৭৬ পৃষ্ঠা পরিমিত এই পুস্তকটিতে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মদেরও, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মদেরও পঠনীয়। আজকাল সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সদ্ভাবের প্রয়োজন অনেক মনীষী ও অন্য অনেকে নির্দেশ ও স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই মৈত্রী ও সদ্ভাব অকপট ও গভীর হইতে হইলে সকল ধর্মের মত-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক—শুধু ঐতিহাসিক প্রাচীন ধর্মগুলির নহে, আধুনিক ধর্মগুলি সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা চাই। এই পুস্তিকাটি হইতে মোটামুটি সেইরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে। যাহারা ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা করেন বা করিতে চান, ইহা তাঁহাদেরও কাজে লাগিবে। ব্রাহ্মসমাজ কোন সম্পূর্ণ অভ্রান্ত উপদেষ্টা বা গ্রন্থ মানেন না। সুতরাং এই পুস্তকটির প্রত্যেক কথাই প্রত্যেক ব্রাহ্মের স্বীকৃত ও অনুমোদিত, এরূপ নহে। ইহার পাঁচটি অধ্যায়ে আছে—মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্মের আচরণ এবং পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগের কর্তব্য, সমবেত উপাসনা, নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান। পরিশিষ্টে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

ধর্ম্মের প্রকৃতি ও বিকৃতি—শ্রীসরোজকুমার দাস, এম্-এ, পিএইচ-ডি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দর্শনাধ্যাপক ডক্টর সরোজকুমার দাস বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানবত্তা ও মননশীলতার সহিত এই পুস্তিকায়

ধর্মের প্রকৃতি, ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও সাধনার স্তরভেদ, শঙ্করাচার্য ও তদীয় ব্রহ্মসাধন, রাজা রামমোহন রায় ও তদীয় ব্রহ্মবিদ্যাসংস্কার, এবং ধর্মের বিকৃতি, এই কয়টি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

ড.

শ্যামল ও কজ্জল—দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

প্রাচীন বাংলার দুইটি সমৃদ্ধ জনপদ বাগুসন (চাঁদপ্রতাপ পরগণা) ও সাভারের কাহিনী লইয়া প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। এই জনপদ দুইটি পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ যুগের বিকৃতির সময় চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এবং এ-দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ চ্যুত হইয়া তান্ত্রিক বামাচার এবং কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া ধর্ম্মান্ধতায় কি বিশৃঙ্খলা এবং বীভৎসতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই চিত্রে নায়ক শ্যামল এবং নায়িকা কজ্জলের প্রেম-কাহিনীকে সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের এই প্রকার পরিণতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন—লেখক হিসাবেও তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আলোচ্য বইখানি তাঁহার শেষ রচনা কয়েকখানির মধ্যে অন্যতম। সেই হিসাবে বইখানির মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঘুমপাড়ানী গান—শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। 'কোলকাতা প্রকাশনা নিকেতন, ১২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট্, কোলকাতা'। দাম দেড় টাকা।

বইখানি পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম না। গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে যে প্লটটি লেখক বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহা লইয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচিত হইতে পারিত—অথচ তাহা হইতে পারে নাই। ভাষার কৃত্রিমতা-দোষ-দুষ্টতাই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইল। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব তাঁহার উপর এত প্রবল যে, লেখক অন্ধভাবে সেই ভাষা ও ঢং অনুকরণ করিয়াছেন, অথচ সে ভাষার বিশেষত্ব তাঁহার আয়ত্ত নহে। বিশেষ করিয়া সংলাপের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্র-সংলাপের নিগূঢ় রস ও গভীরতা যাহার বলে তাঁহার চরিত্রগুলি মুহূর্ত্তে অসাধারণ হইয়া বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পাঠকের চোখের সম্মুখে জীবন লাভ করে, সেই গভীরতা এবং মর্ম্মরস লেখকের সৃষ্ট সংলাপের মধ্যে না-থাকায় অনাবশ্যক কথার মারপ্যাঁচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে বক্তব্য বিষয় জটিল ও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে—অন্য দিকে গল্পকেও দানা বাঁধিতে দেয় নাই।

ডেটেনিউ—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত। সরস্বতী-লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

কারা-প্রাচীরের অন্তরালে রাজবন্দীর দিন কেমন করিয়া কাটে, সেখানকার দুঃখ কত, তাহা জানিতে বাহিরের লোকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। একাধিক লেখক ইহার পূর্ব্বে সে-কৌতূহল মিটাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু এই বইখানি পড়িয়া মনে হইল, এমনটি আর পড়ি নাই।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছ সাবলীল (অবশ্য কিছু কিছু প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগাধিক্য দোষ আছে)—চিত্র-অঙ্কনের পটুতাও চমৎকার। কিন্তু কেবল শিল্পচাতুর্য্যই বইখানির বড় সম্পদ্ নয়; এই শিল্পচাতুর্য্যের অন্তরালে একটি গভীর অনুভূতিসম্পন্ন মনের আত্মপ্রকাশই বইখানির পরম গৌরবের বিষয়।

কারা-জীবনে বন্দীরা হাসি-তামাশা করিয়া দিন কাটায়—বাহির হইতে দেখিয়া-শুনিয়া তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সে হাসি-তামাশা সত্য বস্তু নয়, তাহা নিতান্তই কৃত্রিম, কৃত্রিম উল্লাসের আবরণ রচিয়া তাহারা অন্তরের আর্ত্তনাদ-ক্ষোভকে ঢাকিয়া রাখে, না-হইলে তাহারা বাঁচিতে পারিত না। তবুও কোলাহলমুখর দিনের অবসানে একাকীত্বের অবসরে তাহাদের দৃষ্টি আপনার সত্যকার অবস্থার দিকে নিবদ্ধ হয়। গভীর রাত্রে একা জানালার গরাদের উপরে মুখ রাখিয়া বন্দী যখন আপনার পানে ফিরিয়া চায়—জীবন তখন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে বন্দীর পক্ষে সে এক ভয়াবহ সময়। ইহার ফলে অনেকে উন্মাদ হইয়া যান, অনেকে আত্মহত্যা করিয়া বসেন। তাই এদিকে যথাসাধ্য চোখ বুজিয়া থাকাই বন্দীরা শ্রেয় পন্থা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দুঃসাহসী মন এদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সমস্ত দেখিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনি বৈরাগী না-হইলেও রসিক। মনের দৃষ্টিরসে অভিষিক্ত না-হইলে এ-অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সহ্য করা যায় না, তুচ্ছ করা যায় না। সেই রসদৃষ্টি আছে বলিয়াই বইখানি এমন রসোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। রোমাঞ্চকর কারা-কাহিনীর রোমাঞ্চকর অংশকে অর্থাৎ বাহিরের কোলাহলকে খাটো করিয়া নীরব মন হইয়া উঠিয়াছে বড়।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিপুর পরিচয়—প্রথম ভাগ। শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি এল। লীলাবাস, ১১৩, রূপচাঁদ মুখার্জ্জী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রধানতঃ শান্তিপুরের কৃতী সন্তান মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্পর্কে নানা ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং দীর্ঘ পরিশিষ্টে প্রসঙ্গতঃ শান্তিপুরের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কয়েকটি বিষয় ও কয়েক জন খ্যাতনামা মহাপুরুষের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থসংকলনের জন্য গ্রন্থকার নানা স্থানে ও নানা সময়ে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক আলোচনা করিয়াছেন। পাদটীকায় ও প্রমাণপঞ্জীতে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে একটি বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থব্যবহারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। গ্রন্থে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে লেখা অনেক স্থানে খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ধর্ম্মসমন্বয় ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার। নোয়াখালি হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ৫৯। মূল্য আট আনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাণী ও ধর্ম্মসমন্বয়ে তাঁহার কি দান—তাহাই এই পুস্তকে গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা সহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তত্ত্বান্বেষিগণ বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।

পরমেশ্বর ও তাঁহাকে লাভের উপায়—শ্রীগোপীনাথ মিত্র। প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ মিত্র, ৩২ জয় মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৮। মূল্য আট আনা মাত্র।

বেদান্তদর্শন, উপনিষদ্, গীতা, মনুসংহিতা ও সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত-সংগ্রহের (বঙ্গানুবাদ সহ) সংক্ষিপ্ত সারসঙ্কলন। ১০৮খানি

উপনিষদের মধ্যে ইহাতে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই নয়খানি উপনিষদ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

গীতার কথা—শ্রীরণজিৎকুমার নিয়োগী, বি-এ। মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ৮৬। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকার এই পুস্তিকায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার মর্ম্মকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহাদের সভাষ্য মূল গীতা পড়িবার অবসর কম, তাঁহারা 'গীতার কথা' পড়িয়া গীতাতত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

প্রবাসে—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬, বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। সচিত্র।

বইখানির অতিসাধারণ নাম দেখিয়া ইহার বিষয়বস্তুর পরিসর সম্বন্ধে ভুল ধারণা হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু এখানে 'প্রবাস' অর্থে রাঁচি বা গিরিডি নয়, শিলং বা দার্জ্জিলিং নয়, এমন কি কাশ্মীরও নয়। ১৯৩৩ সালের শেষে এগার টাকা সম্বল লইয়া লেখক পৃথিবী-পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, বালি, জাভা, ইরান ও ইরাক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য-আরামে পরিবৃত হইয়া লেখক ভ্রমণ করেন নাই; তাঁহার বিচিত্র ও আকস্মিক অভিজ্ঞতার কথাই স্থানে স্থানে ভাষাগত ত্রুটি সত্ত্বেও, পাঠককে আকর্ষণ করে। আলোচিত দেশগুলি সম্বন্ধে অনেক তথ্যও এই বইটিতে আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বাংলার পুরনারী—দীনেশচন্দ্র সেন। প্রকাশক—ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী, কলিকাতা।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের শেষ গ্রন্থ "বাংলার পুরনারী" তাঁহার মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার শেষ গ্রন্থ হইলেও তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। বাংলার ইতিহাস ও বাংলার সাহিত্য দুই দিক্ দিয়াই এই বইখানির মূল্য আছে। প্রাচীন বাংলায় অর্থাৎ নবাবী আমলের শেষ দিকে বাংলার পল্লীতে এমন কয়েকটি রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহারা ইতিহাসে ও সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন পাইবার যোগ্য। বাংলার পল্লীগীতিকথায় তাঁহাদের কাহিনী ইতিহাস ও কল্পনায় মেশামেশি হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি কয়েক জনের সাহায্যে এই পল্লীগীতিগুলি সংগ্রহ করেন। মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত চারি খণ্ডে গবর্ণমেণ্টের অর্দ্ধেক আর্থিক সাহায্যে এই গীতিকাগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৫৮টি গীতিকা আছে।

'বাংলার পুরনারী' পুস্তকে যে সকল নারীচরিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা বঙ্গীয় পল্লীগীতিকা হইতে সঙ্কলিত। মূল গীতিকাগুলি পূর্ব্ববঙ্গের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় লিখিত, তাহা সকলের সহজবোধ্য নহে। দীনেশবাবুর সহজ সরল, মাজ্জিত ও সুললিত ভাষায় গল্পগুলি বাঙালী মাত্রেরই উপভোগ্য হইয়াছে।

বাংলার পল্লীগীতির এই চরিত্রগুলি শুধু যে চরিত্রহিসাবে অপূর্ব্ব তাহা নয়, চিত্রহিসাবেও নিখুঁৎ। যে পল্লীকবিরা এই ছবিগুলি আঁকিয়াছেন তাঁহারা নিপুণ শিল্পী। না হইলে কমলারাণীর দীঘিতে প্রাণ উৎসর্গ, মহুয়ার সর্ব্বগ্রাসী প্রেম, কাজলরেখার অনন্ত ধৈর্য্য, কাঞ্চনমালার সহজিয়া প্রেম, চন্দ্রাবতীর ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির এমন অপরূপ চিত্তগ্রাহী ছবি তাঁহারা আঁকিতে পারিতেন না। এই চিত্রগুলিতে খাঁটি বাংলার বাস্তব চিত্রগুলি ধীরে ধীরে কখন যে অবাস্তবের স্বপ্নলোকে ও অপূর্ব্ব কল্পনাকে গিয়া উঠিতেছে তাহা ধরা যায় না। পাঠকের মন এই উপাখ্যানগুলির রসসৌন্দর্য্যে এমন ভরিয়া উঠে যে দীর্ঘকাল ধরিয়া দৈনন্দিন তুচ্ছতার উপরে তাহা গানের সুরের রেশের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

বাংলা দেশে আধুনিক উপন্যাস প্রভৃতির সৃষ্টি যখন বহু দূরে তখনকার দিনে পল্লীকবিরা যে এমন চিত্তহারিণী কাহিনীগুলি এমন অপূর্ব্ব কবিত্বরসে ভরপুর করিয়া পল্লীকৃষক ও নিরক্ষর গ্রামবাসীদের উপহার দিয়াছেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আধুনিক বাংলা ভাষায় মার্জ্জিত রূপে এই চিত্রগুলিকে না দেখিতে পাইলে আমরা উহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। দীনেশচন্দ্র তাঁহার সুমার্জ্জিত ও সুললিত ভাষার সৌষ্ঠবে বাংলার পুরনারীকে অলঙ্কৃত করিয়া তাহাদের অনবদ্য বিচিত্র রূপ পাঠকদের নিকট জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। আজ আর তাঁহাকে এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু বাংলার পাঠক-পাঠিকা তাঁহার নিকট ঋণী রহিল।

শ্রীশান্তা দেবী

জোনাকি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

এটি একটি সনেটগুচ্ছ। "সাধারণতঃ চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারে সনেটের প্রত্যেক লাইনটি রচিত হয়। সনেটকে আরও সংক্ষিপ্ততর করবার চেষ্টায় তার প্রত্যেক চরণটির বর্ণমালা আট থেকে এগারো অক্ষরে গ্রথিত হয়েছে—এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়।"

সব কয়টি কবিতার গতিই একমুখী। কবি তাঁর মানসীকে উদ্দেশ করিয়াই একটির পর একটি করিয়া এই জোনাকির প্রদীপগুলি ভাসাইয়া দিয়াছেন। জোনাকির মত তাহারা দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়ে নাই, স্রোতের ধারার মত একই পথে চলিয়াছে। এত ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও প্রত্যেকটি সনেটই তাহার ভাবসম্পদ পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। নিপুণ কারিগরের হাতে গড়া ছোট গহনাতেও যেমন তাহার সমস্ত নৈপুণ্য ফুটিয়া উঠে কবির হাতে জোনাকিও সেইরূপ তারার মালার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ.

ওলাউঠা রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা—ডাঃ অভয়কুমার সরকার, এম্. বি., ডি. পি. এইচ.। প্রকাশক—রায় এণ্ড কোং, ৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১।০।

বইখানির প্রথম সংস্করণের সমালোচনা "প্রবাসী"তে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং পুনরায় ইহার বিস্তৃত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই বইখানি বাংলা দেশের বহু মিউনিসিপালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ পাঠ করিয়া থাকেন এবং ইহার উপদেশমত কাজ করেন। বাংলা দেশেই কলেরা রোগের প্রভাব পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক। তাহার প্রধান কারণ পুষ্করিণী ও কুয়ার জল প্রভৃতি দূষিত করার কুঅভ্যাস, যাহা এমন ভাবে কুত্রাপি হয় না। আরও নানারূপ কারণ আছে, যাহা এই পুস্তকে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কলেরা রোগের চিকিৎসাও ইহাতে বিস্তৃতভাবে

লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা আশা করিয়াছিলাম ব্যাকটিরিও-ফাজের দ্বারা কলেরা চিকিৎসার নূতন পদ্ধতি ও গ্লুকোজ ইনজেকশন প্রভৃতির কথা দেখিতে পাইব।

বসন্ত রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা—ডাঃ অভয়কুমার সরকার, এম্. বি., ডি. পি. এইচ.। প্রকাশক—শ্রীঅমলকুমার সরকার, কলেজ রোড, ফরিদপুর। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৷০।

এই পুস্তক-পাঠে বসন্ত রোগ সম্বন্ধে সকল তথ্যই জানিতে পারা যায় এবং চিকিৎসকগণ ইহার সাহায্যে সাফল্যের সহিত ঐ রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন এবং স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এই রোগের প্রতিষেধের উপায়গুলি সম্যক্‌ভাবে অবগত হইতে পারেন। ইহাতে শিরামধ্যে আইওডিন ইনজেকশন ও ডাঃ দাসগুপ্তের প্রবর্তিত আইওডিনের সহিত দুধ মিশ্রিত করিয়া ইনজেকশনের অদ্ভুত সাফল্যের কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বসন্ত-চিকিৎসার আরও কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা আছে তাহার কথা লেখকের উল্লেখ করা উচিত ছিল। প্রথমত আর্সেনিক (সালফারসিনল) ইনজেকশনের কথা। দ্বিতীয় ভিজগাপটমের ডাঃ গোবিন্দ আয়ার কর্তৃক উল্লিখিত লিভার একস্ট্রাক্ট ইনজেকশনের দ্বারা চিকিৎসার কথা। তৃতীয়ত নূতন ঔষধ প্রণ্টোসিল প্রয়োগের কথা।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়, এম্. এ., বি. এল.। বক্সীবাজার, ঢাকা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ৮৬ পৃ. মূল্য আট আনা মাত্র।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে উচ্চ বিজ্ঞান অধার্ম্মিক নয়—উহাও ধর্ম্ম মানে। আর উভয়ের কলহটা অতীতে যতই তীব্র হউক না কেন, বর্ত্তমানে ক্রমশঃ উহা লোপ পাইতেছে।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ও সুলেখক। কিন্তু কতকগুলি ইংরেজী কথার তিনি যে তর্জ্জমা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পছন্দ হয় নাই; যেমন, 'Occasionalism'এর বাংলা 'সাময়িকতাবাদ' (২৪ পৃঃ), ইত্যাদি। তবে, এ সব অনুবাদে ভুল করিতে করিতেই ঠিক কথাটি ভাষায় আসিয়া পড়িবে। ছাপার ভুলও বইখানিতে অল্পবিস্তর আছে। এ গ্রন্থে আলোচিত প্রশ্নের আরও আলোচনা হওয়া সভ্যতার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বইখানা লোকপ্রিয় হওয়া উচিত।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ছেলেদের খেলা—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ (ক্যাণ্টাব)। শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী, ৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃ. ১১৫। মূল্য ৸০।

বালক-বালিকাদের মানসিক বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে খেলাধুলা যে কত দূর সহায়তা করে এবং খেলাধুলার আনন্দের মধ্য দিয়া তাহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা, উদারতা, পরস্পর-সহযোগিতা, মানসিক প্রসারতা প্রভৃতি যে কত দূর বর্দ্ধিত হয়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজও আমাদের দেশে ইহা ততটা উপলব্ধি হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহ ফ্রোবেল, মন্তেসরী প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ-প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের উপকারিতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আলোচ্য বইখানিতে বালকবালিকাদের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের ১৬৫টা খেলার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। অনেক খেলা চিত্রসাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকের ধারণা মূল্যবান্ যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকে আমোদপ্রদ খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, বইখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের এই ভুল ধারণার পরিবর্ত্তন হইবে। লেখক বহু বৎসর বঙ্গীয় ও তৎপরে ভারতবর্ষীয় বয়স্কাউট সঙ্ঘের কার্য্যাধ্যক্ষরূপে এই দেশের বালক-বালিকাদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই বইখানি বালক-বালিকাদিগের নিকট ও ক্রীড়া-শিক্ষকদিগের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

বেদের পরিচয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন প্রণীত। বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা। ২০+৪২১ পৃষ্ঠা, ডিমাই ৮ পাতার আকার। মূল্য ৩৲ টাকা।

গ্রন্থের ভূমিকায় স্যর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'বেদের সম্যক পরিচয় এই 'বেদের পরিচয়' গ্রন্থে আছে।" কথাটি কিন্তু অত্যুক্তি হইয়াছে। কারণ বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই ইহাতে নাই। অবশ্য গ্রন্থকার মহাশয়ই ১৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থকে বেদের প্রাথমিক পরিচয় বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি স্বামী মহাশয়ের প্রস্তাবনা অংশটি পড়িলে মনে হয়, তাঁহার হৃদয় যথার্থই বেদবিদ্যা প্রচারের জন্য ব্যাকুল এবং এজন্য তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছেন। ইহাতে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বেদবিদ্যা লাভের ইচ্ছা হিন্দুমাত্রেরই বোধ হয় জাগরূক হইবে। অতঃপর ৮ম অধ্যায়ে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ১২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বেদের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, তাহা বৈদিক হিন্দুর দৃষ্টিতেই দিয়াছেন এবং সাধারণের অজ্ঞাত বহু কথাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু নবম হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের লক্ষ্য যেন কেবল বেদের পরিচয়ের দিকে আবদ্ধ ছিল না বোধ হইল। তিনি নবম অধ্যায়ে কেবল শুক্ল যজুর্বেদের অধ্যায়সার দিয়া ক্ষান্ত হইলেন কেন? অন্য বেদগুলির কথা কিছু দিলে কি ভাল হইত না? অতঃপর দশম ও একাদশ অধ্যায়ে ১৯১ পৃষ্ঠায় যে পুরুষসূক্তের ও ঈশোপনিষদের যে "বন ব্যাখ্যা" প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য বেদের পরিচয় প্রদান নহে, কিন্তু গৌড়ীয় অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ মতে বেদার্থ প্রচার। এ গ্রন্থে বেদের পরিচয় আটটি অধ্যায়ে ১৫০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু "বন ব্যাখ্যায়" ১৯১ পৃষ্ঠা স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্য মনে হয় "বন ব্যাখ্যা"র প্রচার উদ্দেশ্যই এস্থলে প্রধান। বস্তুতঃ বেদ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য কথাই রহিয়া গিয়াছে। বেদের পরিচয় আজ বোধ হয় সহস্র পৃষ্ঠাতেও কুলায় না। পুরাণমধ্যে বেদ সম্বন্ধে যে-সব কথা জানা যায় তাহা দিলেন না কেন তাহা বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে যে-সব গবেষণা করিয়াছেন তাহার পরিচয় থাকিলে ভাল হইত। "বন" মহারাজের পাশ্চাত্য প্রদেশে গতিবিধি অবাধ, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে অনেক সন্ধানই দিতে পারিতেন। বস্তুতঃ আজ যদি হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদ আলোচনা করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে এই সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বহু আপত্তিকর কথার সদুত্তর আমাদের জানা থাকা আবশ্যক হইবে। যাহা হউক, গৌড়ীয় অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ "বেদের পরিচয়" নামে অভিহিত করিলেও ইহা হইতে বেদ সম্বন্ধে বহু অপ্রচলিত এবং সাধারণের অজ্ঞাত কথার জ্ঞান হইবে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। গ্রন্থকার অপর সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ বিষয়ে যেরূপ সংযত তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসাই করিতে হইবে। তবে যেখানে গ্রন্থকার যুক্তিবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার অসাবধানতা এবং অকুশলতা অনেক স্থলে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থকার এ বিষয়ে ভবিষ্যতে মনোযোগ প্রদান করিলে তাঁহার লেখা পড়িয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের



উৎকণ্ঠিতা

শ্রীনীরদ মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। যাহা হউক, সমাজের এই উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে এই গ্রন্থখানি যে সমাজের মহান্ উপকারসাধন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চিদ্‌ঘনানন্দ

জীবনসঙ্গিনী—প্রথম খণ্ড। শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

লেখক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় এই গ্রন্থে সহধর্ম্মিণীর ধারাবাহিক জীবনের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্ম্মজীবনেরও একটা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। গ্রন্থকার শুধু যে এক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তাহা নহে, তিনি এক জন প্রসিদ্ধ কর্ম্মযোগী। তাঁহার জীবনে তাঁহার যোগ্য সহধর্ম্মিণীর প্রভাবও বড় অল্প নয়। নানা দুঃখ-নির্যাতন সহ্য করিয়াও সেই পুণ্যবতী নারী কিরূপে স্বামীর যথার্থ জীবনসঙ্গিনী হইয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি চিত্তাকর্ষক ঘটনাপরম্পরায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশের রাজনীতিক ইতিহাসেরও কতকটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। রচনাগুণে ও ঘটনাবৈচিত্র্যে পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় মনোজ্ঞ হইয়াছে।

পত্নী-ব্রত—শ্রীমতিলাল দাশ। প্রাপ্তিস্থান—দাসগুপ্ত এণ্ড কোং ৫৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইহাতে আটটি ছোট গল্প স্থান পাইয়াছে। প্রথম গল্প "পত্নী-ব্রত" হইতেই পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। এই গল্পটিতে এমন একটা মাধুর্য্যের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, যাহা পাঠকের অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে না। দ্বিতীয় গল্প "স্বামী ও স্ত্রী"-তে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের একটা সুখদুঃখময় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সাধন" ও "দীক্ষা" গল্প দুইটিতে একটা সুন্দর সমাহিত ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রন্থকারের গল্পগুলি মামুলী রচনা নয়। দুটি-তিনটি গল্পে উচ্ছ্বাসের স্রোতটা আর একটু সংযত করিলে ভাল হইত। যাহা হউক, ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এই পুস্তকখানি আদৃত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

জাতীয়তার পথে—মৌলবী রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকটি চিন্তাশীল লেখক জাতীয়তা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, রেজাউল করীম সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। তিনি নানা পত্রিকায় প্রকৃত জাতীয়তা কি তাহা বুঝাইবার জন্য বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্র দেখাইয়াছেন যে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের প্রধান অন্তরায় সাম্প্রদায়িকতা, এবং সে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও ধর্ম্মান্ধতা হইতে। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোককে জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার নানা ভাবে সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে অনেকের ধারণা যে মুসলমানের স্বজাতিপ্রেম কোন ভৌগোলিক গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহে। গ্রন্থকার নবজাগরিত তুরস্ক, ইরাক ও ইরানের প্রমাণ দেখাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সেই ধারণা একান্ত ভ্রান্ত, "আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার মাতৃভূমি"—এই মহান্ আদর্শকে বরণ করিয়া তুরস্ক প্রভৃতি দেশ আজ সর্ব্বত্র সমাদৃত। এ দেশেও যে সেই আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই প্রচার করিবার জন্য লেখক এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি হজরত মহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের মতবাদ গ্রহণ করিয়া ইসলামের জাতীয়তার আদর্শের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আজ ভারতীয় মুসলমানকে হজরত মহম্মদের আদর্শ অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলনে জাতিগঠনের কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। নিজেদের বিশেষ সুবিধা অপেক্ষা সমগ্র দেশের ও সমগ্র জাতির সাধারণ সুবিধাকে উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহাই আদায় করিবার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত হইতে হইবে। ইহাই ইস্‌লামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ।" আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। লেখকের রচনাভঙ্গী প্রাণস্পর্শী ও সরল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

কাম-রূপ—শ্রীচরণদাস ঘোষ। চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন, বজবজ। মূল্য এক টাকা।

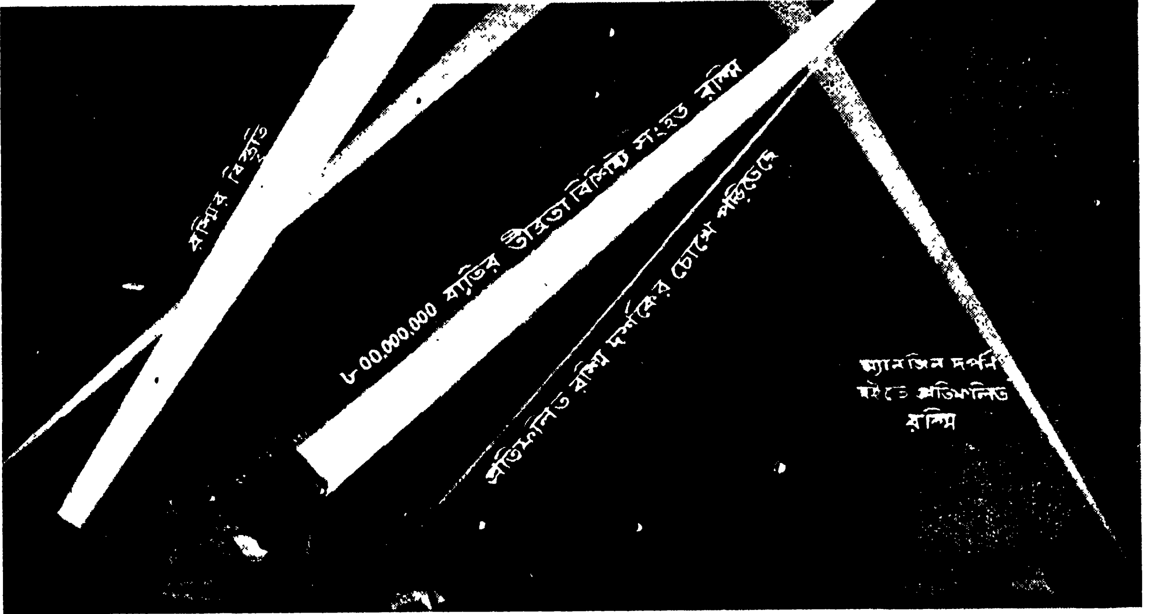
কাম-রূপ উপন্যাস। কাহিনী রোমান্টিক। ঘটনার সংস্থান—আসাম প্রদেশের অরণ্য অঞ্চলে। প্রকৃত সংস্থিতি ছায়ালোকিত ভাবলোকে। সন্ন্যাসীর শুষ্ক চিত্ত নারীর প্রেমে সরস ও সার্থক হইল, গল্পের পরিকল্পনা এই দিকে চলিয়াছে। মানুষের বাহিরটা সমাজ ও রাষ্ট্র-শক্তির অধীন, অন্তর স্বাধীন; কামনার পরিতৃপ্তিতে স্বাধীনতা নাই, প্রেমের প্রতিষ্ঠা ত্যাগে; পুরুষের শক্তি নারী, নারীর মহিমা জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে, জীবনের চরিতার্থতা বৈরাগ্যে নয়; গল্পাংশের মধ্য দিয়া এই ভাবগুলি গ্রন্থকার ফুটাইতে চাহিয়াছেন। রূপক ও রূপকথায় মিশাইয়া কামরূপের কাহিনী অন্য উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র একটি রূপ ধারণ করিয়াছে। গল্প আরণ্য পথে প্রবাহিত। অরণ্যে কোলাহল নাই, কুহক আছে। গল্প সরস। ভাষা প্রাঞ্জল। বর্ণনা চিত্তগ্রাহী। বাস্তব-বিভ্রান্ত পাঠকের স্বপ্ন-পিপাসু অন্তরকে "কাম-রূপ" তৃপ্তিদান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বিমান-সন্ধানী আলো

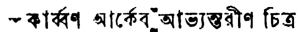
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান যুদ্ধে বিমান-আক্রমণেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। বোমাবর্ষী বিমানসমূহ কিরূপ ভয়াবহ ধ্বংসলীলা প্রকটিত করিয়া থাকে তাহার বিবরণ কাহারও অবিদিত নাই। এই ভয়াবহ আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে বিমান-আগমন-সংবাদজ্ঞাপক স্বয়ংক্রিয় শব্দযন্ত্র, বেলুন ব্যারেজ, বিমান-ধ্বংসী কামান প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বৈদ্যুতিক পর্দ্দার পরিকল্পনার বিষয় শোনা যাইতেছিল। পরিকল্পনাটা ছিল এইরূপ—যে-দেশ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা তাহার বহিঃসীমানার চতুর্দ্দিকে কিছুদূর অন্তর-অন্তর শক্তিশালী তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে অতি তীব্র 'তড়িৎ-প্রবাহের একটা অদৃশ্য পর্দ্দা সৃষ্টি করা হইবে। এই বৈদ্যুতিক পর্দ্দা থাকিবে আকাশের উর্দ্ধস্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অদৃশ্য পর্দ্দার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই বিমানপোতে আগুন ধরিয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এ পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হইয়াছে এরূপ কোন খবর শোনা যায় নাই।



বিভিন্ন ধরণের সন্ধানী আলোক-রশ্মি

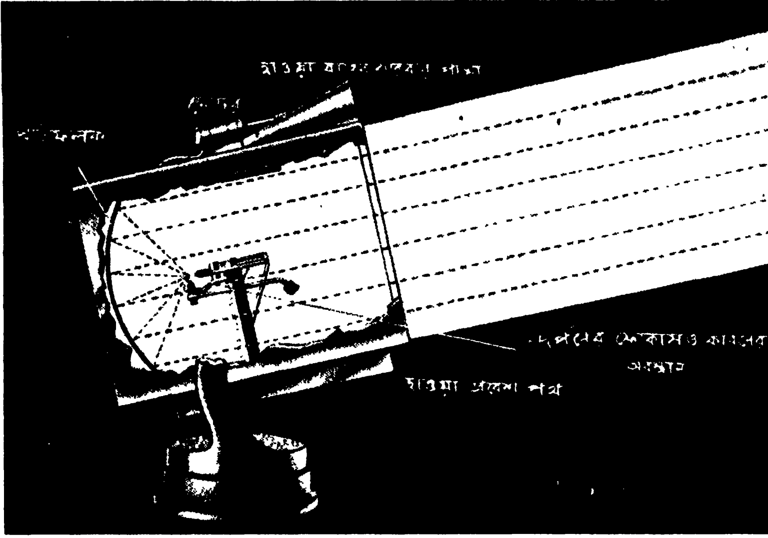
যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রধানতঃ জঙ্গী-বিমানের সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ করিয়া অথবা বিমান-বিধ্বংসী কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিয়াই আক্রমণকারী বিমানকে পর্য্যুদস্ত করা হইয়া থাকে। ঠিক উপর হইতে বোমারু-বিমান লক্ষ্যস্থলে বোমা বর্ষণ করে; কিন্তু বিমান-আগমন-বার্ত্তাজ্ঞাপক এমন শব্দযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে বহু দূর হইতে বিমান আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া লক্ষ্যস্থলে আসিবার পূর্ব্বেই প্রতিপক্ষীয় জঙ্গী-বিমানদল পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য


—কার্ব্বণ আর্কের আভ্যন্তরীণ চিত্র

প্রজ্বলিত আর্ককে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে

ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। তাছাড়া আক্রমণকারী বিমানের প্রধান শত্রু হইতেছে—বিমান-বিধ্বংসী কামান। এক বার দৃষ্টিগোচর হইলে এই কামানের হাত হইতে বিমানের আর নিস্তার নাই। সেই জন্যই রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া ইহারা দলে দলে আক্রমণ করিতে বাহির হয়। দেখিতে না পাইলে বিমান-ধ্বংসী কামান আক্রমণ করিবে কাহাকে? কাজেই অতিতীব্র আলো-বিকিরণকারী বিমান-সন্ধানী আলো আবিষ্কৃত হইয়াছে। যতই উঁচুতে উঠুক, মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করিতে না পারিলে সন্ধানী আলোর পাল্লায় তাহাকে পড়িতেই হইবে। এই সন্ধানী আলোর কার্য্যকৌশল অতীব বিচিত্র।

প্রথম যখন সন্ধানী আলো আবিষ্কৃত হয় তখন কেরোসিন অথবা এসিটিলিন ব্যবহার করা হইত। কিন্তু ইহা সন্তোষজনক না হওয়ায় বিজলী বাতি ব্যবহৃত হইতে থাকে। বিজলী বাতি ব্যবহার করিয়াও সন্ধানী আলোর তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। আজকাল অবশ্য সঙ্কেত প্রেরণের উদ্দেশ্যে ছোটখাট সন্ধানী আলোতে বিজলী বাতি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বৈদ্যুতিক 'আর্ক-লাইট' উদ্ভাবিত হইবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ধানী আলোর উন্নতি সুরু হয়। প্যারিস নগরীর রাজপথ আলোকিত করিবার জন্য ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক আর্ক-লাইট ব্যবহৃত হইয়াছিল। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-উৎপাদক কতকগুলি তড়িৎকোষ বা 'সেল' হইতে উৎপন্ন তড়িৎস্রোত পরস্পর সংলগ্ন দুইটি কার্ব্বণ পেন্সিলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করা হইত। তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইবার সময় কার্ব্বণ পেন্সিল দুইটি কিয়দ্দূর সরাইয়া লইলেই উভয় পেন্সিলের মধ্যস্থিত ফাঁকা জায়গাটুকুতে ধনুকের আকারে একটি তীব্র আলো-রেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কার্ব্বণ দুইটির একটি ধন-তড়িৎ বা পজিটিভ, অপরটি ঋণ বা নেগেটীভ তড়িৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে। তড়িৎপ্রবাহ



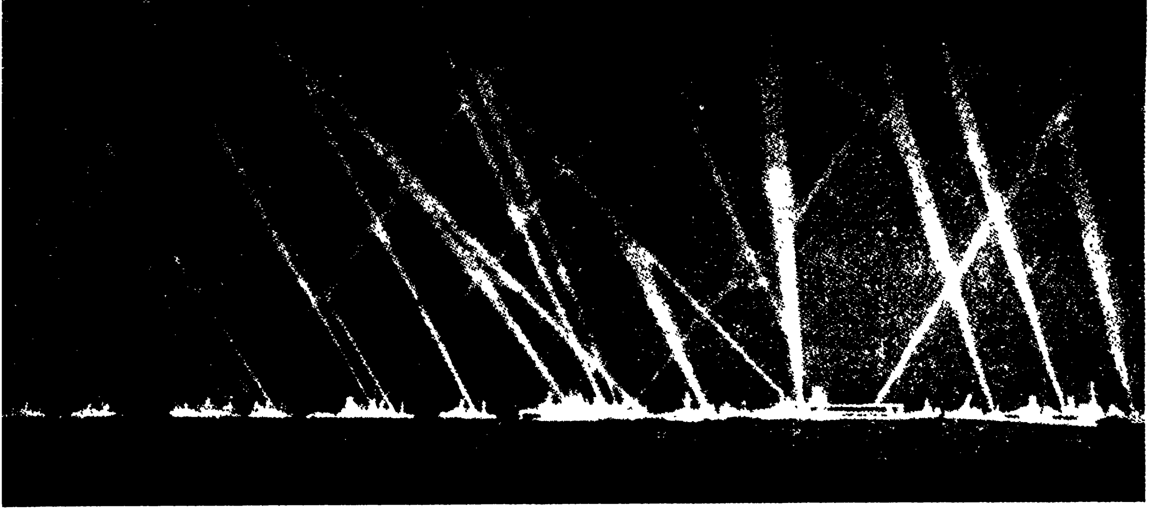
দর্পণের ফোকাসিং পয়েন্ট ও কার্ব্বণের অবস্থান

ঘটে। 'আর্কে'র মধ্যে তখন প্রবল চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্থানচ্যুতি ঘটিতে থাকে। অবশ্য আর্কের গায়ে ক্রমাগত অ্যাল্‌কহল্‌ বাষ্প প্রয়োগে এ অস্থিরতা বিদূরিত হইতে পারে। কারণ অ্যাল্‌কহল্‌ বাষ্পে আবৃত থাকায় কার্ব্বণটি বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া সহজে দহন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারে না।

বহুবিধ কঠিন পদার্থ থাকিতেও আর্ক-লাইটে ক্ষয়-প্রবণ কার্ব্বণ ব্যবহৃত হয় কেন? এ প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিতে পারে। কার্ব্বণ ব্যবহার করিবার প্রধান কারণ এই যে, প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় অন্যান্য কঠিন বস্তু অপেক্ষা কার্ব্বণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিতে পারে। পরে প্রমাণিত হইল যে, সূর্য্যের মধ্যে এমন কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ রহিয়াছে যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় কার্ব্বণ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ঔজ্জ্বল্য বিকিরণ করিতে পারে। এগুলি অর্দ্ধস্বচ্ছ বলিয়া যেমন বহির্দ্দেশ হইতে তেমনই অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে অতি তীব্র কিরণ বিস্তার করে। সিরিয়াম ও ল্যান্‌থেনাম্‌ নামক দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকাজাতীয় পদার্থ পজিটিভ কার্ব্বণের অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট করাইয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অত্যুজ্জ্বল-আলো-বিকিরণকারী এই গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং তাহার ফলে কার্ব্বণ-আর্কের আলোর ঔজ্জ্বল্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই গ্যাস যাহাতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া না পড়িয়া সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যেই অবস্থান করে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থ সহযোগে এই দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকার এক প্রকার মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয়। এই মিশ্রণ এমন ভাবে প্রস্তুত যে তাপের প্রভাবে চতুর্দ্দিকের কার্ব্বণ আবরণ অপেক্ষা ইহা কিঞ্চিৎ দ্রুতগতিতে বাষ্পীভূত হইতে পারে। ইহার সুবিধা এই যে, দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকার গ্যাস

নেগেটিভ কার্ব্বণ হইতে ছুটিয়া গিয়া পজিটিভ কার্ব্বণের অগ্রভাগে পতিত হয় এবং সেখানে একটি গর্ত্ত সৃষ্টি করে। অত্যধিক তাপে উত্তপ্ত হইয়া এই স্থানটি সুতীব্র আলোক বিকিরণ করিতে থাকে। কার্ব্বণ দুইটির মধ্যস্থলে আলোক-রেখা ধনুকের মত বাঁকিয়া থাকে বলিয়াই ইহাকে আর্ক-লাইট বলা হয়। যাহা হউক, প্যারিস নগরীর রাজপথ আলোকিত করিবার ব্যাপার হইতে আর্ক-লাইটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলেও তড়িৎ উৎপাদনের সহজ উপায় আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাহার প্রায় বিশ বছর পরে ডাইনামো আবিষ্কারের ফলে তড়িৎ উৎপাদনের সকল অসুবিধা বিদূরিত হয়। তখন হইতেই আর্ক-লাইট দ্রুতগতিতে দিনের পর দিন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে।

আর্ক-লাইটের আলোর তীব্রতা বা ঔজ্জ্বল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে তড়িৎপ্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহও আবার বেহিসাবী ভাবে বৃদ্ধি করা যায় না, কারণ প্রবাহ বৃদ্ধি করিলে কার্ব্বণ অতি দ্রুত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় অবশ্য খুব মোটা কার্ব্বণ ব্যবহার করা যাইতে পারে; তাহাতে কিন্তু আবার অন্য অসুবিধা



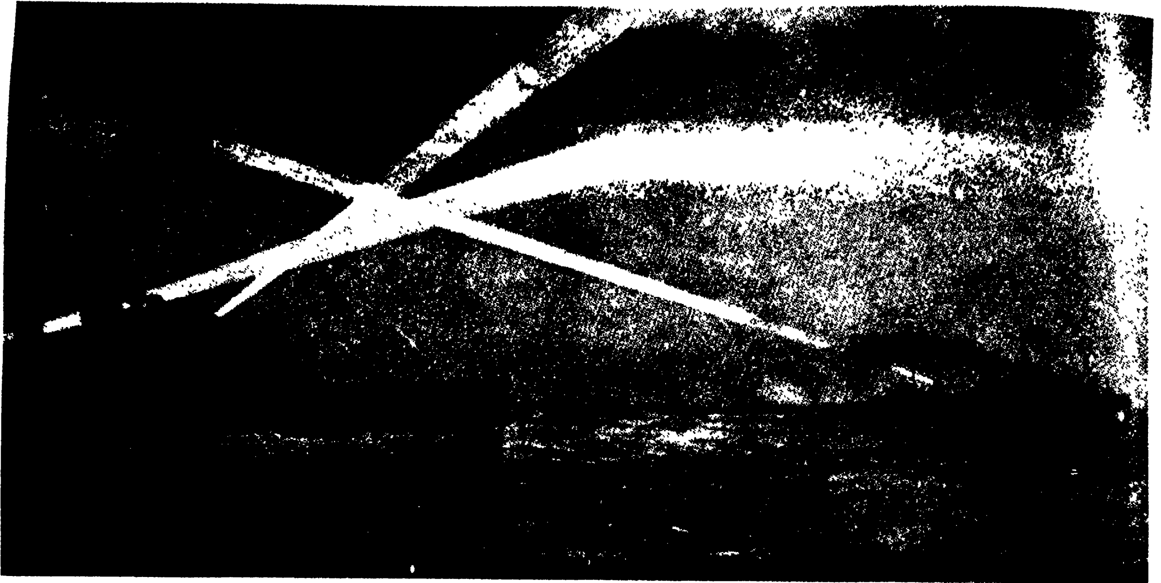
সম্মিলিত নৌবহর হইতে উর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত সন্ধানী আলোক-রশ্মির দৃশ্য

একসঙ্গে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে না এবং যেটুকু উৎপন্ন হয় তাহাও কার্ব্বণের গর্ত্তের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়। নেগেটিভ কার্ব্বণটিও এমন ভাবে অবস্থিত যে উহা হইতে নির্গত অগ্নিশিখা পজিটিভ কার্ব্বণের গর্ত্ত স্পর্শ করিয়াই প্রজ্জলিত হইতে থাকে, কাজেই গ্যাস গর্ত্তের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবার অবসর পায় না—ভিতরেই জলিতে থাকে।

পূর্ব্বের তুলনায় আধুনিক আর্ক-লাইটের কার্য্যকরী শক্তি কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে একটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ৮০০ বাতির শক্তিবিশিষ্ট আলোকরশ্মি উৎপাদন করিতে পূর্ব্বেকার একটি কার্ব্বণ-আর্কের ৩৬০ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎশক্তি ও ১২৫ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট প্রতিফলক দর্পণের প্রয়োজন হইত। আজকাল ঐরূপ তীব্র রশ্মি উৎপাদন করিতে মাত্র ১৫০ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ শক্তি ও ৬০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট প্রতিফলক দর্পণের প্রয়োজন হয়।

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে—৮০০,০০০,০০০ বাতির শক্তিবিশিষ্ট তীব্র আলোকরশ্মিই বর্ত্তমান উদ্দেশ্য-সাধনে একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক যন্ত্র-সাহায্যে ১৬ মিলিমিটার (আধ ইঞ্চির কিছু বেশী) মোটা পজিটিভ কার্ব্বণ পেন্সিলের ভিতর দিয়া ১৫০ অ্যাম্পিয়ারের তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালিত করিলেই ঐরূপ তীব্র রশ্মি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। আলোর তীব্রতা আরও বাড়াইতে হইলে ২৫০ অ্যাম্পিয়ার পর্য্যন্ত তড়িৎপ্রবাহ বৃদ্ধি করা চলে। কিন্তু তীব্রতা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি করিলে তাহার আবার কতকগুলি অসুবিধা উপস্থিত হয়। তীব্রতা বাড়াইবার পর ইহার ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ১,০০০,০০০,০০০ বাতির তীব্রতায় ঔজ্জ্বল্য সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পায়। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে—২৫০ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহে পজিটিভ কার্ব্বণের গর্ত্তের মধ্যে যে-গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা প্রবাহের প্রবল চাপে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হইয়া আলোর ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট করিয়া দেয়। তাছাড়া তীব্রতর রশ্মি শূন্যপথে যতই দূরে যাইতে থাকে ততই উহার ফিরিয়া আসিবারক্ষমতাও ক্রমশঃ কমিতে থাকে। আলো ফিরিয়া আসিতে না পারিলে লক্ষ্যবস্তু দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বিমান-সন্ধানী আলো হইতে নির্গত রশ্মিকে সংহত করিয়া একদিকে বহুদূরে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে চায়ের পিরিচের মত নিম্নোদর প্যারাবোলিক দর্পণ ব্যবহৃত হয়। কাচ অথবা ধাতুনির্ম্মিত উভয় প্রকারের দর্পণই ব্যবহৃত হইতে পারে। ধাতব দর্পণের মসৃণতা সহজে বিনষ্ট হয় কিন্তু কাচ-নির্ম্মিত দর্পণ অধিককাল স্থায়ী এবং তাহার



জাহাজ হইতে সন্ধানী আলো মেঘের উপর পড়িয়াছে

প্রতিফলন-ক্ষমতাও বেশী। তবে ভঙ্গপ্রবণতা ও নির্ম্মাণ-ব্যায়াধিক্যের "জন্য ইহার অসুবিধাও কম নহে।" প্যারাবোলিক দর্পণের প্রধান গুণ এই যে, ইহার 'ফোকাসে' অবস্থিত উৎপত্তিস্থল হইতে আগত আলোকরশ্মিগুলিকে সংহত করিয়া সমান্তরাল রেখায় এক দিকে প্রেরণ করিতে পারে। আলোকের উৎপত্তিস্থল যদি অতিমাত্রায় ক্ষুদ্রাকার হয় এবং তাহা দর্পণের ঠিক 'ফোক্যাল পয়েন্টে' রাখা যায় তবেই আশানুরূপ সমান্তরাল রশ্মিপথ পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে তত সূক্ষ্ম হিসাবের প্রয়োজন হয় না। কারণ সূক্ষ্ম হিসাবমত যে রশ্মি আলোকাধার হইতে নির্গত হইবে তাহার তীব্রতা যথেষ্ট হইলেও লক্ষ্যস্থলের কিয়দংশ মাত্র ঐ আলোতে উদ্ভাসিত হইবে। আলোকরশ্মি যতই দূরে যাক দর্পণের ব্যাস পরিমিত স্থানের বেশী আলোকিত করিতে পারিবে না। অর্থাৎ প্রতিফলক দর্পণের ব্যাস যদি ৫ ফুট হয় তবে তাহা হইতে প্রেরিত আলোকরশ্মি প্রায় সমপরিমাণ স্থানকেই বৃত্তাকারে আলোকিত করিবে। কাজেই বিমান-বিধ্বংসী কামানের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে দর্পণখানিকে ১২০ ডিগ্রিতে ঘুরাইয়া পজিটিভ কার্ব্বণের গর্ত্তটিকে এক ইঞ্চির বত্রিশ ভাগের এক ভাগ স্থনের মধ্যে স্থাপিত করিয়া প্রতি বর্গ মিলিমিটার পরিমিত স্থানে ১৽৫ অ্যাম্পিয়ার হিসাবে বিদ্যুৎচাপে প্রয়োগ করিলে রশ্মির প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতি ঘটিবে এবং তীব্রতা হইবে ৮০০,০০০,০০০ বাতির সমান। সন্ধানী আলোর তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে পজিটিভ কার্ব্বণের গর্ত্তের দর্পণের 'ফোক্যাল পয়েন্টে' অবস্থানের উপর। ফোক্যাল পয়েন্ট এক ইঞ্চির এক-চতুর্থাংশ স্থানচ্যুত হইলে আলোর পাল্লা শতকরা বিশ ভাগ হ্রাস পায় এবং শতকরা চল্লিশ ভাগ তীব্রতা কমিয়া যায়। আধ ইঞ্চি তফাৎ হইলে তীব্রতা ও দূরত্বের পাল্লা প্রায় ৬০ ভাগ হ্রাস পাইয়া থাকে। ফোকাস ও কার্ব্বণকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত করাইবার জন্য আলোকাধার সংলগ্ন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কার্ব্বণ ক্ষয় হইবামাত্রই ইহা আপনা আপনিই তাহাকে আগাইয়া দেয় এবং পজিটিভ কার্ব্বণকে ঠিক ফোকাসে রাখে। কোন কারণে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিকল হইয়া পড়িলে অপারেটর নিজেও উহা করিতে পারে।

পজিটিভ কার্ব্বণটাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া

নেগেটিভ কার্ব্বণের অগ্রভাগ তাহাতে স্পর্শ করাইয়া রাখা হয়। সুইচ টিপিয়া দিবার পর নেগেটিভ কার্ব্বণটাকে যান্ত্রিক কৌশলে ক্ষিপ্রতার সহিত সরাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রদীপ্ত 'আর্ক' আত্মপ্রকাশ করে, কার্ব্বণ পেন্সিল দুইটিকে সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে রাখা দারকার। কার্ব্বণ পুড়িতে পুড়িতে অনবরতই এই ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কিন্তু স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক কৌশলে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান রক্ষিত হয়।

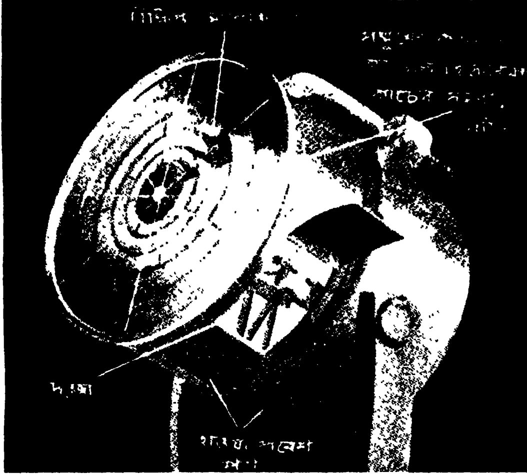
বিমান-সন্ধানী আলোর প্রতিফলক দর্পণটি যথাসম্ভব বড় করাই প্রয়োজন। দর্পণ যত ছোট হইবে উহার 'ফোক্যাল পয়েণ্ট'ও তাহার তত নিকটে যাইবে। তাহার ফলে আর্কের প্রচণ্ড উত্তাপে শীঘ্রই দর্পণ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই বৃহত্তর দর্পণের প্রয়োজন। দর্পণটির পরিধি যত বিস্তৃত হইবে তাহার ফোক্যাল পয়েণ্টও তত দূরে সরিয়া যাইবে। আর্কটিকে ফোকাসে রাখিতে হয় বলিয়া এ অবস্থায় দর্পণ হইতে উহা অনেক দূরে থাকিবে। তখন কার্ব্বণকে অত্যধিক উত্তাপে পোড়াইয়া তীব্রতর আলো উৎপাদন করিলেও দর্পণের অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। যুদ্ধ-জাহাজের প্রতিফলক দর্পণ সাধারণতঃ তিন ফুট ব্যাসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষ প্রয়োজনে অবশ্য বড় দর্পণও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিমান-সন্ধানী আলোর দর্পণ পাঁচ ফুটের নীচে হইলে চলে না। পরিধি আরও বৃদ্ধি করিলে অবশ্য আলোর তীব্রতা বর্দ্ধিত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আবার অসুবিধা সৃষ্টি হয়। ৫ ফুট দর্পণ তাহার ফোকাসে অবস্থিত ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দুকে বর্দ্ধিত করিয়া সমপরিধিবিশিষ্ট স্থানকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করে এবং তীব্র রশ্মি অক্ষীণভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রধাবিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিমান-সন্ধানী আলো প্রায় ৮০০,০০০,০০০ বাতির সমান ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে। হিসাব মত এইরূপ আলো হইতে অধিকতর তীব্রতাসম্পন্ন রশ্মি বিকিরিত হইতে পারিত কিন্তু নানা কারণে ইহার তেজ হ্রাস পাইয়া থাকে। উৎপন্ন তেজের শতকরা প্রায় ৬০ হইতে ৭০ ভাগই বাজে খরচে নষ্ট হইয়া যায়। বাকী যেটুকু থাকে তাহার তীব্রতাই ৮০০,০০০,০০০ বাতির



টেলিফোনে আদেশানুযায়ী অপারেটর সন্ধানী আলো পরিচালনা করিতেছে।

সমান। উৎপন্ন তেজের কিয়দংশ প্রতিফলক দর্পণ শোষণ করিয়া লয়। পাতলা কাচ ব্যবহার করিয়া কিয়ৎপরিমাণে শোষণ নিবারিত হইতে পারে বটে, তথাপি কিন্তু শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ তেজ নষ্ট হইয়া যায়। কার্ব্বণ, তাহার 'হোল্ডার' এবং 'আর্ক' নিয়ন্ত্রক বিবিধ যন্ত্রাদি শতকরা প্রায় ৯ ভাগ উত্তাপ হরণ করে। সম্মুখের কাচখানিও যথেষ্ট তেজ শোষণ করিয়া লয়। কিন্তু কতকগুলি খণ্ডিত কাচের সমবায়ে সম্মুখের আবরণী নির্ম্মিত হইলে এই শোষণ অনেকাংশে কমিয়া যায়। ছোট আলোতে যত অধিক পরিমাণ বাজে খরচের ফলে তীব্রতা নষ্ট হয় আনুপাতিক হিসাবে বড় আলোতে ততটা বাজে খরচ হয় না।

বিভিন্ন দূরত্বে রশ্মির তীব্রতার তারতম্য হিসাব করিয়া বিমান-সন্ধানী আলোকরশ্মির পাল্লা নির্দ্ধারিত হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে co-efficient of transparency বলে ইহার অনেকটা নির্ভর করে তাহার উপর। অর্থাৎ আলোর গতিবিধি ও তীব্রতা অনেকাংশে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। উষ্ণতর আবহাওয়ায় স্থলভাগের উপর প্রতি



সন্ধানী আলোর সম্মুখস্থ কাচের দৃশ্য

হাজার গজ উর্দ্ধে co-efficient of transparency হয় প্রায় ০·৫৬। অর্থাৎ উষ্ণতর অবস্থায় বায়ুমণ্ডলের প্রতি হাজার গজ দূরত্বে শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ আলো শোষিত হইয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব যদি সর্ব্বত্র সমান থাকিত এবং ইহা যদি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইত তবে সন্ধানী-আলোক-রশ্মি অবাধে অসীমের দিকে প্রবাহিত হইতে পারিত; কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। যতই উর্দ্ধে উঠা যায় ততই ইহা হাল্কা হইতে থাকে; বিশেষতঃ বিভিন্নজাতীয় অগণিত ক্ষুদ্র কণিকা বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহাদের উপর প্রতিফলিত হইয়া রশ্মির অনেকাংশই ফিরিয়া আসে অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাছাড়া উর্দ্ধস্তরের হাল্কা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র রশ্মি বক্রীভূত হইয়া পৃথিবীর দিকেই ফিরিয়া আসে।

তীব্র আলোকরশ্মি উৎপাদনের ফলে আলোকাধারে অত্যধিক উত্তাপ সঞ্চিত হয়। অতিরিক্ত উত্তাপ বিদূরিত করিয়া ইহাকে উপযুক্ত পরিমাণে ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন। আলোকাধারের উপরে অবস্থিত মোটরের সাহায্যে পাখা ঘুরাইয়া এক দিক্ দিয়া জোর করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করাইয়া অপর দিকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ভিতরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে পারে না, অধিকন্তু উপরের দিকে আলোকপাত করিবার সময় জ্বলন্ত কার্ব্বণ-কণিকা-সমূহ দর্পণের উপর পড়িয়া তাহার মসৃণতা বিনষ্ট করিতে পারে না।

বিমান আক্রমণের সময় অপারেটর দূর হইতে আলো নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ নিকটে থাকিলে ভাসমান ধূলি-কণিকায় প্রতিহত হইয়া রশ্মির কিয়দংশ প্রায় সোজাসুজি আসিয়া চোখের উপর পতিত হয়। তাহাতে চোখ ধাঁধিয়া যায় এবং লক্ষ্যস্থল দেখিতে পায় না। কাজেই দূর হইতে যান্ত্রিক কৌশলে আলো নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। বিমান-ধ্বংসী কামান থাকে আরও অনেক দূরে। ব্যাটারীর গোলন্দাজের টেলিফোন-নির্দ্দেশানুযায়ী অপারেটর আলো প্রক্ষেপ করিয়া থাকে। সময় সময় এমনও ঘটে যে, উড্ডীয়মান বিমান হইতে আলো প্রতিফলিত হইয়া প্রায় সমরেখায় অথবা সামান্য মাত্র কোণে অপারেটরের চোখের উপরই পতিত হয়। ফলে সে আর লক্ষ্য বস্তু দেখিতে পায় না, কিন্তু বিমান-আরোহীরা নীচের লোক-দিগকে পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার সুযোগ পায়। এই তীব্র আলো বিমান-চালকের চোখে পড়িবামাত্রই প্রখর তেজে তাহার চোখ ধাঁধিয়া যায়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চোখে অন্ধকার দেখে। একটু সামলাইয়া উঠিবামাত্রই আবার সেই তীব্র আলো। এইরূপে বিভ্রান্ত হইয়া অনেক বিমান-চালক বেঘোরে প্রাণ হারায়। দিনের বেলায় যেমন হেলিওগ্রাফের সাহায্যে সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়, রাত্রির অন্ধকারে সিগন্যাল প্রেরণ করিবার জন্যও সন্ধানী আলোর ব্যবহার হইয়া থাকে। অনেক উঁচুতে মেঘের উপর সন্ধানী আলো ফেলিয়া দূরস্থিত জাহাজ- অথবা স্থল- সৈন্যদলের সহিত সঙ্কেত-বার্ত্তার আদান-প্রদানও চলে।

ল্যাপল্যাণ্ড

"ল্যাপল্যাণ্ড" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৬৪৬



ল্যাপল্যাণ্ড, পার্ব্বত্য দৃশ্য



ল্যাপল্যাণ্ড পার্ব্বত্য দৃশ্য



কিরুনা। কিরুনার পর্ব্বতমালা পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহখনির জন্য বিখ্যাত।



কিরুনা। কিরুনার লৌহগর্ভ পর্ব্বতমালা তিন মাইল দীর্ঘ—তাহাতে ৭৫০ মিলিয়ন টন লৌহ আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

রাজপুত্র

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

খোকার বয়স পাঁচ বৎসর—

খোকা মায়ের কোলের মধ্যে চোখ বুজিয়াই শুইয়া ছিল, মা একটু নড়িয়া উঠিতেই মিট মিট করিয়া তাকাইতে আরম্ভ করিল।

বিভা আবার শুইয়া পড়িয়া বলিল—দুষ্টু, এখনও ঘুমোস নি, তোর বাবার ফিরবার সময় হ'ল যে! তাঁকে ভাত-জল দিতে হবে না?

খোকা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তার পর কি মা?

বিভা বলিতে আরম্ভ করিল—রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে চললেন। কত দেশ, কত নদী, কত পর্ব্বত পার হয়ে, মেঘের রাজ্য পার হয়ে শেষে এক দেশে উপস্থিত হলেন। পক্ষীরাজ ঘোড়াটাকে এক গাছে বেঁধে রেখে তিনি একটু এগিয়ে দেখেন এক প্রকাণ্ড রাজপুরী। বাহিরের সিংদরজায় সেপাই পাহারা দিচ্ছে কিন্তু সে ঘুমন্ত। আশেপাশে আরও কত সেপাই-সান্ত্রী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। রাজপুত্তুর ভিতরে গিয়ে দেখেন গরু বিচালি খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে, মুখে তখনও বিচালি, ময়ূর নাচতে নাচতে তেমনি ভাবেই ঘুমিয়েছে···

এই ঘুমন্ত রাজপুরীর সব জায়গা রাজপুত্তুর তন্ন তন্ন ক'রে দেখলেন। এরা কেন ঘুমিয়েছে, কখন জাগবে কিছুই জানলেন না। শেষে দেখেন এক ঘরে এক রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে—

—পালঙ্ক কি মা?

—এই খাটের মতই, কিন্তু নকশা-করা খুব দামী। এ রকম করলে ঘুমোবি কখন?

পাশের রাজবাড়ীর পেটা ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গেল। খোকা প্রশ্ন করিল—ও কি মা?

—রাজবাড়ীর ঘড়ি বাজল, নটা বেজেছে, কখন ঘুমুবি?

—তার পর কি মা?

বিভা পুনরায় আরম্ভ করিল—রাজকন্যার মেঘবরণ চুল, কুঁচবরণ রূপ। সমস্ত ঘর তার রূপে আলো হয়ে আছে। পাশে দাসী চামর-হাতে ঘুমিয়ে আছে—রাজকন্যার চুল পালঙ্ক ছাড়িয়ে মেঝেয় এসে পড়ে—

—সে তো তোমারও পড়ে মা, তুমি কি রাজকন্যা?

—না, শোন্ তার পর, মাথার শিয়রে একটা সোনার কাঠি, একটা রূপোর কাঠি। রাজপুত্তুর তাই নিয়ে খেলা করতে করতে সোনার কাঠিটা হাত থেকে রাজকন্যার কপালের উপর পড়ল—দেখতে দেখতে সব জেগে উঠল। হাতীশালে হাতী ডাকল, ঘোড়াশালে ঘোড়া...রাজপুত্তুর শেষে এক দিন রাজকন্যাকে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উঠে ফিরে এলেন—

—রাজকন্যাকে আনলে কেন?

—খেলা করবে ব'লে। এখনও ঘুমোলি নে?

খোকা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—ওই রাজবাড়ীতে পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে?

সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল, বিভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিরক্তির সহিত কহিল—জানি নে, ওই তোর বাবা এসেছে, যেমন ছেলে, এখন একা থাক—

খোকা চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল—সে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়াছে। বৈকালে আকাশের গায়ে যে সোনালী আর কালো কালো মেঘগুলি দেখিয়াছিল তাহার ভিতর দিয়া সে চলিয়াছে, সোনালী মেঘ সে তরোয়াল দিয়া কাটিয়া রাস্তা করিয়া চলিয়াছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়াছে। বহু দূরে কালো মেঘের ওপারে গিয়া দেখে সেই ঘুমন্ত রাজপুরীর চূড়া। রাক্ষসী আসিয়া পথ আট্‌কাইল···

বাবা যেন কি বলিতেছেন—

খোকা ঘুমের ঘোরে জড়িত চোখ মেলিয়া আবার চোখ বুজিল। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না।

•

পরদিন সকালে খোকা বারান্দায় সুতা ও ঘুড়ি লইয়া খেলিতেছিল। ঘুড়ির কাগজের অবশিষ্ট কিছুই নাই, কিন্তু খোকা নিবিষ্টমনে তাহাই উড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

মা আসিয়া বলিলেন—কোথাও যাস্ নে খোকা।

—না। এই তো ঘুড়ি ওড়াচ্ছি।

কর্ম্মব্যস্ত মা চলিয়া গেলে, খোকা আকাশের পানে চাহিয়া দেখে তেমনি মেঘ। কালো কালো তাহার পাশে তুলার মত শাদা মেঘ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। খোকা রেলিং ধরিয়া ভাবিল, ওই মেঘরাজ্যের পরেই সেই ঘুমন্ত পুরী, সেখানে চুল এলাইয়া কতকাল ধরিয়া ঘুমাইয়া আছে রাজকন্যা, দাসী চামর-হাতে দাঁড়াইয়াই আছে।

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সে যেদিন রাজকন্যাকে লইয়া আসিবে, মা সেদিন বলিবেন—কোথায় ছিলি খোকা?

সে রাজকন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া বলিবে—বল তো কোথায়?

মা আশ্চর্য্য হইবেন, সে রাজকন্যাকে বাহির করিয়া দিয়া কেবল হাসিবে—রাক্ষসী-হত্যার গল্পটা সে সবিস্তারে বলিবে—

হাতের ঘুড়িখানা বাতাসে ফাৎ ফাৎ করিয়া উঠিল। খোকা চাহিয়া চাহিয়া আবার ভাবিল, রাজকন্যা যদি আজই সে আনিতে পারিত তবে দুই জনে মিলিয়া ঘুড়ি উড়াইত—রাজকন্যা ঘুড়ি উড়াইয়া দিত, সে সুতা ধরিয়া দৌড়াইত।

০

দুপুরে বিভা ক্লান্তদেহে ঘরে আসিয়া দেখে খোকা পাঁজি খুলিয়া নিবিষ্ট মনে ছবি দেখিতেছে। রাঁধিয়া, স্বামীকে খাওয়াইয়া অনেকক্ষণ আগেই সে তাহাকে আপিসে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহার পর এক রাশ কাপড়, ওয়াড় কাচিতে সে সত্যই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।' বিভা খোকাকে বলিল—খোকা এদিকে আয়, শুয়ে থাকবি।

—না মা, আমি ছবি দেখি।

—না, যে রোদ পড়েছে, এদিকে আয়।

খোকা মিনতি করিয়া কহিল—কোথাও যাব না, আমি ছবি দেখে পরে শোব।

বিভা ক্লান্তদেহে শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

খোকা ছবি দেখিতে দেখিতে মাথা তুলিয়া দেখে মা ঘুমাইতেছে। ভিজা চুল মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রাজকন্যার মত।

নিস্তব্ধ দুপুর। চারি পাশে কোন সাড়া-শব্দ নাই। গাছের পাতাও নড়িতেছে না, খোকা এদিকে ওদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া আছে, তাহার কান ধরিয়া টানিবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সে আর একটু অগ্রসর হইল।

মনে মনে এক বার ভাবিল তাহার হাতে তো তরোয়াল নাই, যদি রাক্ষসী আসিয়া পড়ে সে কি করিবে। বাড়ীর সামনে বকুলগাছের তলায় সে ভীত হইয়া ঘুমন্ত কুকুরটির পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সামনে চাহিয়া দেখে আকাশে তেমন মেঘ নাই, রাস্তাটা যথাসম্ভব পরিষ্কারই রহিয়াছে। মা তাহার রাণী নয় তাই পক্ষীরাজ ঘোড়া দিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সে সেই স্বপ্নপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে আজ মা ঘুমাইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আনিয়া হাজির করিবে।

এক বুড়ী ভিক্ষা করিয়া উত্তপ্ত রাস্তা দিয়া লাঠি ঠক্-ঠক্ করিতে করিতে চলিয়াছে। খোকা চুপ করিয়া ভীত দৃষ্টিতে দেখিতেছিল—এই সেই রাক্ষসী কিন্তু তাহার হাতে তো কিছুই নাই। সে গাছটার আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। বুড়ী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, খোকাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।

খোকা তাকাইয়া দেখিল, ঐ তো সেই রাজপুরী। মা বলিয়াছে রাজবাড়ীতে পেটা ঘড়ি বাজে। খোকা হৃষ্টমনে চলিতে লাগিল।

•

সিংদরজায় সেপাই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া একখানা টুলের উপর বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে। চোখের দিকে

চাহিয়া দেখিল সে সত্যই ঘুমাইতেছে—মেঘের রাজ্য পার না হইয়াই সে তাহা হইলে ঘুমন্ত রাজপুরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

পাশের খাঁচায় ময়ূর ঘুমাইতেছে, সামনের পুকুরে পাতিহাঁস এক পায়ে ভর দিয়া পৃষ্ঠের পালকে মুখ লুকাইয়া ঘুমাইতেছে। এই সেই ঘুমন্ত পুরী, খোকা সামনের চত্বর পার হইয়া দালানের সিঁড়িতে উপস্থিত হইল।

ইজেরটা খুলিয়া যাইতেছিল, সেটাকে বাঁধিয়া লইয়া দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে যাইবে কিন্তু একটা কুকুর চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে—ঘুমন্ত রাজপুরীতে এই জীবন্ত কুকুরটির অস্তিত্বকে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি খোকার ছিল না—সে উপরে উঠিয়া গেল। এক বার চাহিয়া দেখিল, কুকুরটি আবার চোখ বুজিয়াছে—

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া খোকা দেখে—তেমনি ঘর, শ্বেতপাথরে বাঁধানো, ইহাই হয়ত পালঙ্ক। ঘরে ঢুকিয়া দেখে সত্যই এক রাজকন্যা ঘুমাইতেছে। মেঝে পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহার মেঘবরণ চুল,—বালিশে মাথা রাখিয়া কুঁচ বরণ কন্যা ঘুমাইতেছে। বুকের উপর একখানা খোলা বই নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইতেছে।

খোকা সমস্ত ঘর খুঁজিতে আরম্ভ করিল, সোনার কাঠি রূপার কাঠি কোথায় আছে। পালঙ্কের নীচে খুঁজিল, তাহার মা সাধারণতঃ এইরূপ স্থানেই মিছরির কৌটা লুকাইয়া রাখেন। কোথাও সোনার কাঠি রূপার কাঠি নাই। বাহির হইয়া আসিবে হঠাৎ দেখে মেঘবরণ চুলে তাহার পথ বন্ধ। তাহাকে সরাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল—

আশ্চর্য্য—রাজকন্যা জাগিয়াছে! খোকা তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল—তুমি রাজকন্যা?

রাজকন্যা কহিল—হ্যাঁ। তুমি কে?

—আমি খোকা।

রাজকন্যা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া ছিলেন, খোকা আবার শুধাইল—তোমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে?

রাজকন্যা হাসিয়া বলিল—হুঁ, তুমি নেবে?

—হুঁ।

—কি করবে?

—দেশজয় করতে যাব।

—তার পর?

—রাজকন্যাকে নিয়ে মাকে দেব।

—রাজকন্যাকে নিয়ে কি করবে?

খোকা বলিল—খেলব।

—কি খেলবে?

—ঘুড়ি ওড়াব।

—তোমাদের বাড়ী কোন্ দিকে?

খোকা অনেকটা উদাস ভাবে যা হয় একটা দিক দেখাইয়া দিয়া বলিল—এই দিকে।

—কেমন ক'রে এলে?

—হেঁটে হেঁটে—

—কেন?

খোকা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—মার তো পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই।

রাজকন্যা আবার একটু হাসিয়া উঠিল।

রাজকন্যা দাসীকে কহিল—এ খোকা কাদের জান?

দাসী বলিল—এ তো শরৎবাবুর, আমাদের মেজ ম্যানেজার বাবুর ছেলে -

রাজকন্যা বলিল—একে দিয়ে এস, এলই বা কি ক'রে?

দাসী খোকাকে কোলে করিয়া কহিল—বাড়ী যাবে?

খোকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যাইবে, কিন্তু রাজকন্যা তো তাহার সহিত গেল না। সে বলিল—তুমি যাবে না?

রাজকন্যা হাসিয়া কহিল—আমাকে নিয়ে কি করবে?

—খেলব। তুমি ঘুড়ি উড়িয়ে দেবে—

—আর?

—মার কাছে নিয়ে যাব।

রাজকন্যা আবার হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আর এক দিন যাব।

খোকার ডাগর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল—কই রাজকন্যা তো আসিল না। সে দাসীর কাঁধের উপর অত্যন্ত-ক্লান্তের মত মাথাটা ন্যস্ত করিয়া দিল।

হঠাৎ দেখে তাহার মা বলিতেছে—কোথায় গিয়েছিলি খোকা?

খোকা মায়ের কোলে উঠিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—রাজকন্যা তো এল না মা।

মা বলিলেন—এত দুরন্ত হয়েছিস, কোথায় গেছলি?

খোকা রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে শুনিল, মা বাবার নিকট অভিযোগ করিতেছেন—এত দুষ্টু ছেলেকে তো আমি সামলাতে পারি না। আজ একা একা সে এখান থেকে বৌরাণীর ঘরে গিয়ে উঠেছিল!

আফ্রিকায় ভারতীয়ের অভিজ্ঞতা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকার তিনটি সুন্দর বন্দর আছে, তার মধ্যে বেইরা সৌন্দর্য্যে ও বাণিজ্যের প্রসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশাল পার্ব্বত্য ভূমি ক্রমে উঠে ইম্‌টালীতে গিয়ে সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেই সমতল ভূমি উর্ব্বরতা, প্রাচুর্য্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, ধাতব পদার্থ এখানে প্রচুর। এই বিশাল ভূমির উপর ইউরোপীয়ানদের রাজত্ব—নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান, চীনা, আরব, সোমালী, এ-সকল জাত ইউরোপীয়ানদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সাহায্য করছে। নানারূপ ট্যাক্স, বর্ণগত বাধা, অর্থনৈতিক অসমতা এশিয়াবাসী নীরবে সহ্য করছে। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই, প্রতিবাদ করলেও প্রতিকারের প্রত্যাশা করা অন্যায় এবং আইনবিরুদ্ধ। বুলবায় রেল-স্টেশনে এক দিন স্নান করতে চেয়ে শুনলাম, অন্-ইউরোপীয়ানদের স্নানের ব্যবস্থা এখানে নেই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে স্নানের আশা পরিসমাপ্ত করতে হ'ল। আমাদের দেশের অস্পৃশ্য ভাষাহীনদের অবস্থা তখন বেশ ভাল ক'রেই বুঝলাম।



দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গন্ধীর বাসগৃহ

সলসবারী, বুলবায়ো হয়ে একটি বিশাল জঙ্গলপূর্ণ ভূমিখণ্ডের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। চুর্দিকে অফুরন্ত বন। বনে বন্য জীব, তারা একে অন্যকে বধ ক'রে জীবন ধারণ করে। আমার মনে হ'ল এরূপ বন্য জীব হিংস্র, আভিজাত্য-অহঙ্কারে পূর্ণ মানুষের চেয়ে সহস্রগুণে দয়ালু।

বন-জঙ্গল পার হয়ে এক দিন লিভিংস্টোন নামক একটি ছোট শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। মিঃ নাই আমাকে অতিথিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তথাকার কংগ্রেস-সেক্রেটারী এবং হিন্দুসভার সভাপতি। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হ'ল ভারতবাসীর সকল রকম স্বার্থ বজায় রাখা এবং হিন্দুসভার উদ্দেশ্য হ'ল হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ দূর করা। ভারতবাসীর চুর্দ্দশার জন্য মিঃ নাই শুধু কারাবরণ করেছেন তা নয়, অনেক সময় দুঃসাহসের পরিচয়ও দিয়েছেন, অনেক অর্থব্যয় করেছেন। উত্তর- এবং দক্ষিণ- রোডেসিয়াতে ভারতবাসীর 'বাসে' বসবার অধিকার নেই। সেই অধিকার পাবার জন্য মিঃ নাই-এর ভ্রাতা বাসে গিয়ে বসেছেন। কন্‌ডাক্টর বলেছে, "যদি আপনি এখানে বসেন তবে অন্য কোন প্যাসেঞ্জার বসবে না, আপনি কি সমুদয় সিটের ভাড়া দিতে পারবেন?" তিনি ভাড়া দিয়েছেন, প্যাসেঞ্জার-ভর্ত্তি গাড়ীতে উঠেছেন, ঠেলে শ্বেতকায়গণ তাঁকে ফেলে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে মারপিট হয়েছে, শরীর ক্ষতবিক্ষত



জুলুদের বিবাহ-উৎসব

হয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে এখন ভারতবাসী লিভিংস্টোন শহর হ'তে ভিক্টোরিয়া প্রপাত পর্য্যন্ত বাসে যেতে পারে।

লিভিংস্টোন পরিত্যাগ করে, বুলবায়ো হয়ে লুইস্‌ত্রিকার্ত পৌঁছেই বুঝলাম, দক্ষিণ-আফ্রিকার দ্বারে এসে পৌঁছেছি। এখান থেকেই উচ্চভূমির সূচনা, বুয়রদের বসতি আরম্ভ হয়েছে। এখান থেকেই হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের বর্ব্বরতা লোপ পেয়ে গেছে, নূতন জাতিভেদের সঙ্গে পরাজিত হয়ে।

লুইস্‌ত্রিকার্তের এক-শ মাইল উত্তরে এক গভীর জঙ্গলের পাশে আমি এক বার অর্দ্ধমৃতবৎ হয়ে পড়েছিলাম। এক বুয়র আমার এই দুরবস্থা দেখে ট্রাকে করে লুইস্‌ত্রিকার্তে এনে হাজির করে। বুয়রগণ ভারতবাসীদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। শরীরে বল ফিরে পাবার পর রক্ষাকর্ত্তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ঘরে ডাকে নি, বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে' হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে আমাকে উঠিয়ে এনেছিল। সে বলেছিল, একটা মানুষকে উঠিয়ে এনেছি, একটা কুলিকে উঠিয়ে আনি নি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী কুলি নামে পরিচিত।

আশেপাশের নিগ্রো-গ্রামে যেতে ভুলি নি। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভবিষ্যতের লক্ষ্য ঠিক করবার ভার ইউরোপীয়ান মিশনারীরা গ্রহণ করেছেন। মিশনারী যা শিক্ষা দিয়ে থাকে, সামাজিক হিসাবে মন্দ নয়; কিন্তু বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিভেদ পাকা হয়ে যাচ্ছে। এক জাত অন্য জাতের সঙ্গে মিশতে চায় না, কথা কইতে চায় না, কারবার করতে চায় না। এদের মধ্যে থাকবার সময় অনেক বার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি যে, মিশনারীরা তাদের ভুল পথে নিয়ে চলছে। যে-গ্রামে গিয়েছি সেই গ্রামেই অনেক সামাজিক পরিবর্ত্তন আনতে পেরেছি। কিন্তু যখনই মিশনারীরা এসে আমার সঙ্গে বাক্যযুদ্ধে লেগে যেত, আমাদের দেশের সামাজিক

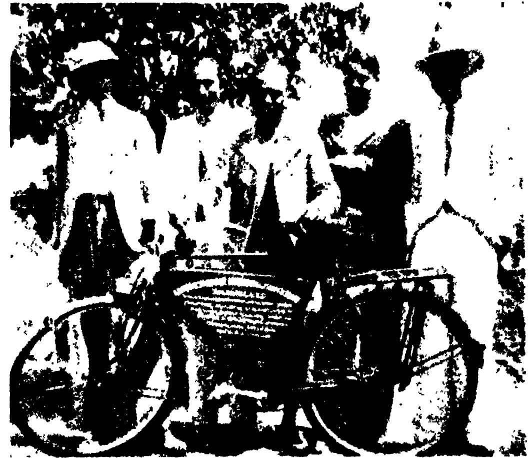


ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় জেব্রায়-টানা গাড়ী

হঠাৎ পুলিস এসে আমার গলা ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার গালে চড় মেরেছি। অমনি সে দেখিয়ে দিল "Only for Europeans"। চড় মারবার জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছে। পুলিস চড় খেয়েও হেসেছে, ক্ষমা করেছে, তাকে এখনও মনে হয়, তার ভালবাসার কথা মনে হয়। ইচ্ছা করলেই তিন মাসের জন্য জেলে পাঠাতে পারত। কিন্তু ন্যায্য দাবি পাবার জন্য আমার প্রতিবাদ পুলিস আমার চড় খেয়ে নিজের অজ্ঞাতে স্বীকার করেছে। পোস্টাপিসে চিঠি পোস্ট করতে গিয়ে টিকিট কিনতে

রীতি-নীতির কথা বলত, তখনই আমার মাথা নত হয়ে যেত। তবু আমি উত্তর দিতাম, আমাদের দেশের পুরাতন পাপের বীজ যেন নূতন ক'রে দক্ষিণ-আফ্রিকায় বপন করা না হয়। আমি নতমস্তকে স্বীকার করতাম, আমাদের মধ্যে এখনও বিধবা-বিবাহ ভাল করে প্রচলিত হয় নি, আমাদের দেশের নারী এখনও স্বাধীনতা পায় নি, তা ব'লে এদেশে স্বাধীন নারীর স্বাধীনতা লোপ করবার কারও অধিকার নেই। এদেশে আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও আদর্শের বিস্তার করতে আসি নি, আমাদের কাপুরুষতা বিস্তার করতে আসি নি, আসছি আমাদের দেশের পাপ যেন এই নিরীহদের মাঝে বিস্তার লাভ না করে। আমার পাল্টা কথা শুনে মিশনারী পর্য্যন্ত খুশি হয়ে যেত।

দক্ষিণ-আফ্রিকাতে ভারতবাসীর কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এই নিয়মকানুনগুলি দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতবাসীর অভ্যাস হয়ে গেছে। এই সব আইন আমাকে অনেক সময় ভঙ্গ করতে হয়েছে। জলতেষ্টা পেলে পাবলিক পার্কে পাইপ খুলে জল খেতে গেছি, জেনেছি সেই পাইপ ইউরোপীয়ানদের জন্য। পুলিস এসে মানা করেছে এ-রকম যেন আর না করি। রেল-স্টেশনে বসবার জন্য বেঞ্চ পাতা, তাতে ব'সে আছি,



নাইরোবিতে লেখক ও কয়েকজন বাঙালী অধিবাসী

চেয়ে টিকিট কিনতে পারি নি, বলে দিয়েছে, নেটিভ সেকশনে যান। তৎক্ষণাৎ বলেছি, এই ত নেটিভ সেকশন, You are nothing but natives। পোস্টমাস্টার নিজে এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, "Non-Europeans are known here as natives"—হোটেল, রেস্তঁর‍্যা, নাপিতের দোকান সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা। ভারতীয়দের হাতে প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও, মিঃ রেজা

আলী প্রমুখ ভারতীয়-প্রধানদের আগমনের পরেও দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউরোপীয়ানরা ভারতের সভ্যতাকে সভ্যতা বলে মানে নি, হয়ত ভারতবাসী যে মানুষ তাও অনুভব করে নি। এর কারণ ভারতবাসী নিজের দেশের লোককে যত ঘৃণা করে অপমান করে তেমনটি অন্য কেউ করে নি, করতে পারবেও না। তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

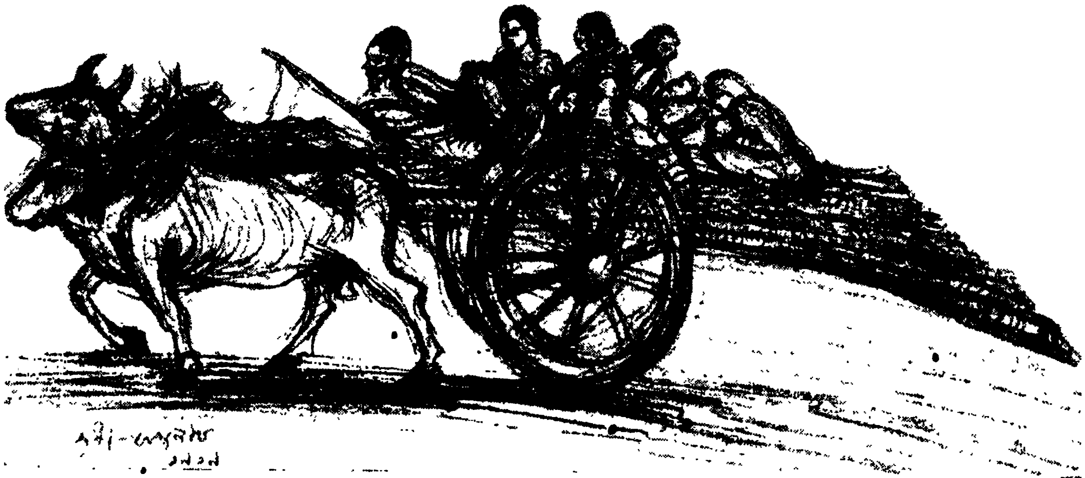


পর্ত্তুগীজ আফ্রিকার বিশিষ্ট গোয়ানিজ অধিবাসী সাধারণের নিকট "গান্ধী" বলে পরিচিত



মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিকের আপিস

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যখন ভারতীয় কুলির দল গিয়ে হাজির হ'ল, ভারতীয় ব্যবসায়ীর দল তাহাদের 'কোলচা' ব'লে ডাকতে লাগল। বুয়রগণ কোলচা শব্দ বিশেষ বুঝতে পারে নি, ব্যবসায়ীরা তাদের বুঝিয়ে দিল "কোলচা" গুজরাতী শব্দ, কুলি হ'ল ভারতীয় শব্দ। বুয়রগণ ব্যবসায়ীদের সুখী করবার জন্য তাদের বড় কুলি বলতে লাগল এবং কুলিদের কুলিই বলতে লাগল। নিজের ভাইকে ছোট করে যারা বড় হ'তে চায় তাদের এই অবস্থাই হয়।



গৌরী

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

রান্নাঘরের কাজ গৌরী নিজেই করতেন। ফলে ছোট ছেলেটাকে নিয়ে বেশ একটু মুশ্‌কিল হয়েছিল কারণ মাকে ছাড়া আর কাউকে সে জানে না। যখন-তখন মাকে কাছে না পেলে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করত এবং কেঁদে-ককিয়ে সে তার সেই অস্বস্তি জ্ঞাপন করত। তার কথা আমরা বুঝতে পারতাম কিন্তু তার প্রতিকারে বিশেষ কিছু করতে পারতাম না।

বাইরের কাজের অর্থাৎ বাসনমাজা, ঘর ধোওয়া, কাপড় কাচার জন্য এক জন ঝি—এদেশের ভাষায় দাই ছিল। লোকটি ভাল—মুখে কথা নেই। বয়স হয়েছে তার এবং তাড়াতাড়ি কোন কিছু সে করতে পারে না, কিন্তু কাজে সে ফাঁকি দেয় না এবং কাজও তার পরিষ্কার।

নিজ হ'তেই সে এক দিন তার ছোট নাতনীটিকে সঙ্গে ক'রে এনে খোকাকে রাখবার কাজে লাগিয়েছিল। গৌরীকে বলল—দুটি ক'রে খেতে দিও মা ওকে।

নাতনীর নাম মুরলী। বয়স বছর দশ-বারো হবে। গলায় তার একটা রুপোর হাঁসুলি আর দু-হাতে ঐ রুপোরই সরু রুলি। গায়ের রং ময়লা হ'লেও মুখের তার শ্রী আছে। প্রথম তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে মা-বাপের ওর অবস্থা ভাল, নইলে গহনা ও পরে কেন? এখানে যারা ঐ সব কাজ করে তাদের মেয়েদের কারো গায়েই প্রায় গহনা নেই। শেষে শুনলাম যে দুঃখধান্ধা ক'রে বুড়ীই ঐ গহনা তার নাতনীকে গড়িয়ে দিয়েছে এবং ওর মাকে এখনও পুষছে অর্থাৎ খেতে পরতে দিচ্ছে তাকে, কারণ স্বামী তার না কি নিরুদ্দেশ।

এক দিনেই দেখলাম মুরলী খোকার সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে ফেলল। সারাদিনের মধ্যে আর খোকার কান্না শুনতে পাওয়া গেল না। তার খাবার সময় বুঝে তার মা-ই নিজ হ'তে এসে বার-বার খোকাকে খাইয়ে গেলেন।

খোকার সম্বন্ধে এত দিনে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম।

মাস-কাবারের পরে যেদিন বুড়ী মাইনে নিয়ে গেল সেই দিনই বিকেলের দিকে এসে মুরলী তার মাইনে চাইল। তাকে মাইনে দেবার কোন কথা হয় নি। সেই কথা তাকে বললে সে জবাব করল যে মাইনে না হ'লে সে কাজ করবে না এবং একছুটে বাড়ীর বার হয়ে গেল।

বুড়ী তখন সেখানে ছিল না। সে আসতে সব কথা তাকে বলা হ'ল। সে স্বীকার করল যে মুরলীকে মাইনে দেবার কোন কথা হয় নি কিন্তু সে মিনতি ক'রে বলল—তা মা একটা ক'রে টাকা ওকে দিও। ওর বড় ইচ্ছে যে টাকা আনবে ও—দিও মা একটা ক'রে টাকা। তোমার রাজার সংসার—

তার কথায় বাধা দিয়ে গৌরী বললেন—না দেবো না টাকা—একটা টাকা কি অমনি গাছের ফল?

বুড়ী আর কোন কথা বলল না।

বুড়ী তার কাজ করে কিন্তু মুরলী আর আসে না। ছেলেকে নিয়ে গৌরী আবার বিব্রত হয়ে পড়েছেন—ছেলেটারও খোয়ার হচ্ছে কম নয়।

দেখে শুনে আমি এক দিন গৌরীকে বললাম—একটা টাকা ত—না-হয় দাও—

গৌরী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—না কখ্‌খনো দেব না। জুলুম ক'রে যে টাকা আদায় করতে চায়, কখ্‌খনো দেবো না তাকে টাকা—

আর এক জন লোক ঠিক করা হ'ল খোকাকে খেলাবার কিন্তু তাকে দেখে খোকা তার কোলে যেতে চাইল না। জোর ক'রে অতঃপর খোকাকে তার কোলে দিয়ে তাকে বলা হ'ল বাইরে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে।

একটু পরেই সে ফিরে এল, বললে—খোকা এমন হাত-পা ছুড়ছে যে তার ভয় হচ্ছে যে হয়ত' কোল থেকে পড়ে

যাবে সে। খোকার কান্না আমরা বাড়ী থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম; নূতন লোকটির কাছ থেকে গৌরী খোকাকে কোলে নিলেন কিন্তু ঠাস্ ঠাস্ ক'রে দুই গালে তার চড় কষিয়ে দিলেন! খোকা চীৎকার ক'রে উঠল এবং মাই মুখে দিয়ে তার সে চীৎকার বন্ধ করাতে হ'ল।

আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না; যে-মারের মানে সে বুঝল না—বোঝবার সম্ভাবনাও যার নেই, তাকে মেরে কি লাভ হ'ল। এও বুঝলাম না মেরে ছেলেকে কাঁদিয়ে ঐ ভাবে তাকে চুপ করানর মানে কি। গৌরীকেও সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি নি—করতে সাহস পাই নি।

খোকার সম্বন্ধে কি করা যায় ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

দু-তিন দিন পরে এক দিন সকালে খোকা বারান্দায় শুয়েছিল। তার উপরে শূন্যে ঝুলছিল একটা রঙ-বেরঙের ফুলদার ঝারি। বাতাসে সেটা নড়ছিল—রঙের সেই উৎসবের দিকে চেয়ে খোকা আপন মনে হাসছিল খেলছিল।

হঠাৎ খোকা কেঁদে উঠল—একবারে ককিয়ে কান্না সে।

কি হ'ল দেখতে তাড়াতাড়ি আমি বাইরের ঘর থেকে ভেতরে এলাম—দেখলাম গৌরী তার আগেই এসেছেন এবং খোকাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। আমায় দেখে তিনি বললেন—দেখলে পাজী ছুঁড়িটার কাণ্ড?

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কার কথা তিনি বলছেন এবং কি বলছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—কার কথা বলছ? কি করল কে?

ঐ পাজী ছুঁড়ি মুরলীর কথা বলছি—কাঁদিয়ে দিয়ে গেল ছেলেটাকে খামকা—

ব্যাপারটা তবু আমি ঠিক ধরতে পারলাম না—মুরলী কাঁদিয়ে দিয়ে গেল—তার মানে?

—মানে আবার কি? তুমি দেখতে পেলে না? তোমার সামনে দিয়েই ত ছুটে পালাল ছুঁড়িটা—

—কিন্তু করল কি সে?

—এসেছিল সে একটা কাদের ছেলেকে কোলে ক'রে। এসে দাঁড়াল খোকার সামনে। আমি সব দেখতে পাচ্ছি রান্নাঘর থেকে। কোলের তার ছেলেটাকে দাওয়ায় বসিয়ে কত সব হাসিখুশী—আমি ভাবি বুঝি খোকার সঙ্গেই ঐ সব হচ্ছে। তার পরে কি একটা কাজে অন্যমনা হয়েছি আর দেখি খোকা কেঁদে উঠল। আমি চেয়ে দেখি তার কোলের ছেলেটাকে নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার পরে আমায় আসতে দেখেই দুড়দুড় ক'রে ছুটে পালাল—দেখলে না তুমি—তোমার সামনে দিয়েই ত গেল—

গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু মুরলীকে দেখে খোকা কেঁদে উঠবে কেন?

—মুরলীকে দেখে কি কেঁদেছে—মুরলী ওকে না নিয়ে আর এক জনকে কোলে নিল তাই দেখেই না কেঁদে উঠল ও—

অবস্থাটা অনুভব করতে পারলাম কিন্তু মুরলীর উপর রাগ করতে পারলাম না বরং খুশী হয়ে উঠল মনটা তার উপরে।

দিন দুই পরে মুরলীকে আবার ডাকবার কথা গৌরীকে বললাম। এবার তিনি আগের মত ঝাঁঝিয়ে উঠলেন না এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজিও হয়ে গেলেন আমার কথায়। মুরলীকে ডাকা হ'ল। কথা ঠিক হ'ল যে এক টাকা ক'রে সে মাহিনা পাবে কিন্তু খেতে পাবে না। তাতেই রাজি হয়ে মুরলী কাজে লেগে গেল। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না দু-বেলা খাওয়ার বদলে একটা টাকা নিয়ে কি লাভ তার হবে। এক দিন গৌরীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা ঐ এক টাকা মাইনে নিয়ে কি লাভ হ'ল ওর?

—ষোল আনাই লাভ—

—তার মানে?

—মানে এই যে খেতে ত সে পাবেই—টাকাটা হ'ল উপরি পাওনা—

—কিন্তু খেতে দেবার ত কথা নেই।

—কথা নেই বটে, কিন্তু খেতে যে দিতেই হয়। ঐ ছেলেমানুষ মেয়েটা না খেয়ে সারাদিন সামনে ব'সে থাকবে—সে কি হয়?

আমি আর কোন কথা বললাম না, কারণ তাঁর মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিলাম যে সে হয় না।

হাসির গানের দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মজ্জার রক্ত দিয়ে লেখে যারা তাদেরই রচিত সাহিত্য জাতির ইতিহাসে আনে যুগান্তর। দ্বিজেন্দ্রলাল খ্যাতির জন্য লেখেন নি, টাকার জন্যও লেখেন নি, ব্যথায় পাগল হয়ে তিনি লিখেছিলেন মর্ম্মের শোণিতে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে তাঁর মর্ম্মান্তিক বেদনারই অভিব্যক্তি। যা তিনি লিখে গেছেন তার সঙ্গে তাঁর অন্তরের নিবিড়তম অনুভূতি জড়ান ছিল বলেই সে-লেখা জাতির প্রাণকে এমন ক'রে স্পর্শ করেছে। লেখা দিয়ে দেশের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারা বড় সহজ কথা নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, সাজাহান অথবা চন্দ্রগুপ্ত কত কাল বেঁচে থাকবে—জানি নে; কিন্তু হাসির গানের দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যে যে অমর হয়ে থাকবেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বস্তুত বাঙালীর সাহিত্যে হাস্যরসের অবতারণায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন। একটা বিরাট জাতি যার অতীত এত মহিমময় সে কি চিরকালই অধঃপতিত থেকে যাঁবে ললাটে দাসত্বের দুরপনেয় কালিমা নিয়ে? তার ঘুম কি কিছুতেই ভাঙবে না? তার ললাটের কালিমা কি কোন দিনই মুছবে না? দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণ পাগল হয়ে উঠেছিল জন্মভূমিকে নব-জীবনের গরিমার মধ্যে রূপান্তরিত দেখবার জন্য। তিনি দেখেছিলেন আমাদের অধঃপতনের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে তবে সে আমরাই। আমাদেরই দুর্ব্বলতা, আমাদেরই চরিত্রের অসম্পূর্ণতা অগৌরবের মধ্যে আমাদিগকে ডুবিয়ে রেখেছে। বিজেতাকে অপরাধী ক'রে কোন লাভ নেই। অপরাধী আমরাই। আমাদের ভীরুতা, আমাদের জড়তা, আমাদের চিত্তের সঙ্কীর্ণতা এগুলিই আমাদের কল্যাণের পথে প্রচণ্ডতম বাধা। সুতরাং অধঃপতিত দেশকে গৌরবের মধ্যে উন্নীত করতে হ'লে তার মানুষগুলির মেরুদণ্ডকে আগে জোরালো করা চাই। মানুষ যেখানে অমানুষ হয়ে আছে সেখানে জাতীয় জীবনে রূপান্তর ঘটান অসম্ভব। দেশোদ্ধার এত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল তাই গাইলেন, "আবার তোরা মানুষ হ'।" হুইটম্যানের ভাষায়, Produce great Persons, the rest follows.

দেশের মানুষগুলিকে চরিত্র-গৌরবে গৌরবান্বিত ক'রে তুলবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যে হাস্যরসের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। হাসির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষকে তার দুর্ব্বলতা সম্পর্কে সচেতন করবার। আমাদের স্বভাবের মধ্যে যে-সকল গলদ আছে সেগুলোর সম্পর্কে আমরা সাধারণতঃ অচেতন থাকি। আমাদের রাগ, আমাদের ভয়, আমাদের কাম, আমাদের অহঙ্কার—এই প্রবৃত্তিগুলোকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে আমরা যে আমাদিগকে কতখানি হাস্যাস্পদ ক'রে তুলি সে-সম্পর্কে আমাদের কোন খেয়ালই থাকে না এবং খেয়াল থাকে না ব'লেই কথায়-কথায় চটে উঠি, বিপদের আভাস পাওয়া মাত্রই কোনদিকে না চেয়ে পিছন পানে চম্পট দিই, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়ে সকলের কাছে নিজেকে জাহির ক'রে বেড়াই। দুর্বৃত্তের ভয়ে 'চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে' উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করবার সময় নিজের অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায় সেটা যদি কেউ সামনে আয়না ধ'রে দেখিয়ে দিতে পারত, বন্ধুর কাজ করত সন্দেহ নেই, কারণ নিজেকে ঐ অবস্থায় দেখে আপনার কাছে আপনাকে এতই হাস্যাস্পদ লাগত যে পলায়ন করা আর সম্ভব হ'ত না। অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে আমরা যখন জীবনের পথে চলি গর্ব্বিত মোরগের মত মস্তকটিকে ইতস্তত সঞ্চালন করতে করতে তখন তার মধ্যে যে ছেলেমানুষি প্রকাশ পায় তাকে সহজে আমরা ধরতে পারি নে। ধরতে পারলে নিজের দুর্ব্বলতায়

নিজেই হো হো ক'রে হেসে উঠতাম আর সেই হাসির ঝরণায় আমাদের অহমিকার কালিমা ধুয়ে যেত।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি এক-একটি দর্পণের মত। সেই দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকগুলি। হাসির গানের আয়নায় আমরা আমাদিগকে নূতন ক'রে আবিষ্কার করি—আমাদের চরিত্রের যে-সকল অসম্পূর্ণতা ইতিপূর্ব্বে আমাদের চোখে পড়ে নি সেগুলিকে সহসা দেখতে পাই। দেখে নিজেরই প্রতি নিজের করুণা জাগে—অন্যের উপরে রাগ হয় না। আমাদের চরিত্রের অন্ধকারময় দিক্‌টার উপরে কেউ যদি সমালোচনার আলোকপাত করে তার প্রতি আমরা সাধারণতঃ খুশী হই না। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের স্বভাবের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন—কিন্তু তাঁর উপরে তো আমাদের রাগ হয় না। রাগ যে হয় না তার কারণ বিদ্রূপের কষাঘাত থেকে অন্যকে যেমন তিনি রেহাই দেন নি, নিজেকেও তেমনি রেহাই দেন নি। বিদ্রূপের পাত্র যেখানে থাকে নিম্নের সমতলভূমিতে এবং বিদ্রূপকারী থাকে সমতল-ভূমির বহুউর্দ্ধে পর্ব্বতের শিখরদেশে সেখানে একের ব্যঙ্গোক্তি অপরের ক্ষতবিক্ষতচিত্তে শুধু ক্ষোভেরই সঞ্চার করে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপের মধ্যে খোঁচা আছে যথেষ্ট—কিন্তু সে-খোঁচার মধ্যে বিষ নেই। তিনি তো মেঘনাদের মত উর্দ্ধলোক থেকে তাঁর বিদ্রূপের শরজাল বর্ষণ করেন নি মাটির দুর্ব্বলচেতা জীবগুলিকে লক্ষ্য ক'রে। শাণিত বাক্যের শরজালে অন্যকে বিদ্ধ ক'রে যে এক রকমের পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করা যায়—সে রকম আনন্দ অনুভব করার মত মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁর আসন ছিল সকলের মাঝে—সকলের সঙ্গে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতাগুলি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। নিজেও যত হেসেছেন আমাদেরও তত হাসিয়েছেন। সকলের প্রতি তাঁর অন্তরে প্রকাণ্ড সহানুভূতি ছিল ব'লেই হাসির গান বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতাকে এমন ক'রে হাসাতে পেরেছে। অন্যের এবং নিজের মধ্যে কোন ব্যবধান যদি তিনি রাখতেন, তাঁর গান শুনে দেশ হাসত না—চটত এবং তার ফলে তাঁর সাহিত্যসাধনা কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ ঘটাত।

মানুষ না হ'তে পারলে জাতি যে উঠবে না—এ-সত্য দ্বিজেন্দ্রলাল মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এ-সত্যও তিনি বুঝেছিলেন যে বাঙালীর মগজ আছে, ভাবপ্রবণতা আছে, নেই শুধু চরিত্রবল। বড় বড় বুলি আওড়াতে সে খুবই ওস্তাদ—তার রসনায় পেট্রিয়টিজ্‌মের জয়গান—বন্দেমাতরম্ শুনলেই ভাবাবেগের আতিশয্যে চোখ দিয়ে তার জল ঝরে কিন্তু যে দুর্জ্জয় সংকল্প এবং কর্ম্মশক্তি থাকলে পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করে তার অভাব সেই সংকল্পের এবং কর্ম্মশক্তির। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই আসে নবজীবনের সমারোহ। বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে। আমরা স্বাধীনতার জয়গান গাই কিন্তু জীবনকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চাই। যেখানে বিপদ সেখানে আমাদের চুলের টিকিটি দেখবার জো নেই। আমাদের কথার এবং কাজের মধ্যে এই যে অসামঞ্জস্য—এই অসামঞ্জস্য দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্তকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছিল। এই অসামঞ্জস্যের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখে-ছিলেন ভণ্ডামির কালিমা আর এই ভণ্ডামির কালিমা থেকে জাতিকে মুক্ত করবার জন্য তিনি নিক্ষেপ করেছেন তাঁর তূণের বাছা বাছা বাণগুলি। বচনবাগীশ নেতৃবৃন্দ আকাশ ফাটিয়ে বক্তৃতা করছে—কিন্তু আত্মদানের যখন সময় এসেছে তখন একেবারে পগার পার। এ-দৃশ্য দেখে দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় ক্ষেপে যাবার উপক্রম হয়েছে আর ক্ষিপ্ত অন্তরের সেই ক্ষোভ অট্টহাসিতে প্রকাশ পেয়েছে।—

বলি তো হাসব না, হাসি রাখতে চাই তো চেপে,
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে!
সাহেব-তাড়াতে ধৃতমত অকুলস্থ স্ত্রীব,
ভূতভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর;
যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায়;
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে হয়ে ওঠে দায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের যে-হাসি, সে-হাসির উৎস অন্তরের গভীরতম বেদনায়। কত যে চোখের জল লুকিয়ে রয়েছে তাঁর হাসির গানের পিছনে! দেশব্যাপী একটা প্রকাণ্ড ভীরুতা আধ্যাত্মিকতার মুখোস পরে রয়েছে এবং কুড়েমি আপনাকে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম ব'লে চালাবার চেষ্টা করছে—

এই কপটতা দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। এত বড় দুর্ব্বলতা নিয়ে মাত্র মুখের জোরে হিন্দুধর্ম্ম যে কোন কালেই বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারবে না—একথা বুঝতেও দ্বিজেন্দ্রলালের একটুও বিলম্ব লাগে নি।

তোমরা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কোরেই, হ'তে চাও যে ধন্য
—তা সে হবে কেন?
তোমরা মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও যে বিশ্বে অগ্রগণ্য!
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দুধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম—
'ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধর্ম্ম!'
অমনি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেত চর্ম্ম?
—তা সে হবে কেন!

মাত্র চালাকির দ্বারা যে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না—এই কথাটাই দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিবেকানন্দের মতই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের কর্ম্মবিমুখ হীনবীর্য্য জাতি চালাকির দ্বারা দেশোদ্ধার করতে চায়। জাতির এই যে সর্ব্বনেশে দুর্ব্বলতা—এই দুর্ব্বলতাকে এই জন্যেই তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। তাঁর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতম শরজাল সর্ব্বাঙ্গে বহন ক'রে পেট্রিয়টের মুখোস-পরা কর্ম্মবিমুখ ভীরু 'নন্দলাল' বাংলা-সাহিত্যে আজও বেঁচে রয়েছে এবং চিরদিন বেঁচে থাকবে। বিপদকে নন্দলালের বড় ভয়, মরতে নন্দলালের অত্যন্ত কুণ্ঠা। বেঁচে থাকবার বাসনা তার অত্যন্ত বলবতী, আরামে তার অত্যন্ত লোভ। কিন্তু দেশোদ্ধার সে করবেই—এবং তার জন্য বেঁচে থাকতেই হবে। এই বেঁচে থাকাটাকে justify করবার জন্য সে বারে বারে কপটতার আশ্রয় নিচ্ছে। দেশের প্রতি সত্যিকারের প্রেম নেই অথচ করতালির লোভে দেশপ্রেমিক সাজবার এই যে হাস্যকর প্রচেষ্টা—নন্দলাল এই ভণ্ডামির প্রতিমূর্ত্তি। আনন্দমঠে বঙ্কিম ছড়িয়েছেন মৃত্যুর মন্ত্র। স্বাধীনতার জন্য "আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে"—এই বাণীই বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী। দ্বিজেন্দ্রলালের বাণীও একই বাণী। বাহিরে দুই জনই চোগাচাপকানধারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, কিন্তু অন্তরে দুই জনই মুক্তিপিপাসু বিদ্রোহী। এই দুই জনের এক জনকে বাদ দিয়ে আর এক জনের কথা ভাবা যায় না।

বঙ্কিম লিখলেন,

"মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন,

"বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, সে দেশে বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।"

নন্দলাল দেশের জন্য মরতে ভয় পেয়েছে—জীবনের প্রতি তার অত্যধিক মমতা আর এই মমতাই কবির চোখে তাকে এমন বিসদৃশ ক'রে তুলেছে।

নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ রেলে 'কলিশন' হয়
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ীচাপা-পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল!

ভণ্ডামিকে দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না

মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে,—
সবার বাড়া শত্রু সে; আবার তোরা মানুষ হ।

ভণ্ডই তো সমাজের সকলের চেয়ে বড় শত্রু—কারণ তার রসনায় ধর্ম্মের বড় বড় বুলি কিন্তু চরিত্রে পর্ব্বত-প্রমাণ গলদ। সে অত্যন্ত অসাধু হয়েও লোক-দেখানো সাধুতার মুখোস প'রে বেড়ায় সমাজের কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার লোভে। যারা সাধারণ লোক তাদের চরিত্রে দোষত্রুটি থাকলেও সমাজ তাদের দ্বারা খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না—কারণ তারা যা নয় খ্যাতির লোভে তা সেজে বেড়ায় না, তারা ভিতরে এক রকম এবং বাহিরে আর রকম নয়, তারা আর সকলের কাছে আপনাদিগকে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় না, মুখে গীতার, বাইবেলের আর কোরাণের শ্লোক আওড়ায় না; তারা খায়দায় ঘুমায়, চাকরি ক'রে পয়সা আনে, সমাজে আর দশ জন যা করছে মন্ত্রের মত তাই ক'রে যায়। তারা আচারের দাস। গড্ডলিকাপ্রবাহে ভেসে চলেছে স্রোতের তৃণের মত। তারা মারাত্মক নয়। মারাত্মক হ'ল ভণ্ডের দল যাদের হাতে বড় বড় আদর্শের পতাকা কিন্তু সে-আদর্শকে অনুসরণ করবার সংকল্প নেই যাদের মনে—যারা আপনাদের অন্তরের ভীরুতাকে গোপন ক'রে রেখেছে আধ্যাত্মিকতার আবরণে।

দেখি যদি গৌরমূর্ত্তির রক্তবর্ণ আঁখি
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' বলে ডাকি ;
পালাই ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে, যেন বাঘে খেলে !
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে'
পিতৃপুণ্যে পৌঁছে বাড়ী, ঘরে দিয়া চাবি
মালা জপি এবং আমার গীতার কথা ভাবি।
আমার গীতার কথা ভাবি।

ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার যে কপটতা এই কপটতাকে দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। পরাধীন জাতি সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে স'য়ে যাবে আর গীতা হাতে নিয়ে আধ্যাত্মিকতার গৌরব করবে—দ্বিজেন্দ্র-লালের পক্ষে এ-দৃশ্য সত্যসত্যই দুঃসহ ছিল। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ভীরুতার কোনখানেই মিল নেই। ভগবান্‌কে যে ভয় করবে মানুষের ভয়ে সে কখনও কাতর হবে না। মানুষের ভয়ে যে কাঁপে ভগবানে তার কোন বিশ্বাস নেই। গীতা মানুষকে বলে নি অন্যায়কে সহ্য করতে। ভারতবর্ষ যদি গীতার বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত সে কখনও স্বাধীনতা হারাত না। কথায়-কথায় গীতার গৌরব করব আর দিনের পর দিন প্রবলের সমস্ত ঔদ্ধত্যকে সহ্য ক'রে ক্রীতদাসের অভিশপ্ত জীবন বহন ক'রে চলব এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার আর কি ঘটতে পারে ? ইংরেজীতে যাকে বলে sense of humour—তার উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের ষোল আনা অধিকার ছিল এবং সেই জন্যই কর্ম্মবিমুখ ভীরু জাতির মুখে গীতার গুণকীর্ত্তন অত্যন্ত হাস্যকর ব'লেই তাঁর কাছে মনে হয়েছিল। প্রবলের উৎপীড়নকে সহ্য করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে লেশমাত্র নেই এই সত্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিকে আর এক জন আকর্ষণ করেছিলেন এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁকে কৃষ্ণ-চরিত্র লিখতে হয়েছিল একটা মেরুদণ্ডহীন জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করবার জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল দু-জনেরই অভিযান ভীরুতার বিরুদ্ধে, সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে দু-জনেই দেশবাসীকে দিয়েছেন বীরধর্ম্মে দীক্ষা। বার্নার্ড শ সম্পর্কে চেষ্টারটন্ (Chesterton) লিখেছেন, All virtues he has are heroic virtues. দ্বিজেন্দ্র-লাল এবং বঙ্কিমচন্দ্র দু-জনের সম্পর্কেই আমরা এক কথাটা ব্যবহার করতে পারি। বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে তাঁরা আসেন নি আমাদের চিত্তকে স্বপ্নের দেশে নিয়ে যাবার জন্য; হাতে পাঞ্চজন্য নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন ঘুমিয়ে-পড়া জাতিকে ক্ষাত্রবীর্য্যের গরিমার মধ্যে জাগাতে। আনন্দমঠে জীবানন্দ সন্তানধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে গৃহবাসী হবার ইচ্ছা যেখানে প্রকাশ করেছে সেখানে শান্তির মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে—

"ছি, তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালোবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি বীরধর্ম্ম কখনও ত্যাগ করিও না।"

পাছে প্রেমের জন্য মহেন্দ্রসিংহের সন্তানধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটে সেজন্য কল্যাণী বিষপান করতে দ্বিধা করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসচক্ষে ভাবী কালের জন্মভূমির যে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তিনি বীরের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় এই জন্যই বীরধর্ম্মের এত জয়গান—মরণের পায়ে এত অর্ঘ্যদান। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর স্বপ্ন দিয়ে যে ভারতবর্ষকে তৈরি করেছিলেন—যাকে তিনি দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার ব'লে প্রাণ ভরে ডেকেছিলেন—সেই দেশকে সৃষ্টি করবার জন্য যে বীরের প্রয়োজন তা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন আর সেই জন্যই তাঁর সাহিত্যে মরণের বন্দনাগান—শৌর্য্যের আদর্শ পেয়েছে এতখানি পূজা।

আমাদের জাতটা একটু বেশীমাত্রায় সেন্টিমেন্টাল—আমাদের ভাবপ্রবণতা যে পরিমাণে বেশী কর্ম্মপ্রবণতা সেই পরিমাণে কম। ভাবপ্রবণ লোক শুধুই ভালবাসে, শুধুই ঘৃণা করে কিন্তু যে আদর্শকে ভালবাসে তার সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করতে সে প্রস্তুত নয়, যাকে সে ঘৃণা করে তাকে অপসারিত করবার জন্য সে কিছু করে না। দেশ বলতে সে অজ্ঞান, স্বাধীনতার জয়গান গাইতে তার চোখে জল ঝরে, সত্যের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে—কিন্তু যেই দেশের জন্য কিছু করবার সময় আসে, স্বাধীনতার জন্য, সত্যের জন্য লড়াই করবার ডাক পড়ে—অমনি সে ঘরের কোণে আশ্রয় লয়, কর্ম্মক্ষেত্রে তার দেখা পাওয়া মুশকিল। সে জানে অনেক কিছু, করে না কিছুই। জানার

মধ্যে বিপদ নেই—কিন্তু যা সত্য ব'লে জানি তাকে অনুসরণ করতে গেলে ক্ষতি এবং বিপদ অনিবার্য্য। সুতরাং কর্ম্মের ঘরকে শূন্য রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই যে sentimentality—একে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন আর সেই ঘৃণা তাঁর হাসির গানের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

মোটা তাকিয়ায় দিয়া ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ—
আর friends-দের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
খুব করি hate ও abuse;
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think
তাহ'লে you are an awful goose.

অথবা,

From the above দেখতে পাচ্ছ বেশ
যে আমরা neither fish nor flesh
আমরা curious commodities, human
oddities, denominated Baboos;
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি কিন্তু কাজের
সময় সব ঢুঁ ঢুঁ স;

একটা কর্ম্মবিমুখ মুখসর্ব্বস্ব সেন্টিমেন্টাল জাতকে জোরাল মেরুদণ্ড দেবার জন্যেই তো হাসির গানের কষাঘাত, তার জন্যই তো বাংলার রঙ্গমঞ্চে রাণা প্রতাপ আর দুর্গাদাসের মত বীরপুরুষদের অবতারণা। এখানে হাসির গানের 'হ'তে পার্ত্তাম' গানটির প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বদলে গেল মতটা—একটা চমৎকার ব্যঙ্গ-কবিতা—লেখা হয়েছে তাদেরই লক্ষ্য ক'রে যাদের কোন কিছুতে বিশ্বাস নেই—যাদের কথায় কথায় মতের এবং পথের পরিবর্ত্তন ঘটে—যাদের ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত ঠুন্‌কো। ভাবপ্রবণতা রয়েছে কিন্তু চরিত্রবল নেই—এ রকম দুর্ভাগা জীবদের দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত করুণার চোখে দেখতেন।

স্বদেশের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের যে প্রেম তার মধ্যে কিছু ভেজাল ছিল না। বিবেকানন্দের মত, বঙ্কিমের মত, রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি দাস-সুলভ পরানুকরণপ্রিয়তাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। এই জন্য ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যারা সাহেবদের অনুকরণ করতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল তাদের বিলাতী বাঁদর বলতে তাঁর রসনা একটুও কুণ্ঠিত হয় নি। নতুন কিছুর পিছনে ক্রমাগত ছুটে বেড়ানর মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড ছেলেমানুষি রয়েছে এবং এই ছেলেমানুষি আমাদের যে কোনখানেই পৌঁছে দেয় না—একথা দ্বিজেন্দ্রলাল জানতেন; এই জন্য আধুনিকতার মোহকে বিদ্রূপ করতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। যে-যুক্তির দোহাই দিয়ে পুরানোকে আমরা বর্জ্জন করতে চাই—অতিআধুনিকদের উপাস্য দেবতা হচ্ছে সেই যুক্তি। কিন্তু যুক্তিবাদী আধুনিকদের চেয়ে জগত যে বিজ্ঞতর এতে কি কোন সন্দেহ আছে? যে প্রেমিক ষোল আনা যুক্তিবাদী—বুদ্ধিই যার একমাত্র আশ্রয়, চিরকুমার থাকা ছাড়া তার উপায় নেই। যে সিপাহীর দল ক্রমাগত হিসাব ক'রে চলতে চায় সে কখনও লড়াই করবে না—প্রাণ রক্ষার জন্য পালাবে।

কিন্তু তাই ব'লে দ্বিজেন্দ্রলাল কুসংস্কারকে কোনখানে প্রশ্রয় দেন নি। যে পুরাতন আমাদের চিত্তকে অতীতের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে চায়, যা তাকে নব নব জ্ঞানের মধ্যে প্রসারিত হ'তে দেয় না তাকে দ্বিজেন্দ্রলাল আঘাতই করেছেন। কুসংস্কার বর্ব্বরতারই দান। আমাদের চলার পথে কুসংস্কারগুলি প্রকাণ্ড অন্তরায়। 'বিষ্যুৎবারের বারবেলা' এই কুসংস্কারের উপরেই প্রচণ্ড কষাঘাত।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের বিস্তৃত সমালোচনা এখানে সম্ভব নয়। জোরের সঙ্গে এইখানে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে বঙ্গসাহিত্যে হাসির গান সত্যসত্যই অতুলনীয়। অন্তরের দুঃসহ বেদনা কান্না হয়ে বেরিয়ে এসেছে আর এই কান্নাই হাসির গানগুলিকে অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বঙ্গসাহিত্যে এই এক জন প্রতিভা-শালী কবির আবির্ভাব হয়েছে যাঁর সাহিত্যে পৌরুষের প্রচণ্ড দীপ্তি—নারীসুলভ পেলবত্বাকে যিনি কোথাও প্রশ্রয় দেন নি—যিনি জাতটাকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন বীরের জোরালো জাত ক'রে। তাঁর প্রতিভার বেদীমূলে আমার প্রাণের প্রণাম নিবেদন ক'রে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

দিল্লী এক্সপ্রেস

মোগলসরাই—বিন্ধ্যাচল—মেজারোড

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ও-পায়ের বেঞ্চে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই।

বড় জংশন আসিলেই যাত্রীর ওঠানামার প্রাচুর্য্যে ক্ষণিকের পরিচয় অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, নূতন আলো চোখের পাতায় আঘাত করে।

উহারা একটি কোণ ঘেঁষিয়াই বসিয়াছে। উহাদের গল্প চলিয়াছে অনর্গল; বেঞ্চের উপর কাগজের ঠোঙায় ও শালপাতার উপর পেঁড়া, মিঠাই, চানাচুর ভাজা, পুরি, আলু-কি-শাক ইত্যাদি রহিয়াছে, মাটির ভাঁড়ে মোগলসরাইয়ের মালাই রহিয়াছে, তাহার পাশে দুটি লাল টুকটুকে আপেল ও পেয়ারাও যেন রহিয়াছে। উহারা এ সব স্পর্শ না করিয়া বালু-কি-ভাজি মোমফালির খোলা ছাড়াইতে ব্যস্ত। গল্পও চলিতেছে সেই সঙ্গে। এটুকু না বলিয়া দিলেও কাহারও হয়ত বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, উহারা তরুণ-তরুণী।

মেয়েটি যেন হাসির ঝরণা। অত্যন্ত কাঁচা বয়স বলিয়াই বোধ করি অকারণ হাসির মাত্রাটা উহার অত্যধিক। যে-মনে সবেমাত্র পৃথিবীর রং ধরিতে সুরু হইয়াছে সে-মনের প্রাচুর্য্য স্বাভাবিক। বাড়ীর শাসন-গণ্ডী এখানে শিথিল, চারি দিকের দৃশ্যপটও নূতন এবং প্রিয়সান্নিধ্যলাভের আবেগ উচ্ছ্বসিত, এমন পরিবেশেও যদি ··। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ রাখিয়া তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিলাম, আমার দৃষ্টির মধ্যে অভিনিবেশ লক্ষ্য করিয়াই উহাদের উচ্ছ্বসিত হাসি একটু যেন স্তিমিত হইয়া গেল। আমার পক্ক কেশ ও টাকযুক্ত মাথা দেখিয়া কি কোন গুরু-স্থানীয় রাশভারী অভিভাবকের কথা মনে পড়িয়াছে? তা যদি হয়—চোখের দৃষ্টি আমাকে সংহত করিতেই হইবে। আমাদের পৃথিবীও যে এক দিন এমনই রূপে রসে সঞ্জীবিত ছিল সে-কথা উহাদের ভুলাইয়া দিতে হইবে। সত্যই ত চলমান জগতে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করা মানেই—, অগ্রগতিকে পদে পদে ব্যাহত করা। সুতরাং চক্ষু বুজিলাম। বুড়া বয়সের যে ধর্ম্ম অর্থাৎ তন্দ্রাকর্ষণ সেইটাই প্রকটিত করিয়া উহাদের নিরঙ্কুশ করাই আমার অভিপ্রায়। দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় কিন্তু তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহারই কল্যাণে অতীত স্মৃতি রোমন্থন পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল।

—গরম পুরি যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—এস খাওয়া যাক।

—পোড়াকপাল! যা চেহারা তোমার পুরির—আর ন্যালনেলে আলুর তরকারি! ঠিক যেন—

—কি?

—এই বাসি ভালবাসার মত আর কি।

—ইস, বাসি ভালবাসা কি রকম তুমি যেন জান?

—নাই জানি, শুনেছি ত।

—কি রকম, কি রকম?

—আহা মশাই যেন কিছুই জানেন না!

—কেমন ক'রে জানব? এ কারবার এই ত আমার প্রথম।

—প্রথম? তা বই কি! এতদিন অবধি কাউকে ভালবাস নি?

—ভালবাসা কি এতই সহজ!

—সহজই ত। না হ'লে— কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া, এঁরা কি মনে করবেন বলত?

—কাঁরা? তোমার বাংলা কথা ওঁরা বুঝলে ত?

—আর ওই ভদ্রলোক?

—উনি ত ঢুলছেন।

—আচ্ছা, বুড়ো হ'লে আমরাও অমনি ঢুলব ত?

—আগে বুড়ো হই—তার পর বলব।

—ইস, বলবে আবার কি—বুড়োই হব না আমরা!

—সেই ভাল। তরুণ হাসিয়া উঠিল। যারা সাধ

ক'রে বুড়ো হয় আমরা তাদের দলে নই। মোমফালি ত শেষ করলে—এইবার চানাচুর—

—এই যে তোমার চানাচুর আর পুরির সদ্গতি করছি। পাতার সামান্য খড় খড় শব্দ হইল।

—আহা ফেলে দিলে? কোন গরীব-দুঃখীকে দিলেও ত কাজ হত।

—এই ট্রেনে গরীব দুঃখী খুঁজে মরি আর কি। এস রাবড়ি খাওয়া যাক।

—তুমি চানাচুর ফেললে কেন?

—রাগ হ'ল?

—তোমার সঙ্গে কথাই বলব না আর। কেন ফেললে আমার চানাচুর?

—তুমিই বা কেন ফেললে আমার পুরি?

—বেশ করেছি—আমার ইচ্ছে। এই তোমার রাবড়িও ফেলে দিলাম। ট্রেনের গতিশব্দের সঙ্গে খুরি-ভাঙার একটি নূতন অস্পষ্ট শব্দ উঠিয়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। মুহূর্ত্তপূর্ব্বের উচ্ছ্বসিত হাসি নূতনতর আলাপের গাম্ভীর্য্যে ডুবিয়া গেল। ট্রেন চলিতে লাগিল। তন্দ্রার আলস্যে এক-এক বার চোখও ত চাহিতে পারি!

হ্যাঁ, মেঘই নামিয়াছে। তবে ভরসার কথা—এ মেঘের পিছনে প্রচণ্ড রৌদ্রের দীপ্তি আছে। এটি শরতের মেঘ। উপলক্ষ্য ইহার সামান্য। এই সমস্ত তুচ্ছ বস্তুর সংঘাতেই আসল বস্তুটির ঘনসান্নিধ্য লাভ করা যায়। যে-জিনিস উচ্ছি্ত হইতেছে, যে-জিনিসের অপচয় ঘটিতেছে—সংসারের দিক্ হইতে তাহার কতটুকুই বা মূল্য? এই অপচয়কে যত দিন কৌতুকের বিষয়স্তর হইতে নিম্নমুখী করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা না জাগিবে তত দিনই এরা মুক্ত পাখী। এদের বিস্তৃত পক্ষপুটে অবাধ আলো আর বায়ুর অবারিত দাক্ষিণ্য লাগিয়াই থাকিবে।

আবার এক সময়ে তন্দ্রাই আসিয়াছিল হয়ত, খিল খিল হাসির শব্দে ভাঙিয়া গেল। হাঁ, শরতের মেঘই বটে!

—চুণারের রাজ্যশুদ্ধ মাটি যে কিনে নিলে গো?

—দুটো ফুলদানি আর কিছু খেলনা ত।

—কুঁজো?

—ও ত একটি মোটিস।

—কিন্তু জান না ত—আমাদের পাখীর বাসায় ও-সব বড় বেমানান।

—পাখীর বাসা! বাঃ, বেশ বলেছ ত তুমি। তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটু পরে হাসি থামাইয়া বলিল, কি পাখী গো? আমি বলব? বলব? কবুতর—যাকে বলে পায়রা। এই এতটুকু খোপের ভেতর বসে বক্ বকম্—বক্ বকম্—তরুণী জানালার ধারে হেলান দিয়া হাসির বেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। হঠাৎ টুস্ করিয়া একটা শব্দ উঠিল।

—যাঃ, ফেললে ত ভেঙে কুঁজোটা?

—আহা—জল ঠাণ্ডা হবে ব'লে ওটা কিনেছিলাম গো। আহা!

—থাক, তোমার দুঃখ প্রকাশে আর কাজ নেই। ফুলদানিটা সাবধানে রাখ।

—যায় ভেঙে যাক না। আমাদের পায়রার খোপে এ-সব কি হবে? তার চেয়ে বরং বক্ বকম্—বক বকম্—

হাসির মাত্রাটা অত্যধিক এবং বিরামবিহীন। কাজেই বিরক্ত হইয়া আমিও চোখ চাহিলাম। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তরুণের দৃষ্টিতে কি যেন সঙ্কেতের ছায়া আন্দোলিত হইল। তরুণী সে সঙ্কেতকে প্রথমটা গ্রাহ্যই করিল না। খানিক পরে অর্দ্ধ সমাপ্ত হাসির মুখে একটি 'উঃ' বলিয়া কোণের দিকে সরিয়া গেল।

তরুণ হাসিল।

—বাঃ রে, আমায় চিমটি কাটলে কেন?

—কাটলাম চিমটি? ও ত পিঁপড়ে।

—হাঁ, তা বইকি! বেশ—তোমার সঙ্গে এই আড়ি—আড়ি—আড়ি—। কনিষ্ঠা অঙ্গুলি বার তিনেক আন্দোলিত করিয়া গম্ভীর মুখে তরুণী পিছন ফিরিয়া বসিল।

তরুণ বলিল—বেশ, আমার রইল ভাব—ভাব—ভাব।

তরুণী বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কই, কোথায় ভাব?

তরুণ হাসিয়া বলিল, ভাব—ভাব।

তরুণী বলিল, সত্যি কেন না একটা ডাব। বড় জল-তেষ্টা পেয়েছে।

—ডাব তো ডাব, এ-দেশে ঝুনো নারকেল পাওয়াও দুষ্কর। একটা লেমনেড—

গ্রীবা হেলাইয়া তরুণী বলিল, ছাই দেশ।

তরুণ বলিল, তবু তো চলেছ সেই দেশে। সোনার দেশ তোমায় ঠাঁই দিল না।

তরুণীর উজ্জ্বল মুখে সহসা একটি ছায়া যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, সোনার দেশ যদি তো থাকলে না কেন সেখানে? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

—তুমি নয়—তুমি নয়—সে আর এক জন।

—কে সে? তরুণীর মুখে চোখে কৌতূহল।

—শুনে রাগ করবে না? আচ্ছা এদিকে এগিয়ে এস, কানে কানে বলি সে-কথা।

—ধ্যেৎ। বলিয়া সকোপ কটাক্ষে তরুণী মাথা সরাইয়া দিল। সে মুখে লজ্জা আনন্দ মিশিয়া প্রথম সূর্য্যোদয়ের মহিমাকে যেন প্রকাশ করিতেছে।

—তুমি আমায় বিয়ে না করলেই তো পারতে? কত সুন্দরী মেয়ে ছিল।

—ছিলই তো।

—কত টাকা তাদের ছিল।

—ছিলই তো।

—কত ভালই না বাসত—

—ঐটি বাদ। আমার চোখের সুন্দর আর লোকের চোখের সুন্দর আলাদা। ও-কথা থাক, একটা গান গাও না?

—দূর, এই ট্রেনে!

—ট্রেনের তালে তালে গান জমে ভাল। যারা গাইয়ে তাদের কথা বলছি নে। এই তালকে যে নিজস্ব করে নিতে পারে তার গান যে একান্ত ভাবে তারই—এ-কথা বোঝ না কেন? গাও।

—কিন্তু যে-গান আমারই নিজস্ব সম্পত্তি, মনে মনেই তা গাইব, তোমাকে শোনাব কেন?

—এ তো স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। যেগুলি তোমার নিজস্ব সম্পত্তি তার মধ্যে আমিও কি একটি নয়!

—যাও—তুমি ভারি—

—লক্ষ্মী।

হয়ত তরুণী গানই গাহিত, কিন্তু বিন্ধ্যাচলে গাড়ী আসিয়া থামিল এবং এক দল যাত্রী আমাদের কামরা লক্ষ্য করিয়াই কোলাহল জমাইয়া তুলিল, এই দিকে—এই দিকে। এই কুলি ইধার ইধার—এধারে এস না গো, অমন করে চললেই জায়গা পেয়েছ আর কি!

দলটি নেহাৎ মন্দ নহে। পঞ্চাশোর্দ্ধের এক দম্পতি দশ-বারটি সন্তান-সন্ততি ও আধ-গাড়ী বোঝাই জিনিষপত্র লইয়া হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের চীৎকারে আমার তন্দ্রা টুটিয়া গেল, ট্রেনস্থ সকলেই বেশ একটু চকিত হইয়া উঠিলেন, দম্পতির চটুল আলাপ বন্ধ হইয়া গেল।

তা জায়গা একটু ছিল—ও-পাশের বেঞ্চে। অবশ্য দশ-বার জন বসিবার মত নহে। নবাগত গৃহিণীর ইঙ্গিতে বাহিনী সেই দিকেই পরিচালিত হইল। কামরার দুয়ার খোলা ছাড়া কর্ত্তার আর কোন কর্ত্তৃত্ব দেখা গেল না। গৃহিণী কোলের ছেলে, হাতের কুঁজা ও পাখা কর্ত্তার হাতে দিয়া কুলিদের জিনিসপত্র রাখিবার ও ছেলেমেয়েদের বসিবার নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন। কোলের ছেলেটা মাতৃঅঙ্কচ্যুত হইয়া গগনবিদীর্ণ-করা রবে ট্রেনস্থ সকলের শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল। বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রকম অশিষ্ট মন্তব্য বা আচরণের জন্য রেল-কোম্পানী কতকগুলি শাস্তিমূলক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যাত্রীদের স্বস্তিবিধানের আয়োজন করিয়াছেন; অবোধ শিশুর অনর্গল চীৎকার যে কবে আইন-কর্ত্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে—ট্রেনসুদ্ধ লোক তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ভাবিলেই ত প্রতিকার হয় না। আমাদের ভাবনার অবসরে ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাহিনীসমেত গৃহিণীও 'সুজনে'র মত সঙ্কীর্ণ জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আশে-পাশে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জায়গা-দখলকারী বেহিসাবী যাত্রীদলকে মনে মনে

অভিসম্পাত করিতেছেন। কর্ত্তা নিতান্ত নিরীহের মত যেদিকে তরুণ দম্পতি বসিয়াছিল সেই দিকের বেঞ্চে কোনক্রমে বসিয়াছিলেন।

প্রায় সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সামলাইয়া গৃহিণীর দৃষ্টি ঐদিকেই পড়িল। অমনই শীর্ণ মুখে তাঁহার অনেকগুলি শিরা সুপ্রকটিত হইয়া উঠিল। তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, ওখানে বসলে যে?

কর্ত্তা মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, আর জায়গা কোথায় যে বসব?

—কেন, আমাদের এখানে এসে বসতে পার না?

—তোমরাই ত শিমভাতে হচ্ছ ঠাসাঠাসি ব'সে।

—শিমভাতেই হই আর আলুভাতেই হই—এস ইদিকে। ও-সব আমরা ঢের বুঝতে পারি।

কর্ত্তা ঈষৎ উষ্ণস্বরে বলিলেন, কি-সব?

—কিছু নয়। এস বলছি ইদিকে। গৃহিণীর কণ্ঠস্বর ধমকের মতই শোনাইল।

কর্ত্তা বাঙ্নিষ্পত্তি না-করিয়াই উঠিলেন, কোলের ছেলেটা আবার ককাইয়া উঠিল।

কর্ত্তা নিকটবর্ত্তী হইলে গৃহিণী চাপা অথচ কামরাস্থ সকলের শ্রুতিগম্য স্বরে তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, ছি ছি, চিরকালটাই তোমার এক ভাবে গেল। লজ্জাও করল না ঐখানে গিয়ে বসতে? তোমার বড়মেয়ে বেঁচে থাকলে যে ওর বয়সীই হ'ত।

—আঃ—থাম। কি যে পাগলের মত বক!

—হাঁ, আমি ত পাগলই। নাও, আর দাঁড়িয়ে ওদিকে চেয়ে থাকতে হবে না। ব'স।

ছেলেটাকে স্বামীর কোল হইতে হ্যাঁচকা টানে নিজের পানে আকর্ষণ করতঃ তাহার অন্তিম চীৎকারের সুযোগ বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। ও-পাশের তরুণী হাসিয়া উঠিল।

—মরণ! হাসি দেখে আর বাঁচি নে! বলে, কত ঢংই জান রাধা!

স্বামী বসিবার পর ছেলেমেয়েদের মধ্যে কলরব উঠিল, উঃ—লাগে যে! কিন্তু পতিগতপ্রাণা সাধ্বী সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া বলিতে লাগিলেন, একটা কাজও তো তোমায় দিয়ে হয় না—এমন কম্মিষ্ঠে পুরুষও ভূ-ভারতে জন্মেছিলে! ধন্যি যা হোক। নামবে তো পৈরাগে?

—তা নামব বইকি।

—তুমি তো বল—গার্ড-ড্রাইভার, সাহেব-মেম সকলের সঙ্গে তোমার হলায়-গলায়। তাদের ব'লে একটা ভাল জায়গা রিজার্ভ ক'রে নিতে পার না?

—মাঝ-স্টেশন থেকে উঠলে কি জায়গা পাওয়া যায়?

—না, যায় না! তবে আর রেলে চাকরি ক'র কি করতে? তোমাদেরই তো রেল, মিনি-ভাড়ায় যেতে দিচ্ছে—আর জায়গা দেবে না?

স্বামী-স্ত্রীর যুক্তিকে কাটাইবার জন্য বলিলেন—জান, রেল-কোম্পানীর কি নিয়ম? যারা টিকিট কিনে যায় তাদের জন্য সব সময়ে আমরা জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য। পাস নেওয়ার মজা কত!

ঠোঁট উল্টাইয়া স্ত্রী বলিলেন—ইস্, মগের মুলুক আর কি! কেন, পাস নিয়ে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছে তারা? সারা জীবন গতর জল ক'রে খাটে যারা তাদের ওপর এই ব্যাভার! রেল-কোম্পানী কি চামার—

—তারা ব্যবসাদার। স্বামীর এই অনুচ্চ মন্তব্যে স্ত্রী তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলিলেন—ঝাঁটা মারি অমন ব্যবসার মুখে, এতে কি ওদের ভাল হবে মনে কর?

—জানি না। বিরক্তিভরে স্বামী মুখ ফিরাইলেন।

—ফের চাইছ ওদিকে, বেহায়া কোথাকার!

—তবে কি তোমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকব?

—থাকবেই তো। জান না, কি মন্তর পড়ে বিয়ে করেছ! সারা জীবনটা আমায় জ্বালিয়েও তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না?

করুণ রস আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া স্বামী ছেলে ভুলাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

ছেলে চুপ করিল। স্বামীর ছড়া শুনিয়া নহে, ও পাশের তরুণীর মূকাভিনয়ের গুণে। তরুণী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল এবং ডান হাতে একটি লাল টুকটুকে আপেল তুলিয়া ছেলেটির সামনে আন্দোলিত করিতেছিল। বাপের কাঁধের উপর উপুড় হইয়া থাকাতে ছেলেটির দৃষ্টি

বিপরীত বেঞ্চে উপবিষ্ট তরুণীর আন্দোলিত আপেলের দিকেই নিবদ্ধ হইয়াছিল।

নিঃশব্দে সে হাত বাড়াইল, নিঃশব্দে তরুণী আপেলটি তাহার হাতে তুলিয়া দিল। ছেলের কান্না থামিল। আপেল লইয়া সে বাপের গালে ঘষিতেই তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, আরে এটা এল কোত্থেকে ?

গৃহিণী বিদ্যুদ্বেগে পিছনে ফিরিয়াই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। অতঃপর হাসিমুখে তরুণীর পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমিই দিয়েছ বুঝি মা ? তা দামী জিনিষটা কেন ওকে দিলে ? ও কি খেতে শিখেছে এখনও। বলে তিন সের দুধ ভরসা ক'রেই জীবন ধারণ করে। কি বলছ ? দাঁড়াও ওদিকে গিয়ে বসি, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করি।

তিনি ওদিকে উঠিয়া গেলেন।

অনুচ্চকণ্ঠের আলাপ পরিচয় খানিকক্ষণ ধরিয়া চলিল। মিনিট পাঁচেক আলাপ চলিবার পর গৃহিণী সর্পদষ্টার মত চমকাইয়া উঠিলেন, অ্যাঁ, বল কি ! তাই তো বলি, আমার চোখকে যে ফাঁকি দেয় তেমন মানুষ তো ভূভারতে আজও দেখি নি।

বলিতে বলিতে বিদ্যুদ্বেগে এ-পাশে সরিয়া আসিয়া তন্দ্রাভিভূত স্বামীকে একটি ঠেলা দিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, শুনছ ? ওঠ।

—উঠব, কোথায় ? সে বেচারীর স্বর তন্দ্রাভঙ্গজনিত অপ্রসন্নতায় ঈষৎ উচ্চ।

—চুলোয়। পরের স্টেশনে যদি এখান থেকে না নেমে যাই তো কি বলেছি ! যত অনাচার বয়ে একসঙ্গে চলতে হবে নাকি !

—নামবে তো এলাহাবাদে।

—না, না, কামরা বদলাও।

—দেখলে তো ওদিকের ইণ্টার ক্লাস বোঝাই।

—কেন থার্ড কেলাস তো রয়েছে কত। আমি বাপু এত অনাচারের সঙ্গে আর এক দণ্ডও যেতে পারব না। আবার হাঁ করে তাকায়! শোন। কর্ণে কথোপকথনছলে অনাচারের তথ্যটি তিনি প্রকাশ করিলেন—যার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে ছিলে এতক্ষণ—ওরা বিয়ে-করা নয়। নিয়ে পালাচ্ছে।

—বল কি ! প্রচণ্ড বিস্ময়ে স্বামী সেই নিষিদ্ধ দিকেই দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন।

মেজারোডে গাড়ী আসিতেই ইহাদের নামিবার ধুম পড়িয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে সব কিছু ওলোটপালোট করিয়া, ছেলে কাঁদাইয়া, কুলি ও কর্ত্তাকে ধমকাইয়া, হাতে কাঁধে ও কোলে অচল ও সচল পুঁটুলি লইয়া গৃহিণী নামিয়া গেলেন এবং নামিয়াই জানালা দিয়া একটা অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ ওই হাস্যমুখী তরুণীর পানে নিক্ষেপ করিয়া বেশ একটু উচ্চ কণ্ঠেই মন্তব্য করিলেন, মরণ।

মরণ যাহারই হউক, কামরাস্থ সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

তরুণও হাসিতে হাসিতে বলিল, কেন বললে মিথ্যে কথা ?

—বলব না ! না হ'লে কর্ত্তা বেচারির দশা কি হ'ত বল দেখি ! আচ্ছা, বয়স হ'লে আমরাও অমনি হব তো ? এক পাল ছেলে মেয়ে, পুন্যি সঞ্চয়ের নেশা, কথায় কথায় রাগ, হিংসা, তোমার উপর সন্দেহ—বল না ?

—হ'তেও পারি।

—ইস্। তার আগে আমাদের যেন মরণ হয়।

আমার মনে একটু দার্শনিকতা জাগিল। কাল বড় নিষ্ঠুর। কাহার চিতাশয্যায় কিসের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত অলক্ষিতে সে করে—সে-কথা সে জানাইয়া করে না অথবা সে-জিনিসের প্রতিষ্ঠা হইলেই বিবেকবুদ্ধি আমাদের আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রথম-জীবনের ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটিলেই কি উত্তর-জীবনের সন্দেহের আগুন সেই চিতাগ্নি হইতে ধূমে বাষ্পে অমনই অলক্ষিতে আত্মপ্রকাশ করিবে !

এবার সত্যই তন্দ্রা আসিতেছিল। এলাহাবাদ না আসিলে চক্ষু চাহিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া চক্ষু বুজিলাম।

দিল্লী এক্সপ্রেস নির্ব্বিকার চিত্তে চলিতে লাগিল।

উর্ব্বশী

শ্রীনীলিমা মিত্র

১

জীবনে কত লোক আসে যায়, কিন্তু সবাইকে মনে থাকে না, মনে রাখিবার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু জীবনের এই প্রত্যহ পথ-চলার মাঝে এমন এক-এক জন আসে, যাহার সহিত বহুদিনের পরিচয়ের দরকার হয় না, একটি দৃষ্টিপাতেই হৃদয়ের নিভৃতে শূন্য আসনটি সে অনায়াসে অধিকার করিয়া বসে।

তাপস যেদিন কোথা হইতে বদলি হইয়া আমাদের আপিসে আসিল, যেদিন তাহাকে সেই প্রত্যহ-পরিচিত লোকের ভিড় হইতে চিনিয়া লইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না, তাহারও না, আমারও না। প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে আমরা ছুটির পর গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পরস্পরের সঙ্গী হইতে লাগিলাম। তাপসের বাসা শহরের এক প্রান্তে, আমার অপর প্রান্তে। কত দিন বাড়ী ফিরিবার পথে তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া আমার অবলম্বনহীন জীবনের একমাত্র সঙ্গী, পিতার আমলের ভৃত্য এবং আমার একাধারে বন্ধু, পাচক, ভৃত্য ও গৃহিণী সুরদাসের হাতের প্রস্তুত চা পান করাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক দিন তাপস জিদ ধরিয়া বসিল তাহার বাসায় গিয়া চা-পান করিতে হইবে, নতুবা তাহার সহিত সকল সম্বন্ধের এখানেই শেষ। অগত্যা আমার প্রাত্যহিক নেশা খেলা বাদ দিয়াও তাহার সহিত যাইতে হইল। গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া তাপস ডাকিল, "উর্ব্বশী!" ভিতর হইতে অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব আসিল, "যাই।" মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম, আমার জন্য ত কোনও নারী এমন উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করে না!

দরজা খোলার শব্দে চকিত হইয়া সম্মুখে চাহিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম—কে ইহার নাম উর্ব্বশী রাখিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু আমার মনে হইল উর্ব্বশী কি এত সুন্দর ছিলেন! আমি চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না, সসম্ভ্রমে আমার দৃষ্টি আপনিই নত হইয়া পড়িল। তাপস আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলে উর্ব্বশীর আহ্বানে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমাকে একটি কক্ষে বসাইয়া তাহারা কক্ষান্তরে গমন করিল। আমি একাকী বসিয়া রহিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাপস আপিসের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আসিল। আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া প্রশ্ন করিল, "কার ধ্যান করছ হে?" আমি দুষ্টামি করিয়া কহিলাম, "তোমারই উর্ব্বশীর, বাস্তবিক স্ত্রী-ভাগ্যে তুমি ভাগ্যবান্।" তাপস সহাস্যে আমার এই অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া, বিবাহিত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের নানা রূপ নজীর তুলিয়া আমাকে লোভ দেখাইতে লাগিল। আমি আমার মুক্ত জীবনের রস বর্ণনা করিয়া তাহার কর্ণে কিঞ্চিৎ পরিবেষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় একটি ছোট ট্রেতে করিয়া দুই প্লেট জলখাবার ও দুই পেয়ালা চা লইয়া উর্ব্বশী প্রবেশ করিল।

চা ও জলযোগ করিতে করিতে তিন জনে নানারূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। ফিরিবার পথে এই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল উর্ব্বশী কেবল রূপেই নয়, ব্যক্তিত্বেও যে-কোন রমণীর ঈর্ষার পাত্রী।

২

মাস কয়েক পরের কথা। ইতিমধ্যে তাপসের গৃহে আরও কয়েক বার গিয়াছি। তাহাদের অনুরোধে উর্ব্বশীকে নাম ধরিয়াই ডাকি, সে আমাকে দাদা বলে। সেদিন বিকালে আপিসের ছুটির পর দু-জনে পথে বাহির হইয়াছি। রাস্তায় ভিড়ের অন্ত নাই। কর্ম্মাবসানে গৃহাভিমুখী যাত্রীদল লইয়া বাস, গাড়ী অনবরত ছুটিয়া চলিয়াছে। অকস্মাৎ একখানি মোটর আসিয়া একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর পড়িল। আমি মুহূর্ত্তে সরিয়া

গেলাম। কিন্তু তাপস যেমনই সরিতে যাইবে, অমনি হোঁচট খাইয়া একেবারে রাস্তার উপর উপুড় হইয়া পড়িল —গাড়ীর চালক গতিরোধ করিতে পারিল না, গাড়ীখানা একেবারে তাপসের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল! আমার চোখের সম্মুখে যেন নীল আকাশ হইতে বজ্র খসিয়া পড়িল! আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তাপসকে বাঁচাইতে হইবে। একখানি চলন্ত ট্যাক্সিকে থামাইয়া এক জন পথিক যুবকের সাহায্যে তাপসের রক্তাক্ত দেহ-খানি তাহার ভিতর শোয়াইয়া দিলাম। ততক্ষণে রাস্তায় ভিড় জমিয়া গিয়াছে, পুলিস আসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে। অতিকষ্টে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার হইয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পুরস্কারের লোভে ট্যাক্সিচালক অল্প-ক্ষণের মধ্যেই গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া দিল।

তাপসকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তাররা যখন বলিলেন তাহার জীবনের আশা নাই, তখন আমি যেন অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। উর্ব্বশীকে একটা খবর দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহার গৃহ এখান হইতে দুই মাইলেরও বেশী দূর। তাহার নিকট যদি যাই, এই মুমূর্ষু রোগীকে কিসের ভরসায় কাহার নিকট রাখিয়া যাইব? নিরুপায় হইয়া ডাক্তারের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। ডাক্তারটি লোক ভাল। হাসপাতালের এক জন লোক মারফৎ সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার হাতে দুই ছত্র লিখিয়া দিলাম—"উর্ব্বশী, তাপস মোটর-দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক আহত, শীঘ্র এস। দাদা।"

পত্রবাহক চলিয়া গেলে তাপসের শিয়রে একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "তাপস যদি না বাঁচে, উর্ব্বশীর কি হইবে? তাপসের কাছে শুনিয়াছিলাম উর্ব্বশীকে বিবাহ করিয়া সে আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হইয়াছিল। তাঁহারা কি এই দুঃসময়েও তাহাকে আশ্রয় দিবেন না? এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি, এমন সময় তাপস চোখ মেলিয়া চাহিল। সে যেন কিছু বলিতে চাহিল, কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফুটিল না দেখিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিলাম। তিনি আসিয়া তাপসের মুখে কি একটা ওষুধ ঢালিয়া দিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমার একখানি হাত ধরিয়া সে অস্ফুট অনুনয়ভরা কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, "অপূর্ব্ব আমি চললুম ভাই, ওকে তোর হাতে দিয়ে যাচ্ছি, জানি তোর কাছে তার অসম্মান হবে না।" সে ক্লান্ত হইয়া থামিল, তার পর কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলিল, "বল্, তাকে দেখবি? তুই 'না' বললে যে আমি মরতেও পারব না অপূর্ব্ব।" তাপস শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষুর প্রান্ত বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। অশ্রুতে আমার কণ্ঠ বুজিয়া আসিল, আমি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রাণপণ শক্তিতে বলিলাম, "আমি তার সব ভার নিলাম তাপস, আজ থেকে উর্ব্বশী আমার ছোট বোন।" তাপসের উদ্বেগকাতর মুখ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে গভীর শান্তিতে চোখ দুটি বন্ধ করিল। ডাক্তার বিষণ্ন অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "শেষ হয়ে এল।"

কিছুক্ষণ বাদে যখন উর্ব্বশীর ট্যাক্সি আসিয়া হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

৩

সংবাদটা শুনিয়া উর্ব্বশী প্রথমটা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কোন রূপ অস্থিরতা প্রকাশ করে নাই। প্রবীণ ডাক্তার দেখিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার চিকিৎসক-জীবনে এরূপ ধৈর্য্য তিনি দেখেন নাই। উর্ব্বশীকে তাহার বাসায় পৌছাইয়া দিয়া সুরদাসকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখিয়া হাসপাতালে ফিরিয়া গেলাম। এই শীতের রাত্রে শ্মশান-যাত্রার সঙ্গী কোথায় পাইব ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলাম।

৪

তাপসের শেষকৃত্য সমাপন করিয়া যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্ব-দিনের পরিশ্রমে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন দেওয়ালের ঘড়িটায় সশব্দে দশটা বাজিতেছে। চমকিয়া উঠিলাম;

মনে পড়িল আপিস যাইতে হইবে। ক্রমশঃ এক-এক করিয়া গতরাত্রির কথা মনে পড়িল। আজ আপিসের পর তাপস আমার সহগামী হইবে না। বুকটায় এক অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করিলাম। এমন দুঃখের রাত্রিরও প্রভাত হয় কেন? চুপ করিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম উর্ব্বশীর কি করিব? তাপস তাহাকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে রূপসী, যুবতী। তাহার সহিত এক গৃহে বাস করা লোকচক্ষে শোভন হইবে না। কিন্তু ভিন্ন গৃহে রাখিলে কে তাহার দেখাশুনা করিবে? আমার অর্থের অভাব ছিল না, মনে মনে স্থির করিলাম তাহাকে তাহার কোনও আত্মীয়ের গৃহে রাখিয়া দিব। মাসিক খরচ দিলে হয়ত তাঁহাদের ইহাতে আপত্তি না হইতে পারে। আপন মনে এই সকল চিন্তা করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিয়া আপিসে অসুস্থতার অজুহাতে সেদিনের জন্য ছুটি প্রার্থনা করিয়া একখানি দরখাস্ত লিখিলাম এবং উহা লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া উর্ব্বশীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

৫

উর্ব্বশী আমাকে দেখিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সদ্য-বিধবাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে তাহাকে কেবলমাত্র বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া ভুলাইতে কোথায় যেন বাধিল। উর্ব্বশী বোধ করি আমার অবস্থা অনুমান করিতে পারিয়াছিল—কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চোখে জল আসিল। তাহার দীর্ঘপক্ষ্ম আয়ত চোখদুটির কোলে কালি পড়িয়াছে, গণ্ডের রক্তিমাভা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার অত্যধিক সাদা মুখ দেখিয়া মমির কথা মনে পড়িল। কিন্তু তথাপি মনে হইল এই সৌন্দর্য্যের বুঝি তুলনা নাই।

উর্ব্বশীই প্রথমে কথা কহিল। দেখিলাম এত দুঃখের ভিতরও নিজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে সে সবই ভাবিয়াছে—কিন্তু কোনই উপায় করিতে পারে নাই। আমার প্রস্তাব শুনিয়া সে জানাইল, অর্থের জন্য তাহার চিন্তা নাই—এক জন বিধবার খরচ তাহার গহনা ও সঞ্চিত সামান্য অর্থেই চলিয়া যাইবে। প্রয়োজনমত একটা শিক্ষয়িত্রীর কাজও সে করিতে পারে। কিন্তু এই বিশ্ব-সংসারে তাহার আপনার বলিতে যে কেহই রহিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কহিলাম, "আমি তো আছি উর্ব্বশী, আমার হাতেই যে সে তোমাকে দিয়ে গেছে। তুমিও কি তার মত বিশ্বাস ক'রে নিজেকে আমার হাতে তুলে দিতে পারবে না?" উর্ব্বশী যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইল, সাগ্রহে কহিল, "দাদা, আমি জানি তোমার দ্বারা কখনও কোনও ক্ষতিই আমার হ'তে পারে না, আমি শুধু ভাবছিলাম, তোমার মুক্ত জীবন-পথে আমি শুধু বিড়ম্বনা হয়ে থাকব।" এই সম্বন্ধে তাহার সহিত আলোচনা করিয়া স্থির হইল,—আমি যেরূপ ভিন্ন বাসায় আছি সেইরূপই থাকিব, সুরদাস তাহার নিকট থাকিবে,—প্রয়োজনমত আমি দেখা করিয়া যাইব। এই প্রস্তাবে সুরদাস প্রথমে রাজী হয় নাই, বলিয়াছিল আমাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু যখন তাহাকে আমার অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম এবং আরও জানাইলাম সে প্রত্যহই আমায় দেখিতে পাইবে, তখন সে সম্মত হইল। এইরূপ স্থির হওয়ায় আমার বুক হইতে যেন একটি গুরুভার নামিয়া গেল। উর্ব্বশী কখন উঠিয়া গিয়াছিল। আমার জলযোগ এখনও হয় নাই জানিয়া সে পাচকের মারফৎ কিছু খাবার লইয়া ফিরিয়া আসিল। অন্য দিন সে নিজেই খাবার লইয়া আসে, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া বুঝিলাম এখন তাহার হাতে খাইতে নাই তাই এই ব্যবস্থা। তাহার এই স্পর্শদোষ-বিচার দেখিয়া বড়ই রাগ হইল। এক বার মনে হইল প্রতিবাদ করি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল তাহার অন্তরের যে ক্ষত প্রসঙ্গান্তরে ক্ষণেকের জন্য চাপা পড়িয়াছে, পুনরায় তাহার অবতারণা করা উচিত হইবে না।

অতিকষ্টে কিছু মুখে দিয়া সে-বেলার মত উঠিয়া পড়িলাম। উর্ব্বশীকে বার-বার আহারের জন্য অনুরোধ করিয়া, সুরদাসের উপর তাহাকে আহার করাইবার ভার দিয়া, বিকালে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইলাম।

৬

মাস দুই পরের কথা। তাপসের শ্রাদ্ধ নিরাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উর্ব্বশীর শোকাবেগও কিছু শান্ত হইয়াছে। আমি প্রতিদিন বিকালে তাহাকে দেখিয়া আসিতাম, অনেকদিন তাহার অনুরোধে বৈকালিক জলযোগ বা রাত্রির আহার তাহারই ওখানে সমাপন করিতে হইত। এইরূপে আমরা পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছিলাম। প্রথম প্রথম তাহার নিকট প্রত্যহ যাইতে সে সঙ্কোচ হইত এখন তাহা কাটিয়া গিয়াছে, উপরন্তু তাহার স্নেহ-যত্ন সর্ব্বদা আমাকে তাহার প্রতি আকর্ষণ করিত। আগে জামার বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে নিজেই লাগাইতাম, এখন জামাটা উর্ব্বশীর কাছে ফেলিয়া দিয়া আসি। এমনই ছোটখাট কাজের ভিতর দিয়া সে কখন আমার নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সকাল হইতে ভাবি কখন বিকাল হইবে। এখন সুরদাসও নাই, নূতন পাচকের সহিত পয়সার সম্বন্ধ, সে তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া চলিয়া যায়, কাছে বসিয়া অনুরোধ করিয়া বেশী খাওয়ায় না—কম খাইলে অনুযোগ করে না। বিকালে উর্ব্বশী এই অভাবটি সুদে-আসলে পূর্ণ করিয়া দেয়। তাহাকে এত কাছে পাইয়া এক-এক দিন আমার অন্তরের সুপ্ত যৌবন মাথা তুলিয়া উঠিত। কিন্তু সে এত অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে আমার কাঁছে আসিয়া দাঁড়াইত যে আমি নিজের মনেই লজ্জায় মরিয়া যাইতাম। এমনই করিয়া তাহার অতিবিশ্বাস আমাকে অন্যায়ের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিত।

৭

কয় দিন হইতেই সর্দ্দি-কাসিতে কষ্ট পাইতেছিলাম। সে দিন আপিস হইতেই মাথাটা দপ্ দপ্ করিতেছিল, যখন বাসায় ফিরিলাম তখন বেশ জ্বর আসিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। বুঝিলাম ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছি; দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। কম্বল মুড়ি দিয়া বিছানার আশ্রয় লইলাম। কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে জানি না—পাচকের আহ্বানে নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে আহার প্রস্তুত করিয়া ডাকিতে আসিয়াছে। অসুস্থতার কথা জানাইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। একা একা মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে কেবলই উর্ব্বশীকে মনে পড়িতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে সুরদাস আসিল। পূর্ব্বদিনে আমি না যাওয়ায় উর্ব্বশী ও সে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আমার অনুপস্থিতির কারণ জানিয়া সুরদাস অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে আমার নিষেধ না মানিয়া উর্ব্বশীকে সংবাদ দিয়া ছুটি লইয়া আসিতে গেল। কখন সে ফিরিয়া আসিয়াছে জানিতে পারি নাই। একটি অতি কোমল হস্তের সযত্ন স্পর্শে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম উর্ব্বশী আমার ললাটে হস্তস্পর্শ দ্বারা উত্তাপ অনুমানের চেষ্টা করিতেছে। ইহার পূর্ব্বে উর্ব্বশী কখনও আমার বাসায় আসে নাই। কতখানি উদ্বেগ যে আজ তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে অনুমান করিয়া অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব পুলক অনুভব করিলাম। উর্ব্বশী ও সুরদাস পালা করিয়া আমার সেবা করিতে লাগিল। রাত্রে উর্ব্বশীকে বাড়ী যাইতে বলিলাম, মনে ইচ্ছা না থাকিলেও লোকলজ্জা ও ভদ্রতার খাতিরে জিদ করিলাম। কিন্তু সে কোনও ওজর-আপত্তি মানিল না। বলিল "তুমি তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না দাদা, তোমার বাড়ীতে জোর করে থাকবার অধিকার ত আমার আছে।" রাত্রে বাড়ী পাহারা দিবার জন্য আমার ভৃত্যটি তাহার গৃহে শয়ন করিল।

৮

উর্ব্বশীর একান্ত সেবা-যত্নে আমি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি। বৃদ্ধ সুরদাসকে সে বেশী কিছু করিতে দিত না। সুরদাস ডাক্তারকে খবর দিত, ঔষধ আনিত, উর্ব্বশীর স্নানাহারের সময় আমার নিকট বসিত। ইহা ভিন্ন উর্ব্বশীই অক্লান্ত-ভাবে সব করিত। প্রথম প্রথম সুরদাস উর্ব্বশীর সহিত আমার অতিরিক্ত মেলামেশা তেমন পছন্দ করিত না, কিন্তু আমার অসুখের পর হইতে তাহার মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এখন সে উর্ব্বশীকে আমার চেয়েও বেশী ভক্তি করে, ভালবাসে। উর্ব্বশীর সেবা-পরায়ণতা, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রভৃতি বলিতে বলিতে সে পঞ্চমুখ হইয়া উঠে।

সেদিন দুপুরে আমি ইজি চেয়ারে শুইয়া আছি। মাথার উপর বর্ষাশেষের সুনীল আকাশ রৌদ্রে ঝলমল্ করিতেছে।

একটা নাম-না-জানা পাখী অদ্ভুত একটা শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। চুপ করিয়া শুইয়া উর্ব্বশীর কথাই ভাবিতেছিলাম। কি আশ্চর্য্য এই মেয়েটি! ইহাকে আলেয়ার মত শুধু দৃষ্টি দিয়া উপভোগ করা চলে, কিন্তু আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমাকে ভাল করিবার জন্য ইহার প্রাণপণ চেষ্টার কথা মনে পড়িল—সেবা-যত্নের কোথাও কোনও খুঁত নাই, আন্তরিকতার অভাব নাই কিন্তু তবু কোথাও যেন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলে—যাহাকে অতিক্রম না করিতে পারিলে তাহাকে সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না, অথচ জোর করিয়া ভাঙিবার বাধা এ নয়। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছি। অন্তরের এই উন্মত্ততাকে যুক্তিতর্ক দিয়া কতদিন ঠেকাইয়া রাখিব? দিনে যাহাকে কোনক্রমেই পাই না, রাত্রে স্বপ্নে তাহাকে উপভোগ করি। আমি সুস্থ হইবার পর সর্ব্বদাই ভয় হয় এইবার সে কোন দিন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব করিবে, সে চলিয়া গেলে কেমন করিয়া বাস করিব ভাবিতেও পারি না—অথচ কিসের জোরে তাহাকে ধরিয়া রাখিব?

এমন সময় একটা প্লেটে করিয়া ছাড়ান বেদানা লইয়া উর্ব্বশী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এ-কথা সে-কথার পর সে কহিল, "দাদা, কাল আমি বাড়ী যাব।"

আমার কানে যেন কোন নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রবেশ করিল। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় মুহূর্ত্তের জন্য অসাড় হইয়া গেল। কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে বিদ্রোহের মুখে যুক্তিতর্ক কোথায় ভাসিয়া গেল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, "এত সহজেই সে এই কথাটা কেমন করিয়া উচ্চারণ করিল? সে আমার জন্য অনেক করিয়াছে বটে, কিন্তু আমিও কি তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে কিছুই দিই নাই? আমার অন্তরের সব কিছু যে তাহারই পায়ে উজাড় করিয়া দিয়াছি।"

তাহার একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলাম, "উর্ব্বশী।" উর্ব্বশী নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না—আমার নিকটে সরিয়া আসিয়া একখানি হাত আমার মাথায় রাখিয়া অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে কহিল, "দাদা"। তাহার বুদ্ধির জন্য তাহাকে বরাবরই শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু সে যে এত বুদ্ধিমতী তাহা জানিতাম না। তাহার মুখের এই একটি মাত্র কথায় মন্ত্রের মত কাজ হইল। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাতরভাবে কহিলাম, "তুমি আমায় ক্ষমা কর উর্ব্বশী। বল বল, ক্ষমা করেছ?" সে সহজ কণ্ঠে কহিল, "আমি যে তোমার ছোট বোন দাদা, আমি কি তোমায় ক্ষমা করতে পারি?" একটুকু থামিয়া পুনরায় কহিল, "কিন্তু তবু বলছি তোমায় আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছি।" পদশব্দে বুঝিতে পারিলাম সে চলিয়া গেল। হয়ত আমাকে একলা থাকিয়া সহজ হইবার সুযোগ দিয়া গেল।

৯

উর্ব্বশী চলিয়া গিয়াছে। আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। অন্তর-বাহিরের এই নিয়ত দ্বন্দ্বে আমি নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। সেদিনকার সেই ঘটনার পর হইতে উর্ব্বশীর কাছে যাইতে ভয় করে। কিন্তু না গিয়াও থাকিতে পারি না। বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া অজ্ঞাতসারে তাহার গৃহাভিমুখে চলিতে থাকি—তাহার দ্বারসম্মুখে উপস্থিত হইলে চেতনা হয়, কিন্তু তখন আর ফিরিতে পারি না! কিন্তু এমন করিয়া দিন কাটে না। ভয় হয় তাহাকে আবার কোন দিন অপমান করিয়া বসিব। তাহার কোনও ক্ষতি করা আমার সাধ্য নয় তাহা নিশ্চয় জানি। কিন্তু উর্ব্বশীকে হারানোর চেয়ে তাহার শ্রদ্ধা হারানো যে আরও কষ্টকর। কিন্তু কি করিব? কোনও দূরদেশে পলাইয়া যাইব? আবার মনে পড়ে, তাপস যে তাহাকে আমারই হাতে দিয়া গিয়াছে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া উর্ব্বশীর নামে আমার সর্ব্বস্ব দান করিয়া একখানি উইল লিখিলাম। আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাহার আছে, সুরদাসও রহিল। কিন্তু অর্থাভাবে তাহাকে কোনও দিন কষ্টে পড়িতে না হয়। উইলখানির সঙ্গে একখানি ছোট চিঠি লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিলাম। তাহার পর একটা স্যুটকেসে আবশ্যক বস্ত্রাদি লইয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম। নিজের

জন্য ভাবিবার কিছু ছিল না। পুরুষমানুষ, শরীরে শক্তি আছে, একেবারে মূর্খও নই, একটা মানুষের খরচ চালাইয়া লইতে পারিব।

*　　*　　*

তাহাকে লিখিয়াছিলাম, "উর্ব্বশী, তোমাকে বড় ভালবেসেছিলুম, আর সেই ভালবাসাই আজ আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাপস তোমার ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছিল। তোমার স্বর্গত স্বামীর অন্তিম আদেশ এবং তোমার দাদার একমাত্র ও শেষ অনুরোধ রেখে এই সঙ্গে যে উইলখানা পাঠালুম তা গ্রহণ ক'রো। সুরদাসকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, তাই তার সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই আমার নেই। আমার জন্য ভেব না। আমি কোথায় যাচ্ছি জানি না, কিন্তু যত দূরেই থাকি—এক বার শেষ দেখা করতে আসব। আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি তোমার জীবন সার্থক হোক। দাদা।"

শিলঙে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ের পথ বেয়ে
আকাশে নীলের ঢেউ,
কুটীরে শিশুরা খেলে,
পাহাড়ী ঝাউয়ের বন

চলেছে উন্মুখ্য নদী
সুদূরে রঙের ঢেউ,
ফুলদল আঁখি মেলে,
শোঁও শোঁও শন্ শন্

পাথরে পাথরে খেলা ক'রে,
দু-চোখ স্বপনে যায় ভ'রে।
ছেড়ে যাই সুদূরের পানে,
আকাশ ভরিয়া দেয় গানে।

উঠেছি মেঘের দেশে
হেথায় স্নিগ্ধ বায়ু,
ওদিকে পাহাড় হ'তে
আমরা নামিয়া চলি,

বুঝি বা পৃথিবী-শেষে
হেথায় কোমল ছায়া,
ভীষণ তীব্র স্রোতে
জলের সে মায়াবিনী

আসিয়াছি স্বরগের তীর,
পদতলে কায়া ধরণীর।
নেমে আসে জলপ্রপাত,
মৃত্যু ভুলায়ে তোলে হাত।

আমরা নামিয়া চলি,
মায়াবিনী ডাকে "আয়",
আমরা বিপদ ভুলি,
আঁকড়ি গুল্মদল

খাড়া পাথরের পথ,
হাতছানি পায় পায়,
তার পানে আঁখি তুলি,
চলি পুনঃ চঞ্চল,

দুই ধারে অতল পাতাল,
রূপে করে মরণ-মাতাল।
পদতলে সরিছে পাথর
মন চলে, শরীর কাতর।

বুঝি বা পারি না আর
এমন সোপান নাই
"ফিরিলাম, মায়াবিনী,"—
রূপালি আঁচল তার

পাথরে ক্ষুরের ধার,
পা রাখিব যার ঠাঁই,
আবার উঠিয়া আসি,—
জল্‌জল্ জলে রোদে,

খাড়া হয়ে নেমেছে পাষাণ,
নীচে কাঁপে মৃত্যু-নিশান।
ভ্রূকুটি হানিয়া বুঝি চায়
কালো পথে পাহাড়ে লুটায়।

আবার ফিরিয়া চলি,
তরুর সবুজ হাসি,
কুটীরে শিশুর খেলা,
জলধারা যাদুকরী

উঁচুনীচু কত পথ,
আকাশে নীলের রাশি,
উঠানে ফুলের মেলা,
বিদ্যুতে দিঠি ভরি

দূরে দূরে রঙীন কুটীর,
পদতলে উন্মুখ্য অধীর।
আঁখি-আগে জাগে লোকালয়
করিয়াছে আজি মন জয়।



ল্যাপল্যাণ্ডের কুটীরের অনুসরণে নির্ম্মিত কিরুনার গীর্জ্জা

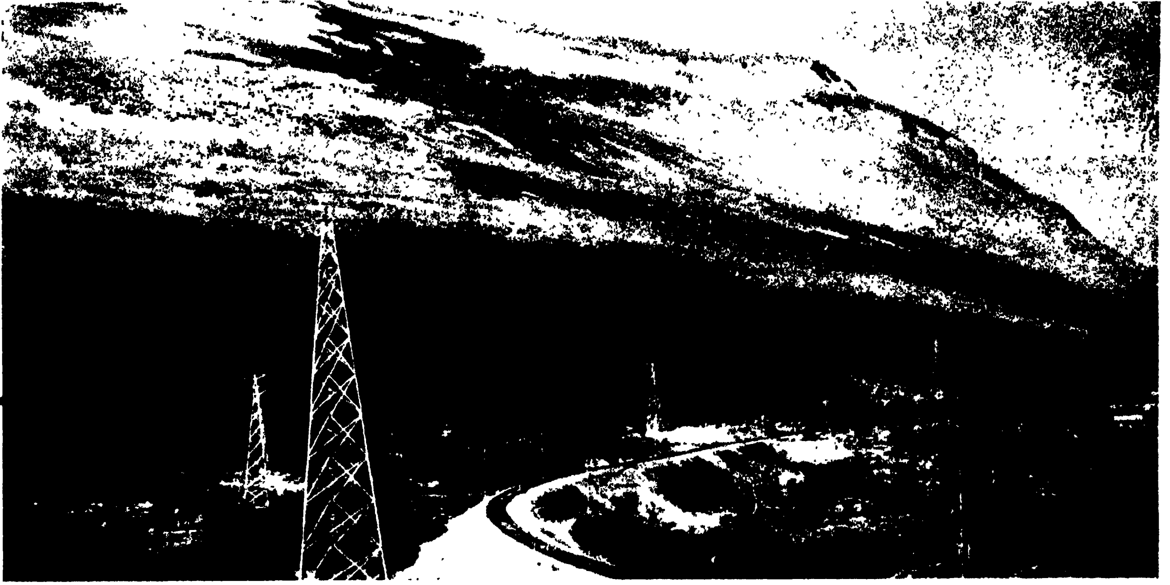
ল্যাপল্যাণ্ড

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রথম বার ল্যাপল্যাণ্ড গিয়াছিলাম ১৯২৯ সালে। ১৯৩৩ সালে পুনরায় তিন বার ল্যাপল্যাণ্ড যাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রথম যাত্রায় নবেম্বর মাসে সুইডেনের প্রধান শহর স্টকহলম্‌ হইতে বোদেন যাই। বোদেন একটি প্রাচীন দুর্গবেষ্টিত সামরিক শহর; দেশের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে বোথনিয়ান উপসাগরের উত্তর-কূলের অনতিদূরে অবস্থিত। স্টকহলম্‌ হইতে মেল-গাড়ীতে সেখানে পৌছিতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগে। পথে গলিত বরফের বৃষ্টি ও ঘন কুয়াশা প্রকৃতির উপর যেন যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল, দেশের এই উত্তরাঞ্চলের মনোরম দৃশ্য কিছুই চোখে পড়ে নাই।

বোদেন একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র। দুইটি বিরাট্‌ কূর্ম্মাকৃতি পর্ব্বতের মধ্যে প্রাচীন এক বিরাট্‌ দুর্গ আছে। পূর্ব্বদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য এই দুর্গের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা একটি 'নিষিদ্ধ শহর', অর্থাৎ এখানে আসিতে হইলে সকল বিদেশীকেই সমর-বিভাগের ছাড়পত্র লইয়া আসিতে হয়।

পশ্চিম পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ ঢালু হইয়া, অনেক নদনদী বক্ষে ধারণ করিয়া, বোথনিয়ান উপসাগরে মিলিত হইয়াছে। পার্ব্বত্য নদীগুলি উপকূলভাগের ভূমিকে স্থানে স্থানে উর্ব্বর করিয়াছে। এই শীতকঠিন স্থানে গ্রীষ্ম-কালটা দীর্ঘ না হইলেও রৌদ্রালোকের প্রাচুর্য্য হেতু বিশেষ বিশেষ ফসল চাষের পক্ষে অনুকূল। দেশের এই দিক্‌টায় জলাভূমি ও তরাইয়ের সংখ্যা অনেক। কিন্তু শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া এখানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন। এই উত্তর-প্রান্ত-প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ইহার বৃহৎ অরণ্যানী। বন-বিভাগের ও কাঠের কারখানার কাজ করিয়া এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের জীবিকার সংস্থান হয়। কৃষি ইহাদের উপরি-ব্যবসার মত। শীতের সময় গাছ কাটা, গাছ চালান দেওয়া ইত্যাদি কাজ; আর ক্ষণ-



ল্যাপল্যাণ্ডের টুরিষ্ট ষ্টেশন হইতে পর্ব্বতের দৃশ্য

স্থায়ী গ্রীষ্মকালে ক্ষেত-খামারের কাজ চলে। আরণ্যশিল্প ও খনিজ কর্ম্মে নিয়োজিত লোকদের ছেলেমেয়েদিগকে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তরিতরকারি ও শস্য উৎপাদন এবং গো-রক্ষণ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় ও ফার্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে। পনর হইতে আঠার বৎসর বয়সের চল্লিশটি ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা এই বিদ্যালয়ে আছে।

সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা পর্য্যন্ত শীতকালে ল্যাপল্যাণ্ড যাওয়ার কথা কল্পনা করিতে পারে না। শীতকালে ল্যাপল্যাণ্ডে কোথায় কি ভাবে চলাফেরা করিতে হইবে সে-বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য বোদেনের নিকটবর্ত্তী সুন্দরভি গণ-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলাম। বস্তুতঃ এখান হইতেই ল্যাপল্যাণ্ড সুরু হইয়াছে। লৌহখনির জন্য বিখ্যাত ল্যাপল্যাণ্ডের কিরুনা শহর এখান হইতে প্রায় তিন শত মাইল উত্তরে অবস্থিত।

পরদিন কিরুনা যাইবার গাড়ী ধরিলাম। বৈদ্যুতিক এঞ্জিন-চালিত গাড়ী দ্রুত উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। এ-দেশের গাড়ীগুলি পরিচ্ছন্ন, যাত্রীতে পূর্ণ, কিন্তু টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। চলার পথে কোন স্টেশনে না-পৌঁছান পর্য্যন্ত বসতির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এখানে সেখানে বন, টিলা, পাহাড় ও ছোট-বড় অনেক হ্রদ। গাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ একটা স্টেশনে গাড়ী থামিবা মাত্র যাত্রীদের মধ্যে একটা আলোড়ন অনুভব করিয়া চোখ মেলিয়া দেখি, গাড়ী 'আর্টিক সার্কেল' অর্থাৎ সুমেরুবৃত্ত স্টেশনে পৌঁছিয়াছে। স্টেশন-ঘরটি নাকি ঠিক সুমেরুবৃত্তের উপরেই পড়িয়াছে। গাড়ীতে কয়েক জন দক্ষিণ-ইউরোপের যাত্রী ছিলেন। অনেকেই নামিয়া স্টেশন-গৃহস্থিত পোস্ট-আপিস হইতে কার্ড কিনিয়া খুব সম্ভব পোলার সার্কেল হইতে আত্মীয়-স্বজনকে নমস্কার জানাইয়া স্টেশনেই পোস্ট করিলেন। এক জন যাত্রীর নিকট শুনিলাম সুমেরুবৃত্ত পোস্ট-আপিসের ছাপসমেত কার্ড পাইয়া বাড়ীর লোক খুব খুশী হইবে। গাড়ী চলিতে সুরু করিলে এক জন অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, এখানকার বায়ুর সঙ্গে সার্কেলের দক্ষিণের বায়ুর প্রভেদ অনেক, আমি বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই। তবে মনে মনে এক বার অনুমান করিলাম, দেশ হইতে কত দূরে আসিয়াছি। এক এঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকের সহিত আলাপ

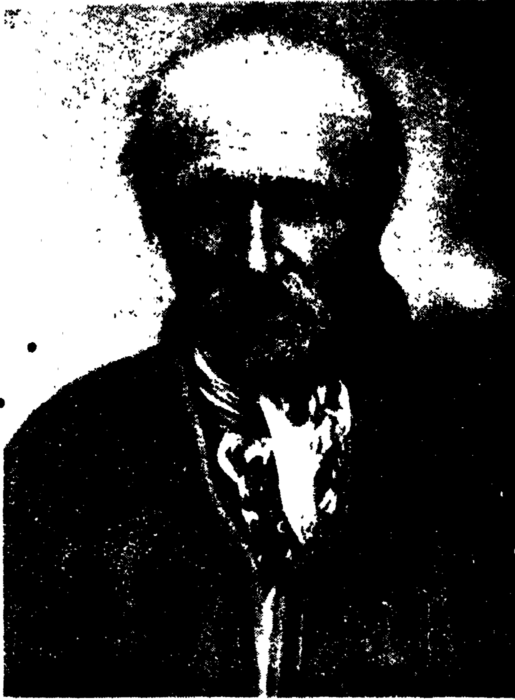


ল্যাপল্যাণ্ডের বল্‌গা হরিণের দল

হয়। পাহাড়-পর্ব্বত সন্ধান করিয়া ভূগর্ভের কোথায় কি গুপ্তধন আছে, তাহার সন্ধান লওয়া ইঁহার পেশা। লোকটি খুব আলাপী। নিজের পেশা সম্পর্কে তিনি বহু বৎসর আফ্রিকায় ছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে এই মরুপ্রান্তে লোহা ছাড়া অন্য ধাতুরও খনি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে এই এলাকায় একটি সোনার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর প্রান্তে ল্যাপ ছাড়া অন্য কেহ বড় বাস করিত না। লৌহগর্ভ বিশাল পর্ব্বতমালা আবিষ্কৃত হওয়ার পর লৌহ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে কিরোনা শহর গড়িয়া উঠে। এখন এখানে প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। বাসিন্দাদের অধিকাংশই খনির কাজে নিযুক্ত। তবে এখানকার মজুরদের সঙ্গে দেশের অন্য স্থানের মজুরদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শিক্ষা ও সভ্যতায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য হেতু এখানকার সমাজ একটু নূতন ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে। যখন লৌহ রপ্তানি ভাল চলে, তখন পুরুষ মাসিক তিন শত হইতে সাত শত ক্রাউন পর্য্যন্ত রোজগার করে। প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক, বাড়ী-ঘর ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থার একটা স্টাণ্ডার্ড আছে। এখানকার বহু শ্রমিকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছি। সকলের বাড়ীতেই আলমারী-ভরা পুস্তক ও লেখাপড়ার সুব্যবস্থা চোখে পড়িয়াছে। ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া বুঝিয়াছি যে, ইহারা সারা দুনিয়ার প্রগতির খবর রাখে। শহরে দৈনিক কাগজ তিনটি; সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজও আছে। তাছাড়া প্রধান শহর স্টকহলমের একটি-না-একটি দৈনিক সকলেই রাখে ও পড়ে। শহরে তিনটি স্কুল। স্কুলের ঘরবাড়ী ও ব্যবস্থা একেবারে আধুনিকতম। শহরটি আধুনিক বলিয়া ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিধিমত গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিরুনায় পৌঁছিয়া দেখি যে বরফে সব একাকার, প্লাটফরমের উপর প্রায় দুই-তিন ফুট আন্দাজ পুরু বরফের আস্তরণ। গাড়ী হইতে নামিয়াই বুঝিলাম শীতের পার্থক্য। আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু ও সুন্দরভি স্কুলের অধ্যক্ষের বন্ধুরা আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী দিনে এক বার দক্ষিণের যাত্রীকে লইয়া কিরুনায় আসে। তাহা দেখিবার জন্য শহরের লোকেরা স্টেশনে আসিয়া জড় হয়। ইহা প্রায় দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া-পরার মত অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।



ল্যাপল্যাণ্ডের কবি যোহান তুরী

কালা আদমীর চেহারা দেখিয়াই বহু লোক আমার চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের চাহনি বন্ধুভাবাপন্ন—তাহারা কেহ কেহ হয়ত আমাকে চিনিত, কারণ চার বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসিয়া কিছু দিন থাকিয়া গিয়াছিলাম। পরিচিত ও অপরিচিত অনেকেই ডান হাতের দস্তানা খুলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। একে ঠাণ্ডা, তার উপর এতগুলি বিশাল হাতে হাণ্ডশেক্ আমার পক্ষে বড় আরামপ্রদ হয় নাই। আমার বন্ধু স হঠাৎ আমাকে এক মুহূর্ত্তে ভীড় হইতে বাহিরে আনিয়া তাঁহার টানা স্লেজ গাড়ীর উপর বসাইয়া দিলেন। আমার অন্য এক বাড়ীতে অতিথি হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। তাঁহার সঙ্গে ছিল একটি শিশু; তাহাকে আমার কোলে বসাইয়া গাড়ী লইয়া একেবারে সোজা নিজের বাড়ীতে। চার বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি ছিলাম তখন তিনি ও তাঁহার স্ত্রী মাত্র দুইটি প্রাণী বাস করিতেন। ইতিমধ্যে বাড়ীতে একটি নূতন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার বয়স প্রায় সাড়ে তিন। বাড়ীতে পৌছিয়াই সে তাহার মাকে জানাইল যে তাহার নূতন বন্ধুকে স্নান করাইতে হইবে। তাহার মতে গাড়ীতে আমার রং কাল হইয়া গিয়াছে। তাহার কথায় বাড়ীতে খুব হাসির রোল উঠিল। একে একে পূর্ব্বপরিচিত অনেক বন্ধু দেখা করিতে আসিলেন।

পরদিন প্রাতে ল্যাপ জাতি সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ আমার এক বন্ধুকে লইয়া কিরুনার দশ মাইল উত্তরে মোটরে ঝুক্কাসারভি গ্রামে যাই। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টায় ঝুক্কাসারভি পৌছি। তখন বরফে সব একাকার। শীত তখন -১২´ ডিগ্রি। স্টকহলমে তখনও +১৫° ডিগ্রি ছিল।

এই গ্রামে ল্যাপ শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় আছে। তাহা ছাড়া অথর্ব্ব ল্যাপ বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য একটি আশ্রয়গৃহ কিরুনার সহৃদয় নাগরিকেরা তৈয়ারী করিয়াছেন।



ল্যাপল্যাণ্ডবাসী।
এরিক্সন গঠিত মূর্ত্তি


ল্যাপ বালকের দল

ঝুক্কাসারভি গ্রামটি তর্ণের তীরে সমতল ভূমির উপর অবস্থিত, চারি দিকে পাহাড়। সকালবেলা এখানে পৌছিয়াই বন্ধুরা এক পূর্ব্বপরিচিতার নিকট হইতে গ্রাম্য গীর্জ্জার চাবি চাহিয়া লইলেন।

ছোট্ট একটি গীর্জ্জা—কাঠের তৈয়ারী। চারি দিকে গাছের বড় বড় ডালের উঁচু বেড়া। ফটকটি ঘরের আকারে কাঠের তৈয়ারী। তোরণের উপরিভাগে একটি ঘণ্টা ঝুলান। ইহা পার হইয়াই ছোট্ট একটি আঙিনা, সমাধিতে পূর্ণ। একটি সমাধির উপর একটি মাত্র পাইন গাছ। সঙ্গিনী আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে গাছটির নাম 'কবা'; ইহার একটি ইতিহাস আছে—কবা নামক এক ল্যাপ যুবক নির্জ্জন পাহাড়ের উপর পাইন গাছের ডালে গলা ঝুলাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। কবাকে এই স্থানে সমাহিত করা হয়। সমাধির উপর গাছটি আপনা হইতেই ঐ বৃক্ষের অনুরূপ হইয়া বড় হইয়াছে। আমি চুপ করিয়া গল্পটি শুনিতেছিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, ল্যাপল্যাণ্ডে বাস করিয়া সভ্য দেশের লোকের উপরও ল্যাপদের মত আদিম পাহাড়ী জাতির ভৌতিক বিশ্বাসের প্রভাব পড়িয়াছে।

দরজা খুলিয়া গীর্জ্জার ভিতরে যাওয়া গেল। সবসুদ্ধ দশ-বারটি বেঞ্চ। এক-একটিতে চার-পাঁচ জন বসিতে পারে। দেওয়ালের কাছে এদিক-ওদিকে স্থানীয় পুরাতন শিল্পবস্তু সংরক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে একটি বাক্স প্রায় আড়াই ফুট লম্বা, ফুটখানেক চওড়া ও ইঞ্চি-দশেক খাড়া একটি কাঠের টুকরায় তৈয়ারী। বাক্সটি খুব পুরনো হইবে। দেওয়ালের উপর ঝুলান একটি কাষ্ঠফলকের উপর আমার চোখ পড়িল। ইহার উপর ল্যাটিন ভাষায় কি লেখা, বন্ধুকে অনুরোধ করা মাত্রই তিনি ইহার অনুবাদ করিলেন—"আমরা তিন জন আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরিয়া গঙ্গার উপর নৌকায় বেড়াইয়াছি; ইউরোপের সকল দেশই দেখিয়াছি; জল- ও স্থল-পথে বহু ভ্রমণ করিয়াছি; পরে এখানে পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি। সন ১৬৮১।" এই কাষ্ঠ-ফলকের নিদর্শন হইতে জানা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতেও এই স্থান সভ্য জগতের নিকট কতই না অপরিচিত ছিল।


ল্যাপদের সঙ্গে লেখক



ল্যাপদের সঙ্গে লেখক

উপরোক্ত পৃথিবী-ভ্রমণকারী ফরাসী যুবকত্রয় এই স্থানটিকে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন!

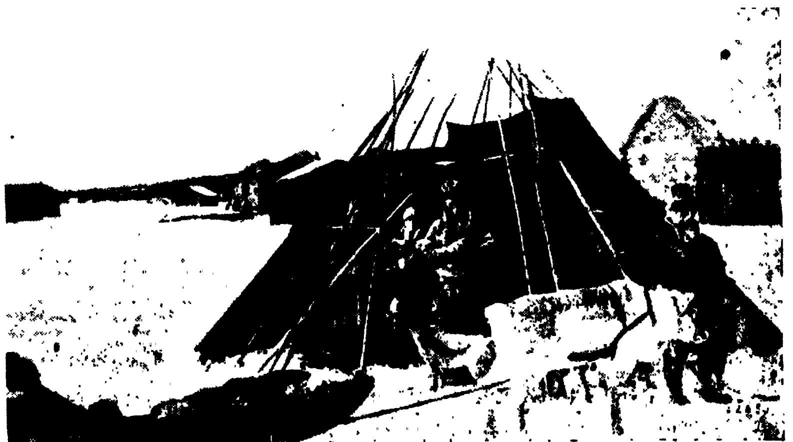
গীর্জ্জাটি খুব বেশী দিনের নহে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাপদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই গীর্জ্জার ভিত্তি-স্থাপন করা হয়। পূর্ব্বে স্থানটি ল্যাপদের প্রাচীন ধর্ম্মানুযায়ী একটি পীঠস্থান ছিল। বর্ত্তমান গীর্জ্জাটি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নির্ম্মিত হয়। ইহা এক বার আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল। তার পর ইহার পূর্ণ সংস্কার হয়।

ফিরিয়া বৃদ্ধার হাতে চাবি দিতেই, তিনি বিদেশীকে সব বিষয় দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তার পর অপাঙ্গে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, গলার স্বর নামাইয়া, বন্ধুকে সকৌতুকে আমার দেশ কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলেন।

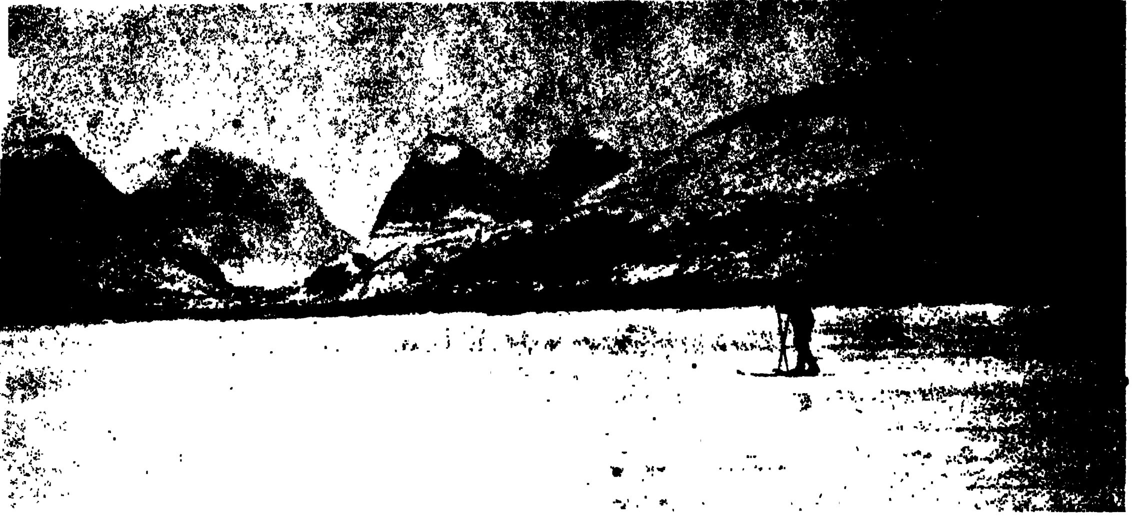
বন্ধু উত্তর দিলেন, 'ইণ্ডিয়ান'। মহিলার ধারণা হইল আমি রেড্-ইণ্ডিয়ান; একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ঘরে পালকের টুপি পরি কিনা। কথাটার মর্ম্ম বুঝিয়া উত্তরটা শান্তভাবে দিতে পারিলাম না, বৃদ্ধা একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কফি পানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গল্প চলিতে লাগিল। বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন আমার বাড়ী প্যারিসের কাছে কিনা। তাঁহার এই প্রশ্নের মর্ম্ম তখনও ঠিক বুঝি নাই। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি বিবাহিত কিনা। তিনি একটি সংবাদপত্রের সাদা অংশ ছিঁড়িয়া নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। তার পর সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন যেন আমি দেশে ফিরিয়া তাঁহাকে একখানা কার্ড লিখি। মহিলার জন্ম এই গ্রামেই এবং এখানেই সারাটা জীবন ল্যাপদের মধ্যে কাটাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, ল্যাপল্যাণ্ডের এই কোণে বাস করিতে কেমন লাগে? উত্তর আসিল, "ল্যাপল্যাণ্ডের মত জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। আমার ছেলে সেদিন কাগজ পড়িয়া বলিল, প্যারিসের কোথায় এক জন আর-এক জনকে খুন করিয়া টাকা-পয়সা লইয়া গিয়াছে। ল্যাপল্যাণ্ডে এরূপ কোথাও হয় না।" বৃদ্ধার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, কেন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমার দেশ প্যারিসের কাছে কিনা। বৃদ্ধা সুরসিক, বিদায় লইবার সময় দুই হাতে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র আবার ল্যাপল্যাণ্ডে আসিও—আমি দেখিয়া শুনিয়া একটি ভাল ল্যাপ-মেয়ের সহিত তোমার বিবাহ দিয়া দিব—এইখানেই ঘর-বাড়ী করিয়া থাকিতে পারিবে।"

সেখান হইতে গ্রামের ল্যাপ স্কুলটি দেখিতে গেলাম। যাযাবর ল্যাপরা শীতের প্রারম্ভে বল্গা হরিণের দল লইয়া



ল্যাপদের তাঁবু



ল্যাপল্যাণ্ড, হ্রদ ও পর্ব্বত

পাহাড়-পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ায়। পড়ুয়া-বয়সের ছেলে-মেয়েদিগকে বিদ্যালয়ে দিয়া যায়। আবার বসন্তের প্রারম্ভে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সন্তানসন্ততি লইয়া গ্রীষ্মাবাসের সুখভোগ করে। যাযাবর ল্যাপদের জীবন-যাত্রাপ্রণালীতে কোন প্রকার বাধা না দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদানের এইরূপ ব্যবস্থা সুইডিশ গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। ল্যাপদিগকে সেই জন্য কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। ল্যাপরা এই ব্যবস্থাকে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। সুইডিশ রাজত্বে যে-সকল ল্যাপ বাস করে তাহাদের শতকরা এক শত জনই এখন লেখাপড়া জানে। এই নীতির ফলে ভবিষ্যতে ল্যাপ সমাজের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, এরূপ আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে। ল্যাপ বিদ্যালয় দেখিয়া অনাথ ল্যাপদের আশ্রয়গৃহ দেখিতে গেলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধ, পঙ্গু, আশ্রয়হীন ল্যাপদের জন্য এই আশ্রম ১৯৩২ সালে কিরুনা মিউনিসিপ্যালিটি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ল্যাপ ভাষায় অভিজ্ঞ এক জন তত্ত্বাবধায়িকা এই গৃহের কর্ত্রী। গৃহটি প্রশস্ত, ইহাতে সতেরটি শয়নকক্ষ আছে। ঘরের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড হল। আশ্রমের পরিচালিকাকে আমাদের আগমনবার্ত্তা কিরোনা হইতেই টেলিফোনযোগে দেওয়া হইয়াছিল; তিনি আমাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া হলের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে ছয় জন অথর্ব্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ইঁহাদের কেহ বা চলিতে অসমর্থ, কেহ বা অন্ধ, সকলের পরণেই স্বদেশীয় রঙীন পোষাক এবং মাথায় টুপি। দুই জন বৃদ্ধা চোখে ভাল দেখিতে পান না, কিন্তু তবুও চিরজীবনের অভ্যাসবশতঃ হরিণের চামড়ার ব্যাগ তৈরি করিতেছিলেন। আমি সকলের সহিত করমর্দ্দন করিলাম, সকলেই খুশী হইলেন। এক জন তাঁহার জামার ভিতর হইতে হরিণের চামড়ার নানা আকারের থলি বাহির করিলেন। তামাক রাখিবার একটি থলি দেড় ক্রাউন দিয়া ক্রয় করিলাম।

এক জনের বয়স ৯৪ বৎসর, একেবারে অথর্ব্ব, এক জায়গায় বসিয়া এবং শুইয়াই তাঁহার দিন কাটে। এক বৃদ্ধার মুখে দেখিলাম পাইপ। আমি তাঁহাকে আমার পাইপের তামাক আগাইয়া দিলাম। তিনি নিজের পাইপে আমার তামাক ভরিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া নীরবে তাঁহার নিজের তামাকের থলিটি আমার সম্মুখে আগাইয়া দিলেন। আমি সামান্য কিছু তামাক লইয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলাম। ল্যাপদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে অসাধারণ ধৈর্য্যের দরকার। তাঁহারা স্বভাবতই স্বল্পভাষী। যাহা বলে তাহাও সাঙ্কেতিক কথা।

একটি কামরায় গিয়া দেখি, এক বৃদ্ধা আধুনিক এক

স্প্রিঙের খাটের উপর শুইয়া, পাশে একটি ছোট টেবিল, তাহার উপর খানকয়েক বই, তাহার মধ্যে একখানি বাইবেল, সাধু সুন্দর সিং-এর জীবনী। আমি জানিতাম সাধু সুন্দরসিং সুইডেন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভক্ত খ্রীষ্টানরা প্রায়ই আমাকে সুন্দর সিং-এর কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। গৃহকর্ত্রীর নিকট শুনিলাম যে সুন্দর সিং-এর জীবনী অনেকে অতি শ্রদ্ধার সহিত পড়েন।

পরবর্ত্তী গ্রীষ্মে আবার ল্যাপল্যাণ্ডে যাই। সেবার ল্যাপল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হইয়া নারভিক্ পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। পথে ইংশো, আবিস্কো, আবিস্কোযক্, পোলনেভিক্কেন নামক স্থানের কতকগুলি ল্যাপ-বসতি দেখিয়া দেখি।

গ্রীষ্মের ল্যাপল্যাণ্ডে অন্ধকারময় শীতঋতুর দৃশ্য স্মরণ করা কঠিন। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা দিবালোকে উজ্জ্বল নির্জ্জন মেরুপ্রান্তে আসিলে মনে হয় যেন কোন অবাস্তব রাজ্যে উপনীত হইয়াছি। কিরুনা হইতে প্রথম ইংশো যাই। ল্যাপ-বসতিটি স্টেশনের কাছেই একটি ছোট হ্রদের তীরে অবস্থিত। হ্রদের উপর কয়েকটি ল্যাপ-নৌকা ছিল। এই নৌকায় চড়িয়া ল্যাপরা হ্রদের জলে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিয়া থাকে। নৌকাগুলি আকৃতিতে অনেকটা পূর্ব্ববঙ্গের পান্সি নৌকার মত; তফাৎ এই যে, আগা ও গলুই প্রায় সমান উঁচু ও অনেক বেশী খাড়া।

ইংশো গ্রামের ল্যাপ ঘরগুলি আধুনিক সরঞ্জামে অর্থাৎ কাঠের তৈয়ারী। সেখানকার ঘরবাড়ীগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, সুইডিস শহরের প্রভাব এখানে কতখানি। এইখানে প্রথম দোচালা কাঠের ল্যাপ-কুটীর দেখি।

ইংশো হইতে গাড়ীতে করিয়া আরও উত্তরে প্রায় ঘণ্টা-চারেকের পথ অতিক্রম করিয়া আবিস্কো যাই। এই স্থান ল্যাপল্যাণ্ডীয় বিশাল পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রায় মধ্য-স্থলে অবস্থিত। স্টেশন হইতে মাইল-তিনেক দূরে প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য হ্রদ তর্ণেত্রস্কের তীরে পর্ব্বতের কোলে অবস্থিত নির্জ্জন অতিথিশালা। ইহারই নাম আবিস্কো-যক। আবাসগৃহের সম্মুখ দিয়া রেল-লাইন হ্রদের তীর ঘেঁষিয়া নার্ভিক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এক দিকে পর্ব্বতপৃষ্ঠ হঠাৎ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। আবাস-গৃহের পিছনে পার্ব্বত্য হ্রদের তর্ণেত্রস্কের জল সূর্য্যের আলোকে বিশাল রৌপ্যখণ্ডের মত ঝলমল করিতেছে। প্রায় ত্রিশ মাইল লম্বা হ্রদটিকে চারি দিকের পর্ব্বতমালা যেন কোলে ধরিয়া আছে। আমাদের আবাসগৃহের দক্ষিণে একটি নদী কঠিন প্রস্তরময় ভূমিতে খাদ কাটিয়া চিরতুষারের উৎস হইতে আসিয়া তর্ণেত্রস্কের জলে মিশিয়াছে।

তর্ণেত্রস্কের পশ্চিম পারে পলনেভিক্কেন নামক স্থানে যাযাবর ল্যাপদের একটি গ্রীষ্মকালীন কলোনি আছে জানিলাম। গৃহকর্ত্তাকে পলনেভিক্কেন দেখার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি তাঁহার নিজের মোটরবোট ও এক জন চালক দিতে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন সেখানে যাওয়া স্থির হইল।

পরদিন কিন্তু বিছানা ছাড়িয়াই দেখা গেল যে প্রকৃতির রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। গাঢ় কুয়াশার আবরণ বাহিরের জগতকে সম্পূর্ণরূপে চোখের আড়াল করিয়া দিয়াছে। আমরা পলনেভিক্কেন দেখার আশা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম; হঠাৎ রোদ উঠিল। সকলেরই কি আনন্দ।

ধীরে ধীরে কুয়াশার আবরণ কাটিয়া গেল। আমরা সাড়ে এগারটায় মোটর-বোটে চড়িলাম। আমাদের নৌকা শান্ত হ্রদের জল কাটিয়া পশ্চিম দিকে চলিল।

কিছু দূর যাইতে না যাইতেই নৌকা হইতে চোখে পড়িল 'ল্যাপ গেট' বা ল্যাপ-দ্বারের দৃশ্য। ইহা উঁচু পর্ব্বতের গায়ে চন্দ্রবিন্দুর আকারের একটি বিশাল গিরিবর্ত্ম। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, কোন্ সুদূর অতীতে তুষারবাহী জলস্রোত এক নদীপথের সৃষ্টি করিয়াছিল—ক্রমে ইহা গিরিবর্ত্মে পরিণত হইয়াছে। শুধু এই ল্যাপ-দ্বারকে দেখিবার জন্য এখানে বহু দূরদেশের লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ল্যাপরা অতি প্রাচীন কাল হইতে এই গিরিবর্ত্মের পথ বাহিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে চলিয়া থাকে। সেজন্য ইহার নাম ল্যাপ-দ্বার।

আমাদের নৌকা পলনেভিক্কেন পৌঁছিলে দেখি তীরের উপর ছোটখাট একটি বাজার বসিয়া গিয়াছে। বলগা হরিণের শিঙের তৈরি খাপওয়ালা ছোটবড় নানা আকারের ছুরি; খাপের উপর অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত হরিণ ও পাহাড়-পর্ব্বতের চিত্র; তাছাড়া লোমশ চামড়ার জিনিস অনেক। আমরা জিনিসপত্রগুলি দেখিতেছি, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আমার ইচ্ছা ছিল কোন এক ল্যাপ তাঁবুতে গিয়া বসি। একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া একটা বড় "কোটা"র (তাঁবুর) সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং পুরু কাপড়ের পরদা টানিয়া তাঁবুর ভিতরে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—অর্থের বিনিময়ে কফি পাওয়া যাইতে পারে কিনা। উত্তর আসিল, হাঁ। তাঁবুর ভিতর প্রৌঢ় এক ল্যাপ ও বার-তের বৎসরের একটি ছেলে। বন্ধুর ইঙ্গিতে তাহার সঙ্গে দরজার পাশে এক কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিলাম। ইহা আগন্তুকদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট বসিবার স্থান।

কোট্টার ঠিক মধ্যস্থলে ছোট একটি লোহার উনুন। ইহার উপর লোহার শিকলে ঝুলানো একটি কেটলি। ছেলেটি সঙ্কেত পাইয়া বাহির হইতে কাঠ লইয়া আগুন জ্বালাইতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে গৃহকর্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাদিগকে "স্বাগতম্" সম্বোধন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের চামড়ার উপর বসিতে বলিলেন। আমি খুশী হইলাম, কারণ আমার জানা ছিল শুধু বিশিষ্ট অতিথিকে সম্মান ও প্রীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ পার্শ্বের আসন বিছানো থাকে।

এই স্থানের ল্যাপরা শিক্ষিত। আবিস্কোযকে অতিথিশালা স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ইহারা বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। প্রশ্ন হইল—"দেশ কোথায়?" 'ভারতবর্ষ' বলিতেই মহাত্মা গান্ধী ও সাধু সুন্দর সিং-এর খবর জিজ্ঞাসা করিল। ইহারা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িয়াছে, সাধু সুন্দর সিংকে দেখিয়াছে ও তাঁহার বই পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর কথা কাগজে পড়িয়াছে। এই দূর মেরুপ্রদেশে মহাত্মা গান্ধীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

কফি-পানের পর বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমি দেড় ক্রাউন (প্রায় এক টাকার মত) চা-দানির উপর রাখিলাম। মহিলা সংকোচের সঙ্গে বলিলেন, "ধন্যবাদ, কিন্তু অতিরিক্ত দিয়াছেন, মাত্র ত তিন পেয়ালা কফি।" আমি ছেলেকে কিছু কিনিয়া দিতে বলিলাম, করমর্দ্দন করিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া বাহিরে আসিলাম। ইহারা সকলে আমাদের সঙ্গে তীর পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া গেলেন।

পাহাড়ের দেশে বাদল নেমেছে

শ্রীকমলরাণী মিত্র

পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘে মেঘে
হ'ল মিতালি;
কালো কালো মেঘ কালো পাথরের
এল কোল ঘেঁষে;
গগনে গগনে বিদ্যুতে জ্বলে দীপালি;
চোখ মেলে রই দূর পানে ঠায়
অনিমেষে!
বর্ষার রং জমাট বেঁধেছে শালবনে,
কী-যে মায়া লাগে দিগন্ত-অঙ্গনে,
ঘন হয়ে আসে বাদল-আঁধার
দিন-শেষে।
পাহাড়ের দেশে বাদল নেমেছে—
ঘোর বাদল,
কাজরীর ছাঁদে ঝুমুর উতলা,
বাজে মাদল
পাহাড়িয়া মেয়ে কুর্চির ফুলে ভরি আঁচল
নেচে নেচে যায় কী জানি কিসের
উদ্দেশে।

আশ্রমের আদর্শ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক দিন পরে আজ আমি তোমাদের সম্মুখে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আজ এসেছি। এ-কথা জানি যে দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির ব্যবধানে আমার বহুকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই হোক তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের, সকল কর্তব্য-কর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে। এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্যে শুধু তোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের কথা; বাংলার নিভৃত এক প্রান্তে আমি তখন ছিলাম পদ্মা নদীর নির্জন তীরে। মন যখন সেদিকে তাকায় দেখতে পায় যেন এক দূর যুগের প্রত্যুষের আভা। কখন এক উদ্বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তখন কেবল-মাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ডুবেছিলাম তারি সঙ্গে ছিল বিষয় কর্মের বিপুল বোঝা।

কেন সেই শান্তিময় পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ আবেষ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে তখন বাইরে ছিল সবদিকেই বিরলতা ও বিজনতা কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি বর্তমান কালের তুচ্ছতা, ইতরতা, প্রগল্‌ভতা, সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কতদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে দুটি একটি মাত্র উপাসক নিয়ে সমবেত হয়েছি,—অবিরত চেষ্টা ছিল সুপ্ত প্রাণকে জাগাবার। তারি সঙ্গে আরো চেষ্টা ছিল ছেলে-দের মনে তাদের স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনো বিপর্যস্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না; অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্নান-পান-আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা ক'রে অন্যমনস্ক হ'তে পারত না।

আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণশক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয় এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব কিছুকে সন্দেহ করা অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারি তো বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে সমাজে। বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানব-সভ্যতার চির-দিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয় নি মানব সমাজের দিগ দিগন্তে।

আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদূরের থেকে। আর এক বার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা

ভেদ ক'রে সেই যে পথযাত্রা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখ-স্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। একে স্বীকার ক'রে নাও।

ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তি-মন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে তবু মানুষের শক্তি আজো সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। সেই ভরসার পরে ভর ক'রে মজ্জমান তরী উদ্ধার চেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে। কালের স্রোত বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সব সময় তাঁদের অনুভূতিতে পৌঁছয় না। এক দিন যখন প্রগল্‌ভ তর্কের এবং বিদ্রূপমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অঙ্ক বেড়ে যাবে তখন সংশয়শুষ্ক বন্ধ্যা বুদ্ধির অভিমান প্রাণে শান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্বোধনমন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

[শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্যের অভিভাষণ, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত।]

বাংলা শিক্ষার প্রণালী

শ্রীঅনাথনাথ বসুকে লিখিত পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

অনাথ, বাংলা শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনকে জাগাবার রাস্তা যত প্রশস্ত এমন আর কোনো উপায়ে নয়। কবিতাই হোক গদ্যই হোক ওরা যা কিছু পড়বে তার থেকে চিন্তার বিষয় বা কল্পনার বিষয়কে বেছে নিয়ে সেটাকে ওদের মনের মধ্যে খুব করে আলোড়িত করা চাই, শুধু কথার মানে জানতে দেওয়া যথেষ্ট নয়। ভাষার বাহ্যরূপটাও ওদের বেশ ভালো করে জানা উচিত যাতে ওরা ভাষাটাকে যথোচিতরূপে ব্যবহার করতে পারে। ইংরেজি বই থেকে মনের খোরাক পাবার অবস্থায় পৌঁছতে দেরি হবে—কিন্তু বাংলা থেকে প্রতিদিনই যেন ওদের মন খাদ্য পায়। যা ওদের নির্দিষ্ট পাঠ তারই মধ্যে যেন ওরা বদ্ধ না থাকে—বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-ইতিহাসের বিচিত্র বিষয় নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে ওদের মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলো। তার পরে যা তারা গ্রহণ করবে তা যাতে দান করতে পারে সর্বদাই তার চেষ্টা কোরো। সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে ওদের বক্তৃতা সভা আহ্বান কোরো—যে-বিষয়ে বক্তৃতা হবে আগে থাকতে খুব ভালো করে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করে ওদের মনকে প্রস্তুত করে তুলো। বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মননশক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোনো কালে সবল হয় না। তোমরা গয়লার কাজ ছেড়ে দিয়ে রাখালের কাজ কোরো। ইতি

১০ মার্চ, ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



অসময়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈকালবেলা ফসল-ফুরানো
শূন্য ক্ষেতে
বৈশাখে যবে কৃপণ ধরণী
রয়েছে তেতে,
ছেড়ে তার বন জানি নে তখন
কী ভুল ভুলি
শুষ্ক ধূলির ধূসর দৈন্যে
এসেছিল বুলবুলি ॥

সকালবেলার স্মৃতিখানি মনে
বহিয়া বুঝি
তরুণ দিনের ভরা আতিথ্যে
বেড়ালো খুঁজি।
অরুণে শ্যামলে উজ্জ্বল সেই
পূর্ণতারে
মিথ্যা ভাবিয়া ফিরে যাবে শেষে
রাতের অন্ধকারে ॥
তবুও তো গান করে গেল দান
কিছু না পেয়ে
সংসারমাঝে কী শুনায়ে গেল
কাহারে চেয়ে।
যাহা গেছে সবে কোনো রূপ ধরে
রয়েছে বাকী
এই সংবাদ বুঝি মনে মনে
জানিতে পেরেছে পাখী ॥
প্রভাতবেলার যে ঐশ্বর্য
রাখে নি কণা,
তার আগমন হারায় না কভু
সে সান্ত্বনা।
সত্য যা পাই ক্ষণেক হলেও
ক্ষণিক নহে
সকালের পাখী বিকালের গান
এ আনন্দই বহে ॥

সাহানা]

সার্থকতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাছ দেয় ফল ঋণ ব'লে তাহা নহে,
নিজের সে দান নিজেরই জীবনে বহে।
পথিক আসিয়া লয় যদি ফলভার,
প্রাপ্যের বেশি সে সৌভাগ্য তার ॥

প্রভাতী]

তপোবন

"তপোবন" প্রবন্ধ অধ্যাপনাকালে শান্তিনিকেতনে কথিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার, ঐতিহাসিক তপোবনের কথা আমি জানি নে। কেউ জানে ব'লে আমি বিশ্বাস করি নে। তপোবনের কথার উল্লেখ আছে পুরাণে, কিন্তু এত অসম্ভব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সঙ্গে সে জড়িত যে তাকে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করি নে। সেখানে যে-সব ঋষি-তপস্বীদের বাস তাঁরা সমুদ্র-পর্বতকে অভিশাপের জোরে কম্পমান ক'রে জোড়হস্তে দ্বারস্থ করতে পারতেন। আবার তাঁদের তপস্যাও অযুত-নিযুত বৎসরের তাপে এমন সর্বনেশে হয়ে যেতে পারত যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাবার জো হ'ত, শেষকালে দেবতাদের কেঁদে এসে পড়তে হ'ত তাঁদের তেজ ঠাণ্ডা করতে। এমন সব কথা বিশ্বাস করবার আশ্চর্য শক্তি যাঁদের আছে, তাঁদের পড়াশুনো করবার দরকার নেই।

বৈদিক কালে তপোবন নাম দিয়ে কোনও আশ্রম ছিল এ যদি সত্য হয় তবে কালক্রমে তার লোকস্মৃতি এমন অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়ে উঠতে নিশ্চয়ই দীর্ঘ সময় নিয়েছিল। অর্থাৎ তপোবনের জনশ্রুতি যখন কাব্যে পুরাণে দেখা দিয়েছিল তখন তার অস্তিত্ব এক কল্পনা ছাড়া আর কোথাও ছিল না।

পুরাণের আরও উত্তরকালে তপস্যার বিশেষ কেন্দ্ররূপে তপোবনের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে তার নামও পাই নে কোথাও। আরণ্যক নাম পাওয়া যায়। বোঝা যায় আর্যাবর্তে এক সময় নাগরিক সভ্যতা এসে অরণ্যের উচ্ছেদ ঘটায় নি। পৃথিবীতে সর্বত্রই দেখা যায় বনে যাদের বাসা তাদের মন হয়ে যায় বুনো। তারা পশু মেরে খায়, পশুচর্ম পরে, অসংস্কৃত থাকে তাদের ভাষা।

একদিন ভারতের আর্যাবর্তের বনে যে আর্যরা নিয়েছিলেন আশ্রয়, তাঁদের মনের শক্তি মূঢ় হয়ে যায় নি। তাঁরা গদগদভাবী ছিলেন না, তাঁদের ভাষা এতদূর সংস্কৃত ছিল যে তাতে নৈর্ব্যক্তিক ভাবের তত্ত্বকথা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল।

সেদিনকার সাহেত্যে যে সমস্ত আলাপের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সাংসারিক প্রয়োজনঘটিত নয়। পরস্পরের প্রয়োজনের কথার একেবারেই কোথাও ব্যবহার ছিল না এ হ'তেই পারে না। কিন্তু তার কোনো অংশ রক্ষিত হয় নি। অন্য অনেক সভ্যতায় দৈবক্রমে বা ইচ্ছাক্রমে অনেক তুচ্ছ বিষয় টিকে আছে। ভারতে নেই তার একটা কারণ এদেশে তখন লিপির আবিষ্কার হয় নি, গুরুশিষ্যানুক্রমে মুখে মুখে স্মৃতিযোগে বিশেষ চেষ্টায় যাকে চালনা করা গিয়েছে তাই বেঁচে আছে। তার থেকে জানা যাবে কোন্ জিনিসকে আর্য পিতামহেরা কোনোমতেই ভুলতে দিতে চান নি। সে আত্মরক্ষার বিদ্যা নয়, পশুচারণ বা পশুমারণ বিদ্যা নয়,— সাংসারিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিদ্যা। উপনিষদে বিদ্যাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বাণী মনে রাখবার যোগ্য। "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো অথর্ব বেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দঃ জ্যোতিষমিতি— অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে" অর্থাৎ ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ব বেদ, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ এ সমস্তই অপরা বিদ্যা, সেই হচ্ছে পরা বিদ্যা যার দ্বারা অক্ষরপুরুষকে উপলব্ধি করা যায়। যে চার বেদ ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রের মূলে তাদেরও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব'লে গণ্য করা হয় নি। অথচ সেগুলি কোনো বিশেষ প্রয়োজনমূলক নয় অর্থাৎ ধনুর্বেদ বা আয়ুর্বেদের মতো ব্যাবহারিক নয়। আর শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্র সমাজের সংস্কৃতিকে বহন করেছে মাত্র, জীবনধারণের প্রয়োজনে তার মূল্য নেই। এতে স্বাভাবিক বন্য বর্বরতার লেশমাত্র লক্ষণ পাওয়া যায় না। সেই আরণ্যকে ঋষিদের সকলের চেয়ে মহৎ লক্ষ্য ছিল অন্ততঃ স্বরূপকে আত্মার মধ্যে পাওয়া। মানুষের ইতিহাসে এমন সাধনা আর তো কোনো বনবাসীর মধ্যে কল্পনা করা যায় না। ভারতে প্রথমাগত আর্য ঔপনিবেশিকদের মধ্যে তপোবন নামক কোনো বিশেষ সংজ্ঞাধারী আশ্রমের সন্ধান পাই বা না পাই আরণ্যক সাধকদের এই যে আশ্চর্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাই, আমার কাছে তপোবন নামটি এরই প্রতীক।

ইটকাঠের আবাস প্রাণহীন, অরণ্যের আবাস প্রাণময়। এইখানে বাসকালে জগতের সকল প্রাণের মধ্যে যে অসীম প্রাণের উৎস আছে, ঋষিরা ধ্যানযোগে তাকে অনুভব করেছিলেন। বলেছিলেন—"যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং", অর্থাৎ যা কিছু আছে এই সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্ছে। এ একটি আশ্চর্য বচন। তবে কি পাথর স্পন্দিত হচ্ছে? লোহা স্পন্দিত হচ্ছে? বিজ্ঞানীরা বলেন হাঁ হচ্ছে, ঋষিরাও বলেছেন হাঁ হচ্ছে। উভয়ের ভাষার প্রভেদ আছে। সবকিছুকে যাতে কাঁপাচ্ছে বিজ্ঞানীরা তাকে একটা কোনো নাম দিয়েছেন, বলেছেন সে কাঁপছে বিশ্বব্যাপী তেজে বা তাপে। ঋষি বলছেন, কাঁপছে প্রাণে। বললেই আপনার মধ্যে কথাটাকে বুঝতে পারি। অন্য শব্দগুলি শব্দ মাত্র। আমরা আপনার মধ্যে একান্তভাবে জানি স্বতশ্চলৎশক্তি আছে প্রাণেতে, এ একটা শব্দ মাত্র নয়, এ অভিজ্ঞতা। ইলেক্‌ট্রন প্রোটোনের পরমাণুবাচক নাম ছিল না কিন্তু "যদিদং কিঞ্চ সর্বম্" বলতে চরমে তো তাদেরই বোঝায়। তারা তো কাঁপছেই। কোথা থেকে কাঁপন এল? ঋষিরা বলেন প্রাণ-শক্তি থেকে, সে-কথাটা নিজের মধ্যে অব্যবহিতভাবে বুঝতে পেরেছেন। ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনদের কিছুতে ধাক্কা দিচ্ছে না বাইরে থেকে, তারা নিজের চলমানতা থেকে চলেছে। তাকেই বলা হয়েছে প্রাণ এজতি।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন, "কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ", সব প্রথমে প্রাণ কার দ্বারা প্রৈতি অর্থাৎ গতি-শীলতা পেয়েছে? তার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন "কেনেষিতং পতন্তি প্রেষিতং মনঃ", কার ইচ্ছায় ইচ্ছিত মন আপন বিষয়ের দিকে গমন করছে। মনের গতি ইচ্ছার গতি, মন যে ইচ্ছাময়। উপনিষদ্ বিশেষ দুই গতির কথায় বলেছেন একটা হচ্ছে প্রাণের গতি, আর একটা হচ্ছে ইচ্ছার গতি, ইচ্ছাই চলে। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, আবার ইচ্ছার কথা বলা হ'ল, বাক্ তো ইচ্ছারই প্রকাশ, তার যথার্থ গতি শব্দের গতি নয়, তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছার গতি। এইজন্যে য়িহুদি শাস্ত্রে বলা হয়েছে সৃষ্টির আরম্ভে ছিল শব্দ—তার মানে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। সব শেষে বলা হয়েছে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি। কোন দেবতা চক্ষুকে শ্রোত্রকে জুড়ে দিয়েছেন, এরা বাইরের জিনিস, শক্তির বাহন মাত্র। প্রশ্নের যা উত্তর দেওয়া হয়েছে, তা আরো গভীর রহস্যপূর্ণ। উত্তর এই যে শ্রোত্রের ভিতরে আছে শ্রোত্র, মনের ভিতরে মন, বাক্যের ভিতরে বাক্য। এই যে কান শোনে, মন মনন করে, প্রকাশ করে বাক্য বললে চলবে না, কানের ইন্দ্রিয়টা শোনে, মনের যন্ত্রটা ভাবে, বাগিন্দ্রিয় প্রকাশ করে। যে করে সে তার অন্তরতর। সে বাক্য মনের অগোচর।

তপোবনের কথা বলতে গিয়ে এই যে ব্যাখ্যা করা হ'ল তার কারণ আমি জানাতে চাই, অরণ্যে যাঁরা সমাহিত চিত্তে চিন্তা করেছেন, তাঁদের চিন্তা বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় নয়, সমগ্র অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অগ্নি হ'তে জল হ'তে বিশ্বভুবন হ'তে ওষধি হ'তে বনস্পতি হ'তে পরিপূর্ণতার যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ করেছেন এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

পূর্বেই বলেছি পৌরাণিক যুগের আগে তপোবনের ঠিকানা পাওয়া যায় নি। বোধ হয় তখন তপোবন বলে বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো তপস্যার কেন্দ্র চারিদিক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ছিল না। সমস্ত আর্যাবর্ত তখন অরণ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল, আর পশুচারণই ছিল মানবের প্রধান উপজীবিকা, ধেনুই ছিল সেই যুগের প্রধান ধনসম্পদ। রাজারা যখন কোনও ঋষিকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতে চাইতেন, তখন হাজার বা লক্ষ গরু দান করতেন, ঋষিরা কি ক'রে তাদের খাদ্য জোগাতেন জানি না। সেই যুগের শাস্ত্রে চাষবাসের প্রাধান্য বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায় না।

জনক যখন চাষ করতেন, তখন কৃষি ছিল বিদ্যা, মজুরি নয়, ওর বিশেষ মর্যাদা ছিল। এই বিদ্যা রক্ষা করা ও প্রচার করা বিশেষভাবে রাজাদের কর্তব্য ছিল। নগরের উৎপত্তি জনসমবায়ে; যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল খেয়ে বিপুল লোকসংঘের প্রাণধারণ চলতে পারে না। চাষ করে প্রকৃতির খাদ্য উৎপাদন-শক্তিকে তাগিদ করতেই হয়। এই প্রয়োজনের প্রেরণায় কৃষিবিদ্যার আবিষ্কার হয়েছিল। এই বিদ্যাকে অনার্যদের হাত থেকে রক্ষা আর্যরা একটা প্রধান কর্তব্য বলেই গণ্য করেছিলেন। রামায়ণের মূল কাহিনী যে সীতাকে উদ্ধার করা, অর্থাৎ কৃষিবিদ্যা রক্ষা করা অবলম্বন করে বর্ণিত এই মত আমি অন্যত্র ব্যক্ত করেছি। সীতা শব্দের অর্থ হলচালন-রেখা। মানবী-গর্ভে সীতার জন্ম নয়, হলচালন-রেখা থেকেই জনক রাজা সীতাকে পেয়েছিলেন। রামায়ণের যথার্থ কাহিনীর স্পষ্টতর নিদর্শন এর চেয়ে আর হতে পারে না। এই সীতার পবিত্র দায়িত্ব রক্ষার জন্য রাজন্যবর্গকে যখন আহ্বান করা হয়েছিল, তখন হরধনুভঙ্গের পণ স্বীকার করতে হয়েছিল। শৈব ধর্ম অনার্য দ্রাবিড়দের এবং তাদের পূর্ববর্তী জাতিদের ধর্ম ছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে যে-সব শিলালিপি আবিষ্কার করা হয়েছে, তাতে পশুপতি শিবের মূর্তির সঙ্গে পশুদের মূর্তি অঙ্কিত আছে। পৌরাণিক ধর্মে তাঁকে বৃষবাহন রূপে দেখা যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে চণ্ডীকে দেখা যায় পশুদের রক্ষাকর্ত্রীরূপে।

অরণ্যবাসী আর্যদের ধেনুর সঙ্গেই সম্পর্ক দেখা যায়। ইন্দ্রের বাহন হাতী ও ঘোড়া, অর্থাৎ যে দুটি পশু মানুষের ব্যবহার্য। কিন্তু তাঁদের প্রিয়সঙ্গীরূপে বাঘ-ভাল্লুক তো দেখা যায় না, বাঘ দেখা গেছে মহেঞ্জোদাড়োর উৎকীর্ণ মূর্তিতে। পরবর্তী যুগেও শৈবধর্ম দ্রাবিড়দের মধ্যেই প্রধানত প্রচলিত। আরও একটি মনে রাখতে হবে রাবণ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের পরাভূত ও অপমানিত করেছিলেন। কথিত আছে, তাঁর উপাস্য দেবতা শিবের প্রভাবেই স্বর্গ মর্ত জয় করেছেন। সরস্বতী দৃষদ্বতী নদীর নাম আছে বেদে কিন্তু পবিত্র জ্ঞানে নদী-পূজার কি কোন উল্লেখ পাওয়া যায়? শিবের মূর্তির সঙ্গে মিলিত আছে গঙ্গা, আর আছে সর্প। সর্পপূজা অনার্যদের। আরও প্রমাণ আছে। দক্ষযজ্ঞে আহূত হয়েছিলেন বৈদিক দেবতারা, শিব হয়েছিলেন অনাদৃত। তাই অনার্যরা এসে মারামারি কাটাকাটি করে যজ্ঞ পণ্ড করে দিয়েছিল। শৈবধর্ম তাদেরি ধর্ম যারা আর্যদের যথাসর্বস্ব লুটপাট করে কেড়ে নিয়ে যেত।

বিশ্বামিত্র রামকে আমন্ত্রণ করলেন, এদের ধনুককে অর্থাৎ শক্তিকে ভাঙতে। যে ভাঙবে, সীতাকে গ্রহণ ও রক্ষা করবে সেই।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ নগরের যুগে, তপোবন ছিল না। কালিদাসের কাব্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি দেখলেন শহরে সভ্যতায় মানুষকে বিলাসিতায় কলুষিত, বঞ্চনাপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে তুলেছে। মালবিকাগ্নিমিত্র পড়ে দেখলে তখনকার সভ্যতার এই রূপ স্পষ্ট দেখতে পাবে।

কবির হৃদয়ে এবং কাব্যে তপোবনের নির্মল আদর্শ রূপ নিয়ে নামল। তখনকার কালে যে যুগ আপন পুণ্যকীর্তি নিয়ে তিরোহিত তারি স্মৃতিকে তিনি তাঁর অনেক গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তখন আক্রমণকারী শত্রু আসছিল চারিদিক থেকে। দুর্গ-পরিরক্ষিত নগর নির্মাণ করে তাদের প্রতিহত করবার প্রয়োজন ঘটেছিল। শক্তিকে কেন্দ্র ক'রে নগরের গঠন হ'ল। কিন্তু শক্তির ধর্ম এই, সে পরিমিত সীমায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। বেড়ে চলে তার ক্ষুধা। এক শক্তি আর শক্তিকে গ্রাস ক'রে আপনাকে স্ফীত করে। ক্ষুধার সীমা আছে কিন্তু পেটুকতার সীমা নেই। শক্তি পেটুক, অ-স্বাভাবিক তার লোভ। অরণ্যাশ্রমের জায়গায় এল নগর। নগরে নগরে বেধে উঠল কেবলি অসহিষ্ণু শক্তির দ্বন্দ্ব। পরস্পর হতে থাকল বিচ্ছিন্ন বিভক্ত, বাহিরের শত্রু যখন এল তখন তাকে ঠেকাতে পারলে না। তার পর থেকে চিরপরাভবে ভারতবর্ষের মাথা নত হয়ে রইল।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যাঁরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, শত্রু সংহার করেছেন তাঁদের উল্লেখ বড় দেখতে পাওয়া যায় না। রাজাদের মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁদেরই খ্যাতি ছিল। সেই জন্য একে রাজবিদ্যা বলত। বৈদিক যুগের কোনো ইতিহাস নেই, সব ঝাপসা। মাঝে মাঝে এক-এক ঋষির কথা, যিনি নূতন মন্ত্র, নূতন যজ্ঞ বা নূতন অগ্নি চয়ন করেছিলেন। এটা ছিল ভারতে আরণ্যক যুগ। এর থেকে আমরা পরবর্তী নাগরিক যুগে আসি। তখন নানা পাপ এসে মানুষের স্বভাবকে আশ্রয় করে। এটা স্বাভাবিক, অন্য দেশের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, নাগরিক সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে স্বভাবের বিকৃতি ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন থেকে প্রশ্রয় পেয়ে সভ্যতার ভিত্তি বিদীর্ণ করেছে, শাখায় প্রশাখায় সর্বনাশ বিস্তার করেছে চারিদিকে। নাগরিক সভ্যতার নিদারুণ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আজ। দেখছি মানব দানব হয়ে উঠেছে।

দেশ]

সংস্কৃত-সাহিত্যের তিব্বত-বিজয়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

তের শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে প্রবল-প্রতাপ স্রঙ্-সান-গ্যাম্পো (নরদেব) তিব্বতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার দুই রাণীর মধ্যে একজন চীন-সম্রাটের কন্যা, অপরা নেপালরাজ-দুহিতা। তাঁহারা দুই জনই ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহেই নরদেব তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইলেন, এবং ষোল জন সঙ্গীর সহিত সচিব-শ্রেষ্ঠ থোন্মি সম্ভোটকে মগধদেশে প্রেরণ করিলেন। এই সময়েই প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছিলেন। নরদেবের শ্বশুর চীন-সম্রাট্ তাই-সুঙের আনুকূল্যে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রঅধ্যয়ন করিতে ভারতে আসিয়া ছিলেন।

মগধের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণের নিকট বহুবৎসর নানা শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়া থোন্মি সম্ভোট স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিব্বতে সে-সময়ে লিপিবিদ্যার প্রচলন ছিল না। নাগরী বর্ণমালার আদর্শে তিব্বতী-লিপি উদ্ভাবন করিয়া তিনি ব্যাকরণ ও রচনা বিষয়ে আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। তিব্বতরাজ নিজে চারি বৎসরে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলেন। এই সময়েই রত্নমেঘ-সূত্র, কারণ্ডব্যূহ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। এই সকল গ্রন্থের সাহায্যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলে প্রজাবৃন্দ ন্যায়পরায়ণ নৃপতির অনুরক্ত হইয়া পড়িল। এই জন্যই নরদেবের নাম হইল 'স্রঙ্-সান্-গ্যাম্পো' অর্থাৎ অকপট, ন্যায়বান, অগাধসত্ত্ব। ভক্তিনত প্রজাপুঞ্জ মনে করিত, নরদেব অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধেরই অবতার। তাঁহার রাজত্বকালে সম্ভোট, ধর্ম্মকোশ, ব্রাহ্মণপণ্ডিত শঙ্কর, চীনাচার্য্য হ্ব-সন, নেপালগুরু শীলমঞ্জু প্রভৃতি বহু পিটক-গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপ অনুবাদকার্য্য অবিচ্ছেদে ও পূর্ণোদ্যমেই চলিয়াছিল। শত সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভাষান্তরিত হইয়াছিল, এবং সকলেই তাহা পড়িয়া বুঝিতে পারিত। অনুবাদ এতই স্পষ্ট, অবিকল ও মূলানুগত যে, বহু সংস্কৃত পুঁথির সাহায্যেও যথার্থ পাঠনির্ণয়ে সন্দেহ হইলে তিব্বতীয় অনুবাদ দেখিলেই সংশয় দূর হয়। বিশ্বের অনুবাদ-সাহিত্যে এইরূপ মূলানুগত্য আর কোথাও দেখা যায় নাই। অনুবাদক পণ্ডিতগণ প্রত্যেক সংস্কৃত শব্দের অবিকল তিব্বতীয় প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিতে উৎসুক থাকিতেন। কিন্তু অনেক ভুল থাকিলেও তাঁহাদের অনুবাদের ভাষা বিশুদ্ধ তিব্বতী। সেকালে উহা সুপাঠ্য ছিল, কিন্তু একালে অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে, কারণ কালক্রমে উচ্চারণ বিকৃতি ও ব্যাকরণগত পরিবর্ত্তনের ফলে অন্যান্য ভাষার ন্যায় তিব্বতী ভাষারও রূপান্তর হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ ভিন্ন আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল, যথা কালিদাসের মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ, রত্নাকরের ছন্দোরত্নাকর, জ্ঞানশ্রীমিত্রের বৃত্তমালা-স্তুতি; পাণিনিসূত্র ও রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদী, চন্দ্রগোমীর চান্দ্র-ব্যাকরণ, শর্ব্ববর্ম্মার কলাপ, অনুভূতিস্বরূপাচার্য্যের সারস্বত, রবিগুপ্তের আর্য্যাকোষ, আর্যাশূরের সুভাষিত-রত্নকরণ্ড; অমরকোষ ও সুভূতিচন্দ্রকৃত কামধেনুটীকা, শ্রীধরসেনের মুক্তাবলী বা বিশ্বলোচন অভিধান, বাগ্ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় ও সর্ব্বহিত মিত্রদত্ত-কৃত ব্রহ্মবেদ-শার্ঙ্গধরচরক-টীকা, শালিহোত্রের অষ্টায়ুর্ব্বেদসংহিতা; নগ্নজিতের চিত্রলক্ষণ, আত্রেয়-কৃত প্রতিমা-মান লক্ষণ; ঈশ্বর রচিত সর্ব্বেশ্বর-রসায়ন; সামুদ্রিক-ব্যঞ্জন-বর্ণন; স্ববোদয়ার্থ-সংগ্রহ ইত্যাদি। সর্ব্বসমেত অনুবাদগ্রন্থের সংখ্যা ৪,৫৬৬ —তন্মধ্যে কতকগুলি অপভ্রংশ ও চীনাভাষা হইতে অনূদিত। এই সকল গ্রন্থ কাষ্ঠখোদিত ব্লক হইতে মুদ্রিত হইত। এখন ভারতের মধ্যে মাত্র ছয়টি গ্রন্থাগারে এই তিব্বতীয় গ্রন্থমালা সংগৃহীত হইয়াছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলে, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে, পাটনার বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটিতে, এবং মাদ্রাজ আদেয়ারের থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে।

অনুবাদ-গ্রন্থ ভিন্ন তিব্বতীভাষায় নানা বিষয়ে শত শত মূল গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। স্থানীয় কথাকাহিনী, কাব্য ও গীতি-কবিতা ভিন্ন প্রায় সমগ্র তিব্বতীয় সাহিত্যই সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ভাষান্তরিত। প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদও কিছু আছে। তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে আবার বহু গ্রন্থ মোঙ্গল, মাঞ্চু ও চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইউরোপে লাতিনের ন্যায় মোঙ্গলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ও মধ্য এসিয়ায় তিব্বতী ভাষা এইরূপে ধর্ম্ম, সংস্কৃতির ও শিক্ষার বাহন হইয়াছিল। শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতীয় সাহিত্যের তিন যুগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ শতক পর্য্যন্ত (৬৫০—১৪০০) আদি যুগ, অর্থাৎ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের যুগ। মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খাঁ ১২০৫ সালে তিব্বত জয় করেন। কাশ্মীরী পণ্ডিত শাক্যশ্রী সেই সময়ে তিব্বতে আগমন করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি মগধদেশে ছিলেন, এবং তুরস্ক সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিহার-বিধ্বংস ও লুণ্ঠন স্বচক্ষে দর্শন করেন।

পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতক পর্য্যন্ত (১৪০০—১৭০০) মধ্য যুগ। এই তিন শত বৎসরকাল তিব্বতী পণ্ডিতগণ চীন-সাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা করেন এবং দেশপ্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, কথা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপে তিব্বত-সাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হইল, এবং বৌদ্ধধর্ম্মও নব প্রেরণা লাভ করিল। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ। এই যুগেই তিব্বতী ভাষা এসিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের দেবভাষারূপে গণ্য হইয়াছে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে হাঙ্গেরী দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সোমা ডি কোরোস ইংরেজ-সরকারের সহায়তায় বহু কাল বাস করিয়া তিব্বতী শিক্ষা করেন। তিনি তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করেন, এবং এসিয়াটিক রিসার্চ্চ ও এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিব্বত-সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের শরচ্চন্দ্র দাস দার্জ্জিলিং তিব্বতী বোর্ডিং স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিব্বতী শিক্ষা করিয়া ভারত-সরকারের অনুরোধে তিনি চারি বার তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিব্বত-সংক্রান্ত দৌত্যকার্য্যে সহায়তার জন্য ভারত-সরকার তাঁহাকে চীন-রাজধানী পিকিঙে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-রচিত অবদান-কল্পলতার লুপ্তপ্রায় মূলগ্রন্থ ও তাহার তিব্বতীয় অনুবাদ, কাব্যাদর্শের অনুবাদ, ভদ্রকল্পদ্রুম নামক ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থ শরচ্চন্দ্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিব্বতীয় বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি 'তিব্বতী হইতে ইংরেজী অভিধান' মুদ্রিত হয়।

প্রাচীন কালের শত শত সংস্কৃত গ্রন্থরত্ন চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদের সাহায্যে তাহার মধ্যে অনেকগুলি পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। এইরূপে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্ম্মমতের বিস্মৃত তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান লাভের জন্যই তিব্বতী ভাষা আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

অলকা।]



বিবিধ প্রসঙ্গ



কবির অভয়বাণী

যে ২২শে শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্ণে রবীন্দ্রনাথ উক্তীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য উপাধি প্রাপ্ত হন, সেই দিন প্রাতে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনাকালে তিনি যে মহৎ উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন, তাহার অনুলিপি তাঁহার দ্বারা সংশোধিত হইয়া আসিলে প্রকাশিত হইবে।

জগৎজোড়া একটা আতঙ্কের আবির্ভাব হইয়াছে বুঝি-বা বর্তমান যুদ্ধের ফলে মানব-সভ্যতা লুপ্ত হয়। কবি এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁহার মহতী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে পুরাকালে বহু জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূভাগের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। যখন সেই সমুদয় ঘটিয়াছিল, তখন মানুষ ভাবিয়া থাকিবে সৃষ্টি বুঝি লোপ পাইল, প্রলয় উপস্থিত। কিন্তু সেই সমুদয়ের মধ্য দিয়া পৃথিবী পূর্ণ পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সেইরূপ নানা বিপ্লব, নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষ ও তাহার সভ্যতা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বস্তুতঃ মানব-সৃষ্টি এখনও শেষ হয় নাই। সভ্যতায় ভাঙন ধরে নাই, সভ্যতা এখনও পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কবির বাণীর কিয়দংশ আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি।

তাহার একটি অসম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, অসংশোধিত অনুলিপি নীচে মুদ্রিত হইল।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা প্রথমে একটা আবরণ রচনা করেন। সেই আবরণের ভিতর দিয়ে সৃষ্টির কার্য চলে এবং এরই ভিতরে হয় সৃষ্টির পরিণতি। প্রথমে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থাকে কিন্তু নানা কাজের মধ্য দিয়ে আসে তার পরিণতি—যেমন করে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে জ্যোতি। আদি সৃষ্টির মূলে অঙ্গার-বাষ্প আবিল ক'রে রেখেছিল এই পৃথিবীকে। প্লাবনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছিল এর প্রকৃত রূপ। সূর্যকে প্রথমে অবরুদ্ধ করেছিল প্রকাণ্ড বাষ্প-আবরণ, কিন্তু তার আলোক এসে পৌঁছেছিল নবসৃষ্টির উদ্যমে পীড়িত পৃথিবীর বকে ঐ প্রকাণ্ড আবরণ ভেদ ক'রে। তেমনি ক'রে মানব-লোকে এসে পৌঁছেছে মহামানবের বাণী। অনেকে বলেন পৃথিবীর সৃষ্টি এখন জরাগ্রস্ত—ভাঙনের চিহ্ন পড়েছে তাতে। কিন্তু আমি তা মনে করি নে। মানবের সম্পূর্ণ সৃষ্টি এখনও হয় নি, মানবের মধ্যে এমন কিছু আছে যার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি, এখনও যা রয়েছে অসম্পূর্ণ। বস্তুত পক্ষে মানব-সৃষ্টি এখনও শেষ হয় নি।

যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা দিয়েছেন আশার বাণী। যেমন ক'রে আদিম সৃষ্টিতে দেখা গিয়েছে মহা-সমুদ্রের ভিতর হ'তে দেশ-মহাদেশের ক্ষীণ আভাস, যেমন ক'রে সূর্য আপনার আবরণকে পেরিয়ে এসেছে পৃথিবীতে, তেমনি ক'রে মহাপুরুষরা এনেছেন আশার বাণী। সমস্ত প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে সে ব্যাপ্ত করবে। সে রোপিত হয়েছে মাত্র কিন্তু অঙ্কুরিত হয় নি। বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষরা ঐতিহাসিক নির্দেশ-ক্রমে জন্মেছিলেন গত দিনে, কিন্তু তাঁদের কাজ তো গত হয় নি। তাঁরা যে ভাবী কালের, তাঁরা চিরকালের, ভবিষ্যতের। তাঁদের যথার্থ তারিখ হবে সে দিন যখন দেখা যাবে তাঁদের কর্মের ধারা পেয়েছে যথার্থ সুন্দর রূপ—যেদিন তাঁদের বাণী হবে প্রতিষ্ঠিত।

কোথা হ'তে এই মহামানবেরা প্রেরণা পেয়েছেন? কে তাঁদের পাঠিয়েছিল এই পঙ্কিল আবিলতাপূর্ণ পৃথিবীতে? ভবিষ্যৎ কালের জন্য যে বাণী তাঁরা রেখে গেছেন, অতীত কালে সেই বাণী তাঁরা কোথায় পেয়েছিলেন? যাঁরা বলেন, তাঁদের বিশ্বাস করা যায় না, যাঁরা এর প্রতিবাদ করেন, তাঁরা ত বলতে পারেন না কোথায় পেয়েছেন এই মহামানবেরা বাণী। এ তো প্রতিবাদ করার সময় নয়—সে বাণী যে আজও শুনতে পাচ্ছি। এখনও সম্পূর্ণ হয় নি মানুষ, এখনো রয়েছে তারা আদিম হয়ে; তাই তারা পায় না শুনতে সেই মহান্ বাণী। এই অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়ে উঁকি মেরেছে সেই মহাপুরুষদের মহান্ মন্ত্র—তাঁরা অভয় দিয়ে গিয়েছেন। তাতে সত্যতা নেই ব'লে উপেক্ষা করলে চলবে না। মানুষ এখনও প্রস্তুত হয় নি সেই মহান্ আদর্শ গ্রহণ করতে। তারা এখনও পঙ্কসলিলে অর্ধনিমজ্জিত। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম যেদিন মানুষ গ্রহণ করবে এই বাণীকে—উপলব্ধি করবে তার সত্যতাকে। এখন যারা প্রতিবাদ জানাবে তারা অশ্রদ্ধেয়—তাদের প্রতিবাদের কোন মূল্য নেই। তাদের প্রতিবাদ দাঁড়াতে পারে না—উপেক্ষা করতে পারে না সেই মহামন্ত্রকে। যাঁরা সর্বমানবকে স্বীকার করেছেন—যাঁরা সর্বপীড়িতের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের সেই বাণী রয়েছে চিরন্তন সত্য হয়ে, তা যে মিথ্যা হ'তে পারে না। তাঁরা যে এই পঙ্কিল পৃথিবীর অনেক ঊর্ধ্বে। তাই আজ বিশ্বনৃশংসতার মধ্য দিয়ে আমি তাঁদের বার-বার প্রণাম করি।

মানবের সত্যতাকে আমরা হাতড়ে বেড়াই, কিন্তু খুঁজে পাই

নে। সেই জন্য আমাদের প্রার্থনা—হে জ্যোতির্ময় পুরুষ, তুমি মানবের চিরন্তন সত্যকে আমাদের কাছে নিয়ে এস। আমরা যে অসত্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই অসত্যকে ঘুচিয়ে দাও; আমরা যে অন্ধকারে আবদ্ধ, সেই অন্ধকারলোকে জ্যোতি নিয়ে এস। তোমার আবির্ভাব আমাদের মধ্যে হউক, তোমার ও আমাদের বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে তোমার সত্য রূপ, তোমার জ্যোতির্ময় রূপ আমাদের আত্মাতে প্রকাশ কর।

—

বড়লাটের বিবৃতি

গত ৭ই আগস্ট বড়লাট যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমরা সন্তোষজনক মনে করি না।

বিবৃতিতে আছে, ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্ব প্রদান ব্রিটেনের লক্ষ্য। ইহা ব্রিটিশ নৃপতি ও অনেক ব্রিটিশ রাজপুরুষ অনেক বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কখন তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই।

বলা হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর, সম্ভবপর ন্যূনতম বিলম্বে, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদানভূত লোকসমষ্টিগুলির প্রতিনিধিগুলিকে লইয়া একটি কমীটি গঠিত হইবে এবং তাহার কাজ হইবে ভারতবর্ষের নূতন কন্সটিটিউশ্যনের বা মূল রাষ্ট্রবিধির কাঠামো রচনা করা। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা ভারতীয়েরা স্বীকার করিবে ব্রিটেন যদি এইরূপ আশা করেন, তাহা হইলে সে-আশা পূর্ণ হইবে না। কারণ, বিবৃতিতে বলা হয় নাই প্রধান লোকসমষ্টি কাহারা, কোন্ সমষ্টি কত জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে, প্রতিনিধিদিগকে কে মনোনয়ন বা নির্বাচন করিবে, ইত্যাদি। অনুমান হয়, বড়লাটই স্থির করিবেন, প্রধান দল কোন্ কোন্‌টি এবং "প্রতিনিধি" কোন্ দলের কয় জন ও কে কে হইবেন, তাহাও তিনিই স্থির করিবেন। তাহা হইলে বিলাতী গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের তথাকথিত "প্রতিনিধিরা" যেমন বাস্তবিক প্রতিনিধি ছিলেন না, ইহারাও সেইরূপ ভারতীয়দের প্রকৃত প্রতিনিধি হইবেন না।

আর এক কথা। ভারতশাসন-আইন চালু করিবার আগেই যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাহাতে দেখা গিয়াছে কোন্ দলের লোকপ্রিয়তা, প্রতিনিধিত্ব ও শক্তি কত। অধিকাংশ প্রদেশে অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্য কংগ্রেসী দল হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এখন আবার নির্বাচন হইলে কংগ্রেসীদের সংখ্যাধিক্য তত বেশী যদি না হয়, তাহা হইলেও অন্য সকল দলের চেয়ে বেশি হইবে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে কংগ্রেসী দলের প্রতিনিধিদের যথোচিত সংখ্যাধিক্য থাকা উচিত ও আবশ্যক। আমরা কংগ্রেসের সভ্য না হইলেও কংগ্রেসের যাহা ন্যায্য দাবী হইতে পারে তাহা বলিলাম। কংগ্রেসের একটি সভ্যতালিকা আছে এবং নির্বাচিত নিখিলভারতীয় কমীটি ও কার্যনির্বাহক কমীটি আছে। অতএব, এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ দলকে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। অন্য কোন দল এইরূপ সুশৃঙ্খল গঠন ও ব্যবস্থা দেখাইতে পারিলে তাহাও নির্বাচনের দাবী করিতে পারে।

বড়লাটের বিবৃতিটিতে তিনটি দলের উল্লেখ আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, "মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বরের গবন্মেণ্ট কংগ্রেসের, মুসলিম লীগের ও হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহক কমীটিগুলির প্রস্তাব দেখিয়াছেন।" মুসলমান সমাজ জানেন যে, আজাদ মুসলিম দলের সভ্যসংখ্যা মুসলিম লীগের সভ্যসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস সভ্যেরা আছেন, মোমিনরা আছেন, অহ্‌রররা আছেন, জামিয়ৎ-উল-উলেমা আছেন, শিয়ারা আছেন—ইহাদের সকলের সংখ্যার সমষ্টি মুসলিম লীগের সভ্যসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি, এবং ইহারা মুসলিম লীগের মত মানেন না; অথচ মুসলিম লীগকেই ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র মনে করেন ও করিবেন! কারণ স্পষ্ট—কারণ মুসলিম লীগের দাবী দ্বারা কংগ্রেসের ও হিন্দুমহাসভার দাবীর বিরুদ্ধতা করিবার সুবিধা হয়। যদি মুসলিম লীগের এক জন "প্রতিনিধি" লওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দুমহাসভার লইতে হইবে তিন জন। কারণ ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমানদের তিনগুণ।

অনেক পরস্পরবিরুদ্ধমতাবলম্বী সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইবার স্পষ্ট পূর্বাভাস আমরা বড়লাটের বিবৃতিতে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু গাজন নষ্ট করিবার অভিসন্ধি তাঁহার আছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

ব্রিটিশ জাতি, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট, ব্রিটেন ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় রাজনৈতিক দল প্রভৃতির মধ্যে মিলন ও ঐক্য দেখিতে অভিলাষী, এই ন্যাকামিটার বয়স ঠিক কত বৎসর বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা অনেক দিন হইল সাবালক হইয়াছে। সুতরাং সে যে বড়লাটের বিবৃতিতেও সরব ও আত্মপ্রকাশমান হইয়াছে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ব্রিটিশ ন্যাকামির কথা বলিলাম এই জন্য যে, ব্রিটিশেরা বলেন তাঁহারা আমাদের মতে মিল ও ঐক্য চান, কিন্তু তাঁহারা অমিল ও অনৈক্যের যে সব কারণ নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলা দূর করিতেছেন না!

সংখ্যালঘুদের মতামতের গুরুত্ব পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইবে বলিয়া বড়লাট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মুসলিম লীগকেই ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট কার্যত মুসলমানদের মুখপাত্র মনে করেন। তাহার প্রধান দাবী পাকিস্তান। ইহাতে গবন্মেণ্ট রাজী হইবেন কি? সিন্ধুদেশে পঞ্জাবে বঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। তাহাদের অভিযোগসমূহে কান দিবেন কি? বিবৃতির একটি বাক্য এই:—

"It has already been made clear that my declaration of last October does not exclude examination of any part either of the Act of 1935 or of the policy and plans on which it is based."

তাৎপর্য্য। ইহা ইতিপূর্বেই বিশদ করা হইয়াছে যে, আমার গত অক্টোবরের ঘোষণা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইনের কোন অংশের, বা যে পলিসির বা প্ল্যানসমূহের উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত, তৎসমুদয়ের, পরীক্ষায় বাধা দেয় না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরারূপ পলিসির ভিত্তির উপর ভারতশাসন-আইনের অট্টালিকা নির্মিত। পরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার ফলে ঐ সিদ্ধান্তটা উল্টাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কি?

আইনটার একটা প্ল্যান দেশী রাজ্যের প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা। ঐ প্ল্যানটা বদলাইতে পারে কি?

ইত্যাদি।

বিবৃতির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে:—

ইহা সুস্পষ্ট যে সমগ্রসীভূত সহযোগিতার সৌকর্য্য বিধানের নিমিত্ত প্রদেশগুলির প্রধান প্রধান দলগুলির মধ্যে কতকটা মতৈক্য কেন্দ্রে তাহাদের সম্মিলিত সহশ্রমিতার একটা বাঞ্ছিত পূর্বপ্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ মতৈক্যে উপনীত হওয়া যায় নাই।

তাহা হইলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিলেন ও করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদেরই দ্বারা সৃষ্ট মতানৈক্যের যে-সব কারণ—বিশেষতঃ বঙ্গে—বিদ্যমান ও কায়েম, তৎসত্ত্বেও মতৈক্য হইবে! আশ্চর্য্য আশাশীলতা, আশ্চর্য্য "দুর্ভাগ্যক্রমে"!

বড়লাট কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টে তাঁহার কৌন্সিলে অর্থাৎ শাসন-পরিষদে ভিন্ন ভিন্ন দলের জনকয়েক "প্রতিনিধি" লইয়া তাহা বৃহত্তর করিবেন। কোন্ কোন্ দলের লইবেন, কোন্ দলের কয় জন লইবেন, দলগুলি তাঁহাদিগকে নির্বাচন করিবে, না তিনিই মনোনীত করিবেন—বিবৃতিতে এসব কিছুই বলা হয় নাই। কৌন্সিলের এই সদস্যবৃদ্ধি ব্যতীত একটি যুদ্ধ-পরামর্শদাতা কৌন্সিল গঠনের কথাও বিবৃতিটিতে আছে। তাহাতে দেশী রাজ্যগুলির (নৃপতিদের না প্রজাদের?) এবং ভারতের সমগ্র জাতীয় জীবনের অন্যান্য অংশের "প্রতিনিধি" থাকিবে। "প্রতিনিধি" বাছিবে কে, বিবৃতিতে তাহা বলা হয় নাই। পরামর্শদাতাদের পরামর্শ অনুসারে গবন্মেণ্ট চলিবেন কি না, বিবৃতিতে তাহা লেখা নাই। কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থ ও পলিসির বিরুদ্ধ হইলেই পরামর্শ যে অগ্রাহ্য হইবে, তাহা নিশ্চিত।

কংগ্রেস চাহিয়াছিলেন কেন্দ্রে সকল দলের আস্থাভাজন জাতীয় গবন্মেণ্ট। বড়লাট যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা কংগ্রেসের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নহে।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওএল্‌থে (সাম্রাজ্যে নহে) স্বাধীন ও সমান অংশীদারত্ব কালক্রমে লাভ করিবে, বিবৃতির শেষ বাক্যে এই আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ এখন পরাধীন, দুর্বল, দরিদ্র, নানা দলে বিভক্ত। তাহার পক্ষে স্বাধীন, প্রবল, ঐশ্বর্য্যশালী ও অনেকটা একমত ব্রিটেনের সমান অংশীদার হওয়াটা খুব একটা গৌরবপূর্ণ ভবিষ্যৎ মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগকে কেহ কল্পনাবিলাসী মনে করিলেও আমরা অন্য একটা বিদেশী রাষ্ট্রমণ্ডলের অন্তর্গত ও তাহার অন্যান্য অংশের সমান অংশীদারত্ব গৌরবের কথা মনে করি না। প্রকৃতি আমাদিগকে বৃহত্তর ব্রিটেনের অংশ করেন নাই,

বৃহত্তর ব্রিটেনের অংশ হওয়া আমাদের চরম পরিণতি নহে, হইতে পারে না।

ব্রিটেনের আয়তন ৮৯,০৪১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা সাড়ে চারি কোটি। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮,০৮,৬৭৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটির উপর। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতাতে তাহার স্বকীয় এমন কিছু ছিল ও আছে, যাহা ব্রিটেনের ছিল না ও নাই। সুতরাং বৃহত্তর ব্রিটেনের অংশ হওয়া আমাদের ভবিষ্যৎ চরম আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে পারে না—তাহা যে কোন সর্তেই হউক না কেন। আপাততঃ আমরা যাত্রাপথে সুবিধাজনক পান্থশালা যাহা পাই, তাহাতে অস্থায়ী ভাবে থাকিতে পারি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তাহা পান্থশালা মাত্র।

কংগ্রেসের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যদি ছাড়াছাড়ি না হইত, কংগ্রেস যদি ভিন্ন ভিন্ন উপদলে বিভক্ত হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে বড়লাটের বিবৃতির সুর ও চেহারা অন্য প্রকারের হইত বলিয়া মনে করি।

বিবৃতিতে যে বলা হইয়াছে যে, সংখ্যালঘুদের মতামতের পূর্ণ গুরুত্ব স্বীকার করিয়া কাজ করা হইবে, ভারতবর্ষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দায়িত্ব এমন কোন শাসনতন্ত্রকে হস্তান্তরিত করা হইবে না যাহার কর্তৃত্বাধিকার ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের বৃহৎ ও শক্তিশালী কোন কোন উপাদান কর্তৃক অস্বীকৃত, এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে এরূপ শাসনতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করাইতে বলপ্রয়োগ করিতে পারেন না, কার্যতঃ তাহার মানে এই হইবে যে, সংখ্যালঘুদিগকে (অর্থাৎ প্রধানতঃ মুসলিম লীগকে) আপত্তি করিয়া কংগ্রেসের স্বাধীনতা ও স্বশাসনের দাবী প্রতিরোধ ও ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। গণতান্ত্রিক দেশসমূহের ইতিহাসে দেখা যায়, শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মত অনুসারেই কাজ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতের পূর্ণ গুরুত্ব স্বীকার না করিয়া সংখ্যালঘুদের মতকেই প্রাধান্য দিতেছেন নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াটা কি পাপ, না আইনের চোখে অপরাধ? ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সংখ্যালঘুদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবী অনুযায়ী শাসনতন্ত্র মানাইবার নিমিত্ত বলপ্রয়োগ করিতে পারেন না বলিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা ত সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু সবাইকারই উপর বলপ্রয়োগ করিয়া নিজেদের শাসনতন্ত্র মানাইয়া আসিতেছেন? এখন তবে বলপ্রয়োগ-বিরোধিতার ভান, "অহিংস" হইবার ভান, কেন করিতেছেন?

বলা হইয়াছে, কোন কোন শক্তিশালী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসের কর্তৃত্ব করিবার অধিকার স্বীকার করেন না, সুতরাং গবর্মেণ্ট এই সংখ্যালঘু দলগুলিকে কংগ্রেসী শাসন মানাইবার নিমিত্ত বলপ্রয়োগ করিবেন না। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী দল যে কংগ্রেস তাহাও ত গবর্মেণ্টের কর্তৃত্ব করিবার অধিকার মানে না। গবর্মেণ্ট তাহাকে বলপ্রয়োগ দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করাইতে কেন চান? তাহার উপর বলপ্রয়োগ কেন করিয়াছেন?

—

সুভাষবাবুর মুক্তির প্রশ্ন

পার্লেমেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব বলিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু হলওয়েল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে নেতা- রূপে অভিযান শুরু করিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী কথা দিয়াছেন যে, ঐ মনুমেণ্ট এখন যেখানে আছে সেখান হইতে সরাইয়া ফেলা হইবে, এবং বঙ্গের আইন-সভায় কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও হলওয়েল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, সুভাষবাবুকে এখনও কেন মুক্তি দেওয়া হয় নাই? বিলাতী পার্লেমেণ্ট বহু দূরে, এখন সেখানে এয়ার মেলের চিঠিও যদি পৌছে, তাহা হইলেও পাঁচ সপ্তাহের আগে পৌছিবে না। কিন্তু বঙ্গের আইন-সভা নিকটেই, তাহার বৈঠকও চলিতেছে। কোন সদস্য সেখানে প্রশ্নটা তুলিতে পারেন। বিলাতেও টেলিগ্রাফ দ্বারা পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন করান যাইতে পারে। জেলে সুভাষবাবুর স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছে, দেহের ওজন কমিয়া যাইতেছে। [২৩শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট।]

—

ইস্লামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব

জাতিবর্ণ-বাসস্থান-নির্বিশেষে সকল মানুষের ভ্রাতৃত্ব অতি উচ্চ আদর্শ। খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচারকগণ ও অন্য সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের ধর্মে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ উপদিষ্ট হইয়াছে। অগণিত খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী লোকে তাহাদের আচরণ দ্বারা প্রমাণ করে, যে, তাহারা এই উপদেশ মানে না। ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনেক জাতিও মুখে খ্রীষ্টিয়ান হইলেও এই বিষয়ে অ-খ্রীষ্টিয়ান। কিন্তু অন্য দিকে দেখা যায়, এমন অনেক খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁহারা জাতিবর্ণ-বাসস্থান-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃভাবাপন্ন এবং তাহাদের হিতকামী ও হিতব্রতী।

মুসলমানেরাও বলিয়া থাকেন তাঁহাদের শাস্ত্রে বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপদেশ আছে। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব কি অর্থে তাঁহাদের শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে জানি না। ইহার অর্থ দুই রকম হইতে পারে। এক অর্থ এই যে, সব দেশের সব জাতির সব রঙের মানুষ পরস্পরের ভাই। আর এক অর্থ পৃথিবীর সব জায়গার মুসলমান, তাহাদের গায়ের রং যাহাই হউক, পরস্পরের ভাই। কোন্ অর্থটি ঠিক, বলিতে পারি না। কিন্তু এক বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। মুসলমানদের মধ্যে শাদা, কালা, হলদে মানুষের মধ্যে সেরূপ কোন বর্ণভেদ নাই যেরূপ ভেদ শাদা খ্রীষ্টিয়ান, কালা খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতির মধ্যে আছে। হিন্দুদের কথা বলিতেছি না এই জন্য যে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ সুবিদিত।

দেশ প্রদেশ ভেদ সত্ত্বেও সব মুসলমান ধর্মভাই, এই কথা গত মাসে বঙ্গের আইন-সভায় প্রধান মন্ত্রী ও অন্য কয়েক জন মুসলমান বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন বঙ্গের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভার একটা সিদ্ধান্তের সমর্থনে। বঙ্গের সরকারী চাকরীগুলার শতকরা পঞ্চাশটা মুসলমানেরা পাইবে, এইরূপ একটা সরকারী নিয়ম হইয়াছে। এরূপ নিয়ম আমরা কখনও ন্যায়সঙ্গত বা দেশের পক্ষে হিতকর বলিয়া স্বীকার করি নাই; ইহাই বার-বার বলিয়াছি যে, উহা অন্যায় ও দেশের পক্ষে অনিষ্টকর, এবং তাহার কারণও দেখাইয়াছি। সর্বাধিক যোগ্যতার জোরে মুসলমানেরা সব চাকরী পাইলেও তাহা ন্যায্য আপত্তির বিষয় হইত না। সে সব কথার পুনরুল্লেখ করিব না। মুসলমানদের ভাগে শতকরা যে ৫০টি চাকরী রাখা হইয়াছে, তাহার কোন কোনটির জন্য যোগ্য মুসলমান বঙ্গে পাওয়া যায় না। বঙ্গের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভা সেরূপ ক্ষেত্রে স্থির করিয়াছেন যে, মুসলমানদের ভাগের কোন চাকরীর জন্য বঙ্গনিবাসী বাঙালী মুসলমান পাওয়া না গেলে বঙ্গের বাহির হইতে অবাঙালী মুসলমান আনিয়া তাহাকে ঐ চাকরী দেওয়া হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনসভায় যে তর্কবিতর্ক হয়, সেই উপলক্ষ্যে প্রধান মন্ত্রী ও অন্য কোন কোন মুসলমান সদস্য সব মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের কথা পাড়েন। তাঁহাদের কথাটার মানে এই যে, যেহেতু অবাঙালী মুসলমান বাঙালী মুসলমানের ভাই, অতএব বাঙালী মুসলমানের প্রাপ্য চাকরীটা, যোগ্য বাঙালী মুসলমান প্রার্থীর অভাবে অবাঙালী মুসলমানকে দিলে শুধু যে কোন দোষ হয় না তাহা নহে, বরং তাহা দেওয়াই উচিত এবং তদ্দ্বারাই মুসলমান-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এখন আমাদের বক্তব্য বলি।

ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে চাকরী ভাগের আমরা বিরোধী। আমাদের মতে চাকরোকে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা দেশের সরকারী কাজ করিবার নিমিত্ত দেওয়া হয়—হিন্দু-সম্প্রদায়ের কাজ করিবার জন্য দেওয়া হয় না, মুসলমান-সম্প্রদায়ের কাজ করিবার নিমিত্তও দেওয়া হয় না, সকল সম্প্রদায়ের হিতকর কাজ করিবার নিমিত্ত দেওয়া হয়। চাকরী সম্প্রদায়নির্বিশেষে যোগ্যতমকে দেওয়া উচিত এই জন্য যে, যোগ্যতমের নিকট হইতেই সকলের চেয়ে ভাল কাজ, উৎকৃষ্টতম ও অধিকতম কাজ, পাওয়া যাইবে! কিন্তু সরকারী চাকরীগুলার সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা যত দিন না রদ হইতেছে, তত দিন দেখিতে হইবে উহা অনুসারে কত দূর চলা যায় এবং উহা অনুসারে সরকারী কাজ কত ভাল ও কত বেশি হইতে পারে। ঐ বাঁটোআরা অনুসারে বাঙালী মুসলমানদের প্রাপ্য কোন চাকরীর জন্য যত বাঙালী মুসলমান উমেদার দরখাস্ত করিবে, তাহাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই চাকরীটি দেওয়া

উচিত, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু যদি এরূপ কোন চাকরীর জন্য ন্যূনতমযোগ্যতাবিশিষ্ট কোন বাঙালী মুসলমানও না-পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাহাকে চাকরী দেওয়া হইবে? এই প্রশ্নের ন্যায্য এবং ভারতশাসন-আইন-অনুযায়ী প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব (provincial autonomy)-নীতি সঙ্গত এক মাত্র উত্তর, অমুসলমান যোগ্য কোন বাঙালীকে দিতে হইবে। বাংলা দেশ হইতে যত রাজস্ব আদায় হয় তাহার একটা অংশ ভারত-গবন্মেণ্ট লইয়া থাকেন। বাকী যাহা থাকে, তাহা দ্বারা বাংলা দেশের কাজ সকল সম্প্রদায়ের বাঙালীদের দ্বারা এবং সকল সম্প্রদায়ের বাঙালীদের সুবিধার জন্য চালাইতে হইবে। ইহাতে বঙ্গের বাহিরের কোন লোকের কোন দাবী নাই। বঙ্গের বাহিরের কেহ বঙ্গের বাহির হইতে বঙ্গের রাজস্বে এক পয়সাও দেন না—সুতরাং কোন অবাঙালীর মুসলমান বলিয়াই বঙ্গে চাকরী পাইবার কোন দাবী থাকিতে পারে না। বঙ্গের হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ট্যাক্স দেন প্রধানতঃ বঙ্গের লোকদের সুবিধার নিমিত্ত এবং অংশতঃ সমগ্রভারতের সুবিধার নিমিত্ত। যাহা সমগ্রভারতের সুবিধার নিমিত্ত দেওয়া হয়, তাহা ত ভারত-গবন্মেণ্ট লইয়াই থাকেন। বাকী যাহা থাকে, কোনও প্রকারে বা আকারে তাহাতে ভাগ বসাইবার অধিকার কোন অবাঙালী মুসলমানের বা হিন্দুর নাই, সেরূপ অধিকার তাহাকে দিবার অধিকারও বঙ্গের মুসলমান মন্ত্রীদের নাই।

যদি বঙ্গের কোন চাকরীর নিমিত্ত কোন ধর্ম-সম্প্রদায়েরই কোন যোগ্য বাঙালী না-পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অবশ্য অবাঙালীকে দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অবাঙালীকে কাজ দিবার এরূপ কোন অবস্থা ঘটে নাই—যে-যে কাজে বঙ্গের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভা বঙ্গের বাহির হইতে মুসলমান আমদানী করিয়াছেন বা করিতে চান, তাহার প্রত্যেকটির নিমিত্ত যোগ্যতম বা যোগ্যতর হিন্দু বাঙালী ছিল ও আছে।

যোগ্য বাঙালী থাকিতেও যে কতকগুলি উচ্চ পদে ইংরেজ ও অন্য অ-বাঙালী নিযুক্ত আছেন, তাহা ভারতবর্ষের ও বঙ্গের পরাধীনতার ফল। তাহার আলোচনা এখন করিতেছি না। এখন প্রাদেশিক চাকরীর কথাই হইতেছে, 'সাম্রাজ্যিক' চাকরীসমষ্টির (Imperial servicesএর) কথা হইতেছে না।

বঙ্গের বাহিরের মুসলমানেরা বঙ্গের রাজস্বের কোন অংশ দেন না, দুর্ভিক্ষ আদি বঙ্গের বিপদে আপদে সকল বাঙালীর কিংবা কেবল বাঙালী মুসলমানদেরও সাহায্য করেন না, বাঙালীদের জন্য কিংবা শুধু বাঙালী মুসলমানদেরও জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন করেন না, বঙ্গের বাঙালীদের কিংবা শুধু বাঙালী মুসলমানদেরও নিমিত্ত কৃষিশিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি উপার্জনের ক্ষেত্রে উপার্জনের উপায় করিয়া দেন না—এই সমুদয় ব্যাপারে ইস্‌লামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বমুসলমান-ভ্রাতৃত্বের কোন প্রমাণ বঙ্গের বাহিরের মুসলমানেরা দেন না। বাংলা দেশকে কিছু দিবার বেলায় তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন বাংলার মুসলমানেরা তাঁহাদের ভাই নহেন। কিন্তু বাঙালী মুসলমান মন্ত্রীরা বলিতেছেন, "তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের ভাই, বঙ্গের এই-এই চাকরী এবং বঙ্গের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত তাহার বেতন মেহেরবাণী করিয়া তোমাদিগকে লইতেই লইবে, নতুবা চাকরীগুলা সেই হিন্দুদের হাতে যায় যাহারা আমাদের কেহ নহে। তোমরাই আমাদের সর্বস্ব।"

—

বাহির হইতে মুসলমান চাকুরে আমদানী

বঙ্গের কোন কোন মুসলমানের—হয়ত অনেক মুসলমানেরই, এইরূপ ধারণা আছে শুনিয়াছি যে এ-যাবৎ হিন্দুরাই তাহাদিগকে সরকারী চাকরি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, অনেক চাকরির জন্য ন্যূনতমযোগ্যতাবিশিষ্ট বাঙালী মুসলমানও পাওয়া যায় না। দুই-চারিটা অপেক্ষাকৃত বড় চাকরির বেলাতেই এই কথাটা খবরের কাগজে প্রকাশ পায়, কিন্তু কোন কোন অপেক্ষাকৃত ছোট চাকরির জন্যও মুসলমান বাঙালী পাওয়া যায় নাই।

ইহা হইতে বুঝা উচিত, হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে নাই, যোগ্যতার অভাবেই তাঁহারা

বঞ্চিত ছিলেন। চাকরি দিবার মালিক ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বহু বৎসর হইতে তাঁহাদিগকে চাকরি দিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন ও আছেন। শিক্ষালাভ করিবার উপায় স্বরূপ ইস্কুল কলেজগুলির দ্বার মুসলমানদের জন্যও খোলা ছিল, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে অনেক বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়া আসিতেছে। অতএব সরকারী চাকরি তাঁহারা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী না-পাওয়ার জন্য হিন্দুদিগকে দোষী না করিয়া আপনাদিগকেই দোষী করা উচিত। ভারতবর্ষের যে-কয়টি প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় অধিকতম, সেখানে তাঁহারা ত বেশী বেশী চাকরি পাইতেছেনই, আবার যে-যে প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যায় কম সেখানেও সরকারী নিয়মের জোরে তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিকতর চাকরি পাইতেছেন। এ-অবস্থায় যোগ্য কোন মুসলমানের নিজের প্রদেশ ছাড়িয়া বঙ্গে চাকরি করিতে আসিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং বঙ্গের বাহির হইতে যে-যে মুসলমানকে আনা হইবে, তাহারা যে সাধারণতঃ কি দরের মানুষ হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাঙালী মোহম্মদীয়েরা নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতেছেন না। তাঁহাদের প্রাপ্য ৫০টি চাকরীর মধ্যে একটি যদি বাহিরের কোন জাতভাইকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেটি তাঁহাদের হাতছাড়া হয়, এবং পরবর্তী খালি পদেও তাঁহাদের দাবী থাকে না। কিন্তু যদি তাহা বাঙালী মোহম্মদীয়ের অভাবে বাঙালী হিন্দুকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দু পান ৫১টি এবং তাঁহারা পান ৪৯টি; সুতরাং পরবর্তী খালি পদটিতে তাঁহাদের দাবী থাকে।

—

ইতিহাসে মুসলমান বিশ্বভ্রাতৃত্ব

মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব যতটা আছে তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। আমরা আগে সেই ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বঙ্গের আইন-সভায় মুসলমান মন্ত্রী ও সদস্যেরা ইহার যেরূপ অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক। অতীত ও আধুনিক ইতিহাসে আরবের ও তুরস্কের বহু ঘোরতর যুদ্ধের বর্ণনা আছে। আরবের ইরাণের তুর্কিস্থানের তাতারের আফগানিস্থানেরও পরস্পর এইরূপ বহু যুদ্ধের বর্ণনা আছে। এইগুলা বাস্তব কোন বিশ্বজনীন মুসলমান ভ্রাতৃত্ব যে ছিল না এবং এখনও নাই, তাহার প্রমাণ।

ভারতবর্ষের বাহিরের এই সকল মুসলমান দেশের ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, মুসলমান ভ্রাতৃত্ব কেতাবে লিখিত থাকিলেও পাঠানের সহিত মুঘলের, মুঘলের সহিত পাঠানের এবং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মুসলমান রাজাদের ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে বিস্তর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাদির শাহ ও অন্য কোন কোন মুসলমান বিজেতা যখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ আক্রমণ করেন, তখন তথায় মুসলমান রাজারই রাজত্ব ছিল।

এক দেশের মুসলমান-সমষ্টির সহিত অন্য দেশের মুসলমান-সমষ্টির যে কার্যগত কোন ভ্রাতৃত্ব নাই, তাহার দ্বারা ইস্লামের বা মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হয় না। খ্রীষ্টীয় জগতেও এরূপ ভ্রাতৃত্ব ছিল না, এখনও নাই; হিন্দু জগতেও ছিল না ও নাই।

এখন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে বিশ্বজনীন সর্বসাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের খোশামোদ করিয়া ও তাহাকে ঘুষ দিয়া কিম্বা কাহাকেও উৎপীড়ন করিয়া ও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহা করা যাইবে না।

—

কেন্দ্রীয় কার্যক্ষেত্রে বাঙালীও চাই

কলিকাতা যখন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, তখন বাঙালীরা ভারত-গবর্মেণ্টের নিকটতম জাতি বলিয়া, এবং যোগ্যতার বলেও, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের ছোট বড় অনেক কাজ পাইত—বিশেষ করিয়া ছোট ও মাঝারি কাজ অনেক পাইত। এখন সে সুবিধা নাই। কিন্তু আগে যেমন এখনও সেইরূপ বাংলা দেশের লোকসংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশি আছে এবং ভারত-গবর্মেণ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বাংলা দেশ হইতে যত টাকা পান অন্য কোন প্রদেশ হইতে তত পান না। এই জন্য ভারত-

গবর্ন্মেণ্টের সব কাজের একটা ন্যায্য অংশ' আমরা চাই—অনুগ্রহ হিসাবে নহে, অন্য কাহাকেও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নহে, যোগ্যতার জোরে চাই। এবং ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া চাই। এই হেতু পুরাতন ও নূতন দিল্লীতে এবং সিমলায় বাঙালীর প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাই। দিল্লীতে বাঙালীদের বিদ্যালয় আছে, একটি কলেজ থাকাও আবশ্যক। আগে আগে একথা বলিয়াছি, আবার বলিতেছি। এই সব জায়গায় বড় বড় ব্যবসা ও কারখানাও বাঙালীর থাকা আবশ্যক।

—

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগে বাঙালীর নিয়োগ

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের অঙ্গস্বরূপ যে শিক্ষা-বিভাগ আছে তাহার কর্মাধ্যক্ষকে আগে ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারাল বলিত, এখন শিক্ষা-কমিশনার বলে। বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম-এ, পীএইচ-ডী, তাঁহার টেক্নিক্যাল সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ডক্টর সেন শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা কেন্দ্রীয় বোর্ডের সেক্রেটরীর কাজও করিবেন।

এই নিয়োগে আমরা প্রীত হইয়াছি।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির যে শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষের পদ ৯ মাস খালি আছে, যাঁহার নিয়োগ গত এপ্রিল মাসে হইয়া যাওয়া উচিত ছিল এবং যাঁহার নিয়োগ এখনও না-হওয়া নবগঠিত কর্পোরেশ্যনের অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ, সেই শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষের পদের ধীরেন্দ্রবাবু এক জন প্রার্থী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে যোগ্যতম প্রার্থী বলিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতার কাজটি অপেক্ষা উচ্চতর কাজ পাওয়ায় আমাদের মতের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে।

—

রবীন্দ্রনাথের নূতন 'সম্মান'

উক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Oxford University) রবীন্দ্রনাথকে সম্মানার্থ সাহিত্যাচার্য (Doctor of Literature, *honoris causa*) উপাধি দিয়া যে স্বয়ং সম্মানিত হইয়াছেন, তাহা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদাতা প্রতিনিধি ফেডার‍্যাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস গোয়াইয়ার (Sir Maurice Gwyer) তাঁহার বক্তৃতায় স্বয়ং বলিয়াছেন ("the University whose representative I am has, in honouring you, done honour to itself")। ইহাও সত্য যে, এই সম্মান রবীন্দ্রনাথ না পাইলে তাঁহার কিছুই অগৌরব হইত না, পাওয়াতেও গৌরব বাড়িল না। তথাপি ইহা তুচ্ছ নহে। উক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার জ্ঞানগৌরব আছে। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী জাতির প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়াও ইহার একটা লৌকিক প্রতিষ্ঠা আছে। তাহার পক্ষে পরাধীন ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয় কবিকে সম্মান প্রদান দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক-নির্বিশেষে মানব সম্পর্ক স্বীকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। বিদ্যা সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক প্রতিভায় শ্রেষ্ঠতা অন্য দিকে শ্রেষ্ঠতার অস্তিত্বের অন্ততঃ পরোক্ষ প্রমাণ, ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা না-মানিতে পারে, কিন্তু উক্সফোর্ডের মত রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় যখন এ-সকল বিষয়ে যোগ্যতার আদর করিয়াছেন, তখন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও এই উৎকর্ষ-মানিয়া-লওয়ার প্রভাব পড়িবেই।

কবির ব্যক্তিত্বে ও জীবনে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সহিত তাঁহার স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক মত ও কার্য্যের যোগ যে মধ্যে মধ্যে হইয়াছে তাহা বিচারপতি হেণ্ডার্সন স্বরচিত ও স্বকথিত কবিসার্বভৌমের সত্য প্রশস্তিতে বলিয়াছেন।*

রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দানের নিমিত্ত উক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সর্ মরিস গোয়াইয়ারের সমক্ষে উপস্থিত করা উপলক্ষ্যে লাটিন ভাষায় লিখিত এই প্রশস্তিটি পঠিত হয়। ইংরেজী অনুবাদে ইহার উৎকর্ষ কতকটা বুঝা যায়। মূল লাটিনে বোধ হয় ইহা আরও

*"Let it also be said that he has not valued a sheltered life so far above the public good as to hold himself wholly aloof from the dust and heat of the world outside; for there have been times when he has not scorned to step down into the market-place; when, if he thought that a wrong had been done, he has not feared to challenge the British raj itself and the authority of its magistrates; and when he has boldly corrected the faults of his own fellow-citizens."

উৎকৃষ্ট। কিন্তু বিচারপতি হেণ্ডার্সন যেরূপ গড়গড় করিয়া লাটিন পড়িয়া গেলেন, তাহাতে কোন বাগ্মিতা না-থাকায় শুনিয়া রচনাটির বিষয়গৌরব বা ভাষার উৎকর্ষ কিছুই বুঝা যায় নাই। সর্ মরিস গোয়াইয়ারের বক্তৃতা এবং কবির প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যক্তিগত আচরণ ও ভঙ্গী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সংস্কৃত, লাটিন ও ইংরেজী ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা না-মানিলেও তাহাতে সত্য আছে এবং তাহাতে বক্তার বিজেতৃজাতিসুলভ দম্ভের অভাব সূচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে উক্ত তীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্যাচার্য' পদবীসম্মান দিবার কথা অনেক বৎসর পূর্বে উঠিয়াছিল। তখন তাহা দেওয়া হয় নাই। এখন দিবার রাজনৈতিক কারণ হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রতীচ্য এক প্রভুজাতির রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণ দ্বারা প্রাচ্যের এক পরাধীন দেশের কবিঋষিকে সম্মান প্রদান স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া থাকিবে।

—

সর্ অতুল চট্টোপাধ্যায় পুনরায় সম্মানিত

সর্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং যোগ্যতার জোরে শেষ পর্যন্ত বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্যও হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কোন প্রদেশের গবর্ণর করা উচিত ছিল। তিনি বিলাতে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার হইয়াছিলেন। জেনিভায় লীগ অব নেশুন্স ও ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার আফিস সম্পর্ক অনেক উচ্চ কাজ তিনি করিয়াছিলেন। তিনি আগে লণ্ডনে রয়াল সোসাইটি অব্ আর্টসের কৌন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আবার সেই সম্মানিত পদে তাঁহার নির্বাচন হইয়াছে। যোগ্য লোককেই নির্বাচন করা হইয়াছে।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা-বিরোধী দিবস

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের মত মহা অনিষ্টকর চাল কূটনীতিবিশারদ ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা পূর্বে কখনও চালেন নাই। ইহা উল্টাইয়া দিতে না পারিলে ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই। ১লা ভাদ্র (১৭ই আগস্ট) উহার বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র সভা করিয়া আন্দোলন করিতে হইবে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ বহু দেশনায়ক এই নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা পালন করা একান্ত আবশ্যক।

—

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার প্রসিদ্ধ গানে যে-জন্মভূমিকে সকল দেশের সেরা বলিয়াছেন, সেটি কোন্ দেশ? বর্তমান ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই সে দেশ নহে। কেন না, ইহার দুর্গতি ও হীন অবস্থা দেখিলে ইহাকে কেহ সকল দেশের সেরা বলিতে পারেন না। অতীতগৌরবমণ্ডিত ভারতবর্ষকেও সকল দেশের সেরা বলা যায় না, কারণ অতীতের যে যুগই লওয়া যাউক, প্রত্যেক যুগেই শ্লাঘ্য অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ নিন্দনীয়ও কিছু না কিছু ছিল; এবং তাহা অতীতের ভারত, বর্তমানের নহে—এখন বিদ্যমান নাই।

কবি সেই ভবিষ্যৎ ভারতকে সকল দেশের সেরা বলিয়াছেন যাহাতে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অংশের এবং দেশভক্ত মনীষীদিগের 'স্বপ্ন'দৃষ্ট আদর্শের অপূর্ব সংমিশ্রণ হইতে থাকিবে!

—

৪ঠা আগস্টের প্রতিবাদ-দিবস

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধক দ্বিতীয় বিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, কৃষিঋণ আইন সংশোধন বিল, বঙ্গের বাহির হইতে মুসলমান চাকর্যে আমদানী, ও বঙ্গের মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভার অন্যান্য কার্যের অন্তর্নিহিত নীতির প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার টাউনহলে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে ঘোষণা করা হয় যে, ৪ঠা আগস্ট বঙ্গের সর্বত্র ঐরূপ প্রতিবাদ করা হইবে। এই ঘোষণা অনুসারে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, বঙ্গের সকল অঞ্চলে বহুসংখ্যক বৃহৎ সভায় মন্ত্রীদের কাজের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। বসু-দলের লোকেরাও প্রথমোক্ত দুইটি বিলের বার-বার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

—

কৃষিঋণ আইন সংশোধন বিল

"আর্থিক জগৎ" পত্রিকার নিম্নমুদ্রিত মন্তব্য হইতে কৃষিঋণ আইন সংশোধন বিলের স্বরূপ বুঝা যাইবে।

"বিলটির মর্ম্ম এই যে ঋণসালিশী আইন পাস হইবার পূর্ব্বে আদালতের ডিক্রী-বলে কৃষকের যে সমস্ত জমি ভূম্যধিকারী অথবা মহাজনের হাতে চলিয়া গিয়াছে তাহা ডিক্রীদারগণকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া পুনরায় কৃষকের হাতে প্রত্যর্পণ করা হইবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যুক্তি এই যে ঋণসালিশী আইন পাস হইবার উপক্রম দেখিয়া বহু ব্যক্তি তাড়াহুড়া করিয়া তাহাদের পাওনা টাকার জন্য ডিক্রী মূলে কৃষকের জোত জমি হস্তগত করিয়াছিল। কাজেই বর্ত্তমানে উহার প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে। এই আইনের বলে ঋণসালিশী আইন পাস হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কত বৎসর সময়ের মধ্যে হস্তান্তরিত জমি পুনরায় কৃষককে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, 'উপযুক্ত' ক্ষতিপূরণ কি ভাবে নির্দ্ধারিত হইবে, এই ক্ষতিপূরণের টাকা একসঙ্গে না বহু বৎসরের কিস্তিতে দেওয়া হইবে, টাকা দেওয়ার দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে এখন কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে আইন প্রণেতাগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক আইনে যে প্রকার মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ঋণসালিশী আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ততঃ দশ বৎসর কালের মধ্যে যে সমস্ত জমি খাজনা বা ঋণের জন্য কৃষকের হস্তচ্যুত হইয়াছে তাহা এই আইনের আমলে আনা হইবে। অধিকন্তু 'উপযুক্ত' ক্ষতিপূরণের নামে ভূম্যধিকারী ও মহাজনের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ যথাসম্ভব কম করিয়া ধরা হইবে। এতদুপরি এই টাকা পরিশোধের দায়িত্ব কৃষকের উপর ফেলিয়া তাহাদিগকে বহু বৎসরের কিস্তি দেওয়া হইবে—এরূপ আশঙ্কাও রহিয়াছে। মোটের উপর এই আইন পাস হইলে দেশের বহু মধ্যবিত্ত পরিবার—যাহারা জমির খাজনা ও দাদনী টাকা হইতে বঞ্চিত হইয়া কোনওরূপে খামার জমির ফসল দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতেছে তাহারাও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।"

"ঋণসালিসী আইন পাস হইবার উপক্রম" কয় বৎসর আগে জানা গিয়াছিল? তাহার আগেকার ডিক্রীর ফলে হস্তান্তরিত জমিও প্রত্যর্পণের জন্য আইন করা ত অত্যন্ত অসঙ্গত ও অন্যায় হইবেই, দুই তিন বৎসর আগে হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পণের ব্যবস্থাও অন্যায় হইবে।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

বাঙালীদের বৈশিষ্ট্য প্রভাব প্রতিপত্তি এখনও যাহা আছে, তাহা বহু পরিমাণে তাহাদের শিক্ষার ফল। আমরা প্রধানতঃ হিন্দু বাঙালীদের কথা বলিলেও মুসলমান বাঙালীদিগকে বাদ দিতেছি না। তাঁহাদের মধ্যেও শিক্ষিতদের প্রভাব প্রতিপত্তি বঙ্গে প্রাপ্ত শিক্ষার ফল। বাঙালীদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং স্বাধীনতা পাইবার চেষ্টা তাহাদের শিক্ষাপ্রসূত। তাহাদের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের চক্ষুশূল। বাঙালীদের নবজাত শিল্প-বাণিজ্যোদ্যমও সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজদের চক্ষুশূল। প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার সমুদয় স্তর গবর্মেণ্টের করায়ত্ত করিতে না-পারিলে বাঙালীর স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা ও শিল্প-বাণিজ্য-প্রচেষ্টা নির্মূল করা যাইতে পারিবে না। এই কারণে সমুদয় শিক্ষালয়ের উপর সরকারী ক্ষমতা বিস্তার আবশ্যক। ব্যাপক ও প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ সরকারী প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। মাধ্যমিক উচ্চবিদ্যালয়গুলির উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে হইলে, তাহাদের উপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষমতা ও প্রভাব আছে, তাহা বিনষ্ট করা আবশ্যক। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা একাধিক প্রদেশে বিস্তৃত, যেমন কলিকাতার এলাকা আসামেও বিস্তৃত, তাহার সম্বন্ধে কোন আইন করা ভারতশাসন-আইন অনুসারে প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট ও আইনসভার ক্ষমতাবহির্ভূত ছিল। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সময়ই পার্লেমেণ্টে ঐ আইন সংশোধন করিয়া সে বাধা দূর করা হইয়াছে! ইহা বাঙালীর মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের নিমিত্ত আবশ্যক ছিল বলিয়া যুদ্ধের সময়ই সংশোধনটা জরুরি হইয়াছিল! বাধা দূর হওয়ায় এখন বঙ্গের মন্ত্রীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে আইন করিতে পারেন। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা বিল রচিত ও সরকারী কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বিলটা আইনে পরিণত হইলে মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়গুলির রকম বার আনা যে উঠাইয়া দেওয়া হইবে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষা-বিভাগের জেঙ্কিন্স সাহেব পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে ছিল, তিন-চারি শত মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ই বাংলা দেশের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মুসলমান মন্ত্রীরাও ত বাঙালী, বঙ্গের শিক্ষাসংকোচে তাঁহাদের কি লাভ? লাভ একাধিক প্রকারের। তাঁহারা স্বপদে আসীন হইয়াছেন ইংরেজ

গবর্মেণ্টের কৃপায় এবং স্বপদে আসীন আছেন ইংরেজ সদস্যদের সমর্থনের জোরে। ইংরেজ সদস্য ও ইংরেজ রাজপুরুষেরা জাতভাই ও এক-দিল্। উক্ত মন্ত্রীদের লাভ এই যে, শিক্ষাসংকোচ দ্বারা এই সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ মালিকদিগকে খুশি করা যাইবে। আর একটা লাভ, ঈর্ষ্যাভাজন হিন্দু বাঙালীদিগকে ইহা দ্বারা জব্দ করা যাইবে, তাহাদের সংস্কৃতির ও শ্রীবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইবে। ইহা ঠিক্ বটে যে, হিন্দু বাঙালীর স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পাইয়া অনেক মুসলমান শিক্ষিত হইয়াছেন; সুতরাং হিন্দুর উন্নতিতে মুসলমানেরও উন্নতি হইয়াছে। অধিকন্তু, মুসলমান মন্ত্রীরা ও আইন-সভার মুসলমান সদস্যেরা যতটুকু রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ হিন্দুদের আন্দোলনের ফলে, সুতরাং হিন্দুর মনের হীনতা ঘটিলে রাষ্ট্রীয় অধিকার আর বেশি পাওয়া দুর্ঘট হইবে। এসব কথা সত্য, কিন্তু এ সকলের চিন্তা প্রভুত্বসম্পন্ন মুসলমানদের মনে উদিত হয় না।

তদ্ভিন্ন, বিলটাতে একটা ফিকির আছে যাহার বলে কর্তৃপক্ষ সেই সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেচ্ছ কমাইতে পারিবেন কিংবা তাহাদের সম্বন্ধে খুব কড়া নিয়ম করিতে পারিবেন যাহাতে হিন্দুরা বা প্রধানতঃ হিন্দুরা পড়ে ও মুসলমানদের জন্য অভিপ্রেত সব বিদ্যালয় রাখিতে ও বাড়াইতে পারিবেন, এবং নিয়মাবলীর কঠোরতা হইতে মুসলমান ছাত্রদিগকে নিষ্কৃতি দিয়া হিন্দু ছাত্রদের উপর জবরদস্তি করিতে পারিবেন। এই কৌশলটা ৪৭ ধারার আকারে বিলের মধ্যে বিরাজমান। ঐ ধারাটা এই :

"47. The Provincial Government may by notification exempt any secondary school or class of secondary schools, or any student or class of students in any secondary school, from the operation of all or any of the provisions of this Act, and the powers of the Board, of the Executive Council and of any Committee constituted under this Act shall be deemed to be limited in proportion to the extent of such notification."

বাংলা দেশে কর্তৃপক্ষের কুব্যবস্থার ফলে বহু বৎসর ধরিয়া শিক্ষামন্ত্রী ক্রমান্বয়ে সেই সম্প্রদায় হইতে নিযুক্ত হইতেছে, অধিকাংশ স্কুলপরিদর্শক লওয়া হইতেছে সেই সম্প্রদায় হইতে এবং সরকারী ও সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে অধিকাংশ শিক্ষক লওয়া হইতেছে সেই সম্প্রদায় হইতে যাহা শিক্ষায় অনগ্রসর; এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় আইনও করিতেছে সেই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোক! ইহা অন্যায়, অনিষ্টকর ও শোচনীয় ব্যবস্থা। শিক্ষার উচ্চতর স্তরের কথা ছাড়িয়া দিয়া মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কথাই ধরুন।

বালকবালিকাদের নিমিত্ত যে ১৩০৪টি উচ্চ বিদ্যালয় আছে, তাহার মধ্যে সরকারী ৪৯টি, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ৬২৮টি এবং সম্পূর্ণ বেসরকারী ৬৩১টি। সরকারী ৪৯টি বাদে যে ১২৫৫টি থাকে, তাহার মধ্যে গোটা বার মুসলমানদের স্থাপিত, বাকী বার শতাধিক বিদ্যালয় হিন্দুদের স্থাপিত। ১৩০৪টি বিদ্যালয় চালাইতে যত খরচ হয়, তাহার কেবল শতকরা ১৮ ভাগ সরকার দেন, বাকী ৮২ ভাগ দেশের লোকেরা দেন। সরকারী ১৮ ভাগ প্রদত্ত হয় সরকারী রাজস্ব হইতে যাহার অন্ততঃ শতকরা ৭৫ টাকা হিন্দুর ট্যাক ও পকেট হইতে আসে। দেশের লোকেরা যে ৮২ ভাগ দেয় তাহারও অধিকাংশ যে হিন্দুরা দেয় তাহা উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু ছাত্রদের আধিক্য হইতেও বুঝা যাইবে।

উচ্চবিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ১,৬৮,০০০। তন্মধ্যে "উচ্চ" বর্ণের হিন্দু ছাত্র ১,২২,০০০, তপসিলভুক্ত হিন্দু ছাত্র ৮,৪০০, এবং মুসলমান, ছাত্র ৪৭,০০০। এই অঙ্কগুলি অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

অধিকাংশ স্কুল স্থাপন করিয়াছে ও চালায় হিন্দুরা, অধিকাংশ খরচ দেয় হিন্দুরা, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী হিন্দু সমাজের; অতএব শিক্ষার বিধান করিবার ক্ষমতা ন্যায়তঃ তাহাদের থাকা উচিত। কিন্তু করিবে অন্যেরা! উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির শতকরা পঞ্চাশটির অধিকের উপর এবং মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি শতকরা ৭৫-এর অধিকের উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তথাপি মন্ত্রীদের প্রভুত্বক্ষুধা মিটিতেছে না! তাঁহারা সবগুলির হর্তাকর্তাবিধাতা এবং মরজি অনুসারে সংহর্তা হইতে চান।

—

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের ধারাসমূহ

মাধ্যমিক শিক্ষাবিলটা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আপত্তি এই যে তাহা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর রচিত। রাষ্ট্রীয় কোন ব্যবস্থাই সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর রচিত হওয়া উচিত নহে, শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ত নহেই। মাধ্যমিক শিক্ষাবিলে ৫৩টা ধারা আছে। অনেকগুলার বহু উপধারা আছে। অনেকগুলা সম্বন্ধেই অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু সব কথা লিখিবার জায়গা নাই, সময়ও নাই। অল্প কিছু লিখিব।

বিলটার উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে মাধ্যমিক শিক্ষার রেগুলেশ্যন ও কণ্ট্রোল, অর্থাৎ তাহাকে নিয়মিতকরণ ও তাহার উপর কর্তৃত্ব করণ—শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের বালাই ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অথবা ম্যাট্রিকুলেশ্যনের পর যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ছাড়া যে শিক্ষা, তাহাই মাধ্যমিক শিক্ষা। এ রকম ব্যাপক সংজ্ঞাও এড়াইয়া পাছে কোন রকম শিক্ষা কর্তৃত্বের বাহিরে চলিয়া যায় সেই ভয়ে একটা উপধারায় বলা হইয়াছে, প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট ইস্তাহার দ্বারা যে-কোন রকম শিক্ষাকে মাধ্যমিক বা অ-মাধ্যমিক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন—ফাঁকি দিবার যো নাই!

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়মিতকরণ ও সংযমন ("regulation and control") জন্য যে বোর্ড গঠিত হইবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর তাহার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব থাকিবে। এই বোর্ডের সভ্য হইবেন ৫০ জন। তাহাতে সরকারী লোক, সরকার-মনোনীত লোক, মুসলমানদের ও হিন্দুদের 'প্রতিনিধি' ইত্যাদি এরূপ সংখ্যায় থাকিবে যে, যে-হিন্দুরা ইস্কুল চালায় সব চেয়ে বেশী, টাকা দেয় সব চেয়ে বেশী, ছাত্রছাত্রী যোগায় সব চেয়ে বেশী, তাহারা সরকারী সভ্য, সরকার-মনোনীত সভ্য, ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী সভ্য এবং মুসলমান সভ্যদিগের সম্মিলনে সর্বদাই ভোটে হারিয়া যাইতে পারিবে! বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত করিবেন গবন্মেণ্ট।

বোর্ড ইস্কুল অনুমোদন ও না-মঞ্জুর, সাহায্য দেওয়া না-দেওয়া, ছাত্র ভর্তি করা না-করা, ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া না-দেওয়া, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও অনুমোদন বা অননুমোদন ইত্যাদি সব কাজের কর্তা হইবেন। বোর্ড ক্ষমতা পরিচালন করিবেন একটা কার্যনির্বাহক কৌন্সিলের দ্বারা। ঐ কৌন্সিলটা এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে সরকারী মতের জয় সর্বদাই যাহাতে হইতে পারে। কার্য-নির্বাহক কৌন্সিলের সর্বব্যাপী ক্ষমতা বিলের ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে দিতেছি।

grant or refuse approval to secondary schools, maintain a register of approved secondary schools, and withdraw such approval if it thinks fit;
distribute grants-in-aid to secondary schools....;
....recognize secondary schools for the purpose of presenting candidates for examinations, including the matriculation examination of the University of Calcutta, and withdraw such recognition if it thinks fit;
....grant permission to candidates to appear at examinations, including the matriculation examination of the University of Calcutta, and to refuse such permission if it thinks fit;
determine the use in secondary schools of such publications recommended by the Publication Committee as it thinks fit;
publish such publications recommended by the Publication Committee as it thinks fit.

এই আইন পাস হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় তালিকা (syllabus) নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, প্রণয়ন, সংকলন ও প্রকাশ, এবং পরীক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা আর থাকিবে না। সুতরাং পরীক্ষার্থীদের ফী হইতে ও পাঠ্যপুস্তক-বিক্রয় হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে বহু লক্ষ টাকা আয় হয়, তাহা থাকিবে না। অথচ বিলটাতে কোথাও বিশ্ববিদ্যলয়ের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নাই, তাহাকে অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডকে প্রতিবৎসর পঁচিশ লক্ষ এবং তাহার উপর আরও এক লক্ষের অনধিক টাকা দিবার ব্যবস্থা আছে; অধিকন্তু বলা হইয়াছে বোর্ড পরীক্ষার সমুদয় ফীগুলা পাইবে, তাহার প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক-গুলার বিক্রীর টাকা পাইবে, এবং অন্যান্য সব আয়ের টাকা পাইবে। অবশ্য গবন্মেণ্টের সুয়োরাণী ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীর উপর যাহাতে আইন-সভা হস্তক্ষেপ করিতে না-পারে, তাহার নিমিত্ত সম্প্রতি আইন করা হইয়া গিয়াছে।

এখন যে-সকল মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত, বিলটা আইন হইলে তাহাদের

অনুমোদন দুই বৎসর কায়েম থাকিবে। তাহার পর সেগুলিকে অনুমোদিত তালিকায় রাখা না-রাখা বোর্ডের মরজির ও ইচ্ছার অধীন হইবে।

উপরে বোর্ডের একটি পব্লিকেশন কমীটি বা পুস্তক-প্রকাশ কমীটির উল্লেখ আছে। এই কমীটির সভ্য হইবেন, সভাপতিকে লইয়া, নয় জন। এই নয় জনের মধ্যে পাঁচ জনই হইবেন সরকারী বা আধা-সরকারী পদের বলে (অর্থাৎ "এক্স অফিসিয়ো"); যথা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার, স্ত্রীশিক্ষার ডেপুটি ডিরেক্‌ট্রেস অথবা সেই পদ সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী চক্রের স্কুল-ইন্সপেক্‌ট্রেস্, মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর, বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত এক জন স্কুল ইন্সপেক্টার, এবং বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত তিন ব্যক্তি যাহার মধ্যে এক জন হইবেন মুসলমান, এক জন 'বর্ণ'-হিন্দু ও এক জন তপসিলি হিন্দু। এই কমীটিতে সরকারী মতেরই যে প্রাধান্য হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সভ্যদের মধ্যে এক জনও সাহিত্যিক না হইতে পারেন,—না হওয়াই সম্ভব—এবং যে দু-জন হিন্দু নির্বাচিত হইবেন, সরকারী প্রভাবে অভিভূত বোর্ডই তাঁহাদিগকে নির্বাচন করিবেন। বঙ্গের সাহিত্য গবর্মেণ্টের সৃষ্টি নহে, বেসরকারী শিক্ষিত সাধারণের সৃষ্টি। বঙ্গের সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে প্রধান কেহ কেহ সরকারী চাকর্যে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও সাহিত্য-সৃষ্টি সরকারী চাকর্যে রূপে করেন নাই। বঙ্গে ইংরেজী যে-সব সাধারণ বহি বা পাঠ্যপুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাও সরকারী কর্মচারীরা কর্মচারী রূপে লেখেন নাই।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা, লেখান, প্রকাশ করা এমন একটা কমীটির হাতে পড়িবে, যাহাদের অধিকাংশ জ্ঞান-রাজ্যের, সাহিত্য-জগতের, মানুষ নহে, যাহারা আমলাতন্ত্রের অঙ্গীভূত বা তাঁবেদার। তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত বহিগুলা সাহিত্য-পদবাচ্য হইবে না। সেগুলা বঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের মন গড়িতে ঢালিতে চাহিবে গোলামি ছাঁচে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে ম্যাট্রিকুলেশ্যনের পুস্তকপ্রকাশলব্ধ আয় হইতেই বঞ্চিত হইবেন, তাহা নহে, ভাল পুস্তকের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদিগের মন আদর্শানুযায়ী রূপে গড়িবার সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রকাশিত সকল বহিই অত্যুৎকৃষ্ট, বলিতেছি না। কিন্তু বিলে যে পুস্তক প্রকাশ কমীটির ব্যবস্থা আছে, তাহার নির্বাচন, সঙ্কলন প্রভৃতি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অপকৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহাদের সংখ্যা সমান সমান—যেন মুসলমানরা বঙ্গে হিন্দুদের সমান শিক্ষিত, শিক্ষা-বিষয়ে তাহাদের সমান উদ্যোগী, সমানসংখ্যক স্কুল স্থাপন করিয়াছে, সমান ব্যয় করিয়া আসিতেছে, সমানসংখ্যক ছাত্রছাত্রী যোগাইয়াছে!

আরও কয়েকটা কমীটির ব্যবস্থা আছে। সবগুলারই গঠন নিন্দনীয়।

বোর্ডে এবং কমীটিগুলাতে গবর্মেণ্টের মতের অনুসরণের যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিয়াও মন্ত্রীরা সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা ৪৫ ধারায় বলিয়াছেন যে, গবর্মেণ্টের মতে যদি বোর্ড বা কোন কমীটি তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন প্রস্তাব ধার্য্য করেন বা কোন কাজ করিতে চান, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে দিবেন না এবং সেই কাজ নিষেধ করিবেন! ৪৬ ধারায় মন্ত্রীরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, বোর্ড কাজে অযোগ্যতা দেখাইলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে গবর্মেণ্ট বোর্ডের নির্বাচিত ও নিযুক্ত সভ্যদিগকে অপসৃত করিয়া নূতন নির্বাচন ও নিয়োগ দ্বারা নূতন বোর্ড গঠনের আদেশ দিবেন! বোর্ডের মান ইজ্জৎ যাহাতে লোকচক্ষে খুবই বেশি হয়, তাহার সুব্যবস্থা বটে!

আর একটা কথা লিখিয়া বক্তব্য আপাততঃ শেষ করি।

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক বিলটার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি ইহার উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবৃতিতে বলিয়াছেন:—

"The establishment of such an authority was strong-

ly recommended by the Sadler Commission over twenty years ago."

"কুড়ি বৎসরেরও অধিক পূর্বে স্যাডলার কমিশন বোর্ডের মত এইরূপ একটি ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন।"

স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই :—

"The Central Educational Authority must be so constituted as to command the confidence of the different sections of the community whose co-operation is indispensable to the success of any adequate plan of educational reform."

"বঙ্গের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক কর্তৃসমিতির গঠন এরূপ হওয়া চাই-ই যাহাতে উহা সমাজের সেই সব ভিন্ন ভিন্ন অংশের আস্থাভাজন হয় যাহাদের সহযোগিতা শিক্ষা-সংস্কারের যে-কোন প্রয়োজনানুরূপ প্ল্যানের সাফল্যের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক।"

বঙ্গীয় সমাজের যে বৃহৎ ও প্রভাবশালী অংশ শিক্ষার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, মাধ্যমিক শিক্ষাবিল তাহার সহযোগিতা পাওয়া দূরে থাক, তাহার ঐকান্তিক বিরোধিতাই বাংলা দেশের সর্বত্র পাইতেছে। এই বিরোধিতা বাড়িয়াই চলিবে।

আমরা মনে করি না ও বলি না যে, বাংলা দেশে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা নিখুঁত কিম্বা প্রয়োজনানুরূপ। অসাম্প্রদায়িক, আদর্শানুযায়ী, নিরপেক্ষ, ও সুচিন্তিত সংস্কারের প্রয়োজন আমরা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করি। কিন্তু বর্তমান গবন্মেণ্টের বা মন্ত্রিসভার সেরূপ সংস্কার করিবার মত সাধারণ জ্ঞান নাই, তদ্রূপ শিক্ষাবিষয়ক আদর্শ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাই, তদ্রূপ সংস্কৃতি নাই, তদ্রূপ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নাই, এবং তদ্রূপ ধীরবুদ্ধি ও নিরপেক্ষতা নাই।

অতএব এই বিলটা প্রত্যাহার করাই শ্রেয়ঃ।

—

"সৈনিক সংগ্রহে সাম্প্রদায়িকতা"

"হিন্দুস্থান" লিখিতেছেন :—

"বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে, বাঙ্গলায় যে তের শত নূতন সৈনিক ভর্ত্তি করা হইবে, তাহার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন মুসলমানকে লইতে হইবে। যদি প্রয়োজন মত শিক্ষিত মুসলমান পাওয়া না যায়, তাহা হইলে অশিক্ষিত মুসলমানকেই লইতে হইবে। প্রার্থী বাছাই করিবার জন্য যে কমিটা নিযুক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে—দুই জন মুসলমান, এক জন তপশীল শ্রেণীভুক্ত হিন্দু ও আর একজন বর্ণ-হিন্দু—এই চারি জনের কমিটাকে সৈনিক নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই ব্যবস্থায় বিস্মিত হইয়াছি। সেনাবিভাগে সাম্প্রদায়িক হারে নির্ব্বাচন-পদ্ধতি এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। কিছু দিন পূর্ব্বে যে সমুদ্রতীর-রক্ষাবাহিনীর জন্য কয়েক শত লোক বাঙ্গলা হইতে লওয়া হইয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই হিন্দু ছিল। তখন মন্ত্রিমণ্ডলী মনে করিয়াছিলেন যে, মুসলমানদিগকে ইচ্ছা করিয়াই বাদ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু পরে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে বাস্তবিক মুসলমান কেহ প্রার্থীই হয় নাই। তখন অগত্যা তাঁহাদিগকে হিন্দুই লইতে বাধ্য হইতে হয়। ঐ বাহিনীতে যে সমস্ত লোক লওয়া হইয়াছিল, তাহাদের যে শিক্ষার মানদণ্ড নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেরূপ শিক্ষিত মুসলমান ঐ কার্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ মন্ত্রিমণ্ডলীর অনুগ্রহে তাহারা অনায়াসে চাকুরী হিসাবে বেশী মাহিনা বাঙ্গালায়ই পাইতেছে। তাই মন্ত্রিমণ্ডলী এবার নূতন নিয়ম করিয়া মুসলমানের হার বাঁধিয়া দিয়াছেন। শিক্ষিত মুসলমান যে শতকরা ৫০ জন পাওয়া যাইবে না তাহা তাঁহারা জানেন। তাই অশিক্ষিত মুসলমান লইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।"

"আমরা এই ব্যবস্থায় বিস্মিত" হই নাই। ব্রিটিশ রাজত্বে সরকারী ব্যবস্থার বাহারই এই যে, ইহা ক্ষেত্রভেদে এরূপ করা হয় যাহাতে হিন্দুদের সুবিধা না হয়। যদি সমগ্রভারতে এক এক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার অনুপাতে সিপাহী লওয়া হইত, তাহা হইলে সেনাদলের শতকরা ৭০ জনের উপর সিপাহী হইত হিন্দু। কিন্তু হিন্দুদিগকে সেরূপ প্রাধান্য দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ—যদিও দিলে তাহা ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিকই হইত। কিন্তু বাংলা প্রদেশে সাম্প্রদায়িক লোকসংখ্যার অনুপাতে সৈনিক লইলে হিন্দুরা অপ্রধান হইবে, অতএব এই প্রদেশের জন্য তাহাই সুব্যবস্থা।

—

মানকুমারী বসু জয়ন্তী উৎসব

গত ২৮শে জুলাই খুলনায় মহিলা কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুর জয়ন্তী উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ ও অন্য অনেকে ইহার উদ্যোগী ছিলেন ও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বাহির হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্য কেহ কেহ অনুষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্থানীয়

করোনেশন উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়, সার্বজনীন শিশু-বিদ্যালয় এবং খুলনার ছাত্র-ফেডারেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে মহিলা-কবিকে মানপত্র প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। কবি নম্রতার সহিত সংক্ষেপে অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দান করেন। উত্তর-দান প্রসঙ্গে শেষের দিকে তিনি বলেন :—

"সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে আমার কোন দিন সাহস ছিল না। সেই জন্য বহুদিন অবধি কবিতা ও প্রবন্ধে আমি নিজের নাম সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। বিশ্ববারা প্রভৃতি বেদসূক্ত-রচয়িত্রীগণ, সুলভা, গৌতমী, গার্গী, উভয় ভারতী প্রভৃতি সুপণ্ডিতা মহীয়সী মহিলাগণ, থেরিগাথা-রচয়িত্রী মহিলাগণ এবং আধুনিক কালের শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায় প্রভৃতি মহিলাগণের যেদেশে অভ্যুদয় হইয়াছে, সে দেশে জন্মিয়া আমি তাঁহাদের মর্য্যাদা কতটুকু রাখিতে পারিয়াছি? সেই জন্য আজিকার এই উৎসবে আমি যারপরনাই লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইতেছি।"

কবির উত্তর দেওয়া হইবার পর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী তাঁহার সময়োচিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি সর্বশেষে বলিয়াছেন :—

"শ্রীমতী মানকুমারী দেবীর রচনার মধ্যে তাঁর নিজস্ব জীবনের শোকের নিবিড় ছায়া যেমন আমরা দেখি, সুবিপুল স্নেহের এবং অনুভূতির স্পর্শও আমরা তেমনই সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিয়া থাকি। আর একটি জিনিস যাহা এই মনস্বিনী লেখিকার সমস্ত রচনাকে অমৃত-সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা তাঁহার অমেয় ভগবৎপ্রেম এবং সুগভীর ধর্ম্মবিশ্বাস। তিনি যখনই যেখানে আঘাত পাইয়াছেন, তা কি দুরন্ত সর্ব্বধ্বংসী কালের কাছে, কি দেশাচার, লোকাচার বা অন্যায় অনাচারের হস্তে, তখনই যিনি সর্ব্বলোক ও কালের অতীত, সকল অবিচার-অত্যাচারের প্রতিবিধাতা, তাঁহারই নিকট আন্তরিকতার সহিত স্মরণ লইয়া প্রতিবিধান ভিক্ষা করিয়াছেন।"

—

ফ্রান্সের সর্বনাশ জাপানের পৌষ মাস

ব্রিটেন আত্মরক্ষা ও সাম্রাজ্যরক্ষায় বিব্রত। সেই সুযোগে জাপান ব্রিটেনকে বলে, ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া চীনে যুদ্ধের উপকরণ প্রেরণ বন্ধ করিতে হইবে। আপাততঃ তিন মাসের জন্য ব্রিটেন জাপানের এই দাবী মানিয়া লইয়াছে। তাহাতে চীনের অসুবিধা হইয়াছে। ফ্রান্সের অধিকৃত ইন্দো-চীনের মধ্য দিয়া চীনে যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ জাপানের ধমকানিতে ফ্রান্স আগেই বন্ধ করিয়াছিল। এখন ফ্রান্সের অধিকতর দুর্গতি হওয়ায় সেই সুযোগে জাপান বলিয়াছে, ইন্দো-চীনের উপকূলে তাহাকে নৌবহরের ঘাঁটি এবং মধ্যে বিমান-ঘাঁটি স্থাপন করিতে দিতে হইবে, অধিকন্তু ইন্দো-চীনের ভিতর দিয়া চীনে জাপানী সেনাদল পাঠাইতে দিতে হইবে। ফ্রান্সকে ভীত করিবার নিমিত্ত, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ইন্দো-চীনের নিকটে কয়েকটা জাপানী যুদ্ধজাহাজ আসিয়াছে।

খবর আসিয়াছে, ফ্রান্স জাপানের দাবী বা অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবে এবং জাপানের আক্রমণ হইতে ইন্দো-চীন রক্ষা করিবে। দেখা যাক কি হয়।

জাপান কার্যতঃ ইন্দো-চীনে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মদেশের সীমাও জাপানী সাম্রাজ্যের সামিল বা প্রায় সামিল ইন্দো-চীনের সীমার ঠেকাঠেকি হইবে। ঠেকাঠেকির ফলে ঠুকাঠুকি ও তাহার ফলে স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব হইবে কিনা, কে জানে! ইহা ভারতীয়দের চিন্তার বিষয়। কিন্তু চিন্তাই সার। তাহারা ভাবিয়া কি করিবে? জাপান যে পরে সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিতে পারে, এরূপ একটা টেলিগ্রাম দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে।

জাভা প্রভৃতি দ্বীপ হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। জার্মেনী হল্যাণ্ডকে গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু তাহার সাম্রাজ্য গ্রাস করে নাই। এ অবস্থায় জাপান জাভা প্রভৃতি বড় বড় দ্বীপ দখল করিলে তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইবে না; গ্রাস করিতে যে চায় তাহার খবর ত রটিয়াছেই।

ব্রিটেন শাঙ্ঘাই হইতে সৈন্য অপসৃত করিয়াছে। তাহাদিগকে অন্যত্র কাজে লাগাইবে। সেখানে ছিল মোটে দেড় হাজার সৈনিক। এই সামান্য কয় জন লোক অন্যত্র যেখানে যাইবে সেখানে না গেলে সেই স্থান বিপন্ন হইত কি না জানি না; কিন্তু ইহাদিগকে সরাইয়া লওয়ায় জাপানের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। খবর রটিয়াছে ৭০০ আমেরিকান সৈনিক শাঙ্ঘাইয়ে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিবে।

জাপান ক্রমশঃ এশিয়ায় প্রবলতর হইতেছে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও খুব কাছ ঘেঁষিয়া আসিতেছে।

জাপান ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ায় রাশিয়া পাল্টা পাঁয়তারা কি করিতেছে না-করিতেছে, সম্প্রতি তাহার কোন খবর আসে নাই। [১২-৮-১৯৪০]

—

জার্মেনীর ব্রিটেন আক্রমণ

ব্রিটেন যদি চারি দিকে সমুদ্র-পরিখাবেষ্টিত না হইত, তাহা হইলে জার্মেনী কোন্ দিন লক্ষ লক্ষ সৈনিক লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। তাহার ফল কি হইত, কে জানে। কিন্তু সমুদ্র ব্রিটেনকে রক্ষা করিতেছে। আর রক্ষা করিতেছে তাহার অনতিক্রান্ত রণতরীসমষ্টি। স্থলপথে ও জলপথে ব্রিটেন আক্রমণের সুবিধা না থাকায় জার্মেনী আকাশপথে আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্রিটিশ বৈমানিকদিগের শৌর্য ও দক্ষতায় এখনও বিশেষ কিছু সফলতালাভ করিতে পারে নাই। আকাশ-পথে লক্ষ লক্ষ সৈন্য ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়ত জার্মেনীও সম্ভবপর মনে করে না। এখানে-সেখানে নানা স্থানে বোমা ফেলিয়া ও আগুন লাগাইয়া ইংরেজদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করা, তাহাদিগকে ভয়-ত্রস্ত করা, তাহাদের মরেল্ (morale) নষ্ট করা, হয়ত জার্মেনীর উদ্দেশ্য। কিন্তু এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত ব্রিটিশদের ব্যবহার যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের মরেল্ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম।

—

ইয়োরোপ মহাদেশের অবস্থা

ইয়োরোপ মহাদেশে প্রধান শক্তি হইবার সখ জার্মেনীর থাকিলেও সে সখ পূরণের প্রবলতম বাধা রাশিয়া বিদ্যমান থাকিতে তাহা পূর্ণ হইবে না। এবং রাশিয়া শুধু বিদ্যমান নহে, বর্ধমানও বটে। সে পোল্যাণ্ডের কতকটা অংশ এবং ফিনল্যাণ্ডের কতকটা আগে গ্রাস করিয়াছিল; পরে করে রুমানিয়ার বেসারেবিয়া ও বুকোভিনা প্রদেশদ্বয়। তৎপরে লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া "স্বেচ্ছায়" সোভিয়েট রাশিয়ার রক্তিম চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছে। বল্কান দেশগুলির মধ্যে রুমানিয়াতে হাঙ্গেরী ভাগ বসাইতে চায়।...

আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি হুভার সাহেব লিখিয়াছেন, পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও নরওয়েতে দুর্ভিক্ষে অগণিত লোক মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

মাসিক কাগজের পক্ষে আর বেশী কিছু না লেখাই ভাল, কারণ 'পরিস্থিতি' ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাইতেছে। [১২-৮-১৯৪০]।

—

আফ্রিকার অবস্থা

যুদ্ধটা আফ্রিকাতেও পৌঁছিয়াছে। ঐ মহাদেশের মধ্যে এক মিশর দেশের আংশিক স্বাধীনতা আছে। তাহা একাকী ইটালীর সহিত যুদ্ধে সমকক্ষতা করিতে না পারিলেও ব্রিটেন নিজের স্বার্থরক্ষার খাতিরেই তাহার সাহায্য করিবে। ইটালী সোমালিল্যাণ্ডে গোটা তিন শহর দখল করিয়া থাকিলেও এখন মোটের উপর বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারে নাই।

আফ্রিকায় পুরা স্বাধীন দেশ আছে নিগ্রোদের সাধারণতন্ত্র লাইবীরিয়া, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র ও নগণ্য, এবং আমেরিকার আশ্রিত। তাহাকে কেহ আক্রমণ করিবে না।

—

হাভানায় আমেরিকার ঐক্য

হাভানায় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সম্প্রতি যে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কয়েকটি বিষয়ে উভয় আমেরিকার মতৈক্য হইয়াছে। তাহার দুই-একটির উল্লেখ করিতেছি।

আমেরিকায় ইয়োরোপের কোন কোন দেশের অধীন ভূখণ্ড আছে; ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, হল্যাণ্ডের আছে। যদি এই প্রভুদেশগুলি অন্য কোন দেশের দ্বারা বিজিত হয়, তাহা হইলে বিজেতারা বিজিত দেশের আমেরিকাস্থিত ভূখণ্ডের মালিক হইতে পারিবে না। কোন ইয়োরোপীয় দেশ তাহার অধীনস্থ আমেরিকান্ ভূখণ্ড অন্য কোন দেশকে কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবে না। ইয়োরোপীয় কোন দেশের অধীন আমেরিকাস্থিত কোন ভূভাগকে স্বাধীন আমেরিকান্ রাষ্ট্রসমষ্টি তাহার ইয়োরোপীয় মালিক দেশের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া স্বাধীন করিয়া দিতে চাহিতেছে না, কিন্তু অধীন আমেরিকান্ দেশের হস্তান্তর যুদ্ধ বা অন্য উপায়ে তাহারা হইতে দিবে না। তাহার সম্ভাবনা ঘটিলে ভূভাগগুলিকে স্বাধীন অবস্থায় রাখিতে স্বাধীন আমেরিকান্ রাষ্ট্রগুলি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে।

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন

সারদাচরণ উকীল

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন

সারদাচরণ উকীল

পেট্রল এখন যুদ্ধের একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। আমেরিকা অতঃপর ইয়োরোপ ও এশিয়ায় পেট্রল-রপ্তানি সীমাবদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত যত বেশী সম্ভব পেট্রল নিজের কাছে রাখিবে।

সুলভতম ডাকমাসুল

ব্রহ্মদেশে এক পাই (এক পয়সার এক-তৃতীয়াংশ) ডাকমাসুলে পাঁচ তোলা পর্যন্ত ওজনের খবরের কাগজ যায়। ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশের চেয়ে ধনী নহে, লিখনপঠন-ক্ষমত্বের শতকরা হারও এদেশে ব্রহ্মদেশের চেয়ে কম। ভারতবর্ষেও এক পাই ডাকমাসুল প্রচলিত হওয়া উচিত।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত বৎসর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কোথাও অধিবেশন হয় নাই। এ বৎসরও কোথাও তাহার আয়োজন হইতেছে বলিয়া শুনি নাই। গত বৎসরে আমরা সম্মেলনের অধিবেশন জামশেদপুরে করিবার কথা তুলিয়াছিলাম। কিন্তু যখন কথা উঠে, জামশেদপুরের বাঙালীরা তখন বলিয়াছিলেন, তখন আয়োজন করিবার যথেষ্ট সময় ছিল না।

যেখানেই হউক, এবার অধিবেশন হওয়া উচিত। খবরের কাগজে দেখিলাম,এ বৎসর পুণায় নিখিলভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন হইবে। হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা এরূপ লোক পুণায় যত আছেন, বাংলা যাঁহাদের মাতৃভাষা সেরূপ লোক তদপেক্ষা অনেক বেশী বঙ্গের বাহিরে অনেক শহরে আছেন। বাঙালীর নিজের মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ নাই, বলা যায় না। কিন্তু সেই অনুরাগকে ফলপ্রসূ করিবার মত যথেষ্ট উদ্যোগিতা আমাদের এখনও জন্মে নাই। উদ্যোগিতা বাড়ান সাধ্যাতীত নহে।

ভারতরক্ষা বিধির অপপ্রয়োগ

বঙ্গে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ভারতরক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী নিয়ম অনুসারে বিস্তর লোককে বিনা বিচারে জেলে পাঠান হইতেছে। উক্ত নিয়মগুলার এই অপপ্রয়োগের প্রতিবাদ বহু সভা হইতে এবং সংবাদপত্রে হইতেছে।

সমুদয় কংগ্রেসওআলাকে ও প্রতিবাদকদিগকে জেলে পাঠাইলেও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারত রক্ষা করা যাইবে না। রক্ষার নিমিত্ত চাই জলে স্থলে আকাশে যথেষ্ট শিক্ষিত যান ও যন্ত্রসম্ভার সজ্জিত বহু লক্ষ সৈনিক। তাহার সমুচিত আয়োজনের উদ্যোগ সরকার এখনও করিতেছেন না।

হাজারীবাগে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান বন্ধ করিবার চেষ্টা

হাজারীবাগ, ৩১শে জুলাই

কাসমার, গোলা, রামগড় প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা খুব বেশী। ঐ সব অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বাংলায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রহিত করিবার জন্য প্রচেষ্টা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আগামী ৩রা আগষ্ট হাজারীবাগ জেলা বোর্ডের সভার কার্য্যতালিকায় এ-বিষয়ে আলোচনা হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইউ. পি.

এই গর্হিত চেষ্টার ফল কি হইল কেহ জানাইলে উপকৃত হইব।

সমবায় সমিতি আইন পাস

শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে সমবায় সমিতি আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের লিখিত একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার লেখক ও অন্য অনেকে সমবায় সমিতি বিলটা সংশোধন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অপকৃষ্ট আকারেই এসেমব্লীতে পাস হইয়া গিয়াছে। রেজিস্ট্রারকে এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া সমবায় প্রচেষ্টার উন্নতি ও বিস্তৃতি দুর্ঘট করা হইয়াছে।

অস্তিত্ববিহীন শিক্ষাসচিবের সহকারী

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাসচিবের পদ নয়-দশ মাস শূন্য আছে। উহার হিন্দুপ্রার্থীরা মুসলমানপ্রার্থী বা প্রার্থীদের চেয়ে এত বেশী যোগ্যতর যে, তাহাতে মুসলমান নিয়োগ ঘটিয়া উঠিল না। অতএব অন্ততঃ শিক্ষাসচিবের এক জন সহকারী যাহাতে মুসলমান হয়; সেই জন্য সহকারী শিক্ষাসচিবের পদের সৃষ্টি হইল! অতঃপর শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হইতে পারিবে!

টাকার বড় টানাটানি, এত দিন সহকারী না থাকাতেও কাজ চলিতেছে, এই সহকারীর চেয়ে কর্পোরেশনের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির জন্য এক জন মহিলা তত্ত্বাবধায়িকার নিয়োগ অধিক আবশ্যক—ইত্যাদি কোন সত্য যুক্তিই গ্রাহ্য হইল না।

উহ্য আছে যে, সহকারীটি মুসলমান হইবে, যদিও তাহা বলা হয় নাই। কেবল স্থির হইয়াছে যে, হিন্দী-উর্দু-জানা আবেদক যোগ্যতর বিবেচিত হইবে। এইরূপ সর্ত্ত করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, মুসলমান হয় হউক কিন্তু তাহার বাঙালী হওয়া চাই; কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হয় নাই। কর্পোরেশনের বিদ্যালয়সমূহের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে শতকরা আট জনের মাত্র হিন্দী বা উর্দু মাতৃভাষা। সুতরাং বাকী শতকরা বিরানব্বই জনের মাতৃভাষা বাংলা। অতএব যে আবেদক বা যে-যে

আবেদকের অন্যান্য যোগ্যতা আছে অধিকন্তু যিনি বা যাঁহারা বাংলা হিন্দী ও উর্দু জানেন তিনি বা তাঁহারাই শিক্ষাসচিবের সহকারীর পদের যোগ্যতর বা যোগ্যতম বিবেচিত হইবেন—এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। বাংলা জানেন না এমন কোন লোককে এই কাজে নিযুক্ত করা উচিত নহে; কারণ, যদি মুসলমান ছাত্রদের জন্যই তাঁহার নিয়োগ আবশ্যক মনে হইয়া থাকে, তাহা হইলেও শতকরা ৯২ জন মুসলমান ছাত্রের মাতৃভাষা বাংলা, অতএব সহকারীর বাংলা হিন্দী ও উর্দু তিনটা ভাষাই জানা চাই।

বঙ্গে এরূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান দু-ই আছেন। বঙ্গের বাহিরে এরূপ হিন্দু বিস্তর আছেন, তাঁহাদেরও দরখাস্ত করা উচিত। নিয়োগ এপ্রিল মাসে হইবে।

—

বঙ্গের এসেমব্লীতে অগ্রাহ্য দুটি বিল

ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল এসেমব্লীতে একটি বিল পেশ করিতে চাহিয়াছিলেন যাহার উদ্দেশ্য ছিল আইন-সভা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সভাগুলিতে উৎকোচদান ও গ্রহণ এবং গর্হিত রকমের প্রভাব প্রয়োগ ইত্যাদি নিবারণ। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সুরাবিক্রয় ও পান নিষেধক আইন করাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাও অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

দুনিয়ায় কেবল যে নিরপরাধ গরিবদের মা-বাপই আছে তাহা নয়, অন্য নানাবিধ জীবেরও মা-বাপ আছে।

—

ঢাকায় কম যোগ্য স্বাস্থ্যকর্মচারী নিযুক্ত

ঢাকা মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্যকর্মচারীর পদের জন্য একাধিক যোগ্যতর ও মিউনিসিপাল কার্যে অভিজ্ঞতাশালী হিন্দু প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপিতযোগ্যতাহীন এক জন মুসলমান প্রার্থীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার নিয়োগের হিন্দু প্রস্তাবক নিজেই স্বীকার করেন যে, হিন্দু প্রার্থীরা যোগ্যতর। ব্যাপারটা এতই কুৎসিত, যে, ঢাকার সিবিল-সার্জন মেজর লিণ্টন ও তিন জন কংগ্রেসী কমিশনার মীটিং ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

—

জুলুম করিয়া যুদ্ধ-চাঁদা আদায়ের অভিযোগ

শুধু বঙ্গে নয়, অন্য অনেক প্রদেশেও অভিযোগ শুনা যাইতেছে যে, বহু সরকারী কর্মচারী জুলুম করিয়া যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করিতেছে। এই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করিয়া কোন কোন কর্মচারী দোষী প্রমাণিত হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।

—

স্বেচ্ছাসেবকদের পোষাক ও ড্রিল সম্বন্ধে হুকুম

খাকসারদের উদ্দেশ্য যে, আবশ্যক হইলে বলপ্রয়োগের দ্বারাও, ভারতে ও পরে পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন, তাহা তাহাদের কাজ ও তাহাদের নেতাদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পঞ্জাবে তাহারা নিষিদ্ধ দল বলিয়া ঘোষিতও হইয়াছে। ভারত-গবর্মেণ্ট যদি কেবল তাহাদিগকে দেশের সর্বত্র নিষিদ্ধ দল বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তাহা হইলেই ঠিক হইত। কিন্তু ভারত-সরকার হুকুম জারি করিয়াছেন যে, সর্ববিধ স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ, লাঠি বা অন্য অস্ত্র ব্যবহার এবং সৈন্য ও পুলিসের সদৃশ কোন প্রকার উর্দি পরিধান নিষিদ্ধ হইল!

গবর্মেণ্টের সৈন্য বহুৎ আছে, পুলিসেরও অভাব নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সিন্ধুদেশ, বাংলার কোন কোন স্থান, পঞ্জাবের কোন কোন স্থান প্রভৃতিতে রক্তপাত লুণ্ঠনাদি হইয়াছে। পরে আরও হইতে পারে। তাহা নিবারণের জন্য কংগ্রেস ও অন্য কোন কোন সমিতি অহিংস স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতেছিলেন। প্রকারান্তরে তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া গবর্মেণ্ট ভাল কাজ করিলেন না। দেশে শান্তিরক্ষা শুধু গবর্মেণ্টের বেতনভোগী লোকদের দ্বারা ও সিবিল গার্ড নামক আধা-সরকারী পুলিস দ্বারা হইবে না।

গত ১১ই আগস্ট পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কানপুর পৌঁছেন। তথাকার কংগ্রেস সেবা-দল আপনাদের উর্দি পরিয়া লাঠিহাতে শোভাযাত্রা করিয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়।

তাঁহার মতে সাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাসেবক-দল বা রক্ষী-দল গঠন অনুচিত। সাধারণতঃ আমাদেরও মত তাহাই। কিন্তু যদি হিন্দুরা অপর কাহারও দ্বারা রক্ষিত না হয়, তাহা হইলেও কি তাহারা রক্ষী-দল গঠন করিবে না?

—

ঋণসালিসী বোর্ডের উপদ্রব

বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন অনুসারে ঋণসালিসী বোর্ড-সমূহের স্থাপনকাল হইতে গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বোর্ডগুলার কাজের সম্বন্ধে একটা বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ১৯৩৯এর শেষ পর্যন্ত সব বোর্ডে মোট ১৭,০৩,৭৩৬টি মামলা রুজু এবং ৮,৩৫,-৪৭৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। ঐ নিষ্পত্তীকৃত মামলাগুলির মধ্যে ২,৯৭,৭৮৮টি মামলাতে দাবী ছিল ১২,৪৯,৫৩,০০০ টাকার। বোর্ডসমূহ দাবী কমাইয়া ৪,৭৪,৫৯,০০০ টাকার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। অর্থাৎ পাওনাদারদের ৭,৭৪,৯৪,০০০

(প্রায় আট কোটি) টাকা মাঠে মারা গিয়াছে। আরও যে ৫,৩৭,৬৮৮টা মামলার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার দাবীর পরিমাণ এবং কত টাকায় নিষ্পত্তি হইয়াছে ইত্যাদি কোন খবর কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত বিবরণে নাই। হইতে পারে যে, এই মোকদ্দমাগুলাতে মহাজনদের দাবী আরও খুব বেশী পরিমাণ (অর্থাৎ শতকরা ৬২ টাকারও বেশী) কমান হইয়াছে বলিয়া কর্তারা নীরব।

দুঃস্থ কৃষকেরা অত্যধিক সুদ হইতে নিষ্কৃতি পায়, ইহা আমরা খুবই চাই। কিন্তু অকৃষককে আইনের সুবিধা দেওয়া, যে ১০০ টাকা শোধ দিতে সমর্থ তাহার সপক্ষে মাত্র ২০।২৫ টাকার ডিক্রী দেওয়া, যে তিন-চার কিস্তিতে টাকা শোধ করিতে পারে, তাহাকে ১৫।২০ বৎসর ব্যাপী কিস্তি-বন্দির সুবিধা দেওয়া, মহাজনদিগকে হায়রান ও লাঞ্ছিত ও ভয়াতুর করিয়া খুব কম ডিক্রীতে রাজী করা—আইনের ব্যপদেশে ইত্যাকার উপদ্রব অন্য কোন প্রদেশে হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। চাষীখাতক আইনটা অবশ্য এরূপ করিয়া প্রণীত হইয়াছে, যাহাতে সাধারণ কোন দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইয়া এই সব উপদ্রবের প্রতিকার হইতে না পারে। তথাপি আইনজ্ঞেরা দেখুন, সেরূপ উপায়ে প্রতিকার হইতে পারে কি না। কিছু সম্ভাবনা থাকিলে সেই উপায় অবলম্বিত হউক।

ভারতশাসন-আইন অনুসারে গবর্ণরের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং দায়িত্ব অনুসারে কাজ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাও আছে। কিন্তু ঐ আইনের "সংখ্যালঘু" শব্দের এই অর্থ বোধ হয় উহ্য আছে যে, হিন্দুরা কোথাও সংখ্যালঘু বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তথাপি হিন্দু পাওনাদারেরা দলবদ্ধ হইয়া এক বার গবর্ণরের নিকট খাঁটি প্রমাণসহ দরখাস্ত করিতে পারেন।

আইন অনুসারে ফেডার্যাল কোর্টের শরণাপন্ন হওয়া যায় কি না, আইনজ্ঞেরা তাহাও ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন।

নোয়াখালি জেলায় ঋণসালিসী বোর্ডসমূহের অপকর্মের একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী বাহির করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপিয়াছিলাম। অন্য সকল জেলারও এইরূপ বৃত্তান্ত বাহির হওয়া আবশ্যক।

—

সারদাচরণ উকীল

বাঙালীর প্রধান বিশিষ্টতা তাহার সাহিত্যে। অধুনা কয়েক বৎসর হইতে ললিতকলার ক্ষেত্রেও—বিশেষত চিত্রে, বঙ্গীয় প্রতিভার বিশিষ্টতা লক্ষিত হইতেছে।

উত্তর-ভারতে, ভারতবর্ষের রাজধানী নূতন দিল্লীতে এবং সেখানে থাকা প্রযুক্ত কোন কোন দেশী রাজ্যেও, চিত্রকলায় বাঙালীর প্রতিভার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছিলেন প্রধানত চিত্রশিল্পী সারদাচরণ উকীল, এবং তাহার পর



সারদাচরণ উকিল

তাঁহার দুই শিল্পী ভ্রাতা বরদাচরণ ও রণদাচরণ। সারদাচরণ প্রতিভাশালী শিল্পী ছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনায়, অঙ্কনরীতিতে ও বর্ণবিন্যাসে অনন্যতন্ত্রতা ছিল, স্বকীয়ত্ব ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতবর্ষের চিত্রজগৎ দরিদ্রতর ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা নূতন দিল্লীতে একটি স্থায়ী চিত্রপ্রদর্শনী (Art Gallery) স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের একটি চিত্রবিদ্যালয়ও আছে। প্রধানতঃ বরদাবাবুর উদ্যোগিতাতেই এক বার লণ্ডনে ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনী হইয়াছিল। দিল্লীতে যে জাতীয় চিত্রশালা (National Art Gallery) স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, বরদাবাবু তাহার প্রধান উদ্যোগী। সারদাবাবুর মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতারা ও পরিবারস্থ অন্য সকলে স্বভাবতই শোকার্ত্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইবেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আশা করি শিল্পী ভ্রাতাদের কীর্তিগুলি রক্ষিত হইবে।

—

গান্ধীজীর বর্তমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের পন্থানুযায়ী

মালিকান্দায় গান্ধী সেবাশ্রম সংঘ ভাঙিয়া দিবার আগে হইতেই গান্ধীজীর গ্রামিক "গঠনমূলক" কাজে ঝোঁক ছিল। পরে তাহা বাড়িয়া চলিতেছে। মান্দ্রাজের

দৈনিক "হিন্দু"তে প্রকাশিত নিম্নমুদ্রিত টেলিগ্রামটিতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি বলিয়াছেন,

"সেবাগ্রামকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করা নিশ্চয়ই তাঁহার বর্ত্তমান 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা'। এক জন মানুষের পক্ষে কোন দিন একটি গ্রামসম্পর্কে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব হইলেও, সমগ্র ভারতবর্ষকে ঐরূপ সফল কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করার পক্ষে এক জন মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প। কিন্তু যদি কেহ একটি আদর্শ গ্রাম উৎপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তদ্দ্বারা শুধু সমগ্র দেশকে নহে, হয়ত সমগ্র পৃথিবীকে একটি আদর্শ দিয়া যাইতে পারেন।"

TO MAKE SEVAGRAM AN IDEAL VILLAGE
GANDHIJI'S PRESENT AMBITION

BOMBAY, Aug. 4.

Referring to his own example, Gandhiji says that his present ambition is certainly to make Sevagram an ideal village. "While it is possible for one man to fulfil his ambition with respect to a single village some day," I lds "one man's life-time is too short to overtake the whole of India. But if one man can produce one ideal village he will have provided the pattern not only for the whole country but perhaps for the whole world."—*United Press.*

বৎসরাধিক পূর্বে যখন রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে ছিলেন, তখন তথাকার কর্মীদের কাছে তাহার ইতিহাস ও আদর্শ বিষয়ে যাহা বলেন, তাহার অনুলেখন গত বৎসরের ভাদ্রের প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল তাহার উপসংহার নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সব শেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই; চেষ্টা করতে হবে যেন এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার বলবার কথা ছিল এই যে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোট গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্রে কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে—এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে।

"এই ক-খানা গ্রামকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করতে হবে—সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান বাজনা, কীর্তন পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক খানা গ্রামকে এই ভাবে তৈরি ক'রে দাও।"

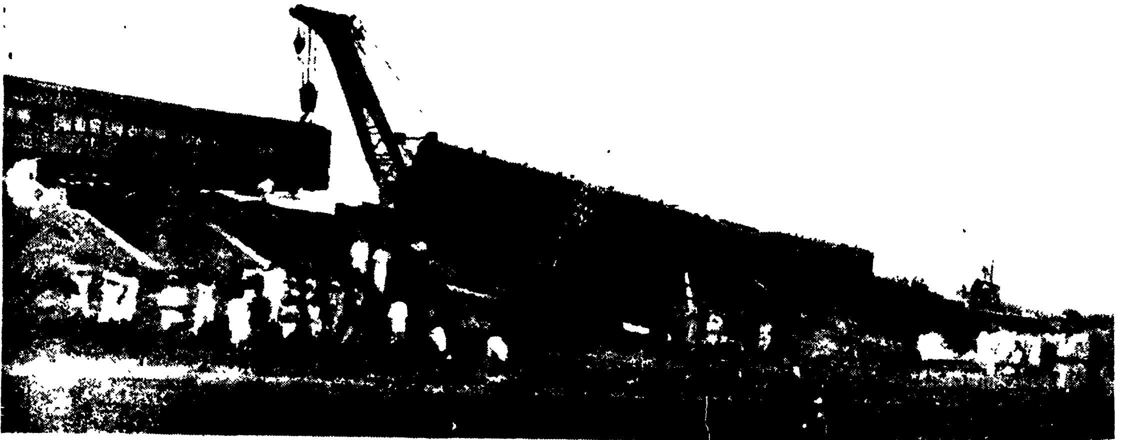
রবীন্দ্রনাথের এক বৎসর আগেকার উক্তি এবং গান্ধীজীর কয়েক দিন আগেকার উক্তির মধ্যে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা ভাব ও চিন্তার মিল ত বটেই, অধিকন্তু ভাষারও মিল। ইহাকে আকস্মিক বলা যায় কি?

"আর্য্য" দলের শীল্ড লাভ

"আর্য্য" (Aryan) ফুটবল দলের শীল্ড লাভে আমরা খুশি হইয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ঢাকা মেল দুর্ঘটনা

একদা যাহা আকস্মিক ছিল, এখন তাহা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। তাই রেলওয়ে দুর্ঘটনার কথা শুনিলে বেদনা বোধ হয় কিন্তু বিস্ময় অনুভূত হয় না। ১৯৩৭-৩৮ সালে ছয় মাসের মধ্যে ই. আই. রেলওয়ের বিহটা ও বামরৌলী দুর্ঘটনার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ই. বি. রেলওয়ের মাজদিয়া ষ্টেশনে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সহিত ঢাকা মেলের যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হয় তাহাতে বহু লোক হতাহত হইয়াছিল। তাহার পর এক বৎসর মাত্র গত হইয়াছে। সেই ই. বি. রেলওয়ের ঢাকা মেল চুয়াডাঙ্গা



ঢাকা মেলের ধ্বংসাবশেষ



ঢাকা মেলের বিচূর্ণ এঞ্জিন

ও জয়রামপুরের মধ্যে আবার লাইনচ্যুত হইল। এই ঘটনা ঘটে ১৯শে শ্রাবণ, রবিবার রাত্রি ২টা-৪৫ মিনিটে। বাঙালী দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা লইয়া ঘর-বসতি করে। ইহার উপর আর একটি বাড়িল—রেলওয়ে দুর্বিপাক। রোগ ও দুর্ভাগ্যের সহিত লড়াই করিতে করিতে শুধু বাঙালী কেন ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসাহ ও উদ্যম অপগতপ্রায়। অপহৃতশক্তি যে-সকল ভারতবাসীর প্রাণটুকু মাত্র অবশিষ্ট ছিল, সেই প্রাণও আজ একান্ত তুচ্ছ হইয়া উঠিল। যে-সকল অমূল্য প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইল, তাহাদের আর ফিরাইয়া আনা যাইবে না। আমরা সেই নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি। যাহারা ইহার জন্য দায়ী তাহাদের বিচার আবশ্যক। এই অমার্জ্জনীয় মারাত্মক শৈথিল্য কাহার বা কাহাদের সর্ব্বসাধারণে সেই কথা জানিতে চায়। সেই তদন্ত একটি নিরপেক্ষ বেসরকারী সমিতি কর্ত্তৃক হইবে এরূপ আশা সর্ব্বসাধারণে করিতে পারে। এই দুর্ঘটনায় আরোহী আহত হইয়াছে ৯০ জন, এ পর্য্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৪১।

—

গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেণ্টগণের প্রতি

আগামী আশ্বিন মাসের প্রবাসী ২৫শে ভাদ্র ১০ই সেপ্টেম্বর বাহির হইবে। অতএব যে-সকল গ্রাহক ঠিকানা বদল করিতে চান, এবং যে-সকল বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দিতে বা বদল করিতে চান তাঁহারা যেন ২০শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের আপিসে তাহা জানান। এজেণ্টগণও যেন ঐ সময়ের মধ্যে অর্ডার ও টাকা প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন।

ম্যানেজার, প্রবাসী কার্য্যালয়

—

চিত্র-পরিচয়

সখী বিশাখা, কৃষ্ণ-বিরহে কাতরা শ্রীমতী রাধিকাকে কৃষ্ণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন এবং সেই চিত্র দেখিয়া রাধিকা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেছেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের "আলেখ্য-দর্শন" চিত্র এই কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত হইয়াছে।

—

শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দান

গত ২৯শে শ্রাবণ ৭ই আগস্ট অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় শান্তিনিকেতনে সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য্য (ডি. লিট.) উপাধিদান উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস গোয়াইয়ার ও সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিপদে বৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রগণ, বিশ্বভারতী সংসদের সদস্যগণ, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিগণ, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণ ও বিশ্বভারতীর সুহৃদ্ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সূচনায় নিম্নলিখিত স্বস্তিবাচন করেন :

স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সংগমেমহি।

সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় আমরা কল্যাণের পথ অনুসরণ করিব; মহানুভব জ্ঞানীজনদিগের সহিত সম্মিলিত হইব।

যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা
অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত
স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।

অমরগণ যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন এবং মানবলোকদ্বারাও যাঁহারা সম্মানিত, যাঁহারা নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারা আমাদিগকে মহত্ত্বের পথ প্রদর্শন করুন। হে জ্ঞানীবৃন্দ, আপনাদের মঙ্গলকামনা দ্বারা আমাদিগকে পরিচালিত করিতে থাকুন।

অতঃপর আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণ নিম্নমুদ্রিত অভিনন্দন-সংগীত গান করেন।

বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে
বরপুত্রসংঘ বিরাজ হে।
ঘনতিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহ জ্যোতিদীক্ষা
যাত্রীদল সব সাজ হে,
দিব্যবীণা বাজ হে।
এস কর্ম্মী, এস জ্ঞানী
এস জনকল্যাণধ্যানী,
এস তাপস-রাজ হে।
এস হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।

অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হেণ্ডার্সন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সর্ মরিস গোয়াইয়ারকে সম্বোধন করিয়া, নিম্নানূদিত কবি-প্রশস্তি পাঠ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী উহা মূলত লাটিন ভাষায় পঠিত হয়; সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উহার একটি ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন।

"অক্সফোর্ড-জননী কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপমাণ্ডলিক ও অধ্যক্ষবর্গের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত মাননীয় মহাশয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান অদ্য আপনার সম্মুখে বর্ত্তমান, "মহৎ বংশধারা মহৎ পিতৃপুরুষগণেরই পরিচায়ক," হোরেসের এই বাণীর যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

"অদ্য আমি তাঁহার পিতামহকে স্মরণ করি, তিনি 'এক নবধর্ম্মমণ্ডলীর ভ্রাতৃসঙ্ঘের অন্যতম ছিলেন, যে-সকল ভারতীয় সর্ব্বপ্রথম সমুদ্র পার হইয়া সুদূর ব্রিটেনে গিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদেরও একজন। দৃঢ়চেতা, গভীর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ধর্ম্মনায়ক, তাঁহার পিতৃদেবকে স্মরণ করি, মনীষা ও ধর্ম্মপরায়ণতায় যিনি দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভাশালিনী জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে [স্বর্ণকুমারী দেবী] স্মরণ করি, ভারত-মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জীবনযাত্রা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয়কে স্মরণ করি, তাঁহাদের মধ্যে এক জন [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রথম ভারতীয়; এক জন [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] দার্শনিকরূপে, এক জন [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর] সাহিত্যে ও কলাবিদ্যার চর্চ্চায় সমসাময়িক যুগে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আর এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিনি আজ আপনার সম্মুখে বর্ত্তমান, তিনি তাঁহার জীবনে, তাঁহার চরিত্রগৌরবে, তাঁহার প্রতিভাবলে, তাঁহার বংশগৌরব বহু গুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন; বিনয় ও সাধুতা তাঁহাকে গর্ব্বিত হইতে দিবে না, নহিলে, "আমার জীবন আমার পুণ্য বংশের শ্রেষ্ঠ ভূষণ" স্কিপিয়োর এই উক্তিতে অধিকার তাঁহার অপেক্ষা অন্য কাহারও অধিক নাই। তিনি এক জন বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ, গদ্যে ও পদ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী; কাব্য, ইতিহাস, ব্যঙ্গরচনা, উপন্যাস, সকলই তিনি লিখিয়াছেন; সাহিত্যের কোনও বিভাগই তাঁহার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় নাই, সাহিত্যের যে-বিভাগেই তিনি হাত দিয়াছেন তাহাকেই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কল্পনার সম্পদের সহিত রচনারীতির সৌষ্ঠবের এইরূপ সম্মিলন অসাধারণ। তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা ও বিস্তার, হাসির সঙ্গে মনীষার, ভীষণের সহিত আনন্দের এমন মিলন, আমাদের হৃদয়ের গভীরতম আবেগকে উদ্বোধিত করিবার এমন ক্ষমতা—এ অতি বিস্ময়কর। সর্ব্বোপরি স্মরণ করিতে হয়, তাঁহার ঐকান্তিক মানবধর্ম্মের কথা,—মানবজাতির সহিত যে-কোনো ভাবে সম্পর্কিত এমন কিছুই তাঁহার কাছে তুচ্ছ নহে। গীতকাররূপে যিনি কোনো বন্ধনই মানেন না, তিনিই আবার অসংখ্য সুর-রূপের স্রষ্টা; শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তিনি তত্ত্ববিদ্যাকে অধিগত করিয়াছেন; বহুজনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু স্বল্পজনসাধ্য সুদুর্লভ চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়া তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। এই বিচিত্র সাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়াও তিনি একান্তভাবে আত্মগত জীবন যাপন করেন নাই; তরুণবয়স্কদিগের সুশিক্ষার জন্য তিনি এই সুবিশ্রুত শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছেন; বিচক্ষণ প্রণালীতে ছাত্রদের অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পিপাসা জাগরূক করাই এই বিদ্যালয়ের আদর্শ। মানবকল্যাণের ঊর্দ্ধে নিভৃত জীবনকেই কাম্য বলিয়া মানিয়া বৃহত্তর জগতের তাপ-মলিনতা হইতে তিনি একান্তভাবে দূরে থাকেন নাই; প্রয়োজন যখন হইয়াছে তখন তিনি হাটের ধূলার মধ্যেও নামিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্যায় ঘটিতে যখন দেখিয়াছেন ব্রিটিশ-রাজ ও তন্নিযুক্ত শাসকদিগের কাজের বৈধতা অস্বীকার করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই, এবং দেশবাসীর দোষ-ত্রুটির সমালোচনাও তিনি নির্ভীকভাবেই করিয়াছেন। আর কি বলিব? বিচিত্রমনা কবি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুরগুরু, কায়মনোবাক্যে দার্শনিক, জ্ঞান ও তত্ত্বের ধারক, স্বাধীনতার সাধক আপনার সম্মুখে বর্ত্তমান, জীবন ও

চারিত্রবলে ইনি বিশ্বমানবের শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই ইনি নোবেল-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপমাণ্ডলিক, আচার্য্য ও অধ্যক্ষবর্গের সকলের সম্মতিক্রমে অক্সফোর্ডের জয়মাল্যে বিভূষিত ও সম্মানহেতুক সাহিত্যাচার্য্য পদে বৃত হইবার নিমিত্ত সর্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রীবৃন্দের প্রিয়তম রবীন্দ্রনাথকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি।"

সর্ মরিস গোয়াইয়ার অতঃপর নিম্নানূদিত মন্তব্য দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ডের সম্মানিত সাহিত্যাচার্য্যপদে বরণ করেন।

"হে ভক্তিভাজন মনীষী, বাণীর প্রিয়তম সাধক, সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারবলে ও উপমাণ্ডলিকের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে সম্মানিত সাহিত্যাচার্য্য উপাধিতে বরণ করি।"

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নিম্নমুদ্রিত অভিভাষণটি পাঠ করিয়া এই উপাধি গ্রহণ করেন:

"ভবন্ত উক্ষতীর্থবিশ্ববিদ্যালয়প্রতিভূব!

"এষোঽস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতবর্ষস্য। তং মাং সম্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রত্না বিদ্যাভূমির্নিমাত্মনো মানবধর্ম্মাম্নায়মেব মহান্তমাবিষ্কর্ত্তুমীহতে যস্য খল্বর্থঃ সাম্প্রতমতিতরাং গম্ভীরশ্চানতিপাত্যশ্চ সংবৃত্তঃ। গর্ব্বোত্তানং মে চিত্তং প্রতিপদ্যাস্য বাচিকং প্রতিপত্তি চৈতাং প্রহিতাং প্রতীকমিবানশ্বরং মানবধর্ম্মাত্মনঃ। সভাজয়ামি ভবতোঽত্র শান্তিনিকেতনে। যদেতদনর্ঘমুপায়ন মানীতম্ ভবদ্ভির্দর্থং মদ্দেশার্থঞ্চ চিরং তদবস্থাস্যতেঽস্মৎ হৃদয়েষু সম্পৎস্যতে চ তদ্ভবতামস্মাকং চ সাধারণসংস্কৃতিসম্পত্তয় ইতি প্রতিযন্তু ভবন্তঃ।

"স খল্বয়ং কালঃ প্রবর্দ্ধতে যত্রাতঙ্কঃ। তিরোধত্তে গুণঃ। প্রসরত্যশিষ্টত্বং নিরঙ্কুশম্। প্রবর্ত্ততে চ পশূচিতা স্পৃহা ভোগে সমুপচীয়মানা ভূতবিদ্যয়া।

"অস্মিন্ হি ব্যতিকরে কস্যাপি ভুবনব্যাপিনঃ সম্বন্ধস্য বীজসমুদ্গমোক্তির্নাম কদাচিৎ কবিজনোচিতেব প্রতীয়তে।

"তথাপি তু সংযম্যতে কালস্তুর্জ্জয়ম্নপি নিরন্তরম্। কিঞ্চ যে নাম বয়মতীত্যাপ্যেনং জীবামঃ প্রতীমশ্চ যদার্য্যধর্ম্মশ্চরমার্থসম্পত্তয়ে বর্দ্ধতৈব নিত্যমতি তৈরস্মাভিঃ সেয়ং প্রতীতিরবশ্যং প্রত্যগ্রীকরণীয়া।

"ক্ষেমং বতেদং নিমিত্তং কস্যাপ্যনাগতস্য সময়স্যেতি প্রতিগৃহ্যতে ময়ৈষা প্রতিপত্তির্বিহিতোক্ষতীর্থবিশ্ববিদ্যালয়েন। নূনং ন জীবিষ্যাম্যহমবলোকয়িতুমেনং প্রতিষ্ঠিতম্। সভাজনীয়স্ত্বেষ তস্য সপ্রণয়ঃ সঙ্কেতঃ সংগর ইব দিবসানাং প্রশস্যতরাণামিতি শিবম্॥"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংস্কৃত অভিভাষণের একটি ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন। নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ মুদ্রিত হইল।

"অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ,

ভারতবর্ষের কবি আমাকে সম্মানিত করিয়া আপনাদের প্রাচীন বিদ্যাভূমি স্বীয় মানবধর্ম্মের মহৎ ঐতিহ্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। আজিকার দিনে এই ঐতিহ্যের একটি গভীর ও গুরুতর দ্যোতনা আছে। ইহার বাণী যে সম্মান বহন করিয়া আনিয়াছে, অবিনশ্বর মানবধর্ম্মের প্রতীকরূপে আমি গর্ব্বিতহৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিলাম। শান্তিনিকেতনে আপনারা সুস্বাগত; আমার ও আমার স্বদেশের জন্য আপনারা যে সৌহৃদ্যের অর্ঘ্য আনিয়াছেন তাহা চিরদিনের জন্য আমাদের হৃদয়ে আসন লইল, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের উভয়কে ঐক্যবদ্ধ হইতে তাহা সহায় হউক।

"আজিকার যুগে চারিত্রবল অন্তর্হিত, বেদনা পুঞ্জীভূত, দেশ-মহাদেশ সর্ব্বনাশের কবলিত, বর্ব্বরতা মুক্তবন্ধ, পাশবিক অধিকার-তৃষ্ণা বিজ্ঞানের সহায়ে বিস্তারিত—এ-সময়ে বিশ্বমানবের ঐক্যতত্ত্বের কথা হয়ত কবিজনোচিত শুনাইবে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে কালের রূপ যতই ভয়ঙ্কর হউক, তাহার প্রকোপ চিরন্তন নয়—এই বর্ত্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া, কালের বৃহত্তর অস্তিত্বের মধ্যে আমরা যাহারা বাঁচিবার প্রয়াসী, মানব-সংস্কৃতি নিরন্তর এক চরম লক্ষ্যের অভিমুখে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, হৃদয়ে এই প্রত্যয় আমরা দৃঢ় রাখিব। অনাগত যুগের সূচনাস্বরূপ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিনন্দন আমি গ্রহণ করিলাম; আমার জীবিতকালে সে-যুগ আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে পারিব না, তথাপি মহত্তর ভবিষ্যতের নির্দ্দেশকরূপে এই প্রীতির অর্ঘ্যে আমার মন আনন্দিত।"

অতঃপর সর মরিস গোয়াইয়ার রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণ পাঠ করেন। নিম্নে তাহার অনুবাদ মুদ্রিত হইল।

"মহাশয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে আমি তাঁহার তরুণতম আচার্য্যকে প্রণতি জ্ঞাপন করি। আমি যাঁহার প্রতিনিধি সেই বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে সম্মানিত করিয়া নিজেই সম্মানিত হইয়াছেন—এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিয়া আমি কৃতার্থ। যে-ভাষা আমি বলিতেছি এবং যে-ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার স্বীয় বাণী প্রেরণ করিয়াছেন উভয়েরই সম্মানার্হা জননী যে-ভাষা সেই প্রাচীন ভাষায় আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপহার গ্রহণ করিয়াছেন—আপনার সুললিত বাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে নিবেদন করিতে আমি বিস্মৃত হইব না।

"মহাশয়, আপনি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে-

যুগের আপনি অলঙ্কারস্বরূপ, সে-যুগে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের আসন অপরাপর কালের তুলনায় অতি ঊর্দ্ধে; কিন্তু তাহাই যে যথেষ্ট নয়, যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার সহিত সরলতা, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যকেও যে স্থান দিতে হইবে, এ-কথা আপনি সর্ব্বদাই বলিয়াছেন। শান্তিনিকেতন ও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয়ের মধ্যে এই ঐক্যসূত্র বিদ্যমান যে, উভয়ই মানব-ব্যক্তিত্বকে স্বীকার ও সম্মানকেই শিক্ষার প্রতিষ্ঠাভূমি করিয়াছে। অন্যের ব্যক্তিত্বকে স্বীকার না করিলে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রত্যাশা করা চলে না। তাই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ই পরমতসহিষ্ণুতাকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া জানিয়াছে। ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি; বস্তুত গণতন্ত্রের একটা আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, গণতন্ত্র শুধু একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো মাত্র নয়—গণতন্ত্রে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ সম্বন্ধে যত দূর সজাগ, সেই অনুপাতেই ইহা সাফল্য লাভ করিয়াছে ও করিবে।

"আপনি ও আপনার সমধর্ম্মীগণ যে-সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন ও নিজ জীবনে পালন করিয়াছেন, আজ এই দুঃস্বপ্নবেষ্টিত পৃথিবীতে তাহার বিষম বিপৎকাল উপস্থিত; আজ দেখিতেছি যুক্তিকে কণ্ঠরোধ করিবার প্রয়াস, পরমতসহিষ্ণুতাকে নিবারণ করিবার ও দানবিক জড়বাদের দ্বারা মানবতাকে নিষ্পিষ্ট করিবার চেষ্টা। এই দ্বন্দ্বে মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্যই বিনষ্ট হইবে এমন আশঙ্কা আছে। যদি পৃথিবীকে অন্ধকারময় যুগের পুনরাবর্ত্তন হইতে রক্ষা করিতে হয় তবে শেষ পর্য্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চালাইতে হইবে—ইহাতে সন্ধির কোনও অবসর নাই। একান্ত মনে এত দিন যে-সকল বিশ্বাস লালন করিয়াছি তাহা যদি মিথ্যা পরিহাস-ছলনা না হয়, তবে এই দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি কি, সে-সম্বন্ধেও আমাদের কোন সংশয় থাকিতে পারে না—যদিও বহু রক্তপাত ও অশ্রুজলের মধ্য দিয়া হয়ত সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। কিন্তু জয়লাভ নিষ্ফল হইবে, চিত্তের যে সংযম দ্বারা স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে সেই সংযমের মধ্যে নূতন যুগের মানুষ যদি না গড়িয়া উঠে। যে-সকল দুর্ম্মতি আজ ইউরোপকে বিধ্বস্ত করিতেছে তাহারা নিজেদের কাজ ভালো করিয়াই জানে, তাই তাহারা যে-সব দেশ ধ্বংস করিয়াছে সে-সকল স্থানে বাছিয়া বাছিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় ও প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলিকেই আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধ মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া করা চলিতে পারে—যেমন বর্ত্তমান যুদ্ধ চলিতেছে, এবং যুদ্ধের ফলে মানবের অনেক মহত্তম বৃত্তি উদ্বোধিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যুদ্ধ অতীব অকল্যাণকর অভিশাপ, এবং নিজে বিনষ্ট না হইলে ইহা সভ্যতাকেই বিনষ্ট করিবে। মিল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে, "শক্তিপ্রয়োগ করিয়া শত্রুকে জয় করিতে গেলে শত্রুকে পূর্ণ জয় করা যায় না, অংশতঃ জয় করা যায় মাত্র"; কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করিলে চলিবে না, চিন্তার রাজ্যে ও মনের ক্ষেত্রেও জয় করিতে হইবে—দার্শনিক ও শিক্ষাগুরুগণই সে-ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত সহায় হইতে পারেন।

"বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই আমরা নৈরাশ্যের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, ভাবালুতা চিন্তার স্থান অধিকার করিতেছে, এবং স্বৈরপন্থা নায়কের ইচ্ছার নিকট অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করিতেছে। বিচিত্র কর্ম্ম ও চিন্তার ধারা দ্বারা রাষ্ট্রীয় সংস্থা যদি উজ্জীবিত না হয়, তবে গণতন্ত্র বা চিত্তের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত কোনও সমাজই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সুদৃঢ় মননশক্তি, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, বাস্তবের মুখামুখি দাঁড়াইবার সাহস, যে-সকল সমস্যার সমাধান জড়তাবশত আমরা করিতে পারি নাই তাহাকে স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি, অতীতের দাস না হইয়া বা ক্রমবিকাশের গতি-রোধ না করিয়া প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা—ইহাই কি আজিকার দিনে আমাদের একান্ত প্রয়োজন নয়? শান্তিনিকেতনে ও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে, উভয় স্থানেই এই সকল নীতিই শিক্ষাদানপ্রণালীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

"মহাশয়, আপনার স্বাগতবাণীর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, অদ্য এক প্রাচীন ও এক নবীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বন্ধন স্থাপিত হইল সেই সূত্রপথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তি একীভূত হইয়া ধাবমান হউক এবং ভগবানের ইচ্ছায় উভয় দেশই পরস্পরের নিকট হইতে শক্তিলাভ করুক। সত্যজিজ্ঞাসা সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, নবজীবনলাভের আশা ও শক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্ততিদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হউক।"

নিম্নমুদ্রিত শান্তিবাচন উচ্চারিত হইলে অনুষ্ঠান পরি-সমাপ্ত হয়:

পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তি র্দ্যৌঃ
শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ
শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ
শান্তিঃ সর্ব্বৈঃ মে দেবাঃ শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব্বশান্তিভিঃ
শময়ামোহং যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং
তচ্ছিবং সর্ব্বমেব শমস্ত নঃ।

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে, জলে ওষধি বনস্পতিতে শান্তি বিরাজ করুক, দেবতারা আমাদের শান্তিদান করুন, যাহা ক্রূর, যাহা ভয়ানক তাহা শান্ত হউক, মঙ্গলকর হউক।

হিন্দীতে সন্তবাণী

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

সত্যকার কাব্য ও কবিতা যুগধর্ম্ম-নিরপেক্ষ। পুরানো হিন্দী কবিদের কাব্য ও কবিতা পুরাতনপন্থী হ'লেও তা আধুনিক কালের রুচিবিরোধী আদৌ নয়,—বরং তা আধুনিক সাহিত্যিক-মণ্ডলীর নিকটে অমূল্য সম্পদ ব'লেই গৃহীত হবে। তাঁদের কবিধর্ম্ম ও কাব্য-প্রকৃতি শুধু সাময়িক খ্যাতির গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারে নি; কাল ও দেশ তা বিচার ক'রে একে এত উঁচুতে স্থান দিয়েছে যে আজও তা সমাদৃত হয়ে আসছে।

বিষয় ও আখ্যান-বস্তু মহিমায় হিন্দী ভাষার গত যুগ এত সূক্ষ্ম ও করুণ যে আংশিক ভাবে তার পরিচয় দিলে কাব্যরসিকের মনে আনন্দ হবে না, মন ভরবে না। কিন্তু বিস্তৃতভাবে এক-একটি সম্পূর্ণ কবিতার পরিচয় এই প্রবন্ধের অপরিসর ক্ষেত্রে অসম্ভব। কিন্তু এ-সকল কবিতার ছিটেফোঁটা পড়েও আনন্দ হয়। অবসরযাপনের বিলাস-সামগ্রী তা নয়; তাতে যথেষ্ট পরিমাণে মনের খোরাক যোগায়—অনেক অনধীত বিষয় জ্ঞানলাভ হয়। সাধু-সন্তজনের বাণী আলোচনা করলে তাতে দেখা যাবে যে সেগুলি শুধু নিছক শুষ্ক উপদেশপূর্ণ নয়; বিষয়, আখ্যানবস্তু ও কবিত্ব-মাধুর্যে তা অনুপম।

শিখগুরু তেগ বাহাদুর নানকের একটি বাণী উল্লেখ করেছেন—

"কাহি রে বন খোজন যাই,
সর্ব-নিবাসী, সদা অলোপা, তোহি সঙ্গ সমাই,
পুহুপ মধ্যে জিমি বাস বসত হায়,
মুকুর মাহ জম্ ছাঁহি,
তয়সেহি হরি বসে নিরন্তর,
ঘরহি খোঁজহি যাই;
বাহর ভিতর একহি জানহু,
এহ গুরু জ্ঞান বতাই,
জন নানক বিন আপহি চিনহি,
মিটে না ভ্রমকি কাই।"

তুমি কেন তাঁকে খুঁজতে বনে যাচ্ছ, তিনি সর্ব্ব-নিবাসী কিন্তু সর্ব্ব-অগোচর, তোমার মাঝেই তো তিনি আছেন। পুষ্পের মাঝে যেমন সুবাস, মুকুরের মাঝে যেমন প্রতিচ্ছবি, তেমনি তিনি তোমার মাঝে নিরন্তর বাস করছেন, তাঁকে তোমার ঘরে গিয়েই খোঁজ। গুরু বলছেন, তোমার ভিতর-বাইরে ভগবান বিরাজ করছেন—এই জ্ঞান তোমার অন্তরে আপনি না উদয় হ'লে মানুষ মানুষকে উপদেশ দিয়ে এই ভ্রম-জাল দূর করতে পারে না।

সন্ত-বাণী হিসাবে কবীরের বাণীর প্রাধান্য স্বীকার করতেই হবে। তিনি বলছেন—

"মালা তো করমে ফিরে,
জীভ ফিরে মুখ মাহি;
মনুয়া তো চহুঁ দিশি ফিরে,
এই তো সুমিরণ নাহি।"

তোমার মালা হাতে করে জপ করছ, তোমার জিবও তোমার মুখের মধ্যে নাম কপচাচ্ছে, কিন্তু তোমার মন তো তাতে বসছে না, সে দশ-দিশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে,—এরূপ ভাবে ভগবানকে স্মরণ করলে তো তাঁকে পাওয়া যাবে না।

কবীর সাহেব আরও বলছেন যে, প্রেম প্রেম ক'রে লোকে কত বলছে কিন্তু প্রেমের আসল স্বরূপ তো কেউ ধারণা করতে পারছে না। তাই তিনি বলছেন—

"প্রেম না বাঢ়ী উপজে,
প্রেম না হাট বিকায়;
রাজা, পরজা যেঁহি রুচে,
সীশ দেই লে যায়।
প্রেম, প্রেম সব কোই কহৈ,
প্রেম না চিন্হি কোই;
আঠ পহর ভীনা রহৈ,
প্রেম কহাঐ সোই।"

প্রেম ক্ষেতের ফসল নয়, প্রেম হাটে বিকায় না, প্রেমের সম্পর্কে রাজা-প্রজার ভেদ নেই, কারণ উভয়ই প্রেমের আকর্ষণে মস্তক অবনত করে। প্রেম-প্রেম ক'রে চেঁচালেই হয় না; প্রেমের অষ্ট প্রহর অর্থাৎ সদা-নিরত সাধনা চাই।

সুরদাস হিন্দী ভাষার মহাকবি। তিনি এক স্থলে বলেছেন—

"প্রীতি করি কাহু সুখ ন লহো"

প্রেম ক'রে, প্রীতি জ্ঞাপন ক'রে কেউ কখনও সুখশান্তি পায় নি। তার চিরজীবন দুঃখেই কেটে যায়।

আর এক জায়গায় বলছেন—

"মেরে কুঁওর কান্হ বিমু সব কুছ,
বৈসেহি ধর্যো রহে।"

সমস্ত ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল, শ্রীকৃষ্ণও ব্রজের বিরহে অধীর। এমনি করে ভক্ত ভগবানে আত্মসমর্পণ না করলে তার সাধনা ব্যর্থতার বোঝা হয়ে দাড়ায়।

হিন্দী ভাষাতে সাধুসন্তদের বাণী-সংগ্রহ প্রকাশিত হ'লে দেখা যাবে যে তা অক্ষয় ভাণ্ডার। অন্য ভাষা-ভাষী সন্তজনও এই ভাষাতে তাঁদের অমূল্য উপদেশ-বাণী প্রচার ক'রে গেছেন। তা এত মধুর ও প্রাণ-স্পর্শী যে এক বার পড়তে গেলেই মন মুগ্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে চোখে পড়ে কবীর ও রৈদাস (বাংলায় আমরা যাঁকে রবিদাস ব'লে থাকি) দুই ভায়ে সাধু ও ভক্ত-কবির ধর্ম্মালোচনায় বাদ-প্রতিবাদ, যা প্রায়ই লেগে থাকত।

রৈদাসজীর প্রভাব এক দিন গুজরাত দেশকে ঢেকে ফেলেছিল। আজও গুজরাতে তাঁর লাখ-লাখ শিষ্য আছেন; তাঁরা নিজেকে রবিদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকেন। দরিদ্র চণ্ডালের গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রে ভগবদ্‌ভক্তি ও আরাধনা তাঁকে সর্ব্বজাতির পূজ্য গুরুর আসনে বসিয়েছিল।

কবীর সাহেব ও রৈদাসজীর মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চা নিয়ে বহু বাক্‌বিতণ্ডা হ'ত কিন্তু তাতে উভয়ের সৌহার্দ্য শিথিল না হয়ে আরও গভীর, আরও দৃঢ়ীভূত হয়েছিল।

রৈদাস বলেছেন—

"প্রভুজী তুম চন্দন হম পানী,
যাকি অঙ্গ্ অঙ্গ বাস সমানী।"

প্রভু, তুমি চন্দন আর আমি জল—উভয়ের অবিচ্ছেদ্য মিলনে কণায় কণায় সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

"প্রভুজী তুম ঘন বন হম মোরা,
যৈ সে চিতওত চন্দ্-চকোরা।"

প্রভু, তুমি যেন নিবিড় বন, আমি তার মাঝে ময়ূর, চকোর যেমন চাঁদের দিকে চেয়ে আছে তেমনি আমি তোমার দিকে চেয়ে আছি।

আবার বলছেন—

"প্রভুজী তুম মোতী হম ধাগা,
যৈসে সোনে মিলত্ সোহাগা।"

প্রভু, তুমি মহামূল্যবান মোতী আর আমি (ভক্ত) মোতীর মালা গাঁথবার সুতো (ধাগা)। তুমি ও আমি সোনা-সোহাগার ন্যায় মিশে এক হয়ে আছি।

দাদূ দয়াল শুধু এক জন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন না, তিনি এক জন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। তাঁর একটি উপদেশ-বাণী উল্লেখ করছি:—

"জাতি ন পুঁছো সাধু কী,
পুঁছ লীজিয়ে জ্ঞান;
মোল করো তলয়ার কা,
পড়া রহন কো ম্যান।"

সাধুসন্ত জনের জাতি-পাঁতির খোঁজ ক'র না,—তার জ্ঞান ও গুণের পরখ কর। তরবারির ধাতু ও মূল্য পরীক্ষা কর, তার কোষ দূরে পড়ে থাকুক।

দাদূ দয়াল নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, তাই তিনি "সব মে রমনেওয়ালা রাম" বলে ভগবানের নাম জপ করতেন। তিনি বহু ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন এবং হিন্দী, ফারসী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষাতে তাঁর বাণী রেখে গেছেন।

দাদূর রচনা সর্ব্বসাধারণের নিকট "শাখী" বলে পরিচিত আর কবীরের রচনা "ভজন" বলে অভিহিত করা হয়। দাদূর "শাখী" প্রেমের মহিমায় সমুজ্জ্বল আর কবীরের ভজন ভক্তি ও শ্রদ্ধার মহিমায় করুণ।

এই দুই জন মহাকবি ও পরম সাধু হিন্দু ও মুসলমানে কোনোরূপ ভেদাভেদের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁদের উদার হৃদয়ে গোঁড়ামির রেখাপাতও করতে পারেনি—এমনি মহান এঁরা ছিলেন। গুরু নানকের উপদেশ-বাণী অনেক বাংলা-সাহিত্যরসিকের আদরণীয় ও প্রিয়।

সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি আরও কত সাধু-সন্তজনের উপদেশ-বাণীতে হিন্দী ভাষার অক্ষয় ভাণ্ডার ভরে আছে তা বলে শেষ করা যায় না।

কবীরের আর একটি বাণী এখানে উল্লেখ করি।

তিনি বলেছেন—

"বীত গয়ে দিন ভজন বিনা রে।
বালকপন গয়ো খেল-কুদ মে,
জব জওয়ানী তব মান কিয়ারে।
* * * * *
কহত কবীর শুনো ভাই যাকৈ,
পার উতর গয়ে সন্ত জনারে।"

বিনা সাধন-ভজনে মানব-জীবন সমাপ্ত হয়ে গেল। বাল্যকাল খেলাধুলায় আর যৌবন হাসা-পরিহাসে কেটে গেল...যাঁরা সাধুসন্ত-জন, বৃথা কালাতিপাত করেন নি, সাধন-ভজন করেছেন,—তাঁরা অনায়াসে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

সুরদাসের একটি বাণী উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

"উধো, মন ন হোঁহি দশ, বীশ,
এক হুতো সো গয়ো শ্যাম সঙ্গ
অব কো আরাধয় ঈশ।"

সুরদাস বলছেন যে মানুষের একটা মন থাকে, দশ-বিশটা তো মন থাকে না। সেই একটা মন শ্যামের সঙ্গে চলে গিয়েছে এখন আর কে ঈশ্বরের আরাধনা করবে



দেশ-বিদেশের কথা



একটি নূতন শিল্পের উদ্ভাবন

শ্রীরমেশ বসু

বাঁশ বাঙ্গলা দেশের একটি বিশিষ্ট জিনিষ। ইহা গ্রীষ্মমণ্ডলে জন্মে। বাঙ্গলা দেশের সমুদ্রতট হইতে হিমালয়ের উপর দশ হাজার ফুট বা তাবও উঁচুতে ইহা দেখা যায়। বাঁশের বহু রকম শ্রেণী ও উপশ্রেণী আছে। বাঁশের ব্যবহারেরও যে কত বৈচিত্র্য আছে তাহাও বলিয়া শেষ করা যায় না। অসভ্য ও সুসভ্য জাতিরা এই বাঁশ হইতে নানা দিকে নানা উপকার পাইয়া আসিতেছে। সাধারণ লোকদের জীবনের এমন কোন দিক্ নাই যাহাতে বাঁশ কোন-না-কোন কাজে লাগিয়াছে। এখন কথা হইতেছে বর্ত্তমান যুগে ইহার উপযোগিতা কি আগের মত থাকিবে, না কমিয়া যাইবে? ইহার উত্তর নির্ভর করে ইহাকে আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া কাজে লাগান যাইতে পারে কিনা তাহার উপর; কিন্তু আধুনিক যুগের রুচি ও প্রয়োজন অনুরূপ। বাঁশ হইতে এ যুগের উপযোগী কি করা যায় তাহা লইয়া চেষ্টা-চরিত্র করার পর ইহার মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। তাহাতে ইহার ব্যবহারের নূতন দিক্ খুলিয়া গিয়াছে। তবে বাঙ্গলা দেশে যে পরিমাণে বাঁশ জন্মে বা জন্মান যাইতে পারে সে তুলনায় এই নূতন ব্যবহারেও ইহার প্রয়োগ সামান্যই হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে কাগজের কল খুব বেশী নাই। বোধ হয় সবসুদ্ধ চার-পাঁচটি হইবে। ইহার মধ্যে টিটাগড়ের কাগজের কারখানা নাকি দিন এক শত টন এবং রাণীগঞ্জের কারখানা বৎসরে মাত্র দশ হাজার টন বাঁশ ব্যবহার করে। সুতরাং এই বিস্তৃত দেশে যে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ তাহা হইতে আধুনিক যুগের

মণ্ড অবস্থায় ইহাকে ছাঁচে ঢালিয়া যে-কোন আকার দেওয়া যায়। ইহা তাপ ও ধ্বনি সঞ্চারে বাধা দেয় (non-conductor of heat and sound-proof) বলিয়া ইহা কতকগুলি বিশেষ কাজে ব্যবহারের উপযোগী। এই জমান মণ্ড যে-কোন রঙে রঞ্জিত করা যায়, সুতরাং ইহার প্রয়োগে বিচিত্রতার সম্ভাবনা ঘটে। ইহাতে বার্ণিশ চলে। এই মণ্ডে প্রস্তুত জিনিষগুলিতে রং ও বার্ণিশের সাহায্যে মাটির, কাঠের, ইটের ও পাথরের জিনিষের আভাস আসে। শক্ত কাগজের মত পাতলা করিয়া ইহার দ্বারা কতকগুলি জিনিষ প্রস্তুত করা যায়।

এই যে নূতন শিল্পের কথা বলা হইতেছে ইহা শুধু পরীক্ষাগারেই সফলতা লাভ করে নাই, ব্যবসা হিসাবেও ইহার সফলতা সুনিশ্চিত। যে কাঁচা মাল দরকার তাহা এদেশে অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাঁশ বা আঁশযুক্ত অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ এত পরিমাণে জন্মে যে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহারই হয় না। এই নূতন শিল্পে দেশের কাঁচা মাল দেশেই ব্যবহৃত হইয়া সত্যকার ধনবৃদ্ধির একটা পথ খুলিবে। কাঁচা মাল ছাড়া আর যে-সব জিনিষ দরকার তাহাও এই দেশেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই শিল্পের জন্য যে-সব রাসায়নিক দ্রব্য আবশ্যক তাহাও ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী যে শিল্প উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা ষোল আনা স্বদেশী, তাহার সম্পর্কে কোন কিছুর জন্যই বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে না। আর বিদেশে যুদ্ধ বা রাজ্যবিপ্লব হইলেও এই ভারতীয় শিল্পের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। বরং নানা দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উহাতে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি বিষয়ে সাহায্যই হইবে। ব্যবসায় জগতের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পের প্রতিযোগিতার কোন সম্ভাবনা নাই।

বাজারে প্রচলিত বহু রকমের মণ্ডীকৃত জিনিষ (plastics) ও অন্যান্য কতকগুলি শিল্পের যে সব অসুবিধা আছে তাহা এই নূতন ধরণের জমানো মণ্ডে না থাকাতে সহজেই ইহা উহাদের স্থান দখল করিতে পারিবে, যেমন সেলুলয়েড, বেকেলাইট, কম্প্রেস্‌ড্ ফাইবার, ভেনেষ্টা প্লাইউড প্রভৃতি। ব্যবহারিক প্রয়োগে ইহাদের প্রত্যেকটির দোষ বাহির হইয়াছে, কিন্তু এই নূতন মণ্ডে সে-সব দেখা যায় না। ইহার ব্যবহার যেমন বেশী হইতে থাকিবে তেমন গবেষণা ও পরীক্ষার সাহায্যে ইহার উন্নতি আরও বেশী হইতে পারিবে। এই মণ্ড হইতে কি কি জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে এবার আমরা তাহা আলোচনা করিব।

এই মণ্ড দ্বারা পাতের আকারে তক্তা নির্ম্মাণ করা যায়। উহা ধ্বনি ও তাপ সঞ্চারে বাধা দেয় বলিয়া বহু কাজে লাগিবে। ইহার দ্বারা ঘরের পার্টিশন ও সিলিং করিলে অন্য কামরার শব্দ শোনা যাইবে না বা চালের গরম ঘরের মধ্যে অনুভূত হইবে না। তক্তা নানা রঙের হইবে বলিয়া দেখিতে সুশ্রী হইবে এবং তাহার উপর কারুকার্য্য চলিবে। বিশেষ করিয়া সিনেমা-গৃহে ও বক্তৃতা-গৃহে ইহা অতি প্রয়োজনীয় হইবে। এই তক্তা সোজা ও বাঁকান দুই রকমই হইতে পারিবে, ইহা অত্যন্ত সুবিধার কথা। ভেনেষ্টা প্লাইউড বা ঐরূপ পাত-করা অন্য কোন জিনিষের তক্তা পরতে পরতে সাজান থাকে, সুতরাং একবার ক্ষয় ধরিলে উহা সহজে চটিয়া নষ্ট হইয়া যায়, আর ধারে মুড়ি দিয়া না আটকাইলে ধার খসিয়া আসে। কিন্তু "পাল্‌পো" তক্তায় সেরূপ কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন-না, ইহা আঁশময় না হইয়া পিণ্ডীকৃত হয়। ইহার তক্তায় উচ্চশ্রেণীর কাজের জন্য বাক্স প্রস্তুত করিলে যেমন মজবুত তেমনি সুদৃশ্য হইবে। প্রচলিত হারমোনিয়াম, রেডিও ও গ্রামোফোনের 'কেস'গুলিতে পেরেক ব্যবহার না করিয়া আঠা দ্বারা কাঠ জোড়ান হয় এবং পরে উহা খুলিয়া যায়, কিন্তু এই জমান মণ্ড দ্বারা জোড়া না দিয়া ছাঁচে একেবারে 'কেস্' প্রস্তুত করা যায়, তাহাতে যত দিন 'কেস্' টিকিবে ততদিনের মধ্যে জোড়া খুলিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। এই মণ্ডদ্বারা যে 'সুটকেস্' ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা দেখিতে যেরূপ সুন্দর, তেমনি টেঁকসই ও হাল্‌কা। টেবিলের উপরভাগ ইচ্ছামত নানা আকারে ও রঙে উক্ত পাত হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। চায়ের ট্রে ইত্যাদি অতি সুন্দর হইয়াছে। "পাল্‌পো" পাতের কতকগুলি গুণ দেখিয়া বিদেশী বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন এরোপ্লেনের কোন কোন অংশ নির্ম্মাণে ইহা কাজে লাগিবে।

বিদেশ হইতে যে সব পুতুল ও খেলনা এদেশে এখন প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে তাহা সাধারণতঃ সেলুলয়েড বা ধাতুনির্ম্মিত। সেগুলি সহজে ভাঙিয়া যায় বা টোল খায়। সেলুলয়েডের খেলনায় আবার সহজে আগুন ধরে বলিয়া বিপজ্জনক। কাগজের খেলনা ত জল লাগিলেই নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল খেলনা ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া অবোধ শিশুদিগকে নিত্য যোগান দিতে গিয়া সাধারণ গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আর খেলনার খেয়ালে বহু অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। শুধু ১৯৩৫ সালে আমরা বিদেশ হইতে চল্লিশ লক্ষ টাকার পুতুল কিনিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়াছি। এই জমানো মণ্ড হইতে

প্রস্তুত খেলনাগুলি শক্ত, মজবুত ও হাল্কা, আর ইহাদের রঙের বাহারও কম নয়। এই নূতন শিল্প দ্বারা বহু অর্থ দেশে রাখিবার একটা উপায় হইবে। শুধু সাধারণ পুতুল নয়, নানা রকম কলের পুতুলও (mechanical toys) প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আরও কত রকমের জিনিস যে এই মণ্ড দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং করা যাইতে পারে তাহার সীমা নাই বলিলেই চলে। ফুলদানি, ব্র্যাকেট, কৌটা, সুইচ, সুন্দর টেবিল-ল্যাম্প, ল্যাম্পের ঢাকনা, ছাই রাখিবার পাত্র, কারুকার্য্যময় মূর্ত্তি, ছাতা ও লাঠির সুদৃশ্য বাঁট, ফটো রাখিবার ফ্রেম, তৈলচিত্রের ফ্রেম, সুদৃশ্য গহনার বাক্স, সেলাইয়ের বাক্স ইত্যাদি নানা জিনিষ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। বড় বড় তৈলচিত্রের ফ্রেম যাহা এখন বিদেশ হইতে আসে সেগুলি অত্যন্ত ভারী ও দামী, অথচ উহার একটু অংশ খসিয়া গেলে উহার সমস্তটাই নষ্ট হইয়া যায় ও বদলাইতে হয়। এই মণ্ড হইতে প্রস্তুত ফ্রেমে সে দোষ ঘটে না।

বিজলী পাখার জন্য যে ব্লেড লাগে তাহা ধাতুনির্ম্মিত হইলে হাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার বদলে গরম হইয়া উঠে, আর কাঠের তৈয়ারী হইলে বিজলী খরচ বেশী হয়। কিন্তু এই "পালপো" নির্ম্মিত ব্লেডে ধাতুর ব্লেডের মত কম বিজলী খরচ হয় এবং কাঠের ব্লেডের মত ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। উপরন্তু উহা যে-কোন আকারে ও কারুকার্য্যময় করিয়া প্রস্তুত করা যায়।

এই যে একটি নূতন শিল্প এদেশে উদ্ভাবিত হইল সে-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কতকগুলি কথা বলা দরকার। এখন দেখা যাইতেছে পৃথিবীর নানা দেশে স্বাভাবিক জিনিসের পরিবর্ত্তে সংহত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নানা প্রকার মণ্ড উদ্ভাবন করিয়া নূতন নূতন শিল্পের পত্তন করা হইতেছে। এ-পর্য্যন্ত এ-ধরণের নাকি ১২৫০ প্রকারের শিল্প উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই জন্য আমাদের দেশের এক জন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন—"We are in a plastic age", এ-কথা যে সত্য তাহা আমরা বাজারে প্রচলিত জিনিসগুলির খোঁজ করিলেই বুঝিতে পারি। সব দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে যেন বিদেশের কোন স্বভাবজাত জিনিস যাহাতে সে-দেশের একচেটিয়া অধিকার ও আধিপত্য তাহার উপর নির্ভর করিতে

না হয়। তাহা হইলে বিদেশকে অর্থ দিতে হয়। যুদ্ধ বাধিলে ঐ বিদেশের কাঁচা মাল পাওয়া যায় না, তাহাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। সেই জন্ম যে-দেশে যে-জিনিস স্বাভাবিক ভাবে বেশী জন্মে তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নানা রকম শিল্প গড়িবার চেষ্টা হইতেছে এবং উহা সফলও হইতেছে। যেমন নানা রকমের রং এবং জাপানের সেলুলয়েড ও রেশমের ব্যবসায়। এমন কি, কিছুদিন আগে সুপ্রসিদ্ধ মোটরগাড়ী নির্ম্মাতা হেন্‌রী ফোর্ড বলিয়াছেন, যে তিনি নাকি ভবিষ্যতে তাঁহার মোটর গাড়ীর অধিক অংশ এইরূপে synthetic plastics দ্বারা তৈয়ারী করিবেন।

এ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী নিজ হাতে জিনিসগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি বাংলা সরকারের ও কলিকাতা কর্পোরেশনের শিল্পসংগ্রহালয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সকলেই দেখিয়া বুঝিয়াছেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। হাতের তৈয়ারী জিনিস ভাল হইলেও উহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা যায় না, সুতরাং ব্যবসা হিসাবে চালান যায় না। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই শিল্পের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে গৃহশিল্প হিসাবে অনেক কাজ হইতে পারিবে। বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে মূল জিনিস প্রস্তুত করিয়া দিলে ছাঁচে করিয়া নানা জিনিস প্রস্তুত করা একটি বৃহৎ গৃহশিল্প হইতে পারিবে। বাজারের চাহিদা মিটাইতে হইলে কলের সাহায্য দরকার। এই জন্য প্রচুর অর্থের আবশ্যক। এই শিল্প দেশের ধনবৃদ্ধির একটি নূতন উপায় করিয়া দিবে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের দেশের এক জন চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যাহা সাধন করিয়াছেন তাহাকে পোষণ করিয়া ব্যবসায় হিসাবে তাহাকে সফল করিয়া তুলিতে সাহায্য করা।

—

লণ্ডনে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি ও রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

প্রায় এক-বৎসরকাল হইল, লণ্ডনে একটি বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিমাসে ইহার অধিবেশন হয় ও সাহিত্য আলোচনা ও নাটকাভিনয়াদি হয়। এই সমিতির উদ্যোগে এই রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর শশধর সিংহ প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী আশালতা ভট্টাচার্য্য এই সমিতির সভানেত্রী, ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাক্ষা-গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর রামকান্ত ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক।

—

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

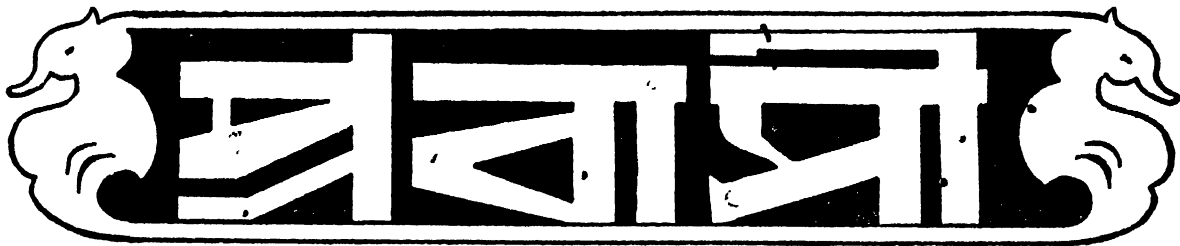
শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকশিল্প বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগে লণ্ডনে বঙ্গীয় লোকশিল্পের আলোচনা প্রসার লাভ করিতেছে। তিনি এ-বিষয়ে তথায় কয়েকটি বক্তৃতাও করিয়াছেন।



১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পাড়ি



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪০শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রথম ৈপ্রতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেন পুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার জানি না সে কোথা হ'তে
হোলো উত্থিত নিত্য-ধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।
বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নব বিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষবিনাশের হেলা।
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ-ঢাকা বধূ সেজে
গলায় পরিয়া হার
বুদ্বুদ-মণিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব॥

বলিদান

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

শারদীয় দুর্গোৎসব আসিয়া উপস্থিত। এই সময়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব। কালীপূজা জগদ্ধাত্রী-পূজা প্রভৃতি উৎসবেও বাংলা দেশ জাগিয়া ওঠে বটে, কিন্তু দুর্গাপূজাই বাংলা দেশের উৎসবের সেরা উৎসব। এই সব শক্তিপূজাতেই বিস্তর ছাগপশু বলি দেওয়া হয়। মহিষ-বলি এখনও কোথাও কোথাও চলিত আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় মহিষ-বলি অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমাদের বাল্যকালে এক-একটি গ্রামে যে-পরিমাণ মহিষ-বলি দেখিয়াছি এখন বোধ হয় গোটা জেলায় ততগুলি মহিষ-বলি হয় কি না সন্দেহ।

শাক্তদের পূজাতে পশুবলি একটি মুখ্য অঙ্গ। শাক্তদের মধ্যে দক্ষিণাচারী ও বামাচারী—এই দুইটি প্রধান ভাগ আছে। বামাচারীদের মধ্যেই বলির আড়ম্বর কিছু বেশী। দক্ষিণাচারীদের কেহ কেহ পশুবলিটা পছন্দ করেন না বলিয়া চালকুমড়া, ইক্ষু প্রভৃতি বস্তু বলি দেন। বৈষ্ণবের বাড়ীতেও দেবীপূজার উপলক্ষ্যে বলি দিতে হইলে ঐরূপ কুমড়া, ইক্ষু প্রভৃতিরই বলি হয়।

বলির সমারোহটা বাংলা, আসাম, নেপাল ও হিমালয় প্রদেশেই বেশী। উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দেশে বৈষ্ণব তীর্থতে সাধারণতঃ পশুবলি চলে না। কাশী শৈব তীর্থ। সেখানে দুর্গাবাড়ী ছাড়া আর কোন দেবী-স্থানে পশুবলির প্রথা নাই। দুর্গাবাড়ীর বাহিরে হাত-তিনেক স্বতন্ত্র একটুখানি স্থান আছে, তাহা নাকি বিশ্বনাথের পবিত্র কাশীর ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে। কাশীর সমস্ত পশুবলি এই বিশ্বনাথের পবিত্র ধামের বহির্ভূত তিন হাত জায়গাটুকুর মধ্যেই দিতে হয়। বিন্ধ্যবাসিনী দেবী মীর্জ্জাপুর শহর হইতে দূরে। এই দেবীর নামে প্রাচীন কালে লক্ষ লক্ষ লোক দেশে-বিদেশে বিচরণ করিয়া হঠাৎ ফাঁসী দিয়া অগণিত পথযাত্রীর প্রাণ লইত। তাহাদের নাম ছিল ঠগ বা ঠগী। ঠগীরা মানুষ মারিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিত বটে, কিন্তু ঐ ভাবে মানুষ হত্যা করাটাই ছিল তাহাদের ধর্ম্ম। সেই সব নিহত লোককে বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে বলি দেওয়া হইত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। এই ঠগীদের মধ্যে মুসলমানও ছিল বিস্তর। বিন্ধ্যবাসিনীর চরণে মানুষ বলি দিতে ঠগী-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদেরও ভক্তি ও উৎসাহ কম ছিল না।

যাগযজ্ঞে প্রাচীন কালে পশুবলির প্রথা ছিল। কাজেই পশুবলির প্রাচীনতায় বিষয়ে সংশয় করিবার কোন হেতু নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশু-হিংসার দ্বারা যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে বহু বাণী উত্থিত হইয়াছে। বেদের মধ্যেও হিংসার নিন্দা ঘোষিত হইয়াছে। আচার্য্য কপিল, পঞ্চশিখ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের তো প্রধান কথাই এই হিংসার বিরুদ্ধে। বৈষ্ণব আচার্য্যগণও যুগে যুগে, দেশে দেশে নানা ভাবে অহিংসার মন্ত্রই উচ্চারণ করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের কথা বলিতে গিয়া গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী বলিয়াছেন,

> নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
>
> সদয় হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং
>
> কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে।

"নিষ্ঠুর পশুঘাত দেখিয়া সদয়হৃদয় নারায়ণ বুদ্ধরূপে শ্রুতিজাত যজ্ঞবিধির নিন্দা করিলেন।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দশাবতার-স্তবে বুদ্ধদেবের কথায় বলিলেন—"কারুণ্য মাতন্বতে" অর্থাৎ তিনি জগতে কারুণ্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শৈব সাধকগণও হিংসাকে সর্ব্বতোভাবেই নিন্দা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ

প্রভৃতিও বলিয়াছেন, "বলি দিতে হয় দাও অন্তরের রিপুগুলিকে—ছাগলের ছানাগুলি বধ করিয়া আর কি পুণ্য সঞ্চয় করিতে চাও ?"

অথচ এই পশুবলিও তো কম প্রাচীন প্রথা নহে। কাজেই "প্রথা" সমর্থন করিতেছে এই হিংসাকে, অথচ মানবচিত্তের সহজ "দয়া মৈত্রী" বলিতেছে, হিংসা দূর কর। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় কেমন করিয়া ? তাই অনেকে পশুর বদলে ইক্ষু কুষ্মাণ্ড প্রভৃতিই বলি দেন। আসাম, হিমালয় প্রদেশে ও বাংলার বাহিরে ক্ষত্রিয় ছাড়া উচ্চ জাতিরা হিংসাবিমুখ। অন্ত্যজ জাতিরা বলি দিলেও অনেক ক্ষেত্রে রক্তপাত না করিয়া গলা মোচড়াইয়া পশু বধ করে। তাহার মধ্যেও ভাবটা দেখা যায় এই যে দেবতাকে পশুবলি দিব বটে, তবে রক্তপাতটা করিব না। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন নাটকে রঘুপতি হইলেন "প্রথা"র অবতার আর গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহ হইলেন "দয়া"র অবতার।

পূর্ব্বকালে মনে হয় বাংলা দেশের বাহিরেও পশুবলি প্রথা আরও বেশী প্রচলিত ছিল। তাই সাধক কবীর বলিয়াছেন,

সন্তো পাঁড়ে নিপুণ কসাঈ
বকরা মারি ভৈঁসা পর ধাবৈ
দিল মেঁ দরদ ন আঈ।

—বীজক শব্দ, ১১

"হে সাধু ব্রাহ্মণ পাড়ে অতি নিপুণ কসাই। পাঠা বধ করিয়া তিনি মহিষের প্রতি ধাবিত, একটুও দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় না।"

আবার তিনি বলেন,

অপনে সুতকে মুংডন করাবৈ
ছুরা লগন ন পাবৈ।
অজয়া কে চিংগনা ধরি মারৈ
তনিক দয়া ন আবৈ।

"আপন সন্তানের মাথা মুড়াইবার সময় দেখেন যেন একটুও ক্ষুরের আঘাত না লাগে। আর ছাগের শিশুকে ধরিয়া যখন মারে তখন হয় না একটুও দয়া।"

এইরূপ মধ্যযুগের সকল ভক্ত সাধকের বাণীর মধ্যেই পাই। মধ্যযুগের সাধকরা সকলেই এই পশুহিংসার বিরোধী। তাহাতেই মনে হয় বাংলার বাহিরে পূজার জন্য পশুহিংসা ক্রমশঃ এই সব কারণেই কমিয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশে মহাপ্রভুর প্রচারের পরেও, বৈষ্ণব ভাবের প্রসারের পরেও পূজার্থ জীবহিংসা কেন তবে তেমন ভাবে কমিয়া যায় নাই ? হয়তো পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেকটা কমিয়াছে তবু যাহা আছে তাহাকেও তো কম বলা চলে না।

কিছুদিন যাবৎ বাংলা দেশেও একটা আন্দোলন চলিয়াছে পূজাতে হিংসা অপরিহার্য্য কি না। অনেকে স্বভাবতঃ সহৃদয় হইয়াও প্রাচীন প্রথার কথা ভাবিয়াই পূজার্থ এই জীবহিংসা উঠাইয়া দিতে পারিতেছেন না।

এখন ভাবিবার কথা এই যে, ধর্ম্মের মধ্যে এই জীববলি প্রবেশ করিল কেমন করিয়া ? সেই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে হৃদয়ের ও প্রথার মধ্যে এই যে বিরোধ অনেক পরিমাণে তাহার মীমাংসা হয়।

আসলে "বলি" কথাটার মূল অর্থই "উৎসর্গ"। দেবতাকে যাহাই কেন নিবেদন করি না তাহাই "বলি"। এই উৎসর্গ করা ছাড়া সাধনা কি হয় ? সকল সাধনার মূলেই আছে তাই উৎসর্গ অর্থাৎ বলি। সেই "উৎসর্গ" অর্থাৎ "বলি" দিতে হইবে আপনাকে। আপনাকে বলি না দিলে কি জ্ঞান কি প্রেম কি শক্তি, কিছুই মেলে না। শক্তির ক্ষেত্রে তো আত্মোৎসর্গ ছাড়া এক তিলও অগ্রসর হওয়া যায় না। জ্ঞানের বা প্রেমের ক্ষেত্রেই কি কম উৎসর্গের প্রয়োজন ?

এই উৎসর্গ প্রথমে সাধক নিজেকেই করিবেন। ক্রমে এমন হইল যে, আপনার স্থলে আপনার প্রিয়তম কাহাকেও উৎসর্গ করিতেন। তাই ইহুদীয় খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান শাস্ত্রে দেখা যায় এব্রাহাম আপনার স্থলে আপনার পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হইলেন। এই বলি অর্থেও উৎসর্গ অর্থাৎ sacrifice। এই sacrifice এখনও আত্মোৎসর্গের বিশুদ্ধ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। কর্ণও তাঁর পুত্র বৃষকেতুকে উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। sacrifice অর্থাৎ আত্মোৎসর্গ ছাড়া কোন মহদ্‌ব্রতই সাধনা করা অসম্ভব।

আপনাকে যদি উৎসর্গ না করা যায় তবে কেমন

করিয়া প্রেমের দেবতাকে দাবী করা যায়। কাজেই "বলি" কথাটার আদিম অর্থ "উৎসর্গ" বলিয়া যখন ধরি তখন শাক্তকেও বলিতে হয় "বলি" বিনা সাধনা হয় না, প্রেমিককেও বলিতে হয় "বলি" বিনা সাধনা হয় না। "বলি" কথাটির সেই আদিম অর্থ ধরিলে বৌদ্ধ বৈষ্ণব সকলকেই বলি মানিতে হয়। কারণ ভগবানকে প্রেমের জোরে পাইতে হইলেও বৈষ্ণবের চাই বলি। জগতের পূর্ণ কল্যাণ চাহিতে হইলে বৌদ্ধ সাধকের পক্ষেও চাই বলি। বলি ছাড়া এক পদও সাধনার রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না।

কিন্তু এই বলি হইল আপনাকে উৎসর্গ করা। সেই অর্থেই বলি কথা এখনও ভারতের সকল প্রদেশেই সাধু ভক্তদের মধ্যে প্রচলিত। শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, সৌর, সবাই নিজ নিজ মন্দিরে পুষ্প পত্র চন্দন অর্ঘ্য সবই বলি দেয়। প্রেম ভক্তি বলি দেয়। কিন্তু যেই এই সব বস্তু বা আপনাকে বলি না দিয়া বলি দিতে যায় ছাগশিশুকে তখনই দেখা দেয় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ। তখন শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দুধর্ম্ম আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় মারাত্মক বিরোধে। কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থে দেখা যায় ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত দেবীর ভক্ত নরনারীগণও ঐ বলিস্থানের দিকে চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিতে পারেন না। দয়াময়ীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই দিকে তাকাইতে পারেন না। মিস মেয়ো যখন ভারতের নামে খেউর গাহিয়াছেন তখন তাঁহারও প্রধান একটি বিষয় ছিল ধর্ম্মের নামে ভারতে এই সব আদিমযুগোচিত বীভৎসতা। কালীঘাটের বলিপশুর গরম গরম রক্ত লইয়া যে নিষ্ঠুর লীলা, তাহা শুনিলে কে না স্তম্ভিত হইবে?

অথচ যদি বলির সেই আসল প্রাচীনতম অর্থকে আমরা আশ্রয় করি তবে কে না তাহাতে হইবে ভক্তিমান? আপনাকে "উৎসর্গ" বিনা কোন্ সাধনা প্রতিষ্ঠিত?

প্রথমেই দেখা যাউক বৌদ্ধ সাধনাতে আত্মোৎসর্গের নমুনা কেমন মেলে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আসল কথাটাই হইল সবার কল্যাণের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করা। য়ুরোপীয়রা যখন ভারতকে আঘাত করিতে চাহেন্ তখন বলেন ভারতের ধর্ম্ম স্বার্থময় ধর্ম্ম। সবার হিতের জন্য সাধনা নাকি ভারতের ধর্ম্মসাধনা নহে। কিন্তু বৌদ্ধদের মৈত্রী-ভাবনার মধ্যে সর্ব্বজীবের জন্য যে অপরিমেয় মৈত্রী-ভাবের কথা আছে, সেই ব্রহ্মবিহারের সঙ্গে জগতের আর কোন মৈত্রীসাধনার তুলনাই চলে না।

এই বিষয়ে প্রজ্ঞাকরমতিকৃত বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকায় যাহা দেখি তাহার তুলনা নাই। সেখানে দেখি সাধক বোধিসত্ত্বপদ লাভ করিয়া যখন বুদ্ধত্ব পাইবার অধিকারী তখন জগতের কল্যাণের জন্য আপন বুদ্ধত্ব-লাভও সরাইয়া রাখিয়া জগতের সেবার জন্য চিরদুঃখ বরণ করিতে উদ্যত। কারণ যাঁহারা জগতের অন্ধকার দূর করিয়া মানবকে আলোক দিবেন তাঁহারাই যদি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন তবে আর মানব আলোক পাইবে কোথায়? তাই বোধিসত্ত্বের যোগ্য প্রার্থনা দেখিতেছি,

এবং সর্বমিদং কৃত্বা যন্ময়াসাদিতং শুভম্।
তেন স্যাং সর্বসত্ত্বানাং সর্বদুঃখ প্রশান্তিকৃৎ।

—বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকা, ৩,৬

"এই সব করিয়া যে কিছু শুভ আমি লাভ করিয়াছি তাহার দ্বারা যেন আমি সকল জীবের সর্ব্বদুঃখ দূর করিতে পারি।"

গ্লাননামস্মি ভৈষজ্যং ভবেয়ং বৈদ্য এব চ।
তদুপস্থায়কশ্চৈব যাবদ্রোগাপুনর্ভবঃ॥ ঐ, ৩, ৭

"যাবৎ না তাহাদের রোগ একেবারে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত না হয় তাবৎ যেন পীড়িতদের জন্য আমি ঔষধ হই, তাহাদের জন্য যেন আমি চিকিৎসক হই, তাহাদের রোগ সেবার জন্য যেন আমি সেবক হই।"

"আমার যাহা কিছু পুণ্য যাহা কিছু শুভ ফল সবই যেন আমি সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্য নিষ্কাম ভাবে দান করিতে পারি"

নিরপেক্ষস্তজাম্যেষ সর্বসত্ত্বার্থ সিদ্ধয়ে। ঐ, ৩, ১০

তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সর্ব্বজীবের সর্ব্বদুঃখ দূর করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন,

অনাথানামহং নাথঃ সার্থবাহশ্চ যায়িনাম্।
পারেপ্সূনাংচ নৌভূতঃ সেতুঃ সংক্রম এব চ।

ঐ, ৩, ১৭

"অনাথদের জন্য যেন আমি নাথ হই, পথচারীদের যেন আমি পথপ্রদর্শক হই, পার হইতে ইচ্ছুকদের যেন আমি নৌকা

হই, আমি যেন সবার চলিবার পথে সেতু ও সংক্রম হইয়া থাকি।"

দীপার্থিনামহং দীপঃ শয্যা শয্যার্থিনামহম্।
দাসার্থিনামহং দাসো ভবেয়ং সর্ব্বদেহিনাম।

ঐ, ৩,১৮

"দীপার্থীদের জন্য যেন আমি দীপ হই, শয্যার্থীদের জন্য যেন আমি শয্যা হই, দাসার্থীদের জন্য আমি দাস হই, এমন করিয়া যেন সর্ব্বজীবের সেবা করিতে পারি।"

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ৫০তম অধ্যায়ে আছে মহর্ষি চ্যবন গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমস্থলে জলের মধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যায় রত ছিলেন। জালিকেরা সেখানে যে মৎস্যের জন্য বিরাট জাল ফেলিয়াছিল তাহার মধ্যে চ্যবনও বদ্ধ হইলেন। তপস্যায় রত মহর্ষিকে দেখিয়া জালিকেরা মহাভীত হইল। তাহারা কহিল "হে মহাভাগ, আমরা না জানিয়া আপনাকে জালে বদ্ধ করিয়া তুলিয়াছি। আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া যথাসুখ অন্যত্র গমন করুন। আমরা এই সব মৎস্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।" মহর্ষি বলিলেন, "এই সব দুর্ভাগ্য জীবকে ফেলিয়া আমি কোথাও যাইব না, ইহাদের যে গতি আমারও সেই গতি হউক।" অগত্যা এই সব শুনিয়া রাজা সেখানে আসিয়া মহর্ষিকে অনুরোধ করিলেন যেন তিনি জালিকগণকে ক্ষমা করেন এবং তাহাদের জীবিকাস্বরূপ মৎস্যগুলি ধরিয়া বিক্রয় করিতে দেন। মহর্ষি বলিলেন, "এই সব হতভাগ্য জীবকে ছাড়িয়া যদি আমি কেবল নিজের সুখ অন্বেষণ করি তবে আমার মত নিষ্ঠুর হৃদয়হীন আর কে?"

দুঃখিতানীহ ভূতানি দৃষ্ট্বা স্যাদ্ যো ন দুঃখিতঃ।
কেবলাত্মহিতার্থী যঃ কো নৃশংসতরস্ততঃ।

"এই জগতে দুঃখিত জীবদের দেখিয়া যে না দুঃখিত হয়, যে কেবল আপন হিতই খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহার অপেক্ষা নৃশংস আর কে আছে?"

—মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৫০ অধ্যায়

যন্ময়া সুকৃতং কিঞ্চিৎ মনোবাক্ কায়কর্ম্মভিঃ।
দুঃখার্ত্তা জন্তবস্তেন সর্বে সন্তু সুখাবহাঃ। ঐ

'মনে বাক্যে, কায়ে কর্ম্মে যে কিছু সুকৃতি আমি অর্জ্জন করিয়া থাকি তাহাতে সকল দুঃখার্ত্ত প্রাণী যেন দুঃখের অতীত হইয়া সুখী হয়।"

ঠিক যেন বোধিসত্ত্বগণেরই প্রার্থনা। তার পর মহর্ষি চ্যবন আরও বলিতেছেন,

জ্ঞানিনোঽপি যদা স্বার্থং নিশ্চিত্য ধ্যানমাস্থিতাঃ।
সত্ত্বাঃ সংসার দুঃখার্ত্তাঃ কং যান্তি শরণং তদা। ঐ

"জ্ঞানীরাও যদি স্বার্থপর হইয়া আপনার ধ্যান ধারণা লইয়াই থাকেন তবে সংসার-দুঃখে প্রপীড়িত জীবগণ কাহার শরণ লইবে?"

কোঽন্নু স স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং দুঃখিতাত্মনাম্।
অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানাং ভবেয়ং দুঃখভাক্ সদা। ঐ

"এমন কি উপায় আছে যাহাতে আমি সকল দুঃখিত জীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দুঃখ নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সকল দুঃখ হইতে মুক্ত করি।"

অপহৃত্যার্ত্তিমার্ত্তানাং সুখং যদুপজায়তে।
তস্য স্বর্গাপবর্গৌ বা কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। ঐ

"দুঃখার্ত্তের দুঃখ দূর করিয়া অন্তরে যে আনন্দ জন্মে, স্বর্গে বা মুক্তিতে কি তাহার এক আনা আনন্দও আছে?"

মহাভারতের বনপর্ব্বে ১৩০-১৩১ অধ্যায়ে মহাত্মা শিবির উপাখ্যান। তাঁহার প্রার্থনাতেও জগতের দুঃখ মোচনের কথাই দেখি। বোধিসত্ত্বদের মত তাঁহারও দৃষ্টি পরের কল্যাণের জন্য। স্বার্থপর স্বর্গ বা মুক্তি তাঁহার কামনার অযোগ্য।

যন্মমাস্তি শুভং কিঞ্চিৎ মম জন্মনি জন্মনি।
ভবেয়মতমার্ত্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশকঃ।

"জন্মে জন্মে যদি আমি কিছুমাত্র সুকৃত সঞ্চয় করিয়া থাকি তবে যেন তাহাতে আমি সকল দুঃখার্ত্ত জীবের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হই।"

ভাগবতে দেখিতে পাই মহাত্মা রন্তিদেব জীবের দুঃখমোচনের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিলেন। তাহাতেও যখন সর্ব্বজীবের সকল অভাবমোচনে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি বলিলেন,

ন কাময়েঽহং গতিরীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।

—ভাগবত, ৯, ২১, ১৩,

"আমি ঈশ্বরের কাছে অষ্টসিদ্ধিযুক্ত পরাগতি চাহি না, অপুনর্ভব মুক্তিও চাহি না। আমি চাই যেন সকল দুঃখার্ত্ত জীবের

অন্তরে প্রবেশ করিয়া সবাকার সকল দুঃখদাহ আমিই গ্রহণ করি আর সবাই যেন সুদুঃখ হয়।"

ভাগবতের প্রহ্লাদ-উপাখ্যানে দেখি নারায়ণ যখন প্রহ্লাদকে বর দান করিতে চাহিলেন তখন প্রহ্লাদ ভগবানকে বলিলেন,

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ
নৈতান্ বিহায় কৃপাণান্ ন বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে ॥

—ভাগবত, ৭, ৯, ৪৪

"হে দেব, প্রায়ই মুনিগণ আপন বিমুক্তিকামনায় নির্জ্জনে মুনিব্রতচরণ করেন, অন্যের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ নাই। কৃপাপাত্র দুঃখার্ত্ত এই সব জীবদের ছাড়িয়া আমি একা মুক্তি চাহি না। তুমি ছাড়া এই সব ভ্রান্ত জীবগণের আর তো অন্য শরণ দেখিতেছি না।"

বেশি দিনের কথা নহে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময়েও বঙ্গদেশে মহাসাধক মহাত্মা বাসুদেব দত্ত আসিয়া মহাপ্রভুকে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন,

জগত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
এক নিবেদন মোর কর অঙ্গীকার ॥
করিতে সমর্থ তুমি হও দয়াময়।
তুমি মনে কর যদি অনায়াসে হয় ॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মম শিরে।
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব রোগ ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, পরিচ্ছেদ ১৫

ইহার অপেক্ষা বড় বলি বা আত্মোৎসর্গ আর কি আছে। বলি দিতে হইলে এমন বলি আর নাই। এই বলি যখন দিতে শিখিব তখন আমাদের সকল দুঃখদুর্গতি দূর হইবে, তখন সব ভেদবিভেদ-বিরোধের অবসান হইবে, তখন আমরা যে শক্তি লাভ করিব তাহার আর তুলনা নাই। শাক্ত,বৈষ্ণব বৌদ্ধ সবার সমান সাধনা এই বলিদান।

বাংলায় বাউলদের মধ্যে কথা আছে, প্রেমের পথে যে জন জীবন্তে আপনাকে প্রিয়তমের চরণে উৎসর্গ না করিতে পারিল, যে-জন সাধনাতে জীবন্ত না মরিল সে যেন প্রেম বা সাধনার কথা মুখেও না উচ্চারণ করে। বাংলার বাহিরে কবীর, রবিদাস, নানক, দাদূ প্রভৃতি সকল সাধকেরই এক কথা। সাধনাতে প্রথমেই জীবন্তে মরিতে হইবে। কবীর বলিতেছেন,

পহিলে সাঁটা সির ধরৈ
তো পৈসৈ সো ঘর মাহিঁ ॥

"প্রথমে যে এই সাধনায় ঘরের দ্বারে আপনার শির দিল মূল্য রূপে, কেবল সেইজনই আপন জীবন-বলিদানের ফলে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় সেই ঘরে।"

কবীর আরও বলেন,

নাঁব লেবৈ মুবা লেবৈ
জীবত লেবা ন জাই।

"যে নাম লইতে চায় সে যেন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া নাম নেয়, প্রাণ রাখিয়া এই নাম তো যায় না নেওয়া।"

তাই দেবতার আরতি করিতে গিয়া ভক্ত সাধিকা মীরাবাঈ বলিলেন, "হে প্রেমের স্বামী, মাটির প্রদীপে কি করা যায় তোমার প্রেম-আরতি? হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া রচিতে হইবে সেই প্রেম-আরতির প্রদীপ, শিরা-স্নায়ু দিয়া করিতে হইবে বাতি, তৈলের মত বিন্দু বিন্দু প্রাণরক্ত দিয়া জাগাইয়া রাখিতে হইবে সেই শিখাকে, তবু যেন আমার অন্তরাত্মা ভয় না পায়। যেন আমার অন্তরাত্মা এই প্রেমারতির সাধনাতে কৃপণের মত আত্মোৎসর্গে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়।"

আরতি কঁরো দেহ বাতী।
লোহ জলে প্রভু তেল বরাবর
মৈঁ নহীঁ সঁকুঁচাতী।

কবীর বলেন, "এই আত্মোৎসর্গও একটা মুহূর্ত্তমাত্রের উদ্দীপনা-প্রসূত আত্মঘাত নহে। "সতী"-ব্রতের জন্য নারী যে প্রিয়তমের চিতার মধ্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে তাহার অপেক্ষা অনেক কঠিন হইল পলে পলে আপনার আদর্শের কাছে, আপনার প্রেমের কাছে, আপনাকে বলি দেওয়া।" তাই কবীর বলিলেন,

জোগতে জৌহর ভলা ঘড়ী এককা কাম।
আঠ পহরকা জুঝনা অংতহীন সংগ্রাম।

"এই রকম নিত্য আত্ম-উৎসর্গের অপেক্ষা আগুনের মধ্যে সতীর ঝাঁপাইয়া পড়া অনেক সহজ, কারণ এক ঘড়ীতে তাহা চুকিয়া যায়। এ যে সারা জীবন অষ্ট-প্রহরের যুদ্ধ, এ যে অন্তহীন সংগ্রাম!"

এই নিত্য আত্মবলিদান বিনা সাধকের চলেই না। সতীরও আত্মবলিদান আছে। বীর যে যুদ্ধক্ষেত্রে আপন মনুষ্যত্ব ও আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়েন তাঁহাদের উভয়েরই ব্যাপার চুকিয়া যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে। কিন্তু সাধকের যে আত্মবলিদান তাহা চলিবে সারা জীবন ধরিয়া। এক মুহূর্ত্তের বীরত্ব সহজ। সারা জীবন বীরত্বের শিখাকে, আলোর জ্যোতিকে অমলিন রাখা দুঃসাধ্য ব্রত। তবু সাধক, সতী এবং বীরকে আত্ম বলিদান করিতেই হয়। আপন প্রেম ও আদর্শের কাছে এই যে আত্মবলিদান তাহাতে এক তিল হৃদয় কাঁপিলে চলিবে না। "এই সাধনায় ভয় বা কম্পের কিছু মাত্র স্থান নাই। সাধক সতী ও বীর সকল ভয় ও কম্পের অতীত।"

সাধ সতী ঔর শূর মঁ।
ভয় কম্প কছু নাহিঁ।

এই বলিদানই হইল আসল বলিদান। আপনাকে বাঁচাইতে গিয়া যে ভীরু সাধনা-কৃপণ মানুষ দুর্ব্বল অসহায় ছাগল-ছানা ধরিয়া আপনার যোগ্য প্রতিনিধি মনে করে তাহার আপন মূল্য সে আপনিই ঘোষণা করিয়া দেয়। যথার্থ বলিদানই হইল শাক্ত পূজকের শক্তিপূজা বৈষ্ণবেরও প্রেমপূজা ইহাই। এই বলিদানে যদি আমাদের সাধনা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমাদের সব ক্ষুদ্র ভেদ-বিভেদ ও বিরোধ দূরীভূত হইবে, আমাদের সকল ক্লৈব্য ও দুর্ব্বলতা দূর হইবে। বৈষ্ণব ও শাক্ত সকলের পক্ষেই এই বলিদান অপরিহার্য্য।

রজনীগন্ধা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

এ মোর কুটীরপ্রান্তে কোথা ঠাঁই? ফুল নাহি ফোটে;
তুলসীর মঞ্চখানি এক পাশে—তারই কোণ ঘেঁসে
একটি রজনীগন্ধা চুপি চুপি ভয়ে বেড়ে ওঠে
সসঙ্কোচ আব্‌ডালে, অঙ্গ ঢাকি বিধবার বেশে!

শীর্ণ দেহদণ্ডখানি ঊর্দ্ধপানে উচ্চকিতে চায়,
ক্ষুদ্র পুষ্পপাত্র ভরি গন্ধটুকু অর্পিতে আকাশে;
আন্দোলিত কম্র তনু মন্দবায়ে কাঁপে আশঙ্কায়—
মৌন মিনতির অর্ঘ্য পাছে কারও পড়ে দৃষ্টিপাশে।

মঞ্জরিত তুলসীর রেণুগুলি সারারাত্রি ধরি
অজস্র আশিস সম ঝরি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গে তার,
অন্ধকার রজনীর মর্ম্মতন্ত্রী করুণায় ভরি
মন্ত্রপাঠ করে যেন ঝিল্লীকণ্ঠে তুলিয়া ঝঙ্কার!

শ্রীহীন কুটীর মোর ম্রিয়মাণ নিস্তব্ধ নির্জ্জন,—
একা-একা চেয়ে দেখি পুষ্পের সে আত্মনিবেদন!

নির্মোক

"বনফুল"

১৩

অন্য কোথাও নয়, মুখে—সুতরাং খবরটা চাপা রহিল না। নানা ছুতায় অনেকেই আসিয়া বিমল ডাক্তারের সহিত আলাপ করিয়া গেল এবং খবরটা প্রত্যক্ষ করিয়া রং চড়াইয়া রাষ্ট্র করিতে লাগিল। হরেন বোস বিমলকে কোন প্রকারে কায়দায় আনিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। এইবার কে কাহার পিঠের চামড়া তোলে দেখা যাক! হুঁ হুঁ বাবা, ভগবানের কাছে চালাকি নয়! লোকটা যে অতিশয় ইতর তাহা তিনি গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন কিন্তু একা কি করিবেন, সকলেই উহার পক্ষে। এমন কি চৌধুরী মহাশয়কেও পর্য্যন্ত ছোকরা হাত করিয়া ফেলিয়াছে। এইবার! আগুন এবং পাপ বেশী দিন চাপা দিয়া রাখা যায় না, এক দিন না এক দিন ফুটিয়া বাহির হইবেই। একেবারে মুখে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। হইবে না? ভৈরবের স্ত্রীকে লইয়া যা ঢলাঢলি! আজকাল আবার মথুরবাবুর পুত্রবধূটার সঙ্গে জুটিয়াছে! একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া মোটরে হাওয়া খাইতে যাওয়া হয়! মথুরবাবুর ছেলেটাও যেমন বখাটে, পুত্রবধূটাও কি ঠিক তেমনি জুটিয়াছে! শ্বশুর-শাশুড়ী যাইতে-না-যাইতেই দিগ্বিজয় সুরু করিয়া দিয়াছে! নমস্কার বাবা আজকালকার মেয়েদের চরণে! আমাদের বউ-ঝি মুখ্যু-সুখ্যু আছে, মুখ্যুসুখ্যুই ভাল!—গুপিবাবুর সহিত এইরূপ নানা প্রকার আলোচনা করিয়া হরেন বোস দুইটি অস্ত্র চালনা করিলেন। প্রথম, সিভিল সার্জনের কাছে আর একটি দরখাস্ত দিলেন, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তারকে যেন অবিলম্বে হাসপাতাল হইতে অপসারিত করা হয়। দ্বিতীয় যে-কাজটি তিনি করিলেন তাহা তাঁহারই মত প্রতিভাবান্ লোকের পক্ষে সম্ভব। তিনি যে কবিতা লিখিতে পারেন তাহা কে জানিত! তিনি বিমল, ভৈরবের স্ত্রী, বিনোদিনী এবং কুষ্ঠ, এই চারিটি বিষয়কে জড়াইয়া একটি পয়ার রচনা করিলেন এবং সেটি অপরের দ্বারায় কার্বন কাগজ সহযোগে নকল করাইয়া এক দিন রাত্রে চতুর্দ্দিকে সাঁটিয়া দিলেন।

বিমলের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাহার চোখের সামনে যেন তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা দাউ দাউ করিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, সে অসহায়ের মত বসিয়া দেখিতেছে। তাহার বারম্বার মনে হইতেছে আর কিছু নয়, পাপের শাস্তি। নিদারুণ অর্থগৃধ্নুতার নিদারুণ পরিণাম! হাসপাতালের গরীব অসহায় রোগীদের প্রাণ লইয়া সে যে এত দিন ছিনিমিনি খেলিয়াছে, চিকিৎসার নামে প্রতারণা করিয়াছে—এ তাহারই সাজা। সেই অসহায় ভিখারীটার কথা, ভৈরবের ছেলেটার কথা, যে টিউমার কেসটা সেপটিক হইয়া মারা গিয়াছিল তাহার কথা—সব তাহার মনে পড়িতে লাগিল! আরও যে কত মরিয়াছে তাহার ঠিক কি! গুপিবাবুর হাতেই ত সে আজকাল সকলের চিকিৎসার ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে ত নিজে কিছুই দেখিত না, দেখিবার অবসরই ছিল না। আরও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত তাহার অবসর ছিল না, এখন কিন্তু তাহার অনেক অবসর। কথাটা রাষ্ট্র হইয়া যাইবার পর হইতে তাহার ডাকও কমিয়া গিয়াছে। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তারকে কে ডাকিবে! দুই দিন হইতে সে হাসপাতাল যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে! এই মুখ লইয়া সকলের সামনে বাহির হইতে কেমন যেন লজ্জা করে। তাহার কাছে আসিতেও সকলে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়। যোগেন চাকরটা পর্য্যন্ত কাল হইতে আসিতেছে না। ঠাকুরটা আগেই পলাইয়াছে। কেবল যায় নাই কাঙালী—সেই শূয়ারে-চেরা ছেলেটা। সে ভাল হইয়া গিয়াছে এবং বিমলের কাছেই আছে। আজ

বিমল জগদীশবাবু ও ভূধরবাবুকে ডাকিয়াছে, তাঁহাদের মত এবং পরামর্শ লইবার জন্য।

জগদীশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিমলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পরিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—সারা মুখটাতেই বেরিয়েছে দেখছি যে, ছুঁলে বেশ বুঝতে পারেন ত, কোন অ্যানিসথেসিয়া নেই?

—না।

—জ্বালাটালা করে?

—না।

জগদীশবাবু চশমাটি খুলিয়া বলিলেন—এক বার কলকাতা গিয়ে দেখিয়ে আসুন মশায়!

—আপনার কি মনে হয়?

জগদীশবাবু হাসিলেন, ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটি বার-দুই উঁকি মারিয়া গেল। কিছুক্ষণ হাসিমুখে থাকিয়া তিনি বলিলেন—আপনি নিজে ডাক্তার, আপনাকে আর কি বলব আমি!

জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন।

একটু পরে ভূধরবাবু আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিমলকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর বলিলেন—ও-সব একদম বাজে কথা। মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন আপনি! আপনি অত্যধিক মাংস-টাংস খান, এই গরমে লিভার-টিভার খারাপ হয়ে কিছু হয়েছে একটা। একটা কোর্স ক্যালসিয়াম নিন আর ম্যাগসালফ খেয়ে ফেলুন খানিকটা—ও কিছু নয়, দু-দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিমল বলিল—তা না হয় যাবে, কিন্তু এখন যে সবাই একঘরে করেছে তার উপায় কি! কেস-টেস একেবারে আসছে না।

—কুছ পরোয়া নেই, আমি আপনাকে ব্ল্যাক করব। আপনার বাইরে যাবার দরকার নেই, ঘরে বসেই আপনার মাইক্রসকোপের কাজ করুন আপনি, আমি আপনাকে কেস পাঠাবো। ভয় কি!

—বামুনটা পর্য্যন্ত পালিয়েছে।

—তাই নাকি? আচ্ছা, আমার বাড়ী থেকে আপনার খাবার আসবে রোজ! কিছু ঘাবড়াবেন না আপনি।

—হরেন বোস আমার নামে আবার একটা দরখাস্ত করিয়েছে তা শুনেছেন ত?

—শুনেছি। ও কিচ্ছু হবে না। আপনি সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে, এ যে লেপ্রসি নয় তা যে-কোন ডাক্তার বুঝতে পারবে। আপনি হরেন বোসের নামে ডিফামেশন কেস ক'রে দিন একটা। ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া! ওই পদ্যটা যে ওই লিখেছে তার প্রমাণ আমার হাতে আছে, যে-ছোকরা কপি করেছিল সে আমার চেনা লোক, তার কাছেই শুনলাম সব। দিন কেস ক'রে! প্রুফ আছে।

বিমল হাসিয়া বলিল—ভারি দমে গেছি, কিছু ভাল লাগছে না।

—স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স জীবন যুদ্ধে দমে গেলে কি চলে মশাই, যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। ওই যে যেখানে ইটের ভাটা করেছি সেই জমিটার 'লিজ' নিয়ে নবীনবাবুর সঙ্গে কি কম ফাইটটা করতে হয়েছে আমাকে! শেষ-কালে মিথ্যে ঝুটো ফৌজদারি কেসই ক'রে দিলাম আমি ওর নামে, বাছাধন দেখলেন আমার সঙ্গে ট্যাঁ ফোঁ ক'রে বিশেষ সুবিধে হবে না, সুড়সুড় ক'রে রাজি হয়ে গেলেন শেষকালে। যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবস্থা করতে হয়! এই যে দেখুন না, আগে মদ নইলে চলত না আমার, আজকাল আর খাই না। দেখলুম লিভার কিডনি-ফিডনিগুলো গোলমাল করছে, পয়সাও বেশ খরচ হচ্ছে, দিলাম ছেড়ে। যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। দমবেন কেন, কি হয়েছে আপনার? হরেন বোস? ওকে জব্দ করতে কতক্ষণ! দিন আপনি ওর নামে একটা কেস ক'রে, আর এবার চেষ্টা করুন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যেন এক পয়সার না কনট্র্যাক্ট পায়। মিউনিসিপাল কমিশনাররা তো সবাই আপনার হাতে। কনট্র্যাক্ট না পেলে দেখবেন বাছাধন মুষড়ে যাবে।

বিমল কিছু বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভূধরবাবু পকেট হইতে কাগজের ফর্দ্দটা বাহির করিয়া বলিলেন—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এখনও পাঁচ জায়গাতে যেতে বাকী। ওঃ আর পারা যায় না! কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না আপনি। আমাদের বাড়ী থেকে ভাত পাঠিয়ে দেব আমি। আচ্ছা, চলি এবার।

ভূধরবাবু চলিয়া গেলেন।

বিপদে না পড়িলে লোক চেনা যায় না। ভূধরবাবুকে বিমল এত দিন চিনিতে পারে নাই।

সিভিল সার্জন বিমলকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ঠিক কুষ্ঠ কিনা তাহা বলা শক্ত। মাস ছয়েক ছুটি লইয়া কিছু কাল অন্যত্র যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত, ট্রপিকাল স্কুলেও একবার দেখাইয়া আসা উচিত। লেপ্রসি যদি হয় ছয় মাসের মধ্যে বোঝা যাইবে। সাহেব তাহার সহিত যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিলেন। তাহাকে অবিলম্বে ছয় মাসের ছুটির জন্য সুপারিশ করিয়া একখানা সার্টিফিকেটও দিলেন।

ট্রপিকাল স্কুলে গিয়াও কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। তাঁহারা রক্ত লইয়া, চামড়া কাটিয়া, নাকের রস লইয়া নানা রকম পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। কুষ্ঠ যে নয় তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। একটা লাগাইবার ঔষধ দিয়া বলিলেন, আবার কিছু দিন পরে আসিতে। বিমল কলিকাতায় গিয়া গোপনে একটা হোটেলে উঠিয়াছিল, গোপনেই ফিরিয়া আসিল। এই চেহারা লইয়া মণির সহিত সে দেখা করিতে পারিল না। কাহারও সহিতই সে দেখা করিল না। কাহারও সহিত দেখা করিবার প্রবৃত্তিই তাহার ছিল না, এই জনতা হইতে দূরে যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। সে তাহার চাকুরিস্থলেও আর ফিরিয়া গেল না। কলিকাতায় বসিয়াই সে ছুটির জন্য দরখাস্ত করিল এবং সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট-সুদ্ধ সেটি নন্দী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। ডুলুকেও একখানি চিঠি লিখিল সে যেন তাহার জিনিসপত্র তাহার দেশের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। সে সোজা দেশে ফিরিয়া যাইবে, এই ছয় মাস অন্য কোথাও নয়, শম্ভু-কাকার আশ্রয়েই কাটাইয়া দিতে হইবে। দেশে গিয়া সে মণিকে জানাইয়া দিবে যে বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য তাহাকে ছুটি লইয়া দেশে আসিতে হইয়াছে, কিছু দিন দেশেই থাকিবে।

একটা জংসন স্টেশনে ট্রেন বদলি করিতে হইবে।

বিমল ট্রেনের প্রতীক্ষায় প্ল্যাটফর্মের একটা অন্ধকার অংশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আজকাল সে যথাসম্ভব আলোক পরিহার করিয়া চলিতেছে! হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল প্ল্যাটফর্মের ওধারে যে মহিলাটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তিনি যেন অনেকটা বিনোদিনীর মত। আশ্চর্য্য সাদৃশ্য তো! বিমল আর একটু আগাইয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। এ কি, এ যে বিনোদিনীই। অমরও তাহা হইলে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। ভালই হইল ইহাদের সহিত দেখাটা হইয়া গেল।

বিমল আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—কোথা যাচ্ছেন আপনারা, অমর কই?

বিনোদিনী অবাক হইয়া গেল। বিমলকে এখানে দেখিবে সে প্রত্যাশা করে নাই।

বিমল পুনরায় প্রশ্ন করিল—অমর কই, যাচ্ছেন কোথা!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনোদিনী বলিল—আমি একাই যাচ্ছি।

—তাই নাকি, হঠাৎ একা কেন?

আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনোদিনী একটা তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিল—এবার একাই চলতে হবে!

—মানে?

—মানে ত আপনি জানেন। আমি এত দিন জানতাম না, কাল জেনেছি। ও-কথা জানার পর আপনার বন্ধুর সঙ্গে থাকার আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

বিমল নির্ব্বাক্ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

—কোথা যাচ্ছেন এখন?

—যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর বাড়ী।

—তার পর ?

—তার পর কোথাও একটা চাকরি-টাকরি জুটিয়ে নেব।

বিনোদিনী এ-বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে চাহিল না, অন্য দিকে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। বিমলও কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। একটু পরেই বিনোদিনীর গাড়ী আসিল, সে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ট্রেন চলিয়া গেল। বিমল বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল মণিও কি আমাকে এমনি করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবে যদি সে জানিতে পারে আমার কুষ্ঠ হইয়াছে? অমরের ব্যাধির কারণ কাম, আমার এটা যদি কুষ্ঠই হয় তাহা হইলে ইহার কারণ লোভ। তফাৎ তো খুব বেশী নয়! অসুখ হইলে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে! সহসা তাহার ভৈরবের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। সে চোর জানিয়াও তাহার স্বামীকে ত্যাগ করে নাই। তাহাকে গালি দিয়াছে, গঞ্জনা দিয়াছে, এমন কি মারিয়াছে পর্য্যন্ত, কিন্তু ত্যাগ তো করে নাই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিমল তাহার আত্মজীবনী লিখিতেছিল—

এখানে এক বৎসর কাটিয়া গেল। সময় কত শীঘ্র কাটিয়া যায়! মনে হইতেছে এই তো সেদিন মাত্র আসিলাম। এই এক বৎসরে জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছে, জীবনের নূতন স্বাদ পাইয়াছি। দুঃখের অন্ধকারে নিজের উপর নয় ভগবানের উপর একান্তমনে নির্ভর করিয়াছিলাম। তাঁহার মঙ্গলময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এখানে যেদিন প্রথম আসি সেদিন শম্ভুকাকা বাড়ীতে ছিলেন না, গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। আমার মনে শঙ্কা ছিল আমার চেহারা দেখিয়া শম্ভুকাকাও হয়ত ভয় পাইবেন, হয়ত তিনিও কোন ছুতায় আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন। তখন শম্ভু-কাকাকে চিনিতাম না। শম্ভুকাকা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে অকপটে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম, কিছুই গোপন করিলাম না। সমস্ত শুনিয়া তিনি আমার দিকে এমন করিয়া চাহিয়া রহিলেন যেন তিনি একটা দেবতা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

বলিলাম—শম্ভুকাকা, আপনিও আমাকে ত্যাগ করবেন না তো?

—ত্যাগ করব! এ-ধারণা তোমার মাথায় কি ক'রে ঢুকল! নিজের সন্তানকে কেউ কখনও ত্যাগ করে?

তাহার পর সহসা তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—ত্যাগ করব! তোমাকে পূজো করা উচিত! একটা কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে জেনে-শুনে তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করেছ। আহত সৈনিককে কেউ কখনও ত্যাগ করে? বলছ কি তুমি!

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিলেন—কোন ভয় নেই তোমার। তুমি চুপচাপ ব'সে থাক, আমিই তোমার চিকিৎসা করব! আজকাল এর তো খুব ভাল ইনজেক্শন বেরিয়েছে। আজই আনতে দাও—ভয় কি, ঠিক হয়ে যাবে সব। আমিই তোমাকে সারিয়ে দিচ্ছি, দেখ না! সব ঠিক হয়ে যাবে।

শম্ভুকাকা এমন একটা উৎসাহ প্রকাশ করিলেন যেন সমস্ত সমস্যার তিনি সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন! এ-রোগের যখন ইনজেকশন করিবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তখন আর ভাবনা কি! শম্ভুকাকার ইনজেকশনের উপর অগাধ বিশ্বাস। শুধু ইনজেকশন নয় সমস্ত জিনিসেরই উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। প্রত্যেক ঔষধটির যে-সকল গুণাবলী ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে শম্ভুকাকা সমস্ত বিশ্বাস করেন। মেটিরিয়া মেডিকা তাঁহার কণ্ঠস্থ এবং তাহাতে যে-সকল কথা লেখা আছে তাহা তিনি অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মনে করেন। যদি কোন ঔষধের মনোমত ফল না হয় তিনি ঔষধের দোষ দেন না, নিজের বুদ্ধির দোষ দেন। তাঁহার ধারণা ঠিকমত বাছিয়া ঠিক ঔষধটি দিতে পারিলে নিশ্চয়ই রোগ সারিবে—সারিতে বাধ্য। শম্ভুকাকার এই বিশ্বাস দেখিয়া হিংসা হয়! আমাদের এ বিশ্বাস নাই। আমরা ঔষধ দিই দ্বিধাভরে; যদি ফল হয় ভালই, না যদি হয় কি করিব! শম্ভুকাকা ঔষধ দেন নিষ্ঠাভরে, যেরূপ

নিষ্ঠাভরে ভক্ত দেবতার সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করে। শম্ভুকাকার নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হই। শম্ভুকাকার চিকিৎসা-প্রণালীও অদ্ভুত। তিনি কেবল ঔষধ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, শক্ত রোগী হইলে তাহার সেবার ভারও তিনি গ্রহণ করেন। শক্ত রোগী হইলে এবং পয়সা খরচ করিতে সক্ষম হইলে শম্ভুকাকা সাধারণতঃ ফুরণ করিয়া চিকিৎসা করেন। অর্দ্ধেক টাকা প্রথমে দিতে হয় এবং বাকী অর্দ্ধেক রোগ ভাল হইলে দিতে হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি থাকে। শম্ভুকাকা ঔষধের বাক্সটি লইয়া রোগীর শয্যা-পার্শ্বে গিয়া বসেন। নিজ হাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়ান, পথ্যও নিজ হাতে প্রস্তুত করেন এবং নিজেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি সেবা করেন। রোগী যদি ভাল হয় তাহা হইলে শম্ভুকাকা সানন্দে তাঁহার বাকী অর্দ্ধেক টাকা লইয়া ফিরিয়া আসেন। রোগী মরিয়া গেলে তাহার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বসিয়া শোক করেন, শ্মশানে যান, তাহার পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া শূন্যহস্তে বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রোগীর জন্য এতটা করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। শম্ভুকাকার ডাক্তারি বিদ্যা হয়ত তেমন গভীর নয়, কিন্তু বিদ্যার গভীরতা লইয়া কি হইবে যদি প্রাণ না থাকে! আমি যদি কখনও শক্ত অসুখে পড়ি, শম্ভুকাকার চিকিৎসাতেই থাকিব। আমার কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসাও হয়ত তাঁহাকে দিয়াই করাইতাম কিন্তু তাহার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ আমার কুষ্ঠ হয় নাই, হইয়াছিল ডারমাল্ লিশ্‌ম্যানিয়াসিস! যে জীবাণু কালাজ্বর রোগের কারণ, সেই জীবাণুই ইহারও কারণ। মানুষের ত্বক আশ্রয় করিয়া অনেক সময় ইহা বিভীষিকার সৃষ্টি করে। আমার বিভীষিকাটা বেশী হইয়াছিল কারণ আমার বিবেকও সুস্থ ছিল না। নিজে অসুখে পড়িয়া একটা জিনিস মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি—আমাদের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও আমাদের বিদ্যা অতিশয় অল্প। এই অল্প বিদ্যার সহিত যদি সহৃদয়তা না থাকে তবে ইহা লইয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা জুয়াচুরির নামান্তর মাত্র।

বর্ত্তমানে আমার সমস্যা রোগ কিংবা রোগী নহে, বস্তুত কোন উৎকণ্ঠাজনক সমস্যাই আর আমার নাই, জীবনকে সহজ করিয়া ফেলিয়াছি। পৈতৃক জমি সামান্য যাহা ছিল তাহাই চাষ করিয়া দিন কাটাইতেছি। বিলাসের উপকরণ জুটাইতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু সুখে আছি। উন্মুক্ত বাতাসে, উদার মাঠে খোলা আকাশের নীচে স্বচ্ছন্দ সুন্দর গতিতে জীবন বহিয়া চলিয়াছে। সিনেমা, রেডিও অথবা বৈদ্যুতিক আলোর অভাবে মোটেই কষ্ট পাইতেছি না। প্রকৃতির বিরাট্ নাট্যশালায় বহু সিনেমা, বহু আলো, বহু রেডিও আছে—দেখিবার চোখ এবং শুনিবার কান থাকিলেই তাহাদের পরিচয় মেলে। বিরাট্ আকাশ কখনও ঘনঘটাচ্ছন্ন, কখনও জ্যোৎস্নাকুল, কখনও রৌদ্র-তপ্ত, কখনও মেঘ-বিচিত্র, কখনও নক্ষত্রখচিত। উদার মাঠ কখনও শ্যামল শোভায় হাসিতেছে, কখনও স্বর্ণবর্ণ পক্বশস্যভারে মহিমময় হইয়া উঠিতেছে, কখনও ধূসর উষর মূর্ত্তি। নদীর জলে ক্ষণে ক্ষণে কত শোভা, পাখীর গানে ক্ষণে ক্ষণে কত সুর—সমস্ত প্রকৃতির কত রূপ, কত ঐশ্বর্য্য। আমরাও প্রকৃতির সন্তান, কিন্তু ইহাদের সহিত সহজভাবে কণ্ঠ মিলাইয়া জীবনের স্বাভাবিক ঐক্যসঙ্গীতে যোগদান করিতে পারি না। আমরা কেমন যেন অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি। স্বল্প জ্ঞানের অহমিকায় জীবনকে অকারণে জটিল করিয়া সভ্যতার গর্ব্ব করিতেছি। আমার এই যে বর্ত্তমান জীবন ইহাও যে কম জটিল তাহা নহে, ইহাতেও জটিলতা আছে। কিন্তু তাহা স্বাভাবিক জটিলতা, জটিলতার মধ্যেও খানিকটা সরলতা আছে। অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি বিচলিত করে, উইপোকা শূকর অথবা সজারুর দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া পড়ি, দারুণ বর্ষায় অথবা দারুণ রৌদ্রে ঘরের মধ্যে আরাম করিয়া বসিয়া থাকা চলে না—মাঠে যাইতে হয়, জনমজুররা সকলেই শান্তশিষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণ নহে, তাহারাও মাঝে মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। কিন্তু এ-সব জিনিস জীবনের মূল শান্তিকে বিঘ্নিত করে না—মানুষকে ভণ্ড করে না—বিবেককে বিষাক্ত করিয়া মুমূর্ষু করিয়া তোলে না। এ-সব জটিলতার মধ্যে কুচক্রীর কৌশল অথবা কুটিলতা নাই, এ-সব জটিলতা জীবনের সহজ জটিলতা, সুস্থ সবল জীবনীশক্তির দ্বারা ইহাদের দমন করাও অসম্ভব নহে।

চাষ করি বলিয়া যে চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা নয়, চিকিৎসাও করি, কিন্তু চিকিৎসা লইয়া ব্যবসায় আর করি না। কোন বিদ্যা লইয়া ব্যবসা করা চলে না। বিদ্যায় ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ব্যবসায়ী হইলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। বর্ত্তমান সভ্যতায় বিদ্যা-ব্যবসায়ী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের এত প্রভাব বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা। বিদ্যা সমস্ত জীবন ধরিয়া অনুশীলন করিতে হয় এবং তাহার শেষ নাই—ইহা লইয়া ব্যবসায় চলিবে কি রূপে? সম্পূর্ণ জিনিষটা তো আমি কখনই ক্রেতাকে দিতে পারিব না, অথচ ভান করিতে হইবে যে সম্পূর্ণটাই দিতেছি। শব্দের ঝঙ্কারে ভাণ্ডের শূন্যতাকে ঢাকিতে হইবে! অনেক দিন উহা করিয়াছি, আর ভাল লাগিতেছে না। বলা বাহুল্য, বড়লোকেরা আমাকে ডাকে না। কারণ বড়লোকেরা ডাক্তার ডাকে ঠিক সেই মনোবৃত্তি লইয়া যে মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা মোটর কেনে, বাড়ী করে। মোটর এবং বাড়ী যেমন পছন্দসই হওয়া দরকার, ডাক্তারও তেমনি পছন্দসই হওয়া চাই। শুধু চিকিৎসা করিলেই চলিবে না, বাড়ীর লোকেদের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। নানা ডাক্তার নানা কৌশলে ইহা করিয়া থাকে। জগদীশবাবু, ভূধরবাবু, গাঙ্গুলী মহাশয়, মহাদেববাবু সকলেই ইহা করিতেছেন, প্রত্যেকের ধরণটা শুধু আলাদা রকমের। আজকাল ডাক্তারির মত গুরুগিরিও একটা পেশা হইয়াছে এবং গুরুরাও শিষ্যদের মনোরঞ্জন করিয়াই নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখিতেছেন—প্রত্যেক ব্যবসায়েই ক্রেতার মনোরঞ্জন না করিলে চলে না।

যাহারা পয়সা দিয়া ডাকে তাহাদের চিকিৎসা করার আর একটা মুশকিল তাহারা রোগ না সারিলে ডাক্তারকেই দায়ী করে। তাহারা পয়সাটাকেই মানে এবং অর্থের বিনিময়ে সবকিছুই সম্ভবপর বলিয়া মনে করে। মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য্য পরিণাম তাহা তাহারা জানে হয়ত, কিন্তু মানে না। তাহারা মনে করে কিছু অর্থব্যয় করিলে বুঝি নিয়তিরও হাত এড়াইতে পারিবে এবং ডাক্তার তাহা এড়াইতে সাহায্য করে, সেই জন্যই তাহাকে পয়সা দেওয়া, সে যদি ঠিক্‌মত তাহা করিতে না পারে তাহা হইলে সে আবার কিসের ডাক্তার!

গরীবেরা অসুখে পড়িলে ডাক্তারকে ডাকে, ভগবানকেও ডাকে। ঝড়ে বাড়ী উড়িয়া গেলে তাহারা দড়ি, খুঁটি, চাল অথবা ঘরামিকেই পুরাপুরি দায়ী করে না, ঝড়কে এবং ঝড়ের প্রাবল্যকেও স্বীকার করে। তাহারা প্রকৃতির সহিত পরিচিত, প্রকৃতির রুদ্র, মোহন শান্ত নানা রূপের সহিত তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, তাহারা নিয়তিকে মানে, ভগবানে বিশ্বাস করে। এই সব অশিক্ষিত গরীব লোকদের চিকিৎসা করিয়া সুখ আছে, তাহাদের চিকিৎসা করিলেই তাহারা খুশী, বাঁচা-মরা ভগবানের হাত। ডাক্তারবাবু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, পরমায়ু ছিল না তাই মরিয়া গেল, থাকিলে নিশ্চয়ই বাঁচিত। অর্দ্ধশিক্ষিত সভ্যনামধেয় জীবদের এমন সরল বিশ্বাস নাই, বিশেষ করিয়া যাহারা ধনী তাহাদের নাস্তিকতা আরও প্রখর। তাহারা মুখে, কাগজে-কলমে, বক্তৃতায় ভগবানের অস্তিত্ব হয়ত স্বীকার করে কিন্তু মনে মনে সকলেই নাস্তিক। নাস্তিক বলিয়াই এত অশান্তি। এই দীন দরিদ্র পল্লীবাসীরা অশিক্ষিত, অধিকাংশ লোকেরই অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। তবু কিন্তু তাহাদের জীবনের একটা আদর্শ আছে, দার্শনিকের মত একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলিবার মত বলিষ্ঠতা আছে। ইহারা মূর্খ কিন্তু অমানুষ নয়। ইহারা জীবনকে পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া নয় জীবনের ভিতরেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জীবনের সহিত সত্য পরিচয় আছে বলিয়াই ইহারা জীবন্ত।

ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া সত্যই সুখী হইয়াছি। ইহারা আমাকে টাকা দিতে পারে না বটে, কিন্তু যাহা দেয় তাহা অমূল্য—সমস্ত প্রাণটাই হাতে তুলিয়া দেয়! তাছাড়া গাছের ফল, ঘরের দুধ, উৎসবের মিষ্টান্ন,—যখন যেটুকু পারে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আনিয়া দেয়। সর্ব্বদাই যেন কৃতজ্ঞতায় অবনমিত হইয়া আছে, অথচ আমি ইহাদের কতটুকু করি, কতটুকু করিবার সাধ্য আছে আমার! অধিকাংশ অসুখেরই তো ঔষধ জানা নাই। তবে এটা ঠিক, ইহাদের অসুখ সহজে সারে ইহারা অসহায় বলিয়া প্রকৃতিও ইহাদের করুণা করেন

আরও একটা কথা, বড়লোকদের মত ইহাদের অসুখ অর্থ-জনিত নহে। ইহারা সাদাসিধা সোজা অসুখেই ভোগে এবং অল্পস্বল্প চিকিৎসাতেই সারিয়া ওঠে। কুইনিন, টিঞ্চার আইওডিন, ম্যাগসাল্‌ফ এবং ক্যাস্টর অয়েল দিয়াই শতকরা পঞ্চাশ জনের অসুখ সারিয়া যায়। অথচ এই সব অসুখই বড়লোকের বাড়ীতে হইলে কি কাণ্ডটাই না হয়! বড়লোকের সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়াছি! মনে পড়িতেছে, প্রথম যখন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে যাই তখন অনাদিবাবু অনিলের স্যুটটা আমাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এত দিন যেন সেই স্যুটটাই পরিয়া অস্বস্তি ভোগ করিতেছিলাম! ঢিলা জামা, ছোট প্যাণ্টালুন এবং আঁট জুতা পরিয়া কিছুতেই যেন শান্তি পাইতেছিলাম না। ধার-করা সেই স্যুটটা খুলিয়া ফেলিয়া যেন বাঁচিয়াছি।

পদশব্দ শুনিয়া বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল পরেশ-দা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন!

—পরেশ-দা, হঠাৎ যে!

—বেড়াতে এলাম, ছুটিতে আছি এখন!

—বাঃ, বেশ হয়েছে—বসুন!

পরেশ-দা বলিলেন—তোমার অসুখ-টসুখ ত সব বাজে, তুমি আবার জয়েন করছ কবে?

—আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। জয়েন করব না।

—সে কি!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—বদিবাবু মারা গেছেন জান ত?

—তাই নাকি! কি হয়েছিল?

—তিনি গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে সেই জৈনদের মন্দিরের তালা ভাঙবার জন্যে পাহাড়ে উঠছিলেন এক দল ভলাণ্টিয়ার নিয়ে, উঠতে উঠতেই হার্ট ফেল ক'রে মারা যান! বড় ভাল লোক ছিলেন!

বিমল নীরব হইয়া রহিল, বদিবাবুর হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি তাহার মনের ভিতর জলজল করিতে লাগিল

পরেশ-দা আর একটা খবর দিলেন।

—তোমার সেই সুপ্রিয়া সরকার আর সুব্রতবাবুকে দেখলাম সেদিন। সুপ্রিয়া সরকারের হাতে এখন আর ইংরেজী নভেল নেই, কোলে খোকা। প্যালপিটেশন্ সেরে গেছে শুনলাম। সুব্রতবাবুরও চেহারা ফিরে গেছে।

বিমল শুনিয়া একটু হাসিল।

—অমরের কোন খবর জানেন?

—জানি। ভয়ানক মাতাল আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। জমিদারি ত দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে শুনেছি।

—তার স্ত্রী আর ফেরে নি?

—না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরেশ-দা বলিলেন—তুমি আর জয়েন করবে না, মানে? এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে? এখানে প্র্যাকটিস সুরু করেছ বুঝি!

বিমল মৃদু হাসিয়া বলিল—করি কিছু কিছু।

—এখানে কি ওখানকার মত হবে? ওখানে ফিল্‌ড্ কত বড়!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—তোমার মণিমালার কি এ জায়গা পছন্দ হবে—এ যে ঘোর পাড়া-গাঁ—

বিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—আপনি শোনেন নি বুঝি?

—কি?

—মণি মারা গেছে!

—সে কি, কি ক'রে?

—ছেলে হতে গিয়ে!

পরেশ-দা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিমল হাসিয়া বলিল—যেদিন খবরটা পেলাম, সেদিনই ঠিক এখানে একটা খুব শক্ত লেবার-কেস করলাম আমি, গরীব চাষার মেয়ে, বেঁচে গেল সে!

পরেশ-দা বলিলেন—তুমি নিজের কাছে রাখলেই পারতে?

বিমল একটু হাসিল

সমাপ্ত

অধ্যাত্মে ও বিজ্ঞানে

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১

বিজ্ঞানের গর্ব্ব আজ এই যে তার কারবার অকাট্য প্রমাণ নিয়ে। অকাট্য প্রমাণের উপর তার সত্য প্রতিষ্ঠিত; আর অকাট্য প্রমাণের উপর যে সত্য প্রতিষ্ঠিত নয় বা হ'তে পারে না, তাকে সত্য বলা চলে না, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক সত্য তা নয়, বিজ্ঞানের রাজ্যে তার স্থান নেই।

অকাট্য প্রমাণ বলি কাকে? একমাত্র জিনিস সেটি—প্রত্যক্ষ। শোনা কথা প্রত্যক্ষ নয়, আন্দাজ অনুমান প্রত্যক্ষ নয়, বুদ্ধি-রচিত ভাব-প্রণোদিত কথা প্রত্যক্ষ নয়; হ'লেও হ'তে পারে, হ'লে ভাল হয় তাই সত্য ব'লে মানা উচিত—এ ধরণের বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শের তাগিদে কল্পিত তথ্য বিজ্ঞানে বাতিল। প্রত্যক্ষ তা হ'লে কি, কি ধরণে গ্রহণ হ'লে, অনুভব হ'লে সিদ্ধান্ত হ'লে বলতে পারি প্রত্যক্ষ হয়েছে? প্রত্যক্ষ অর্থ সাক্ষাৎ—চক্ষুর সম্মুখে দেখি যাকে। এই উপায়েই জিনিস এমন নিশ্চিত নিঃসন্দেহ হয় যাতে অণুমাত্র দ্বিধার অবকাশ থাকে না; অবশ্য সাধারণ ভাবে ইন্দ্রিয়ের স্পর্শই প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয় যার সাক্ষ্য দেয় তাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গৌণ পোষকতা থাকলেও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ই অগ্রণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিখুঁৎ নিপুণ।* চোখে দেখাই প্রত্যক্ষ; যে জিনিস চোখে দেখি না, চোখে দেখবার সম্ভাবনাও নেই তা অপ্রত্যক্ষ সুতরাং অসত্য—বৈজ্ঞানিকের হিসাবে। প্রত্যক্ষের এই হ'ল মূল ও আদি

কিন্তু ইন্দ্রিয় যে ভুল-ভ্রান্তি করে না, চোখের দেখা হ'লেই তা যে অকাট্য সত্য হবে, এমন কি কথা আছে? পাণ্ডুরোগগ্রস্ত সকল জিনিসই দেখে হরিদ্রারঞ্জিত, বর্ণান্ধ বর্ণবৈষম্য লক্ষ্য করতে অক্ষম। কিন্তু কেবল ব্যাধি-পীড়িত বৈকল্যদুষ্ট নয়, সুস্থ সবল ইন্দ্রিয়েরও অনেক সময়ে অলীক দর্শন হয়—যেমন ভূতপ্রেত অশরীরী ছায়া দর্শন। এ-জাতীয় প্রত্যক্ষের কোন মূল্য নেই আমরা সকলেই জানি। সুতরাং প্রত্যক্ষকে সীমাবদ্ধ করতে হয় আর একটি সর্ত্ত দিয়ে—তা হ'ল এই যে প্রত্যক্ষ কেবল একের নয়, এমন কি বহুরও নয়, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই সকলের। যে প্রত্যক্ষ কেবল ব্যক্তিগত তাই অলীক হ'তে পারে, সকলের কাছে সমান ভাবে যা প্রত্যক্ষ তাই বাস্তব। কিন্তু একথাও কি বলা চলে? সমষ্টিগত দৃষ্টি-বিভ্রম কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মরীচিকা ত সকলের প্রত্যক্ষ। যে কেহ মরুতে যায় (বিশেষ স্থানে ও ক্ষণে) সেই তা দেখতে পারে। তবু মরীচিকা অলীক। কেন? কারণ নিকটে যাও, দেখবে সে সরে দাঁড়িয়েছে অথবা মিশিয়ে গেছে, নাস্তি। অর্থাৎ সে দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নয়, সে হ'ল দ্রষ্টারই দৃষ্টির রচনা। দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ বাস্তব বস্তুর তবে সন্ধান হয় কি রকমে? বাস্তব বস্তুর দর্শন হওয়া চাই অবিসংবাদী—কেবল সকল দর্শকের পক্ষে নয়, সকল সময়ে (অর্থাৎ দেখা যখনই ন্যায্য তখনই—স্পষ্ট দৃষ্ট অন্তরায় কিছু না এসে পড়লে) হওয়া চাই।

তবুও দর্শনের সব আটঘাট বাঁধা হ'ল না। কারণ এমন জিনিস এমন ঘটনা সকলে সকল সময়ে সাক্ষাৎ করে, তার দর্শন সকলের পক্ষে সর্ব্বদা অবিসংবাদী—অথচ তা সত্য নয়। সূর্য্য পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমে চলেছে, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে†—এ ত সকল লোক সকল সময়ে দেখেছে,

* এক জন ফরসী বৈজ্ঞানিক বলেছেন—La vue qui est l'organe scientifique par excellence.

† পৃথিবীর উপর থেকেও পৃথিবীর গতি চাক্ষুষ দেখা কি রকমে সম্ভব তার দু-একটি কলাকৌশল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন বটে। কিন্তু সেগুলিতেও পৃথিবীর গতি যে চাক্ষুষ দেখা যায় এমন কথা ঠিক বলা চলে না; বলা চলে, বড়জোর, পৃথিবীর গতি ধরে নিলে সে কলাকৌশলগুলির সহজ ও সম্যক্ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দেখছে এবং দেখবে (হয়ত); তবু এটি অসত্য, বিজ্ঞানেই আবিষ্কার করেছে। (এমন কি অনেকে বলেছেন স্বয়ং সূর্য্যটি—যাকে এমন অবিসংবাদী বাস্তব বোধ হয়—তাও মরীচিকার মতনই দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র—আলোকরশ্মির বক্রগতিজনিত মায়া সৃষ্টি।)

প্রত্যক্ষ প্রমাণের তবে আরও সংশোধন করা প্রয়োজন হয়েছে। প্রত্যক্ষ বস্তু (সকলের ও সকল সময়ের হ'লেও) বাস্তব সত্য হ'তে পারে তখনই যখন অন্যান্য প্রত্যক্ষের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে, অন্যান্য প্রত্যক্ষকে সে নাস্তি না করে, অন্যান্য প্রত্যক্ষ তার প্রত্যক্ষতা সমর্থন করে। এর থেকে একটা অবশ্যম্ভাবী সূত্রে পৌঁছতে হয়, তা হ'ল এই যে, সকল প্রত্যক্ষ মিলে যদি একটা অপ্রত্যক্ষের সাক্ষ্য দেয় তবে সে অপ্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষবৎ বাস্তব। সূর্য্যের স্থিরত্ব এবং পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখী গতি এই ভাবেই আবিষ্কৃত ও সিদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু ফলে শেষটা দাঁড়া'ল কি? দেখছি প্রত্যক্ষকে জোর ক'রে একান্ত ভাবে আঁকড়ে ধরবার ফলেই ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষকে ছেড়ে অনেক দূরে এসেছি—অনুমানের কোঠায় গিয়ে পড়েছি, যদিও বলছি এ হ'ল "প্রত্যক্ষ" প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক অনুমান। কিন্তু এখানেও শেষ নয়, আধুনিক বিজ্ঞান আরও আগে চলতে বলছে। এই যাকে বলছি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ অনুমান—সূর্য্য স্থির, আর পৃথিবী সচল—এটি আপেক্ষিক সত্য মাত্র; বিশেষ দ্রষ্টার বিশেষ স্থান কাল থেকে দেখার ভঙ্গী মাত্র। দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ হিসাবেও তথ্যটির কোন অর্থ নেই। প্যারাসুটটা পৃথিবীর উপর ছুটে নেমে আসছে, না সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটি সহ পৃথিবীটাই প্যারাসুটটার দিকে ছুটে উঠে আসছে—ব্যাপারটি দু-রকমেই দেখা যেতে পারে এবং দুটিরই সমান রাশিফল। টলেমি, কোপরনিকস, নিউটন আর আইনস্টাইন ব্রহ্মাণ্ডের যে বিভিন্ন চিত্র দিয়েছেন তার কোনটি যে বাস্তব, বাস্তবের প্রতিলিপি তা কে বলতে পারে? টলেমির চিত্র জটিল হ'তে পারে কিন্তু তাঁর (epicyclic) ছক দিয়েও (আধুনিক ছকের মতই,) চন্দ্রগ্রহণ ঠিক করা যেত। তবে এক হিসাবে বলা যেতে পারে এই মহাপুরুষ কয় জনের হাতে ব্রহ্মাণ্ড-চিত্র পেয়েছে একটা ক্রম-পরিণতি। প্রথমে যা ছিল জটিল সঙ্কীর্ণ ব্যষ্টিমুখী, ক্রমে তা হয়ে উঠেছে সরল ব্যাপক সর্ব্বসাধারণ-মুখী। কিন্তু এত সূত্রকারের কৌশল—কত বেশী জিনিস কত অল্প কথায় বেঁধে রাখা যায়। সত্য-অসত্য, বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন এখানে নেই। সূত্রকে ব্যাপকতর করে তোলা অর্থই যে সত্যের নিকটতর হওয়া এমন বলা চলে না—ফলতঃ ব্যাপকতর হওয়া অর্থ আমরা দেখছি অধিকতর নির্বাস্তব হয়ে ওঠা।*

মোট ব্যাপার তবে হ'ল এই। ইন্দ্রিয়গত অনেকগুলি প্রত্যক্ষ—যতই বিষম বিরূপ হোক না, তাদের সম্মিলিত করা, একটা সাধারণ সূত্রের মধ্যে গ্রথিত করার নাম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। প্রাকৃতিক নিয়ম যা বলা হয় তা এই সূত্র মাত্র—মানুষের মনের রচিত শৃঙ্খলা শুধু। সুতরাং মানুষের মনের বাহিরে, বাস্তবে তার অস্তিত্ব কিছু নেই। বিজ্ঞানের গোড়াকার দারুণ কড়া পাহারা এই রকমে অজ্ঞাতসারেই একটা অশরীরী অবাস্তব মনোময় তত্ত্বের অনিশ্চয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছে—কঠোর জড়বাদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছে শেষে ধোঁয়াটে অজ্ঞেয়বাদের মধ্যে।

ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষকে ধরে থাকলে অনুমানের মধ্যে, জল্পনার এবং কল্পনার মধ্যে গিয়ে যে পড়তে হবেই তা আর এক ধারা অনুসরণ করলেও আমরা দেখতে পারি। অবশ্য এ-কথা সহজেই বোঝা যায় যে বিজ্ঞানের—এবং সকল জ্ঞানের—প্রধান কাজই হ'ল দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে পৌঁছান—দৃষ্ট কার্য্য থেকে অদৃষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। কিন্তু অদৃশ্য কারণ অনেক সময়ে আবিষ্কার হয়, শেষে প্রত্যক্ষ হয়—নেপচুন বা হেলি ধূমকেতুর প্রত্যাবর্ত্তন যে রকমে প্রথমে অনুমিত, পরে দৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু অনেক সময় বিজ্ঞান এমন অদৃশ্যের

* আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বে সকল সমীকরণ সর্ব্বদা চেয়েছে দ্রষ্টাকে কি রকমে বাদ দিয়ে দিয়ে চলা যায় ও কি রকমে ও কি প্রকার দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ বস্তু পাওয়া যায়। তবে এ পথে তিনি পৌঁছেছেন এমন এক গাণিতিক বস্তু-জগতে যার সঙ্গে দৃশ্য বা দৃষ্ট বাস্তবের কোন মিল বা সমতৌল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

কথা বলে যা চিরকালই অদৃশ্য থেকে যায় এবং যার অস্তিত্ব কেবল বিশ্বাসের বিষয় মাত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বের গোড়ার বস্তু আবিষ্কারের জন্য দৃশ্যকে কেটে কেটে যথাসম্ভব খণ্ড খণ্ড ক'রে শেষে এসে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ-কণায়। বলা হচ্ছে বিদ্যুৎকণা (নানা ওজনের নানা প্রকৃতির)—বা কণা না ব'লে বলা উচিত ঢেউকণা নিয়েই বিশ্বজগৎ—সকল বস্তু, প্রত্যেক বস্তু নানাসংখ্যক ঢেউকণার নানা ভাবে সজ্জিত আকার মাত্র। কোন্ বস্তুর কি বৈদ্যুতিক আকার তারও ছক এঁকে নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

কিন্তু এই গোড়ার কথাতেই যদি প্রশ্ন তুলি বিদ্যুৎ কি প্রত্যক্ষের বস্তু? কোন বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎ চোখে দেখেছে? বলতেই হয় সে-ভাবে কেউ প্রত্যক্ষ করে নি, চোখে দেখে নি। প্রত্যক্ষ হয়, চোখে দেখা যায় কেবল একটি জিনিস—আলো। বৈজ্ঞানিক (বৃহৎ ছেড়ে যখন ক্ষুদ্রে, অণু-পরমাণুতে পৌঁছেছেন সেখানেও) দেখেছেন আলোর ছটা, আলোর নানা প্রকার গতিবিধি। প্রত্যক্ষবাদীর আলো ছাড়া দ্বিতীয় গতি কি থাকতে পারে, আলোর অতিরিক্ত আর কি তার প্রতীতির মধ্যে আসতে পারে? আলো, আলো-ছায়ার বহুরূপী লীলা দেখছি কিন্তু আলোর পিছনে যে বস্তু মেনে নিয়েছি, এই আলোর লীলার ব্যাখ্যার জন্য তা ত অনুমান। এক সময়ে আলোর আশ্রয়স্বরূপ এক ঈথরকে কল্পনা করা হয়েছিল, ও বস্তুটি স্বতঃসিদ্ধান্তরূপেই সর্ব্ববাদিসম্মত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আইনস্টাইন এসে বললেন—ওটার কোন প্রয়োজন নাই, ওটি বাহুল্য মাত্র। আলোর পিছনে যে বৈদ্যুতিক জগতের ছক এঁকে দিয়েছি তাও ঐ আলোর ফুলঝুরির ব্যাখ্যার জন্য, তার একটা সূত্র বানিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু ছক—আইনস্টাইনের equation আর বৈয়াকরণের সহর্দ্দেঃ একই পর্য্যায়ের—তাইতে ছকটা প্রতিনিয়ত বদলাতে হচ্ছে। আলোর স্বরূপ কি তা-পর্য্যন্ত জানি না! তার আচার, ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে তাও সেই জিনিস যাকে বলা হয় বিদ্যুৎ। আলোর এক বিশেষ গতিবিধি হ'লে বলি বিদ্যুৎ, আর এক বিশেষ গতিবিধি হ'লে বলি আলো।

আলোর পর্দ্দা দিয়েই আমাদের চোখ আঁটা—আলো-ছায়ার বাহিরে যে বস্তু তা কল্পনার বিষয়। তাই বুঝি উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং—প্রোজ্জ্বল পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা। হে সূর্য্য তাকে দূরে সরিয়ে দাও।

অধ্যাত্ম-সাধক সত্যের সন্ধানে তাই চলেছিলেন একটু বিভিন্ন পথে। অধ্যাত্ম-সাধকও চান প্রত্যক্ষ অনুভূতি, সাক্ষাৎকার। কিন্তু এই চক্ষু দিয়ে নয়; এই চক্ষুর পশ্চাতে যে চক্ষু রয়েছে; এই দৃষ্টি দিয়ে নয়, এই দৃষ্টির দ্রষ্টা যে তাকে দিয়ে হবে প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎকার। কি সে জিনিস—চক্ষুর চক্ষু, দৃষ্টির দৃষ্টি? চৈতন্য—বিশুদ্ধ চৈতন্য। চৈতন্য কি বস্তু? বৈদান্তিক বলছেন রূপ (অথবা রূপময়) থেকে রূপকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই ব্রহ্ম। সেই রকমে বলা চলে জ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান থেকে জ্ঞানবৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে বাকী থাকে যা তাই চৈতন্য। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম চলেছে একই লক্ষ্যে—বাস্তবের সাক্ষাৎ অনুসরণে—তবে উভয়ের পথ বিভিন্ন স্তরে, সমান্তরাল রেখায়। চোখ প্রত্যক্ষ করে জড় আলো—চৈতন্য প্রত্যক্ষ করে জ্যোতি। স্থূল দর্শনে মিলতে পারে স্থূল আলোই, অন্তর্দর্শনে দেখা যায় চিন্ময় আলো—জ্যোতিরুত্তমম্। স্থূল আলোতে বড়-জোর প্রতিফলিত হয় বাহ্যরূপ, আকার কিন্তু চৈতন্যে ধরা দেয় স্বরূপ, বস্তুর অন্তঃস্থ সত্তা ও ধর্ম্ম। চোখের দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকতে বাধ্য, সেখানে যে পর্দ্দা ঘনিয়ে আসেই, অন্তর্দৃষ্টিতে তার কোন সম্ভাবনাই নেই, তা নিষ্কলুষ, নির্নিমিখ।

উত্তমজ্যোতি আছে কি না তার প্রমাণ দর্শন—তোমার দর্শন, আমার দর্শন, সকলের দর্শন বা দর্শনের সম্ভাবনা। জড়, যাকে প্রথম দৃষ্টিতে দূর হ'তে মনে হয় স্থাণু নিরেট গাঢ় তমসাচ্ছন্ন (বাহিরের আলোতেই সে আলোকিত হয় মাত্র), সেই জড় এখন বৈজ্ঞানিকের নিকটতর নিবিড়তর সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে দেখা যায় নৃত্যপর আলোক-স্ফুলিঙ্গরূপে। সমস্ত জড় সৃষ্টিটাই গঠিত এই আলোক-স্ফুলিঙ্গের ছন্দিত লীলায়। কেবল সূর্য্য বা নক্ষত্ররাই যে স্বয়ম্প্রভ তেজের পুঞ্জ তা নয়, এই পৃথিবীর, মাটির, প্রতি ধূলিকণাও, এই

দেহের প্রতি অণু তেজোময়; অন্য রকম যদি দেখায় তবে তার কারণ বাহ্য সাধারণ দৃষ্টির অক্ষমতা—তা দৃষ্টিবিভ্রম বা দৃষ্টির স্থূলতার পরিচয় মাত্র।

ঠিক সেই রকমে বৈজ্ঞানিকের অ-স্থূল জ্যোতির পশ্চাতেও আছে আর এক সূক্ষ্ম জ্যোতি—সূক্ষ্ম হ'লেও তা কম বাস্তব নয়, বরং তাই হ'ল সত্যতর বাস্তব। এ সূক্ষ্ম জ্যোতির জন্য দৃষ্টিও হওয়া প্রয়োজন আরও সূক্ষ্ম আরও নিবিড়—কিন্তু তাকে এত সূক্ষ্ম এত নিবিড় হ'তে হয় যে সে কেবল মাত্রা হিসাবে ভিন্ন নয়, গুণধর্ম্ম হিসাবে, একটা পর্য্যায় হিসাবেই ভিন্ন হয়ে পড়ে। জড়-বৈজ্ঞানিকের বাহাদুরি এমন স্পর্শালু গ্রহণ-তৎপর যন্ত্র আবিষ্কার করা, প্রস্তুত করা যাতে স্বতঃই প্রতিফলিত অঙ্কিত হয় সূক্ষ্মতর আলোর স্ফুরণ। অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিকেরও অনুরূপ কৃতিত্ব।

আমরা বলেছি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রত্যক্ষতা পর্য্যবসিত হয়েছে আলোর চিত্রে। আলোর খেলাই দেখা যায়—সাদা মোটা চোখে তার বেশী দেখি না, সূক্ষ্মতর (যান্ত্রিক) চোখ দিয়েও তার অতিরিক্ত কিছু দেখি না। আলোর পিছনে কি যে বস্তু তা গবেষণার বিষয়, আলো নিজেই বা কি তাও অনুমানের বিষয়। আলোর গতিবিধি অনুসারে নানা রকম চিত্র, ছক এঁকে তুলছি—তাকেই নাম দিয়েছি প্রাকৃতিক নিয়ম, সমীকরণী সূত্র। 'কিন্তু তাতে বাস্তব বস্তুর বেশী নিকটে যে আসতে পেরেছি তা নয়।'

কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টির ধর্ম্ম একটু পৃথক্। চিন্ময় চক্ষু কেবল জ্যোতিকে নয়, জ্যোতির্ম্ময়কেও দেখতে পারে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দৃষ্টির সঙ্গেই রয়েছে উপলব্ধি—রূপের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুর বা সত্তার উপলব্ধি। বৈদিক ঋষি এই কথাটিই হয়ত বলতে চেয়েছেন তাঁর এই মন্ত্রে—জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে; সত্য সূর্য্যের সঙ্গে দৃষ্টি সম্মিলিত অচ্ছেদ্য একীভূত—লক্ষ্যবদ্ধ শরের মত তন্ময়।

কারণ অধ্যাত্ম-দৃষ্টি অর্থ একাত্মতা। আধ্যাত্মিক জ্ঞান এই একাত্মতা এবং সত্য এখানে লাভ হয় এই একাত্মতার ফলে। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। শুধু ব্রহ্ম সম্বন্ধে নয়—সকল আপেক্ষিক উপাধিক বস্তু বা অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এই সত্য প্রযোজ্য। বৈজ্ঞানিক দর্শনের স্থূল দৃষ্টিশক্তিকে একাগ্র সূচীমুখ করেছেন (অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সহায়ে), এ উপায়ে বস্তুর, অস্তিত্বের একটা ছায়াচিত্র পাই (প্লেটো-কথিত বিখ্যাত গুহার দৃষ্টান্তে যেমন); এই চিত্র যে চিত্র মাত্র, বস্তু হয়ত নয়, এবং বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বিশেষ আছে কি না, এ রকম সন্দেহ অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাত্ম-দৃষ্টিও সূচ্যগ্র একমুখী, শাণিত ও প্রখর। তবে স্থূল-আলো-আশ্রয়ী নয় ব'লে, চিন্ময় বা চেতনার দৃষ্টি ব'লে তাতে এসেছে আর এক গুণ। সে কেবল বাহিরের অবয়ব অনুসরণ করে না, রূপের চিত্র প্রতিফলিত করে না, সে প্রবেশ করে রূপের অন্তরে রূপীর মধ্যে এবং তাতে ওতঃপ্রোত একীভূত হয়ে যায়। 'বৈজ্ঞানিকের ভৌতিক দৃষ্টি দিয়ে জিনিসের দেখি বা গড়ি নানা জ্যামিতিক আকার। দৃষ্টির কেন্দ্র যেদিকে যেমন বদলে ধরি, সেই অনুসারে ঐ আকারেও পরিবর্ত্তন এসে পড়ে—এই যেমন মোটামুটি ভাবে বলা চলে, প্রথম, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি (common sense view), তার পর নিউটনীয় দৃষ্টি, তার পর আইনস্টাইনীয় দৃষ্টি। কিন্তু চিন্ময় দৃষ্টি বস্তুর অন্তর্ভেদ ক'রে তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়—সে-দৃষ্টিতে সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আপেক্ষিকত্ব নাই, তার সত্য নিরপেক্ষ সত্য, বস্তুর নিজস্ব সত্য—দ্রষ্টার দৃষ্টি-পরিচ্ছিন্ন সে সত্য নয়।

প্রাচীন যুগে পারমার্থিক অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকেও অনেক আধিভৌতিক তত্ত্ব এই পথে আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রাচীন ঋষি উদ্ভিদের সম্বন্ধে যখন বলেছেন তারা ভিতরে ভিতরে সজ্ঞান, তাদের ভিতরে ভিতরে রয়েছে সুখ-দুঃখ বোধ (অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতাঃ) তখন তাঁরা যে একটা কবিত্বময় কল্পনার বিলাস মাত্র দেখিয়েছেন তা নয়—উদ্ভিদের সঙ্গে একাত্মতার ফলে তাঁদের এ-জ্ঞান এসেছিল, এ-সত্য লাভ হয়েছিল এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের বিখ্যাত তথ্যটি—চলা পৃথ্বী স্থিরা ইব ভাতি—যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের ফলে নয়, অনুরূপ একটা একাত্ম অনুভূতির ফলে আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, মনে হয় সেই রকম সম্ভাবনাই বেশী। 'ভেষজশাস্ত্রে দ্রব্যগুণের সন্ধানও অনেক হয়ত এই উপায়ে

প্রথমে মিলেছিল। অবশ্য এ রকম একাত্মানুভূতির ফল নির্ভর করে সত্য সত্যই একাত্মানুভূতি হয়েছিল কি না তার উপর—নতুবা সিদ্ধান্তটি হয় একটা মিশ্রণ—খানিকটা সত্য উপলব্ধি, আর খানিকটা মস্তিষ্কের কল্পনাজল্পনা।

প্রকৃতপক্ষে, "একাত্মানুভূতি" নামটি অত্যন্ত দার্শনিক হ'লেও এবং অতি বিরল বস্তু ব'লে মনে হলেও—বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিকেরাও যে এই জিনিষটিরই কল্যাণে নব নব আবিষ্কার করতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নাই। লৌকিক কথায় যাকে বলে good hit, সাধু ভাষায় যাকে বলে intuition—এবং বৈজ্ঞানিকেরা যে working hypothesisএর কথা বলেন তার অনেকগুলিই—যেগুলি যতখানি সত্য বাস্তব, ততখানি তারা সেই একাত্মানুভূতির একটা প্রকাশ, প্রতিচ্ছবি, উদাহরণ।

বিজ্ঞান যে-আলো হাতে নিয়ে, গ্রীক সাধু ডাইওজেনেসের মত জগৎ জুড়ে সত্যের জন্য ঢুঁড়ে বেড়ায়, সে আলো ত তার নিজের ভিতরের আর একটা আলোর প্রতিরূপ—তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। অবশ্য বিজ্ঞানে প্রশ্ন করতে চায় না আলোর আলো কে বা কি। তার মনে হয় কি একটা অবৈজ্ঞানিক কাজ সে ক'রে ফেলল। কিন্তু জ্ঞানের এ হ'ল স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য কৌতূহল; প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক—বৈজ্ঞানিক হিসাবে না হোক—এ সমস্যার দুয়ারে এসে পৌঁছেছেন, এর মীমাংসার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

যাই হোক

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

যাই হোক, থেকো তুমি নিরুদ্বিগ্ন মনে,
কোথাও পাবে না বাধা; বাকি এ জীবনে
তুমি রবে উপলক্ষ্য, গৌণ আকস্মিক;
তোমার বিচ্ছেদস্মৃতি যত দাগা দিক
সাময়িক সে যে। আজ বুঝেছি আমিও
তারে যত ছোটো করো, সে আমারি প্রিয়
লুকায়ে তোমার মাঝে এল ছদ্মবেশে;
ধন্য আমি দ্বিধা যে করি নি সে নিমেষে
চাহিল সে অর্ঘ্য যবে তনুখানি মোর;
দিতে কোথা বাধে নি যে, এ গর্ব্বের জোর
অক্ষয় সম্বলরূপে পেয়েছি অন্তরে।
তাহারো পরীক্ষা-ক্ষণ এল কিন্তু পরে
তুমি যবে চলে গেলে আগ্রহে উন্মনা
নব পরিচয়ে। দিয়ে মেকী প্রেম-সোনা
মানুষেরে কিনিয়াছ পণ্যদ্রব্য সম,
কৌতূহল-অবসানে তারে হে নির্ম্মম
ফেলে গেছ পানপাত্র উৎসবের শেষে।
সেই তুমি কী যে বলো আজ দ্বারে এসে

সুলোচনার কাহিনী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইয়াছে, সুকিয়া ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছি, ডাক্তারখানা খুলিতে দেরি হইয়া গিয়াছে, সময় হইয়া আসিল, সুতরাং হন্ হন্ করিয়াই চলিয়াছি, এমন সময়ে বাড়ীঘরের থামের ছায়ার আলো-আঁধারির মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াই আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম।

এ যেন সেই সুলোচনার মা না? অবিকল সেই রকম দেখিতে যদিও বহু বহু কাল দেখি নাই। কিন্তু তাও কি সম্ভব এতকাল পরে সুলোচনার মা বাঁচিয়া থাকিবে এবং কলিকাতা শহরেই থাকিবে?

একটু জোর গলায় ডাক দিলাম—শুনছেন? শুনছেন? বলি শুনছেন এই যে? যে বৃদ্ধাটি ফিরিয়া দাঁড়াইল আমার ডাক শুনিয়া এবং হয়তো বা তাহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া—বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম সে সুলোচনার মা-ই বটে।

সুলোচনার মা কাছে আসিল। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরে পরিচয় দিতেই দন্তহীন মুখে এক গাল হাসিয়া বলিল—ও, তুমি যদু! আহা কতকাল দেখি নি তোমাদের!—ইত্যাদি বা ঐ ধরণের কোন উক্তি।

আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যবনিকা হঠাৎ সরিয়া গেল। গত মহাযুদ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতা···ঘোড়ার ট্রাম সবে মাত্র বন্ধ হইয়াছে··· তখনকার আমলের অতি সুন্দরী আধুনিকাদের মধ্যে যে আমার চোখে সর্ব্বপ্রধান সুন্দরী এবং সব চেয়ে আধুনিকা ছিল, কিছুকাল পরে যাহাকে জীবনের জনসমুদ্রে একদম হারাইয়া ফেলি এ সেই মেয়েটির মা···

তখনকার মেয়েদের চুল বাঁধিবার রীতি বা কাপড়-চোপড় পরিবার ধরণ একালের মত ছিল না বটে, কিন্তু সত্যিকার সুন্দরী যে হয়, তাহাকে যে-কোন সাজে, যে-কোন ঢঙে, যে-কোন ভঙ্গিতে মানায়···এবং সুলোচনা ছিল সেই ধরণের সুন্দরী মেয়ে···তাহার সেই দীর্ঘ ঋজু, চম্পকগৌর যৌবনদীপ্ত দেহ, লম্বা টানা কালো কালো ডাগর চোখ, কালো কোঁকড়া চুলের রাশি, নিটোল সুগঠিত বাহু দুটি সুন্দর মুখশ্রী কলিকাতার পথে পথে গলির আড়ালে আবডালে, পথের বাঁক হঠাৎ ফিরিয়াই কিংবা কোন নির্জ্জন পার্কে পাদচারণরত অবস্থায় কত দিন কল্পনানেত্রে দেখিতাম, দেশে ফিরিয়া কত বর্ষণমুখর শ্রাবণ বা ভাদ্র রজনীতে এক-ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রথম-যৌবনের রঙিন নেশায় যাহার মুখ কত বার মনে পড়িত সেই সুলোচনার কোন খবর পাই নাই আজ এত বছর, ধীরে ধীরে কবে সে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল··· আজ আবার পুরোনো যুগের সে মেয়েটি ১৯৩০ সালের কলিকাতায় কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল!

একটি প্রেমের কাহিনী। তবে সে-প্রেমের নায়ক আমি নই, গোড়াতেই কথাটা বলিয়া রাখা ভাল। সব যুগেই মেয়েরা যেমন ভালবাসে, ভালবাসিয়া কষ্ট পায়, মুখ বুজিয়া সহ্য করে, তিলে তিলে নির্ব্বোধের মত নিজের দেহ ক্ষয় করে দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়··· অত রূপ লইয়াও সুলোচনা সে-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই জানিতাম, তাই পরবর্ত্তী সময়ে মেয়েদের যখন ভাল করিয়া জানিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম তখন সেকালের তরুণী প্রেমিকা সুলোচনার জন্য মাঝে মাঝে মনটা কেমন করিয়া উঠিত।

যাক এখন সে-সব কথা। বর্ত্তমানের কথাই আবার বলি।

সুলোচনার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে, আজ দেখিয়াই বুঝিলাম। কিন্তু সুলোচনার মা ভিক্ষা করিতেছে কেন? সুলোচনা কোথায়? কারণ ভিক্ষাই সে করিতেছিল। থামের পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোকের কাছে দু-একটি পয়সা চাহিতেছিল আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

আমাকে পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধা

একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার সে-ভাবটা কাটাইয়া দিবার জন্ত বলিলাম—এখানেই কোথাও বাসা বুঝি? দোকানে জিনিস কিনতে এসেছিলেন?...ভাল আছেন?

—আর বাবা ভাল আর মন্দ! তুমিও যেমন!

কথাটা ভাল লাগিল না, সুতরাং যে প্রশ্নটি এতক্ষণ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল, সেটা করিয়া ফেলিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম সুলোচনার বয়স এখন হিসাবমত প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ—সুতরাং তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচের কারণ কি আছে? সে এখন আর ব্রীড়াবনতা সুন্দরী কিশোরী প্রণয়িনী নয় কারও।

—ইয়ে,—গিয়ে সু— আপনার মেয়ে কোথায়?

—তাই তো বলছি বাবা, সে কি আর আছে? সে থাকলে আমার আজ এই—বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি এ উত্তরের জন্ত আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রতিভের মত বলিলাম—ও!...

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে আমিই বলিলাম—আজকাল আছেন কোথায়?

—রাস্তা—গবর্ণমেণ্টের রাস্তা।

সবই বুঝিলাম। বড় কষ্ট হইল এ-কথা বলিলে ঠিক কথা বলা হইবে না। কষ্ট হইলেও বুড়ীর জন্ত হয় নাই। বুড়ীকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিব ভাবিতেছি এমন সময় সে বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল বড় ভাল হ'ল বাবা। আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে হতভাগী তো পালাল, এখন তার দুটি ছেলে, একটির বয়েস ষোল আর একটি চোদ্দ, এদের নিয়ে আমার কি দুর্দ্দশা ভাব দিকি এ বয়েসে! একটা ঘরে আছি—এখনই ভাড়া দিতে না পারলে সোমবারে তাড়িয়ে দেবে বলেছে। তাই বলছি রাস্তা ছাড়া তখন যাব কোথায়?

—সুলোচনা কত দিন মারা গিয়েছে?

—এই চোদ্দ বছর। ঐ কোলের ছেলেটি যখন দু-মাসের—সেই থেকে মানুষ করছি।

আমার হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। সুলোচনাকে আমি জানিতাম বটে, কিন্তু তার আসল ইতিহাস আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল, আমি খানিকটা বুঝিতাম, খানিকটা বুঝিতাম না—তাহার আর একটা কারণ আমার বয়সও তখন কম ছিল। রূপসী সুলোচনা আমার কাছে চিরদিন নারীত্বের গহন রহস্যের প্রতীক হইয়া আছে। এই উত্তম সুযোগ। বড় কৌতূহল হইল উহার মায়ের মুখে তাহার ইতিহাস সব শুনিব।

বৃদ্ধাকে বলিলাম—আপনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে থাকবেন কাল বিকেল পাঁচটার সময়—আমি আসব। বাড়ীভাড়ার ব্যবস্থা করব যা হয়।

বুড়ী ছাড়িল না, তাহার বাসা দেখিতে হইবে এখনি। অগত্যা গেলাম। বাসা দেখিয়া মনে হইল, তেমন ঘরে মানুষ থাকিতে পারে না, গরু থাকিলেও কষ্ট পায়। এক-তলায় ছোট্ট অন্ধকূপের মত ঘর, একটি মাত্র দোর, যেটা দিয়া ঢুকিতে হয়—দ্বিতীয় দরজা বা জানালা নাই। এই পচা ভাদ্রে কি ভীষণ গুমট ঘরের মধ্যে।

সুলোচনার ছেলেরা একটু পরে আসিল। বড় সুন্দর ছেলেদুটি, সুলোচনার মুখচোখ ভুলিয়া গিয়াছিলাম—ইহাদের—বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেটিকে দেখিয়া আবার সুলোচনাকে স্পষ্ট মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজে একটি, অপরটি গান গায়।

হায় অভাগী সুলোচনা!...

তখনকার কালের শৌখীন মেয়ে, এখনকার কালের আধুনিকা স্মার্ট মেয়ে সুলোচনার মা ও ছেলেদের এ কি গৃহ, এ কি গৃহসজ্জা!...ছেঁড়া চটের বিছানা, চটের মধ্যে বিচুলির কুচিপোরা বালিশ, ভাঙা কলাইচটা এক-আধখানা সান্কি, একটা মাটির কলসী আর দড়ির আলনায় অতি মলিন খান দুই-তিন কাপড় ও জামা। একখানা কেঁওড়া-কাঠের হাত-দুই চওড়া তক্তপোষ আছে—ছেলেদুটি তাতে শোয়, বুড়ী শোয় মেজেতে। তাও এই ঘরে আশ্রয় মিলিতেছে কই? এই আস্তাবল হইতেও বাড়ীওয়ালা নাকি ইহাদের তাড়াইয়া দিবে বলিতেছে।

এই কাহিনীটি আর বেশী দূর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে সুলোচনা কে ছিল, তাহার সহিত আমার কি ভাবে আলাপ—ইহা বলিব। নতুবা গল্পের শেষ অংশ ভয়ানক খাপছাড়া ঠেকিবে।

২

১৯০৬ সালে দেশের স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া

কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছি। বেচু চাটুজ্জের ষ্ট্রীটে আমারই স্বগ্রামস্থ এক বন্ধুর বাবা ছেলেপুলে লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন, সেখানেই উঠিয়াছি। আমার বন্ধুটির দাদা তখন বি-এ পড়েন এবং তাঁহারই সঙ্গে দেখা করিতে প্রকাশচন্দ্র বসু নামে তাঁহারই এক বন্ধু বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। এই প্রকাশবাবু বড় অদ্ভুত লোক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মনে প্রাণে যোগ দেওয়ার ফলে পুলিশের হাতে গুরুতর প্রহার খাইয়া নাকি কিছু দিন হাসপাতালে এবং কিছু দিন জেলে ছিলেন। তিনি নিজের হাতে কাহাকেও বোমা মারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই—কিন্তু আলিপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ দিনকতক তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছিল। খুব বলিষ্ঠ, দীর্ঘ চেহারা, মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। প্রেসিডেন্সি কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র, ছাত্র হিসাবেও যথেষ্ট মেধাবী।

আমরা প্রকাশ-দাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া চলিতাম। তিনি বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত খুশি হইয়া উঠিতেন, প্রকাশের জন্য এ-খাবার করা, প্রকাশের জন্য ও-খাবার করা, চা কোথায়, চেয়ারের উপর পাতিবার কুশন কোথায়, মিনি তাহার হাতের উলের কাজ দেখাইতে ছুটিতেছে, ডলি পড়া বলিয়া লইবার ছুতা করিয়া প্রকাশ-দার সঙ্গে দুটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে—প্রকাশ-দার কাছে যেন বাড়ীসুদ্ধ লোকের মন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবার অধিকার ছিল না বাড়ীতে, তাহা হইলে সকলেই এক সঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ তুলিবে।

প্রকাশ-দার সঙ্গে মাঝে মাঝে সতীশ রায় বলিয়া তাঁহার এক বন্ধু আসিতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, খুব বড় বড় চোখ, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা। ইহারা সবাই খুব ফুর্ত্তিবাজ আমুদে ধরণের লোক—আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী মাতাইয়া তুলিতেন হাসি গল্পে গানে। মাঝে মাঝে আবার কয় বন্ধুতে ঘরে খিল দিয়া কিসের পরামর্শ করিতেন—তখন আমাদের জানালা দিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারাও নিষেধ ছিল।

কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া এক দিন বন্ধু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরা ঘরে দোর দিয়ে কি করে রে?

শরৎ চুপিচুপি বলিল—কাউকে বলিস নি ভাই, ওরা সব অ্যানার্কিষ্ট।

—তোর দাদাও?

—হ্যাঁ। ওরা দাদাকে দলে নিয়েছে।

শুনিয়া মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ও উত্তেজনা অনুভব করিলাম। অ্যানার্কিষ্টদের সঙ্গে এক বাসায় আছি ভাবিয়া ভয়ও হইল।

এইখানে এক দিন প্রথম দেখিলাম সুলোচনার মাকে। নিজের ঘরটিতে বসিয়া পড়িতেছি, একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—প্রকাশ এখানে কবে এসেছিল জান? আজ আসবার কথা আছে?

দেখিলাম স্ত্রীলোকটির পরনে শাদা থান, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশী নয়, গায়ের রং খুব ধপধপে ফর্সা, বয়স হইলেও মুখশ্রী দেখিতে ভাল। আমার মুখে প্রকাশবাবুর আসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া আমারই ঘরে সে বসিল। আমায় বলিল—তুমি কি কর, ছেলে?

—পড়ি ফার্ষ্ট ইয়ারে।

—এটা তোমাদের বাড়ী?

—আমার বন্ধুর বাড়ী, আমি এখানে থাকি। বাড়ীতে মেয়েরা আছেন—চলুন না বাড়ীর মধ্যে, এখানে কেন ব'সে থাকবেন?

এই ভাবে সুলোচনার মার সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদেরও আলাপ হইয়া গেল। সুলোচনার মা কিন্তু প্রকাশ-দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া অন্য কার্য্যে কখনও আসে না, এক দিন আমার এ-কথা মনে হইল। বাড়ীর মধ্যে মেয়েরাও এ-কথা বলিতে সুরু করিল। স্ত্রীলোকটি যে প্রকাশবাবুর কাছে টাকা লইতে আসে, তাহাও সকলে জানিয়া গেল। ক্রমে আমাদের সামনেই সে প্রকাশবাবুকে বলিত—ও প্রকাশ, বাবা এ-মাসে আর দশটা টাকা না-দিলে মেয়ের বই হবে না। ক্লাসে তাকে বকে, বই না-কিনে ইস্কুলে যাবে কি ক'রে?

আমার বন্ধুকে এক দিন বলিলাম—ওঁর মেয়ে আছে

তা তো এতদিন শুনি নি, ওঁরা প্রকাশ-দার কেউ হন? প্রকাশ-দা টাকা দেন কেন ওঁদের?

বন্ধু বলিল—জানি ওঁর এক মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। আমি শুনেছি মেয়েটি, সধবা, কিন্তু তার স্বামীর কাছে থাকে না। মা ও মেয়ে কোথায় যেন বাসা ক'রে থাকে, প্রকাশ-দা আর সতীশ-দা দুজনে খরচ দেন। দাদা এ-সব গল্প সেদিন মার কাছে করছিল।

—তা প্রকাশ-দা আর সতীশ-দা টাকা দেন কেন?

—ওঁরা অ্যানার্কিষ্ট কিনা, দেশের আর দশের সেবা ওঁদের কাজ, বিশেষ ক'রে প্রকাশ-দার। দাদা বলে প্রকাশ-দা বাড়ী থেকে যে টাকা পান, তার বেশীর ভাগ ওদের দিয়ে দেন, নিজে অনেক সময় টাকা ধার করতে আসেন দাদার কাছে। দুটো টিউশনি করেন, সে-টাকাও ওদের দিয়ে দেন।

আমার ক্রমে মনে হইল বুড়ী প্রকাশ-দার কাছে নানা রকম ফন্দি ও ছুতায় টাকা আদায় করিতে আসে। আর সব সময়েই মেয়ের ওজুহাতে। আজ আমার মেয়ের এ নাই, আজ আমার মেয়ের তা নাই, একটা না একটা ছুতা বুড়ীর লাগিয়াই আছে। প্রকাশ-দাও যেন কল্পতরু, 'না' বলিতে শুনিলাম না কোনদিন। বুড়ীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলাম—বুড়ী বলিলাম বটে, কিন্তু সুলোচনার মা সে-যুগে বুড়ী ছিল না।

কত বার ভাবিতাম প্রকাশ-দাকে বলি, উহারা ফাঁকি দিয়া আপনার কাছে টাকা লইতেছে, আপনি যা চায় তা দেন কেন? কিন্তু প্রকাশ-দাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করিতাম, কখনও সাহস করিয়া কথাটা বলিতে পারি নাই।

৩

এখানে এক দিন সুলোচনা আসিল তাহার মায়ের সঙ্গে।

দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রূপসী বটে! পাড়াগাঁ হইতে কয়েক মাস মাত্র আসিয়াছি, অমন রূপ কখনও দেখি নাই। বছর ষোল কি সতের বয়েস, পিঠে দীর্ঘ কালো চুলের বিনুনি দোলানো, যেমন চোখ, তেমন ধপধপে গায়ের রং, তেমনি নিটোল স্বাস্থ্য, অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী! বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে স্বভাবতই তাহার যথেষ্ট ভাব হইয়া গেল। তার পর প্রায়ই আসিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া প্রকাশ-দার আসিবার সময়টাতেই আসে এবং বেশীর ভাগ কথাবার্ত্তা বলে প্রকাশ-দার সঙ্গেই। প্রকাশ-দা উপস্থিত থাকিলে সেই যে তাঁহার চেয়ারের পিছনটি ধরিয়া দাঁড়ায়, তিনি যতক্ষণ এ-বাড়ীতে থাকেন, বড় একটা অন্য কোথাও নড়িতে দেখি নাই।

প্রকাশ-দা উঠিয়া চলিয়া গেলে সুলোচনা আমাদের বড় বিরক্ত করিত। হয়তো বা আমাদের সে মানুষ বলিয়াই মনে করিত না, কে জানে? টেবিলে বসিয়া পড়িতেছি, সুলোচনা হঠাৎ আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া গেল, নয় তো পিছন হইতে আসিয়া দুই হাত দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল, নয় তো ভূতের গল্প শুনিবার আবদার ধরিয়া বসিল। পড়িতে দিবে না কিছুতেই, পড়া থাক, তাহার সঙ্গে ছাদে কে যাইবে? ডলির পুতুলের শুভ-বিবাহ এখনই ছাদে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার পুতুলের সহিত—ইত্যাদি, এক-এক দিন এক-এক রকমের ব্যাপার।

কিন্তু প্রকাশ-দা থাকিলে সুলোচনা এ-রকম করিত না। তখন তার অন্য মূর্ত্তি, ধীর স্থির, বেশী হাসিত না, বেশী বকিত না, কেমন যেন সলজ্জ, সকুণ্ঠ চোখ-মুখের ভাব, কতদিন দেখিয়াছি।

প্রকাশ-দা সুলোচনাকে 'সু' বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া আমরাও সবাই তাহাকে 'সু' বলিতাম। এক দিন সুলোচনা তাহাতে আপত্তি করিল। শরৎকে বলিল—প্রকাশ-দা যা বলেন, তোমরাও তাই বলবে কেন? ও নামে ডেকো না। কানে ভাল লাগে না। আমার বড় রাগ হইল। সুলোচনার চাল-দেওয়া ধরণের কথাবার্ত্তা আমার সহ্য হইত না—আমার মনে হইত মেয়েটি অত্যন্ত গর্ব্বিতা ও চালবাজ। রাগের ঝোঁকে বলিলাম—তাহ'লে তুমিও আমাদের সঙ্গে মিশতে এস না। সুলোচনার সহিত আমাদের এ-ধরণের খুঁটিনাটি ঝগড়া প্রায়ই চলিত। তবে সে যে সব সময়ে আমাদের বাসায় আসিত তা নয়, মাসের মধ্যে দশ-বারো দিনের বেশী না। প্রকাশ-দা এখানে যে-যে দিন আসিবেন, এমন দিন

ছাড়া সুলোচনার এখানে আসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতাম। সতীশদার প্রতি সুলোচনা যেন তেমন সন্তুষ্ট নয়, অথচ সতীশ-দা সুলোচনা বলিতে অজ্ঞান ছিলেন—আমার বন্ধু শরৎ বলিত সুলোচনাদের কলিকাতার বাসাভাড়া ও বাসার সমস্ত খরচ নাকি সতীশ-দা দিতেন—কিন্তু সুলোচনা সতীশদাকে কেন যে দেখিতে পারিত না তাহা কি করিয়া বলিব?

এক দিনের কথা বলি। সেদিন সতীশবাবু আসিবার কিছু পরেই সুলোচনা তাহার মায়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির। সুলোচনার মা বলিল—সতীশ, আমাকে দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়ে আনবে বাবা? সুলোচনাও বলিল—হ্যাঁ মামা, (সতীশবাবুকে সুলোচনা মামা বলিয়াই ডাকিত) চল আমিও যাব।

সতীশ-দা হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছেন, তাঁহার চোখ-মুখের খুশির ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হইল। উৎসাহের সহিত বলিলেন—হাঁ হাঁ। বরং চল দক্ষিণেশ্বর থেকে আমরা বরানগরে স্বামী অবধূতানন্দের আশ্রম দেখে আসব—সেও বড় চমৎকার জায়গা গঙ্গার ধারে।

সুলোচনার মা বলিলেন—তা হ'ল অমনি পেনেটির দ্বাদশ শিবের মন্দিরও কেন দেখে আসি চল না?

সুলোচনাও বলিল—বড্ড মজা হয় মামা। একখানা গাড়ী ডাক। সতীশ-দা গাড়ী ডাকিতে গিয়াছেন, এমন সময় প্রকাশ-দা আসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিল তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। তিনি কেন যাইতে চাহিলেন না তাহা আমি জানি না, সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনাও তাহার মাকে বলিল—সে কোথাও যাইবে না, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে তিনি একাই যাইতে পারেন। সতীশবাবু ইতিমধ্যে গাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিলেন কিন্তু ঘটনার নূতন পরিস্থিতি দেখিয়া বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। প্রকাশ-দাও সুলোচনাকে যাইবার জন্য যথেষ্ট বলিলেন, এমন কি শেষে রাগও করিলেন, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই গেল না। অবশেষে বেচারী সতীশ-দার শুধু সুলোচনার মাকে লইয়াই যাইতে হইল। অবশ্য আমার বন্ধুর বাড়ীর মেয়েরা কেউ কেউ সঙ্গে গেলেন—এতগুলি মেয়ে গেল, তবুও সুলোচনা এক পাও নড়িতে চাহিল না।

বছর দুই এই ভাবে নানা সুখদুঃখের ঘটনার মধ্য দিয়া কাটিয়া পরে ১৩০৮ সালে আমাদের বাসা উঠিয়া গেল। আমি কলেজের হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। সুলোচনাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। আমার ছাত্র-জীবনের বাকী বৎসরগুলির মধ্যে সুলোচনা বা তাহার মায়ের সঙ্গে চোখের দেখাও নাই এক দিনের জন্য। সতীশবাবুকেও আর কখনও দেখি নাই। ইহাদের না দেখিবার কারণও যথেষ্ট ছিল, পুলিশের চাপেই বাসা উঠাইতে হইয়াছিল।

তবে প্রকাশ-দার সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা এই যে আমার ছাত্র-জীবনের তৃতীয় বৎসরে প্রকাশ-দা অদ্ভুত ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। আর কেহ কোনদিন তাঁহাকে দেখে নাই; পূর্ব্ববঙ্গের কোথায় স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়া পুলিশের গুলিতে মারা পড়িয়াছেন, কয়েক বছর পরে বিশ্বস্তসূত্রে একথা শুনিয়াছিলাম।

বছর পাঁচ-ছয় পরের কথা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার বাহিরে চাকুরী করি। কি একটা ছুটি উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে নামিয়া শেয়ালদ' দিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। তখনকার আমলে শেয়ালদহ নর্থ স্টেসন হয় নাই—যেখানে আজকাল নর্থ স্টেশনের সম্মুখের ভাড়াটে গাড়ীর আড্ডা। ওখানে অনেক চা, পান, শরবৎ ইত্যাদির দোকান ছিল। একটি দোকানে শরবৎ খাইতে গিয়াছি, দেখিলাম একটি ছোকরা এবং তাহার সহিত একটি সুবেশা রূপসী তরুণী সেখানে দাঁড়াইয়া ভাঁড়ে করিয়া শরবৎ খাইতেছে। দু-এক বার গোপনে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বয়েস বাইশ-তেইশ হইবে—চোখ যেন ফিরানো যায় না তাহার দিক হইতে। না, অপূর্ব্ব রূপসী বটে মেয়েটি।...আমিই শুধু চাহিয়া নাই, আশেপাশের অনেকেরই দেখিলাম আমার দশা।

হঠাৎ আমাকে ভীষণ চমকিত ও আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া তরুণী আমার একেবারে সামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আরে, যদু-দা যে!

বলিয়াই সে আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।



বর্ষায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীবাসুদেব রায়

চিনিতে অবশ্য বিলম্ব হইল না, বলিলাম—সুলোচনা যে! কোথা থেকে? তোমার মা কোথায়? কি করছ এখন?

সুলোচনা এ-সব কথায় কোনো উত্তর না দিয়া সর্ব্বপ্রথম আমায় প্রশ্ন করিল—প্রকাশ-দার কোনো খবর পেয়েছ?

প্রকাশ-দার মৃত্যু-সংবাদ তখন আমি শুনিয়াছি, কিন্তু সে-কথা বলিলাম না।

সুলোচনা আমায় ছাড়িতে চায় না, তখনকার পরিচিতদের মধ্যে এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, আমার বন্ধু শরৎ এখন কোথায়, তাহার দাদা বিনোদ কি করে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে কিনা—নানা মেয়েলি প্রশ্ন। আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—অনেক দিন পরে দেখা, খাওয়াও দেখি, চল তো রায় মশায়ের হোটেলে?

সেই পুরোনো দিনের মতই নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার সুলোচনার, মেয়েমানুষ হইয়াও ছেলের মত ব্যবহার, ধরণ-ধারণ, সেই সবই বজায় আছে অবিকল। তবে তাহার পরনে চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল শাড়ী ও ব্লাউজের বাহার, গলায় চিক্‌চিকে সরু চেন ও পেনডেন্ট্, পায়ের রূপালি ব্রোকেডের জুতা, সুগঠিত পেলব সুগৌর হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে সরু-ফিতা-বাঁধা হাতঘড়ি প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইল সুলোচনার অবস্থা ফিরিয়াছে। সুলোচনার শৌখীনতার প্রতি স্নেহ হইল—এমন সুন্দরী মেয়েরা বেশভূষা না করিবে, সেন্ট-পাউডার না মাখিবে—তবে সে-সব সৃষ্টি হইয়াছে কাহাদের জন্য? সুলোচনার অঙ্গে শাড়ী-ব্লাউজ-অলঙ্কার উঠিয়া নিজেরাই ধন্য হইয়া গিয়াছে না কি?

আমি বলিলাম—আরে ছাড়ো ছাড়ো, হাত ধরে ওরকম টানাটানি কোরো না—রায়মশায় কেন, চলো ট্রামে ন্যাশনাল হোটেলে যাই কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে। কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটি বাদ সাধিল, নতুবা সুলোচনাকে লইয়া যাওয়া কষ্টকর হইত না।

ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া বসিল—ট্রেনের দেরি নেই, কোথায় যাবে এখন বৌদি? এস, চল—বাঃ—এমন কি মনে হইল যে ছোকরা যেন সুলোচনার উপর জোর খাটাইতেছে। রাগ হইল—কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বাপু! সুলোচনাকে আমরা ছেলেবেলা হইতে জানি, তুমি তখন জন্মাও নাই। আজ আসিয়াছ আমাদের সামনে সুলোচনাকে ঘড়ি দেখিয়া টাইম বলিয়া দিতে! সুলোচনা যে খুব ভাল মেয়ে নয়, এ ধারণা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখন সে-ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। বেচারী প্রকাশ-দা! মেয়েদের ভালবাসার এই তো মূল্য। অন্ততঃ সুলোচনার মত মেয়েদের। মনটা অশ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। সুলোচনাকে লইয়া ছোকরা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

সুলোচনা যাইতে যাইতে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—দমদমায় বাসা আজকাল। যেও এক দিন—মা আছেন বাসায়। বিস্কুটের কারখানার পেছনে নরেশ পালের বাগানবাড়ী—

বলা বাহুল্য, দমদমার নরেশ পালের বাগানবাড়ী খুঁজিয়া সেখানে যাইবার সুবিধা ও সময় আমার হইয়া ওঠে নাই।

•

বছরখানেক পরে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব বৎসর ১৯১৩ সালে আমি সন্ধ্যার দিকে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে ট্রাম ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একখানি ট্রাম আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিলাম প্রথম শ্রেণীর কামরায় একখানি বেঞ্চিতে সুলোচনা একা বসিয়া আছে। আমি তখনই বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া ট্রামখানাতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সুলোচনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরে আমাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া ভারি খুশি হইয়া উঠিল। বলিল—উঃ যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে! আমি বলি কে এসে ঝুপ্ করে পাশে বসে পড়ল রে বাবা! ভাল? কতদিন দেখা হয় নি—সেই শেয়ালদ' স্টেশনে সেবার—দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে চাঁদনির মোড়ে ট্রাম আসিল। সুলোচনা বলিল—নামো। এখানে ঘড়্-ঘ্না, কুরুশ-কাঁটা কিনব আর ছেলেটার জন্যে হর্লিক কিনব—আমি উহার মুখের দিকে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া সুলোচনা সলজ্জমুখে বলিল—আজকাল আমার

স্বামী এসেছেন যে, আজ প্রায় বছরখানেক। এখন রোজগার করছি দু-পয়সা, সবাই আসবে, এতদিন কেউ খোঁজও নেয় নি।

—আজকাল কি কর?

—বা রে, আজকাল তো ক্যাম্বেলে নার্সগিরি করি। এত দিন নার্সদের হোস্টেলে ছিলাম—এখন স্বামী ফিরে আসাতে বাসা করেছি দমদমাতে। সেই আর বছর যখন তোমার সঙ্গে দেখা তখন থেকে দমদমায় বাসা। এস না আজ, চল—আমার খোকাকে দেখে আসবে এখন—

—না আজ থাক। আর-এক দিন হবে—চল চা খাবে সুলোচনা?

—শোন বলি। তুমি গিয়ে খোকার মামা, শুধু হাতে যেন যেও না। ওকে একটা হার কেন দেও না?

আমার বড় রাগ হইল। দম দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে সুলোচনা মায়ের মতই পটু হইয়া উঠিয়াছে। আপন মামা হইলেও আজকালকার বাজারে শুধু টাকা দিয়া মুখ-দেখা সারে, আর আমি কোথাকার কে, হার কেন দিতে যাইব? বলিলাম—এখন যাব না তোমার বাসায়। বড় ব্যস্ত আছি।

ট্রাম হইতে নামিয়া আমরা একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়াইয়াছি, গ্যাসের আলোয় সুলোচনাকে দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এ রকম রূপসী মেয়েকে লইয়া কোনো চায়ের দোকানে ঢুকিতে সঙ্কোচ মনে হয়—বিশেষতঃ মনে রাখিবেন ১৯১৩ সালের কলিকাতা, তখনকার দিনে মেয়েরা পথেঘাটে খুব কমই বাহির হইত। হইলও তাই, চায়ের দোকানসুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া একদৃষ্টে সুলোচনার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার উপর সুলোচনার মুখে খই ফুটিতেছে কথায়। সে চুপ করিয়া থাকিতে জানে না, আমি বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আমায় বলিল—যাবে না বই কি ইঃ—ভাগনের মুখ দেখ নি, দেওয়ার ভয়ে বোনের বাড়ী যাবে না লজ্জা করে না বলতে? যেতেই হবে, আমি নেমন্তন্ন করছি সামনের শনিবারে যাবে—ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ইহার সব ব্যাপারই রহস্যাবৃত, কোথায় এতদিন ইহার স্বামী ছিল, কোথা হইতে বা আবার আসিল, এ-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও চাপিয়া গেলাম। তবে সুলোচনা কখনো মিথ্যা বলে না ইহা আমি জানিতাম, পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এমন সব অবস্থায় সত্য কথা বলিত, যেখানে সত্য বলিলে তাহার নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই সুলোচনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয় নাই।

চা খাওয়া ও উলবোনার কাঁটা কেনার পরে আমি তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিলাম। গাড়ীর কামরায় বসিয়া সে তাহার পাশে বেঞ্চিতে হাত চাপড়াইয়া বলিল—এস, ব'স, যদু-দা—

বলিলাম—আজ নয় সুলোচনা—মাপ কর। কাজ আছে—

সুলোচনা অভিমানের সুরে বলিল—না, থাক্ কাজ। এস—আসতেই হবে। কত কথা আছে তোমার সঙ্গে—রাস্তায় দেখা, কি কথাই বা হ'ল! পুরোনো দিনের কথা আর কার সঙ্গে কইব?

পরে হঠাৎ আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, প্রকাশ-দার আর কোনও খবর পাও নি?

বলিলাম—নাঃ, কই আর—মনে মনে ভাবিলাম—সে-কথা জেনে তোমার লাভই বা কি এখন।

—বেঁচে নিশ্চয়ই আছেন, তবে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। তাঁর কথা যে কই, এমন আর লোক কই এক তুমি ছাড়া?

—কেন, সতীশ-দা কোথায়?

—মামা? মামা বিয়েথা ক'রে দেশে দিব্যি সংসারী হয়ে বসেছে। তার মত মানুষে আর এর বেশী কি করবে? প্রকাশ-দার মত কি সবাই?

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। সুলোচনা বিস্ময়ের সুরে বলিল—সত্যি, আসবে না নাকি যদু-দা? এস ব'স—

বলিয়া আমার হাত ধরিতে গেল।

কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। তা ছাড়া সেই রাত্রেই আমাকে কর্ম্মস্থানে ফিরিতে হইবে—সুলোচনার সঙ্গে গেলে ট্রেন ফেল করি। চাকুরি বজায় রাখিয়া তবে অন্য কথা।

তখন কি জানি সুলোচনার সহিত এই শেষ দেখা?

সতের-আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা এ-সব।

৪

সুলোচনার মা পার্কে আসিল।

তাহাকে বাড়ীভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া বলিলাম—এখন বলুন তো, আমি অনেক কথাই জানতুম না আপনাদের সম্বন্ধে। যা জানি, ভাসা-ভাসা ভাবে জানি। সবটা বলুন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। পার্কে ছেলেমেয়েরা দোলনায় দুলিতেছে, চেঁচামেচি করিতেছে, ঘুঘ্‌নি চানাচুর কিনিতেছে।

সুলোচনার মায়ের নিকট হইতে নানারূপ জেরা করিয়া যে তথ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলাম সেদিন, তাহা যেমন করুণ, জীবনের গভীর অনুভূতির দিক হইতেও তেমনি অপূর্ব্ব। কিন্তু তাহা বৃদ্ধার কথায় বলিলে ঠিকমত গুছাইয়া বলা হইবে না। তাই নিজে খানিকটা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম।

সুলোচনার মা অল্প বয়সে মেয়েটিকে লইয়া বিধবা হন।

ওদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। সুলোচনার যখন আট বছর বয়স, তখন তার বিবাহ হয় পাশের গ্রামে। স্বামীর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ, স্বামীর চেহারা ভাল ছিল না বলিয়া ছেলেমানুষ মেয়ে তার কাছে বড় একটা যাইতে চাহিত না। স্বামী ছিল মূর্খ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক, আট বছরের স্ত্রীর উপর মারধর ও নানা রকম অত্যাচার সুরু করে। ফলে ওর মা দেশের জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কলিকাতায় আসিল—তখন সুলোচনার বয়স দশ বৎসর। উদ্দেশ্য, মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাধীন ভাবে থাকিবার কোন সুবিধা করিয়া দিবে।

কিন্তু তখনকার কালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন প্রভৃতিকে লোকে ভাল চোখে দেখিত না। মা মেয়ের হাত ধরিয়া নানা জায়গায় বেড়াইল। হাতের পয়সা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেল—কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। এদিকে আরও নূতন উপসর্গ, মেয়ে অপূর্ব্ব রূপসী, দশ বছরের হইলে কি হয়, তাহাকে দেখায় তের-চোদ্দ বছরের মত—দুষ্ট লোকের চোখ পড়িল মেয়ের উপর।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া মা মেয়েকে বলিল—চল আজ গঙ্গায় ডুবে মরব দু-জনে—এখানে আর কোনও সুবিধে নেই—এবার মান যাবে। গরীবের কেউ নেই।

মেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল।

রাত ন-টার সময় মেয়ে বলিল—কখন আমরা ডুবব মা? অন্নপূর্ণার ঘাটে চল যাই। মা বলিল—এখনও সব ঘাটে লোক। এখন না, দেরী কর—

রাত দশটার সময় মা মেয়ের হাত ধরিয়া বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—হাঁ রে, পারবি তো? বল আগে থেকে—পারবি তো?

মেয়ে এতটুকু ভয় খায় নাই। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি সঙ্গে থাকলে মা ঠিক পারব—

সেই সময় যামিনী ঘোষ বলিয়া একটি ছোকরা, আপিসের কেরাণী, ঘাটের কাছেই কোথায় বসিয়া হাওয়া খাইতেছিল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন? আর ব্যাপারই বা কি? কি বলাবলি করছেন আপনারা? বাসা কোথায় আপনাদের?

যামিনী ঘোষের প্রশ্নের স্বরে বালিকা থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা সব খুলিয়া বলাতে সে-রাত্রে যামিনী মা ও মেয়েকে নিজের বাসায় লইয়া গেল।

দিন-পনর কাটিল মন্দ নয়। যামিনী ছেলেটি খুব ভাল, কিন্তু ইহার এক বন্ধু সম্ভবতঃ যামিনীর মুখে ইহাদের ইতিহাস শুনিয়া এক বার দেখিতে আসিল। সেই যে আসিল, আর সে বাড়ী ছাড়িতে চায় না। তার আসা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। সুলোচনাও সকলের সামনে চিরকাল বাহির হয়, তখন তো আরও ছেলেমানুষ।

ছোকরা মাথার পিছন দিকে চুল ফিরাইত বলিয়া সুলোচনা আড়ালে মার কাছে তাহার নাম রাখিয়াছিল কাকাতুয়া। একদিন মেয়ে মাকে বলিল—মা কাকাতুয়া

ভারি দুষ্টু—আমাকে গয়নার বাক্স দেখিয়ে বলে কি না আমার সঙ্গে যাবি? তোকে এই সব গয়না দেব—আমি ওর সামনে আর বেরুব না—

মা বলিল—হতচ্ছাড়া মেয়ে, তুইই বা যাস কেন সকলের সামনে? বাড়ীর মধ্যে থাকবি, যার-তার সামনে বেরনো, গল্প করা কি ভাল? আমরা গরীব লোক, আমাদের কত বিপদ জানিস?

যামিনীর আর এক বন্ধু ছিল, সতীশ রায়। সতীশ মা ও মেয়ের দুঃখ শুনিয়া তাহাদের নিজের বাসায় লইয়া আশ্রয় দিল বটে কিন্তু দিনকতক পরে সেখানেও গোলেযোগ বাধিল। সতীশ সুলোচনাকে দেখিয়া পাগল হইল। এমন কি সতীশের মা সুলোচনা বিবাহিতা জানিয়াও ছেলের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, সুলোচনার মায়েরও অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুলোচনা একেবারে বাঁকিয়া বসিল। মাকে বলিল—মেয়েমানুষের ক-বার বিয়ে হয়? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—আমার আর লেখাপড়া শেখাতে হবে না তোমায়—তুমি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী রেখে এস, সেখানে বাঁচি আর মরি। ঢের হয়েছে—

এখানে এই সময় একদিন আসিলেন প্রকাশ-দা।

প্রকাশ-দা সতীশের বন্ধু এবং ছাত্রমহলে নাম-করা স্বদেশী। অ্যানার্কিষ্ট বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার যথেষ্ট রটিয়াছে তখন পুলিশের কৃপায়। প্রকাশ-দা সুলোচনার ইতিহাস সব শুনিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সুলোচনা বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হইল। প্রকাশ-দা মাঝে মাঝে তাহার পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন।

এদিকে সতীশ বড় বিরক্ত করিয়া তুলিল। একই বাড়ীতে থাকা, সর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাৎ, সামনে না আসিয়া উপায় নাই। নানারকম দামী জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিল—সেন্ট, সাবান, কাপড়-জামা ইত্যাদি। সুলোচনা বলিত—মামা, এ-সব কেন দিস? তুই বড় স্বার্থপর। এ-সব আমি নেব না।

মাকে বলিত—মা, অনেক মানুষ দেখলাম এ-বয়সে, প্রকাশ-দার মত মানুষ এ-পর্য্যন্ত আর দেখি নি! অন্য ধাতের একেবারে—উনি মানুষ না দেবতা তাই ভাবি।

সতীশ দিত দামী দামী কাপড়, এক বার পূজায় একখানা ভাল বেনারসী শাড়ীও দিল। প্রকাশ-দা দিলেন একজোড়া মোটা স্বদেশী তাঁতের শাড়ী। সুলোচনার কি আহ্লাদ প্রকাশ-দার দেওয়া সেই মোটা শাড়ী পরিয়া! সতীশ-দার দেওয়া ভাল শাড়ী সে কদাচিৎ ব্যবহার করিত—কিন্তু মোটা তাঁতের শাড়ী দুখানা পরিয়া রোজ স্কুলে যাইত।

এক দিন সে প্রকাশ-দাকে সতীশের ব্যবহার সব খুলিয়া বলিল। প্রকাশ-দা বলিলেন—এখানে তোমাদের আর থাকা উচিত না। তোমার লেখাপড়া এখানে থাকলে কিছু হবে না, অন্য জায়গায় বাসা কর, খরচ যা হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।

সুলোচনার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতি কানাই ধরের গলিতে সস্ত্রীক বাসা করিয়া থাকিত। সুলোচনারা সেই বাসায় উঠিয়া আসিল—আসিবার সময় সুলোচনা প্রকাশ-দার দেওয়া মোটা শাড়ী পরিয়া, সতীশের দেওয়া দামী কাপড়-জামা সেখানেই রাখিয়া আসিল। সতীশ এই ব্যাপারে দিনকতক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রকাশ-দার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। মা মেয়েকে বলিল—কেন, সতীশকে অমন করে চটিয়ে দিলি? ওর মনে কষ্ট দেওয়া হ'ল না?

সুলোচনা বলিল—কষ্ট না পেলে মামার জ্ঞান হবে না মা। তা ছাড়া দেখছ না, আমাদের জন্যে ও সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছিল, ওর দেওয়া জিনিস আর নেব না।

তা সত্ত্বেও সতীশ ওদের নূতন বাসায় যাতায়াত করিত, জিনিসপত্রও দিতে ছাড়িত না। সুলোচনা বলিত—মামা, আবার কেন আসিস্? তুই বড় স্বার্থপর—স্বার্থের জন্যে সব করিস বলে আমার ভাল লাগে না। দেখ্ দিকি প্রকাশ-দা'কে?

এক দিন সতীশ বলিল—আচ্ছা, আমি কি করলে তুই খুশি হবি সুলোচনা? বল, আমি তাই করব।

সুলোচনা বলিল—তুই বিয়ে কর মামা। খুব খুশি হব তাহ'লে। আমায় যদি সন্তুষ্ট করবার তোর ইচ্ছে থাকে, খুব শীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেল্।

নতুন বাসায় প্রকাশ-দা কিন্তু বেশী আসিতেন না

এবং আসিতেন না বলিয়াই আমাদের বাসায় যেদিন প্রকাশ-দার আসিবার কথা থাকিত, সেদিন সুলোচনা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করিত।

এই সময় আলিপুর বোমার মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। কি করিয়া প্রকাশ-দা ইহার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন, সে-কথা সুলোচনার মা আমায় বলিতে পারে নাই। প্রকাশ-দা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত রহিলেন, সুলোচনা বড় ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিত বলিয়া তাহার মা এক দিন কলেজে খোঁজ করিতে গিয়া জানিল কলেজেও প্রকাশ-দা বহুদিন যাবৎ অনুপস্থিত।

ছ-মাস পরে প্রকাশ-দা হঠাৎ এক দিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা হাতে ওদের বাসায় হাজির। সুলোচনা তো খবর পাইয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাহিরের ঘরে আসিল। বলিল—কোথায় ছিলে প্রকাশ-দা এতদিন? চেহারা এমন হয়েছে কেন তোমার?

প্রকাশ-দা বলিলেন—সে কথা জিগ্যেস করিস নে সু। তা ছাড়া, এই শেষ। আমি স্বদেশীর আসামী, পুলিশ পেছনে ঘুরছে—আর আসতে হয়ত পারব না। যাবার সময় একটা কথা জিগ্যেস করে যাই, হয়ত আর দেখাই হবে না, সু, তুই আমায় কখনও ঘৃণা করবি নে বল্?

সুলোচনা বলিল—তোমাকে অনেক ভালবাসি প্রকাশ-দা। যদি স্বামী না থাকত, তবে তোমার আরও নিকটে আসতুম। পা ছুঁয়ে বলছি—তা না হলে তোমার এই বিপদের সময়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতুম—একলা যেতে দিতুম না—

বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুলোচনার মা আমায় বলিল—মেয়ে আমার কখনও কাঁদত না। এই অনেকদিন পরে কাঁদলে। যাবার সময় প্রকাশকে কড়ার করিয়ে নিলে বিপদ উদ্ধার হলেই আবার ফিরে এসে সকলের আগে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু প্রকাশ এই যে গেল, আর কখনও ফিরে আসে নি।

আমি বলিলাম—তার পর? আপনাদের কি হ'ল?

—তার পর প্রকাশ তো চলে গেল। শোনো সব কথা, বিশ্বাস করবে না হয়ত। এই কলকাতা শহরে সেই পোড়ারমুখী মেয়ের আগুনের মত রূপ নিয়ে সে কি কষ্ট, কি বিপদ, গিয়েছে আমাদের! দেখেছিলে তো তাকে?

দেখিয়াছিলাম বই কি। আজও এই প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অপরাহ্ণের মৃদু স্তিমিত রৌদ্রালোকে সুলোচনা সেই অপূর্ব্বসুন্দর কিশোরীমূর্ত্তি স্পষ্ট মনের চোখে ফুটিয়া উঠিল। তার সেই ডাগর ডাগর চোখ, ঘন কালোচুলের রাশি...কথার সেই ভঙ্গি... চমৎকার মুখের হাসি...সর্ব্বোপরি তার অনিন্দ্য মুখশ্রী...

তখন সুলোচনাকে বুঝি নাই, চিনি নাই—অভিজ্ঞতার অভাবের দরুণ সুলোচনাকে সে সময় চরিত্রহীনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া ভাবিয়াছি—শুধু আমি নই, আমার বন্ধুর বাসায় মেয়েরা সুলোচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্যই হৃদয়ঙ্গম করিত। আমিও বিশ্বাস করিতাম। মনে মনে পরলোক-বাসিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

সুলোচনার মা বলিল—মেয়ে রোজ কাঁদে প্রকাশ চলে যাওয়ার পরে। জানালা খুলে চেয়ে থাকে। সতীশকে দু-চোখে দেখতে পারে না। এদিকে যে-বাসায় আমরা ছিলাম, তারা ঠিকমত টাকা দিতে না পারাতে আমাদের রাখতে চাইলে না। কালীঘাটে আমরা উঠে গিয়ে ছোট্ট একটি খোলার ঘরে আশ্রয় নিলাম। এক দিন সেখানে এল কোথাকার রাজার ম্যানেজার—দশ হাজার টাকার লোভ দেখালে। মেয়ের গা সোনায় মুড়ে দেবে। মেয়ে বললে—মা চুলগুলো কেটে ফেলি, নয়ত আর পারি নে। আমি বাড়ী নেই, গুণ্ডার দল বাড়ী ঘিরে ফেলেছে, বললে বিশ্বাস করবে না—এই কালীঘাটে। ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যে। মেয়ে মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলেছে চুলে—আগুন জেলে মরবে। এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম—লোক ডাকাডাকি করলাম, গুণ্ডার দল পালাল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সতীশ-দা যেত না বাসায়?

—যেত, টাকা দিয়ে আসত আমার হাতে মেয়েকে লুকিয়ে। মেয়েও বড্ড নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে সতীশের সঙ্গে। একটা মুখের ভাল কথাও ইদানীং বলত না। ওর চিঠির আগে আগে এক-আধ খানার উত্তর দিত—শেষে তাও বন্ধ করে দিলে। আমায় বলত—না মা,

ওকে আসতে দিও না। ও যে সর্ব্বস্বান্ত হ'ল আমাদের দিয়ে। কুকুরের মত আমরা ওর টাকা খাচ্চি কেন? ও বিয়ে-থাওয়া করবে না আমাদের না ছাড়লে।

এই সময় পাড়ার এক সহৃদয় প্রৌঢ় ডাক্তার নিজে চেষ্টা করিয়া সুলোচনাকে মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ শিখিবার জন্ম ভর্ত্তি করিয়া দিলেন—পাস করিয়া প্রথমতঃ সেই ডাক্তারের ডাক্তারখানাতেই কাজ পায়। কিছুদিন সেখানে কাজ করিবার পরে এক দিন মাকে আসিয়া বলিল—মা, এ জগতে সব সমান। ওখানে আর আমার কাজ করা চলবে না। ছেড়ে দিয়ে এলুম।

মাস-দুই পরে ক্যাম্বেল হাসপাতালে কাজ জুটিল। তখন ওদের পটলডাঙায় বাসা। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রোজ রাত এগারোটার সময় মেয়েকে বাসায় আনে সঙ্গে করিয়া। তাহার মধ্যেও বহু বিপদ গেল। ক্যাম্বেলের নার্স সুলোচনার রূপের খ্যাতি তখন চারি দিকে ছড়াইয়াছে, ছাত্রমণ্ডলীর অনেকের বাসন্তী প্রেমের স্বপ্ন সে—কত প্রলোভন তাহাকে যে প্রতিদিন এড়াইয়া চলিতে হইত! গুণ্ডার হাতে পড়িতে পড়িতে কতদিন বাঁচিয়া গিয়াছে। এক দিন মাকে বলিল—প্রকাশ-দা ফিরে এসে এ-রকম দেখে খুশি হবে না। সে দেখে অসন্তুষ্ট হয় এমন কাজ কখনও করব না। তুমি আলাদা ছোট বাসা কর—আমি ক্যাম্বেলে নার্সদের হোস্টেলে যাই।

তাহাই হইল। হোস্টেলে দুজনের নাম দিয়ে যারা দেখা করিতে পারিবে—স্বামীর ও প্রকাশ-দার। আশা ছিল প্রকাশ-দা এক দিন হঠাৎ আসিয়া পড়িবেই।

সুলোচনার মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, কখনও এর পরে প্রকাশ-দার পত্রটত্র আসত না?

বুড়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কখনও না। মেয়ে প্রকাশ-দা বলতে অজ্ঞান। ভাবত, প্রকাশ আসবে ফিরে। আমায় কতদিন বলেছে এ-কথা। প্রকাশ দেখে খুশি হবে ব'লেই তো দমদমায় অতিথিশালা খোলা গেল ওর স্বামীকে নিয়ে এসে।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—অতিথিশালা! সে কি রকম?

—মেয়ের খেয়াল! এদিকে প্রকাশের নাম ক্যাম্বেলের হোস্টেলে লেখানো, ওদিকে দমদমার অতিথিশালা খোলা প্রকাশকে খুশি করবার জন্যে—প্রকাশ তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

—ওর স্বামীকে আনলেন বুঝি আবার?

—আমরা আনি নি বাবা। ক্যাম্বেলে এক জন রুগী এসেছিল সুলোচনার শ্বশুরবাড়ীর গাঁ থেকে। সে গিয়ে খবর দিলে। স্বামী এসে পড়ল, মাপ চাইলে—আমরাও জায়গা দিলাম এই ভেবে যে স্বামী ভিন্ন বাহিরে পদে পদে বিপদ। স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কেউ মিত্র নেই সবাই শত্রু। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। ওর স্বামীকে নিয়ে দমদমায় বাসা করা গেল। যে যায় সেই খায়, তাই নাম হ'ল অতিথিশালা।

আমার সঙ্গে এই সময়েই সুলোচনার দেখা হইয়াছিল। সে-কথাও আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম।

বৃদ্ধা বলিল—তোমার কথা বলেছিল এখন আমার মনে হচ্চে বাবা। তার পর ও চাকুরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস্ করতে লাগল। বেশ দু-পয়সা আয় হ'ল। দুটি ছেলে হ'ল। জামাইয়ের এক-কাঁড়ি দেনা ছিল দেশে, সব ও শোধ দিলে। সেই সময় এক দিন কে এসে বললে দমদমার বাসায়, প্রকাশ মারা গিয়েছে। শুনেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল—সেই থেকে হ'ল বুকের রোগ। তাতেই শেষে মারা গেল। খবরটা শোনার পর ছ-মাস বেঁচে ছিল।

দু-জনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধা অন্যমনস্কভাবে বলিল—সন্ন্যিসি হয়ে যাব বলে আপদ বিদেয় করবার জন্যে আট বছর বয়েসে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সে কোথায় চলে গিয়েছে আজ, আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে এখনও ভুগছি বন্ধনে। সে স্বামীকে ভাল করলে, তাকে মদ ছাড়ালে, মানুষ করলে—ক'রে মরে গেল। জামাইও মারা গিয়েছেন। এখন আমি যদি মরে যাই ছেলে দুটো নিরুপায়। কোথায় দাঁড়াবে? রাস্তা—গবর্ণমেণ্টের রাস্তা।

আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ইদানীং আমাদের বড় সুখ হয়েছিল। সে তুমি দেখ নি। খাট, পিকচার, বাসন,—সুলোচনা প্র্যাকটিসে বেশ রোজগার করত—টাকা জমিয়ে এ-সব করেছিল। শৌখীন ছিল খুব, সে

তুমিও তো দেখেছ। ময়লা কি কুশ্রী জিনিস দু-চোখে দেখতে পারত না। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল—জামাইয়ের হাতে অনেক টাকা পড়ল মেয়ে মারা যাওয়ার পরে। জামাই তেজারতী করতে গিয়ে হাওড়ায় জমি বন্ধক রেখে দু-হাজার টাকা ধার দিয়েছিল—তার পরে সেও তো মরে গেল। হ্যাণ্ডনোটখানা এখনও আছে, হ্যাঁ বাবা, তাতে কিছু হয়?

বুড়ীকে বলিলাম, চোদ্দ বছর পরে সে হ্যাণ্ডনোটে আর কিছু হইবে না। রাখিয়া ঘরের জঞ্জাল বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা তার নাই।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িল। বলিলাম—আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটা ছোকরাকে বেড়াতে দেখেছিলাম এক বার। সে কে জানেন?

বুড়ী বলিল—শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা তো? বছর বাইশ বয়েস? ও তো তার দেওর। পুঁণ্যর জ্যাঠতুত ভাই—দমদমার বাসায় থেকে পড়ত।

আমার কত দিনের ভুল ভাঙিয়া গেল। কি অবিচার করিয়াছি সুলোচনার প্রতি!

সুলোচনা যে-যুগে বাহিরে চলাফেরা করিত, সে-যুগে মেয়েদের অমন ভাব কেহ পছন্দ করিত না বলিয়াই তাহার নামে নানা কথা উঠিয়াছিল। সেই তরুণীর সচেতন অন্তরাত্মা যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহারই একনিষ্ঠ ধ্যানে সে দিনের পর দিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া মরিত আশার কুহকে…ক্যাম্বেলের সামনে দিয়া ট্রামে যাতায়াত করিবার সময় অভাগী সুলোচনার কথা আজকাল বড় মনে পড়ে।

বেদনার মোহ

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

তীর ছেড়ে কবে তরী অকূলে গিয়েছে ভেসে
সেদিন ভুলি নি আজো ভুলি নি,
যে মালা হঠাৎ ছিঁড়ে ধূলিতে পড়েছে লুটে
ধূলি হ'তে তারে আজো তুলি নি।
ধূলির মরমে মেশা বেদনে বেদন মাখা
আমার মালারে রাখি ধূলিতে,
সে ধূলি গোধূলি-রঙে রঙীন হয়েছে কবে
আমি পারি নাই তাহা ভুলিতে।

প্রভাতের যে আলোক পলকে হারাল জ্যোতি
সহসা মেঘের বুকে আঁধারে
ঘন সন্ধ্যায় সে যে মোর বেদনার বুকে
রঙের স্বপন-জালে বাঁধা রে।
মোর পূরণিমা-নভে শ্রাবণের মেঘ কবে
অশ্রু-বেদন দিল আনিয়া,
সে দিবস স্মৃতি-রসে জীবনের সুধা মম
হাসি-ক্রন্দনে রাখি ছানিয়া।

অকূলের বুকে ভাসি, দিশাহীন ঘুরি ফিরি
কূলের বেদনা তবু ভুলি নি,
আমি ধূলিমাখা মোর বুকের মালিকাগাছি
সুখের আশায় তবু তুলি নি।

১৯৩১ সালের সেন্সাসে ভুল

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আমাদের দেশে প্রথম ইংরেজী ১৮৭২ সালে মানুষ গণনা হয়। সেবার কিন্তু এক দিনে বা এক রাত্রিতে সব মানুষ গণনা করা হয় নাই। ১৮৭২ সালের সেন্সাস লওয়ার ফলে কর্ত্তৃপক্ষগণ যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তাহারই ফলে ইংরেজী ১৮৮১ সালে এক দিনে বা এক রাত্রিতে সমগ্র ভারতবর্ষের লোক গণনা করা হয়। তাহার পর প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর সেন্সাস লওয়া হইতেছে। গত ইংরেজী ১৯৩১ সালে মানুষ গণনা করা হইয়াছে এবং আগামী ইংরেজী ১৯৪১ সালে আবার মানুষ গণনা হইবে। এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা হইতেছে; দিল্লীতে সেন্সাস কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। বাংলায় ডাচ সাহেব সেন্সাস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। এইবার কি ভাবে, কি কি বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে বা করা হইবে না সে-সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। যেমন কথা উঠিয়াছে হিন্দুদের মধ্যে কে কি জাতি তাহার পরিচয় লওয়া হইবে না ইত্যাদি।

এখন আমরা গত ১৯৩১ সালের সেন্সাস সঠিক কিংবা ভুল সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। হিন্দুরা, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের হিন্দুরা, কংগ্রেসের কথায় গত ১৯৩১ সালের সেন্সাস বয়কট বা বর্জ্জন করেন। তথাপি বাংলার সেন্সাস সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব দাবি করেন যে—

"১৯২১ সালের সেন্সাস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্থির করেন যে সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে হাজারকরা এক জনের বেশী গণনায় ভুল হওয়া সম্ভব নহে; এবং পল্লী-অঞ্চলে ইহার অপেক্ষা আরও সঠিক গণনা হইয়াছে। এবারেও সাহসের সহিত তত দূর সঠিক হওয়ার দাবি করা যাইতে পারে।"—বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট, পৃ. ২

কিন্তু হাজার-করা এক জনের বেশী গণনায় ভুল হয় নাই—কর্ত্তৃপক্ষের এই দাবি কি ঠিক? বিশেষ করিয়া হিন্দুদের বেলায় এই দাবি কি খাটে?

প্রথমেই এই কলিকাতার কথা ধরা যাউক। কলিকাতার লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দুরা ইংরেজী ১৯০১ সালে শতকরা ৬৪·৮৫ ছিল, ইংরেজী ১৯১১ সালে বাড়িয়া শতকরা ৬৬·৪৭ হয় এবং ইংরেজী ১৯২১ সালে আরও বাড়িয়া ৬৯·৬১ হয়, কিন্তু ইংরেজী ১৯৩১ সালে কমিয়া ৬৮·৭১এ দাঁড়ায়। অপর পক্ষে মুসলমানদের অনুপাত কমিতেছিল কিন্তু ১৯৩১ সালে বাড়িয়া যায়। সেন্সাস-কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকার করেন যে সেন্সাসের রাত্রিতে কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানে শেষ বা চূড়ান্ত গণনা করা হয় নাই। যথা:—

৭ নং ওয়ার্ড, বড়বাজার—১৩২টি ব্লক্
৫ নং ওয়ার্ড, জোড়াবাগান—৪৫টি ব্লক্
২৯ নং ওয়ার্ড, মাণিকতলা—২২টি ব্লক্
৬ নং ওয়ার্ড, জোড়াসাঁকো—৩২টি ব্লক্
—কলিকাতার সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯৩১ সাল, পৃ. ১

এই শেষ গণনা না হওয়ার ফলে, এই কয়টি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা ইংরেজী ১৯২১ সালের তুলনায় ইংরেজী ১৯৩১ সালে খুব কমিয়া যায়। যথা—

	১৯২১	১৯৩১	কমি
৫ নং জোড়াবাগান	৫২,৫৭৩	৩৯,৩৫৫	= ১৩ হাজার
৬ নং জোড়াসাঁকো	৫৭,২১৬	৪৬,১১৬	= ১১ হাজার
৭নং বড়বাজার	৩২,৯৫৯	১৮,৬৯০	= ১৪ হাজার

অথচ ইংরেজী ১৮৮১ সাল হইতে বরাবর এই কয়টি ওয়ার্ডে লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছিল। হঠাৎ প্রায় শতকরা ৩৩ জন করিয়া কমিয়া যাইবার হেতু কি? কর্ত্তৃপক্ষ এই কমিয়া যাওয়ার সম্বন্ধে কোনও যুক্তি বা কারণ দেখাইতে পারেন নাই।

বাংলার সেন্সাস-রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠায় কর্তৃপক্ষগণ স্বীকার করিতেছেন যে, নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শেষ বা চূড়ান্ত গণনা, যাতায়াতের অসুবিধা হেতু কিংবা লিখন-পঠনক্ষম গণনাকারীর অভাবে করা যায় নাই।

স্থানের নাম	পরিমাণ	
বাঁকুড়া—রানিবাঁধ	৮৪·০	বর্গমাইল
মেদিনীপুর—ঝাড়গ্রাম	৯০·০	"
—নয়াগ্রাম	১·০	"
কলিকাতা	১·২	"
বাখরগঞ্জ	৭৩·৪	"
—পটুয়াখালি	৩৭·৬	"
—ভোলা	৩৫·৮	"
নোয়াখালি	১৬·২	"
—সন্দীপ	২·০	"
ঐ	১০·০	"
—ছাগলনাইয়া	১·৫	"
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম (সমস্ত জিলা)	৫,০৯৭·০	"
স্বাধীন ত্রিপুরা	১,৬৩৮·০	"
সিকিম	২,৮১৮·০	"
	৯,৯০৮·৩	"

তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে, কলিকাতায় বাসিন্দাদের বাধা দেওয়ার জন্য শেষ গণনা সঠিক্ করা যায় নাই।

সমগ্র ইংরেজ-শাসিত বাংলা দেশের পরিমাণ ৭৭,৫২১ বর্গমাইল—ইহার মধ্যে ৫,৪৫২ বর্গমাইলের, অর্থাৎ শতকরা ৭ ভাগের মধ্যে লোকগণনা যথাযথ ভাবে হয় নাই। তথাপি তাঁহারা দাবি করিতেছেন যে গত ১৯২১ সালের ন্যায় এবারেও (অর্থাৎ ১৯৩১ সালে) মানুষ গণনা ঠিক্ হইয়াছে। ইহা সরকারী জিদ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

এইবার আমরা সেন্সাস-কর্তৃপক্ষগণের প্রকাশিত ১৯৩১ সালের সেন্সাস-রিপোর্টের অঙ্ক হইতে দেখাইব যে তাঁহাদের দাবির সত্যতা সম্বন্ধে লোকের মনে ঘোরতর সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আর প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক পরোক্ষে হিন্দুদের খাটো করিবার চেষ্টা আছে। বিভিন্ন রকমের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দিলাম।

(১) বাংলা দেশের ১৯৩১ সালের সেন্সাস-রিপোর্টের ২২০ পৃষ্ঠায় বিশিষ্ট বয়সের হিন্দু, মুসলমান ও সকল ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা স্ত্রী-পুরুষভেদে দেওয়া আছে; এবং ঐ সব সংখ্যার সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া মন্তব্য প্রকাশও করা হইয়াছে। নিম্নে আমরা সেন্সাস-রিপোর্টের কোষ্ঠাটির যে-অংশটুকু দরকার তাহা তুলিয়া দিলাম ও সেন্সাস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মন্তব্যের অনুবাদ চুম্বক করিয়া দিলাম এবং ঐ মন্তব্য যেখানে যেখানে ভুল তাহার নীচে রেখা টানিয়া পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য আমাদের বক্তব্য ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখিলাম।

VI-১১ নং কোষ্ঠা

বিশিষ্ট বয়সের পুরুষ ও নারীর সংখ্যা; সকল ধর্ম; হিন্দু ও মুসলমান, ১৯৩১

বিশিষ্ট বয়স	সকল ধর্ম		মুসলমান		হিন্দু	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
১৫—২৫	* †	৫২,৭৭,৫০৪	†	২২,২৮,৪৭৮	†	২৯,৪৫,৮৯২
২০—৩০	৪৮,৬৩,৬৫৩	৪৮,৪৪,৭৪৬	২২,২১,১৬৩	২১,২০,৫৫৮	২৫,৪৫,৪৮৬	২৬,২৭,২৮৫
২৫—৩৫	৪৬,১০,০২৭	†	২১,২০,৯০৭	†	২৩,৯৪,০৯১	†
১৭—২৩	†	৩৬,০০,৬৩৪	†	১৫,২৫,০০৪	†	
২৪—৩০	৩৫,১১,৯৯১	†	১৬,০৪,৭৯৪	†	১৮,৩৬,১২১	

'*' এই চিহ্নিত স্থানের সংখ্যাগুলি অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করা হইল না।

"বয়স হিসাবে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা ও বিভাগ সেন্সাসের তালিকা হইতে চুম্বক করিয়া VI-১১ নং কোঠায় দেখান হইয়াছে। মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন যে বরের বয়সের কাছাকাছি কনে পাওয়া যায় না বলিয়া তাহা নহে। বস্তুতঃ পক্ষে বাংলায় যে-সব বাপ-মায়ের মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে তাঁহারা পাত্র পান না—ইহাই হইতেছে সাধারণ অভিজ্ঞতা। কোঠার সংখ্যা বিচার করিলেও এই মনে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ সকল ধর্ম্মের লোকের মধ্যে ২০-৩০ বৎসর বয়সের পুরুষের সংখ্যা তদপেক্ষা ৫ বৎসর কম বয়সের নারীদের সংখ্যার চেয়ে কম। তদ্রূপ ২৫-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষের সংখ্যা ১৫-২৫ বৎসরের বা ২০-৩০ বৎসর বয়সের মেয়েদের সংখ্যার চেয়ে কম। মুসলমানদের মধ্যে ১৫-২৫ বৎসর বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ২০-৩০ কিংবা ২৫-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষদের অপেক্ষা বেশী। এবং ২০-৩০ বৎসর বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ২৫-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষের সংখ্যার খুব কাছাকাছি। [এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ভুল; মুসলমানদের মধ্যে ২০-৩০ বৎসর বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ২৬ লক্ষ ২১ হাজার এবং ২৫-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষদের সংখ্যা ২৩ লক্ষ ৯৪ হাজার। আর আমরা এই সংখ্যা পাইতেছি সেন্সাসের Tables হইতে]

হিন্দুদের মধ্যেও ১৫-২৫ বৎসর বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ২০-৩০ বৎসর বয়সের বা ২৫-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা ঢের ঢের বেশী। এই সমাজে বর-কনের মধ্যে গড়ে ৫ বছরের তফাৎ থাকিলেও ২৫-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষদের পক্ষে ২০-৩০ বৎসর বয়সের যথেষ্ট মেয়ে পাওয়া যায়। [কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে হিন্দুদের মধ্যে ১৫-২৫ বৎসর বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ২০-৩০ বৎসর বয়সের পুরুষদের অপেক্ষা ঢের ঢের বেশী নহে; হাজারকরা ৩ জন মাত্র বেশী; এবং ২৫-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষদের অপেক্ষা হাজারকরা ৪৮ জন বেশী। আর গড়ে বর-ক'নের মধ্যে ৫ বছরের তফাৎ ধরিলে দেখা যায় ২৫-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষের সংখ্যা ২১,২০,৯০৭ অপেক্ষা ২০-৩০ বৎসর বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ২১,২০,৫৫৮ জন কম।]

* * *

* * *

বর্ত্তমানে লোকের বয়স-বিভাগ এমনিই যে সমগ্র লোক-সংখ্যা ধরিলে ১৭-২৩ বৎসর বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ২৪-৩০ বৎসর বয়সের পুরুষদের চেয়ে বেশী। এই বয়স-বিভাগ ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা বৎসামান্য কম; কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বেশী। [প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহার ঠিক উল্টা] এ-কথা নির্ভয়ে বলা চলে যে ১৫ বৎসরের উপর বয়সের মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশী হইবে—যদি তাহাদের অল্পবয়সে সন্তান-প্রসব করিতে না হয়, এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা গড়ে ৫ বৎসর বাদে যদি তাহাদের বিবাহ হয়। যদ্যপি স্ত্রী-পুরুষের উভয়ের বিবাহের বয়স গড়ে ৫ বৎসর বাড়াইয়া দিলে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ে, তাহা হইলে এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও ৫ বৎসরের পার্থক্যে গড়ে ৩০ বৎসরের বর অপেক্ষা গড়ে ২৫ বৎসরের কনের সংখ্যা কম হইবে। এইরূপ মুসলমানদের মধ্যে গড়ে সাড়ে উনিশ বৎসরের মেয়েদের তাহাদের অপেক্ষা ৭ বৎসরের বড় পুরুষদের তুলনায় যে সংখ্যা লুপ্ত দেখা যায় তাহা লোপ পাইবে।"

[প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কোন সংখ্যাল্পতা নাই; বরং গড়ে ২৬½ বৎসরের ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার পুরুষের তুলনায় ১৯½ বৎসরের মেয়ের সংখ্যা ২০ লক্ষ ৭ হাজার, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৭১ হাজার বা শতকরা ৯ জন করিয়া বেশী।]

এইরূপ ভ্রমের কারণ একটু চিন্তা করিলেই সহজে ধরা পড়ে। উপরে উদ্ধৃত VI-১১ নং কোঠায় হিন্দুর স্থলে মুসলমানের সংখ্যা ও মুসলমানের স্থলে হিন্দুর সংখ্যা বসাইয়া এই ভ্রমের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভ্রমের কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, সেন্সাসের সময় অনেক কর্ম্মচারী ঠিকা ভাবে লওয়া হয়। যাহাতে ঠিকা কর্ম্মচারীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হয় তজ্জন্য নিম্নতম যোগ্যতার (minimum qualifications) এর পরিমাণ খুব কমাইয়া দেওয়া হয়। ফলে এরূপ গণ্ডমূর্খ লোক লওয়া হইয়াছিল যে, যে-কোন কারণে কোন সংখ্যার এক বার ওলট-পালট হইয়া গেলে তাহা যে ভুল হইয়াছে তাহা ধরিবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কাহারও রহিল না। নচেৎ সেন্সাসের Imperial Table VII-এর ৩৬ পৃ. খুলিয়া দেখিলেই এই ভুলটি ধরা পড়িত। আরও একটি আশ্চর্য্য কথা—বাংলা দেশে হিন্দুরা শতকরা ৪৪ জন, আর আর মুসলমানেরা শতকরা ৫৫ জন। সাধারণতঃ যে-কোন বিশিষ্ট বয়স-বিভাগ ধরিয়া বিচার করি না

কেন মুসলমানের সংখ্যা, হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সেন্সাস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও এ কথা জানেন। তথাপি VI-১১ নং কোষ্ঠায় বিশিষ্ট বয়স-বিভাগের মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের অপেক্ষা কম—সামান্য কম নহে! ৩৪ লক্ষ কম!! এই সামান্য জিনিসটিও কর্তাদের চোখে পড়িল না। ভ্রমপূর্ণ কোষ্ঠাটি ছাপা হইল—তাহার উপর আবার মন্তব্য!!!

কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে ইহা ইচ্ছাকৃত। আবার কেহ কেহ বলেন যে সেন্সাস-রিপোর্টের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বিভিন্ন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের দিয়া প্রথমে লিখান হয়, সেন্সাস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহা দেখিয়া দেন। তৎপরে ছাপান হয়। এই অংশটি কোন মুসলমান ডেপুটির (যিনি মুসলমানদের প্রাপ্য হিস্যা অনুসারে, যোগ্যতা হিসাবে নহে, চাকুরী পাইয়াছিলেন) লেখা। এক জন ডেপুটি যে এই রকম ভুল করিতে পারে ইহা ভাল করিয়া না তলাইয়া সেন্সাস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উহা মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন। ফলে এই ভুলশুদ্ধ ভ্রমপূর্ণ মন্তব্য ছাপা হইয়াছে।

সেন্সাস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এই ভ্রমপূর্ণ উক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা জনে নানা প্রকার সন্দেহ করে। "মুসলমানেরা নারী হরণ অত্যধিক মাত্রায় করিয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা কম, সেই জন্য বাধ্য হইয়া মুসলমানেরা নারী হরণ করিয়া থাকে," এইরূপ কুযুক্তি মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। তাহারই পোষকতার জন্য এই ভুল। আবার কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে ১৯৩১ সালের সেন্সাসের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (Executive Councillor) স্যর আল্‌হজ্ আব্দুল করিম গজনবী সাহেবকে খুশী করিবার অভিপ্রায়ে সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এইরূপ ভ্রমপূর্ণ উক্তি ও মন্তব্য করিয়াছেন।

(২) ইংরেজী ১৯৩১ সালের বাংলার সেন্সাস রিপোর্টের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় IX—১৪ নং কোষ্ঠায় ২৪ বৎসরের অধিক বয়স্ক হিন্দু পুরুষ, যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনুপাত হাজারকরা ১৩১ জন বলিয়া দেখান হইয়াছে। ঐ পাতায় ২৪ বৎসর অধিক বয়স্ক হিন্দু পুরুষের সংখ্যা ৫৪,৩৩,৯৬৪ জন বলিয়া দেখান হইয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ৭,৩০,৯৬৭ জন বলিয়া দেখান হইয়াছে। উক্ত দুইটি সংখ্যা হইতে অনুপাত করিয়া আমরা পাই যে হিন্দুদের মধ্যে প্রাথমিকশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অনুপাত হাজারকরা ১৩৪'৩ জন—১৩১ জন নহে।

হিন্দুর বেলায় ভুল করিয়া শিক্ষিতদের অনুপাত কম করিয়া দেখান হইল কেন? ইহা কি কেবলমাত্র ছাপার ভুল, না আর কিছু?

যে-সময়ে সেন্সাস লওয়া হয় ও সেন্সাস-রিপোর্ট লেখা ও ছাপা হয় সেই সময়ে বিলাতে ১।২।৩ নং গোলটেবিল বৈঠক চলিতেছিল, লোদিয়ান কমিটি কাহাকে কাহাকে ভোটাধিকার দেওয়া হইবে সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলেন! একটা কথা উঠে যে, যাহারা সাবালক বা ২৫ বছর বয়সের উপর এবং প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া হইবে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুপাতের ভুলের সহিত ইহার কি কোন সম্বন্ধ নাই?

হিন্দুকে খাটো করিবার ও মুসলমানকে বড় করিবার এই একমাত্র উদাহরণ নহে। ১৯২ পৃষ্ঠায় প্রতি হাজার পুরুষের মৃত্যু-অনুসারে নারীর মৃত্যু দেখান হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে নারী-মৃত্যু হাজারে ৯০৩, হিন্দুদের মধ্যে হাজারে ৯১৮। কিন্তু ১৯৩ পৃষ্ঠায় আবার মুসলমানদের মধ্যে নারী-মৃত্যুর হার কমাইয়া ৯০৩ স্থলে ৯০১ বলিয়া দেখান হইয়াছে আর হিন্দুদের মধ্যে নারী-মৃত্যুর হার ৯১৮ স্থলে ৯২০ বলিয়া বাড়াইয়া দেখান হইয়াছে।

(৩) মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে ও কিছু কিছু শিক্ষাবিস্তারও হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের ১৯৩১ সালের সেন্সাসে যে শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে তাহা ভুল বলিয়া আমাদের মনে সন্দেহ হয়।

ইংরেজী ১৯২১ সালের সেন্সাস-অনুসারে লিখন-পঠনক্ষম সর্ব্ব-বয়সের মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৫৯,৩৭৭ এবং যাহারা ২০ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক তাঁহাদের

সংখ্যা ছিল ২৮,৬৭১। ইংরেজী ১৯৩১ সালে সর্ব্ব-বয়সের লিখনপঠনক্ষম মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৯,৪৭৯ এবং যাহারা ২০-র উপর তাঁহাদের সংখ্যা হয় ৯৫,৬৮২। "সাবালিকা" অর্থাৎ ২০-র উপর বয়সের মুসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে হঠাৎ এরূপ শিক্ষাবিস্তৃতির কারণ কি?

১৯২১ সালে সর্ব্ব-বয়সের লিখনপঠনক্ষম যাহারা ছিলেন তাঁহাদের সকলকারই বয়স ১০-এর উপর বলিয়া যদি ধরিয়া লই এবং তাঁহাদের মধ্যে ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত কেহই যদি মারা না গিয়া থাকেন ধরিয়া লই, তাহা হইলেও ঊর্দ্ধসংখ্যা ২০-র উপর লিখনপঠনক্ষম মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩,৩৭৯। কিন্তু সেন্সাসে পাইতেছি—৯৫,৬৮২। বাকী ৭২ হাজার আসিল কোথা হইতে?

এক কথা হইতে পারে, মুসলমান "সাবালিকা" স্ত্রীরা যাহারা পূর্ব্বে নিরক্ষরা ছিলেন গত দশ বৎসরে নিজেরা বাড়ীতে পড়িয়া লিখনপঠনক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু সেন্সাস রিপোর্টেই পাই যে "বিবাহের পর মুসলমান স্ত্রীলোকেরা শিক্ষার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন না" (৩৩৫ পৃ. দ্রষ্টব্য)। তাহা ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে পর্দ্দার প্রচলন আছে এবং সকলেই অল্প বয়সেই—হিন্দুদের অপেক্ষাও অল্প বয়সে বিবাহিতা হন এবং বিবাহের পর স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা কহা তাঁহাদের পক্ষে গুরুতর দোষের। সুতরাং তাঁহারা বাড়ীতে পড়িয়া যে লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর প্রকৃতই এরূপ হইলে মুসলমান-সমাজের সামাজিক জীবনের এইরূপ গুরু পরিবর্ত্তনের বিষয় মুসলমান কাগজওয়ালারা ও নেতারা কেহ না কেহ বলিতেন।

আসল কথা হইতেছে, সেন্সাস ভুল। গণনা করিয়া যাহা তাহা করিয়া লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা, বিশেষ করিয়া এইরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা, বাড়াইয়া দিয়াছে। পুরুষের বেলায় বাড়াইবার সেরূপ সুযোগ ঘটে না। তিনু সেখ নিরক্ষর—তিনুকে লিখনপঠনক্ষম বলিয়া লিখিলে ভুল ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনুর পরিবার বীণাপাণি নেচ্ছা-বিবি পর্দ্দানশীন, তাঁহাকে লিখন-পঠনক্ষম বলিয়া লিখিলে কেহ ধরিতে পারিবে না। এই রকম যে হইয়াছে তাহার একটি উদাহরণ দিই। জেলা ২৪ পরগণার জয়নগর থানায় মুসলমান পুরুষের সংখ্যা ২২,৮৫৮, আর ইহাদের মধ্যে ৩,৮৫৬ জন লিখন-পঠনক্ষম অর্থাৎ শতকরা ১৬·৮ জন লিখন-পঠনক্ষম। ঐ থানায় মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২১,৮০৫ আর তাঁহাদের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র ৪১১ জন অর্থাৎ শতকরা ১·৯ জন। ঐ থানার অন্তর্গত জয়নগর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ৪৫৭ জন মুসলমান পুরুষের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম পুরুষ পাই ৭৬ জন, অর্থাৎ শতকরা ১৬·৬ জন প্রায় থানার মুসলমান শিক্ষিতের অনুপাতের সমান। কিন্তু ৩৭৫ জন মুসলমান স্ত্রীলোকের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৭৮ জন (পুরুষদের চেয়ে কিছু বেশী) আর অনুপাত হিসাবে শতকরা ২০·৮ জন। থানার অনুপাত শতকরা ১·৯-এর চেয়ে ১০।১২ গুণ ত বেশী বটেই, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পুরুষদের চেয়ে শতকরা ৪ বেশী!! যাঁহারা জয়নগরের অধিবাসী তাঁহারা খবর শুনিয়া অবাক! আমরাও অবাক! স্থানীয় মুসলমান পুরুষেরাও আরও অবাক!!

(৪) ব্রাহ্মদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই। ব্রাহ্মরা সকলেই শিক্ষিত। বেশীর ভাগ লোক শহর-অঞ্চলে বাস করেন—তাঁহাদের মধ্যে যে ভ্রমেও কেহ বাল্য-বিবাহ দিতে পারেন ইহা আমাদের কাহারও জানা ছিল না। বাল্য-বিবাহ দেওয়া তাঁহাদের একরূপ ধর্ম্মমতবিরুদ্ধ। কিন্তু সেন্সাস-রিপোর্টে বিবাহিত ব্রাহ্ম-পুরুষ ও ব্রাহ্ম-স্ত্রীদের বয়স-বিভাগের কোঠায় পাই—

	বয়স বিভাগ		
	০-৬	৭-১৩	১৪-১৬
পুরুষ	"	৭	১১
স্ত্রী	১	৭	১২

বাংলা দেশে বিবাহিতা ব্রাহ্ম-স্ত্রীর সংখ্যা ৩৮১। ইহাদের মধ্যে ৮ জন অর্থাৎ শতকরা ২·১ জন চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহিতা। ইহার পরেও যদি সেন্সাস রিপোর্ট অভ্রান্ত বলিতে চাহেন তো বলুন।

কলিকাতা শহরের ব্রাহ্মদেরও মধ্যে বাল্য-বিবাহ আছে (কলিকাতার সেন্সাস রিপোর্ট ১২৯ পৃ.) যথা—

বয়স	বিবাহিত পুরুষ	স্ত্রী
৫-১০	২	১
১০-১৫	৫	২

আর বালক ব্রাহ্মরা তাহাদের অপেক্ষা অধিকবয়স্ক স্ত্রীদের বিবাহ করে !!

(৫) লোক-গণনাকারীরা যেমন স্ত্রীলোক লিখনপঠনক্ষম কিনা যা-তা করিয়া লিখিলে তাহার ভুল ধরা শক্ত, তেমনি কোন বাড়ীতে শিশু জন্মিয়াছে বলিয়া শিশুর সংখ্যা বাড়াইয়া দিলে তাহাও ধরা শক্ত। প্রথমে Preliminary প্রাথমিক সেন্সাস হয়—প্রাথমিক সেন্সাসের পর যাহারা সেন্সাসের রাত্রি অবধি জন্মগ্রহণ করে তাহারা শেষ সেন্সাসের তালিকায় স্থান পায়। এই ভুল সহজে ধরা পড়ে না। ইসমাইলের বাপ প্রাথমিক সেন্সাসের পর মারা গেল—তাহার মৃত্যুর কথা অনেকেই জানিতে সক্ষম। কিন্তু ইসমাইলের "শেষ পক্ষের নিকার কবিলার সন্তান" হইল কিনা বলা সুকঠিন। অনেক স্থলে, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ শিশুর সংখ্যা গত ১৯৩১ সালের সেন্সাসে বাড়ান হইয়াছে। প্রমাণ দিতেছি—

গত তিনটি সেন্সাসে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান শিশু অর্থাৎ যাহাদের বয়স ০—১ বৎসর তাহাদের সংখ্যা নিম্নে দিলাম।

শিশুর বয়স ০-১ বৎসর

সেন্সাসের বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৯১১	৬,৩৮,৯১২	৭,৪৮,২২৩
১৯২১	৫,৯৭,৯৮১	৭,৬৯,০৬৮
১৯৩১	৬,৯৪,০৯৫	৯,৬৭,৫৬৩

দেখা যায়, প্রত্যেক সেন্সাসেই মুসলমান শিশুর সংখ্যা হিন্দু শিশুর সংখ্যাপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ বাংলা দেশের লোকের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। আর মুসলমানদের মধ্যে শিশু ও নাবালকের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা বেশী। সেজন্য আমরা নিম্নে শতকরা হিসাবে পরস্পরের সংখ্যা, ও শিশুর সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখাইতেছি।

সেন্সাসের বৎসর	প্রতি ১০০ হিন্দুতে মুসলমানের সংখ্যা কেবল শিশু	মোট লোকসংখ্যা	আপেক্ষিক শিশু বৃদ্ধি
১৯১১	১২২.৭	১১৫.৯	৬.৮
১৯২১	১২৮.৭	১২২.৫	৬.১
১৯৩১	১৩৯.৩	১২৫.২	১৪.১

হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা ১১৫.৯ হইতে বাড়িয়া ১২৫.২এ দাঁড়াইয়াছে। সে-হিসাবে শিশুর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বড় জোর ১২২.৭+(১২৫.২—১১৫.৯)= ১৩২.০ হয়। কিন্তু অনুপাত দাঁড়াইয়াছে ১৩৯.৩। ইংরেজী ১৯২১ সালের সেন্সাস সঠিক বলিয়া ধরিলে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান বাড়িয়াছে ১২৫.২—১২২.৫=২.৭। সে-হিসাবে শিশুর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বড় জোর ১২৮.৭+২.৭= ১৩১.৪ হয়। কিন্তু অনুপাত দাঁড়াইয়াছে ১৩৯.৩।

হিন্দুর তুলনায় মুসলমান ১৯১১ সালে বেশী ছিল এবং ১৯২১ সালেও বেশী ছিল। শুধু বেশী ছিল তাহা নহে, আপেক্ষিক বৃদ্ধিও হইয়াছিল। তথাপি আপেক্ষিক শিশু-বৃদ্ধির পরিমাপ ছিল ৬.৮ বা ৬.১। আর এবার হঠাৎ বাড়িয়া দাঁড়াইল ১৪.১, একেবারে ডবলের উপর।

ইহার একমাত্র কারণ মুসলমান শিশুর সংখ্যা যা তা করিয়া বাড়ান ও সেন্সাসে ভুল সংখ্যা দেখান।

(৬) বাংলার ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ২য় খণ্ডের ১৮ পাতায় ৮ নং Tableএ কয়েকটি জাতির বয়স স্ত্রী-পুরুষের হিসাব ও বিবাহিত অবস্থার পরিচয় দেওয়া আছে। ইহা হইতে কয়েকটি জাতির বিবাহিত স্ত্রী ও বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা নিম্নে দিলাম:—

	ব্রাহ্মণ	কায়স্থ	বৈদ্য	ব্রাহ্ম
বিবাহিত স্বামী	৩,৬৩,০৬৯	৩,৬২,৭৮৫	২৩,৫৭১	৫৮৯
" স্ত্রী	৩,০৭,৫২১	৩,৩৫,৮৬৩	২২,১১৫	৩৮১
বাড়তি বিবাহিত স্বামীর সংখ্যা	৫৫,৫৪৮	২৬,৯২২	১,৪৫৬	২০৮
বাড়তির শতকরা হিসাব	১৮.৬	৮.০	৬.৬	৫৪.৬

স্ত্রী নাই অথচ বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা বেশী দেখা যাইতেছে। ইহার তিনটি কারণ থাকিতে পারে—

প্রথম, অন্য দেশ হইতে এমন সব বিবাহিত পুরুষের আমদানী যাহারা তাঁহাদের স্ত্রীকে স্বদেশে রাখিয়া আসিয়াছেন; দ্বিতীয়, এক স্ত্রীর একাধিক পতি থাকা; তৃতীয়, সেন্সাসের গণনার ভুল। প্রথম কারণ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের বেলায় আংশিক ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু বৈদ্য বা ব্রাহ্মদের বেলায় উহা খাটে না। ব্রাহ্ম পুরুষেরা সকলেই শিক্ষিত—তাঁহারা বরং স্ত্রীকে বাংলা দেশে রাখিয়া বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া থাকেন। স্ত্রীর সংখ্যা স্বামীর সংখ্যার চেয়ে বেশী হইবে আশা করা যায়—কিন্তু সেন্সাসে ইহার ঠিক উল্টা। দ্বিতীয় কারণ, একেবারেই অসম্ভব—বাংলা দেশের হিন্দুরা তিব্বতের লামা নহে। কাজে-কাজেই সেন্সাসের ভুল ছাড়া অন্য কারণ হইতে পারে না।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি অন্য প্রদেশে থাকিতে পারে, কিন্তু বাংলার বাহিরে মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, যুগী বা জেলে কৈবর্ত্ত নাই। তাহাদের বেলায়ও বিবাহিত স্বামীর সংখ্যা বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। নিম্নে সেন্সাস রিপোর্ট হইতে তাহাদের সংখ্যা দেওয়া গেল।

বিবাহিত	মাহিষ্য	নমঃশূদ্র	যুগী	জেলে কৈবর্ত্ত
স্বামী	৫,৭০,০৯০	৫,০৬,০৬০	৯৪,৪৫৪	৮৮,৩৩৪
স্ত্রী	৫,৬৩,২৭৯	৪,৯৮,৬৮৩	৯২,৫৫১	৮৩,০৭০
বাড়তি স্বামী	৬,৮১১	৭,৩৭৭	১,৯০৩	৫,২৬৪

(৭) ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা কিশোরগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ শহরে মহকুমা আদালত, হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটি, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, হেডমাস্টার প্রভৃতি সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও ইংরেজী জানেন। তথাপি ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে ৩০৮-৩১১ পৃষ্ঠায় দেখান হইল যে কিশোরগঞ্জ শহরে ইংরেজি-লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তি নাই। কথাটি যদি সত্য হয় (!), তাহা হইলে তথাকার স্থানীয় সেন্সাস-রিপোর্টটি কে লিখিল?

ইহার পরেও ১৯৩১ সালের বাংলা দেশের সেন্সাস-গণনা সঠিক হইয়াছে বলা কোন স্থিরমতি লোকের পক্ষে সম্ভব নহে।

আশা করা যায় আগামী সেন্সাসের সময় বাঙালী হিন্দুরা কংগ্রেসের প্ররোচনায় ভুলিয়া সেন্সাস বয়কট করিবেন না। আর কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে নির্ভুল সেন্সাস হয় তাহার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিবেন। এ-বিষয়ে মুসলমান নেতাদের নিকট কিছু বক্তব্য আছে। শিক্ষিতের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কম, অথচ সেন্সাসে লেখান হইল বা দেখান হইল শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী—ইহাতে হিন্দুদের উপর টেক্কা দেওয়া চলে বটে, কিন্তু মুসলমান সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। বরং ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অকল্যাণই হয়। সেন্সাস যাহাতে দেশের অবস্থার সত্য পরিচায়ক হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।



দিল্লী এক্সপ্রেস

এলাহাবাদ—সিরাথু—কানপুর—দিল্লী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গাড়ির ঝাঁকানি ও বসিবার আলস্যে চক্ষু আপনিই বুজিয়া আসে, এবং বড় জংশনে যাত্রীর কোলাহলে সে-তন্দ্রাটুকু নিমেষে ভাঙিয়া যায়।

প্রবল কণ্ঠের 'দেড়া'-'দেড়া' চীৎকারধ্বনিতে চক্ষু চাহিলাম। প্রকাণ্ড একটি দল। প্রকাণ্ড বলিয়াই অবাঞ্ছিত। সর্ব্ববয়সের এবং হয়ত বা বাংলা দেশের সর্ব্বজাতির সমন্বয় ইহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। মহিলার সংখ্যাই বেশী এবং বিধবারাই তাঁহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। মাত্র দুই-তিন জন পুরুষ জন-কুড়ি মহিলা ও শিশু সমভিব্যাহারে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। প্রয়াগ সর্ব্বতীর্থের প্রবেশদ্বারস্বরূপ; এখানে মাথা মুড়াইয়া যত কিছু পাপ-তাপের বোঝা ত্রিবেণীর তীরে বিসর্জ্জন দিয়া তবে নাকি তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিতে হয়। মুণ্ডিত-মস্তক বিধবাদের দেখিয়া সে-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

'দেড়া'-'দেড়া' কর্ণভেদী রবের প্রত্যুত্তরে দলস্থ এক জন শীর্ণকায় ব্যক্তি এক মুঠা গোলাপী রঙের টিকেট পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্লেষভরা কণ্ঠে কহিলেন—এই দেখুন সেটুকু জ্ঞান আমাদের আছে। এক টুকরো কাষ্ঠবৎ গদির জন্য যে এত চেঁচামেচি করতে হয়, তা জানলে লাল টিকেট না-কিনে হলদে টিকিটই কিনতাম!

তাঁহারা তীর্থ করিতেই আসিয়াছেন, সুতরাং সব রকম কষ্টকে বরণ করিবার দুঃসাহস তাঁহাদের ছিল। অধিকাংশই মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন।

একটি রোরুদ্যমানা বিধবাকে ঘিরিয়া কতকগুলি বিধবা সান্ত্বনার কথা বলিতেছিলেন—কেঁদে আর কি করবে দিদি, সময় থাকলে আমরাই কি ফেলে আসতে পারতুম!

এক জন রমণী বলিলেন—আর হাসপাতালের ব্যবস্থা ভালই। ধর না কেন, চার দিন রইলুম—মন্দ যদি হ'ত ওরই মধ্যে—ষাট্, ষাট্!

রোরুদ্যমানা রমণী আকুল স্বরে বলিলেন—কিন্তু ও যদি না বাঁচে?

—সে ভগমানের হাত। বরাতে যার মিত্যু নেই তাকে কেউ মারতে পারে না, মা। হরিবোল—হরিবোল। একটি স্থূলাঙ্গী বিধবা মালা ফিরাইতে ফিরাইতে এই উক্তি করিলেন।

—তা ছাড়া পুরুষমানুষ, টাকা জমা রইল, টিকিট রইল তার কাছে, পৈরাগ থেকে কলকাতায় ফিরে যেতে কতক্ষণ! হাঁগা, মেজঠাকুরপো—পৈরাগ থেকে কলকাতা যেতে কতক্ষণ লাগে গা?

শীর্ণকায় পুরুষটি সহাস্যে বলিলেন—কতক্ষণ বা! আজ সন্ধ্যায় উঠব—পৌঁছব কাল বেলা দশটায়। রাঙা-বৌ অত ভাবে কেন? টাল যখন সামলেছেন তখন কোন ভয় নেই।

রোরুদ্যমানা বিধবাটি ঘোমটার আড়াল হইতে মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন—আর দুই-এক দিন থেকে গেলে কি হ'ত না, বাবা?

—অসম্ভব। সময় থাকলে কি আমরা এমনি পিশাচ যে ওঁকে ফেলে চলে যাই! এ তো যে-সে তীর্থ নয়—কেদার-বদরী। বছরে মাত্র দুটি মাস যাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজী দর্শন ক'রে দিল্লী হয়ে যাব হরিদ্বার। সেখানে বাস করতে হবে তে-রাত্তির। তা হ'লেই ধর না কেন জষ্টির তেসরা-চৌঠা ছাড়া যাত্রা করাই হবে না। আর দেরি করলে পৌঁছতে পারব কেন, বাবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে যে। জয় বাবা বদরীনারায়ণ!

যাত্রিবৃন্দ সকলেই সেই জয়ধ্বনিতে যোগ দিলেন। শীর্ণকায় লোকটিকে পাশে ডাকিয়া বসাইলাম—আসুন, বসুন।

তিনি পাশে বসিয়া হাসি দ্বারা আমাকে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন—আপনিও কি বদরী-নারায়ণ—

—আজ্ঞে না—দিল্লী। অর্থাৎ কর্ম্মস্থলে।

—বটে, বটে। তা বেশ। কত দিন আছেন ওখানে? দশ বছর? তাহ'লে নিশ্চয়ই জানেন ওখানে থাকবার সুবিধা কোথায়? হাঁ, আপাততঃ নামব হাথরাসে। নেমে মথুরা-বৃন্দাবন দেখে—

জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার সঙ্গী বাবুর কি হয়েছে?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—আর বলেন কেন মশাই, ওর নাম তিনু মণ্ডল। ভয়ানক পেটুক লোক মশাই। পথে যা দেখবে তাই কিনবে। হাজার বার পই পই ক'রে বললাম—খাস নে অত চীনেবাদাম, খাস নে গোগ্রাসে অত পুরি-ছোলাভাজা! কলেরা অমনি হয়? যেমন প্রয়াগে নামা—

—বলেন কি—কলেরা? তা ফেলে এলেন?

—কি করব—বেরিয়েছি বাবা বদরীনারায়ণের নাম ক'রে। এবার অকাল নেই, পয়সা পেলাম কিছু,—বলি তীর্থেই ঘুরে আসি। জষ্ঠি মাসের প্রথম সপ্তাহে হরিদ্বার থেকে না বেরলে ওখানে কি পৌঁছন যায়? এ কি যে-সে তীর্থ?

—তাহ'লে রুগীর ব্যবস্থা—

—দেখুন, ভগবান ছাড়া—জন্ম-মৃত্যুর উপর মানুষের কি কোন হাত আছে? এই বদরীনারায়ণের পথে আমাদের কার অদৃষ্টে কি আছে কেউ বলতে পারে? তীর্থ করতে বেরিয়ে দয়া-মায়া, প্রাণের ভয় এ-সব রাখলে চলে না, মশাই!

—রোগীর অবস্থা কেমন?

তিনি আর একটু কাছে সরিয়া আসিলেন ও কণ্ঠ নামাইয়া অন্যের অশ্রুতিগম্য স্বরে বলিলেন—মোটেই সুবিধের নয়, মশাই। হয়ত আজ রাত্রিরেই—কি করব বলুন, মারে কেষ্ট রাখে কে?

—আর এক দিন দেখে এলেই পারতেন?

—তা পারতাম, তাহ'লে ওর বোনকে নিয়ে কি আর ওখান থেকে বার হ'তে পারতাম! শ্রাদ্ধশান্তি না চুকে-বুকে গেলে ও কি অশৌচ অবস্থায় তীর্থে যেত? ওকে দেশে রাখবার জন্যই বা কে যেত শুনি? তা হয় না, অনেক ভেবে-চিন্তেই এই ব্যবস্থা করলাম। এক জনের জন্য এতগুলি লোকের আশাকে তো নষ্ট করতে পারি না, মশাই!

তা সত্য। কিন্তু পুণ্যসঞ্চয়ের এই উগ্র প্রবৃত্তি—যে-প্রবৃত্তির মুখে মানুষের যত কিছু সুকোমল বৃত্তি জলিয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহার কি নাম দিব জানি না। পীড়িত ব্যক্তির ইতিহাস সংগ্রহের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করিলাম।

উত্তরে ভদ্রলোক বলিলেন—অবস্থা ওদের ভালই। চাষবাসের জমিজমা আছে; ওই যে পোর্ট ক্যানিং জানেন তো—সেখান দিয়েই সুন্দরবন অঞ্চলে যেতে হয়। অবশ্য তিনুর অবস্থা তেমন ছিল না, বোনটা বিধবা হয়ে ঘরে এল না তো, জমিদারের ঐশ্বর্য্য নিয়ে এল! ভাইয়ের কপাল ফিরল। বোনের তো ছেলেপুলে কেউ নেই—ভাইয়ের সংসার নিয়েই সংসারী। ছেলেবেলায়—এই তিনুর বয়স যখন দশ বছর—তখন ওর বাবা মারা যায়। ওই বোনই ওকে সাহায্য করে—মানুষ করে। বোনও কি যে-সে বোন, ভাইগতপ্রাণ। দেখলেন না, ভাইয়ের জন্য কি হাকুলি-বিকুলি।

বলিলাম—তা ওঁকে কেন রেখে এলেন না ওখানে?

তিনি গলার স্বর নামাইয়া চুপি চুপি বলিলেন—একা মেয়েমানুষ, কোথায় রেখে আসব মশায়? আর রুগীর যা অবস্থা, কখন কি হয়, তখন উনি যে অকূল পাথারে পড়বেন।

আমার পাশেই এক ছোকরা বসিয়া ছিল। সে যে কোথা হইতে উঠিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করি নাই, এবং সে যে বাঙালী তাহাও এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। পরিচ্ছদে তাহার ঢিলা পায়জামা, মাথায় টুপি ও গায়ে ছিটের কোট তো ছিলই। সর্ব্বোপরি বহুদিন পশ্চিমে থাকায় দরুণ মুখাকৃতিতেও ও-দেশের ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া অবধি একটি কোণ দখল করিয়া ঢুলিতেছিল। বোধ হয় পূর্ব্বরাত্রির জাগরণের জের চলিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, আমাদের কথোপকথনের অবকাশে তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গিয়াছে এবং বেশ একটু আগ্রহভরা

দৃষ্টিতে তীর্থযাত্রার এই অপরূপ ইতিহাস শুনিতেছে।

বক্তা থামিতেই সে প্রশ্ন করিল—একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, মশায়?

বক্তা হাসিমুখেই বলিলেন—স্বচ্ছন্দে।

ছোকরা বলিল—যে ভদ্রলোকের অসুখ তাঁর নাম কি, আর তাঁকে কোন্ হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে?

—সেই যে মতিলাল নেহেরুর বাড়ীর হাসপাতাল—সেইখানে সে আছে। নাম তার তিনু মণ্ডল কিনা তিনকড়ি মণ্ডল। বারুইপুর গ্রামে বাস।

ছোকরা সুটকেশ হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ওঁর দিদি কি ফিরে যেতে চান সেখানে?

—আপনি যাবেন নাকি?

মনে তো করছি—নেকস্‌ট স্টপেজে নেমে যাব। কি জানেন, আমরা হলাম লক্ষীছাড়া ভবঘুরে। তীর্থফীর্থ অত বুঝি না মশায়!

—যাচ্ছেন—যান। স্বর নামাইয়া বক্তা বলিলেন—কিন্তু গিয়ে কি দেখবেন জানি না। মোট কথা—

—ওঁর দিদি কি সত্যিই যেতে চান?

শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি মহিলাদের পানে চাহিয়া বলিলেন—ওগো কদম, এই ইনি তিনুকে দেখতে এলাহাবাদে চলেছেন, রাঙাবৌ কি যাবেন ওঁর সঙ্গে? যাবেন তো বলুন এই বেলা।

কদম অর্থাৎ সেই মালাজপরতা স্থূলাঙ্গী বিধবা রাঙা-বৌয়ের সঙ্গে দুই-এক মিনিট ফিসফাস করিয়া কি পরামর্শ করিলেন, পরে বলিলেন—রাঙাবৌ বলছে, উনি যখন যাচ্ছেন—তখন ভাবনা কি। তিনু সেরে উঠে যেন সোজা বাড়ী চলে যায়—কোথাও না অপিক্কে করে। আর উনি যদি কিছু মনে না করেন তো—ওঁর রাহা-খরচ—

ছোকরা অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল—আমার রাহা-খরচের জন্ম ভাবতে হবে না, ব্যবস্থা যা করবার নিজেরাই ক'রে নিতে পারব। উনি ফিরে যাবেন কি?

স্থূলাঙ্গী বিধবাই উত্তর দিলেন—বাবা বদরীনাথের নাম ক'রে বেরিয়েছে, ফিরে যাবে কোন্ মুখে। তিনু তো সেরে উঠবেই—মাঝ হ'তে ও-বেচারীর এত বড় আশা—

ছোকরা শীর্ণকায় ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—যদি খারাপ কিছু হয়—কোথায় আপনাদের খবর পাঠাব বলুন?

ভদ্রলোক চোখ টিপিয়া বলিলেন—ক্ষেপেছেন আপনি! যাচ্ছি তীর্থে—ও-খবর নিয়ে আমাদের লাভ! এই কাগজখানা বরঞ্চ রাখুন—বাড়ীর ঠিকানা; যদি তেমন কিছু হয়ই—

ছোকরা মৃদু হাসিয়া বলিল—বুঝেছি।

গাড়ীর গতি মন্থর হইয়া আসিল। ছোকরা দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া নামিয়া গেল।

ভদ্রলোক জানালা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া বলিলেন—নমস্কার—নমস্কার। কি যে উপকার করলেন আমাদের, ধন্যবাদ। আপনার কত কষ্ট—

ছোকরা উত্তর দিল—কষ্ট তো আপনারা দেন নি—আমিই সেধে নিয়েছি, সুতরাং ধন্যবাদটা আর দেবেন না। প্রয়াগ সেবাসঙ্ঘের নাম জানেন? জানেন না? আচ্ছা, সময় ও সুবিধা মত জেনে রাখবেন, উপকার পাবেন।

দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ স্টেশনের নামটি পড়িবার ছলে মন্তব্য করিলেন—সিরাথু। সিরাথুতেও এক্সপ্রেস থামে? কি যে এক্সপ্রেস—বাবা! যাক্, একটা ভাবনা ঘুচল।

গাড়ী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাত্রীদলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্থূলাঙ্গী বিধবা হরিনামের ঝুলিটি কপালে ঠেকাইয়া ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—সবই বাবার মাহিত্তির। জয় বাবা বদরীনারায়ণ!

ভ্রাতৃশোকাভিভূত বিধবার মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন—একটা পান দাও না দিদি, একটু দোক্তাও দিও, গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে!

কথিত আছে, সাধুত্বের ভান করিয়া পাকা বদমায়েসও সাধু বনিয়া যায়; নিদ্রার ভানে যে সত্যকার নিদ্রা আসিবে ইহা আর বিচিত্র কি। রাত্রিও বাড়িতেছে, ট্রেনের

ঝাঁকানি সমভাবেই চলিতেছে, আর শুকনা পুরি ও জলসিদ্ধ আলু কি শাক রসনার লোলুপত্বকে নির্ব্বাণপন্থী করিয়া উদরের ক্ষুধাকে আশ্চর্য্যজনকভাবে প্রশমিত করিয়া দিয়াছে। রাত্রির আয়োজনে সকলেই, যে যেখানে পাইয়াছেন, একটুও কাৎ হইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। নিদ্রার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া চারি দিকে চাহিলাম। কি অসহায় নিদ্রা-আতুর মুখগুলি। সারাদিনের সংঘাতে হাসি-ভাবনার সংমিশ্রণে যে-সব কুঞ্চিত রেখা মুখের উপর তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর দৃশ্যকে মনে পড়াইয়া দেয়, নিদ্রার অচেতন মুহূর্ত্তে সেগুলি কি করুণ! একটি প্রচণ্ড আঘাতে সমস্ত যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কোথায় বিক্ষোভ, কোথায়ই বা উল্লাস? মৃত্যুকে নিদ্রার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার শুভমুহূর্ত্ত আমার চোখের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তৎপূর্ব্বে চৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ডে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম:

শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার।
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত।

বইখানি হস্তচ্যুত হইয়া পাশে গড়াইয়া পড়িল; ঈশ্বরের অপূর্ব্ব মহিমা ধ্যান করিতে করিতে আমিও তন্দ্রা-লোকে উত্তীর্ণ হইলাম।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। গাড়ীতে কি ডাকাত পড়িয়াছে? না, ট্রেন অ্যাক্‌সিডেণ্ট? এরূপ দাপাদাপি-মাতামাতি রাত্রির মধ্যযামে প্রত্যাশা করি নাই। চোখ চাহিলাম। একটা বড় জংশন। গভীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া কখনও যদি জনকোলাহল শুনিয়া থাকেন তো সমুদ্রতীরে তরঙ্গাভিঘাতের কল্পনা করুন। নির্জ্জন বালুচরে চারিদিকে আবছা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়াছেন; আকাশে চাঁদ আছে, কিন্তু তন্দ্রাজড়িত চোখে সে আলো পারলৌকিক রহস্যে আবৃত; সমুদ্র-তরঙ্গ চোখের সম্মুখে সগর্জ্জনে ভাঙিয়া পড়িতেছে; আধ-জাগরণে সেই দৃশ্য ও সেই ধ্বনি রূপলোকের কথা মনে জাগাইতেছে; হাতের কাছে একটা কিছু পাওয়ার ইচ্ছাও তেমন দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে না—মন নিষ্ক্রিয়তার বিষে আচ্ছন্ন; অথচ জাগিয়া উঠিলেন।

—টিকেট।

কল্পলোক ও পরলোক এক নিমিষে অন্তর্দ্ধান করিল। রেল-কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যদৃঢ় পোষাক রূঢ় বাস্তবের কষা-ঘাতের মতই অবশিষ্ট তন্দ্রাটুকু টুটাইয়া দিল। হাঁ, নির্দ্দয় কষার মতই চেহারা বটে। মাথার টুপির নীচে বর্ত্তুলাকার সদা-ঘূর্ণায়মান দুটি চোখ, ওষ্ঠের দুই প্রান্তে উদ্ধত গোঁফ, লোমশ কৃষ্ণবর্ণের কঠিন দুটি করের সঞ্চালন এবং গায়ের আঁটসাঁট পোষাকে তাঁহার অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চেহারা দেখিলেই পুরিভক্ষণজনিত যেটুকু শোণিতের আমেজ অনিদ্রাকাতর যাত্রীর টোল-খাওয়া গালে অনুমান করা যায় তাহাও কর্পূরের মত উবিয়া যাইতে দেরি হয় না।

—টিকেট প্লীজ।

ইংরেজী বিনয়ের মধ্যেও কি কামান-বিদারণ শব্দ!

টিকেট দিলাম। তিনি এমন ভাবে এক বার টিকেটের পানে ও এক বার আমাদের পানে চাহিতে লাগিলেন যেন কোম্পানীকে ফাঁকি দিবার জন্য আমরা চিরকাল এমনই ভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছি!

একান্ত তাঁহার সন্দেহযুক্ত চাহনির অর্থ কয়েক মিনিট পরেই প্রত্যক্ষীভূত হইল। প্রত্যেক যাত্রীর টিকেট পরীক্ষান্তে তিনি ল্যাভাটরির দরজার হাতলে হাত দিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশের বক্রতায় বুঝা গেল, হাতের কব্জিতে তিনি বল প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, দরজা কেন খোলে না? ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বেই তো এক বার অনায়াসেই দরজা খুলিয়াছিলাম, আর এখন সেটা হঠাৎ বিকল হইবার কারণ কি?

অবিলম্বে সন্দেহ ভঞ্জন হইল। অধিকতর বল প্রয়োগে দরজা খুলিল এবং চেকার নির্ম্মম হস্তে চুলের মুঠি ধরিয়া এক ব্যক্তিকে হিড় হিড় করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিল। লোকটির বেশ-বাস খুব মলিন নহে; রেল-কোম্পানীকে মাশুল ফাঁকি দিবার মত অবস্থা তাহার নাও হইতে পারে! কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরে মাশুল ফাঁকি দিবার এমন সুবর্ণ-সুযোগকে উপেক্ষা করাও কম শক্তির পরিচায়ক নহে!

অনুনয়-বিনয়ে কোন ফল ফলিল না, নির্ম্মম চেকার

অর্দ্ধচন্দ্র-প্রহারে তাহাকে নামাইয়া দিল। নামাইয়া দিবার পর তাহার দৃষ্টি পড়িল দুয়ারের ও-পাশে দণ্ডায়মান গৈরিক-বাস-পরিহিত এক সন্ন্যাসীর উপর।

—এই, তুম কাঁহাসে আয়া?

—হিঁয়েসে—সাব।

—টিকেস হ্যায়—টিকেস?

সাধু বুলি পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন—দেখছ বাবা, সন্ন্যাসী লোক—ভিখিরী, টিকিট কোথায় পাব বাবা?

—তব উতর যাও। সাধু লোক হ্যায় তো পাঁওদলমে যাও—

—পাঁয়দলে অত রাস্তা যেতে পারব কেন, বাবা? আর দশ দিন বাদে যে কুম্ভমেলা, পৌছতে পারব কেন বাবা?

—হাম কা জানে! উতরো কি নেহি?

—আচ্ছা বাবা, কেন জুলুম করছ? আমায় উতরে দিয়ে তোমার কি লাভ হবে বাবা! আমার জন্যে রেল চালাতে কি বেশী খরচ হবে? সেই তো বাবা কয়লা পুড়বে, গার্ড সায়েবের মাইনেও কিছু বেশী দিতে হবে না—

—উতর যাও। কর্ত্তব্যপরায়ণ চেকার আসিয়া সাধুর গলদেশে হস্তার্পণ করিল।

আমাদের মনে ব্যথা জাগিল। চেকারকে অনুনয় করিয়া বলিলাম—যাক না একটা লোক—কে আর দেখছে। তোমারও পুণ্য হবে।

চেকার হাসিয়া জানাইল, রেলের আইন বড় কড়া। পাপ-পুণ্যের ধার তাহারা বড়-একটা ধারে না। আমরা দয়াপরবশ হইয়া বাধা দিতেছি বটে, কিন্তু কাল রাত্রিতে আমাদের কোন কিছু চুরি হইলে আমরাই তখন রেল-কোম্পানীকে দুষিব। এই সব লোকের সাধুবেশ থাকিলেও আসলে উহারা চোর বদমায়েস ইত্যাদি।

কাকুতিবান সাধুকে লইয়া চেকার নামিয়া গেল।

সাধু-নির্যাতন ব্যাপারে সকলেরই ঘুম ছুটিয়া গিয়াছিল। নানারূপ মন্তব্যে এইটুকু পরিস্ফুট হইল যে, কলি চারি পোয়া পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। যাহারা ব্যবসা চালায় তাহারা পাপ-পুণ্যের খতিয়ান রাখে না—এবং রাখে না বলিয়াই এ-ব্যবসায়ে মন্দা পড়িতে বাধ্য। সে-শুভদিন যবেই আসুক, আপাততঃ ট্রেনটা ছাড়িলে যে বাঁচি। অত রাত্রিতেও ঠাণ্ডা পুরিকে গরম বলিয়া প্রচার করিতে ভেণ্ডারেরা সপ্তমে গলা ফাটাইতেছে; গরম দুধ ও গরম চা-ওয়ালাদের উৎসাহও প্রচুর।

অবশেষে ট্রেন ছাড়িতেই যে যাহার জায়গায় আসিয়া বসিলেন। আমিও বেঞ্চের উপর পা তুলিতে যাইব—অকস্মাৎ—ওরে বাবা! ভীষণ ভাবে চমকিয়া বিদ্যুৎ চালিতের মত দুই পা তুলিয়া বেঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

—বাবুজী, ডরো মৎ। প্রথমে ঝাঁকড়া মাথা, পরে রুদ্রাক্ষ-ভূষিত দুই বাহু গাড়ীর মেঝের উপর রাখিয়া আমারই বেঞ্চের তলদেশ হইতে আবির্ভূত হইলেন এক গৈরিক-বসন-পরিহিত সহাস্যবদন সন্ন্যাসী।

—আরে সাধুবাবা ক্যায়সে আ গেয়ি?

—আশমানসে। হাসিমুখে সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ডরো মৎ বাবুজী। টিকিস চেকার যব আয়া—হাম ছিপাকে হিঁয়েই রহা। উলোগ শয়তান হ্যায়। উসসে সাচ্চা বোলনেসে বহুৎ তকলিফ দেতা।

—তাই ব'লে সাধু হয়ে মিথ্যা বলবেন?

—শয়তানকো সাথ সাচ বোলনেসে কোই ফায়দা নেহি। রামচন্দরজী হ্যায় হামারা সাথ—হ্যায় হামারা দিলমে। উয়ো ভি জানতে হেঁ কোই ঝুট—কোই বা সাচ। বৈঠিয়ে আব।

সাধু আমার পাশেই বসিলেন। বসিয়া বলিলেন—হাম বাংলা ভি জানে বাবুজী—তোমারা বাংলা মুল্লুকমে বহুৎ মাহিনা হাম থা। হাম কালীঘাট গেঁয়ি—নবদ্বীপ ভি গেঁয়ি। নবদ্বীপ বহুৎ আচ্ছা তীরথ হ্যায়। হুঁয়া গঙ্গা মায়িজী রহতা।

ইচ্ছা না-থাকিলেও আলাপ খানিকটা করিতে হইল।

—আচ্ছা সাধুজী, সারা রাস্তা তোমরা বিনি টিকেটে যাও—কেউ নামিয়ে দিলে কি কর?

সাধুজী কপালে হাত দিয়া হাসিলেন—হামরা গাড়ীমেঁ যাই, পাঁওদলসে যাই, যেমন সুবিস্তা তেমন যাই বাবুজী। সাধুলোক এক ভগমানকা নোকর হ্যায়—আউর দুসরা

লোককো নোকর নেহি আছে। চৈতন্যভাগবতখানা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—ধরমগ্রন্থ হ্যায় ?

—হাঁ। এর নাম চৈতন্যভাগবত। সাধু বৃন্দাবন দাস লিখেছেন।

—বৃন্দাবন দাস! বৃন্দাবনমে রাধাশ্যাম হ্যায়; আপ দেখিয়েছেন বৃন্দাবন ?

—না। কিন্তু ইনি সে বৃন্দাবন নন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নাম জানেন ?

সাধুজী উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কহিলেন—কলিযুগমে দেওতা হ্যায়। পতিত কা ঠাকুর—নবদ্বীপমে নাম কীর্ত্তন লীলা করিয়েছেন। হামি জানি, জগাই মাধাই ভি উদ্ধার করিয়েছেন।

—তাঁরই লীলাকথা এই বইতে আছে।

—আপ পড়বেন থোড়া ? বাংলা হামি জানে—পড়বেন বাবুজী ?

বলিলাম—এটা হইতেছে মধ্য খণ্ড। প্রভু গৃহত্যাগ ক'রে যাবেন—তাই শচী দেবীকে বোঝাচ্ছেন।

ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥
বুকে হাথ দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার।"
যত কিছু বোলে প্রভু, শচী সব শুনে।
উত্তর না স্ফুরে কান্দে অঝোর নয়নে॥

* * *

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে॥

সন্ন্যাসীর নয়ন মুদিয়া আসিয়াছে—মাথা হেলিয়া পড়িয়াছে। ভাবাবেশে কি তন্দ্রাবেশে বুঝিবার জন্য খানিকটা পাঠে বিরতি দিলাম। সন্ন্যাসীমানুষ না হইলে তন্দ্রাই বলিতাম। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধির কথাও তো বহু স্থলে পড়িয়াছি। ঈশ্বরপুরীর মত ইঁহারও কি ? কিন্তু পুলক, কম্প, স্বেদ, অশ্রু কই ? তবে বোধ হয়—?

বই বন্ধ করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস লওয়ার অবসরে সকলেরই সমাধি হইল দেখিতেছি! আবার গাড়ীর দোলা লাগিতেছে, আবার চক্ষুতে তন্দ্রার আবেশ। বালিশটা টানিয়া লইয়া আমিও কাৎ হইলাম।

গাঢ় ঘুম। ঠেলা খাইয়া ভাঙিয়া গেল। চারি দিক রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরের মাঠঘাট সকালের প্রসন্ন হাসিতে ঝলমল করিতেছে। পশ্চিম শহরের রুক্ষ মাটি ও কদর্য্য বস্তির চেহারাও সকালে একটু কোমল হইয়াছে যেন। জানালার বাহিরে নীল আকাশ অবশ্য বাংলার মত তেমন সুনীল নহে। সবুজ ক্ষেত আর সুনীল আকাশে বাংলাতেই দেখিয়াছি গলাগলি ভাব। সেখানকার প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য—এখানে কার্পণ্যে কেমন যেন সঙ্কুচিত। তবু কিছুক্ষণ চাহিলাম বাহিরে। কল্যকার প্রকৃতির অনেক কিছুই নাই। গাড়ীর মধ্যেও কেদার-বদরী-যাত্রীর বৃহৎ দলটি নাই, হাবড়া হইতে কানপুর পর্য্যন্ত অর্দ্ধপরিচিত ছায়াচিত্রের অসংখ্য ছবি মিলাইয়া গিয়াছে। পাশে সেই ঝাঁকড়া-মাথা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীও নাই। আর নাই—

পাশের যাত্রী আমাকে বলিলেন—কিছু খোয়া গেল নাকি, মশাই ? যে ঘুম—যাবে না ?

চীৎকার করিয়া উঠিলাম—আমার সুটকেশ ? ফলের টুকরিটা ? হাতপাখা—মগ ? আর বালতির মধ্যে বসানো নূতন প্রাইমাসের স্টোভ, আর ফায়ার-হ্যাণ্ডের হ্যারিকেন ?

গাড়ীর একমাত্র সঙ্গী সেই ভদ্রলোক হেঁট হইয়া কি যেন তুলিয়া লইলেন ও সেটির ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এটা বোধ হয় আপনার ? সন্ন্যাসীর সঙ্গে অতগুলো লোক নেমে গেল হাথরাসে—কি ক'রে বুঝব বলুন কোনটা কার জিনিষ ? সন্ন্যাসী ব্যাটার সে কি সাহায্য করবার ধুম! কুলি ডাকতে দিলে না তাদের—নিজে থেকে গাড়ী সাফ্ ক'রে মালপত্তর নামিয়ে দিলে মশাই! তখন যদি জানতাম—

চৈতন্যভাগবতখানি হাত বাড়াইয়া লইলাম। সংসারের সব কিছু ত্যাগ যে কত বড় সাধনার সামগ্রী সে-কথা আমার মত এই দণ্ডে আর কয় জন বুঝিতে পারিয়াছে জানি না।

মাথা নামাইয়া বইখানি বুকে চাপিয়া ধরিলাম, দুই চোখে ধারা নামিল এবং দিল্লী এক্সপ্রেস ছুটিয়া চলিল।

নীলাঙ্গুরীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

১

মীরা

আমার প্রশ্নটা বোধ হয় একটু জটিল।—ভালবাসা কি সব সময়েই তাহার সেই চিরন্তন রূপেই দেখা দিবে?—সেই আবেগ-বিহ্বল কিংবা অশ্রুসজল? ঘৃণা কি সব সময়েই ঘৃণা? ভালবাসা কি একটা অভিনয়?—না, সত্য থেকে অভিন্ন একটা কিছু?…যদি তাহাই হয় তো সত্যের সেই অন্তর্বহ্নিতে সে কি, যাহা খাদ, যাহা অবান্তর সেই সব-কিছুকেই দগ্ধ ভস্মীভূত করিয়া দিতে সমর্থ নয়? বেশ গুছাইয়া মনের কথাটা বলিতে পারিতেছি না;…কিন্তু এও বলি—হাজার গুছাইয়া বলিলেও কি অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা আছে আপনাদের নিকট?

আপনাদের মস্তিষ্কের উপর কটাক্ষ করিতেছি না, দোহাই। বলিতেছি অভিজ্ঞতার কথা।—আপনারা ভালবাসেন নাই, ভালবাসার কত রূপ তাহা দেখেনও নাই, ভালবাসা পাওয়া তো দূরের কথা। প্রমাণ দিবেন বিবাহের। কিন্তু ওটা আমার তরফেরই প্রমাণ, অর্থাৎ বিবাহিত বলিয়াই ভালবাসার কিছু জানিলেন না। আপনাদের বিবাহ তো?—আপনি তখন বোধ হয় প্রাণ পণে পাসের পড়া লইয়া ব্যস্ত, ঘটকিনী হাঁটাহাঁটি করিতেছে, পুরোহিত কোষ্ঠীবিচার করিতেছে, আপনার পিতা আর বাড়ির অন্যান্য পুরুষেরা কুটুম এবং গহনা যাচাই করিতেছেন, মেয়েরা পাত্রীর নাক, চোখ, কান, চুলের হ্রস্বদীর্ঘতা লইয়া ব্যস্ত। পাসের পড়া থেকে ফুরসৎ হইলে টোপর এবং পরীক্ষার ফলাফলের দুশ্চিন্তা মাথায় করিয়া আপনি সুড়সুড় করিয়া গিয়া গোটাকতক মন্ত্র আওড়াইয়া আসিলেন;—সংস্কৃতে যতটুকু জ্ঞান তাহাতে সেগুলা আপনার পক্ষে বিবাহের মন্ত্রও হইতে পারে, ভূত-ঝাড়ার মন্ত্রও হইতে পারে; এবং বাসর-ঘরে অশ্রাব্য বিদ্রূপ এবং অসহ্য কর্ণতাড়নায় আপনার নিজের ভূত-ঝাড়ার যদি ব্যবস্থা না থাকিত তো বোধ হয়, কি জন্য আপনার কষ্ট করিয়া আসা সেটা বেমালুম ভুলিয়া বসিয়া থাকিতেন।…বাঙালী ব্যবস্থাপকেরা দূরদর্শী ছিলেন,—বধূ আনিবার ব্যবস্থাটা করিয়া গিয়াছেন ধুতি-শাড়ীতে গাঁটছড়া বাঁধিয়া। বুঝিয়াছিলেন এই সব পরীক্ষা-পাগল বরেরা উদম পাগল হইয়া নিতান্ত যদি বস্ত্র-উত্তরীয় ফেলিয়া না পালায় তো কনেকে কোন রকমে বাড়িতে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। এই আপনাদের বিবাহ, এর মধ্যে ভালবাসার স্থান কোথায়?…হদ্দ আছে একটা নিশ্চিন্ত আরাম; চোখ-কান মুদ্রিত করিয়া…

অনিলের কথা মনে পড়িয়া গেল। জীবনকে যদি কেহ দেখিয়া থাকে তো সে অনিল। তাহার দেখারও একটু বিশেষত্ব আছে, আপনার আমার মত করিয়া দেখে না। বলে, "ভাই, খাসা আছি। বাপ-মা, দৈব-গুরুজন, আত্মীয়-স্বজনে মিলে সমস্ত বাজার উটকে অবস্থামত সেরা অম্বুরী তামাক জোগাড় ক'রে, সেজেগুজে নল্‌চেটা হাতে তুলে দিয়েছে, ভুড়ুক ভুড়ুক ক'রে টেনে যাচ্ছি গুড়গড়া; এসা আমেজ যে প্রতি টানেই যে বুক খালি ক'রে দম বেরিয়ে যাচ্ছে সেটুকু পর্য্যন্ত হুঁস্ হবার ভয় নেই। এ-ধাতে, মানে, এই তাকিয়া-জাপটান জাতের পক্ষে, এই ভাল; থাকুক ও উড়ঞ্চুরে ডানপিটেরা, ল্যভ, ডিভোর্স, কোর্টশিপ ইলোপ্‌মেণ্ট আরও যত সব আদাড়ে রোমান্স নিয়ে…"

আপনাদের বিবাহ এই গড়গড়ার মাথায় অম্বুরী তামাক, অনায়াসলব্ধ একটা মিষ্টাস্বাদ, সঙ্গে একটা নেশার আমেজ। তাহাতে ভালবাসার 'অম্ল-তিক্ত-কটু-কষায়' কোথায়? ঝোলা গুড়ে গঙ্গা মাতাইয়া বলা, অমৃত পান করিয়া উঠিলাম।

তাই বলিতেছিলাম—বিবাহটাই প্রমাণ যে ভালবাসা কি তাহা জানে না। যাহাতে না জানিতে পান সেই জন্যই আপনার শুভার্থীরা—অথবা দুই পক্ষই ধরিয়া বলা যাক—আপনাদের শুভার্থীরা আপনাদের বিবাহ দিয়া দিয়াছেন—ভালবাসার প্রতিষেধ হিসাবে। কেন এরূপ করা তাহা জানি না, তবে এইটুকু জানা আছে যে ভালবাসায় গরল থাকিতে পারে। অন্ততঃ আমার বেলায় ছিল;—আরও কত সবার বেলায়, জীবনের চলতি পথে এক সময় যাহাদের সঙ্গে হইয়াছিল দিনকয়েকের সাক্ষাৎ।

কণ্ঠে গরল ধারণ করা কি সবার কাজ?—সেই জন্যই বোধ হয় আপনাদের অঙ্গে বিবাহের রক্ষাকবচ আঁটা,—মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ।

ভগবান্ আপনাদের নিরাপদ রাখুন।" আমি কিন্তু যেন জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এই গরলামৃত আকণ্ঠ পান করিতে পাই।

২

আমারও রক্ষাকবচের আয়োজন হইতেছিল।

বি-এ পাস করিয়া বেশ একটু ক্লান্তি আসিয়াছে। বাড়ির বাড়া-ভাত খাইয়া কলেজে হাজরি দিয়া পাস করা নয় ত, হোস্টেলের আড্ডা জমাইয়াও নয়। উদয়াস্ত মাস্টারি,—প্রাইভেট টুইশন। চারিটা বৎসর ধরিয়া এক দণ্ডের জন্যও সরস্বতী দেবীর এলাকার বাহিরে পা দিতে পারি নাই। বীণাপাণি সরস্বতীর নয়, শুদ্ধ বাগেবীর,—বাক্যের অধীশ্বরীর। অর্থাৎ জীবনের সমস্ত সরসতা বিসর্জ্জন দিয়া এই চারিটা বৎসর শুধুই বকিয়াছি। সকালে দুই টুইশনে পাঁচটি ছেলে—ছোট ছেলে। বিকালে, কলেজ-ফেরত বাসায় আসিবার পথে একটি ধাড়ী—তিন-তিন বার ম্যাট্রিকুলেশন-বুড়ী ছুঁইয়া আসিয়াছে। তাহার পর সন্ধ্যা যাইতে-না-যাইতেই বাসার টুইশন—তিনটি ছেলেমেয়ে ও এক জন বৃদ্ধ, আমার মনিবের খুড়া। বৃদ্ধের টুইশনটা একটু বাড়াইয়া বলিতেছি; আসলে টুইশন নয়, তাঁহাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনাইতে হইত, ছেলেমেয়েদের পড়ার পাট শেষ হইলে। তিনি আবার বেজায় কালা ছিলেন, প্রায় কথাটাই তাঁহাকে দুই বার করিয়া শুনাইতে হইত। বৃদ্ধ এদিকে কিন্তু লোক ভাল ছিলেন এবং ভাল লোক ছিলেন বলিয়াই আমার নিকট হইতে এই ফালতু কাজটুকু লইতেন; তাঁহার একটা বিশ্বাস এই ছিল যে, এটা আমায় একটা মস্ত বড় অনুগ্রহ করিতেছেন। টুইশনের অধিক এই কাজটুকু লইয়া আমায় যেন নিছক গৃহশিক্ষকেরও অধিক একটু জায়গা দিলেন। এক এক সময় বেশী প্রীত হইয়া বলিতেন, "না, তোমার পড়ার বেশ কায়দা আছে শৈলেন।"

নিতান্ত ভদ্রতার মিথ্যা এটুকু, কেন না, সমস্ত দিনের কসরতের পর গলা আমার তখন সমস্ত কায়দার বাহিরে। আমিও একটা ভদ্রতার মিথ্যায় জবাব দিতাম—তাঁহার কানের নিদারুণ অত্যাচারের কথা চাপা দিয়া বলিতাম, "আপনাকে শুনিয়েও বেশ একটা সুখ আছে; বহু ভাগ্যে এমন এক জন শ্রোতা পাওয়া যায়।"

যখন আহারে বসিতাম অনর্গল বকার ফলে পেট আর বুক দুইটাই এমন ফাঁকা হইয়া থাকিত যে কোন্‌টা পেট আর কোন্‌টা বুক যেন সাড় থাকিত না।

আমার পাস করার জীবনটা অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি বাক্যের মরুভূমির ভিতর দিয়া—মহাশ্বেতা বাঙ্ময়ী সরস্বতীর এলাকা। যখন বি-এ পাস করিলাম তখন আমি শুষ্ক, পরিশ্রান্ত। শুধু এইটুকুই নয়, অনুভব করিতাম জীবনে একটা মস্ত বড় ক্ষতি হইয়া চলিয়াছে। টুইশনি সংগ্রহ করিতে এবং সংগ্রহ করার পর বজায় রাখিতে ঝুটা-সাঁচ্চা উভয়বিধ কৃতজ্ঞতার জন্য গার্জেনদের খোশামোদ করিতে করিতে মেরুদণ্ড যাইতেছে বাঁকিয়া। বাক্যের অর্ঘ্য রচনায় পাই আনন্দ। হারানো দম বোধ হয় এক দিন ফিরিয়া পাইতে পারি, কিন্তু এ সর্বনাশ হইতে কখনও উদ্ধার পাইব কি না জানি না।...মোট কথা আমার পাস করার যে আনন্দ সেটা ঠিক সাফল্যের আনন্দ নয়, একটা মুক্তির স্বস্তি;—মনে হইল কি একটা অসহ অবস্থা হইতে যেন অব্যাহতি পাইলাম।

জীবনের এই সুর-পরিবর্তনের মাহেন্দ্র লগ্নে ওদিকে শানাইয়ের আমেজ উঠিল। আমি তখন পরীক্ষা দেওয়ার পর পূর্ব-উপকূলে ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। প্ল্যান হইয়াছে

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার মুখে কলিকাতায় ফিরিব, তাহার পর দেশে—আমাদের প্রবাসভূমিতে। ভ্রাম্যমানের নিরুদ্দেশ হাল্কা দিনগুলি বাঁশির সুরে স্বপ্নালু হইয়া উঠিত। খবর পাইতাম বিবাহের আয়োজন হইতেছে। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের জীবন আমায় ডাকিতেছে। কি মধুর! ক্লান্ত চোখে কত অপূর্ব রঙের আভাস যেন ফুটিয়া উঠিতেছে; কত স্বপ্ন!—যেন একটা রূপকথার জগৎ এই জীবনকেই ঘিরিয়া কি ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল,—তাহার সম্মুখ হইতে পর্দা গুটাইয়া যাইতেছে। বাঁচিয়াছি, শুষ্ক পাঠের উপর আর স্পৃহা নাই। বাঁচিয়া উঠিয়া আবার ঐ মরণের দিকে পা বাড়াইব না।

ঠিক এই সময় একটা ব্যাপার হইল যাহাতে কলেজ, পড়া, পাস করা,—যে-সবকে মরণ ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহারা আবার নূতন সুরে ডাক দিল। আহ্বানটা আসিলও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত একটা দিক্ হইতে।

ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম পাস করিয়াছি। পাততাড়ি গুটাইতেছিলাম, অর্থাৎ বাড়ি যাইব, বাঁধাছাঁদা হইতেছিল। স্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকার একটা পাতা ছিঁড়িয়া আমার প্রিয় একটি সিনেমা-আর্টিস্টের ছবি মুড়িয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিব, হঠাৎ সেই ছিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের গোটা দুই অসংলগ্ন লাইন চোখে পড়িল—

…আবেদনকারী স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করুন। গুরুপ্রসাদ রায়, ব্যারিষ্টার, ৩৫।৩।১ লিন্‌ড্‌সে ক্রিসেন্ট, বালিগঞ্জ।

আবেদন করিয়াই জীবনের এতটা কাটিয়াছে, কাজেই একটা কৌতূহল হইল, এ আবার কিসের আবেদন? বিজ্ঞাপনের বাকিটুকু মোড়কের ভাঁজের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছে, আবার ভাঁজ খুলিয়া পড়িলাম।—

'একটি নয়-দশ বৎসরের বালিকার জন্ম এক জন গ্র্যাজুয়েট গৃহশিক্ষক প্রয়োজন। গৃহশিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকই বাঞ্ছনীয়। আবেদনকারী স্বয়ং আসিয়া',…ইত্যাদি

কয়েক বার পড়িলাম এবং প্রতি বারেই মনটা যেন বেশী করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। আমায় আকৃষ্ট করিতেছিল স্বয়ং বিজ্ঞাপনদাতা অর্থাৎ ছাত্রীর পিতা; আরও সঠিকভাবে বলিলে বলিতে হয়—ঠিক ছাত্রীর পিতা নয়, তাঁহার নামটা। আমার জিবে যেন জড়াইয়া যাইতেছে,—গুরুপ্রসাদ—গুরুপ্রসাদ রায়…যতই নাড়াচাড়া করিতেছি ততই লোকটিকে প্র্যাকটিসে, প্রাচুর্যে, আরামে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। এই মনে হওয়ার মধ্যে একটা হিসাবও ছিল বোধ হয়। নামটা অতি-আধুনিক সুধীনও নয় অথবা রীতীশও নয়। গুরুপ্রসাদ নামের গুরুভার কাঁধে লইয়া ব্যারিস্টারি পড়িতে যাইত সে অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। তাহার মানে এখন তাঁহার অন্ততঃ ছত্রিশ-সাঁয়ত্রিশ বৎসরের প্র্যাকটিস, বয়স ষাটের কাছাকাছি, একটা বেশ কায়েমী প্র্যাকটিসের উপর গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছেন। আশা করা যায় দিবেন-থোবেন ভাল। একটা আরামের পরিবেশের ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে।…নিশ্চয় কালা নয়, নিশ্চয় বসিয়া বসিয়া পরের মুখে খবরের কাগজ শুনিবার ফুরসৎ নাই তাঁহার। লোভ হয়, এক বার দেখাই যাক্ না।

এম. এ. পড়িবার এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, এ বিষয়বুদ্ধিটা যে একেবারেই ছিল না এ-কথা বলিতে পারি না, তবে আসল কথা ছিল সখ। চার বৎসর ধরিয়া যে নাগাড়ে নয়টি-দশটি ছাত্রছাত্রীর হাতে আয়ুক্ষয় করিয়া আসিতেছে তাহার এক বার একটি মাত্র ছাত্রীকে পড়াইবার সখ হয়ই। চুরি-ডাকাতির জন্ম পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া আসিবার পর আমাদের গাঁয়ের ভুতো বাগ্দী একবার বলিয়াছিল, "এবার আরাম ক'রে তোমাদের স্বদেশী জেল খাটবার বড় আহিক্ষে হয় দাদাঠাকুর, এক বার দেখলে হ'ত।"… এ-ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম;—সশ্রম কারাভোগের পর একটু নিশ্চিন্ত কারা-উপভোগ মাত্র।

কিন্তু বাধাও আছে। ব্যারিস্টার জীবগুলিকে আমি যেন অন্তর্নির্দিষ্ট হইয়া এড়াইয়া চলি। মনে হয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খগ-নাসা এবং বক্র তর্জনী দিয়া উঁহারা সর্বদাই যেন অন্যের কথাগুলি পর্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া লইবার জন্ম মুখাইয়া আছে। অবশ্য সব ব্যারিস্টার যে খগ-নাসা এমন নয়, সংসারে খাঁদা ব্যারিস্টারও বিস্তর আছে; তবে আমার মনে কেমন করিয়া একটা টাইপ-চেহারা গাঁথিয়া গিয়াছে।…ধরুন, আমি চাকরির উমেদার হইয়া

গেলাম। যেন গিয়া বারান্দার সিঁড়ির নীচের ধাপে দাঁড়াইয়াছি। সামনে প্যান্টের পকেটে ডান হাত দিয়া বাঁ-হাতের মুঠায় পাইপের আগাটা ধরিয়া ব্যারিস্টার গুরুপ্রসাদ রায়; আমার মুখের উপর ফেলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খগ-নাসা ইত্যাদি। প্রশ্ন হইল, "কি চান?"

আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, ঢোঁক গিলিয়া উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে স্টেট্‌স্‌ম্যানে দেখলাম..."

—"ই—য়েস্‌, কি দেখলেন বলুন; আউট্‌ উইথ্‌ ইট্‌।"

"আজ্ঞে দেখলাম যে আপনার মেয়ের জন্যে..."

"আর ইউ সিওর—আমার মেয়ে?"

"আজ্ঞে, আপনার নাতনীর জন্যে..."

"স্টেট্‌স্‌ম্যানে কি আমার নাতনী ব'লে মেন্‌শন্‌ করা আছে?"

ততক্ষণে আমার দফা অর্দ্ধেক নিকেশ হইয়া গিয়াছে। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, একদমে সবটা বলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "আজ্ঞে দেখলাম নয়-দশ বৎসরের একটি মেয়ের জন্যে এক জন টিউটার..."

"এক্সপিরিয়েন্স্‌ড্‌ গ্র্যাজুয়েট্‌ টিউটার।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এক জন এক্সপিরিন্স্‌ড্‌ গ্র্যাজুয়েট্‌ টিউটর দরকার আপনার, তাই..."

"আপনার এক্সপিরিয়েন্স?"

"আজ্ঞে আমি চার বৎসর ধ'রে দিন আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িয়ে এসেছি।"

ব্যারিস্টারি অধরোষ্ঠ কুটিল বিদ্রূপে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।—দাঁতের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—শখ! .. উত্তর হইল, "তার মানে, জঙ্গলে খেটেছেন ব'লে বাগানেও কাজ করতে পারবেন।...না, আমার একটু অন্য ধরণের অভিজ্ঞ লোক চাই; আপনি তাহ'লে আসুন; নমস্কার।"

কাল্পনিক গুরুপ্রসাদের সঙ্গে এই রকম একটা কাল্পনিক কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। বিজ্ঞাপনটার দিকে চাহিয়া এক দিকে লোভ আর অপর দিকে আশঙ্কা—এই দোটানায় পড়িয়া যাইব, কি যাইব না যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিলাম; তাহার কারণ, শুধু একটা মনগড়া আশঙ্কার এমন একটা সুবিধা ছাড়ার চিন্তায় নিজের মনের কাছেই নিজেকে যেন অপরাধী বলিয়া বোধ হইতেছিল। ব্যারিস্টারের ভয়ে শখের দিকটা যেমন কমিয়া আসিতেছিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি বলিয়াই এর বৈষয়িক দিকটা তেমনি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল চাই কি এই সুযোগে জীবনের গতিটাই ফিরিয়া যাইতে পারে। দুশ্চিন্তারহিত প্রচুর অবসরের মধ্যে বেশ ভাল ভাবেই এম-এ.-টা হইতে পারে, আই-এ পাস করা পর্যন্ত জীবনের যা একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একটা কৃতী মানুষের সাহচর্যে ও সাহায্যে জীবনে ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারি। শেষ পর্যন্ত যদি কপাল তেমন ভাবেই খোলে তো কত কী না হইতে পারে?—কল্পনা একেবারে অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যাদানের কোঠায় গিয়া ঠেকিল; সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী—নানা রকম তত্ত্ববাক্যের হুড়াহুড়িতে মনটা গরম হইয়া উঠিল; মনে পড়িল শেক্সপীয়রের অমর বাণী—দেয়ার ইজ এ টাইড্‌ ইন্‌ দি এফেয়ার্স্‌ অব্‌ মেন্‌...বাধা-ছাদা ছাড়িয়া খানিকটা চিন্তা করিলাম—ভগবান্‌ এদিকে নামে যেমন লোকটিকে গুরুপ্রসাদ করিয়াছেন, ওদিকে পেশায় তেমনি ব্যারিস্টার না-করিয়া যদি ডাক্তার কিংবা জজ-মুন্সেফ-গোছের কিছু একটা করিয়া দিতে পারিতেন তো সোনায় সোহাগা হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই...

চিন্তার মাঝেই একবার গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িলাম; না, জুজুর ভয়ে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; ব্যারিস্টার তো ব্যারিস্টারই-সই। জীবনের যত মঙ্গল সব থাকে বিপদের অন্তরালে, বীরের মত পা ফেলিয়া গিয়া সেই বিপদের সামনে দাঁড়াইতে হইবে। দেরি করা নয়, শুভস্য শীঘ্রম্‌।

৩

৩৫।৩.১ লিওসে ক্রিসেণ্টে যখন উপস্থিত হইলাম বেলা তখন প্রায় তিনটে হইবে।

বাড়িটা একেবারে নূতন, সময় হিসাবেও নূতন, আবার স্টাইল হিসাবেও নূতন। ঢালাই করা কংক্রিটের বাড়ি; রেলিং, জানালার সান্‌-শেড্‌, ছাদের আলিসা, থাম, সিঁড়ির পাড়, কোনখানেই স্থাপত্য-অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র

নাই; সব জ্যামিতির সোজা কিংবা বৃত্তাভাস রেখার নানা রকম সমন্বয়ে গড়া। বাহির হইতে যতটা বোঝা যায় বাড়ির ঘরদালানও ঐ ধরণের। কোণ-কানের বালাই খুব অল্পই; যেখানে কোণ-কানের সম্ভাবনা সেখানেই একটু ঘুরিয়া যেন এড়াইয়া গেছে। সব মিশাইয়া ঠিক যে সৌন্দর্যের অভাব বলিব তাহা নয়, তবে আমার মত অনভ্যস্তের চোখে নিরাভরণ অতি-আধুনিকত্বের একটা অস্বস্তি জাগায় যেন।

বেশ বড় হাতার মধ্যে বাড়িটা। বাঁ-দিকে একটা মাঝারি সাইজের বাগান, মাঝখানটিতে একটা ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট, তার চারি দিকে কতকগুলি কামিনী গাছ, প্রত্যেক গাছটি এক রকম করিয়া দুই তিন থাকে পরিপাটি করিয়া ছাঁটা; একটি পাতার, কি একটি ডালের বাহুল্য নাই। ফুল? সে নিশ্চয় এ-সব গাছের কাছে আকাশ-কুসুম মাত্র।...এদিকে-ওদিকে কয়েক রকম মরশুমি ফুলের বেড্, তারের জাল দিয়া মোড়া কয়েকটা লোহার পাতের খিলান—তাহার উপর কয়েক রকম বিলাতী লতার ঝাড়, ছুরি-কাঁচির শাসনে বেশ সংযত। মোটের উপর বাড়ি আর বাগান দুই-ই যেন এক ছন্দে রচা, কোথাও একটু বাহুল্য নাই, চারা-গাছটি হইতে আরম্ভ করিয়া সবই দিব্য ছাঁটা-কাটা, মাজাঘষা, তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে।

বাড়ির ডানদিকে গ্যারাজ, চাকরদের আউট্-হাউস্। সমস্ত চৌহদ্দিটা এক-বুক-উঁচু দেয়াল দিয়া ঘেরা, মাঝখানে ঢালা লোহার এক জোড়া গেট। গেটের একটা থামে পালিশ-করা পিত্তলের ফলকে কালো অক্ষরে ইংরেজীতে নাম লেখা—জি. পি. রে., বার-এট্-ল।

সমস্ত পথটা নিজের মনেই ব্যারিস্টারের বিরুদ্ধে আস্ফালন করিতে করিতে আসিলাম। মনে মনে কোথায় যেন একটু আশা ছিল ৩৫।৩।১ এই ত্র্যহস্পর্শযুক্ত গোলমেলে নম্বরটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না। চেষ্টা করাও হইবে, অথচ ভালয় ভালয় বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়াও আসা যাইবে। বাড়িটা পাইয়া দমিয়া গেলাম, সঙ্গে সঙ্গেই যে গেটের মধ্যে পা দিব এমন সাহস হইল না। অথচ এক জন জলজ্যান্ত ব্যারিস্টারের গেটের সামনে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাও নিরাপদ নয়। কি করা যায়?

দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে দেয়ালের আড়ালে আড়ালে ফুটপাথের উপর খানিকটা এমুড়ো ওমুড়ো পায়চারি করিলাম, শক্তি সঞ্চয় করিতেছি। যে-সংকল্প লইয়া আজ বাড়ি যাওয়া স্থগিত রাখিলাম, সামান্য দ্বিধা—হয়ত ভীরুতারই জন্য সে-সংকল্প ত্যাগ করিয়া গেলে জীবন তাহার ব্যর্থতা লইয়া নিশ্চয় এক দিন জবাবদিহি চাহিবে।

দেয়ালের আড়ালেই কোঁচা দিয়া জুতাটা ঝাড়িয়া লইলাম। তাহার পর হাত দিয়া চুলটা গুছাইয়া লইয়া এবং প্রথম সওয়াল-জবাবে যে ইংরেজী কথাগুলা দরকার হইতে পারে—সেগুলা আবার এক বার মনে মনে আওড়াইয়া লইয়া গেট ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

গা ছম-ছম করিতেছে। সুরকির রাস্তার উপর চলার মস্ মস্ শব্দ হইতেছে, মনে হইতেছে বাড়ির গাঢ় নিস্তব্ধতার গায়ে যেন সিঁদ কাটা হইতেছে।...দেখিয়া থাকিবেন—আধুনিক ভদ্রোচিত বাড়ি সব নিস্তব্ধ। শব্দ স্বাভাবিক নিশ্চয়, কিন্তু স্তব্ধতাই সভ্যতা। পূর্বে সৌন্দর্য দিত অবগুণ্ঠন, আজকাল অবগুণ্ঠন টানে শব্দে।... রেডিওর লাউডস্পীকার?—সেটা ব্যতিক্রম,—অতি-আধুনিকার অতিরিক্ত বেহায়াপনা।

সুরকির রাস্তার শেষে একটি তেরছা বারান্দার সামনে গোল সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বুকটা ঢিপ-ঢিপ করিতেছে। সামনেই ঘর, বোধ হয় হল-ঘর। শব্দ হইল যেন লোক আসিতেছে, একটা খসখসে শব্দ—নিশ্চয় বিলাতী ঘাসের চটিপরা ব্যারিস্টার। বুকটাকে একটু চাপিয়া ধরিতে হইল। ঘরের ভারী পরদাটা নড়িয়া উঠিল।

পরদা ঠেলিয়া যে বাহির হইয়া আসিল সে ব্যারিস্টার নয়, চাকর। এসব বাড়িতে এদের অভিধেয় বোধ হয় 'বেয়ারা'। গায়ে একটা পরিষ্কার ফতুয়া, দেহটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তেলচুকচুকে। বাম বাহুতে একটা সোনার তাগা। কাঁধের উপর একটা ঝাড়ন; বাড়ির চাকরের মত তাহার ঝাড়নও বেশ পরিষ্কার।

প্রশ্ন হইল, "কাকে চান?"

কথাটা গলায় কোথায় আটকাইয়া গিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "গুরুসদয় বাবু...মানে এই ব্যারিস্টার সাহেবকে।"

"তিনি নেই এখানে।"

এত মধুর সংবাদ জীবনে কখনও শুনি নাই। বুকে যে হাওয়াটা আটকাইয়াছিল একটি তৃপ্তির নিশ্বাসে সেটা মুক্ত হইয়া গেল। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। একটু মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় গেছেন? আসবেন কবে?"

"কুমিল্লায় একটা সিডিশ্যন কেসে গেছেন, দিন-পনর লাগতে পারে।"

চাকরের মুখে 'সিডিশ্যন কেস' কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিত ভাবে চাহিলাম, তখনই কিন্তু ভাবিলাম—ব্যারিস্টারের বেয়ারা, এমন আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

যাই হোক, বাঁচা গেল। চেষ্টা করিলাম, গৃহকর্তা বাড়ি নাই, আমি আর কি করিতে পারি? এ-আপশোষ তো আর থাকিবে না যে জীবনে মস্ত বড় একটা সুবিধা পাইয়াও গাফিলতি বা ভয়ে নষ্ট করিয়া ফেলিলাম?

ফিরিতেছি, বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দরকার ছিল আপনার?"

দরকারটা বলিলাম।

বেয়ারা বলিল, "ছোট দিদিমণির মাস্টারির জন্যে? তাহ'লে আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

শঙ্কিত এবং সন্দিগ্ধভাবে ফিরিয়া চাহিলাম, লোকটা কি ভাবিয়াছিল আমি চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছি! একটু বিরক্তিও আসিল। যতটা সম্ভব মুখের ভাবটা ফিরাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আছেন সায়েব?—তবে যে তুমি বললে...?"

বলিল, "সায়েব নেই, তবে মাস্টার ঠিক করা মীরা দিদিমণির হাতে, তাঁকে ডেকে দেই গে; আপনি বসেন উঠে এসে।" বলিয়া বারান্দায় একটা উইকারের চেয়ার সামান্য একটু সামনে ঠেলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ব্যারিস্টার সম্বন্ধেই ভাবিয়া আসিয়াছি, তাহাদের কন্যা সম্বন্ধে কোন রকম গড়াপেটা ধারণা নাই। এ জীবগুলি আবার কি জাতীয় হওয়া সম্ভব, চেয়ারে বসিয়া নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করিতেছি এমন সময় মীরা উপর হইতে নামিয়া আসিয়া একটি চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল।—মাথায় পরিষ্কার বাঁকা সিঁথি, হাতে একখানি রাঙা মলাটের বই; একটি আঙুল তাহার মধ্যে গোঁজা, পায়ে এক জোড়া জরির কাজ-করা মখমলের স্যাণ্ডেল। প্রথম দর্শনেই মীরার খুঁটিনাটি সব দেখিয়া লওয়া অল্প দক্ষতার কাজ নয়; অন্ততঃ আমি তো পারি নাই; তবে এই তিনটে জিনিস চোখে যেন আপনিই পড়িয়া গিয়াছিল, বিশেষ করিয়া বাঁকা সিঁথি; তাই এগুলার উল্লেখ করিলাম। মেয়েদের মাথায় বাঁকা সিঁথি তখন সবে উঠিয়াছে,—অতি-আধুনিকার বিদ্রোহের বাঁকা অসি।

আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলাম।

মীরা প্রতিনমস্কার করিয়া এক বার তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। এমন একটা দৃষ্টি যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে মানিয়া লইতে হইল—হ্যাঁ, ব্যারিস্টারের কন্যা বটে! প্রশ্ন করিল—"টুইশ্যনের জন্যে এসেছেন?"

আমার অতিরিক্ত সঙ্কোচের কারণটা পরে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি।—প্রথমতঃ, এত সপ্রতিভ অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কথাবার্তা আমার এই প্রথম; দ্বিতীয়তঃ, ওরই হাতে টিউটার-নিয়োগের ভারটা থাকায় ওর গুরুত্বটা সেই সময় আমার কাছে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল।

ওর পিতার সামনে যেমন করিয়া উত্তর দিতাম বলিয়া আমার বিশ্বাস, কতকটা সেই রকম ভাবেই শঙ্কিত বিনয়ের স্বরে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"গ্র্যাজুয়েট?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এইবারেই পাস করেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তিনবার "আজ্ঞে হ্যাঁ" করিতে করিতে আমার দৃষ্টি আপনা-আপনিই নত হইয়া পড়িয়াছে। মীরা একটু চুপ করিল। বোধ হয় নত দৃষ্টির সুযোগে আবেদনকারীকে

আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "আমাদের এক জন অভিজ্ঞ লোক দরকার ব'লে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।"

আমি একটু ধোঁকায় পড়িয়া গেলাম। প্রতিদিন আট-দশটা টুইশ্যন করার কথাটা বলা নিরাপদ হইবে কি না, ভাবিতেছি, মীরা নিজেই বলিল—"বেশ, থাকুন। টুইশ্যনের আবার অভিজ্ঞতা কি তাও তো বুঝি না।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলাম; ঠিক এত সহজে আর এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ আশা করি নাই।

মীরা বইটা চেয়ারের পিঠে দুই বার ঠুকিয়া প্রশ্ন করিল, "কত মাইনে চান?"

অস্বীকার করিব না, এত সহজে নিয়োগের পর এমন উদার প্রশ্নে একেবারে কৃতকৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলাম। মুখে একটু কৃতজ্ঞ খোশামোদের ভাব যদি ফুটিয়া থাকে তো কিছু আশ্চর্য হইবার নাই তাহাতে। এর পূর্বে, তিন চার দিনের কম হাঁটাহাটি করিয়া কোন টুইশ্যনই সংগ্রহ করিতে পারি নাই, গার্জেন-সম্প্রদায়কে ভিজাইবার অত অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও।

ব'ললাম, "যা আপনাদের সুবিধা হয় অনুগ্রহ ক'রে দেওয়া।"

মীরার নাসিকার ডান দিকটা সামান্য একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আমাদের সুবিধার জন্যেই কি আপনি পথ চেয়ে এসেছেন?"

বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, একেই খুশী করিতে গিয়াছি, আর এর কাছেই এমন উল্টা প্রশ্ন। বলিলাম—সংলগ্ন কিছুই বলিলাম না, "আজ্ঞে—মানে হচ্ছে—আসল কথা···" বলিয়া মাঝখানেই থামিয়া গেলাম।

মীরার নাসিকার কুঞ্চনটা মিলাইয়া গিয়া কতকটা কৌতুকপূর্ণ হাসিতে ঠোঁট দুইটি একটু প্রসারিত হইল। বোধ হয় কথাটা শেষ করিতে পারি কিনা দেখিবার জন্য আমার মুখের পানে খানিকটা চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসির সঙ্গেই বলিল, "বলুন আসল কথাটা। আমরা ওটা খুব বুঝি, দ্বিধা করবার দরকার নেই; জানেনই তো ব্যারিস্টারের বাড়ি; বাবা আসল কথা আগে ঠিক না-ক'রে মক্কেলের কাগজপত্র ছোঁন না"—বলিয়া বেশ ভালো ভাবেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মীরা তাহার বাবার মক্কেলের সঙ্গে ব্যবহারের কথায় হাসে নাই, এত হাসিবার কথা নয় সেটা। আমার এই অকূল পাথারে পড়ার মত অবস্থা দেখিয়া, ও আর হাসি চাপিতে পারিতেছিল না, একটা ছুতা করিয়া প্রাণ খুলিয়া একটু হাসিয়া লইল।

পরক্ষণেই কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লইল—প্রগলভতা হইয়া যাইতেছে বুঝিয়াই হোক, কিংবা আমি আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়াই হোক। বলিল, "না, আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন; আচ্ছা, ধরুন···"

হঠাৎ সচকিত হইয়া ব'লল, "কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?—বাঃ; বসুন।"

আমার বসা উচিত ছিল না, এক জন অপরিচিতা যুবতী দাঁড়াইয়া সামনে; তবু মীরার বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বসিয়া পড়িলাম, এবং রাগ হইল মীরার উপর। মেয়েটা আসিয়াই আমায় দাঁড় করাইয়াছিল—তাহার নীরব সম্ভ্রম-জাগান উপস্থিতির দ্বারা, এখন আবার বসাইয়া দিল—তাহার ছোট্ট একটি হুকুমের দ্বারা। মরিয়া হইয়া খুব মোটা রকম একটা মাহিনা চাহিয়া আজকের এ-পর্ব শেষ করিতে যাইব, এমন সময় স্কুল হইতে আমার ভাবী ছাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। মীরা বলিল, "তোমার নতুন মাস্টারমশাই তরু; ঘরটা দেখিয়ে দাও। আপনি কাল সকালেই আসবেন তাহ'লে।"

সকালেই আসার অসুবিধা ছিল, হাসিটাও বড় তীক্ষ্ণ ভাবে বিঁধিয়াছিল, 'ওঠ বোস' করার ব্যাপারটাও মনে তখনও টাটকা—অর্থাৎ সেটা যে আমারই দুর্বলতা সেটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তখনও হয় নাই আমার, তাহার উপর শেষের এই হুকুম—মোটেই সুপাচ্য নয়। সান্ত্বনা মাত্র এই যে চাকরি ওর নয়, ওর পিতার, অর্থাৎ এক জন পুরুষের। আহত আত্মসম্মানকে সান্ত্বনা দিলাম—আসিব, কিন্তু অন্ততঃ একটা দিন দেরি করিয়া। ওর প্রথম হুকুমটা অমান্য করিয়া।

তাহার পর সন্ধ্যায় কিছু কেনাকাটা করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত সব গোছগাছ করিয়া রাখিয়া, এঁদের বলিয়া কহিয়া রাখিয়া পরদিন ভোরেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম। (ক্রমশঃ)

ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যে প্রাচীন কালের মানব

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভিতর দিয়া বুঢ়াবলঙ্গা নামে একটি নদী বহিয়া গিয়াছে, ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা শহর তাহারই পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। নদীটি সিমলিপাল নামক পর্ব্বতপুঞ্জের মধ্যে উত্থিত হইয়া বালেশ্বর জেলায় চাঁদিপুরের নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। নদীর যে-অংশ পাহাড়িয়া অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে বর্ষার সময়ে ইহা তীব্রবেগে ছুটিয়া চলে কিন্তু পাহাড় ছাড়িয়া সমতলভূমিতে পড়িলে আঁকিয়া-বাঁকিয়া মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়। এক সময়ে সিমলিপাল পর্ব্বতমালা আরও উচ্চ ছিল, কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন মাত্র তিন বা সাড়ে-তিন হাজার ফুটে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ বর্ষায় মেঘের দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া মেঘাসনী (৩৮২৩ ফুট) নাম লাভ করিয়াছে। সিমলিপাল হইতে বর্ষার সময়ে যে-সব কাদামাটি ও পাথর ধুইয়া আসে তাহা যুগের পর যুগ সঞ্চিত হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমির সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার কতক অংশ ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত, অবশিষ্ট বালেশ্বর জেলার মধ্যে অবস্থিত। বারিপদা শহর সমুদ্রকূল হইতে সোজা প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত, অথচ এক সময়ে যে এই স্থানেই সমুদ্র প্রবাহিত হইত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বারিপদা শহর নদীগর্ভ হইতে প্রায় ত্রিশ ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত। অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে শহরের নীচু অংশ কখনও কখনও নদীর দ্বারা প্লাবিত হয়, কিন্তু সচরাচর জল অতদূর ওঠে না। শীতকালে নদীর জল শুকাইয়া গেলে গর্ভের মধ্যে অথবা তটভূমির নিম্নতম স্তরে এক প্রকার পাথর বাহির হইয়া পড়ে। ইহাকে স্থানীয় লোকে অসুরহাড়িয়া বলিয়া থাকে, কেন না ইহার রং কতকটা হাড়ের মত এবং পাথরটির মধ্যে অনেক ছোটবড় গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অংশ আবার বাস্তবিকই হাড়েরই মতন মনে হয়। এই পাথরের বিষয়



তীর দিয়া মাছ ধরিবার চেষ্টা

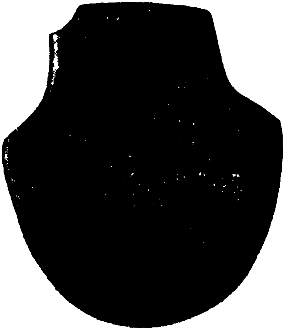
ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু মহাশয় বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং অপর কয়েক জন পরীক্ষা করিয়া অসুরহাড়িয়ার মধ্যে সমুদ্রজীবী মৎস্যের দাঁত, অয়েষ্টার নামক এক প্রকার শামুক এবং অন্য দু-এক প্রকার জীবের দেহাবশেষ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব এক সময়ে এই স্থানে সমুদ্র বর্ত্তমান ছিল এবং তাহার তলদেশে নানাবিধ জীবজন্তুর দেহাবশেষ সঞ্চিত হইয়া অসুরহাড়িয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কালক্রমে পলি পড়িতে পড়িতে সমুদ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সরিয়া

যায় এবং সমগ্র স্থানটি উচ্চ সমতলভূমিতে পরিণত হয়। ইহারই উপরে আজ মানুষের চেষ্টায় একটি সুরম্য নগরী স্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ আজকার মত সভ্য বা সমৃদ্ধ হয় নাই। তখন তাহারা চাষবাস পর্য্যন্ত জানিত না, বনের ফলমূল আহরণের দ্বারা জীবন ধারণ করিত অথবা বুদ্ধিবলে পশুপাখী শিকার করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিত। বারিপদা শহরের নীচে যে পলি সঞ্চিত হইয়া আছে তাহার মধ্য হইতে ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ আচার্য্য এবং ওরম্যান নামক জনৈক আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ্, উভয়ে মিলিয়া প্রাচীন কালের কয়েকটি পাথরে তৈয়ারি কুঠার খুঁজিয়া পান। বারিপদার উত্তর-পশ্চিম কোণে, প্রায় এগার মাইল দূরে, কুলিঅনা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। দেড় বৎসর



খননকার্য্যে রত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল



গড়পদা গ্রামে প্রাপ্ত তামার অস্ত্র ও তাহার উপরে উৎকীর্ণ লিপি

পূর্ব্বে কুলিঅনায় পুষ্করিণী-খননের সময়ে ঐরূপ আরও কতকগুলি শস্ত্র আবিষ্কৃত হয়। অল্প দিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মিগণ ভূস্তর-খননের দ্বারা সেখানে প্রাচীন ইতিহাসের আরও কিছু উপাদান সংগ্রহ করেন। সেই উপলক্ষ্যে ময়ূরভঞ্জের গ্রামবাসীদের বিষয়েও কিছু কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হয়।

কুলিঅনা গ্রামটি একখণ্ড উচ্চ সমতল ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহার আশপাশে নীচু মাটিতে চাষ হয়, কিন্তু উঁচু জমি অত্যন্ত কঠিন এবং কাঁকরে ভরা বলিয়া চাষ-আবাদ সম্ভব নহে। শাল, আসন, কেন্দু, চার, চরলা, অতাঙি প্রভৃতি নানাবিধ বন্য বৃক্ষলতায় ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশ আচ্ছন্ন। বনের মধ্যে ইতস্ততঃ রাজসরকার পথনির্ম্মাণের জন্য কাঁকরের খাদ খনন করিয়াছেন। এগুলিকে উড়িয়া ভাষায় গুড়ি-খাদান বলে। গুড়ি-খাদানগুলি কাটিবার সময়ে প্রায়ই প্রাচীন যুগের পাথরে তৈয়ারি অস্ত্রাদি বাহির হয়। কুলিঅনা গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুর, কলাবাড়িয়া, মুয়াবেড়ি, সাশুিম প্রভৃতি গ্রামে সর্ব্বসমেত প্রায় সাত শত যন্ত্র বা অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঠিক কতকাল পূর্ব্বে এই সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইত তাহা সমস্যার বিষয়, তবে সচরাচর এগুলি ভূপৃষ্ঠের দুই হইতে পাঁচ-ছয় ফুট গভীর স্তরে পাওয়া যায়। দু-একটি দশ ফুট গভীর স্তর হইতেও পাওয়া গিয়াছে।

মাটির নীচে বিভিন্ন স্তরের কোন্‌টি কোন্‌ সময়ে গঠিত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে চারিদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া মাটি এবং পাথর পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল কুলিআনার পূর্ব্বদিকে প্রায় দুই-তিন মাইল অন্তরে আরও উচ্চভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক সময়ে এইখানে ছোটখাট পাহাড়ের শ্রেণী ছিল এবং সেই পর্ব্বতমালা হইতে প্রাচীনকালে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া বুড়াবলঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইত। কালক্রমে পর্ব্বতটি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু জমির ঢালু পরীক্ষা করিলে এখনও সেই নিশ্চিহ্ন পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর পথ আবিষ্কার করা যায়। সেই নদী এককালে যে-সকল নুড়ি ও কাদা মিশাইয়া স্তরের পর স্তর রচনা করিয়াছিল, আমরা তাহারই মধ্যে পাথরে নির্ম্মিত কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র কুড়াইয়া পাই।



খননে প্রাপ্ত একখানি পাথরের অস্ত্র

প্রাচীন কালে মানুষ নদীস্রোতের কাছাকাছি বাস করিতে ভালবাসিত। তাহারা তখনও মাটি পোড়াইয়া জলের পাত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, সেই জন্য তাহাদিগকে জলের কাছে, হয়ত বনের ভিতরে, বাস করিতে হইত। ময়ূরভঞ্জের মত ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড, আফ্রিকার পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলে, ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশেও একই আকারের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে ইহার দ্বারা মানুষ প্রধানতঃ শিকার করিত এবং চামড়া হইতে মাংস ছাড়াইয়া তাহা নানারূপে ব্যবহার করিত।



চুড়ির দোকান

ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে, বিশেষতঃ সিমলিপাল পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী দেশে, খাড়িয়া নামে একটি আদিম জাতি বসবাস করে। ইহারা বনের ফলমূল আহরণ

করে এবং অরণ্যজাত ধুনা, মধু, মোম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য জাতির নিকটে বিক্রয় করে। সেই পয়সায় নুন ও কাপড় কেনে অথবা রাজাকে খাজনা দেয়। খাড়িয়া জাতি গাছে উঠিতে খুব ওস্তাদ। হাতে একখানি ধারাল কুঠার লইয়া ইহারা প্রায় খাড়া গাছেও সহজে উঠিয়া যায়। প্রথমে এক দিকে গাছের গুঁড়িতে কোপ মারিয়া পায়ের বুড়া আঙুল রাখিবার মত জায়গা করিয়া লয়। তাহার পর অপর হাতে কুঠার লইয়া আরও উপরে কোপ মারে, সেখানে অন্য পায়ের বুড়া আঙুলে ভর দিয়া কিছু উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপে ক্রমাগত কোপ দিতে দিতে বহু উচ্চ গাছেও খাড়িয়াগণ উঠিতে পারে। এ-বিষয়ে ময়ূরভঞ্জে তাহাদের জোড়া আর মেলে না।

এক দিন কুলিঅনায় আমরা কয়েক জন খাড়িয়ার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলাম। তাহাদের নিকটে শুনিলাম যে বনে তাহারা বিভিন্ন ঋতুতে চার, কেন্দু প্রভৃতি নানাবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া থাকে। আবার মাটির ভিতরে খামালুর মত অনেক প্রকার কন্দমূল সংগ্রহ করে। মাটির ভিতরে মূল কিন্তু সবগুলি সহজলভ্য নহে। কোন কোন লতার মূল পর্য্যন্ত পৌছিতে এক মানুষের বেশী গভীর গর্ত্ত করিতে হয়। পুরুষেরা খন্তা লইয়া মাটি কাটে এবং ঝুড়িতে মাটি তুলিয়া দেয়, খাড়িয়া মেয়েরা সেই মাটি ফেলিতে থাকে। অবশেষে হয়ত বড় এক খণ্ড মূল সংগৃহীত হয়, তখন সকলে মিলিয়া তাহা ভক্ষণ করে।



হাটে মা ও ছেলে

ঝুড়ি নির্ম্মাণ করিবার উপাদানও গ্রামবাসিগণ বনের লতাপাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়, সব সময়ে বাঁশ দিয়া নির্ম্মাণ করে না। আমরা পৌষ মাসে কুলিঅনায় খননকার্য্যের জন্য গিয়াছিলাম, তখন বনে একটি লতায় স্তবকে স্তবকে সাদা ফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। এই লতার সাহায্যে গ্রামের মধ্যে লোকে ঝুড়ি বুনিয়া লয়, ইহার নাম অতাণ্ডি। বনের মধ্যে বহুবিধ গাছের ফল হইতে ময়ূরভঞ্জের অধিবাসিগণ তৈল নিষ্কাশন করিয়া থাকে। ভেলা, বাঘনখীর ফল, মহুয়া ও রেড়ীর বীজ



ধান মাপিয়া দিতেছে



গয়লাদের বাড়ীতে দেওয়ালে আলপনা

এবং শিয়ালকাঁটার সরিষা হইতে নানা উপায়ে ইহারা তেল বাহির করিতে জানে। তাহাদিগকে এজন্য কলুর শরণাপন্ন হইতে হয় না। শুকনা তাতের দ্বারা অথবা বীজগুলিকে ছেঁচিয়া ফুটাইয়া অথবা ভাপানোর পর দুই খণ্ড কাঠের মধ্যে নিষ্পেষিত করিয়া তাহারা যে কি সহজে তৈল সংগ্রহ করে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কোন তেল ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়, কোনটি গাড়ীর চাকায় দিবার জন্য, কোনটি রন্ধনকার্য্যে প্রয়োগের জন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কিছু দিন পূর্ব্বেও ময়ূরভঞ্জে একটি প্রাচীন শিল্প জীবিত ছিল, এখন তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সিমলিপাল পর্ব্বতের মধ্যে লৌহের উৎকৃষ্ট খনি আছে। এখানকার কামার জাতি পূর্ব্বে দুইটি পায়ে চালানো হাপরের সাহায্যে ছোট চুলিতে লোহা গলাইত। কিন্তু লৌহ গলানোর জন্য অনেক কাঠ-কয়লার প্রয়োজন হয়। রাজ্যে বনসম্পদ সংরক্ষণের জন্য আজকাল সরকার তাহাদিগকে কাঠ-কয়লা পোড়াইতে দেন না বলিয়া লৌহশিল্পটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও এমন দু-চার জন বৃদ্ধ কারিগর আছে যাহারা নিজে হাতে লোহা গলাইয়াছে, কিন্তু আজ তাহাদের একান্ত দুরবস্থা। কেহ চাষবাস ধরিয়াছে, কেহ বা কেনা লোহায় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামবাসীর নিকটে বিক্রয় করে।

বনের মধ্যে স্বীয় বুদ্ধিবলে এবং পরস্পরের সাহচর্য্যের দ্বারা ইহারা সকলে বাঁচিয়া থাকে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ করিলে ইহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই কঠিন হইত, তাই গ্রামের দরিদ্র অধিবাসিগণের মধ্যে সামাজিকতার বোধ শহরের মধ্যবিত্ত অধিবাসিগণ অপেক্ষা হয়ত বেশী। গ্রামের মধ্যে প্রায়ই ঢাক-ঢোলের বাজনা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত 'সভ্য' হইয়াছে তাহারা হরিনাম সংকীর্ত্তন করে, তদপেক্ষা 'অসভ্য' জনে মনের আনন্দে নাচগান করিয়া থাকে।

খাড়িয়াদের মত বাথুড়ি নামে অপর একটি জাতি কুলিআনার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করে। বাথুড়িরা দারিদ্র হইলেও খাড়িয়া জাতি অপেক্ষা অবস্থাপন্ন।



হাটে কামার-বৌ ও তাহার ছেলে



চুন প্রস্তুত করিবার জন্য নদীতে ঝিনুক কুড়াইতেছে



বুড়াবলঙ্গা নদীর দৃশ্য



হাটে কেন্দফল বিক্রয় করিতেছে

বাথুড়িরা চাষবাস করে, পাথর বা কাঠের যাঁতে তেল পিষিয়া লয় এবং অসুখ করিলে বনের ওষধি-সংযোগে তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকে। বাথুড়িদের নানাবিধ নাচগান আছে। চাঙ্গু নামে ইহাদের এক প্রকার চর্ম্ম-নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র আছে। বসন্তকালে চাঙ্গু পিটিয়া বাথুড়ি যুবকগণ গ্রামে গ্রামে নাচ দেখায়। স্বীয় গ্রামে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সম্মিলিতভাবে নৃত্য করে। ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালের সংখ্যা কম নহে। সাঁওতালগণ অপরাপর জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্রভাবে বাস করে। তাহাদেরও নাচগান আছে এবং সাঁওতাল-গ্রামে মাদলের শব্দ রোজ সন্ধ্যাবেলা শুনিতে পাওয়া যায়। শীতকালে কুলিঅনায় সাঁওতালদের কুকুড়া-উড়া নামে একটি বিখ্যাত পরবের অনুষ্ঠান হয়, সারারাত নাচগান চলিতে থাকে এবং ক্রোশ-ক্রোশান্তর হইতে নানা জাতির লোক সেই মেলা দেখিতে আসে।

আমরা যে-সকল পাথরের অস্ত্র মাটি খুঁড়িয়া পাইয়াছিলাম, তাহা লইয়া খাড়িয়া, বাথুড়ি, ভূমিজ প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই আলোচনা করিতাম। আজকাল সকল জাতিই লোহার যন্ত্রাদি ব্যবহার করে। পাথরের মধ্যে যাঁতা, শিল-নোড়া, থালা, বাটি ও তেল পিষিবার যাঁতের অংশ-বিশেষ নির্ম্মিত হয়। সেই জন্য পুরাকালের পাথরের অস্ত্রগুলি ইহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তু। তাহারই মধ্যে যেগুলি ঘষিয়া মাজিয়া পালিশ করা হইত, ময়ূরভঞ্জের গ্রামাঞ্চলের লোকে এখনও সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া থাকে। তবে পূর্ব্বকালে লোকে নিত্য প্রয়োজনের জন্য উহা ব্যবহার করিত, ইহারা তাহার লৌকিক ব্যবহার কিছু জানে না। এগুলিকে অলৌকিক পদার্থ বলিয়া কল্পনা করে। পালিশ করা পাথরের কুঠারকে উড়িয়া ভাষায় চড়কপথর বলে, ইহার অর্থ বাজ-পাথর। ইহাদের ধারণা বজ্রপাতের সময়ে মাটির উপরে একখণ্ড এইরূপ পাথর বর্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস চড়কপথর কুড়াইয়া পাইলে ঘরে রাখা উচিত, তাহাতে গৃহস্বামীর মঙ্গল হয়।

পাথরের অস্ত্রাদির ব্যবহার কত কাল হইল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমাদের নিকটে আজ তাহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালের মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী আমাদের নিকটে বিস্ময়ের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। মাটি খুঁড়িলে আমরা এইরূপে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন খুঁজিয়া পাই। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মধ্যেই অন্যান্য অঞ্চলে প্রস্তর-যুগের পরে তাম্রযুগের আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যায়। তখনও মানুষে লোহা গলাইতে শিখে নাই, তামার দ্বারা কুঠার এবং বর্শাফলক নির্ম্মাণ করিয়া লইত। এরূপ তামার একখণ্ড কুঠারফলক কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে হয়ত কেহ কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে কোনও রাজা জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া দানপত্র সেই তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। গড়পদা নামক গ্রামের সেই ব্রাহ্মণপরিবার উত্তরকালে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু আজও তাঁহাদের গৃহে প্রাচীন কালের উৎকীর্ণ দান-লিপিটি সযত্নে রক্ষিত আছে।

ময়ূরভঞ্জের ইতস্ততঃ আমরা এইরূপ প্রাচীন সভ্যতার নানাবিধ নিদর্শন দেখিতে পাই। তদ্ভিন্ন গ্রামবাসীদের মধ্যে পূর্ব্বকালের শিল্পকর্ম্ম তো এখনও ক্ষীণকায় অবস্থায় কিছু কিছু বাঁচিয়া আছে। চেষ্টা করিলে হয়ত ইহা হইতে আমাদেরও শিখিবার মত জিনিস পাওয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে গ্রামের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতিও সাধিত হয়।

ভারতবর্ষের ধর্ম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাচীন ধর্ম দেখা যায় না যার মূলে দেবতার ভয়ের স্থান নেই। শাসনেই তাদের সকলের মূল প্রেরণা। প্রায় সকল ধর্মই জোর করে মানুষকে কতকগুলি আচার ও নিয়মপালনের তাড়া দিয়েছে—পাপের ভয়, নরকের ভয়, উৎকট শাস্তির ভয়, শত সহস্র ভয়ের শাসনে কঠোর গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা হয়েছে ধর্মজীবনকে। এই সমস্ত ধর্মের মূলে ছিল আদিম মানুষের অন্ধশক্তিকে পূজা। এক জন সর্বশক্তিমান দেবতা সৃষ্টিকে বাইরে থেকে চালনা করছেন, তাঁর অনুশাসন তিলমাত্র অমান্য করলে গুরুতর শাস্তি অপেক্ষা করে আছে—সকল ধর্ম্মেরই এই হ'ল মূল কথা।

এর বিশেষ একটি কারণ আছে। প্রথম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল নিতান্তই অনিশ্চিত। আহার-বিহার প্রভৃতি সকল প্রয়োজনের ব্যবস্থাই ছিল একান্ত দুর্লভ, পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অত্যন্ত ক্রূর, নিষ্ঠুর। পশুচারণ থেকে কূট বণিকবৃত্তি পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের সকল অবস্থাতেই দেখি কাড়াকাড়ির চেষ্টা ছিল প্রবল। এই দস্যুবৃত্তি নির্মম হয়েছিল মানব-সমাজে। এরই তাড়নায় সেদিন মানুষ শক্তিকে শ্রদ্ধা করেছে, শক্তির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতাকে দূর করে, শান্ত করে, প্রাণপণে তাকে আপনার পক্ষে টানবার চেষ্টা করেছে। জীবনকে এই ভাবে দেখার ফলে তাদের ধর্মে শাসন-নীতি হয়েছে প্রবল; এরই ফলে সে-যুগে যার হাতে ছিল শাসনদণ্ড সে জোর করে সকলকে এনেছে নিজের মতে, নিজের বাহুবলের দ্বারা এবং দেবতাকে স্বপক্ষে টেনে সে নির্লজ্জের মত পীড়িত করেছে অন্যকে।

একমাত্র উপনিষদের ধর্মেই দেখতে পাই ঋষিরা দূর করতে পেরেছেন শক্তির ভয়ংকর এই ভয়কে। তাঁরা বলেছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এমন দৃঢ়স্বরে এত বড় কথা কোনো ধর্মে কোথাও বলা হয় নি। এই আনন্দের দিকেই চলেছে সৃষ্টি, ভয়ের দিকে নয়। এ-কথা যাঁরা বলেছেন তাঁদেরও জীবন তখন ছিল বিভীষিকার দ্বারা হিংস্রতার দ্বারা ঘেরা। এই আদিম যুগের মানুষই যেদিন অন্যত্র পূজা করেছে অন্ধ শক্তিকে, সেই যুগেরই আর এক মানুষের অন্তরে প্রথম এল উপনিষদের মন্ত্রে আনন্দের অমোঘ বাণী, সে-বাণী এল আমাদেরই এই ভারতবর্ষে।

আনন্দের এ বাণী সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলিত হবার বাণী। মূঢ়তা বা ভয়ের চিহ্নলেশমাত্র এর মধ্যে নেই। এই সাধনায় সদাজাগ্রত চেষ্টার সুনিশ্চিত নির্দেশ আছে। আপনাকে নির্মল, শুচি করতে হবে, সৃষ্টির মূলে নিহিত রয়েছে যে ঐক্য তাকে মৈত্রীভাবের চর্চায় বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, পরমদেবতার সঙ্গে নিগূঢ়তম আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। ইহজীবনের সকল প্রিয়সম্পর্কের অপেক্ষা তিনি প্রিয়তর এই কথাই তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন দ্বিধাহীন উদাত্ত কণ্ঠে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা", তিনিই অন্তরের অন্তরতর আত্মা যিনি এই বিশ্বের অন্তরে নিরন্তর বাস করছেন। তিনি সকল প্রিয়ের প্রিয়, সকলের চেয়ে ভয়ংকর তিনি নন। এই

উপলব্ধির মধ্যে মূঢ়তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই, মন্ত্রতন্ত্রের নিষ্ঠুর বাক্যজালে কোথাও তাঁকে শান্ত করার ভীরু চেষ্টা নেই, বিকৃতির কণামাত্র স্থান নেই।

ঋষিরা বলেছেন, সকলকে সমান দেখতে হবে, সাধনাকে সকলের মধ্যে সার্থক করে তুলতে হবে। সকলের মধ্যে আপনাকে যে দেখেছে অবিকৃত বিমল দৃষ্টিতে, তারই সাধনা সার্থক। এই যে সাম্যবোধ, অন্য দেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে একেই বলা হয়েছে ডেমক্র্যাসি। এ-দেশের সাধনায় একে যে মানা হয়নি তা তো নয়, উচ্চনীচতার ভেদ দূর করবার চেষ্টা এ-দেশেও হয়েছে। সাম্যের সাধনা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্রই যে দূর হয়ে যাচ্ছে এর কারণ কেন্দ্রগত বিশ্বাসে কোথাও এর সংকল্পের অভাব রয়েছে। আজ তাই সে এমন নিঃশেষে উন্মূল হয়ে অমানুষিক বিপ্লবের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল।

ডেমক্র্যাসির ইতিহাসের আরম্ভে দাস-ব্যবসা যখন দেশে দেশে মানবতাকে কলুষিত করেছিল সে-যুগে দস্যুবৃত্তির নিপীড়ন ছিল বিস্তৃত। ধর্মপ্রচারের উন্নত ধ্বজার সঙ্গে ডেমক্র্যাসির ভক্তেরাই এক দিন সর্বত্র নিষ্ঠুর অসাম্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্, ধর্মের যা মূল কথা তা প্রবেশ করে নি তাদের অন্তরে। বিশ্বের রাজার শক্তিকে মেনে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থেরই সিদ্ধি করব— এই ছিল একমাত্র বোধ।

তাই বলি, নির্মল মূঢ়তাবর্জিত উপনিষদের যে ধর্ম তা শুধু আদিম কালেই নয় পরবর্তী কালেও অন্য কোথাও দেখা যায় নি,—ভয়ংকরকে ভয়ংকর আচারের দ্বারা শান্ত করার চেষ্টা কোথাও নেই প্রাচীন এই ঋষিদের ধর্মে।

পরবর্তী যুগে দুঃখকে এক দিন মানা হয়েছে এই ভারতবর্ষেই। বৌদ্ধযুগের সূচনায় একটা অবসাদ এল; এই বোধ এল যে জীবনযাত্রা সুখের নয় শান্তির নয়, যাকে পাই তাকে এক দিন অকস্মাৎ হারাই— মৃত্যু জীবনকে আক্রমণ করে, জরা পীড়িত করে দেহকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে অসম্ভব নয় এ-ধরণের চিন্তা এবং অনুভূতি। বেদে কিন্তু কোথাও দেখি না এ-ধরণের অবসাদ। তাঁরা বারংবার চেয়েছেন সৃষ্টির এই আনন্দ-যজ্ঞে মুক্ত আলোকে, বাতাসে স্থান পেতে।

অস্তিত্বের সম্বন্ধে দুঃসহতাবোধ এবং জীবনকে এড়াবার দুর্বলতা সেই দেশেই এক দিন এল, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই এল একটি মহান বাণী। দুঃখকে স্বীকারের সঙ্গে বুদ্ধ তার নিবৃত্তির কথাই বলেছেন। সেও কিছু কম বড়ো কথা নয়। মানব-জীবনের যে দুঃখ তা ব্যক্তিগত দুঃখ, বুদ্ধ এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আপন প্রবৃত্তি, আপন কামনার চরিতার্থতা থেকে বঞ্চিত হওয়াতেই মানুষের দুঃখের মূল আছে নিহিত। এই তত্ত্বের সঙ্গেই তিনি তাই বললেন মৈত্রীর বাণী। সকলকে সমান করে, এক করে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখলে তবেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি। মাতা যেমন করে আপন একমাত্র পুত্রকে ভালোবাসেন সর্ব-মানবকে সেই ভাবে ভালোবাসলে তবেই দুঃখের নির্মমতার হাত থেকে মুক্তি, তবেই সীমাবদ্ধ এই সংসারে অসীমের উপলব্ধি হবে সম্পূর্ণ। প্রেমের এই উদার উপলব্ধিতেই জীবনের মুক্তি। এখানেও কোনো দণ্ডধারী ভয়ংকরের কল্পনা দেখি না। অকৃতার্থতার দুঃখ জীবনে আছে, সে-কথা অস্বীকার করা হয় নি কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এ-কথাও বলা হয়েছে যে অকৃতার্থতার এই দুঃখ আত্মপরাভবের লজ্জায়, কোনো অদৃশ্য শাসকের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মপালনের ত্রুটি এর কারণ নয়।

অতএব দেখতে পাই উপনিষদের মন্ত্রে "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং" সর্বব্যাপী সত্তার কথা কল্পনা করা হয়েছে, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয়ের মন্ত্রে বৌদ্ধযুগেও সেই একই সত্তার কল্পনা করা হয়েছে। এই মন্ত্রের কোথাও কোনো অংশে তিলমাত্র নালিশ নেই। উপনিষদের ঋষি বলেছেন শান্তির দিক থেকে, বলেছেন পূর্ণতার দিক থেকে; বুদ্ধ বলেছেন আপনাকে ভোলবার দ্বারা, পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের দ্বারা জীবন সাধনার বাণী। লোভ-ক্রোধ জয়ের তাঁর যে বাণী সেও সেই "তেন ত্যক্তেন"রই বাণী। মূলত দুইই সম্পূর্ণ একই বাণী।

জগতের বীভৎস ব্যভিচারের মধ্যে আজ এই সত্যটি বিশেষ করে স্মরণ করবার দিন এসেছে। লোভ কোরো না—এ বাণী আজ সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ আবর্তে মানুষ মনে রাখতে পারছে না। এর স্থান বুঝি আজ রাষ্ট্রনীতি থেকে একেবারেই মুছে গেল; সমাজনীতির ক্ষেত্রে তো বহু পূর্বেই মানুষ এ-বাণী বিস্মৃত হয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জার কথা, উপনিষদের মন্ত্রের এই দেশেও মানুষকে অপমানিত আমরা কম করি নি। লোভের তাড়নায় মানুষ আজ মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে দিকে দিকে বলহীন করছে, মারছে। যুগান্তরের সাধনায় পাওয়া সকল বিশ্বাসকে সে আজ নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে, দুর্বল করছে। এতে যে প্রতিনিয়ত সে নিজেকেই আঘাত করছে তা নিজেও জানে না।

এই ভেদবুদ্ধি যে আমাদের দেশের অন্তরের জিনিস নয় তা আমরা ভুলতে বসেছি। এর পীড়নে কী পরিমাণে পঙ্গু আমরা হয়েছি এবং আজো হচ্ছি, জীবনের ক্ষেত্রে ক্রমশই কি ভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি তা আমরা এতদিন বুঝি নি, আজো বুঝতে পারলুম না। আমার মনে হয় এই মনোবৃত্তির জন্যে দায়ী আমাদের অনার্য রক্ত যা পরবর্তী যুগে অলক্ষিতে আমাদের দেহের মধ্যে এসে মিশেছে। ইতিহাস ভালো করে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মনে হয় এই কারণেই হয়ত মানবতার বা সাম্যের যে ধর্ম তা মুছে গিয়েছে। অনার্যরক্তের সংমিশ্রণের বিকৃতিকে অস্বীকার কেমন করে করি যখন চারিদিকে দেখি এই বিকৃত মনোবৃত্তি শক্তির নামে, বলের নামে সমগ্র মানব-সমাজকে জীর্ণ করছে। দৃষ্টি তাদের এতদূর অন্ধ যে তারা দেখতেও পায় না এতে নিজেরই নৌকায় ছিদ্র করা হচ্ছে।

আমাদের দেশেও আজ তাই ভাববার সময় এসেছে। ভাবনা জাগছে ভারত আজ তার এই চরম বিপদের সময় আপনাকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? এর মূল কারণ নির্দেশ করা একেবারেই কঠিন নয়। ধীরে ধীরে অতি সুনিশ্চিত এবং সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এ-দেশে মানুষের কেন্দ্রগত শক্তির মূল ছেদ করা হয়েছে, তাকে অপহরণ করা হয়েছে কূট রাষ্ট্রনীতির সাহায্যে। আজ সাহায্য করবার ডাক এসেছে, কিন্তু সে-শক্তি এখন কোথায়। ভারত সহায়তা করতে পারবে না বিশ্বমানবকে কোনো ক্ষেত্রেই। আমরা দাস্যবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়েছি মনুষ্যত্ব হারিয়ে; আজ কাদের সাহায্যে এই যুগান্তরগত পরাভবের গ্লানি দূর করব। মানুষকেই যে আমরা তিলে তিলে নিঃশেষে হারিয়েছি। যে ধর্ম এক দিন মানুষকে কাছে টেনেছিল সাম্যের আকর্ষণে, প্রেমের আকর্ষণে তাতে এতবড়ো কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেবতাকে যারা ভয়ের তাড়নায় পূজা করে তারা দেবতার পশু, তারা নিজেদের তুচ্ছ আচারবিচারের যূপে আবদ্ধ হয়ে আছে। পূজারীর গৌরব তাঁদের জন্য নয়, সৃষ্টির যজ্ঞশালায় কোনো শুভকার্যে তাদের অধিকার নেই। দেখতে পাচ্ছি সেই হিংস্র পশুরাই আজ দলে দলে খরনখরদন্ত বিস্তার করে দিকে দিকে উদ্দাম হয়ে জেগে উঠেছে। কে আজ তাদের শান্ত করবে, নিবৃত্ত করবে জানি নে।

এই নিদারুণ বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তবু গৌরবের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করবার দিন এসেছে যে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সেই ভারতবর্ষে যে-দেশে পরম আনন্দরূপের চরমতম উপলব্ধি এক দিন সার্থক হয়েছিল, এই দেশেই এক দিন মানুষকে ভয়ের কঠোর বন্ধন থেকে উদ্ধার করে আনন্দের উদারলোকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন সেই ঋষিদের আজ প্রণাম নিবেদন করি।

[শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য্যের উপদেশ, ১৫ শ্রাবণ, ১৩৪৭। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত]

কাত্যায়নী

"বনফুল"

প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাভাতিক গীতি-বন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ পাঠে মগ্ন, কেহ গোচারণে গিয়াছেন, কেহ সমিধ আহরণে ব্যস্ত। আশ্রম-অঙ্গন-প্রান্তে যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী কাত্যায়নী উদূখলে মুষল প্রহার করতঃ নীবার কণ্ডন করিতেছেন এবং কৌতুক সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন অদূরে ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-সন্নিহিত গুল্ম-ছায়ায় সাবধান-সঞ্চরণে তিত্তির-দম্পতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অতিশয় চতুর সঙ্গোপনশীল প্রাণী ইহারা, আশ্রম শান্ত না হইলে আত্ম-প্রকাশ করে না। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলে প্রত্যহই কাত্যায়নীর যে-কাহিনীটি মনে পড়ে অদ্যও তাহা মনে পড়িল। কথিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া গুরুর নিকট শিক্ষিত বেদ বমন করিয়া দেন এবং সে সমস্তই তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরিয়া নাকি বহির্গত হয়। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলেই কাত্যায়নী উক্ত অলৌকিক কাহিনীটি স্মরণ করেন। একদা স্বামীকে এ-বিষয়ে প্রশ্নও করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নাই, মৃদুহাস্য করিয়াছিলেন মাত্র। জ্ঞান-গম্ভীর তপস্বী স্বামীকে প্রগল্‌ভ প্রশ্ন করিতে কাত্যায়নীর শঙ্কা হয়। বস্তুতঃ, স্ত্রী-প্রজ্ঞা কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্য-সমীপে চিরকালই সঙ্কুচিতা, গৃহ-কর্ম্মের মধ্যে তিনি আজীবন আপনাকে অবলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, মৈত্রেয়ীর মত তো তাঁহার বাক্‌পটুতা অথবা বিদ্যাবত্তা নাই যে স্বচ্ছন্দে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দীর্ঘ কথোপকথনে নিরত হইতে পারেন। ভারতপূজ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তিনি কি আলাপ করিবেন!

সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন কুটীর-অভ্যন্তরে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "অয়ি, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি, জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, আত্ম-প্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। অয়ি, পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়—"

কাত্যায়নীর ওষ্ঠপ্রান্ত ঈষৎ বক্র হইল। তিনি অনুমান করিলেন অদ্যও সপত্নী মৈত্রেয়ী স্বামী-সহ ব্রহ্ম-বিষয়ক বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াছেন। কাত্যায়নীর মনে প্রশ্ন জাগিল, ইহা না করিয়া অরণি-সহযোগে অগ্নি উৎপাদন করতঃ ভর্ত্তার নিমিত্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিলে কি পত্নী-কর্ত্তব্য চারুতর রূপে নিষ্পন্ন হইত না? কাত্যায়নী বুঝিতে পারেন না মৈত্রেয়ীর মনোভাব কি। মৈত্রেয়ী কোন দিনই গৃহকর্ম্ম বিষয়ে তাবৎ উৎসাহ প্রকাশ করেন না, গৃহকর্ম্মে সাতিশয় নিপুণাও নহেন, ব্রহ্ম-বিদ্যা-অনুশীলনেই তাঁহার যত কুশলতা! ব্রহ্ম, আত্মা, অমৃত! কাত্যায়নীর ওষ্ঠ-প্রান্ত বক্রতর হইল। তিনি অধিকতর শক্তিপ্রয়োগ করতঃ উদূখলে মুষলচালনা করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষোভে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুনরায় তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল স্বামী বলিতেছেন, "যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণাকে গ্রহণ করিলে অথবা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দসমূহ গৃহীত হয়, যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হয় তেমনি অয়ি মৈত্রেয়ি, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ—"

ধূম শব্দটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিবামাত্র কাত্যায়নীর স্মরণ হইল গত সন্ধ্যায় ধূমানাম্নী আশ্রম-ধেনুটি কিঞ্চিৎ অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল, অবিলম্বে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, হয়ত অচিরে তাহার শুশ্রূষারও প্রয়োজন হইবে। উদূখল-গাত্রে মুষলটি তির্য্যগ্‌ভাবে

স্থাপনকরতঃ কাত্যায়নী গোশালা অভিমুখে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া তাঁহার চিন্তা দূরীভূত হইল, দেখিলেন ধূমা সুস্থ হইয়াছে, তৃণ-চর্ব্বণে আর অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। কাত্যায়নীকে দেখিয়া ধূম্রবর্ণা স্নিগ্ধ-নেত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল, কাত্যায়নী তাহার সুচিক্কণ পৃষ্ঠদেশে স্নেহভরে হস্তার্পণকরতঃ তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

অদূরে বৃদ্ধ আশ্রম-মৃগ চিত্রক ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্ব্বাদল-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল, কাত্যায়নীর পদশব্দে সে-ও তাহার শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত-শৃঙ্গ-শোভিত মস্তক তুলিয়া স্নেহ-প্রত্যাশী একাগ্র দৃষ্টিতে কাত্যায়নীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী তাহার নিকটেও গেলেন এবং ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমাকে লইয়া খেলা করিবার মত সময় এখন আমার নাই, আমার অনেক কাজ", চিত্রক শৃঙ্গ-শোভিত মস্তকটি একবার সঞ্চালিত করিয়া পুচ্ছটি ঈষৎ আন্দোলিত করিল এবং ভর্ৎসিত হইয়া অমনোযোগী বালক যেমন পাঠে মনঃসংযোগ করে তেমনি নবদূর্ব্বাদলে মনঃসংযোগ করিল।

কাত্যায়নী পুনরায় অঙ্গন-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল হয়ত এতক্ষণ বায়সকুল আসিয়া নীবার ভোজন করিতেছে। এবম্বিধ আশঙ্কা সত্ত্বেও কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাঁহাকে থামিতে হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, নবাগত আশ্রম-বালক আরুণির পীতবর্ণ উত্তরীয়টি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে। আরুণি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গোচারণে গিয়াছে। প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে বিধৌত আর্দ্র উত্তরীয় শুষ্ক করিবার মানসে আরুণি প্রত্যহ সেটি আমলকী-শাখায় প্রলম্বিত করিয়া দেয়, কিন্তু গ্রন্থি শিথিল থাকে বলিয়া প্রায়শই তাহা বায়ুতাড়িত হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রায় প্রত্যহই কাত্যায়নী আরুণির উত্তরীয়টি ধূলি হইতে উদ্ধার করেন। উত্তরীয় হইতে ধূলি অপসারণ করিতে করিতে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করতঃ অন্য দিনের মত আজিও স্থির করিলেন যে আরুণির ঈদৃশ অনবধানতার জন্য অদ্য তাহাকে ভর্ৎসনাই করিতে হইবে। একাধিক বার তিনি এ সঙ্কল্প করিয়াছেন। আরুণিকে এ-বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে তিনি সচেতন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর এ যাবৎ ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। দুষ্টমতি এই চঞ্চল বালকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভর্ৎসনা-বাক্য রসনা হইতে নির্গত হইতে চাহে না, পরন্তু স্নেহ-রসে সমস্ত অন্তর আপ্লুত হইয়া যায়। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও সত্য যে আরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়া-প্রবণতা, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা-ত্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদগুণাবলীই তাহাকে কাত্যায়নীর নিকট প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রবাসী বটুর উপর কিছুতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।

অঙ্গনে প্রত্যাগত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার আশঙ্কা অমূলক ছিল না, একাধিক বায়স আসিয়া নীবার অপহরণে রত হইয়াছে। করতালি-শব্দে তিনি তাহাদের বিতাড়িত করিলেন, ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-তলস্থ তিত্তির-দম্পতিও এই শব্দে সচকিত হইয়া গুল্মান্তরালে আত্মগোপন করিল। কাত্যায়নী উদূখল-সমীপবর্ত্তিনী হইয়া পুনরায় নীবার-সংস্কারে মনোযোগ দিলেন।

পুনরায় তাঁহার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল স্বামী আবেগভরে বলিতেছেন, "যেমন সৈন্ধব-খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু জলের যে-কোন অংশ হইতে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তেমনি অয়ি, এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘন। এই মহান্ আত্মা এই সমুদয় ভূত হইতে উত্থিত হইয়া ইহাতেই আবার বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"

এই সকল আধ্যাত্মিক বাক্যাবলী কাত্যায়নীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল না। কোন দিনই করে না। অদ্য কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল স্বামীর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর। সপত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া এমন আবেগ-কম্পিত-স্বরে স্বামী কি বলিতেছেন! কই, এমন আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে স্বামী তাঁহাকে কোন দিন কিছু বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না তো।

সহসা মৈত্রেয়ীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষা হইল। ক্ষোভ-সহকারে তিনি স্মরণ করিলেন মৈত্রেয়ী কেবল শাস্ত্র-চর্চ্চাই করে, আর কিছু করে না। এই যে বৃহৎ আশ্রম, যে-আশ্রমে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মানী গুণী অতিথি-বৃন্দ সততই আগমন করেন, যে-আশ্রম পূর্ণ করিয়া বিদ্যার্থীর দল সর্ব্বদাই বিরাজমান, যেখানে যাগ-যজ্ঞ নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই আছে, সে-আশ্রমের যাবতীয় পরিশ্রম-সাধ্য কর্ম্মভার তিনি একাই তো এত কাল বহন করিলেন। মৈত্রেয়ী তাঁহার শ্রমভার লাঘবে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে? সে তো অহরহ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা লইয়াই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কাত্যায়নীর স্মরণপথে উদিত হইল কিছু কাল পূর্ব্বে আশ্রমে যখন মন্ত্র-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখনও মৈত্রেয়ী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত না করিয়া সমাগত জনৈক মুনির সহিত ব্রহ্ম-বিষয়ক রচনায় সময়ক্ষেপ করিয়াছিল। একা কাত্যায়নীই কয়েক জন আশ্রম-বালকের সহায়তায় উদুম্বর বৃক্ষ হইতে স্রুব, চমস, ইন্ধন, অরণি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে একাই ব্রীহি, যব, তিল, মাস, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসুর, খল্য, খলকুল প্রভৃতি গ্রাম্য শস্য একত্র করিয়া দধি মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিতে হইয়াছিল। তিনিই রাত্রি জাগরণ করিয়া সমাগত অতিথিবর্গের জন্য পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী কিছুই করে নাই। তাঁহার আরও মনে পড়িল গত বৎসর ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য অংসল বৃষ-মাংস ভক্ষণেচ্ছু হইয়াছিলেন, তাহারও সমস্ত আয়োজন কাত্যায়নীকেই একা করিতে হইয়াছিল। তিনিই যজ্ঞাগ্নি-কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া মাংস-শূল্য প্রস্তুতকরতঃ স্বামীর সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ী কিছুই করেন নাই। অথচ স্বামীর আবেগ-কম্পিত যত আলাপ সব মৈত্রেয়ীর সঙ্গে! কাত্যায়নী একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

ক্ষণপরেই তাঁহার মনে হইল, না, না, ইহা মিথ্যা। মৈত্রেয়ী যতই না কেন ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনা করুক স্বামীর নিভৃত অন্তর-দেশে কাত্যায়নীরই আসন অবিচলিত আছে।

সহসা কুটীরাভ্যন্তরে আলোচনা বন্ধ হইল। দ্বার-প্রান্তে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দেখা দিলেন।

প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, পিঙ্গল জটাভারে বার্দ্ধক্যের রজতচ্ছটা, জ্যোতির্ম্ময় নয়ন-যুগল আনন্দ-সমুজ্জ্বল। কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "অয়ি কাত্যায়নি, আমি অত্য বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। মৈত্রেয়ী সত্যই আনন্দদায়িনী, তাহার আগ্রহ-বিশুদ্ধ অমৃত-পিপাসা প্রকৃতই অনন্তমুখিনী, সত্যই ব্রহ্মবাদিনী সে। অয়ি কাত্যায়নি, গৃহাস্থাশ্রমে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া আমি জীবনের শেষ-প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এইবার আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। সে জন্য তোমার ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে আমার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার মানসে আমি মৈত্রেয়ীকে আজ আহ্বান করিয়াছিলাম। মৈত্রেয়ী কি বলিল, জান? সে বলিল, আমি বিত্ত চাহি না, আমি অমৃতত্ব চাই, সমুদয়ের একায়ন যে আত্মা আমি তাহাকেই উপলব্ধি করিতে চাই। বিত্ত লইয়া আমি কি করিব! অয়ি কাত্যায়নি, আনন্দে, বিস্ময়ে, গর্ব্বে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন মৈত্রেয়ী আমার প্রিয়া ছিল আজ সে আমার প্রিয়তমা হইয়াছে—"

আবেগের আতিশয্যে বাক্‌রুদ্ধ হইল, যাজ্ঞবল্ক্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ব্রীড়াবনতমুখী মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এক অপরূপ শোভা বিকীরিত হইতে লাগিল।

ব্রহ্ম-অনভিজ্ঞা কাত্যায়নী পাংশু বিবর্ণমুখে উদূখল-সমীপে বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নন্দলাল বসুর শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

নন্দলাল সার্থক শিক্ষক। যে-জীবিকাব্রত তিনি নিয়েছিলেন, জীবনে সে-বিষয়ে পেয়েছেন অসামান্য সন্তোষ। তাঁর কাছে যে-সব শিল্পী ও ছাত্র সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিল্প-জীবনে নিজ নিজ ধারা খুঁজে পেয়েছেন। শিল্প সৃষ্টি করার এবং শেখার নেশা তাঁদের পেয়ে বসেছে। তিনি আশা করেন, দারুণ দুঃখে প'ড়েও তাঁরা সৃষ্টির কাজ বন্ধ করবেন না। তাছাড়া, তাঁরা আগের মত কেবলমাত্র পোর্ট্রেট বা মিথলজি না এঁকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। নন্দলাল আশা করেন, পরে বাংলা দেশ দৃশ্যচিত্র, প্রাণীচিত্র, এনগ্রেভিং, এচিং, মডেলিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃতী শিল্পী পাবে। ইতিমধ্যেই কয়েক জন সুনাম পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যে কয়েক জন বিশ্বভারতী-কলাভবনের কাজে তাঁকে সাহায্য করছেন, তাঁরা তাঁর কাছে থেকেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারান নি। ওঁদের এই স্বাধীনতা দিতে পেরেছেন বলে নন্দলাল গৌরব বোধ করেন।

শান্তিনিকেতনের কলাভবনের বহু কৃতী ছাত্র আজ ভারতবর্ষের প্রদেশে-প্রদেশে শিল্পবিদ্যালয়ে কাজ করছেন। তাঁদের কাছে কলাভবন ও নন্দলালের সান্নিধ্য জীবনের বড় প্রিয় বস্তু। নন্দলাল মনে করেন, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কৃপায় যে শিল্প-দৃষ্টি পেয়েছেন তা শান্তিনিকেতনে কলাভবনের কাজে লেগে সার্থক হয়েছে। শান্তিনিকেতনের বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রীরা, গুরুদেব এবং মুক্ত আকাশ তাঁর জীবন ক'রে তুলেছে আনন্দময়। তিনি বলেন, "এখানকার চার দিকের বস্তু সব দেখে আগের চেয়ে শত গুণ বেশি সুখ পাই। এখনো যে মনে তাজা আছি এইটাই তার মাপকাঠি।"

নন্দলালের শিক্ষকতার সব চেয়ে বড় সার্থকতা এইখানে যে তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের সম্বন্ধ শিক্ষক ও ছাত্রের নয়—নিবিড় স্নেহের সম্বন্ধ, বন্ধু ও বন্ধুর নিবিড় যোগ। এক দল মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে বেঁধেছেন। ঘুরে ফিরে তাঁরা তাঁর কাছে আসেন এই জন্যে নয় যে তিনি ভারতবর্ষের নামজাদা শিল্পী—পৃথিবীর রসিক জনের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের সব চেয়ে বড় গর্ব এইখানে যে তিনি তাঁদের আপন জন, তাঁদের আত্মীয়। শিক্ষা সম্বন্ধে এই পটো মানুষটি নূতন নূতন পরীক্ষা করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বা পদ্ধতি কিছুই গতানুগতিক নয়। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানবার জন্যে এক দিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "কলাভবনের মধ্যে দিয়ে আপনি কি চেয়েছেন, শিল্পীসৃষ্টি করতে না একটা শিল্প আন্দোলন সৃষ্টি করতে?"

জবাব এল, "না, কোন আন্দোলন সৃষ্টি করতে চাই না। ওতে আমার বিশ্বাস নেই। আন্দোলনের নাম ক'রে যত ম্যানারিজম্ গড়ে ওঠে। বরাবর শুধু চেয়েছি আমি শিল্পী হব আর শিল্পীর মনের মধ্যে শিল্পীকে জাগাবার সাহায্য করব। সেটাই সব চেয়ে বড় কথা। এখানে কাজ করতে আসবার সময় অবনীবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেখ, আমড়াগাছকে আম গাছ করার চেষ্টা কখনও ক'রো না। তিনি আরও বলেছিলেন, মনে রেখ, নুড়িতে জল ঢেলে যেমন গাছ হয় না, তেমনি যাদের মনের মধ্যে শিল্প নেই তাদের কখনো শিখিয়ে পড়িয়ে শিল্পী করা যায় না। শিক্ষকের কাজ—মালির কাজ। কিছুই সে সৃষ্টি করে না, বীজ পেলে, চারা পেলে যত্ন ক'রে বাড়িয়ে তোলে, বাঁচিয়ে রাখে।"

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠল, "কি ভাবে সেই কঠিন কাজ করেন? আপনার শিক্ষাপদ্ধতি কি রকম?"

প্রশ্ন শুনে নিমেষে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অন্তরাগ হয়ে উঠলেন, বললেন, "যে-পদ্ধতিতে অন্যান্য আর্ট



গঙ্গা শ্রীনন্দলাল বসু



ত্রিকালেশ্বর শিব শ্রীনন্দলাল বসু

বড়োদা গাইকোয়াড় স্মৃতিমন্দিরে ফ্রেস্কো



কুটির
শ্রীনন্দলাল বসু

স্কুলে কাজ শেখানো হয়, আমি মনে করি, তা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কর্তৃপক্ষেরা বছরে বছরে ভাগ ক'রে সিলেবাস করেছেন। এক বছর কপি করান, এক বছর ড্রয়িং শেখান, এক বছর বা নেচার স্টাডি করান। শেষে কম্পোজিশন শেখান বা অরিজিন্যাল কাজ করান। গোড়া থেকে ছাত্রদের কল্পনাকে বাড়াবার সাহায্য করেন না। শেষের দিকে যখন কল্পনার কসরৎ করবার চেষ্টা করেন তখন তার মধ্যে কল্পনা একেবারে মারা গেছে। মানুষের খাওয়া-চলা-ভাবার কাজ যুগপৎ একসঙ্গে চলে। কেউ যদি এক বছর ধরে শুধু খায়, তার পর এক বছর ধরে শুধু ভাবে, তাহ'লে তার সত্যিকার বিকাশ কি করে হয়? অ্যাকাডেমির প্রচলিত পদ্ধতি সেই রকম। ক্লাস বলতে আমাদের এখানে কিছু নেই। আমি এক-একটি মানুষকে ইউনিট ধরি। এখানকার কাজের ধারা প্রধানতঃ অরিজিন্যাল ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে। কপির পর কপি করিয়ে কারো হাত পাকাবার চেষ্টা করা হয় না। আমাদের কি ধরণের পদ্ধতি জান? বাঘ যেমন বাচ্চাদের শিকার শেখায়। সে নিজে শিকার করে, বাচ্চারা তা দেখে শেখে। নিজে শিকার না করে সে যদি তাদের শিকার-শেখার ক্লাস খুলত, তাহ'লে বাচ্চারা তো শিখতই না, সে নিজে আর বাচ্চারা সকলেই না খেতে পেয়ে মারা যেত। শিক্ষকদের নিজেদের রোজ কিছু কিছু সৃষ্টি করা দরকার। শিক্ষকেরা অনবরত শিল্পসৃষ্টি করতে থাকলে শিল্পের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠবে এবং তার ভিতর শিল্পীরা নিজ নিজ কাজের প্রেরণা পাবে। যিনি শেখাবেন আর যে শিখবে দুজনের মধ্যে মনে মনে সম্বন্ধ স্থাপন করার খুব দরকার। এ তো হাত দিয়ে হাতের কাজ শেখানো নয়,—প্রাণ দিয়ে প্রাণ জাগানো। আমার ধারণা, শুধু টেকনিক শিখে সত্যিকার কোন কাজ হয় না। ভিতরের শিল্পী জাগলে টেকনিক খুঁজে পাবেই সে। শিল্পের উপর অনুরাগই ছবির প্রাণ। টেকনিকের কৌশল দিয়ে অনুরাগ সৃষ্টি করা যায় না। বরং অনুরাগ থাকলে টেকনিক অনায়াসে শেখা যায়।

"কোন নূতন ছাত্র আমাদের কাছে এলে তাকে প্রথমেই বলি, একটি ছবি আঁক,—মন থেকে অরিজিন্যাল ছবি, কোন-কিছুর কপি নয়। সেই ছবিখানা দেখে



শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

মোটামুটি ছেলেটির সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিই। তার পর থেকে শেখানো শুরু হয়। অনেক দিন আগের কথা। তখন অবনীবাবুর কাছে কাজ শিখি, সেই সময়ে বিখ্যাত জাপানী শিক্ষাব্রতী ওকাকুরা এক বার আলোচনা-প্রসঙ্গে একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন। তিনি একটা ত্রিভুজ এঁকে তার তিন দিকে তিনটি শব্দ লিখেছিলেন, ট্র্যাডিশন, নেচার আর অরিজিন্যালিটি। তার পর বলেছিলেন, শিল্প নির্ভর করে যুগপৎ এই তিনটে জিনিসের উপর। কোন-একটিকে বাদ দিয়ে যে শিল্পসৃষ্টি হয় তা পূর্ণ নয়। ধর যেখানে ট্র্যাডিশন নেই, আছে শুধু নেচার আর অরিজিন্যালিটি, সে-শিল্প সব সময়েই যেন শৈশবে থাকে, তার একটা অতীতের দৃঢ় ভিত্তি থাকে না। শিল্পীর খামখেয়ালি তার মধ্যে প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আবার যেখানে নেচার নেই, শুধু ট্র্যাডিশন আর অরিজিন্যালিটি আছে, সেখানে শিল্পের মধ্যে তাজা প্রাণ থাকে না। যেখানে অরিজিন্যালিটি নেই, শিল্প

সেখানে হয়ে পড়ে একঘেয়ে। ওকাকুরার ঐ কথাটি শিল্প-শেখানর কাজে আমাদের খুব সাহায্য করেছে।



শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীঅতুল বসু অঙ্কিত। চিত্রাধিকারিণী শ্রীরাণী চন্দ

ছাত্রদের মধ্যে এই তিন দিকে একসঙ্গে বিকাশ যাতে হয় তার চেষ্টা আমরা করি। প্রথমে আঁকাই অরিজিন্যাল ছবি। যেখানে তার ভুল হয় বা যে জিনিসটা ভালি হয় না দেখি তখন সেই ধরণের কপির কাজ করাই। তার পর বলি প্রকৃতি থেকে সেই ধরণের কাজ করতে। আবার অরিজিন্যাল করে, আবার কপি করে, আবার প্রকৃতি থেকে আঁকবার চেষ্টা করে। ঘুরে ফিরে সেই অরিজিন্যালিটি, ট্র্যাডিশন, নেচার বারবার আসতে থাকে।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "এই ধরণে কাজ যে করান তার কি কোন নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে? ধরুন, প্রত্যেক বছরে অবশ্যকর্তব্যরূপে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার কপি বা অরিজিন্যাল কাজ ছাত্রদের করতেই হবে—এমন কোন ব্যবস্থা করেছেন? এবং পাঁচ বছরের কোর্স'টা বছরের হিসেবে স্তরে স্তরে ভাগ করা কি?"

নন্দলাল একটু হেসে জবাব দিলেন, "না। আমাকে অনেকে অনুরোধ করেন, বছর বছর ভাগ ক'রে একটা সিলেবাস তৈরি করুন। আমি বলি, বছর-বছরের সিলেবাস কেমন ক'রে করতে হয় জানি না—আমার একেবারে পাঁচ বছরের সিলেবাস। যে-কোন ছাত্রকে পাঁচ বছর পরে দেখবে শিল্পের টেকনিকের দিক থেকে যা যা শেখবার তা সে শিখেছে। কেমন করে শিখেছে, তা সে বলতে পারে না। কবে, কিসের পর যে কি শিখেছে তাও সে বলতে পারে না। কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় শেখাতে হবে—যেমন বস্তু দেখে নকল করা, মন থেকে কোন কাল্পনিক বস্তুর আকার দেওয়া, পারস্পেকটিভ, তুলির টান দেওয়া, রং মেশানো ইত্যাদি। এখানকার শিক্ষকদের মনে মনে সেগুলি ঠিক করা আছে আর ছাত্ররা সেগুলি শিখছে কি না সে-বিষয়ে সব সময়ে তাঁরা দৃষ্টি রাখেন। গোড়া থেকে আমরা তাদের মনের ভিতরের কল্পনাকে জাগাবার সাহায্য করি। ঠিক বলতে গেলে আমরা কাউকে শিল্প শেখাই না—শুধু তার মনে শিল্পের উপর যে অনুরাগ থাকে তা বাড়িয়ে দিই। তার পর সে আপনা থেকেই খুঁজে খুঁজে জিজ্ঞেস করে ক'রে শেখে। আমি জানি, তার মনে এই অনুরাগ থাকলে সে যেখানেই থাকুক শেখবার পথ বার করে নেবেই।

"সাইকেল চালাবার সময় শুনেছি পথের দিকে দৃষ্টি রাখলেই সাইকেল ঠিক চলে—গাড়ীর দিকে মন দিলেই পড়ে যেতে হয়। শিল্পীর মনকে জাগাবার চেষ্টা না করে যারা উৎকট উৎসাহে টেক্‌নিক শেখায় তারা সেই ভুল করে।

"আরও একটা কথা। কলাভবনের ছাত্রদের আমি শুধু শিল্পের ছাত্র হিসেবে দেখি না—দেখি এক পরিবারের লোক হিসেবে। আমার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে তাদেরও উন্নতি-অবনতি বাঁধা। সব সময়ে যে আমরা একসঙ্গে উঠি বসি।

"পূজনীয় গুরুদেব যখন এখানে আমায় আশ্রয় দিলেন, বলেছিলেন, আমি শান্তিনিকেতনে এসে নিজে শিল্পের সাধনা করব—ইচ্ছেমত ছাত্র নেব। কেবলমাত্র এখানে যেন একটি শিল্পের আবহাওয়া গড়ে তোলবার সাহায্য করি। এই কারণে কলাভবন এখনো অ্যাকাডেমি হয়ে

ওঠে নি। ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গড়ে তোলাতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলে কখনও বেশী ছাত্র নিতে পারি না। প্রত্যেক বছরে কত জনকে ফিরে যেতে হয়। ইচ্ছে করলে ছাত্রদের থাকবার আরও কয়েকখানা বাড়ী অনায়াসে করান যায়। কিন্তু তাহলে এখানে একটি আর্ট স্কুল গড়ে উঠবে—কলাভবনের বিশেষত্ব আর থাকবে না। সংখ্যায় বেশী হয়ে গেলে ছাত্রদের সঙ্গে আর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকবে না।"

নন্দলাল চুপ করলেন। তাঁকে চিন্তিত বোধ হ'ল, কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তাঁকে বিরক্ত না করে আমিও ভাবতে লাগলুম, বর্তমানে কলাভবনে ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, প্রায় সত্তর জন। ছোট একটা আর্ট স্কুলের ছাত্রসংখ্যা। এইখানেই নন্দলালের কৃতিত্ব। শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় দুরূহ সমস্যার সমাধানের সম্মুখীন হয়েছেন। স্টুডিয়োতে অনুসরণ করা হয় যে-শিক্ষাপদ্ধতি সেই পদ্ধতি দিয়ে একটা অ্যাকাডেমির কাজ চালাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর পদ্ধতির মধ্যে তিনটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রথমতঃ, তিনি শিক্ষার ইউনিট ধরেন ক্লাসের ছাত্রগোষ্ঠী নয়—এক-একটি ছাত্র। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে তুলতে চান। অ্যাকাডেমির প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষক কম-বেশি একটা কারখানার নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রস্বরূপ। তৃতীয়তঃ, তিনি অ্যানালিটিক পদ্ধতি মোটে পছন্দ করেন না। তিনি চান ছাত্রের মনের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্বন্ধে অনুরাগ জাগাতে, বিচ্ছিন্নধারায় একটির পর একটি টেকনিক অভ্যাস করিয়ে সব ছাত্রকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাপাজোখা সিলেবাস শেষ করাতে চান না। য়ুরোপে বড় বড় শিল্পীদের কেউ কেউ নিজের স্টুডিয়োতে মাত্র কয়েকজন ছাত্র নিয়ে কম-বেশি এ-ভাবে এখনো কাজ শেখান। কিন্তু নন্দলালের এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, একটা বিদ্যালয়ের ছাত্রগোষ্ঠী নিয়ে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় কি না। এক দিন ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির এক্সপেরিমেন্ট সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যন্ত ব্যাপকভাবে হয়ে গেছে—টোলে টোলে ছাত্রদের মোটামুটি এই পদ্ধতিতেই শেখান হ'ত। সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি—এক দিন সেই সব টোল থেকে শত শত মহাপণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল। তবু এ-কথা বলতেই হবে, সাধারণতঃ টোলে ছাত্রসংখ্যা কম ছিল, 'তা কখনও আধুনিক বিদ্যালয়ের আকার পায় নি। আধুনিক জগতের সংস্কারপন্থী শিক্ষাব্রতীরা নন্দলালের এই চেষ্টার মধ্যে অনেক কিছু অনুসরণীয় জিনিষ পাবেন। হয়ত এই



শ্রীনন্দলাল বসু
বড়োদা গাইকোয়াড় স্মৃতিমন্দিরে ফ্রেস্কো-চিত্র অঙ্কনে রত

কারণেই আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত ডুয়ির ছাত্র শ্রীযুক্ত জেকবসন শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছলেন। শোনা যায় এখান থেকে তিনি গুরুকে চিঠি লিখেছিলেন, ভারতবর্ষে যদি আর কিছুর জন্যে আপনি না আসেন, অন্ততঃ নন্দলালের সঙ্গে আলাপ করতে এবং কলাভবনে শিক্ষাসম্বন্ধে যে এক নূতন এক্সপেরিমেণ্ট হচ্ছে তা দেখতে আপনার আসা উচিত।

কার্যতঃ সত্তর জন ছাত্রের দল নিয়ে নন্দলাল আপন পদ্ধতিতে কি ভাবে কাজ করেন তা আরও স্পষ্ট করে জানবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলুম, "কলাভবনে তো এখন প্রায় সত্তর জন ছাত্র আছেন। তাদের সকলের সঙ্গে আপনি কি ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গড়ে তুলতে পারেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "কি ভাবে করি, একটা দৃষ্টান্ত দিই। যখন কোন ছবির কাজ করি, প্রত্যেক দিন দু-জন দু-জন ক'রে ছাত্র বা ছাত্রীকে কাছে ডেকে নিই। তারা আমার সঙ্গে কাজ করে। তাদের সঙ্গে গল্প করি। শুধু



যমুনা শ্রীনন্দলাল বসু
বড়োদা গাইকোয়াড় স্মৃতিমন্দিরে অঙ্কিত ফ্রেস্কো

শিল্পের গল্প নয়, নানা গল্প। এমনি ভাবে পালা করে সকলকে কাছে নিয়ে আসি। তার পর পিকনিক বা বিদেশে বেড়াতে যাবার সময় মেলামেশার একটা বড় সুযোগ পাই। ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে নিয়ে যাই— সারাদিন আলাপ-আলোচনা কাজকর্ম্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের যোগ সাধিত হয়।

"আগে খুব কম ছাত্র ছিল। তখনই আমি ভাল ভাবে এই পদ্ধতিতে কাজ করতে পারতুম। এখন ক্রমশই ছাত্র বেড়ে চলেছে। আরও বাড়বে। এ পদ্ধতি তখন বদলাতে হবেই। এখনই মনে সমস্যা উঠেছে। কেবলই ভাবি, কি ভাবে তখন কাজ করা যাবে? একটা বিষয়ে ঠিক করেছি, আরও কিছু বেশী ছেলে হয়ে পড়লে আমি বিনোদ ও আর অন্য যাঁরা আছেন, প্রত্যেকের এক-একটা সম্পূর্ণ আলাদা ইউনিট করে দেব। যে যার নিজের দলকে শেখাবেন। এখন যেমন সকলেই সকলের ছাত্র তখন আর তা থাকবে না। যাই বল, শিক্ষাক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে খুব বড় জিনিস বলে গণ্য করি। এতে অবশ্য একটা ভয় আছে, পরে আমরা গুরু না-হয়ে পড়ি। কিন্তু এই ভয় কেটে যাবে যদি শিক্ষকেরা নিজেকে শিক্ষাব্রতী ব'লে মনে করেন আর নিজে শিল্পসৃষ্টি করতে থাকেন।

"আরও একটা কথা আছে। আজকাল আমরা যে পদ্ধতিতে কাজ করছি, তা সফল হয়ে উঠেছে এই জন্যই যে আমরা যে ক-জন শিক্ষক আছি সবাই এক। আমাদের মধ্যে মনের কোন গরমিল নেই। আমি ওঁদের মনে জোর করে আমার মতামত চাপিয়ে দিই না। আমাদের পরস্পরের আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আমাদের এক করে রেখেছে। আর খুব ভাগ্যের কথা এই যে, আমরা সবাই এক পথে চিন্তা করছি—তা না হ'লে বড় মুশকিল হ'ত। আমাদের মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই। আমাদের চিন্তার আদান-প্রদান অবাধভাবে চলে।

"হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে পার, বছর বছর এক দল পুরাতন ছেলেমেয়ে চলে যায়—তাদের জায়গায় আসে নতুন এক দল ছেলেমেয়ে। তারা এখানকার বিশেষ পরিমণ্ডলের সঙ্গে অনায়াসে নিজেদের মানিয়ে নেয় কেমন করে? এ-কাজে সাহায্য করে পুরাতন ছেলেমেয়েরা। এই জন্যই কোর্স যথারীতি শেষ করার পরও কিছু ভাল ছাত্রছাত্রীকে এখানে রেখে দিই কয়েক বছর। তারা নতুন ছাত্রদের মধ্যে ট্র্যাডিশনটা সঞ্চারিত করে।"

আমি বললুম, "অন্য অন্য আর্ট স্কুলের চেয়ে শান্তি-নিকেতনে পটো সৃষ্টি করার কাজে আপনাদের একটা স্বাভাবিক সুবিধা আছে। এখানকার প্রকৃতি—একে লক্ষ্য না ক'রে থাকা যায় না। কবি শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছেন শিল্পী তৈরি করার পরিমণ্ডল ক'রে।"

তিনি বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, এখানে নানান উৎসব আছে, অভিনয় আছে, গানের জলসা আছে। শান্তি-

নিকেতনের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের অবিচ্ছিন্ন যোগ। বিশেষতঃ, গানের ও নাচের মধ্যে দিয়ে আমাদের মন সরস হয়ে ওঠে।"

এই সময়ে শিল্পী শ্রীবিনোদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত এসে হাজির হলেন। দু-একটা হাল্কা কথা চলল—আবার সাধারণ কথার ফাঁকে ফাঁকে একটু হাসি-তামাশা চলতে লাগল। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে বললুম, "আজ মাস্টারমশায়ের সঙ্গে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।" কথার পিঠে এই সময়ে নন্দলাল বললেন, "আমি কি ভাবে কাজ শেখাই এঁদের মুখে শুনতে পাবে। এঁরা তো আমার কাছে গোড়া থেকেই আছেন। বল না হে মণি, তখন তোমাদের কাজ হ'ত কি ভাবে।"

শ্রীযুক্ত গুপ্ত জবাব দিলেন, "আমাদের কোন সিলেবাসও ছিল না, কোর্সও ছিল না। আমরা খেয়ালমত ছবি আঁকতুম, কপি করতুম। তার পর ওঁর কাছে নিয়ে এলে উনি এখানটা হয়ত বদলে দিতেন, ওখানটায় বা দুটো পোঁচ বা সামান্য একটা রেখা টেনে দিতেন। এমন কি, আমাদের যে ইণ্ডিয়ান আর্টের পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে হবে তারও কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিলাতী, জাপানী, চীনে যা খুশি পদ্ধতিতে খেয়াল মত ছবি আঁকতুম। কখনো বা আমরা পারসিক ছবির ধরণে এঁকে তার মধ্যে কোন বাংলা দেশের গাছ বা মানুষ যোগ করে দিতুম।"

নন্দলাল বললেন, "হ্যাঁ, আজকাল দুটো বিষয়ে একটু অদলবদল করেছি। আগে আমার মত ছিল, সব দরজা খোলা। ছাত্রদের একেবারে অবাধ স্বাধীনতা দিতুম। বিলাতী, জাপানী, চীনে, পারসিক, ভারতীয় যে যে পদ্ধতিতে ইচ্ছে শেখ। সে-পদ্ধতির যতটুকু আমি জানি, ততটুকু সাহায্য দেব। এখন তা করি না। এখন বলি, যে যে-পথে ইচ্ছে যাও, কিন্তু প্রথম ভারতীয় পদ্ধতিতে—যেটা আমি বিশেষ ক'রে জানি—খানিকটা কাজ শেখ, হাত ঠিক ক'রে নাও। একটা রাস্তায় কতকটা শক্তি অর্জন করার পর নিজের ইচ্ছেমত রাস্তা ধর। সে-রাস্তার যতটুকু জানি সাহায্য করব। হাঁটতে পারার মত আগে শক্তি অর্জন করা চাই। আজকাল সেইটুকু জোর করি। আর একটা পরিবর্তন এই হয়েছে যে, আজকাল পড়াশোনার দিকে একটু বেশী নজর দিতে চাইছি। কারণ, অনেক ছাত্র এখন শিল্প শেখানোর কাজই জীবিকা করে নিচ্ছে। নিজে আঁকার জন্যে অবশ্য খবর জানার বেশি দরকার নেই।"

আমি বললুম, "আপনি যে-পদ্ধতিতে কাজ করছেন, এ আমাদের কাছে একেবারে নূতন জিনিস। এর জন্য আপনি কখনো কোনো বাধা পান নি?"

নন্দলাল জবাব দিলেন, "না। রবিবাবু বরাবর আমাকে স্বাধীনতা ও উৎসাহ দিয়েছেন। কখনো কোন সূত্রে এসে আমার কাজের ধারায় বাধা দেন নি। আমি যে-পদ্ধতিতে কাজ করি, সে তো তাঁরও মনের মত পদ্ধতি।"

রাঙামাটির মাঠের উঁচু ডাঙার উপরে গড়ে উঠেছে শান্তিনিকেতনের আশ্রম। এখানে ওখানে যেন টুকরো টুকরো ছড়ানো ছোট বাড়ীগুলি। মাথার উপরে পরিষ্কার আকাশ বেঁকে দিগন্তে দিগন্তে হেলে পড়েছে, তার বুকে জ্বলে উঠেছে ছোট ছোট তারা। বেশী দিন নয়, মাত্র চল্লিশ বছর আগে কে জানত, এই রাঙামাটির মরুভূমির উপর এক দিন গড়ে উঠবে পৃথিবীর শিক্ষাব্রতীদের তীর্থভূমি।

সারদাচরণ উকীল

শ্রীঅবনীনাথ রায়

১৯২৫ সালের কথা। তখন আমি সবে দিল্লী এসেছি। এক দিন বাড়ী দেখতে গিয়ে হঠাৎ সারদাচরণ উকীলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সারদাবাবু তখন দিল্লী ফোর্টের সামনে এস্‌প্লেনেড রোডে একটা দোতলা বাড়ীতে থাকতেন।



আরতি
সারদাচরণ উকীল

রাস্তার ধারের ঘরখানি তাঁর বৈঠকখানাও বটে, চিত্রশালাও বটে। ঘরের দেয়াল তাঁর আঁকা ছবিতে বোঝাই, কতকগুলি ছবি ঘরের মেঝেয় দেয়ালে ঠেস দেওয়া আছে—সমাপ্ত এবং অসমাপ্ত ছবি সংখ্যায় অনেকগুলি, কিন্তু সেগুলি ছড়িয়ে নেই—সর্বত্র একটা গুছিয়ে রাখার সুষমা। সেই ঘরে বসেই শিল্পী তাঁর ছবি আঁকেন—নীচের রাস্তা দিয়ে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম চলে কিন্তু সেই কর্কশ আওয়াজে উপরে ধ্যানরত শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ হয় না।

হেসে বললুম, ও, আপনিই বুঝি শ্রীসারদাচরণ উকীলের সৌজন্যে ? 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রভৃতি মাসিক পত্রে আপনার হাতের ছবি দেখেছি কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। এত দিন পরে আলাপ হয়ে খুশী হলুম।

আমার ভণিতা শুনে সারদাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন—সরল প্রাণখোলা হাসি!

মাথায় মত শিল্পীরই চেহারা বটে—দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, এলায়িত বাবরি চুল। সবল দেহ—দিল্লীর কঠোর শীতেও কোন দিন খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং খদ্দরের চাদর ছাড়া আর কোন শীতবস্ত্র ব্যবহার করতে দেখি নি।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'তে দেরী হ'ল না। আমি তখন দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টে থাকতুম। সেটা দিল্লী থেকে দশ মাইল দূর। রাত্রে সেখানে ফিরতে না পারলে সারদা-বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করতুম। সারদাবাবুর পরিবারবর্গ তখন দিল্লীতে ছিলেন না। সুতরাং আমরা দুজনে হিন্দুস্থানী খাবারওয়ালার দোকান থেকে পুরি-কচৌরি কিনে এনে আচার সমভিব্যাহারে মহানন্দে নৈশ ভোজন সমাপ্ত করতুম। তার পর ঐ চিত্রশালা-গৃহের মেজের কার্পেটের উপর নিদ্রার আয়োজন। কিন্তু গল্পে গল্পে নিদ্রাদেবী কোথায় পালিয়ে যেতেন আমাদের হুঁস থাকত না। এখন মনে পড়ছে আমাদের এই নৈশ ভোজনপর্বে এক দিন যোগ দিয়েছিলেন ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায়। ডাঃ রায় তখনও কলকাতায় গিয়ে নিউ ইণ্ডিয়া জীবন-বীমা কোম্পানীতে যোগ দেন নি। তিনি তখন সবেমাত্র গাজিয়া-বাদের বাসা উঠিয়ে দিয়ে দিল্লী এসেছেন।



মা।

সারদাচরণ উকীল

কিন্তু সারদাবাবুর কথাতেই ফিরে আসা যাক্। এই সময় দিল্লীতে ফাউণ্টেনের সামনে আমাদের বেঙ্গলী ক্লাব ছিল। বেঙ্গলী ক্লাব তখন খুব জমে উঠেছে। তার চারু- এবং কারু-শিল্প সম্বন্ধে কোন সমস্যা উঠলেই তার সমাধান করতেন সারদা-বাবু। শিল্পসম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনাতেই সারদাবাবুকে কোন দিন ফেল করতে দেখি নি। তাঁর আর্টিস্টের চোখ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং রসবোধ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এই সময়ে বেঙ্গলী ক্লাবের তরফ থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য "ফাল্গুনী" অভিনয় করেছিলুম। তার সাফল্যের অনেকখানি যে সারদাবাবুর কৃতিত্বের উপর নির্ভর করেছিল এ-কথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই।

সারদাবাবুর ছবিগুলি স্বপ্রকাশ—তার গুণ সম্বন্ধে এতদিন পরে ওকালতি করতে যাওয়া অবান্তর হবে। আর বিশেষ ক'রে যাঁরা চিত্রকর নন তাঁরা সারদাবাবুর ছবি কেন ভাল তা সম্ভবত খুঁটিনাটির বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারবেন না। কিন্তু একটা বস্তু আছে যা টেক্‌নিকেরও উপরে—সেই বস্তু সাধারণ দর্শক বা পাঠককে তার অজ্ঞাতেই আকর্ষণ করে। আর সেই হচ্ছে সকল বড় শিল্পের এবং সাহিত্যের সত্যিকার পরিচয়। সারদাবাবুর ছবি এই পরিচয়ে ভাস্বর। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু একেবারে মৌলিক—সব তাঁর নিজের পরিকল্পনা থেকে নিঃসৃত হ'ত। আর সে পরিকল্পনা যে কত উচ্চ ভাবের দ্যোতক তা যাঁরা সারদাবাবুর ছবি দেখেছেন তাঁরাই সাক্ষ্য দিতে পারবেন। সারদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর ছবির বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারতেন না। তিনি সৃষ্টি ক'রেই খালাস। সৃষ্টির ব্যাখ্যার ভার তিনি নিজে নিতেন না।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের শিল্প-শাখার তিনি বার-দুই সভাপতি হয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে এক বার তাঁর অভিভাষণের নাম দিয়েছিলেন "বীণার সুর"। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে সকল মানুষের মধ্যেই একটা সুর আছে লেখক সেটা প্রকাশ করেন তাঁর রচনায়, কবি তাঁর কাব্যে, চিত্রকর তাঁর চিত্রে।

আমার দিল্লী ত্যাগের পর মাঝে মাঝে সারদাবাবুর খবর পেতুম নানা সূত্রে—তিনি যশের উচ্চ সোপানে ক্রমশঃ আরোহণ করছিলেন। তাঁকে ঘিরে দিল্লীতে এক দল নূতন ছাত্র শিল্পী গড়ে উঠেছিল। নয়া দিল্লীর কনট্ প্লেসে যখন তাঁর শিল্পশালা তখন তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়। তার পর তিনি দিল্লীতে জমি কিনে বাড়ী করেছিলেন শুনেছি। সে-বাড়ী আমি দেখি নি।

সারদাবাবু আর নেই। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় শিল্প-জগতের যে বিশেষ ক্ষতি হয়েছে সে-বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। কারণ ভারতীয় শিল্পের চিত্রকর আমাদের দেশে গোনাগুন্‌তি, প্রতিভাবান্ মানুষ তার মধ্যে আবার আরও কম। কিন্তু আমার মনে সারদাবাবুর যে-ছবি বড় হয়ে আছে সে ততটা চিত্রকর সারদাচরণের নয়, যতটা মানুষ সারদাচরণের। সরল, নির্ভীক, অকৃত্রিম স্বভাব কিন্তু ব্যক্তিত্বশালী এবং রুচিসম্পন্ন। মানুষকে যিনি 'এস' ব'লে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে জানতেন কিন্তু নিজের সহস্র তুচ্ছতা দিয়ে তাকে বিব্রত করতেন না। এই উদার হৃদয় স্নেহশীল বন্ধুবৎসল বাঙালীর স্মৃতির উদ্দেশে আমার প্রীতির অঞ্জলি নিবেদন করছি।





পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে

চার্লস্ এণ্ড্রুজের রচিত কবিতার অনুবাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ,
সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা,
রঙীন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো।
এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে,
মুখশ্রীতে বিষাদ-দুঃখ,
বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মুকুটিত।
তিনি যেন বল্‌চেন,
"তোমরা যারা চলে যাচ্চ,
তোমাদের কাছে একি কিছুই নয়?
তাকাও দেখি, বলো দেখি,
কোনো দুঃখ কি আছে আমার দুঃখের তুল্য?"

পুণ্য দীক্ষা-অনুষ্ঠান শেষ হোলো।
মনে জাগল তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাস-বাণী—
"এস, আমার কাছে, যারা কর্মক্লিষ্ট,
এস, যারা ভারাক্রান্ত,
আমি তোমাদের বিরাম দেব।"
এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আন্‌ল আমাদের মনে,
ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেলুম তাঁর স্বর্গলোকে।
শুনলুম, "ঊর্ধ্বে তোলো তোমার হৃদয়কে।"
উত্তর দিলুম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেচি তোমারি দিকে।"

চলে এলুম বাইরে।
গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
তারা দেহকে পীড়ন ক'রে চলেচে
ক্লান্ত, আক্রান্ত গুরুভারে,
তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে ঊর্ধ্বে উদ্বাহন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,
নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত, তৃষার্ত, তারা ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।

এদিকে তাঁর বিষণ্ণ দুঃখাভিভূত মুখশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি মুকুটিত।
গভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—
"আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে-নির্মমতা
সে আমারই প্রতি।" ২২।৪।৪০, মংপু

সমসাময়িক]

"মানসী" কাব্যপাঠের ভূমিকা

শান্তিনিকেতনে "মানসী" অধ্যাপনাকালে কথিত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজিতে যাকে বলে মিষ্টিক, মানসীর প্রথম কবিতাটি ["উপহার"—"নিভৃত এ চিত্তমাঝে"] সেই শ্রেণীর। যখন রচনা করি, তখন কী মনে করে লিখেছিলাম, তা বলা শক্ত। কিছুদিন পরে যখন পিছু ফিরে দেখি, তখন অনেক লেখা ঝাপসা মনে হয়, তার সম্পূর্ণ অর্থ কী তা বলা যায় না।

আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বের নানাদিক থেকে প্রেরণা আসে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অহরহ আমাদের মনের মধ্যে নানা দূত পাঠাচ্ছে, প্রভাতের আলো, আকাশের নীলিমা, পাখীর কলরব, সমুদ্রের তরঙ্গ, আমাদের মনে বিচিত্র বাণী বহন ক'রে আনছে। আমরা হয়তো অনেক সময় অন্যমনস্ক থাকি, কিন্তু নিরন্তর তার অভিঘাত চলেছে, আমাদের মনকে জাগিয়ে রেখেছে। এর দুটি ধারা; একটি আনন্দের, সুন্দরের, আর একটি ভয়ের, ভীষণের। আজকের আকাশে যে ভীষণ নির্মমতা, তার মধ্যে ভয়ানক দুঃখের আশঙ্কা আছে। এর যেমন একটা বাণী আছে, তেমনি বসন্তকালে আনন্দের রবে চতুর্দিক ভ'রে ওঠে, তাতে আমরা কান দিই বা না দিই, তার প্রতি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এই বাণীর ভাষায় কোনো প্রকাশ নেই, ব্যাকরণ-শুদ্ধ বানানো কোনও কথা নেই, কিন্তু তার একটা ধ্বনি আছে তা অনির্বচনীয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত ক'রে সেই ধ্বনি ওঠে। আমাদের চারিদিকে যা রয়েছে, তা অসীম, তার কোনো নির্দিষ্ট ভাষা নেই, তা অতি বিরাট, কবি তাকে ছন্দের মধ্যে ছাঁচের মধ্যে ফেলে তৈরি ক'রে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতরে যে প্রতিমা গড়েছেন তাতে তাঁর আশা-ভালোবাসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কবির কাজ। তাকে সুন্দরের সীমায় বাঁধতে চেয়েছেন, তাই তিনি মানসী প্রতিমা গড়েছেন, সেই প্রতিমায় রূপ নিয়েছে তাঁর আশা তাঁর ভালোবাসা।

উপনিষদের একটি বচনে ঋষি বলেছেন যে, ইন্দ্রের না আছে বন্ধু, না আছে সঙ্গী। তিনি যখন প্রকাশ হতে চান, তখন তিনি বন্ধুর খোঁজ করেন। উপনিষদে ঋষি বলেছেন, "অভ্রাতৃব্যো অমাত্বনাপিরিন্দ্র জনুষসনা সনাদসি। যুধেদাপিত্ব মিচ্ছসে"—হে ইন্দ্র, তুমি শত্রুরহিত নায়ক-রহিত বন্ধুরহিত। কিন্তু তিনি যখন প্রকাশ চান, তখন বন্ধুর খোঁজ করেন। বিরহী তাঁর বাণী, যতক্ষণ না সেই হৃদয়ের সঙ্গে মিলন হয় যে আনন্দের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করে।

যতক্ষণ আমি তাঁকে গ্রহণ না করেছি, ততক্ষণ তিনি নিঃসঙ্গ। বিশ্বের যা কিছু দান, তা আমাদের হৃদয়দ্বারে এসে বলছে, আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না। সে যেন দরদী বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদিকে বিশ্বের বিচিত্র বাণী মানুষের হৃদয়েও জাগাচ্ছে 'বিরহবেদনা, যে-মিলনে পূর্ণতা সেই মিলনকে সে খুঁজছে। তার কামনা শিল্পে ছন্দে গানে মূর্তি ধরতে থাকে। তাই নিয়ে কবির কবিত্ব, গুণীর গুণপনা। নিরন্তর অন্তরে বাহিরে ঘাতপ্রতিঘাতে এই যে কাব্যরূপের সৃষ্টি চলেছে মানসীর প্রথম কবিতায় তারই কথা ব্যক্ত হয়েছে।

'মানসী'র প্রথম পাঁচ-ছয়টি কবিতা বেদনার কবিতা। এই কাব্য দুঃখের কথায় শুরু হ'ল কেন, এটি একটি তর্কের বিষয়। মানুষ তার রসসৃষ্টিতে, রচনাতে বড় স্থান দিয়েছে দুঃখকে, বেদনাকে। অ্যারিষ্টটল থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর যত আলংকারিক তার কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন অনেক প্রকারে। এ বিষয়ে আমার নিজের একটি মত আছে। আমরা নিজেকে অনুভব করতে চাই। নিখিল বিশ্ব যখন আমাকে স্পর্শ করে, তখন আমরা আপনাকে অনুভব করতে পাই, সুন্দরকে যখন দেখি তখন নিজেকে উপলব্ধি করি। এইরকমে আপনাকে যখন পাই, তখন আমরা খুশি হই।

আমরা যখন কোনো বন্ধুকে পাই, তখন সেই বন্ধুর ভিতর দিয়ে নিজেকে নিবিড়ভাবে অনুভব করি। উপনিষদেও আছে, পুত্র যে আমাদের প্রিয়, তাও নিজের জন্য; সেই পুত্রের ভিতরে আপনার আত্মাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করি। আপনাকে অনুভব করাই আনন্দের ভিত্তি। দুঃখের মধ্যে আমরা গভীরভাবে আপনাকে অনুভব করি। কিন্তু সংসারে বাস্তবক্ষেত্রে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি জড়িত থাকে। সাহিত্যে সেই নিত্য সম্বন্ধ নেই। যেমন কিং লীয়রে রাজার মানসিক বিকৃতি, রামায়ণে সীতার কাহিনী। সেই কঠিন দুঃখের মধ্যে আপনাকে দেখতে পাই, কিন্তু ক্ষতির কোনো কারণ থাকে না, সম্পূর্ণ নিষ্কাম দুঃখ।

ছেলেরা যেমন আবদার করে, ভূতের গল্প বলো। তারা জানে যে, ভূত তাদের কিছু করতে পারবে না, তবু সেই ভয় করাটাই তাদের ভালো লাগে; এই ভয়ের উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে তারা পায়। যে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি আছে, আমরা তাকে এড়িয়ে যেতে চাই। আমাদের মধ্যে যাঁরা বীর, তাঁরা লাভ-লোকসানের কোনো ধার ধারেন না, তাঁরাই প্রকৃত ভয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁরা নিবিড়ভাবে আত্মোপলব্ধি করেন। এইসব কবিতাতে যা বলতে চেয়েছি, তার মূলে জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা হয়তো ছিল, কিন্তু সে-অভিজ্ঞতা মানুষ ভোলে না কেন? কারণ সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষ এমন কিছু পায়, যা দুঃখের ভিতর দিয়ে মনকে গভীরতর উপলব্ধি ও অনুভূতিতে নিয়ে যায়, যা চিরস্মরণীয়, যা ভোলবার নয়।

সাধারণত কবির চিত্তের দুটি পর্ব বা অধ্যায় থাকে। এক অধ্যায়ে সে তার জীবনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ ক'রে বলতে চায়, সেই বলার জন্যে তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়ে। এই যে তার বেদনা-প্রকাশের ব্যাকুলতা, এটা তাকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করে তোলে। তার জীবনের আর একটা দিকও আছে; সে-অধ্যায়ে সে বেদনার উৎস হ'তে প্রাপ্ত ভাবকে জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণময় রসের সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই যে সৃষ্টির আবেগ এটা তাকে এমন একটা রসোপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায় যেটা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নয়, বেদনাও নয়, তা হচ্ছে দুঃখবেদনার অতীত এমন একটা বস্তু যা বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করে, চিরন্তনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা চায়। কবি তাঁর কাব্যে, রচনায়, জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের মধ্যে যা পান সেইটেকেই দৈনন্দিন গণ্ডীর থেকে পার ক'রে নিয়ে চিরন্তনের সুরে তাঁকে দেন বেঁধে। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের এবং অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম।

প্রথম পর্বের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের বিশেষ তফাৎ এই যে, প্রথম পর্বে কবি নিজেকে ঘোষণা করেন অর্থাৎ কারও কাছে দরদ আদায় করবার ইচ্ছেটাই তাঁর তখন প্রবল। দ্বিতীয় পর্বে কবি বেদনাকে অবিকল ব্যক্ত করেন না, তখন তিনি সৃষ্টি করবার জন্য, সুখদুঃখের সীমাকে অতিক্রম ক'রে যান। প্রথম পর্বের মতন অন্যের কাছে নিজের বেদনার জন্য দরদ প্রার্থনা করেন না।

মানসীর প্রথম দিকের কবিতাগুলিকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা উচিত বলা কঠিন। তাতে কবির হৃদয়ের আবেগ রয়েছে; কিন্তু কবিতার শেষ কথা তো তা নয়। হৃদয়ের আবেগ কবিতার উপকরণ বা মশলার মতন, সেই সব উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের, সেই সৌন্দর্যসৃষ্টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করলে কবি তখন ভুলে যান তুচ্ছ দিকের কথা। তখন সেই আবেগকে উপলক্ষ্য ক'রে মনের বেদনার ভিত্তিভূমিতে সৃষ্টি করতে চান শিল্প-কুশলতায় সুন্দরকে। অর্থাৎ তিনি শিল্পরচনা করেন যাতে তাঁর সুখদুঃখ, সাময়িক আবিলতামুক্ত হয়ে চিরন্তনের বুকে গেঁথে যায় নির্মাল্যে। এই শিল্পসৃষ্টিকে গৌণভাবে বলতে পারা যায় অটোবায়গ্রাফি, কিন্তু মুখ্যভাবে তা হচ্ছে আপনার রচনাকে আপনার সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করবার আগ্রহ।

মানসীর গোড়ার কবিতা হচ্ছে সেই ভাবের আলপনা। ছন্দের দিকে দৃষ্টি দিলে তা বোঝা যায়। তার আগে বাংলা কবিতায় এ-সব ছন্দের আমদানি হয় নি। বাংলা কাব্য পয়ার আর ত্রিপদীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে যুক্ত অক্ষরে কবিতার মধ্যে আহ্বান ক'রে, তার ধ্বনির পূর্ণ মূল্য দেওয়া হ'ল। এমনি ক'রে কাব্যে গাম্ভীর্য ও সরসতার প্রতিষ্ঠা ঘটল। বিষয়বস্তুকে কৌশলে বলাটাই হচ্ছে শিল্পরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, বিষয়টা হচ্ছে গৌণ। কবির বলার মধ্যে থাকে চিরকালের বুকে থাকবার ইচ্ছা। দাশরথি রায়ের "অতি নগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম", কবিতাটিকে রিয়্যালিষ্টিক বলতে পারা যায়। কিন্তু এর ভিতরে মজার কথা হচ্ছে অলংকার আর অনুপ্রাস। এই অনুপ্রাস এবং অলংকারের মধ্যে চিরন্তনের দিকে পৌঁছবার বেগ আছে। সহজ নিত্যনৈমিত্তিক কথা বা বিষয়কে এমনভাবে বলেছেন যেন তা সময়-সমুদ্রের ওপারে যায়। নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ের কথাকে এমন ক'রেই সাময়িকতার সীমা অতিক্রম ক'রে চিরন্তনের দরবারে উপস্থিত করার ইচ্ছা সকলেরই হয়।

বেদনার কথা হচ্ছে। আজ যে বেদনা পরিপূর্ণ কাল তাই হারিয়ে যায় বিস্মৃতিতে, এইটেই সত্যিকার দুঃখের বিষয়। আজ যে-সম্বন্ধ আনন্দপূর্ণ সেটা যদি যায় চ'লে বিস্মৃতিতে তবেই দুঃখ। কিন্তু এই দুঃখকে কবি শিল্পসূত্রে রাঙা রং দিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন সেটা দুঃখকে উত্তীর্ণ ক'রে চিরন্তনের বুকে নেয় চিরস্থিতির আসন।

কবিতায় যে-দুঃখকে রূপ দেওয়া হয় সে-দুঃখ দুঃখকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রকাশ করে নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে, এইভাবে বলাটাই হচ্ছে কথার শিল্প, সেইটে দিয়েই কবি চিরন্তনের বুকে স্থিতি দাবি করেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টায় আগ্রহে।

মানসীর গোড়ার কবিতাতে ["ভুলে"] বারে বারে ভুল করবার কথা আছে, সেটা কিন্তু ধুয়োর মতন, ঐ ধুয়োর মধ্যেই কারিগরি, তারই সহায়তায় ভুলে যাবার দুঃখকে একটা সৌন্দর্যের পটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিস্মৃতির বেদনাকে যেন পৃথিবীতে কেউ না ভুলে যায়, সাহিত্যের মধ্যে সেই না-ভোলবার বেদনা, সেই না-ভোলবার রস যেন থেকে যায়; এমনি ক'রেই কবি বলবার চেষ্টা করেছেন দুঃখের ব্যথাকে, সেই অনির্বচনীয় আনন্দকে।

কাব্যে যে-বেদনা ফুটে ওঠে সে-বেদনা ব্যক্তিগত নয়: বেদনার তীব্রতা যতক্ষণ না ভুলতে পারা যায় ততক্ষণ তার ভিতরকার কথা বলা যায় না। যতক্ষণ ব্যথা তীব্র হয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা মনকে কেমন আড়ষ্ট ক'রে রাখে, সেটার তীব্রতা ক'মে গেলে তার স্মৃতিকে ভিত্তি ক'রেই কবি তাঁর রচনা শুরু করেন। এই কারণে, টাটকা আঘাতের বিষয়টা, তাঁর হৃদয়াবেগের ধারাটা কাব্যে বিশেষ স্থান পায় না। কাজেই দুঃখকে ভুলে যাবার অর্থাৎ দুঃখের মুহ্যমান অবস্থাকে ভোলবার, অতিক্রম করবার প্রয়োজন আছে। সেটা ভুলতে পারলেই দুঃখকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারা যায়। সময় সময় অনভিপ্রেত বিষয় ও ভাবও প্রকাশের কৌশলে কবিতায় বড় স্থান নেয়।

মানসীর দ্বিতীয় কবিতাতেও একই কথা বলা হয়েছে। ভাবের গ্রন্থি ছন্দ দিয়ে বেঁধে বেঁধে এমনভাবে আঁট করে রাখা হয়েছে যেন বহু বৎসরের ঘাঁটাঘাঁটি সত্ত্বেও তা অক্ষত থাকে, থাকে অমলিন। এই সময় মাথায় যে-সব বিচিত্র ছন্দ এল তার সাহায্যে আনন্দময় বাণীকে বেঁধে দেওয়া গেল। এমন কৌশলে বেঁধে দেবার চেষ্টা করা গেল যেন কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অক্ষয় হয়ে থাকে চিরন্তনের বুকে।

প্রতিদিনের লাভ-লোকসানের দুঃখসুখের তুচ্ছতাকে মানুষ জানে। এক দিকে মানুষের এই তুচ্ছতাময় ব্যাপার, তার অন্য দিকে আছে অনন্তকালের একটা ক্ষেত্র,—অসীমের দিকে যাত্রা-পথ। অসীম কালের ইঙ্গিত মানুষকে নিরন্তর ডাক দিচ্ছে, তার প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কত বিচিত্রতার প্রকাশে। এই সবের মধ্যেই আছে চিরন্তনের স্বাক্ষর, সুন্দরের স্বাক্ষর।

এই জন্যেই দেখতে পাই, মানুষের জীবনের দুটো দিক। এক দিকে সে চায় ক্রমাগত ভুলতে জীবনের তুচ্ছতাপূর্ণ ঘটনা, বিষয়; অন্য দিকে সে চায় না ভুলতে, বেদনার স্মৃতি-আনন্দকে। মানুষের মন তাকেই খুঁজে বেড়ায়, চায় তাকেই অবলম্বন ক'রে থাকতে। সে তার জীবনের, কল্পনার অনুভূতির, শ্রেষ্ঠ ধনকে, পরম সম্পদকে সেই নৌকায় তুলে দিতে চায় যে তরণী অনন্ত-কালের দিকে যাত্রা করে, যা এ-ঘাটে ও-ঘাটে আটকে পরম যাত্রার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় না।

মানুষের দুরাশা, সে তার ক্ষণিক জীবনকে বেঁধে দেবে চির-কালের সূত্রে। মানুষের জীবনে, কবির জীবনে নানা রকমেই এই দুরাশা অভিব্যক্ত হয়েছে। নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত ইমারতের গায়ে অনেকে যে নিজের নাম লিখে দেয় তার কারণ আর কিছু নয়, কারণ হচ্ছে নিজের নামকে এমন একটা কিছুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যা তার নামের সাক্ষ্য বহন করবে চিরকালের দরবারে চিরদিনের জন্য। শাজাহানের তাজমহলের দেওয়ালে যে-সব নাম পেনসিলে লেখা হয়, তার উদ্দেশ্যও তা-ই। অর্থাৎ এই অমর কীর্তির সঙ্গে মিশে অমর হয়ে থাক তাদের নাম। চিরন্তনের সঙ্গে যোগস্থাপনের এই ইচ্ছাই মানুষকে টেনে তোলে প্রতিদিনের তুচ্ছতা থেকে।

একটা কথা তোমরা মনে রেখো, বেদ-উপনিষদের মন্ত্রাদির একটা গভীর অর্থ ছিল। কেবল বাক্য নয়, সেটা ধ্বনি। ধ্বনি বাক্যের চেয়ে বড়। ধ্বনি ক্রমাগত মনকে জাগায়। শব্দার্থ সীমাবদ্ধ, ধ্বনির অনুরণন অসীম। ধ্বনির কোনও সীমা নেই ব'লেই সে ক্রমাগত মনকে চালায়। লৌকিক প্রয়োজনের বাহন হচ্ছে ছন্দ। ছন্দ বাণীকে দেয় ধ্বনি। সে ধ্বনি অর্থজড়িত নয়। ছেলেদের জন্য ছড়াগুলির কথা ভেবে দেখ। তাদের মন ভোলাবার জন্য শব্দ দ্বারা ক্রমাগত ধ্বনি সৃষ্টি ক'রে রসে পূর্ণ এই রকমের ছবিকে সর্ব্বদাই তাদের মনে জাগানো হয়েছে। এইজন্যেই বলছি সাহিত্যে গোড়া থেকেই ধ্বনির ব্যবহার হয়েছে।

কবির হাতে সেই ছন্দের ব্যবহার। মানুষের মনের সাধারণ দুঃখসুখের কথা নিয়েই ছন্দোবদ্ধ হয় বাণী। মনে যদি বাজাতে চাও বচনাতীত বিষয় তাহলে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয়। এইজন্য কবিরা তাঁদের বাণী-সৃষ্টিকে রক্ষা করেছেন ছন্দে ধ্বনিতে। এই রকম ক'রেই ছন্দের দ্বারা সৃষ্টি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। কবিও তাঁর বাক্যকে স্থায়ী ক'রে রাখতে চান ছন্দের দ্বারা স্পন্দিত ক'রে।

এই চেষ্টার মূলে রয়েছে কবির আনন্দ। সুতরাং কবি তাঁর কবিতায় যা বলেন সেটাকে তাঁর অটোবায়োগ্রাফি বললে ভুল হবে; কাব্যরচনায় আসলে প্রধান হচ্ছে কবির আনন্দ, বর্ণনীয় বিষয়টা গৌণ।

'মানসী' রচনার সময় আমি ছিলেম গাজিপুরে। গোলাপের জন্য গাজিপুর বিখ্যাত। কিন্তু সে-গোলাপ থাকে না কবিদের প্রিয়কুঞ্জবনে, থাকে ব্যবসায়ের ছাঁদে। কিন্তু গোড়ায় আমি ভেবেছিলেম আমি যাচ্ছি সেই গোলাপ-নিকেতনে যেখানে বুল-বুল গান গায়—সাদী এবং হাফেজ যেমন ক'রে মুগ্ধ হতেন আনন্দ পেতেন পারস্যের গোলাপকুঞ্জে, ভেবেছিলেম তেমনি ক'রে আমার দিন কাটবে গাজিপুরের গোলাপকুঞ্জে। কিন্তু

যা দেখলাম সেটা কল্পিত রূপের ঠিক উলটো।… কিন্তু সেখানকার গোলাপকুঞ্জের অবস্থা যাই থাক আমার মনের ইচ্ছার মধ্যে যে আনন্দ নিয়ে গিয়েছিলাম, তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। সেই আনন্দই মানসীর কাব্যে ধরা দিয়েছে, নিজেকে প্রকাশ করেছে ছন্দে। বুলবুলের মতন কিংবা সেই কবিদের মতন সেই আনন্দই মন্ত্রিত হয়েছে ছন্দে, ছন্দের ধ্বনিতে।

সে-সময় কত রকমের ছন্দ গুঞ্জরিত হয়েছিল আমার মাথায়। এইসব ছন্দের লীলাভূমি হচ্ছে সাংসারিক বিষয়। কিন্তু তবু বিষয়টা হচ্ছে গৌণ, বলবার ভঙ্গীটাই হচ্ছে আসল। গোলাপের প্রতি টানটা শেষ পর্যন্ত একটা মনের আনন্দে পরিণত হ'ল, তার অনির্বচনীয়তায় ভ'বে উঠল মানসীর ছন্দের সাজি।

মানসীর প্রথম দিকের অনেক কবিতায় মনে হবে আত্ম-জীবনের প্রেরণা আছে, সে-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ তার মধ্যে অত্যুক্তি অনেক, তার মধ্যে রকমারি ভাব আছে, যে-সব ভাব কবির নিজের নয়। কারিকর কার্পেটে ছবি-রচনায় সৌন্দর্য-সৃষ্টির আনন্দে এমন অনেক লতাপাতাফুলের নক্‌শা আঁকেন যার সঙ্গে প্রকৃতির রাজ্যের লতাপাতাফুলের কোনো মিল নেই। কিন্তু তাঁর সেই আনন্দময় সৃষ্টি কার্পেটে যেমন বিশেষ একটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তেমনি কবিও গৌণভাবের বিষয়ের পটে শিল্প রচনা করেন আনন্দ দিয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টির উৎসাহে। এই আনন্দ দিয়ে সৃষ্টি করবার কাজে দুঃখ আছে। কিন্তু এই সৃষ্টি করার যে সাধনা যে দুঃখ, সেইটাই কবির ধর্ম। এইভাবে মানসীর কবিতাগুলিকে দেখলে তবেই এর আনন্দ পাবে।…

দেশ]

আধুনিক শিক্ষার বিষয়বস্তু

শ্রীঅনাথনাথ বসু

…ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে দেখেছি নানাবকম হাতের কাজের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ সেখানে শিক্ষাতাত্ত্বিকেরা আজকাল বুঝতে পেরেছেন এবং স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই ভাবের হাতের কাজের ভিতর দিয়ে শিশু এমন শিক্ষা লাভ করে যা সে পুঁথির ভিতর দিয়ে পায় না। এগুলির সাহায্যে হাত পা চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ ঘটে এবং এগুলির বিকাশের সঙ্গে মন ও বুদ্ধির বিকাশের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আমরাও অনেক সময়ে দেখেছি 'হাতের কাজ করতে করতে ছেলের বুদ্ধি খুলে যায়। তাছাড়া সকল ছেলেমেয়েই পুঁথি পড়ার দক্ষ হয় না, কেউ হয়তো স্বভাবতই হাতের কাজ করতে ভালবাসে, কেউ ভাল গান করতে পারে, কেউ ছবি আঁকতে পারে এবং এই ধরণের কাজের মধ্যেই তাদের বুদ্ধি খোলে। সুতরাং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যদি এরূপ শিক্ষার আয়োজন না থাকে তবে সে-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সকলের উপযুক্ত হতে পারে না।

আমাদের দেশে অনেক অভিভাবক মনে করেন ছেলে যদি গান বা অভিনয় করে বা হাতের কাজ বা খেলাধুলা করে তবে তাতে তার লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ এইভাবের ব্যক্তিগত শক্তির বিকাশের আয়োজন না করলে ব্যক্তিত্বের ক্ষতি হয়, ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশই হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এই ব্যক্তিগত শক্তির বিকাশ নানাভাবে কাজে লেগেছে; এমন কি অনেক সময়ে বিদ্যালয়ে শেখা লেখাপড়া যত না কাজে লেগেছে, বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষক ও অভিভাবক-গণের সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে শেখা এই ধরণের বিদ্যা তার চেয়ে বেশী কাজে লেগেছে।

বিদ্যালয়ে নানারকমের হাতের কাজ শেখানর উদ্দেশ্য মুখ্যত বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া নয়, যদিও এই ধরণের শিক্ষা নানা-ভাবে বৃত্তির সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে, এগুলির ব্যবস্থা করা দরকার হয়, প্রধানত শিশুচিত্তের একটি বড় অভাব মোচন করবার জন্য। প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই এক-একটি বিশেষ বিষয়ে স্বাভাবিক দক্ষতা আছে, প্রত্যেক ছেলেমেয়েই এই ভাবের স্বাভাবিক নিপুণতার বলে অল্পবিস্তর পরিমাণে নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারে। এই বিধিদত্ত প্রতিভার বলে কেউ পারে গানের জাল বুনতে, কেউ পারে পুতুল গড়তে, কেউ পারে রঙের মায়া সৃষ্টি করতে কেউ আবার নূতন নূতন যন্ত্র নিয়ে খেলা করতে। অবশ্য সকলেই যে জগদীশচন্দ্র, নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ হয় তা নয়; কিন্তু তবুও সকলের কমবেশি পরিমাণে এই শক্তি আছে। কার ভিতরে কি বিশেষ শক্তি আছে তা কে জানে? তাই বিদ্যা-লয়ে এই ধরণের যতরকম কাজের ব্যবস্থা করা যায় ততই ভাল। কিন্তু এ বিষয়ে শুধু শিক্ষকদের দৃষ্টি দিলেই চলবে না, অভিভাবক-দেরও এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে হবে। ছেলেমেয়েরা যেদিকে স্বাভাবিক প্রতিভা দেখাবে সেই প্রতিভা-বিকাশের আয়োজন তাঁদেরও করতে হবে।…

উত্তরা]

বঙ্কিমচন্দ্র ও ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়

শ্রীভরদ্বাজ

বঙ্কিম-সাহিত্যের অনেক স্থলে মুসলমান-চরিত্রকে খাটো করিয়া দেখান হইয়াছে, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকটিত হইয়াছে—এরূপ একটা ধুয়া উঠিয়াছিল। তাহার রেশ আজও মিটে নাই মনে হইতেছে। অন্যের বেলা যাহাই হোক্, যিনি আমাদের স্বাদেশিকতার জনক বলিয়া কীর্ত্তিত তাঁহাতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা শোভা পায় না। বঙ্কিম-সাহিত্যে এরূপ সঙ্কীর্ণতা বস্তুতঃ আছে কি না, এবং যদি থাকে তবে উহার কোন ঐতিহাসিক কারণ আছে কি না, তাহার যৎসামান্য আলোচনা করিব। সত্যের শাণিত কৃপাণ যাঁহার হস্তে ঝলসিয়া উঠিয়াছিল, ব্যাজস্তুতির দ্বারা তাঁহার লোকান্তরিত আত্মাকে সম্মান প্রদর্শন করা ঠিক হইবে না। সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিতেছি দেখিলে বরং সেই মহান্ আত্মার তুষ্টির সম্ভাবনা, এবং সেই চেষ্টাতে আমাদেরও উপকার হইবে।

গোড়াতে একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করি। আমি যাহা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব তাহা পলিটিক্স নহে। ক্বচিৎ কোনও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি কর্তৃক নিরালা প্রান্তরে, বাঁশের ঝোপের অন্ধকারে, শ্মশানের সান্নিধ্যে মরা-মানুষের সাক্ষাৎকারের কথা আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু মরা-মানুষকে চর্ম চক্ষে দেখিলেও তাহাকে মানুষ বলিতে নাই, ভূত বলিতে হয়। তেমনই যে পলিটিক্স মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে তাহাকে আর পলিটিক্স বলা চলে না,—তার নাম ইতিহাস। ইতিহাস ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া কোন বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে পলিটিক্স মরিয়াই ইতিহাস হয়, এবং জীবন্ত অথবা অদ্যকার ইতিহাসের নামই পলিটিক্স। এখানে 'মরা' পলিটিক্স অর্থাৎ ইতিহাসের কথাই বলা হইবে। তবে আর এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে ইতিহাস গাছ এবং পলিটিক্স তাহার ফল। ইতিহাসের যে-অধ্যায়টির কথা বলা হইবে তাহা পড়িতে পড়িতে যদি পলিটিক্সের কোন কথা পাঠকের মনে পড়িয়া যায়, সে দোষ লেখকের নহে।

'ন্যাশনালিজম্' কথাটার ঠিক প্রতিশব্দ আমাদের ভাষাতে নাই। উহাতে একটা সঙ্কীর্ণতা ও মারমুখো ভাব অবশ্যই আছে যার নিন্দা টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ যুক্তির সহিত ও সর্বাপেক্ষা জোরাল ভাষায় সমগ্র মানব-জাতির দরবারে করিয়াছেন। কিন্তু অপর পক্ষে, জাতিকে রক্ষা করিবার অনুকূলে ন্যাশনালিজম্ বা স্বাদেশিকতা ইতিহাসে অসাধ্যসাধন করিয়াছে; অনেক মুমূর্ষু সমাজকে উহা বাঁচাইয়াছে, অনেক অত্যাচারীর দর্প উহা খর্ব করিয়াছে, অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য উহা সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপে জ্ঞানরাজ্যে যে নবজাগরণ আসিয়াছিল এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার যে বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, উহাদের মিলনের ফলেই ন্যাশনালিজমের উৎপত্তি।

ভারতবর্ষে সেই ভাবের বন্যা প্রথমে দেখা দেয় বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দীতে। নানা বিপর্যয়ে স্বাধীন-চিন্তার স্রোত ভারতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় বালুকা খুঁড়িয়া সেই লুপ্ত সরস্বতীকে পুনরুদ্ধার করিলেন। স্মৃতিগ্রন্থ খুঁজিয়া তিনি সেই পুরাতন বাণী আবিষ্কার করিলেন, আবার লোককে শুনাইলেন—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যবিনির্ণয়ঃ
> যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

স্বাধীন চিন্তার মহিমা আবার কীর্ত্তিত হইল। এই সময়েই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার তরঙ্গে উচ্ছল কলনাদিনী, বাঙ্ময়ী আকাশগঙ্গা ইউরোপ প্লাবিত করিয়া ভারতে আবির্ভূতা হইলেন। যে-ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় অবতীর্ণা করিলেন তিনি ফিরিঙ্গি-সন্তান হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির

আধ্যাত্মিক সাধনার যমুনা উক্ত দুই ধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই তিন প্রধান ধারার সহিত আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা মিলিত হইয়া নব্যবঙ্গের বিশাল জীবনস্রোত সৃষ্ট হইয়াছে। নব্যবঙ্গের অভ্যুত্থান ইতিহাসের এক অতি গৌরবময় পর্ব। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পরে এরূপ জ্ঞান-গরিমা-সমুজ্জ্বল যুগ আমাদের ইতিহাসে আর কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এই নব্যবঙ্গের সম্পর্কেই গোখলে বলিয়াছিলেন, "বাংলা আজ যাহা ভাবে, বাকী ভারতবর্ষ তাহা আগামী কল্য ভাবিবে।" বাংলা-সাহিত্য এই নব-জাগরণের যুগে যেরূপ উন্নত হইয়াছে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। এই নবীন সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক্ ও বহুমুখী বিকাশ আমরা বঙ্কিমের রচনায় দেখিতে পাই।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অর্বাচীন যুগের ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই। যে-ইতিহাস আমরা পড়ি তাহা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস, ভারতে ইংরেজ-রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস;—দেশের লোকের, দেশের সমাজের, দেশের সাহিত্যের, দেশের আর্থিক অবস্থার বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায় না। আর কোম্পানীর শাসনের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তাহাও সর্বাংশে ভ্রমশূন্য নহে। নব্যবঙ্গের ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়-কৃত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে আমরা ঐ ইতিহাসের একখানি খসড়া মাত্র পাই। উহাতে হিন্দুদের নাম ছাড়া ও ডেভিড হেয়ার, রিচার্ডসন, ডিরোজিও, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন-প্রমুখ অনেক খ্রীস্টানের এবং দু-এক জন নাস্তিকের নামও আছে; কিন্তু কোন মুসলমানের নাম আমরা খুঁজিয়া পাই না। ইহার কারণ কি? যে-ভাবে আমাদের দেশে ইতিহাসের অধ্যয়ন-অধ্যাপন হয় তাহার এমনই গুণ যে, এরূপ একটা স্বাভাবিক প্রশ্নও সাধারণতঃ আমাদের মনে উদিত হয় না। মুসলমানেরা স্বাধীন চিন্তার বিরোধী, কিংবা বাঙালী মুসলমানেরা স্বভাবতই বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন এবং বিদ্যা-চর্চায় প্রতি অবজ্ঞাশীল—ইহা বলিলে এক হিসাবে প্রশ্নটির পাশ কাটাইয়া যাওয়া হয়, আর এক হিসাবে নিতান্ত মিথ্যাভাষণ হয়।

আমীর আলী মহম্মদকে "Prophet of Rationalism" বলিয়াছেন। মুসলমানের দর্শন-বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে মুতাজিলা সম্প্রদায়, সুফি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বাঙালী মুসলমানেরা যে বাঙালী হিন্দুদের অপেক্ষা স্বভাবতঃই বুদ্ধিহীন একথা এখন কেহই বলিতে পারিবেন না। তবে বাঙালায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ইতিহাসে মুসলমানের দান নাই কেন?

ব্যাপার যত দূর বুঝা যায় তাহা এই যে, ইংরেজ যখন এদেশের মালিক হইলেন তখন রাজ্য গেল মুসলমানের। মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজের শাসন এবং ইংরেজ-প্রদত্ত শিক্ষাদীক্ষাকে মানিয়া লওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়াছিল। মুসলমান-রাজশক্তির অভাবে ভারতবর্ষ 'দরুল-হারাবে' অর্থাৎ বিধর্মীর রাজ্যে, ইস্লামের শত্রু-রাজ্যে পরিণত হইল। খাঁটি মুসলমানের পক্ষে অ-মুসলমান রাজশক্তিকে মানিয়া লওয়া উচিত কি না এ সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছিল। ইংরেজরা কোন ব্যাপারেই হেস্তনেস্ত করেন না। মন্থর-গতিতে অগ্রসর হওয়াই তাঁহাদের স্বভাব। ভারতবর্ষে রাজ্য-স্থাপন সম্পর্কেও তাঁহারা এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের মালিক হইয়াও তাঁহারা দিল্লীর বাদ্শাহের মৌখিক মর্যাদা করিতেন—এমন কি, ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর মুলুকেও বাদ্শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রারই প্রচলন ছিল। এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার ফলে মুসলমানদের পক্ষে ধর্মের ব্যাপারটা তেমন সঙ্গীন হইয়া উঠে নাই; কারণ দরুল-ইস্লাম কখন যে দরুল-হারাবে পরিণত হইল তাহার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। পরিবর্তনটা ভেল্কিবাজীর ন্যায় ঘটিয়াছিল। তাহা হইলেও মুসলমানেরা যে নিশ্চেষ্ট ছিলেন তাহা নহে। যত দূর বুঝা যায় মুসলমানদের ভিতরে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। ওয়াহাবি-আন্দোলনও উহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহীরা এক স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিল এবং সুদূর চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট হইতেও ঐ ঘাঁটিতে লোক এবং টাকাকড়ি যোগান হইত। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সর্ উইলিয়ম হাণ্টার-রচিত

"The Indian Musalmans" পুস্তকে উহার কতক বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিব। পাঠকবর্গ মনে রাখিবেন যে তখন বঙ্কিমের প্রতিভা-সূর্য পূর্ণবেগে তেজ বিকিরণ করিতেছে।

"The Musalmans of India are, and have been for many years a source of chronic danger to the British Power in India. For some reason or other they have held aloof from our system, and the changes in which the more flexible Hindus have cheerfully acquiesced are regarded by them as deep personal wrongs.

* * * *

The truth is that our system of public instruction which has awakened the Hindus from the sleep of centuries, and quickened their inert masses with some of the noble impulses of a nation, is opposed to the traditions, unsuited to the requirements, and hateful to the religion of the Mussulmans.

* * * *

The Bengal Mahomedans refused a system which gave them no advantage over the people whom they had so long ruled, a people whom they hated as idolaters and despised as a servile race. Religion came to the support of the popular feeling against the innovation, and so long it remained doubtful whether a Mussulman Boy could attend our State schools without perdition to his soul. Had we introduced our system by means of English masters, or boldly changed the language of public business to our own tongue, their religious difficulty would in one important respect have been less. For the Mahomedans admit that the Christian faith, however short of the full truth as finally revealed by their Prophet, is nevertheless one of the inspired religions which have been vouchsafed to mankind. But Hinduism is to them the mystery of abominations, a system of devil worship and idolatry unbroken by a single gleam of the knowledge of the one God. The language of our Government schools in Lower Bengal is Hindu and the masters are Hindus. The Mussulmans with one consent spurned the instructions of idolaters through the medium of the language of idolatry.

* * * *

The truth is that our system of public instruction ignores the three most powerful instincts of the Mussulman heart. In the first place it conducts education in the vernacular of Bengal, a language which the educated Mahomedans despise and by means of Hindu teachers whom the whole Mahomedan community hates......... In the second place our rural schools seldom enable a Mahomedan to learn the tongues necessary for his holding a respectable position in life, and for the performance of his religious duties. Every Mahomedan gentleman must have some knowledge of Persian, and Persian is a language unknown even in our higher class district schools............. In the third place our system of public instruction makes no provision for the religious education of the Mahomedan youth.

[বাহুল্য বিবেচনায় বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল না।]

এই সকল কথা সম্ভবতঃ মুসলমানদের কানে ভালই লাগিয়াছিল; যেহেতু পরবর্তী কালের শিক্ষাপ্রণালী অনেকটা হাণ্টার-নির্দিষ্ট ধাঁচেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও সেই ধাঁচ বদলায় নাই এবং হাণ্টারের বাণী অনেক স্থলে উৎসাহের সহিত আজও উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ব্যাপার কি দাঁড়াইয়াছিল এক বার তলাইয়া দেখা যাক্। আমহার্স্ট ও বেণ্টিঙ্কের সময়ে "নয়ী রোশ্নী" ও "পুরাণী রোশ্নীর" মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল। উভয় পক্ষেই বাঙালী ও ইংরেজ ছিলেন, হিন্দু, খ্রীস্টান ও নাস্তিক পর্যন্ত ছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষেই কোন মুসলমানের নাম দেখিতে পাই না। অবশেষে "নয়ী রোশ্নী"রই জয় হইল। ইউরোপের নবজাগরণের আলোক বাংলা দেশে উপনীত হইল। উহারই অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে বাংলায় জাতীয়তার ভাব ও জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই নূতন ভাবের এক জন প্রধান প্রচারক, এবং এই নূতন সাহিত্যের সর্বপ্রধান স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন "বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালার ভরসা।" অপর স্থানে বলিলেন—

ইংরেজী-লেখক, ইংরেজী-বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরেজ ভিন্ন কখনও খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এক দিকে সংস্কৃত ও পণ্ডিতীর দৌরাত্ম্য, অপর দিকে ইংরেজীর দৌরাত্ম্য—এই উভয় দৌরাত্ম্য হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠ করিলেন। প্রাচ্যের পাশ্চাত্যের সমস্ত জ্ঞানরাশি বাঙ্গালী সংগ্রহ করিবে, হজম করিবে, বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিবে—ইহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা। অপর দিকে যে ধুয়া উঠিল (হাণ্টারী ধুয়া) উহার সহিত বঙ্কিমের আদর্শের কোন জায়গায় মিল আছে কি? যদি না থাকে, তবে মুসলমানদের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি না দেখানোর জন্য আমরা তাঁহাকে কটূক্তি করিতে পারি কি? উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বাঙালী মুসলমানেরা কোথায় ছিলেন তাহা না জানার দরুন আমরা অনেক বিষয়কে ভুল বুঝিয়া থাকি।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়া-শুনিয়া ইউরোপীয় ন্যাশনালিজম্ এদেশে আমদানী করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজমের মন্দ দিকটা তিনি অবশ্যই দেখিয়াছিলেন ও দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু ন্যাশনালিজমের প্রতি তাঁহার খুবই অনুরাগ ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আর্য্যদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখনও চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা। (জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।) ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।

উদ্ধৃত-অংশে 'আর্য' ও 'হিন্দু' কথা দুটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে ন্যাশনালিজমের আদর্শ ধরিয়াছিলেন তাহা তখনকার বাঙালী মুসলমানদের নিকটও তুল্যভাবে অজ্ঞাত ছিল। উহা একান্তভাবে "আধুনিক ইউরোপে"র সৃষ্ট। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র শুধু হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক কারণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হইল। যেরূপ স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মসংস্কারের (Renaissance ও Reformation) স্তর পার হইয়া গেলে ন্যাশনালিজমের আদর্শ সমাজের নিকট বোধগম্য ও বাস্তব হইতে পারে, মুসলমান সমাজের তখন তাদৃশ অবস্থা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানদের মধ্যে তখন ইংরেজ-বিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে ইংরেজদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন আদর্শ কিংবা ভাবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করার মত মেজাজ তাহাদের ছিল না। ইমান্ মাহ্দীর সাহায্যে বিধর্মী ইংরেজকে তাড়াইবার স্বপ্নেই অনেকে বিভোর ছিলেন।

বঙ্কিমবাবু বস্তুতঃ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন কি না এখন সে কথার বিচারে আসা যাউক। এই সম্পর্কে 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' এই দুই গ্রন্থের উল্লেখ আমরা সাধারণতঃ শুনিতে পাই। 'রাজসিংহ' সম্পর্কে কৈফিয়ৎ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দিয়া গিয়াছেন। স্কটের 'Kenilworth'কে যেমন আমরা রাজ্ঞী এলিজাবেথের জীবনী ও ইংলণ্ডের ইতিহাস মনে করিতে পারি না, তেমনি 'রাজসিংহ'কেও আমরা ঔরঙ্গজেব ও মেবারের ইতিহাস মনে করিতে পারি না। আর একটি বিষয় আমরা ভুলিয়া যাই যে টডের চমকপ্রদ 'রাজস্থান' সে যুগে খাঁটি ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইত—এখন যদিও আমরা জানিতে পারিয়াছি যে উহার অনেক বর্ণনাই অলীক ও অতিরঞ্জিত। 'আনন্দমঠে'র প্রতিপাদ্য বিষয়ও বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর যাহাই হউক, মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করা উহার উদ্দেশ্য অবশ্যই নহে। উপন্যাস অর্থাৎ অলীক উপাখ্যান দ্বারা কোন বিষয় কখনও প্রতিপন্ন হয় না। তাহা যদি হইতে পারিত, তবে কোন বিষয়ে প্রমাণের অভাব ঘটিত না। একটা গল্প খাড়া করিয়া যে-কোন বিষয় সহজেই প্রমাণ করা যাইত। উপন্যাসে একটা জিনিস বড়জোর উদাহৃত হইতে পারে। আমার মনে হয় যে 'আনন্দমঠে' যদি কিছু উদাহৃত হইয়া থাকে, তাহা ইংরেজ-প্রশস্তি নহে, মুসলমান-বিদ্বেষও নহে—তাহা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ এই যে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিকে উৎকট কর্মের দ্বারা চিরকাল চাপিয়া রাখা যায় না। নামের পশ্চাতে 'আনন্দ' যোগ করিয়া গেরুয়া পরিলেই সমস্ত আপনা হইতে দমিত হইয়া যায় না। 'আনন্দমঠে' দ্বিতীয়তঃ এই কথারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে মারামারি, কাটাকাটি দ্বারা সত্যকার সমাজসেবা কখনও সাধিত হয় না। অনন্যভক্তি এবং ঐকান্তিক যত্নের দ্বারাই শুধু সমাজের সেবা করা যায়। 'সন্তানে'র নিকট ভক্তির দাবীই করা হইয়াছে—প্রাণদান অতি তুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়ে' অনুরূপ কথাই শুনিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'ধর্মতত্ত্ব', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'লোক-রহস্য' প্রভৃতিতে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। জাতিগঠক এক দিকে জাতীয় চরিত্রের দোষত্রুটিগুলি চোখে



রাঁচি

শ্রীপরিতোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন, অপর দিকে মহান্ আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। 'আনন্দমঠ'কে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার একমাত্র বেদ মনে করিলে তাঁহার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। আরও দু-একটি ছোটখাট বিষয় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। বাংলার পাঠান সুলতানদিগকে বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা বাঙালীর স্বার্থের সহিত নিজেদের স্বার্থকে এক করিয়াছিলেন—বাংলা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেব যে-ধুয়াই ধরাইয়া দিউন না কেন, পাঠান সুলতানেরা বাংলা ভাষাকে 'পৌত্তলিক' ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করেন নাই ইহা ঐতিহাসিক সত্য। দ্বিতীয়তঃ, হজরত মহম্মদ কিংবা ইসলাম সম্পর্কে বঙ্কিমের রচনায় কোন কটূক্তি আমরা দেখিতে পাই না। যদি বস্তুতই তিনি উহাদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইতেন তবে তাঁহার তীক্ষ্ণ শ্লেষ রেনাঁ, কিংবা এইচ. জি. ওয়েলস্‌কেও পরাস্ত করিতে পারিত।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা নেতিবাচক; বঙ্কিমচন্দ্র যে সম্প্রদায়-বিশেষের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না, তাহার পরিচয়। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে তিনি যে সমগ্র দেশের ও সমাজের কল্যাণ কামনা করিতেন তাহার যৎসামান্য প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—

ভারতবর্ষীয় নানা জাতি এক মত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।

অন্যত্র লিখিয়াছেন,

প্রধান কথা এই যে এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণীর এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।

এই সকল উক্তিতে আমরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন রেখা টানিবার পরিচয় পাই কি? এ-কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, কৃষকদের জন্য তিনি যেরূপ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তেমন আর কোন শক্তিমান্ লেখক করেন নাই। তখনও মুসলমানেরা অধিকাংশই কৃষক-প্রজা এবং জমিদার ও তাঁহাদের গোমস্তারা প্রায় ষোল আনাই হিন্দু ছিলেন। সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষক-প্রজার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় যে তিনি মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন? এর চেয়ে কুৎসা আর কি হইতে পারে?

জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক—বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ হিন্দুপাঠকবর্গের উদ্দেশ্যেই তাঁহার সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে ইতিহাসের মধ্যে ইহার কারণ নিহিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা অনুধাবনযোগ্য যে বঙ্কিম-সাহিত্য মুখ্যতঃ হিন্দু পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়া থাকিলেও মুসলমান কিংবা অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকটও তাহা অনুপযোগী নহে। উহার মধ্যে যে শাশ্বত সত্য, যে অমূল্য রত্নরাজি আছে তাহা সর্বসাধারণের সম্পত্তি। ফিক্‌টে জার্মান নেশনকে লক্ষ্য করিয়া যে-সকল উক্তি করিয়াছিলেন তাহা হইতে জার্মান ব্যতীত অন্যান্য জাতিও প্রেরণা লাভ করিয়াছে। 'Ye Mariners of England' কবিতা পাঠ করিয়া বাঙালী ছেলেরাও আনন্দ এবং প্রেরণা লাভ করে। আমাদের বিশ্বাস যে, যে-সকল মুসলমান সত্যদৃষ্টি লইয়া বঙ্কিম-সাহিত্য পড়েন তাঁহারা উহা হইতে আনন্দই লাভ করেন। সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সত্যেই তাহার শক্তি;—কাহার উপলক্ষ্যে বলা হইল, কিরূপ উপমা অলঙ্কার ব্যবহৃত হইল—তাহা গৌণ ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে যদি "পরাণ মণ্ডলে"র স্থলে আমরা "রহিম সেখ" বসাইয়া দিই—যদি 'মুচিরাম গুড়ে'র স্থলে একটা মুসলমানী নাম বসাইয়া দিই, তবে ঐ সকল রচনা আমাদের নিকট কিছুমাত্র বেখাপ্পা মনে হইবে কি? নিশ্চয়ই নয়। আসল কথা এই যে, মনোরাজ্যের যে-স্তরে উঠিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, পাঠক যদি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা বর্জন করিয়া সেই স্তরে উঠিতে পারেন—যদি Renaissance ও Reformationএর সোপান অতিক্রম করিয়া ন্যাশনালিজমের ধাপে পৌঁছিতে পারেন, তবেই

তাঁহার পক্ষে বঙ্কিম-সাহিত্যের রসাস্বাদন করা সম্ভবপর হইবে।

আদর্শের সংঘাত বিষয়ে আর একটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইবে। স্বাদেশিকতাই যে উচ্চতম আদর্শ তাহা অবশ্যই বলা যায় না। আন্তর্জাতিকতা, মহামানবতা প্রভৃতি কথা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টধর্ম, ইস্‌লাম এবং সর্বশেষ শ্রমজীবীদের নামে দেশ ও নেশনের সীমা তুলিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত স্বাদেশিকতাই টিকিয়া আছে। উপরন্তু আমরা দেখিতেছি যে, স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমান বাড়িয়াই চলিয়াছে। বঙ্কিম-সাহিত্য আমাদের দেশে এই নূতন ভাবধারাকে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া দিয়াছে। জাতি (নেশন) কিসে গড়িয়া উঠে, বিশ্লেষণের দ্বারা তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দেখা গিয়াছে, ভাষার ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, শাসনপ্রণালীর ঐক্য, জাতিমূলক (racial) ঐক্য— নেশন-গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নহে। সমস্ত বিচার করিয়া রেনাঁ বলিয়াছেন—

A common memory and a common ideal—these more than a common blood—make a nation.

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের অতীত সর্বাংশে এক না হইলেও তাহাদের ভবিষ্যতের আদর্শ এক হইতে পারে, এবং সেই আদর্শের বেদীমূলে সকলে একত্র হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে প্রাক্-বৈদিক যুগ হইতে মাতৃপূজা প্রচলিত। হিন্দুরা কথায় ও গানে বলেন "মুক্তি মায়ের পদতলে।" অপর দিকে আমরা শুনিতে পাই রসুল হজরত মহম্মদ বড়ই মাতৃভক্ত ছিলেন এবং বলিতেন, "স্বর্গ মায়ের পদতলে" বঙ্কিমচন্দ্র দেশের সেই গরীয়সী মাতৃমূর্তি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। উহা অপেক্ষা উচ্চতর কল্পনা আর কি হইতে পারে? সকল ছেলেই যে মাকে এক ভাবে সেবা করিবে তাহা অবশ্যই নহে। যতক্ষণ মাতৃজ্ঞান, মাতৃভাব থাকে ততক্ষণ দৌরাত্ম্য করিলেও কিছুই আসে যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যে-যুগে, যে রকম আবেষ্টনের মধ্যে যে-সকল উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বর্তমানে অনুপযোগী হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু উহাতে তাঁহার মর্যাদা, তাঁহার আর্য মহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। আজ যদি আমাদের স্বাদেশিকতা বৃহত্তর, মহত্তর ও পবিত্রতর হইয়া থাকে—যদি আমাদের দিক্‌চক্রবাল বঙ্কিমের দৃষ্টিরেখার শেষ সীমা ছাড়াইয়া আরও দূরে সরিয়া গিয়া থাকে, তবে তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে তিনি আমাদিগকে সোজা পথ ধরাইয়া দিয়াছিলেন—ঘুরপাক খাওয়ান নাই। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন হইবার পূর্বে বারংবার ভাবিয়া দেখা উচিত, আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে-সকল দোষত্রুটি তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন আমরা আজও সেগুলি শোধরাইতে পারিয়াছি কিনা; উহাই আজ বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয়।

দুই দিক

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাতের ফুলে ডাক দিয়ে বলে শেষ-রজনীর তারা,
"আমি ভয়ে মরি, কোন্ সুখে তুই হাসিস্ এমন ধারা?"

ফুল বলে আরো দ্বিগুণ হাসিয়া, "মিছে কেন ভয়ে মরো?
অরুণ-আলোর বন্যা আসিছে, কয়ো—উৎসব করো।"

উট-রোগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রায় হাজার বৎসর আগেকার কথা। তখন প্রতীহার-বংশের পতনের ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেই খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা সূর্য্যপাল খুব পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠে সাম্রাজ্য গঠন এবং প্রতীহার-বংশের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবার দিকে মন দিয়েছেন, এমন সময়ে সূর্য্যপালের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিলে।

ব্যাধি যে ঠিক কি, তা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। দক্ষিণ পায়ের একটা শিরা টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করে, বুক ধড়ফড় করে, আর বাম চক্ষুটা থেকে থেকে জবাফুলের মত লাল হয়ে ওঠে। রাজবৈদ্যগণের মধ্যে কেউ বললেন বাতব্যাধি, কেউ বললেন হৃদ্‌রোগ, কেউ বা বললেন মস্তিষ্কের পীড়া। উপসর্গ তেমন কিছু সাঙ্ঘাতিক নয়, কিন্তু মহারাজা দিন দিন বলহীন এবং কৃশ হয়ে পড়তে লাগলেন। মুখ বিস্বাদ, মেজাজ খিটখিটে, আহারে রুচি নেই, রাজকার্য্যে উৎসাহ নেই, আমোদ-প্রমোদে মন সাড়া দেয় না।

রাজবৈদ্যগণ একটা পরামর্শ-সভা ক'রে স্থির করলেন যে, এ ব্যাধি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রবিদিত কোন ব্যাধি নয়; এ নিশ্চয় এমন একটা চোরা ব্যাধি যার উৎপত্তি-স্থল শরীরের বিশেষ কোন গুপ্ত প্রদেশে নিহিত। নিদানশাস্ত্র মথিত ক'রে যখন তার কোন হদিস পাওয়া গেল না, তখন তাঁরা রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। মূলে কুঠারাঘাত না ক'রে শুধু শাখাচ্ছেদন করলে কি মহীরুহের বিনাশ সাধন করা যায়? রোগ বেড়েই চলল, মহারাজা সূর্য্যপাল ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে পড়তে লাগলেন।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় মহারাণী চন্দ্রলীলা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজার আরোগ্য কামনায় তিনি কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কত যাগ-যজ্ঞ, কত গ্রহপূজা করালেন; মাদুলি এবং কবচে, নীলায় এবং পলায় মহারাজার কণ্ঠ ও বাহু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল; তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক—কিছুই বাদ গেল না; কিন্তু রোগ বিন্দুমাত্র উপশমের দিকে না গিয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। মনে হ'ল দেবতাও বুঝি সূর্য্যপালের প্রতি বিরূপ।

রাজবৈদ্যগণের সকল চেষ্টা যখন বিফল হ'ল, তখন রাজ্যের অপরাপর খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হ'ল। কিন্তু কেহই রাজাকে বিন্দুমাত্র সুস্থ করতে সমর্থ হলেন না; শুধু অর্থব্যয় এবং কালক্ষেপই সার হ'ল। সকলেই রাজার জীবনের বিষয়ে হতাশ হলেন; রাজা নিজেও বুঝলেন তাঁর প্রাণপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হ'তে আর বেশী বিলম্ব নেই।

দুর্ব্বল শরীরে সূর্য্যপাল চিকিৎসার তাড়নায় অস্থির হয়েছিলেন। অরিষ্ট, রসায়ন, তৈল, পাচন, বটিকা আর চূর্ণের উৎপীড়ন মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। রাজা মনে মনে একটা সঙ্কল্প ক'রে তাঁর প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্য্যকে ডেকে পাঠালেন।

বল্লভাচার্য্য উপস্থিত হ'লে রাজা বললেন, "মন্ত্রী-মশায়, আজ থেকে আমি সকল চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দিলাম। বৈদ্যরা একেবারে অকর্ম্মণ্য বাজে লোক, বিদ্যে বুদ্ধি কারও কিছু নেই। সহজ রোগ হ'লে তারা হয়ত সময়ে সময়ে সারাতে পারে কিন্তু কঠিন রোগের তারা কেউ নয়। শুধু আমার রাজ্যে নয়, আপনি রাজ্যে রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিন, যে বৈদ্য আমাকে রোগমুক্ত করতে পারবে তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব, কিন্তু চিকিৎসারম্ভের তিন মাসের মধ্যে রোগ সারাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে। এ সর্ত্তে যদি কেউ আসে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে এক জন যথার্থ শক্তিশালী চিকিৎসক। ঘোষণাপত্রে সবিস্তারে আমার রোগ-লক্ষণ বর্ণনা করবেন। যাতে যারা আসবে প্রস্তুত হয়েই যেন আসতে পারে।"

রাজার কথা শুনে বল্লভাচার্য্য অতিশয় চিন্তিত হয়ে বললেন, "মহারাজ, এ কিন্তু বস্তুত চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেওয়াই হ'ল। কারণ, 'অতিবড় ক্ষমতাশালী চিকিৎসকও প্রাণদণ্ডের ভয়ে আপনার' চিকিৎসা করতে সাহস করবে না।"

রাজা তখন মরিয়া হয়েছেন; বললেন, "তা না করুক। এ রোগে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য তা ত বুঝতেই পারছি,—দলন-মসন আর অরিষ্ট-রসায়নের হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে কয়েক দিন একটু শান্তি ভোগ ক'রে মরতে চাই।"

এ সঙ্কল্প থেকে রাজাকে নিরস্ত করবার জন্যে বল্লভাচার্য্য, মহারাণী চন্দ্রশীলা, অমাত্যবর্গ, এমন কি রাজগুরু পর্য্যন্ত অনেক অনুরোধ-উপরোধ সাধ্য-সাধনা করলেন, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। রাজা একেবারে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

অগত্যা বল্লভাচার্য্য চতুর্দ্দিকে ঘোষণাপত্র জারি করলেন। উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর; পশ্চিমে সিন্ধুদেশ; দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মহাকোশল চালুক্য-রাজ্য; পূর্ব্বে অঙ্গ, বঙ্গ, চম্পা-রাজ্য; কোন দেশই বাদ পড়ল না। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট লোভনীয় পুরস্কার বটে, কিন্তু জীবনও ত তার চেয়ে কম লোভনীয় বস্তু নয়। বড় বড় চিকিৎসক পরাভূত হয়েছেন শুনে কোন চিকিৎসকই সূর্য্যপালের চিকিৎসা করতে অগ্রসর হন না। এইরূপে বিনা-চিকিৎসায় প্রায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত হ'ল। রাজার জীবনীশক্তি আরও ক্ষীণ হয়ে এল।

সেই সময়ে মহারাজা সূর্য্যপালের রাজধানী সিংহগড় থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে চৈতসা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে অতিশয় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস ক'রত। অভাবের নিদারুণ তাড়নায় তাদের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণের বিদ্যার দৌড় খুব বেশী ছিল না, কিন্তু কূটবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ ব্যক্তি পাওয়া সত্যই কঠিন ছিল। সূর্য্যপালের চিকিৎসার পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতিরও শ্রুতিগোচর হ'ল।

ব্রাহ্মণের নাম দেবরাজ উপাধ্যায়। কয়েক দিন নিরবসর চিন্তার পর হঠাৎ এক দিন দেবরাজ তার স্ত্রীকে বললে, "ব্রাহ্মণী, তুমি কিছু দিন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কোনও রকমে সংসার চালাও, আমি সিংহগড়ে চললাম মহারাজা সূর্য্যপালের ঘোষিত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জ্জন করতে।"

দেবরাজের কথা শুনে তার স্ত্রী বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "ও মা, সে কি কথা গো! কত বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ হার মেনে গেল মহারাজের রোগ সারাতে, আর তুমি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জান না, তুমি চললে মহারাজাকে সারিয়ে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জ্জন করতে?"

দেবরাজ বললে, "বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ যখন হার মেনে গেছে, তখন বুঝতেই পারছ এ রোগ শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় সারবার নয়। অর্থের এই নিদারুণ অভাব আর সহ্য হয় না ব্রাহ্মণী, ভাগ্য পরীক্ষা করতে চললাম। অর্থ পাই ত হাসতে হাসতে ঘরে ফিরব, নইলে এ ঘৃণিত জীবন শেষ হওয়াই ভাল।"

ব্রাহ্মণী অনেক বোঝালে, অনেক কান্নাকাটি করলে, বললে, "ও গো, এ ত তুমি আত্মহত্যাই করতে চলেছ।" কিন্তু দেবরাজ কোন কথাই শুনলে না, একটি কঙ্কালসার মৃতকল্প টাট্টু ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে তার পিঠে চ'ড়ে সিংহগড় অভিমুখে যাত্রা করলে।

পথে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে করতে চতুর্থ দিন দিবা তৃতীয় প্রহর কালে দেবরাজ সিংহগড়ের পশ্চিম তোরণ অতিক্রম ক'রে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই মাজা-ভাঙা ধিয়ে-ভাজা বিচিত্র অশ্ব, এবং তদুপরি রুক্ষ কৃশ ধূলিধূসর বিচিত্রতর অশ্বারোহীর অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখে পথচারী নাগরিকগণের কৌতুক এবং কৌতূহলের অন্ত রইল না। দেখতে দেখতে দেবরাজের পিছনে জনতা জমে গেল। সকলেই প্রশ্ন করে, কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে, কার বাড়ীতে অতিথি হবে? বিস্ময়াহত জনমণ্ডলীর কৌতূহল নিবারণের কোন প্রকার চেষ্টা না ক'রে দেবরাজ গম্ভীর বদনে সোজা রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অশ্ব চালনা ক'রে চলল। এর পূর্ব্বে সে দু-তিন বার সিংহগড়ে এসেছে, রাজপ্রাসাদের পথ তার অজানা নয়।

প্রাসাদের সিংহদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে।

প্রবেশোদ্যত দেবরাজের পথরোধ ক'রে আরক্ত নেত্রে কর্কশ কণ্ঠে সে বললে, "কোথা যাও ?"

অকুতোভয়ে দেবরাজ বললে, "রাজপুরীতে।"

"কার কাছে ?"

"মহারাজার কাছে।"

সরোষে প্রহরী তর্জ্জন ক'রে উঠল, "স্পর্দ্ধা ত তোমার কম নয় দেখছি! একটা কাণাকড়ির ভিখিরী, তুমি মহারাজার কাছে যাবে ?—পালাও এখান থেকে, নইলে এখুনি তোমাকে বন্দী করব !"

অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের কোটরপ্রবিষ্ট দুই চক্ষু প্রজ্জলিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "বন্দী করবে—না, শেষ পর্য্যন্ত এই কাণাকড়ির ভিখিরীকে বন্দনা করবে, তা ঠিক বলা যায় না! আমি মহাচণ্ড শ্মশান-নিবাসী হ্রীং-ক্রৈট্ আখ্যাত তান্ত্রিক দেবরাজ উপাধ্যায়। ভৈরবীচক্র থেকে উঠে সোজা এসেছিলাম মহারাজকে রোগমুক্ত করতে। ঔষধ-প্রয়োগের আজ প্রশস্ত দিন ছিল, কিন্তু তুমি প্রতিবন্ধক হয়ে আমার গতিরোধ করলে। তুমি রাজদ্রোহী, রাজমৃত্যুকামী। তোমার বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত ক'রে তোমার কর্ম্মচ্যুতির পর তোমার স্থলে উত্তম সিংকে প্রতিষ্ঠিত করাব। আপাততঃ ফিরে চললাম।" ব'লে দেবরাজ লাগাম টেনে অশ্বের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল।

'কাণাকড়ির ভিখিরী'র অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার অকস্মাৎ একটা উৎকট জটিলতায় পরিণত হওয়ায় প্রহরী একেবারে হকচকিয়ে গেল। মহারাজার চিকিৎসার প্রতিবন্ধক হওয়ার গুরু অপরাধের বিরুদ্ধে দেবরাজ কর্তৃক রাজসমীপে অভি-যোগ আনা, এবং পরিণামে তার কর্ম্মচ্যুতি ও অজানা অচেনা উত্তম সিঙের নিয়োগ—সমস্ত ব্যাপারটাকে ষোল আনা সন্দেহ অথবা উপেক্ষা করবার মত তার মনের জোর রইল না। ওদিকে এক-পা, এক-পা ক'রে দেবরাজ ফিরে চলেছে; দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে তাকে সন্ধান ক'রে বার করা কঠিন হবে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রহরী ছুটে গিয়ে দেবরাজের ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে এসে, কি বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে, বললে, "শোন। উত্তম সিং কে ?"

অবলীলার সহিত দেবরাজ বললে, "মধ্যম সিঙের বড় ভাই।"

বিস্মিত হয়ে প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, "মধ্যম সিং আবার কে ?"

দেবরাজ বললে, "উত্তম সিঙের ছোট ভাই।"

সমস্যা কিছুমাত্র মন্দীভূত হ'ল না। এক মুহূর্ত্ত চিন্তার পর প্রহরীর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, মান-মর্য্যাদা লজ্জা-সঙ্কোচের অনুরোধে অন্ন-বস্ত্রের পাকা ব্যবস্থাকে সংশয়াপন্ন করার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর নেই। তা ছাড়া, তান্ত্রিকদের প্রতি মনে মনে তার উৎকট ভীতি ছিল; সুতরাং দেবরাজের প্ররোচনায় রাজাদেশে তার কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কাও যে মনের মধ্যে উদিত হয় নি তা নয়। মস্তক হ'তে শিরস্ত্রাণ উন্মোচিত ক'রে দেব-রাজের সম্মুখে রেখে যুক্তকরে সে বললে, "উত্তম সিং মধ্যম সিংদের আমি জানি নে। কিন্তু আপনি আমাকে অধম সিং ব'লে জানবেন। আমি আপনাকে বুঝতে পারি নি প্রভু! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

দেবরাজ ধূর্ত্ত ব্যক্তি, কোথায় কোন্ জিনিস শেষ, এবং কোন্ জিনিস আরম্ভ করা উচিত তা সে বিলক্ষণ বোঝে; বললে, "তবে আমাকে মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

প্রহরী বললে, "মহারাজার কাছে আপনাকে পাঠাবার আমার অধিকার নেই। প্রধান মন্ত্রীমশায় এখন রাজ-প্রাসাদে মন্ত্রণাগারে আছেন, আমি আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

দেবরাজ বললে, "বেশ, তাই দাও।"

অদূরে এক জন টহলদার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাকে ডেকে প্রহরী সব কথা বুঝিয়ে ব'লে তার সঙ্গে দেবরাজকে প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্য্যের নিকট পাঠিয়ে দিলে।

এক জন তান্ত্রিক চিকিৎসক রাজার চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হয়েছে টহলদারের মুখে অবগত হয়ে সকৌতূহলে বল্লভাচার্য্য তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের আকৃতি দেখে কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

দেবরাজকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বল্লভাচার্য্য বললেন, "আপনি মহারাজার রোগ সারাবেন ?"

দেবরাজ অসঙ্কোচে বললে, "হ্যাঁ, সারাব বইকি।"

বল্লভাচার্য্য বললেন, "কিন্তু না সারাতে পারলে কি তার ফল তা জানেন ত?"

দেবরাজ বললে, "সব জানি মন্ত্রীমশায়, এই দীর্ঘ পথ এত কষ্ট ক'রে নিজের জীবন দিতে আসি নি, পরের জীবন দিতেই এসেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, এখান থেকে আমি অর্থোপার্জ্জন ক'রেই যাব, প্রাণ দিয়ে যাব না।"

বল্লভাচার্য্য বললেন, "ভগবানের অনুগ্রহে আপনি যেন এখান থেকে অর্থোপার্জ্জন করেই যান।"

দেবরাজ বললে, "কারুর অনুগ্রহের দরকার নেই মন্ত্রী-মশায়, সে কার্য্য আমি নিজের বিদ্যে বুদ্ধির জোরেই ক'রে যাব।"

আরও ক্ষণকাল দেবরাজের সহিত আলাপ-আলোচনা ক'রে বল্লভাচার্য্য রাজসমীপে উপস্থিত হলেন।

এত দিন পরে একজন চিকিৎসক চিকিৎসা করবার জন্য উদ্যত হয়েছে শুনে রাজা উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সর্প্তের কথা জানে ত?"

বল্লভাচার্য্য বললেন, "সম্পূর্ণ জানে। মহারাজকে সারাতে পারবে সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জাতি?"

বল্লভাচার্য্য বললেন, "ব্রাহ্মণ। তান্ত্রিক।"

বল্লভাচার্য্যের কথায় উৎফুল্ল হয়ে রাজা বললেন, "তান্ত্রিক? তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ওষুধ দেবে না-কি?"

বল্লভাচার্য্য বললেন, "সেই রকমই ত বলে।"

রাজা বললেন, "সে কথা ভাল। ভেষজ-শক্তির সঙ্গে মন্ত্র-শক্তির যোগ হ'লে উপকার হবার সম্ভাবনা খুব বেশী।"

বল্লভাচার্য্য বললেন, "উপকার হ'লে ত আমরা বেঁচে যাই মহারাজ, কিন্তু তার চেহারা দেখলে একটুও শ্রদ্ধা হয় না।"

রাজা বললেন, "তা হোক। তান্ত্রিকদের চেহারা দেখতে ভাল হয় না। ডাকান্ তাকে এখনি আমার কাছে।"

তথাপি, দেবরাজ এলে তার মূর্ত্তি দেখে রাজার উৎসাহ অনেকটা কমে গেল, বললেন, "আমাকে তুমি সারাতে পারবে?"

দেবরাজ বললেন, "নিশ্চয় পারব।"

রাজা বললেন, "তিন মাসের মধ্যে?"

রাজার প্রতি তর্জ্জনী আস্ফালিত ক'রে দেবরাজ বললে, "তিন মাস বলছেন কি মহারাজ! তিন দিনে আপনাকে সারিয়ে দোব।"

রাজা বললেন, "তুমি পাগল!"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, এ পর্য্যন্ত যাঁরা আপনার চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন?"

রাজা বললেন, "না, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন না।"

করজোড়ে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা করবেন,—সুস্থমস্তিষ্কের লোকেরা যখন কোন সুবিধেই করতে পারে নি, তখন পাগলকেই এক বার পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। আর, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যে ব্যক্তির মহাচণ্ড শ্মশানে কুম্ভক যোগের দ্বারা শিববিন্দুর চতুর্দ্দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কাটে, সে পাগল নয়ত কি? আমি আপনার কাছে প্রাণ দিতে আসি নি মহারাজ। মহাচণ্ড শ্মশানে উৎকটভৈরবের যে মন্দির-গুহা নির্ম্মাণ করব, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে তার অর্থ সংগ্রহ করতে। আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে ব'লে রাখছি, আজ থেকে চার দিনের দিন এই পাগলের হাতে গুণে গুণে এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা আপনাকে দিতে হবে।"

উৎসাহিত হয়ে রাজা বললেন, "তা যদি হয় ত এক লক্ষ নয়, দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দোব; কিন্তু তা যদি না হয় তা হ'লে—"

সূর্য্যপালকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে দেবরাজ বললে, "এ বিষয়ে আর কিন্তু নেই মহারাজ, একেবারে নিশ্চয়। আজ সন্ধ্যাবেলা আমি ওষুধ নিয়ে আসব, আর সেই সময়ে ঔষধ সেবনের নিয়ম আপনাকে ব'লে দোব। আপাততঃ, আপনার রাশি কি আমাকে বলুন।"

সূর্য্যপাল বললেন, "সিংহ রাশি।"

দেবরাজ বললে, "আর মহারাণীর ?"

সূর্য্যপাল বললেন, "বৃষ রাশি।"

নিজের বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, আপনি দক্ষিণ চক্ষু বন্ধ ক'রে বাম চক্ষু দিয়ে আমার দিকে এক-দৃষ্টে একটু তাকিয়ে থাকুন।"

সূর্য্যপাল তাই-ই করলেন। কি করেন, তান্ত্রিক চিকিৎসকের হয়ত কোন মন্ত্র-প্রক্রিয়াই বা হবে।

এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রে দেবরাজ বললে, "এবার ঠিক উল্টো, আপনি দক্ষিণ, আমি বাম।"

সূর্য্যপাল বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন।

দেবরাজ বললে, "হয়েছে, এবার দুই চোখ খুলুন। কোন ভয় নেই মহারাজ, তিন দিনেই আপনাকে সুস্থ ক'রে দোব। তবে রোগ-শান্তির পর 'তুষ্টস্তু দানং রবি-নন্দনস্তু' করতে হবে।"

সকৌতূহলে রাজা বললেন, "সে কি ?"

দেবরাজ বললে, "সে অতি সামান্য ব্যাপার, যথাকালে জানতে পারবেন। এখন আমি চললাম, সন্ধ্যার সময়ে আসব।"

রাজা বললেন, "ঔষধ-সেবনের নিয়ম পালনের কথা বলছিলে, নিয়ম খুব কঠিন না-কি ?"

দেবরাজ বললে, "আজ্ঞে না মহারাজ, অতি সহজ নিয়ম, শুনলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু কঠিনই হোক আর সহজই হোক, নিয়ম পালন না করলে ওষুধে উপকার হবে কেন বলুন ?"

রাজা বললেন, "সে ত সত্যি কথা। তোমার কোন চিন্তা নেই, নিয়ম পালন আমার দ্বারা বর্ণে বর্ণে হবে।"

প্রসন্নমুখে দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হ'ল। বিশেষতঃ এই চিকিৎসায় যখন আমারও জীবন-মরণের কথা জড়িত।"

রাজা বললেন, "সত্যিই ত।" তার পর বল্লভাচার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে আহার এবং বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

"যে আজ্ঞে", ব'লে দেবরাজকে নিয়ে বল্লভাচার্য্য প্রস্থান করলেন।

সন্ধ্যার পর রাজ-অন্তঃপুরে রাজা ও রাণী দেবরাজেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময়ে এক জন পরিচারিকা এসে সংবাদ দিলে দেবরাজ এসেছে।

রাজা বললেন, "নিয়ে এস এখানে।"

একটু পরেই পরিচারিকার সহিত দেবরাজ প্রবেশ করলে। হাতে তার সুবর্ণ পাত্রে ঈষৎ লালচে রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। বলা বাহুল্য, সুবর্ণপাত্রটি রাজ-ভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত এবং পাত্রের ঔষধ সাধারণ লাল রং মিশ্রিত খাঁটি জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দেবরাজকে দেখে রাজা ও রাণী আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। মহারাণী চন্দ্রশীলা ভক্তিভরে দেবরাজকে প্রণাম করলেন।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে দেবরাজ বললে, "জয় হোক মহারাণী মহারাজার!" তার পর সুবর্ণপাত্রটি চন্দ্রশীলার হাতে দিয়ে বললে, "মহারাজ, আপনার ওষুধ এনেছি।"

রাজা বললেন, "ওষুধ খাবার নিয়ম কি বলুন ?"

দেবরাজ বললে, "আজ থেকে ঔষধ-সেবনের তিন রাত্রি আপনি মহারাণীকে আপনার দক্ষিণ পাশে নিয়ে এক পালঙ্কে পূর্ব্ব শিয়রে শয়ন করবেন। এই পাত্রটি সমস্ত রাত পালঙ্কের ঈশান কোণে রাখা থাকবে। প্রত্যুষে উঠে মহারাণী বাসি কাপড়ে আপনার হাতে ওষুধ দেবেন। আপনিও বাসি কাপড়ে পূর্ব্বমুখে ব'সে সমস্ত ওষুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। দিনের মধ্যে এক বার মাত্র ওষুধ খাওয়া। আবার কাল সন্ধ্যায় যে ওষুধ দিয়ে যাব, পরশু প্রত্যুষে তা খাবেন।"

রাজা বললেন, "মাত্র এই ? আর কোন নিয়ম নেই ?"

দেবরাজ বললে, "আর একটি মাত্র নিয়ম আছে। নিদিধ্যাসনে দেখা গেল, আপনার এ ব্যাধির মধ্যে উষ্ট্রিকা দোষ আছে,—ওষুধ খাবার সময় আপনি কদাচ উট মনে করবেন না। উট মনে করলে উপকার তো হবেই না, উল্টে অপকার হবে। উট মনে পড়লে সেদিন আর ওষুধ খাবেন না।"

সকৌতূহলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "উট কি ?"

দেবরাজ বললে, "এই—জন্তু উট। হাতী, ঘোড়া, উট বলে না ? সেই উট। লম্বা গলা, পিঠে কুঁজ।"

রাজা বললেন, "অত ক'রে বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। আমার নিজের উটশালাতেই তো হাজারো উট আছে।" তার পর এক মুহূর্ত্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে বললেন, "না না, উট মনে করব না। উট মনে করব কেন ? উট মনে করবার কি কারণ আছে !"

দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হবে। তা হ'লে তিন দিনে আরাম। তা যদি না হয় তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে শূলে চ'ড়ে বসব মহারাজ !"

দেবরাজের কথা শুনে রাজা ও রাণী উভয়েই খুব সন্তুষ্ট হলেন। আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে প্রবল আশা দেখা দিলে।

পরদিন প্রত্যূষে ঈশান কোণ থেকে ওষুধের পাত্রটি নিয়ে মহারাণী চন্দ্রশীলা সযত্নে স্বামীর হাতে দিলেন। পূর্ব্ব দিকে মুখ ক'রে সূর্য্যপাল প্রস্তুত হয়েই বসেছিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ ক'রে ঔষধ পান করতে গিয়ে পাত্রটা মুখে ঠেকিয়েই ভূমির উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন।

উৎকণ্ঠিত স্বরে চন্দ্রশীলা বললেন, "কি হ'ল ? খেলেন না কেন মহারাজ ?"

অপ্রতিভ মুখে সূর্য্যপাল বললেন, "উট মনে প'ড়ে গেল।"

শুনে রাণী শিউরে উঠলেন ; বললেন, "আগে থেকেই মনে পড়ছিল,—না, খেতে গিয়ে মনে পড়ল ?"

রাজা বললেন, "খেতে গিয়ে মনে পড়ল।"

নিঃশব্দে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রাণী বললেন, "কি আর করবেন বলুন, এক দিন পেছিয়ে গেল। কাল আর মনে করবেন না।"

মনে মনে কি ভাবতে ভাবতে রাজা বললেন, "না, তা আর করব না।"

সন্ধ্যাবেলা ওষুধ দিতে এসে সব কথা শুনে দেবরাজ মুখ গম্ভীর করলে। বললে, "মহারাজ, এত ক'রে যে-কথাটা নিষেধ ক'রে দিলাম, শেষ পর্য্যন্ত তাই ক'রে বসলেন ?"

অপ্রতিভ হয়ে সূর্য্যপাল বললেন, "কি করি বল ? ইচ্ছে ক'রে করেছি কি ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল।"

দেবরাজ বললে, "তার আগেই টপ্ ক'রে খেয়ে ফেললে ত হ'ত !"

অন্যমনস্কভাবে রাজা বললেন, "কাল না-হয় তাই করব।" তার পর মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা ক'রে বললেন, "দেখ দেবরাজ, এ নিয়মটা তুমি যদি আমাকে না জানাতে তা হ'লে এমনি-এমনিই পালন হয়ে যেত। জানিয়েই অসুবিধেয় ফেলেছ !"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেবরাজ বললে, "বলেন কি মহারাজ ! এর উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, না জানিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি কি ? হঠাৎ যদি আপনি উটের কথা মনে ক'রে ফেলেন,—তা হ'লে ?"

রাজা মৃদু ভাবে আপত্তি করলেন ; বললেন, "না না, হঠাৎ উটের কথাই বা মনে করতে যাব কেন ?"

দেবরাজ বললে, "এই যে আপনি বললেন আপনার উটশালায় হাজারো উট আছে ?"

রাজা বললেন, "কি গেরো ! শুধু কি আমার উট-শালাই আছে ? হাতীশালা নেই, ঘোড়াশালা নেই ?"

দেবরাজ বললে, "কিন্তু মহারাজ, উটশালাও তো আছে।"

রাজা আর তর্ক করলেন না,—পরদিন নিয়ম পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

পরদিনও কিন্তু একই ব্যাপার ঘটল, মুখে ঠেকিয়েই ঔষধের পাত্র নামিয়ে রাখতে হ'ল, উট মনে পড়ায় ঔষধ খাওয়া চলল না। তৎপরদিন থেকে ঔষধের পাত্র স্পর্শ করাও চলল না, আগে থেকেই উটের কথা মনে পড়তে থাকে !

মহারাণী চন্দ্রশীলা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওষুধ খাবার সময় যাতে উটের কথা রাজার মনে না পড়ে সে জন্য তিনি রাজাকে নানা প্রকারে অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করেন, মিথ্যা ক'রে বলেন, "মহারাজ, আপনার হাতীশালায় আজ লক্ষ্মণদাসের ভারি অসুখ। এক ফুটো ডাল-পালা মুখে দেয় নি। আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি শুঁড়

["ফিজি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ.৮০১]

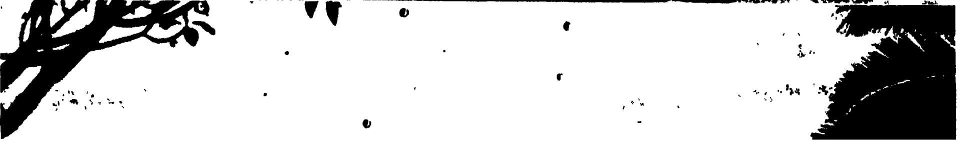






উপর হইতে : ফিজির গৃহ । ফিজির লোকসংগীত-গায়কদল । ফিজির যোদ্ধা









উপর হইতে : সরকারী আপিস-আদালত, ফিজি। ফিজির প্রধান শহর, সুবা।
ফিজির পূর্ব্বতন প্রধান নগর, লেবুকা

নাড়ছে।" লছমনদাস রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হস্তী। কিন্তু শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা চলে? লছমনদাসের দীর্ঘ আন্দোলিত শুঁড় রাজার মনে ঢুনডিনাথের লম্বা গলা রূপে উঁচু হয়ে দেখা দেয়,—রাজা ধীরে ধীরে অ-সেবিত ঔষধের পাত্র ভূমিতলে নামিয়ে রাখেন। ঢুনডিনাথ রাজার সবচেয়ে আদরের উট—খাস আরব দেশ থেকে বহু যত্নে এবং বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করা।

মহারাণী চন্দ্রশীলার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে বলেন, "তোমার অপরাধ কি মহারাজ! আমার নিজেরই মন ক্রমশঃ এক উটশালায় পরিণত হয়েছে!

এমনি ভাবে মাসাধিক কাল গত হল। সূর্য্যপালের পেটে এক বিন্দু ঔষধ প্রবেশ করল না, ওদিকে রাজার-হালে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারে দেবরাজের শরীর দিন দিন কান্তিমান হয়ে উঠছে। ঔষধ দিতে এসে দেবরাজ গজগজ করে; বলে, "মহারাজ, মনে করেছিলাম দিন-চারেকে কার্য্য শেষ ক'রে বাড়ী ফিরব, কিন্তু আপনি এমনি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছেন যে দেখতে দেখতে এক মাস হয়ে গেল। ওদিকে বাড়ীতে কত প্রয়োজনীয় কাজ পণ্ড হচ্ছে।"

রাজা কিছু বলেন না, বেকায়দায় প'ড়ে গেছেন, মনের আক্রোশ মনের মধ্যে চেপে চুপ ক'রে থাকেন।

আর দিন-পনর 'পরে কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে। বল্লভাচার্য্যকে আর দেবরাজকে রাজা ডাকিয়ে পাঠালেন।

উভয়ে উপস্থিত হ'লে দেবরাজের প্রতি সক্রোধ নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে রাজা বললেন, "দেবরাজ, তুমি একটি বিষম ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, জোচ্চোর!"

কাঁচুমাচু মুখে করজোড়ে দেবরাজ বললে, "কেন মহারাজ?"

কঠোর কণ্ঠে রাজা বললেন, "আবার চালাকি করছ? কেন, তা জান না?"

দেবরাজ কোন কথা বললে না, করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আমার আগেকার রোগ সেরে গেছে, তার বিন্দুবিসর্গও আর নেই। কিন্তু তার জায়গায় নূতন যে রোগ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছি! আগেকার রোগ এর চেয়ে ভাল ছিল। তার শেষ ছিল মৃত্যুতে, কিন্তু এ রোগে বেঁচে থেকে দিবা-রাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি!"

রাজার কাতরোক্তি শুনে দেবরাজের হাসি পেয়েছিল। অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে সে বললে, "কি রোগ মহারাজ?"

রাজা সজোরে চীৎকার ক'রে উঠলেন, "হারামজাদা আবার ন্যাকামি করছ! উট-রোগ তা তুমি জান না?"

শুনে মন্ত্রী বল্লভাচার্য্য চমকে উঠলেন; বললেন, "বলেন কি মহারাজ! উট-রোগ?"

রাজা বললেন, "হ্যাঁ, উট-রোগ। ওই নচ্ছারটা একটা আস্ত উট আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে! ঘুমিয়ে পর্য্যন্ত নিস্তার নেই, স্বপ্ন দেখি উটের। ঘুম ভাঙলে মনে হয় উট,—উট ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ মনের মধ্যে উট খট্‌খট্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায়! তার পর দেবরাজের দিকে আরক্ত নেত্রে দৃষ্টি-পাত ক'রে বললেন, "বার কর্ এ উট আমার মনের ভেতর থেকে, নইলে তোকে শূলে চড়িয়ে নুনে পুড়িয়ে মারব!"

মনের অপরিসীম উল্লাস অতি কষ্টে মনের মধ্যে দমন ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, প্রথম দিনেই ত বলেছিলাম যে নিদিধ্যাসনে দেখা গিয়েছিল আপনার রোগে উষ্ট্রিকা দোষ—"

দেবরাজকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজা চীৎকার ক'রে উঠলেন, "চোপ রও পাষণ্ড! ফের যদি উষ্ট্রিকা দোষের কথা উচ্চারণ করেছ, এক্ষুণি দু-খণ্ড করব তোমাকে!" ব'লে কোষ থেকে অসি নিষ্কাসিত করলেন।

দেবরাজ দেখলে আর বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই। করজোড়ে বললে, "দোহাই মহারাজ! দয়া ক'রে ও কার্য্যটি করবেন না। প্রাণটা দেহে বর্ত্তমান থাকলে উটের যা-হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু না থাকলে উটকে কোন মতেই বার করতে পারব না। এর অতি সহজ প্রতিকার আছে, অভয় দেন ত নিবেদন করি।"

রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কি?"

দেবরাজ বললে, "আপনার পায়ের শির তার টন্‌টন্‌ করে না?"

রাজা বললেন, "না।"

"বুক ধড়ফড় করে না?"

"না।"

"চোখ লাল হয় না?"

"না।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, তা হ'লে ত আপনার আসল রোগ একেবারে সেরে গিয়েছে। আপনার প্রতিশ্রুত দুই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে আমাকে বিদায় করুন, তা হ'লে আপনার মন থেকে বেরিয়ে এসে উটও আমার পিছনে পিছনে খট্‌খট্‌ করতে করতে চ'লে যাবে।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে রাজা বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। মন্ত্রীমশায়, এই শয়তানটাকে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লাথি মেরে বিদায় করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এর এক ফোঁটা ওষুধ আপনার পেটে গেল না, আর দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা একে দিতে বলছেন?"

রাজা বললেন, "এই সর্ব্বনেশে লোককে আর এক দিনও আমাদের রাজ্যে রাখবেন না। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ পর্য্যন্ত ও আপনার মনে হাতী ঢুকিয়ে ছাড়বে! তখন চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওকে বিদায় করতে হবে।"

এই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক কথা শোনবার পর মন্ত্রী আর দ্বিরুক্তি করলেন না, দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

সেই বিপুল বহুমূল্য অর্থ ষোল আনা মজবুত বোরায় পুরে আটটা ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী রক্ষীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রফুল্লমুখে দেবরাজ নিজের সেই মাজা-ভাঙা ঘোড়ার উপর সমাসীন হয়ে চৈতসা অভিমুখে যাত্রা করলে। বলা বাহুল্য, রাজবাড়ীর পুষ্টিকর দানা-পানির গুণে দেবরাজের সেই ঘিয়ে-ভাজা ঘোড়াও অনেকটা বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

রাত্রে মহারাণী চন্দ্রশীলা পূর্ব্বের মত রাজার বাম পার্শ্বে শয়ন করলেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর সূর্য্যপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, কাল রাত্রে আপনার সুনিদ্রা হয়েছিল ত?"

প্রসন্নমুখে রাজা বললেন, "হ্যাঁ, সমস্ত রাত।"

"স্বপ্ন দেখেছিলেন?"

"দেখেছিলাম।"

সভয়ে মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের স্বপ্ন?"

সহাস্যমুখে রাজা বললেন, "উটের স্বপ্ন একেবারেই নয়; শুধু তোমার স্বপ্ন।"

সূর্য্যপালের কথা শুনে লজ্জায় এবং আনন্দে মহারাণীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলেন, উটটা তা হ'লে সত্য সত্যই দেবরাজের সহিত প্রস্থান করেছে।

[প্রচলিত প্রাচীন কাহিনীর ছায়াবলম্বনে।]



পুস্তক পরিচয়

লঘুগুরু—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কর্তৃক রচিত কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ। ২৫।২ মোহনবাগান রো হইতে 'রঞ্জন-পাবলিশিং হাউস' কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৪, মূল্য এক টাকা।

'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন' রচয়িতা, 'চলন্তিকা' অভিধানের সংকলয়িতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিভাষা সমিতি'র সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এক দিকে তিনি যেমন রসস্রষ্টা সাহিত্যিক, অন্য দিকে তেমনি বিচারশীল বিশ্লেষক ও বৈজ্ঞানিক। ইহা ছাড়া, 'বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্'-এর মত একটা বিরাট্ প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতে, বাঙ্গালীর মধ্যে যাহা অসাধারণ, কার্যক্ষেত্রে কৃতকর্মিতাও তাঁহার সুবিদিত—ইহার জন্যও বাঙ্গালী এবং ভারতবাসী তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। রাজশেখর-বাবু পেশাদারী সাহিত্যিক নহেন, এই জন্য বহুলেখ হইবার তাগিদ তাঁহার নাই। অধিক লেখেন না বলিয়াই বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ তাঁহার রস-রচনা অথবা প্রবন্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁহার নক্শা ও ছোট গল্পগুলি পুস্তকাকারে তিন খণ্ডে প্রকাশিত করিয়া ইতিমধ্যে তিনি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক-সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার দশটী প্রবন্ধ গ্রন্থময় আকারে বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য, মানসিক সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি লইয়া। প্রবন্ধ কয়টী এই—'নামতত্ত্ব', 'ডাক্তারি ও কবিরাজি', 'ভদ্র জীবিকা', 'রস ও রুচি', 'অপবিজ্ঞান', 'ঘনীকৃত তৈল', 'ভাষা ও সংকেত', 'সাধু ও চলিত ভাষা,' 'বাংলা পরিভাষা' এবং 'সাহিত্য-বিচার'। প্রবন্ধগুলি এমন সব বিষয় লইয়া যাহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কিছু-না-কিছু কৌতূহল আছে—বিষয়গুলি তাহার জগৎকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান। রাজশেখর-বাবুর কথা বলিবার ধরণে পাণ্ডিত্যের বৃথা বাহ্বাস্ফোট নাই অর্থচ সুযুক্তির সঙ্গে তিনি কাজের কথার অবতারণা করিয়াছেন, ধীর ভাবে বিচারের সঙ্গে নিজের রায় দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে যে জিনিসটী নিতান্ত দুর্লভ, সেটী রাজশেখর-বাবুর চিন্তা এবং প্রকাশভঙ্গীকে বিশেষ করিয়া উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে—সেটী হইতেছে, সহজ, সরল অথচ কৌতুক-মিশ্র দৃষ্টি। তাঁহার লেখায় অজ্ঞতার বা কুযুক্তির প্রতি ক্রোধ নাই, উপরন্তু যথেষ্ট অনুকম্পা আছে। এই জন্য তাঁহার লেখা পড়িয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত শুনিবেন, এবং তাঁহার কথার মধ্যে অন্তর্নিহিত হাস্য-রস উপভোগ করিবেন। 'নামতত্ত্ব' প্রবন্ধে, আমাদের সমাজে মানুষ চিনিতে হইলে যে পদবী অপেক্ষা ব্যক্তিগত নামের উপযোগিতা বেশী, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন,—ইংরেজী কায়দায় 'ঘোষ, দত্ত, ঘোষাল' বলা অপেক্ষা বাঙ্গালী কায়দায় 'অমুক-বাবু' বলিয়া উল্লেখ করিলেই যে মানুষটীকে আমরা শীঘ্র বুঝিব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নামের আগে 'শ্রী' লিখিব, কি লিখিব না—এই বিষয়ে তিনি নিরপেক্ষ, তবে তিনি নিজে আর 'শ্রী' ব্যবহার করিতেছেন না। বাঙ্গালী পুরুষের মেয়েলি নাম লইয়া ইতিপূর্বে তিনি আমাদের হাসাইয়াছেন ('লালিমা পাল [পুং]')। সমস্ত নারীর নামের সঙ্গে 'দেবী' পদ ব্যবহার করিলে, 'মিস্' বা 'মিসিস্' বলার শ্রুতিকটুত্ব হইতে আমরা উদ্ধার পাইব,—তাঁহার এই প্রস্তাব আজকাল অতি সহজ ভাবেই ভদ্র সমাজে গৃহীত হইয়া যাইতেছে। 'ডাক্তারি ও কবিরাজি' প্রবন্ধে নিরপেক্ষভাবে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই দুই প্রকার চিকিৎসার আলোচনা আছে। কবিরাজী চিকিৎসাকে একেবারে বর্জন করিলে চলিবে না; ইহার মধ্যে খাঁটি জিনিস যাহা আছে তাহাকে উপেক্ষা করিলে আমরাই ঠকিব। রাজশেখর-বাবু দুই-চারিটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথা বলিয়াছেন—সকল সভ্য দেশেরই আপন আপন ফার্মাকোপিয়া আছে, এবং তাহা দেশের প্রথা ও রুচি অনুসারে সংকলিত হইয়া থাকে। এদেশের ফার্মাকোপিয়ার বর্তমান কালের উপযোগী সুপরীক্ষিত যথাসম্ভব দেশীয় উপাদানের সন্নিবেশ হওয়া উচিত। ঔষধ-তৈয়ারির যে-সকল ডাক্তারী প্রণালী আছে তাহার অতিরিক্ত আয়ুর্বেদীয় প্রণালীও থাকা উচিত। 'ভদ্র-জীবিকা' প্রবন্ধে বাঙ্গালী ছেলের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কাজ করিবার সুবিধা অসুবিধা এবং বণিগ্‌বৃত্তির সহিত সংস্কৃতির সম্বন্ধ লইয়া সুন্দর আলোচনা আছে। রসসৃষ্টির মূল প্রেরণা কি, রসাত্মক রচনার লক্ষণ কি, এই বিচার লইয়া পরবর্তী প্রবন্ধ 'রস ও রুচি'। লেখকের মতে—'ভোক্তার রুচি গঠিত ক'রে, কল্যাণের অন্তরায় না হ'য়ে, যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।' 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধটীতে আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মনে নানা বিষয়ে যে সকল অবৈজ্ঞানিক ধারণা বিদ্যমান, তাহার চিত্তাকর্ষক আলোচনা আছে। 'ঘনীকৃত তৈল' প্রবন্ধের শেষ কথা—'কম্‌তার কুলাইলে ঘি খাইব, অথবা সর্ষপ তিল চীনাবাদাম বা নারিকেল তৈল খাইব। রুচিতে না বাধিলে স্বদেশী চর্বিও খাইব, কিন্তু বিদেশী ঘনীকৃত তৈল পূতনার স্তন্যবৎ পরিহার করিব।' ভাষা ও পরিভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলিতে অনেক কার্যকর কথার আলোচনা আছে—এগুলি এমন সহজ ভাবে গুছাইয়া লেখা যে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আলোচনা করিয়া মত স্থির করিতে পাঠকের দেরী হয় না। সাহিত্য-স্রষ্টা কে? সমালোচকের কাজ কি? অল্প কথায় লেখক এই জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন শেষ প্রবন্ধে।

মোট কথা, নানা দিক্ দিয়া 'লঘুগুরু' বাঙ্গালা প্রবন্ধ-সাহিত্যের একখানি অতি উপাদেয় পুস্তক হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক এই বই আরামের সঙ্গে পড়িতে পারিবেন। এবং ইহার বক্তব্যগুলির প্রতি একটু মন দিলে, সুযুক্তিপূর্ণ আলাপে যে মানসিক তৃপ্তি এবং মানসিক উৎকর্ষ ঘটে, তাহা লাভ করিবেন।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ১৭৯৫-১৮৭৬—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্-এ ডি-লিট্ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সহিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০। মূল্য পরিষৎ সদস্যের পক্ষে ২৲, সাধারণের পক্ষে ২।০।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলা দেশের অন্যতম প্রধান 'তথ্যমাত্রদর্শী' ঐতিহাসিক। এরূপ পক্ষপাতহীন অধ্যবসায়ের সহিত কালক্রম ধরিয়া ঘটনাবলীর আলোচনা আমাদের দেশে বিশেষ দুর্লভ।

ব্রজেন্দ্র-বাবু বিশেষ ভাবে উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধারে আত্মনিয়োজিত হইয়াছেন। এই কার্যে তিনি মুখ্যতঃ সমসাময়িক কাগজপত্র ও পত্রিকার আশ্রয় লইয়াছেন, বিশ্বাসযোগ্য সমসাময়িক উক্তিকে ঘটনাপরম্পরার বিচারে প্রধান প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতিতে আলোচনা ব্যাপক ভাবে তাঁহারই হাতে হইয়াছে, এবং অতি সার্থক ভাবেই হইয়াছে। আমাদের কালে অখ্যাত, অজ্ঞাত ও দুষ্প্রাপ্য বহু প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সন্ধান ব্রজেন্দ্র-বাবু আমাদের দিয়াছেন, এবং বেশীর ভাগ তাঁহার নিজের আহৃত এই সমস্ত উপাদান হইতে, ইংরেজ জাতি ও ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত সংঘাতের ফলে আধুনিক যুগে উনবিংশ শতকের মধ্যে কি করিয়া বাঙ্গালী জাতির জীবনের ও মনের গতি ফিরিল এবং তাহার সভ্যতা নবকলেবর ধারণ করিল তাহার দিগ্‌দর্শন তিনি আমাদের করাইয়াছেন। অধুনা দুষ্প্রাপ্য বহু প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার করিয়া সেগুলির পুনঃপ্রকাশন তিনি করিয়াছেন। বর্তমান যুগের প্রারম্ভে যে-সকল কৃতকর্মা বাঙ্গালী চিন্তানেতা ও সাহিত্যিক প্রকট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের পরিচয় ও কৃতিত্বের কথা তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পুস্তকখানির তিনটী খণ্ড শতাধিক বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী জীবনের লুপ্তকথায় পরিপূর্ণ তিনটী মহামূল্যবান ভাণ্ডারস্বরূপ, বহুকাল ধরিয়া অন্যতম প্রমাণগ্রন্থ-রূপে বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা-ক্ষেত্রে বিরাজ করিবে। উনবিংশ শতকের প্রধান বাঙ্গালী লেখকদের রচনার প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের কাজে অবতীর্ণ হওয়াও তাঁহার আর একটী কৃতিত্ব।

প্রস্তুত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ইহার যে আদর হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। এই বই ১৩৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, ছয় বৎসর পরে ইহার পরিবর্ধিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত নূতন সংস্করণ বাহির হইল। ইহাতে ধারাবাহিক ভাবে ১৭৯৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালার নাট্যজগতের প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু ১৩৩১ সালে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—'নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে দুটি বিশেষ উপকরণের সাহায্য লইতে হয়,—পুরাতন সংবাদ-পত্রের ফাইল, ও পুরাতন বিজ্ঞাপন-পত্রের তাড়া।' প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় অধ্যবসায়ের সহিত ব্রজেন্দ্র-বাবু এই দুই উপকরণ যতদূর পাওয়া যায় ততদূর খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইতিহাস-গঠনের কাজে লাগাইয়াছেন। ১৭৯৫ সালে জনৈক রুষ দেশীয় 'ভবঘুরে' Herasim Lebedeff হেরাসিম লেবেডেফ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, এবং গোলোকনাথ দাস নামক একজন বাঙ্গালী ভাষাশিক্ষকের সহায়তায় ডোমতলায় (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীটে) একটি থিয়েটার খুলিয়া তাহাতে পর পর দুইটী বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় করান। এই অভিনয় বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা হইয়াছিল। ১৭৯৬ সালে লেবেডেফ বিলাত চলিয়া যান, ও সেই সঙ্গে এই প্রথম বাঙ্গালা নাট্যশালাটী বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পরে বাঙ্গালা যাত্রার পুনরুজ্জীবন দেখা যায়। পরে ১৮৩১ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেষ্টায় শেক্স্‌পিয়রের ইংরেজী নাটক ও ভবভূতির ইংরেজী অনুবাদ লইয়া বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার সূত্রপাত হয়। ইহার চারি বৎসর পরে বাঙ্গালা ভাষায় নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়, ইউরোপীয় থিয়েটারের রীতি এই ভাবে নূতন করিয়া বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রূপে, বাঙ্গালা নাট্যশালার আদিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭৬ সালে Dramatic Performances Control Bill আইন ইংরেজ সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়া পর্যন্ত, এই বিষয়ে প্রাপ্ত জ্ঞাতব্য এবং প্রমাণ-উদ্ধারের সহিত সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্যে পূর্ণ ইতিহাস প্রস্তুত গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

পুস্তকখানি তথ্যবহুল; ইহাতে গ্রন্থকার নিজেকে কোথাও প্রকাশ করেন নাই; নিজের মতামত দিবার জন্য কোথাও ব্যস্ত হন নাই। ইহাই এই বই মর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। উচ্ছ্বাসপরিপূর্ণ তথ্যবিষয়ে অসম্পূর্ণ সাহিত্য বা সমাজের ইতিহাস যখন বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রচুর, তখন এইরূপ নির্বৈয়ক্তিক আলোচনা ইতিহাসের প্রধান গুণ বলিতে হইবে। কিন্তু তথ্যবহুল ও নির্বৈয়ক্তিক বলিয়া বইখানিতে সাহিত্য-রসের অভাব নাই। ইহা বাস্তবিকই বাঙ্গালা ভাষার একখানি অতি চিত্তাকর্ষক বই হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোথাও পাঠকের আগ্রহ কমে না। এক শত বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা বহু স্থলে তখনকার দিনের অংশভাক্ বা প্রত্যক্ষদর্শীদের নিজের কথায় বলা হইয়াছে বলিয়া, বইখানির চিত্তাকর্ষকত্ব আরও বাড়িয়াছে। প্রমাণ-স্বরূপ নূতন কাগজপত্র বাহির না হইলে, এই বইয়ের documentary value, অর্থাৎ নথীপত্রের মত প্রমাণ হিসাবে ইহার মূল্য কখনও কমিবে না।

বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিক্, তাহার নাট্যকলা ও নাট্যসাহিত্যের এই বিশদ ইতিহাস পাঠ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক আনন্দিত হইবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বরবিতান চতুর্থ খণ্ড—ধর্মসংগীত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি কাঙালীচরণ সেন। সম্পাদক শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

রবীন্দ্র-রচিত ধর্মসংগীতাবলীর সুরধারার মধ্য দিয়া অগণিত নরনারী তাহাদের বেদনাকে নূতন রূপে দেখিয়া দুঃখ-আঘাতে নিবিড় শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে, ভক্তজন আরাধ্য দেবতাকে দুর্লভ দূর না মনে করিয়া, তাঁহাকে বন্ধু ও প্রিয় বলিয়া জানিয়া জীবনকে সুন্দরতর, সাধনাকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে—ভগবানের পাপ-শাসন মূর্তি-কল্পনা ক্রমশ দূর হইয়া তিনি ভক্তের জীবনদেবতা, একান্ত নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত প্রিয়তম জন হইয়াছেন। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে জানিতে হইবে, এই প্রাচীন বাণীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংগীতে যে নূতন রূপ দিয়াছেন তাহাতে এই বাণী আর শুধু বন্ধনমুক্ত জনের বোধগম্য তত্ত্বকথামাত্র হইয়া নাই, শতবন্ধনপীড়িত নরনারীও এই সকল সংগীতের কথায় ও সুরে ক্ষণিকের জন্য হইলেও, বেদনার শোকের মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্পর্শলাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। "অল্প লইয়া থাকি তাই", "তুমি বন্ধু তুমি নাথ", "নিবিড় ঘন আঁধারে", "জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপাতরণী" "আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে", "সদা থাকো আনন্দে" প্রভৃতি পঞ্চাশটি বিখ্যাত ধর্মসংগীত ও তাঁহার স্বরলিপি স্বরবিতানের এই খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রসংগীত গীতশাস্ত্রীদের মতে সংগীত না-হইতে পারে, কিন্তু গীততত্ত্বানভিজ্ঞ সাধারণ লোকের হৃদয় যে তাহা স্পর্শ করে তাহার কারণ শুধু তাহার কথা নয়, তাহার সুরও। এই জন্য তাহারও সুরবিকৃতি করিলে কথা দ্বারা সে-ক্ষতির পূরণ

হয় না। "স্বরবিতান" নাম দিয়া বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-সংগীতের যে সমগ্র স্বরলিপি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতেছেন, রবীন্দ্র-সংগীতশিক্ষার্থিগণ প্রাকৃতরুচিকে তুষ্ট না করিয়া তাহারই অনুসরণ করিলে রচয়িতা ও শ্রোতা উভয়ের প্রতিই সুবিচার করা হইবে।

পাগলা দাশু—সুকুমার রায় চৌধুরী। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স্ লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

গত কয়েক বৎসরে আয়তনের দিক দিয়া বাংলা "শিশু"-সাহিত্য বিশেষ স্ফীতিলাভ করিয়াছে, সংখ্যা গুনিয়া দেখিলে আমাদের সাহিত্যের এই বিভাগ সম্বন্ধে আশার অন্ত থাকে না; কিন্তু অক্ষম রচনায় পূর্ণ এই সকল বই খুলিয়া পড়িতে গেলে দেখা যায়, এই দিকেই ফাঁকি সব চেয়ে বেশি চলিতেছে, এবং ক্ষণে ক্ষণে সুকুমার রায় চৌধুরীর অকালমৃত্যুর কথা মনে পড়িয়া আমাদের ক্ষতির কথা নূতন করিয়া অনুভব করিতে হয়। বালক-বালিকাদের মনস্তুষ্টির জন্য সুকুমার রায়চৌধুরী যে কত বিচিত্র আয়োজন করিয়াছিলেন পুস্তকাকারে তাহার নিদর্শন এ পর্য্যন্ত মাত্র দুইটি ছিল, অন্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে সন্দেশের পুরাতন ফাইল ছাড়া গতি ছিল না। বর্ত্তমানে "সন্দেশ" হইতে সুকুমার রায়চৌধুরীর উজ্জ্বলহাস্যরসাকীর্ণ কয়েকটি গল্প এই পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। এখন যাঁহারা ত্রিংশোর্দ্ধ তাঁহারা আর বালক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য না থাকিলেও তাঁহাদের অনেকেই নিজেদের শৈশবস্মৃতির মধুর আলোকে সমুজ্জ্বল এই গল্পের বইটি সংগ্রহ করিবার জন্য আগ্রহে অধীর হইবেন এই কথা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি।

স.

কলিকাল—শ্রীসজনীকান্ত দাস। প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। ক্রাউন চতুরংশিত, ১৫৫ পৃষ্ঠা। দাম দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদেবতার কথা সবিস্তারে লিখেছেন। সক্রেটিসও বলতেন যে এক নিত্যসঙ্গী ডীমন তাঁকে অহরহ চালিত করে। বিখ্যাত ও অলখ্যাত আরও অনেক লোক তাঁদের চেষ্টার পশ্চাতে কোনও অলক্ষ্য শক্তি অনুভব করেছেন। এই শক্তি—তা দেবতাই হোক বা অন্তরের প্রেরণাই হোক—যাঁর উপর অধিষ্ঠান করে তাঁর কার্যাবলীতে একটা সামঞ্জস্য বা একমুখতা আনে। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের স্কন্ধে বা লেখনীতে ঐ রকম কোনও জীবন্ত অথবা রূপক দেবতা ভর ক'রে আছেন কিনা তা তিনি কখনও প্রকাশ করেন নি। হয়তো বিনয়বশতঃ বলেন নি, কিংবা নিজেই টের পান নি। কিন্তু আমরা বহুকাল থেকে তাঁর লেখা প'ড়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহগ্রস্ত হয়ে আছি। তিনি গল্প নক্শা কবিতা রাজনীতি যাই লিখুন, তার অধিকাংশে একই লক্ষণ দেখতে পাই। যুক্তি বিবৃতি অলংকার প্রভৃতি মামুলী সাহিত্যিক উপায় তিনি প্রচুর প্রয়োগ করেন, কিন্তু সে সমস্তই গৌণ। তাঁর প্রধান চেষ্টা শরসন্ধান ও লক্ষ্যবেধ। ক্ষুদ্র ব্যক্তি যেমন গোঁফ পাগড়ি জোব্বা খেতাব ইত্যাদি ধারণ ক'রে বৃহত্ত্ব লাভ করে, তেমনি অনেক তুচ্ছ হেয় বস্তু সজ্জা আর আড়ম্বরের আবরণে জেঁকে ওঠে। নিত্য দেখে দেখে আমাদের চোখে ধাঁধা লাগে, তাদের আসল রূপটি আমরা বুঝতে পারি না। সজনীবাবুর বিশিষ্ট পদ্ধতি এই—তিনি প্রথমেই এক টানে আক্রান্ত বিষয়টির খোলস ছাড়িয়ে ফেলেন, তার পর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের খোঁচা লাগান। তখন আর যুক্তির দরকার হয় না, পাঠকের যে স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান আর হাস্যরসবোধ আছে তাতেই অবাধে কাজ হাসিল হয়। কিন্তু কলিকাল প'ড়ে মনে হ'ল, লেখকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্প্রতি স'রে দাঁড়িয়েছেন। এই বইখানিতে যে একুশটি সচিত্র গল্প ও নক্শা আছে তার উদ্দেশ্য শুধুই রঙ্গ। অর্থাৎ এই লেখাগুলির উপলক্ষ্য আছে কিন্তু লক্ষ্য কেউ নেই, বেধনাস্ত্রও নেই। সেজন্য সকলেই নিশ্চিন্ত হয়ে লেখকের অপূর্ব হাস্যরস উপভোগ করতে পারবেন, অতর্কিতে শরবিদ্ধ হবার ভয় নেই।

রাজশেখর বসু

চিত্রচম্পূ—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক রচিত। কাশীধামের জয়নারায়ণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তি-মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৫২ নং বাগ্ রাণীভবানী, কাশী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার অতি প্রখ্যাত কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে বঙ্গের প্রথম গবর্ণর ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের নিয়োগে প্রথমে তিনিই কৃপারাম প্রভৃতি অপর দশ জন পণ্ডিতের সহযোগে হিন্দু দায়ভাগ বিষয়ে "বিবাদার্ণব সেতু" নামে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। উক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ শোভাকরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বিষ্ণু সিদ্ধান্ত-বাগীশের পৌত্র এবং প্রখ্যাত নৈয়ায়িক রামদেব তর্কবাগীশের পুত্র। তিনি "চন্দ্রাভিষেক" এবং "কাশীশতক" প্রভৃতিও রচনা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হইয়া তাঁহার আদেশে বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার পরে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে "চিত্রচম্পূ" নামে কাব্য রচনা করেন। সংস্কৃত গদ্যপদ্যময় এই অপূর্ব্ব কাব্যে চিত্রসেনের সম্বন্ধে অনেক চিত্র-কথার বর্ণন করায় ঐ কাব্যের নাম "চিত্রচম্পূ"। পূর্ব্বে বঙ্গের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বাণেশ্বরের বহু উদ্ভট কবিতা জানিলেও তাঁহার "চিত্রচম্পূ"র কথা সকলে জানিতেন না। এত দিন পরে শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তিমহাশয় বহু কষ্টে "চিত্রচম্পূ"র পুঁথি সংগ্রহ করিয়া অতি কঠোর পরিশ্রমে সংশোধন ও সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই কাব্যের প্রথমে মহারাজ চিত্রসেনের প্রশস্তি, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যতালিকা, বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণনার পরে স্বপ্নে মৃগয়ায়ত রাজার সৎসঙ্গ সরোবর দর্শন, প্রেমভক্তি দেবীর সহিত বৃন্দাবনে গমন, পথিমধ্যে অঙ্গ, চম্পা, মগধ, মিথিলা, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থদর্শন এবং বৃন্দাবনে

রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডে স্নান, বৃন্দাবন লীলাদর্শন, রাধাকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ লাভ ও অযোধ্যায় রামসীতাদর্শন প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু সুধীগণের এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের নীরব সাধক কাশীবাসী শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তিমহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বদেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখবন্ধ দ্বারা এই গ্রন্থ গৌরবিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তি-মহাশয় এই গ্রন্থে ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী ভূমিকা এবং পরে সংস্কৃত ভূমিকার দ্বারা এমন বহু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তি-মহাশয় সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

তাসের ঘর—শ্রীমতী মায়া দে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ টাকা। ১১৮ পৃ.।

আলোচ্য গ্রন্থখানি না নাটক, না উপন্যাস। লেখিকা টেক্‌নিকের দিক হইতে গোলযোগ বাধাইলেও তাঁহার রচনার হাত ভাল। উজ্জ্বলা ও সম্মোহনের চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়ডঙ্কা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। কলিকাতা ৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে আশুতোষ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

আলোচ্য পুস্তকটি ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছড়া ও গল্পের বই। গ্রন্থকার শিশুসাহিত্যের লেখক হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এই পুস্তকটি গ্রন্থকারের পূর্ব্বেকার রচনার মত চিত্তাকর্ষক হয় নাই। যাহা হউক, শিশুদিগের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম—(অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা)। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থে প্রাঞ্জল ভাষায় নাতিবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি, গতি ও প্রসারের ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। গ্রন্থকার নানা যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাহা সারাংশ, তাহা অন্য কোন দেশে প্রচলিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে গৃহীত হয় নাই" (পৃ. ৪৯)। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশ ও মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, ইহা মাধ্ব বা রামানুজ কিংবা বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বা শাখা নহে" (পৃ. ৯৭)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বাংলার মনীষী—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ও ৩৮, জনসন রোড, ঢাকা। সচিত্র।

বহিখানি কিশোরবয়স্ক পাঠকপাঠিকাদের জন্য লিখিত। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়, শ্রীচৈতন্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, অতীত ও বর্ত্তমান যুগের এই বারো জন বাঙালী পুরুষশ্রেষ্ঠের কথা লেখক হৃদ্য ভাষায় এই বহিতে আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের পুণ্যচরিত বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলে, প্রত্যেকের জন্য এই আকারের এক-একটি বহি লিখিলেও কুলাইত না। তাই অল্পপরিসরের মধ্যে, আলোচিত জীবনের সকল ঘটনা বর্ণনা না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু-চারটি বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক ঘটনা অবলম্বন করিয়া চরিতালেখ্য আঁকিয়াছেন, এই উপায়েই কিশোর পাঠকপাঠিকাদের মনে আলোচ্য চরিত্রের মহত্ত্ব বিশেষ ভাবে ছাপ রাখিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

চিত্রগুলি যাহাতে বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক, সুস্পষ্ট ও সুমুদ্রিত হয় সেদিকে প্রকাশক একেবারেই দৃষ্টি দেন নাই।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও ৩৮, জনসন রোড, ঢাকা। সচিত্র।

গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্পের অনেকগুলিই শ্লীলতাসম্মত বা আধুনিক রুচিসঙ্গত নয়। রুচিহীনতা মার্জ্জিত করিয়া লেখক গল্পগুলি এই পুস্তকে শিশুদের জন্য পরিবেশন করিয়াছেন, সেদিক দিয়া তাঁহার চেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু লেখক গোপাল ভাঁড়ের গল্পে তাঁহার রচনার উপাদান সন্ধান না করিলেই ভাল হইত মনে হয়, কারণ গোপাল ভাঁড়ের গল্প যে-ধরণের রসিকতার জন্য বিদিত, রুচির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা প্রয়োগ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য কাগজের মলাট ৪।০, রেক্সিনে বাঁধাই ৫।০। সচিত্র।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা বইয়ের পক্ষে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইয়াছে। প্রথম খণ্ডেরও দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রায় প্রত্যেক খণ্ডেই রবীন্দ্রনাথের

স্থান না কোন দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগৃহীত হইতেছে। এই সমগ্র-রচনাবলী প্রকাশের ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ও রবীন্দ্রবাণীর সমগ্র রূপটি দেশবাসীর মনে আরও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই লোকপ্রিয়তা হইতে এইরূপ আশা করা যায়।

স.

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রণীত, এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এই বৃহৎ ও প্রামাণিক অভিধানটির ৬৯তম খণ্ড শেষ হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ 'বেমালুম', এবং শেষ পত্রাঙ্ক ২১৯৬।

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। কলিকাতার ১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট ভবন হইতে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খণ্ডের ১০ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। "মৃত্যুর পূর্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বর্তমান সংখ্যার ও পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যার পাণ্ডুলিপির সম্পাদন কার্য প্রায় শেষ করিয়া গিয়াছেন।" এই সংখ্যায় "অনুপলব্ধি" শব্দটি সম্বন্ধীয় সন্দর্ভ শেষ হইয়াছে, এবং "অনুভব" সম্বন্ধে সাত পৃষ্ঠা লিখিত হইয়াছে; অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। তদ্ভিন্ন "অনুপ্রাস" বিষয়ক প্রবন্ধটিও দীর্ঘ ও উল্লেখযোগ্য।

জীবনীকোষ—ভারতীয় ঐতিহাসিক। শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। ১ম সংস্করণ। ২১শ সংখ্যা। ২১০-৩-২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে অধ্যাপক দেবব্রত চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য, নিয়মিত গ্রাহকের পক্ষে প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা, অন্যের পক্ষে দুই টাকা।

এই ২১শ সংখ্যায় ১৫৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৬৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে; ১৫৭০এর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় বাজীরাও সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ শেষ হইয়াছে। ১৬৮০ সংখ্যক পৃষ্ঠার শেষ নাম "বিজয়সিংহ(৪)"

এই ২১শ সংখ্যাটি ভিন্ন আমরা এই ভারতীয় ঐতিহাসিক জীবনীকোষের কাপড়ে বাঁধান ১ম, ২য়, ও তৃতীয় খণ্ড পাইয়াছি। প্রথম খণ্ডে ৪৪০ পৃষ্ঠা আছে। তাহার শেষ নাম "উমাচরণ মিত্র।" দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ৪৪৮ পৃষ্ঠা। তাহার প্রথম নাম "ককাই সান্তরা, মহাপাত্র", শেষ নাম "গোবিন্দ—(১)"। তৃতীয় খণ্ডে আছে ৪৪৮ পৃষ্ঠা। তাহার প্রথম নাম "গোবিন্দ—(২)", শেষ নাম "দিব্যসিংহ (দ্বিতীয়)"।

গ্রন্থকার তাঁহার অপূর্ব জীবনীকোষের "ভারতীয় পৌরাণিক" অংশ ২২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করিয়া কীর্তিমান্ হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও শ্রমশক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রকার গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রথম বলিয়া গ্রন্থকার অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "গ্রন্থকারের অধ্যবসায় বিস্ময়জনক। তাঁহার বিষয়-সংগ্রহ বহুব্যাপক, পৌরাণিক ইতিহাস আলোচনায় এই গ্রন্থের আনুকূল্য অত্যাবশ্যক হইবে, এবং সেইরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও অবসর-যাপনের পক্ষে ইহা মনোহারী।" আমরাও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং লিখিয়াছিলাম, গ্রন্থখানি সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের পাঠকদিগের বিশেষ কাজে লাগিবে; এই জন্য ইহা বাংলা দেশের এবং বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের লাইব্রেরিতে, স্কুলে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পারিবারিক লাইব্রেরিতে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

যিনি জীবনীকোষের এইরূপ পৌরাণিক অংশ সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই ঐতিহাসিক অংশও প্রায় সমাপ্ত করিয়াছেন। সমাপ্ত যে হইবে তাঁহার পূর্ব কৃতিত্বই তাহার প্রমাণ। ইহাও পৌরাণিক অংশের মত পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক এবং পাঠকদিগের কাজে লাগিবে। পৌরাণিক অংশের মত ইহাও সকল রকম লাইব্রেরিতে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইবার যোগ্য।

এই প্রকার প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ গ্রন্থের বিক্রী উপন্যাস ও গল্পের বহির মত অধিক হয় না। এই কারণে সমুদয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এবং সঙ্গতিপন্ন লোকদিগের ইহার গ্রাহক হওয়া কর্তব্য।

সিঁথির সিঁদুর—শ্রীশান্তা দেবী প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্ধিত। এই সংস্করণে দুইটি মনোহারী গল্প নূতন সংযোজিত হইয়াছে। কাপড়ে বাঁধান। মূল্য এক টাকা। প্রবাসী কার্যালয়ে এবং গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট ২৮৩ দর্গা রোড ঠিকানায় পাওয়া যায়। দুই শতাধিক পৃষ্ঠার বাঁধান বহির এক টাকা দাম সস্তা।

এই পুস্তকটির যে তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার লোকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের একাধিক শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে ইহার কোন কোন গল্পের—যেমন "শিক্ষার পরীক্ষা" ইংরেজী অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল।

পরভৃতিকা—উপন্যাস। শ্রীসীতা দেবী প্রণীত। নূতন সংস্করণ। কাপড়ে বাঁধান। মূল্য আড়াই টাকা। কলিকাতায় কলেজ স্কোয়্যারে প্রকাশক এম্. সী. সরকার এণ্ড সন্সের দোকানে এবং প্রবাসী কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

এই পুস্তকটি যে কিরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ও মনোরঞ্জক তাঁহার একটি মাত্র অন্যতম প্রমাণের উল্লেখ করিব। গ্রন্থকর্ত্রী কর্তৃক ইহার ইংরেজী অনুবাদ যখন এলাহাবাদের বিখ্যাত দৈনিক "লীডার" কাগজে বাহির হইত, তখন তাঁহার কাটতি বাড়িয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মদেশবাসী বাঙালীদের জীবনের যে চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা ইহার অন্যতম আকর্ষণ।

রাশিয়ার চিঠি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় মুদ্রণ। প্রবাসীর অর্ধেক আকারের ২১৮ পৃষ্ঠা। তা ছাড়া আলাদা ভাল কাগজে ছাপা ১২খানি ছবি আছে। মূল্য ১৸০। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সাতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ চিঠিগুলি প্রথমে প্রবাসীতে বাহির হয়। তখন এগুলি অগণিত লোক পড়িয়াছিল। তাহার পর প্রথম মুদ্রণের ৩১০০ পুস্তক বিক্রী হইয়াছে। তাহাও অগণিত লোক পড়িয়াছে। কারণ, আমাদের দেশে এক একখানা মাসিক ও বহি অনেক হাত ফেরে, এবং তাহার অনেক হাত কপর্দকশূন্যও নহে। তখন এদেশী সরকার তাহাতে মন্দ কিছু দেখেন নাই, দেখিবার কথাও নয়। কিন্তু ইহার একটি মাত্র চিঠির ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে বাহির হওয়ায় তৎক্ষণাৎ সরকারী হুকুম আসিল, খবরদার, সম্পাদক যেন অন্য চিঠিগুলির অনুবাদ না ছাপেন! এ রকম হুকুমের কারণ পার্লেমেণ্টে জিজ্ঞাসা করায় ভারতসচিবের পক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হয় যে, বাংলায় চিঠিগুলি কম লোকেই পড়িয়াছে বা পড়িতে পারে, ইংরেজী অনুবাদ হইলে বহুৎ বেশী লোকে পড়ে। তাহা অবাঞ্ছনীয় !! ইতি।

সানাই—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

"সানাই" রবীন্দ্রনাথের নূতনতম কবিতা-গ্রন্থ। ইহার পরও তিনি অবশ্য কবিতা লিখিতেছেন, যথেষ্টসংখ্যক লেখা হইলে আবার একখানি বহি বাহির হইবে।

এই নূতন বহিটির কেবল সামান্য বাহ্য পরিচয় দিতেছি আন্তর পরিচয় দিতে হইলে এবং পুস্তকখানির ৬০টি কবিতার একটি সাধারণ সুর আবিষ্কার ও নির্দেশ করিতে হইলে বিস্তারিত সমালোচনা আবশ্যক। তাহার স্থান এখানে নাই। পুস্তকখানির সুরের কিঞ্চিৎ আভাস "সানাই" শীর্ষক কবিতাটিতে পাওয়া যায়। তাহাতে কোনও ধনী গৃহস্থের বাড়ীর ভোজের আয়োজন, ধানের কলের দিগন্তে উত্তোলিত "কালিমাধূম্র হাত" ও "ধানপচানির গন্ধ", রেলগাড়ীর শিষ এবং "দুই প্রহরের ঘণ্টা"র বর্ণনা ও উল্লেখ করিয়া কবি বলিতেছেন :—

"সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে।
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তরমাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছস্বর
গভীর মধুর
অমর্ত্যলোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।"

ক.

প্রশ্নাবলী

শ্রীউমা গুহ

১। (ক) মহাভারতের পর্ব্ব-সংখ্যা ১৮; (খ) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্য-সংখ্যা ১৮ অক্ষৌহিণী; (গ) কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ১৮ দিন ব্যাপিয়া হইয়াছিল; (ঘ) পুরাণের সংখ্যা ১৮; (ঙ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধ্যায়-সংখ্যা ১৮—এতগুলি '১৮'এর মিলের কোন তাৎপর্য্য আছে কি? অথবা ইহা আকস্মিক?

২। শ্রীশ্রী৺শিবের ধ্বনি (ব্যোম) শব্দের অর্থ আকাশ, শ্রীশ্রী৺শিবের এই ধ্বনির কোন তাৎপর্য্য আছে কি?

৩। শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরের (শিবের) আবাসস্থল কাশী। 'কাশ' শব্দ হইতে 'কাশী' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'কাশ' মানেও 'আকাশ'। শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরের ধ্বনি ব্যোম অর্থাৎ 'আকাশ' এবং শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরের আবাস 'কাশী' এই উভয় 'আকাশ' শব্দের কোন তাৎপর্য্য আছে কি?

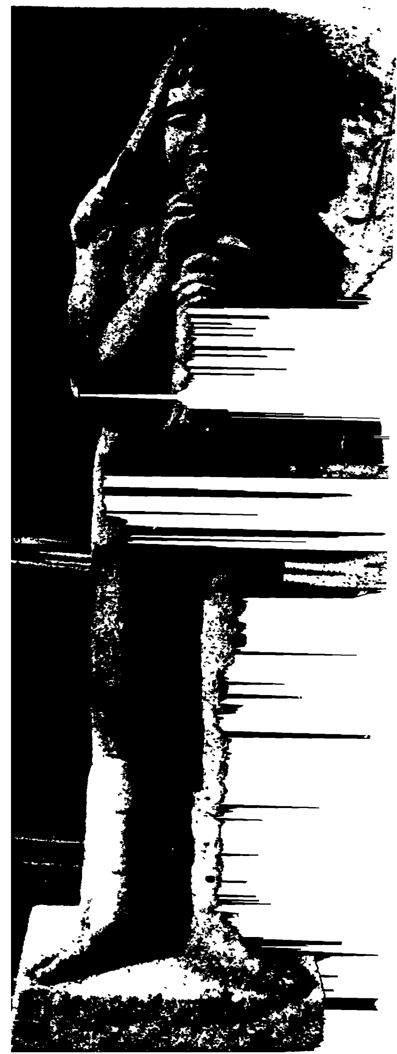
৪। এক দিন 'অয়ন' পরিবর্ত্তন হয় কত বৎসরে? কিছু দিন পূর্ব্বে ১০ই পৌষ 'উত্তরায়ণ' আরম্ভ হইত। এখন ৯ই পৌষ হইতেছে। ৭২ বৎসরে এক দিন 'অয়ন' পরিবর্ত্তন হয় কি?

৫। ভীষ্মদেবের মৃত্যু উত্তরায়ণের প্রথম দিনে হইয়াছিল। ভীষ্মদেবের মৃত্যু কোন্ মাসের কোন্ তারিখে হইয়াছিল? মাঘ মাসের ১৮ই তারিখে কি? কত বৎসর অন্তর এক দিন 'অয়ন' পরিবর্ত্তন হয় এবং ভীষ্মদেবের মৃত্যু কোন্ মাসের কোন্ তারিখে হইয়াছিল তাহা স্থির হইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল অবিসংবাদিতরূপে স্থির হইতে পারে।

শ্রীমতী অনসূয়া দেবী



শীত



দ্বার

শিল্পী শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর কর্তৃক গঠিত তিনটি মূর্তি



জীবনের বোঝা
শিল্পী শ্রীপ্রদোষ দাসগুপ্ত



ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা
শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

কাঠঠোক্‌রা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কয়েকদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম—বাগানের এক পাশে ঝোপের আড়ালে একটা ভাঁট গাছের পাতা মুড়িয়া টুনটুনি পাখী বাসা নির্ম্মাণ করিতেছে। দুপুরবেলা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছি—হঠাৎ 'ক্রির-র-র-র-ক্রির-র-র-র' শব্দ করিতে করিতে একটা কাঠঠোক্‌রা পাখী প্রায় গা ঘেঁসিয়াই উড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ। আর একটা কাঠঠোক্‌রা উড়িয়া আসিয়া আমার সম্মুখেই একটা গাছের উপর বসিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেকের মধ্যেই শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। একটু লক্ষ্য করিতেই দেখিলাম, পাখী দুইটা যেন অস্থির ভাবে এ-গাছে ও-গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। কাঠঠোক্‌রা পাখীরা তো অত নীচুতে ওড়ে না! তা ছাড়া একই স্থানে অস্থির ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে কেন? কেহ বাসার নিকটবর্ত্তী হইলে পাখীরা সাধারণতঃ তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে; কেহ কেহ আবার আগন্তুককে আক্রমণ করিতেও ইতস্ততঃ করে না। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ছোটবড় অনেক পাখীই এমন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করে যে, কাছে থাকিয়াও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু অজানাভাবে কেহ নিকটবর্ত্তী হইলেও চীৎকার করিয়া তাহাকে কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে। এই কারণেই সন্দেহ হইল—নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও ইহাদের বাসা রহিয়াছে এবং আমাকে আততায়ী ভাবিয়াই ভয়ে উহারা এরূপ করিতেছে। কিন্তু ইহারা তো গাছের অতি উচ্চ স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে—তবে আমাকে ভয়ই বা কিসের? ব্যাপারটা কি—দেখিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইল। কিছু দূরে অর্দ্ধমৃত প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষের গায়েই উহারা বারবার উড়িয়া আসিয়া বসিতেছিল। আগের দিনে ঐ গাছটার একটা শুষ্ক মোটা ডাল ভাঙিয়া পড়ে। ডালটার অগ্রভাগ মাটিতে পড়িলেও



বৃহদাকার "ক্যাম্পেফাইলাস প্রিন্সিপ্যালিস" কাঠঠোক্‌রা গর্ত্ত খুঁড়িতেছে।

গোড়ার দিকটা খাড়া ভাবে গাছের মধ্যভাগে আটকাইয়া গিয়াছিল। ডালটার দিকে খানিকটা অগ্রসর হইতেই



এ-দেশী লালটুপি কাঠঠোক্‌রার তিনটি বাচ্চা

দেখি—বাড়ীর বিড়ালটা ডালের নীচেই মাটির উপর 'থাপে' বসিয়া লেজটাকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে নাসিকা ও ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া অদ্ভুত একপ্রকার শব্দ করিতেছে। অনধিগম্য স্থানে পাখী বসিয়া থাকিতে দেখিলে প্রায়শঃই বিড়ালের এরূপ ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যাহা হউক, কাঠঠোক্‌রাগুলিকে দেখিয়াই যে বিড়ালটা ঐরূপ করিতেছিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কাঠঠোক্‌রা দুইটাও ঐ স্থানেই উড়িয়া আসিতেছে কেন? তবে কি ডালটার কোথাও উহাদের বাসা রহিয়াছে? ডালটার এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া উপরের দিকে মোটা স্থানটাতে একটা গোলাকার গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। গর্ত্তের ভিতরে যে দুই-একটি বাচ্চা রহিয়াছে তাহাও বুঝা গেল। আমাকে দেখিয়া বিড়ালটা ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল।

রাত্রিবেলায় একটা ঝাপটাঝাপটির শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আলো জ্বালিয়া দেখি—বিড়ালটা ঘরের কোণে একটা পাখীর ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া গন্‌গন্‌ করিতেছে। চোখ দুইটা তার আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতেছিল। পাখীটা তখনও খুব ক্ষীণ ভাবে মাঝে মাঝে ডানা নাড়িতেছিল। অতি কষ্টে পাখীটাকে বিড়ালের কবল হইতে ছাড়াইয়া লইলাম; কিন্তু তখন সে সম্পূর্ণ অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। পাখীটি ছিল বিচিত্রবর্ণের একটি কাঠঠোক্‌রা। বিড়ালটা যে পূর্ব্বদৃষ্ট কাঠঠোক্‌রাদের একটিকেই হত্যা করিয়াছে এ-সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ রহিল না। পরের দিন বাসার কাছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কাঠঠোক্‌রার সন্ধান মিলিল না। বিড়ালের ভয়ে হয়ত অপরটাও পলাইয়া গিয়াছিল। গর্ত্তের কাছে উঁকি মারিতেই বাচ্চাগুলি কিলবিল করিয়া খাইবার জন্য ঠোঁট বাড়াইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই বোধ হয় ভুল বুঝিতে পারিয়া গর্ত্তের মধ্যে মুখ লুকাইল।

বৃক্ষের কোটর হইতে বাচ্চাগুলিকে আনিয়া পুষিতে লাগিলাম। তিনটি বাচ্চা। [এই পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য] তখনও ডানার পালক সম্পূর্ণরূপে গজায় নাই। দেখিতে অতি কুৎসিত। বেশ নিরিবিলি এক স্থানে চুপচাপ বসিয়া থাকে। প্রথমে ঠোঁট হাঁ করাইয়া মুখের মধ্যে খাবার গুঁজিয়া দিতে হইত। প্রায় পনর দিনের মধ্যেই চেহারা বদলাইয়া গেল। কালচে হলুদ রঙের পালকে ডানা দুইটি ভরিয়া উঠিল। ঠোঁটের প্রান্তভাগ হইতে গলা পর্য্যন্ত সাদার উপর মোটা মোটা কালো ডোরা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তার পর কয়েক দিনের মধ্যেই ঝুঁটির মত লাল রঙের পালক মাথাটিকে ঢাকিয়া ফেলিল। দূর হইতে দেখিলে মনে হইত যেন উহারা মাথায় লাল ফেজ পরিয়া আছে। কিছু বড় হইবার পর ইহাদিগকে খাঁচার বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উড়িবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিত না। সর্ব্বদাই বেড়া, খুঁটি ও দেয়াল বাহিয়া লাফাইতে লাফাইতে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিত এবং সম্মুখে যাহা পাইত তাহাই ঠোঁট দিয়া খুটখাট করিয়া খুঁটিয়া দেখিত। সম্মুখে একখানা কাঠ ফেলিয়া রাখিলে তো কথাই ছিল না। সারাদিন ওটাকে ঠোকরাইতে ব্যস্ত থাকিত। মুখে শব্দ নাই। খাওয়ার সময় এমন কি পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধিলেও অন্যান্য পাখীদের মত চেঁচামেচি করিত না।

লোক দেখিলেই গায়ে পিঠে চড়িয়া ঠোঁট দিয়া খুঁটিতে আরম্ভ করিত। খাবার কাছে আসিলে সোজাসুজি সেখানে উপস্থিত হইত না। চতুর্দ্দিকে যেন কত কাজ রহিয়াছে এরূপ ভঙ্গীতে এটা-ওটা ঠোকরাইতে ঠোকরাইতে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে লাফাইতে লাফাইতে খাবারের জায়গায় উপস্থিত হইত। ভয় পাইলে অথবা কোনরূপ উত্তেজনার কারণ ঘটিলেই মাথার পালকগুলি খাড়া হইয়া উঠিত। অন্যান্য পাখীদের মত গাছের ডাল বা মেঝেতে বসিতে ইহারা বড়ই অসুবিধা বোধ করিত; কিন্তু খাড়া দেয়াল, বৃক্ষকাণ্ড বা খুঁটির উপর ইতস্ততঃ ওঠা-নামা করিতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি অনুভব করিত না। কখনও কখনও মেঝের উপর পিপীলিকা বা অন্য কোন পোকামাকড় দেখিতে পাইলেই সাপের মত লম্বা জিভ বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে সেটাকে মুখের মধ্যে লইয়া যাইত; কিন্তু বোধ হয় বিস্বাদ বলিয়াই পরক্ষণে আবার ঠোঁট ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিত। বাচ্চাগুলি পুষিবার ফলে কাঠঠোক্‌রা পাখীদের প্রাথমিক জীবনযাত্রা-প্রণালীর কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইয়াছিল।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই রকমের কাঠঠোক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এক রকমের পাখীর দেহ বর্ণবৈচিত্র্যবিহীন। সর্ব্বশরীর কেবল সাদা-কালোয় চিত্রিত। আর এক রকমের কাঠঠোক্‌রার দৈহিক বর্ণবৈচিত্র্য অতি উজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর। তাহাদের মুখ হইতে গলার উভয় পার্শ্ব সাদার উপর মোটা মোটা কালো রেখায় চিত্রিত। মাথার উপর উজ্জ্বল লাল বর্ণের ঝুঁটি। ডানায় হলুদ রঙের পালক। মনে হয় যেন হলুদ জামা ও লাল টুপি পরিয়া কাঠ কাটিতে বাহির হইয়াছে। বাস্তবিকই এক উড়িবার সময় ভিন্ন, কি বসিবার কায়দায়, কি কাঠ ঠোক্‌রাইবার ব্যাপারে ইহা-দিগকে সাধারণ পাখীর মত বলিয়া মনে হয় না। কখনও কখনও একক ভাবে কখনও বা দলে দলে ইহারা কাঠ খুঁটিয়া বেড়ায় এবং এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইবার সময় 'ক্রির-র র-র' করিয়া একটানা একটা শব্দ করিয়া থাকে।

গল্পে আছে—কোন কাঠুরিয়ার অতিথিপরায়ণ বালক যখন-তখন বাড়ীতে অতিথি ডাকিয়া আনিত। বালকের



রসশোষক কাঠঠোক্‌রা। গর্ত্ত খুঁড়িয়া রস জমা হইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে।

বিমাতা ইহাতে কুপিতা হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য কাঠুরিয়াকে প্ররোচনা দিতে থাকে। অবশেষে কাঠুরিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহে সাহায্যের অজুহাতে বালকটিকে এক দিন তাহার সহিত বনে লইয়া যায়। বনের মধ্যে কিছু দূর ভ্রমণ করিবার পর ক্লান্তদেহে তাহারা প্রকাণ্ড একটা জীর্ণ বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় করিলে বালকটি তথায় ঘুমাইয়া পড়ে। কাঠুরিয়া তখন প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে কোটরের মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া আসে। ভুলক্রমে কুঠার-খানি কোটরে ফেলিয়া আসিয়াছিল। জাগরিত হইয়া

অনেক চীৎকার করিয়াও বালক যখন কাহারও সাড়াশব্দ পাইল না তখন কুঠারের সাহায্যে গাছ কাটিয়া বাহির



বাচ্চা কাঠঠোক্‌রা

হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই বালকই নাকি অবশেষে কাঠঠোক্‌রা পাখী হইয়া বনে বনে কাঠ কাটিয়া বেড়াইত এবং অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই গৃহস্থ বাড়ীর উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় 'ক্রির-র-র-র', 'ক্রির-র-র্-র' শব্দ করিয়া তাহাদিগকে অতিথি আগমন-সংবাদ জানাইয়া দিত। বর্ত্তমান কাঠ-ঠোক্‌রা পাখীরা নাকি তাহারই বংশধর? আজও আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাড়ীর সীমানায় 'ক্রির-র-র-র' 'ক্রির-র-র-র' আওয়াজ শুনিলে গৃহস্থেরা অতিথি-আগমন-আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া থাকেন।

অনেকের ধারণা, কাঠঠোক্‌রা নেহাৎ অকারণে এবং অজানিত ভাবে অপরের সুবিধার নিমিত্ত সারাদিন কাঠ খুঁটিয়া বেড়ায়। তাহারা গাছের গায়ে গর্ত্ত খুঁড়িয়া গেলে অপর পাখীরা আসিয়া সেই গর্ত্তে বাসা নির্ম্মাণ করে। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তাহা নহে। মৃত পুরাতন বৃক্ষকাণ্ডে নানাবিধ কীটপতঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাণ্ড বা বল্কলের অভ্যন্তরে ডিম পাড়িয়া রাখে। কাঠঠোক্‌রারা এই সকল পোকামাকড় খাইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৃক্ষগাত্রে ছিদ্র করিয়া পোকামাকড় সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা সারাদিন কাঠ খুঁটিয়া বেড়ায়। অবশ্য বাসা বাঁধিবার উদ্দেশ্যেও মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া থাকে। সহজেই গর্ত্ত খুঁড়িতে পারে বলিয়া এক স্থানে খানিকটা গর্ত্ত করিবার পর কোন কারণে অপছন্দ হইলে সেটা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া অন্য স্থানে নূতন গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে কিছু পোকামাকড় সংগ্রহও হইয়া থাকে। এই কারণে একই গাছে বহু গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ গর্ত্তই শূন্য পড়িয়া থাকে বলিয়া অন্যান্য পাখীরা আসিয়া তাহার মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে। ইহাদের নখর এবং শরীরের গঠনই এইরূপ যে, লেজে ভর না দিয়া অন্যান্য পাখীদের মত সরু ডালে বসিতে পারে না; কিন্তু খাড়া বৃক্ষকাণ্ড বা তাহার মোটা ডাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারে। হাতুড়ির মত ঘা মারিয়া গর্ত্ত খুঁড়িতে হয় বলিয়া মস্তকটাকে গাছ হইতে বেশ দূরে রাখিতে হয় নচেৎ যথেষ্ট বেগভার অর্জ্জিত হয় না অথচ পিছনে ঠেকা না দিলেও ঐ সময় শরীরের ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। লেজের সাহায্যেই তাহাদের এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। লেজটাকে সর্ব্বদাই ইহারা গাছের গায়ে ঠেসান দিয়া রাখে। নিঃশব্দ সঞ্চরণ এবং গায়ের রং ইহাদিগকে আত্মগোপনে যথেষ্ট সহায়তা করে। শত্রু সম্মুখীন হইলেও সহজে ইহারা উড়িয়া পালায় না। বৃক্ষকাণ্ডের অপর দিকে ঘুরিয়া গিয়া চুপ করিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখে—শত্রু আছে, না চলিয়া গিয়াছে। এই উঁকি মারিয়া দেখিবার স্বভাবটা বড়ই উপভোগ্য। যৌননির্ব্বাচনের সময় ইহাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিও কম হয় না। স্ত্রী-পাখী একসঙ্গে সাধারণতঃ তিনটি ডিম পাড়ে। কোন কোন জাতীয় কাঠঠোক্‌রা একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টি বা ততোধিক ডিমও পাড়িয়া থাকে। বেশীর

ভাগ কাঠঠোক্‌রাই উদ্গীর্ণ খাদ্য খাওয়াইয়া তাহাদের বাচ্চাগুলিকে বড় করিয়া তোলে।



স্বর্ণপক্ষ কাঠঠোক্‌রা বাসা পরিষ্কার রাখিবার জন্য ঠোঁটে আবর্জ্জনা লইয়া দূরে ফেলিতে যাইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়া ও ম্যাডাগাস্কার ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বিভিন্ন জাতের কাঠঠোক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতের প্রায় চারি শতের উপর কাঠঠোক্‌রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গাছের গায়ে গর্ত্ত খুঁড়িলেও কাঠঠোক্‌রা সাধারণতঃ অনিষ্টকারী পাখী নহে। কারণ মাঝে মাঝে জীবিত বৃক্ষকাণ্ডে গর্ত্ত করিলেও প্রধানতঃ ইহারা শুষ্ক কাণ্ডেই ছিদ্র করিয়া থাকে। অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গেরা অনেক সময় বল্কলের অভ্যন্তরে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে কীড়া বাহির হইলে তাহারা ক্রমশঃ বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জীবিত অংশকেও বিনষ্ট করিয়া ফেলে। কাঠঠোক্‌রারা এই পোকা খাইয়া বরং উপকারই করিয়া থাকে। অবশ্য কয়েক জাতের কাঠঠোক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা জীবিত বৃক্ষের রস শোষণ করিয়াই জীবনধারণ করে। ইহাদের আক্রমণে প্রতি বৎসর বহু ফলবান বৃক্ষের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপে রস-শোষক কয়েক জাতের কাঠঠোক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা নানাবিধ ফলবান বৃক্ষলতার গায়ে ছিদ্র করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। গর্ত্তে রস সঞ্চিত হইলেই তাহা পান করিয়া আবার তাহার পাশেই নূতন গর্ত্ত খুঁড়িয়া দেয়। এইরূপে এক একটা গাছে প্রায় পাঁচ-ছয় শত ক্ষত উৎপন্ন হয়। বহু গাছই এই আঘাতের ধকল কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া অকালে শুকাইয়া যায়।

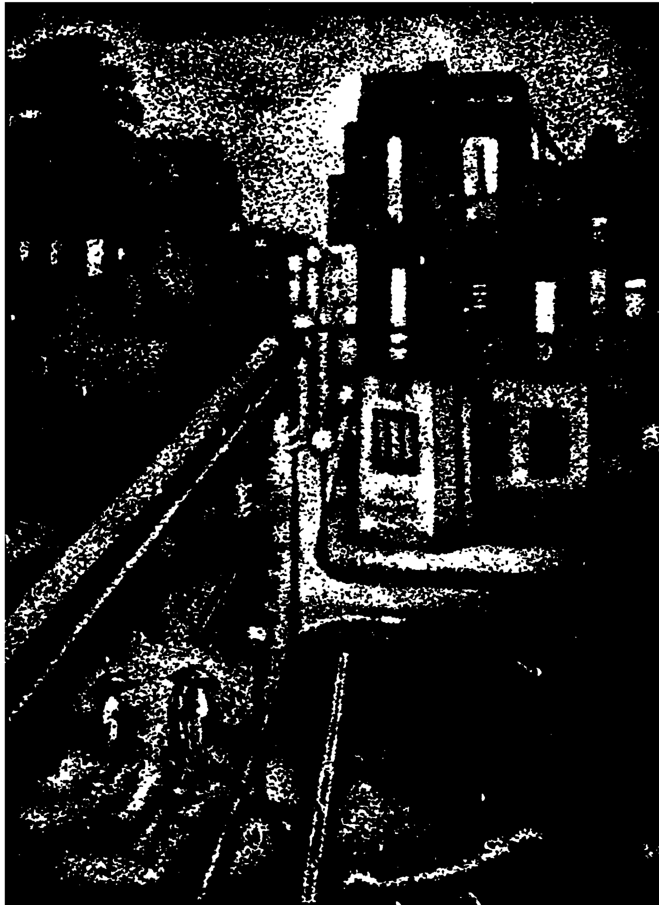
অধিকাংশ কাঠঠোক্‌রারই মাথার উপর ছোটবড় নানা রঙের ঝুঁটি দেখিতে পাওয়া যায়। দৈহিক গঠন, মাথার ঝুঁটি এবং গাত্র-রেখা দেখিয়া অন্যান্য পাখী হইতে ইহাদের বৈষম্য সহজেই নজরে পড়ে। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া কাঠঠোক্‌রা, লিউয়িস্ কাঠঠোক্‌রা, স্বর্ণপক্ষ, জেব্রা কাঠঠোক্‌রা, গিলা, রস-শোষক ও কোন কোন জাতীয় ডাউনি কাঠঠোক্‌রাকে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ পাখী বলিয়াই ভ্রম জন্মে। ইহাদের কাহারও কাহারও আচার-ব্যবহারও আবার



"ডাউনি" কাঠঠোক্‌রা

সাধারণ কাঠঠোক্‌রার বিপরীত। ক্যালিফোর্নিয়া কাঠঠোক্‌রা খুঁটির গায়ে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ভবিষ্যতে ব্যবহারের নিমিত্ত বাদামজাতীয় ফল ভর্ত্তি করিয়া রাখে। খাদ্য-সঞ্চয়ের সংস্কারবশে সময়ে সময়ে ইহারা বাদামের অভাবে পাথরের নুড়ি বা তদনুরূপ কোন জিনিস দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করে। স্বর্ণপক্ষ কাঠঠোক্‌রা পুরাতন বৃক্ষ-কাণ্ডে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। লিউয়িস্ কাঠঠোক্‌রারা পুরাতন বৃক্ষকাণ্ড হইতে পোকামাকড় তো সংগ্রহ করেই তাছাড়া উড়ন্ত কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়, এমন কি কীট-পতঙ্গের সন্ধানে প্রায়ই ভূমিতে অবতরণ করিয়া থাকে। ইহারা বাদাম, ষ্ট্রবেরী, আপেল প্রভৃতি নানাজাতীয় ফলও ভক্ষণ করিয়া থাকে। গিলা কাঠঠোক্‌রারা সময় সময় লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া শস্য-কণিকা, মাংসের টুকরা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চুরি করিয়া লইয়া যায়। প্রায়ই ইহারা পত্রশূন্য এক জাতের বৃহদাকার মনসা গাছে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। গর্ত্ত খুঁড়িবামাত্রই সেখান হইতে প্রচুর পরিমাণ রস নির্গত হইতে থাকে। এই রস শুকাইয়া গর্ত্তের অভ্যন্তরে একটি মসৃণ আবরণের সৃষ্টি করে। তখন তাহারা সেখানে বাসা বাঁধিয়া ডিম পাড়ে।

কয়েক জাতের কাঠঠোক্‌রার ঝুঁটি না থাকিলেও মস্তকের উপরিভাগে লাল, হলদে প্রভৃতি নানা রঙের পালক থাকে। এই পালক এবং দেহের বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া ইহাদিগকে সহজেই কাঠঠোক্‌রা বলিয়া অনুমান করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ড্রাইওবেট্‌স্ পিউবেসেন্‌স্, ভিলোসাস্, অ্যালবোলার ভ্যাটাস, পিকয়েডেস আর্কটিকাস, টেক্সাস কাঠঠোক্‌রা, অ্যারিজোনা কাঠঠোক্‌রা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঝুঁটিওয়ালা কাঠঠোক্‌রাদের মধ্যে কিও-ফ্লোয়াল পাইলেটাস এবং ক্যাম্পেফাইলাস্ প্রিন্সি-প্যালিস্ নামক কাঠঠোক্‌রারাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা সাধারণ একটি কাক বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হইয়া থাকে।



বর্ষা-সন্ধ্যায় কলিকাতা
কাঠখোদাই

শ্রীরমেন্দ্রনাথ
চক্রবর্ত্তী

রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম. এ., পিএইচ. ডি.

খুব বেশী দিন হয় নি যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তেমন সুস্পষ্ট নয় এবং এ হেন অস্পষ্টতার ফলে এই সাহিত্য সৃষ্টির গৌরব আরোপিত হয়েছে একাধিক ব্যক্তির উপর। কেউ কেউ বলেন যে উইলিয়ম কেরীই এই সাহিত্যের জনক, আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের নামও কেউ কেউ এই সঙ্গে জুড়ে দেন; কেউ বা বলেন রামমোহন রায়ই এই সাহিত্যের শৈশবে পিতার কাজ করেছেন; আর অন্যদের মত হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সত্যিকারের স্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে যাঁরা টেকচাঁদ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এই সকল দাবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিতান্ত অসহায় ভাবে আত্মগোপন ক'রে আছে। উপস্থিত প্রবন্ধে তাকে আবিষ্কার করার আংশিক চেষ্টা করা যাবে। বাংলা গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে রামমোহন রায়ের প্রভাব কতখানি তাই হবে আমাদের আলোচ্য।

১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াবার জন্যে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর সহকর্মিগণ চৌদ্দখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ-সকলকে 'ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা' নামে উল্লেখ করা হবে। এ-দেশের আধুনিক সাহিত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে উক্ত গ্রন্থমালার প্রভাব সম্বন্ধে যে-ধারণা চলে আসছে তা সর্ব্বৈব যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না। বর্ত্তমান যুগে, এ-সকল বইতেই সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্য রচনার কাজে গদ্যের ব্যবহার হয়েছে সত্য বটে, কিন্তু এদের সম্বন্ধে এ কথাই একমাত্র কথা নয়। এই বইগুলি পাঠকসমাজে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এবং তাদের সমাদর হয়েছিল কি পরিমাণে, তা না জেনে বাংলা সাহিত্যের ওপর কেরী ও তাঁর ফোর্ট উইলিয়মী দলের প্রভাব আন্দাজ করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম হবে।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার প্রচার ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে এই পুস্তকসমূহের বিষয়বস্তুর দিকে আগে তাকাতে হবে। এদের মধ্যে পাঁচখানি সংস্কৃত ('হিতোপদেশ'[১] 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' ও 'পুরুষ পরীক্ষা'), এক খানি পারসী ('তুতিনামা[২]) আর একখানি ইংরেজী গল্প-গ্রন্থের ('ঈশপ্স্ ফেবলস্') অনুবাদ; অবশিষ্ট সাতখানির মধ্যে একখানি ('ইতিহাসমালা') গল্পের সঙ্কলন, দুইখানি ('লিপিমালা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা') প্রবন্ধ-পুস্তক, একখানি ('কথোপকথন') কথাবার্ত্তার নমুনা এবং তিনখানি (প্রতাপাদিত্যের চরিত্র', 'রাজাবলী' ও 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র') ইতিহাসমূলক রচনা। এই শেষোক্ত সাতখানি পুস্তকের মধ্যে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় কিছু কিছু গল্প আছে, আর তিনখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থকেও গল্প-পুস্তক ব'লে গণ্য করা যায়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অধিকাংশই ছিল গল্প-পুস্তক। দেশ কাল নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের গল্পপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত; কাজেই মনে হ'তে পারে যে ঐ গ্রন্থমালা তখনকার দিনে বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল এবং তার ফলে বাংলার নূতন গদ্য-সাহিত্য ত্বরিত গতিবেগ লাভ করেছিল। কিন্তু ফলত ব্যাপারটা যে এরূপ হয় নি তা অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে ব'লে মনে হয়।

গল্প শুনতে যে লোকে আকৃষ্ট হয় তার প্রধান কারণ আখ্যানের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব; আর পুরানো গল্প এবং অনেক বার শোনা গল্পও যে লোকে শোনে তার

১। তিন বার তিন লেখকের দ্বারা অনুবাদিত।

২। এই গ্রন্থ সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' নামক গল্পপুস্তক থেকে সঙ্কলিত।

কারণ অন্তর্নিহিত আদর্শের মহিমা। যেমন এ-দেশের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির গল্প; হাজার বার শুনেও সেগুলি সম্বন্ধে শ্রোতাদের আকর্ষণ শিথিল হয় না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার গল্পে এই দুইয়ের কোন গুণই বড় একটা ছিল না। সংস্কৃত গ্রন্থের আখ্যানসমূহ লোক-মুখে খুবই প্রচলিত ছিল। তাই যে-ভাষায় অপরিচিত বা অল্পপরিচিত আরবী, পারশী ও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য এবং পদবিন্যাসপ্রণালী (syntax) গোলমেলে, সে-ভাষায় ঐ পরিচিত গল্প শুনতে লোকের তেমন আগ্রহ হয়ত দেখা যায় নি। প্রতাপাদিত্য বা কৃষ্ণচন্দ্রাদির চরিত্র সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলতে পারা যায়।

গল্প ও গল্পমূলক পুস্তকগুলি ছেড়ে দিলে ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার যে বই বাকী থাকে তা হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'। এই বইখানিকে গ্রন্থকারের মৌলিক রচনা ব'লে ধরা হ'লেও এর বিষয়-বস্তুর অভিনবত্ব খুবই অল্প। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও পুরাণাদি থেকে সঙ্কলন ক'রে এই পুস্তক তৈরি হয়েছিল। এজন্যে এখানি পাঠকদের আকৃষ্ট করবার মত বই হয় নি। রচনারীতির দিক দিয়েও এই বই বরং কিয়দংশে তাঁদের বিমুখ করবার মত। এর আরম্ভে দুর্ব্বোধ্য সমাসের বাহুল্য পাঠকবর্গের মনে রীতিমত ভয় জন্মায়। যার বিষয়বস্তু বা রচনারীতির আকর্ষণ কম, এমন বইও শুধু গদ্যের অভি-নবত্বের জন্যে জনসাধারণের কৌতূহলের বস্তু হ'তে পারত কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার দুর্ম্মূল্যতার জন্যে তা হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ঐ পুস্তকসকলের প্রতি খণ্ডের দাম কখনও কখনও আট টাকা পর্য্যন্ত ছিল। যে-সময়ে লোকে আট-দশ টাকা মাসিক বেতনে ছোটখাট সংসার চালাত সেই সময়ের পক্ষে এই দাম সংগ্রহ করা যে কষ্টসাধ্য ছিল তা বলাই বাহুল্য।

এই সব কারণে মনে হয় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক হ'লেও উক্ত কলেজের গ্রন্থমালা তৎকালীন জনসাধারণের খুব অল্পাংশের হাতেই পৌঁছতে পেরেছিল। ঐ বইগুলি হয়ত কেবল কোম্পানীর কর্ম্মপ্রার্থী বিলাতী সাহেব ও মুষ্টিমেয় কৌতূহলী ধনী ব্যক্তিরাই ক্রয় করতে পারতেন। এরূপ স্বল্পপ্রচারিত পুস্তকের প্রভাব খুব সীমাবদ্ধ থাকবারই কথা। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে অন্যরূপ ব্যাপার ঘটেছিল তা ভাববার কোন কারণ আছে ব'লে মনে হয় না। সে যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের এই অলোভনীয় অবস্থা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই সাহিত্যের কৃতী প্রবর্ত্তক রামমোহন রায় যখন ১৮১৫ সালে বাংলা গদ্যে রচিত তাঁর দুখানি একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক পুস্তক ('বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার') প্রকাশ ক'রে বিনামূল্যে বিতরণ করলেন তখন থেকে বাংলা গদ্য-সাহিত্য এগিয়ে চলার মত গতিবেগ সংগ্রহ করল।

রামমোহনের পুস্তক ছিল লোকসাধারণের অনুষ্ঠিত মূর্ত্তিপূজামূলক ঈশ্বরোপাসনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনায় পূর্ণ। কাজেই এই বই প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় তুমুল আন্দোলন সুরু হ'ল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যে অল্পসংখ্যক লোকের মনঃপূত হল তাঁরা রামমোহনের মতানুবর্ত্তী হলেন, আর যাঁরা একেশ্বর-বাদ প্রচারের মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবের বিভীষিকা দেখলেন তাঁরা তাঁর উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠলেন। রামমোহনের বাংলা গদ্য সমসাময়িক লোকদের মধ্যে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এই ব্যাপার তার বেশ সুস্পষ্ট সাক্ষী। এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব কেরী প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকগণের কৃতিত্বের বহু ঊর্দ্ধে।

রামমোহনের গদ্য-রচনার বহুল প্রচার যে কেবল ধর্ম্ম-বিষয়ক বাদানুবাদের আশ্রয়েই ঘটেছিল তা মনে করবার কারণ নেই। ধর্ম্মতত্ত্বের আন্দোলন তাঁর লেখা প্রচারের সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু তাঁর গদ্য-রচনার প্রাঞ্জলতাও তাঁকে এ-বিষয়ে কম সাহায্য করে নি। তাঁর প্রচারিত গ্রন্থদ্বয়ে তিনি যদি বেদান্তের মত দুরূহ বিষয়কে নিতান্ত সহজরূপে পাঠকের বোধগম্য করতে না পারতেন তবে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের তেমন বিচলিত হবার কথা ছিল না। কারণ যে-সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিজের পুস্তক-মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি যত দিন দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ ছিল তত দিন গোঁড়া সমাজ-নায়কদের মানসিক শান্তি নষ্ট হয় নি। কিন্তু প্রাঞ্জল বাংলা গদ্যে সে-সকলের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ক'রে তিনি যখন সংখ্যাবহুল সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করলেন তখন গোঁড়ার দল

বিচলিত না হয়ে থাকতে পারলেন না। একেশ্বরবাদের বার্থ প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদিগণ বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করাকেও অপরাধজনক ব'লে প্রচার করলেন (গ্র. ৯-১০)।[৩] রামমোহনের বাংলা গদ্যের প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে এ হ'ল পরোক্ষ প্রমাণ। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণপ্রার্থীকে রামমোহনের রচনার সহিত ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের ও অন্যান্য সমসাময়িক লেখকের রচনার তুলনা করতে হবে। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'[৪] নামক গ্রন্থের আরম্ভে লিখছেন :—

"ব্রহ্ম সর্ব্বে বদিষ্যন্তি সমায়াতে কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ। ইত্যাদি শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত স্থলাভিষিক্ত তত্ত্বজ্ঞানিমানিবদের স্বকপোলকল্পিত স্বপ্রয়োজন সিদ্ধি তাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনার খণ্ডনার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে করিও না। যে হেতুক বিশিষ্টানুশিষ্ট শিষ্টেরদের সে কথা লক্ষ্যই নহে তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে বিশুদ্ধ মাতাপিতৃক অবিগীত শিষ্টেরদের যদ্যপি স্ব স্ব জাতি ও কুল ও আশ্রম বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণ শতেতেও অন্যথা কখন হইতে পারে না এ নিশ্চয়ই আছে তথাপি এতদ্দেশে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত জনয়তি কুমুদভ্রান্তিং ধূর্ত্তবকো হি বালমৎস্যানাং এতৎ শাস্ত্রার্থন্যায় বকধূর্ত্তেরদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রে অনাস্থা না হয় কেবল এই তাৎপর্য্যেতে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে।"

আর ১৮২৩ সালে প্রকাশিত 'পাষণ্ড পীড়ন'[৫] গ্রন্থের আরম্ভে আছে :—

"অবিরত মনস্তাপতাপিত ভাক্তত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশেষদিগের এবং প্রতারকপ্রতারণাস্বরূপ মহাধূমান্ধকারে জন্মান্ধের ন্যায় অন্ধ তৎসংসর্গি জীববিশেষদিগের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিবসে প্রেরিত, চিরচিন্তিত, স্বকপোলকল্পিত নানা বাগাড়ম্বরিত, মন্বাদিবচনতাৎপর্য্যার্থবহিষ্কৃত, স্বানুচরজীবসমাজ সন্তোষার্থ রচিত, অন্তঃসাররহিত, অল্পবুদ্ধি জনগণের আপাততঃ শ্রবণমধুর নয়নধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ, উত্তরাভাস প্রাপ্ত হইবামাত্র হৃষ্টচিত্ত কৃতকৃত্য হইলাম।"

উদ্ধৃত রচনাংশ দুটির সঙ্গে তুলনার জন্য রামমোহনের রচনা থেকেও দুটি অংশ নিচে দেওয়া যাচ্ছে। 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'র উত্তরে রামমোহন যে বই ('ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার') লিখেছিলেন তার গোড়াতে আছে :—

"ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্ত চন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্তশাস্ত্রের মত পূর্ব্বে হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে "অশ্বচিকিৎসা" "গোপের শ্বশুরালয় গমন" "ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" "চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং" "হাটারি বাজারি কথা নয়" "রোজা নমাজ" ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে ঐ পাঠ কর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গবিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, এ গ্রন্থের সংক্ষেপে চন্দ্রিকা এইরূপ হয় তাঁহার মূল গ্রন্থ বা কি প্রকার হইবেক? (গ্র. ৬৮৫-৬৮৬)

আর রামমোহন 'পথ্য প্রদান' নাম দিয়ে 'পাষণ্ড-পীড়নে'র যে উত্তর লিখেছিলেন তার ভূমিকার আরম্ভে আছে :—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠা সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন ঐ দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে

৩। গ্র = রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলী, পাণিনি কার্য্যালয় (১৩১২) প্রকাশিত।

৪। এই গ্রন্থ রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থের উত্তরে লিখিত হলেও ইহাতে খাঁটি দার্শনিক আলোচনার বদলে লৌকিক তর্কযুক্তি দ্বারা একেশ্বরবাদ খণ্ডনের প্রয়াস এবং রামমোহন রায়ের প্রতি ব্যঙ্গ কটূক্তি মাত্র আছে।

৫। এই গ্রন্থও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'রই অনুরূপ উদ্দেশ্যে এবং প্রণালীতে লিখিত।

অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন'; এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদ ছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন। অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল।"

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সমসাময়িক লেখকদের চেয়ে রামমোহনের রচনারীতি কত বেশী প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। কিন্তু তাঁর রচনায় এর চেয়েও সরল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন অংশ আছে। নিচে তার দুটি নমুনা উদ্ধার করা গেল।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) নামক পত্রিকায় তিনি খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের সমালোচনার উত্তরে লিখছেন :—

বায়বেলে আদ্য তিন অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে পাই যে "ঈশ্বর আপন ক্রিয়া হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন" "ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতেছিলেন" "ঈশ্বর আদমকে কহিলেন যে তুমি কোথায় রহিয়াছ" অতএব বিশ্রাম এই শব্দের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহার একাবস্থ স্বভাবে আঘাত পড়ে। আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতেছিলেন এই বাক্যের দ্বারা মোসার কি তাৎপর্য্য ছিল যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদবিক্ষেপের দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন। আর আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ এই প্রশ্নের দ্বারা মোসার কি এই তাৎপর্য্য ছিল যে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন স্থানে স্থিতি ইহা জানিতেন না। যদি মোসার এই সকল তাৎপর্য্য ছিল তবে ঈশ্বরের স্বভাবকে অতি চমৎকার রূপে মোসা জানিয়াছিলেন এবং মোসার পরমার্থজ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থ-জ্ঞান দুই প্রায় সমান ছিল। (গ্রং ৪৮৮-৪৮৯)

সংবাদ কৌমুদীতে রামমোহন চুম্বকমণি (magnet) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে আছে :—

চুম্বকমণির কেন্দ্রাভিমুখ্যরূপ যে গুণ তাহার অন্য অন্য সকল গুণ হইতে সপ্রয়োজনক; যেহেতু ইহার দ্বারা নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে পথ নিশ্চয় করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে। ইহার গুণ জানিবার পূর্ব্বে নাবিকেরদের তারা ভিন্ন কোন পথ নিশ্চায়ক বস্তু ছিল না, এবং সমুদ্রের তীর হইতে অনেক দূর যাইতে তাহারদের সাহস ছিল না। যাহারা পৃথিবী খনন করিয়া ধাতু বাহির করে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ও ঐ চুম্বকমণির দ্বারা তাহারদের পথ নিশ্চয় হয়, এবং চুম্বকমণির দ্বারা পথিকেরা দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনারদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে।' (গ্রং ৮০১)

মাঝে মাঝে দু-চারিটি কথা বদল করে দিলে রামমোহনের রচনার উদ্ধৃত অংশ দুটিকে প্রায় আধুনিক বাংলা গদ্য বলে চালানো যেতে পারে। কিন্তু এ সকল প্রমাণ সত্বেও কেউ কেউ তাঁর রচনারীতিকে তাঁর সমসাময়িক বর্গের লিপিভঙ্গীর চেয়ে নিকৃষ্ট বলতে চান। রামমোহনের সমস্ত রচনাই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা নিয়ে এবং বাদ বিতণ্ডামূলক অতএব তাতে সাহিত্যিকগুণ থাকতে পারে না, এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁরাও রামমোহনের রচনা সম্বন্ধে অবিচার করেন। কারণ বাদবিতণ্ডামূলক লেখা লিখতে গিয়েও তিনি স্থানে স্থানে সাহিত্যিক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পাদরী ও শিষ্যসংবাদ' নামক বিদ্রূপাত্মক রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। খৃষ্টান মিশনারীরা হিন্দুর দার্শনিক মত নিয়ে যখন নানা কদর্থ সুরু করেছিলেন তখন রামমোহন অন্যান্য লেখার সঙ্গে এটি তাঁদের উপহার দেন (অবশ্য ইংরেজী অনুবাদ সহ)। নিচে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :—

পাদরি তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই ঈশ্বর এক কি অনেক? প্রথম শিষ্য উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন। দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, ঈশ্বর দুই। তৃতীয় শিষ্য উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই।

পাদরি—হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারির ন্যায় উত্তর করিলে?.........

পাদরি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ?

প্রথম শিষ্য—আপনি কহিয়াছিলেন যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলিগোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে আমারদিগের গণনা মতে এক, এক, এক অবশ্য তিন হয়।

* * * * *

পাদরী—হা এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না এবং তাঁহারদিগের শক্তি ও

প্রতাপ তুল্য নহে এমত জানিও না কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য—এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীনদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

*   *   *

পাদরি—এ নিগূঢ় বিষয় কিন্তু...এ গুপ্ত বিষয় কোনরূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য হাস্য করিয়া কহিল, মহাশয় দশ সহস্র ক্রোশ হইতে এই ধর্ম্ম আমাবদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

(গ্র. ৪৯১-৪৯২)

এই লেখার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ ও ত্রিত্ববাদের দ্বন্দ্ব কেমন হাস্যকরভাবে প্রকটিত হয়েছে তা যিনি এটি সম্পূর্ণ পড়েন নি তাঁকে বোঝান শক্ত হবে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রচনাটিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহনের কোন অসংযত উক্তি নেই। আর তা থাকতেও পারে না, কারণ তিনি খ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। মিশনারীদের একদেশদর্শিতাই তাঁকে ঐ ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু যে কারণেই রামমোহন এই রচনা করে থাকুন তাতে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশ পেতে বাধা পায় নি। এই ক্ষুদ্র রচনা পড়ে মনে হয় তিনি যদি কেবল সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করতেন তবে হয়ত সুয়িফ্‌ট (Swift) আদির চেয়েও বড় হাস্যরসিক বলে খ্যাতি লাভ করতে পারতেন। তাঁর এই রচনাটিতে প্রচুর হাস্যরস (humour) বর্ত্তমান আছে।৬ এ গুণ তাঁর বাদবিতণ্ডামূলক রচনায়ও যে নিতান্ত দুর্ল্লভ তা নয়।

ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে জীবহিংসা ও মাংসভোজন গর্হিত মনে ক'রে 'চারি প্রশ্নে'র রচয়িতা আমিষাহারী রামমোহনকে যে নিন্দা করেছিলেন তার উত্তরে মাংসভোজনের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার ক'রে তিনি 'চারি প্রশ্নের উত্তরে' লিখেছেন :—

মৎসরতা৭ কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়। লোকে কেন খায় কেন সুখে কালযাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেশ দেয়। মাংসভোজন শাস্ত্রে অবিহিত ইহা যদি না কহিতে পারে অন্ততঃ লোকনিন্দা করিবার উদ্দেশে কহিবেক যে নিবেদন করিয়া খায় না কিম্বা আচমনে অধিক কি অল্প জল লইয়াছিল কিন্তু মৎসরের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারব্ধনির্ম্মিত ভোগ পরিত্যাগ করে ইহাতে মৎসরের অদৃষ্টে যে দুঃখ তাহা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি॥ (গ্র. ২৩৯)

'চারি প্রশ্নের উত্তর' পেয়ে প্রশ্নকর্তা যে খুব খুশী হন নি তা বলাই বাহুল্য। অচিরাৎ তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে তার এক প্রত্যুত্তর প্রকাশ করলেন। এ বইয়ের ভাষার নমুনা আমরা দেখেছি। রামমোহন নিজের প্রতি নিন্দা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তিতে পূর্ণ এই বইয়ের উত্তরে 'পথ্য প্রদান' নামে যে বৃহৎ পুস্তক রচনা করেছিলেন তার ভূমিকায় কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, কেন যে তিনি কটূক্তির উত্তর কটূক্তি দ্বারা দেন নি। তাঁর দেওয়া একটি কারণ তাঁরই ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে।

বালক ও পশ্বাদির চিত্তকরণে ও চিকিৎসা সময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে ঐ অবোধ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষণার বিনিময়ে ধর্ম্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ঐ প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি। (গ্র. ২৪৭)

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র লেখক মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচায্য তাঁর গ্রন্থে রামমোহনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করছিলেন। তার উত্তরে রামমোহন 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামে পুস্তক রচনা করেন। এই বইয়ের গোড়ায়ও তিনি পাল্টা দুর্ব্বাক্য ব্যবহার না করার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তিনি লিখছেন :—

"আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য

৬। রচনাটির সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ। এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিন জন চীনদেশস্থ শিষ্য ইহারদের পরস্পর কথোপকথন।'

৬। স্থানাভাবে এই রচনাটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা গেল না। আর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে সমগ্র রচনার সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে তাতেও নিবৃত্ত থাকতে হ'ল।

৭। পরশ্রীকাতরতা

লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয়ক বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কখন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম। (গ্র. ৬৮৬)

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত তিনটি থেকে রামমোহনের যে বচন-চাতুর্য্য ও সূক্ষ্ম হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা কেবল উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টার রচনাতেই সুলভ। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকবর্গের বা রামমোহনের সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের রচনায় এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখা যায় ব'লে মনে হয় না। আর তা হয়ত দেখাও যেতে পারে না; কারণ রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের এক বিষয়ে বিষম প্রভেদ ছিল। এই প্রভেদ হচ্ছে প্রেরণা সম্পর্কিত। মৃত্যুঞ্জয় বা পাষণ্ডপীড়নাদির লেখকরা লিখেছিলেন অর্থপ্রাপ্তির আশায়। তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ তাঁদের রচনায় দেখা দেয় নি; মুখ্যত সংস্কৃত, পারশী বা ইংরেজী পুস্তক বা সে সকলের বিষয়-বস্তুর সাহায্য নিয়ে তাঁরা যে-সব রচনা করেছিলেন সেগুলো কোনও রকমে কাজ চালাবার মতো ছিল। এই তাঁদের সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা।

রামমোহন রায় যে গদ্য রচনা করেছিলেন তার পশ্চাতে ছিল মননশক্তির এবং হৃদয়বৃত্তির সেই প্রবল প্রেরণা যার তাড়নায় মানুষ ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়ে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের ও ভবিষ্যৎ পুরুষদের মঙ্গল চিন্তা করে। এই আন্তরিক প্রেরণার ফলেই তাঁর প্রকাশভঙ্গী যথাসম্ভব সরল, সরস ও কৃত্রিমতাবর্জ্জিত হ'তে পেরেছিল। কিন্তু উক্ত প্রেরণাই কেবল তাঁকে এ কাজে সিদ্ধি দান করে নি। রামমোহনের বহুভাষাজ্ঞান এবং ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষমতাও তাঁকে বাংলা গদ্যের কৃতী প্রবর্ত্তক করে তোলবার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর লেখা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' পড়লেই বোঝা যায় বাংলা ভাষার অনন্যসাধারণ প্রকৃতিটি কেমন ভাল রূপে তাঁর জানা ছিল। রচনাকে সুস্পষ্ট ও সুন্দর করতে হ'লে এটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর লেখার স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্যতা যে নেই তা নয়, তবে সে-সকল দুর্ব্বোধ্যতা আলোচ্য বিষয়ের দুরূহত্বের জন্যে। স্থানবিশেষে তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত বাগ্‌ধারা (idiom) ব্যবহার ক'রেও রচনাকে একটু শক্ত করেছেন কিন্তু সেগুলি তাঁর জ্ঞাতসারেই ঘটেছে; এর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :—

বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে ইহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে করা যায় না। (গ্র. ৭)

রামমোহনের রচনায় স্থানে স্থানে কঠিনতা থাকলেও তার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের কাজ ব্যাহত হয় নি। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের যে প্রবল আন্দোলন তিনি দেশমধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে নব-প্রবর্ত্তিত গদ্যরচনা এক নূতন গতিবেগ পেয়েছিল এবং তারই ফলে ঘটল দেশীয় লোকেদের দ্বারা সংবাদপত্র প্রকাশ। এই সংবাদপত্রও বাংলা গদ্যকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার কম সাহায্য করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের হাতে বাংলা সাহিত্যের দুর্দ্দশা ঘটেছিল যথেষ্ট। এই শোচনীয় অবস্থার হাত থেকে যিনি বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করলেন তিনি রামমোহনের পরম অনুরাগী ও শিষ্যকল্প দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ ক'রে দেবেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য সাহিত্যের বুনিয়াদ দৃঢ়তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কেবল ধর্ম্মমতাদিতে নয় রচনাপদ্ধতিতেও দেবেন্দ্রনাথের উপর রামমোহনের প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। এই দেবেন্দ্র-নাথের প্রভাব তত্ত্ববোধিনীর প্রথম সম্পাদক (১৮৪৩—১৮৫৪) অক্ষয়কুমার দত্তের উপরে পড়েছিল আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এই প্রভাবের একান্ত বাইরে ছিলেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সে-সকলের আলোচনা সম্ভব নয়। বারান্তরে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবে কিন্তু তার আগেই একথা বলা যেতে পারে যে রামমোহনের প্রবর্ত্তিত গদ্যের ধারাকে আশ্রয় করেই আধুনিক বাংলার 'সর্ব্বজনব্যবহার্য্য গদ্য রীতি গড়ে উঠেছে।*

*'বেদান্তচন্দ্রিকা' এবং 'পাষণ্ডপীড়ন' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধারে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ফিজি

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড বন্দর থেকে ফিজি মোটে তিন দিনের পথ ;—আবহাওয়ার তফাৎ কিন্তু অনেক। কুয়াশায় ঢাকা আবছা অকল্যাণ্ড বন্দর ছাড়বার পর ভাবতেও পারি নি যে দু-দিন পরেই গ্রীষ্মকালের গাত্রবস্ত্র পরিধান ক'রে সোলার টুপি মাথায় দিয়ে সূর্য্যের উত্তাপ থেকে মাথা বাঁচাবার পন্থা অবলম্বন করতে হবে। জাহাজের মহিলা যাত্রীরা ত ট্রপিক্যাল আবহাওয়ার অজুহাতে নানা রকম অদ্ভুত পোষাক বার করলেন। তৃতীয় দিন প্রত্যূষে আমরা ফিজির রাজধানী প্রধান শহর ও বন্দর সুবাতে (Suva) এসে হাজির হ'লাম। "ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর" গাইড-বইয়ে দেখলাম ফিজিকে "Little India of the Pacific" নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুবা পৌঁছে সেই রকমই মনে হ'ল, বিশেষ ক'রে যখন হিন্দিতে মোটর-ড্রাইভারের সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেলাম। জাহাজ থেকে মাঝি-মাল্লা ও সুবা শহর দেখে কলম্বোর কথা মনে পড়ে যায়। বেশী দিন অষ্ট্রেলিয়ায় থাকবার পর কালো লোকদের দেখে খুব আনন্দিত হলাম। ইমিগ্রেসন-কর্ম্মচারীদের হাত থেকে ছাড়া পেতে বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। লড়াইয়ের দরুন একটু বেশী কড়া হয়েছেন এঁরা। আরও শুনতে পেলাম ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাবার দরুন ইদানীং এঁরা সতর্ক হয়েছেন। এক জন ভারতীয় সহযাত্রী ছিলেন জাহাজে। এঁর সহোদর ভ্রাতা ফিজি-অধিবাসী। বিশেষ অনুমতিপত্রের বন্দোবস্ত ক'রে এঁকে আসতে হয়েছে। আমার সহযাত্রী এক জন জাপানী যুবকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, দু-জনে এক সঙ্গে সমস্ত দ্বীপটি ঘুরে দেখে আসব। জেটিতে নেমে ট্যুরিষ্ট ব্যুরো থেকে গাইড-বুক ও নানা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ ক'রে নেওয়া গেল। বাইরে রাস্তায় এসে এক দল মোটর-কোম্পানীর লোকের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। প্রায় সবই ভারতীয় কোম্পানী।

ইউরোপীয়ান নাবিকদের মধ্যে টাসম্যান নামে এক জন নাবিক ফিজিদ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে সর্ব্বপ্রথম উপনীত



ফিজির গ্রাম

হন। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে আরও পাঁচটি দ্বীপ ও কতকগুলি পাহাড়-পর্ব্বত তিনি আবিষ্কার করেন। এই সব আবিষ্কৃত দ্বীপগুলিকে ইনি Prince William's Islands নামে অভিহিত করেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন কুক Vatoa নামে একটি দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ক্যাপ্টেন উইলসন নামে আর এক জন শ্বেতাঙ্গ

নাবিকও কয়েকটি দ্বীপ আবিষ্কার করেন। শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের ভিতর এই তিন জন নাবিকের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণকায় দ্বীপবাসীরা এই শ্বেতাঙ্গ নাবিকদেরই সর্ব্বপ্রথম আপনাদের সমুদ্রতটে জাহাজ নোঙর করতে দেখেছিল।



ফিজির শিশুরা নারিকেল গাছে চড়িতেছে

প্রায় ২৫০টি দ্বীপ নিয়ে দ্বীপপুঞ্জ, সব চেয়ে প্রধান দ্বীপের নাম ভিটি লেবু (Viti Levu), সুবা বন্দর এই দ্বীপেই অবস্থিত। ৪০৫৩ বর্গমাইল এর পরিধি। এর পর ভানুয়া লেবু (Vanua Levu) নামে যে-দ্বীপটি অবস্থিত তার পরিধি ২১২৮ বর্গমাইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির ভিতর Taveuni দ্বীপের পরিধি, ১৬৬ বর্গমাইল ও Kandavu ১৬৫ বর্গমাইল। প্রায় ৮০টি দ্বীপে লোকবসতি আছে, বাকী দ্বীপগুলিতে পাহাড়-জঙ্গল ছাড়া বিশেষ কিছু নেই।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ বহু পুরাতন কাল থেকে অন্যান্য মহাদেশের মত আদিম মানবের আমল থেকে আছে, না, হঠাৎ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে পরবর্ত্তী কালে এর জন্ম সে-কথা কেউ নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে না, ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে অনেকেই ব'লে থাকেন যে বহু যুগ থেকে অন্যান্য মহাদেশের মতই এর অস্তিত্ব। অনেক কাল ফিজিতে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ-সংবাদ শোনা যায় নি। Vanua Levu দ্বীপে Thermal Spring আগ্নেয়গিরির চিহ্নস্বরূপ আজও বর্ত্তমান।

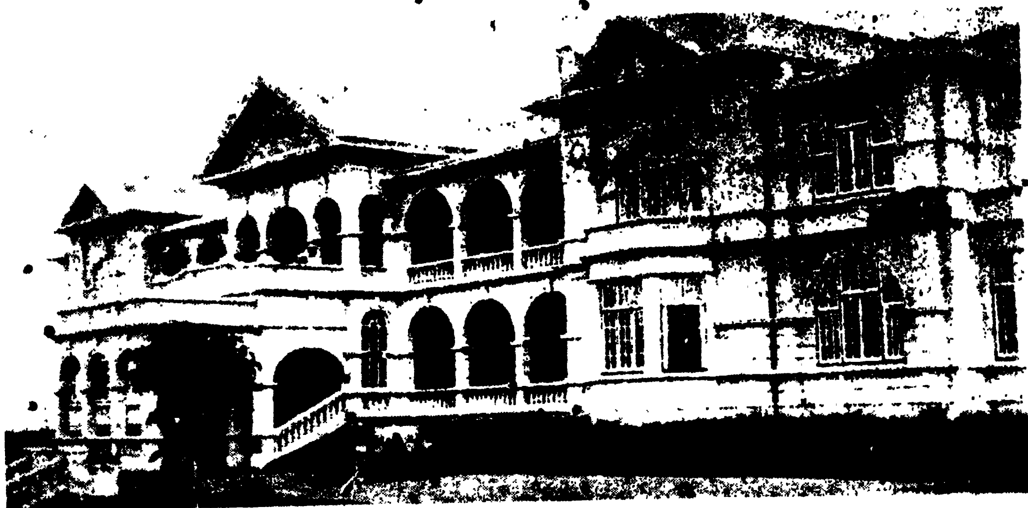
কথিত আছে, বহুকাল আগে আফ্রিকা থেকে এক দল লোক ভারতবর্ষ হয়ে নিউগিনি দিয়ে এই দিকে এসে বসবাস করতে থাকে। এদের মেলানেসিয়ান (Melanesian) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদের গ্রাম্য সঙ্গীতে—ফিজি ভাষায় একে মেকে (Meke) বলা হয়—তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; কোনও গ্রাম্য গাথায় বলা হয়েছে যে এদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ নৌকো (Canoe) ক'রে তুফানের তোড়ে পশ্চিম দিক থেকে এই দ্বীপে এসে উপনীত হন। ফিজির অধিবাসী, গ্রাম্য লোকের বেশভূষা দেখলে সিনেমায়-দেখা আফ্রিকার লোকদের ছবির কথা মনে প'ড়ে যায় বইকি। এদের মাথার চুল ও গায়ের রঙে কোনও তফাৎ নেই। বলিষ্ঠ অবয়ব—লড়াই করতে এরা ওস্তাদ। আদিম ফিজি-অধিবাসীরা যে হিংস্র ও নরমাংসভোজী ছিল এ-কথা শুনতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে নাবিকেরা একে "Cannibal Isles of Fiji" নামে অভিহিত করেছে। আদিম ফিজিবাসীদের ভিতর নানা রকম হিংস্র ও অসভ্য রীতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যান্য মেলানেসিয়ান জাতির চেয়ে নানা বিষয়ে অনেক উন্নত ছিল। কারুশিল্পে এরা ওস্তাদ, কুম্ভকার হিসেবে এরা অতুলনীয়, নৌ-নির্ম্মাণ শিল্পে এরা অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছিল। এদের নৌকো বনের সব চেয়ে শক্ত কাঠের তৈরি। এই নৌকোতে প্রায় তিন শত লোকের স্থান-সঙ্কুলান হ'ত ও সমুদ্রের তুফান সহ্য করতে এর মত মজবুত নৌকো আর ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাচীন কালের সে নৌকো এখন একটিও নেই। স্থানীয় সংগ্রহাগারে বৃহৎ



ফিজিদ্বীপবাসীরা বল্লম দিয়া মাছ ধরিতেছে



ফিজির বাঁশের ভেলা



গবর্ণমেণ্ট হাউস, সুবা, ফিজি

পানীয়াধার রক্ষিত আছে। এর বৃত্ত প্রায় ৪ ফুট; কাঠের কাজ হিসেবে অতি উচ্চ স্থান পাবার যোগ্য।

গ্রামের লোকবসতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের গ্রামের প্রধান হিসেবে এক জনকে রেখে তার অধীনে এক-একটি



প্রসাধন

লোকসমষ্টি রাখবার প্রয়োজন ঘটে। এই রকমে সমাজ গ'ড়ে ওঠে। এই সব সমাজ-প্রতিষ্ঠাতারা কালে দেবতা হিসেবে পরিগণিত হয়। এদের উদ্দেশেই বেদীতলে অধিবাসীরা তাদের ক্ষেতের প্রথম ফল উৎসর্গ ক'রে বীজ বপন বা কৃষিকার্য্যের যাবতীয় কাজ সুরু করে। প্রচলিত বিশ্বাস এইরূপ যে, এই আত্মা কোনও জন্তুরূপে প্রাণ ধারণ ক'রে থাকেন। সেই জন্তুকে এরা পবিত্র ব'লে মেনে থাকে, দারুণ অন্নাভাবেও এরা সেই জন্তুকে খাদ্য হিসেবে স্পর্শ করে না।

"ভিটি লেবু দ্বীপে" এক বিদেশী পলিনেসিয়ান সমাজ-পতির সাম্রাজ্যপত্তন-কাহিনী কথিত আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সিঙ্গাটোকা (Singatoka) নদীর তীরে দুইটি জাতি তাদের দল নিয়ে কালাতিপাত করছিল। তাদের ভিতর মতদ্বৈধ ঘটে এই নিয়ে যে, কে এদের ভিতর দুই পক্ষের শাসনকর্ত্তা হিসেবে গৃহীত হবে। এক জন মনোনীত হবার পর অভিষেক-উৎসবের ভোজের মৎস্য সংগ্রহের জন্য এক দল মৎস্যজীবী সমুদ্রতীরে প্রেরিত হয়। তারা নির্জ্জন সমুদ্রতীরে ঘুরতে ঘুরতে একটি শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট এক সুশ্রী ও অপেক্ষাকৃত ফরসা রঙের লোককে দেখতে পায়। সম্ভবতঃ কোনও নৌকো প্রচণ্ড তুফানে প'ড়ে ডুবে যাওয়ার দরুন এই লোকটি সেখানে কোনও রকমে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, এবং সম্ভবতঃ লোকটি পলিনেসিয়ান শ্রেণীভুক্ত। (কথিত আছে, পলিনেসিয়ানরা ভারতবর্ষের দিক থেকেই নিউজিল্যাণ্ড ও এই সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে)। ফিজিবাসী কৃষ্ণকায় মৎস্যজীবীর দল এই সুশ্রী যুবককে দৈবপ্রেরিত মহাপুরুষ সাব্যস্ত ক'রে তাদের প্রচলিত প্রথা, অর্থাৎ কোনও বিদেশীর চোখে সমুদ্রের লোনা জল ছিটিয়ে দিয়ে বধ করবার কথা, ভুলে গিয়ে একে গ্রামে নিয়ে হাজির করে। সবাই একে মহাপুরুষ (Kalavu) ব'লে মেনে নিয়ে শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এই পলিনেসিয়ান-বংশেরই এক জন কালে ব্রিটিশদের সর্ত্ত-পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, যাতে ফিজি ব্রিটিশদের অধীনে এসে পড়ে।

সুবা শহর আধুনিক, ইংরেজদের তৈরি। মিউজিয়মে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সমস্ত দ্বীপটি ঘুরে এসে জাহাজে চা খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। সিঙ্গাটোকা নদীর ধারে সেই গ্রাম এখনও আছে। গ্রামবাসীদের কুটীর ও বেশ-ভূষা অনেকটা আফ্রিকানদের মত মনে হ'ল। রাস্তার ধারে মোটর থামিয়ে বিশ্রাম করছিলাম এমন সময় এক জন ফিজিবাসী তার উল্কি-পড়া বুনো বেশে বল্লম হাতে নিয়ে মোটরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, ছবি তুলে নেবার পর দু-চার পেনি বকশিশ পাবার লোভে। অপর্য্যাপ্ত কলা পাওয়া যায় এই দিকে, ফিজির কলা পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। আনারসও এখানে প্রচুর ফ'লে থাকে। এখানকার ইক্ষু-ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ। চিনির কারখানা এখানে অনেক আছে এবং বেশীর ভাগ কারখানাই ভারতীয় দ্বারা পরিচালিত।

লাউটোকায় (Lautoka, ফিজির আর একটি শহর) চিনির কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম। অনেক ভারতীয় এই সব কারখানার মালিক। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ভারতীয় শ্রমিক এই দিকে আসতে থাকে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এখানে প্রায় সাত হাজার ভারতীয়ের আমদানী হয়। ১৯৩৬ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে এখানকার ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৪২·৮৫। ভারতীয় পুরুষের সংখ্যা ৪৮,২৪৬ ও নারীর সংখ্যা ৩৬,৭৫৬, মোট সংখ্যা ৮৫,০০২ জন। এর মধ্যে ৬০,৫৫৬ জন ফিজিতেই জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ এরা দেখেই নি। যুক্তপ্রদেশী ভারতীয়ের সংখ্যাই বেশী। বাঙালী হয়ত এক-আধ জন আছেন মাত্র। আট ভাগের এক অংশ ভারতীয় ইসলামধর্ম্মাবলম্বী ও প্রায় এক হাজারের উপর ভারতীয় খ্রীষ্টান। এখানকার ভারতীয়দের ভিতর জাতিবিচার তেমন প্রবল নেই। যারা বহুদিন আগে ভারতবর্ষের কূল ছেড়েছে তারা তাদের আর্থিক উন্নতির কল্পনা নিয়েই সমুদ্রে ভেসে এসেছে, জাতকে তারা বড় আমল দেয় নি। হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক জাহাজে একই উদ্দেশ্যে ভেসে এসে আপনাদের ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে, যা ভারতবর্ষে থাকতে তারা কখনও করে নি। ভারতীয়রা এই জন্য ফিজিবাসীর সঙ্গেও বেশ মিশে গেছে। অনেক ভারতীয় ঐ দেশী ভাষায় কথা কইতে পারে। ভারতীয় শ্রমিকদের ঢোলকের সঙ্গে ফিজিবাসীর নৃত্যগীতের সম্মিলন বেশ উপভোগ্য।

অনেক ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ফিজিদের বুনো নৃত্য (যা আদিম ফিজিবাসীরা তাদের শাসনকর্ত্তার সামনে কোনও পাতার রস থেকে তৈরি "kava" নামে পানীয় পান ক'রে নাচত) দেখতে এখানে আসেন। কোনও বিশেষ উৎসবের সময় এরা সেই নৃত্য ক'রে থাকে।

এ-দেশের লোকের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর আত্মা পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পর পাহাড়ের শেষপ্রান্তে এসে মিলিয়ে যাবার জায়গায় এসে হাজির হয়। সেইখান থেকে তাকে হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় সমুদ্রের জলে। টুইলেইতা (Tuileita) পর্ব্বতমালা ভিটি লেবু দ্বীপের "Spirit Path" নামে অভিহিত। পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে তার পরই অসীম সমুদ্র। আত্মা এই পর্য্যন্ত এসেই হয়ত বা সমুদ্রের দিকেই উধাও হয়। ফিজিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐ দিক থেকেই অনেক যুগ আগে এদের পূর্ব্বপুরুষ নৌকা ক'রে এসে হাজির হয়েছিল। কাজেই এই দিকেই আবার তাকে যেতে হবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার মস্তকমুণ্ডনের প্রথা প্রচলিত; মৃত ব্যক্তির পুরুষ আত্মীয়গণের বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির প্রথম জোড় (joint) ভেঙে দেওয়া হয়।

আধুনিক ফিজিবাসীরা স্কুলে পড়ছে। অনেকেই মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভ করছে। ভারতীয়দের জন্য স্কুল আছে। আর্য্যকন্যা বিদ্যালয়, মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় এবং ফিজিয়ানদের নিজস্ব স্কুলও আছে। হিন্দুদের মন্দির ও মুসলমানদের মসজিদ এখানে দেখেছি। ভারতীয় ছাত্রদের উচ্চশিক্ষালাভার্থ নিউজিল্যাণ্ডে যেতে হয়। ফিজিতে সে সুবিধে নেই।

ফিজির ভূমি খুব উর্ব্বর। নানা রকম ফসল এখানে ফলে। ভারতীয়ের অবস্থিতির জন্য ধানের চাষ এখানে হয়ে থাকে। তবে ভারতবর্ষ থেকে চাল, ডাল, আটা ও ঘৃতের আমদানি এদের করতে হয়।

ফিজি দ্বীপে Tavua নামক জায়গায় সোনার খনি আছে। স্বর্ণখনি, আনারস, ইক্ষু, কলা ইত্যাদি নানা রকম ফসল দিয়ে ইংরেজদের রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবার পক্ষে ফিজি কম সাহায্য করে না।

ভারতবর্ষে ফেরবার পথে ফিজির ভারতীয় নেতা পণ্ডিত বিষ্ণু দেওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ ঘটে। জাহাজে দু-এক জন ভারতীয়ের কাছে এঁর নাম শুনেছিলাম। ফেরবার পথে শহরের দিকে গিয়ে পণ্ডিত বিষ্ণু দেওয়ের খোঁজ করলাম। এক জন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সঙ্গে ক'রে নিয়ে পণ্ডিত বিষ্ণু দেওয়ের আপিসে হাজির ক'রে পরিচয় ক'রে দিলেন যে ভারতবর্ষ থেকে একজন "মেহমান" (অতিথি) এসেছেন। পণ্ডিতজী মহা আনন্দে আমাদের স্বাগতসম্ভাষণ করলেন। ইনি এখানকার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় প্রতিনিধি। এঁর

পৈতৃকভূমি বিহারে, ফিজি এঁর জন্মস্থান—কখনও ভারতবর্ষে যান নি। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেব এঁর আতিথ্যে এখানে ছিলেন। ভারতবর্ষের ছেলে—দূর থেকে ভারতবর্ষকে ইনি দেবতার মত পূজা করে থাকেন। আমাকে এখানে তিন সপ্তাহ থেকে গিয়ে পরের জাহাজে ফিরে যাবার অনুরোধ জানালেন। সারাদিন এঁর সঙ্গে কাটানো গেল।

ভারতবর্ষ পঁচিশ বছর আগে যেমন অবস্থায় ছিল, ফিজি যেন সেই রকম অবস্থায় পড়ে আছে মনে হ'ল। এখানকার স্থানীয় গ্রামের-স্কুলে নেটিবদের প্রবেশ নিষেধ। রাস্তার শৌচাগারে এক দিকে নেটিভ ও অন্য দিকে ইউরোপীয়ান লেখা। পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথাবার্তায় মনে হ'ল যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংগ্রামে কিছু লাভবান হ'লে ফিজিবাসীদের কিছু সৌভাগ্য হ'লেও হতে পারে। পণ্ডিতজী এখানকার ভারতীয় লাইব্রেরি ও পাঠাগারে নিয়ে গেলেন—অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। লাইব্রেরির টেবিলের উপর "বিশাল ভারত" ও "মডার্ণ রিভিয়ু" দেখে বেশ আনন্দ পেলম।

পণ্ডিতজীর সঙ্গে এখানকার এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। হিন্দুস্থানী খানা খেয়ে হিন্দী ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কওয়া গেল, তার পর গাড়ীতে ক'রে তিন জনে এই সুন্দর দ্বীপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান গেল। দু-জনই বেশ আমুদে ও অমায়িক। বেশ সৌহৃদ্য হয়ে গেল। এঁরা দু-জনে আমাকে এখানে কিছুকাল কাটিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তখন আর তার উপায় ছিল না। সন্ধ্যের আগে এঁরা আমায় জেটিতে পৌঁছে দিলেন। ভারতবর্ষের বাইরে এই দু-জন ভারতীয় বন্ধুর সৌহৃদ্য কখনও ভুলব না। আমি ভারতবর্ষের দিকে ভেসে পড়লাম—ফিজির উপকূল থেকে এঁরা আমায় বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিজির উপকূল চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিদায়

শ্রীহেমলতা দেবী

পৃথিবী, তোমার কাছে লইব বিদায়
ছেড়ে যাব, চলে যাব দূর সীমানায়।
এ দুটি আঁখির দিঠি যত দূর চলে
মন মোর তারি সাথে নিত্য সুকৌশলে
দৃষ্টির বাঁধন ছাড়ি চ'লে যায় পার
সীমাহারা আনন্দের লভে সমাচার।

যা দিয়েছ, যা নিয়েছ, যা পেয়েছ সব
হিসাব ধরিয়া রাখা তোমারি সম্ভব।
পথের সংবাদ রাখো পৃথ্বীনাম ধর
সবারে ধরিয়া রাখি কীর্ত্তি কত কর।
হেথা মোরে জন্ম দিলে করিলে লালন
তোমার আদেশ তাই করেছি পালন
দিয়েছি-য়া তাই লও, ডাকিও না পিছু
হোক না সে যত ক্ষুদ্র তবুও সে কিছু।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজাগোপালাচার্যের প্রস্তাব মুসলিম লীগের বিবেচনারও অযোগ্য !

কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা ও মাদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচার্য এই প্রস্তাব করেন যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যদি ভারতবর্ষে "জাতীয় গবর্মেণ্ট" স্থাপনে রাজী হন, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেসে তাঁহার সহকর্মীদিগকে এই বন্দোবস্তে রাজী করিবার দায়িত্ব লইতেছেন যে, মুসলিম লীগ প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করিতে আহূত হইবেন এবং সেই প্রধান মন্ত্রী জাতীয় মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য মন্ত্রী মনোনীত করিবেন। রাজাগোপালাচার্য মহাশয়ের এইরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে, বড়লাট ও ভারতসচিব উভয়েই বলিয়াছেন, ভারতে সংখ্যালঘু একাধিক দল আছে যাহারা কংগ্রেসের সমগ্র-জাতির প্রতিনিধিত্বের দাবী মানে না এবং কংগ্রেসের শাসনাধিকার মানিতে রাজী নহে; এই কারণে কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত জাতীয় গবর্মেণ্ট স্থাপনের প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইতে পারে না। সংখ্যালঘু দলগুলার মধ্যে মুসলিম লীগই কংগ্রেসকে না-মানিবার চীৎকার সকলের চেয়ে জোর গলায় করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য রাজাগোপালাচার্য মহাশয় এই মর্মের কথা বলিলেন, "আচ্ছা, মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে মানিতে চান না, আমরাই মুসলিম লীগের আজ্ঞাবহ হইব; লীগই জাতীয় গবর্মেণ্ট গঠন করুন।" এইরূপ প্রস্তাব দ্বারা প্রস্তাবক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আপত্তির অকপটতা এবং মুসলিম লীগেরও কংগ্রেস-বিরোধিতার স্বরূপ সম্ভবতঃ পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস-নেতাদের চেয়ে কম চতুর নহেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনের কথা ত এ নয় যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হইয়াই আছেন, কেবল ভারতীয় কোন কোন সংখ্যালঘু দলের কংগ্রেসভীতির জন্য দিতে পারিতেছেন না, সেই দলগুলাকে কংগ্রেস রাজী করিতে পারিলেই উক্ত কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা হাতে তুলিয়া দিবেন। ভারতের প্রভুরা ভারতবর্ষকে সাধ্যপক্ষে স্বাধীন হইতে দিবেনই না, ইহাই তাঁহাদের মনের ভাব; সংখ্যালঘুদের মতামতটা না-দিবার একটা বাহানা ও উপায় মাত্র। এবং কংগ্রেসের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের আপত্তি যাহাতে অটুট থাকে তাহার ব্যবস্থা প্রভুরা নানাবিধ বাঁটোআরা ও অন্যান্য উপায়ে করিয়া রাখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংখ্যালঘু দলগুলির সরকারের অনুমোদিত কোন সম্পূর্ণ তালিকা ত নাই। এখন যাহাদিগকে সরকার সংখ্যালঘু বলিয়া মানিতেছেন, কংগ্রেস যদি কোন প্রকারে তাহাদের আপত্তি দূর করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে সরকার তৎক্ষণাৎ অন্য কোন ভুঁইফোঁড় দলকে খাড়া করিয়া বলিবেন, "এরা কংগ্রেসকে মানিতে রাজী নয়।"

অবস্থা এইরূপ। সুতরাং রাজাগোপালাচার্য মহাশয় প্রস্তাব করিবামাত্র ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে হাঁ না কিছুই বলিলেন না, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে, বরং ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহারা, তাঁহাদের হাতধরা সংখ্যালঘু দলগুলা কি বলে (অথবা তাহাদের দ্বারা কি বলান যায়), তাহারই অপেক্ষায় রহিলেন। এই প্রতীক্ষা ফলবতী হইয়াছে।

মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবটি প্রকাশিত হইবার পরই অযোধ্যাবাসী মাহমুদাবাদের মুসলমান রাজা লিখিয়া জানাইলেন, মুসলমানেরা (অর্থাৎ মুসলিম লীগের মুসলমানেরা) এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে না; ইহার দ্বারা তাহাদিগকে কৌশলে ভারতীয় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি যে একটা মহাজাতি, অর্থাৎ নেশ্যন, তাহা মানাইয়া লইবার মতলব আছে। মুসলিম লীগের মত ও মনোভাব যাহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে অন্য কোন কোন মুসলমান এই আপত্তিও করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী যদি মুসলমান হন এবং অন্যান্য

মন্ত্রীরা যদি তাঁহার দ্বারা মনোনীত হন, তাহা হইলেও তাহা সন্তোষজনক হইবে না এই কারণে যে, এই মন্ত্রী-সভাকে দায়ী হইতে হইবে কেন্দ্রীয় আইন-সভার নিকট, যে আইনসভার অধিকাংশ সদস্য হিন্দু। অর্থাৎ কি না, যদিও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের অধিকাংশ হিন্দু এবং যদিও তাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, তাঁহাদের প্রদত্ত রাজস্বের অংশ, সার্বজনিক কার্যে উৎসাহ প্রভৃতি কোন বিষয়েই অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন, তথাপি মুসলিম লীগপন্থীরা হিন্দুপ্রধান কোন আইনসভার নিকট দায়ী হইতে অস্বীকৃত।

এই কারণেই মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে এমন ভাবে ভাগ করিতে চায়, যাহাতে এমন এক একটা অংশ থাকে যাহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। লীগের এই দাবীর ভিতরকার যুক্তি এই যে, মুসলমানেরা সমগ্রভারতে সংখ্যালঘু, গবন্মেণ্ট বলিয়াছেন সংখ্যালঘুদের মত পূর্ণ-মাত্রায় বিবেচিত হইবে, মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের মুখপাত্র, লীগ চায় পাকিস্তান,—অতএব লীগের দাবী গবন্মেণ্টের মানিয়া লওয়া উচিত। ভাল কথা। বঙ্গের হিন্দুরা বঙ্গে (এবং পঞ্জাবের, সিন্ধুর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুরা ঐ ঐ প্রদেশে) সংখ্যালঘু, গবন্মেণ্ট বলিয়াছেন সংখ্যালঘুদের মত পূর্ণমাত্রায় বিবেচিত হইবে, বঙ্গের (এবং পঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের) হিন্দুদের মুখপাত্র প্রত্যেক সভা (এবং নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভাও) ভারতবর্ষের খণ্ডী-করণের বিরোধী,—অতএব হিন্দুদের এই সকল প্রতিষ্ঠানের আপত্তি গবন্মেণ্টের গ্রাহ্য করা উচিত। এই যুক্তিটিরও ন্যায্যতা ত মানিতে হইবে?

গবন্মেণ্ট এ পর্যন্ত পাকিস্তান-প্রস্তাব মঞ্জুর করেন নাই। কিন্তু গবন্মেণ্ট ভবিষ্যতে যাহাই করুন, মুসলিম লীগ যাহাই করিতে চান, ভারতবর্ষের হিন্দুসমষ্টি ইহাতে রাজী হইবেন না, এবং অনেক মুসলমানও রাজী হইবেন না। তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত করিলে একটা দীর্ঘকালস্থায়ী অন্তর্যুদ্ধেরই ব্যবস্থা করা হইবে। পাকিস্তান-প্রস্তাবের বিস্তারিত আলোচনা করা এখন আমাদের অভিপ্রেত নহে বলিয়া সে বিষয়ে আপাততঃ আর কিছু বলিব না।

"রাজাজী ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ও মুসলিম লীগের মনোভাবের ও আন্তরিকতার পরীক্ষা করিতে চাহিয়া-ছিলেন। কেহই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দিলেন না। কেহই তাঁহার প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় বুঝা গেল।" ইহাতে কাহার ওস্তাদি বেশী বলা কঠিন।

রাজাজী যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা করা তাঁহার উচিত হয় নাই। এ-রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওআর্কিং কমীটির সভ্যদের মত না লইয়া কিছু বলা অনুচিত হইয়াছে। এমন কি, সমগ্র কংগ্রেসের মত না-লইয়া ওআর্কিং কমীটিরও এরূপ বিষয়ে মত প্রকাশ করা অনুচিত। সমগ্রভারতের শাসনভার কার্যতঃ মুসলিম লীগের হাতে তুলিয়া দিবার অধিকার কংগ্রেসের নাই, ব্রিটিশ গবন্মেণ্টেরও নাই। মুসলমানের প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় আমাদের আপত্তি নাই। অ-গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, পারসী,...যে-কেহ প্রধান মন্ত্রী মনোনীত হইবেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি। পক্ষান্তরে, গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে যে-কোন সম্প্রদায়েরই কোন রাজনীতিক তাঁহার যোগ্যতার বলে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হউন না কেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানদের দ্বারা দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য ও শাসন নির্বাহিত হইলে দেশের কি দুর্গতি হয়, তাহা আমরা বাঙালীরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। এই জন্য রাজাজীর প্রস্তাব বঙ্গে কংগ্রেসকে অধিকতর লোক-প্রিয় না করিয়া তাহার বিপরীত ফলই উৎপাদন করিয়াছে।

—

রাজাজীর আর একটি অবিবেচকতা

রাজাজীর প্রস্তাবে আপত্তিকারী এক মুসলমানের বিবৃতির উত্তরে তিনি (রাজাজী) এই মর্মের কথা বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে পাকিস্তান-প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; অর্থাৎ গণপরিষদ্ যখন ভবিষ্যভারতের মূল রাষ্ট্রবিধি রচনা করিবে, তখন অধিকাংশ মুসলমান প্রতিনিধি পাকিস্তান চাহিলে তাহাই মঞ্জুর হইতে পারিবে!

অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বঙ্গে এরূপ কথার ফল কংগ্রেসের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। বঙ্গের হিন্দুরা ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারিবে না যে, কংগ্রেস ত "না-গ্রহণ না-বর্জন" ব্যপদেশে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটাকে গ্রহণই করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন দেখিতেছি কংগ্রেস পাকিস্তানও গলাধঃকরণ করিতে রাজী! সেদিন মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের আলোচনার সময় মিঃ ওআর্ড্‌সওআর্থ বলিয়াছিলেন, "swallow is the word", "গিলিয়া ফেলাই এখন সবার সেরা বাণী", "ক্যাস্টর অয়েল খাইতে কাহারও ভাল লাগে না, কিন্তু তথাপি তাহা গিলিয়া ফেলিতে হয়, সেইরূপ মাধ্যমিক শিক্ষা বিলটা সাম্প্রদায়িকতার একটা ডোজ্‌ হইলেও তাহা গলাধঃকরণ করাই শ্রেয়ঃ!" এই ইংরেজপুঙ্গবের বাণীর অনুসরণ করিয়া কংগ্রেস-নেতারাও কি বলিবেন, "সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটা সুস্বাদু না হইলেও যেমন গিলিয়া ফেলিয়াছি, পাকিস্তানটাও তেমনি গলাধঃকরণ করিতে হইবে?"

শুনিয়াছি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নাকি কংগ্রেসওআলাদিগকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার মতে, ঐ প্রস্তাবটি কখনও কার্যে পরিণত হইবে না। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রেত কোন কিছুর বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলেই যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাহা পরিত্যক্ত হয়, এমন নহে। তথাপি কু-প্রস্তাব মাত্রেরই বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কর্তব্য, এবং সেই জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও আন্দোলন আবশ্যক। মৌলানা সাহেব যদি তাহা করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, কি উদ্দেশ্যে করিয়াছেন বলিতে পারি না। তিনি সৎ উদ্দেশ্যেই নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে নিষেধ করিয়াছেন ধরিয়া লইয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি কেমন করিয়া জানিলেন, পাকিস্তান-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবে না? তিনি ত ভবিষ্যদ্দর্শী নহেন এবং উহাকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার শক্তিও তাঁহার নাই।

বঙ্গে কংগ্রেসের অবাঞ্ছনীয় অবস্থা

আমরা কংগ্রেসের সভ্য না হইলেও তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে, কংগ্রেস যদি নিজের ঘোষিত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে চলিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারাই ভারতবর্ষ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। আমাদের এইরূপ বিশ্বাস আমাদিগকে সময়ে সময়ে কংগ্রেসের সমালোচনা করিতে বাধ্য করে যখন দেখি উহা নিজের আদর্শ হইতে চ্যুত হইতেছে। আমাদের মতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা সম্বন্ধে কংগ্রেস আপন আদর্শ রক্ষা করিতে পারে নাই, পাকিস্তান-প্রস্তাব সম্পর্কেও তাহাদের আদর্শ-চ্যুতির উপক্রম হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরায় বঙ্গের প্রতি অবিচার অন্য সব প্রদেশ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় এবং তাহার সম্বন্ধে কংগ্রেস নামে "না-গ্রহণ না-বর্জন" কিন্তু বাস্তবিক গ্রহণ-নীতি অবলম্বন করায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বঙ্গেই খুব বেশী হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গে কংগ্রেসের প্রভাব কমিয়াছে। পাকিস্তান-প্রস্তাবও কংগ্রেস মানিয়া লইবে, এরূপ ধারণা জন্মিলে তাহাদের প্রভাব আরও কমিবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ কংগ্রেসের স্থান পূর্ণ করিতে পারে, বঙ্গে এরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এ-পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই।

বঙ্গে কংগ্রেসের যতগুলি দল ও উপদল আছে, তাহার কোন একটিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা "কংগ্রেস" শব্দ ব্যবহার করিতেছি না; সকল দলের সমষ্টিকে বঙ্গের কংগ্রেস বলিতেছি। ইহার মধ্যে সুভাষ বাবুর ফরওআর্ড ব্লক আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে বৈধ কংগ্রেসী বলেন এবং সুভাষ বাবুর দলের লোকেরা অ্যাড্‌-হক্‌ বলেন তাঁহারা আছেন, কংগ্রেস "জাতীয়" দল আছেন, সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টরা আছেন, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপদল আছেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের উপদল আছেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উপদল আছেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উপদল আছেন, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের উপদল আছেন,…। এতগুলি দল-উপদল থাকাও বঙ্গে কংগ্রেসের প্রভাব কমিবার কারণ হইয়াছে। কংগ্রেস যে এতগুলি দলে

বিভক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য দায়ী বা দোষী কে, তাহার বিচার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, তাহা করিবার মত বিস্তারিত খবরও আমাদের জানা নাই। আমরা যতগুলি দল-উপদলের নাম করিলাম, বাস্তবিক ততগুলি দল-উপদল আছে কিনা, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, বঙ্গের কংগ্রেসওআলারা একটি ঘননিবিষ্ট সংহত সমষ্টি নহেন, কিন্তু তাহা হওয়া আবশ্যক। তাহা সদ্য সদ্য হওয়া সম্ভব না হইলে অন্ততঃ দলের সংখ্যা কমা আবশ্যক।

স্বাধীন চিন্তা থাকা উচিত এবং তাহা থাকিলে দলবিভাগ অনিবার্য, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বঙ্গে যে কংগ্রেসের এত দল-উপদল হইয়াছে, তাহার সব-গুলি মতের পার্থক্যজাত নহে, অন্ততঃ কতকগুলি ব্যক্তিগত কারণে উদ্ভূত, আমাদের ধারণা এইরূপ। অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের ভ্রম হইতে পারে।

বঙ্গের কংগ্রেসওআলাদের ঐক্য কেবল যে, বঙ্গেরই প্রভাববৃদ্ধি, শক্তিবৃদ্ধি ও হিতের নিমিত্ত আবশ্যক, তাহা নহে; উহা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভাববৃদ্ধি, শক্তিবৃদ্ধি এবং হিতের জন্যও আবশ্যক। যাঁহারা বাংলাকে তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা ভুল করেন। হীনবল বাংলা এবং শক্তিমান্ ভারত, উভয়ের যুগপৎ বিদ্যমানতার ধারণা বা কল্পনা করা যায় না।

—

ভারতসচিবের "না"

পার্লেমেণ্টের এক জন সদস্য ভারতসচিবকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতাদের কাছে যে-সব প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেগুলির গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিবৃতি দিবার আছে কি? তাহাতে ভারতসচিব উত্তর দেন, "কংগ্রেস সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং মুসলিম লীগ বড়লাটের বিবৃতিকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া একটি প্রস্তাব ধার্য করিয়াছেন। অন্যান্য পক্ষের মত এখনও জানা যায় নাই।" ইহাতে অন্য এক জন সভ্য জিজ্ঞাসা করেন, "কংগ্রেসই বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন পক্ষ, এই তথ্য বিবেচনা করিয়া ভারতসচিব কি প্রশ্নটির সমাধানের দিকে অগ্রসর হইবার নূতন পথের বিষয় ভাবিবেন?" ভারতসচিব উত্তর দেন, "না"।

দ্বিতীয় সভ্যটি জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সরকারী প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার সমাধানের জন্য ভারতসচিব কোন নূতন পন্থা অবলম্বন করিবার বিষয় ভাবিবেন কি না। ভারতসচিব একটি ছোট্ট "না" শব্দ উচ্চারণ দ্বারা শুধু যে জ্ঞাপন করিলেন যে তিনি তাহা করিবেন না, তাহা নহে, অধিকন্তু তিনি ইহাও জানাইলেন যে, কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যান তিনি অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।

প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকারের চক্ষে এবং মুসলিম লীগের মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কংগ্রেস তুচ্ছ হইতে পারে; কিন্তু ভারতসচিব কর্তৃক "না" শব্দ উচ্চারিত হইবার কয়েক দিন আগেও পার্লেমেণ্টেই তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,

"The Congress leaders are men inspired by an ardent national patriotism. They have built up a remarkable organization, by far the most efficient political machine in India, of which they are justly proud. They have striven to make that organization national and all-embracing."

তাৎপর্য্য। কংগ্রেস-নেতারা জ্বলন্ত দেশভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহারা এমন একটি প্রখ্যাত শৃঙ্খলাবদ্ধ সংঘ গড়িয়া তুলিয়াছেন যাহা ভারতে সর্বাপেক্ষা কার্যকর রাজনৈতিক যন্ত্র ও অন্য সব দল কার্যক্ষমত্বে তাহার বহু পশ্চাতে, এবং ইহার গর্ব যে তাঁহারা করেন তাহা ন্যায্য। তাঁহারা এই সুশৃঙ্খল দলটিকে মহাজাতির সকল অংশের প্রতিনিধিত্ব করিতে এবং সকলকে ইহার মধ্যে লইতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

ভারতসচিব ইহাও বলিয়াছিলেন,

"It is true that they are the largest single party in British India."

"ইহা সত্য যে, কংগ্রেস ব্রিটিশ ভারতে বৃহত্তম একটি দল।"

ভারতসচিব নিজে যে দলের এই প্রকার সত্য প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার কি কারণ তিনি পাইয়াছেন জানি না। তাঁহার একমাত্র ভরসা মুসলিম লীগ। তাহার নেতা মিঃ জিন্না এবং তাহার সভ্যেরা যাহাই বলুন তাহা মুসলমানদের সকলের মুখপাত্র নহে। মুসলমানদের বৃহত্তর আরও দল আছে। ভারতসচিব

তরুণ মুসলিমদের মনের ভাব বিবেচনা করিয়াছেন কি? আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বড়লাটের প্রস্তাব ও তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসের মন্তব্য বিবেচনা করিয়া প্রকাশ্য সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবের ভূমিকায় বলিয়াছেন :—

"মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাজাতিক (nationalist) ছাত্রগণ বড়লাটের সর্বশেষ বিবৃতি এবং তদ্বিষয়ে ভারতসচিবের বক্তৃতা পড়িয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতার যে প্রস্তাব কংগ্রেস-পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল বড়লাট ও ভারতসচিব তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতা পাইবার জন্মগত অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন।"

প্রস্তাবটির সংকল্প অংশটি এইরূপ :—

"আমরা ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের কঠোর নিন্দা করিতেছি এবং কংগ্রেস সভাপতিকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আসন্ন সংগ্রামে আমরা সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিব।"

ভারতসচিব যে বলিয়াছেন, অন্যান্য দলের মতামত জানা যায় নাই, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। উদারনৈতিক দল তাঁহাদের মত কতকগুলি প্রস্তাবের আকারে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন। তাঁহাদের ভাষা সংযত, কিন্তু তাঁহারা বড়লাটের বিবৃতি ও ভারতসচিবের মতের প্রতিকূল সমালোচনাই করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভাও তাঁহাদের মতামত জানাইয়াছেন। কিন্তু হইতে পারে যে, ভারতসচিব মুসলিম লীগের সমর্থনে এমন উল্লসিত হইয়াছিলেন যে, অন্য কোনও পক্ষের কথাই তাঁহার মনে পড়ে নাই। সেগুলা তাঁহার চোখে না-থাকার সমান।

—

কংগ্রেস ও মিঃ জিন্না

কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভদ্র ভাষায় লিখিত গোপনীয় একটি টেলিগ্রামের যে অভদ্র উত্তর মিঃ জিন্না দিয়া মৌলানা সাহেবের টেলিগ্রাম ও তাহার উত্তর খবরের কাগজে ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক মুসলমান ভদ্রলোকও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ মুসলিম লীগের সভ্য। মিঃ জিন্নার এইরূপ ব্যবহারের পর অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, কংগ্রেস বা কোন কংগ্রেস-নেতা অতঃপর মিঃ জিন্নাকে ও মুসলিম লীগকে খুশি করিবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, তাঁহাদের সহিত সংস্রবও রাখিবেন না। কিন্তু রাজাজী সে অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার মহানুভবতার না অন্য কিছুর পরিচায়ক?

—

মুসলিম লীগের আত্মপ্রতারণা

মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহক সমিতির যে বৈঠক সম্প্রতি বোম্বাইয়ে হইয়া গিয়াছে তাহাতে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে যে বড়লাট ও ভারতসচিব লীগের মতের দিকে অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছেন। লীগের প্রধান মত এই যে, ভারতবর্ষে কোন একটি নেশ্যন অর্থাৎ মহাজাতি নাই, মুসলমানরা একটি আলাদা নেশ্যন, হিন্দুরা আর একটা স্বতন্ত্র নেশ্যন এবং সেই জন্য মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে বিভক্ত করিয়া পাকিস্তানে মুসলিম নেশ্যনের আধিপত্য কায়েম করিতে চান। কিন্তু বড়লাটের বিবৃতিতে ও ভারতসচিবের বক্তৃতায় বার-বার ভারতবর্ষের একটি জাতীয় জীবনের উপাদানীভূত ভিন্ন ভিন্ন অংশই (Various elements in the national life of India) উল্লিখিত হইয়াছে, কোথাও বলা হয় নাই বা আভাসও দেওয়া হয় নাই যে, এদেশে দুটা বা তার চেয়ে বেশী নেশ্যন বাস করে। উভয় রাজপুরুষের বক্তৃতায় ভারতের যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা একটা অখণ্ড দেশের ও একটা অখণ্ড নেশ্যনের, দুটা নেশ্যনের নহে। ভারতসচিব ভারতের অখণ্ডত্বের ও ভারতীয় নেশ্যনের একত্বের কথা অতি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

"Underlying the differences in India there is, after all, the fact that India is a self-contained and distinctive region of the world."

"India can boast of an ancient civilization and of a long history common to all its peoples, of which all Indians are equally proud."

"There is no Indian who is not proud to be called an Indian."

"There is the unity not merely of administration but of political thought and aspiration which the British can justly claim to have contributed to India's national life."

এই সকল উক্তির মধ্যে মুসলিম লীগের মতের সহিত কোন সাদৃশ্যের আভাসও পাওয়া যায় না।

মুসলমানদের একটা "সুবিধা" ও হিন্দুদের একটা "অসুবিধা"

মুসলমান সম্প্রদায়ের এই একটা "সুবিধা" আছে, যে, তাহাদের মধ্যে এক দল লোক গবন্মে´ণ্টকে, কখন কখন শুধু ভিতরে ভিতরে কখন কখন বাহিরেও, তোয়াজ করিয়া নিজেদের কাজ উদ্ধার করিতে পারে; আবার আর এক দল লোক আছে যাহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া সেখানেও নিজ সম্প্রদায়ের কাজ উদ্ধার করে। মুসলমানদের মধ্যে গবন্মে´ণ্টের সঙ্গে সহযোগিতাকারী অংশকেই গবন্মে´ণ্ট মুসলমানদের মুখপাত্র বলিয়া মানেন। এটা গবন্মে´ণ্টের "সুবিধা"।

হিন্দুদের "অসুবিধা" এই যে, তাহাদের মধ্যে এই রকম দুটা ভাগ নাই। খুব উৎসাহী হিন্দু রাজনীতিকরা কংগ্রেসওআলা। গবন্মে´ণ্ট মনে করিয়াছিলেন, মুসলিম লীগের মত হিন্দু মহাসভাকেও নামে ও কার্যতঃ কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া কংগ্রেসকে কিঞ্চিৎ খাটো করিতে পারিবেন। সেই জন্য বড়লাটের বিবৃতিতে মুসলিম লীগের সঙ্গে হিন্দু মহাসভারও নাম ছিল। কিন্তু হিন্দু মহাসভা আপাততঃ ডোমীনিয়ন স্টেটাস্ চাহিলেও তাহার শেষ প্রকাশ্য লক্ষ্য পূর্ণস্বাধীনতা বলিয়া এবং মহাসভা আরও কোন কোন দাবী করায় ভারতসচিবের ৫ই আগস্টের "না"-প্রধান উত্তরে হিন্দু মহাসভা উল্লিখিত হয় নাই।

আমরা জানি না, বড়লাটের পরিবর্ধিত শাসন-পরিষদে (expanded Executive Council-এ) সদস্যরূপে কাহাকেও পাঠাইতে হিন্দু মহাসভা রাজী হইবেন কি না। কিন্তু যদি মহাসভা সদস্য পাঠাইতে রাজী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের আত্মসম্মান ও **কার্যকারিতা** বজায় রাখিবার নিমিত্ত এই সর্ত করা একান্ত আবশ্যক যে, মুসলিম লীগকে যত জন সদস্য পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হইবে, হিন্দু মহাসভাকে তাহার তিন গুণ সদস্য পাঠাইতে দেওয়া হইবে।" ভারতবর্ষের হিন্দুরা কোন দিক্ দিয়াই মুসলমানদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে—বরং শিক্ষায় এবং রাজস্বপ্রদানক্ষমতায় তাহারা মুসলমানদের চেয়ে অগ্রগণ্য। এবং তাহারা সংখ্যায় মুসলমানদের তিনগুণ। সুতরাং যত দিন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিকতার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতা বজায় থাকিবে, তত দিন সংখ্যানুপাতে হিন্দুদের যাহা প্রাপ্য তাহা দাবী করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, দাবী না-করা আহম্মকি ও আত্মসম্মানহানিকর।

—

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের বিরোধীরা যুক্তিতে ও ন্যায়ের দিক দিয়া প্রবলতর পক্ষ হইলেও, উহার সমর্থকদিগের ভোট বেশী থাকায় উহা স্বাজাতিকদিগের দ্বারা সম্পূর্ণ বর্জিত একটা সিলেক্ট কমীটিতে প্রেরিত হইয়াছে। তাহা হইলেও উহার বিরুদ্ধে সর্বত্র মীটিং হইতে থাকা আবশ্যক, এবং তাহা হইতেছেও। ভোটের জোরে উহা আইনে পরিণত হইতে পারে, হইবেই—এমনও বলা যাইতে পারে। উহা আইনে পরিণত হইলে তখন উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার, বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলি রক্ষা করিবার, তাহাদের সংখ্যা বাড়াইবার এবং সমুদয়গুলিতে সুশিক্ষা ও কার্যকর শিক্ষা দিবার কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, এখন হইতে সে-বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক লইয়া মন্ত্রণা করা আবশ্যক। বৃহৎ "বিরাট" জনসভা মন্ত্রণার স্থান নহে। ক্ষুদ্র মন্ত্রণা-সমিতি চাই।

বিলটা যে সাম্প্রদায়িকতাপ্রসূত, সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ প্রথম হইতেই ছিল না। অধিকন্তু মৌলবী ফজলল হকের এই কথায় তিনি উহার সাম্প্রদায়িকত্ব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, উহা পাস করাইতে না পারিলে তিনি ও তাঁহার দলের সদস্যেরা ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসী হইবেন।

—

বঙ্গের বাহিরেও কংগ্রেসে অনৈক্য

আমরা বঙ্গে কংগ্রেসের দল-উপদলগুলির উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গের বাহিরেও যে কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য ও দলাদলি নাই, তাহা নহে—যদিও বঙ্গের বাহিরে যে অনৈক্য আছে তাহা বঙ্গের সমতুল্য নহে। ভারত-সচিব যে কংগ্রেসকে এত সহজে অগ্রাহ্য করিতে বা

করিবার ভান করিতে পারিয়াছেন, কংগ্রেসের মধ্যে অনৈক্য তাহার একটি কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

সকলের চেয়ে বড় অনৈক্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত অহিংসনীতির পুরা অনুসরণ বিষয়ে ওআর্কিং কমীটির অধিকাংশ সভ্যের মতভেদ। তাহাতে কার্যক্ষেত্রে কংগ্রেসের শক্তির হ্রাস কিছু বুঝা যাইবে কিনা, এখনও বলা যায় না।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত এই মতভেদের আগে হইতেই বঙ্গে যেমন, বঙ্গের বাহিরেও তেমনি কংগ্রেসওআলাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দল ছিল, কম্যুনিস্ট দল ছিল, কংগ্রেস ন্যাশন্যালিস্ট দল ছিল, এবং পরে সুভাষ বাবুর ফরওআর্ড ব্লক দলের উদ্ভব হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, সকল বিষয়ে না-হউক একটি কোন একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকল দল ও উপদলের কংগ্রেসীরা একমত হইয়া একত্র কাজে লাগিয়া গেলে অন্য অনেক বিষয়েও ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইবে। অনেক "বামপন্থী" এই বলিয়া "দক্ষিণপন্থী"দিগকে খোঁটা দিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহারা (দক্ষিণ-পন্থীরা) সংগ্রামবিমুখ। এখন যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে সংগ্রাম ত আসন্ন মনে হইতেছে। সংগ্রাম—অবশ্য অহিংস—আরম্ভ করা উচিত বা অনুচিত হইবে সে-বিষয়ে কিছু বলিতেছি না। কিন্তু যদি সংগ্রাম করাই স্থির হয়, তাহা হইলে বামপন্থী দক্ষিণপন্থীদের তাহা একযোগে করায় আপত্তি কি?

এইরূপ আরও কোন কোন কাজ আছে যাহা সকল পন্থীই সম্মিলিত ভাবে করিতে পারেন।

—

কংগ্রেস ও মহাসভা দলের সম্মিলিত কার্য

শুধু কংগ্রেসের ভিন্ন ভিন্ন দলেরই সম্মিলিত চেষ্টা যে সম্ভব, তাহা নহে; এমন বিস্তর কাজ আছে যাহা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা একত্র করিতে পারেন। তাহার প্রমাণ, আইন-সভায় কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবং অন্যতম কংগ্রেসী মৌলবী নওশের আলী বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত একযোগে কলিকাতা-মিউনিসিপালিটি-সংহারক বিলের বিরোধিতা করিতেছেন।

আইন-সভাতেও সব মুসলমান এই বিলটার সমর্থন করিতেছেন না। সুতরাং ইহার বিরোধীদের মধ্যে অনেক মুসলমানও আছেন বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এরূপ বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি বিলটা আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে সেরূপ আইন অচল করিবার জন্য কি করিতে পারা যায়, এখন হইতে সে-বিষয়ে মন্ত্রণা করা উচিত।

এইরূপ কংগ্রেসী ও মহাসভাপন্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের বিরোধিতাও একসঙ্গে করিতেছেন।

—

হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্য

নিখিল-ভারতীয় হিন্দু মহাসভা দাবী করেন যে, উহাই সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের একমাত্র মুখপাত্র। সম্ভবতঃ মুসলীম লীগ মুসলমান-সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে দাবী করেন, এই দাবী তাহারই অনুরূপ। হিন্দু মহাসভা সমগ্র-ভারতের হিন্দুদের একমাত্র প্রতিনিধি-সভা কিনা, তাহার বিচার করা অনাবশ্যক। কিন্তু মহাসভাকে এই অনুরোধ করা যাইতে পারে যে, সব অঞ্চলের হিন্দুদের যুক্তিসঙ্গত সব মত বিবেচনা করিয়া মহাসভার নেতারা যেন নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন, এবং কাহাকেও যেন অনর্থক গালাগালি না দেন। কয়েক জন অবাঙালী হিন্দু মহাসভানায়কের বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রবন্ধ পড়িয়া ইহা লেখা আবশ্যক মনে হইয়াছে।

আগে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে সমগ্রভারতবর্ষে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান কেবল হিন্দু মহাসভা ছিল। এখন হিন্দু লীগ নামক আর একটি প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হইয়াছে। মাসাধিক পূর্বে তাহার প্রথম অধিবেশন লক্ষ্ণৌতে হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় নেতা শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আণে ইহার সভাপতিত্ব করেন। লীগের সহিত মহাসভার কোন অনৈক্য নাই, লীগের আবির্ভাব হইয়াছে মহাসভারই দুটি কাজ করিবার নিমিত্ত—যথা পাকিস্তান-প্রস্তাবের বিরোধিতা এবং আগামী সেন্সসে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা,—এই মর্মে একটি বিবৃতি উক্ত লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময় কিংবা কিছু আগে, বা পরে খবরের কাগজে দেখিয়া-

ছিলাম। অনৈক্য না থাকিলেই ভাল। কিন্তু বিবৃতিটির দ্বারা আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

বাংলা দেশে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা ছাড়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (মিঃ বি. সি. চ্যাট্যার্জির) নেতৃত্বে অন্য একটি হিন্দু-সভা আছে। কিছু কাল পূর্বে দুটি সভা এক হইয়া গিয়াছিল। এখন আবার পৃথক্ হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয় নহে।

—

হিন্দু একত্বের প্রয়োজন

বলা বাহুল্য, অন্য সব সম্প্রদায়ের মত হিন্দুদের মধ্যেও ঐক্য একান্ত আবশ্যক। বরং হিন্দুদের ঐক্য অন্যদের চেয়ে অধিক আবশ্যক। কারণ, হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ থাকায়, অনেক জাতির হিন্দুদিগকে ভাঙাইয়া অন্য দলে ও অন্য ধর্মসম্প্রদায়ে লইয়া যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। আর একটি কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভক্তদের আক্রোশ হিন্দুদের উপর বেশি, এবং তাহাদের ও তাহাদের অনুগৃহীত পোষ্যদের আক্রমণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে খুব জোরে চলিতেছে।

বঙ্গীয় হিন্দুসভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সকল হিন্দুকে এক হইবার নিমিত্ত একটি অনুরোধ জানান হইয়াছে। গত জন্মাষ্টমীর দিন ভারতসেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে কলিকাতায় হিন্দুদের যে বৃহৎ সভা হয় তাহাতে সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্য কোন কোন বক্তা ঐক্যের প্রয়োজন ব্যক্ত করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু তদর্থে অস্পৃশ্যতা উন্মূলন করা চাই, বলেন। ইহা সত্য কথা। অস্পৃশ্যতা থাকিতে হিন্দুরা কখনও এক হইতে পারিবে না। ইহা মনুষ্যত্বের অপমান। কিন্তু শুধু অস্পৃশ্যতা দূর করিলেই হিন্দু সমাজের অখণ্ডত্ব সাধিত হইবে না। খুলনায় বঙ্গের হিন্দুদের যে প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে এবং হিন্দুদের অন্য কোন কোন কন্ফারেন্সে ভিন্ন ভিন্ন জাতির (caste-এর) ও উপজাতির (sub-casteএর) মধ্যে বিবাহ আবশ্যক বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। ইহা হিন্দু সমাজের সংহতির ও যথেষ্ট লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। হিন্দু সমাজে, খুব অল্পসংখ্যক হইলেও এরূপ বিবাহ হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু আরও হওয়া চাই। সংস্কৃতির ঐক্য বা সাদৃশ্য এবং অন্যবিধ অবস্থার সাম্য যত বাড়িবে, ভিন্ন ভিন্ন লোকসমষ্টির মধ্যে বিবাহও তত বাড়িবে।

বাংলা দেশে সব প্রদেশের হিন্দু থাকেন। তাঁহাদের অনেকে বাংলা বুঝেন ও বলেন। বাঙালীর মত করিয়া ধুতি ও শাড়ীও পরেন। তাঁহাদের সকলের মধ্যে মেলামেশা বাড়িলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশাগত হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ বাড়িতে পারে। সমগ্রভারতীয় হিন্দু একত্বের জন্য তাহা বাঞ্ছনীয়।

—

"পর্দা-নিবারক সম্মেলন"

কলিকাতার সত্যনারায়ণ পার্কের সম্মুখে অকোলার প্রসিদ্ধ সমাজসেবিকা শ্রীমতী রাধা দেবী গোয়নকার সভানেত্রীত্বে সম্প্রতি পর্দা-নিবারক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী বিড়লা ছিলেন 'স্বাগতাধ্যক্ষা' (অভ্যর্থনা-সমিতির নেত্রী) এবং শ্রীমতী জ্ঞানবতী দেবী লাঠ ও শ্রীমতী কস্তুরী দেবী সোঢানী ছিলেন সংযুক্ত-স্বাগত-মন্ত্রিণী (অভ্যর্থনা-সমিতির যুগ্ম সম্পাদিকা)। সভানেত্রী মহোদয়া পর্দা-প্রথার নানা দোষ দেখাইয়া তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, নারী জাতির সর্ববিধ উন্নতির নিমিত্ত পর্দা-প্রথার উচ্ছেদ আবশ্যক। ইহা ঠিক কথা। প্রধানতঃ মাড়োয়ারী সমাজের উদ্যোগে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সভার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত মণ্ডপে কয়েক হাজার মহিলা সমবেত হন। তাঁহাদের মধ্যে বহু অবগুণ্ঠনবতী বয়স্থা মাড়োয়ারী মহিলাও ছিলেন। তাঁহারা মণ্ডপের ভিতরে আসিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করেন।

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সফলতা আমরা কামনা করি।

পর্দা-নিবারক সম্মেলনের সভানেত্রীকে যে শোভাযাত্রা সহকারে হাবড়া স্টেশন হইতে আনা হয়, তাহার সম্মুখ ভাগে অশ্বারোহিণী স্বয়ংসেবিকারা (girl volunteers) ছিলেন। ইহা এই সম্মেলনের একটি বিশেষত্ব। আমরা এক বার রাজপুতানার একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের সচিত্র

রিপোর্ট পাইয়াছিলাম, যাহাতে অন্য সব রকম শিক্ষার সহিত, "রাজপুত বীরবালা" প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বালিকাদিগকে অশ্বারোহণও শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকা আমাদিগকে এক সময় বলিয়াছিলেন, এই রাজপুত বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যয় কলিকাতার মাড়োয়ারীরা নির্বাহ করেন।

বাঙালী বালিকাদিগকেও, সন্তরণ বাইসিকল-চালনা ও অস্ত্রব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, অশ্বারোহণও শিক্ষা দেওয়া উচিত। মফঃসলে এরূপ শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, যদিও কলিকাতাতেও অসাধ্য নহে।

—

পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ

পূজার ছুটিতে অনেক ছাত্র ও ছাত্রী বাড়ী যাইবেন। কেহ কেহ বঙ্গের বাহিরে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে পারেন, কেহ বা দেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন। কিন্তু যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী কলিকাতায় পড়েন কিন্তু যাঁহাদের বাড়ী অন্যত্র, তাঁহাদের অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অবস্থিত আপনাদের বাসগ্রামে বা নিবাসনগরে যাইবেন। কলিকাতার বাহিরের স্কুল-কলেজগুলিতে যাঁহারা পড়েন, তাঁহারাও অনেকে নিজের নিজের গ্রামে যাইবেন। বাংলা দেশে কলিকাতা, হাবড়া ও ঢাকা বাদ দিলে আর সব শহর প্রায় বড় গ্রামেরই মত। সুতরাং বাংলা দেশকে জানিবার মানে বঙ্গের গ্রামগুলিকে জানা বলিলেও চলে।

আমরা অনেকে বাংলা দেশে জন্মিয়া বাংলা দেশে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হইয়াছি, অথচ বাস্তবিক আমাদের দেশটিকে ও জাতিকে জানি না চিনি না। দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামের লোক, তাহাদেরও অধিকাংশ সাধারণ চাষী কিংবা ভূমিশূন্য ক্ষেতমজুর (তাহাও শুধু চাষের সময়, অন্য সময়ে বেকার)। এই সব লোক কেমন ঘরে থাকে, কি খায়, কি পরে (যদি তাহাদের থাকিবার ঘর থাকে, খাইবার কিছু থাকে, পরিবার কিছু থাকে), কিরূপ আয়ের উপর নির্ভর করে এবং সে আয় কেমন করিয়া হয় (যদি কিছু আয় থাকে), তাহাদের কোন কাজ থাকিলে তাহা কি এবং তাহা জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট কিনা, তাহাদের মধ্যে যাহারা বেকার তাহাদের বেকার হইবার ও থাকিবার কারণ কি, তাহাদের দুঃখ কি, দুঃখের কারণ কি, সুখ যদি তাহাদের জীবনে থাকে তাহার প্রকৃতি, স্বরূপ ও কারণ কি—এই সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব জানিবার বিষয়। না জানিলে দেশকে ও জাতিকে জানা যায় না। কিন্তু খবরের কাগজ পড়িয়া, বক্তৃতা শুনিয়া, কেতাব পড়িয়া এই সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। দরদী হৃদয় লইয়া গ্রামে বাস করিলে, গ্রামের লোকদের উপকারী মুরুব্বি না সাজিয়া তাহাদের এক জনের মত হইয়া গ্রাম-সমাজে মেলামেশা করিলে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে। যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী জনসেবক হইতে চান, তাঁহাদিগকে এই প্রকারে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথাসম্ভব লাভ করিতে হইবে।

কেহ যদি এরূপ কোন উদ্দেশ্য না লইয়াও সহজভাবে গ্রামের লোকদের সহিত মেশেন, তাহা হইলেও কতক জ্ঞান স্বতই লব্ধ হইবে।

ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামে যেমন প্রচুর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ কিছু শিখাইতেও পারেন। পড়িতে শিখাইয়া তাঁহারা জ্ঞান দান করিতে পারেন, মুখে মুখেও অনেক বিষয় শিখাইতে পারেন।

—

আগামী সেন্সাস

গত সেন্সাসের অনেক ভুল প্রবাসীতে, মডার্ণ রিভিয়ুতে ও অন্য কোন কোন কাগজে দেখান হইয়াছে। এই প্রকার ও অন্যবিধ ভুল যাহাতে আগামী সেন্সাসে না হয়, এখন হইতেই তাহার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। আগামী সেন্সাসে লোক-গণনা কি প্রকারে হইবে, তাহার কিছু বর্ণনা ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। এই গণনাপ্রণালীর মধ্যে যদি এরূপ কোন খুঁৎ থাকে, যাহার জন্য ভুল হওয়া অনিবার্য বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, তাহা হইলে সেই খুঁৎ এখনই কর্তৃপক্ষের গোচর করা দরকার। এই বিষয়টির প্রতি বিশেষজ্ঞদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষাসংসদের পরীক্ষা

শ্রীনিকেতন হইতে বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্মী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ধর আমাদিগকে জানাইয়াছেন :—

"বিশ্বভারতী লোকশিক্ষাসংসদের পরিচালনায় গত ১৮ই মার্চ হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রবেশিকা ও আদ্য পরীক্ষা আরম্ভ হয়। স্থানীয় বিদ্যালয় ও লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিজ নিজ কেন্দ্রে বিশেষ উৎসাহের সহিত পরীক্ষা সুসম্পন্ন করেন। এবারে আদ্য পরীক্ষায় মোট ১২ জন পরীক্ষার্থী ছিল; তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মোট ১৭ জন পরীক্ষার্থী ছিল, তাহার মধ্যে ১২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

"গত বৎসর অপেক্ষা এবারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী। সুদূর বোম্বাইয়েও পরীক্ষার কেন্দ্র করা হইয়াছে। এবারে কয়েক জন মহিলাও পরীক্ষার্থিনী ছিলেন। আগামী বৎসরে বঙ্গের ভিতর ও বাহিরের নানা স্থানে পরীক্ষার কেন্দ্র করা হইবে।"

পরীক্ষার ফল

আদ্য পরীক্ষা।

শ্রীনিকেতন কেন্দ্র—বীরভূম

১। শ্রীরামরেণু মুখোপাধ্যায়—প্রথম বিভাগ।
২। শ্রীরামানন্দ রায় দ্বিতীয় বিভাগ
৩। শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
৪। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার ঐ
৫। শ্রীরমেশচন্দ্র বিশ্বাস ঐ
৬। শ্রীঅবনীজানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ
৭। শ্রীগৌরপদ সরকার ঐ
৮। শ্রীজটাধারী রায় ঐ
৯। শ্রীরামচরণ কর ঐ
১০। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঐ
১১। কাজি গোলাম মহবুব ঐ

শ্রীপুর কেন্দ্র—যশোহর

১। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র দ্বিতীয় বিভাগ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

বালী কেন্দ্র—হাবড়া।

১। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ কুমার প্রথম বিভাগ
২। শ্রীফণীভূষণ গুঁই ঐ
৩। শ্রীঅনিলকুমার বসু
৪। শ্রীসন্তোষকুমার দাস দ্বিতীয় বিভাগ
৫। শ্রীমুরলীমোহন দাস ঐ
৬। শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
৭। শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ
৮। শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ

চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্র—নদীয়া।

১। শ্রীকালীপদ নাথ দ্বিতীয় বিভাগ
২। শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাথ ঐ
৩। শ্রীমতী আভারাণী চৌধুরী ঐ

বোম্বাই কেন্দ্র

১। শ্রীমতী ঊষারাণী দে দ্বিতীয় বিভাগ

যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি এখন বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতেও প্রথমে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুব কম হইয়াছিল। পুনা ও বোম্বাইয়ের যে "শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর ঠাকরসী ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়" বহু বৎসর পূর্বে অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্বে মহাশয় স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা উহাতে ১৫ লক্ষ টাকা দাতা পরলোকগত সর্ বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসীর মাতার নাম অনুসারে নামিত হইয়াছে, তাহাতে এখনও পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা অল্পই হয়। বটগাছের বীজ অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা হইতেই বিশাল ছায়াতরুর উদ্ভব হয়। আমাদের এই আশা আছে যে, বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষাসংসদ ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতে কালক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করিবে এবং গৃহে গৃহে প্রভূত জ্ঞান বিস্তারের উপলক্ষ্য ও কারণ হইবে।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রবেশিকা পরীক্ষা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন সর্বত্র বাড়াইবার নিমিত্ত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পাঠ্য-তালিকাও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফী দুই টাকা। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা লওয়া হইবে এবং ডিসেম্বর মাসে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে পরীক্ষার ফল অনুসারে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরিত হইবে। কলিকাতাতেও একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এলাহাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পরীক্ষাসচিব। সম্মেলনের এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সফল হউক। ইহা অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়।

যুদ্ধের প্রথম বৎসর

গত বৎসর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ইয়োরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। আবার আর এক সেপ্টেম্বর উপস্থিত। এখনও ঠিক্ বলা যায় না শেষ পর্য্যন্ত কোন্ পক্ষ জিতিবে। কিন্তু ইহাও বলা যায় না যে, জার্মেনী এ-পর্য্যন্ত হারিয়াছে বা ইংলণ্ড জিতিয়াছে। জার্মেনী এখনও ইংলণ্ডে তাহার সৈন্য নামাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার বিস্তর এরোপ্লেন নষ্ট ও বিমানযোদ্ধা নিহত হওয়া সত্ত্বেও এখনও প্রতিদিন, এবং কোন কোন দিন পাঁচ-ছয় বার, আকাশ-পথে ইংলণ্ডে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। ইহা অনেকে মনে করেন এবং আমাদেরও বিশ্বাস সেইরূপ যে, জার্মেনী শেষ পর্য্যন্ত হারিবে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ছাড়া, আর যাহার যাহার বিরুদ্ধে জার্মেনী অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকেই হারাইয়া দিয়াছে। নৈতিক প্রশংসা তাহার প্রাপ্য নহে, কিন্তু হিটলার যে যুদ্ধযন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে তাহার কার্যকারিতা স্বীকার করিতে হইবে। ইয়োরোপীয় যুদ্ধ প্রথম কয়েক মাস ইয়োরোপে আবদ্ধ ছিল। তাহার পর আফ্রিকা পৌঁছে। এখন, এডেনের উপর বোমা পড়ায়, উহা এশিয়াতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিতে হইবে।

আফ্রিকায় যুদ্ধের ফল শেষ পর্যন্ত যাহাই হউক, উহার ফল ব্রিটিশ প্রজা সোমালিদের পক্ষে অতি তিক্ত হইয়াছে—ব্রিটেন সোমালিল্যাণ্ড হইতে সরিয়া পড়ায় সোমালিদিগকে ইটালীর অধীন হইতে হইয়াছে। ব্রিটেন তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী ছিল, সে দায়িত্ব পালন করিতে পারিল না। পূর্ব-আফ্রিকার কেনিয়ার সীমান্তে বুনা নামক জায়গাটি হইতেও ব্রিটেন ইটালিয়ানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না-পারায় হটিয়া আসিয়াছে। মানুষকে অধীন ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া রাখিবার কুফল এক্ষেত্রেও বুঝা যাইতেছে।

আমেরিকা ও ব্রিটেন

আমেরিকা ক্রমেই যুদ্ধের মধ্যে আসিয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছে। কানাডার সহিত পারস্পরিক রক্ষার চুক্তি হইয়াছে। যুদ্ধসম্ভার ত আমেরিকা ব্রিটেনকে দিয়াই আসিতেছে। এখন আমেরিকা মহাদেশে ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত কোন কোন জায়গা আমেরিকা ইজারা লইয়া তাহাতে জলযুদ্ধ ও আকাশ-যুদ্ধের ঘাঁটি বসাইতেছে। সমর্থ বয়সের সব আমেরিকানকে আবশ্যিক যুদ্ধ-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমেরিকার যুদ্ধের কয়েকটা বরাদ্দ অর্থের সমষ্টি এমন বিপুল তাহার কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন।

চীন ও জাপান

ফ্রান্সের অধিকৃত ইন্দোচীনের ভিতর দিয়া সৈন্য পাঠাই-বার "অনুমতি" জাপান শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের নিকট আদায় করিয়াছে। আপাততঃ ১২,০০০ সৈন্য যাইবে চুংকিয়ান আক্রমণ করিতে, কথা এইরূপ। ১২,০০০ বাড়িয়া ১,২০,০০০ হইতে কতক্ষণ? চীনও অসতর্ক বা তন্দ্রালস নাই। চৈনিক সৈন্যেরা জাপানের সহিত লড়িতে প্রস্তুত আছে।

আমেরিকা ইন্দোচীনের মধ্য দিয়া জাপানের অভিযান পছন্দ করে না, তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। হল্যাণ্ডের অধিকৃত জাভা প্রভৃতি দ্বীপের উপর জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি আমেরিকাকে বিষম সন্দিহান করিয়াছে।

আমেরিকা, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া

জাপানের অতি বাড় দেখিয়া আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার সহিত সন্ধির মত কিছু করিতেছে, এবং সন্ধির নিমিত্ত রাশিয়ার সহিত কথাবার্তা চালাইতেছে। আমেরিকার এই সব চা'লে যদি জাপান সাবধান হইয়া নিজের লোভ দমন না করে, তাহা হইলে পূর্ব-এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরে প্রচণ্ড সমরানল জ্বলিতে পারে।

রুম্যানিয়া

রুমানিয়ার আরও অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। রুমানিয়ার ভিতরেও বিপ্লব ঘটিয়াছে। রাজা কারল তাঁহার পুত্রকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। একজন নেতা ডিক্টেটর হইয়াছেন। কয়েক জন ভূতপূর্ব মন্ত্রী নিজের নিজের বাড়ীতে গ্রেপ্তার হইয়া আছেন। হয়ত তাঁহাদের বিচার হইবে। রাজা কারলেরও বিচার হইবার সম্ভবনা ছিল, তিনি সুইজারল্যাণ্ড চলিয়া গিয়াছেন।

—

হলোএল মনুমেণ্ট "সত্যাগ্রহী"দের মুক্তি

হলোএল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে যাঁহারা "সত্যাগ্রহ" করিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন। খালাসের পর আবার কাহারও কাহারও অন্য অভিযোগে বিচার চলিতেছে।

ঐ মনুমেণ্টটা বাংলা-সরকার অন্যত্র সরাইয়া রাখিবার নিমিত্ত মিস্ত্রি লাগাইয়াছেন।

কতকগুলি লোকের কারাবাস হইল, কিন্তু মনুমেণ্টটা সরাইবার পরিবর্তে যদি ভাঙিয়া ফেলাও হইত, তাহা হইলেও দেশের স্বাধীনতা এক আঙ্গুলও আগাইয়া আসিত না।

—

"অন্ধকূপটা ছিলই না!

গবেষণার দ্বারা নহে, কিন্তু ভোটের চোটে, ঠিক হইয়া গেল "অন্ধকূপ"টা ছিলই না, সেখানে কেউ মারা পড়ে নাই, বিদ্যালয়পাঠ্য কোন বহিতে উহার উল্লেখ থাকিতে পারিবে না! আমরা এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি, কিন্তু যতটুকু পড়িয়াছি তাহাতে আমাদের ধারণা এই যে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের একটা ছোট কামরায় অল্পসংখ্যক বন্দী মারা পড়িয়াছিল, যদিও হলোএল-কথিত সংখ্যাটা অত্যুক্তি, এবং যদিও সিরাজউদ্দৌলার জ্ঞাতসারে ব্যাপারটা ঘটে নাই।

প্রথমতঃ এক জন এম. এল. এ. প্রস্তাব করেন যে, কোন ইতিহাসেই কেহই "অন্ধকূপ হত্যা"র বিষয় লিখিতে পারিবে না! কিন্তু সমস্ত পৃথিবীটা, সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, এমন কি সমস্ত ব্রিটিশ ভারতবর্ষও ত হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর অধীন নহে। সুতরাং ইহা সহজেই উপলব্ধ হইল যে, প্রস্তাবটা প্র্যাক্টিকেব্‌ল্ নয়। শেষ পর্যন্ত বঙ্গের অভাগা বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকলেখকদের উপরেই একটা হুকুম জারি হইল।

—

সুভাষবাবুর নামে একাধিক মোকদ্দমা

খবরের কাগজে সংবাদ বাহির হইল, সুভাষবাবু দুই-এক দিনের মধ্যেই খালাস পাইবেন। এই সু-সংবাদ বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ ছিল না। কেন-না, যে মনুমেণ্টটার বিরুদ্ধে অভিযানের অছিলায় তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়, সেটা ত অপসৃত হইতেছে এবং অভিযানও তাহার আগেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার খালাস হইবার গুজব রটিবার পরেই কাগজে খবর বাহির হইল যে, তিনি গত ফেব্রুয়ারী মাসে—ছয় মাস আগে—কি বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই অভিযোগে পুলিস তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনিয়াছে। তাহার পর এপ্রিল ও মে মাসে তাঁহার বক্তৃতা ও লেখার জন্যও আরও মোকদ্দমা হইয়াছে। তিনি খালাস পান নাই। তিনি কি বলিয়াছিলেন লিখিয়াছিলেন আমরা জানি না। যদি জানিতাম তাহা হইলেও বিচারাধীন সে সব বিষয়ে কিছু লেখা অনুচিত ও বে-আইনী হইত। অনেক স্থলে কোন অভিযোগ সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পুলিসের খুব বেশি সময় লাগে। এ-ক্ষেত্রে সেরূপ কিছু ঘটিয়াছিল কি না জানা যায় নাই।

ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজারা পূর্বজন্মে কে কি করিয়াছিল, সে বিষয়ে যে পুলিসকে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয় না, তাহা পুলিসের পক্ষে বাঁচোয়া এবং প্রজাদেরও পরম সান্ত্বনা।

—

রাজনারায়ণ বসু

গত ২২শে ভাদ্র শনিবার ঋষিকল্প মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্মদিবসে সন্ধ্যা ৬টায় অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-ভবনে রাজনারায়ণ স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সমিতি এবং তত্রত্য সাহিত্য-

পরিষৎ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সভার আয়োজন করেন। তথাকার সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশবাবু বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি স্বরচিত কবিতা পড়েন ও অধুনালুপ্ত "মেদিনীবান্ধব" হইতে বসু মহাশয়ের জনৈক ছাত্রের স্মৃতিকথা পড়িয়া শুনান। অতঃপর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজের স্মৃতি হইতে বসু মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলেন। তাহার পর সভাপতির অভিভাষণ পড়া হইয়া সভার কাজ নির্বিঘ্নে শেষ হয়। মেদিনীপুরের নানা প্রকার সুকার্যের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কৃতিত্ব বর্ত্তমান—এই সমস্ত কার্যের তিনি ছিলেন হোতা। কৃতজ্ঞ মেদিনীপুরবাসীরা তাঁহার কোন স্থায়ী স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিলে আপনাদিগকেই ধন্য করিবেন। মেদিনীপুরে তাঁহার অসংখ্য কার্য্যের মধ্যে "পাবলিক লাইব্রেরি" অন্যতম। সম্প্রতি ঐ লাইব্রেরির গৃহ নূতন করিয়া নির্মিত হইতেছে। ঐ গৃহ তাঁহার পুণ্য নামে উৎসর্গ করিলে মেদিনীপুরবাসীরা তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণের কিঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারিবেন।

আগামী ৩১শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার তাঁহার পরলোকগমন-দিবস। আশা করি যথাসময়ে বাংলার সর্বত্র তাঁহার স্মৃতি-দিবস পালন করা হইবে।

সমগ্র দেশ তাঁহার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছিল। শিক্ষা, সমাজসংস্কার, ধর্মপ্রচার, লোক-সেবা, রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রভৃতি নানা প্রকার জনহিতকর কার্যের মধ্যে আজিও তাঁহার স্মৃতি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার দেশভক্তি, মনীষা ও ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়াছেন।

—

মেদিনীপুর জেলায় জলপ্লাবন

কাঁথি মহকুমার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের দুর্দশার যে মর্মন্তুদ বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িলে তথাকার বিপন্ন লোকদের যে কত অধিক সাহায্য আবশ্যক, তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মে। প্রায় ছয় লক্ষ লোক বিপন্ন হইয়াছে, অগণিত লোক অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বা লতাপাতা খাইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। ক্ষুধার্ত শিশু ও নর-নারীর চরম দুর্গতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অন্যূন এক কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমীটি ও কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমীটি বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—

১। শ্রীকুমারচন্দ্র জানা, জেলা কংগ্রেস অফিস, বড়বাজার, মেদিনীপুর, ২। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস অফিস, কাঁথি, জিলা মেদিনীপুর।

কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা এই সমাজের মারফত সাহায্য দিতে চান, তাঁহারা উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু মহাশয়ের নামে ২১১ নং কর্নওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন।

তমলুক মহকুমারও বহু বাসস্থান বন্যাবিধ্বস্ত হইয়াছে, সেখানেও সাহায্য চাই।

শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা, জানাইতেছেন:—

হিন্দু সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুত ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তাছাড়া মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি, কাঁথি বন্যা সাহায্য সমিতি প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি এই আর্ত্ত জনগণের সেবা যথাসাধ্য করিতেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্ত সামান্য। নিরন্ন ও দুস্থ জনগণের ঔষধ-পথ্য এবং অন্নসংস্থানের জন্য জেলা বোর্ড ও সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি।

—

দামোদরের বন্যা

দামোদরের বন্যায় বর্ধমান জেলার জামালপুর ও রায়না থানার প্রায় এক শত গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে। বহু গ্রামের গরীব অধিবাসীদের ঘর ও আসবাবপত্র বন্যার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহারা গাছতলায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের অনেকে খাদ্যাভাবে অনাহারে অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেছে। গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণের অবিলম্বে এই অঞ্চলে সাহায্য করা প্রয়োজন। জামালপুর থানার বিখ্যাত নাকড়াহাল বাঁধ গত বর্ষের বন্যার বেগে ফাটিয়া গিয়াছে এবং যদি আবার বন্যা হয়

তবে ঐ বাধাটি থাকিবে না—কাজেই এ বিষয়েও গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণের অবহিত হওয়া কর্তব্য।

সিন্ধুর হিন্দুদের বড়লাট-সাক্ষাৎকার হইল না

সিন্ধুদেশের হিন্দুরা বড়লাটের নিকট কয়েক জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া আপনাদের দুঃখদুর্গতির কথা নিবেদন করিতে চাহিয়াছিলেন। বড়লাট তাঁহাদের সে আবেদন এই বলিয়া না-মঞ্জুর করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অভিযোগ-শ্রবণাদি ব্যাপার প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত। ইহা সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য মাত্র। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইনের ৫২ ধারায় প্রাদেশিক গবর্ণরদের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব ("special responsibilities") নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার প্রথম দুটি, প্রদেশের বা তাহার অংশবিশেষের শান্তিভঙ্গের গুরুতর আশঙ্কা হইলে সেই আশঙ্কা নিবারণের দায়িত্ব এবং সংখ্যালঘু লোকসমষ্টিদের বৈধ স্বার্থ নিরাপদ করা। যথা :—

"52.—(1) In the exercise of his functions the Governor shall have the following special responsibilities, that is to say :—

(a) The prevention of any grave menace to the peace or tranquillity of the Province or any part thereof;

(b) The safeguarding of the legitimate interests of minorities;

খবরের কাগজের পাঠকমাত্রেই জানেন সিন্ধুদেশের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নহে, শান্তিভঙ্গই বার-বার হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবার আশঙ্কাও আছে; প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট তাহা নিবারণ করিতে পারেন নাই। সকল মানুষের সকলের চেয়ে বড় স্বার্থ প্রাণরক্ষা, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষাও বড় স্বার্থ। সিন্ধুদেশের হিন্দুদের প্রাণ মান ধন সবই বিপন্ন। প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট এই অবস্থার প্রতিকার করিতে না-পারায় হিন্দুরা বড়লাটকে আপনাদের অভিযোগ জানাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহাদের অভিযোগ জানাইবার অধিকার আছে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইনের ৫২ ধারায় যেমন গবর্ণরের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব আছে, সেইরূপ ১২ ধারায় গবর্ণর-জেনার‍্যালেরও কতকগুলি দায়িত্ব আছে। যথা—

"12.—(1) In the exercise of his functions the Governor-General shall have the following special responsibilities, that is to say,—

(a) The prevention of any grave menance to the peace or tranquillity of India or any part thereof;.....

(c) The safeguarding of the legitimate interests minorities;

ভারতশাসন-আইনের এই ধারাগুলির উদ্দেশ্য আমরা এই বুঝি যে, গবর্ণর নিজের বিশেষ দায়িত্ব অনুসারে কাজ করিবেন; তিনি যদি তাহা না করেন বা করিতে না-পারেন, তাহা হইলে গবর্ণর-জেনার‍্যাল সেই সেই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করিবেন। তিনি যদি তাহা না-করেন তাহা হইলে ১২ ধারাটি আইনে আছে কিসের জন্য? যদি "মাইনরিটিজ" ("minorities") শব্দটির অর্থগুলির মধ্যে অপ্রকাশিত উহ্য এই অর্থও থাকে, যে, যেহেতু হিন্দুরা সমগ্রভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব তাহারা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে জিলায় শহরে বা গ্রামে মাইনরিটি (সংখ্যালঘু) লোকসমষ্টি নহে, তাহা হইলে সেই অর্থটা খুলিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত।

সিন্ধুদেশের হিন্দুদের বড়লাটকে আপনাদের অভিযোগ শুনাইবার যেমন অধিকার জন্মিয়াছে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও বঙ্গের হিন্দুদেরও সেইরূপ অধিকার জন্মিয়াছে।

বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা ও প্রবাসীর সম্পাদক

কয়েকটি দৈনিকে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার নির্বাচিত কর্মীদের যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে সহকারী সভাপতিদের মধ্যে প্রবাসীর সম্পাদকের নাম দেখিলাম। ইহা ভুল। প্রবাসীর সম্পাদক হিন্দু মহাসভার সভ্য নহেন এবং সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইতে সম্মতিও দেন নাই। তাঁহার সম্মতি চাওয়াও হয় নাই।

প্রবাসীর সম্পাদক কোনও রাজনৈতিক দলের বা সমিতির সভ্য নহেন।

ভারতের শান্তি ও কল্যাণের নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দায়িত্ব

বড়লাটের যে বিবৃতিটিকে খবরের কাগজে তাঁহার শেষ বিবৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহাতে একাধিক স্থানে নিম্নলিখিত কথা বা তাহার সমার্থক কথা আছে।

"It goes without saying that they ("His Majesty's Government") could not contemplate the transfer of their present responsibilities for the peace and welfare

of India to any system of Government whose authority is directly denied by large and powerful elements in India's national life."

তাৎপর্য। ইহা না বলিলেও চলে যে মহামহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বরের গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য তাঁহাদের বর্তমান দায়িত্বসমূহ এমন কোন প্রকার গবর্মেণ্টকে হস্তান্তরিত করিবার কথা ভাবিতে পারেন না যাহার কর্তৃত্বাধিকার ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের বৃহৎ ও শক্তিশালী কোন কোন অংশ অস্বীকার করে।

এই অস্বীকৃতির প্রকৃতি ও কারণ এখন বিশ্লেষণ করিব না। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যত দিন ভারতবর্ষের প্রভু আছেন এবং যত দিন আপনাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত ভারতীয় জনগণের কোন-না-কোন অংশের ঐরূপ অস্বীকৃতি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে, তত দিন তাঁহারা কোন প্রকার ভারতীয় মহাজাতীয় গবর্মেণ্টকেই নিজেদের "দায়িত্ব" অর্পণ করিবেন না।

দায়িত্বটা কিরূপ পালিত হইতেছে তাহাই এখানে আমাদের আলোচ্য।

ভারতবর্ষের শান্তিভঙ্গ দুই প্রকারে হইতে পারে, আভ্যন্তরীণ উপদ্রব দ্বারা এবং বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ দ্বারা। গত ২৫।৩০ বৎসরে ভারতবর্ষে যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া আসিতেছে, ইংলণ্ডেশ্বরের গবর্মেণ্টের শাসনকালে তাহার পূর্বে তত হইত না। ইহা ভারত-গবর্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রসদস্য থাকা কালে স্বয়ং সর্ হেনরী ক্রেক বলিয়াছিলেন। ভারতশাসন-আইনের প্রাদেশিক অংশ জারি হইবার পর অনেক প্রদেশে—বিশেষতঃ সিন্ধুদেশে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে এবং বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে উপদ্রব খুবই হইয়া আসিতেছে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ কারণজনিত শান্তিভঙ্গ নিবারণের দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক পালিত হইতেছে, বলা যায় না। জাতীয় গবর্মেণ্ট দ্বারাই এই দায়িত্ব যথোচিত পালিত হইতে পারে।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে যেরূপ শান্তিভঙ্গ হয়, তাহার অভিজ্ঞতা সম্প্রতি ভারতীয়দের হয় নাই বটে, কিন্তু যে-যে বিদেশী জাতি দ্বারা বর্তমানে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের অনেক-লক্ষ-পরিমিত যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যদল (mechanized army) আছে, বহু যুদ্ধজাহাজ আছে, এবং অনেক হাজার করিয়া সামরিক এরোপ্লেন আছে। ভারতবর্ষের নিজস্ব স্থলসৈন্য, রণতরীসমষ্টি এবং এরোপ্লেনসমষ্টি তাহাদের সমকক্ষ নহে। সমকক্ষ করিবার যথেষ্ট ও সমুচিত চেষ্টাও গবর্মেণ্ট করিতেছেন না। সেরূপ চেষ্টা কেবল জাতীয় গবর্মেণ্টের দ্বারা হইতে পারে। ব্রিটেন আত্মরক্ষাতেই এত বিব্রত যে, কোন প্রবল জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে যে নিজের সামরিক শক্তি ভারতরক্ষার নিমিত্ত সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায় না।

অতএব, আভ্যন্তরীণ উপদ্রব হইতে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষের শান্তি রক্ষা করিবার দায়িত্ব কোন গণতান্ত্রিক জাতীয় গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করাই উচিত।

ভারতবর্ষের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দ্বারা কিরূপ পালিত হইতেছে, তাহার আলোচনা অনেক বার করিয়াছি। কোন জাতির কল্যাণের মোটামুটি অর্থ এই যে, তাহাদের আয় যথেষ্ট আছে, তাহাদের স্বাস্থ্য গড়ে অন্য সভ্য জাতিদের সমান, তাহাদের মৃত্যুর হার অন্য সভ্য জাতিদের চেয়ে বেশি নয়, এবং অন্য সভ্য জাতিদের মতই তাহারা শিক্ষিত ও জ্ঞানবান্। সাংখ্যিক লোকতত্ত্বের (statisticsএর) যত বার্ষিক পুস্তক বাহির হয়, তাহার সাহায্যে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি এবং একাধিক বার দেখাইয়াছি যে, সভ্য গবর্মেণ্টের দ্বারা শাসিত যত দেশ পৃথিবীতে আছে, তাহার মধ্যে ভারতীয়দের মাথাপিছু গড়পড়তা বার্ষিক আয় সকলের নীচে, ভারতবর্ষে মহামারী (epidemics) সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, ভারতীয়দের মৃত্যুর হার সকলের চেয়ে বেশি, 'বাঁচিবার আশা' ("expectation of life") সকলের চেয়ে কম, এবং শতকরা নিরক্ষরের সংখ্যা ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশি। সুতরাং ভারতবর্ষের লোকদের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যথোচিত করিতে পারিয়াছেন বা পারিতেছেন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। সভ্য জগতে যেখানে যেখানে এই দায়িত্ব যথোচিত পালিত হইয়াছে বা হইতেছে, সেগুলি সমস্তই স্বশাসক দেশ, অতএব, ব্রিটিশ জাতি যদি ভারতের কল্যাণ চান, তাহা হইলে তাহাকে স্বশাসক হইতে দিতে হইবে।

স্বশাসন ব্যতীত অনুগৃহীত সম্প্রদায়েরও সম্যক্ উন্নতি অসম্ভব

সভ্য স্বশাসক জগতের প্রত্যেক দেশ অপেক্ষা পরশাসিত ভারতের অবস্থা আর্থিক, স্বাস্থ্যিক ও শৈক্ষিক প্রত্যেক বিষয়ে নিকৃষ্ট। সমগ্র ভারতীয় জাতির অবস্থা ত এই প্রকার। কিন্তু কেহ হয়ত ভাবিতে ও বলিতে পারেন যে, সমগ্র ভারতীয় জাতির অবস্থা যাহাই হউক, বিদেশী শাসনে বিদেশী শাসকদের অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের অবস্থা খুব ভাল। কিন্তু ইহা সত্য নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া মুসলমানেরা বিদেশী শাসকদের নানা প্রকারে অনুগ্রহভাজন। তাহার ফলে অনেক মুসলমানের চাকরী হইয়াছে এবং অনেকে আইনসভার সভ্য হইয়াছেন ও খেতাব পাইয়াছেন। কিন্তু মুসলমান জনসমষ্টি ঐশ্বর্য্যে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, জ্ঞানে কোন বিদেশী সভ্য জাতির সমান হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের নিকটেও পৌঁছিতে পারে নাই। পরশাসিত ভারতবর্ষের অগ্রসরতম সম্প্রদায়ও স্বশাসক গণতান্ত্রিক দেশের নিগৃহীততম জাতি ও শ্রেণীরও সমকক্ষ নহে। আমেরিকার নিগ্রোদের আইনানুযায়ী অধিকার যাহাই হউক, তাহারা এখনও শিক্ষার সুযোগ শ্বেতদের সমান পায় না, পথে ঘাটে ট্রেনে ষ্টীমারে হোটেলে গির্জ্জায় গোরস্থানে এখনও তাহারা শ্বেতদের সমান সুবিধা ও মর্য্যাদা পায় না, এখনও বিনা বিচারে প্রতিবৎসর অল্পসংখ্যক নিগ্রো শ্বেত-জনতা কর্ত্তৃক নিহত (lynched) হয়, এখনও কোন কোন জীবিকার দ্বার তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। কিন্তু নিগ্রোদের স্বাস্থ্য ভারতবর্ষের অগ্রসরতম বা অনুগৃহীততম যে-কোন সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের চেয়ে ভাল, তাহাদের মৃত্যুর হার ভারতীয় যে-কোন শ্রেণীর মৃত্যুর হার অপেক্ষা কম, তাহাদের মাথা-পিছু গড় আয় ভারতীয় অনুগৃহীততমদের চেয়ে অনেক বেশী এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষিতদের শতকরা সংখ্যা ভারতবর্ষের অনুগৃহীততম সম্প্রদায়ের চেয়ে বহু বহু গুণ বেশী, ভারতের শিক্ষায় অগ্রসরতম সম্প্রদায় বা শ্রেণীর চেয়েও বেশী। স্বশাসন মানবজীবনের সব দুঃখের অমোঘ ঔষধ নহে, কিন্তু স্বশাসন ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ই পূর্ণ ফলপ্রদ হইতে পারে না,—সকল ঔষধের অনুপান স্বশাসন।

—

রাজবহিষ্কৃতদের অবস্থা

"ভারত-রক্ষা" আইন অনুসারে অনেক লোক এক একটা প্রদেশ, জেলা, অঞ্চল, বা শহর হইতে সরকারী হুকুমে বহিষ্কৃত হইতেছেন। কিন্তু সরকার যদিও এই প্রকারে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের উপার্জ্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, তথাপি, শুনিতেছি, তাঁহাদের কোন ভাতার বন্দোবস্ত এ-পর্য্যন্ত করেন নাই। বিচারান্তে যাহারা কয়েদী হয়, তাহারা বন্দী অবস্থায় খাইতে পরিতে পায়, মাথা রাখিবার ঠাঁই পায়; যাহাদের ফাঁসীর হুকুম হয়, তাহারাও ফাঁসী না-হওয়া পর্যন্ত খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান পায়। নির্বাসিতদের জন্যও অশন-বসন-নিবাসের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী আদেশে বিনা বিচারে যাহারা বহিষ্কৃত (externed) হয়, তাহারা উল্লিখিত দণ্ডিত সকল লোকদের চেয়েই কি বেশি দোষী? দোষী যে তাহাও ত প্রমাণিত হয় নাই।

তাঁহাদের ও তাঁহাদের পোষ্যবর্গের নিমিত্ত যথেষ্ট ভাতার ব্যবস্থা করা ন্যায়সঙ্গত, না-করা অযৌক্তিক ও নিন্দনীয়।

—

রাজবন্দীদের অবস্থা

বিনা বিচারে যাহাদিগকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, এখানে কেবল তাহাদিগকেই রাজবন্দী বলিতেছি। তাহাদের জন্য বর্ত্তমানে কেবল 'স্টেটসম্যান' ও 'আজাদ' অনুমোদিত কাগজের তালিকাভুক্ত। রাজবন্দীরা কোন সাপ্তাহিক ও মাসিকের গ্রাহক হইতে পারে না। উক্ত দৈনিক দুটা বা একটা তাহারা লইতে চাহিলে তাহার মূল্য তাহাদিগকে দিতে হয়, কিন্তু তাহার জন্য তাহাদিগকে খোরাকীর অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয় না। আগে তাহা দেওয়া হইত, এবং এই অতিরিক্ত টাকা সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, পুস্তক প্রভৃতি ক্রয়ে ব্যয়িত হইত। বর্ত্তমানেও রাজবন্দীদিগকে পড়াশুনার জন্য অতিরিক্ত কিছু

দেওয়া উচিত। এখন তাহাদের সংখ্যা আগেকার চেয়ে অনেক কম। তাহাদের দেহের ও মনের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, গবন্মে‍র্ণ্টের তাহা দেওয়া উচিত। তাহাদের কাহারও কাহারও স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইয়াছে। স্বাস্থ্যের অবনতির কারণের মধ্যে মানসিক কারণও আছে।

রাজবন্দীদিগের পোষ্যগণের ভরণপোষণাদির বিষয়েও গবন্মে‍র্ণ্টের যথোচিত ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

—

ক্ষয়িষ্ণু বাংলা

১৩৩০ সালের চৈত্রের প্রবাসীতে আমরা পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম এবং দেখাইয়াছিলাম বাঁকুড়া জেলা তাহাদের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতম। এই অবস্থার প্রতিকারের উপায়ও কিছু কিছু আমরা অনেক বার আলোচনা করিয়াছি। একটি উপায়—কৃষি-ক্ষেত্রে জলসেচন—সম্বন্ধে আমরা বারংবার লিখিয়াছি যে, পঞ্জাব প্রদেশে গবন্মে‍র্ণ্ট তেত্রিশ কোটি টাকা কৃত্রিম জল-প্রণালীর জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন, পরে বৎসরাধিক পূর্বে আরও নয় কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা হইয়াছে। অন্য কোন কোন প্রদেশে জলসেচনের নিমিত্ত পূর্তকার্যে কুড়ি-বাইশ কোটি টাকা করিয়া খরচ হইয়াছে।' বঙ্গে অল্প দিন আগে পর্যন্তও এই কাজে এক কোটিও খরচ হয় নাই।

কয়েক দিন হইল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দামোদরের একটা খাল কাটিয়া বহু লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচন করিবার একটা পরিকল্পনা মঞ্জুর করান হইয়াছে। ব্যয় হইবে আনুমানিক ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এই টাকা সেচন দ্বারা উপকৃত লোকদিগকে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিয়া সুদে-আসলে শোধ করিতে হইবে। ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল এই অতি যুক্তিসঙ্গত সংশোধক প্রস্তাব করেন যে, খাল ও তাহার শাখাগুলা প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইবার পূর্বে ট্যাক্সের হার সম্বন্ধে যেন ব্যবস্থাপক সভার মত লওয়া হয়, কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাব না-মঞ্জুর হইয়া যায়।

জলসেচন-প্রণালী দ্বারা মজা হাজা নদী ও জমির পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া বঙ্গের জন্য হইয়া আসিতেছে। প্রবাসীতে ও মডার্ণ রিভিয়ুতে এ বিষয়ে ঢের লেখালেখি হইয়াছে, ডক্টর মেঘনাদ সাহা মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছেন, তাহার আগে "আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মারক গ্রন্থে" এ বিষয়ে একটি বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। শতাধিক বৎসরের পরিকল্পনার ও আলোচনার ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। দেখা যাক, নবীনতম পরিকল্পনায় কোন কাজ হয়, না উহা শুধু মন্ত্রীদের ভোটসংগ্রহের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার নবপ্রকাশিত "বাঙ্‌লা ও বাঙালী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে যেখানে যত মরা নদীর ধ্বংসাবশেষ রুদ্ধ স্রোতোহীন বিল ও খাল রূপে দেখা যায়, এবং গ্রামে গ্রামে যেখানে যত পঙ্কিল জলাশয় আছে, সেখানে ভরা নদী হইতে নূতন জল আনিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ভূমিও পলিমাটি পাইয়া উর্ব্বরা হইবে। খাল, বিল জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার হইলে মৎস্যের চাষ বাড়িবে ও মশককুলও বিনষ্ট হইবে। চারি দিকে এখন কৃষির যে অবনতি ও দৈন্য দেখা দিয়াছে তাহার এবং নদীর বন্যারও প্রতিরোধ হইবে।"

রাধাকমলবাবু যে উপায় বলিয়াছেন, তাহা সেই সব অঞ্চলের পক্ষে মোটের উপর ঠিক্ যাহার মধ্য দিয়া এরূপ "ভরা নদী" প্রবাহিত যাহা বর্ষার কয়েক দিন ছাড়া অন্য সময়েও ভরা থাকে। সে-সব জায়গাতেও উহা আগেকার নদীর ধ্বংসাবশেষ খাল বিলের পক্ষেই প্রধানতঃ প্রযোজ্য, ভরা নদী হইতে দূরবর্ত্তী জলাশয় সম্বন্ধে সহজে ও অনতিব্যয়ে প্রযোজ্য নহে। অন্য যে-সকল অঞ্চলের—যেমন বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশের অনেক অঞ্চলের—মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীতে কেবল বর্ষার অল্প কয়েক দিনই সাঁতার-জল বা তাহা অপেক্ষা কম জল থাকে, সে সব অঞ্চলে তাঁহার বর্ণিত উপায়টি খাটিবে না, অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলেও, উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের যে-সব অঞ্চলে তাঁহার বর্ণিত উপায়টি অবলম্বিত হইতে পারে, তথায় অবলম্বিত হইলে বাংলা দেশের উপকার হইবে।

—

বিধবাবিবাহ-প্রবর্তক বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক এসেমব্লীতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস একটি বিধবাবিবাহ-প্রবর্তক বিল পেশ করিয়াছেন। বালিকা ও নিঃসন্তান যুবতী বিধবাদের বিবাহের অবাধ প্রচলন একান্ত আবশ্যক। তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও সহানুভূতিপূর্ণ সামাজিক ব্যবহারের জন্য ইহা আবশ্যক, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত ইহা আবশ্যক, লোক-সংখ্যার যথোচিত বৃদ্ধি ও সমতা রক্ষার নিমিত্ত ইহা আবশ্যক, এবং বিবাহযোগ্যা পাত্রীর অভাবে ক্ষয়িষ্ণু কোন কোন হিন্দু জা'তকে (casteকে) বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহা আবশ্যক।

দাস মহাশয়ের বিলের একটি ধারার আমরা সমর্থন করি না। তিনি চান যে, বিপত্নীকরা বিধবা ভিন্ন অন্য কোন নারীকে বিবাহ করিতে পারিবে না। বিপত্নীক-দের বিধবা বিবাহ করা বাঞ্ছনীয় হইলেও, বিপত্নীকদের সহিত কুমারীদিগের এবং কুমারদের বিধবাদিগের সহিত বিবাহ হইবার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

স্থলবিশেষে সসন্তানা যুবতী বিধবাদেরও বিবাহের স্বাধীনতা থাকা উচিত—যদিও ইহা অধিকাংশ স্থলে বাঞ্ছনীয় নহে এবং ঘটিবেও না।

বরপণ-নিবারক বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক এসেমব্লীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস একটি বিল পেশ করিয়াছেন যাহার প্রধান ধারা এই যে, কেহ ৫১৲ টাকা বা তাহার সমান মূল্যের যৌতুক অপেক্ষা অধিক পণ দিতে বা লইতে পারিবে না, দিলে বা লইলে, তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে।

বরপণ-প্রথার উচ্ছেদের নিমিত্ত সকল প্রকার বৈধ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। একক কোন উপায়ই সম্পূর্ণ ফলপ্রদ না-হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক বৈধ উপায়েই কিছু ফল হইবে। সুতরাং এ-বিষয়ে আইন করাও যুক্তিসঙ্গত।

বঙ্গে জাহাজনির্ম্মাণে সরকারী উৎসাহের দাবী

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক কৌন্সিলে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস এই প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গে জাহাজ-নির্ম্মাণে গবন্মেণ্টের সকল রকম সুবিধা, সাহায্য ও উৎসাহ তদর্থে গঠিত ভারতীয় কোম্পানীদিগকে দেওয়া উচিত। প্রস্তাবটি নীচে উদ্ধৃত হইল।

"This Council is of opinion, that the Government of Bengal should move the Government of India to establish as early as possible a ship-building industry in Bengal and also to encourage it by the grant of construction bounties and by advancing cheap loans and assisting the acquisition of suitable sites and by guaranteeing all Government and Port Trust works in connexion with shipping to associations of competent Indians formed into companies for the building of ships in Bengal."

বোম্বাইয়ের সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশ্যন কোম্পানী কলিকাতায় জাহাজ-নির্ম্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে জায়গাটি যেরূপ খাজনায় লইতে চাহিয়াছিলেন, পোর্ট ট্রাস্ট সেরূপ খাজনায় তাহা দিতে স্বীকৃত না-হওয়ায় উক্ত কোম্পানী কলিকাতার পরিবর্তে বিজাগাপাটমে জায়গা লইয়াছেন। তাঁহারা সেখানেই জাহাজ নির্ম্মাণ করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের নির্বাচিত জায়গাটি কলিকাতায় না পাওয়ায় বঙ্গে সদ্য সদ্য ভারতীয় মূলধনে ও অধ্যক্ষতায় জাহাজ-নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইল না। সিন্ধিয়া কোম্পানীর যেরূপ প্রচুর মূলধন আছে, তাহা সংগ্রহ করা সহজ নহে—বিশেষ করিয়া বঙ্গে। কিন্তু সিন্ধিয়া কোম্পা-নীর কারখানা যে বাংলা দেশে হইল না, ইহা সকল দিক দিয়াই যে দুঃখেরই বিষয় তাহা নহে। বোম্বাইয়ের ঐ কোম্পানী এখানে কাজ আরম্ভ করিলে তাহাতে বাঙালী-দের কোন লাভ বা অন্য কোন সুবিধা হইত না। বাঙালীরা যদি সুবিধা চান, যদি লাভবান হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দলবদ্ধভাবে মূলধন সংগ্রহে এখনই লাগিয়া যাইতে হইবে। জাহাজ-নির্ম্মাণের কিছু অভিজ্ঞতা আছে এরূপ বাঙালী চট্টগ্রামে আছেন, ব্রহ্ম-দেশেও বোধ হয় আছেন। অবিলম্বে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করা হউক।

বঙ্গে একটি জৈন উৎসব

জৈনদিগের পবিত্র "পর্য্যুষণ" উপলক্ষে তরুণ জৈন সংঘ কলিকাতায় কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করিয়া-

ছিলেন। শ্রীযুক্ত গগনবিহারী মেহতা "প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও পুরোহিত" (Prophets and Priests) সম্বন্ধে এক দিন চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করেন, ডক্টর কালিদাস নাগ "বিশ্ব-সংস্কৃতিতে জৈনধর্ম্মের স্থান" সম্বন্ধে একটি বহুতথ্যপূর্ণ ও দ্যোতনাসম্বলিত প্রবন্ধ পাঠ করেন, কাকা কলেলকর "অহিংসা ও বিশ্ববিপ্লব" এবং পণ্ডিত দরবারীলাল "ধর্ম্ম এবং তাহার মতবাদ ও আচরণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষোক্ত দুটি বক্তৃতার রাত্রে আমি সভাপতি ছিলাম, কিন্তু অনেক রাত্রি হইয়া যাওয়ায় আমার বক্তব্য বলি নাই। জৈনধর্ম্ম যে বঙ্গে প্রাচীন কালে বাঙালীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার কিছু প্রমাণ দিয়া আমি প্রস্তাব করিতে চাহিয়াছিলাম, যে, যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক সংস্কৃতির অনুশীলনের ব্যবস্থা হইতেছে এবং বিশ্বভারতীতে ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছে, সেইরূপ জৈনেরা জৈনসংস্কৃতি অনুশীলনের ব্যবস্থা করুন। যাহা হউক, ডক্টর কালিদাস নাগ নিম্নোদ্ধৃত বিস্তৃততর কর্ম্মপদ্ধতিটি জৈন সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। ইহা দৈনিক "ভারত" প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) দক্ষিণ ও উত্তর ভারত হইতে জৈন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে একত্র করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম নিখিল ভারত জৈন কংগ্রেসের (অথবা সম্মিলনীর) ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য একটা ক্ষুদ্র কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হউক।

(২) সমস্ত বিখ্যাত শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া কলিকাতায় একটি জৈন যুবক সমিতি গঠিত হউক এবং নিখিল ভারত জৈন কংগ্রেসে জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন জৈন পরিষদ ও প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রাথমিক রিপোর্ট ও মন্তব্য প্রস্তুত করিবার ভার উক্ত সমিতির উপর অর্পিত হউক।

(৩) জৈন প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যেক জৈন কর্ম্মীর মধ্যে সংস্পর্শ বজায় রাখিবার জন্য মাসিক সংবাদ-ইস্তাহার কলিকাতা হইতে হিন্দী ও ইংরাজীতে প্রকাশিত হউক।

(৪) জৈন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা ও পাঠের জন্য জনসাধারণকে, বিশেষ ভাবে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষকগণকে উৎসাহ দানের জন্য কলিকাতায় একটি নাতিবৃহৎ আলোচনীয় পুস্তকালয় ও পাঠাগার খোলা হউক।

(৫) সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে জৈনদের বিখ্যাত তীর্থস্থান, মন্দির ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের একটি তালিকা সঙ্কলিত হউক এবং সম্ভবপর হইলে এই সমস্ত বিষয়ে লণ্ঠন ও আলোকচিত্রের সাহায্যে জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হউক।

(৬) জৈন পুস্তকালয় ও সংবাদ বিভাগের অবস্থানের নিকটে যে কোন সাধারণ জৈন অট্টালিকায় অথবা কোন নূতন প্রতিষ্ঠানে জৈন চারুকলা ও প্রত্নবিদ্যার একটি ক্ষুদ্রায়তন জাদুঘর খোলা হইবে। জৈন হস্তলিপি চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য চারুকলার সাময়িক প্রদর্শনীর আয়োজন জৈন জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় হইতে পারে।

(৭) নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির ব্যবস্থার জন্য একটা কেন্দ্রীয় জৈন গবেষণা-ভাণ্ডার সৃষ্টি করা হউক :—

(ক) জৈন দর্শন চারুকলা ও সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞ সপ্রতিষ্ঠ গবেষকের জন্য কয়েকটি বৃত্তি।

(খ) জৈনধর্ম্মের নীতি, বিশেষ ভাবে সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলের জন্য অহিংসার অমর কাহিনী পরিব্যাপ্ত করিতে যে-সমস্ত জনপ্রিয় পুস্তক সাহায্য করিবে তাহা সংগ্রহ।

(গ) বাংলার বাহির হইতে এবং বিদেশ হইতে যে-সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিতরা বিশেষভাবে জৈনধর্ম্ম ও জৈনসংস্কৃতির সম্বন্ধে মূল জ্ঞানলাভ করিতে আসেন তাঁহাদের অবস্থানের জন্য এবং অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতায় একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে একটি আন্তর্জ্জাতিক অতিথিভবন স্থাপন। এইরূপ অতিথিপরায়ণ কেন্দ্র জৈনসম্প্রদায়ের কৃতিত্ব বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত করিবে এবং বহির্জ্জগতের জৈন সমর্থকদের সঙ্গে ভারতীয় জৈনদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে ঘনিষ্ঠতর করিবে।

—

বঙ্গের হাতের তাঁতের কাপড়

গত বৎসর ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত প্রভৃতির উদ্যোগে যেমন কলিকাতার ওএলিংটন স্কোয়্যারের নিকট বাংলার হাতের তাঁতের কাপড়ের একটি প্রদর্শনী দুর্গাপূজার এক মাস আগে হইতে খোলা হইয়াছিল, এ বৎসরও সেইরূপ প্রদর্শনী সেইখানে প্রবাসীর সম্পাদকের সভাপতিত্বে সভা করিয়া খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত ভবতারণ সরকার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মঠ, শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। বঙ্গের তন্তুবায়েরা পুরুষানুক্রমে বয়নের কাজ করিয়া যে শিল্পনৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, তাহা নষ্ট হইতে

দেওয়া উচিত নহে। বাংলা দেশেই প্রস্তুত সুতা তাঁহারা উচিত মূল্যে পাইলে এবং তাহাদের বোনা কাপড় সর্বত্র বিক্রীর বন্দোবস্ত করিলে মিলের কাপড়ের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও হাতের তাঁতের কাপড় টিকিয়া থাকিতে পারে। তাহাতে বহুলক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। বর্তমানে কলের কাপড় ও সস্তা হাতের তাঁতের কাপড়ের মূল্যে তফাৎ বেশি নয়; অথচ তাঁতের কাপড় বেশি টেঁকসই ও সুন্দর। যে-সব উপায়ে কোম্পানীর আমলে আমাদের তাঁতীদের ব্যবসা নষ্ট করা হয়, হেমেন্দ্রবাবু তাহার একটির উল্লেখ করেন এবং তদ্বিষয়ক একটি পুরাতন পুস্তক দেখান। আমাদের দেশী সুতী রেশমী ও পশমী কাপড়ের ১৮ ভল্যুম্ নমুনা বিলাতী তাঁতীদের সুবিধার নিমিত্ত ভারতবর্ষেরই ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার বৃত্তান্ত স্বর্গগত মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের রুইন অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজী পুস্তকে আছে।

ভারতীয় ভাষাসমূহে সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

সারা ভারতের জন্য একটি সরকারী কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিষয়ক পরামর্শদাতা বোর্ড আছে। গত ৬ই ও ৭ই মে সিমলায় ঐ বোর্ডের যে অধিবেশন হয় তাহাতে ভারতীয় বর্তমান সকল ভাষায় একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়। বোর্ড এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং এই মত প্রকাশ করেন যে, ইংরেজী পরিভাষার অনুসরণ দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সর্বোত্তমরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। "ইংরেজী পরিভাষার অনুসরণ" ("following the English terminology") কথাগুলি তাঁহারা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন জানি না। তাঁহারা এ বিষয়ে বোম্বাইয়ের শিক্ষা-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টরের একটি নোটকে ভিত্তি করিয়া বিষয়টির বিচার করেন। সেই নোটটিতে আছে যে, ভারতীয় ভাষাগুলির পরিভাষার প্রধান অংশ ইংরেজী পরিভাষা হইতে ধার করা হইবে ("should be borrowed extensively from the English terminology") এবং প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার পরিভাষার অতি অল্প একটি অংশ ("a very small section") দেশী ও তাহার নিজস্ব হইবে। চমৎকার ফতোআ।

বোর্ড আট জন সভ্যের একটি কমীটি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন এই বিষয়টি সম্যক্ আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত। এই কমীটির সভাপতি সর্ আকবর হাইদারী। এই কমীটিতে কোন বাঙালী নাই, বাংলা দেশের "প্রতিনিধিত্ব" করিবার নিমিত্ত বঙ্গের কোনও সরকারী ইংরেজ কর্মচারীও নাই। বোর্ড বোধ হয় জানেন না যে, বাংলা দেশের একটা ভাষা ও সাহিত্য আছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আগেই একটি পরিভাষা কমীটি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ঐ কমীটি অনেক কাজ করিয়াছেন।

আমরা বাঙালীরা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে নগণ্য মনে করি না। কিন্তু ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যেমন সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা দ্বারা বাংলা দেশকে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে শক্তিহীন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্যে ও জ্ঞানরাজ্যেও কি বাংলা দেশকে উপেক্ষা করিয়া কোণঠাসা করিতে চান?

আট জন সভ্যের কমীটিকে অন্য সভ্য লইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহার মরজি হইলে কোন বাঙালী তাহাতে স্থান পাইতেও পারে। কিন্তু প্রথমেই, বোর্ড যে বাংলা দেশকে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ছাঁটিয়া দিয়াছেন, ইহার প্রচ্ছন্ন অর্থ ও উদ্দেশ্য থাকা অসম্ভব নহে।

এই বিষয়টি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত তথ্য সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়টির প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মৌলবী হকের খোলা চিঠির খোলা জবাব

প্রাদেশিক কংগ্রেসী গবন্মেণ্টগুলা মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে, এই অভিযোগ মুসলিম লীগ-ওআলারা বারংবার তারস্বরে করিলেও তাহার একটা দৃষ্টান্তও প্রমাণ করিতে না পারায়—হয়ত, মনে মনে—একটু অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিলেন। এ হেন সময়ে

মধ্য প্রদেশের হাইকোর্টের একটা মোকদ্দমার রায় পড়িয়া বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী সোল্লাসে মহাত্মা গান্ধীকে একটা খোলা চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ধারণা বা ধারণার ভান, তাহাতে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, ঐ প্রদেশের হিন্দু কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কতকগুলি নির্দোষ মুসলমানকে ফাঁসীকাঠে চড়াইতে চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজী এই খোলা চিঠির খোলা জবাব দিয়া দেখাইয়াছেন, হক সাহেবের উল্লাসের কোন কারণ নাই। গান্ধীজী ইহাও বলিয়াছেন যে, বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে চিঠি লিখিবার আগেই 'হরিজন' পত্রিকায় এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য বাহির হইয়া গিয়াছিল।

'হরিজন' কাগজ হইতে গান্ধীজীর প্রবন্ধ বিস্তর কাগজে উদ্ধৃত বা অনুবাদিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পুনর্মুদ্রণ এখানে অনাবশ্যক।

গান্ধীজী ভিন্ন আরও অনেকে হক সাহেবের চিঠির সমুচিত উত্তর দিয়াছেন।

আসাম প্রদেশের বাঙালী

ভৌগোলিক ও ভাষিক বঙ্গের কতক অংশ—যেমন শ্রীহট্ট জেলা—আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অসমিয়া-ভাষাভাষী অনেকে এই জেলাটিকে পুনর্বার বাংলাদেশভুক্ত দেখিতে ইচ্ছুক।

বঙ্গের কিয়দংশ আসামপ্রদেশভুক্ত হওয়ায় এবং আসাম প্রদেশের অন্যান্য অংশেও অনেক বাঙালী থাকায় ও যাওয়ায় ফল এই হইয়াছে যে, আসাম প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৩ জন বাংলা-ভাষী এবং শতকরা ২১·৬ জন অসমিয়া-ভাষী। অর্থাৎ প্রদেশটির নাম যদিও আসাম, কিন্তু এখানে অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহে। সমস্ত আসাম প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু তাহার সেই অংশটির কথা ধরা যায় যাহাকে খাস্ আসাম বা আসাম উপত্যকা বলে, তাহা হইলে দেখি সেখানেও অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ অর্ধেকের উপর কিম্বা অন্ততঃ অর্ধেকও নহেন। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে তাঁহারা শতকরা ৪১ জন, বাঙালীরা প্রায় শতকরা ২৩ জন, বাকী শতকরা ৩৬ জন অন্য নানা ভাষাভাষী।

আসাম প্রদেশে বা খাস আসামে অসমিয়া-ভাষীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহেন বলিয়া, সমগ্র প্রদেশে বাঙালীদের সংখ্যা তাঁহাদের প্রায় দ্বিগুণ বলিয়া, তথাকার বাঙালীরা সেখানে প্রভুত্ব করিতে বা তথাকার প্রধান অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইতে চান না। অসমিয়া-ভাষীদের ও তাঁহাদের ভাষাসাহিত্য-সংস্কৃতির পূর্ণ উন্নতি হওয়াতে তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। শিল্প-বাণিজ্যে ও কৃষিতে এবং সরকারী চাকরীতে অসমিয়া-ভাষীরা পূর্ণ সুযোগ ও অধিকার প্রাপ্ত হউন, ইহাও বাঙালীরা চান। কিন্তু তাঁহারা ইহাও চান যে, যেহেতু তাঁহারাও ভারতবর্ষের মহাজাতির, জানপদ-বর্গের ও পৌরজনের অংশ এবং যেহেতু তাঁহারাও আসাম প্রদেশেরও অধিবাসী, সেই জন্য তাঁহাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিনষ্ট বা খর্ব করিবার কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ চেষ্টা হইবে না, তাঁহাদের সন্তানেরা মাতৃভাষায় শিক্ষা পাইবে, তাঁহারা ন্যায্য মূল্যে জমি লইয়া ঘর-বাড়ী চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবেন, এবং যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকরী তাঁহারা পাইবেন। এই সকল ও অন্য কোন কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ নানা বাধাবিঘ্ন ঘটায় এই বৎসর ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আসাম প্রদেশের পৌরজন-সভার (Assam Citizens' Assocation এর) একটি কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। আগেও এরূপ একাধিক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। এই বৎসরের কন্‌ফারেন্সটিতে ২১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎসমুদয়ের ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের বৃত্তান্ত সম্বলিত একটি রিপোর্ট সভা ইংরেজীতে বাহির করিয়াছেন। রাধাকুমুদ বাবু তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলির বিষয় এই :—

Citizenship of Assam irrespective of race, language and religion; Fundamental Rights of Citizenship; No Discrimination among Assam Nationals to be made in grants of Licenses, Leases, Contracts, Ferries, Hats Pounds, Fisheries, etc.; No similar Discrimination in Recruitment to Public Services; Fundamental Linguistic Fact and Medium of Instruction; Census Operations; Nominations to Local Bodies; No Discrimination in the Award of Scholarships and Stipends; No Discrimination in appointments to private concerns.

সমুদয় প্রস্তাবই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত।

অশীতিপর অধ্যাপক কার্বের লঘু শ্রম

পুনার অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্বে মহাশয় কীর্ত্তিমান পুরুষ। তিনি পুনার বিখ্যাত হিন্দু বিধবা-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং পুনা ও বোম্বাইয়ের শ্রীমতী নাথীবাঈ দামোদর ঠাকরসী ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বোম্বাইয়ের পরলোকগত ধনী বণিক বিঠলদাস দামোদর ঠাকরসী পনর লক্ষ টাকা দান করিয়া আপনার মায়ের নাম অনুসারে তাহার নামকরণ করাইয়াছিলেন।

অধ্যাপক কার্বের বয়স এখন ৮২র উপর। ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার এখনও যোগ আছে, কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ তাহা পরিচালনের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্থির করেন, বৃদ্ধ বয়সে দিবসের কতকটা অংশ কাজে ব্যাপৃত থাকিবার মত "লঘু শ্রম" তাঁহার পক্ষে আবশ্যক। এই জন্য তিনি মহারাষ্ট্র গ্রামিক প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির আয় হইতে ছোট ছোট অনেক গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাহায্য করা হয়, কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়কে বাঁচাইয়া রাখিবার বা চালাইবার নিমিত্ত সমিতি দায়ী নহেন।

কার্বে মহাশয় প্রত্যহ দুই ঘণ্টা পুনার দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। সঙ্গে এক জন যুবক স্বেচ্ছাসেবক থাকেন। নগরবাসীরা দুই-চারি পয়সা এক আনা দুই আনা যিনি যাহা দেন, অধ্যাপক মহাশয় কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা লইয়া সমিতির কাজে ব্যয় করেন।

ইহাই তাঁহার "লঘু শ্রম"। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক দেশভক্তেরা সকলেই তাঁহার মত লঘু শ্রম করিলে স্বয়ং ধন্য হইবেন এবং দেশ উপকৃত হইবে। যাঁহারা কোন প্রতিষ্ঠানের বা জনহিতকর কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত, তাঁহারা বড় বড় দান পাইলে অবশ্যই লইবেন, কিন্তু দুই চারি পয়সা যেন অগ্রাহ্য না করেন। অধ্যাপক মহাশয় ১৫ লক্ষ টাকা মবলগ দান যেমন কৃতজ্ঞচিত্তে লইয়াছিলেন, এক আনাও সেইরূপ সাদরে গ্রহণ করেন।

সম্মাননীয়া প্রফুল্লময়ী দেবী

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ পরলোকগত বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ও পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতা শ্রীযুক্তা প্রফুল্লময়ী দেবী চুরাশি বৎসর বয়সে ঠাকুর-পরিবারের জোড়াসাঁকোস্থিত ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতীতের সহিত তাঁহাদের আর একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইল। প্রফুল্লময়ী দেবীর কিছু পুরাস্মৃতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

নাগপুরে বাঙালী হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ

গত ২৬শে আগস্ট নাগপুর হিন্দু-যুবকসভার উদ্যোগে তথাকার বেঙ্কটেশ থিয়েটারে এক বিরাট সভায় বঙ্গের মন্ত্রীদের কূটনীতির নিন্দাজ্ঞাপক নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

"This mass meeting of the Hindus records its emphatic protest against the anti-Hindu policy of the Muslim ministry in Bengal and further demands that H. E. the Viceroy and H. E. the Governor of Bengal should intervene at this stage and stop the passing of the highly controversial bills which are before the Bengal Assembly in view of the disturbed conditions arising out of the European war."

নাগপুরের সভায় যাঁহারা এই প্রস্তাবটি উত্থাপন ও সমর্থন করেন, তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, বঙ্গের হিন্দুরা তাঁহাদের প্রতি ন্যায়বিরুদ্ধ ও গর্হিত ব্যবহারের প্রতিকারের নিমিত্ত যদি কোন সক্রিয় উপায় ("direct action") অবলম্বন করেন, তাহা হইলে মধ্যপ্রদেশের হিন্দু যুবকেরা তাঁহাদিগকে অর্থ ও সত্যাগ্রহী যোগাইয়া সাহায্য করিবেন, যেমন তাঁহারা হায়দরাবাদের হিন্দুদের জন্য করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক দেশপাণ্ডে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রসঙ্গে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের আন্দোলনের উল্লেখ করেন এবং বলেন, মহারাষ্ট্রের নেতা লোকমান্য টিলক বাঙালীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা সত্য কথা যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙালীদের দুঃখ যেরূপ আপনাদের বলিয়া অনুভব করেন, অন্য কোন প্রদেশের লোক সেরূপ করেন না।

দেশপাণ্ডে মহাশয় বাঙালীদের অনেক প্রশংসা করেন। তাহা উদ্ধৃত করিব না। কিন্তু তাঁহার একটি কথা প্রশংসাসূচক হইলেও উদ্ধৃত করিব এই আশায় ও এই ইচ্ছায় যে, আমাদের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি আছে আমরা যেন তাঁহাদের প্রীতির যোগ্য হইতে ও থাকিতে পারি।

দেশপাণ্ডে মহাশয় বলেন :—

Bengal is the hope of India's freedom. Once the Hindus in Bengal are crippled and made weak, all the hope of Purna Swarajya is lost. What Kipling said of England is equally true of Bengal: "Who stands if Bengal falls?" and "Who falls if Bengal stands?"

"তাৎপর্য্য। বাংলাই ভারতের স্বাধীনতার ভরসা। যদি বঙ্গের হিন্দুরা পঙ্গু ও দুর্বল হয়, তাহা হইলে পূর্ণ স্বরাজ্যের সব আশা নির্মূল হইবে। কিপলিং ইংলণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন বঙ্গের সম্বন্ধেও তাহা সমান সত্য :—"যদি বঙ্গের পতন হয়, কে দাঁড়াইয়া থাকিবে?" "যদি বাংলা দাঁড়াইয়া থাকে, কাহার পতন হইবে?"

—

দেশের ডাকে সাড়া দিতে ছাত্রদিগকে আহ্বান

এলাহাবাদ, ৯ই সেপ্টেম্বর।—"দেশের সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থায় ছাত্রগণ রাজনীতির সহিত জড়িত থাকে না. তখন পড়াশুনায় সময় অতিবাহিত করাই ছাত্রগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি অস্বাভাবিক। দেশ আজ জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন। দেশের সম্মান রক্ষা আজ সকলের বড় কথা। এই সময় ছাত্রগণের একমাত্র কর্ত্তব্য দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া। সেই দিন আজ উপস্থিত হইয়াছে।" এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রদত্ত এক মানপত্রের উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক সভায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উপরিউক্তরূপ বক্তৃতা দেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন যে, তাহারা যেন ভাবাবেগে না চলে—বাস্তবতার দিক হইতে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া যেন তাহারা সমস্যার সমাধান করিতে সচেষ্ট হয়।

ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু বলেন, "শক্তি-পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। এই শক্তি-পরীক্ষা অতি কঠোর হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি ছাত্রদিগকে এই জন্য প্রস্তুত করিতে না পারিয়া থাকে, তবে ছাত্রগণের শিক্ষা বৃথা, শিক্ষা-প্রণালী গলদপূর্ণ।" পণ্ডিতজী আরও বলেন, "বর্ত্তমানের বিপ্লবমুখী দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল দিনে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন প্রধান কথা নয়। হিন্দু মুসলমান যে-ই প্রশ্ন তুলুক, তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিবার সময় আর তাঁহার নাই।" ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে অতীতের বস্তু বলিয়া পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন যে, মিঃ আমেরি এখনো উনবিংশ শতাব্দীর কথা বলিতেছেন। —এ, পি,

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ছাত্রদিগকে যে দেশের ডাকে সাড়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন, প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদিগের প্রতি সেই অনুরোধ আমরা সাধারণ ভাবে সমর্থন করি। অধিকন্তু তাহার উপর বলি, অন্য সব প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরও এই ডাকে সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য—সাড়া দিবার সমস্ত বোঝাটা ছাত্রদের ঘাড়ে পড়া উচিত নয়।

সাম্প্রদায়িকতাপ্রসূত সমস্যা সম্বন্ধে আমাদিগকে একটু ভিন্ন মতের কথা বলিতে হইবে।

সিন্ধুদেশ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল প্রদেশের অনেক স্থলে সাম্প্রদায়িক কারণেই অনেকের মান-ইজ্জৎ ধন-প্রাণ বিপন্ন। তজ্জন্য তাহারা ব্যতিব্যস্ত। রাজনৈতিক কারণে যদি সমস্ত দেশবাসীর জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে বা হয়, তাহা হইলেও ঐ বিপন্ন লোকদের প্রাণ লইয়া নূতন করিয়া টানাটানি কি প্রকারে হইবে? তাহাদের প্রত্যেকের প্রাণ ত একটা মাত্র। একাধিক প্রাণ ত কাহারও নাই, যে, সাম্প্রদায়িক কারণে উদ্ভূত জীবন-মরণ সমস্যার উপর আবার রাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় দফা জীবন-মরণ সমস্যার আবির্ভাব হইবে।

সাম্প্রদায়িক কারণে বাঙালী হিন্দুরা বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত আজ বলিয়া নয়, অনেক দিন হইতে। বাঙালী হিন্দু ও বাংলা দেশ যাইতে বসিয়াছে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতায় বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত বঙ্গের বাস্তব সাহায্য কোন দিন করেন নাই, তাঁহারা আজ অন্য জীবন-মরণ সমস্যার কথা তুলিলে, সে-কথা বঙ্গের কংগ্রেসওআলাদের কানে ঢুকিতে পারে, অন্যদের কানে ঢুকিবে না। বাঙালী হিন্দুরা বলিতে পারে, "রামে মারিলেও আমরা মরিব, রাবণে মারিলেও আমরা

মরিব; রাখিয়া দাও তোমার উচ্চ রাজনীতির কথা।"

বাঙালী হিন্দুরা যেন জার্মেনীর ইহুদী। জার্ম্যান ইহুদীরা ও তাহাদের বাপ পিতামহ প্রপিতামহ জার্মেনীর মানুষ। কিন্তু জার্মেনী তাহাদিগকে নিজের বলিয়া স্বীকার ত করিলই না, অধিকন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। বাঙালী হিন্দুরা বাংলা দেশ হইতে তাড়িত এখনও হয় নাই বটে, ভারতবর্ষ হইতেও তাড়িত হয় নাই বটে; কিন্তু বাংলা দেশে তাহারা সরকারী ব্যবহার এরূপ পাইতেছে যেন তাহারা বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই। বঙ্গের বাহিরেও তাহাদের সেই দশা। বিহার প্রদেশে, যুক্ত-প্রদেশে, আসামে, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য উৎপীড়িত; তাহারা যদি চাকরী পায়, সেটা তাহাদের উপর দয়া; যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে, সেটাও অন্যদের দয়া; বৈজ্ঞানিক সরকারী পরিভাষা হইবে, সেখানে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি কেহ নাই। তাহারা যেমন বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই, তেমনই ভারতবর্ষেরও কেউ নয়, ভারতবর্ষের জন্যও কখনও কিছু করে নাই। সুতরাং যেমন, যদি জার্মান ইহুদীদিগকে কেহ বলিত, "ওহে, দেশের জন্য কিছু কর," তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, "আমাদের দেশ কোথায়?", সেইরূপ যদি কেহ, বাঙালী হিন্দুদিগকে বলে, "দেশের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, দেশের জন্য কিছু কর", তাহারাও বলিতে পারে, "কোথায় আমাদের দেশ?"

—

ছাত্রছাত্রীদের চিত্রপ্রদর্শনী

কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা-য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে এবং কলিকাতার কোন কোন কলেজে চিত্রপ্রদর্শনী হইতেছে। যাঁহারা বিশেষ করিয়া চিত্রবিদ্যারই শিক্ষার্থী নহেন, এরূপ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও অভিনিবেশ সহকারে ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের প্রধান প্রধান চিত্রসমূহের উৎকর্ষ ও রস অনুভব করিতে পারা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। আশা করি, এই সকল প্রদর্শনীতে এই দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। এই প্রদর্শনীগুলিতে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের আঁকা ছবিই থাকে, না বাহিরের চিত্রকরদের ছবিও থাকে, তাহা জানি না; কারণ, অবসর অভাবে এই প্রদর্শনীগুলি দেখিবার সুযোগ পাই নাই। সম্ভবতঃ প্রধানতঃ ছাত্রছাত্রীদের নিজের আঁকা ছবিই থাকে। যাঁহারা অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কন-বিদ্যার চর্চা করিতেছেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা অধিকতর সংস্কৃতিমান্ হইবেন।

—

শ্রীমতী ইলা দেবী

তরুণ বয়সে শ্রীমতী ইলা দেবীর মৃত্যু হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার যে-সেবা পাইয়া উপকৃত হইতে



শ্রীমতী ইলা দেবী

পারিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় বাংলা-দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং "যে ঘরে হ'ল না খেলা"

নামক একটি উপন্যাস ও "ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া" নামক একটি গল্পগুচ্ছ এবং তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত সুধাংশু-কুমার হালদার মহাশয়ের সহযোগিতায় "সপ্তক" নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই অল্প কয়েকটি রচনা হইতেই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বুঝা গিয়াছিল। ডক্টর কালিদাস নাগ প্রবাসীতে তাঁহার গল্পগুচ্ছটির সপ্রশংস সমালোচনা করিয়াছিলেন।

—

প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর জন্য রচনা প্রেরণ সম্বন্ধে অনুরোধ

আমার সম্পাদিত দুইখানি কাগজের নিমিত্ত বাংলা ও ইংরেজী রচনা আমার বাসায় না পাঠাইয়া আমাদের কার্যালয়ে প্রেরণ করাই শ্রেয়ঃ। আমি যদি কাহাকেও আমার বাসায় রচনা পাঠাইতে বলিয়া থাকি বা বলি, তাহা হইলে তিনি অবশ্য বাসাতেই পাঠাইবেন। রচনা যাহাতে সহজে পড়া যায়, কাগজের এক পৃষ্ঠায় তাহা সেইরূপ ভাবে টাইপলিখিত বা হস্তলিখিত হইলে বাধিত হইব।

—

স্বাধীনতা ও সাহিত্য

একটি ইংরেজী দৈনিকে দেখিলাম, গত ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে ছাত্রছাত্রীদিগের সাহিত্যিক কন্‌ফারেন্সের তৃতীয় বৈঠকে "স্বাধীনতা ও সাহিত্য" (Freedom and Literature) বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বাগচী, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বসু এবং সভাপতি ডক্টর কালিদাস নাগ নিজ নিজ বক্তব্য বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য মানুষের অন্তরের বহিঃপ্রকাশ। মনের পূর্ণ প্রকাশ রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও বৈয়ক্তিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। সুতরাং সাহিত্যের উৎকর্ষ স্বাধীনতা থাকার উপর নির্ভর করে। আবার, উৎকৃষ্ট সাহিত্যও মানুষকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার সমার্থক নহে।

জাতি মহৎ না হইলে সাহিত্য মহৎ হয় না। মহত্তম সাহিত্যের একটি লক্ষণ এই যে, তাহা দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সকলের হৃদয়মন স্পর্শ করিতে পারে।

—

ভ্রম-সংশোধন

শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে উপাধি দানের বিবরণে গত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এই অনুষ্ঠানে মাল্যচন্দন দিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিচারপতি হেণ্ডার্সন সাহেব এই অনুষ্ঠানে যে লাটিন বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রচিত ও মুদ্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছিল, সর্ মরিস গোয়াইয়ার উহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মূল লাটিন বক্তৃতাটি যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রচিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা আমরা জানিতাম না। ঐ বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলী যে রবীন্দ্রনাথকে এত গভীরভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়।

—

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী সুষমা লাহিড়ী জানাইতেছেন, 'গত শ্রাবণের প্রবাসীতে "দি রেফিউজ" প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল, "এই আতুর-নিবাসটি বর্ত্তমান নাম দিয়া চালাইয়াছিলেন স্বর্গত শ্রীযুক্ত আনন্দ বিশ্বাস নামক এক জন সহৃদয় খ্রীষ্টিয়ান ভদ্রলোক।" তিনি জীবিতই আছেন এবং বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন।'....

জাতির রূপ ও পরিণতি

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

নর বা বানরের জন্মস্থান

অতীত যুগে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই প্রথম পুচ্ছহীন নর বা বানরের কোন পূর্ব্বপুরুষ দেখা দিয়াছিল। তাহার পর আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, হিমালয়ের অভ্যুত্থান ও সবুজ ঘাস-বনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বংশধরেরা এক দিকে বানরের ধারায় অপর দিকে মানুষের ধারায় ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়াছিল। এই পথটি সহজ ও সরল ছিল না। আবেষ্টনের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবের নানা রূপ ও নানা গুণ লইয়া প্রকৃতি অনেক খেলা খেলিয়াছে যাহার ফলে অভিব্যক্তির এক শাখা নানা বানরশ্রেণীর রূপে পল্লবিত হইয়াছিল এবং আর এক শাখা মানুষের রূপে ও গুণে বহু বিফলতা ও সিদ্ধির ভিতর দিয়া ক্রম-বিকশিত হইয়াছিল।

সাধারণভাবে বলা যায়, আদিম মানুষের আবেষ্টন ছিল নাত্যুষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া। ক্রমশঃ পৃথিবী অতি শীতল হওয়াতে খাদ্য ও গণ্ডস্রাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে আদিম মানুষের দেহ ও মুখচ্ছবি পরিবর্ত্তিত হইল নিগ্রো হইতে মেডিটারেনিয়ান জাতির আকারের দিকে। আবার ঐ অঞ্চল বহু যুগ ধরিয়া যখন শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল তখন অন্ত গণ্ডগুলির স্রাবে পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের মুখ চ্যাপ্টা, তাহার চুল সোজা ও দেহ বলিষ্ঠ ও ছোটখাট হইল—আলপাইন ও মঙ্গোলিয়ান জাতির আকারের দিকে এই অবস্থান্তর। খুব সম্ভবতঃ লক্ষ যুগ ধরিয়া নিগ্রো ও অষ্ট্রেলিয়ান জাতির আদিম পূর্ব্বপুরুষ ছাড়া ক্রমবিবর্ত্তনশীল সকল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিশাল তুষাররাশির দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত মধ্য-এশিয়া অঞ্চলেই এই বিচিত্র দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে। উল্লিখিত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খুলি লম্বা এবং মগজের সম্মুখটাও বড় হইতে থাকে। পক্ষান্তরে যে-সকল আদিম জাতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সময় দক্ষিণে ও পূর্ব্বদিকে উত্তপ্ত ও বারিধারাধৌত বন-জঙ্গলের দিকে অভিযান করিয়াছিল তাহারা দারুণ ঠাণ্ডা অথবা ঘাস-বনের খাদ্যসঙ্কট হইতে বাঁচিয়াছিল সত্য কিন্তু শেষে উত্তরপথগামী অপেক্ষা তাহারাই জগতের ইতিহাসে পিছাইয়া পড়িল। তাহাদিগের মধ্যে মস্তিষ্কের আকার-বৃদ্ধি বা পরিণতি দেখা যায় নাই এবং তাহাদেরই বংশধর এখন আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বনজঙ্গলে খর্ব্বাকৃতি নাতিদীর্ঘ নাতিগোলাকার মস্তকবিশিষ্ট পৃথিবীর জাতির এক অপরিণত শাখা নিগ্রো ও অষ্ট্রেলিয়ান বলিয়া এখন পরিচিত। তাহাদের গায়ের লোম বাঁকা ও অগভীরভাবে সন্নিবিষ্ট। ইহাতে অন্য আদিম মানুষের জন্মনিকেতন মধ্য-এশিয়ায় নহে, দক্ষিণের অতি উষ্ণ আবহাওয়ায় যে তাহাদের বসতি—যেখানে তাড়াতাড়ি তাহাদিগের রক্ত ঠাণ্ডা করিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা বুঝা যায়।

জাতির সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণ

বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক কাল বসবাসের ফলে জাতির রূপ যে বিচিত্র হইয়াছিল শুধু তাহা নহে তাহাদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাহ, তাহাদিগের ভাষা ও আচার বিধি-নিষেধের বিশিষ্টতা, তাহাদিগের মধ্যে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা, সবই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। যেমন বাহিরের রূপ তেমনই ভিতরের দিক হইতেও এই প্রকারে জাতীয় ঐক্যের সংঘটন হয়। এখন আমরা যাহাকে জাতীয়তা বা দেশপ্রেমের আখ্যা দিই তাহার মৌলিক উপকরণ এই রূপ ও মনোগত ঐক্যবোধজনিত আত্মীয়তা যাহার জন্য আদিম মানুষও তাহার জন্মস্থান ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিংবা সমাজের কোন আভ্যন্তরীণ

বিপদে বা বাহিরের শত্রুর তাড়নে একযোগে দেশান্তরে বিপুল অভিযান করিত। পরিভ্রমণের পথে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ এবং জাতির সংমিশ্রণ প্রচুর ঘটে। ইহাতে জাতীয় লক্ষণগুলি কিছু অস্পষ্ট হয় সত্য, কিন্তু মোটামুটি বেশী রক্ত-সংমিশ্রণ পূর্ব্বকালে ঘটে নাই। প্রকৃতি মানুষকে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অনুকূল অঞ্চলে লালন-পালন করিয়া তাহাকে বিশিষ্ট সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছে, অন্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তাহাকে ভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া মানুষ তাহার জন্মনিকেতন এবং তাহার গোষ্ঠীর প্রভাব লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। তাহার জৈব জীবনের দশ ভাগের নয় ভাগ আদিম আবেষ্টনে কাটিয়াছে, উহার ছাপ তাহার অঙ্গে অঙ্গে নাড়ীতে নাড়ীতে অঙ্কিত। আফ্রিকাতে এবং আরব দেশে মরুভূমি যখন বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল এবং বিপুলতোয়া নদীকূলে মানুষের বসবাস কেন্দ্রীভূত হইল, সেই সময় এক দিকে যেমন জাতীয় লক্ষণগুলি বেশ পরিস্ফুট হইল, অপর দিকে তেমনই পরবর্ত্তী যুগে লোকবৃদ্ধিহেতু বিরাট্ প্রসার, প্রব্রজন ও সংঘর্ষের ফলে অপেক্ষাকৃত আদিকালীন জাতিগুলি ক্রমশঃ আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার গহন বন বা সীমান্তপ্রদেশে বিতাড়িত হইল। খুব পুরাতন মৌলিক জাতিগুলির পরিচয় পাওয়া যায় খর্ব্বাকৃতি নেগ্রিটোগুলির মধ্যে—যাহারা আফ্রিকা কিংবা পূর্ব্ব-এশিয়ার অনধিগম্য জঙ্গলে এখন বাস করিতেছে, কিংবা অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলি—যাহারা এখন তাহাদিগকে দূরে হটাইয়া দিয়াছে, তাহারা এখন বাস করিতেছে মধ্য-এশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তাহা হইতে ক্রমপ্রসারিত বিভিন্ন মণ্ডলে। জন্মনিকেতন হইতে এই সকল জাতি অধিক দূরে পরিক্রমণ করিতে বাধ্য হয় নাই, যতটা বাধ্য হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সর্ব্বাপেক্ষা আদিম জাতিগুলি যাহারা এখন টাসমেনিয়া, কেপ কলোনি, গ্রীনল্যাণ্ড ও ব্রেজিলের সীমান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

জাতি বনাম জনগোষ্ঠী

যখন জাতিগুলি তাহাদের রূপ ও গুণের সমাবেশ ধীরে ধীরে সংগ্রহ করিতেছিল, তাহাদিগের জৈব জীবনের সেই আরম্ভ ও পরিণতি সময়ে তাহারা স্বাধু ছিল—যেমন শ্বেতকায়, হরিদ্রা, পিঙ্গল ও কৃষ্ণজাতি সমুদায়। প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে প্রব্রজনহেতু জাতির সম্মিলনে যথেষ্ট সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহারাই সভ্যতার আলোক ভূমণ্ডলের দিকে দিকে লইয়া গিয়াছে। ফলে এখন অবিমিশ্র জাতি একেবারেই নাই বলিলেই চলে। কেহ কেহ নর্ডিক, আলপাইন, মেডিটারেনিয়ান প্রভৃতি জাতির নাম উল্লেখ করিলেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জোর তাঁহারা বলেন মাত্র এই তিনটি জাতিকে—অষ্ট্রেলিয়ান, নিগ্রো ও মোঙ্গলিয়ানকে চেনা অপেক্ষাকৃত সহজ। নর্ডিক, আলপাইন ও মেডিটারেনিয়ান ইউরোপে বহু বার মিশ্রিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য; ইহারা এবং বিশেষতঃ নর্ডিক-জার্ম্মান, ইংরেজ, ইটালীয়ান প্রভৃতি জাতি (race) নহে, জনগোষ্ঠী (people)। তবু এটা অস্বীকার করা যায় না যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট মৌলিক জাতির রক্তের পরিমাণ কম-বেশী পাওয়া যায়। বর্ত্তমান জনসমাজের বৈচিত্র্য দাঁড়াইয়াছে জাতিগত রূপ ও গুণের বিশিষ্টতার জন্য নহে—ভাষা ও কৃষ্টির প্রভেদের জন্য। ইতিহাসও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী লইয়া কখনও কাহাকে সভ্যতার সোপানে উঠাইয়াছে, আবার তাহাকে কিছুকালের মধ্যেই নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছে। রক্তের তেজ নয়, প্রকৃতি, সমাজ ও কৃষ্টির দোষগুণে জাতির উত্থান-পতন। হিটলার লক্ষ কথা বলিলেও "আর্য্য" জাতি কখনও ছিল না, এখনও নাই, তেমনই সেমিটিক জাতিও নাই। যদি আর্য্যকে ভাষাভাষী না বুঝিয়া জাতি বুঝিতে হয় তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে যেমন আইরিশ ও ইতালীয়দিগকে গণ্য করিতে হইবে, তেমনি সিংহল দ্বীপের অসভ্য ভেদ্দা নিগ্রোদিগকেও গণ্য করিতে হইবে। আর্য্য বা নর্ডিক শ্রেষ্ঠতা একটা অলীক রাষ্ট্রিক, বিপদ-সঙ্কুল পরিকল্পনা। কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া বুদ্ধি-পরিমাপের ভাগফল তুলনা করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, ইউরো-আমেরিকাবাসী ও এশিয়াবাসী-

দিগের মধ্যে জাতিগত বুদ্ধির প্রভেদ নাই বলিলেও চলে।

বুদ্ধি-পরিমাপের ভাগফল

শ্বেতকায় জাতি	১০০
চীনবাসী	৯৮-৯৯
জাপানী	৯৮
হিন্দু	৯৮

এই প্রকার প্রভেদ একই জনসমাজে বিভিন্ন স্তরে বরং অধিকই প্রতীয়মান। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত স্তরবিভাগ পাওয়া গিয়াছিল।

ক—৫; খ—৪; গ—৩; ঘ—২; ঙ—১; ফেল

চীনবাসী	৩·৩৫
ইহুদী	৩·১৮
নর্ডিক	৩
বিদেশী ছাত্র (চীনবাসী বাদে)	৩
আলপাইন	২·৯৪
মেডিটারেনিয়ান	২·৮৩
নিগ্রো	২·৮

যে-সব ছাত্রকে কোন বিশেষ শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় নাই তাহাদিগের অধ্যয়ন-ফলাফল অন্য জাতির অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। ১০০ নর্ডিক মানুষ এই প্রকার অবিভক্ত ছাত্রগণ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। চীনবাসী ও জাপানী শিশুরা সমানভাবে লালিত-পালিত হইলে মার্কিন ও ইউরোপীয় শিশুদিগের মতই উচ্চ-বুদ্ধি-পরিমাপক ভাগফল দেখাইয়াছে। অবশ্য এ-কথা এখানে বলা বিশেষ আবশ্যক যে এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির তুলনামূলক পরিমাপ-প্রণালীগুলির বহু দোষ ও বহু বিঘ্ন আছে। এগুলির নিরাকরণ সহজ নহে। ইহা কিন্তু নির্ব্বিবাদে এখন বলিতে পারা যায় যে, কোন জাতির কোন প্রকার মৌলিক মানসিক অযোগ্যতা নাই।

জাতিবৈর ও জাগতিক অশান্তি

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে একটা কাল্পনিক জাতি-ও বর্ণ-গত শ্রেষ্ঠতার পরিকল্পনা বিশ্বসভ্যতাকে নানা প্রকারে বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়েরা যখন আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্ম-মণ্ডলে রাষ্ট্রিক ও ব্যবসায়ীর শাসন-দণ্ড লইয়া জুড়িয়া বসিল, তখন অনেক কৃষ্ণকায় জাতি ধ্বংসের মুখে পতিত হইল। আমেরিকাতে চার শতাব্দী মধ্যে রক্তাভ ইণ্ডিয়ানেরা ১,০০০,০০০ হইতে ২৬৬,০০০ সংখ্যায় কমিয়া গেল। আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসিগণ ১৮৮২ সালে ছিল সংখ্যায় ২০৬,০০০,০০০; ১৯৩১ সালে তাহাদিগের সংখ্যা দাঁড়াইল ১৪২,৪০০,০০০; প্রশান্ত মহাসাগরে এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে অধিবাসিগণও সংখ্যায় অনেক কমিয়া গেল এবং টাসমেনিয়াতে একটি আদিম জাতি একেবারেই বিলুপ্ত হইল। এইরূপে ইউরোপীয় সভ্যতা ও ব্যবসা-প্রণালীর সংস্পর্শে আসিয়া অনেক আদিম কৃষ্ণকায় জাতি হটিয়া যাইতেছে বা মরণোন্মুখ হইতেছে। অপর দিকে সমগ্র পৃথিবীতে এখন কৃষ্ণ, পিঙ্গল বা হরিদ্রাভ বর্ণের নানা জাতির সংখ্যা শ্বেতজাতিদিগের সংখ্যার তিন গুণ। স্বাস্থ্য-বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বর্ণরঞ্জিত ভাগ—যাহা এখন গ্রীষ্মমণ্ডলদ্বয়ের অন্তর্বর্ত্তী, তাহা ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। ফলে বর্ণহীন ও কৃষ্ণকায়, পিঙ্গল ও হরিদ্রাভ বর্ণ জাতিদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর সংঘর্ষের কারণ সৃষ্টি হইতেছে। যে-সব গ্রীষ্মমণ্ডলীর পর্ব্বত ও সমুদ্র অঞ্চলে শ্বেতকায় জাতি এখন বসবাস করিতেছে সেইখানেই বাহুবলের দ্বারা বর্ণসমস্যার শেষ মীমাংসা সন্নিকট হইয়া আসিতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল যেখানে বর্ণযুক্ত জাতিরা আর্থিক ও সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত সেখানে তাহাদিগের উপনিবেশ স্থাপন, জমি, শিল্প ও ব্যবসা-সংক্রান্ত ন্যায্য অধিকার শ্বেতকায়-দিগের মত না মিলিলে একটা বিরাট সংঘর্ষ ঠেকাইয়া রাখিবার উপায় নাই। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের ১৫০,০০০,০০০ অধিবাসীদিগের মধ্যে ১১,০০০,০০০ লোক বর্ণযুক্ত। ইংরাজ সাম্রাজ্যে ৪৫০,০০০,০০০ লোকের মধ্যে ৪০০,০০০,০০০ বর্ণযুক্ত। চীনবাসী ও জাপানীদিগের উপনিবেশ স্থাপন অবৈধ করিয়া যেমন মার্কিন রাষ্ট্র

প্রাচ্যমণ্ডলে বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়াছে, তেমনই দক্ষিণ-আফ্রিকা ও কেনিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে জাতিগত অবিচার করিয়া ভারতবর্ষকে নিতান্ত অবমাননা করিয়াছে। এদিকে যেমন চীন জাপান, তেমনি ভারতবর্ষ লোকসংখ্যায় ভরপুর। ৯০০,০০০,০০০ এশিয়াবাসী আজ পৃথিবীতে ৬০০,০০০,০০০ শ্বেতজাতি যে-স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে তাহার এক-ষষ্ঠাংশ স্থানে ঘন বসতি করিয়া রহিতে বাধ্য হইয়াছে। এদিকে দক্ষিণ-আফ্রিকা, নিউ-জিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে শ্বেতকায় জাতি ততটা বা একেবারেই কার্য্যক্ষম নয় সেখানে বর্ণযুক্ত জাতির প্রবেশ আজ নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ মৌসুমি ও গ্রীষ্মমণ্ডলের অংশে যেখানে ইউ-রোপীয়েরা মাঠে ঘাটে দৈহিক পরিশ্রম করিতে একেবারে অনুপযোগী, সেখানেও তাহারা ভবিষ্যৎ শ্বেতকায় বংশের জন্য অক্ষত ও অনধ্যুষিত করিয়া রাখিতেছে। পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও হরিদ্রাভ জাতির ত্বকে অনেক বেশী রং থাকাতে তাহারা শ্বেতজাতি অপেক্ষা প্রখর ও অবিশ্রান্ত রৌদ্রে দগ্ধ হয় না। তাহাদিগের ত্বকে ইউরোপীয় অপেক্ষা অনেক বেশী স্বেদনিঃসরণশীল গ্রন্থি আছে, তাহা ছাড়া তাহাদিগের ওজন ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া তাহারা গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তাপ ও সিক্ততা সহনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। সমগ্র পৃথিবীতে যে-পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় পূর্ব্ব- ও দক্ষিণ- এশিয়ার সন্নিকট কোন অঞ্চলে—বিশেষতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রদেশে প্রাচ্য জাতির অনধিকার—যেমন শস্য-উৎপাদনের বিঘ্ন স্থাপন করা একটি অন্যায্য আর্থিক ব্যবস্থা—তেমনই জাতিবৈরের উৎসাহ দান করিয়া একটি অসঙ্গত রাষ্ট্রিক বিধি—বদ্ধ দ্বার মুক্ত করিবার বিলম্ব আর করা উচিত নয়।

বর্ণবৈরের ভবিষ্যৎ

মার্কিন দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বর্ণের অধিকারের বিষম বীজ উপ্ত হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়াছে। কিন্তু মার্কিনের উত্তরে এবং ইংরেজ-শাসিত আফ্রিকার অন্য অঞ্চলে বর্ণবিভাগ তত সুস্পষ্ট নয়। দক্ষিণ-আমেরিকার অনেক প্রদেশে, নিউজিল্যাণ্ডে কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে অবাধ জাতি-সংমিশ্রণ ঘটিতেছে; বর্ণ ও জাতি মিলিয়া বহু সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইতেছে এখানে, অথচ সামাজিক অসদ্ভাব ঘটে নাই।

বস্তুতঃ আর্য্য বা নর্ডিক জাতির প্রাধান্যের কল্পনা বা শ্বেতকায় জাতির বসুন্ধরা অধিকারের উপকথা; এ সবই কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্বার্থের সহিত জড়িত হইয়া পৃথিবীতে যেমন ভাবজগতে গোলযোগ তেমনই রাষ্ট্রিক জগতে অশান্তি ও কলহ আনিয়াছে। পক্ষান্তরে যখনই কোন সভ্যতা বা সমাজ সকলকে সমান অধিকার দিতে এবং কোন বিশেষ শ্রেণীর শাসন ও শোষণ নিবারণ করিতে চাহিয়াছে তখনই জাতিগত বা বর্ণগত কোন প্রভেদই এই সুব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য বা বিশৃঙ্খলার কারণ হয় নাই। অপর দিকে যেখানেই জাতিবৈর বা বর্ণসংঘর্ষ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে রহিয়াছে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণের আর্থিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব। ত্বকাবরণ বা জাতির অন্য কোন রূপে বা গুণ সংঘর্ষের উপাদানের আসল জোগান দেয় নাই। তাহারা বরং আর্থিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের সহজ ও স্বেচ্ছা চিহ্নিত প্রতীক মাত্র। যেখানে যেখানে পৃথিবীতে জাতি- ও বর্ণ- বৈর মানব-সভ্যতাকে বিভ্রান্ত ও কলুষিত করিয়াছে সেখানে যেমন বিজ্ঞান তেমনই সামাজিক প্রেমের আবশ্যক। বিজ্ঞান বলিয়া দিবে, সব জাতি রক্তে, দেহে ও গুণে প্রায়ই সমান ও প্রেমধর্ম্ম বলিয়া দিবে, "সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।"

শিক্ষার পুরাতন-নূতন ক্ষেত্র

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বহু দিন একই আবহাওয়ার মধ্যে থাকার ফলে আমাদের ধারণা হইয়াছে, শিক্ষা দিতে গেলেই পাকা ঘর-দালান চাই, বয়সের এবং শিক্ষা গ্রহণ করিবার শক্তি না বুঝিয়া ছাত্রকে চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা চাই, একই বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকলগুলি শিখিতেই প্রতি বৎসর বই বদল করিয়া গোড়া হইতে নূতন করিয়া আরম্ভ করা চাই, প্রতি ৪০।৫০ মিনিট অন্তর শিক্ষক বদল করিয়া বিদ্যালয়ের নিয়ম প্রতিপালন করা চাই, বৎসরের মধ্যে বার দুই-তিন পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পাশ-ফেল স্থির করা চাই, ইত্যাদি বিদ্যালয়গত যত কিছু নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, সবগুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করা চাই। এই সকল না-হইলে শিক্ষা হইল না।

আমাদের মনে হয় পুস্তকের মধ্য দিয়া যত শিক্ষা দেওয়া যাক, পুস্তকের বাহিরে শিক্ষার ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা কম ত নয়ই, বরং বেশী। উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে এবং জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত যোগাযোগ রাখিতে পুস্তকস্থ বিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন। ব্যাবহারিক জগতের কার্য্যকর জ্ঞান পুস্তকের সাহায্য বিনা অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিলে এ-বিষয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আজকাল ট্রেনে যাতায়াত অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে; যতই দিন যাইবে, ইহার প্রসার অবশ্যম্ভাবী। রেলপথগুলি নানা জেলা, নানা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া নানা নদ-নদী পুলের সাহায্যে পার হইয়া গিয়াছে। গাড়ী কত পথ অতিক্রম করিল, তাহা টেলিগ্রাফ-পোষ্টের গাত্রে লিখিত অক্ষর হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতে পারে; কিন্তু অনুসন্ধিৎসু লোকের মনে সেই স্থানের বিষয় অনেক প্রশ্ন জাগিয়া থাকে। সেই হেতু প্রতি জেলার শেষে যদি বড় বড় অক্ষরে কোনও বোর্ডের দুই পৃষ্ঠে দুই জেলার নাম লেখা থাকে তাহা হইলে লোকের মনে তাহা জানিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জাগরূক হয় এবং ট্রেনে চলার কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকে। মানচিত্রে বসিয়া দুই বৎসরে যে জেলার সীমারেখা মনে রাখা সম্ভব নয়, তাহা মাত্র দুই মিনিটে শিখিয়া লওয়া সম্ভব। এই ভাবে প্রতি প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল চড়িয়া গেলে, বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশগুলির সীমারেখা জানিবার জন্য কি ঔৎসুক্য থাকে। দক্ষিণ দিকে যাত্রাকালে আবার অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের মধ্য দিয়া বোম্বাই গিয়া পড়িতে হয়। এক বার ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল এবং আর-এক বার বেঙ্গল নাগপুর রেল চড়িয়া যাইবার সময় বাংলা-বিহারের সীমা দেখিয়া লইয়া মনে মনে এই দুই সীমার যোগ করিয়া দিতে পারিলে বাংলার শেষ ও বিহার প্রদেশের আরম্ভ মনে করিয়া লওয়া কষ্টকর নয়। এই ভাবে প্রতি প্রদেশ সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

রেলপথ ছাড়া রাজপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে এই ভাবে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ বেশী। দ্রুত রেল চলিয়াছে, ষ্টেশনে না পৌঁছিলে সে থামিবে না। কিন্তু পায়ে চলার পথে বা মোটরে যাইবার সময় সকল বিষয় আগ্রহ থাকিলে ইচ্ছামত থামিতে পারা যায়। যাঁহারা ট্রেনে গিয়াছেন, আবার রাজপথে যাইবার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারা প্রদেশ বা জেলার সীমা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে নদীর কথা বলিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি। রেলপথই হউক, আর রাজপথই হউক অনেক নদী পার হইয়া গিয়াছে। কে না জানেন ট্রেনের মধ্যে বসিয়া প্রতি বড় পুল পার হইবার সময় নদীর নাম লইয়া বহু আলোচনা হইয়া থাকে? দামোদর বা রূপনারায়ণ,

কাটজুড়ি না মহানদী, কৃষ্ণা না গোদাবরী ইত্যাদি বহু আলোচনা চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য, আজও লোকের আলোচনার মধ্যে অনেক সময় ভুল ধারণা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়। দেখিয়াছি বুদ্ধিমান লোকে "কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" হইয়া শোভা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সকল নদীর অর্থাৎ পুলের নাম যদি পুলের গাত্রে বড় অক্ষরে লেখা থাকে, তাহা হইলে কেবল যে নূতন শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ হয়, তাহা নহে, ভুল শিক্ষার হাত হইতে এবং অনেক অবান্তর আলোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। আমার মনে হয় সেই স্থানের নাম, জেলা এবং প্রদেশের নাম, নদীর দৈর্ঘ্য এবং কোন কোন স্থান বাহিয়া আসিয়া কোথায় পড়িতেছে, সবই দেওয়া যাইতে পারে। ট্রেন চলিবার সময় এত কথা পড়িবার সুযোগ নাই। কিন্তু প্রায় সকল সময়ই পুলের নিকট ট্রেন ধীরে ধীরে যায়, সুতরাং প্রধান অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইল। কিন্তু রাজপথের উপর এই বালাই নাই; যে কেহ সামান্য সময় অপেক্ষা করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া লইতে পারে।

বহু বৎসর চেষ্টা করিয়া নদীসম্বন্ধে যে-সকল বিষয় ছাত্রদের আয়ত্ত করাইতে হয় তাহার সমস্তই এই পুলের গাত্রে লিখিয়া শিখাইতে পারা যায়।

রাজপথের আরও সুবিধা আছে। পথের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ বা উহা হইতে বাহির হইয়া যদি কোনও পথ কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে পৌছিয়া থাকে, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ স্থানের প্রসিদ্ধির ঐতিহাসিক কারণ বা কিম্বদন্তী যদি কিছু থাকে, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি কাহারও সময় ও সুবিধা থাকে, তিনি স্বচ্ছন্দে তাহা পরিদর্শন করিয়া আসিতে পারেন। এক জনের চক্ষে যাহা পড়ে নাই, তাহা অপরের চক্ষে ধরা পড়িতে পারে। যদি কোনও ফলক, নূতন কিছু ধাতু, বৃক্ষলতা, পুরাতন স্তূপ, মন্দির, মসজিদ বা অপর কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় বা বস্তুর অবস্থান থাকে, তাহা সর্ব্বসাধারণে

জানিতে পারিলে, উহার মধ্যে কোনও বিশেষজ্ঞ হয়ত নানা নূতন তথ্যের সন্ধান দিতে পারেন।

পথের ধারে ডাকবাংলা, বিদ্যালয়-গৃহ, সাধারণ চিকিৎসালয়, মিউনিসিপ্যাল, জেলা বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের আপিসে বা অন্য কোনও সাধাবণ পাঠাগারে এই সকল তথ্য লিখিয়া রাখিলে কেবল যে স্থানীয় লোকের শিক্ষার সুবিধা হয় তাহা নহে, পথেব যাত্রীরাও সে-সকল বিষয় জানিয়া যাইতে পারে। লোকমুখে প্রচার হইয়া পড়িলে যাঁহার সে-সম্বন্ধে কোনরূপ ঔৎসুক্য আছে, তিনি নিজে গিয়া অনুসন্ধান করিবেন।

চলার পথ ছাড়িয়া আমরা বিশ্রাম স্থানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি। রেল-লাইনে ক্ষুদ্র বৃহৎ অজস্র স্টেশন আছে। এই স্টেশনগুলি সাধারণতঃ ঐ সকল স্থানের নাম প্রকাশ করে। কিন্তু এইগুলিকে আরও নানা রকম কাজে লাগাইতে পারা যায়। অন্ততঃ বড় বড় স্টেশন, দুই তিন বা ততোধিক রেল-লাইনের সংযোগ স্থলগুলি বিশেষভাবে শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করা প্রয়োজন। অনেক সময় ঐ সকল স্থানে গাড়ী বদল করিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হয়, ট্রেন ধরিতে না পারিয়া পরের ট্রেনের জন্য দুই-দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করা যে কি কষ্টকর ব্যাপার তাহা লিখিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এই সকল স্টেশনে বহুপ্রকার তথ্য বিজ্ঞপ্তির আয়োজন করা যায়। প্রথমতঃ যে লাইন বা শাখার সংযোগস্থল ঐগুলির প্রতিষ্ঠার সাল, মোট দূরত্ব ঐ লাইনের প্রধান প্রধান স্টেশনগুলির নাম দিয়া একখানি বোর্ড দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর স্টেশনের নামের হেতু, সুবিধা হইলে ঐ স্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিকট-বর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থান, শিল্পকেন্দ্রের পরিচয়, কোন্ চাষ ঐ স্থানে বেশী হয়, কোনও খনিজ পদার্থ আছে কি না, রেল বাহিয়া মাল কোথায় বেশী যায় এবং কোথা হইতে এবং কি মাল বেশী আসিয়া নামে, সম্ভব হইলে তাহার পরিমাণ, স্বচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে। কাচের আলমারিতে ঐ স্থানের শিল্প ও কারু-দ্রব্যের নমুনা এমন কি কাঁচা মালেরও বাজার-দর প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া নমুনা রাখিতে পারিলে, কেবল যে শিক্ষাই হয়, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা

বাণিজ্যের যোগাযোগ হওয়া খুবই সম্ভব, যদি লোকে বুঝিতে পারে ঐ স্থানের আশপাশে বহু মহুয়া বৃক্ষ আছে। ঐ স্থানে প্রচুর গুড় জন্মে, তৈলবীজ ইচ্ছামত পরিমাণে ক্রয় করিতে পারা যায়, সামান্য খনন করিলেই দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম দেখা যায়। সাধারণ পাথর অপেক্ষা বহুগুণ ওজনের পাথর অজস্র পাওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি। প্রত্যুত প্রত্যেক বড় স্টেশনকে স্থানীয় দ্রব্যাদির প্রদর্শনীতে পরিণত করা যাইতে পারে।

এখন ভারতবর্ষে অ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য বক্‌সাইট পাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, গন্ধক এবং লোহের "পাথর" প্রচুর দেখা যাইতেছে, কায়েনাইট, ক্রোমাইট প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ম্যাঙ্গানিজ ধাতু ভারতে পাওয়া যায় বলিয়া লোকে কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত জানিত না, কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ম্যাঙ্গানিজ উঠিয়াছে। এখন চারিদিক হইতে গ্রাফাইট, ফেরিক অক্সাইড, চায়না ক্লে (china clay) প্রভৃতি উঁকি মারিতেছে। লোকচক্ষের অন্তরালে অনাদিকাল হইতেই ইহারা পড়িয়া আছে এখন হঠাৎ লোকে সন্ধান পাইতেছে, তাহাতেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তথ্যপ্রচার দ্বারা এ-বিষয়ে ঔৎসুক্য জাগরিত করিতে পারিলে আরও অনেক খনিজের আবিষ্কার হইবে আশা করা যায়।

মেদিনীপুর জেলায় কাজু বাদাম প্রচুর জন্মে। কোনও কোনও স্থানে অজস্র শিমল গাছ অযত্নে নষ্ট হইয়া যায়, কোথাও তিসি, কোথাও তিল, কোথাও বা নীল প্রচুর জন্মে এই সকল বহু জ্ঞাতব্য বিষয় রেল-স্টেশন মারফতে বাহিরে প্রচার করা যাইতে পারে। যদি কোথাও নূতন আবিষ্কার কিছু হইয়া থাকে, তাহাও জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

এ সকলই চলার পথের খবর। গ্রামের মধ্যেও এই সকল বিষয় সহজে জানাইতে পারা যায়। চারিদিকে স্কুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই যে সকল শিক্ষার কেন্দ্র আছে, তাহার মধ্য দিয়া পুথিগত বিদ্যার চেয়ে অধিকতর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।



দেশ-বিদেশের কথা



বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার ও তৎসম্বন্ধে প্রস্তাবিত আইন

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম. এ.

বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বাংলার আইন-সভায় যে বিতর্ক চলছে দৈনিক ও সাময়িক পত্রে তার যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ প্রস্তাবিত আইনটির (Bengal Agriculturial Produce Markets Bill) গুরুত্ব কম বলা চলে না, কারণ বিলটি বর্ত্তমান অবস্থায় আইনে পরিণত হলে তার ফল আমাদের পল্লীজীবনে সুদূরপ্রসারী হবে। সে কারণে বিলটির যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে মনে করা অসঙ্গত হবে না। বিলটির উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলা হয়েছিল :—আমাদের কৃষিজ দ্রব্যের কেনা-বেচায় নানা গোলমাল দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলতে পারে বাজারে ভেজালও চলে; মালিক ও ব্যাপারীরা নানা রকম অন্যায় পাওনা আদায় করেন; ওজনের কোন নিশ্চয়তা নেই; বাজারে রাস্তাঘাট ভাল নয়; দাম সম্বন্ধে কোন খবর সহজে পাওয়া যায় না; দালালদের উৎপাতও বড় কম নয়; এবং তারা সাধারণতঃ বিক্রেতার চেয়ে ক্রেতার স্বার্থ বেশী দেখে। সেই জন্যে বিলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) সমস্ত বাজার, মেলা ও হাট রেজেষ্ট্রী করা (খ) বাজারের বাজে আদায় বন্ধ করা এবং বাজার হ'তে বাজার মালিকদের পাওনা সব জায়গায় সমান করা, (গ) ব্যবসার অন্যায় ব্যবস্থা বন্ধ করা, (ঘ) সব জায়গায় সমান ওজন প্রবর্ত্তন করা, (ঙ) বাজারে পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, (চ) কৃষকদের পণ্যের দাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখা, (ছ) কৃষকেরা তাদের ন্যায্য দেয় ছাড়া বাজারদরের সমস্তটাই পায় ও অযথা উৎপীড়িত না হয় তার চেষ্টা করা, (জ) ক্রেতা ও জনসাধারণকে অন্যায় ব্যবস্থার হাত হতে রক্ষা করা (চাষীরা নিজেরাও অন্যায় করে চলে বলে দেখা গেছে), (ঝ) চাষী যাতে উন্নততর শস্য চাষ করে তার চেষ্টা করা, (ঞ) এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত অন্যায় প্রথা বন্ধ করা। মন্ত্রী-মহাশয়ের বিশ্বাস এই আইনটিই ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাজার-হাট নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং ফলে আমাদের চাষীদের উন্নতি হবে।

বিলটিতে যে উদ্দেশ্যগুলি বর্ণিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিই সাধু বলে মনে হ'লেও, প্রত্যেক ব্যাপারটিই যে বহুশ্রমসাধ্য সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ চলতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের পল্লীজীবনে এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে যতগুলি বড় অকল্যাণ আছে, তার সব কটি নিবারণের চেষ্টাই এই একটি বিল করতে চায়। অর্থাৎ মন্ত্রী-মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মনে করা চলতে পারে, এই একটি বিল আইনে পরিণত হ'লেই আমাদের চাষীরা জিনিসের ভাল দাম পাবে, তাদের কেউ আর ঠকাতে পারবে না, তাদের শস্য উন্নত ধরণের হবে, তাদের কাছ থেকে কোন অন্যায় প্রাপ্য আদায় করা সম্ভব হবে না—এক কথায় বহু শত বছর ধরে তাদের যে অভিযোগ চলে আসছে এবং এতকাল যার কোনও সমাধান হয় নি, বা সম্ভব হয় নি, এই একটি পঁচিশ ধারার আইনে তাদের সে সমস্ত অভিযোগ দূর হবে। সুতরাং দেখা যায়, কি কি ব্যবস্থার ফলে এই আশা সফল হবে বলে মন্ত্রী-মহাশয়ের বিশ্বাস। আইনটি কৃষিজ দ্রব্যের বেচাকেনা সম্পর্কে। সেই জন্যে কৃষিজ দ্রব্যের সংখ্যা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে পাট, ধান, চাউল, গম, তৈলজ বীজ, ডিম, মাছ গৃহপালিত পশু, এবং এই পশুগুলির চামড়া ও পশম, এ সমস্তই ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, এবং সরকার যখন যে-জিনিসটিকে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবেন তখন সেগুলিও এই আইনের মধ্যে আসবে। চাষী বলতে বোঝায় যারা নিজে ও সপরিবারে বা ঠিকা মজুরের বা আধিয়ার, বর্গাদার বা ভাগদারের সাহায্যে কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন

করেন। লক্ষ্য করতে হবে চাষী-খাতক আইনের (Bengal Agricultural Debtors Act, 1935) কৃষক সংজ্ঞার সঙ্গে এ আইনের কৃষক সংজ্ঞার মিল নেই।

এই আইনের প্রথম নির্দ্দেশ—আইনটি প্রচলিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে বর্ত্তমানে কৃষিজাত দ্রব্যের কেনা-বেচার জন্য যতগুলি বাজার আছে সবগুলি রেজেষ্ট্রী করতে হবে। এ রেজেষ্ট্রী করবার ভার হাটের মালিকদের উপর, অর্থাৎ যাঁরা হাটের খাজানা পান, তা সে নিজের জন্যই হোক্ বা দেবোত্তরের সেবাইত হিসেবেই হোক বা অপর কারও ট্রাষ্টী হিসেবেই হোক। এই আইনটি প্রচলিত হওয়ার পর ভবিষ্যতে যতগুলি বাজার হবে সব কয়টিই রেজেষ্ট্রী করতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম সম্বন্ধে ৭ ধারায় বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে সাধারণতঃ সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত বাজার-কমিটিরাই বাজার স্থাপনা করবেন। অপর কেউ নয়। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষ হাটের মালিক হলে তিনি সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করে বাজার চালাতে পারেন, যদিও তার পরিবর্ত্তে কোনও অমালিক লাইসেন্স পেতে অধিকারী এমন কোনও কথা নেই। অর্থাৎ যেখানে হাটের মালিক লাইসেন্স চাইবেন তিনি পাবেন; কিন্তু তাঁর কর্ম্মচারী বা তাঁর কোনও জিম্মাদার দরখাস্ত করলে যে লাইসেন্স পাবেন এমন কোনও কথা নেই।

এই সমস্ত কাজ ছাড়া বাজার-কমিটিগুলির আর একটি বড় কাজ আছে এবং সে-কাজটি হচ্ছে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ। ৬ ধারায় বলা হয়েছে:—

(১) প্রাদেশিক সরকার বিজ্ঞপ্তির দ্বারা কোন জায়গায় কোন বিশেষ জিনিসের কেনা-বেচা বন্ধ করে দিতে পারেন, এ রকম নিষেধাজ্ঞার আগে কি কি আপত্তি হতে পারে সব শোনা হবে।

(২) আপত্তি বিচার করবার পর, সরকার বাজারটির সমস্ত অংশ বা অংশবিশেষকে নির্দ্দিষ্ট করে দিতে পারেন এবং সেই নির্দ্দিষ্ট বাজারগুলিতে বিজ্ঞাপিত সমস্ত কৃষিজ দ্রব্য বা বিজ্ঞাপিত কয়েকটি কৃষিজ দ্রব্য কেনা-বেচা বন্ধ করে দিতে পারেন।

কাজেই এই ধারার ব্যবস্থা অনুসারে বাজার-কমিটিগুলির অসীম ক্ষমতা। তাদের নিজেদের বাজারগুলিতে তাদের সম্পূর্ণ

অধিকার। কিন্তু যেখানে কোনও ব্যক্তিবিশেষই হাটের মালিক সেখানেও কমিটিগুলির ক্ষমতা কম নয়। তারা সমান ওজন প্রবর্ত্তন করার ব্যবস্থা করবে, দরকার হলে যে-কোনও খবর যে-কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে, এবং সে-কারণে মালিকদের খাতাপত্র দেখবার অধিকারও তাদের পাওয়া সম্ভব। নির্দ্দিষ্ট বাজারগুলিতে নির্দ্দিষ্ট জিনিস ছাড়া অন্য কিছু কেনা-বেচা হলে সেই কেনা-বেচা বন্ধ করার অধিকার তাদের সম্পূর্ণই আছে। উপরন্তু ১৩(১)(খ) ধারার বলে যাঁরা চাষী নন অথচ কোনও উপায়ে কৃষিজ দ্রব্যের কেনা-বেচার সঙ্গে সংযুক্ত, তাঁদের এবং অন্য যত ব্যবসাদার আছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁদের রয়েছে। এমন কি যদি তাঁরা লাইসেন্সের সর্ত্তানুযায়ী কাজ না করেন, তাহ'লে তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করা বাজার-কমিটিগুলির সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এর উপর আপীল চলতে পারে বটে, কিন্তু সে-আপীল আদালতে চলবে না। কে আপীল শুনবেন, তা সরকার নির্দ্দিষ্ট করে দেবেন। এ ছাড়া যাতে ব্যবসায়ে কোন রকম অন্যায় পাওনা আদায় না হয় সে-ব্যবস্থাও এতে করা হয়েছে। সকলের উপরে, যাঁরা বাজার-কমিটির কথা শুনবেন না তাঁদের যথেষ্ট দণ্ড দেবার ক্ষমতা কমিটিগুলিকে দেওয়া হয়েছে এবং এ দণ্ডের পরিমাণ এককালীন ৫০০৲ এবং দৈনিক ১০০৲ টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এই যে ধারা কয়টি আমরা পেয়েছি তাতে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির সব কয়টি ব্যবস্থা হয় না। সেই জন্য পরিশেষে বলা হয়েছে, বাজার-কমিটিগুলি যে টাকা পাবেন, লাইসেন্স ফি, এবং জিনিস কেনা-বেচার উপর ফি (১৪ ধারা দ্রষ্টব্য) তা থেকেই বাজার-কমিটিগুলির আয়। সে টাকায় কমিটির খরচ-খরচা ইত্যাদি বাদ দিয়ে একটি বাজার-ফণ্ড খোলা হবে। সে ফণ্ডের উদ্দেশ্য হবে (১) বাজার স্থাপনের জন্য জমি কেনা, (২) বাজারের উন্নতি করা, (৩) বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের সুবিধা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাড়ী বা আটচালা তৈয়ারী করা বা মেরামত করা, (৪) ড্রেন তৈয়ারী, (৫) কমীটির সভ্যদের নির্ব্বাচনের জন্য খরচা, (৬) সমিতি যদি ধার গ্রহণ ক'রে থাকে তাহ'লে সে-ধারের সুদ দেওয়া এবং সে-ধার শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা, (৭) বাজার ও দাম সম্পর্কিত হিসাব প্রভৃতি সংগ্রহ করা, (৮) কৃষির উন্নতি ও সঞ্চয়ের উৎসাহ দেওয়া, (৯) বাজারের জন্য রাস্তাঘাট তৈয়ারী করা, (১০) ওজনের গোলমাল নিবারণ করা, (১১) বাজারে গাছ বসান ও গরু-ঘোড়ার পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পরিশেষে এই কমীটিগুলির গঠনের কথা উল্লেখ করা উচিত মনে করি। কমীটিগুলির সদস্যসংখ্যা বারো জন। তার মধ্যে পাঁচ জন স্থানীয় কৃষকদের মধ্য হ'তে ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি দ্বারা নির্ব্বাচিত। তিন জন ব্যবসায়ীদের মধ্য হ'তে নির্ব্বাচিত। বাকী চার জন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত, তবে তার মধ্যে এক জন বাজার-মালিক থাকবেন। এ ব্যবস্থা অবশ্য মফস্বলের পক্ষে, কলকাতার পক্ষে অন্য ব্যবস্থা। সেখানে তিন জন কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হবেন বা স্থানীয় কমিশনারেরাই কমীটিতে থাকবেন। বাকী তিন জন ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে নির্ব্বাচিত। বাকী ছয় জন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তার মধ্যে পাঁচ জন হবেন কৃষক-স্বার্থের রক্ষক এবং এক জন বাজার-মালিক। প্রাদেশিক সরকার অবশ্য সঙ্গত মনে করলে কোন কমীটিকে নাকচ ক'রে দিতে পারবেন, যদিও এ-রকম নাকচ

এক বৎসরের বেশী স্থায়ী হবে না। কিন্তু সরকারের কোন একটি কমীটিকে নাকচ করে আর একটি নূতন কমটি গঠন করবার ক্ষমতাও থাকবে।

আইনের ধারাগুলির আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, তার মধ্যে বিশেষ কতকগুলি দোষ ছাড়াও তার গত দোষের অভাব নেই। এই একটি আইনের সাহায্যে পল্লী সমস্ত বড় বড় সমস্যার সমাধানের আশা করা হয়েছে কিন্তু যাঁরা পল্লীর সমস্যাগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, তাঁরা এ-প্রস্তাবের অসঙ্গতি সহজেই বুঝতে পারবেন। সিলেক্ট কমীটির রিপোর্টে শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এই জন্যেই বলেছেন একটি আইনের সাহায্যে সমস্ত কৃষিজ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। স্বাভাবিক পক্ষে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে সমস্ত কৃষিজ পণ্য সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় আমাদের প্রাত্যহিক তরকারির গুরুত্ব যা, ধান বা পাটের গুরুত্ব নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশী; এবং শুধু যে গুরুত্বই বেশী তাই নয়, দুয়ের সমস্যাও সম্পূর্ণ পৃথক। পাটের যে আন্তর্জাতিক মূল্য আছে, তরকারির সে-সমস্যা কখনই নেই এবং সে-হিসেবে দুটি এক পর্য্যায়ে পড়ে না। সেই জন্য পাটের দাম নিয়ন্ত্রণ কেবল স্থানীয় ব্যাপার নয়, এ-বিষয়ে সমস্ত প্রদেশময় এক নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত। অথচ অন্য পণ্য সম্বন্ধে এ প্রাদেশিক ঐক্য হয়ত অপ্রয়োজনীয়। তাই সমস্ত পণ্যগুলি এক পর্য্যায়ভুক্ত হ'লে আমাদের বিশেষ কোন উপকার আশা করা চলে না।

কিন্তু আইনটির তার চেয়েও আর একটি বড় মৌলিক দোষ আছে। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে স্বাধীন ক্রয়বিক্রয়ের অধিকার সাধারণতঃ দুই-একটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে খর্ব্ব হয় নি। কিন্তু বর্ত্তমান আইনের ফলে সে অধিকার খর্ব্ব হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে যে-যে দেশে রাষ্ট্রতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে, সে-সব দেশে এ-আদর্শ যে দুর্লভ তা নয়। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় সে-সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা আংশিক নয়, সর্ব্বাঙ্গীণই। সেই কারণে সরকার যদি আমাদের কৃষকদের জীবনধারণের সম্পূর্ণ ভার নিতে রাজী থাকেন, তাঁদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করেন, তাহ'লে এ-প্রচেষ্টা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে সরকারের পক্ষে প্রয়োজন হ'লে সমস্ত কৃষিজ পণ্য কিনে চাষীদের সঙ্গত মূল্য দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেই জন্য যদি এ-আইনের ফলে সমস্ত বাজার-দর নীচের দিকে যায়, তাহ'লে এই নূতন ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যবসায়ী বাজার-দরের নীচু দামে জিনিস কিনতে না পারলেও পরিণামে ক্ষতি কৃষকদেরই। এই ব্যাপারটিতে আরও বিশেষ আশঙ্কার কারণ এই যে কোন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করার জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা প্রথমে প্রস্তাবিত হয়েছিল, সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে; এবং সে কারণে বাজার-কমিটিগুলির নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাবিহারে কোনও বাধা নেই। তাই যাঁরা কৃষকদের প্রকৃত কল্যাণকামী তাঁদের পক্ষে এ-বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তার প্রয়োজন হয়েছে।

এ ছাড়া বিলটির বহু ধারায় আপত্তি করা চলতে পারে। সর্ব্বপ্রথম আপত্তি বাজার-কমিটির গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে। কলিকাতা সম্পর্কে করপোরেশনের এ বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল এবং সেজন্য নূতন ক'রে আইনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মফস্বলে যে কমিটিগুলি গঠিত হবে তার উপর আপীলের কোনও সুবন্দোবস্ত নেই। অবশ্য বলা হয়েছে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে আপীল চলতে পারে—কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি আদালত নয়। সেই জন্য যেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করছে সেখানে আদালতে আপীলের অধিকার যে অবশ্য-প্রয়োজনীয় এ-কথা অনেকেই স্বীকার করবেন। বিশেষ ক'রে কৃষকদের মধ্য হ'তে কোনও কোনও স্থানে সম্প্রদায়বিশেষেরই সংখ্যাধিক্যে কমিটিতে নির্ব্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং এই কমিটিগুলি নির্ভয়ে যে-কোন বাজার-মালিকের লাইসেন্স নাকচ করতে পারেন, যে-কোন ব্যবসায়ীর কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, এদের প্রত্যেককেই প্রচুর দণ্ড বিধান করতে পারেন এবং হয়ত নিজেরা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বহুকাল-স্থাপিত একটি হাটের পাশে আর একটি হাট স্থাপনা করে প্রথম হাটটিতে সমস্ত লাভজনক জিনিস কেনা-বেচা বন্ধ করে দিতে পারেন। সেই জন্য এই বাজার-কমিটিগুলির নীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও দৃঢ়তর ব্যবস্থার প্রয়োজন, কারণ ২৩ ধারার ব্যবহার যে অত্যন্তই কম হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাছাড়া যে উপায়ে বাজারের উন্নতির চেষ্টা করা হয়েছে তা কৃষক এবং ব্যবসায়ী উভয়ের দিক দিয়েই অত্যন্ত আপত্তিজনক। পূর্ব্বে বলা হয়েছে কমিটিরা যে টাকা পাবেন, খরচ-খরচা বাদে তাতে একটি বাজার-ফাণ্ড গঠিত হবে এবং সেই ফাণ্ড হ'তে, বাজার পরিষ্কার রাখা, ড্রেন তৈরি করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হবে। কিন্তু কমিটির আয়ের ব্যবস্থা দুটি। প্রথমটি লাইসেন্স ফি এবং দ্বিতীয়টি প্রত্যেক পণ্যের উপর একটি কর। প্রথমটির

আর কত হবে বলা কঠিন; কিন্তু যদি কমিটিকে রাস্তাঘাট, বাজারের মধ্যে গাছপালা বসান, ধার শোধ ইত্যাদি প্রচুর খরচ করতে হয়, তাহলে বলা বাহুল্য কৃষিজ পণ্যের উপর করভার গুরুতর হ'তে বাধ্য। আর যদি কৃষিজ পণ্যের উপর ট্যাক্স বসে তাহ'লে সে করভার ব্যবসায়ী ও কৃষকদের পরিণামে বহন করতে হবে সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। বরং যেখানে কৃষকদের জিনিষ বিক্রয় ছাড়া কোন উপায় নেই এবং সে হিসেবে তাদের জিনিষ বেচতেই হবে, 'এবং যেহেতু বহু জিনিষের দাম অনেক সময় আন্তর্জাতিক বা অন্ততঃ আন্তঃপ্রাদেশিক ঘটনার উপর নির্ভর করে, আশঙ্কা হয় এ করভার শেষ পর্য্যন্ত কৃষকদের উপরে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। এ অবস্থায় কৃষকদের সারা বছরের জীবিকা হ'তে তাদের বঞ্চিত ক'রে হাটের সময় রোদবৃষ্টি থেকে আশ্রয় দিলেই সরকারের কর্ত্তব্য শেষ হয় না; বরং সেটি সরকারের অকর্ত্তব্য, এবং পরিণামে হাটের রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্যে কৃষকেরা সারা বছরের জীবিকা হ'তে কিছু করেও বঞ্চিত হ'তে সুরু করে, তাহ'লে তাদের অবস্থার উন্নতি কখনই হবে না। কাজেই সরকার যদি প্রয়োজন কালে সমস্ত পণ্য কিনে নিতে রাজী থাকেন, তাহ'লে তাঁদের দুঃসাহসে সকলেই আনন্দিত হবেন; তা না হ'লে এ কেবল অদূরদর্শিতার পরিচয়।

পরিশেষে একটি আইনঘটিত সন্দেহের কথা তুলে প্রবন্ধ শেষ করব। এ আইনটি যখন প্রস্তাবিত হয় তখন বলা হয়েছিল বাজার-কমিটি কর্ত্তৃক কোন নিষেধাজ্ঞার ফলে যদি কোন বাজারে কেনা-বেচা বন্ধ হয় এবং সে-কারণে বাজারের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহ'লে সে-মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সিলেক্ট কমিটিতে এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে বাজার-মালিকদের একটি বিশেষ অধিকার খর্ব্ব হয়েছে। ভারত-শাসন আইনের ২৯৯ ধারায় বলা হয়েছে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকার কোন সময়েই কোন জমি বা ব্যবসায়-কেন্দ্র সাধারণের তরফ থেকে হস্তগত করতে পারবেন না, যদি না তার যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় এবং শুধু যে জমি বা ব্যবসায় কেন্দ্র হস্তগত করলেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাই নয়, এতে কারুর কোন রকম অধিকার খর্ব্ব হ'লেও অনুরূপ ব্যবস্থা। এ ধারা দুটি পরস্পর-বিরোধী কি না আইনজ্ঞদের বিচার্য্য।



১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত